জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিক পত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রথম ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

১৯৪৮

প্রথম বর্ষঃ জানুয়ারী—১৯৪৮

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৯

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

প্রথম বর্ষ | জানুয়ারী—১৯৪৮ | প্রথম সংখ্যা

আমাদের কথা

পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজের উপরেই এখন বিজ্ঞানের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। আমাদের দেশেও বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ক্রমশ প্রশস্ততর হচ্ছে। বিজ্ঞানের ব্যবহারিক রূপ শুধু যন্ত্রে নিবদ্ধ নেই, দেশের উন্নতিকল্পে যে-কোনো ব্যাপক পরিকল্পনা ও ভাবনা-চিন্তাতেও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে এবং তার ফলে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং অনেক সময় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্পর্কিত বহু প্রশ্ন সাধারণ লোকের মনেও জাগতে শুরু করেছে। অথচ বিজ্ঞানের পক্ষে সবচেয়ে বেদনাদায়ক সংবাদ এই যে জনসাধারণ এর মারাত্মক অপপ্রয়োগের সমারোহ দেখেই বিজ্ঞানের ক্ষমতার প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু যে কারণেই হোক, অশুভের মধ্যে থেকেও অনেক সময় শুভের আবির্ভাব ঘটে।

গত যুদ্ধে বিজ্ঞানের যে ব্যভিচার হয়েছে বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার তুলনা নেই। এই যুদ্ধ বিশ্বের যাবতীয় সমাজকে যেন সমূলে উৎপাটিত করে দিয়ে গেছে। মানুষের জীবন যাত্রার ধারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু তবু আশার কথা এই যে বিভ্রান্ত মানুষ আবার বিজ্ঞানীকেই ডাকছে তাকে উদ্ধার করার কাজে, তার জন্যে নতুন সমাজ গড়ে তুলতে, তার খাদ্য উৎপাদনের উন্নততর কৌশল আবিষ্কারের জন্যে, তার মনুষ্যত্বের হৃত-মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে। সাধারণ লোকেও তাই আজ বুঝতে পারছে বিজ্ঞান তার অধিকার-বহির্ভূত সযত্ন-রক্ষিত কোনো গুণী সম্প্রদায়ের হাতের বিশেষ মন্ত্র নয়, বিজ্ঞান মানুষের সমাজকে ও জীবনধারাকে সুনিয়ন্ত্রিত, সুপরিচালিত ও সুসংহত করবার একটি পদ্ধতিও। বিজ্ঞান শুধু নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের কৌশল নয়, বিজ্ঞান তার চেয়েও বড়, অর্থাৎ বিজ্ঞান জীবনের সকল বিভাগে সামগ্রিক ভাবে প্রয়োগযোগ্য একটি কল্যাণময় বিধানও। তাই সে বুঝতে পারছে বিশ্ব-প্রকৃতির অঙ্গীভূত মানুষের সমাজ বিশ্ব-প্রকৃতির পরিচয় যত বেশি জানবে তত তার মনুষ্যত্বের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার অধিকার জন্মাবে। তাই সে একথা এখন হৃদয়ঙ্গম করছে যে বিজ্ঞান কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের স্বার্থের জন্যে নয়, বিজ্ঞান সকল সমাজের সকল মানুষের সম-সমৃদ্ধি গঠনের জন্যে।

কিন্তু পৃথিবীতে বড় বড় বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটলেও বিজ্ঞানের এই সামগ্রিক মহৎ আদর্শ সকল

দেশ সমানভাবে অনুসরণ করতে পারে নি। তা যদি পারত তা হলে জাতিতে জাতিতে এত সংঘর্ষ ঘটত না। তার কারণ বিজ্ঞান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশেষ সম্প্রদায়ের ক্ষমতা লাভের কৌশল হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং এত বড় বিপর্যয়কারী যুদ্ধের পর আজও যদি বিজ্ঞান কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের হাতে কেবল মাত্র মারণ অস্ত্র হিসাবেই ব্যবহৃত হতে থাকে তাহলে পৃথিবী ধ্বংসের মুখেই এগিয়ে যাবে। এই ধ্বংসের হাত থেকে পৃথিবীকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের মহৎ আদর্শে বড় হওয়া। কারণ ভারতবর্ষের মতো বিরাট সম্পদশালী দেশ যদি বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণাধীনে শক্তিশালী হয় তা হলে তা পৃথিবীর মধ্যে এক নতুন আদর্শের প্রবর্তন করতে পারবে। কিন্তু বিশ্বকল্যাণে ভারতবর্ষের যে প্রধান অংশ গ্রহণ করতে হবে সে চেতনা আমাদের দেশের মনীষীদের মনে জাগলেও কার্যক্ষেত্রে বিশেষ কিছু করবার অধিকার এতদিন আমাদের ছিল না। আজ অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই কাজে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অবিলম্বে এগিয়ে আসার সময় এসেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের আদর্শ কি, বিজ্ঞান কি, তা দেশের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার না হলে বিজ্ঞানীদের কাজ সহজ হতে পারে না। রাষ্ট্রের হাতে চরম ক্ষমতা থাকলেও যেমন দেশের লোকের ঐকান্তিক সহযোগিতা ভিন্ন রাষ্ট্র নির্বিঘ্নে চলতে পারে না, তেমনি বিজ্ঞানের আদর্শে দেশকে গড়ে তুলতেও দেশের লোকের ঐকান্তিক সহযোগিতা চাই। এই সহযোগিতার কাজে কিছু সাহায্যও হতে পারবে এই শুভ ইচ্ছায় মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রকাশ। এই কাগজে সাধারণ পাঠকের জন্যে যতদূর সম্ভব সহজ ভাষায় বিজ্ঞান সম্পর্কিত নানা বিষয় আলোচনা করা হবে। অবশ্য চর্চা ও সাক্ষাৎ সম্পর্কের অভাবে প্রথম প্রথম বিজ্ঞানের সহজ ভাষাও খুব সহজ বলে মনে না হতে পারে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, পাঠকের মনের সক্রিয় সহযোগিতা ও উৎসাহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ বাধা অল্প দিনেই দূর হয়ে যাবে।

দেশবাসীর মনে আজ শত রকম প্রশ্ন জাগছে, তার উত্তর সাধারণ প্রচলিত কাগজে পাওয়া সম্ভব নয়। সে জন্যেও জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মতো বিশেষ একখানি কাগজের দরকার আমরা অনুভব করেছি। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচার চেষ্টা এদেশে আগেও হয়েছে, কিন্তু আগেকার অবস্থা বিজ্ঞান বিষয়ক সাময়িক পত্রের অনুকূল ছিল না বলে তার ধারাবাহিকতা বজায় থাকেনি। আজ আমাদের অবস্থান্তর ঘটেছে। একদিকে শিক্ষায়তনসমূহে এখন মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শেখানো হবে, অন্য দিকে জনসাধারণও বিজ্ঞান-সচেতন হয়ে উঠছে। তা ছাড়া সাধারণ পাঠকেরও রুচির পরিবর্তন ঘটেছে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে দেশ স্বাধীন হওয়ায় দেশ উন্নয়নে বিজ্ঞানের যে ব্যাপক প্রয়োগ হবে তার জন্যে সাধারণ অশিক্ষিত লোকের মনও সজাগ হয়ে উঠেছে। সুতরাং সাধারণ শিক্ষা যেমন দ্রুত প্রসারিত হতে পারবে, সেই সঙ্গে দেশের মধ্যে বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞানের প্রচারও অপেক্ষাকৃত সহজ হবে।

এ কাগজ যে অবিলম্বে সাধারণ পাঠকের পক্ষে সরল পাঠ্য হবে সে আশা স্বভাবতই আমরা করি না। আজ এর আরম্ভ মাত্র, ধীরে ধীরে পাঠক-দের দাবী অনুসারেই এ কাগজ একটা বিশেষ রূপ নেবে সে বিশ্বাস আমাদের আছে, আর সেই বিশ্বাস নিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু হল।

বিজ্ঞানের পরিচ্ছেদ

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি

আমরা প্রকৃতির মধ্যে বাস করিতেছি। তাহাকে না জানিলে জীবন ধারণ অসম্ভব। সকল মানুষ কিছু কিছু জানে, বিশেষ কিছু জানে না। শিশু হাত পা ছুঁড়িয়া, হাতের দ্রব্য ধরিয়া টিপিয়া ঠুকিয়া ঠেলিয়া ছিঁড়িয়া চাখিয়া, যতরকমে পারে ততরকমে দ্রব্যটির গুণ জানিতে চায়। বয়স বাড়িতে থাকে, নানা পদার্থের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করে; বলে, ইহা গো, উহা বৃক্ষ। পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে, জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ, মানুষ যাবজ্জীবন তাহার হিতকর তাহার সুখকর পদার্থের অন্বেষণ করে।

এই জানা সামান্য জ্ঞান; বিশেষ জানা বিজ্ঞান। যাহা আছে, যাহা হইয়াছে, যাহা হইতেছে, এক কথায় ভূত,—ভূতের বিশেষ জ্ঞান, বিজ্ঞান। প্রাচীনেরা দেখিয়াছিলেন প্রকৃতি পঞ্চভূতাত্মক। পঞ্চ ভূতের নাম দিয়াছিলেন,—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম। ক্ষিতি পৃথ্বী, অপ্ জল, মরুৎ বায়ু, ব্যোম আকাশ, তেজস্ তাপ। এই সকল নামের বিশেষ অর্থ আছে। এ সকল নাম সংজ্ঞা। পৃথ্বীর ধর্ম যাহাতে আছে, সেটা পৃথ্বী। অন্নে পৃথ্বী আছে বলিলে বুঝায় না—অন্নে পৃথিবী আছে। সাদৃশ্য দেখিয়া নাম হইয়াছে। সংস্কৃতে অসংখ্য শব্দ দ্ব্যর্থ ত্র্যর্থ আছে। যেমন, অঙ্কুশ—হস্তীতাড়ন করণ; এবং সে আকারের বক্র নলের নামও অঙ্কুশ (syphon)। শর্করা—কঙ্কর; তৎ আকারের মিষ্ট দ্রব্য শর্করা। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক,—জ্ঞানের পাঁচটি দ্বার; রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ,—পঞ্চ জ্ঞান। পঞ্চভূত পঞ্চ জ্ঞানের বিষয়। প্রকৃতি এই পঞ্চভূতের খেলা।

মানুষ এই পঞ্চভূতকে আয়ত্তে আনিতে চায়। প্রকৃতিকে বর্গে বর্গে ভাগ করিয়া, বর্গিত করিয়া খেলা দেখিতেছে। পরিদৃষ্ট খেলা সূত্রবদ্ধ বা সূত্রিত করিতেছে। বহুকে অল্পে আনিতেছে। স্বর্গে ও অন্তরীক্ষে হাত যায় না; সেখানে চক্ষু একমাত্র ইন্দ্রিয় জ্ঞান আহরণ করিতেছে। যেখানে হাত যায়, সেখানে পঞ্চভূতের সন্নিবেশ বিপর্যস্ত করিয়া মানুষ নূতন ক্রিয়া ঘটাইতেছে, দৃষ্ট ফল সূত্রিত করিতেছে। এইরূপে যে জ্ঞান লব্ধ হইতেছে, তাহা বিজ্ঞান। মানুষ বিজ্ঞান দ্বারা প্রকৃতির গূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করিয়া তাহাকে বশীভূত করিতে চায়।

বিজ্ঞান এক বিশাল তরু। তাহার নানা শাখা-প্রশাখা জন্মিয়াছে। এক এক শাখা এক এক বিদ্যা। পঞ্চভূতের ক্রিয়ার বিদ্যা ভূতবিদ্যা। ইহা কি? কি পদার্থ?—কিমিতি বিদ্যা অনুসন্ধান করিতেছে। প্রাণীবিদ্যা প্রাণীর, উদ্ভিদ্-বিদ্যা উদ্ভিদের, ভূ-বিদ্যা ভূ-তলের, জ্যোতির্বিদ্যা জ্যোতিষ্ক-গণের জ্ঞান আহরণ করিতেছে। বিজ্ঞানী এক এক বিদ্যার অনুশীলন করেন; আর যিনি সমুদয় শাখা দৃষ্টি করেন, তিনি বৈজ্ঞানিক।

প্রকৃতির পরিচর্যা করিতে করিতে বৈজ্ঞানিকের কয়েকটি গুণ জন্মে। তিনি 'সৎ' লইয়া থাকেন,—সত্যবাদিতা ও মিতভাষিতা তাঁহার চরিত্রে পরিস্ফুট হয়। যিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় চিন্তা করেন, তাঁহার ঔদার্য ও আর্জব জন্মে, তিনি সর্বভূতে সমদৃষ্টি করিতে পারেন। এই এই লক্ষণ প্রকাশ না পাইলে বুঝিতে হইবে বিজ্ঞান অনুশীলন বৃথা হইয়াছে। বিজ্ঞানীর দৃষ্টি প্রসারিত হইতে পায় না। তাঁহার দৃষ্টি আংশিক, অপূর্ণ। কর্ম

বিভাগে ব্যবসায়ীর আয় বৃদ্ধি হয়; কিন্তু কার্মিকেরা মনে অঙ্গহীন ও অপূর্ণ মানুষ হইয়া দাঁড়ায়। ভূতবিৎ, কিমিতিবিৎ, কিম্বা অন্য বিদ্যাবিৎ একা একা কিছু করিতে পারেন না, পরস্পরের সাহায্যে অগ্রসর হ'ন। বিজ্ঞানীরাই কিন্তু বিজ্ঞান-তরুকে পুষ্ট, বর্ধিত ও ফলপ্রসূ করিয়া থাকেন। সাধারণ লোকে ইহাঁদের কৃত কর্ম দেখিতে পায়। আর বিজ্ঞানের নাম করিলে তর্ক নিরস্ত হয়।

বিজ্ঞান বলে অভাবনীয় ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে। লৌহ-নির্মিত বৃহৎ পোত বক্ষে একটি গ্রামের লোক রাখিয়া অগাধ-জলধি-জল 'ভু-ফাল' করিয়া ধাবিত হইতেছে; দিবা কি রাত্রি কি, সুযোগ কি দুর্যোগ কি, ভ্রূক্ষেপ নাই। পোতাধ্যক্ষ নিঃশঙ্ক চিত্তে গন্তব্য-স্থানে চলিয়াছেন। কোন্ সময়ে ভূ-পৃষ্ঠের কোন্ স্থানে আছেন তাহা জানিতে অকূল সমুদ্রেও ভুল হয় না। মাথার উপর দিয়া বায়ুযান চলিয়া গেল, গোঁ গোঁ শব্দ শুনিতেছি, কিন্তু দৃক্‌পাত করিতেছি না। জানি, বায়ুযানে দীর্ঘ-পথযাত্রী আছেন। নির্দিষ্ট সময়ে অভীষ্ট স্থানে উপনীত হইবেন। ধন্য মানবের বুদ্ধি, ধন্য তাহার বিজ্ঞান।

বহু বৎসর পূর্বে এক বারমাসিক পুস্তকে তড়িন্ময়ী নাম্নী কিঙ্করীর সেবাকর্ম বর্ণনা করিয়াছিলাম। তখন সে বালিকা ছিল; এখন সে বহুরূপা প্রবলা যুবতী। কভু অযুত হস্তীর বল ধরে, কভু সুকুমারী। রাত্রিকালে দীপ জ্বালায়; গ্রীষ্মে পাখা ঘুরায়; রন্ধনশালায় অন্ন পাক করে; দূরস্থ বন্ধুর কথা বহন করে, রাজপথে রথের অশ্ব হয়। পিশাচ-সিদ্ধ পিশাচ দ্বারা অলৌকিক কর্ম করিতে পারেন, কিন্তু তিনি সদা শঙ্কিত, অসাবধান হইলে পিশাচ তাহাঁর প্রাণবিনাশ করে। তড়িন্ময়ী কোথায় থাকে, তাহার স্বরূপ কেহ জানে না। কিন্তু বিজ্ঞানীর নিকট সে দাসী।

বিজ্ঞানীরা মানুষের সুখবৃদ্ধি চিন্তা করিতেছেন। রোগের যন্ত্রণা লঘু করিয়াছেন; বহু দুশ্চিকিৎস্য রোগের ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন; ক্ষেত্রে প্রচুর অন্ন উৎপাদন করিতেছেন; আর কাম-উপভোগের অসংখ্য উপকরণ সজ্জিত করিতেছেন। লোকে বিজ্ঞানকে ধন্য বলিতেছে, আর বিজ্ঞানীকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিতেছে।

কিন্তু সেই বিজ্ঞান-বলেই নরহত্যার অসংখ্য পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানী নিবিষ্টচিত্তে শত্রুর প্রাণ সংহারের উপায় অন্বেষণ করিতেছেন। পূর্বকালেও মানুষে-মানুষে, দেশে দেশে বৈরিতা হইত। যুদ্ধে লোকক্ষয়ও হইত। কিন্তু বর্তমান কালের সভ্য জাতি নগরকে নগর ভস্মীভূত করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। "এটমিক বম্" আবিষ্কারক ইহার করালী মূর্তি দেখিয়া নিজেই স্তম্ভিত হইতেছে। শুধু এইটিই নয়, শূন্য হইতে রোগের বীজাণু নিক্ষেপ করিয়া ভূ-পৃষ্ঠের গ্রাম, নগর, সুসমৃদ্ধ রাজধানীর জনগণকে নির্মূল করিবার বুদ্ধি প্রয়োগে ইতস্ততঃ করিতেছে না।

আমরা সে সব বৃত্তান্ত পড়িতেছি, আর ভাবিতেছি বিজ্ঞান মানুষের অধোগতি বর্ধিত করিয়াছে। যখন কৌরবেরা বিরাট-রাজের গোধন হরণ করিতে আসিয়াছিলেন, অর্জুন সম্মোহন বাণ দ্বারা কৌরব-সেনা মূর্ছিত করিয়াছিলেন; তখন ইচ্ছা করিলে তিনি বীরগণের মস্তক ছেদন করিতে পারিতেন, কিন্তু করেন নাই। মনু বিষ-দিগ্ধ বাণ এবং কর্ণী বাণ (যে বাণের কর্ণ থাকে, দেহে বিদ্ধ হইলে উৎপাটন করিতে পারা যায় না) নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

সভ্য মানুষ মনে করিতেছে, পরম সুখে আছি; অন্নকষ্ট নাই, বস্ত্রকষ্ট নাই, রোগ নাই, শোক নাই; কিন্তু বাস্তবিক শান্তি পাইয়াছে কি? কাম-উপভোগের বহুবিধ আয়োজন তাহার তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিয়াছে। কলিকাতায় নানাস্থানে ক্রূর নরহত্যা চলিতেছিল, কিন্তু একদিনের তরেও সিনেমা স্থগিত হয় নাই। যদি পাড়ায় পাড়ায় বিনামূল্যে সিনেমা দেখাইবার ব্যবস্থা

হয়, দিবারাত্রি রেডিওতে নানাবিধ গীত শুনিতে পাওয়া যায়, বিনামূল্যে অন্নপানীয় বিতরিত হয়, তাহা হইলে মানুষ সুখশান্তি ভোগ করিতে পারিবে কি? শুনিতে পাই, আমেরিকায় কেহ কেহ কর্মহীন হইয়া অবিরত তৃষ্ণা পরিতৃপ্তি করিতে না পারিয়া জীবন বিসর্জন করিয়াছে। বিজ্ঞানের পরিণাম কি এই?

বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, বিজ্ঞানের কি দোষ? মানুষের দোষ। যদি কেহ অগ্নি উৎপাদন করিতে শিখিয়া অন্যের গৃহে সংযোগ করে আর গৃহ ভস্মসাৎ হয়, সে দোষ মানুষের, অগ্নি-উৎপাদন-জ্ঞানের নয়। এই যুক্তি মানি, কিন্তু ইহাও মানিতে হইবে, বিজ্ঞান মানুষকে সদ্‌বুদ্ধি দেয় না, তাহাকে সৎপথে পরিচালিত করিতে পারে না।

বিজ্ঞান বহিঃ-প্রকৃতি বশীভূত করিতেছে, কিন্তু অন্তঃ-প্রকৃতির পরিচর্যা করে নাই। বিজ্ঞান কাহার জন্য? নিশ্চয়ই আমার জন্য। আমিই ভোক্তা, আমিই দ্রষ্টা; আমার যাহা হিত, তাহাই হিত। জড়বিজ্ঞান ইহা স্মরণ না করাতে সভ্য মানুষ সুখের অধিকারী হইয়াও অসুখী। বিজ্ঞান অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা না করিলে মানুষের কল্যাণ হইবে না।

অধ্যাত্ম-বিদ্যা কর্মে পরাঙ্মুখ করে, সংসারে উদাসীন করে। আমরা শক্তিমান্ ও উদ্যোগী হইতে চাই। ভূত-বিদ্যা বলেই সভ্য দেশ শক্তি-শালী ও কর্মঠ হইয়াছে। অতএব আমাদের দেশে ভূত-বিদ্যা বহু-প্রচারিত হউক, লোকের জড়তা দূরীভূত হউক। কিন্তু আমরা শান্তিও চাই। অতএব অধ্যাত্মবিদ্যাকে শিক্ষার ভূমি করিতে হইবে। ভূত-বিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যা একা একা সমাজ-স্থিতি করিতে পারে না। ইয়োরোপের পর পর দুই মহাযুদ্ধ তাহার প্রমাণ। সে দেশের বর্তমান ঈর্ষা দ্বেষ লক্ষ্য করিলে তৃতীয় যুদ্ধ আসন্ন মনে হয়।

এই কারণে ভারতী-প্রজ্ঞা শুধাইতেছেন, হে বৈজ্ঞানিক! তুমি কি অন্বেষণ করিতেছ? তোমার অন্বেষণের পরিচ্ছেদ পাইয়াছ কি? তুমি প্রকৃতির অবগুণ্ঠন ঈষৎ উন্মোচন করিয়াছ, কিছু ধ্রুব পাইয়াছ কি?

যুরোপ যখন বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে বিশ্বের রহস্য-নিকেতনের দরজা খুলতে লাগল তখন যেদিকে চায় সেই দিকেই দেখে বাঁধা নিয়ম। নিয়ত এই দেখার অভ্যাসে তার এই বিশ্বাসটা ঢিলে হয়ে এসেছে যে, নিয়মেরও পশ্চাতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের মানবত্বের অন্তরঙ্গ মিল আছে। * * * * একঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্যে দুর্বলতায় কাত হয়ে পড়েছি, আর ওরাই কি একঝোঁকা আধিভৌতিক চালে এক পায়ে লাফিয়ে মনুষ্যত্বের সার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌঁচচ্ছে।

—রবীন্দ্রনাথ (শিক্ষার মিলন)

রামেন্দ্র'র পথ না জগদীশ-প্রফুল্ল'র পথ ?

শ্রীবিনয়কুমার সরকার

কোন্ পথে চলিবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষৎ —প্রচারের পথে, না গবেষণার পথে ?

গবেষণাও জরুরি, প্রচারও জরুরি। তবে গবেষণাটা প্রচার নয়, আর প্রচারটাও গবেষণা নয়। গবেষণা এক চিজ। প্রচার আর এক চিজ। প্রচারে গবেষণায় ফারাক মেরুতে মেরুতে।

বিজ্ঞান-প্রচার বাংলাদেশে আজ নতুন নয়। প্রচারের জন্য একটা জবরদস্ত ব্যবস্থা হইয়াছিল বছর শয়েকেরও আগে। প্রচারক ছিলেন অক্ষয় দত্ত (১৮১০-৮৬)। তাঁহার মেজাজে ছিল ইয়োরামেরিকান বিজ্ঞানবিদ্যাগুলাকে বাংলার জমিনে আনিয়া খাড়া করানো। "তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা" (১৮৪৩) ছিল সেই পশ্চিমা বিজ্ঞান-বিদ্যার বাহন। বিজ্ঞান ছাড়া অন্যান্য মালও এই চৌবাচ্চায় মজুদ হইত। কিন্তু ধর্ম্ম-গবেষক আর দর্শন-গবেষক অক্ষয় দত্ত'র তদ্‌বিরে "তত্ত্ববোধিনী"র তত্ত্বের ভিতর পদার্থতত্ত্ব, উদ্ভিদ-তত্ত্ব, আর জীব-তত্ত্ব ইত্যাদি সেকেলে প্রাকৃতিক তত্ত্বের সব-কিছুই পাওয়া যাইত। সেই "তত্ত্ববোধিনী"র প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিষয়ক বিদ্যাগুলা খাইয়া উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের বাঙালীর বাচ্চারা বিজ্ঞান-নিষ্ঠ হইতে শিখিয়াছিল। সঙ্গে-সঙ্গে বাংলা গদ্যও শিখিয়াছিল। বাঙলায় বাঙালীর জন্য বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-প্রচারের আখ্‌ড়ায় অক্ষয় দত্ত নং ১ ওস্তাদ। কাল হিসাবেও বটে, মাল হিসাবেও বটে।

আর এক জবরদস্ত বিজ্ঞান-প্রচারক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১)। লোকেরা তাঁহাকে জানে ইতিহাস আর প্রত্নতত্ত্বের বেপারী বলিয়া। কিন্তু তাঁহার "বিবিধার্থ সংগ্রহ" (১৮৫১) পত্রিকা ছিল বাঙালী জাতের দ্বিতীয় "তত্ত্ববোধিনী"। এই হাটে সওদা বিকাইত রকমারি। সাহিত্যকে সাহিত্য, দর্শনকে দর্শন, ইতিহাসকে ইতিহাস আর বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান,—কোনো অর্থই বাদ পড়িত না। বাঙালীর বাচ্চারা রাজেন্দ্রলালের হাতে বিজ্ঞান খাইয়া বেশ-কিছু বৈজ্ঞানিক মাল রপ্ত করিতে পারিয়াছিল। একালের বাঙালী বিজ্ঞান-সেবক, বিজ্ঞান-গবেষক আর বিজ্ঞান-প্রচারকের বাবারা আর বাবার বাবারা অক্ষয় দত্ত আর রাজেন্দ্র মিত্র দুইজনের নিকটই চরমভাবে ঋণী ছিলেন। আমাদের একালের লোকেরা বোধ হয় সেকথা ভুলিয়া গিয়াছে।

বিজ্ঞান-প্রচারের তৃতীয় ধাপে দেখিতে পাই ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে (১৮২৫-৯৪)। ভূদেব ছিলেন পরিবার-শাস্ত্রী, আচার-শাস্ত্রী, সমাজ-শাস্ত্রী। তাঁহার হাতে ছিল "এডুকেশন গেজেট" পত্রিকা (১৮৬৮)। নাম ইংরেজি, কিন্তু কাম বাংলা। এই জন্য লোক-মহলে ভূদেব একমাত্র শিক্ষা-বিজ্ঞানের সওদাগর বলিয়া পরিচিত। ধারণাটা নেহাৎ একচোখো। "এডুকেশন গেজেট" পত্রিকার মারফৎ বাঙালীর পাতে পরিবেষণ করা হইত "বিবিধার্থ সংগ্রহে"রই হরেক-প্রকার জ্ঞান ও বিজ্ঞান।

অক্ষয়, রাজেন্দ্র, ভূদেব,—এই তিনজন ছিলেন বাঙালী বিজ্ঞান-প্রচারকদের কোঠে "বাঘা-বাঘা" পণ্ডিত। আজকালকার বিজ্ঞান-"গবেষকেরা" হয়ত এসম্বন্ধে বেশ-কিছু ওয়াকিব্‌হাল নন। তবে একালের বিজ্ঞান-প্রচারকদের পক্ষে এই ত্রিবীরকে দূর হইতে সেলাম ঠুকিয়া আখড়ায় হাজির

হওয়া উচিত। এই ত্রিবীর বাংলায় গদ্য-সাহিত্যের তিন বিপুল-বিপুল খুঁটা। এই জন্যও সকলেরই কুর্ণিশ-যোগ্য।

বিজ্ঞান-প্রচারের ঝুঁকি বাঙলার প্রত্যেক মাসিক পত্রিকাই নিজ ঘাড়ে লইয়াছে। এমন কোনো বড় বহরের মাসিক মাথা খাড়া করে নাই যাঁহার ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের ছিটে-ফোঁটা বাঙালী মহলে ছড়ানো হয় নাই। বিজ্ঞানের দরদ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর বাচ্চার জীবনে একটা মস্ত দরদ রহিয়াছে। একথাটা সর্ব্বদাই মনে রাখা ভাল।

১৯০১ সালে তের-চৌদ্দ বৎসর বয়সে মালদহ হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজে আসিয়া ঢুকিলাম। বিজ্ঞান-ঘেঁশা কোনো নামজাদা পত্রিকা তখন ছিল কিনা সন্দেহ। সে-যুগে বাংলা পড়ার রেওয়াজ বড় একটা ছিল না। কিন্তু জানিতাম যে, হোমিও-প্যাথিক ডোজের বিজ্ঞানশীল পত্রিকা ছিল অনেক-গুলা। তখনকার দিনে একজন জবরদস্ত্ বাঘা পণ্ডিত বিশেষরূপে বিজ্ঞান-প্রচারক বলিয়া নামজাদা ছিলেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক ইজ্জদ্ সেই অক্ষয়-রাজেন্দ্র-ভূদেবের চেয়েও বেশী। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর (১৮৬৭-১৯১৯) কথা বলিতেছি। তাঁহার সঙ্গে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসেবীদের কোনো বৈঠক, সঙ্ঘ বা আড্ডা গাঁথা ছিল না। তাঁহাকে চলিতে হইত একা-একা। কোনো পত্রিকার সঙ্গেও তাঁহার বাঁধা যোগাযোগ ছিল না।

সেকালের ছোকরা মহলে রামেন্দ্রসুন্দরের "প্রকৃতি" (১৮৯৬) বইয়ের নামডাক ছিল জবর। বইটার প্রবন্ধগুলা অক্ষয় সরকারের "নবজীবন" (১৮৮৪), সুধী ঠাকুরের "সাধনা" (১৮৯১) আর সুরেশ সমাজপতির "সাহিত্য" (১৮৯৪) ইত্যাদি মাসিকে বাহির হইয়াছিল। এই পত্রিকাগুলা বিজ্ঞান-খোরদের কাগজ ছিল না। ছিল "পাঁচ-ফুলে সাজি" বিশেষ। কিন্তু রামেন্দ্র ছিলেন সত্যিকার "বিজ্ঞান-খোর"।

অক্ষয়-রাজেন্দ্র-ভূদেবে আর রামেন্দ্রসুন্দরে প্রভেদ বিস্তর। সেই ত্রিবীর ছিলেন বিজ্ঞান-প্রেমিক মাত্র। তাঁহাদের পেশা বিজ্ঞান-প্রচারের উপরে বা বাহিরে যাইতে পারে নাই। বিজ্ঞানের ভিতরেও তাঁহারা ঢুকেন নাই। রামেন্দ্র মামুলি বিজ্ঞান-প্রেমিক আর বিজ্ঞান-প্রচারক মাত্র নন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞান-সিদ্ধ লোক, বিজ্ঞান-খোর পণ্ডিত, বিজ্ঞান-সেবক, বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান-সেবা ছিল তাঁহার আসল ও প্রধান পেশা। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত "জিজ্ঞাসা" বইয়ের প্রবন্ধগুলায়ও "প্রকৃতি" বইয়ের বিজ্ঞান-সাধকই হাজিরা দিয়াছেন। দর্শন, সাহিত্য, শিক্ষা, শিল্প, শব্দ, সমাজ, ধর্ম্মাধর্ম্ম, ব্যক্তিত্ব, সুনীতি-কুনীতি, বেদ, যজ্ঞ ইত্যাদি নানা মাল সম্বন্ধে রামেন্দ্রর মগজ মৃত্যু (১৯১৯) পর্য্যন্ত খেলিয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের আবহাওয়ায় তিনি ভাষা ও সাহিত্যের তাত্ত্বিকরূপে বাজার বসাইয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রবন্ধেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিদ্যা-গুলা তাঁহার প্রধান আলোচ্য ছিল। বিংশ শতাব্দীর যুবকবাঙলা প্রধানতঃ বা একমাত্র রামেন্দ্র-সাহিত্যকেই হাক্স্লে-সাহিত্য বা রেনাঁ-সাহিত্য সমঝিয়া থাকে। আমরা সেকালে বিজ্ঞান-লেখক, বিজ্ঞান-প্রচারক, বিজ্ঞান-প্রাবন্ধিক বলিলে রামেন্দ্র-কেই বুঝিতাম। গদ্য-রচনায় রামেন্দ্রিক রীতি আমাদের পছন্দ-সই ছিল।

একমাত্র বিজ্ঞান-প্রচারের মতলবে পত্রিকা চালানো হালের কথা। ১৯২৪ সালে "প্রকৃতি" দেখা দেয় দ্বৈমাসিক রূপে। হাল ধরিবার ভার ছিল পাখী-শাস্ত্রী সত্য লাহার হাতে। একালের বহু-সংখ্যক বিজ্ঞান-গবেষক আর বিজ্ঞান-প্রচা-রকের তিনি ব্যক্তিগত বন্ধু। বছর চোদ্দ ছিল এই পত্রিকার আয়ু। ইহার লেখকেরা প্রায় সকলেই বিজ্ঞান-বিদ্যার মাষ্টার-জাতীয় লোক। প্রত্যেকেই অল্পবিস্তর রামেন্দ্রর পথের পথিক। রামেন্দ্রর সমসাময়িক,—রাবীন্দ্রিক বোলপুরের জগদানন্দ রায়ও একালের অনেক যুবা মাষ্টারকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনায় হদিশ জোগাইয়াছেন।

"প্রকৃতি"র সঙ্গে কোনো সঙ্ঘ বা পরিষদের যোগাযোগ ছিল না। তবে মাঝে-মাঝে সত্য লাহার ঘরোআ বৈঠকে অথবা পাখীর বাগানে বিজ্ঞান-সেবক, বিজ্ঞান-প্রচারক, বিজ্ঞান-গবেষক ইত্যাদি লোকজনের তর্কাতর্কি, প্রশ্নাপ্রশ্নি ও কিঞ্চিৎ-কিছু মিষ্টি-মুখের ব্যবস্থা হইত। ফরাসী পারিভাষিকে সতু লাহার বৈঠকগুলা ছিল "সাল"-জাতীয় আড্ডা। এই সকল বৈঠকে কোনো-কোনো সময়ে ইয়োরা-মেরিকান নরনারীর আনাগোনাও ঘটিত।

দ্বৈমাসিক "প্রকৃতি"র যুগে রামেন্দ্রর মতন "সবে ধন নীলমণি"র ঠাঁই ছিল না। এই অবস্থায় গণ্ডা-গণ্ডা বা ডজন-ডজন ছোট-বড়-মাঝারি রামেন্দ্রর কলম চলিত। বিজ্ঞান-প্রচার সাধিত হইয়াছে অনেকগুলা বিজ্ঞান-সিদ্ধ, বিজ্ঞান-খোর, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের সহযোগিতায় বা প্রতি-যোগিতায়। বলিয়া রাখি যে, এই সকল লেখকদের কেহ-কেহ বিজ্ঞান-"গবেষণা"য়ও পাকা লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁহদের গবেষণার ফল প্রথমেই বাংলায় "প্রকৃতি"তে বাহির হইত না।

প্রথম বর্ষের "প্রকৃতি"র লেখকেরা বর্ণমালা মাফিক নিম্নরূপ (১৯২৩-২৪):—অতুল দত্ত (প্রাণ), অনিল ঘোষ (মাছ), উমাপতি বাজপেয়ী (রসায়ন), একেন ঘোষ (চিকিৎসা), জ্যোতির্ময় ব্যানার্জি (মাছ), দুর্গাদাস মুখার্জি (পিঁপড়ে), প্রফুল্ল রায় (শুভেচ্ছা), প্রশান্ত মহালানবিশ (আবহাওয়া) বনোয়ারী চৌধুরী (নৃতত্ত্ব), বলাই দত্ত (সমুদ্র), বিনয় পাল (প্রাণ), বিপিন সেন (আবহাওয়া), ভূদেব বসু (সাপ), যোগেন সাহা (রঙ), ল্যাঙ্কাস্টার (উদ্ভিদ), শ্যামাদাস মুখার্জি (গোলাপ), সত্য লাহা (পাখী), সুধীন রায় (পিঁপড়ে), সুরেশ দত্ত (ভূতত্ত্ব), সুবোধ মজুমদার (রসায়ন), ও হেম দাশগুপ্ত (ভূতত্ত্ব)।

১৯২৪-২৫ সালে এই অধম ইতালি, স্বইট্‌-সার্ল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও জার্মানি ইত্যাদি দেশে ভবঘুরে। সেখানে "প্রকৃতি"র সেবায় কিঞ্চিৎ-কিছু পাঠাইবার জন্য তাগিদ জুটিত। সেই তাগিদের জবাবে মাঝে-মাঝে বিজ্ঞান-গবেষণার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বিদেশী,—বোধ হয় প্রধানতঃ জার্মান,—তথ্য পাঠাইয়াছি। সে-সব যথাসময়ে ছাপাও হইয়াছে।

শেষ,—চতুর্দ্দশ,—বর্ষের (১৯৩৮) ছয় সংখ্যায় যে-সকল বিজ্ঞান-খোরের লেখা বাহির হইয়াছিল তাঁহাদের নাম করিয়া যাইতেছি, যথা:—গোপাল ভট্টাচার্য্য (পোকা), জ্ঞানেন্দ্র রায় (খাল-বিল-হ্রদ), জ্ঞানেন্দ্র ভাদুড়ী (প্রাণি-বিজ্ঞানের পরি-ভাষা), নিকুঞ্জ দত্ত (উদ্ভিদ্), প্রফুল্ল রায় (রসায়ন), বীরেন ঘোষ (সিকিম-হিমালয়ের উদ্ভিদ্), বিমল চ্যাটার্জি (প্রাণী), যোগেশ রায় (প্রাণি-বিজ্ঞানের পরিভাষা), শরৎ মিত্র (নৃতত্ত্ব), সত্য সেন (ভূতত্ত্ব), সত্য রায় চৌধুরী, সুধীর বসু (পরমাণু), সুরেন চ্যাটার্জি (বিজ্ঞানের ভাষা), সুরেশ সেন (প্রাণী)। ১৯৩৭ সালে জগদীশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। কাজেই ১৯৩৮-এর পত্রিকার অন্যতম সংখ্যায় জগদীশ-স্মৃতি, জগদীশ-সম্বর্দ্ধনা ও বসু-বিজ্ঞান-মন্দির ইত্যাদি বিষয়ক রচনা বাহির হয়। জগদীশ-লেখকদের নাম নিম্নরূপ:—গোপাল ভট্টাচার্য্য, চারুবালা মিত্র, জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ, নির্ম্মল লাহা, বীরবল সাহনি (লক্ষ্ণৌ), মেঘনাদ সাহা, যতীন সেনগুপ্ত, সত্যেন সেনগুপ্ত ও সুধীর বসু।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—চৌদ্দবৎসরের বেশী "প্রকৃতি" টেকসই হয় নাই। ১৯৩৮ সালে পাততাড়ি গুটাইবার সময় কর্ম্মাধ্যক্ষ বিদায় নিবেদনে জানাইতেছেন:—"মাতৃভাষার সাহায্যে বিজ্ঞান-সেবার যুগ এখনো বাংলাদেশে আসে নাই।" তাহার কারণও তিনি বাৎলাইতেছেন, যথা:—'এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজে সম্পূর্ণ উদাসীনতার ভাবই চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরিয়া আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি।" যাহা হউক, লোকসান সহিবার ক্ষমতা সতু লাহার ছিল। এই জন্য

বিজ্ঞান-সেবার আর বিজ্ঞান-প্রচারের আর এক ধাপ (১৯২৪-৩৮) বাঙালী সমাজে রহিয়া গেল। "শনৈঃ শনৈঃ পর্ব্বত-লঙ্ঘনম্।" জানিয়া রাখা ভাল যে, গণ্ডা-গণ্ডা বিজ্ঞান-খোর থাকা সত্ত্বেও বাংলায় "প্রকৃতি" টিকিল না।

আজ ১৯৪৮ সাল। বিজ্ঞান-প্রচারের জন্য একটা পরিষৎ কায়েম হইতেছে। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমানে বিজ্ঞান-সিদ্ধ, বিজ্ঞান-খোর, বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞান-প্রচারক গুনতিতে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই "প্রকৃতি" দ্বৈমাসিকের চেয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" মাসিক অনেক-বেশী সুবিধাজনক আবহাওয়ায় পয়দা হইল। বিজ্ঞানের জ্যোতিষীরা এই শিশুর কোষ্ঠী গুনিতে লাগুন।

সোজা চোখে দেখিতেছি যে, বিজ্ঞান-পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী ইস্কুল-কলেজে আজকাল হাজার-হাজার। আই-এস-সি, বি-এস-সি'র তো কথাই নাই। যাদবপুর আর শিবপুর কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রের দলও বেশ-কিছু বড়। আর ইহাদের পেটেও রকমারি বিজ্ঞান পড়ে। মায় ম্যাট্রিক ছাত্র-ছাত্রীরাও হাজারে-হাজারে বিজ্ঞান-বিদ্যাগুলার সঙ্গে মোলাকাৎ করিতে পারে। ঘটনাচক্রে বাংলা ভাষায়ই একালে বিজ্ঞান চালানো হইতেছে,—নিচের কোটায়। উহা একটা জবর কথা। এই কথাটার কিম্মৎ লাখ টাকা।

বিজ্ঞান-বিদ্যার ছোট-বড়-মাঝারি মাষ্টার একালে গুনতিতে বেশ পুরু। বিজ্ঞানের বই-লেখক, নোট-লেখক ইত্যাদি বিজ্ঞান-খোরেরা দু-পয়সা কামাইবার সুযোগ পাইতেছে। কাজেই বিজ্ঞান-প্রচার এযুগে আর কষ্ট-কল্পনার সাধনা না হইতেও পারে। ইহার ভিতর কৃচ্ছ্রসাধন, "তপস্যা" আর স্বার্থত্যাগের ঠাঁই হয়ত নাই। এমন কি দ্বৈমাসিক "প্রকৃতি"র যুগেও (১৯২৪-৩৮) বিজ্ঞান-প্রচারের কাজ স্রেফ লাহার পক্ষে স্বার্থত্যাগের কাজ বিবেচিত হইত। লেখকদেরকে তাগিদ দিতে-দিতে কর্মাধ্যক্ষকে চটিজুতার সুকতলা ক্ষয়াইতে হইয়াছে। তাঁহাকে হয়রান-পরেশান হইতে হইত। আর রামেন্দ্র'র যুগে (১৮৮৪-১৯১৯) তো এটা অতি-মাত্রায় আদর্শনিষ্ঠার, পথ-প্রদর্শকের আর ভাবুকতার কাজ ছিল। কিন্তু ১৯৪৮ সালে বিজ্ঞান-প্রচার কাণ্ডটা মামুলি ইস্কুল-কলেজের টেক্স্ট্ বুক প্রকাশের সামিল। "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" মাস মাস বাজারে দেখা দিলে বাঙালী জনসাধারণের লাভ ছাড়া লোকসান নাই মনে হইতেছে। দেখা যাউক।

একটা বিজ্ঞান-খোর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের দল আজকার বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের তদ্‌বিরে "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকার ঝুঁকি লইতেছেন। ঠিক এই দরের বিজ্ঞান-সাধক, বিজ্ঞান-খোর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের আড্ডা অক্ষয় দত্তর সেকাল হইতে আমাদের একাল পর্য্যন্ত বাংলায় আলোচনার জন্য বাঙালী সমাজে দেখা যায় নাই। এতগুলা পণ্ডিতে মিলিয়া বাংলা বৈজ্ঞানিক পত্রিকা কায়েম করেন নাই। ১৯৪৮ সালের এই বিশেষত্বটা খুবই মহত্বপূর্ণ। বাঙালী জাত্ ধাপে-ধাপে বাড়্তির পথে আগাইতে-আগাইতে আজ এক অপূর্ব্ব অধ্যায়ের সৃষ্টি করিতে চলিল। সত্যিকার একটা নয়া বাঙ্লা এই ধাপে কায়েম হইতেছে সন্দেহ নাই।

কাজেই আবার প্রশ্ন করিতেছি। কোন্ পথে চলিবে বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষৎ—গবেষণার পথে না প্রচারের পথে?

বলিয়াছি,—বিজ্ঞান-প্রচারের আসরে রামেন্দ্রকে "সবে ধন নীলমণি" সমঝিতাম। সেই যুগে বিজ্ঞান-"গবেষণার" দৌড় ছিল কিরূপ? বলা বাহুল্য, বিজ্ঞান-গবেষণা কী চিজ তাহা অক্ষয় দত্ত'রও জানা ছিল না, রাজেন্দ্র মিত্র'রও জানা ছিল না, আর ভূদেব মুখার্জিরও জানা ছিল না। আর সত্যি কথা,—এমন কি রামেন্দ্র ত্রিবেদীও বিজ্ঞান-গবেষণার ধার ধারিতেন না। তাঁহার সঙ্গে খাঁটি ল্যাবরেটরির যোগাযোগ একপ্রকার ছিল না বলিলেই চলে।

কাল হিসাবে বাঙালী জাতের প্রথম বিজ্ঞান-"গবেষক" জগদীশ বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) আর প্রফুল্ল রায় (১৮৬১-১৯৪৪)। ইঁহারা দুই জনেই নিজ-নিজ কোঠে রামেন্দ্র'র সমসাময়িক। যে-বৎসর রামেন্দ্র'র বিজ্ঞান-প্রচার সুরু হয় প্রায় সেই বৎসরই এই দুই বিজ্ঞান-সেবকের বিজ্ঞান-"গবেষণা"ও বাজারে বাহির হয়। ১৯০১-০৫ সালে আমরা জগদীশ ও প্রফুল্লকে বাঙালী জাতের দুই চোখ, দুই বিজ্ঞানবীর বলিয়া পূজা করিতাম। তখনকার দিনে এই দুই জন ছিলেন বিজ্ঞান-গবেষণার দুনিয়ায় বাঙালী সমাজের "সবে ধন নীলমণি"। ঘটনাচক্রে এই অধম দুই বিজ্ঞানবীরেরই অকিঞ্চিৎকর ছাত্র (১৯০১-০৩)। তবে পদার্থ-বিজ্ঞানে আর রসায়নে হাতে খড়ি পর্য্যন্ত হইয়াছিল। দৌড়টা তাহার বেশী যায় নাই। বুঝা যাইতেছে, যাহা কিছু এই আসরে বকিয়া যাইতেছি সবই অনধিকার চর্চ্চা মাত্র।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষৎ কায়েম হইতেছে বিংশ শতাব্দীর প্রায়-মাঝামাঝি। বিজ্ঞান-প্রচারের আখড়ায় আজ "সবে ধন নীলমণি"র যুগ আর নাই। এমন কি বিজ্ঞান-গবেষকের আখড়ায়ও আজ "সবে ধন নীলমণি"র যুগ নাই। রামেন্দ্র'র উত্তরাধিকারীরা আজকাল গুনতিতে ঢের। জগদীশ-প্রফুল্ল'র উত্তরাধিকারীরা গুনতিতে পুরু নয় বটে,—কিন্তু দলটা বেশ চলনসই। গোটা ভারতের হিসাব লইলে বোধ হয় কম-সে-কম শ-দেড়েক বাঙালী বিজ্ঞান-সেবক একালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে বহাল আছে। ছয় কোটি বঙ্গ-ভাষীর পক্ষে শ-দেড়-দুই বিজ্ঞান-গবেষক তুচ্ছ আর নগণ্য। কিন্তু ১৯০১-২০-এর তুলনায় ও পারিপ্রেক্ষিকে গোটা শ-দেড়-দুই নেহাৎ নিন্দনীয় আর ফেলিতব্য চিজ নয়।

সওয়াল এই,—রামেন্দ্র'র পথে চলিবে, না জগদীশ-প্রফুল্ল'র পথে চলিবে আজকার বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষৎ? মাতব্বরেরা মাথা ঠিক করুন।

আমি আদার বেপারী,—জাহাজের খবর রাখি না। কিঞ্চিৎ-কিছু আদার খবর রাখিয়া থাকি। ১৯২৬ সালে বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষৎ কায়েম করিয়াছি। বাংলা ভাষায় ধন-বিজ্ঞানের নানা শাখার অন্তর্গত তথ্য ও তত্ত্ব আলোচনা এই পরিষদের মতলব। আজ পর্য্যন্ত ধন-বিজ্ঞানের কোনো বাঙালী অধ্যাপক এই পরিষদে পায়ের ধূলা ফেলা উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। "আর্থিক উন্নতি" নামক মাসিক কাগজ চালাই-তেছি। ধন-বিজ্ঞানের কোনো বাঙালী অধ্যাপক এই পত্রিকায় কলম চালাইতে রাজি হইলেন না। কয়েক জন অবৃত্তিক এম-এ পাস করা গবেষকের সাহায্যে পত্রিকা চালানো হইতেছে। "বাংলায় ধন-বিজ্ঞান" (দুই ভাগ) আর "সমাজ-বিজ্ঞান" (প্রথম ভাগ) এই তিন খণ্ড বইয়ের প্রায় হাজার-দুই পৃষ্ঠাও এই সব হাতে বাহির হইয়াছে। লেখকেরা গুনতিতে হইবে গোটা পঞ্চাশেক। তাঁহাদের প্রায় কেহই ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যার মাষ্টারি করেন না। এম-এ (বা এম-এ, বি-এল) পাসের পর নানা পেশায় বাহাল আছেন।

অথচ বাংলা দেশের প্রায় শ-দেড়েক কলেজে কম-সে-কম শ-ছয়েক বাঙালী অধ্যাপক ধন-বিজ্ঞানের নানা শাখায় ছেলে-মেয়ে পিটাইতে অভ্যস্ত। এই সকল পণ্ডিতেরা লেখালেখি সম্বন্ধে এক প্রকার নির্ব্বিকার। বরাতের জোর,—লাহা-গুষ্টির আর এক প্রতিনিধি,—দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ,—নরেন লাহা তাঁহার বারান্দায় ধন-বিজ্ঞান পরিষদের টোল বসাইতে দিয়া থাকেন। আর তাঁহার টাকাটা-সিকিটা-দোয়ানিটা "আর্থিক উন্নতি"র মারফৎ ছাপাখানায় বিলি হয়। এই জন্য বাংলায় ধনবিজ্ঞান-প্রচার টিং-টিং করিয়া চলিতেছে। সত্যি কথা,—এই অধম তাহার সাধনায় ফেল মারিয়াছে।

এই গেল বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞান-প্রচারের দৌড় বাঙালী সমাজে। এখনো ধনবিজ্ঞান বিদ্যাটাকে ইস্কুল-কলেজে বাংলা ভাষায় পড়াইবার কানুন নাই। কাজেই টেক্‌স্টবুকের বাজার, নোটের বাজার ধনবিজ্ঞানের আসরে কায়েম হইতে পারে নাই। সুতরাং বাংলায় ধনবিজ্ঞান লেখালেখির বালাই আজ পর্য্যন্ত নাই। এই আখড়ায় দুপয়সা কামাইবার সম্ভাবনা একদম শূন্য।

অপর দিকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিদ্যার বরাত বেশ-কিছু ভাল। কেন না পাঠশালা আর ম্যাট্রিক্ ইস্কুলে হোমিওপ্যাথিক ডোজে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, খাদ্যবিজ্ঞান আর আবহাওয়াবিজ্ঞান হইতে বিজলী-বিজ্ঞান, গ্যাস-বিষ-বিজ্ঞান, জীবজন্তু-বিজ্ঞান আর নক্ষত্র-বিজ্ঞান পর্য্যন্ত সর্ব-কিছুই ছড়াইবার ব্যবস্থা আছে। আর তাহার জন্য বাংলা ভাষাই বাহন রূপে ব্যবহৃত হয়।

হাতের কাছে রহিয়াছে পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য প্রণীত "আকাশের মায়া" (১৯৪৭)। প্রথম অধ্যায়ের নাম "শূন্য ব্যোম অপরিমাণ।" কয়েক লাইন উদ্ধৃত করিতেছি, যথা:—"আমরা যে-সমস্ত জিনিষের সঙ্গে পরিচিত, তাদের মধ্যে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ছোটে আলো। অবশ্য শব্দও যে নেহাৎ আস্তে চলে, তা নয়। তা হলেও আলোর গতির কাছে দাঁড়াতে পারে এমন কোনো জিনিষ আমাদের জানা নেই।" পঞ্চানন ১৯৪৭-এর অন্যতম রামেন্দ্র। এই ধরণের আর এক রামেন্দ্র হইতেছেন ভূপেন্দ্র দাশ। তাঁহার "বাস্তব ও স্বপ্ন" (১৯৪৭) বইয়ে আইনষ্টাইনের মতগুলা জলের মতন বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য এই বস্তুটা জলের মতন বুঝা সম্ভব কিনা আলাদা কথা। এক তৃতীয় রামেন্দ্রর নামও করিতেছি। তিনি "বিজ্ঞান ও দর্শন" (১৯৪৭) বইয়ের লেখক অতীন বসু। রচনা তিনটাই, পাঠশালার ছেলে-মেয়েদের জন্য তৈরি।

যাহা হউক, বলিতেছি যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বিদ্যাগুলোর জন্য বাজার তৈয়ারী হইতে পারিয়াছে। সুতরাং এই কোঠে প্রচার আর প্রচারকের দল পুরু হইতেছে। ধনবিজ্ঞানের বেলায় সে-কথা খাটে না।

এদিকে যে দু-এক জন বাঙালীর বাচ্চা ধনবিজ্ঞানবিদ্যায় গবেষণা করেন তাঁহাদের পক্ষে বাংলা ভাষার পথ মাড়ানো আত্মহত্যার সামিল। ইংরেজিতে না লিখিলে তাঁহাদেরকে যাচাই করিবে কে? নক্‌রি দিবে কে? পদে বাড়াইবে কে? দরমাহায় উঁচাইয়া তুলিবে কে? ব্যস্। বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞানের গবেষণা-ঠবেষণা বিলকুল অচল।

আর প্রচারের ঝকমারি কে পোহাইতে চায়? অবশ্য মাসিক পত্রে চাই মাঝে-মাঝে রাষ্ট্রনীতির দস্তলওয়ালা আর্থিক প্রবন্ধ। সংবাদ-বিজ্ঞানের দস্তুরই তাই। এইজন্য পত্রিকার সম্পাদকেরা কয়েকজন কংগ্রেসপন্থী, সমাজতন্ত্রপন্থী, মজুরপন্থী অথবা কমিউনিস্টপন্থী লেখক ভাড়া করিয়া রাখেন। তাহাতে বাংলা ভাষার মারফৎ রাষ্ট্রিক অর্থশাস্ত্রের কয়েকটা বুখ্‌নি বাঙালী সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মন্দ কী? যা পাওয়া যায় তাই লাভ।

অতএব সোজা কথা ভাবিতেছি। বলিয়া রাখি। ১৯৪৮ সালের বাঙালী বিজ্ঞান-"গবেষকদের" পক্ষে নিজ-নিজ গবেষণার ফল প্রথমে বাংলায় প্রকাশ করা অসম্ভব। গবেষণাগুলার যাচাই বা দর-কষাকষির জন্য অ-ভারতীয় ভাষায় প্রকাশ করিতেই হইবে। এখনো অনেক দিন,—কত বৎসর পর্য্যন্ত বলা কঠিন,—বাঙালী বিজ্ঞানশাস্ত্রীদের পক্ষে ইংরেজি, ফরাসী, জার্মান, রুশ, ইতালিয়ান, স্পেনিশ ও জাপানী ভাষায় নিজ-নিজ গবেষণা প্রকাশ করা নেহাৎ জরুরি থাকিবে। যাঁহার যে-ভাষায় সুবিধা তাঁহার পক্ষে সেই ভাষার সদ্ব্যবহার করা উচিত,—বলা বাহুল্য। একমাত্র ইংরেজিকে বাঙালী পণ্ডিতদের পক্ষে বিজ্ঞান-গবেষণা প্রচারের বাহন সমঝিয়া রাখা ঠিক হইবে

না। জাপানীরা জার্মান, ফরাসী, ইতালিয়ান, রুশ ও স্পেনিশ ভাষার মারফৎও গবেষণা প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত। কথাটার দিকে বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের মাতব্বরেরা কান দিবেন কি?

তবে কি আমার মতে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের চলা উচিত একমাত্র রামেন্দ্রসুন্দরের পথে? জগদীশ-প্রফুল্ল'র পরবর্ত্তী বিজ্ঞান-গবেষকেরা—"প্রকৃতি"-দ্বৈমাসিকের পরবর্ত্তী বিজ্ঞানখোরেরা বিজ্ঞান-গবেষণার পথে এই পরিষৎকে চালাইবেন না কি? চালানো উচিত নয় কি? এক কথায় জবাব দিয়াছি,—সম্ভব নয়। আজও প্রধানতঃ বিজ্ঞান-প্রচারের পথেই—অর্থাৎ দ্বৈমাসিক "প্রকৃতি"র পথেই,—বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকাকে চলিতে হইবে।

তবে একমাত্র প্রচারের পথে নয়। "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকার আধাআধি বিজ্ঞান-প্রচারের কাজে বাঁধিয়া রাখা চলিতে পারে। বিজ্ঞান-প্রাবন্ধিকেরা রামেন্দ্রসুন্দরের পথে এবং দ্বৈমাসিক "প্রকৃতি"র পথে বাংলায় উঁচু বিজ্ঞানের মাল প্রচার করিতে থাকুন। পত্রিকার অপর অর্দ্ধেকটা বাঁধিয়া রাখা উচিত বাঙালী বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার ফল প্রকাশের জন্য। কোনো গবেষণা-প্রবন্ধ ইংরেজিতে, জার্মানে বা অন্য কোনো বিদেশী ভাষায় প্রকাশ করিবার পরেই বাঙালী বিজ্ঞান-খোরেরা তাহার চুম্বক বাংলায় প্রকাশ করিতে সুরু করুন। নিজ-নিজ গবেষণার চুম্বক নিজের লেখা বাংলা প্রবন্ধে বাহির করিতে থাকিলে তাঁহারা "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" পত্রিকাকে গবেষণার পথেই বেশ কিছু চলাইতে পারিবেন। তাহা হইলে বাঙালীর বাচ্চার পক্ষে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির উপযুক্ত কর্ত্তব্যপালন করা ঘটিয়া উঠিবে।

"জ্ঞান ও বিজ্ঞান" মাসিকটা "প্রকৃতি" দ্বৈমাসিকের পরবর্ত্তী ধাপ রূপে গড়িয়া উঠুক। হুবহু তাহার জুড়িদার যেন না হয়। জাহাজী কারবার সম্বন্ধে আদার বেপারীর পক্ষে এই পর্য্যন্ত বলা-কওয়াই যথেষ্ট। একালের বাঙালীজাতের ইজ্জৎ রক্ষা করিবার জন্য বিজ্ঞানখোরদের মজলিশে একটা প্রস্তাব পেশ করিয়া রাখা গেল। ইহার উপর বেশী-কিছু বলিতে গেলে মাতব্বরেরা লাঠ্যৌষধি লাগাইবেন আর বলিবেন:—"তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।" অতএব অনধিকার-চর্চ্চার খতম এইখানে।

আমি বাল্যকালে "দিগ্‌দর্শন" * হইতে প্রথম শিক্ষা করি—বেঞ্জামিন-ফ্রাঙ্কলিন্ ঘুড়ি উড়াইতে উড়াইতে উহার সিক্ত সূত্রে তড়িৎ প্রবাহ লক্ষ্য করেন, তাহা হইতেই 'lightening conductor'-এর সৃষ্টি।

—প্রফুল্লচন্দ্র (বাঙ্গলা গদ্য-সাহিত্যের ধারা)

---

* শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ১৮১৮ সনে "দিগ্‌দর্শন" নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। এটা প্রথম মাসিকপত্র। তাতে ইংরাজি ও বাংলায় লেখা প্রবন্ধ থাকত; উদ্ভিদ, প্রাণী, ভূগোল প্রভৃতি বিজ্ঞানের তথ্য আলোচিত হ'ত।

বিজ্ঞানের বিশ্বরূপ

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যুদ্ধার্থে সমবেত বহু প্রিয় পরিজন ও স্বজন বান্ধবদের নিরীক্ষণ করে এবং ভ্রাতৃবিরোধের নিদারুণ পরিণাম চিন্তা করে বীরবর অর্জুন যখন বিষাদক্লিষ্ট ও শোকাকুল হয়ে পড়েন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দিব্যজ্ঞান দান করেছিলেন, যার ফলে তিনি অপূর্ব ও অচিন্তনীয় বিশ্বরূপ দর্শনে সমর্থ হ'ন। গীতায় এ বিশ্বরূপের বিচিত্র বর্ণনা আমরা পাঠ করে থাকি। বর্তমানে বিজ্ঞানও যে দিব্যজ্ঞানের আবিষ্কার করেছে, তাতেও বিশ্বগতের এক অদ্ভুত চিত্র মানুষের নিকট উদ্ভাসিত হয়েছে। বিজ্ঞানের এ বিশ্বরূপ সম্পূর্ণ অভিনব। আমরা সাধারণতঃ রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দময় যে মনোরম জগৎ দেখ্‌তে পাই, তার সঙ্গে বিজ্ঞানের বিশ্বজগতের মোটেই কোন মিল নাই, যদিও এক নিগূঢ় সংযোগসূত্রে এ উভয় জগৎ গাঁথা রয়েছে। বিজ্ঞানের বিশ্বরূপের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষদের বন্ধুগণের অনুরোধ পালন করব, এ উদ্দেশ্যেই আজকের এ লেখার কাজে হাত দিয়েছি।

লিখতে গেলেই প্রথম কাগজ কলমের দরকার। তাই টেবিলের উপর কাগজ পেতে ঝরণা কলম হাতে বসে পড়লাম। তখনিই মনে হ'ল, টেবিলের উপর যে সাদা কাগজ রেখেছি, তা সত্যিই কি সাদা, টেবিলটাও সত্যিই কি এমন নিরেট কঠিন? আমাদের রক্ত-মাংসের চোখে না দেখে বিজ্ঞানের দিব্যচক্ষে যদি এদের দেখা যায়, তবে এদের কি-রূপ দেখায়? এ কথাই এখন আলোচনা করা যাক। সহৃদয় পাঠক মনে করবেন না যে আমি ধান ভানতে বসে শিবের গীত আরম্ভ করেছি। এ আলোচনাতেই আমরা বিজ্ঞানের বিশ্বরূপের কথঞ্চিৎ পরিচয় পেতে পারি।

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে জড়-জগতের যা কিছু আমরা দেখতে পাই তা সব একই উপাদানে গঠিত। সোনা, রূপা, তামা, লোহা, মাটি, পাথর, গাছপালা, জন্তু জানোয়ার, গ্রহ নক্ষত্র, হিন্দু মুসলমান শিখ খৃষ্টান,—সবাই গড়ে উঠেছে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সমাবেশে। সুতরাং আমার সাদা কাগজে বা টেবিলে প্রোটন এবং ইলেকট্রন ছাড়া আর কিছুই নাই। প্রোটন এবং ইলেকট্রন কিন্তু এক সঙ্গে এক স্থানে জড়ো হয়ে থাকতে পারে না। কাজেই আমার কাগজে বা টেবিলে যে সব প্রোটন ও ইলেকট্রন রয়েছে তারা সব অহরহ প্রচণ্ডবেগে চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে; এত বেগে তারা ছুটোছুটি করছে যে তাদের গতিবেগ বা স্থিতি-নির্দেশ বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষেও স্থির করতে পারেন না। এসব প্রোটন ইলেকট্রন মানুষের ইন্দ্রিয়বোধের সম্পূর্ণ অতীত, এমন কি বিজ্ঞানের বহু শক্তিশালী যন্ত্রের সাহায্যেও তাদের ধরা ছোঁয়া যায় না; শুধু তাদের কীর্তিকলাপ হ'তে বিজ্ঞানীরা এইমাত্র জানতে পেরেছেন যে প্রচণ্ডবেগে পরিস্পন্দনের ফলে তারা অনেক সময়ে তরঙ্গের মত আচরণ করে। পাঠক হয়ত প্রশ্ন করবেন—কিসের তরঙ্গ, কোথায় বা এ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়? বিজ্ঞানী বলবেন—বিদ্যুতের তরঙ্গ শূন্যের বা ঈথরের ভিতর দিয়ে। ঈথর কি যদি আবার কেউ এ প্রশ্ন করেন, তবে উত্তরে বলব ঈথর এমন একটি পদার্থ যা সকল স্থানে সকল পদার্থে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে

এবং যার কোন পরিমাণ নাই। কবির কথায় বলতে পারি—এ হচ্ছে "শূন্য ব্যোম অপরিমাণ"।

সুতরাং বিজ্ঞানের দিব্যচক্ষে যখন আমার কাগজের বা টেবিলের দিকে তাকাই, তখন দেখি যে কাগজখানি বা টেবিলটির ভিতর কিছুই নেই, যতখানিটা দেশ জুড়ে এরা আছে তাতে শুধু কতকগুলো ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন প্রোটন বা তরঙ্গের সমাবেশ। এ সব প্রচণ্ড গতিশীল বিদ্যুতের কণাগুলির সমষ্টিগত পরিমাণ বা আয়তন টেবিল বা কাগজের আয়তনের তুলনায় নগণ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। অর্থাৎ 'কাগজ বা টেবিলখানাকে এক প্রকার শূন্য বা ফাঁকি বলা যেতে পারে। তথাপি এরা আমার ইন্দ্রিয় বোধে বেশ ব্যবহারোপযোগী স্বতন্ত্র নিরেট পদার্থ। তার কারণ টেবিলের বিদ্যুৎকণাগুলি অনবরত উপরদিকে ছুটে কাগজের তলার বিদ্যুৎকণাগুলিকে প্রতিঘাত করছে, এর ফলে কাগজখানি টেবিলের উপর ঠিক হয়ে আছে এবং আমার কাজে কোন বাধা দিচ্ছে না। আসলে টেবিল বা কাগজের বেশির ভাগই ফাঁকা—শূন্য দেশ। বিজ্ঞানী বলবেন, এ শূন্য দেশের ভিতর দিয়ে কিন্তু বলের ক্ষেত্র (fields of force) বিরাজ করছে। বিজ্ঞানের বিশ্বরূপের উপাদান হচ্ছে বিদ্যুৎকণা, ঈথর, শক্তির একক (quantum) স্থৈতিক শক্তির ক্ষেত্র ইত্যাদি।

এরা পদার্থ-বাচক সত্তা নয়—সবই এরা অ-পদার্থ। এ সব অ-পদার্থকে বিজ্ঞানীরা অঙ্কশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থার ছাঁচে ঢেলে এক অভিনব বিশ্বজগৎ রচনা করেছেন। আমার শুধু চোখে কাগজখানি যে সাদা দেখাচ্ছে, বিজ্ঞানের বিশ্বজগতে তার কোন অর্থ হয় না। বিদ্যুৎকণাগুলির গতিবিধির পরিবর্তনের ফলে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, সে তরঙ্গগুলি আমার চোখে এসে পড়ায় আমার দেহ-মনে যে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে তাতেই কাগজখানি আমার নিকট সাদা দেখায়। কাগজের বিদ্যুৎকণার গতিবিধির পরিবর্তন ঘটে আবার সূর্য হতে যে ঈথর-বাহিত আলোক কণা বা আলোকতরঙ্গ আসে তার প্রতিঘাতের ফলে। সূর্য-দেহে বিদ্যুৎকণার প্রচণ্ড বেগে অবিরাম পরিস্পন্দনের দরুণ অনবরত এ আলোক-তরঙ্গের সৃষ্টি হচ্ছে। তার ফলেই আমাদের জগৎ আলো ও বর্ণ বহুল, আসলে রূপ বা বর্ণ বলে পদার্থের বা অ-পদার্থের কোন স্বকীয় ধর্ম নাই। তাই বিজ্ঞানের বিশ্বজগতে আমাদের পরিচিত জগতের কোন ধর্মই দেখা যায় না। এ হচ্ছে শুধু রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শ-বিহীন বিদ্যুৎকণা বা বিদ্যুৎতরঙ্গের লীলাখেলা মাত্র। সাধারণ ভাষায় তাই বলতে হয়, এর কোন বাস্তবতা নাই। এ যেন একটা সাঙ্কেতিক জগৎ, কেবল অঙ্কশাস্ত্রের নিয়ম-কানুনের ভিতর দিয়েই এর সন্ধান পাওয়া যায়। কারণ, এ আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের অতীত; অথচ আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের সংযোগে এসেই এ আমাদের চিরপরিচিত বিচিত্র বিশ্বজগতে পরিণত হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলবেন, আমাদের চিরপরিচিত বিশ্বজগতেরই আসলে কোন বাস্তবিক সত্তা নাই; কারণ বিজ্ঞানের বিশ্বজগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের সাহায্যে যখন আমাদের মনের সংযোগে আসে তখনিই এ দৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি হয়। তাই, আমাদের মনের বাইরে আমাদের পরিচিত বিশ্বজগতের কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না;—আমাদের বাইরে যদি কোন বহির্জগৎ থাকে তবে তা হচ্ছে বিজ্ঞানীদের বিশ্বজগৎ। মনের সৃষ্টিবলেই আমাদের চির পরিচিত দৃশ্যমান বিশ্বজগৎকে আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে—মায়া। বিজ্ঞানীরা এ মায়াকে এড়াতে গিয়ে যে বিশ্বরূপের দর্শন পেয়েছেন—তা হচ্ছে একটা ছায়া-জগৎ। আমাদের মনের ইন্দ্রজালে এ ছায়া পরিণত হয় মায়ায়,—শূন্যে পরিব্যাপ্ত কয়েকটি বিদ্যুৎকণা ধারণ করে নিরেট কঠিন টেবিলের আকার বা পাতলা সাদা কাগজের রূপ। এরূপে বিজ্ঞানের ছায়া-জগৎ রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে শব্দে এবং সুখে দুঃখে

মায়াময় ও আমাদের নিকট অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

তাই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, বাস্তব বলে যদি কিছু থাকে তা হলো আমাদের ইন্দ্রিয়-মনের বাইরে,—এবং সে বাস্তব জগৎ হচ্ছে শুধু তরঙ্গের লীলা-খেলা এবং সে তরঙ্গ যে কি তা শুধু বুদ্ধিযোগে অঙ্কশাস্ত্রেরই অধিগম্য। এ ছায়া এবং মায়া জগৎ,—এ অদৃশ্য এবং দৃশ্য জগৎ নিয়েই আমাদের কারবার। এ ছায়া এবং মায়া জগৎ ছাড়া যদি অন্য কোন জগৎ থাকে—অর্জুন যেমন এক নূতন বিশ্বজগতের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়,—তার সন্ধান বা বর্ণনা কোন বিজ্ঞানী বা অবিজ্ঞানী এ পর্যন্ত দিতে পারেন নি। পাঠকগণ হয়ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠছেন, মনে করছেন আমি শুধু হেঁয়ালির সৃষ্টি করছি। অতএব এখানেই বিদায় নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা চক্ষুর উপর বিশ্বাস অধিক। কিছুতে যাহা বিশ্বাস না করি, চক্ষে দেখিলেই তাহাতে বিশ্বাস হয়। অথচ চক্ষের ন্যায় প্রবঞ্চক কেহ নহে। যে সূর্য্যের পরিমাণ লক্ষ লক্ষ যোজনে হয় না, তাহাকে একখানি স্বর্ণথালির মত দেখি। প্রকাণ্ড বিশ্বকে একটি ক্ষুদ্র নক্ষত্র দেখি। * * * যে পরমাণুতে এই জগৎ নির্ম্মিত, তাহার একটিও দেখিতে পাই না। এই অবিশ্বাস-যোগ্য চক্ষু-কেই আমাদের বিশ্বাস। * * * * ভাগ্যক্রমে, মন বাহ্যেন্দ্রিয়াপেক্ষ দূরদর্শী; অদর্শনীয়ও বিজ্ঞান দ্বারা মিত হইয়াছে।

—বঙ্কিমচন্দ্র (বিজ্ঞানরহস্য)

পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা

শ্রীবীরেশচন্দ্র গুহ

পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যার অনুপাতে খাদ্যসমস্যা উদ্বেগজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে যে-সব দেশ তাদের চাহিদা মেটাবার মত খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারে না, তাদের সমস্যা হয়েছে আরও গুরুতর। মোটামুটি হিসেবে দেখা যায়, মোট যে পরিমাণ খাদ্য উৎপাদিত হয় তাতে পৃথিবীর প্রায় ২৫০ কোটি লোকের স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী খাদ্যের চাহিদা পূরণ করা অসম্ভব। তাছাড়া, এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাটিন আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশগুলো এই স্বল্প পরিমিত খাদ্যশস্যের যতটা অংশ পেয়ে থাকে, বিপুল লোকসংখ্যার অনুপাতে তা খুবই সামান্য। যুদ্ধের পূর্বে কোন্ কোন্ দেশ কি হারে পৃথিবীর মোট উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের অংশ পেয়েছিল তা নীচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে:—

১ নং তালিকা

পৃথিবীর মোট উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের শতকরা বণ্টনের হার

	রাশিয়া বাদে ইয়োরোপ	ইউ. এস. এস. আর. সমেত ইয়োরোপ	উত্তর আমেরিকা	লাটিন আমেরিকা	আফ্রিকা	এশিয়া	ওশেনিয়া
সাধারণ খাদ্যদ্রব্য	৩১'৯	৪৩	২৫'৩	৮'৮	৩'২	১৭'৪	২'৩
চাউল বাদে রবিশস্য	৩১'৪	৪৭'৬	৩৪'৬	৬'৬	২'৭	৬'৭	১'৮
চাউল সমেত রবিশস্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য	২৮'৪	৪১'২	২৪'৪	৫'৮	২'৫	২৪ ৬	১'৬
মাংস	৩৬	৪৫'৭	২৯'৭	১১'৯	৩'৪	৫'৬	৩'৭
কফি, চা, কোকো	০	—	—	৪২ ৪	১২'৩	৪৫'৭	০'২
কোটি হিসেবে লোকসংখ্যা	৩৮'৫	৫৪'৯	১৩'৭	১২'৪	১৪'৪	১১১'৪	১'১
মোট লোকসংখ্যার শতকরা হার	১৮'২	২৫'৯	৬'৫	৫'৭	৬'৭	৫২'৫	৫'৫
কোটি একর হিসেবে জমি	১৩৪	৬৫০	৫০০	৫১৮	৭৫০	৬৬০	২'০

উল্লিখিত হিসেব থেকে দেখা যাবে যে রাশিয়া-বাদে ইয়োরোপের লোকসংখ্যা এশিয়ার লোকসংখ্যার তুলনায় কিঞ্চিদধিক এক-তৃতীয়াংশ হলেও তারা এশিয়ার তুলনায় অনেক বেশী খাদ্যশস্য এবং দু'গুণ বেশী মাংস পেয়েছে। এই তালিকা থেকে অনায়াসেই বোঝা যায়—এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাটিন আমেরিকার লোকেরা কতটা অনশনক্লিষ্ট।

'এফ-এ-ও'র (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) হিসেব-মতে পৃথিবীর অর্ধেকেরও বেশী লোক মাথা-পিছু দৈনিক যে খাদ্য গ্রহণ করে, তা থেকে ২,২৫০ ক্যালোরীরও কম তারা পেয়ে থাকে। পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মাত্র ২,২৫০ ক্যালোরী পায়। বাকী লোকেরা পায়, এ' দুয়ের মাঝামাঝি পরিমাণ মাত্র। 'এফ-এ-ও'র মতে মধ্য-আমেরিকা এবং এশিয়ার অধিকাংশ স্থানেই খাদ্যের সর্বাপেক্ষা অভাব। যুদ্ধের পূর্বে কোন্ এলাকায় কত ক্যালোরীর খাদ্য সরবরাহ হতো নীচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে :—

২নং তালিকা

অঞ্চল	দৈনিক মাথাপিছু ক্যালোরী
ভারতবর্ষ	২০২৫
ইন্দোনেশিয়া	২০৩৫
দক্ষিণপূর্ব এশিয়া (মূল ভূখণ্ড)	২২২০
পূর্ব এশিয়া	২২২০
মধ্য আমেরিকা	২০৯০
ইউ. এস. এস. আর.	২৮২৫
ইউ. কে.	৩০১৫
স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া	৩০৭০
ওশেনিয়া	৩১৬০
উত্তর আমেরিকা	৩২৪০

প্রকৃত প্রস্তাবে খাদ্য কতটা খাওয়া হয় তা এ-তালিকা থেকে বোঝা যাবে না। মাথা-পিছু দৈনিক কত ক্যালোরী পাওয়া যেতে পারে এতে তারই হিসেব দেখানো হয়েছে। লোকেরা খায় এরও কম। একজন লোকের পক্ষে ৩,০০০ ক্যালোরী যদি দৈনিক অবশ্য-প্রয়োজনীয় বলে ধরা যায়, তবে উল্লিখিত তালিকা থেকে দেখা যাবে—পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেরই খাদ্যমান কত নীচে। এই সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, ইয়োরোপ ও উত্তর আমেরিকার অধিবাসীরা—যারা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী ও ভাল খাদ্য পায়—তাদের মধ্যেও শতকরা ৩০ থেকে ৫০ জন আধুনিক পুষ্টি-বিজ্ঞানের মতানুসারে শরীরোপযোগী পরিপূর্ণ খাদ্য পায় না, যদিও তারা সাধারণতঃ উপযুক্ত মাত্রায় ক্যালোরী পেয়ে থাকে।

কাজেই একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পৃথিবীর যাবতীয় লোকের যথোপযুক্ত খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হলে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এই উভয়বিধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। বছরে পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি ক'রে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেইজন্য পৃথিবীর খাদ্যসমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা আরও প্রবল হওয়া উচিত।

৩নং তালিকা

১৯৬০ সালে সমগ্র লোকসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের চাহিদা

(যুদ্ধের পূর্বেকার সরবরাহের ওপর মোটামুটি শতকরা প্রয়োজন-বৃদ্ধি দেখান হয়েছে)

খাদ্যদ্রব্য	শতকরা প্রয়োজন বৃদ্ধি
রবিশস্য	২১
মূল এবং কন্দ	২৭
চিনি	১২
স্নেহজাতীয় পদার্থ	৩৪
ডাল	৮০
ফল, তরিতরকারী বা শাকসব্জি	১৬০
মাংস	৪৬
দুধ	১০০

পৃথিবীর লোক শতকরা ২৫ জন হারে বাড়বে এই অনুমান ক'রে ও পুষ্টিসম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট সীমানার প্রতি লক্ষ্য রেখে ১৯৬০ সালে পৃথিবীর খাদ্যের প্রয়োজন যুদ্ধপূর্ব সরবরাহের ওপর মোটামুটি শতকরা কি হারে বৃদ্ধি পাবে 'এফ-এ-ও' তার একটা তালিকা ধরেছেন। উপরের ৩নং তালিকা দ্রষ্টব্য।

এই তালিকা থেকে দেখা যায়, অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কি বিপুল প্রচেষ্টার প্রয়োজন। নানা কারণে এশিয়ার বর্তমান খাদ্য-উৎপাদন ব্যবস্থা অতি নিম্নস্তরে রয়েছে। অন্যান্য দেশেও অনেক উর্বর জমি লোকাভাবে অনাবাদী পড়ে আছে। খাদ্যবৃদ্ধির জন্য ঐ সব স্থানে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন।

সমস্যা-সমাধানের উপায়

পৃথিবীর খাদ্য-সমস্যা অত্যন্ত জটিল। অঙ্গাঙ্গি-ভাবে যুক্ত অনেকগুলি দিক্ এর আছে; সমস্যা সমাধানের জন্য সবগুলিই একযোগে বিচার করতে হবে। বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির সমন্বয়ে এর প্রতিকার সম্ভব হতে পারে। প্রয়োজনের তুলনায় পৃথিবীর খাদ্য-উৎপাদন ব্যবস্থা যখন খুবই অসন্তোষজনক, আমেরিকা তখন বাড়তি খাদ্যশস্য গৃহপালিত পশুর খাদ্য-হিসেবে ব্যবহার করেছে। মূল্যহ্রাসের ভয়ও উৎপাদন-বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেসব ঘাট্‌তি এলাকা যথোপযুক্ত মূল্য দিয়ে খাদ্য-সংগ্রহে অক্ষম, বিভিন্ন গভর্নমেণ্ট পরস্পরের সঙ্গে সুবন্দোবস্ত করে বাড়তি এলাকা থেকে তাদের জন্য খাদ্য আমদানীর ব্যবস্থা করতে পারেন। সব দিক্ থেকে এই প্রশ্ন বিবেচনা করবার জন্য 'এফ-এ-ও' বিশ্ব-খাদ্য-সংসদ (World Food Council) গঠন করেছেন। এদের একটা প্রস্তাব ছিল—বিশ্ব-খাদ্য-ভাণ্ডারের মত একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। বাড়তি এলাকার সমস্ত উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য ধরে রাখা এবং যে সকল ঘাট্‌তি এলাকা যথোপযুক্ত মূল্য প্রদানে অক্ষম—আন্তর্জাতিক অর্থ-তহবিল থেকে ঋণ গ্রহণ ক'রে তাদের খাদ্য সরবরাহ করা হবে এদের কাজ। এভাবেই উৎপাদন-বৃদ্ধির প্রেরণা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব। এই ব্যবস্থায় ঋণগ্রহণকারী ঘাট্‌তি এলাকাগুলো ঋণ-পরিশোধের জন্য বিবিধ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে যত্নবান হবে। সংশ্লিষ্ট গভর্নমেণ্টগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা আর্থিক সামঞ্জস্য বিধানের ওপরই এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে। মোটের ওপর এ-ধরণের কোন পরিকল্পনা ব্যতিরেকে পৃথিবীর খাদ্য-সমস্যা-সমাধানের ব্যবস্থা দুষ্কর।

এখন এই সমস্যাসম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক এবং যান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার আলোচনা প্রয়োজন। খাদ্যের উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হবে। এই নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনে যেখানে জমির মালিক বা কৃষকদের চিরাচরিত সংস্কারে বাধবে (যেমন ভারতের বহুস্থানে হয়ে থাকে), সেখানে এর আমূল পরিবর্তন দরকার। যেখানে জমিসংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা এই বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণের পক্ষে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবে (যেমন ভারতের বহুস্থানে হয়ে থাকে), সেখানে তার আমূল সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। যৌথ কৃষিব্যবস্থাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথা অনুসরণের পক্ষে অনুকূল। সংরক্ষণের সুবন্দোবস্ত, পতিত জমির আবাদ, কৃষিকার্যের যান্ত্রিক ব্যবস্থা, ভাল বীজ নির্বাচন, কৃত্রিম এবং স্বাভাবিক সার ব্যবহার, জলসেচন প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করলে ফসলের উৎপাদন যে অনেক পরিমাণে বেড়ে যাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মোটামুটি হিসেবে দেখা গেছে, এ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে দশ বছরের মধ্যে ভারতের প্রতি-একর জমির ফলন শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পেতে পারে। অনুমান হয় যে, ভাল বীজ ব্যবহারে শতকরা ৫ ভাগ বাড়বে; সার ব্যবহারে বাড়বে শতকরা ২০ ভাগ; আর শতকরা ৫ ভাগ বাড়বে অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ

থেকে শস্যসংরক্ষণ ব্যবস্থায়। 'এফ-এ-ও'র বিশেষজ্ঞ সমিতি হিসেব করে দেখেছেন যে, ভারতবর্ষ বছরে ১৫ লক্ষ টন নাইট্রোজেন, ৭৫০,০০০ টন পটাস্ সার-রূপে ব্যবহার করতে পারে। বর্তমানে যে-পরিমাণ সার ব্যবহার হচ্ছে, এই সংখ্যা তার চেয়ে ২০ গুণেরও বেশী।

খাদ্য-উৎপাদনের ব্যাপারে উৎপাদনকারীদের অর্থসাহায্য প্রদানের প্রশ্নটা মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। উৎপাদনকারীদের বছরে ৯০০ কোটি টাকার মত সাহায্য দান ক'রে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তাদের দেশের খাদ্য-উৎপাদনের হার আশ্চর্যরূপে বাড়িয়ে তুলেছেন এবং দীনতম ব্যক্তিও যাতে আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতে পারে সেজন্য নিয়ন্ত্রিত মূল্যের ব্যবস্থা করেছেন।

গত কয়েক বছর যাবৎ ইংলণ্ডে আলু দশ আনা সের বিক্রয় হচ্ছে। কিন্তু ভারতবর্ষে খাদ্যের অবস্থা তেমন কিছুই উন্নত হয়নি। ভারতবর্ষ ১২৫ কোটি টাকার খাদ্যদ্রব্য—বিশেষ করে রবি-শস্যাদি—বিদেশ থেকে আমদানি করেছে। অথচ খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এ টাকার একটা সামান্য অংশও দেশের উৎপাদনকারীরা পায়নি। উৎপাদন-বৃদ্ধির জন্যে বৃটেন যে পরিমাণ অর্থব্যয় করেছে, ভারতের সেরূপ অর্থব্যয়ের ক্ষমতা না থাকলেও এই ধরণের কাজে সে অন্ততঃ কিছুটাও অগ্রসর হতে পারে। এই উপায়ে পৃথিবীর মোট-উৎপাদন বাড়বে এবং তার ফলে অপরিহার্য দ্রব্যাদি ক্রয়ে বৈদেশিক অর্থের (foreign exchange) ব্যয়ও কিছু পরিমাণে লাঘব হতে পারে।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহে শস্যের অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ, ইঁদুর প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় যেখানে উৎপাদন কম, সেখানেই আবার খাদ্যসংরক্ষণ ব্যবস্থা সুবিধা-জনক নয়। তার ফলে ঘাটতি আরও বেশী হয়ে থাকে। আধুনিক সংরক্ষণ-ব্যবস্থা চালু করলে একমাত্র ভারতেই মাছ, শস্য, তরিতরকারী, দুধ প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যের লক্ষ লক্ষ টন অপচয় নিবারণ করা যেতে পারে।

সুপরিচিত বৈজ্ঞানিক বিধিব্যবস্থা ছাড়াও খাদ্যসমস্যা-সমাধানের জন্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ভেবে দেখতে হবে। যুদ্ধের সময়ে জার্মেনীতে কাঠ থেকে চিনি তৈরী ক'রে তাতে 'ঈস্ট' জন্মানো হতো এবং সেগুলো গরুকে খাইয়ে যথেষ্ট দুধ পাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। জার্মেনী কয়লা থেকে স্নেহ পদার্থ উৎপাদন করেছিল। ১৯৪৬ সালে তেল-নিষ্কাশনের পর চিনাবাদামের শাঁস থেকে ময়দার মত একরকম পদার্থ তৈরী হতো এবং তা আটার সঙ্গে মিশিয়ে ব্যবহার করা হতো। চিনা-বাদাম-মিশানো আটার পুষ্টিকর শক্তি বেশী। আমেরিকাতেও রুটির সঙ্গে চিনাবাদামের গুঁড়ো মিশিয়ে ব্যবহার করতে অনেকে বলে থাকেন।

চাউলের বিষয় হিসেব করে দেখা গেছে, এদেশে যত আতপ চাউল ব্যবহৃত হয় তার শতকরা নব্বই ভাগ যদি সিদ্ধ করা হতো, বছরে প্রায় ৪০০,০০০ টনের মত (১ কোটি মণের বেশী) আস্ত চাউল পাওয়া যেত। কারণ সিদ্ধ চাউল ভাঙে কম। তাছাড়া সিদ্ধ চাউল আতপের চেয়ে বেশী পুষ্টিকর। এরূপ করতে হলে খাদ্য-অভ্যাসের কিছু পরিবর্তন করা প্রয়োজন। রবিশস্যাদির পরিবর্তে আলু ও কন্দজাতীয় পদার্থ বেশী পরিমাণে আহার করা উচিত। কারণ ঐ জাতীয় ফসলের উৎপাদন বেশী এবং বিঘাপ্রতি উৎপন্ন রবি-শস্যাদির তুলনায় ক্যালোরী-মানও বেশী পাওয়া যায়। আমাদের খাদ্যতালিকায় রবিশস্যাদির পরিবর্তে অন্ততঃ আংশিকভাবেও আলুর পরিমাণ বৃদ্ধি করলে আমাদের কিছু বেশী ক্যালোরী পাওয়ার সুবিধা হবে।

গাছের সবুজ পাতা বা ঐ ধরণের অন্যান্য পদার্থ মানুষের খাদ্যের একটা প্রয়োজনীয় উপকরণ হতে

পারে। গত কয়েক বছর ধরেই দেখান হয়েছে যে, এদের মধ্যে যে প্রোটিন আছে তার জৈবিক মান মাংসের প্রায় সমপর্যায়ের। এই প্রোটিন পৃথক করার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। গমের আস্ত গাছগুলাকেও মানুষের খাদ্যবস্তুতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা হয়েছে। সমুদ্রজলে যে বিপুল পরিমাণ প্লাঙ্কটন (plankton) ভেসে বেড়ায়, সেগুলাকেও খাদ্যের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার জন্য সংগ্রহের চেষ্টা হচ্ছে। তাছাড়া এমন আরও উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে, যা আপাত-অদ্ভুত বা অসম্ভব মনে হলেও ভবিষ্যতে কার্যকরী করে তুলতে পারা যাবে। তাতে পৃথিবীর খাদ্য-সরবরাহের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব।

জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধির ফলেই পৃথিবীর বর্তমান খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছে এ ধারণা অনেক অংশেই ভ্রমাত্মক। জনসাধারণ যদি অভিনব যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক কার্যপদ্ধতি অবলম্বনে প্রবুদ্ধ হয়—যদি অপ্রচলিত উৎস থেকে খাদ্যবস্তু আহরণে আগ্রহান্বিত হয়—যদি নির্দিষ্ট ধরণের খাদ্যগ্রহণের অভ্যাস অন্ততঃ কিছুটাও পরিবর্তনের চেষ্টা করে এবং যে সব সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার দরুণ বর্তমান যুগে কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন সীমাবদ্ধ করতে হচ্ছে, তাদের উৎসাদন করে, তবে দুনিয়ার লোকের খাদ্যসমস্যার জন্য উৎকণ্ঠিত হবার কোন কারণ থাকে না। জনসাধারণ আজ এই নতুন যুগের বৈপ্লবিক ভাবধারা গ্রহণ করবে কিনা এবং অগ্রগতির যে সুদূর-প্রসারী প্রশস্ত পথ সামনে উন্মুক্ত রয়েছে বিজ্ঞজনোচিত পন্থায় তা অনুসরণ করবে কিনা—এইটি হচ্ছে প্রশ্ন।

বাঙ্গালা ভাষা এখনও বিজ্ঞান প্রচারের যোগ্য হইতে বিলম্ব রহিয়াছে; কিন্তু এই বিলম্ব ক্রমেই অসহ্য হইয়া পড়িতেছে।...আমাদের বাঙ্গালা ভাষা বর্তমান অবস্থায় যতই দরিদ্র এবং অপুষ্ট হউক, উহা দ্বারা বিজ্ঞানবিদ্যার প্রচার যে একেবারে অসাধ্য, তাহা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি।.........

জ্ঞান-বিজ্ঞান মনুষ্য জাতির সাধারণ সম্পত্তি; দেশ বিশেষের বা জাতি বিশেষের ইহাতে কোনরূপ বিশিষ্ট অধিকার নাই।

রামেন্দ্রসুন্দর (অভিভাষণ, ১৩২০)

ভৌতিক আলো

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

অনেকদিন আগের কথা। সন্ধ্যার পর একদিন কয়েকজন মিলিয়া পল্লীগ্রামের একটা স্কুল বোর্ডিংএ বসিয়া গল্প করিতেছি। তখন বর্ষা সুরু হইয়াছে। বাহিরে ঘুঘরে পোকার একটানা কর্কশ আওয়াজ, নির্দ্দিষ্ট অন্তরায় ব্যাঙের ঐক্যতান এবং অনবরত টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি চলিতেছে। সকলেই গল্পে মসগুল। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হইয়া গেল—মুষলধারে বৃষ্টি। কিছু দূরেই গাছপালা বর্জ্জিত একটা বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এই প্রান্তরের মাঝখানে, ভূমি হইতে প্রায় চার পাঁচ হাত উঁচুতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মধ্যেই হঠাৎ যেন একটা আগুনের গোলা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। গোলাটা এলোমেলো ছুটাছুটি করিয়া প্রায় ১০।১৫ হাত তফাতে যাইতেই হঠাৎ আবার নিবিয়া গেল।

ব্যাপারটা নজরে পড়িয়াছিল অনেকেরই। কাজেই স্থান, কাল, পাত্রানুযায়ী এসব ক্ষেত্রে যাহা হয়, স্বভাবতই সেই ভৌতিক কাণ্ডের আলোচনা সুরু হইয়া গেল। কয়েকজন ছিলেন ভৌতিককাণ্ডে বিশ্বাসী। জনদুই তারস্বরে ভৌতিক ব্যাপারে তাঁহাদের অনাস্থার কথা ঘোষণা করিলেন। তাঁহাদের কথা হইতে মনে হইল—যুক্তি অপেক্ষা শিক্ষাভিমান আহত হইবার আশঙ্কাই তাঁহাদের এই অনাস্থা প্রকাশের কারণ। ভৌতিক ব্যাপার সম্পর্কে আমার কোন স্পষ্ট ধারণা নাই; কাজেই আমি বিশ্বাসীর দলেও নই, অবিশ্বাসীর দলেও নই।

কেমিষ্ট্রি ক্লাসে ফস্‌ফোরেটেড্ হাইড্রোজেন অথবা ফস্‌ফিন গ্যাসের পরীক্ষা দেখিয়াছিলাম। কষ্টিক পটাস্ সলিউসনে কয়েক টুকরা ফস্‌ফরাস ফেলিয়া দিয়া সামান্য উত্তাপ প্রয়োগ করিলেই এক প্রকার গ্যাস নির্গত হয়। এই গ্যাস বাতাসের সংস্পর্শে আসিবামাত্রই অঙ্গুরীয় আকারে জ্বলিতে থাকে। তাছাড়া, সিলিকন হাইড্রাইড নামে এক প্রকার গ্যাস এবং জিঙ্ক ইথাইল নামক এক প্রকার তরল পদার্থও বাতাসের সংস্পর্শে আসিবামাত্রই দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। স্বতঃ প্রজ্বলনক্ষম এরূপ আরও রাসায়নিক পদার্থের নাম করা যাইতে পারে। ফস্‌ফরাস্-সমন্বিত প্রাণীদেহ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ মাটির নীচে চাপা পড়িয়া পচিতে থাকিলে এই ধরণের স্বতঃ প্রজ্বলনক্ষম গ্যাস উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব নহে। এরূপ গ্যাস কোনক্রমে মাটি ভেদ করিয়া বাতাসের সংস্পর্শে আসিলেই আলেয়ার দৃশ্য দেখা স্বাভাবিক। রাসায়নিক পরীক্ষার কথা বর্ণনার পর শ্রোতার দল সকলেই চুপ করিয়া গেলেন।

এক প্রবীণ ভদ্রলোক অনেকক্ষণ ধরিয়াই এক কোণে জড়সড় হইয়া বসিয়াছিলেন। এতক্ষণ তিনি দুই একটি সামান্য কথা ছাড়া মুখব্যাদান করেন নাই। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তিনি বলিলেন—"আলেয়ার কথা না হয় বুঝিলাম, সেটা ভৌতিক ব্যাপার নয়; কিন্তু এমন অনেক ঘটনার কথা শোনা যায়, অতিরঞ্জন বাদ দিলেও যার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায় না। বিজ্ঞান অনেক কিছু অজ্ঞাত রহস্য উদ্ভেদ করিয়াছে বটে, কিন্তু সব কিছুই যে জানিতে পারিয়াছে—এমন কথা বলে না। তাছাড়া, অলিভার লজ এবং ক্রুক্‌সের মত বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকেরাও ভৌতিক ব্যাপারে আস্থাবান হইয়াছেন। কাজেই এইসব ব্যাপারের সত্যতা সম্বন্ধে তর্ক করিয়া

লাভ নাই। রাত্রিবেলায় একদিন এই গ্রামের দক্ষিণদিকে পাঁচীর মার ভিটাতে গেলেই হয়তো আপনাদের ধারণা বদলাইয়া যাইবে।”

অন্ধকাররাত্রিতে এই গ্রামের অনেকেই নাকি পাঁচীর মার ভিটাতে আগুন জ্বলিতে দেখিয়াছে। কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠিল—পাঁচীর মার ভিটার ব্যাপারটা দেখিতেই হইবে। ভূত বিশ্বাস করি বা না করি সংস্কারটা পুরাপুরিই আছে। স্থান এবং সময় বিশেষে একটা অজানা আশঙ্কায় যেন গা ছম্ ছম্ করিয়া ওঠে। কাজেই দুই একজন সঙ্গী যোগাড়ের চেষ্টায় রহিলাম। ভৌতিক ব্যাপারে অবিশ্বাসী বন্ধু দুইজন কাজের অজুহাতে সঙ্গী হইবার অসামর্থ্য জানাইলেন। যাহা হউক, দিন দুই চেষ্টার পরে স্থানীয় দুই ভদ্রলোক সঙ্গে যাইতে রাজী হইলেন।

উপরোক্ত ঘটনার দিনকয়েক পর দুইজন সঙ্গী লইয়া পাঁচীর মার ভিটার দিকে রওনা হইলাম। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। টিপ্ টিপ্ করিয়া অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। সঙ্গে ছাতা, লণ্ঠন ও দিয়াশলাই লইয়াছি। জঙ্গল, ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়া কর্দ্দমাক্ত পিছল রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রায় মাইল খানেক অগ্রসর হইবার পর পাঁচীর মার ভিটার নিকটে উপস্থিত হইলাম। সঙ্গীদের একজন তখন আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অনেক অনুরোধ উপরোধেও তিনি আর অগ্রসর হইতে রাজী হইলেন না, বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

অগত্যা দুজনেই আমরা সন্তর্পণে অগ্রসর হইলাম। ভিটার উত্তর প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছি। চারদিক জঙ্গলঘেরা খোলা মাঠের মত একটা বিস্তীর্ণ জায়গা। মাঝখানে কোন বড় গাছপালা নাই, কাজেই অনেকটা ফর্সা। কিন্তু চতুর্দ্দিকের বড় বড় গাছের ছায়ার মেঘলা রাতের অন্ধকার যেন জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণ দিকে কয়েকটা বড় বড় গাছ যেন জমাট অন্ধকারের বিরাট বোঝা মাথায় করিয়া নিঃসঙ্গভাবে দাঁড়াইয়া আছে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণেও কতকগুলি বড় বড় গাছ। অন্ধকারটা সেই দিকেই বেশী গাঢ়। আশে পাশে লোকালয় নাই। দূরে দুইখানা ঘর দেখা যায় মাত্র। চতুর্দ্দিকে মাঝে মাঝে ব্যাঙের ডাক আর উইচিংড়ি ও ঘুঘরে পোকার একটানা শব্দ। দুইজন একসঙ্গে আছি, সঙ্গে আলোও আছে, তবুও যেন কিরকম একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিলাম।

একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছি। ক্রমে ক্রমে মাঠের মাঝখানের ফর্সা জায়গায় আসিয়া পড়িলাম। জায়গাটা পরিষ্কার হইলেও মাঝে মাঝে উঁচু ঢিবির মত এক একটা লতাগুল্মের ঝোপ। এরূপ একটা ঝোপের আড়াল পার হইতেই দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের সেই জমাট-বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা অস্পষ্ট আলোর রেখা দেখা গেল। লণ্ঠন আড়াল করিয়া সেই স্থানে থমকিয়া দাঁড়াইলাম। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর আর একটু আগাইয়া দেখিলাম স্পষ্ট আলো আসিতেছে। কোনও পরিবর্ত্তন নাই। আর একটা ঝোপ ঘুরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতেই সেই ঘনসন্নিবিষ্ট গাছগুলির নীচে পরিষ্কার একটা উজ্জ্বল আলো দৃষ্টিগোচর হইল। ভয়ে আমরা পরস্পর জোরে জোরে কথা বলিতেছিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়—আমাদের কথোপকথনের ফলেও আলোটার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গেল না, যেমন ছিল তেমনই জ্বলিতে লাগিল। অনেকটা ভরসা হইল।

পশ্চিমদিকে ঘুরিয়া আরও খানিকটা পথ আগাইয়া গেলাম। সঙ্গীটি কিন্তু এবার অগ্রসর হইতে নারাজ, তিনি আলোটাকে ছাতার আড়াল করিয়া সেখানেই উবু হইয়া বসিয়া পড়িলেন। কি করি! আরও অগ্রসর হইব কিনা ভাবিতেছি—ইতিমধ্যে আলোটা যেন হঠাৎ নিবিয়া গেল; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কয়েকবার ক্রমাগত এইরূপই ঘটিতে লাগিল—

একবার নিবে আবার জলে, তারপর অনেকক্ষণ আবার একটানা স্থির আলো। সঙ্গীটি ফিরিয়া আসিবার জন্য জোর তাগিদ দিতে লাগিলেন। ভয়ে গা ছম্ ছম্ করিতেছিল সত্য; কিন্তু তবুও যেন কেমন মনে হইতেছিল—ওটা ভৌতিক ব্যাপার নয়, অন্যকিছু একটা হইবে। সঙ্গীর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া আরও খানিকটা অগ্রসর হইলাম—প্রায় চার পাঁচ হাত দূরেই বেশ বড় একটা অগ্নি-কুণ্ড। আগুনের শিখা নাই। কাঠকয়লা পুড়িয়া যেরূপ গনগনে আগুন হয়, দেখিতে অনেকটা সেই রকম। কিন্তু আলোর তীব্রতা নাই। অতি স্নিগ্ধ নীলাভ আলোতে আশেপাশের ঘাসপাতাগুলি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। আলোয় আকৃষ্ট হইয়া কতরকমের পোকামাকড় যে সেখানে ভীড় জমাইয়াছে তার ইয়ত্তা নাই। কর্ত্তিত একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি হইতে আলো নির্গত হইতেছিল। সমস্ত গুঁড়িটাই জ্বলিয়া জ্বলিয়া যেন একটা অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হইয়াছে।

এই রকম অপরূপ দৃশ্য আর কখনও দেখি নাই। বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। সঙ্গীকে নির্ভয়ে কাছে আসিতে বলিলাম। লণ্ঠনের আলোতে অগ্নিকুণ্ডটা যেন নিষ্প্রভ হইয়া গেল। দেখিলাম—গুঁড়িটার অনেক অংশই পচিয়া গিয়াছে। গুঁড়িটার পাশে, আমাদের দিকে, বড় একটা কচুগাছ জন্মিয়াছিল। তাহার একটা পাতা নীচের দিকে এমনভাবে হেলিয়া পড়িয়াছিল যে একটু বাতাসেই উপরে নীচে উঠানামা করিয়া আন্দোলিত হইতে থাকে। দূর হইতে আলোটাকে বারে বারে জ্বলিতে ও নিবিতে দেখিয়াছিলাম—এতক্ষণে তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলাম। গুঁড়িটার মধ্য হইতে আলোবিকিরণকারী কতক-গুলি কাঠের কুচি সংগ্রহ করিয়া অক্ষত দেহে পাঁচীর মার ভিটা হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

পরের দিন সকালবেলায় গিয়া আরও কাঠ সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। দিনের বেলায় সাধারণ পচা কাঠ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাইত না। রাত্রির অন্ধকারে প্রত্যেকটি টুকরা নীলাভ স্নিগ্ধ আলোয় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত। কিন্তু আলোর ঔজ্জ্বল্য ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল। দিন দুই পরে আলো দেওয়া একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। কতকগুলি সাধারণ কাঠ কেমন করিয়া আলো বিকিরণ করে চেষ্টা করিয়াও তখন তাহার কারণ বুঝিতে পারি নাই।

এই ঘটনার কিছুকাল পর আশ্বিনের মাঝামাঝি একদিন রাত্রিবেলায় পল্লীগ্রামের পথ দিয়া আসিতে-ছিলাম। একটা প্রকাণ্ড জলাশয়ের পাশ দিয়া পথটা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে। সেই সময়টায় দুই তিন দিন যাবৎ মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইতেছিল। সেইদিনও সন্ধ্যার পূর্ব্বে কিছু বর্ষণ হইয়াছিল। সংকীর্ণ পথের দুইধারেই অসংখ্য আসশ্যাওড়া ও ভাঁটগাছের জঙ্গল—হঠাৎ একটা জায়গায় নজর পড়িতেই মনে হইল যেন ভাঁটগাছগুলির মধ্যে অসংখ্য জোনাকি জ্বলিতেছে। বিশেষ ভাবে একটু লক্ষ্য করিতেই দেখিলাম, কেবল এক জায়গাতেই নয়, আশে পাশে প্রায় সর্ব্বত্রই এখানে সেখানে অসংখ্য জোনাকি। অন্ধকারে প্রথমতঃ মনে হইয়াছিল গাছের পাতার উপর বসিয়াই জোনাকিগুলি আলো বিকিরণ করিতেছে, কিন্তু একটা খট্‌কা লাগিল—এতগুলি জোনাকি একদিকে সমবেত হইয়াছে কেন? বিশেষতঃ একটাকেও নড়াচড়া করিতে দেখিতেছি না—ইহারই বা কারণ কি? জোনাকিরা থামিয়া থামিয়া আলো বিকিরণ করে এবং কখনও এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। এ-আলো যে স্থির, নিশ্চল। তবে কি কেঁচোর রস জ্বলিতেছে? হয়তো বৃষ্টির জলে কেঁচোরা গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং তাহাদের গাত্রনিঃসৃত রস হইতে আলো নির্গত হইতেছে। কিন্তু এত কেঁচো আসিবে কোথা হইতে? বিশেষতঃ ঐরূপ কেঁচো থাকিলে রাস্তার উপর নিশ্চয়ই দুই একটার আলো দেখা যাইত।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পথে যতই অগ্রসর হইতেছি, ততই যেন আলোক-বিন্দুর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। রাস্তার এক পাশে আনারস গাছের ঝোপ বেশ খানিকটা জায়গা জুড়িয়া রহিয়াছে। সেই ঝোপটার নীচেই আলোর পরিমাণ অনেক বেশী বোধ হইল। কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিবার পর ছাতার ডগায় করিয়া খানিকটা আলোক বিকিরণকারী পদার্থ তুলিয়া লইলাম। ছাতার ডগায়ও সেই পদার্থ পূর্ব্বের মত স্নিগ্ধ আলো বিকিরণ করিতেছিল।

ঘরে আনিয়া আলো জ্বালিতেই দেখি ছাতার ডগার আলো অদৃশ্য হইয়াছে। খানিকটা ভিজা মাটি আর কয়েকটা দুর্ব্বাঘাস ছাড়া ছাতার ডগায় আর কিছুই ছিল না। ঘর অন্ধকার করিতেই সেই দুর্ব্বাঘাস কয়টি যেন বিজলি বাতির ফিলামেণ্টের মত জ্বলিয়া পুনরায় স্নিগ্ধ আলো প্রদান করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যে ভৌতিক আলোর কথা বলিয়াছি, এই আলোও দেখিতে ঠিক সেই রকমের। যে কারণেই হউক ঐরূপ তৃণগুল্ম হইতেই যে আলো নির্গত হইতেছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ রহিল না। ফিরিয়া গিয়া সেই স্থান হইতে আলো বিকিরণকারী আরও অনেক লতাপাতা সংগ্রহ করিয়া আনিলাম। দেখা গেল—মাটিতে থাকিয়া পচিবার পর শুষ্ক হইয়াছে এইরূপ প্রায় সকল প্রকার লতাপাতা হইতেই আলো নির্গত হইয়া থাকে। পাচীর মার ভিটার গাছের গুঁড়ি হইতে নির্গত আলো আর এই ঘাসপাতার আলো যে অভিন্ন এ বিষয়ে আর কোন সংশয় রহিল না।

সংগৃহীত লতাপাতাগুলি বিছানার পাশে রাখিয়া সারারাতই মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম সমভাবেই আলো বাহির হইতেছে। লতাপাতাগুলি একই ভাবে থাকিলেও পরের দিন রাত্রিবেলায় তাহা হইতে একটুও আলো বাহির হইল না। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম—সেগুলি সম্পূর্ণরূপে শুকাইয়া গিয়াছে। আগের দিন ভিজা অবস্থায় ছিল। তবে কি এইজন্যই আলো দিতেছে না? জল ছিটাইয়া পাতাগুলি ভিজাইয়া দিলাম; পনর-বিশ মিনিট পরে ধীরে ধীরে আলো ফুটিতে লাগিল।

অনুসন্ধানের ফলে দেখিয়াছি—আমাদের দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই যথেষ্ট পরিমাণ আলো বিবিরণকারী লতাপাতা থাকিলেও উপরোক্ত কারণেই একমাত্র বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময়ে এই অদ্ভুত আলো দৃষ্টিগোচর হয় না। পিচ্‌কিরির সাহায্যে বনে জঙ্গলে জল ছিটাইয়া দেখিয়াছি, বর্ষা ছাড়া অন্য ঋতুতেও এরূপ আলো ফুটিয়া উঠে। অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োগে এই আলোর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়; কিন্তু নাইট্রোজেন প্রয়োগে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করিলে আলো বিকিরণ-কারী লতাপাতার মধ্যে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূতার মত পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা এক জাতীয় ছত্রক-সূত্র। 'রানার' বা প্রবহনীর সাহায্যে কোন কোন উদ্ভিদ্ যেমন বংশ বিস্তার করে, ছত্রক জাতীয় উদ্ভিদেরাও সেরূপ অনেক ক্ষেত্রেই সূক্ষ্ম সূত্র সাহায্যে বংশ বিস্তার করিয়া থাকে। এই ছত্রক-সূত্রের সঙ্গে জলের সংস্পর্শ ঘটিলেই তাহা হইতে এরূপ নীলাভ, স্নিগ্ধ আলো নির্গত হইয়া থাকে। সাধারণ কাঠ, খড় পচাইয়া আলো বিকিরণকারী লতাপাতার সংস্পর্শে কিছুদিন রাখিয়া দিলে ছত্রক-সূত্র অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহা-দিগকেও জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তোলে। পচা কাঠ, খড়, লতাপাতা হইতেই ছত্রক-সূত্র আহার্য্য পদার্থ সংগ্রহ করিয়া জীবিত থাকে। কিন্তু ইহাদের জীবন দীর্ঘস্থায়ী নয়। উপযুক্ত আহার্য্য বস্তুর প্রাচুর্য্য থাকিলে অতি দ্রুত গতিতে বংশ বিস্তার করিতে পারে।

আলো বিকিরণকারী লতাপাতা সম্পর্কে অনুসন্ধানের ফলে আমাদের আশেপাশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আরও অনেক রকমের ঠাণ্ডা আলোর সন্ধান পাইয়াছিলাম; ইহাদের মধ্যে জোনাকির আলো, কেঁচো, কেন্নো এবং অন্যান্য কীটপতঙ্গের আলো অনেকের নিকটই সুপরিচিত। তাছাড়া,

ভৌতিক আলো: লেখক কর্তৃক গৃহীত ফোটোগ্রাফ

উপরে: আলোবিকিরণকারী ব্যাঙের ছাতা

নীচে: ফ্লাস্কের মধ্যে সমুদ্র জলের আলো
অন্ধকারে ওই আলোর সাহায্যেই ফোটো
উঠিয়াছে
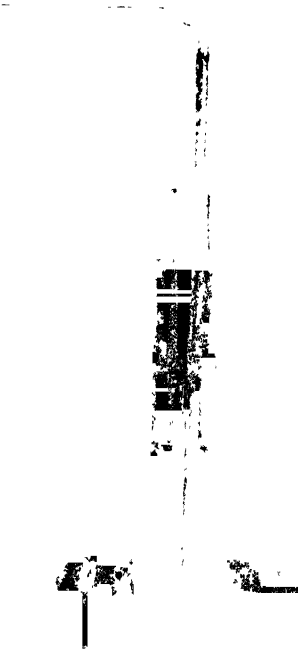
উপরে: ফ্লাস্কের মধ্যে অ্যাগার মিডিয়ামে
আলোক বীজাণুর বংশবৃদ্ধি করা হইয়া
ঐ আলোতেই দীর্ঘ সময় এক্সপোজারে ফোটো তে

নীচে: আলো দেওয়া ব্যাঙের ছাতা
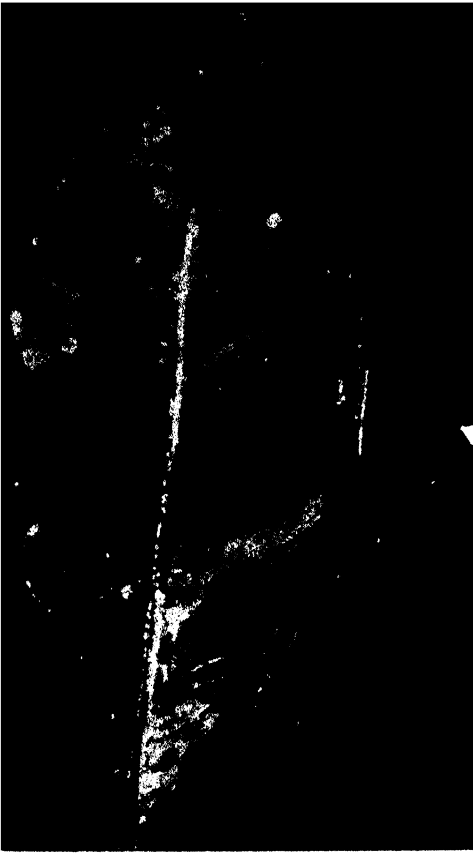
উপরে : চিংড়ির শরীর হইতে আলো নির্গত হইতেছে
ঐ আলোকেই কয়েক ঘণ্টা এক্সপোজারে
ফোটো তোলা হইয়াছে

নীচে : আলোক বিকিরণকারী কাষ্ঠখণ্ড

ারে : পচা পাতার আলো বিকিরণ
সময় এক্সপোজারে পাতার আলোতেই
ফোটো তোলা হইয়াছে

লাবিকিরণকারী লতাপাতার সংস্পর্শে এই পাতাও
শঃ আলোবিকিরণক্ষম হইয়া উঠিয়াছে
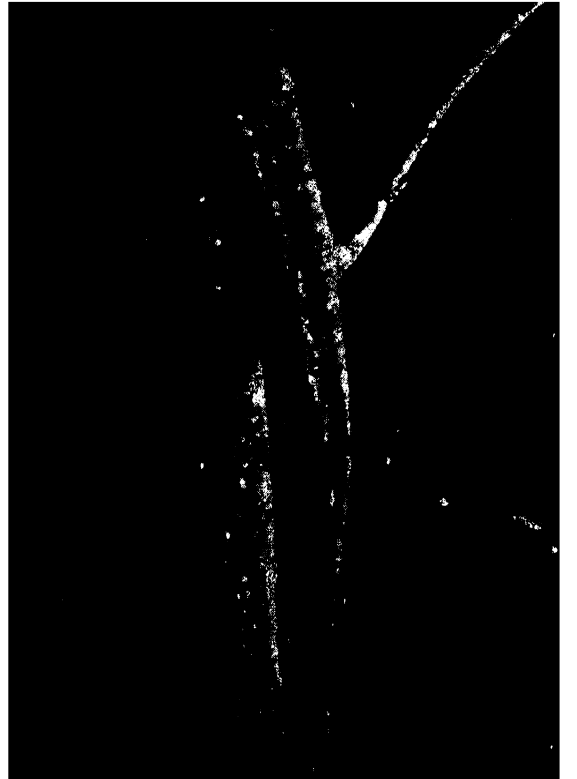
চিংড়ির আলো, ব্যাঙের ছাতার আলো, কোন কোন মাছ-মাংস হইতে নির্গত আলো এবং সমুদ্র জলের জীবাণুর আলো সম্বন্ধেও অনেকের অভিজ্ঞতা থাকিবার কথা।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাত্রিবেলায় একদিন সেণ্ট্রাল এভিনিউ (বর্ত্তমান চিত্তরঞ্জন এভিনিউ) দিয়া আসিতেছিলাম। পূব দিকের একটা সরু গলি দিয়া কিছু দূর যাইতেই মনে হইল—প্রায় ১৫।২০ হাত তফাতে যেন অস্পষ্ট অগ্নিকুণ্ডের মত কিছু একটা জলজল করিতেছে। আর একটু অগ্রসর হইতেই আলোটা আরও স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। মনে মনে ভাবিলাম—কোন বাড়ী হইতে বোধ হয় আবর্জ্জনার পাশেই উনুনের জ্বলন্ত কয়লা ফেলিয়া গিয়াছে। প্রায় তিন চার হাত দূরে উপস্থিত হইতেই দেখিলাম—আলোটা ঠিক জ্বলন্ত কয়লার আগুনের মত নহে, অনেকটা নীলাভ এবং স্নিগ্ধ, ঠিক পচা পাতার আলোর মত। স্থানটা পচা মাছের দুর্গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছিল। আরও কাছে গিয়া বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম—এক স্থানে কতকগুলি চিংড়ির খোলা স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে। এবং সেই খোলাগুলির অনেক স্থান হইতে স্নিগ্ধ আলো নির্গত হইতেছে। দূর হইতে অন্ধকারে সে গুলিকেই অগ্নিকুণ্ড বলিয়া মনে হইয়াছিল। চিংড়ির খোলা হইতে আলো নির্গমের ব্যাপার এই সর্ব্বপ্রথম আমার চোখে পড়িল। সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম। বাছিয়া বাছিয়া খোলা সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিলাম। খোলার আলো ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে হইতে দ্বিতীয় দিনেই সম্পূর্ণরূপে নিভিয়া গেল। তারপর চিংড়ি লইয়া পরীক্ষা সুরু করিলাম। কলিকাতার বাজারে যে সকল চিংড়ি আমদানী হয় তাহা প্রায় একদিন রাখিবার পর দুই একটার শরীর হইতে এরূপ কিছু কিছু আলোক-'বিন্দু' ফুটিয়া উঠে। বাদার চিংড়ি সংগ্রহ করিয়া তাহাদের শরীর হইতে অধিক পরিমাণ আলো নির্গত হইতে দেখিলাম।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র এবং অধ্যাপক মল্লিশের উৎসাহে ঠাণ্ডা আলো উৎপাদনকারী জীবাণুগুলিকে প্রাণীদেহ হইতে পৃথক্ করিয়া আলাদাভাবে বংশবৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থায় বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছিলাম। অন্ধকারে এই ঠাণ্ডা আলো লইয়া কাজ করিবার সময় ইহার চতুষ্পার্শে বিভিন্ন জাতীয় পোকামাকড়ের আনাগোনা এবং তাহাদের অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। ইহার ফলেই পরবর্ত্তীকালে কীটপতঙ্গ সম্পর্কিত গবেষণায় আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। মোটের উপর, এই ভৌতিক আলোই আমাকে সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। কথায় বলে—আলেয়া নাকি বিভ্রান্ত পথিককে পথ ভুলাইয়া লইয়া যায়। আমিও সেরূপ বিভ্রান্ত হইয়া ছুটিতেছি কিনা, কে জানে!

বাঙ্গালার মাটিতে এবং বাঙ্গালার জলে, বাঙ্গালার গ্রামে ও বাঙ্গালার বনে যে সকল পশুপাখী, সাপব্যাঙ, মশামাছি, পোকামাকড়, আহারবিহার করিতেছে, তাহাদের বিশিষ্ট বিবরণের জন্য, তাহাদের আহারবিহারের প্রথা জানিবার জন্য আমরা কি কেবল বিদেশী শিকারীর মুখাপেক্ষা করিয়াই থাকিব?

রামেন্দ্রসুন্দর (অভিভাষণ, ১৩২০)

বাংলার মানুষ

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বাংলাদেশ বলতে আমি বাংলার রাজনৈতিক সীমা পার হয়ে বাংলা ভাষাভাষী সমস্ত বাঙালীর বাসস্থানকে অন্তর্ভুক্ত করেছি। ছোটনাগপুরের নীচু মালভূমি—মানভূম ও ধলভূম যার অন্তর্গত—এবং আসামপ্রদেশের শ্রীহট্ট ও বর্ত্তমান পূর্ব্ব-পাকিস্থান, এ সমস্তই বাঙালীর দেশ। বাংলাদেশের এই বিস্তৃত ভূ ভাগের লোকেরা জাতি ও সংস্কৃতি হিসাবে সকলে কিন্তু এক শ্রেণীতে পড়ে না।

ভৌগোলিক বিচারের দিক্ হ'তে বাংলা দেশকে মোটামুটি এই কয়টী ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) পশ্চিম বাংলার মালভূমি, (২) পশ্চিম ও মধ্য বাংলার সমতল ভূমি, উত্তর ও পূর্ব্ব-বাংলার সংলগ্ন সমতল অংশ বিশেষ একই রকমের ভূখণ্ডও এই সঙ্গে ধরা চলে, (৩) উত্তর বাংলার মালভূমি ও (৪) পূর্ব্ববঙ্গের সীমান্তের পার্ব্বত্য-ভূমি ও সেই সংলগ্ন অঞ্চল।

বাংলাদেশের পশ্চিম অংশে মালভূমিতে (যার মধ্যে মানভূম প্রভৃতি ধরা হ'য়েছে) এখনও বহুস্থানে বিস্তীর্ণ শালবন বর্ত্তমান আছে। এই সকল স্থানে, পুরাতন বাঙালী বাসিন্দার সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতাল প্রভৃতি আদিম জাতির অনেক পল্লী পাওয়া যায়। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম অংশে এক সাঁওতাল জাতিই কোনও কোনও থানায় শতকরা ২০ হ'তে ২৫ পর্য্যন্ত লোকসংখ্যার দাবী রাখে। এই সমস্ত আদিম জাতি এখানে তিনশত বৎসরেরও অধিক কাল বাস করছে। উত্তর বাংলার মালভূমিতে এদের বাস অনেক পরে; তবে সেখানেও এরা সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়।

বাংলার উত্তরে রঙ্‌পুর, জলপাইগুড়ি ও আরও কয়েকটী স্থান তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান কুচবিহার রাজ্যের আদিপুরুষদের পুরাতন কোচ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোচজাতি বহুদিন হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করার ফলে, আমাদের স্মরণে থাকে না যে এরা এদেশে বসতির আরম্ভে জাতি হিসাবে উত্তরবাংলার পুরাতন হিন্দু-বাসিন্দাদের হ'তে কতকটা ভিন্ন ছিল। এদের আকৃতিগত পার্থক্যের কথা পরে বলা হ'য়েছে।

বাংলার পূর্ব্ব-সীমান্তে ত্রিপুরা রাজ্যে, শ্রীহট্ট জেলায়, এবং চট্টগ্রামের ও মৈমনসিংহের পূর্ব্বাংশেও অনেক আদিম জাতির বাস আছে। চট্টগ্রামের মগ ও চাকমা, ত্রিপুরার মুরুং বা ত্রিপুরা, এবং মৈমনসিংহের হাজং গারো এই কয়টী জাতির নাম সকলেই জানেন। আসামের পার্ব্বত্য অঞ্চলের আদিম জাতিগুলির সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

খাস বাঙালী বলতে এই সকল আদিম জাতিদের বোঝায় না। বাংলাদেশের সমতল ভূমিতে বাংলা-ভাষাভাষী যে হিন্দু ও মুসলমান বাস করেন, তাঁদেরই আমরা সাধারণতঃ বাঙালী বলে উল্লেখ করে থাকি। কিন্তু বাংলার মানুষ সম্বন্ধে বলতে গেলে এই আদিম জাতিদের কথা বাদ দেওয়া চলে না। কারণ বাংলাদেশের বাঙালীর সঙ্গে এদের সংস্কৃতি এবং রক্ত এই দুইয়েরই কিছু সম্বন্ধ আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে এই সকল আদিম জাতির উপাস্য প্রাকৃতিক দেব-দেবী অনেক সময়েই বর্ত্তমান হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর পূজার মন্দিরে বা পীরের দরগায় ভিন্ন নাম নিয়ে পূজা পেয়ে থাকে। ত্রিপুরা অঞ্চলে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে কোনও কোনও শক্তি-মন্দিরে নরবলির প্রথা

বর্ত্তমান ছিল। এ রীতি নিকটবর্ত্তী আদিম জাতিদের মধ্যে গ্রামের মঙ্গলার্থে মাথাশিকার অর্থাৎ বিদেশী বা শত্রুপক্ষের লোকের মাথা কেটে এনে গ্রামে সমারোহের সঙ্গে রাখার যে নিয়ম, তার থেকে উদ্ভূত, একথা বলা চলে।

আবার এ কথাও সত্য যে এই সকল আদিম জাতিদের মধ্যে প্রাচীন বৈদিক ও প্রাক্-বৈদিক উচ্চস্তরের সভ্যতার সংস্পর্শের প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের ছেলেদের ছড়া ও সাঁওতালী অনুষ্ঠানের গান, আমাদের মেয়েদের লুপ্তপ্রায় ব্রত ও সাঁওতালী পরবের "কাহিনী,"—এগুলির মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সাদৃশ্য দেখা যায়। তার চেয়েও বড় কথা এই যে, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন আদিম জাতিদের কতক কতক অংশ পুরাতন হিন্দু সভ্যতার প্রভাবে ও পরবর্ত্তী যুগের ইসলাম ধর্ম্মের প্রেরণায়, নিজেদের রীতিনীতি ও ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত করে বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধি করেছে।

নৃতত্ত্বের মাপজোক, রক্ত-শ্রেণী পরীক্ষা—সব দিক হ'তেই পরখ করে দেখা যায় যে, বাঙালী মুসলমান এবং ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য বাদ দিয়ে অন্য বাঙালী হিন্দু—এই দুয়ের মধ্যে দৈহিক পার্থক্য নগণ্য। বরঞ্চ সাদৃশ্যই অনেক বেশী। তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গেও পার্থক্য বাংলার পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট এক একটী অঞ্চলের মধ্যে বিশেষ ধর্ত্তব্য নয়। অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল ধরে কয়েক সহস্র বাঙালী ছাত্রের মাথার মাপ ও দৈহিক দৈর্ঘ্য সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন যে রাঢ় ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তাহা অপেক্ষা রাঢ়ের ব্রাহ্মণ ও মুসলমানের প্রভেদ অনেক কম। এমন কি রাঢ়দেশে বাহ্মণ ও তথাকথিত নিম্নবর্ণের যে প্রভেদ, তার চেয়ে রাঢ় ও সমতটের ব্রাহ্মণদের প্রভেদ কিছু অধিক। বলা বাহুল্য, এই সাম্য কতকটা ভৌগোলিক কারণে হ'লেও প্রধানতঃ রক্ত সংমিশ্রণের ফলেই সম্ভব হ'য়েছে।

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে নৃতত্ত্বের আকৃতিগত বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। যেমন দেহের আকার হিসাবে প্রত্যেক পশুর মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করা হয়, তেমনই মানুষের মধ্যেও আকৃতি হিসাবে জাতি বিভেদ করা হয়। মানুষের বুদ্ধি ও বাকশক্তিই তাকে অন্য জীব হ'তে পৃথক করেছে। এই বুদ্ধি ও বাকশক্তি অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মগজের ও তার বাহিরের আবরণ করোটীরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে। মানুষের মগজের সামনের ভাগ, তার ঠিক নীচের শ্রেণীর বনমানুষ আখ্যাত জীবের চেয়ে বেশী। এই কারণেই মানুষের কপালের সামনের অংশ উঁচু ও প্রশস্ত, এবং মগজের প্রসারকল্পে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য মাথার সঙ্গে চোয়ালের জোড়ালাগার হাড় ছোট ও হাল্কা হ'য়েছে। সঙ্গে সঙ্গে নাকের হাড়, অপেক্ষাকৃত উঁচু হয়ে বনমানুষের মত চ্যাপ্টা নির্ণাসা অবস্থা হতে মানুষের নাকে পরিণত হ'য়েছে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন সর্ব্বত্র সমান পরিমাণে সম্ভব হয় নাই।

প্রধানতঃ প্রাকৃতিক ও খানিকটা সাংস্কৃতিক কারণে মানুষের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য হিসাবে কয়েকটি মূল জাতির সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে মগজের আয়তন ও গঠনে এবং কৃষ্টির দিক হ'তেও সবচেয়ে অনগ্রসর জাতি অষ্ট্রেলিয়ার আদিম মানুষ। ভারতবর্ষের মুণ্ডা, সাঁওতাল, সিংহলের ভেদ্দা ইত্যাদি আদিম জাতির মধ্যে করোটী, নাসিকার হাড় প্রভৃতির গঠনে এই আদিম জাতির সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। আমাদের বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তে যে সব আদিম জাতির উল্লেখ করা হ'য়েছে তারাও কতকটা পরিমাণে এই পর্য্যায়ে আসে।

কোন কোনও নৃতত্ত্ববিদের মতে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নেগ্রিটো অর্থাৎ খর্ব্বাকৃতি ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক নিগ্রোজাতীয় লোকের কিছু সংমিশ্রণ পূর্ব্বভারতের আদিম জাতিদের মধ্যে আছে।

এইরূপ সিদ্ধান্তের ভিত্তি প্রধানতঃ এই সব জাতির মধ্যে কয়েকটী লোকের নিগ্রোর মত অতি কুঞ্চিত কেশ দেখা। বাংলাদেশে এক সময়ে মুসলমান সুলতানদের আমলে কিছু হাবসী সৈনিক বাস করত; এখন তারা সাধারণ লোকের সঙ্গে সংমিশ্রিত ও বিলুপ্ত। এই মিশ্রণের ফলে এই ধরণের চুল কালে-ভদ্রে পাওয়া অসম্ভব নয়। এ ছাড়া, স্বাভাবিক কারণে মধ্যে মধ্যে এক একজন লোকের এইরূপ কেশ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। য়ুরোপের যে সকল পরিবারে নিগ্রো-রক্ত বহু পুরুষের মধ্যে কোন রূপ সংমিশ্রণ হয় নাই, সেখানেও কদাচিৎ এইরূপ কেশ পাওয়া গেছে। মোটের ওপর পূর্ব্বভারতে এই নেগ্রিটো সংমিশ্রণের পরিকল্পনা কোনরূপ ভাল প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় একথা বলা যায়। তবে দক্ষিণ ভারতে কাদির প্রভৃতি জাতির মধ্যে এ মিশ্রণের কিছু লক্ষণ বর্ত্তমান আছে।

বাংলার পশ্চিম সীমান্তের আদিম জাতিদের এবং পূর্ব্ব উত্তর সীমান্তের আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও যথেষ্ট জাতিগত পার্থক্য আছে। এই সব অঞ্চলের বেশীর ভাগ জাতিই পূর্ব্বকালে কৃষি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। পশু-শিকার ছিল এদের প্রধান পেশা। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে "নিষাদ" নামে এই ধরণের জাতির উল্লেখ আছে। পরলোকগত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের নির্দ্দেশ-মত আমরা বাংলার পশ্চিম সীমান্তবাসী ও তাদেরই আত্মীয় ছোটনাগপুর, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি নিবাসী আদিম জাতিদের "নিষাদ" আখ্যা দিতে পারি।

এই নিষাদ জাতির লক্ষণ, লম্বা মাথা, চাপা নীচু কপাল, চেপটা মোটা নাক এবং পিছু-হটা চিবুক। লম্বা মাথা বললে বোঝায় যাদের মাথার প্রস্থ দৈর্ঘ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ ও তার কম। মাথার দৈর্ঘ্য মাপা হয়, মাথার মাঝের লম্ব সমতলে ভ্রুবিন্দুর ঠিক উপর হ'তে তার বিপরীতে, মাথার পিছনের সব চেয়ে দূরের বিন্দু পর্য্যন্ত দূরত্ব দিয়ে। প্রস্থ মাপা হয়, দুই কানের উপরিভাগে মাথার দুই পাশে, উল্লিখিত সমতলের ওপর লম্বরেখায় সব চেয়ে বেশী দূরত্ব নির্ণয় করে। চওড়া মাথা বললে বোঝায় যাদের মাথার প্রস্থ দৈর্ঘ্যের ৮০ ভাগ ও তার চেয়ে বেশী। যাদের মাথা এই দুই মাপের মাঝে পড়ে, তাদের "মাঝারি মাথা" বলা হ'য়ে থাকে।

বাংলার পূর্ব্ব সীমান্তের ও উত্তর সীমান্তের আদিম জাতি ও তাদের সঙ্গে সংমিশ্রিত বাঙালীদের মধ্যে মঙ্গোলীয় জাতির লক্ষণ দেখা যায়। মঙ্গোল জাতির মাথা চওড়া, নাক সংক্ষিপ্ত, গোঁফদাড়ি বিরল, গালের হাড় উঁচু, এবং চোখ ঈষৎ তেরচা। অনেক সময়ে চোখের পাতার ভিতরের কোণ নীচের দিকে জোড়া ও কুঞ্চিত। পূর্ব্ব সীমান্তের মগ, চাকমা ও আসল কোচজাতির মধ্যে এই সকল লক্ষণ মঙ্গোল রক্তের পরিচয় দেয়। এই জাতি-গুলির সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে এই সব অঞ্চলের বাঙালীদের মধ্যেও আকৃতিগত এই সব লক্ষণ কিছু দেখা যায়।

রীজ্‌লে নামক রাজকর্ম্মচারী ও নৃতত্ত্ববিৎ বাংলার বিভিন্ন অংশে মাপজোক নিয়ে বলেন যে এদেশের লোক মঙ্গোলজাতি ও দ্রাবিড় জাতি সংমিশ্রিত। "দ্রাবিড়" শব্দে রীজ্‌লে যাদের নির্দ্দেশ করেছিলেন, তারা প্রকৃত পক্ষে পূর্ব্ববর্ণিত নিষাদ জাতি। এরা বেশীর ভাগই দ্রাবিড়-ভাষাভাষী নয় এবং তামিল-দেশের উন্নত জাতিদের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নাই। দক্ষিণ ভারতে, আদিম জাতিদের বাদ দিলে যারা বাকী থাকে তাদের মধ্যে লম্বা-মাথা, মাঝারি গোছের দীর্ঘাকার, উঁচু কপাল, এবং না-পাতলা, না-মোটা এই রকম মাঝারি নাকওয়ালা লোকের প্রাধান্য দেখা যায়। এরা পালিশ-করা পাথরের অস্ত্রের যুগে এদেশে এসেছিল বলেই মনে হয়। এদের সঙ্গে নিষাদ জাতির কিছু সংমিশ্রণ ঘটেছিল এ কথা সত্য। কিন্তু বাংলা দেশের সমাজের মধ্যস্তরে ও কতক নিম্নাংশে (সনাতন মতে যাদের এই সব স্তরের ধরা হ'ত,

লেখকের মতে নয়) এই মাঝারি লম্বা, মাঝারি নাসা সম্পন্ন জাতির বিস্তার নিষাদ-প্রাধান্য বলা চলে না। এই মিশ্রজাতির লোকেরাই সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে এসে এখানকার খনিজ দ্রব্য হ'তে লোহা গলান ও তা দিয়ে হাতিয়ার তৈয়ারী আবিষ্কার করে।

কিন্তু এই স্বল্প নিষাদরক্ত মিশ্রিত দীর্ঘমস্তক জাতি বাংলার নিম্ন বা মধ্যস্তরে প্রধান স্থান অধিকার করে না। প্রকৃতপক্ষে বাঙালী জাতি মাঝারি মাথা ও চওড়া মাথা সম্পন্ন লোকেই প্রধানতঃ গঠিত। লম্বা মাথা জাতির সহিত চওড়ামাথা লোকের লোকের মিশ্রণের ফলে এই "মাঝারিমাথা" মাপের লোক সৃষ্ট হ'য়েছে এ কথা বলা চলে। বাংলাদেশের পূর্ব্ব সীমান্ত অঞ্চলে চওড়ামাথা মঙ্গোলরক্ত সম্ভূত একথা সত্য। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকের এই সুপুষ্ট মগজের আবরণ চওড়া করোটী এসেছে মহেঞ্জোদারো সভ্যতার অন্যতম বাহকদের কাছ থেকে।

প্রাচীন মহেঞ্জোদারো ও তারই কাছাকাছি বিভিন্ন স্থান খনন করে যে সব পুরাতন করোটী উদ্ধার করা হ'য়েছে, সেগুলি হ'তে লম্বা মাথা পাতলা নাক ও কাটালো মুখের গঠন একটী জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। ডক্টর বিরজাশঙ্কর গুহ ও অন্যান্য অনেকের মতে এই জাতির সহিতই মহেঞ্জোদারো সভ্যতার উৎপত্তি জড়িত। উত্তর ভারতে এই জাতির বংশধরদের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলার মধ্যেও উচ্চবর্ণের জাতিতে এদের সংমিশ্রণ কিছু বর্ত্তমান।

বাংলাদেশের চওড়ামাথা এসেছে—মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া কঙ্কাল হ'তে আর একটী যে জাতির সন্ধান পাওয়া যায়, তাদের বংশানুক্রমে। প্রথমোক্ত লম্বামাথা মহেঞ্জোদারোর লোকদের কিছু পরে এদের সন্ধানীস্তর অবস্থিত। এরা চওড়া মাথা; মুখ এদের গোল গঠনের এবং নাক বেশ বড় ও উঁচু। এদের কঙ্কাল মহেঞ্জোদারো অপেক্ষা তক্ষশীলার নিকটবর্ত্তী হারাপ্পাতেই বেশী পাওয়া যায়। গুজরাট, কর্ণাটক ও বাংলাদেশে এই জাতির মত চওড়া মাথা মানুষ বহু সংখ্যায় বর্ত্তমান। বাংলার নিম্নস্তর ও মধ্যস্তরে এদের সঙ্গে পূর্ব্বাগত লম্বা মাথা লোকদের যথেষ্ট সংমিশ্রণ হ'য়েছে। * মহেঞ্জোদারোর খনন ও আবিষ্কার হওয়ার কিছু পূর্ব্বে আমি নেপালের "নেওয়ার" জাতির সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করে তাম্র অস্ত্র ও তৈজস ব্যবহারকারী সুগঠিত নাসা একটি জাতির বৈদিক সভ্যতার পূর্ব্বে এদেশে আগমনের ও নেপাল পর্য্যন্ত গমনের প্রমাণ দিই। এদের সঙ্গে বাংলার প্রাক্-ব্রাহ্মণ সভ্যতার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।

এই সব জাতির পরে ভারতবর্ষে আসে বৈদিক সভ্যতার বাহকেরা। এদের মাথা লম্বা, বেশ বড়; মুখ পাতলা এবং নাসা কাটালো ও খাড়া। এদের চুল ও চোখের রঙ ছিল ফিকে। এই জাতির খুব সামান্য সংমিশ্রণ দেখা যায় বাংলার উচ্চবর্ণের মধ্যে। এদের বংশধরেরা বাস করে ভারতের উত্তর সীমান্তে অনেকটা অমিশ্রভাবে। অন্যত্র পূর্ব্বের আগত জাতিদের সঙ্গে এরা মিশ্রিত হ'য়ে গেছে। পরিশেষে ইসলাম ধর্ম্মের প্রচারের সময় চট্টগ্রাম অঞ্চলে কিছু আরব ও মালয় হ'তে আগত জাতির, উত্তর বাংলায় উচ্চ বর্ণের সঙ্গে কিছু পাঠানদের এবং ইংরেজ শাসনের আমলে ও তার কিছু পূর্ব্বে আমাদের মধ্যস্তরের জাতির কিছু লোকের সঙ্গে পর্ত্তুগাল ও ইংলণ্ডের লোকের রক্ত সংমিশ্রণ হয়।

প্রবন্ধ শেষ করার আগে একটি বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বাংলাদেশের সংস্কৃতি বরাবরই উত্তর ভারতের অন্যান্য অংশ হ'তে বিশেষ পৃথক ও স্বাধীনতা গুণসম্পন্ন। বাংলার সভ্যতা আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যদেশের রীতিনীতির সনাতন ধারা হ'তে বরাবরই ভিন্ন। তার কারণ

---

* এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে বাংলাভাষায় শ্রীমীনেন্দ্রনাথ বসুর "বাঙালীর পরিচয়" পুস্তকে পাওয়া যাবে।—লেখক

আশা করি এই আলোচনা হ'তে ফুটে উঠেছে। মনে রাখতে হবে যে প্রাচীন বৈদিক সভ্যতার বিরোধী দুইটি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা—গৌতমবুদ্ধ ও মহাবীর—উভয়েই বৈদিক ও প্রাক্-বৈদিক সভ্যতার সংমিশ্রণের স্থলে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। তাঁদের পরবর্ত্তী যুগে বৈদিক কৃষ্টির চাপ পশ্চিম হ'তে আরও এগিয়ে আসার ফলে প্রাক্-বৈদিক সংস্কৃতি প্রধানতঃ বাংলাদেশে হটে এসে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে। এই কারণেই বাংলায় বৌদ্ধ প্রভাব এত বেশী প্রসার লাভ করে ও পালসাম্রাজ্য জনমতের উপর এতদিন স্থায়ী ছিল। উত্তর ভারতে বর্ত্তমান যুগে যাঁরা সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পথ প্রদর্শক, তাঁরাও প্রধানতঃ এই সঙ্গমের স্থলেই অবতীর্ণ হ'য়েছেন। বাংলা, মহারাষ্ট্রের অংশবিশেষ ও গুজরাট প্রাক্-বৈদিক সভ্যতার বাহকদের ঘাঁটি ছিল, একথা আগেই বলেছি। এখানে এখনও তাদের বংশধরেরা প্রধান। এই সব অঞ্চলেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, গোখলে, দয়ানন্দ, তিলক, সুরেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেছেন। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে, যে, কৃষ্টির ধারা পুরুষানুক্রমে শিক্ষা ও স্মৃতি অনুসরণ করে। এ জন্য রক্তসম্পর্কের পার্থক্য আবশ্যক হয় না। কিন্তু সংস্কৃতি যায় বাপমা হ'তে ছেলেতে এবং পুরুষানুক্রমে যুগযুগান্তর ধরে প্রবাহিত হ'য়ে চলে একই সমাজের মাঝে—যারা সংমিশ্রণের ফলে গঠিত। নূতন জাতির নূতন চিন্তাধারার স্পর্শ যারা যত পায় ও ঘনিষ্ট ভাবে মিশে গ্রহণ করতে পারে, তাদের মানসিক শক্তির উন্মেষ ও বিকাশ হয় তত বেশী। আর যেখানে নূতনের স্পর্শ আসে কম, বা এলেও গৃহীত হয় না, সেখানে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী—যাকে আমরা প্রতিভা বলে থাকি,—সাধারণতঃ বেশী জায়গায় ফুটে উঠতে পায় না।

অনেকের ধারণা আছে যে, বাঙ্গালায় চিরকাল বাঙ্গালী আছে, তাহাদিগের উৎপত্তি আবার খুঁজিয়া কি হইবে?...যাহারা বাঙ্গালা দেশে বাস করে, বাঙ্গালা ভাষায় কথা কয়, তাহাদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক মুসলমান। ইহারা বাঙ্গালী বটে, কিন্তু ইহারাও কি সেই প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী জাতির সন্ততি? হাড়ি, কাওরা, ডোম ও মুচি, কৈবর্ত্ত, জেলে, কোঁচ, পলি, ইহারাও তাঁহাদিগের সন্ততি?...ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাঙ্গালীর অতি অল্পভাগ। বাঙ্গালীর মধ্যে যাহারা সংখ্যায় প্রবল, তাহাদিগেরই উৎপত্তিতত্ত্ব অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

* * * *

মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্ব্বসাধারণের জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশ, ইহার গল্প করিতে কি আনন্দ নাই?

বঙ্কিমচন্দ্র (বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১২৮৭)

যুগসন্ধি

শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত

মানব মহাসাহিত্যের দুই ধারা, সায়ান্স আর আর্টস, তার কর্মবেদ আর তার মর্মবাণী। দুই মিলে মানুষের পূর্ণতার আকিঞ্চন।

বিজ্ঞানের বহু যত্নে গ্রথিত যে বিপুলায়তন বিশিষ্ট জ্ঞান, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে নিরলস প্রয়াসে সঞ্চীয়মান, তার বেশির ভাগেই আজ আগ্রহ থাকলেও আমাদের অধিকার নেই। বিজ্ঞানীদের জ্ঞানগম্ভীর কত কথা আমরা বুঝিনে, তাঁদের সতর্ক মনের নানা জিজ্ঞাসার সূক্ষ্ম অভিনবত্ব ধরতে পারিনে। তাঁদের চিন্তাজগৎ থেকে আমাদের ব্যবধান ক্রমশ অপ্রমেয় হয়ে গেল।

বেশী দিনের কথা নয়। আমরা যাকে এখনকার বিজ্ঞান বলে মানি, তার বয়স মোটামুটি তিন শ বছরের বেশী হবে না। একে বিজ্ঞানের যুগ বলা হয়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে তিন শতাব্দী দীর্ঘ কাল নয়, বিজ্ঞানযুগের অতীতে তিন শ বছরে নিখিল নরনারীকে জড়িত করার মত বৃহৎ ব্যাপার পৃথিবীতে কদাচিৎ ঘটত। অথচ আজকে ক্ষণে ক্ষণে মানুষের বিজ্ঞানবল ধরাপৃষ্ঠকে কম্পিত করে দিলে। বস্তুতঃ, বিজ্ঞানের অভ্যুত্থান বিশ্বের ইতিহাসে এক বৃহত্তম ঘটনা।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভোজবাজী থেকে অতিমানবিক মহাবিদ্যা পর্যন্ত নিম্ন-উচ্চ যাবতীয় ধারণা সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই দেখা যায়। তদুপরি এযাবৎ সাহেবশাসিত পাণ্ডাচালিত সনাতন দেশে এমন লোক অসংখ্য, ভালোমন্দ কোন ধারণাই যাদের হবার সুযোগ হয়নি। এর মধ্যে আমাদের সুপ্তি উপেক্ষা ক'রে সচল পৃথিবী চলতে চলতে এক ক্রান্তিপথে, এক যুগসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। সমগ্র মানব-জাতির জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে যে দ্বন্দ্ব, অস্থিরতা, অশান্তি দেখা দিয়েছে, তারা এক মহাবর্তনের পূর্বাভাষ। আমরা সেই পরম দিনের পূর্বাহ্ণের আগন্তুক।

বিংশ শতাব্দীতে এই সভ্যতার বিপর্যয় মানুষের অপ্রত্যাশিত। অনেকের অভিমত, বিজ্ঞানই এর জন্যে দায়ী। উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার ইতিহাসেও দেখি, মানুষের আত্মবিশ্বাস গভীর ও বিজ্ঞানসাধনার জগদ্ধিতৈষণা বড় ছিল। বিগত দিনের বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শকেরা আন্তরিক আবেগ ও ভবিষ্যতের প্রতি গভীর বিশ্বাস নিয়ে সঙ্গীহীন অতন্দ্র সাধনায় জ্ঞানের আলোক জালিয়েছিলেন সে কিসের ক্ষুধা, কিসের তৃষ্ণা, দেহাতীতের উপর সে কোন মহাদ্যুতির দৃষ্টিপ্রসাদ, যার আকর্ষণে তাঁরা দেহকে ক্লিষ্ট, অবহেলিত রেখে পার্থিব সুখসুবিধায় উদাসীন হয়েছিলেন? আজ এ প্রশ্ন নিরর্থক। ফ্যারাডে, কেকুলে, বেয়র, পাস্তর, বুনসেন। এঁদের অম্লান ইতিহাস আজ স্মৃতি মাত্র।

আমরা জানি, বিজ্ঞানের উৎকর্ষের ফলে জীবনযাত্রার বহু প্রয়োজন আমরা সহজে মেটাতে পারি, ক্লেশ ও অক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে লাঘব করতে পারি। তবু তৃপ্তির বদলে আজ জগৎজোড়া অভাব, শান্তির পরিবর্তে সন্দেহ, উদ্বেগ, আতঙ্ক। বিজ্ঞানের আদ্যোপান্তের প্রতি যাঁর অপক্ষপাত দৃষ্টি আছে, তিনি দেখতে পাবেন, আজকের সমাজ যেরূপ ক্ষিপ্রবেগে অসংখ্য জটিল সমস্যা-

গ্রন্থিচয়ের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে তাকে সম্যক প্রতিরোধ করতে বিজ্ঞান সমকক্ষ নয়। তাই, তারই সহায়তায় স্তূপীকৃত অর্থ ও বল মুষ্টিমেয়ের করায়ত্ত হয়, তারই বিপরীত সাধনায় এক এক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন জন্মলাভ করে, যার নির্লজ্জ হিংসায় দানবোত্থা ধরণীর ভয়ে কম্পমানা ও বিপর্যস্তা হ'ন। এতে কার গৌরব?

আসল এবং সাংঘাতিক ত্রুটি হয়েছে এই যে, যদিও বিজ্ঞান-সাধনায় বিপুল শক্তি মানুষের হস্তগত হয়েছে, তাকে শুভ বুদ্ধি নিয়ে সতর্ক ব্যবহারের দায়িত্ব কেউ নেয়নি, অন্ততঃ কোন বৈজ্ঞানিক নেন নি। বরং বিজ্ঞান যত এগিয়ে চলেছে, মানবিক কল্যাণের দিক থেকে তার দৃষ্টি যেন তত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তার ফলে প্রাণপাত পরিশ্রম ও অগণিত অর্থ ব্যয় ক'রে বিজ্ঞানী আজ মানবসভ্যতার প্রাণসংশয়ের সম্মুখীন হয়েছেন। সাধনার সঙ্গে সৃজনের এই বিষম বৈপরীত্য অভূতপূর্ব, এবং মহাবিপদের দুর্লক্ষণ।

আসন্ন ব্যতীপাতের এই অশুভ মুহূর্তে যদি সমগ্রের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে এতাবৎ সাধনালব্ধ বিজ্ঞানবলকে সমাজের বিরামহীন অপ্রমত্ত সেবায় বাধ্য রাখতে হয়; তার পথনির্দ্দেশ ও নেতৃত্ব আমরা বিশ্বের বিজ্ঞানীকুলের কাছেই আশা করব। তাঁদের সাধনায় উত্থিতা মহাশক্তিকে তাঁরাই সংহত ও সুপরিচালিত করতে পারেন। তাঁদের কর্মের ধারায় যে সুগভীর ঐক্য অন্তর্নিহিত থেকে বিজ্ঞানকে বিশ্বের সম্পদরূপে প্রতিষ্ঠা করেছে তা আজ বিজ্ঞানীদের মিলিত করুক। সভ্যতার পরিত্রাণে আজ রাজশক্তির চেয়ে মহত্তর শক্তির প্রয়োজন।

জগতে যা-কিছু জান্‌বার আছে, সমস্তই জানার দ্বারা ও আত্মসাৎ ক'র্‌তে চায়। আমার বস্তুতত্ত্ব-বিদ্যা প্রায় উজাড় করে নিয়েছে, এখন থেকে থেকে রেগে উঠে' ব'ল্‌ছে, "তোমার বিদ্যে তো সিঁধকাঠি দিয়ে একটা দেয়াল ভেঙে তার পিছনে আরেকটা দেয়াল বের ক'রেছে। কিন্তু প্রাণ-পুরুষের অন্দর-মহল কোথায়?"

* * *

শিকড়ের মুঠো মেলে' গাছ মাটির নীচে হরণ শোষণের কাজ করে, সেখানে তো ফুল ফোটায় না। ফুল ফোটে উপরের ডালে, আকাশের দিকে।

—**রক্তকরবী** (অধ্যাপকের উক্তি)

বাংলা পরিভাষা

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

ভারত স্বাধীন হইতেই বড়-ছোট সকলেই রাষ্ট্র-ভাষা লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছেন। কোন্ ভাষা শেষ পর্যন্ত কায়েম হইবে বলা যায় না। বলা বাহুল্য; বাংলা দেশে শেষ পর্যন্ত বাংলাই রাষ্ট্রের ও শিক্ষার ভাষা হইবে। সাময়িক পত্রে ইহা লইয়া বিস্তর আলোচনা চলিতেছে। কেহ কেহ চাহিতেছেন এখনই ইংরেজিকে সম্পূর্ণ পরিবর্জন করিয়া বাংলায় সব-কিছু আরম্ভ করিয়া দেওয়া হউক। আবার কাহারও কাহারও মতে ধীরে ধীরে ইংরেজি পরিবর্তন করিয়া মাতৃভাষার মাধ্যমে কাজ শুরু করা উচিত। পশ্চিম বাংলার প্রধান-মন্ত্রী ডকটর শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ বাংলা ভাষাকে যথাসত্বর রাষ্ট্রের ভাষার রূপ দিতে চাহিতেছেন; তাই নানা দপ্তরের পরিভাষা প্রণয়নের জন্য একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। শুনা যায় যে, সে-সমিতি দ্রুত পরিভাষা প্রণয়ন করিতেছেন।

এই ভাষা সমস্যা লইয়া গত ২১শে ডিসেম্বর ১৯৪৭, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভারতের শিক্ষা-মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ একটি সুচিন্তিত ভাষণ দিয়াছেন। তিনি বলেন, গত ১৫০ বৎসর ধরিয়া যে-ভাষা চলিয়া আসিতেছে, সহসা তাহার আমূল পরিবর্জনে গোলযোগ সৃষ্টি হইবে। তাঁহার মতে প্রথমে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইংরেজি-বাহন ধীরে ধীরে পরিবর্জন করিয়া মাতৃভাষায় সব-কিছু করা বিধেয়। মৌলানা আজাদ, এই সময়ের নির্দেশ দিয়া দুইটি বিপরীত মতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ইহাই যে বর্তমান সময়ে সু-মত তাহাতে দ্বিমত নাই। শিক্ষা-দীক্ষার ভাষা পরিবর্তনে মাত্র পাঁচ বৎসর অতি অল্প সময় বলিতে হইবে!

মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী অধ্যাপক সি. ভি. রামন বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা মাতৃভাষার মাধ্যমে করার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাঁহার মতে ভাষার অভাব, দীনতা ইত্যাদি অনেকটাই কাল্পনিক; মাতৃভাষাকে বিজ্ঞান শিক্ষার বাহনরূপে প্রয়োগ করিলে বিজ্ঞান সার্বজনীন হইয়া উঠিবে।

এই শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট পরিভাষার দরকার, সকলেই তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। কিন্তু ইহার জন্য আমাদের পুঁজিপাটা কতটুকু? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ের পরিভাষার যে-সকল পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৩৫-১৯৪৪), তাহাতে হয়ত মাধ্যমিক শিক্ষাদান চলা সম্ভব। কিন্তু তাহাতে কলেজের বা উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষা চলিবে না, সে-কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সুতরাং অবিলম্বে আমাদের এ-বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে।

গত বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় পশ্চিম বাংলার গবর্নর মাননীয় চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী মাতৃভাষার বাহনে বিজ্ঞান শিক্ষার সুপারিশ করিয়াছেন। অধুনা বাংলার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষাদান প্রবেশিকা শ্রেণী পর্যন্ত পৌছিয়াছে। এইটুকু পৌছাইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ সাতাশ বৎসর লাগিয়াছে বলিয়া তিনি অনুযোগ করেন। তাঁহার ধারণা যে মাতৃভাষার সাহায্যে উচ্চ শিক্ষা দিতে শুরু করিলে নিম্ন স্তরে শিক্ষাদান অতি সহজে আপনা

হইতেই সম্ভব হইয়া উঠিত। বাংলা দেশে এরূপ পরীক্ষা হয় নাই, তখন কেহ ঐ পন্থা অবলম্বন করা দরকার বোধ করেন নাই। অবশ্য এ-কথা স্বীকার্য যে, সে-সময়ে মাত্র দু'একজন মনীষী (আচার্য ৺রামেন্দ্রসুন্দর ও আচার্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়) বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষাদানে উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন। অনুকূল পরিবেশের অভাবেই সম্ভবতঃ তাঁহাদের সে প্রয়াস ফলপ্রসূ হয় নাই। প্রায় অর্দ্ধ-শত বৎসর পূর্বে ৺রামেন্দ্রসুন্দর যে-আশার বাণী শুনাইয়াছিলেন তাহা মনে পড়িতেছে। তিনি লিখিয়াছিলেন, "বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজির স্থানে বাঙ্গলা আসিয়া বসিবে, আমি বরং সেইদিনের আশা রাখি। এই হতভাগ্য দেশে সে দিন শীঘ্র আসিবে না; কিন্তু আমাদের চেষ্টার অভাবে যদি সে দিন না আসে, তাহা হইলে আমাদের শিক্ষায় ধিক্!"[১] উচ্চ শিক্ষা মাতৃভাষার বাহনে শুরু হউক বলিয়া আজ সকলেই তাঁহারই আকাঙ্ক্ষার প্রতিধ্বনি করিতেছেন। কিন্তু এই শিক্ষাদানের জন্য যে পরিভাষা দরকার, তাহা কই? বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, গত পঞ্চাশ বৎসরের প্রয়াসে এমন কোন একখানি অভিধান বা পরিভাষা-পুস্তক প্রণীত হয় নাই, যাহা আমাদের এই অতি প্রয়োজনীয় অভাবটি মিটাইতে পারে।

প্রায় দশ বৎসর পূর্বে বাংলা পরিভাষার সম্পদ আমাদের কিরূপ আছে, তাহা 'বাংলা পরিভাষার গ্রন্থপঞ্জী' নামক এক প্রবন্ধে আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।[২] সে-সম্পদ ভাল কি মন্দ, বেশী কি কম, তাহা আজ পর্যন্ত কেহ খতাইয়া দেখেন নাই, মনে হয়। গ্রন্থপঞ্জীর তালিকা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইবে যে, এই সম্পদ নেহাত অপ্রচুর নয়। সাহিত্য-পরিষদের পরে একমাত্র 'প্রকৃতি' পত্রিকাই বাংলা ভাষার এই অতি প্রয়োজনীয় শাখাটি যত্ন-সিঞ্চনে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। লেখক ও পাঠকের অভাবে 'প্রকৃতি'র প্রকাশ ১৩৪৪ সালে বন্ধ হয়। তবু এই চৌদ্দ বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টা ও প্রচুর অর্থব্যয় করার জন্য 'প্রকৃতি'-সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহার কাছে বাংলাদেশ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছে। এই নবযুগে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে তিনি আবার অকৃপণ হস্তে বঙ্গভারতীর সেবায় অগ্রণী হইবেন এই প্রত্যাশাই রাখি।

আমার গ্রন্থপঞ্জীর তালিকা সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইয়াছে বলি না। উক্ত প্রবন্ধে পরিভাষা সম্বন্ধীয় যে-সব প্রামাণিক প্রবন্ধ বা পুস্তকের সন্ধান আমি পাই নাই, তাহা জানাইতে পাঠকদের অনুরোধ করিয়াছিলাম। কিন্তু অদ্যাবধি কেহ কোন সাড়া দেন নাই। বিশেষ উল্লেখযোগ্য না হইলেও দু' একটি পুরাতন প্রবন্ধ ও পুস্তকের সন্ধান পাইয়াছি। গত দশ বৎসরের মধ্যে অল্প-বেশ আরও কয়েকটি প্রবন্ধ ও পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে। সব মিলাইয়া এখন একটি নূতন গ্রন্থপঞ্জীর তালিকা করা আবশ্যক মনে করি। উহা যে পরিভাষা প্রণয়নে সহায়তা করিবে এরূপ মনে করা অসঙ্গত নয়। ১৯৩৭ সালের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা পুস্তিকা ব্যতীত অন্যান্য কোন বিক্ষিপ্ত প্রমাণ (reference) যদি কাহারও জানা থাকে ত তাহা দয়া করিয়া জানাইলে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

এখন কথা হইতেছে যে, পরিভাষা প্রণয়নের কাজে এই সকল প্রামাণিক পুস্তিকার বা প্রবন্ধের সাহায্য গ্রহণ সত্যই দরকার কি না। বলা নিষ্প্রয়োজন যে উচ্চ বিজ্ঞান শিক্ষায় পরিভাষার বিরাট সম্ভার আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে, পুস্তক রচনাতে আমরা পরিভাষার অত্যন্ত অভাব বোধ করি। মাত্র দু'একটি অভিধান আছে, যাহার

১ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 'বাঙ্গলার আদি (প্রথম) রসায়নগ্রন্থ,' সাঃ-পঃ পত্রিকা, ৫ (৪র্থ সংখ্যা) ১৩০৫; বা শব্দ-কথা, পৃঃ ২৪১ (১৩২৪)

২ প্রকৃতি, ১৪ (১ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৭-৬২ (১৩৪৪)

মধ্যে কিছু কিছু পারিভাষিক শব্দ সংকলিত আছে, কিন্তু তাহাতো পর্যাপ্ত নয়। লেখক পদে পদে বাধা পান, নূতন পরিভাষা রচনায় বাধ্য হন; ফলে সময় নষ্ট হয় প্রচুর এবং কাজও দ্রুত অগ্রসর হয় না। বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট পরিভাষার তালিকায় আমাদের চাহিদা মিটিবে না। প্রচুর ইংরেজি শব্দের নূতন পরিভাষা সৃজন করিতে হইবে। আবার যাহা পূর্ব হইতে রচিত হইয়া আছে, তাহার প্রতি অবহিত হইতে হইবে। অবহেলায়, অবজ্ঞায় সেগুলি দূরে ফেলিয়া দিয়া নূতন শব্দ প্রণয়ন করিতে বসিলে চলিবে না। সকলকেই সেগুলি বিচারের সুযোগ দেওয়া উচিত। ভাল হউক, মন্দ হউক, যে পরিভাষা সম্ভার আমাদের ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে, তাহার একটি সম্পূর্ণ ও মুদ্রিত তালিকা থাকিলে পরিভাষার কাজ তাড়াতাড়ি আগাইতে পারিত। এ-দিকে সুধীমণ্ডলীর (বিশেষতঃ বিজ্ঞানীদের) আশু দৃষ্টিপাত প্রয়োজন মনে করি।

পরিভাষা গঠনের মূলসূত্র লইয়া যথেষ্ট আলোচনা, বাগবিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী হইতে শুরু করিয়া শ্রীরাজশেখর বসু পর্যন্ত বহু প্রথিতযশা মনীষী মূল সূত্রের নির্দেশ দিয়াছেন।[৩] কিন্তু সে-সকল সূত্র ধরিয়া কাজ কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে, তাহা বুঝা কঠিন। এখন এই ব্যাপক পরিভাষা প্রণয়নকালে সেই সকল মূল সূত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা দরকার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয়ের পরিভাষার তালিকা দেখিয়া দু' একটি দুর্বলতার কথা মনে হয়। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় সমিতি এই পরিভাষা রচনায় কি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার পরিষ্কার ইঙ্গিত কোন পরিভাষা পুস্তিকায় দেখান হয় নাই। সুতরাং পূর্ব প্রকাশিত পরিভাষাগুলি বিচার করা হইয়াছে কি না বুঝা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রীয় সমিতি থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি শব্দের পরিভাষা বিভিন্ন বিজ্ঞানে বিভিন্ন করা হইয়াছে। যথা :—adaptation—অভিযোজন (প্রাণিবিদ্যা) এবং প্রতিযোজন (উদ্ভিদবিদ্যা) (২) fresh water—মিঠা জল (প্রাণিবিদ্যা) এবং সুজল (ভূবিদ্যা); (৩) plasma রক্তমস্তু, প্লাজ্‌মা (প্রাণিবিদ্যা) এবং রক্তরস (শারীরবৃত্ত ও স্বাস্থ্যবিদ্যা)। এইরূপ আরও ত্রুটি দেখান যাইতে পারে।

পরিভাষা-রচনা-পদ্ধতি কিরূপ হওয়া বিধেয় তাহাও সবিস্তারে আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আমার 'প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষা'য় যে পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছিল তাহা অনেকেরই অনুমোদন লাভ করে। কিন্তু এখন ঐ পদ্ধতিতে কাজ করা সম্ভব কিনা সুধীগণ বিচার করিবেন, কেন না তাহা বহু শ্রম ও সময় সাপেক্ষ। বিভিন্ন বিষয়ে দ্রুত কাজ করিতে হইলে, শাখা ও কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করিতে হইবে। এরূপ বিরাট কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। পশ্চিম বাংলা সরকার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ,—এরূপ কোন প্রতিষ্ঠান এককভাবে বা পরস্পরের সহযোগিতায় সমগ্র কাজটির ভার লইলে ভাল হয়।

সুচারু পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রচনাকর্তার ও অনুবাদকের হাতে, এ-কথা সকলেই বলিবেন। কিন্তু তাঁহাদের সহায়তা করিবার নিমিত্ত আমরা কি করিতে পারি তাহাই চিন্তনীয়। পূর্বকৃত পরিভাষার ভাণ্ডার হইতে বিভিন্ন লেখকবৃন্দ একই ইংরেজি শব্দের যে-সকল বাংলা পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ বা সৃজন করিয়াছেন, সেগুলি সংকলিত করিয়া এবং তাহার সঙ্গে শাখা, তথা কেন্দ্রীয় সমিতির অনুমোদিত শব্দ পেশ করিলে সাধারণের বিচারের কতকটা সুবিধা হইতে পারে। অবশ্য সাধারণের বিচারই চরম বিচার বলি না। গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-প্রণেতাগণ এই পরিভাষা বিচারে সুবিধা পাইবেন, কারণ তাঁহাদের

৩। পূর্বোল্লিখিত 'বাংলা পরিভাষার গ্রন্থপঞ্জী' দ্রষ্টব্য।

হাতেই পরিভাষার চরম নির্বাচন ও চূড়ান্ত প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিতেছে।

পরিভাষা রচনাকালে কয়েকটি বিষয় স্মরণে রাখা কর্তব্য। ভবিষ্যতে গবেষণা পথের দেউড়ি যাহাতে বন্ধ না হইয়া যায়, তাহার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অন্যান্য প্রদেশের সহিত সহজ যোগাযোগ থাকে, সেই দিকেও নজর রাখা কর্তব্য। শিক্ষার দিক দিয়া পরিভাষার মিল অংশতঃ প্রাদেশিক মিলনের সেতু হইবার সম্ভাবনা রহিবে। তাহাতে জ্ঞানও সহজে সম্প্রসারিত হইবে। ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ডক্টর শ্রীশান্তিস্বরূপ ভাটনগর বার্ষিক অধিবেশনের (১লা জানুয়ারী ১৯৪৮) ভাষণে বিজ্ঞানের পরিভাষা সংক্রান্ত ব্যাপারে এই মতই ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভারতের বিভিন্ন ভাষাতে পৃথক পৃথক বৈজ্ঞানিক শব্দ রচনা করিতে গেলে শ্রমের অপব্যয় হইবে। অদূর ভবিষ্যতের জন্য আমাদিগকে ইংরেজি শব্দের সাহায্যে কাজ চালাইতে হইবে।

আমার মনে হয় উপস্থিত পূর্ব-রচিত যে-সকল পরিভাষা আমাদের সঞ্চিত আছে, তাহার একটি বিস্তৃত বর্ণানুক্রমিক তালিকা যথাসম্ভব প্রকাশ করা কর্তব্য। পরিভাষা সংক্রান্ত বেশীর ভাগই পুস্তক, পুস্তিকা ও পত্রিকা সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থাগারে পাওয়া যাইবে। এই কাজের জন্য প্রচুর অর্থ ও বহু ছাত্র আবশ্যক। অর্থ জুটিলে অভিলাষী ছাত্রের অভাব হইবে না। বিনা অর্থে বা বিনা আয়াসে এই বিরাট কাজ সুসম্পন্ন হইবে, এরূপ আশা করিয়া বসিয়া থাকিলে ভুল হইবে। স্মরণ রাখা কর্তব্য, গত পঞ্চাশ বছর আমরা এইভাবে বৃথা কাল হরণ করিয়াছি। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি মৌলানা আজাদ সাহেবের মতে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে মাতৃ-ভাষায় পঠন-পাঠন কায়েমী হইবে। সুতরাং প্রথম দুই বৎসরের মধ্যে পরিভাষার কাজ শেষ না হইলে বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষা পিছাইয়া পড়িবে।

পরিভাষা-সঙ্কলনে আমাদের দেশে অনেক বাধা বিপত্তি আছে। আমাদের দেশে এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই, যাহা সমস্ত প্রদেশে একই পরিভাষা চালাইবার ব্যবস্থা করিতে পারে, এমন কি—একই প্রদেশের বিভিন্ন লেখককে একই পরিভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য করিতে পারে। এখানে প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান! সকল প্রদেশে একই পরিভাষা না চলিলে, ইহার একটা সাধারণ সমতা রক্ষা করা অসম্ভব।

প্রফুল্লচন্দ্র (বাঙালীর ভবিষ্যৎ)

আচার্য জগদীশচন্দ্র

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানী হইলেও বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে তিনি পৃথক্ করিয়া দেখিতে চাহিতেন না; তাই ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনে যখন তাঁহাকে সভাপতিত্বে বরণ করা হয়, তিনি সভাপতির আসন হইতে বলেন—

'যদিও জীবনের অধিকাংশ কাল আমি বিজ্ঞানের অনুশীলনে যাপন করিয়াছি, তথাপি সাহিত্য-সম্মিলন-সভার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করি নাই। কারণ আমি যাহা খুঁজিয়াছি, দেখিয়াছি, লাভ করিয়াছি তাহাকে দেশের অন্যান্য নানা লাভের সঙ্গে সাজাইয়া ধরিবার অপেক্ষা আর কি সুখ হইতে পারে? আর এই সুযোগে আমাদের দেশের সমস্ত সত্য-সাধকদের সহিত এক সভায় মিলিত হইবার অধিকার যদি লাভ করিয়া থাকি তবে তাহা অপেক্ষা আনন্দ আমার আর কি হইতে পারে।...'

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জগদীশচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছেন, সেই সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'দাসী' নামক পত্রিকায় জগদীশচন্দ্রের প্রথম বাঙলা প্রবন্ধ 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে' প্রকাশিত হয়।

ভাবের ও ভাষার মনোহারিত্বে এই প্রবন্ধ তখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইহা কি একজন প্রথিতনামা বিজ্ঞানীর লেখনী-প্রসূত? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রহস্য করিয়া জগদীশচন্দ্রকে বলেন, "আপনি নিশ্চয়ই আপনার ভগিনীর লেখা নিজের বলিয়া চালাইয়াছেন।" জগদীশচন্দ্রের ভগিনী শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দেবী সাহিত্যক্ষেত্রে তখন বিশেষ সুপরিচিতা।

এই সময় 'অগ্নি-পরীক্ষা' নামে জগদীশচন্দ্রের এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দুইটি বিরাট ইংরাজ বাহিনীকে কিরূপে কয়েক শত গুরখা সৈন্য বার বার বিপর্যস্ত করিয়াছিল সেই বীরত্বের এক কাহিনী। একস্থানে লিখিতেছেন—

'দুর্গের নামমাত্র যে প্রাচীর ছিল তাহা আর রক্ষা পাইল না, গোলার আঘাতে প্রস্তরস্তূপ খসিয়া পড়িতে লাগিল। আক্রান্ত গোরক্ষা সৈন্যের ভাগ্যলক্ষ্মী এখন লুপ্তপ্রায়। কিন্তু এই সময়ে সহসা এক অদ্ভুত দৃশ্য লক্ষিত হইল, ভগ্ন স্থানে মুহূর্ত মধ্যে এক প্রাচীর উত্থিত হইল। এই নূতন প্রাচীর সুকোমল নারী-দেহে রচিত। গোরক্ষা রমণীগণ স্বীয় দেহ দ্বারা প্রাচীরের ভগ্ন স্থান পূর্ণ করিলেন। ইহার অনুরূপ দৃশ্য পৃথিবীতে আর কখনও দেখা যায় নাই। কার্থেজের রমণীরা স্বীয় কেশপাশ ছিন্ন করিয়া ধনুর জ্যা রচনা করিয়াছিলেন কিন্তু রক্তমাংস গঠিত জীবন্ত শরীর দিয়া কুত্রাপি দুর্গ প্রাচীর রক্ষিত হয় নাই।'

'অব্যক্ত' নামক তাঁহার যে পুস্তক পরে প্রকাশিত হয় তাহার কথারম্ভে বলিয়াছেন—

'মানুষ মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা শিক্ষা করে সেই ভাষাতেই সে আপনার সুখদুঃখ জ্ঞাপন করে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমার বৈজ্ঞানিক অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধ মাতৃভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল। তাহার পর বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ও জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং সেই উপলক্ষ্যে বিবিধ মামলা মোকদ্দমায় জড়িত হইয়াছি। এ বিষয়ের আদালত বিদেশে, সেখানে

বাদ প্রতিবাদ কেবল ইয়োরোপীয় ভাষাতেই গৃহীত হইয়া থাকে। এ দেশেও প্রিভি কাউন্সিলের রায় পাওয়া না পর্যন্ত কোন মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না।

'জাতীয় জীবনের পক্ষে অপমান আর কি হইতে পারে ?'

১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ময়মনসিংহ শহরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশনে আচার্য জগদীশচন্দ্রকে সভাপতির পদে বরণ করা হয়। মহারাজা কুমুদ চন্দ্র সিংহ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন। অধিবেশনের কিছু পূর্বে তিনি জগদীশচন্দ্রকে জানান যে, এই অধিবেশন উপলক্ষ্যে তাঁহার আবিষ্কার সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য ময়মনসিংহ-বাসী এবং সম্মিলনীর সভ্যগণ অতিশয় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন; বক্তৃতায় কতকগুলি পরীক্ষাও যেন দেখান হয়। জগদীশচন্দ্র সম্মত হইলেন এবং কতকগুলি বিশেষ যন্ত্র প্রস্তুত করাইয়া সঙ্গে লইয়া যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে মহারাজা জানাইলেন যে, যে হলে তাঁহার বক্তৃতা হইবে তথায় যত লোক ধরে তাহার দশগুণ লোক তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য ব্যগ্র; সেই কারণে অভ্যর্থনা-সমিতি জগদীশচন্দ্রের বক্তৃতা শুনিতে প্রবেশ-মূল্য ধার্য করিতে ইচ্ছুক; এ কথাও জানান হইল যে, প্রবেশ মূল্য যদি একশত টাকা করিয়া ধরা হয় তাহা হইলেও হল ভরিয়া যাইবে। জগদীশচন্দ্র বলিয়া পাঠাইলেন যে, ময়মনসিংহ জমিদার-প্রধান স্থান, টাকা হয়ত অনেক উঠিতে পারে, কিন্তু শুধু বড়লোকের জন্য বক্তৃতা দিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। তিনি এই প্রস্তাবও করিয়া পাঠাইলেন যে, প্রয়োজন হইলে তিনি একই বক্তৃতা দুই দিন দিতে প্রস্তুত কিন্তু কোন প্রবেশ-মূল্য ধার্য করা যেন না হয়। সেই অনুসারে ব্যবস্থাও হইল; স্থির হইল বক্তৃতা একদিন ইংরেজীতে এবং আর একদিন বাঙলাতে হইবে।

আচার্য জগদীশচন্দ্র

জগদীশচন্দ্রের এই বাঙলা বক্তৃতা একটি স্মরণীয় ব্যাপার। দুরূহ বৈজ্ঞানিক তথ্য সহজ সরল ভাষায় বলিয়া যাইতে লাগিলেন, একটিও পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিলেন না, জটিলতার লেশ-মাত্র নাই। বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই এইরূপ শ্রোতারও অন্তঃস্থলে গিয়া তাঁহার কথাগুলি পৌঁছিল।

'বিজ্ঞানী ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয়, একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বিজ্ঞানী পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসংবরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। বিজ্ঞানীকে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্যবেক্ষণের কঠোর পথে তাঁহাকে সর্বদা আত্মসংবরণ করিয়া চলিতে হয়।'

জগদীশচন্দ্রের এই উক্তি যদি ঠিক হয় তো দুই বিভিন্ন পথের যাত্রী জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ কিরূপে আজীবন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে আবদ্ধ ছিলেন? সাধারণত এক মতাবলম্বীর মধ্যেই তো স্থায়ী বন্ধুত্ব জন্মে। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, রবীন্দ্রনাথের লেখায় বিজ্ঞানীর যুক্তির ধারা বহিয়া গিয়াছে, তাই জগদীশচন্দ্র বার বার রবীন্দ্রনাথকে বলিয়াছেন "তুমি যদি কবি না হইতে তো শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হইতে পারিতে।" আর জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের কোন বিশিষ্ট কুঠরির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রাখিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তাঁহার কল্পনা-স্রোতকে অবাধে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাই জগতে তিনি মহান্ বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানীর এই দিকটা লক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্রনাথ একদিন বলিয়াছিলেন—

"বন্ধু, যদিও বিজ্ঞান-রাণীকেই তুমি তোমার সুয়োরাণী করিয়াছ তবু সাহিত্য-সরস্বতী সে পদের দাবী করিতে পারিত—কেবল তোমার অনবধানেই সে অনাদৃতা হইয়া আছে।"

আর বিজ্ঞানের কথা, অপূর্ব্ব রূপকথা; এ রূপকথা শোনবার কৌতূহল সার্ব্বভৌম। এ রূপকথাও সর্ব্বজনবোধ্য করে বলা যায়।

* * *

আর দর্শনবিজ্ঞানও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত না হলে এই দুই শাস্ত্র এক রকম সাম্প্রদায়িক বিদ্যারূপেই থেকে যাবে, যার সঙ্গে লৌকিক মতের কোন সম্পর্ক থাকবে না।..... মনোজগতেও জাতিভেদ আমাদের কারও মনঃপূত নয়।

প্রমথ চৌধুরী (অভিভাষণ)

বর্ত্তমান সভ্যতায় জৈব রসায়নের দান

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র

রসায়নের যে শাখা জৈব রসায়ন নামে খ্যাত উহা অপেক্ষাকৃত নূতন। শতাধিক বর্ষ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে গাছপালা, জীবজন্তুর দেহ প্রভৃতিতে অম্ল, শর্করা, উপক্ষার ইত্যাদি নানা জাতীয় যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ থাকে, উহারা জীবনীশক্তির (Vital force) ক্রিয়ার ফলেই উৎপন্ন হয়। কোন কৃত্রিম উপায়ে উহাঁরা প্রস্তুত হইতে পারে না। এই কারণেই রসায়নের যে শাখায় এই সমস্ত বস্তুর বিষয় আলোচিত হইত তাহার নাম জৈব রসায়ন দেওয়া হইয়াছিল।

১৮২৮ সালে জর্মান বৈজ্ঞানিক ভোয়েলার (Woehler) কৃত্রিম উপায়ে ইউরিয়া (Urea) নামক একটি অঙ্গার, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের যৌগিক প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। ইউরিয়া মূত্রের প্রধান উপাদান এবং এই পরীক্ষা হইতেই প্রথম প্রমাণিত হয় যে জীবনীশক্তি ব্যতিরেকেও তথাকথিত "জৈব" পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারে। তারপর ১২০ বৎসর অতীত হইয়াছে। বৃক্ষে, পত্রে, ফুলে, ফলে, জীবজন্তুর দেহে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায় তাহার সমস্তই যদিও এ পর্য্যন্ত কৃত্রিম উপায়ে রসশালায় প্রস্তুত হয় নাই, তথাপি ঐ সকল পদার্থ যে এই ভাবে প্রস্তুত হইতে পারে সে সম্বন্ধে কাহারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

জীবদেহে ও তরু-গুল্মাদিতে যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ থাকে তাহার অধিকাংশই অঙ্গারযৌগিক। একদিকে যেমন অঙ্গারযৌগিকগুলির স্বরূপ ও গুণ অপরাপর মৌলিক পদার্থদের যৌগিক হইতে অনেক ভিন্ন, অপরদিকে তেমনি অঙ্গারযৌগিকগুলি সংখ্যায়ও অনেক বেশী। এইজন্য জৈব রসায়ন নামের পুরাতন সার্থকতা না থাকিলেও অধ্যয়ন ও অধ্যাপনের সুবিধার জন্য রসায়নের যে অংশে অঙ্গারযৌগিকগুলির বিষয় আলোচিত হয় উহা জৈব রসায়ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

জৈব রসায়ন সাধারণতঃ তিন পর্য্যায়ে বিভক্ত করা হয়। প্রথম পর্য্যায়ের আলোচ্য বিষয় খনিজ তৈল (Petroleum) ও তাহার সহিত যে দাহ্য গ্যাস পাওয়া যায় তাহাদের উপাদানসমূহ এবং এই সকল হইতে নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে লব্ধ অথবা উহাদিগের সহিত রাসায়নিক সম্বন্ধসূত্রে বদ্ধ অঙ্গারযৌগিক সমূহ। খনিজ তৈল বা গ্যাস উভয়েই অঙ্গার ও হাইড্রোজেন এই দুইটি মৌলিক পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে রাসায়নিক সংযোগের ফলে উৎপন্ন "মুক্ত শৃঙ্খল" যৌগিকগণের (Open-chain compounds) মিশ্রণ মাত্র। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের আলোচ্য বিষয় পাথুরে কয়লা হইতে অন্তর্ধূম পাতনের (Destructive distillation) ফলে উদ্ভূত আলকাতরা হইতে আংশিক পাতন (Fractional distillation) দ্বারা লব্ধ হাইড্রোজেন ও অঙ্গারের "বলয়" যৌগিক সমূহ (Ring compounds) এবং ঐ-সকল হইতে ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে লব্ধ অঙ্গারযৌগিক পদার্থ সমূহ। বস্তুতঃ জৈব রসায়ন বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহার অধিকাংশই এই প্রথম ও দ্বিতীয় পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। প্রসঙ্গতঃ ইহাও বলা যায় যে, জৈব রসায়নের মূলে প্রধানতঃ যে দুইটি বস্তু অর্থাৎ খনিজ তৈল (ও

গ্যাস) এবং পাথুরে কয়লা, আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতার মূলেও প্রধানতঃ সেই দুইটি বস্তু। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যে যুদ্ধ-কলহ ও বিবাদ-বিসম্বাদ তাহার মূলে অনেক স্থলেই সভ্যতার এই দুইটি অত্যাবশ্যক উপাদান আয়ত্ত করিবার প্রয়াস।

এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে জৈব রসায়ন, বিশেষতঃ ব্যবহারিক জৈব রসায়ন আমাদের বাস্তব জীবনে কি স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

মানুষ খাদ্যদ্রব্য ভিন্ন বাঁচিতে পারে না। সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর ক্রমবর্দ্ধমান অধিবাসীগণের যথোপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ এখন চিন্তাশীল মনীষীগণের বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের খাদ্যদ্রব্যের অধিকাংশই মাটি হইতে পাই, কারণ ইহাতেই ফলশস্যাদি উৎপন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমস্ত জীবজন্তুর আহার্য্য যোগায়। সুতরাং আহার্য্য বস্তুর পরিমাণ বাড়াইতে হইলে আমাদিগকে হয় ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে হইবে, অথবা সম্ভব হইলে কৃত্রিম উপায়ে আহার্য্য প্রস্তুত করিতে হইবে।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে বৃক্ষপত্রাদির উপাদান—মূলতঃ অঙ্গার, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন, এই চারিটি। ইহার মধ্যে প্রথম উপাদান ইহারা বায়ুর অঙ্গারাম্ল হইতে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় উপাদান মাটির জলীয় ভাগ হইতে গ্রহণ করে। চতুর্থ উপাদান অর্থাৎ নাইট্রোজেন বায়ুতে অপর্য্যাপ্ত থাকিলেও গাছপালা প্রভৃতি সাধারণতঃ বায়ু হইতে গ্রহণ করিতে পারে না, ভূমি হইতেই গ্রহণ করিয়া থাকে। এইজন্য ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রধানতঃ নাইট্রোজেন-যৌগিক পদার্থসমূহ সার হিসাবে ব্যবহার করিতে হয়। কৃত্রিম সারের অধিকাংশই অজৈব রসায়নের বিষয়ীভূত, তবে ক্যালসিয়ম সায়ানামাইড নামক একটি অঙ্গারযৌগিক কৃত্রিম সার প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

রসশালায় কৃত্রিম উপায়ে যে সব অঙ্গারযৌগিক প্রস্তুত হয় তাহার মধ্যে খাদ্যদ্রব্যও আছে। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে যে গ্লুকোজ বা দ্রাক্ষাশর্করা, যাহা রোগীর পথ্যহিসাবে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়, তাহা অনেকস্থলে এখন আর দ্রাক্ষারস হইতে প্রস্তুত হয় না, শ্বেতসার হইতে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাকেরিন নামক যে অঙ্গারযৌগিক এখন সিরাপ, সরবত, লেমনেড ইত্যাদির জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, উহা ঠিক খাদ্যদ্রব্য না হইলেও এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন তৈল, বসা প্রভৃতি হইতে যে মার্গারিন নামক কৃত্রিক মাখন প্রস্তুত হয়, উহা খাদ্যদ্রব্য হিসাবে দুগ্ধ হইতে উদ্ভূত মাখনের তুল্যমূল্য না হইলেও ইহা যে একটি উত্তম খাদ্যদ্রব্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নানাবিধ তৈল কৃত্রিম উপায়ে হাইড্রোজেন-যুক্ত করিয়া যে "ভেজিটেবল" ঘৃত এখন প্রচুর পরিমাণে হইতেছে, উহাও খাদ্য হিসাবে ঘৃত হইতে অনেকাংশে অপকৃষ্ট হইলেও ঘৃতের অভাব কিয়ৎপরিমাণে মোচন করিতেছে।

সভ্যতার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে উহা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভাব বাড়িয়া যায়। মানুষের জীবনযাত্রা ক্রমশঃ জটিল হইয়া পড়ে। নূতন নূতন অভাব মোচন করিবার জন্য তাহাকে পদে পদে শিল্প ও বিজ্ঞান, আন্তর্দেশিক ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সাহায্য লইতে হয়।

সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত বস্তুর দিকে মানুষের দৃষ্টি স্বভাবতঃ প্রথমেই আকৃষ্ট হয়, রঞ্জক পদার্থসমূহ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। এইক্ষেত্রেই জৈব রসায়নের বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রথমে উড্ডীয়মান হইয়াছিল। প্রাচীনকালে যে সব রঞ্জক পদার্থ ব্যবহৃত হইত, তাহার অধিকাংশই আসিত উদ্ভিজ্জগৎ বা প্রাণিজগৎ হইতে। নীলের গাছ হইতে নীল রং, মঞ্জিষ্ঠা হইতে লাল রং, লাক্ষা কীটের ক্রিয়ায় উৎপন্ন লাক্ষা হইতে ও মেক্সিকো দেশীয় কোচিনিয়াল নামক একপ্রকার কীটের শুষ্কদেহ হইতে অলক্ত বর্ণ এবং হরিদ্রা হইতে হরিদ্রা বর্ণ প্রস্তুত হইত।

১৮৫৬ সালে ইংলণ্ডের বিখ্যাত জৈব রাসায়নিক উইলিয়ম হেনরী পার্কিন কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি এই সম্পর্কে যে সমস্ত পরীক্ষা করেন, তাহারই অন্যতমের ফলে অ্যানিলিন মভ (Aniline mauve) নামক বেগুনি কৃত্রিম রং আবিষ্কৃত হয় এবং ইহা হইতেই কৃত্রিম উপায়ে বর্ণক পদার্থ প্রস্তুত করা বিষয়ে অনেকেরই দৃষ্টি পড়ে। ১৮৫৯ সালে ফরাসী রাসায়নিক ভেয়ারক্যাঁ (Verquin) ম্যাজেণ্টা রং আবিষ্কার করেন। ইহার পর হইতে প্রতি বৎসরই নূতন নূতন বিচিত্র কৃত্রিম রং আবিষ্কৃত ও জনসমাজে প্রচারিত হইতে থাকে।

১৮৬৯ সাল জৈব রসায়নের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর গ্রেবে ও লিবেরমান (Graebe and Liebermann) নামক জর্মান রাসায়নিকদ্বয় কৃত্রিম উপায়ে অ্যালিজারিন নামক মঞ্জিষ্ঠার বর্ণক পদার্থ প্রস্তুত করেন। অতি প্রাচীন কাল হইতেই বর্ণক পদার্থরূপে মঞ্জিষ্ঠার ব্যবহার। রোমক বৈজ্ঞানিক প্লিনির গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে। মঞ্জিষ্ঠা-জাতীয় উদ্ভিদের চাষ কেবল ভারতবর্ষে নহে, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ইটালী ও তুরস্ক দেশেও যথেষ্ট হইত। কিন্তু রসশালায় কৃত্রিম উপায়ে অ্যালি-জারিন প্রস্তুত হওয়ার ফলে ইহার ব্যবসায়ে প্রকৃতপক্ষে বিপ্লব আসিয়া পড়ে এবং ফলে মঞ্জিষ্ঠা-জাতীয় উদ্ভিদের আবাদ একপ্রকার বিলুপ্ত হয়।

কৃত্রিম উপায়ে অ্যালিজারিন প্রস্তুত করিতে হইলে আলকাতরা হইতে উদ্ভূত অ্যান্থ্রাসিন নামক অঙ্গারযৌগিকের প্রয়োজন হয়। আমরা পরে দেখিব যে আলকাতরা যে পাথুরে কয়লা হইতে পাওয়া যায় তাহা প্রাগৈতিহাসিক উদ্ভিদের প্রস্তরীভূত অবশেষ। এক্ষেত্রে তাহারা জৈব রসায়নবিদ্‌গণের সাহায্যে বর্ত্তমানকালের উদ্ভিদ-বিশেষকে স্থানভ্রষ্ট করিয়াছে বলিলে একটুও অত্যুক্তি হয় না।

মঞ্জিষ্ঠার বর্ণক পদার্থ সম্বন্ধে যাহা বলিলাম নীলের সম্বন্ধেও তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। ১৮৭৮ সালে জর্মান বৈজ্ঞানিক বায়ার (Baeyer) কৃত্রিম সংশ্লেষণ দ্বারা নীলের বর্ণক পদার্থ প্রথম প্রস্তুত করেন। পরে দীর্ঘ দ্বাদশকালব্যাপী পরীক্ষা ও বহুলক্ষ মুদ্রা ব্যয়ের পর নীল কৃত্রিম উপায়ে রসশালায় সংশ্লেষণ করিবার এমন একটি প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয় যে কৃত্রিম নীল স্বভাবজাত নীলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয় এবং বলা বাহুল্য এই অসম প্রতিযোগিতায় স্বভাবজাত নীল অচিরাৎ পরাস্ত হইয়া যায়।

প্রাচীনকালে মিউরেক্স ব্র্যাণ্ডারিস্ (Murex brandaris) নামক একপ্রকার শম্বুক হইতে Tyrian purple নামক এক প্রকার নীলাভ লোহিত বর্ণের রঞ্জক পদার্থ প্রস্তুত হইত। অত্যন্ত দুর্মূল্য বলিয়া কেবল রাজা ও সম্রাটগণের পরিচ্ছদ রঞ্জনে ইহা ব্যবহৃত হইতে। ১৯০৯ সালে জর্মান জৈব রাসায়নিক ফ্রিডলেণ্ডার (Friedlaender) ১২,০০০ শম্বুকের দেহ হইতে পরীক্ষোপযোগী রং প্রস্তুত করিয়া প্রথমে বিশ্লেষণ এবং পরে কৃত্রিম সংশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ করেন যে এই বর্ণক পদার্থ ও নীলের বর্ণক পদার্থ মূলতঃ একই বস্তু। প্রভেদের মধ্যে নীলে যে হাইড্রোজেন থাকে তাহার কিয়দংশের স্থান প্রথমোক্তটিতে ব্রোমিন নামক মৌলিক পদার্থ দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে।

বর্ণক পদার্থ সমূহ প্রস্তুত করা বিষয়ে জৈব রাসায়নিকগণের প্রচেষ্টা আশাতিরিক্ত সাফল্যে মণ্ডিত হওয়ায় বহু মেধাবী ছাত্র জৈব রসায়ন অধ্যয়ন ও গবেষণায় আকৃষ্ট হন। ফলে শুধু বর্ণক পদার্থ নহে, অন্যান্য নানাবিধ ব্যবহারোপযোগী অঙ্গারযৌগিক রসশালায় সংশ্লেষিত হয়।

সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, বর্ণক বা রঞ্জক

পদার্থের ন্যায় মান। জাতীয় গন্ধদ্রব্য ও সুগন্ধি মশলার চাহিদা বাড়িতে থাকে। কিন্তু উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ গন্ধদ্রব্যের মূল্য স্বভাবতঃ একটু বেশী হওয়ায় উহাদের বহুল ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে নাই। এই ক্ষেত্রেও জৈব রাসায়নিকগণের প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় বিশেষ ফলযুক্ত হইয়াছে। কৃত্রিম সংশ্লেষণ দ্বারা অধিকাংশ গন্ধদ্রব্য ও সুগন্ধি মশলা প্রভৃতির উপাদান (Principle) অনেকস্থলেই রসশালায় প্রস্তুত হইয়া জনসাধারণের নিত্য ব্যবহারের বস্তু হইয়াছে।

জৈব রাসায়নিকগণ স্বভাবজাত অঙ্গারযৌগিকসমূহ প্রথমে বিশ্লেষণ এবং পরে সেগুলি সংশ্লেষণ করিয়া উহাদের পরমাণবিক বিন্যাস বা আভ্যন্তরীণ গঠন সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। উঁহারা দেখিয়াছেব যে, পরমাণুগণের বিন্যাসভেদে অঙ্গারযৌগিকগুলির গুণেরও অনেক তারতম্য হইয়া থাকে। কোন পদার্থ বর্ণক হইয়া থাকে, কোন পদার্থ বা গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে। পদার্থবিশেষ আবার জীবদেহের উপর নানাপ্রকার ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে অর্থাৎ সেইগুলি ঔষধরূপে ব্যবহার করা চলে।

জৈব রসায়নের শেষোক্ত অঙ্গ এখন উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে। এখানে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিব। কোকেইন নামক উপক্ষার (Alkaloid) অল্পকালস্থায়ী অসাড়তা উৎপাদন করিবার জন্য চিকিৎসকগণ যথেষ্ট ব্যবহার করেন; ইহা দক্ষিণ আমেরিকাজাত এরিথ্রোক্সাইলন কোকা (Erythroxylon coca) নামক বৃক্ষের পত্র হইতে পাওয়া যায়। রাসায়নিকগণ বিশ্লেষণ ও পরে সংশ্লেষণ দ্বারা ইহার পরমাণুবিন্যাস বা আভ্যন্তরীণ গঠন সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন। পরে কৃত্রিম সংশ্লেষণ দ্বারা বিটা ইয়ুকেইন (B Eucain) নামক এমন একটি অঙ্গারযৌগিক প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহার পরমাণুবিন্যাস কোকেইনের মত জটিল না হইলেও অনেকাংশে ইহার অনুরূপ এবং সহজেই প্রস্তুত করা যায়। প্রথম মহাযুদ্ধে সামরিক অস্ত্রচিকিৎসাগারগুলিতে এই যৌগিকটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ ইহার ক্রিয়া কোকেইনের অনুরূপ। কোকেইন ও বিটা ইয়ুকেইন সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা কুইনাইন এবং ইহার পরিবর্তে অধুনা বহুল-ব্যবহৃত অ্যাটেব্রিন ও প্লাস্‌মোকিন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। জীবদেহে ম্যালেরিয়া উৎপাদনকারী জীবাণু নষ্ট করিতে ইহাদের শক্তি কুইনাইন হইতে কোন অংশে অল্প নহে।

এইরূপে ধীরে ধীরে আপনার আলোচনা ক্ষেত্রের পরিধি বিস্তার করিয়া জৈব রসায়ন সভ্য মানবের নানা নূতন নূতন অভাব দূর করিবার এবং সভ্যজগতের দ্বারা উপস্থাপিত নানা প্রশ্নের সদুত্তর দিবার চেষ্টা করিতেছে। জীবতত্ত্বের দুরূহ তথ্যগুলির অধিকাংশই তাহার আলোচ্য বিষয় হইয়াছে। ভিটামিন, হরমোন বা জীবগ্রন্থির অন্তঃরসের সক্রিয় পদার্থ প্রভৃতির স্বরূপ কি তাঁহা বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে জৈব রাসায়নিকগণ এখন বিশেষভাবে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, আধুনিক সভ্যতার মূলে পাথুরে কয়লা ও খনিজ তৈল। যতদিন পাথুরে কয়লা বা খনিজ তৈল বা উভয়ের দ্বারা আমরা যথোপযুক্ত কার্য্যকরী শক্তি উদ্ভূত করিতে পারিব, ততদিন আমরা ইহাদের দ্বারা ক্রীতদাসের মত কাজ করাইতে পারিব। কিন্তু এই দুইটি পদার্থের কোনটিরই ভাণ্ডার অফুরন্ত নহে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, অতি প্রাচীনকালে জলাভূমিতে উৎপন্ন গাছপালার অবশেষ রাশীকৃত হইয়া উহার উপর বহুকালব্যাপী তাপ ও চাপের ফলে পাথুরে কয়লার সৃষ্টি হইয়াছে। পদার্থবিদ্যায় আমরা পাঠ করি যে শক্তির বিনাশ নাই রূপান্তর মাত্র আছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে বায়ুস্থ অঙ্গারাম্ল হইতে অঙ্গার ভাগ গ্রহণ

করিয়া সব গাছপালা কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিল, সেই-গুলি এখন পরিবর্ত্তিত অবস্থায় ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করি এবং তাহাদেরই সাহায্যে তাপ, বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদি উৎপন্ন করিয়া রেলগাড়ী, জাহাজ, কলকারখানা চালাইয়া থাকি। এই সমস্ত শক্তি অতি প্রাচীনকালে বিকীর্ণ সূর্য্যরশ্মির শক্তির রূপান্তরমাত্র।

পাথুরে কয়লা যেমন অতি প্রাচীনকালের গাছপালার অবশেষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তেমনি বৈজ্ঞানিকগণের মতে খনিজ তৈলও অতি প্রাচীন-কালের অ্যালগা, ডায়াটম (Alga, diatom) প্রভৃতি নিম্ন স্তরের উদ্ভিদের অবশেষ হইতে, অংশতঃ সামুদ্রিক মৎস্য ও শম্বুকাদি জীবের অবশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা যখন পাথুরে কয়লা বা খনিজ তৈল ব্যবহার করি তখন মাতা বসুন্ধরার বহুযুগের সযত্নসঞ্চিত ধন ব্যয় করিয়া থাকি। এই বিষয়ে যদি আমরা সতর্ক না হই, তবে অপব্যয়ী পিতৃপিতামহের বংশধরগণের যে দুরবস্থা আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করি, আমাদের সুদূর ভবিষ্য-দ্বংশীয়গণেরও সেই অবস্থা হওয়া অনিবার্য্য।

এই বিষয়েও বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাঁহারা একদিকে যেমন পাথুরে কয়লার তাপোৎ-পাদনী শক্তি সম্যক্ ও সম্পূর্ণ কাজে লাগাইবার নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, অপরদিকে তেমনি জৈব রসায়ন-বিহিত প্রক্রিয়াবলীর সাহায্যে পাথুরে কয়লা হাইড্রোজেন-যুক্ত করিয়া অন্তর্দহন এন্‌জিনে (Internal combustion engine) ব্যবহারোপ-যোগী তরল অঙ্গারযৌগিকসমূহ প্রস্তুত করিতেছেন। কারণ পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে সমপরিমাণ ইন্ধন ব্যবহারে বহির্দহন এন্‌জিন অপেক্ষা অন্তর্দহন এন্‌জিনে অনেক বেশী শক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে।

আমরা এতক্ষণ জৈব রসায়নের কেবল সভ্যতা গঠনের দিক দেখিয়াছিলাম। কিন্তু উহার একটা ধ্বংসের দিকও আছে। জৈব রসায়নসাগরমন্থনের ফলে শুধু যে অমৃত উঠিয়াছে তাহা নহে, গরলও যথেষ্ট উঠিয়াছে। একটা চলিত কথা আছে যে, প্রত্যেকেই নিজের মৃত্যুবাণ সঙ্গে লইয়া আসে। মহাকালের সেই শাশ্বত নিয়মের বশেই জৈব রাসায়নিকগণ রসশালায় নানা জাতীয় বিস্ফোরক পদার্থ, বিষাক্ত গ্যাস ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া দূর ভবিষ্যতে বর্ত্তমান সভ্যতা ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করিতেছেন। তৎসম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

বই পড়াটাই যে শেখা, ছেলেদের মনে এই অন্ধসংস্কার যেন জন্মিতে না দেওয়া হয়। প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার হইতেই বইয়ের সঞ্চয় আহরিত হইতেছে, অন্তত হওয়া উচিত, এবং সেখানে যে আমাদেরও অধিকার আছে, একথা পদে পদে জানানো চাই।

রবীন্দ্রনাথ (আবরণ)

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য

শ্রীসুবোধনাথ বাকচী

দীর্ঘদিনের পরবশতার ফলে আমরা প্রতিপদেই জীবন-যুদ্ধে পশ্চাদপসরণ করছি এবং আমাদের জীবনে প্রতিক্ষণেই আসছে ব্যর্থতা। এর মূল কারণ আমরা শিক্ষার আদর্শ হারিয়ে ফেলেছি—জীবনের সঙ্গে যোগসূত্র ছিঁড়ে ফেলেছি। প্রকৃত শিক্ষা তাই যা জীবনকে সুস্থ, সবল ও সুন্দর করে তোলে—প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয় সেই যা জীবনকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে—জগতের সঙ্গে একতালে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে পরিপূর্ণতার দিকে। ব্যক্তির সঙ্গে জীবনের ও প্রকৃতির যোগ সহস্র গ্রন্থিতে বাঁধা এবং এর সঙ্গতি অক্ষুন্ন রাখছে আমাদের জ্ঞান। জীবনের এই পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক দৃষ্টিলাভ করতে সক্ষম হলেই আমরা জ্ঞানী হতে পারি। কিন্তু আমরা যারা শিক্ষিত বলে গর্ব করছি তারা ভেসে বেড়াচ্ছি ত্রিশঙ্কুর রাজত্বে—ফলে আমাদের বহু কষ্টার্জিত বিদ্যা হয়ে পড়েছে নিষ্ফল। একমাত্র জীবনকে যাচাই করেই আমাদের বিদ্যা জ্ঞানে পরিণত হতে পারে এবং তা সম্ভব হয় যদি আমরা শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করি মাতৃভাষার মারফত।

সৃষ্টির আদি থেকেই মানুষ তার জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তার জ্ঞানের সাহায্যে, অন্যথায় তার বিলোপ হ'ত অবশ্যম্ভাবী। মানুষ জ্ঞানার্জন করেছে তৎকালীন বিদ্যাকে আয়ত্ত করে এবং জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করে। এই বিবিধ ও বিশেষ বিদ্যার (যা কালক্রমে পরিণত প্রাপ্ত হয়েছে বিজ্ঞানে) সামগ্রিক সংশ্লিষ্টিকেই জ্ঞান বলতে পারি। সুতরাং বিজ্ঞানই জ্ঞানের উৎস। চিরকালই সভ্যতার বাহন ও ধারক হয়েছে বিজ্ঞান। এবং বিংশ শতাব্দীতে জ্ঞানের পরিধি এমন বিপুল বিস্তৃতিলাভ করেছে, যে সমস্ত জীবনটাই হয়ে গেছে বস্তুতপক্ষে বিজ্ঞানময়। এই ক্রমবর্ধমান সমস্যাবহুল জটিল জীবনে যখন চারিদিক থেকে গভীর সংকট ঘিরে ধরেছে তখন বিশেষ ভাবেই প্রয়োজন আমাদের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত করে এই বিজ্ঞানকে। জীবনকে সুন্দরময় ও সাফল্যমণ্ডিত করে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হ'লে বিজ্ঞান-চর্চার বহুল প্রচার ও প্রসার শুধু প্রয়োজন নয় অবশ্যকর্তব্য, নইলে আমাদের জাতীয় জীবনের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং আজকের দিনে বিজ্ঞানীদের নিজের স্বার্থেই এগিয়ে আসা কর্তব্য জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের জন্য। পরিভাষার দুরূহ সমস্যায় ভীত কিংবা হতাশ হবার কিছুই নেই। রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায় বৈজ্ঞানিক ভাব প্রকাশ করা নিশ্চয়ই সম্ভব। পূর্বগামীরা যদি সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে না পেরে থাকেন তবে তার প্রধান কারণ তদানীন্তন কঠোর প্রতিকূল আবহাওয়া। আজ ভারতে নব পটভূমিকার সৃষ্টি হয়েছে—চারিদিকে নতুন আশা ও আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছে। এই নবীন ভারতের উজ্জ্বলালোকে আমরা এগিয়ে যাব—দোদুল্যমান ভীরু বা ত্রস্ত পদে নয়—দৃঢ় পদক্ষেপে সোৎসাহে। নতুন পরিবেশে জীবনকে সমগ্রভাবে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে আমাদের প্রথম প্রচেষ্টার সোপান হ'ল এই বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ।

জীবনের এই সর্বাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গী অক্ষুন্ন রেখে অথচ আমাদের স্বল্প ক্ষমতার কথা স্মরণ করে আমাদের আপাততঃ দৃষ্টি থাকবে প্রথমতঃ জনগণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলবার দিকে।

শিক্ষা ও দীক্ষা জীবনরসে সিঞ্চিত হয়ে দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবে পরিণত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলবার প্রধান উপাদান বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহের বহুল প্রচার। কিন্তু তথাকথিত জ্ঞানের আহরণেই দৃষ্টিভঙ্গী যে গড়ে ওঠে না এটা আমরা নিত্যই আমাদের জীবনে প্রত্যক্ষ করছি। বিখ্যাত খাদ্যবিজ্ঞানীর পাতে হয়ত দেখবেন তাঁর বহু বিঘোষিত ও বহু নিন্দিত খাদ্যসামগ্রী। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক যিনি হয়ত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সারগর্ভ পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন—তাঁর বাড়ীতে হয়ত দেখবেন স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের প্রাথমিক নিয়মের উপেক্ষা। এটা ঘটতে পেরেছে শুধু আমাদের শিক্ষাদীক্ষার সাথে জীবনের যোগ নেই বলেই—তার ভিতর প্রাণের স্পর্শ নেই বলেই। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা সমস্তই ওভার-কোটের মত বাহিরের আবরণ হয়ে আছে—ঘরে ঢুকেই আলনায় ঝুলিয়ে রাখি—মস্তিষ্ক থেকে অন্তরে প্রবেশ করতে পারে না, কাজেই জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে ওঠে না। আমরা শিখে রেখেছি পাঠ্যপুস্তকের 'সারগর্ভ নীতিকথা' এবং সঙ্গে সঙ্গে এটা মনে গেঁথে রেখেছি যে এই ছাপার অক্ষরে লেখা নীতি-কথার সাথে বাস্তব-জীবনের কোন সম্পর্ক নেই—বরঞ্চ এগুলো বিরুদ্ধবাদী। জেনে রেখেছি যে কর্ম-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেই এই উপদেশ পুঁথিতে ও আলমারীতে সীমাবদ্ধ করে রেখে দিতে হবে।

আর একটা প্রধান অন্তরায় আমাদের ঘরের ভিতর যুগোপযোগী শিক্ষার প্রচার মোটেই হয় নি। এটা বিশেষভাবে আমাদের মনে রাখা দরকার যে ঘরের ভিতর শিক্ষার জের টেনে নিতে না পারলে আমাদের সব শিক্ষাই জীবনের সাথে যোগ হারিয়ে ফেলে নিষ্ফল হয়ে যাবে। পশ্চিমে আজ যে ঘরের ভিতর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দৈনন্দিন জীবন-যাপন করবার প্রচেষ্টা হয়েছে সে শুধু ফ্যাশনের খাতিরে নয়—পারিপার্শ্বিক সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমাদের জীবনে এর প্রয়োজন আরও বেশী। আমাদের সমাজ-জীবন রয়েছে মধ্যযুগীয় আবহাওয়ায় অথচ কর্মজগৎ ও অর্থনৈতিক জগৎ বর্তমান সভ্যতার ধাক্কায় টলমলিয়ে উঠেছে। চতুর্দিকের বিবিধ সমস্যার সমাধানের উপায় আমাদের বের করতে হবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যা আমাদের সাহায্য করবে আমাদের যেটুকু সরঞ্জাম রয়েছে তার সদ্ব্যবহার করে আমাদের জীবনযাত্রা যেন ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারে। এদিক থেকে জনসাধারণকে সাহায্য করতে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত থাকব।

এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করবার জন্য লেখার ভিতর দিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিবেশনের সময় আমাদের আদর্শ হবে রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ—"বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে, তোমাদের পাণ্ডিত্য ও দুরূহ বাক্যজালের আঘাতে শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষণীয় বিষয় যাতে দুঃসহ হয়ে না ওঠে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখো; আর তথ্যের বোঝা হালকা করে অযথা ফেনার যোগান দিয়ে তার পাতটাকে প্রায় ভোজ্যশূন্য করো না। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না।"

দ্বিতীয়তঃ স্কুল ও কলেজের পাঠ্যবস্তু সহজ ও সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক যথাযথতা অক্ষুণ্ণ রেখে বিভিন্ন পরিবেশে প্রকাশ করার জন্য। পাঠ্য-তালিকাভুক্ত বিষয়বস্তু মামুলী হলেও বাংলা ভাষায় তার প্রকাশের প্রয়োজন বর্তমানে খুবই রয়েছে। তা ছাড়া মামুলী বিষয়বস্তুও বিভিন্ন উপায়ে, বিভিন্ন ভঙ্গীতে, ও বিভিন্ন পরিবেশে সুন্দর রূপে প্রকাশ করতে পারলে তা সুখপাঠ্য ও চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশে বর্তমান বৈজ্ঞানিক শিক্ষার আর একটি প্রধান দোষ যে ছাত্রদিগকে যান্ত্রিক ভাবাপন্ন করে তোলে না। বলা বাহুল্য আমাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকবে এই ত্রুটি যথাসম্ভব দূর করবার

জন্য। এই ত্রুটি দূর করবার প্রধান অস্ত্র হবে মিউজিয়ম, প্রদর্শনী, মডেল ও খেলনা এবং স্কুল কলেজে ছেলেদের খেলনা, মডেল ও মেকানো জাতীয় দ্রব্যাদি তৈরী করার ও তা নিয়ে নাড়াচাড়া করার সুযোগ দেওয়া।

তৃতীয়ত: স্কুল কলেজের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পাঠ্যপুস্তক, বিশেষ বিষয়বস্তু সংক্রান্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ ও পরিক্রমা প্রকাশ করবার জন্য আমরা সর্বদাই সচেষ্ট থাকব। এই কার্যের সাহায্যার্থে আমরা ইংরেজি বৈজ্ঞানিক শব্দের ও ভাবের পরিভাষা বের করতে ও তা নিয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক।

আমাদের আর একটা গুরু দায়িত্ব হবে বাজারে যে সব বৈজ্ঞানিক পুস্তক বাংলা ভাষায় বিশেষতঃ ছাত্রদের জন্য বেরোয় তার সতর্ক ও সহানুভূতি-শীল সমালোচনা করা, যাতে আমাদের প্রকাশিত পুস্তকের আদর্শ বেশ উঁচুতে থাকে।

চতুর্থত: লোকসাহিত্য ও শিশুসাহিত্য সর্ব প্রকারে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানসম্পদে সমৃদ্ধশালী করে তোলা।

জনগণের মনের ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলক সাহিত্য। প্রকৃত সাহিত্য শুধু জীবনের সমালোচনা নয় জীবনের রূপায়ন। লোকশিক্ষায় ধর্ম ও পুরাতন ঐতিহ্য বিরাট স্থান অধিকার করে আছে—সাহিত্যে তার প্রতিফলন হয়েছে কিন্তু সমাজব্যবস্থা যে দ্রুত তালে এগিয়ে চলেছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও সাহিত্য এগিয়ে যেতে পারেনি। তার ফলে ঘটেছে প্রতিপদে অসঙ্গতি। পুরাতন জীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তিতে তদানীন্তন লোকশিক্ষা অনেক ক্ষেত্রেই হয়ে পড়েছে কুশিক্ষা। এবং অশিক্ষিতের চেয়ে কুশিক্ষিতের বিপদ যে অনেক বেশী বিশেষতঃ এই গণভোটের যুগে সে কথা বলাই বাহুল্য। এই নতুন শিক্ষায় জনগণকে দীক্ষিত করবার গুরু দায়িত্ব প্রধানতঃ সাহিত্যিকের। কিন্তু আমাদেরও একটা দায়িত্ব রয়েছে, সেটা হচ্ছে সাহিত্যিকগণকে সচেতন করে তোলা এবং তাদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্ভার বৃদ্ধি করে তুলতে যথাসম্ভব সাহায্য করা।

যেখানে সাধারণ সাহিত্যের অবস্থাই এইরূপ—যেখানে শিশুসাহিত্য এখনও উচ্চস্তরে পৌছুতে পারেনি সেখানে বিশেষ করে শিশু সাহিত্যের প্রসঙ্গে আলোচনা না করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমরা সর্বদাই মনে রাখব যে শিশু চিরকাল শিশুই থাকবে না এবং আজকের শিশু কাল দেশের নেতা হবে—দেশকে গড়ে তুলবে।

পঞ্চমত: বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য ও তার পথের বাধা-বিপত্তি দূর করবার জন্য বাৎসরিক সম্মেলন আহ্বান করা এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে শিক্ষামূলক অথচ জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রদর্শনী ও তৎসংক্রান্ত বক্তৃতার ব্যবস্থা করা।

নতুন পথে যাত্রার বাধা ও বিঘ্ন অনেক। প্রতি পদেই উঠবে নতুন সমস্যা এবং গোড়া থেকেই সেগুলো ভালভাবে সমাধান করার প্রয়োজন হবে। বাৎসরিক সম্মেলনে সমস্ত সুধীবৃন্দ একত্রিত হয়ে পরস্পরের মতামত বিচার করতে পারবেন এবং দেশকে সন্ধান দিতে পারবেন ঠিক পথের।

জ্ঞানার্জনের প্রকৃষ্ট পন্থা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। কিন্তু কার্যকারণ সম্পর্ক সঠিক বিশ্লেষণ করতে না পারলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও অনেক সময়েই জন্ম দেয় কুসংস্কারের। পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে এতাদৃশ মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করেই বর্তমান বিজ্ঞান জন্মলাভ করেছে। তেমনি বিজ্ঞানে ও চিন্তাধারায় তাই পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের প্রাধান্য এত। মিউজিয়ম ও প্রদর্শনীর সার্থকতা এই খানেই। প্রদর্শনীর ভিতর দিয়ে জনগণ তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কার্যকারণ সম্পর্ক জানতে পারছে—বুঝতে পারছে যে বৈজ্ঞানিক ঘটনা একটা ভৌতিক ব্যাপার নয়—অহরহই তাদের জীবনে ঘটে চলেছে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া সাধারণ বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারেই।

আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে হলে এবং পরিষদকে সুষ্টুভাবে পড়তে হ'লে প্রয়োজন হবে পরিষদের নিজস্ব বাড়ী, প্রেস, স্থায়ী মিউজিয়ম, প্রদর্শনী ও কারখানা। এগুলো ভালভাবে চালাতে হলে প্রয়োজন হবে বহুবিধ কর্মচারীর এবং বহু বিশেষজ্ঞের সাহায্য।

আমাদের স্বপ্নকে সার্থক করতে হলে প্রয়োজন হবে প্রচুর অর্থের। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় অর্থের কথা উঠলেই অনেক উৎসাহী ব্যক্তি বা মনীষীও হতাশ হয়ে পড়েন। তার অবশ্য যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কিন্তু ভাবতে যুগান্তর হয়েছে! সরকার সাময়িক পুনর্বসতির জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন অথচ জনগণকে দৃঢ় ভিত্তির উপর পুনঃ সংস্থাপিত করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব হবে কেন? শুধু তাই নয়, যে অর্থ আজ ব্যয় করে শিক্ষার বীজ বপন করা হবে, নিশ্চয়ই জানি কালক্রমে তা প্রচুর ফসল উৎপাদন করবে। আমাদের মধ্যে বাংলা দেশের বহু মনীষীর ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানী ও গুণীর সমাবেশ হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও হবে আশা করি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জাতীয় জীবনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা যদি একত্রিত হয়ে দেশের জনগণের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষায় ও মঙ্গল কামনায় কোন পরিকল্পনা গড়ে তোলেন, তবে তাকে রূপায়িত করবার জন্য অর্থ বা লোকের অভাব নিশ্চয়ই হবে না। এবং লোকায়ত্ত সরকারও তাঁদের মতামত উপেক্ষা করবেন না। জাতির চিন্তাধারাকে ও জাতীয় জীবনকে নতুন পথে, মাঙ্গল্যের পথে সর্বকালে এবং সর্বদেশেই এগিয়ে নিয়ে যান দেশের মনীষীরা, ঋষিরা। আমরা জানি আমাদের মধ্যে যে অনুপ্রেরণা এসেছে, যে চিন্তাধারার প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, দেশের অগণিত নরনারীর মনেও আজ ঠিক সেই চিন্তাই বড় হয়ে' উঠেছে। আমরা নিশ্চিত বুঝতে পারছি যে আমরা অন্ধকারে পা ফেলছি না। স্পষ্টই অনুভব করছি যে জনগণ উন্মুখ হয়ে রয়েছেন আমাদের কাজে নামবার আশায়। তাই আমাদের অনুরোধ বাংলাদেশের সমস্ত মনীষী, জ্ঞানী ও গুণীরা যেন এগিয়ে এসে পরিষদের কর্মভার হাতে তুলে নেন। জনসাধারণের প্রতি আমাদের অনুরোধ তাঁরা যেন সাহায্য ও সহানুভূতি দিয়ে পরিষদের ভিত্তি দৃঢ় করে তোলেন এবং যাতে এর উদ্দেশ্য সফল হয়ে ওঠে তার জন্য সচেষ্ট থাকেন।

দশমীকরণের আন্দোলন

শ্রীফণীন্দ্রনাথ শেঠ

কিছুকাল ধরে দেশে দশমীকরণের আন্দোলন চলছে। সারা ভারতে এমন কাগজ খুব কমই আছে, যাতে এই আন্দোলনের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে লেখা-লেখি হয়নি। বহু আপত্তিখণ্ডন ও বাদানুবাদের পর আজ এই আন্দোলন সফল হতে চলেছে। ভারত সরকারের দপ্তরে এর জন্য কাগজ-পত্র তৈরী হচ্ছে। শীঘ্রই এ বিষয়ে আইন-সভায় আলোচনা হবে, তারপর এই সংস্কার চালু করা হবে। সুতরাং ব্যাপারটা কি এখন বোঝা দরকার। যাঁরা নিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করেন, তাঁরা এ আন্দোলনের প্রয়োজন ও উপকারিতা বোঝেন। অথচ এটাও অনুভব করি, এ আন্দোলনের ঠিক স্বরূপটা এখনও দেশের জনসাধারণের অন্তর স্পর্শ করেনি। তাদের জন্য সহজ কথায় কিছু লিখছি।

দশমীকরণের অর্থ এই যে, দেশের বা সমাজের সকল রকম হিসাবের ব্যাপারে—অর্থাৎ মুদ্রা, ওজন ও মাপের বিভিন্ন এককগুলির মধ্যে—এমন একটা নিয়ম চলিত করা, যাতে প্রত্যেকটা একক অপর বড় বা ছোট এককের সঙ্গে ১০গুণের বা ১০ ভাগের সম্বন্ধ রাখে। আর একটু পরিষ্কার করি; টাকা-আনা-পাইয়ের বা মন-সের-ছটাকের বা গজ-ফুট-ইঞ্চির প্রথমটা দ্বিতীয়টার দশ গুণ হওয়া চাই। দেশের চলতি নিয়মে তা নেই। কেন—তার কোন যুক্তি মেলে না। মানুষ এককালে কল্পনায় এ সব এককের সৃষ্টি করেছিল নানা প্রয়োজনের তাগিদে। তার মধ্যে তখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। তাই আমরা ভেবে কোন কিনারা পাই না কেন ইঞ্চির ১২গুণে ফুট; ফুটের ৩গুণে গজ, আবার ১৭৬০ গজে এক মাইল। ছেলেবেলায় এসব প্রশ্ন নিত্য মনে হোত, কোন উত্তর পেতাম না। তখন থেকে ভাবতে আরম্ভ করেছিলাম, যে ভারতের দশমিক গণনা-পদ্ধতির আবিষ্কার জগৎ মেনে নিয়েছে, সেই ভারত কেন দশমিক পদ্ধতিতে সকল রকম মাপে বড় ছোট এককের সম্পর্ক স্থির করে না।

দশের ভাগে সমস্ত মুদ্রা, ওজন ও মাপ গোনার একক ধরে নিলে সব রকমের হিসাব সহজ ও সরল হবে। ফলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গণিত শিক্ষা সুখের হবে, সহজে শিখতে, মনে রাখতে ও কাজ করতে পারবে। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার একটা প্রধান বাহন হবে দশমীকরণ প্রথা। দেশী ও বিলেতী হরেক রকম মুদ্রা, ওজন ও মাপের অযৌক্তিক তালিকা মুখস্থ করতে হবে না। দুর্বোধ্য শুভঙ্করীর আর্যা, অবান্তর কড়া-ক্রান্তি-কাক-তিল ও তার নানারকম আঁকড়ি-বাঁকড়ি, দাঁত ভাঙা কড়া-কিয়া, গণ্ডাকিয়া, বুড়িকিয়া, পণকিয়া, চোককিয়া প্রভৃতি নিরস বিষয়গুলির হাত থেকে রেহাই পাবে। টাকা-আনা-পাই, মন-সের-ছটাক, পাউণ্ড-শিলিং-পেন্স প্রভৃতি মিশ্র যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ, ঊর্ধ্বগ ও নিম্নগ লঘুকরণ, চলিত-নিয়ম প্রভৃতি পাটীগণিতের অধ্যায়গুলি আর কচি কচি মস্তিষ্ক পিষবে না। এই সব বালাই দূর হয়ে যাবে। শুধু শতকিয়া, নামতা ও সরল যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ শিখলেই দৈনন্দিন ব্যাপারে সমস্ত সাধারণ কাজ চলবে। অথচ পরিবর্তনটা অতি সামান্য।

দশমিক নিয়মে কাজ শিখলে প্রচুর সময় ও শ্রমের লাঘব হয় আর অযথা কাগজ ও অর্থের
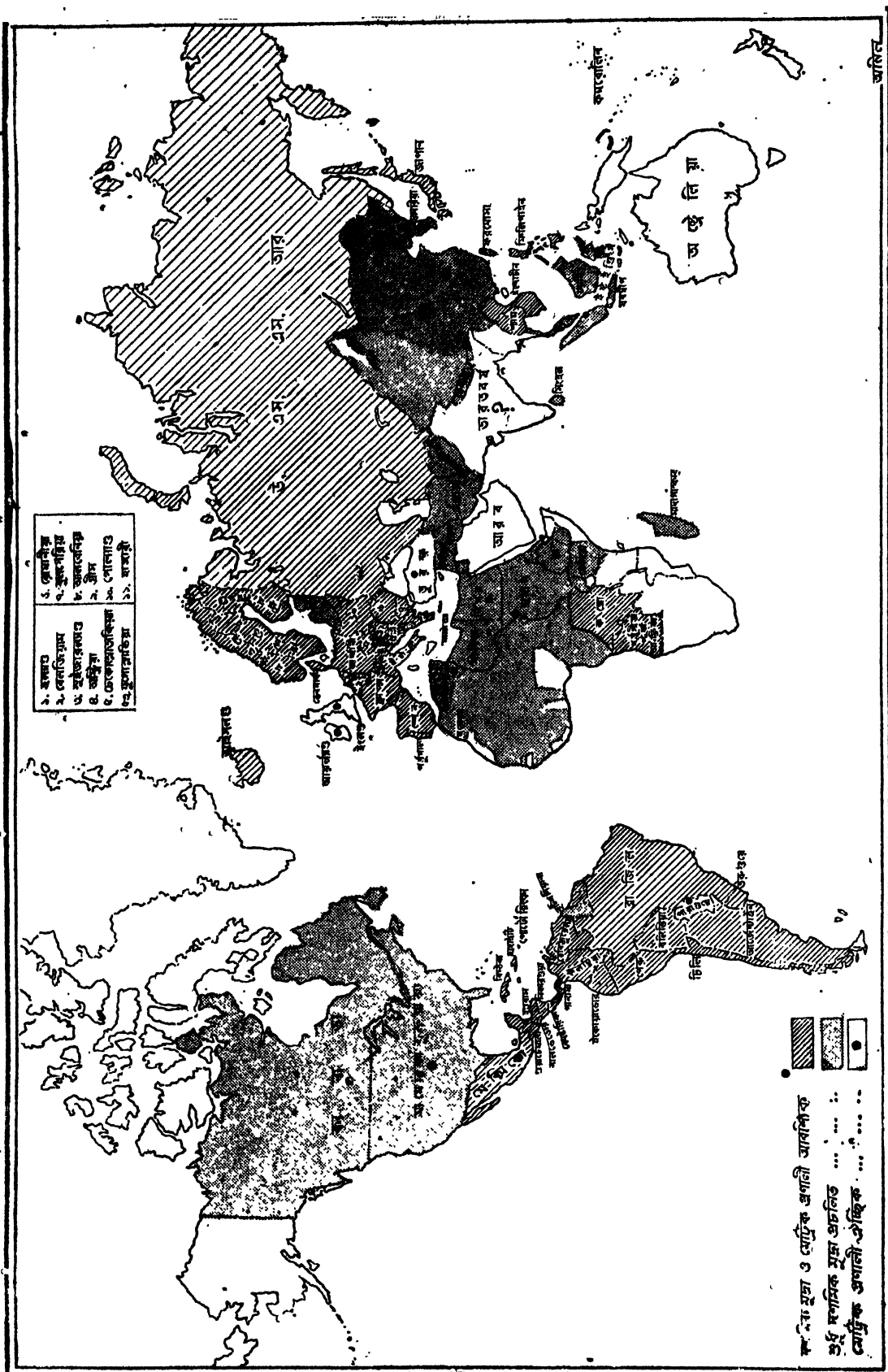
অপচয় বাঁচে। দেশ-বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে গেলে বর্তমান জগতে দশমিক পদ্ধতিতে কাজের ঢের সুবিধা। ইংরেজের দেশ ছাড়া পৃথিবীর বহু সভ্য দেশেই এই প্রথায় কাজ চলে। তাদের কথা বোঝবারও সুবিধা হয়। দেশ-বিদেশের নানা তথ্য দশমিক পদ্ধতিতে সংগ্রহ করে তার থেকে সংখ্যাতত্ত্বের তুলনাত্মক যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাতে যে কোন জাতি তার উন্নতির পথ বেছে নিতে পারে।

তারপর ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন জেলায় ভিন্ন রকমের ওজন ও মাপের প্রথা প্রচলিত আছে মূর্তিমান ভেদের রাজ্য। দশমিক পদ্ধতিতে এগুলি এক নিয়মে বেঁধে, সারা ভারতে সেই প্রথা আইনের বলে চালু করলে, ভারতের সাম্য, একত্ব ও জাতীয়তা বোধ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে, সেটা আজকালকার ভাসা-ভাসা উচ্ছ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

বিজ্ঞানের প্রথম ধাপে পা দিয়েই জানা যায় মেট্রিক-পদ্ধতির কথা। ফরাসী বিপ্লবের প্রচণ্ড বিপর্যয়ের মধ্যে এর জন্ম (১৭৮৩)—ফরাসীদের এক অদ্ভুত দান। মেট্রিক প্রথার মূল একক হচ্ছে 'মিটার'—প্রায় ১'১ গজ। বহু শ্রমে এই একক স্থির হয়েছিল। পৃথিবীর মেরুকেন্দ্র থেকে বিষুবরেখা পর্যন্ত দূরত্বের কোটিভাগের এক ভাগ এই মিটার। *

এই মিটার থেকেই ফরাসীরা ওজন ও অন্যান্য মাপ স্থির করেছে। অর্থাৎ মিটারের ১০ ভাগে ডেসিমিটার, তার ১০ ভাগে সেন্টিমিটার, তার দশ ভাগে মিলিমিটার; তেমনি মিটারের ১০ গুণে ডেকামিটার তার ১০গুণে হেক্টোমিটার তার ১০গুণে কিলোমিটার। আবার ১কিউব (ঘন) সেন্টিমিটার জলের (অবশ্য ৪ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে) ওজনের নাম 'গ্রাম'। তার ১০গুণের ধারায় ডেকাগ্রাম, হেক্টোগ্রাম, কিলোগ্রাম প্রভৃতি। তারপর ১০গ্রাম ওজনে আড়াই সেন্টিমিটার ব্যাসে যে মুদ্রা হয় তার নাম 'ফ্রাঙ্ক'। ফ্রাঙ্কের ১০ভাগের ১০ভাগকে বলা হয় 'সেণ্ট'। জমির মাপের বেলাতেও তাই। ১০ মিটার চওড়া ও ১০মিটার লম্বা জমির বর্গমাপ ১ 'আর'। এক কিলোগ্রাম জলের আয়তনকে নাম দিয়েছে ১'লিটার'। তার ১০এর গুণভাগে বড় ছোট এককগুলি রয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মেট্রিক প্রণালীতে ভিন্ন ভিন্ন মাপের পরিমাণের মধ্যে পরস্পরের এমন সম্বন্ধ আছে যা সহজেই বুঝে নিতে ও হিসাব করতে পারা যায়।

এই মেট্রিক প্রণালীর উপকারিতা বেশী দেখে ইয়োরোপের অনেক দেশ তাদের নিজস্ব প্রণালী ছেড়ে দিয়েছে। তবে পৃথিবীর বহু দেশে এর চলন হলেও ইংরেজ তা নেয়নি। তার কারণটা ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক। ফরাসী-বিপ্লবে উদ্ভূত কোন প্রথা মেনে নিলে ইংরেজকে ফরাসীদের কাছে মাথা নত করতে হয়। সেদিনের ইংরেজ তা পারেনি। দ্বিতীয় কারণ, মেট্রিক-প্রণালী মেনে নিলে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যে তাদের ব্যাবসার একাধিপত্য নষ্ট হোত। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের মাল চাইলে তারা মেট্রিক ওজনে দর দিত, ইংরেজ-অধিকৃত ভারত বা অন্য দেশ তা না জানাতে দরটা সুবিধার কি অসুবিধার বুঝে উঠত না। ফলে পরাধীনের হাটে ইংরেজেরই মাল বিকাতো বেশী। আর তৃতীয় কারণ ইংরেজজাতি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী রক্ষণশীল। তারা সহজে প্রাচীনত্ব ত্যাগ করতে চায় না। তাই মেট্রিক-প্রণালীর ওজন বা মাপকাঠি কারো কাছে থাকলে তাকে সাজা দেবার ব্যবস্থা আইনে ছিল (১৮৯৭ সালের আইনে ধারাটা বাতিল হয়েছে)। ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন তাঁর জাতিকে সুতীব্র ভাষায় কশাঘাত করেছেন এই বলে,—ইংলণ্ডের প্রণালী হচ্ছে 'অনুদার অসভ্য

* সাম্প্রতিক মাপে দেখা গেছে যে এই ভগ্নাংশ ঠিক এক মিটার নয়। তুলনার জন্য প্ল্যাটিনাম-ইরিডিয়ামে তৈরী এক দণ্ডে এই মূল মাপকাঠি চিহ্নিত করে প্যারিসে রক্ষিত আছে। মূল মাপকাঠি হারাতে পারে বা বদলাতে পারে—এই আশঙ্কায় জনকয়েক ফরাসী ও মার্কিন পদার্থবিদ্ বিশেষ কোন রঙের আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য দিয়ে এর মাপ নির্ণয় করেছেন। ফলে পৃথিবীতে দেশ-কাল-পাত্রের কোন পরিবর্তনে বা অন্য কোন বিপর্যয়ে এ মাপকাঠি হারাবার কোন ভয় নেই।

প্রণালী' ও 'মস্তিষ্কক্ষয়ী শৃঙ্খল'। তাঁর আজীবন চেষ্টায়ও পার্লামেন্ট মেট্রিক-প্রণালী গ্রহণ করেনি।

ফরাসী রাষ্ট্রনায়ক নেপোলিয়ন ভবিষ্যৎ বাণী করে গিয়েছিলেন, "একদিন সারা পৃথিবীতে সব কিছু মাপবার একটিমাত্র ভাষা হবে—সে ভাষার নাম মেট্রিক পদ্ধতি।" যুদ্ধের পর দেখা যাচ্ছে তাঁর সেই ভবিষ্যৎ বাণী সত্য হবে। লণ্ডনের 'ডেসিম্যাল এসোসিয়েশন'এর পরিচালনায় ইংলণ্ডে আবার নূতন করে দশমিক ও মেট্রিক-প্রণালী চালাবার আন্দোলন শুরু হয়েছে। ১৯৪৫ সালের অক্টোবরে শতাধিক বিশিষ্ট বণিক-সভার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ম্যাঞ্চেস্টারে এক বিরাট সভা হয়। ইংলণ্ডের মুদ্রা দশমিক প্রথায় চালু করার এবং ওজন ও মাপে মেট্রিক প্রণালী নেবার দাবী সরকারের কাছে তাঁরা করেছেন; নচেৎ ব্রিটিশের বাণিজ্য জগতে আর স্থান পাবে না। সম্প্রতি পার্লামেণ্টে এই নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডাও হয়ে গেছে। নিউ ইয়র্কের আন্তর্জাতিক বণিক-সভায় ৫২টি জাতির প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে প্রস্তাব করেছিলেন যে, মেট্রিক ছাড়া অন্য সব প্রণালী পৃথিবী থেকে তুলে দেওয়া হোক। আন্দোলন চালানোর জন্য শিকগো শহরে 'আমেরিকান মেট্রিক এসোসিয়েশন' নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। ভারতের আন্দোলনকে তারা সকলেই সুদৃষ্টিতে দেখে এবং তাদের ধারণা ভারতের আন্দোলন সফল হলেই পৃথিবীর বাকী ক'জায়গায় এ চালু হবেই। *

কেউ কেউ আপত্তি করেন যে ভারত এখনও অশিক্ষিত, এখানকার অজ্ঞ নিরক্ষর লোকে দশমিক পদ্ধতি বুঝবে না। উত্তরে আমরা বলি, ভারত কি আফগানিস্থান, আবিসিনিয়া, শ্যাম, সিংহল ইত্যাদি দেশের চেয়ে পিছুতে পড়ে আছে? সে সব দেশে দশমিক-পদ্ধতিতে কাজ চল্‌ছে কি করে? আসল কথা হচ্ছে আমরা নূতন কিছু দেখলে আঁতকে উঠি, একটু তলিয়ে দেখি না—তাতে আমাদের ইষ্ট-অনিষ্ট কতখানি। আর দেশে নিরক্ষরতা চিরকাল এই রকমই থাকবে ভাবা শিক্ষাভিমানীর কলঙ্ক। দেশের নিরক্ষরতা শীঘ্র দূর হবে বলেই দশমিক প্রথা আমরা চাই। কংগ্রেস ও তার মত গণ-প্রতিষ্ঠানগুলিকেও এই সংস্কারের প্রচারে আত্মনিয়োগ করতে হবে। কাজটা তাদেরই।

এখন দশমীকরণের ফলে মুদ্রা কি দাঁড়াবে দেখা যাক্। এই নিয়মে ১ টাকায় ১৬ আনা বা ৬৪ পয়সা বা ১৯২ পাই আর থাকবে না; ১ টাকাকে ১০০ ভাগ করে প্রতি অংশকে ১ 'শস্ত' নাম দেওয়া হবে। 'শস্ত' বা ইংরেজী Cent সংস্কৃতমূলক শব্দ, এর অর্থ শতং বা শতাংশ। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অনুরূপ শব্দ চলিত আছে। টাকা ও শস্তের মাঝামাঝি কয়েক রকমের মুদ্রা থাকবে যথা, ৫০, ২৫, ১০, ৫, ২ শস্ত। ১ পয়সা প্রায় দেড় শস্তের সমান। ঠিক হিসাব ধরলে ১৬ পয়সায় ২৫ শস্ত। দশ শস্তে একটি মাধ্যমিক একক—নাম দশ। দশ দশে ১ টাকা। ১ টাকার ওজন হবে ১০ গ্রাম। সুতরাং ১০০ টাকায় ১ কিলোগ্রাম। ১ কিলোগ্রাম তখন ১ সেরের স্থান নেবে। বর্তমান সের ৯৩৩ গ্রামে, ভবিষ্যতে সংস্কৃত 'সের' চালু হবে ১০০০ গ্রামের ওজনে। এই কিলোগ্রামের দশগুণ বা দশভাগে অন্যান্য একক হবে, তাদের নাম নিয়ে আলোচনা চল্‌ছে। নামকরণের মধ্যেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা চাই।

১ মিটারকে দৈর্ঘ্যের একক ধরে তার ১০ গুণ বা ১০ ভাগে হবে অন্যান্য এককগুলি। ১ মিটার প্রায় ৩৯ ইঞ্চি। তাকে ভারতে গজ বলা যেতে পারে। ১০০০ গজে ১ কিলোমিটার। মেট্রিক পদ্ধতির সকল মাপগুলিই গ্রহণ করে ভারতীয় ভাষায় নাম দেওয়া হবে।

দশমিকে লেখবার সময় বিন্দুর বামে পূর্ণ সংখ্যা ও ডাইনে ভগ্নাংশ থাকবে, কিছু না থাকলে শূন্য

* ভারতীয় দশমিক সমিতি—২৯।১এ বলদেও পাড়া রোড, কলিকাতা ৬; প্রবন্ধের লেখক সমিতির সম্পাদক।

দিয়ে খালি স্থান পূর্ণ করতে হবে। আর বিন্দুর নীচে বিন্দু রাখতে হবে। যথা :—

৪ টাকা	৬ দশ	৪ শস্ত	= টাঃ	৪·৬৪
১৩ "	৬ "	—	= টাঃ	১৩·৬০
—	৭ "	৬ "	= টাঃ	০·৭৬
৭৪ "	—	—	= টাঃ	৭৪·০০

সরলভাবে যোগফল টাঃ ৯৩·০০

সরল যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের মতই এবং যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের নিয়ম, কেবল বিন্দুটা যথাস্থানে বসাতে হবে। যে কোন পাটীগণিতের বইয়ে এ সব নিয়মের আলোচনা ও উদাহরণ পাওয়া যাবে। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল :—

(১) ৪ টনো, ৭ কুন্তল, ৩ কিলোগ্রাম, ৮ ডেকা ও ২ গ্রাম টনোয় হবে ৪·৭০৩০৮২ ট.না এবং গ্রামে হবে ৪৭০৩০৮২ গ্রাম। শুধু বিন্দু সরানোর হেরফের।

(২) ১ কুন্তল (অর্থাৎ ১০০ কিলোগ্রাম) ডালের দাম ৩৮·২৪ টাকা হলে, ১ কিলোগ্রামের দাম হবে ৩৮ শস্ত (প্রায়), শস্ত ক্ষুদ্রতম মুদ্রা বলে তার ভগ্নাংশ বলা নিষ্প্রয়োজন।

(৩) ৫০ পাউণ্ড চায়ের দাম ৬২·৩৭ টাকা; পাউণ্ড প্রতি ৩৬ শস্ত লাভ রেখে বেচলে লাভে-আসলে পাওয়া যাবে :—

৫পাঃএ লাভ (·৩৬ × ৫) =	১·৮০	টাকা
৫০ পাঃএ (দশগুণ) =	১৮·০০	টাকা
আসল খরচ =	৬২·৩৭	টাকা
মোট পাওয়া যাবে =	৮০·৩৭	টাকা

এই প্রথায় হিসাবের এত সুবিধা। এ ছাড়া, লগারিথ্‌মের ছকগুলি, বিভিন্ন স্লাইড-রুল ও আঁক-কষা যন্ত্র—এদের সহজেই ব্যবহার করা যাবে। এই প্রথায় কাজ করার পর কোন দেশেই পুরানো প্রথায় ফিরতে চাইবে না। বরং ইতিহাসে নজির আছে যে, কোন দেশে দশমীকরণ প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে শিক্ষার অতি দ্রুত প্রসার হয়েছে।

দশমিকে একটা পরিমাণের পূর্ণ সংখ্যা থেকে তার ভগ্নাংশকে পৃথক করার জন্য দু'য়ের মধ্যে বিন্দুটা একটা চিহ্ন মাত্র। ওর দরকার ঐটুকু। অনেক সময়ে বিন্দুটা অস্পষ্ট বা অন্য কোথাও একটা ফোঁটা বা দাগ থাকলে বিষম গণ্ডগোল হতে পারে, অনেক টাকারও গোলমাল হতে পারে। সুতরাং বিন্দুটা খুব স্পষ্ট থাকা চাই। বিন্দুর বদলে উর্ধ্ব কমা (') বা হাইফেন (-) দেওয়া চলতে পারে যথা :— ১০৬'২৮ বা ৯২-০৮।

আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি এই সামান্য পরিবর্তনের ঢেউ লেগে দেশে শিক্ষা ও অভ্যাসের দিক দিয়ে অনেক কিছু সংস্কার সাধিত হবে। তখন সোনার ওজন ভরিতে চলবে না, দূরত্বের মাপ মাইলে চলবে না। ইঞ্চি-গজ, সের-ছটাক, পাউণ্ড-আউন্স, বিঘা-কাঠা—সবই উল্টে-পাল্টে যাবে। ভাবী কল্যাণের কথা মেনে নিয়ে সেই বৈপ্লবিক পরিস্থিতিকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো চাই। কারণ পরিবর্তনের মনোবৃত্তি সহজ হলেই মানুষ পুরাতনকে মোহের বশে আঁকড়ে ধরতে আর চাইবে না। তার মধ্য দিয়ে যুগ-বিপর্যয় ঘটে যাবে। সুতরাং দশমীকরণের আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠুক।

পদার্থের গঠন-রহস্য

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়

এই অনন্ত বিশ্বে পদার্থ আকারে এবং অবস্থায় অগণিত। এরা একেবারেই ভিন্ন কিনা, এদের মধ্যে কোন যোগ-সূত্র আছে কিনা, এদের গঠনই বা কি রকম,—এই সব প্রশ্ন পৃথিবীর চিন্তাশীল পণ্ডিতদের মন অতি প্রাচীনকাল থেকেই আলোড়ন করে আসছে।

প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকেরা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চভূতের কথা বলতেন। ভূত কথাটার অর্থ উপাদান ধরলে জগতের যাবতীয় পদার্থ (বাস্তব ও শক্তি) এই পাঁচ ভূতে গড়া এবং পরিণামে এতেই লীন হবার কথা। পঞ্চভূতের এই ভাষ্য হয়ত ভাল লাগবে,—ক্ষিতি, অপ্ ও মরুৎ যথাক্রমে কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের প্রতিনিধি; তেজ হ'ল শক্তি এবং ব্যোম* সর্বব্যাপী আকাশ। জগতের সব বস্তু ও শক্তি এদের অন্তর্গত।

গৌতমের মতে দ্রব্য নয় প্রকার,—'ক্ষিত্যপ্তেজো মরুদ্ব্যোম কালা দিগ্দেহি নৌ মনঃ। দ্রব্যান্যথ গুণারূপং রসো গন্ধস্ততঃ পরম্॥ উলুক মুনি বা কণাদ মুনিও বৈশেষিক দর্শনে নয় প্রকার দ্রব্যের কথা লিখেছেন,—'পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যানি।' (১।১।৫)। দ্রব্য বলতে ওঁরা বোঝেন যা গুণের আধার বা আশ্রয় এবং দ্রব্যই অন্যান্য পদার্থের আশ্রয়। কণাদ মুনিই প্রথম বলেন যে, দ্রব্যের কারণ খুঁজতে খুঁজতে এক নিত্য, সৎ, অকারণবৎ পদার্থ মিলবে, তা অন্ত্য পদার্থ। এর নাম অণু বা পরমাণু, এ আর বিভক্ত হয় না, নষ্টও হয় না। মতটা ৪।৫ হাজার বছর আগের। গৌতমও পরমাণুর যে ধারণা গড়েছিলেন, তাতে পরমাণু হচ্ছে 'নিত্য,' 'অতীন্দ্রিয়' অতএব 'নিরাবয়ব' (ন্যায়দর্শন, ২৪)।

গ্রীক দার্শনিক ডিমোক্রিটাস প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে এই পরমাণুতত্ত্বের কথা পাশ্চাত্য জগতকে শোনান,—পদার্থ দৃষ্টি-বহির্ভূত পরমাণুতে গঠিত এবং প্রত্যেক পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন। তাঁরই প্রায় সমসাময়িক দার্শনিক এরিস্টটল সিদ্ধান্ত করেন যে, অগ্নি, বায়ু, জল ও মাটী—এই ৪টি মূল পদার্থ হতে জাগতিক সব-কিছুর গঠন, তাদেরই আকর্ষণ-বিকর্ষণে বিভিন্ন পদার্থের উৎপত্তি। এর বহু পরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা কণাদ-সিদ্ধান্তের অনুরূপ সিদ্ধান্ত গড়েন,—জড়-পদার্থকে ক্রমান্বয়ে ভাগ করলে পরিণামে দৃষ্টি-বহির্ভূত পরমাণু এসে হাজির হবে। সিদ্ধান্তটা অনিশ্চিত ও অস্পষ্ট অবস্থায় বহুকাল ছিল। তারপর ১৪০ বছর আগে ইংরাজ পণ্ডিত ড্যালটন একে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। আভোগাড্রো সে মতটি সংশোধন করার পর তা দাঁড়ায় এই—

গুণ বা আচরণ অপরিবর্তিত রেখে প্রত্যেক পদার্থকে ক্রমাগত ভাগ করে চললে পরিণামে মিলবে অণু, যাদের প্রত্যেকের গুণ, ওজন ও আচরণ এক রকমের—ঠিক পদার্থটিরই মত। অণুকে ভাগ করলে

---

* এই ব্যোমের নানা নাম,—আকাশ, খ, শূন্য ইত্যাদি। একে ব্রহ্মও বলা হয়েছে,—'ওঁ খং ব্রহ্মং খং পুরাণং বায়ুরং খমিতি।'—(বৃহদারণ্যক)। এ জগতের গতিই এই, জাগতিক সব ব্যাপার এই ব্যোম থেকে উৎপন্ন ও এতেই সকলের প্রলয়,—'অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ'—(ছান্দোগ্যোপনিষৎ); 'সর্বভূতোৎপাদকত্বম তস্মিন্নেব হি ভূত প্রলয়ঃ'—(শঙ্কর)। ইত্যাদি' উলুক একে আদিভূত বলেছেন।

একাধিক পরমাণু * পাওয়া যাবে। পরমাণুগুলির সবাই এক রকমের হলে পদার্থটি হবে মৌলিক, অন্যথায় হবে যৌগিক। পৃথক পৃথক পরমাণু রাসায়নিক সংযোগে যৌগিক পদার্থের অণু গড়ে এবং সে অণুর গুণ বা আচরণ যে পরমাণুগুলির সমবায়ে অণুটি গড়ে উঠেছে, তাদের গুণ বা আচরণের মত নয়। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন যে পদার্থ মাত্র ৯২টি † এবং এদের একাধিকের সংযোগে উৎপন্ন অসংখ্য যৌগিক পদার্থ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। একাধিক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর সংযোগে তৈরী হয় যৌগিক পদার্থের অণু, আর এ সংযোগ ঘটে নির্দিষ্ট হারে। কোন মৌলিক পদার্থের একটি পরমাণু যে কয়টি হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয় (বা সরিয়ে স্থান নেয়), সেই সংখ্যাটিকে বলা হয় সেই মৌলিক পদার্থের যোজ্যতা (Valency)।

ড্যালটন-বাদ প্রতিষ্ঠিত হতেই শুরু হল পরমাণুর ওজন ও গুণের সম্পর্ক নির্ণয়ের পালা। জার্মানীর ডবেরাইনার (Dobereiner) ও মায়ার (Meyer), ইংলণ্ডের নিউল্যাণ্ডস্ (Newlands), প্রভৃতি পণ্ডিতেরা এই সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে নিউল্যাণ্ডস্ বল্লেন যে, পরমাণু-ভারের বৃদ্ধির ক্রম ধরে মৌলিক পদার্থগুলিকে সাজালে প্রত্যেক অষ্টমটির রাসায়নিক গুণ এক ধরণের হবে। তখন যতগুলি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছিল, তাদের ঐ ভাবে সাজিয়ে উক্ত গুণের মিল সর্বত্র হয় নি। পাঁচ বছর পরে মেণ্ডেলেফ্ (Mendeleeff) স্বতন্ত্রভাবে পর্যাবৃত্ত-ছক (বা পর্যায় সারণী) নতুন করে গড়েন এবং তাতে ১৮টি মৌলিক পদার্থ সমন্বিত ৩টি দীর্ঘ সারি (পর্যায়) ও ৩টি অষ্টকের ছোট সারি রাখেন।

ছকে মৌলিক পদার্থগুলিকে এমনভাবে সাজান হয়েছে যে, খাড়া থাকের মৌলিক পদার্থগুলির গুণ এক ধরনের। ফলে কয়েক স্থান ফাঁকা থেকে গেছে। তাঁর মতে গুণ হিসাবে ফাঁকা স্থানের উপযুক্ত মৌলিক পদার্থ ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হয়ে স্থানগুলি পূর্ণ করবে। যথার্থই পরে কয়েকটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হবে ফাঁকা স্থান দখল করে। এখনও ১২টি দুর্লভ মৌলিক পদার্থের স্থান নির্দেশ সম্ভব হয় নি আর হাইড্রোজেনের স্থান ঠিক মত বোঝা যাচ্ছে না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পর-পর পদার্থগুলির স্থান গুণলে প্রত্যেক পদার্থের স্থানের একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা হয়। এই সংখ্যাকে পরমাণু-অঙ্ক বলব। ছকে দেখা যায় যে পরমাণুভার এই সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে, তবে আর্গন, টেলুরিয়ম ও কোবাল্ট এর ব্যতিক্রম। অতএব মৌলিক পদার্থের গুণাবলীর নির্দেশক পরমাণু-অঙ্ক, পরমাণু-ভার নয়। প্রত্যেক খাড়া থাকের মৌলিক পদার্থের যোজ্যতা এক রকমের; প্রথম থাকের যোজ্যতা শূন্য অর্থাৎ সেগুলি অপর কোন মৌলিক পদার্থের সঙ্গে যুক্ত হয় না।

এককালে পরমাণুকে অবিভাজ্য তথা পদার্থের চরম অংশ ধরা হয়েছিল। তারপর কেউ কেউ ভাবলেন যে বিভিন্ন পরমাণুগুলি সম্ভবত একটি মাত্র চরম পদার্থে গঠিত। শতাধিক বর্ষ পূর্বে প্রাউট হাইড্রোজেন পরমাণুকে চরম পদার্থ মনে করে অন্যান্য পরমাণুভার হাইড্রোজেনের পরমাণুভার দিয়ে ভাগ করার বৃথা চেষ্টা করেছিলেন।

বৈজ্ঞানিকেরা বছর পঞ্চাশেক পূর্বে লক্ষ্য করেন যে, অম্ল, ক্ষারক বা লবণের দ্রব তড়িৎ-প্রবাহ পরিবহন করে এবং সেই সঙ্গেই দ্বিখণ্ডিত হয়ে পাত্রের উভয় প্রান্তস্থিত তড়িৎদ্বারে জমা হয়। এ রকম বিশ্লেষণকে তড়িৎ-বিশ্লেষণ বলে। রাসায়নিক আরহেনিউস্ এর ব্যাখ্যাকল্পে ৬০ বছর

---

* পরমাণুগুলির গুণ বা আচরণ এক হলেও তাদের পরমাণুভার পৃথক হতে পারে। সেগুলিকে আইসোটোপ বলা হয়।

† এ ছাড়া, আরও কয়েকটি মৌলিক পদার্থ মানুষ অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা সৃষ্টি করেছেন। সেগুলি স্বতঃই তেজস্ক্রিয় এবং কিছুকালের মধ্যে স্থায়ী মৌলিক পদার্থে পরিণত হয়।

পর্যাবৃত্ত ছক

[হাইড্রোজেনকে বাদ রেখে মৌলিক পদার্থের সঙ্কেত ইংরেজি অক্ষরে ও পরমাণুভার বাংলায় দেওয়া হয়েছে।]

যোজ্যতা	0	১	২	৩	৪	৩	২	১	
১ম ছোট সারি (অষ্টক)	He ৪	Li ৭	Gl ৯	B ১১	C ১২	N ৪	O ১৬	F ১৯	
২য় ছোট সারি (অষ্টক)	Ne ২০	Na ২৩	Mg ২৪˙৩	Al ২৭	Si ২৮	P ৩১	S ৩২	Cl ৩৫˙৫	
৩য় দীর্ঘ সারি	A ৩৯˙৯	K ৩৯˙১ Cu ৬৩˙৬	Ca ৪০ Zn ৬৫˙৪	Se ৪৫ Ga ৭০	Ti ৪৮ Ge ৭২˙৬	V ৫১ As ৭৫	Cr ৫২ Se ৭৯	Mn ৫৫ Br ৮০	Fe ৫৬ ; Co ৫৯ ; Ni ৫৮˙৭
৪র্থ দীর্ঘ সারি	Kr ৮৩˙৭	Rb ৮৫˙৫ Ag ১০৮	Sr ৮৭˙৬ Cd ১১২˙৪	Y ৮৯ In ১১৫	Zr ৯১˙২ Sn ১১৯	Nb ৯৩ Sb ১২১˙৭	Mo ৯৬ Te ১২৭˙৫	—— I ১২৬˙৯	Rn ১০২ ; Rh ১০৩ ; Pd ১০৭
৫ম দীর্ঘ সারি	Xe ১৩১˙৩	Cs ১৩৩ Au ১৯৭	Ba ১৩৭˙৪ Hg ২০০˙৬	La ১৩৯ Tl ২০৪	Ce ১৪০ Pb ২০৭	Ta ১৮১˙৪ Bi ২০৯	W ১৮৪ ——	—— ——	Os ১৯৩ ; Ir ১৯৩ ; Pt ১৯৫
৬ষ্ঠ সারি (অসম্পূর্ণ)	Nt ২২২	——	Ra ২২৬	——	Th ২৩২	——	U ২৩৮	——	

আগে তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। অম্ল বা লবণ (বা ক্ষারক) জলে গলালে তার যে কোন অণু দ্বিখণ্ডিত হয় দুই প্রকারের দুই বা ততোধিক আয়নে (ion); তবে দ্রব্যটির সব অণু এভাবে বিভক্ত না হতেও পারে। পদার্থটির ধাতব অংশ নিয়ে যে আয়ন তা পরা (পজিটিভ) তড়িতে আহিত (charged), তেমনি অধাতব অংশ নিয়ে যে আয়ন তা অপরা (নেগেটিভ) তড়িতে আহিত। দ্রবের মধ্যে দুই প্রান্তে নিমজ্জিত দুটি ধাতব তড়িৎ-দ্বারের একটিতে তড়িৎপ্রবাহ প্রবেশ করিয়ে অপরটি থেকে নির্গত করালে পরা আয়নগুলি তড়িৎপ্রবাহের সঙ্গে চালিত হয়ে নির্গমন-তড়িৎ-দ্বারে পৌঁছায় এবং সেই সঙ্গেই অপরা আয়নগুলি প্রবেশ-তড়িৎ-দ্বারে গিয়ে জোটে। পরা ও অপরা আয়নগুলির এই বিপরীত দিকে ছোটা যুগপৎ এবং তারা তড়িৎ-দ্বারে পৌঁছেই প্রশমিত (uncharged) হয়। তড়িৎ প্রবাহের ফলে তড়িৎ-দ্বারে সঞ্চিত মুক্ত আয়ন, তড়িৎ ও রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক (chemical equivalent),—এদের পরিমাণগত সম্বন্ধ পরীক্ষার দ্বারা নির্ণীত হয়েছে। তারপর দেখা গেছে, একযোজী (monovalent) পদার্থের এক গ্রাম পরমাণুকে তড়িৎ-বিশ্লিষ্ট করতে নির্দিষ্ট পরিমাণের আধান (charge) প্রয়োজন। যে কোন একযোজী আয়নের আধান নির্দিষ্ট। তাই বৈজ্ঞানিকেরা মনে করলেন হয়ত তড়িতেরও পরমাণু আছে।

বায়বীয় পদার্থের ভিতর দ্রব পদার্থের তড়িৎ-বিশ্লেষণের অনুরূপ পরীক্ষা আরম্ভ করলেন প্লুকার, হিটর্ফ ও টমসন। একটি বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রযুক্ত নলের দুদিকে দুটি তড়িৎ-দ্বার জুড়ে দিয়ে ক্রমে ক্রমে বায়ু নিষ্কাশন করা হয় ও তড়িৎ চালাবার চেষ্টা করা হয়। দেখা গেল যে, বায়ুর চাপ যতই কমতে থাকে, ততই তার তড়িৎ পরিবহনের ক্ষমতা বেড়ে যায়। অবশেষে স্যর উইলিয়ম্ ক্রুক্স্ দেখান যে, সাধারণ বায়ুচাপের দশলক্ষ ভাগের এক ভাগ চাপ হলে ওই বায়ুর ভিতর দিয়ে অপরা তড়িৎ-দ্বার হতে পরা তড়িৎ-দ্বারের দিকে এক রকম অদৃশ্য প্রবাহের সৃষ্টি হয়। একে আমরা বলব অপরা প্রবাহ (cathode rays)। এর গতি সরল, তবে চুম্বকের সাহায্যে বাঁকান যায়। অন্যান্য পরীক্ষায় প্রমাণিত হয় যে, এ প্রবাহ আলোক তরঙ্গের মত নয়, এ হচ্ছে অপরা তড়িৎ আহিত পদার্থ-কণার প্রবাহ। এ কণাকে বলা হ'ল ইলেকট্রন। এর আধান আছে, ওজন আছে। আয়ন ও ইলেকট্রনের আধান এক ধরা যায় (এ ধরবার কারণও আছে)। ইলেকট্রনের ওজন হাইড্রোজেন আয়নের ওজনের প্রায় ১৮৪০ ভাগের এক ভাগ। ইলেকট্রন তো তাহলে অদ্ভুত রকম হালকা। এই কি তবে পদার্থের চরম কণা? এই কি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন পরমাণুর সৃষ্টি করে? ১৮৩৫টি ইলেকট্রন একত্রে জুটে কি হাইড্রোজেনের পরমাণু তৈরী করে? তা তো হতে পারে না, কেন না, সব ইলেকট্রন অপরাতড়িৎ আহিত অথচ কোন পদার্থের অণু সাধারণত তড়িৎ আধানের পরিচয় দেয় না। যদি প্রত্যেক পরমাণুতে শুধু ইলেকট্রনই থাকে, তাহলে তার অপরা-তড়িৎ আধানের প্রভাব প্রশমিত করার জন্য সমপরিমাণ পরাতড়িৎ আধান প্রয়োজন। তা আসবে কোথা হতে?

ক্রুক্স্-এর হাইড্রোজেনপূর্ণ গ্যাস নল তন্নুক্ত করলে এবং অপরাতড়িৎ-দ্বারে ছিদ্র করলে পিছনে অপরাপ্রবাহের বিপরীত দিকে আর একটি প্রবাহ লক্ষিত হয়। পরীক্ষায় দেখা গেল যে এ হচ্ছে পরাতড়িৎ আহিত কণার প্রবাহ। এ কণা হাইড্রোজেনের তড়িৎ বিশ্লিষ্ট আয়নের সমতুল্য এবং পরস্পরের আধানও সমান। অতএব এ কণার ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের সমান। তড়িৎ-প্রবাহ উক্ত নলের অভ্যন্তরে অণুগুলিকে বিভক্ত করে দুই রকমের অথচ সমমান বিপরীত তড়িৎ আহিত

কণা উৎপাদন করেছে। পরা কণারও হাইড্রোজেন পরমাণুর সমান ওজন এবং অপরা কণা তা'র ১৮৩৫ ভাগের এক ভাগ।

উনবিংশ শতকের শেষাশেষি এ সব পরীক্ষা চলছিল। সেই সময়েই আঁরী বেকরেল ও স্বনামধন্যা শ্রীমতী ক্যুরি কয়েকটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার করেন, যথা,—ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম ও রেডিয়াম। এগুলি হতে তিন রকম রশ্মি স্বতঃ নির্গত হয়। এই পদার্থগুলি যৌগিক বা মৌলিক যে অবস্থায় থাকুক না কেন,—এই রশ্মি নির্গমন একই ভাবে চলতে থাকে। অর্থাৎ এ ব্যাপার পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়াসম্ভূত নয়, পরমাণু-উদ্ভূত। কণার রশ্মি দুটি α (আলফা) ও β (বিটা) নামে এবং আলোক তরঙ্গ পর্দার্থজাতীয় তৃতীয় রশ্মিটি γ (গামা) নামে পরিচিত। ঐ পদার্থগুলির পরমাণু থেকে এই তিনটি রশ্মি অনবরত ক্ষরিত হচ্ছে। ক্ষরণ সরল পথেই হয়, তবে পথে চুম্বক ধরলে α ও β রশ্মি পরস্পর বিপরীত দিকে বেঁকে যায় এবং γ-রশ্মি সরল পথেই থাকে। জানা যায় যে, α-রশ্মি পরাতড়িৎ আহিত, ও β রশ্মি অপরাতড়িৎ আহিত কণার প্রবাহ এবং γ রশ্মি আলোক রশ্মির মত তরঙ্গ। α ও β কণার আধান ওজনাদি নিরূপিত হয়েছে। α-কণার আধান ইলেকট্রন আধানের দ্বিগুণ এবং ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ৪ গুণ; β-কণার আধান এবং ওজন ঠিক ইলেকট্রনের মত, কেবল গতিবেগ কিছু বেশী। তিনটিই বহু পদার্থের প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন করে। পদার্থের মধ্য ভেদ করে যাবার ক্ষমতা তিনটিরই প্রচুর, তবে α-কণার চেয়ে β-কণার এবং β-কণার চেয়ে γ-রশ্মির বেশী।

এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে পরমাণু পদার্থের চরম অংশ নয়, একাধিক অংশের সমবায়। পদার্থের চরম অংশগুলি নিরূপণ করতে হলে পরমাণুর অন্তর খুঁজতে হবে। এজন্য প্রয়োজন পরমাণু ভেদ করবার শক্তি আছে এমন কোন বস্তু। অপরাপ্রবাহ, α, β ও γ রশ্মিকে কাজে লাগিয়েছেন বড় বড় মনীষীবৃন্দ। এ কাজে তাঁদের আর একটি বিশেষ সহায় রঞ্জন রশ্মি (X'ray), যা γ-রশ্মিরই মত, কেবল তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য কিছু বেশী। অতিবেগনি রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য রঞ্জন রশ্মির চেয়ে বড় ও আলোক রশ্মির চেয়ে ছোট; তাকেও কাজে লাগানো হয়েছে। এদের দিয়ে পরমাণুকে বিভক্ত করে পরা ও অপরা আহিত কণা উৎপাদিত করা হয়।

পণ্ডিতবর লেনার্ড অতিক্রুত অপরাপ্রবাহের সাহায্যে পরমাণুর অন্তরের অবস্থা প্রথম অনুসন্ধান করেন। কঠিন পদার্থের অংশগুলি খুব ঘেঁষা-ঘেঁষি,—অণু-পরমাণুদের মাঝে ফাঁক নেই বললেই চলে। এর ভিতরে একটি ইলেকট্রন চালালে তা পরমাণুর ভিতরে প্রবেশ করতে বাধ্য হবে; সোজাসুজি ঢুকলে বা বাহির হলে পরমাণুর মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থাকা সম্ভব, আর বেঁকে গেলে নিশ্চয় কোন বাধা পেয়েছে। লেনার্ড বহু পরীক্ষা করে প্রমাণ করেন যে, পরমাণুর অভ্যন্তরে ইলেকট্রনের চেয়ে ঢের ভারী পরা-আধানযুক্ত কণা বর্তমান, তার নাম তিনি দিয়েছিলেন "dynamids"। এই সময় স্বনামধন্য আর্নেস্ট রদারফোর্ড রেডিয়াম আদি পদার্থ উদ্ভূত α-কণার সাহায্যে এ বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। α কণা পরা আধান যুক্ত ও ইলেকট্রনের চেয়ে অনেক ভারী, হাল্কা ইলেকট্রনের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হবে না সুতরাং সংঘর্ষ সহজেই বোধগম্য হবে। একই তড়িতে আহিত দুটি পদার্থ পরস্পরের দ্বারা বিপ্রকর্ষিত হয়, তাই রদারফোর্ড দেখলেন যে α-কণা কোন পদার্থের ভিতর ঢুকিলে নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। পরীক্ষার ফলে তিনি প্রমাণ করলেন যে পরমাণুর অভ্যন্তরে পরাতড়িৎ আহিত ভারী কণা আছে; তার নাম তিনি দিলেন atomic nucleus, যাকে আমরা বলব পরমাণবিক কেন্দ্রক। তিনি আরও প্রমাণ করলেন যে, হিলিয়মের পরমাণবিক কেন্দ্রক ও α-কণা একই বস্তু। তাদের তড়িৎ আধান = ২ একক পরা

আধান, আর ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ৪ গুণ। এ হচ্ছে ৪০ বছর আগের কথা।

এসব দেখে কোপেনহাগেনের প্রকৃতিবিজ্ঞানের অধ্যাপক নীল্‌স্‌ বোর্‌ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মতবাদ প্রকাশ করেন। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রকের আধান এক এবং তার চারদিকে একটি মাত্র ইলেকট্রন ঘুরছে, তাই সে পরমাণু তড়িৎ আধানের কোন চিহ্ন প্রকাশ করে না। এই কেন্দ্রকের ওজন ইলেকট্রনের ওজনের ১৮:৫ গুণ, কার্যতঃ পরমাণুর ওজন এতেই। নাম হ'ল প্রোটন (গ্রীক ভাষায় এর অর্থ প্রথম)। হিলিয়াম কেন্দ্রকে আছে দুই পরাতড়িৎ আধান তবে ওজন ৪টি প্রোটনের সমান। অতএব এই ৪টি প্রোটনের সহিত দুইটি ইলেকট্রন বাঁধা থাকায় মিলিত আধান হচ্ছে দুই পরা আধান, তাই এই কেন্দ্রকের চারিদিকে ২টি ইলেকট্রন ঘূর্ণায়মান। এইভাবে তৃতীয় মৌলিক পদার্থ লিথিয়ামের পরমাণুর তড়িৎ আধান তিন ও ওজন ৭টি প্রোটনের সমান; অতএব তাতে ৭টি প্রোটন ও ৪টি ইলেকট্রন আছে. আর ৩টি ইলেকট্রন চারদিকে ঘুরছে। মৌলিক পদার্থের পরমাণুভার বা কেন্দ্রকের ওজন এবং তড়িৎ আধান নির্ণীত হওয়ায় এই তথ্য জানা গেল যে, পরমাণুর কেন্দ্রকের তড়িৎ আধানই মেণ্ডেলেফের তালিকায় মৌলিক পদার্থের স্থান নির্দেশ করে ও তারই উপরে তার রাসায়নিক গুণাবলী নির্ভর করে; এইটি আধুনিক বিজ্ঞান জগতের একটা মস্ত বড় আবিষ্কার।

এই তড়িৎ আধান ও পরমাণু-অঙ্ক একই। সর্বশেষ মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়ামের পরমাণু-অঙ্ক বা কেন্দ্রক আধান ৯২ ও ভার ২৩৮; এর চারদিকে ৯২টি ইলেকট্রন ঘুরছে। এমনি করে পরমাণুর তড়িৎ সাম্য রক্ষা হয়। কেন্দ্রাতীত ইলেকট্রনকে ঘূর্ণায়মান মনে করার কারণ এই যে, পরা আহিত কেন্দ্রক অপরা আহিত ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করবেই বলে তা স্বাধীন ভাবে থাকতে পারে না; তবে কেন্দ্রকের চারদিকে ঘুরলে ইলেকট্রনটি বহির্মুখী কেন্দ্রাপসারী বল অর্জন করবে এবং তা কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণী বলকে প্রতিরোধ করবে। ঠিক এই কারণেই চন্দ্রকে পৃথিবীর চারদিকে এবং পৃথিবীকে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে হয়।

বোর-এর মতবাদ অনেক সমস্যার সমাধান করেছে। গত ৩০ বছরে পরমাণুর আভ্যন্তরিক রহস্য অনেক কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সব আর এক প্রবন্ধে আলোচনা করব।

এ প্রবন্ধে আমি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত পরিভাষা ব্যবহার করেছি।

পদার্থ-বিদ্যা শিক্ষাদ্বারা যেমন বুদ্ধিবৃত্তি সমস্তের স্ফূর্তি হয়, তেমনি মনের ঔদার্য্যও জন্মে। যাহা এই বিদ্যার বিষয়ীভূত তাহা অতি বিস্তীর্ণ এবং প্রশস্ত। সেই সকলে অনুক্ষণ অনুধাবন দ্বারা মনুষ্যের মনও তাদৃশ প্রশস্ত হইবে, আশ্চয্য কি?

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

(প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ৬ষ্ঠ সং, ১৮৬৬ সাল)

দেশ বিজ্ঞান-বিমুখ কেন

শ্রীপরিমল গোস্বামী

আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি যে বিজ্ঞান শিক্ষার অনুকূল নয় সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। একটা কারণ, দেশ দরিদ্র। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থাভাবহেতু শিক্ষাবিভাগে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের যে অনিবার্য অসুবিধা আছে, সে কথা মেনে নিলেও সেটাই যে একমাত্র অসুবিধা সে কথা মানা যায় না। কারণ শিক্ষকেরা যদি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেন এবং সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় যদি পরীক্ষার্থীদের সাহিত্য বিষয়ে নিজস্ব ভাষায় মৌলিক রচনাকেই একমাত্র গ্রহণযোগ্য মনে করেন, এবং মুখস্থ বিদ্যাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন তা হলে অবিলম্বে শিক্ষার বর্তমান ক্ষতিকর পদ্ধতি বিনা আড়ম্বরে পরিবর্তিত এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারের অনুকূল অবস্থা হতে পারে।

সাহিত্য বিষয়ে এই ব্যবস্থা অবলম্বন বিজ্ঞান শিক্ষার অনুকূল বলছি তার কারণ আছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

আমাদের দেশে ছোট ছেলেরা অনেকে হাতে লেখা পত্রিকা বের করে। তাদের অনেক লেখা আমি পড়েছি। তারা নিজের চোখে দেখে কোনো ঘটনা বা স্থানের বর্ণনা অনেকেই লিখতে পারে না, অন্য বই থেকে তথ্য সংগ্রহ করে। যারা পল্লীবাসী তারাও তাদের পল্লী সম্পর্কে কিছু লিখতে সঙ্কুচিত হয়। অতি সাধারণ জিনিস, অতি সাধারণ ঘটনা, বা গাছপালা, পশুপাখী, ক্ষেতখামার, চাষবাস, কোনোটাতেই তারা লেখার বিষয় খুঁজে পায় না।

আমি অনেক পরীক্ষার খাতায় ছেলেদের রচনা দেখেছি। তারা সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও নিজের চোখে দেখা কোনো ঘটনা বা অভিজ্ঞতাপ্রসূত কোনো জিনিসের বর্ণনা লিখতে পারে না। একবার প্রশ্ন ছিল, "তোমার গ্রামের কোনো ঘটনা বর্ণনা কর।" শতকরা নিরানব্বুইজন পরীক্ষার্থী একই ঘটনা লিখল। আগুন লাগার ঘটনা। কোনো বই থেকে মুখস্থ করে থাকবে, কারণ পরীক্ষার্থী বিভিন্ন কেন্দ্রের হওয়া সত্ত্বেও রচনার ভাষা এবং বিষয়বস্তু এক। নিজের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা সম্পর্কে রচনা চাওয়া হয়েছিল। যারা মুখস্থ করে লিখেছিল তাদের সংখ্যাই বেশি। অল্প সংখ্যক পরীক্ষার্থী কল্পনা করে লিখেছিল। তাদের মধ্যে একজন দার্জিলিং থেকে নৌকোয় কলকাতা আসে, এবং একজন ঢাকা থেকে পায়ে হেঁটে কলকাতা আসে। এই রকম কাল্পনিক অসম্ভব ভ্রমণকথা অনেকেই লিখেছিল। কিন্তু তারা নিজেরা যদি দুচার মাইলও ভ্রমণ করে থাকে—এবং তা তারা অবশ্যই করেছে—তার মধ্যে তারা লেখার মতো কিছু খুঁজে পায় নি।

আমি দুটি দিকের দৃষ্টান্ত দিলাম। এক স্বাধীনভাবে হাতে লেখা পত্রিকার ক্ষেত্র, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ক্ষেত্র। দুদিকেই দেখা গেল দেখার চোখ তৈরি হয় নি, দ্রষ্টব্য দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, পারিপার্শ্বিক এদের চোখে অর্থহীন, তাই এদের মনেও তা কোনো ছবি জাগায় না। এর কারণ হচ্ছে যেখানে তারা শিক্ষালাভ করে সেখানে তাদের দেখতে শেখানো হয় না। তারও কারণ হচ্ছে, দেখতে শেখানোর দরকারই হয় না। উদ্দেশ্য পরীক্ষা পাস করা, তা তারা মুখস্থ ক'রে, পরের দেখা নিজের দেখা, এবং পরের অভিজ্ঞতা নিজের অভিজ্ঞতা

ব'লে চালিয়েই করতে পারে। বরঞ্চ এতে আরও বেশি মার্ক পায়।

আমাদের দেশের ছেলেদের বিজ্ঞান বিমুখতার সূত্রপাত এইখান থেকেই। তারা পরের চোখে দেখাকে অপরাধ বলে বুঝতে শিখল না, উপরন্তু পুরস্কৃত হল, শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রথা অবিলম্বে অচল হওয়া উচিত।

এ প্রথার আরও গোড়ার দিকে, একেবারে বাল্য শিক্ষার কোঠায় গেলে দেখা যায় ছোট ছোট ছেলেরা বস্তুর সঙ্গে পরিচিত না হয়ে শুধু বস্তুবোধক শব্দ মুখস্থ করে যাচ্ছে। যদি সে বস্তু কি জানতে চাও, তা হলে সেই বস্তুবোধক একটি শব্দের আর একটি প্রতিশব্দ শিখলেই যথেষ্ট। যেমন, অরণ্য মানে বন, পশুরাজ মানে সিংহ, সলিল মানে জল। বস্তু বা বস্তুগুণ নিরপেক্ষ ভাবে এক প্রস্থ শব্দের আর এক প্রস্থ প্রতিশব্দ মুখস্থ করা থেকেই বাস্তব বিমুখতার সূত্রপাত, আর বাস্তব বিমুখতাই হচ্ছে বিজ্ঞান বিমুখতা। এই জাতীয় শিক্ষার ফলেই অধিকাংশ ছেলে নিজের পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে গোড়া থেকেই উদাসীন হয়ে পড়ে, এবং শেষ পর্যন্ত নিজের চোখে দেখা বা সেই দেখা থেকে কোনো বিষয়ের বিচার করার ক্ষমতা আর তার থাকে না। নিজের পারিপার্শ্বিকের পরিচয় সংগ্রহ করার প্রবৃত্তিকে শিশুকাল থেকে জাগিয়ে দিতে পারলে শুধু বিজ্ঞান শিক্ষা নয়, সকল শিক্ষার গোড়াপত্তন হওয়ার সম্ভাবনা। কারণ 'বিজ্ঞান শিক্ষা' এই কথাটিতে পদার্থ বিশ্লেষণ বা বস্তুপরীক্ষা বোঝালেও মূলত সকল শিক্ষাতেই অল্পবিস্তর বিশ্লেষণ এবং সত্যাসত্য যাচাই করার প্রশ্ন ওঠে। অর্থাৎ নিজের বোধ ও বিচারশক্তির সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। সুতরাং বিজ্ঞানশিক্ষার অনুকূল আবহাওয়াই সকল বিষয়ের শিক্ষাকে সার্থক করতে পারে। মনকে জাগিয়ে দেওয়াই হচ্ছে শিক্ষার মূল শর্ত। এই শর্ত গোড়া থেকে পালিত হলে পরিণত বয়সেও মন সক্রিয় এবং সজাগ থাকবে, জড়ত্ব প্রাপ্ত হবে না।

প্রথম শিক্ষা কি ভাবে শুরু হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞের এই মতটি আমার খুব ভাল লেগেছে। প্রথম শিক্ষায় এই পদ্ধতিটি সর্বত্র চালু হওয়া প্রয়োজন :

"In dealing with children, the main essential is not to tell them things, but to encourage them to find out things for themselves. Ask them questions but leave them to find out the answer. If they arrive at the wrong answer, do not tell them they are mistaken and do not tell them the right answer. Ask them other questions, which will show them their mistake and so push their inquiry further.'

শিশুশিক্ষার এটাই একমাত্র যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে অতিরিক্ত অর্থব্যয়ের প্রশ্ন নেই, শুধু শিক্ষকের দায়িত্ববোধের প্রশ্ন আছে। এই দায়িত্ব-বোধ জাগতে পারে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপে।

পরীক্ষার্থীদের অপরের লেখা নিজের লেখা ব'লে চালানোর রীতিকে বিশ্ববিদ্যালয় যদি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারেন তা হলে আমাদের দেশ প্রয়োজনীয় সকল শিক্ষাতেই এগিয়ে যেতে পারবে, বিজ্ঞান শিক্ষাতেও যে এগিয়ে যাবে সে কথা বলা বাহুল্য।

বিবিধ প্রসঙ্গ

পরলোকে বিমলচন্দ্র

গত ১১ই জানুয়ারী ১৯৪৮ রবিবার প্রাতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ও বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ ৭৩ বছর বয়সে 'অমৃতধামে পরম জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ' করেছেন। বিয়োগবিধুর পরিবার-বর্গকে আমরা সান্ত্বনা জানাচ্ছি ও তাঁর আত্মার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

বিমলচন্দ্র ১২বছর বয়সে বৃত্তি নিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন। ১৭ বছর বয়সে এম-এ (গণিত) পাস করে বেরিলী কলেজে এবং পরের বছর আবার এম-এ (ইংরেজি ?) পাস করে সিন্ধুর হায়দরাবাদ কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হন। ১৮৯৬ সালে 'স্টেট স্কলারশিপ' নিয়ে বিলেত যান আই-সি-এস হতে। কেম্ব্রিজে বাংলা পরীক্ষা দিয়ে তিনি হাজার টাকা পুরস্কার পান। তারপর তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গি বদলে যায়। কেম্ব্রিজের 'ট্রাইপস' (সম্ভবত ছুটিতে) পান। বহুকে সেবার উদ্দেশ্যে ডাক্তারী পড়া শুরু করেন। পিতৃবিয়োগের ফলে ১৯০০ সালে ফিরে এসে সিটি কলেজে অধ্যাপক হন। সেই বছরেই সরযূ দেবীকে বিবাহ করে সস্ত্রীক ডাক্তারী পড়ার উদ্দেশ্যে আবার বিলেত যান। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁর স্ত্রী ভারতে ফিরে মারা যান (১৯০২)।

'য়ুনিটেরিয়ান' সমাজের রবিবাসরীয় সভায় প্রায়ই তিনি বক্তৃতা দিতেন, তার অনুলিপি নিয়ে কাগজে পাঠাতেন এডিথ হুটিংহাম। বিমলচন্দ্র ১৯০৩ সালে তাঁকে বিবাহ করেন।

ডাক্তারী পাস করে (অস্ত্রচিকিৎসার ডিগ্রিও নিয়েছিলেন) বিলেতেই চিকিৎসা ব্যাবসা করেন কয়েক বছর। ১৯০৯সালে দেশে ফিরে কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন।

বিদ্যাসাগর কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন (১৯০৯)। পরে এর সঙ্গে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজেও কিছুকাল পড়ান। নৃতত্ত্ব,

ডাক্তার বিমলচন্দ্র ঘোষ

প্রাণিবিদ্যা, মনোবিদ্যা প্রভৃতির পঠন-পাঠন প্রবর্তন সম্পর্কে আশুতোষ তাঁর পরামর্শ নিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শারীরবৃত্ত ও মনোবিদ্যা পড়াতেন, শেষে শুধু মনোবিদ্যা পড়াতেন। জাতীয় আয়ুর্বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের সঙ্গে তার জন্মকাল থেকেই (১৯২১) তিনি যুক্ত ছিলেন।

পড়াতে শুরু করে ক্রমশ চিকিৎসা ব্যবসা প্রায় ত্যাগ করেন। তিনি পড়িয়েছেনও অনেক-কিছু,—ইংরেজি, গণিত, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা, রসায়ন ও দর্শন (অল্প), শারীরবৃত্ত ও নিদান। কতকগুলি পড়াতেন অতি চমৎকার। ইণ্টার-মিডিয়েট ক্লাসে তিনি বাংলা, হিন্দি ও আর একটি

ভারতীয় ভাষায় বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করে বোঝাতেন। 'মনের স্বাস্থ্য' নিয়ে বহু বক্তৃতা দিয়েছেন। তাঁর অধ্যক্ষতাকালেই বিদ্যাসাগর কলেজে বিজ্ঞান প্রদর্শনী হয় (১৯৪০) এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় সেই ধরনের প্রদর্শনী সর্বপ্রথম।

বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষদের ধূমপান না করার ঐতিহ্য ডাঃ ঘোষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সাদাসিদে, নিরহঙ্কার, সদালাপী মানুষ। য়ুরোপীয় পরিবেশকে চমক লাগিয়ে দিয়ে খদ্দরের কাপড়ের উপর ফতুয়া চড়িয়ে চটিপায়ে স্মিতহাস্যে সৌম্য-মূর্তি বিমলচন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে এসে কোন সহ-কর্মীকে পরিষ্কার বাংলায় অভ্যর্থনা জানাতেন, তখন বোঝা যেত কেন তিনি বলতেন, "স্বাধীনতা কাকে বলে বিলেতেই দেখেছি, বিলেতেই শিখেছি।"

নববিধান সমাজের অনেক কাজ করেছেন, প্রচারকও ছিলেন। অন্যান্য কাজ স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বস্তু।

মৃত্যু-শয্যায় তাঁর শেষ একটানা স্পষ্ট কথা হচ্ছে,—"আমরা সবাই এক, আমাদের এক হতে হবে।"—

(ডাঃ ঘোষের ভগিনীর সহযোগিতায় বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীআলোক সেন কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য থেকে।)

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

ভারতে বিজ্ঞান-চর্চার উন্নতিকল্পে অধ্যাপক পি, এস, ম্যাকমেহন ও অধ্যাপক জে, এল, সাইমনসেন 'ব্রিটিশ এসোসিয়েসন ফর দি এড-ভ্যান্সমেণ্ট অফ সায়ান্স'-এর অনুরূপ বৈজ্ঞানিকদের একটি বাৎসরিক সম্মেলন করার চেষ্টা শুরু করেন, যাতে বৈজ্ঞানিকদের সংস্পর্শে এসে অপরে বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত হয় এবং জনসাধারণ মানব কল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে। তাঁদের অদম্য উৎসাহের ফলে ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে উক্ত সোসাইটির ভবনে বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় ও নানা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। বিজ্ঞান কংগ্রেসের রজত-জয়ন্তী ১৯৩৮ সালে সাড়ম্বরে নিষ্পন্ন হয়। নির্বাচিত সভাপতি বিখ্যাত পদার্থবিদ লর্ড রাদার-ফোর্ডের আকস্মিক মৃত্যু হওয়ায় স্যর জেম্‌স্ জিন্‌স্ সভাপতিত্ব করেন। বহু বৈদেশিক বিজ্ঞানী এতে যোগদান করেছিলেন। ৩৪ বছর ধরে বিজ্ঞান কংগ্রেস ভারতের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে চিন্তার আদান-প্রদান ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে পরস্পর যোগসাধন করছে।

এ বৎসর ১লা জানুয়ারী থেকে প্রায় সপ্তাহকাল পাটনায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পঞ্চত্রিংশ অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে দেশীয় ও বিদেশাগত বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক যোগদান করেন। ভারত-বর্ষ ও পাকিস্থানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আট-শতাধিক প্রতিনিধির সমাবেশ হয়। এই অধি-বেশনে নির্বাচিত সভাপতি কর্নেল স্যর রামনাথ চোপরার অসুস্থতা জনিত অনুপস্থিতিতে স্যর সি. ভি. রামন সভাপতির লিখিত অভিভাষণ পাঠ করেন। সভাপতির ভাষণে দেশীয় ভেষজের উৎকর্ষ সাধন ও তার ব্যবহার পুনঃ প্রচলনের এবং আধুনিক ও দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতি সমন্বয় সাধনের পরামর্শ দেন। স্যর সি. ভি. রামন মানুষের স্বাদ ও গন্ধ গ্রহণ ক্ষমতার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের এ বিষয়ে বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের অনুসরণ না করে নূতন পথে অগ্রসর হওয়া উচিত।

আরও একটি বক্তৃতায় অধ্যাপক রামন বলেন যে ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য গঠনের লোভ নাই, অতএব এদেশে পরমাণবিক গবেষণায় অর্থব্যয় নিষ্প্রয়োজন। স্যর শান্তিস্বরূপ ভাটনগর একটি বক্তৃতায় বলেন যে সাম্রাজ্যবাদীর অস্ত্রের পরিবর্তে স্বাধীন ভারতে বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি ও জনগণের কল্যাণে ভারতের সম্পদ বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত করতে হবে। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা

ভারত সরকারকে পরমাণবিক গবেষণা ও পরমাণবিক শক্তিকে শ্রমশিল্পে নিয়োগ সম্পর্কে অধিকতর তৎপর হতে অনুরোধ জানান। খাদ্য সমস্যা আলোচনা সভার উদ্বোধনে ডক্টর শ্রীবীরেশচন্দ্র গুহ বলেন, পৃথিবীর প্রায় ২৫০ কোটি নরনারীর জন্য পর্য্যাপ্ত খাদ্য-দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। এই অভাব বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি ও নূতন খাদ্য-দ্রব্য আবিষ্কার দ্বারা পূরণ হতে পারে। অধ্যাপক শঙ্করণ বলেন যে, ভারতবর্ষের খাদ্য-সমস্যা কৃত্রিম খাদ্য-বস্তু উৎপাদনের দ্বারা সমাধান হওয়া সম্ভব।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

বিজ্ঞানোৎসাহীরা বিজ্ঞান কলেজের একটি সভায় সমবেত হয়ে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠানের সংকল্প করেন। সঙ্গে সঙ্গে উদ্যোগপর্ব্বের কার্য নির্ব্বাহের জন্য সমস্ত ভার একটি ছোট পরিচালক মণ্ডলীর উপর দেন। মণ্ডলীর সভ্যেরা হচ্ছেন—শ্রীসুবোধনাথ বাগচী, শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, শ্রীসর্বানীসহায় গুহ সরকার, শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীপরিমল গোস্বামী, শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ, শ্রীসুধাময় মুখোপাধ্যায়, শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী ও শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসুকে মণ্ডলীর সভাপতি নির্বাচন করা হয়। অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র পরে যোগদান করেন। অধ্যাপক শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় একাধিকবার উপস্থিত থেকে নানাবিধ কাজে সাহায্য করেছেন।

২ শে জানুয়ারী ১৯৪৮ তারিখে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হচ্ছে। যাঁরা চাঁদা দিয়ে আজীবন বা সাধারণ সভ্যের পদ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সভা হবে ৩১শে জানুয়ারী ১৯৪৮; তাঁরা পরিষদের নিয়মাবলী রচনা করবেন, কার্যকরী সমিতি, মন্ত্রণা পরিষদ ইত্যাদিও গঠন করবেন।

অধ্যাপক শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় পত্রিকা প্রকাশ করা হবে স্থির হয়। অনেক প্রাথমিক বাধা-বিপত্তির মধ্যে মাত্র এক মাস সময় নিয়ে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' উদ্বোধনদিবসে আত্মপ্রকাশ করছে। পরিষদ ও পত্রিকা এই দুই নবজাতক প্রত্যেক বাঙালীর সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা কামনা করে।

ত্রুটি স্বীকার

বাংলাদেশে বহু বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানের চর্চা করছেন এবং তাঁদের বহু মূল্যবান অবদানে দেশে সমৃদ্ধ হচ্ছে। তাঁদের উপদেশ, নির্দেশ ও সাহায্য প্রতিপদেই আমরা লাভ করব এই আশা নিয়েই আমরা এই প্রতিষ্ঠান গড়ার স্পর্দ্ধা করেছি। অল্প সময়ে দ্রুত কাজ করতে হবে এই ছিল লক্ষ্য। ফলে ত্রুটি অনেক ঘটা সম্ভব। এসব ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত। তেমনি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রকাশে চার সপ্তাহ সময়ও পাওয়া যায় নি। এখানেও যে-সব ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে তা সবাই মার্জনা করে নেবেন আশা করি। দেশের ও দশের কাজ,—তাই কাজের ভুলচুক কারুর নজরে পড়লে ধরিয়ে দেবেন, সুধরিয়ে নেবেন,—এই সহযোগিতার প্রত্যাশা আমরা প্রত্যেকের কাছে করি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাঁদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হোল, আমরা তাঁদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। গুপ্তপ্রেসের শ্রীঅজয় বসু ও শ্রীসমীর বসু, অক্লান্তকর্ম্মী শ্রীভবানীচরণ রায়, শিল্পী শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায় এবং শ্রী কমল চৌধুরীকে আমরা এজন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মহাত্মা গান্ধী
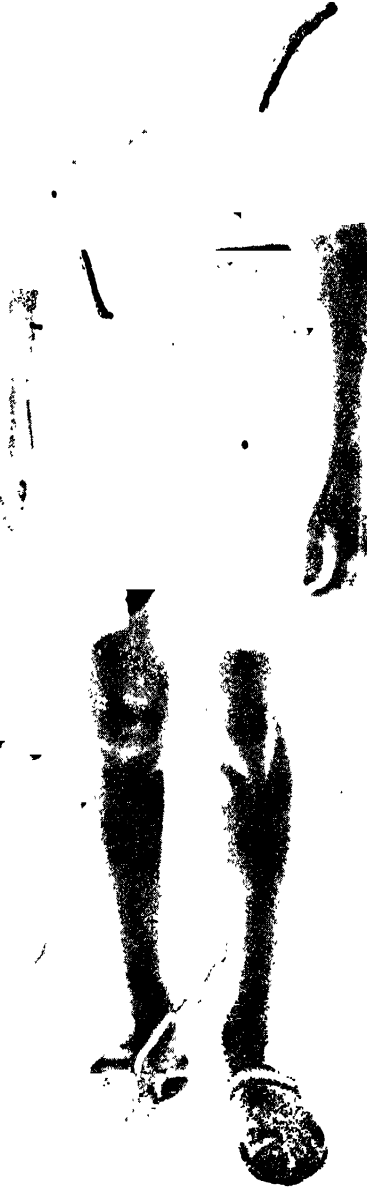
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

প্রথম বর্ষ | ফেব্রুয়ারী—১৯৪৮ | দ্বিতীয় সংখ্যা

আদর্শ বৈজ্ঞানিক গান্ধী

গান্ধীজিকে স্মরণ করিতে গেলে এই কথাটাই বার বার মনে আসে যে তিনি ছিলেন এক অভিনব বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিকের উদ্দেশ্য তথ্য বিচার করা, সত্য আবিষ্কার করা, এবং এই সত্যকে বহু পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যাচাই করে তবে সত্য বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হওয়া। এই বিচারে গান্ধীজীও বৈজ্ঞানিক। তবে তাঁর পদ্ধতি বৈজ্ঞানিকদের সাধারণ পদ্ধতি থেকে স্বতন্ত্র। কারণ তাঁর গবেষণার উপকরণ যন্ত্র নয়, রাসায়নিক নয়, তাঁর গবেষণার উপকরণ তাঁর জীবন। তাঁর সত্যানুসন্ধানী মন গান্ধী নামক একটি মানুষকে বিচিত্র পরীক্ষার মধ্যে ফেলে বার বার তাঁর পরিকল্পিত বা উপলব্ধ সত্যকে যাচাই করে গেছেন।

সাধারণ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও অবশ্য নিজেকে পরীক্ষার উপকরণ বা সত্য যাচাইয়ের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত আছে। তাঁদের অনেকে নিজের জীবনকে মানুষের কল্যাণে অকাতরে বিপন্ন করে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, জীবন দিয়েছেন অনেকে, মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও পরীক্ষা থেকে বিরত হননি। কিন্তু সমস্ত জীবনকেই পরীক্ষার একমাত্র উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করায় গান্ধীজির যে স্বাতন্ত্র্য, তার দৃষ্টান্ত অন্যত্র সামান্যই আছে।

এ বিষয়ে সকলেই একমত যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যখন সকল মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় তখনই হয় তার সার্থকতা। বিজ্ঞানের এই আদর্শকে চরম রূপে গ্রহণ করেছিলেন গান্ধীজি। অর্থাৎ তাঁর মতে সত্য, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন, সমাজগত জীবন, অথবা দেশগত জীবন থেকে লেশমাত্র বিচ্ছিন্ন নয়, সে সত্য যতখানি মানুষের জীবনে সত্য হয়ে উঠল ততখানিই তার মূল্য, ততখানিই তার সার্থকতা। সুতরাং এ আদর্শ সাধারণ বৈজ্ঞানিক আদর্শ থেকে পৃথক নয়। প্রসঙ্গত বলা যায় গবেষণাগারের সব আবিষ্কার সব সময় উদ্দেশ্যমূলক থাকে না। এ রকম অনেক আবিষ্কারের দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যা কোনো বিশেষ গবেষণার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ ঘটেছে। মানুষের প্রয়োজনে তার ব্যবহারের প্রশ্ন এসেছে অনেক পরে। আবার অনেক আবিষ্কার অকস্মাৎ হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক গবেষণা, অথবা উদ্দেশ্যমূলক তথ্য বা সত্য আবিষ্কারের দৃষ্টান্তও অনেক আছে। দৈহিক ব্যাধি বা কৃষি সম্পর্কিত প্রায় সব গবেষণাই

উদ্দেশ্যমূলক ভাবে করা হয়। এবং সত্য আবিষ্কার সব সময় এই প্রকম উদ্দেশ্যমূলক না হলেও, তথ্য আবিষ্কার মোটামুটিভাবে সর্ব সময়েই উদ্দেশ্যমূলক। ডেভির আশ্চর্য প্রদীপ আবিষ্কারের মূলে যে সত্যটি ছিল তার আনুষঙ্গিক তথ্য আবিষ্কারের মূলে ছিল খনির মজুরদের জীবন রক্ষার প্রশ্ন। পরমাণুর কেন্দ্রে আঘাত হেনে তাকে চূর্ণ করতে পারলে প্রচণ্ড শক্তি জেগে ওঠে, কিন্তু এই শক্তির ব্যবহার করতে হলে আনুষঙ্গিক অনেক তথ্য আবিষ্কারের প্রয়োজন ছিল এবং তা ছিল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক গবেষণা বা আবিষ্কার বা উদ্ভাবন বিজ্ঞানের পক্ষে যে অগৌরবের নয় [illegible] এই আদর্শই যে ধীরে ধীরে সর্বত্র রূপায়িত হয়ে উঠেছে সে কথা সকলেই জানেন। পথ দেখিয়েছে রাশিয়া। সেখানে সব গবেষণারই অব্যবহিত ফল যাতে সমস্ত দেশ পেতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই যা কিছু ব্যবস্থা।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে গান্ধীজির পরীক্ষার অব্যবহিত ফল মানুষের কল্যাণের জন্যই কাম্য ছিল। তিনি স্বহস্তে বাংলা ভাষায় একটি কথা লিখে গেছেন—"আমার জীবনই আমার বাণী"—এ কথারও অন্তর্নিহিত অর্থ ঐ একই। তাঁর জীবনের সঙ্গে তাঁর কাজ, তাঁর উদ্দেশ্য, তাঁর পরীক্ষা, তাঁর গবেষণা, সবই ছিল সমবিস্তৃত ইংরেজীতে যাকে বলে কো-এক্সটেন্সিভ। মানুষের কল্যাণের বাইরে তাঁর কোন কথা, কাজ বা চিন্তা ছিল না। বিজ্ঞানেরও এটাই আদর্শ। সত্যকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের এ রকম নির্ভীক পরীক্ষার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল।

আমার পরীক্ষাসমূহ সম্বন্ধে কোনও প্রকার সম্পূর্ণতার আরোপ আমি করিতেছি না। বৈজ্ঞানিক যেমন অতিশয় নিয়মের সহিত বিচার পূর্বক ও সূক্ষ্মভাবে নিজের পরীক্ষা-সমূহ সম্পন্ন করিয়াও তাহা হইতে প্রাপ্ত পরিণামকে অন্তিম পরিণাম বলিয়া গণ্য করে না, যে ফল লাভ করিয়াছে তাহাই সত্য এ সম্বন্ধে সন্দেহ না করিলেও সে বিষয়ে নির্বিকার থাকে, আমার পরীক্ষাসমূহ সম্বন্ধেও আমি সেই মনোভাবই পোষণ করি। আমি গভীর ভাবে আত্মনিরীক্ষণ করিয়াছি, প্রত্যেকটি ভাবকে খুঁজিয়া দেখিয়াছি ও বিশ্লেষণ করিয়াছি। এবং ঐ প্রকার করিয়া যাহা উহার পরিণাম ফল বলিয়া পাইয়াছি তাহা যে সকলের পক্ষেই অন্তিম ফল. তাহা যে অভ্রান্ত সত্য এ প্রকার দাবী করার ইচ্ছা আমি কোনও দিনই করি না।

ম ক গান্ধী (আত্ম-দর্শন)

আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ভারতবর্ষে পরিবর্ত্তিত রাজনীতিক অবস্থা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রচার উপলক্ষে অনেক কথা মনে পড়ে। সে সকলের মধ্যে প্রথমে দুইটির উল্লেখ করিব—

(১) ভারতবর্ষের এই রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের প্রায় ৭৮ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় মহেন্দ্রলাল সরকার কর্ত্তৃক বিজ্ঞান-সভার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা।

(২) ভারতবর্ষের এই রাজনীতিক অবস্থা-পরিবর্ত্তনের চেষ্টা প্রবল হইলে স্বদেশী আন্দোলনের সময় (১৯০৬ খৃষ্টাব্দে) জাতীয় শিক্ষাপরিষদ প্রতিষ্ঠা।

মহেন্দ্রলাল সরকারের পরিকল্পিত অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ প্রথমে করা প্রয়োজন। তাহার আরম্ভ :—

অনুষ্ঠান পত্র

"জ্ঞানাৎ পরতরো নহি"

১। বিশ্বরাজ্যের আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল স্থির চিত্তে আলোচনা করিলে অন্তঃকরণে অদ্ভুত রসের সঞ্চার হয়, এবং কি নিয়মে এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পন্ন হইতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্তে কৌতূহল জন্মে। যদ্দ্বারা এই নিয়মের বিশিষ্ট জ্ঞান হয়, তাহাকেই বিজ্ঞানশাস্ত্র কহে।

২। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে বিজ্ঞানশাস্ত্রের যথেষ্ট সমাদর ও চর্চ্চা ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান কালে বিজ্ঞানশাস্ত্রের যে সকল শাখা সম্যক্ উন্নত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের মধ্যে অনেকগুলির বীজরোপন প্রাচীন হিন্দু ঋষিরাও করেন। জ্যোতিষ, বীজগণিত, মিশ্রগণিত, রেখা-গণিত, আয়ুর্ব্বেদ, সামুদ্রিক, রসায়ন, উদ্ভিদতত্ত্ব সঙ্গীত, মনোবিজ্ঞান, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ শাখা বহুদূর বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, এক্ষণে অনেকেরই প্রায় লোপ হইয়াছে; নামমাত্র অবশিষ্ট আছে।

৩। এক্ষণে ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অনুশীলন নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভা নামে একটি সভা কলিকাতায় স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। এই সভা প্রধান সভারূপে গণ্য হইবে, এবং আবশ্যক মতে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ইহার শাখাসভা স্থাপিত হইবে।

৪। ভারতবর্ষীয়দিগকে আহ্বান করিয়া বিজ্ঞান অনুশীলন বিষয়ে উৎসাহিত ও সক্ষম করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। আর ভারতবর্ষ সম্পর্কীয় যে সকল বিষয় লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা (মনোরম ও জ্ঞানদায়ক প্রাচীন গ্রন্থ সকল মুদ্রিত ও প্রচার করা) সভার আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য।

৫। সভা স্থাপন করিবার জন্য একটি গৃহ, কতকগুলি বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র এবং কতকগুলি উপযুক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তি বিশেষের আবশ্যক। অতএব এই প্রস্তাব হইয়াছে যে, কিছু ভূমি ক্রয় করা ও তাহার উপর একটি আবশ্যকানুরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করা, বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র ক্রয় করা এবং যাঁহারা এক্ষণে বিজ্ঞানানুশীলন করিতেছেন কিংবা যাঁহারা এক্ষণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথচ বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়নে একান্ত অভিলাষী, কিন্তু উপায়াভাবে সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতেছেন

না, এরূপ ব্যক্তিদিগকে বিজ্ঞান চর্চ্চা করিতে আহ্বান করা হইবে।

৬। এই সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে অর্থই প্রধান আবশ্যক, অতএব ভারতবর্ষের শুভানুধ্যায়ী ও উন্নতীচ্ছু জনগণের নিকট বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারা আপন আপন ধনের কিয়দংশ অর্পণ করিয়া উপস্থিত বিষয়ের উন্নতি সাধন করুন।

৭। যাঁহারা চাঁদা গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের নাম পরে প্রকাশিত হইবে। আপাততঃ যাঁহারা স্বাক্ষর করিতে কিংবা চাঁদা দিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট প্রেরণ করিলে সাদরে গৃহীত হইবে।

অনুষ্ঠাতা
শ্রীমহেন্দ্রলাল সরকার

মহেন্দ্র বাবুর চেষ্টা সহজে ফলবতী হয় নাই। অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশের দুই বৎসরেরও অধিক কাল পরে বঙ্কিমচন্দ্র উহা উদ্ধৃত করিয়া উহার সমর্থনে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলেন—বিজ্ঞানই "তড়িৎ তার সম্পাদনে, কামান সন্ধানে, অয়োগোলক বর্ষণে এই বীরপ্রসূ ভারতভূমি হস্তামলকবৎ আয়ত্ত করিয়া শাসন করিতেছে। শুধু তাহাই নহে। বিদেশীয় বিজ্ঞানে আমাদিগকে ক্রমশঃই নির্জ্জীব করিতেছে। যে বিজ্ঞান স্বদেশী হইলে আমাদের দাস হইত, বিদেশী হইয়া আমাদের প্রভু হইয়াছে। আমরা দিন দিন নিরুপায় হইতেছি। অতিথিশালায় আজীবনবাসী অতিথির ন্যায় আমরা প্রভুর আশ্রমে বাস করিতেছি। এই ভারতভূমি একটি বিস্তীর্ণ অতিথিশালা মাত্র।" তখনও ভারতবাসী স্বাধীনতা চাহে নাই বলিযাই বিদেশী শাসনতন্ত্র সেই অতিথিশালাকে বন্দিনিবাসে পরিণত করেন নাই।

প্রবন্ধের উপসংহার ভাগে লিখিত হয় :—

"এই অনুষ্ঠানপত্র আজ আড়াই বৎসর হইল প্রচারিত হইয়াছে। এই আড়াই বৎসরে বঙ্গসমাজ চল্লিশ সহস্র টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন। মহেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন যে, এই তালিকাখানি একটি আশ্চর্য্য দলিল। ইহাতে যেমন কতকগুলি নাম থাকাতে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, তেমনি কতকগুলি নাম না থাকাতে উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে। তিনি আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন না।

"আমরা উপসংহারে আব গোটা দুই কথা বলিতে ইচ্ছা করি। বঙ্গবাসিগণ, আপনারা মহেন্দ্রবাবুর ঈষৎ বক্রোক্তি অবশ্যই বুঝিয়া থাকিবেন। তবে আর কলঙ্কভার কেন শিরে বহন করেন। সকলেই অগ্রসর হউন। যিনি এক দিনে লক্ষমুদ্রা দান করেন, তিনি কেন পশ্চাতে পড়েন? পুত্রকন্যার বিবাহে যাঁহারা লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করেন, তাঁরা কেন নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকেন?"

তিনি য়ুরোপীয়দিগকেও এই কার্য্যে অর্থ সাহায্য করিতে বলিযাছিলেন।

দীর্ঘকাল বিজ্ঞান-সভা যে মৌলিক গবেষণার অবদানে বা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য প্রচারে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ইহার পরে স্বদেশী আন্দোলনকালে দেশে যে নব ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহার ফলে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। তাহার এক ভাগ বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং উত্তর কালে তাহা "কলেজ অব এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেক্‌নলজী" নামে পরিচিত হইতে থাকে। এই বিদ্যালয়ে বা শিক্ষাপরিষদে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা প্রদানের দিকে মনোযোগ প্রদান করা হয়।

এই বিজ্ঞান বিভাগ যে আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছে—সরকারের উপেক্ষা ও দেশের বহু লোকের সন্দেহ ব্যর্থ করিয়া আপনার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে, তাহা যত প্রশংসনীয়ই কেন হউক না, সরকারের উপেক্ষা ও দেশবাসীর ঈপ্সিত

সাহায্যের অভাবে তাহা যে তাহার প্রতিষ্ঠাতৃগণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

মহেন্দ্রলালের বিজ্ঞান-সভা আর জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ এতদুভয়ের মধ্যে বঙ্গদেশে বিজ্ঞান চর্চ্চা যেমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানের চর্চ্চা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। এই সময়ের মধ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নেতৃত্বে তাহার অসাধারণ উন্নতি। পরিষদ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরিষদের আরব্ধ আরও কয়টি কার্য্যের মত তাহা অসমাপ্তই রহিয়া গিয়াছে—পরিষদ তাহার উদ্দেশ্য হইতে সরিয়া গিয়াছে—ইচ্ছা করিয়া কি উপযুক্ত চালকের অভাবে, তাহার আলোচনার স্থান ইহা নহে।

এই সময়ের মধ্যেই বাঙ্গালায় আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র দুই চন্দ্রোদয়—বহু বাঙ্গালীর বিজ্ঞান চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ ও অসাধারণ সাফল্যলাভ। একজন উদ্ভিদের প্রাণের সন্ধান দিয়া যেমন প্রচলিত বিশ্বাস কুসংস্কার বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, আর একজন তেমনই রসায়ন শাস্ত্রের জন্মভূমি বলিয়া ভারতবর্ষের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। একজন বিজ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, একজন স্বয়ং বিজ্ঞান-গবেষণা-মন্দির ছিলেন। উভয়ের—বিশেষ প্রফুল্লচন্দ্রের—শিষ্যদল আজ সমগ্র পৃথিবীতে খ্যাতি লাভ করিয়া দেশের ও গুরুর নাম উজ্জ্বল করিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের ছাত্রপাঠ্য বাঙ্গলার ইতিহাসের সমালোচনা-প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন আচার্য্যদ্বয়ের বাঙ্গালায় অবদান সম্বন্ধে তাহাই বলিলে হয়—"যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।" উভয়েরই দান—কতকগুলি সারগর্ভ প্রবন্ধ; আর আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের একখানি ক্ষুদ্র প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তক। উভয়কেই ছাত্ররূপে বলিয়াছিলাম, তাঁহারা কেন বাঙ্গালায় আপনাদিগের গবেষণাফল প্রকাশ করেন না—তাঁহারা তাহা করিলে বিদেশী বৈজ্ঞানিকগণও বাঙ্গালা শিখিতে বাধ্য হইবেন। উভয়েই বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার পরে তাহা হইবে। তবে উভয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের কথার সমর্থন করিতেন —"বাঙ্গলায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখন বুঝিবে না বা শুনিবে না। * * যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে না বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"

রাজেন্দ্রলাল মিত্র হইতে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী হইতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালার মনীষীরা বঙ্কিমচন্দ্রের মতই সরল ভাষায় বাঙ্গালীকে বিজ্ঞানের তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আর এই সময়ের মধ্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টা তাঁহাদিগের চেষ্টার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে।

আজ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় যখন আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের স্বপ্ন সফল হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি, যখন রবীন্দ্রনাথ শিক্ষায় যে হেরফের দেখিয়া তাহা দূর করিতে বলিয়াছিলেন, ('সাধনা'—১২৯৯ বঙ্গাব্দ) তাহা দূর হইবার উপায় দেখা যাইতেছে, তখন দীর্ঘকাল যাঁহারা যথাসাধ্য বিজ্ঞানকে বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমরা শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ করিব। তাঁহাদিগের চেষ্টা নানা পত্রে নানা প্রবন্ধে আত্মগোপন করিয়া আছে। তাহার সন্ধান করিতে হইবে। পরিভাষা রচনার অনেক চেষ্টা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—১২৮৯ বঙ্গাব্দে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিকল্পনানুসারে "সারস্বত সমাজ" প্রতিষ্ঠা হয়।—

"ভৌগোলিক পরিভাষা নির্ণয়েই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম খসড়া সমস্তটা রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন।

সেটি ছাপাইয়া অন্যান্য সভ্যদের আলোচনার জন্য সকলের হাতে বিতরণ করা হইয়াছিল।"

রাজেন্দ্রলাল প্রাকৃতিক ভূগোল সম্বন্ধে একখানি পুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন।

পরিভাষা কিরূপে রচিত হইবে, সে বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে।

১২৮৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'বঙ্গদর্শনে' "নূতন কথা গড়া" প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে লিখিত হয় :—

"যে কেহ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তিনিই জানেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় অনেক ভাব সহজে ব্যক্ত করা যায় না। ঐ সকল ভাব ব্যক্ত করিতে হইলে, কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা লইয়া নানা মতভেদ আছে। অনেকে বলেন, নূতন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নূতন শব্দ গঠন করা আবশ্যক। অনেকে বলেন, অন্যান্য ভাষা হইতে নূতন শব্দ আমদানী করা আবশ্যক। অনেকে বলেন, চলিত কথা দিয়া যেরূপে হউক ভাব প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট হইল। ইংরেজীতে যে ভাব এক কথায় ব্যক্ত হয় বাঙ্গালায় যদি তাহাই ব্যক্ত করিতে তিন ছত্র লিখিতে হয়, সে-ও স্বীকার, তথাপি নূতন শব্দ গঠন বা ভাষান্তর হইতে শব্দ আনয়ন করা উচিত নহে। আমরা এ তিনটির কোন মতেরই পোষকতা করিতে পারি না। কখন কখন নূতন শব্দ গঠনের প্রয়োজন হয়। কখন ভাষান্তর হইতে শব্দ আনয়নের প্রয়োজন হয়। কখন অনেক কথায় ভাবটি ব্যক্ত করিতে গেলে লেখার বাঁধনী থাকে না এবং ভাবটিও সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করা যায় না।"

তিন উপায়ের দোষগুণ বিচার করিয়া প্রবন্ধ-লেখক বলেন :—

"এরূপ দুরূহ কার্য্যে হঠাৎ কিছু করিলে ভাল না হইয়া বরং মন্দ হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমরা বলি, নূতন ভাব প্রকাশ করিতে হইলে বা নূতন জিনিষের নাম দিতে হইলে বাঙ্গালা, হিন্দী, উড়িয়া সংস্কৃত প্রভৃতিতে যে সকল কথা প্রচলিত আছে, সেগুলি প্রণিধান পূর্ব্বক দেখা উচিত; যদি তাহার মধ্যে কোন কথায় ভাব প্রকাশ হয় তাহা হইলে সেই ভাষার কথাই প্রচলিত করিয়া দেওয়া উচিত। অনেক সময় চলিত ভাষায় এবং ইতর ভাষায় এমন সুন্দর কথা পাওয়া যায় যে, তাহাতে সম্পূর্ণরূপে মনের ভাব প্রকাশ করা যাইতে পারে।"

কয়টি উদাহরণ দিয়া এই সিদ্ধান্ত সমর্থনের চেষ্টা প্রবন্ধে ছিল—

(১) "কাচ সহজে ভাঙ্গিয়া যায়। সহজে ভাঙ্গনগুণ প্রকাশ করিবার জন্য ইতর ভাষায় একটি শব্দ আছে—'ঠুন্‌ক'। কিন্তু যাঁহারা স্কুলের বই লেখেন তাঁহারা ঐ কথাটি না জানিয়া অথবা উহা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা না করিয়া লিখিলেন, কাচ ভঙ্গপ্রবণ। যাহা সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, তাহার নাম সংস্কৃতে ভঙ্গুর। সুতবাং ভঙ্গপ্রবণ শব্দটি না বাঙ্গালা, না ইংরেজী, না সংস্কৃত।"

(২) "দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান বাঙ্গালায় নাই। সুতরাং উহার নামও বাঙ্গালায় নাই। কিন্তু আমার প্রয়োজন ঐ শব্দটির নাম দেওয়া। হিন্দীতে ঐ স্থানকে 'দূন' বলে। কিন্তু বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণ ঐ কথাটি না জানিয়া বা উহা ব্যবহার করিতে ইচ্ছা না করিয়া লিখিলেন কি না—উপত্যকা। উপত্যকা সংস্কৃতে চলিত শব্দ; কিন্তু দুঃখের মধ্যে এই যে, উহাতে পর্ব্বতের আসন্নভূমি বুঝায়, দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান বুঝায় না।"

(৩) "যেখানে বসিয়া জ্যোতির্ব্বিদরা গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি গণনা করেন, তাহার হিন্দী নাম মানমন্দির বা তারাঘর। কিন্তু অনেকে উহার ইংরেজী নাম **observatory** তর্জ্জমা করিয়া নাম রাখিলেন, পর্য্যবেক্ষণিকা। কেহ বুঝিল না, অথচ কেতাবে কেতাবে চলিয়া গেল।"

(৪) "ভারতবর্ষের উত্তর অংশের পর্ব্বতময় প্রদেশকে লোক উত্তরাখণ্ড বলে। কিন্তু ইংরেজীতে উহাকে **Himalayan region** বলে বলিয়া বাঙ্গালা পুস্তকে উহার নাম হিমালয় প্রদেশ হইয়াছে।"

প্রবন্ধ লেখকের বক্তব্য—

"লিখিতে বসিয়া ভাব প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে যে কথাগুলি ব্যবহার করিতে হইবে, বিশেষ রূপ তদন্ত করিয়া তাহাদের অর্থ ঠিক করা উচিত এবং নূতন শব্দ গঠনের পূর্ব্বে বিশেষরূপ সতর্ক হওয়া উচিত।"

তিনি আরও বলেন—"যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় সংস্কৃতাধ্যাপকগণ প্রথমে বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করেন" তখন তাঁহাদিগের সংস্কৃতানুরাগ অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু এখন বাঙ্গালা লেখকদিগের মধ্যে সংস্কৃত পণ্ডিত বিরল। এই সকল লেখক সংস্কৃত ব্যতীত অন্য শব্দ ব্যবহার করিবেন না—এ বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলে—"ইঁহারা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে গিয়া প্রায়ই অর্থবিষয়ে ভয়ানক ভুল করিয়া ও নানারূপ গোলযোগ করিয়া বসেন।"

এইরূপ ভুলের দৃষ্টান্ত আমরা ১২৯৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের 'ভারতী' পত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "বঙ্গভাষা সম্বন্ধে দুই একটি কথা" প্রবন্ধে পাই। তিনি লিখিয়াছেন :—

(১) "কতিপয় বঙ্গীয় লেখক conscience শব্দের অনুবাদস্থলে বিবেক শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বিবেক শব্দটি নিতান্তই দার্শনিক শব্দ ; তাহার অর্থ—আত্মাকে অনাত্মা হইতে—জ্ঞানকে অবিদ্যা হইতে—পুরুষকে প্রকৃতি হইতে বিভক্ত করিয়া দেখা। * * বিবেক একটি তান্ত্রিক (technical) শব্দ। * * Conscience শব্দ যে স্থলে মনোবৃত্তিরূপে ব্যবহৃত হয়, সে স্থলে ধর্ম্ম-বুদ্ধিই তাহার প্রকৃত অনুবাদ ; আর যে স্থলে তাহা সেই বৃত্তির উদ্ভাসরূপে ব্যবহৃত হয়, সে স্থলে ধর্ম্ম-বোধ বা ধর্ম্মজ্ঞান তাহার প্রকৃত অনুবাদ।"

(২) "Pious অথবা Religious শব্দের অনুবাদের পক্ষে ভক্ত শব্দই সবিশেষ উপযোগী। যদি কোন ব্যক্তি ঈশ্বরভক্ত হইয়াও কুকার্য্যে রত হয়, তবে স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে, লোকটা ভক্ত বটে, কিন্তু উহার ধর্ম্মজ্ঞান নাই।"

(৩) "অনেকে Evolution শব্দের অনুবাদ করিয়া থাকে—'বিবর্ত্তবাদ'। বিবর্ত্ত বেদান্ত দর্শনের একটি তান্ত্রিক শব্দ। রজ্জুতে সর্পভ্রমের যে কারণ, তাহাই বিবর্ত্ত-কারণ। অজ্ঞান, যাহা দর্শকের মনের ধর্ম্ম, তাহার প্রভাবে দৃশ্যবস্তু সকল দর্শকের পক্ষে যেরূপ একপ্রকার না হইয়া অন্যপ্রকার দেখায়, তাহারই নাম বিবর্ত্তন। * * * Theory of Evolution এই মতটিকে অভিব্যক্তিবাদ বলাই সর্ব্বাংশে যুক্তিসঙ্গত।"

এইরূপে বাঙ্গালার লেখকগণ অনেকগুলি পরিভাষা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'দাসী' পত্রে "বঙ্গভাষার কলেবর পুষ্টি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে বলা হয় :—

"বঙ্গভাষার বিবর্ত্তনে ও বিকাশে প্রয়োজন যে সব ইংরাজি, পার্সি, উর্দ্দু বা আরবী অথবা অপর কোন দেশীয় শব্দ গ্রহণ আবশ্যক বোধ হইবে—এবং যাহা বঙ্গভাষার, দীনতা বশতঃ ও সংস্কৃত শব্দের ভাবযোজনার অভাব বশতঃ, গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক, তাহাতে বাধা উপস্থিত করা উচিত নয়। এবং যাহাতে ঐ সকল শব্দ ব্যবহার কোন পাঠ্য পুস্তকেও দোষের বিষয় রূপে বিবেচিত না হয় এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত।"

আর সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছিল :—

(১) "পরিবর্ত্তনের স্রোতমধ্যে একদিকে যেমন ভাষার কলেবর পুষ্টি হইয়াছে, অপর দিকে ভিন্ন দেশীয় ভাষার বহু শব্দ বঙ্গভাষায় একই সময় স্থান পাইলে, তাহার দ্বারা ভাষার বিশুদ্ধতা এবং শক্তি বিলোপের সম্ভাবনা আছে।"

(২) "সর্ব্বোপরি একটি কথা মনে রাখা উচিত—আমরা যে কোন ভাষার উদরে এতাদৃশ বিজাতীয় বিদেশীয় শব্দাবলিকে প্রবিষ্ট করাইয়া, তাহা উক্ত ভাষার রক্তমাংস রূপে পরিণত করিতে পারিব, তাহার একটি বিশেষ প্রণালী ও বিশেষ নিয়ম আছে। কোন একটি ভাব প্রকাশের জন্য শব্দ অথবা বিদেশীয় কোন শব্দের অনুরূপ শব্দ যখন কোন ভাষার প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তখন বিশেষ প্রয়োজনে মাত্র ঐ শব্দটিকে নিজস্ব করিয়া লইতে হয়। এতদ্-

ভিন্ন এই শব্দ-গ্রহণ-প্রণালীকে সমর্থন করা যায় না এবং এই বিষয়ে অধিক স্বাধীনতার প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নয়।"

এই সব প্রবন্ধ হইতে বুঝিতে পারা যায়, যাঁহারা বাঙ্গালায় ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই ভাষার পুষ্টি সাধন করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের উপায় চিন্তা করিতে হইয়াছে। তাঁহারা সময় সময় সে সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, সে সকল বিবেচনা করিলে আমরা আমাদিগের এই কার্য্যে সুবিধা পাইব।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের কিছু দিন পূর্ব্বে বিলাতের প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রকাশক ম্যাকমিলান কোম্পানী বাঙ্গালা ভাষায় বিলাতের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক-দিগের বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তক অনুবাদ করাইয়া প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। পুস্তকগুলি এ দেশে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক করাইবার চেষ্টায় তাঁহারা তাহা করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক হাক্সলির বিজ্ঞান প্রবেশ ও অধ্যপক গীকীর প্রাকৃত-ভূগোল বাঙ্গালায় অনূদিত হইয়া বিলাতে ছাপান হয়। দুইজন অতি যোগ্য ব্যক্তির উপর অনুবাদের ভার প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রথমোক্ত পুস্তক রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী ও দ্বিতীয়খানি যোগেশচন্দ্র রায় অনুবাদ করেন। বিলাতে মুদ্রিত হওয়ায় (তখন বাঙ্গালা টাইপরাইটার হয় নাই) পুস্তকে মুদ্রাকরের ভুল অনেকগুলি ছিল। প্রাকৃত-ভূগোলের দীর্ঘ "শুদ্ধি-পত্রের" শেষে আবার লিখিত হয়—"পুস্তকের নানা স্থানে 'ফাট' শব্দ আছে। তাহা ভ্রমক্রমে 'কাট' ছাপা হইয়াছে।" ঐ পুস্তক দুইখানির জন্য অনেক পরিভাষা প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। রামেন্দ্রসুন্দর দীর্ঘজীবী ছিলেন না। কিন্তু যোগেশচন্দ্র দীর্ঘজীবনে পরিভাষা রচনায় যেমন বৈজ্ঞানিক বিষয়েই গ্রন্থ রচনায়ও তেমন স্বয়ং যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন এবং বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন।

সেই সময়ে যাঁহারা বিবিধ মাসিক পত্রে বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন, তাঁহাদিগের অনেকের কথা আজ আমরা বিস্মৃত হইতেছি। তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, প্রবন্ধগুলি মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায় রহিয়াছে, পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। আজ আমাদিগের তাঁহাদিগের কার্য্য পরিদর্শনের ও নাম স্মরণের সময় উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহার পরীক্ষা ও গবেষণা ব্যতীত টাটানগর বা জামশেদপুর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না—অন্ততঃ প্রতিষ্ঠায় বিলম্ব ঘটিত—সেই প্রমথনাথ বসু 'ভারতী ও বালকে' অনেকগুলি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়া-ছিলেন। তদ্ভিন্ন "ভারতী"তে ও 'ভারতী ও বালকে' প্রমথনাথের, (অধ্যাপক) ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের, (অধ্যাপক) অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির বহু প্রবন্ধ; 'সাহিত্যে' শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, নানা পত্রে জগদানন্দ রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির প্রবন্ধ, এ সকলে ভাব প্রকাশের প্রয়োজনে অনেক শব্দ রচনা করিতে হইয়াছে। সে সকলও বিশেষ ভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন হইবে।

বাঙ্গালায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বুঝাইয়া লোককে শিক্ষাদানের প্রয়োজনে রাজেন্দ্রলাল মিত্র যেমন বঙ্কিমচন্দ্র তেমনই প্রবন্ধ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের পথ অনেকের দ্বারা অবলম্বিত হইয়াছে। ১৩০৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'ভারতীতে' মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "বরুণ" নামক প্রবন্ধের উপসংহারে ৪২টি পারিভাষিক শব্দের ইংরেজী কি তাহা এক তালিকায় দিয়াছিলেন।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ বাঙ্গালার কল্যাণকামী বৈজ্ঞানিক ও সমগ্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্ম্মকেন্দ্র হইবে, আজ আমরা সেই আশা মনে পোষণ করিতে পারি। এই পরিষদ যে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সর্ব্ববিধ সাহায্য লাভ করিবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়কেও তাহার কার্য্যে সাহায্য করিবেন, এ সম্ভাবনা আছে বলিয়াই আমরা মনে করি। যে কার্য্যে মনোযোগ দিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ তাহাতে আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারেন নাই, সে কায যে এই পরিষদের দ্বারা সহজে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা ইহার কার্য্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিব।

শিল্পোন্নয়নে খনিজসম্পদের স্থান

শ্রীরুক্মিণীকিশোর দত্তরায় ও শ্রীসুধাংশুরঞ্জন দত্ত

'বাঁচে থাকতে হবে' এটা সকল জাতিরই প্রাণধর্ম। জাগতিক বিষয়বৈভবই এর মূল উপজীব্য। কোনো জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতা, শক্তিসামর্থ্য ও প্রভাবপ্রতিপত্তি যে-সকল বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তার মধ্যে (১) রাষ্ট্রের বিস্তার বা আয়তন, (২) লোকবল ও (৩) ধনদৌলতের পরিমাণ প্রধান। আবার জাতির ধনদৌলত নির্ভর করে প্রধানতঃ তার শিল্প, কৃষি ও খনিজ-সম্পদ এবং বাণিজ্যের উপর। শিল্প-সমৃদ্ধির মূল উপাদান হ'ল (১) শক্তি ও (২) কাঁচা মাল। এ-দুটিই খনিজ সম্পদ থেকে উদ্ভূত। কাজেকাজেই আধুনিক যুগের সর্বপ্রকার বিস্তৃতির ও উন্নতির প্রধান ভিত্তি হ'ল খনিজ-সম্পদ। এই সম্পদের সদ্ব্যবহারে জাতির ধনদৌলত গড়ে ওঠে, আর এর অপব্যবহার বা নিঃশেষই জাতিকে ধ্বংস ও দারিদ্র্যের মুখে টেনে নিয়ে যায়।

পৃথিবীর মাত্র শতকরা একভাগ (১%) ভূমিতে এই খনিজ-সম্পদ ছড়িয়ে আছে—এটা এক পরম বিস্ময়! তা' হলে দুনিয়ার কোন দেশই তার প্রয়োজনানুপাতে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। আমাদের দেশের বেলায়ও এটা সত্য। এই রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়েই আমাদের দেশের খনিজ-সম্পদের অবস্থান এবং তার শিল্প-সম্ভাবনার বিষয় এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করতে প্রয়াস পাব।

সমগ্র বিষয়ের বিশদ আলোচনার প্রারম্ভে একটী সত্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কৃষি-উপযোগী জমিতে যেমন বারে বারেই ফসল হয়, খনিজ-সম্পদ-পূর্ণ মাটিতে কিন্তু দু'বার খনিজ উৎপন্ন হয় না। তুলে নিলেই ফুরিয়ে যায়! এ দিক্ দিয়ে দেখ্‌তে গেলে কোনো এক জায়গায় খনিজ-সম্পদের একবার অভাব হলে তার অভাব সেখানে হবে চিরন্তন। কিন্তু কৃষিজ-সম্পদের অভাব একান্তই সাময়িক এবং পূরণ-সাপেক্ষ। সুতরাং এদিক দিয়ে খনিজ-সম্পদ দেশের এক অমূল্য সম্পদ।

ভারতের খনিজ-সম্ভারকে আলোচনার সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়:—

১। যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত খনিজসমূহ: বক্‌সাইট্, ব্যারাইটিস্, কয়লা, ফেল্‌ড্‌স্পার, লৌহ-প্রস্তর, জিপ্‌সাম্, গ্র্যাফাইট্, লবণ, টাল্‌ক্, বেন্‌টোনাইট্, চূণাপাথর, টাংস্টেন্।

২। খুব অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত খনিজসমূহ: ক্রোমাইট্, কায়ানাইট্, সিলিম্যানাইট্, ম্যাংগানীজ্।

৩। কিঞ্চিদধিক পরিমাণে প্রাপ্ত খনিজসমূহ: বেরিলিয়ম্, কোলাম্বাইট্, ট্যান্‌টালাইট্, স্বর্ণ, ম্যাগনেসাইট্।

৪। দুনিয়ার উৎপাদন-ব্যাপারে বিশিষ্ট স্থান প্রাপ্ত খনিজসমূহ: অভ্র, মোনাজাইট্, টিটানিয়ম্।

৫। অপ্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত খনিজসমূহ: অ্যান্টিমনি, আর্সেনিক, বিস্‌মাথ্, সোহাগা, ক্যাডমিয়ম্, নিকেল, কোবাল্‌ট্, ফ্লুরাইট্, সীসা, পারদ, মোলিবডিনাইট্, দস্তা, রৌপ্য, পেট্রোলিয়ম (খনিজ তৈল)।

শিল্পবাণিজ্যের প্রয়োজনে উত্তোলিত প্রধান প্রধান খনিজ দ্রব্যসমূহের নিম্নলিখিত মূল্য-পরিমাণ হ'তে ভারতীয় বর্ত্তমান খনিজ-শিল্পের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে—

খনিজ	কোটি-টাকা (১৯৪৪)
কয়লা	২৭·২৪
লৌহ ও ইস্পাত	২৬·০৮
ম্যাংগানীজ	৪·৩০ (যুদ্ধপূর্ব)
স্বর্ণ	৩·৫৫
অভ্র	২·৭৩
লবণ	২·৪৬
নির্মাণোপকরণ	২·২৫
পেট্রোলিয়ম্	১·৭৮
তাম্র	০·৬৭
ইল্‌মেনাইট্	০·১৬
চীনামাটি	০·১৩
সোরা	০·১০
ফেরো-ম্যাংগানীজ	০·০৮
ক্রোমাইট্	০·০৭
কায়ানাইট্	০·০৭
ম্যাগনেসাইট্	০·০৫
ষ্টিএটাইট্	০·০৫
জিপ্‌সাম	০·০৩
মোনাজাইট্	০·০২
হীরক	০·০২
ফুলারস্ আর্থ্	০·০২
রুটাইল	০·০২

উল্লিখিত খনিজ-বস্তুগুলির প্রাপ্তি ও তাদের বর্তমান শিল্প-মূল্যের পরিমাণ অনুধাবন করলে এই সিদ্ধান্ত অসংগত নয় যে, ভারতবর্ষ খনিজ-সম্পদে খুব বেশী সমৃদ্ধ নয়। তবে একথাও ঠিক যে, তার খনিজ-সম্পদের তালিকায় নানা জাতীয় এমন দ্রব্যের সমাবেশ আছে যাদের যথাযথ উৎকর্ষসাধন করলে ভারতবর্ষ নিশ্চিতই শিল্প ব্যাপারে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠতে পারে।

ভারতের খনিজ সম্ভারকে শিল্প-প্রয়োগের দিক্ থেকে বিচার করে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে, যথা:—

(১) খনি-জাত জ্বালানী (কয়লা, পেট্রোল ইত্যাদি), (২) লৌহ ও লৌহের সহিত সংকর-ধাতু-উৎপাদক ধাতুসমূহ (৩) লৌহাতিরিক্ত শিল্পোপযোগী ধাতু, (৪) অন্যান্য প্রয়োজনীয় ধাতু-সমূহ।

খনিজ জ্বালানী

কয়লাকে বর্তমান যন্ত্রযুগের প্রাণ বলা যায়। কেন না আমাদের শিল্পায়নের সকল শক্তির উৎসই হ'ল এই কয়লা। কয়লা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খনিজ এবং তার উত্তোলন শিল্পকে খনিজ শিল্পের মধ্যে প্রধান বলা যায়। রেলওয়েতেই কয়লার সবচেয়ে বেশী খরচ। তারপরেই লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে। তা ছাড়া নানা জাতীয় শিল্পের কলে কারখানায় এর যথেষ্ট ব্যবহার আছে।

কয়লা।

ভারতে প্রাপ্ত কয়লার ৯৮% বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যভারত, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, মাদ্রাজ, প্রভৃতি জায়গা থেকে পাওয়া যায়। এ সমস্ত অঞ্চলের খনিসমূহ নিম্নতর গণ্ডোয়ানা স্তরভুক্ত। আসাম, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান এবং রাজপুতানা অঞ্চলের কয়লা-খনির সবগুলিই টারশিয়ারী (Tertiary) স্তরের অন্তর্ভুক্ত, ডাঃ সি. এস. ফক্‌সের হিসাবমত নিম্নতর গণ্ডোয়ানা স্তরের কয়লার পরিমাণ নাকি ৬,০০০ কোটি টন। যে স্থান হতে কয়লা তোলা সম্ভব এমন স্তরের কয়লার পরিমাণ ২,০০০ কোটি টনের বেশী হবে না—এ হিসাবও ডাঃ ফক্‌সেরই। ডাঃ ফক্‌স্ আরও বলেন যে, খুব ভাল জাতের কয়লার পরিমাণ নাকি ৫০০ কোটি টন হবে এবং তন্মধ্যে মাত্র ১৫০ কোটি টন 'কোকিং' কয়লা। এই 'কোকিং' কয়লা থেকে প্রাপ্ত 'কোক্'ই হ'ল লৌহ-নিষ্কাশন-শিল্পের প্রাণ। আমাদের 'কোকিং' কয়লার বেশীর ভাগ বাংলা-বিহারের ঝরিয়া, রাণীগঞ্জ, গিরিধি ও বোকারো প্রভৃতি জায়গায় পাওয়া যায়। এ সকল স্থানের মধ্যে ঝরিয়া হতেই পাওয়া যায় সর্বাধিক (৯০%)। ধাতু নিষ্কাশন-শিল্পের উপযোগী 'কোক্'-এর মৌলিক ধর্ম এবং তার গঠন-উপাদান সম্বন্ধে নানা মত নানা

দেশে প্রচলিত আছে। লৌহপ্রস্তুত কার্যে কোকের উপযোগিতা বিচার করে মার্কিন ও জার্মান দেশে নিম্নলিখিত মান অনুসরণ করা হয়—

	মার্কিন (শতকরা)	জার্মান (শতকরা)
ভস্ম	১২·০	৯·০
গন্ধক	১·৩০	১—১·৫
ফসফরাস	০·০২	——
আর্দ্রতা	৫·০	
সরন্ধ্রতা	৫০·০	

আমাদের কোক্-এ কি আছে, কি নাই দেখা যাক্—

ভস্ম	২২·০	শতকরা
গন্ধক	০·৫০	,,
ফসফরাস্	০·২০	,,
আর্দ্রতা	২·৫	,,
সরন্ধ্রতা	৩৬·৩৮	,,

কোকের বিষয়ে এত জোর দিয়ে এত কথা বলার কারণ, এই কোক্ই হ'ল নানাবিধ ধাতু-নিষ্কাশনী শিল্প এবং লৌহ ও ইস্পাত শিল্প গড়ে' তোলার অপরিহার্য উপাদান। তাই এর প্রস্তুত-প্রণালী ও শিল্পপ্রয়োগ সম্পর্কে আমাদের বিজ্ঞানী ও ধাতু-শিল্পবিদ্‌গণের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করছি। আমাদের দেশের কোক্-এ ভস্ম-পরিমাণের আধিক্য সত্ত্বেও অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায় যে, এই কোক্ ব্লাস্ট-ফারনেস্ এবং ফাউণ্ড্রির জন্য অনুপযোগী মোটেই নয়।

সকলেই জানেন কোক্-প্রস্তুতকালে অন্য নানাবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্যও উপজাত হয়, যথা—গ্যাস, আলকাতরা, অ্যামোনিয়ম্ সালফেট। শেষোক্ত দ্রব্যটী জমির উৎকৃষ্ট সার। আর আলকাতরার পাতনে আমরা বেন্‌জিন্, টলুইন্, জাইলিন, ফেনল, নেফথালিন্ প্রভৃতি নানা দ্রব্য পেয়ে থাকি। এসব কথা প্রায় সকলেই জানেন। আর এই বস্তুনিচয় হ'ল সমগ্র রঞ্জকশিল্প, নানাবিধ ঔষধপত্র এবং বিস্ফোরক নির্মাণের মৌলিক উপাদান। এখনকার 'অ্যাটমিক'যুগে আমাদের দেশে এসব শিল্পের নামগন্ধও নাই—এটা আমাদের পরম লজ্জা ও কলংকের বিষয়। এদিকে বিজ্ঞানী ও শিল্পপতিগণ অচিরেই অবহিত হবেন বলে আশা করি।

নীচে দুনিয়ার ও আমাদের দেশে উৎপন্ন কয়লার তুলনামূলক হিসাব দেওয়া গেল —

সাল	দুনিয়া	ভারত	শতকরা
১৯৩৭	১৫৪·০ কোটি টন	২·৫৪ কোটি টন	১·৬৫
১৯৩৮	১৪৬·৬ ,, ,,	২·৯০ ,, ,,	২·০০
১৯৪০	১৭২·৫ ,, ,,	৩·০০ ,, ,,	১·৭৪

এই তালিকা থেকে কয়লা ও কোক্ উৎপাদন সম্বন্ধে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্তব্যভার যে কী বিপুল আশা করি তা সহজবোধ্য হবে।

আমাদের দেশে পেট্রোলিয়ম বস্তুটীর একান্তই অভাব। আসাম এবং পাঞ্জাবে এই খনিজ-তৈল পাওয়া যায়। সম্প্রতি ত্রিপুরা রাজ্যেও এরূপ

পেট্রোলিয়ম

তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। আসাম ও পাঞ্জাবের তেলে আমাদের চাহিদার শতকরা ২০-২৫ ভাগ মাত্র মিটে। বাকী সবটাই বিদেশ থেকে আসে। পেট্রোলের সাধারণ ব্যবহার সুবিদিত। তা' ছাড়া তার পরিস্রুতাংশে নানাবিধ কাজ হয়। প্রসাধন-সামগ্রী, কীটঘ্ন মলম, ভার্নিশ, পরিশোধক প্রভৃতির প্রস্তুত-শিল্পে ঐসব পরিস্রুতাংশের বহুল ব্যবহার আছে। বিদেশের বিভিন্ন স্থান হ'তে আমদানীর পরিমাণ (আমাদের চাহিদার শতকরা ৮০ভাগ) নীচের তালিকায় দেখানো গেল —

রাশিয়া (শতকরা)	মার্কিন যুঃ রাঃ (শতকরা)	বোর্নিও (শতকরা)	পারস্য (শতকরা)	অন্যান্য (শতকরা)
১৩·৬	১৭·২	১৩·৭	৪২·৭	১২·৮

এই প্রসংগে আমাদের উৎপাদিত পেট্রোলের পরিমাণ দুনিয়ার উৎপাদনের তুলনায় কী অকিঞ্চিৎকর, তা নিম্নপ্রদত্ত তালিকা থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যাবে —

সাল	দুনিয়ার উৎপাদন	ভারতের উৎপাদন
১৯৩৭	২,০০ কোটি ব্যারেল	০·২৫ কোটি ব্যারেল
১৯৪০	২,১৫ ,, ,,	০·২২ ,, ,,

পেট্রোলিয়ম উৎপাদনকারী দেশসমূহের গড় উৎপাদনের হার নীচে দেওয়া গেল —

	দুনিয়ার উৎপাদন (শতকরা)
মার্কিন যুঃ রাঃ	৬২.৮
রাশিয়া	১০.০
ভেনিজুয়েলা	৮.৬
পারস্য	৩.৭

সংখ্যাগুলি অনুশীলন করে দেখলে আমাদের খনিজ তৈলের শোচনীয় অভাব সহজেই চোখে পড়ে। অথচ আজিকার শিল্পপ্রগতির যুগে ইহা অপরিহার্য। কাজেই আমাদিগকে অন্যপথে এর অভাবপূরণের চেষ্টা দেখতে হবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের সামনে তিনটী রাস্তা খোলা আছে—(১) বিজ্ঞানী বার্গেয়ুস আবিষ্কৃত কয়লার হাইড্রোজেনেশন, (২) ফিশার ও ট্রপ্‌শের মেথানল প্রস্তুত-প্রণালী এবং (৩) কম উত্তাপে কয়লার কার্বোনাইজেশন। এদিকে আমি জাতির শিল্পপতি ও বিজ্ঞানীবর্গের আশু দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

লৌহ ও লৌহের সহিত সংকর-ধাতু-উৎপাদক ধাতুসমূহ

প্রথমে লৌহ সম্বন্ধে বলে তৎপর ধাতু-সংকর-উৎপাদক ম্যাংগানীজ, নিকেল, ক্রোমিয়ম, মোলিবডিনম্‌ ও টাংস্টেন সম্বন্ধে বলব।

ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ লোহার খনি সিংভূম ও তার পাশাপাশি দেশীয় রাজ্যসমূহে অবস্থিত। বাস্তার, মহীশূর এবং মধ্যপ্রদেশেও লোহার খনি আছে। মোটামুটি হিসাবে সিংভূম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের লৌহ-প্রস্তরের পরিমাণ প্রায় ৮০০ কোটি টন। এ কারণেই এতদঞ্চলের জামশেদপুর ও বার্নপুরে এবং মহীশূরে লৌহ-ইস্পাত তৈরীর বড় বড় কারখানা স্থাপিত হয়েছে। সৌভাগ্যবশতঃ ভারতের লোহা ও কয়লার খনি পরস্পর খুবই নিকটবর্তী থাকায় পূর্ব-গোলার্ধে আমাদের চেয়ে কম খরচে কেহ পিগ্‌ আয়রন প্রস্তুত করতে পারে না। লৌহনিষ্কাশনে প্রয়োজনীয় খনিজের মধ্যে চূণাপাথর এবং কোক্‌ই প্রধান। আমাদের দেশে দুটীই প্রচুর পরিমাণে আছে। আমাদের কোক্‌-এ ভস্মাধিক্য হেতু ফ্লাক্‌স্‌ ও জ্বালানী অবশ্য কিছু বেশী খরচ হবে। ইস্পাত প্রস্তুতের প্রধান তিনটী অন্তরায় হ'ল অক্সিজেন, গন্ধক এবং ফস্‌ফরাস্‌। কিন্তু আমাদের লৌহপ্রস্তর পৃথিবীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলে কোকের উপাদানে এগুলির সামান্য আধিক্য থাকা সত্বেও আমাদের দেশে এই শিল্পটীর অগ্রগতি কোনক্রমেই ব্যাহত হচ্ছে না।

লৌহ

অধুনা লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের প্রসারে উপজাত শক্তি ও দ্রব্যাদির অপচয়নিবারণের প্রয়োজনীয়তা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এদিক্‌ দিয়ে টাটা কোম্পানীর উদ্যম প্রশংসনীয় এবং টাটার আর্থিক বনিয়াদ যে আজ এত শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে তারও কারণ ঐ সব নানা শাখায় বিভক্ত শিল্পমালার (উপজাত শক্তি ও দ্রব্যাদির সদ্ব্যবহার) সম্মিলিত লাভের টাকা। মূল লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সহিত যে সমস্ত শাখা-শিল্প আজ গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য আর্থিক সম্পর্ক বর্তমান।

নীচে প্রদত্ত হিসাব থেকে এটা স্পষ্টতঃ বুঝা যাবে যে, আধুনিক যুগের অতি-প্রয়োজনীয় এই শিল্পটীর সম্প্রসারণের বহু সুযোগ আমাদের রয়েছে।

ব্যবহৃত লৌহ প্রস্তর

সাল	দুনিয়া	ভারত	শতকরা
১৯৩৭	২১.১ কোটি টন	.২৮৮৬ কোটি টন	১.৩
১৯৪০	২০.৬ „ „	.৩৬০০ „ „	১.৭

(সংখ্যাগুলি মেট্রিক টন নির্দেশক)

নিষ্কাশিত লৌহ (পিগ্‌ আয়রন)

সাল	দুনিয়া	ভারত	শতকরা
১৯৩৭	১০.২৮৪৮ কোটি টন	.১৫৯৮ কোটি টন	১.৫
১৯৪০	১০.৪৬৬৭ " "	.২০১৬ " "	১.৯

(সংখ্যাগুলি লং টন নির্দেশক)

উক্ত শিল্পের মেরুদণ্ড বলা যায়। ম্যাংগানীজের

সামান্যতম সংমিশ্রণ ছাড়া এতটুকু ভাল ইস্পাতও প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। ইস্পাত-শিল্পে অক্সিজেন ও গন্ধক পরিশোধনে ম্যাংগানীজের কার্যকারিতা অতুলনীয়। লোহার সংগে মিশে ম্যাংগানীজ চমৎকার ধাতু (সংকর) উৎপাদন করে। খুব শক্ত এবং ক্ষয়প্রতিরোধক হয় সে সংকর লোহা।

ম্যাংগানীজ

দুনিয়ার উৎপন্ন ম্যাংগানীজের শতকরা ৯৫ ভাগ ধাতুশিল্পেই প্রযুক্ত হয়। যে সমস্ত ম্যাংগানীজ খনিজ-প্রস্তরে ম্যাংগানীজ-ডায়কসাইডের পরিমাণ শতকরা ৮৫-৯০, সেগুলি শুষ্ক ব্যাটারী নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া নানাবিধ রাসায়নিক শিল্পে এবং রং ও রঞ্জক প্রস্তুতশিল্পেও ম্যাংগানীজ-ডায়ক্সাইডের বহুবিধ ব্যবহার আছে।

ভারতে ম্যাংগানীজের খনি যথেষ্ট আছে। বহুবিস্তৃতঅঞ্চলব্যাপী এর প্রসার। মধ্যপ্রদেশের খনিই সবচেয়ে বড় খনি। ১৯৪০ সালের হিসাবে দেখা যায় ভারতীয় উৎপাদনের ৮০% এই অঞ্চল থেকেই সংগৃহীত হয়েছে। ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে শতকরা ১১ ভাগ, বোম্বাইয়ে ৬ ভাগ, বিহার-উড়িষ্যায় ২ ভাগ, মাদ্রাজ-মহীশূর ও অন্যান্য অঞ্চলে ১ ভাগ উৎপন্ন হয়। এ উৎপাদনের ৯০% বিদেশে রপ্তানী হয়ে যায়।

দুনিয়ার হাটে ম্যাংগানীজ-ইস্পাতের চাহিদার উপরই আমাদের এই (রপ্তানী) বাণিজ্যের সমৃদ্ধি নির্ভর করে। আমরা দুনিয়ার মোট উৎপাদনের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ সরবরাহ করি। এ বিষয়ে সোভিয়েটের পরেই আমাদের স্থান, যদিও সোভিয়েট প্রায় অর্ধেক উৎপন্ন করে।

সাল	দুনিয়া	ভারত	শতকরা
১৯৩৭	·৬০ কোটি টন	·১০৫১ কোটি টন	১৭·৫
১৯৩৮	·৫৭ „ „	·০৯৬৭ „ „	১৬·৯
১৯৪০	·৬০ „ „	·১২০০ „ „	২০·০

(সংখ্যাগুলি মেট্রিক টন নির্দেশক)

ক্রোমিয়ম, নিকেল, মোলিবডিনম, ভেনাডিয়ম্ ও টাংষ্টেন

ক্রোমিয়ম ও টাংস্টেন ধাতু দুটী আমাদের দেশে মোটামুটি প্রভূত পরিমাণেই পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে বর্ণিত প্রত্যেকটি ধাতু ইস্পাতের সংগে মিশে চমৎকার সংকর ধাতু তৈরী করে এবং মিশ্র ধাতুগুলি বিভিন্ন গুণ-বিশিষ্ট হয়। ক্রোমিয়ম এবং নিকেল মিশ্রিত ইস্পাত খুব শক্ত, মজবুত এবং কঠিন হয়। ক্রোমিয়ম-ইস্পাতে মরচে ধরে না—বাজারে এরই নাম "stainless steel।" নিকেল-ইস্পাতের রাসায়নিক-প্রক্রিয়া-রোধক শক্তি খুব বেশী। ক্রোমিয়ম, ভেনাডিয়ম ও নিকেলের সমবায়ে মোলিবডিনম চমৎকার সংকর ধাতু তৈরী করে। এই প্রকার সংকর ধাতুর তাপসহন শক্তি এবং স্থিতিস্থাপকতা অধিক। টাংস্টেন-মিশ্রিত ইস্পাত ধাতু-কর্তন শিল্পে যুগান্তর এনেছে। ব্লেড, ক্ষুর, কামানের গোলা, লৌহবর্ম ইত্যাদি প্রস্তুত কার্যে টাংস্টেন-ইস্পাত আজ অপরিহার্য।

নিকেল-ইস্পাত দিয়ে লোকোমোটিভ, টারবাইন ব্লেড্স্ প্রভৃতি নানাবিধ কলকব্জা প্রস্তুত হয়। নিকেল মুদ্রানির্মাণেও লাগে। ক্রোমিয়ম ও মোলিবডিনম-ইস্পাত দিয়ে ক্ষিপ্রগতি যন্ত্রপাতি, মোটর-ইঞ্জিনের নানা অংশ, লৌহবর্ম, গোলা ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। ভেনাডিয়ম-ইস্পাতের একটী গুণ হচ্ছে ধাতুর আকস্মিক আঘাত-সহিষ্ণুতার শক্তি বাড়ানো। মোটকথা, উপরোক্ত ধাতুগুলি ইস্পাতের সহিত মিশে আধুনিক শিল্প-যুগের অনেক প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুত করে। সুতরাং ঐগুলির যাতে সদ্ব্যবহার হয়, সেদিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।

ক্রোমিয়মের সবচেয়ে ভাল খনি বেলুচিস্তানে। বিহার ও উড়িষ্যা সংলগ্ন দেশীয় রাজ্যগুলিতে এবং মাদ্রাজে ও মহীশূরেও এর খনি আছে। ধাতু-শিল্পের পরে এর অন্যতর ব্যবহার তাপসহ ইটনির্মাণে এবং রাসায়নিক শিল্পে।

ক্রোমিয়ম

সোডিয়ম ও পটাসিয়ম ক্রোমেটের ব্যবহার আছে নানা শিল্পে—রং, রঞ্জক এবং ক্রোমিয়াম-ফটকিরি তৈরীর কার্যে।

লোহা, তামা এবং সীসা প্রস্তুতের চুল্লীর ভিতরকার আস্তরণের জন্য ক্রোমিয়ম-প্রস্তরের প্রয়োগ অপরিহার্য। এই ক্রোমাইটের অধিকাংশই পূর্বে বিদেশে রপ্তানী হ'ত। তবে বিগত মহাযুদ্ধে আমাদের দেশে কতিপয় বাইক্রোমেটের কারখানা স্থাপিত হওয়ায় রপ্তানী অনেক কমেছে। এই তরুণ শিল্পটীর যথোপযুক্ত সংরক্ষণ ও পরিবর্ধন জাতীয় কর্তব্য। নীচে দুনিয়ার ও আমাদের উৎপাদনের তুলনা করা গেল—

ক্রোমাইট

সাল	দুনিয়া	ভারত	শতকরা
১৯৩৬	'১০০৮ কোটি টন	'০০৪৯ কোটি টন	৪'৯
১৯৩৭	'১২৮০ " "	'০০৬২ " "	৪'৮

(সংখ্যাগুলি মেট্রিক টন নির্দেশক)

নিকেল

নিকেল আমাদের নাই বল্‌লেই চলে। সামান্য যা' পাওয়া যায়, তা ঘাটশিলার তাম্র-প্রস্তরের (কপার পিরাইটস্) সহিত সংমিশ্রিত অবস্থায়। সেখানকার তামা উৎপাদনকারী ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনই সেটুকুর নিষ্কাশন করে থাকে। দুনিয়ার সকল দেশ এই ধাতুটীর জন্য কানাডার মুখাপেক্ষী। শতকরা ৮৫ ভাগ ঐদেশেই উৎপন্ন হয়।

মোলিবডিনম

মলিবডিনম ধাতুটীও আমাদের প্রায় নাই বল্‌লেই হয়। হাজারিবাগ, মাদ্রাজ ও রাজপুতানায় এর সন্ধান মিলেছে। তবে ধাতুর উত্তোলন ও নিষ্কাশন সম্ভবপর, এমন খনি নেই। উত্তর আমেরিকার একমাত্র কলোরডো প্রদেশেই দুনিয়ার সমগ্র মোলিবডিনামের ৬০% উৎপন্ন হয়।

যোধপুরের দেগানায় এই ধাতুর খনি আছে। সম্প্রতি বাঁকুড়ার ছেঁদা-পাথরেও এর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে। বাঁকুড়ার খনিও ভাল হবে মনে হয়। ১৯৪৪ সালে ৩০ টন মাল দেগানার খনি থেকে উত্তোলিত হয়েছে। এই ধাতুটী সম্পর্কে আমাদের কর্তব্য এখনও অসম্পূর্ণ। আশা করা যায়, বর্তমানে আমরা এবিষয়ে সম্যক্ অবহিত হব।

ভেনেডিয়ম

ভেনাডিয়ম অথবা টিটানিয়ম যুক্ত ইস্পাতের দানা দেখতে মোটামুটি একরকম। গন্ধকাম্ল প্রস্তুতের কার্যে এই ধাতু সংমিশ্রণ ত্বরান্বিত করে অর্থাৎ ঘটকের কাজ করে। পৃথিবীর বৃহত্তম ভেনাডিয়মের খনি দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশে অবস্থিত। আমাদের দেশে ধলভূম মহকুমার দক্ষিণাঞ্চল এবং তৎসংলগ্ন ময়ূরভঞ্জে টিটানিয়ম-লৌহমিশ্রিত ধাতু-প্রস্তরে ভেনাডিয়মের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেছে। উক্ত খনিজের পরিমাণ ২'৫ কোটি টন হবে এবং তাতে ভেনাডিয়ম-পেণ্টক্সাইডের পরিমাণ আছে মাত্র ০'৫৩-১'৭৮ ভাগ। ভবিষ্যতে যদি টিটানিয়মের নিষ্কাশন কার্য শুরু হয়, তা' হলে ঐ সংগে উক্ত ভেনাডিয়মের কাজও শুরু হতে পারে। এই ভেনাডিয়মটুকু যাতে অপচয়িত না হয়, তজ্জন্য আমাদের ধাতুশিল্পবিদ্ ও রসায়নবিদের দৃষ্টি এই দিকে নিবদ্ধ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

লৌহভিন্ন শিল্পোপযোগী অন্যান্য ধাতুসমূহ

তাম্র

ধাতুর মধ্যে তামার বিদ্যুৎ-পরিবাহী ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য। এই জন্য বিদ্যুৎশিল্পে এর বহুল ব্যবহার দেখা যায়। তামার সহিত টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ এবং দস্তা মিশিয়ে পিতল করা হয়। আমাদের দেশে নিত্য গৃহকাজের জন্য তামা-পিতল-কাঁসার নানাবিধ বাসন-কোসনের ব্যবহার বহুকালাবধি প্রচলিত।

ভারতের তাম্র-খনির মধ্যে ঘাটশিলার খনিটিই বড়। তা ছাড়া বিহারের অন্যত্র, ক্ষেত্রী, জয়পুর এবং সিকিমেও ছোট ছোট তাম্র খনি আছে। মৌভাণ্ডারে কপার কর্পোরেশন যা' তামা প্রস্তুত করে, তার সবটাই বিদেশে চলে যায়। এসম্বন্ধে আমাদের সতর্ক হতে

হবে এবং স্বদেশে এর ব্যবহার ত্বরান্বিত করে তুলতে হবে।

ভারতে এই ধাতুসমষ্টির প্রত্যেকটীরই নিরতিশয় অভাব। একমাত্র উদয়পুরের জাওয়ারে বহুদিনের পরিত্যক্ত খনিতে পুনরায় কাজ করে সীসা ও দস্তা নিষ্কাশন করা যায় কিনা তারই পরীক্ষা চলছে।

সীসা, দস্তা, অ্যান্টিমনি, আর্সেনিক, বিস্‌মাথ ও টিন

অ্যান্টিমনি, আর্সেনিক ও বিসমাথ প্রায় সমধর্মী ধাতু। এদের সবচেয়ে বেশী প্রয়োগ নানাবিধ ভেষজ-শিল্পে। ডাঃ ব্রহ্মচারীর কালাজ্বরের অমোঘ ঔষধ 'ইউরিয়া ষ্টিবামাইন' ঔষধ—জগতে অতি সুপরিচিত। উহা অ্যান্টিমনি-ঘটিত ঔষধ। অ্যান্টিমনি অক্‌সাইড খুব ভাল ও দামী শাদা রং। একমাত্র চিত্রালে আর্সেনিকের খনি ছাড়া এ তিনটী ধাতুর আর কোন খনি আমাদের দেশে নাই। সীসা ও দস্তার অক্‌সাইড্, কার্বনেট প্রভৃতি রং-প্রস্তুতশিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান। টিন আর দস্তা ঝালাইয়ের একমাত্র উপাদান বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। এই প্রয়োজনীয় ধাতুগুলির জন্য ভারতকে চিরকালই বিদেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাক্‌তে হবে।

প্ল্যাটিনমের কোন খনি আমাদের দেশে পাওয়া যায় নাই। ভারতের সর্বপ্রধান স্বর্ণখনি মহীশূরের কোলারে অবস্থিত। সমগ্র দুনিয়ায় বার্ষিক ৩০-৩৫ লক্ষ আউন্স স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। তার মধ্যে আমাদের দেশে হয় ০'৩-০'৪ লক্ষ আউন্স, দুনিয়ার উৎপাদনের শতাংশ মাত্র। পৃথিবীর উৎপন্ন স্বর্ণের অর্ধেকই আসে আফ্রিকা থেকে। আমরা আমাদের স্বর্ণের প্রায় সবটাই পাই মহীশূর রাজ্যের কোলার স্বর্ণখনি থেকে। বিহার ও হায়দ্রাবাদেও সামান্য সোনা পাওয়া যায়। রৌপ্যও যৎসামান্য আমাদের দেশে হয়; কোলারের খনিতে সোনার সঙ্গেই যেটুকু পাওয়া যায়,—বার্ষিক উৎপাদন ২০,০০০ আউন্স।

স্বর্ণ, রৌপ্য, প্ল্যাটিনম

এলুমিনিয়মের ব্যবহার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বিশেষ করে বিমাননির্মান শিল্পে এর প্রয়োগ ত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া বিদ্যুৎশিল্পে, মোটর-ইঞ্জিনে, বাসন-কোসনে, কৃত্রিম পোষাক তৈরীতে, রাসায়নিক শিল্পে সর্বত্র এর ব্যবহার দ্রুত তালে বাড়ছে।

এলুমিনিয়ম

বক্‌সাইট-ই এলুমিনিয়মের সর্বাপেক্ষা সাধারণ খনিজ প্রস্তর। কেরোসিন পরিশোধনে এবং ঘর্ষণী নির্মানে এর ব্যবহার অতি সুপরিচিত। রাঁচীতে, জব্বলপুরে, বালাঘাটে, খয়রা, কোলাবা, কোলাপুর, বেলগাঁও ও স্যালেম জিলার সাভেরয় পাহাড় ইত্যাদিতে যথেষ্ট এবং মহীশূরে অল্প পরিমাণে বক্‌সাইট্ পাওয়া গেছে। এই ধাতু-প্রস্তরে ৮-১০% টিটানিয়মও আছে। উহারও নিষ্কাশন আবশ্যক। বক্‌সাইটে যদি এলুমিনিয়ম অক্‌সাইডের পরিমাণ ন্যূনপক্ষে ৫০% হয়, তাহা হইলে উহা কি রাসায়নিক কার্যে, কি এলুমিনিয়ম ধাতু নিষ্কাশনে, ব্যবহার করা চলে। কাজে লাগাবার আগে বক্‌সাইট্‌কে সিলিকা, লোহা ও টিটানিয়ম-এর সংমিশ্রণ থেকে মুক্ত করতে হয়। আমাদের দেশে এলুমিনিয়ম তৈরীর মাত্র দুটা কারখানা আছে। একটী ত্রিবাংকুরে, অন্যটী আসানসোলে।

এদিকে উদ্যমশীল ও অবহিত হওয়ার আমাদের যথেষ্ট অবকাশ আছে। দেশে যখন এই ধাতু শিল্পটী গড়ে ওঠার বিপুল সম্ভাবনা বিদ্যমান, তখন যান-শিল্প গঠনের অন্যতম উপাদান এই এলুমিনিয়ম প্রস্তুতের ব্যাপারে আমাদের জাতীয় সরকার নিশ্চয়ই কোন শৈথিল্য প্রকাশ করবেন না।

এই তিনটি খনিজই আমাদের দেশে প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। দুনিয়ার উৎপাদনের ক্ষেত্রে এরা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মাস্কোভাইট অভ্র ও অভ্রাংশ উৎপাদনে আমাদের স্থান পৃথিবীর সর্বাগ্রে। বিশ্বের মোট উৎপাদনের প্রায় ৮০% আমাদের দেশে হয়। বিদ্যুৎ শিল্পে অভ্র এক অমূল্য উপাদান। বেতারে, বিমান-ইঞ্জিনীয়ারিং ও মোটর যান শিল্পে অভ্রের ব্যবহার অপরিহার্য। ভারতে

অভ্র, মোনাজাইট ও টিটানিয়ম

বিহারের অভ্রখনিই সর্ববৃহৎ। পশ্চিমে গয়া জিলা থেকে শুরু করে হাজারীবাগ, মুংগেরের ভিতর দিয়ে পূর্বে ভাগলপুর জিলা পর্যন্ত ষোল মাইল প্রশস্ত এবং ৯০ মাইল দীর্ঘ প্রকাণ্ড অভ্র-বেষ্টনী বিদ্যমান। তা ছাড়া মাদ্রাজের নেলোর, মহীশূরে এবং রাজপুতানার বহু স্থানে অভ্র-খনি আছে।

দুনিয়ার সকল হাটে অভ্রের চাহিদা যখন প্রায় ভারতীয় মালের উপরই নির্ভর ক'রে আছে, তখন এই শিল্পটাকে বৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক ভিত্তিতে একান্ত সুদৃঢ় করে গড়ে তোলা আমাদের কর্তব্য নয় কি?

টিটানিয়ম

টিটানিয়ম-সংপৃক্ত নানাবিধ খনিজসম্ভারে ভারতের মাটি একান্ত সমৃদ্ধ। বহুবিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপী এর প্রসার। প্রধানতঃ রুটাইল, ইল্‌মেনাইট্, টিটানিয়মঘটিত ম্যাগনেটাইট্, বক্‌সাইট এবং মোনাজাইট বালুরাশি হ'তে এ ধাতু পাওয়া যায়। দুনিয়ার প্রয়োজনের মোট ইল্‌মেনাইটের তিন-চতুর্থাংশের প্রাপ্তিস্থল ত্রিবাংকুর সৈকতের বালুরাশি। ইস্পাত দিয়ে ঝালাইয়ের কাজে, লোহার সহিত সংকর ধাতু এবং উঁচুদরের শ্বেত রঞ্জক প্রস্তুত করণে টিটানিয়মের বহুল ব্যবহার হয়।

মোনাজাইট

ত্রিবাংকুরে প্রাপ্ত অপর্যাপ্ত মোনাজাইট-বালু থেকে থোরিয়ম নামক একটি অতিশয় মূল্যবান এবং বিশেষ প্রয়োজনীয় ধাতু পাওয়া যায়। মনে হয়, ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে আণবিক শক্তির উৎস হবে এই থোরিয়ম এবং সেজন্যই দুনিয়ার বিজ্ঞানী ও রাজনীতিকদের প্রলুব্ধ দৃষ্টি এই ধাতুটীর উপর নিবদ্ধ হচ্ছে। প্রকৃত পক্ষে ইউরেনিয়ম ধাতুই আণবিক শক্তির সহজ উৎস। তবে ইউরেনিয়ম পাওয়া যায় কম; আবার যা পাওয়া যায়, তা'ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। এ-কারণ বিজ্ঞানীদের মন আজ ইউরেনিয়মের অন্য উৎস সন্ধানে ব্যাপৃত। সুখের বিষয় অনায়াসলভ্য এই থোরিয়ম ধাতুকে আজ ইউরেনিয়মের এক নূতন প্রতিকল্পে রূপান্তরিত করা সম্ভবপর হয়েছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বের রাজনীতিতে ভারতের এই থোরিয়ম সম্পদ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করবে সন্দেহ নাই।

ম্যাগনেসাইট

ম্যাগনেসাইট্ খনিজটীও আমাদের দেশে প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। মাদ্রাজে সালেম জিলার খড়ি-পাহাড়ে ও অন্যান্য স্থানে, মহীশূরের হাসানে, কার্নুলের মুদ্দাবরণে, ইদার-রাজ্যের দেব-মোরীতে এবং রাজপুতানার ডুংগারপুর রাজ্যে এর খনি আছে। তন্মধ্যে সালেমেই সর্বাধিক উৎপন্ন হয়।

সালেমের ম্যাগনেসাইট্ সিণ্ডিকেটের বর্তমান বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৪০,০০০ টন। তাপসহ ইট-নির্মাণে সোরেল সিমেণ্ট তৈরীতে এবং মূল ম্যাগনেসিয়ম-ধাতু নিষ্কাশনেই এই খনিজের অন্যতম ব্যবহার। অধুনা সোরেল সিমেণ্টের নানাবিধ শিল্প-সম্ভারেও ইহার প্রভূত ব্যবহার দেখা যায়। বিমান-ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পে ম্যাগনেসিয়মের ব্যবহার আজ ম্যাগনেসিয়ম-ধাতু-নিষ্কাশনী-শিল্পের এক নূতন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করেছে। ম্যাগনেসাইট থেকে এই ধাতু তৈরী হচ্ছে ও হবে।

জিপ্‌সম

পাঞ্জাব, রাজপুতানা, ত্রিচিনাপল্লী, যোধপুর ও বিকানীরে জিপ্‌সম অপর্যাপ্ত পরিমাণে মিলে। নানাবিধ কৃত্রিম প্রস্তরাদি, প্ল্যাস্টার অব্ প্যারিস, রং, রঞ্জক এবং কাগজ প্রস্তুত শিল্পে এর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। দুনিয়ার বার্ষিক উৎপন্ন জিপ্‌সমের পরিমাণ প্রায় কোটি টন হবে। আমাদের উৎপাদন মাত্র ৮০,০০০ টন। অথচ এই খনিজের উৎপাদন বাড়ানো এবং তৎ-সাহায্যে নব নব শিল্পসম্ভার গড়ে তোলার অপূর্ব সম্ভাবনা রয়েছে। বিগত যুদ্ধের সময় তৎকালীন ভারত সরকার ধানবাদের নিকট সির্নাধ্রি নামক স্থানে জিপ্‌সম থেকে অ্যামোনিয়ম-সালফেট তৈরীর এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। সুখের বিষয় তাঁদের অসমাপ্ত কার্য সফল ও সমাপ্ত করবার জন্য বর্তমান জাতীয় সরকারও আত্মনিয়োগ

করেছেন। এই অ্যামোনিয়ম সলফেট উৎকৃষ্ট সার; সুতরাং আমাদের কৃষি উন্নয়নের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান।

শেষোক্ত খনিজটী আসামে পাওয়া গেছে বটে, তবে যে অঞ্চলে তার অবস্থান সে নাকি একান্তই অনধিগম্য। এই দুটী খনিজেরই অন্যতম ব্যবহার তাপসহ ইট প্রস্তুতের কাজে। কাচ প্রস্তুত চুল্লীতে ঐ ধরণের ইট বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয়। দুটীই এলুমিনিয়ম সিলিকেট ঘটিত খনিজ। পৃথিবীর বৃহত্তম কায়া-নাইট খনির একটী আমাদের দেশের খারসোয়ান রাজ্যের অন্তর্গত। ঐ রাজ্যের লাপ্‌সা-বুরু নামক স্থানের বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ১২,৫০০ টন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তার সবটাই রপ্তানী হয়ে যায় বিদেশে। কায়ানাইট দিয়ে তাপসহ ইট প্রস্তুতের শিল্প আমাদের গড়ে তোলা উচিত।

কায়ানাইট্‌ ও সিলিমেনাইট

ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই এই বস্তুটী পাওয়া যায়। চুনের খাঁড়িও তাই ভারতের সর্বত্রই বিদ্যমান। চুনকে আমাদের গৃহ, সেতু দালান-কোঠা নির্মানের অন্যতম উপ-করণ বলা যায়। ধাতু-নিষ্কাশনে এই চুনাপাথর ফ্লাক্‌স্‌-এর কাজ করে। বিশুদ্ধ চুনাপাথর ছাড়া ক্যালসিয়ম কারবাইড্‌, ব্লিচিং পাউডার এবং কাচ তৈরী সম্ভব নয়।

চুনাপাথর

গন্ধক ভারতে বিরল; সামান্য পাওয়া গেছে বেলুচিস্তানে। তবে কোক্‌চুল্লীজাত গ্যাস এবং তাম্র উৎপাদনে উপজাত সালফার ডায়ক্‌সাইড্‌ থেকে আমাদের প্রয়োজন মত গন্ধক মিলতে পারে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের কর্তব্য অপরিসীম। এই গন্ধক অপচয়িত হতে দিলে যে আমাদের প্রভূত আর্থিক ক্ষতির কারণ ঘটে একথা বলাই বাহুল্য। বারান্তরে এ বিষয়ের বিশদ আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো।

গন্ধক

উপসংহার

এই আমাদের দেশের খনিজ সম্পদের মোটামুটি চিত্র। প্রবন্ধটীতে সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে বিজ্ঞান-সম্মত ধারায় আমাদের খনিজ সম্পদের হিসাব-নিকাশ করতে প্রয়াস পেয়েছি। কোথায় কী সম্ভাবনা আছে, কোথায় আছে দুর্বলতা তা'ও দেখাতে চেষ্টা করেছি।

আগেও বলেছি, আবারও বল্‌ছি আমরা অবহিত হলে এ সম্পদের যথাযথ উৎকর্ষ সাধিত হ'বে ও ভারতের শিল্পশক্তি আত্মনির্ভরশীল হ'বে। এ বিষয়ে সরকার, শিল্পপতি ও বিজ্ঞানী-বর্গের মিলিত কর্মধারার ত্রিবেণী-সংগম হলেই না দেশের চল্লিশ কোটি নরনারীর সমৃদ্ধি ও কল্যাণ!

প্রাণিজগতের প্রাচীন দলিল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

মানুষের মন চিরদিনই কৌতূহলী। যেখানেই রহস্যের ঘন যবনিকা তার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেছে সেখানেই সে কৌতূহলী হয়ে উঠেছে আরও বেশী। তাই বার বার প্রচেষ্টা চলেছে সেই যবনিকাকে ছিন্ন করবার—তা সে যত দুর্ভেদ্যই হোক না কেন। যেখানেই অন্ধকারের রাজত্ব সেইখানেই মানুষের জ্ঞানস্পৃহা কাজ করে অত্যন্ত প্রবলভাবে।

জীবজগতের অতীত ইতিহাস আজও মহাকালের ঘন তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে নিহিত। তার সম্যক পরিচয় ও যথার্থ রূপ জানবার প্রবৃত্তি নিয়ে মানুষ যতবার পিছন ফিরে তাকিয়েছে ততবারই চোখে পড়েছে জমাটবাঁধা অন্ধকার। তাই একদিন বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে সেই রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করবার প্রবৃত্তি মানুষের মনে জাগলো। প্রথম সেইদিন মানুষ সত্যকারের প্রশ্ন করলো—"আমি কে?" "এলাম কোথা থেকে?"

দার্শনিকেরা বহু প্রাচীনকাল থেকে এ তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কোনো মীমাংসাই ঠিকমত গ্রাহ্য হোলো না। না হবার কারণ, যেসব হেতু অথবা অবস্থা তাঁরা মীমাংসার সহায়ক বলে ধরে নিয়েছিলেন তাদের সবকটাই ছিল কাল্পনিক। ঠিক মানুষের মনের মত জবাব কোনো দার্শনিকই দিতে সক্ষম হননি। তাই এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অথবা যুক্তিপূর্ণ মীমাংসা বহুদিন ধরে অজ্ঞাতই রয়ে গিয়েছিল।

এমনি করে দলের পর দল একই প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামিয়েছে—অতীতের রুদ্ধ দরজায় করেছে মাথা কোটাকুটি—কিন্তু রহস্যভেদের কোনো পথই তাদের চোখের সম্মুখে পরিস্ফুট হয়নি। যে প্রশ্ন এতকাল ধরে মানুষের মনকে আন্দোলিত করেছে—যার জন্য হাজার হাজার কাল্পনিক ও অলৌকিক মতবাদ আপামর জনসাধারণের চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছে, সেই প্রশ্নের মীমাংসার পথ মানুষ সেইদিনই পেলো যেদিন সে জানতে পারলো 'ফসিল' কি। এই ফসিলের কঠিন কাঠামোর মধ্যে বৈজ্ঞানিকেরা সন্ধান পেলেন এক ক্ষীণ আলোক-রশ্মির। ফসিল যেদিন আবিষ্কৃত হলো সেইদিন মানুষের চোখের সম্মুখে হাজার হাজার বছরের রুদ্ধ দরজা গেল খুলে, জীবন্ত হয়ে উঠলো কবরায়িত ইতিহাসের অসংখ্য পাতা। জীবজগৎ সৃষ্ট হওয়ার পর থেকে পৃথিবীর যে কোষ্ঠী দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর পাক খেয়ে গুটিয়ে গেছে তা আবার গেল খুলে। বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন যে মানুষ পৃথিবীতে একটা আকস্মিক জীব নয়—এর অভ্যুদয় কোনো এক বিশেষ দিনে হয়নি—উপরন্তু এর আগমনের পিছনে আছে এক বিরাট অভিব্যক্তির ধারা—যে ধারা আবার জড়িত হয়ে আছে তার থেকে অতি হীন স্তরের জীবজন্তুর সঙ্গে।

মানুষ যে হঠাৎ 'ফসিল' আবিষ্কার করেছে তা নয়, প্রকৃতির বিভিন্ন জায়গায় এগুলি যেখানে সেখানে ছড়ানো। মানবসভ্যতার আদিম প্রভাত থেকেই এগুলি মানুষের মনে বিস্ময় জাগিয়েছে বড় কম নয়—আর, যেখানেই হয় বিস্ময়ের উদ্ভব, সেইখানেই হয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন। তখনকার দিনে জ্ঞানী দার্শনিকেরা এদের নানারকমে ব্যাখ্যা করেছিলেন। অবশ্য সে সব ব্যাখ্যা আজকাল শুধু যে হাস্যরসেরই অবতারণা করবে তাই নয়, উপরন্তু

প্রাচীনকালের দার্শনিকদের সুযুক্তিপূর্ণ মানসিকতার একটা প্রচণ্ড অভাবও জ্ঞাপন করবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আরিস্টট্‌ল (Aristotle) এবং তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন প্রাচীন পণ্ডিত বলেন যে এগুলি হলো অ-জৈব পদার্থের জৈবরূপ পরিগ্রহ করবার একটা নিস্ফল প্রচেষ্টা। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এম্পিডক্লেস্ (Empedocles) একবার সিসিলির একটা জায়গায় জলহস্তীর প্রস্তরীভূত কঙ্কালের রূপ দেখে ধারণা করেন যে সেখানে নিশ্চয়ই স্বর্গের দেবতাদের সঙ্গে টাইটান দৈত্যদের যুদ্ধ হয়েছিল। হেনরিয়ন (Henrion) নামে আর একজন দার্শনিক ১৭১৮ খ্রীস্টাব্দে মত প্রকাশ করেন যে ঈশ্বর গাছপালা ও জীবজন্তু সৃষ্টি করবার পূর্ব্বে নিজের হাতে কতকগুলি ছাঁচ তৈরী করেন—'ফসিল' হোলো এই সব ছাঁচ। তিনি আবার দৃঢ়তার সঙ্গে এও বলেছিলেন যে আদিপুরুষ আদমের উচ্চতা ছিল ১২৩ ফিট ৯ ইঞ্চি। কিন্তু কোথা থেকে ও কেমন করে তিনি এই মাপটি সংগ্রহ করেছিলেন সেকথা সযত্নে পরিহার করায় বৈজ্ঞানিকেরা তাঁর মতবাদকে আদৌ গ্রাহ্য করেন নি। অবশেষে ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উইলিয়ম বাকল্যাণ্ড তাঁর Observation on Organic Remains attesting the Action of Universal Deluge নামক প্রবন্ধে 'ফসিল' সম্বন্ধে কতকগুলি সত্যকারের জ্ঞানগর্ভ তথ্যের সন্ধান দেন। 'ফসিল' আবিষ্কার সম্বন্ধে লায়েল (Lyell) এর কথা সত্যই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "ফসিল'গুলো যে এক সময়ের জীবন্ত প্রাণীদেরই প্রকৃত দেহাবশেষ একথা প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের মাথায় ঢোকাতেই দেড়শ বছর কেটে গেছে—আর এই দেহাবশেষগুলো যে নোয়ার বন্যায় বিধ্বস্ত প্রাণীদের দেহ নয় সে বিষয়ে প্রত্যয় জন্মাতে লেগেছে আরও দেড়শ বছর।

কিন্তু আজকালকার বৈজ্ঞানিকেরা ফসিলের কদর বুঝেছেন। তাঁরা বেশ ভালভাবেই জানতে পেরেছেন যে ফসিলই হোলো জীবজগতের ইতিহাসকে যুক্তিপূর্ণ তথ্য দিয়ে প্রমাণ করবার একমাত্র দলিল দস্তাবেজ। তাই যেখানে যত ফসিল মানুষের চোখে পড়েছে শুধু যে সেইগুলোকেই সংগ্রহ করে যাদুঘরে রাখবার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে তা নয়, উপরন্তু কোনো বিশেষ প্রাণীর অভ্যুদয় ও জীবনধারা খুঁজে বার করবার জন্য মাটির বুকে চালান হচ্ছে খননের কাজ।

এখন দেখা যাক 'ফসিল' শব্দটার আসল অর্থ কি। 'ফসিল' ইংরেজী শব্দ। এসেছে *fossilis* এই ল্যাটিন শব্দটি থেকে, যার উৎপত্তিমূল হোল *fodere* এই কথাটি, এর ইংরেজী অর্থ হচ্ছে to dig up অর্থাৎ খুঁড়ে বার করা। শব্দগত অর্থ গ্রহণ করলে দেখা যায় যে 'ফসিল' হোলো সেই সব অতি পুরাতন পদার্থ যেগুলি বার করা হয়েছে মাটি খুঁড়ে। কিন্তু এই কথা বললেই ফসিলের সম্বন্ধে সব-কিছু বলা হয় না। 'ফসিল' বলতে সাধারণ মানুষ যা জানে তা হোলো গিয়ে অতি পুরাতন প্রাণীদের কঙ্কাল, যেগুলি এতকাল ছিল মাটির গভীর স্তরে প্রোথিত। তাই বার্নর্ড এই 'ফসিল' সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ক'রে লিখেছেন যে এগুলি হোলো মাটির বুকে রক্ষিত লক্ষ লক্ষ বৎসর আগেকার জীবের দেহাবশেষ। আর এদের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের পিবডি মিউজিয়মের অধ্যাপক ডঃ লাল্-এর (Dr. Lull) কথা সবচেয়ে মনোজ্ঞ। ডঃ লাল সারা জীবন ধরে 'ফসিল' নিয়ে গবেষণা ক'রে বহু কঠিন প্রস্তরের মধ্যে জীবের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি বলেন যে আমরা যে বেঁচে আছি এই সত্যের বিরুদ্ধে যেমন কারো মনে কোনো সন্দেহই উঠতে পারে না, তেমনি ফসিলের তথ্য দ্বারা যে প্রাণীর লুপ্ত জীবন-ইতিহাস শেষ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই কোনো মানুষের মনে আসা উচিত নয়। যা হোক জীবের দেহাবশেষ—

তা উদ্ভিদেরই হোক বা কোনো প্রাণীরই হোক,—যা প্রস্তরীভূত হয়ে যদি ঠিক পূর্ব্বেরই মত আকার পায়, তবে তাকেই আমরা বলব 'ফসিল'। অবশ্য এইটাই যে 'ফসিলের' একমাত্র সংজ্ঞা তা নয়। 'ফসিল' আরো যে কত রকমের হতে পারে তা বলছি।

যে সব 'ফসিল' আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে একজাতের 'ফসিলে' দেখা যায় যে হাজার হাজার বছর পূর্ব্বে প্রাণীটির যে আকৃতি ছিল সেই আকৃতিটা অস্থি মাংস ও চালচামড়া নিয়ে অবিকৃত অবস্থায় বর্ত্তমান—এই এত বছরের প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনেও তার কোনো বিকৃতি দেখা দেয়নি বা পচে গলে যায়নি। কেন এমন হয়? এই প্রশ্ন করবার আগে আমাদের জানা দরকার যে ভূপৃষ্ঠের তাপ সব জায়গায় এক রকম নয়। কোনোখানে অত্যন্ত শীতল, আবার কোনোখানে প্রচণ্ড উষ্ণ। শীতপ্রধান মেরু-অঞ্চলে এমন সব জায়গা আছে যেখানে কোনো জীবের পক্ষেই বাঁচা কষ্টকর। জীবের দেহ বরফের ছোঁয়ায় জমে যাওয়ার আশঙ্কা প্রতি মুহূর্ত্তে। এইগুলি হলো প্রকৃতির 'রেফ্রিজারেটার'। মেরুপ্রদেশের তুন্দ্রা অঞ্চল মনে হয় এই রকম একটি রেফ্রিজারেটার।

সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চল থেকে যেসব 'ফসিল' আবিষ্কৃত হয়েছে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাদের সকল গঠনাদি—এমন কি শরীরের মাংস পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। এই রকম একটি প্রাণীর দেহ সাইবেরিয়ার লেনা নদীর বদ্বীপে প্রথম দেখা গিয়েছিল ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে। ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে সেটিকে সেখান থেকে উদ্ধার করে এনে রাখা হয়েছে লেনিনগ্রাড মিউজিয়মে। আদিমকালের অতিকায় হস্তী ম্যামথ্-এর একটা বিরাট দেহ একেবারে অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে (১নং ছবি) সাইবেরিয়ার বেরেসোভ্কা (Beresovka) অঞ্চলে। এই জায়গাটা হচ্ছে বেরিং প্রণালী থেকে ৮০০ মাইল দূরে আর মেরুবৃত্তের ৬০ মাইল উত্তরে।

১নং ছবি

লেনিনগ্রাড মিউজিয়মে রক্ষিত সাইবেরিয়ার অতিকায় হস্তী (ম্যামথ)। এর শরীরের সমস্ত অংশ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে।

এই দেহটি একটি পরিষ্কার বরফের স্তূপের মধ্য থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে একটি বরফের খাদের মধ্যে পড়ে এর অপমৃত্যু হয়। এর দেহের অবস্থা এত স্বাভাবিক যে দেখলে প্রায় জীবন্ত বলেই মনে হবে। এমন কি পড়ে গিয়ে মরবার সময়ে এর মুখে ও ভাব-ভঙ্গীতে যে একটা বীভৎসতা ফুটে উঠেছিল, সেটা পর্য্যন্ত অবিকৃত আছে। এর বুকের কাছে চাপবাঁধা একটা রক্তের স্তূপও থাকতে দেখা গেছে। তবে দুর্ভাগ্য-ক্রমে এর শুঁড়ের বেশীর ভাগ অংশ মাংসাশী জন্তুরা খেয়ে নিয়েছে। এই রকম বহু জন্তুর দেহাবশেষ সাইবেরিয়ার তুন্দ্রা অঞ্চলে পাওয়া যায়, যাদের মাংস মাংসাশী জন্তুরা খেয়ে নিয়েছে, অথবা কোনো জলপ্রপাতে ধুয়ে বেরিয়ে গেছে। সৌভাগ্যক্রমে এই ম্যামথটির দেহের অপরাপর অংশ নাগালের বাইরে থাকায় সেগুলি আর অন্য জন্তুর পেটে পৌঁছায়নি। এই 'ফসিল'টিকেও লেনিনগ্রাড মিউজিয়মে সযত্নে রেখে দেওয়া হয়েছে।

লোমশ গণ্ডারের যে 'ফসিল' পাওয়া গেছে সেটাও ঠিক এই একই উপায়ে রক্ষিত, তবে তার মাংসের বেশীর ভাগটা জলে ধুয়ে বেরিয়ে যাওয়াতে

শুধু কঙ্কালটাই এখন দেখতে পাওয়া যায়। আবার পোল্যাণ্ড-এর পূর্ব্ব গ্যালিশিয়ার বোহোরড্‌ক্রেনি (Bohorodcrany) অঞ্চলে প্রাগৈতিহাসিক যে গণ্ডারটির দেহ পাওয়া গিয়েছে সেটা কিন্তু রক্ষিত হয়েছে এক অদ্ভুত উপায়ে। ঐ জায়গায় আধুনিক কালে প্রচুর তৈলখনির সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাণীদেহটি ঐ তৈলমিশ্রিত মোমের মত মাটির মধ্যে রক্ষিত হওয়ায় পচনক্রিয়ার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেছে।

আপনারা জানেন যে ভূমিকম্পের সময় আগ্নেয়-গিরির চূড়া ভেদ ক'রে গলিত লাভার স্রোত যখন নেমে আসে, তখন তা আশেপাশের গ্রাম ও নগর ডুবিয়ে দেয়। পম্পিয়াই আর হারকিউলেনিয়ম-এর দুর্ভাগ্যের কথা জানে না এমন লোক হয়ত সভ্যজগতে নেই। কিন্তু মজার ব্যাপার হোলো এই যে, লাভাস্রোতের মধ্যে যেসব জীবজন্তুরা মারা পড়ে তাদের দেহের উপর লাভাস্রোত ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার দরুণ বহু স্তর ছাই জমা হয়ে যায়। তখন ঐ মৃতদেহগুলি বাতাসের সংস্পর্শ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য পচনক্রিয়া থেকে রেহাই পেয়ে যায়। এইভাবে একটা স্লথের কঙ্কাল তার চামড়া ও লোমশুদ্ধ আমেরিকার মেক্সিকো প্রদেশ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে (২নং ছবি)।

আদিমকালের পতঙ্গজাতীয় জীবদেহ রক্ষিত হয়েছে কিন্তু এসব কোনো উপায়ের দ্বারা নয়। এদের রক্ষণের জন্য প্রকৃতি আর একটি পন্থা অবলম্বন করেছিল। পাইনগাছের আঠা বা ধূনা এই পতঙ্গদের রক্ষণের কার্য্যে সহায়তা করেছে। এই সব আঠা যখন সদ্য সদ্য গাছের থেকে ক্ষরে পড়ে তখন সেগুলি অর্দ্ধতরল অবস্থায় থাকে। ক্রমে বাতাসের সংস্পর্শে এসে তারা কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে। পতঙ্গরা উড়ে এসে

২নং ছবি

মেক্সিকোর অতিকায় স্লথ (নোথ্রোবেরিয়াম)। এর পেছনের ডান পায়ের থাবা ও নখরের সঙ্গে লোমশুদ্ধ চামড়া পাওয়া গেছে।
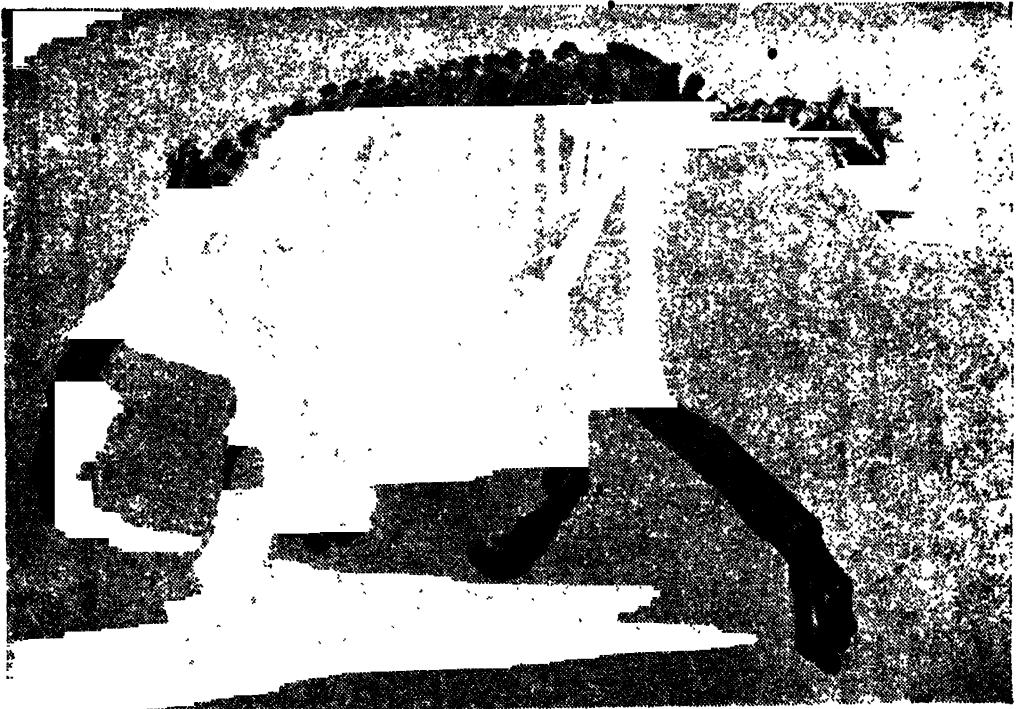
ক্বোনোক্রমে এই আঠার উপর বসে আর সঙ্গে সঙ্গে চটচটে ঘন পদার্থে তাদের পা আটকে বন্দী হয়ে যায়। আবার সেই একই জায়গার উপর নূতন

৩নং ছবি
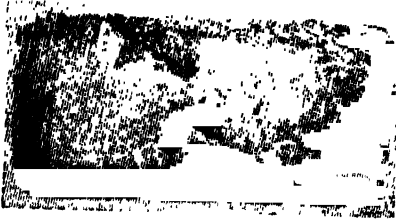
অলিগোসিন যুগের পাইন গাছের আঠায় (অ্যাম্বারে) কবরায়িত পিঁপড়ে।

আঠা এসে পড়ে, আর একটু একটু করে পতঙ্গেরা ঐ আঠার স্তূপের মধ্যে জীবন্ত কবরায়িত হয়ে যায়। এতে কিন্তু পতঙ্গদেহের কোনো অংশেরই এতটুকু ক্ষতি হয় না। (৩নং ছবি)। এই ভাবে প্রায় ২০০০ রকমের প্রাগৈতিহাসিক পতঙ্গের সন্ধান বৈজ্ঞানিকেরা পেয়েছেন—আর শুধু পতঙ্গই বা কেন, মাকড়সা, চিংড়ি ও কাঁকড়া জাতীয় বহু জীবও এইভাবে প্রকৃতির মিউজিয়মে রক্ষিত হয়েছে। তার সাক্ষী স্বরূপ জার্মানীতে বাল্টিক্ সমুদ্রের তীরে কোয়েনিগ্স্বার্গ (Koenigsberg) অঞ্চলে এই আঠার স্তূপ আজও বিস্তৃত হয়ে আছে। তার বহু অংশ খুঁড়ে ফেলা হলেও অনেক কিছু আজও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।

আর এক রকমের 'ফসিলে'র কথা উল্লেখযোগ্য, যাতে আসল জীবদেহের কোনো চিহ্নই দেখা যায় না, অথচ তার অস্তিত্ব ঠিক চেহারার অনুরূপেই টের পাওয়া যায়। এইটি হোলো প্রকৃতিদেবীর আর একটি অদ্ভুত সংরক্ষণ উপায়। কোনো জীবদেহ মাটির নীচে চাপা পড়লে তার চারধারের মাটি তার দেহকে কঠিনভাবে পিষ্ট করে। এই ভাবে পিষ্ট

৪নং ছবি

পম্পিয়াইএর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত একটি কুকুরের ছাঁচ (cast) থেকে 'প্লাস্টার অফ প্যারিসে' গড়া কুকুরের মূর্তি

করার পর সেই মাটির স্তূপ ক্রমে ক্রমে কঠিন হতে থাকে··আর তার মধ্যকার জীবদেহ পচে গলে বেরিয়ে যায়। অবশেষে থাকে কেবল একটা ছাঁচ—যেমন করে ছাঁচে ফেলে পুতুল তৈরী করে ঠিক তেমনি। ভিসুভিয়সের অগ্ন্যুৎপাতের পর যে সব মানুষের ও জীবজন্তুর চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেছে তার বেশীর ভাগই হোলো ছাঁচের মধ্যে রক্ষিত। এতে জীবদেহের আসল জিনিষটা না পাওয়া গেলেও ঠিক তার অনুরূপ আকৃতিটা আমাদের চোখে ধরা দেয় (৪নং ছবি)। এমনি করে কত প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর অস্তিত্বের সন্ধান যে পাওয়া গেছে তার ইয়ত্তা নাই। আর বৈজ্ঞানিকেরা সেইসব হারানো জীবদের সন্ধানে কৃতকার্য্য হ'য়েছেন বড় কম নয়।

শুধু যে ছাঁচই প্রাচীন জীবদেহের সাক্ষ্য রেখেছে তা নয়, ছাপও 'ফসিল' গড়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছে খুব বেশী। প্রাচীন যুগে যখন মাটির অবস্থা ছিল খুব নরম, তখন বৃহৎ বৃহৎ জন্তুর পায়ের গভীর ছাপ তার বুকে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর স্তরীভূত প্রস্তর ঠাণ্ডা ও কঠিন হয়ে যাওয়ায় সেই সব পায়ের ছাপ চিরকালের জন্য মহাকালের খাতায় আঁকা হয়ে গেছে (৫নং ছবি)। শুধু যে জীবজন্তুর দেহাংশের ছাপই প্রাচীন মৃত্তিকার মধ্যে পাওয়া যায় তা নয়, তাতে প্রাচীন যুগের বৃষ্টির ফোঁটা, ঢেউএর দাগ পর্য্যন্ত কোনো কোনো স্তরে আবিষ্কৃত হয়েছে।

তারপর আসে কঙ্কালের কথা। 'ফসিল' বলতেই সাধারণের মনে যে ধারণা জন্মায় তা হোলো কঙ্কালের। কবে কোন অতীতযুগে একটা জীবদেহ

৫নং ছবি

ডাইনোসোরের পায়ের ছাপ।

মাটির চাপে পড়ে তার মেদমজ্জা হারিয়ে শুধু হাড়ের কাঠামোয় যে কেমন করে আসে তা আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু এটা জ্ঞাতব্য যে মেদমাংসে পচনক্রিয়া চললেও হাড়ের পচনক্রিয়া বড় সহজে হয় না। আর, হাড়ের অধিকাংশ অজৈব পদার্থ দিয়ে তৈরী হওয়ার দরুণ মাটির পরিবেশে বেশ ভালভাবেই রক্ষিত হতে পারে। তবে খুব বেশী চাপের তলায় অস্থিগুলিকে মাঝে মাঝে একেবারে পাথরের মত শক্ত হয়ে যেতে দেখা যায়। আসল পাথরের উপাদান আর হাড়ের উপাদানের মধ্যে তফাৎটা অতি অল্প বলে এই অবস্থাটা খুব

শীঘ্রই ঘটে। একেই বলে 'প্রস্তরীভূত কঙ্কাল' (৬নং ছবি)।

এইতো গেল 'ফসিল' কোন কোন প্রকারের হয় তারই একটা বর্ণনা। এইবার আসুন, দেখা যাক 'ফসিল' তৈরীর আসল উপায়টা কি। ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা এটা লক্ষ্য করেছেন যে পৃথিবীর বুকে সব সময়েই স্তরের পর স্তর পড়ছে অধিকতর কঠিন মৃত্তিকার। আর সেই স্তরের মধ্যে চাপা পড়ে যাচ্ছে বহু পুরানো জীবদেহ। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও প্রকৃতি এই স্তর রচনার কাজ ক্রমাগত চালিয়ে এসেছেন সমুদ্রের জল আর নদীর জলের প্লাবনের সাহায্যে। এটা খুবই সত্যি যে, যে কোনো জৈব-পদার্থকে যদি জল ও বাতাসের ছোঁয়া থেকে বাঁচান না যায় তবে সেটা নিশ্চয়ই পচে যাবে। অক্সিজেন হলো পচনক্রিয়ার সহায়ক। তাই প্রকৃতি 'ফসিল' তৈরীর কাজে দুটি জিনিস খুব বেশী করে ব্যবহার করেছেন। এক হলো মাটির নীচে চাপা দিয়ে একেবারে কবরায়িত করা—এটা হয়েছে পূর্ব্বোক্ত সমুদ্র ও নদীর পলিমাটিতে, কিংবা, ঝড়ের সাহায্যে উড়ন্ত ধুলো চাপা পড়ে পড়ে। ভূমিকম্পও 'ফসিল' তৈরীতে কম সাহায্য করেনি। গলিত লাভার স্রোত ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে অচল ছাই ও মৃত্তিকার স্তরে পরিণত হয়েছে। সেগুলিও জল-বাতাস আসা-যাওয়ার পথ করেছে অবরুদ্ধ। আর একটা হলো বদ্ধ জলায়—যেখানে জলের চেয়ে আঠাল কাদার ভাগই বেশী,—এমন জায়গায় ফেলে মৃত্যু ঘটান, তারপর তার উপর আরও কাদা চাপা দেওয়া। হাতীর পূর্ব্বপুরুষদের সবাই মরেছে এই ভাবে।

পূর্ব্বেই বলেছি যে গাছের আঠায় যে রঞ্জন দ্রব্য (Resin) থাকে সেটাও প্রকৃতির আর একটি সংরক্ষণী পদার্থ। পশুপাখীর মলও এই সঙ্গে ধর্ত্তব্য।

৬নং ছবি
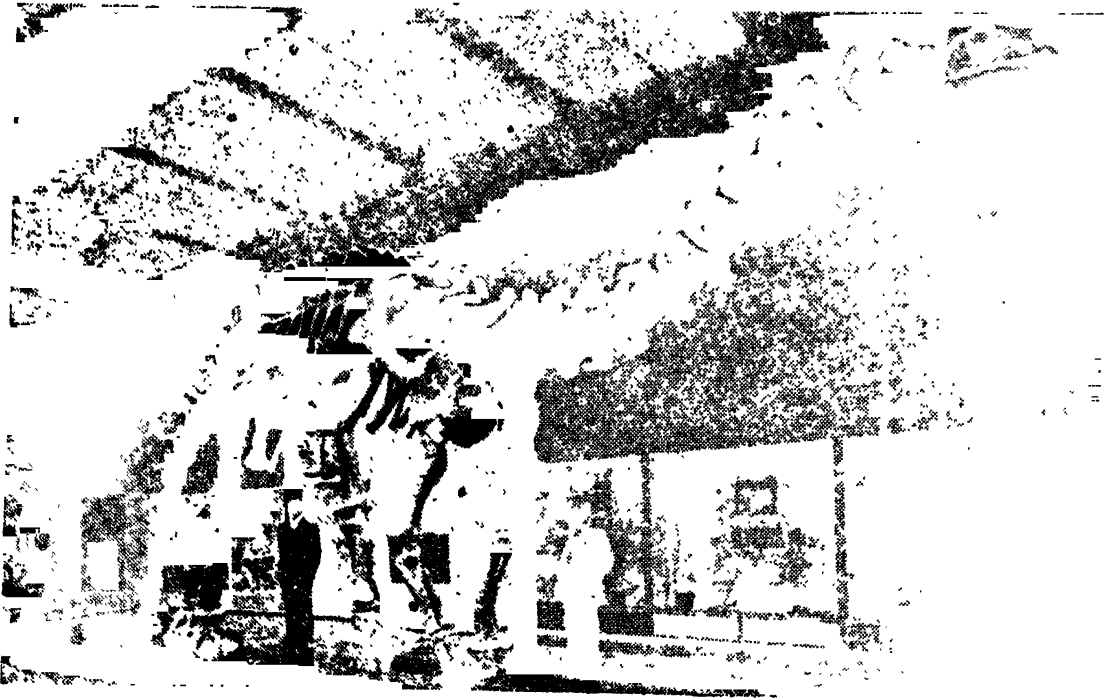
ইয়েল পিবডি মিউজিয়মে রক্ষিত অতিকায় সরীসৃপ ব্রণ্টোসোরের কঙ্কাল থেকে মূর্ত্তি পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাই দেখান হল। (আর. এস্. লালের গ্রন্থ থেকে নেওয়া)

জল শুকিয়ে যাওয়ার পর এটা সব মল হয়ে যায়, আর বহুকাল ধরে এমনি করে জমতে জমতে একজাতীয় সংরক্ষক সৃষ্ট হয়। এদের বলে গুয়ানো (Guano)। এর মধ্যেও ছোট ছোট বহু প্রাচীন কীটপতঙ্গের সন্ধান পাওয়া গেছে।

সংরক্ষক ছাড়াও এই 'ফসিল' তৈরীর ব্যাপারে ভূপৃষ্ঠের উত্থান-পতন এবং নদী ও সমুদ্রের স্থান পরিবর্ত্তন বড় কম কাজ করেনি। তুষারপাত তো একটা অতি প্রয়োজনীয় সংরক্ষক। এর পরিচয় আপনারা আগেই পেয়েছেন।

কাজেই এই সব দেখে যদি আমরা মনে করি যে আমাদের আজকের পৃথিবীতেও ঠিক এই জিনিসগুলি ঘটছে তাহলে কি আমরা খুব ভুল করব? উত্তরে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে আজ যা নূতন কাল তা যখন পুরোনো হয়ে যাবে তখন মানুষের কাছে সে জিনিষের আপাত মূল্য হয়তো কিছু থাকবে না, কিন্তু প্রকৃতি কোনো জিনিষকেই একেবারে হারাতে দেন না—তাঁর গর্ভে তিনি সব কিছুকেই অদৃশ্য করে সংরক্ষণ করেন মাত্র। আমরা আজকের পৃথিবী সম্বন্ধে যত না জানি, হয়তো দু'কোটি বৎসর পরে মানুষ যদি পৃথিবীতে থাকে তবে তারা জানবে আমাদের চেয়ে ঢের বেশী। কাজেই একথাটা সব সময়েই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে প্রকৃতি অবিবেচক নন। অভিব্যক্তির ধারাকে অক্ষুন্ন রাখবার জন্য তাঁর সংরক্ষণ প্রণালী অতি অদ্ভুত। তাই বলতে ইচ্ছা হয়—

"তোমার মহাবিশ্বে কিছু হারায় নাকো কভু" শুধু আমাদের দৃষ্টির অস্পষ্টতার জন্যেই আমরা তা এতদিন দেখতে পাইনি। সে দোষ তো আমাদেরই। কিন্তু আজ মানুষ তার দৃষ্টিকে ফিরে পেয়েছে বৈজ্ঞানিকের চোখে—আজ আর প্রকৃতির কীর্ত্তিকলাপ তার কাছে রহস্যের কালো যবনিকার অন্তরালে ঢাকা নেই।

আমেরিকায় বিজ্ঞান-গবেষণার ব্যয়

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এই বছরে বিজ্ঞান-গবেষণার জন্য মোট ১৬০ কোটী ডলার ব্যয় করবে। এর মধ্যে সরাসরি সরকারী গবেষণাগারসমূহের জন্য ব্যয় করা হবে ৬০ কোটী ডলারের কিছু বেশী। এই রকম গবেষণাগারের সংখ্যা ৫২। এখানে ত্রিশ হাজার বিজ্ঞানী গবেষণাকার্যে লিপ্ত আছেন। শিল্প-সংক্রান্ত গবেষণাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে—যাদের অর্থ আসে জনসাধারণের পকেট থেকে—ব্যয় হবে আনুমানিক ৪০ কোটী ডলার। এ ছাড়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আরও প্রায় ৬০ কোটী ডলার ব্যয় করবে বিজ্ঞান-গবেষণার জন্য।

বিজ্ঞান-গবেষণায় আমেরিকা মাথা পিছু প্রায় ১০ ডলার অর্থাৎ ৩০৲ টাকা ব্যয় করে। ভারতবর্ষে এই সংখ্যা কত?

ফোলিক অ্যাসিড

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

মানুষের দেহে নানা ধরণের রক্তহীনতা ঘটতে দেখা যায়। আঘাত জনিত রক্তমোক্ষণ বা কোনো বিশিষ্ট রোগের দ্বারা শরীর থেকে অত্যধিক রক্তক্ষয় হওয়ার ফলে যে রক্তাল্পতা ঘটে, তাও এক পর্যায়ের রক্তহীনতা। তাতে রক্তের মোট কণিকা-সংখ্যা স্বাভাবিক অপেক্ষা অনেক কমে যায়। লাল কণিকার সংখ্যা ঘন প্রতি বর্গ মিলিমিটারে ৫০ বা ৪০ লক্ষের স্থলে হয়তো ১০ লক্ষ বা তারও কম হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তথাপি ঐ সব লাল কণিকার আকারে প্রকারে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। তার কারণ এটা তাদের সংখ্যাল্পতা মাত্র, এটা কণিকাদের নিশ্চয় কোনো বিকৃতি বা ব্যাধি নয়।

আর এক পর্যায়ের রক্তহীনতা আছে যাতে রক্তক্ষয় না হয়েও কণিকাদের নিজস্ব অপুষ্টি ও ভঙ্গুরতার দরুণ তারা স্বাভাবিকের চেয়ে সংখ্যায় কমে যেতে থাকে এবং তা ছাড়াও তাদের আকারের ও প্রকারের অনেক বিকৃতি ঘটতে থাকে। এই জাতীয় রক্তহীনতা কয়েক প্রকারের স্বতন্ত্র লক্ষণযুক্ত ব্যাধিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। আমরা সাধারণ কথায় যাকে বলি পাণ্ডুরোগ, তা এই জাতীয় রক্তহীনতা। অনেক সময় আমরা মেয়েদের যে অসুস্থতাকে সূতিকা বলি, তাও এই ধরণের রক্তহীনতা সম্পর্কীয়। আর যাকে আমরা গ্রহণী বলে থাকি এবং যাকে ডাক্তারেরা স্প্রু বলেন, তাও এই ধরণের রক্তহীনতা ঘটিত।

এখন ক্রমশ জানা যাচ্ছে যে এই জাতীয় রক্তহীনতা কোনো আগন্তুক বা সংক্রামক ব্যাধি নয়। অনেক সময় দেখা যায় এগুলি বিশেষ রকমের কিছু খাদ্যোপকরণের অভাবে আভ্যন্তরীণ বিপর্যয় হেতুই ঘটে থাকে। এবং খাদ্যের এই সব উপকরণের দৈন্য ঘটতে ঘটতে শরীর যখন দেউলে হয়ে যায়, তখন সেটা প্রকাশ পায় এই ধরণের রক্তহীনতায়। রক্তপরীক্ষাতেই জানা যায় সেটা কোন ধরণের বিকারযুক্ত রক্তহীনতা। এতে কণিকার সংখ্যাও কমে আর অবশিষ্ট কণিকাগুলির চেহারাতে নানা রকম বিকৃতিও ঘটে। একে তাই বলা যায় অপুষ্টিজনিত দূষিত রক্তহীনতা।

নিছক খাদ্যের ত্রুটির দ্বারাই যে এমন কোনো বিচিত্র রকমের ব্যাধি ঘটতে পারে এটা আগে জানা ছিল না। এটা প্রথমে জাপানী চিকিৎসক তাকাকীর নজরে পড়লো, যখন তিনি দেখলেন যে পেট ভরে খেতে পেলেও জাপানী নাবিকদের মধ্যে প্রায়ই বেরিবেরি নামক রোগটি হয়। অনেক পরীক্ষায় বোঝা গেল যে এ কোনো সংক্রামক পীড়া নয়, কেবল তাদের খাদ্যের মধ্যেই কোনো এক বিশেষ উপাদানের অভাবে এই রোগ ঘটেছে। ক্রমে দেখা গেল ঈস্ট্ (খামি জাতীয়) আর চালের ভুষি খেতে দিলেই ঐ বেরিবেরি সেরে যায়। অনুসন্ধান হতে লাগলো ঈস্ট্ প্রভৃতির মধ্যে এমন কোনো সামগ্রী আছে কিনা যার অভাবে বেরিবেরি রোগটি হতে পারে আর যার যোগান দিতে শুরু করলেই সে রোগ আরোগ্য হয়ে যায়। সে পদার্থ ক্রমে আবিষ্কারও হোলো, তার নাম দেওয়া হলো থিয়ামিন। এটি ভিটামিন বি পর্যায়ের অন্তর্গত।

ক্রমে আরো জানা গেল যে ঈস্ট্ প্রভৃতির মধ্যে থিয়ামিন ছাড়াও ভিটামিন বি পর্যায়ের আরো কিছু স্বতন্ত্র সামগ্রী আছে যার অভাবে বেরিবেরি

ছাড়াও অন্যান্য রকম রোগ হতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছিল যে খাদ্যে ভিটামিন বি পর্যায়ের উপাদানের অভাবে কোন কোন ব্যাধি হবার সম্ভাবনা।

প্রথমে মানুষকে নিয়ে নয়, কুকুর আর বাঁদর নিয়ে এই পরীক্ষা চলছিল। এক দল পরীক্ষক দেখলেন যে বাঁদরদের কল-ছাঁটা পালিশ-করা চাল, এবং তার সঙ্গে দুধের কেজীন, কড লিভার অয়েল, কমলা লেবু এবং লবণাদি (সমস্তই ভিটামিন বি বর্জিত) খেতে দিলে তাদের শরীরে কিছুকাল পরে রক্তহীনতা দেখা দেয়। ঐ সব খাদ্য পেট ভরে খেলেও তাদের শরীর ফ্যাকাশে হ'য়ে যায়, গালের ভিতর ঘা হয়, এবং দেহে রক্তহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তবে ঐ খাদ্যের সঙ্গে উপরন্তু কিছু পরিমাণ ঈস্ট্ খেতে দিলেই এ সমস্ত লক্ষণ আরোগ্য হ'য়ে যায়। আর এক দল দেখলেন যে কুকুরদের চোকড়-বিহীন আটা, আর তার সঙ্গে চর্বি, চিনি, লবণাদি, আর ভিটামিন এ, সি এবং ডি খেতে দিলেও তাদের অনুরূপ রক্তহীনতা ঘটে। তাদের শরীর শুকিয়ে যায়, সর্বাঙ্গে ঘা হয়, ও রক্তহীনতার চিহ্ন প্রকাশ পায়। লৌহঘটিত ঔষধাদি দিলেও এ অসুস্থতা সারে না। কিন্তু ভিটামিন বি প্রয়োগ করলেই তা সেরে যায়।

সুতরাং ভিটামিন বি পর্যায়ের যাবতীয় মিশ্রিত উপাদানের মধ্যে যে থিয়ামিন ছাড়াও অন্য এমন কিছু স্বতন্ত্র বস্তু আছে যার অভাবে বেরিবেরি হয় না কিন্তু মারাত্মক রক্তহীনতা হ'তে পারে, এ কথা অনেক আগের থেকেই জানা যাচ্ছিল। কিন্তু সেই জিনিসটি যে কি তা অনেক দিন পর্যন্ত নির্দিষ্টরূপে ধরা পড়ে নি। সেটি যে ফোলিক অ্যাসিড তা এখনকার সব চেয়ে নতুন আবিষ্কার।

ল্যাটিন্ ভাষাতে ফোলিয়াম কথাটির অর্থ পল্লব বা পাতা। ১৯৪১ সালে মিচেল প্রমুখ তিনজন বৈজ্ঞানিক পালং শাকের পাতা থেকে এই পদার্থটি প্রথম আবিষ্কার করেন, এবং তাঁরাই এর নাম দেন ফোলিক অ্যাসিড। ক্রমে জানা যায় যে এই পদার্থ কেবল পালং শাকে নয়, কাঁচা ঘাস, ছত্রকে বা বেঙের ছাতায়, ঈস্টের মধ্যে এবং জন্তু সকলের লিভারে বা মেটুলিতেও আছে। আরও জানা যায় যে এটি ভিটামিন বি কম্প্লেক্সের অন্তর্গত। কুকুর বাঁদর প্রভৃতি জন্তুদের দৈনিক খাদ্যের বরাদ্দ থেকে ভিটামিন বি জাতীয় উপাদান বাদ দিতে থাকলে তাদের যে রক্তহীনতা ঘটে, তা কেবল এই বিশিষ্ট বস্তুটিরই অভাবে। ভিটামিন বি সমৃদ্ধ খাদ্য দিলেই যে তারা আরোগ্য হ'য়ে যায়, সে কেবল এই বিশিষ্ট বস্তুটিরই কারণে।

বলা বাহুল্য যে এই পদার্থটি ঐ সমস্ত খাদ্য-বস্তুর মধ্যে যৌগিকভাবে জটিলরূপে অন্তর্নিহিত হ'য়ে থাকে। ভিন্ন ভিন্ন বৈজ্ঞানিক একে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু থেকে পৃথক ক'রে বের করবার চেষ্টা করেছিলেন। কেউবা এর নাম দিলেন ভিটানিন এম্, কেউবা নাম দিলেন ভিটামিন বিসি, কেউবা নাম দিলেন ইউ ফ্যাক্টর। কিন্তু অবশেষে জানা গেল যে পালং শাকের মধ্যে যা পাওয়া গেছে, এবং ঈস্ট্ প্রভৃতি অন্যান্য জিনিসের মধ্যেও যা পাওয়া যাচ্ছে, সে ঐ একই পদার্থ এবং তার ক্রিয়াও একই প্রকার। তখন অন্যান্য নামের পরিবর্তে ঐ ফোলিক অ্যাসিড নামটিই বহাল রাখা হলো।

এই ফোলিক এ্যাসিডকে রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা পৃথক করা গেছে এবং তারপর দ্রবটি গাঢ়ীকরণ করে ক্রিস্টালাইন বা কেলাসিত আকারে ভূরি ভূরি পরিমাণে অমিশ্রভাবে পাওয়া সম্ভবপর হয়েছে। শুধু তাই নয়, ১৯৪৫ সালে রাসায়নিক সংশ্লেষণের দ্বারা প্রাকৃতিক বস্তুটির অনুরূপ ফোলিক অ্যাসিড কৃত্রিম উপায়ে ল্যাব-রেটরিতে প্রস্তুত করাও সম্ভবপর হয়েছে।

এরপর ফোলিক অ্যাসিড সংগ্রহ করবার জন্য আর পালং শাক বা ঈস্ট প্রভৃতির উপর নির্ভর করবার কোনো প্রয়োজন নেই। সুতরাং ফোলিক অ্যাসিডের গুণাগুণ পরীক্ষা করা এবং

রক্তহীনতার ক্ষেত্রে প্রয়োগের দ্বারা ফলাফল নির্ণয় করা সম্বন্ধে আর কোনো দুষ্প্রাপ্যতা রইল না। সকলেই পরীক্ষা ক'রে দেখতে পেলেন যে কুকুর বাঁদর প্রভৃতি জন্তুদের পূর্বোক্ত ধরনের রক্তহীনতায় ফোলিক অ্যাসিডের প্রয়োগের দ্বারা চমৎকার সুফল পাওয়া যায়।

তখন থেকে মানুষেরও নানাবিধ রক্তহীনতায় ফোলিক অ্যাসিডের প্রয়োগ করা শুরু হলো। স্পাইজ প্রভৃতি কয়েকজন চিকিৎসক বর্ধিত আকারের রক্তকণিকা বিশিষ্ট (macrocytic) দূষিত রক্তহীনতার চিকিৎসায় ফোলিক অ্যাসিড প্রয়োগ করতে লাগলেন এবং দুই শতের অধিক রোগীকে আরোগ্য করবার পরে তাঁদের চিকিৎসার ফলাফল প্রকাশ করলেন। তাঁরা বললেন যে ঐ জাতীয় দূষিত রক্তহীনতায় লিভার একস্ট্রাক্ট যেমন কাজ করে, বহু ক্ষেত্রে ফোলিক অ্যাসিডের ক্রিয়া তার চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নয়। সরাসরি রক্তপাত ও রক্তক্ষয় হওয়া ছাড়া অন্য বহুবিধ দুর্বোধ্য অস্বাভাবিক রক্তহীনতায় এই ফোলিক অ্যাসিড প্রয়োগে রোগীদেহের রক্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে।

সাধারণত অস্থিমজ্জার ভিতর থেকেই রক্তকণিকার সৃষ্টি হয়। ফোলিক অ্যাসিড প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় যে ব্যাধির দ্বারা বিকারগ্রস্ত অস্থিমজ্জার কোষগুলির মধ্যে বিশেষ রকমের পরিবর্তন ঘটতে শুরু হয়। তার পর থেকেই রক্তকণিকার সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে যেতে থাকে এবং সেগুলি বিকৃত আকারের পরিবর্তে সহজ স্বাভাবিক আকারে ও প্রকারে রূপান্তরিত হ'তে থাকে। দেখতে দেখতে অল্পদিনের মধ্যেই রক্তের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়। রোগীর সমস্ত বাহ্যিক লক্ষণগুলিও সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে থাকে। ফোলিক অ্যাসিডের চারদিন মাত্র প্রয়োগের পর থেকেই দেখা যায় যে রোগীর চোখমুখের চেহারা বদলে গেছে, অক্ষুধার জায়গায় তার ক্ষুধার সঞ্চার হয়েছে।

স্প্রু জাতীয় উদরাময়ের রোগে প্রায়ই জিভে এবং গালের মধ্যে ঘা হয়, কিছু খেতে গেলেই মুখের মধ্যে জ্বালা করে, পেট জ্বালা করে, এবং উদরাময়ের লক্ষণ এমন প্রবল থাকে যে কিছুতেই তার কোনো উপশম করা যায় না। কিন্তু ফোলিক অ্যাসিড ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় যে জিভের ঘা অদৃশ্য হয়েছে, জ্বালা দূর হয়েছে এবং উদরাময় আপনিই আরোগ্য হয়ে মলের অবস্থা স্বাভাবিক হয়েছে। ক্রমে রোগীর শরীর সবল হ'তে থাকে এবং কিছু দীর্ঘ দিন চিকিৎসার পরে দেখা যায় যে—রক্তহীনতার আর কোনোই চিহ্ন নেই, রক্তের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকের মতো হয়ে গেছে। স্প্রু রোগের সম্বন্ধে আগে কোনো সার্থক চিকিৎসা ছিল না, এখন ফোলিক অ্যাসিডের আবিষ্কারে সে অভাব কিয়দংশ দূর হয়েছে।

রোগলক্ষণ-বিহীন সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তিদের শরীরে ফোলিক অ্যাসিডের ক্রিয়া কেমন হয় তাও পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়েছে। কয়েকজন সুস্থ ব্যক্তিকে একদিন অন্তর ৫০ মিলিগ্রাম মাত্রায় ফোলিক অ্যাসিড দুই মাস যাবত খাওয়ানো হয়। তাদের কয়েকজনের রক্তকণিকার স্বাভাবিক সংখ্যা প্রতি বর্গ মিলিমিটারে ছিল ৪০ লক্ষের বেশি, এবং কয়েকজনের ছিল ৪০ লক্ষের কম। দুই মাস ফোলিক অ্যাসিড খাওয়ানোর পরে দেখা গেল যে যাদের কণিকার সংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষের কম, তাদের সেই সংখ্যা বেড়ে গিয়ে প্রায় ৪৫ লক্ষের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু যাদের সংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষের বেশি, তাদের ফোলিক অ্যাসিডের দ্বারা কোনোই পরিবর্তন ঘটলো না। এতে বোঝা যায় যে কারো রক্তে যদি সামান্য কিছুও দৈন্য থাকে তবে ফোলিক অ্যাসিড সেটুকুও পূরণ ক'রে দিতে পারে। কিন্তু যেখানে কোনো দৈন্য নেই সেখানে এর রীতিমত প্রয়োগ সত্ত্বেও কোনো ক্রিয়া নেই। অপিচ এর ব্যবহারে কোন কুফলও নেই।

ফোলিক অ্যাসিড কেবল যে মুখ দিয়ে খাওয়া-

নোর দ্বারাই সুফল হয় তা নয়, রোগের কঠিন অবস্থায় প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইনজেকশনের দ্বারাও মাংসপেশীর মধ্যে এই বস্তু প্রয়োগ করা চলতে পারে এবং তাতে আরো কিছু তাড়াতাড়ি উপকার পাওয়া যায়। কেউ কেউ লিভার এক্‌ষ্ট্রাক্‌টের সঙ্গে মিশিয়েও এটি প্রয়োগ ক'রে থাকেন।

যদিও এটি এক নতুন আবিষ্কার, তথাপি এর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। ভারতবর্ষে প্রস্তুত করা সম্ভব হলে এবং সুলভে পাওয়া গেলে আমাদের দেশের লোকের পক্ষে এটি খুবই উপকারে লাগবে। এদেশে রক্তহীনতা অতি সাধারণ রোগ, বহু লোকের মধ্যে প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। তার কারণ আমাদের আজকালকার খাদ্যে ভিটামিন বি জাতীয় যাবতীয় উপাদানের অভাব খুবই বেশী। উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিনের অভাবে তার অপকারিতা আরো প্রকট হয়ে ওঠে। এই সকল কারণেই আমাদের দেশে স্প্রু রোগের প্রাদুর্ভাব যথেষ্ট, আর ভারতীয় মেয়েদের সূতিকা ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগও প্রায় এই কারণেই দেখা যায়। ফোলিক অ্যাসিডের ব্যবহারে ঐ ধরণের যাবতীয় ব্যাধি নিরাময় হ'য়ে যেতে পারে।

একটি নূতন ভিটামিন

মৌমাছির জীবন অল্প—মাস তিনেক মাত্র। কিন্তু রাণী মৌমাছি বাঁচে বহুদিন—বছর পাঁচেক। এই পার্থক্যের কারণ কি? জনৈক মার্কিন বিজ্ঞানী ডক্টর টমাস এস. গার্ডনার এই প্রশ্নের সদুত্তর দেবার জন্যে অনেক দিন পরীক্ষা করেছেন। তিনি বলেন যে রাণী মৌমাছির খাদ্য তথাকথিত 'রয়্যাল জেলি' একটি এতদিন না-জানা বি-জাতীয় ভিটামিনের সমৃদ্ধ উৎস। এই বি ভিটামিনের নাম প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড। সাধারণ মাছিকে এই খাদ্য খাইয়ে দেখা গেছে যে তাদের জীবৎকাল প্রায় দেড়গুণ—শতকরা ৪৬ ভাগ—বেড়ে যায়। ডক্টর গার্ডনার আরও দেখেন যে রয়্যাল জেলিতে প্রাপ্তব্য কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য—বায়োটিন, পিরিডক্সিন ও সোডিয়াম ঈস্ট নিউক্লিএট পরমায়ু বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। মানুষের উপর প্যান্টোথেনিক অ্যাসিডের ক্রিয়া এখনও পরীক্ষা করে দেখা হয় নি। তরুণ পেশীতন্তু, দুধ এবং শিশু-জীবের আহার্য্য দ্রব্যে প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড বর্তমান।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিসাধন ও সমৃদ্ধিকরণ সম্বন্ধে যে কতখানি সচেতন ছিলেন, তাঁহার প্রদত্ত অভিভাষণ ও রচনাবলী হইতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন তিনি বলিয়াছেন, "আমরা যতদিন স্বাধীন ভাবে নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে সমর্থ না হইব, ততদিন আমাদের ভাষার দারিদ্র্য ঘুচিবে না।" শিক্ষা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন:

"আদর্শ-সাহিত্য গঠন করিতে হইলে সঙ্গীত, চিত্রকলা, ভূতত্ত্ব, পদার্থতত্ত্ব, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, রসায়ন-বিজ্ঞান, নৌতত্ত্ব, সমরতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে পুস্তক রচিত হওয়া প্রয়োজন।······শব্দ সম্পদে বাঙ্গালা-ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা হীন। ভূবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, প্রাণি-বিদ্যা, জীবাণুবিদ্যা, এবং অন্যান্য বিজ্ঞান ও রসায়ন-শাস্ত্রের অনুবাদ করিতে হইলে আমাদের চক্ষুস্থির হইয়া যায়, আবশ্যক মত পারিভাষিক শব্দ কোথায় মিলিবে? এ যাবৎ বিজ্ঞান ও রসায়ন-শাস্ত্রের আলোচনার দ্বারা যে শব্দগুলি সংগঠিত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ অতি অল্প।"

কলিকাতার শিক্ষক সম্মেলনে প্রসঙ্গক্রমে শিক্ষার বাহন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন:

"আমাদের মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতেই হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন সময়েই এইটি হওয়া উচিত ছিল। প্রচুর সময়, শক্তি, স্বাস্থ্য ও প্রতিভা অকারণ নষ্ট হইয়াছে। আর নয়, একদিনও নয়, এখনই মাতৃভাষা পঠন, পাঠন ও পরীক্ষার ভাষা করিতে হইবে।"

মাতৃভাষাই যে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন, সে সম্বন্ধে আজ কাহারও দ্বিমত নাই। কিন্তু সে যুগে যে কয়জন মনীষী এই সত্য সর্ব্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন আচার্য্যদেব তাঁহাদের অন্যতম। আজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে, ইংরাজী ভাষায় ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য-বিদ্যা পরিপাক করিতে তাহাদের অজীর্ণ হইতেছে না। কিন্তু যে যুগে ইংরাজী বলাকহা, লেখাপড়া ও ইংরাজী কায়দা দুরস্ত হওয়া কৃষ্টির অন্যতম অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত, সেই যুগে প্রফুল্লচন্দ্র বহু দূরদর্শিতার ফলে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন:

"গণিত, ইতিহাস, ভূগোল এই পরভাষার বিভীষিকায় দুরূহ হইয়া উঠে, পড়া ও পড়ানর আনন্দ এবং সজীবতা চলিয়া যায়, শিক্ষা আগ্রহের জিনিষ না হইয়া নিগ্রহের মূর্ত্তি ধারণ করে। বিদ্যার্থীর মৌলিকতা নষ্ট হইয়া যায়, অকারণ শক্তির অপচয় ও সময়ের অপব্যয় হয়, শিক্ষণীয় বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিবার বিষম ব্যাঘাত ঘটে।···

"যাহা অন্যদেশের ছাত্রেরা সহজে শিখে, তাহা শিখিতে আমাদের ছেলেরা সুকুমার বয়স হইতেই গলদঘর্ম্ম হয়। ইহা একটা প্রকাণ্ড জাতীয় ক্ষতি।"

এই ক্ষতির কথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "জগতের যে সকল ভাষা ভাব প্রকাশের উপযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা তাহাদের অন্যতম।······আমাদের এই মাতৃভাষাকে ছাড়িয়া পরের দুরূহ, উচ্চারণের বিড়ম্বনা পূর্ণ ভাষা কেন আমাদের শিক্ষার বাহন হইবে? ইহা যথার্থই আমাদের পক্ষে বিলাতি মাটি; ইহাতে মৃত্তিকার

সরসতা ও সজীবতা নাই। আমাদের বাড়ন্ত গাছগুলি এই সিমেণ্টে রস পায় না, ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায়।...মাতৃভাষায় সকল বিষয়ের অধ্যাপনা ও পরীক্ষা হইলে সময় বাঁচিবে, অনর্থক শক্তির অপচয় হইবে না, ছেলেরা আগ্রহ করিয়া কত কিছু শিখিতে চাহিবে, শিক্ষা জীবন্ত ও সার্থক হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষার ঘাড়ের এই ভূত নামাইতেই হইবে।"

বলা বাহুল্য এই সব আলোচনার অনেক বৎসর পরে বিদ্যালয়ের পাঠ্যে ও পরীক্ষায় বাঙ্গালাভাষা মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছে।

আচার্য্যদেবের মতে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক শব্দের অভাব ছিল না। তিনি বলেন, বহুবর্ষ-ব্যাপী পরাধীনতার ফলে আমরা বহু অমূল্য রত্ন হারাইয়াছি। ইতিহাস তাঁহার প্রিয় বিষয় ছিল। উত্তরকালে চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী পরিশ্রমের ফলে হিন্দু রসায়নের ইতিবৃত্ত রচনা করিয়াছিলেন। মধ্যে সাহিত্য পরিষদ্‌ গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত রাসায়নিক পরিভাষা সঙ্কলনকালে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ, যাহার ভাব আমরা এখন কেবল ইংরাজি শব্দ দিয়াই প্রকাশ করিয়া থাকি, তাঁহার চোখে পড়ে। কয়েকটি উদ্ধার করিতেছি: (১) **Destructive distillation** অন্তর্ধূম বিপাচন; (২) **Fixture of dyes** রাগবন্ধন; (৩) জাহাজের **Pilot** জল নিয়ামক; (৪) **Laying the foundation stone** মঙ্গলেষ্টক স্থাপন; (৫) **Viceroy** উপরাজ, (৬) **Crown Prince** পরিনায়ক; (৭) **Supper** সায়মাশ; (৮) **Calamine** রসক।

এইরূপ দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, "অনুসন্ধান করিলে এইরূপ শত শত 'সমাজচ্যুত শব্দে'র সন্ধান পাওয়া যাইবে। কৃতী সাহিত্য-রথিগণ...বিস্মৃতির অন্ধকূপ হইতে ইহাদের উদ্ধার সাধন করিয়া হীনবল বাঙ্গালা সাহিত্যসমাজের অঙ্গীভূত করিয়া লইবেন। ইহাই সনির্বন্ধ অনুরোধ।"

সৌভাগ্যের বিষয় আচার্য্যদেবের এই অনুরোধ সুধিজনের কানে প্রবেশ করিয়া করিয়াছে। পরিভাষা সমিতি গঠিত হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয় পারিভাষিক শব্দ তালিকা গ্রন্থন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ এই প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত আছেন। আচার্য্যদেবের বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় উৎসাহের অবধি ছিল না। খাদ্য প্রসঙ্গে ভোজ্যদ্রব্যের গুণাগুণের বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন:

"বর্ত্তমানে আর এক বিষম উৎপাত আরম্ভ হইয়াছে, ভেজিটেবল ঘি নামে এক পদার্থ বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হইতেছে। উদ্ভিজ্জ তৈলের সঙ্গে হাইড্রোজেন সম্মিলিত করাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। রাসায়নিক হিসাবে দেখিতে গেলে, ভাল চর্ব্বি ও ঘৃতের বড় একটা প্রভেদ নাই। কিন্তু এই নকল ঘৃতের ভাইটামিন নামক শরীর গঠনে অত্যাবশ্যক উপাদান একেবারে নাই।"

প্রাচীন হিন্দুদিগের রসায়নশাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে যখন আচার্য্যদেব গবেষণারত ছিলেন তখন রস-রত্নসমুচ্চয়ে রসক হইতে দস্তা নিষ্কাশনের যে বিবরণ তিনি সংস্কৃত শ্লোকের মধ্য দিয়া পাইয়াছিলেন, তাহা পরে সহজ বাঙ্গালা ভাষায় পরিবেষণ করেন। নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদ হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে কেন আচার্য্যদেব বাঙ্গালা ভাষাকে ভাব প্রকাশের যথেষ্ট উপযোগী বলিয়াছিলেন।

"রসকের সহিত হরিদ্রা, লবণ, রজন, ভূষা ও সোহাগা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া মূচির ভিতর আবদ্ধ করিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। একটি সচ্ছিদ্র শরা দ্বারা মূচির মুখ আবৃত করিবে। একটি হাঁড়ি মাটির ভিতর প্রোথিত করিয়া তাহার অর্দ্ধেক জলে পূর্ণ করিবে। তৎপরে ঐ মূচিটি উল্টা ভাবে হাঁড়ির উপর সংস্থাপিত করিয়া কয়লার আগুনে জোরে পোড়াইবে। দস্তা বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া শীতল জলের সংস্পর্শে আসিলে রঙ্গের (রাং) ন্যায় আভাযুক্ত হইয়া জমিয়া যাইবে। যখন অগ্নিশিখার

বর্ণ নীল হইতে সাদা হইবে, তখন উত্তাপ বন্ধ করিতে হইবে।"

দৌলতপুর কলেজে আচার্য্যদেব বাঙ্গালায় নব্য রসায়নের উৎপত্তি সম্বন্ধে একবার বক্তৃতা করেন। ভাষার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ পড়িয়া গেলে বুঝা যাইবে দুরূহ বিজ্ঞানও সরল করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় পরিবেশণ করা অসম্ভব নহে।

"আমাদের দেশের ভাষায় একটি কথা আছে, 'পঞ্চত্ব প্রাপ্তি'। জনৈক ফরাসী দেশীয় বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে হিন্দুরা যে পঞ্চত্ব প্রাপ্তির কথা বলেন, তাহার মধ্যে অনেক গূঢ় রহস্য নিহিত আছে। জগতের সমস্ত পদার্থের মূল উপাদান এই মতে পাঁচটি। ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও ব্যোম। বিশ্লেষণ বা ক্রমান্বয়ে যত ইচ্ছা ভাগ করিলেও যে পদার্থ হইতে সে পদার্থ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ পাওয়া যায় না, তাহাকে মূল পদার্থ বা জগতের মূল বা ভূত বলে। যখন অমর আত্মা দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান তখন যে মাটি, জল, তেজ, বায়ু ও ব্যোম দিয়া দেহ গঠিত হইয়াছে, সেইগুলি পুনরায় পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, ইহারই নাম পঞ্চত্ব প্রাপ্তি, দেহের কোন উপাদান ধ্বংস বা নষ্ট হইল না। দেহের মাটি মাটিতে, জল জলে, এইরূপ পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল—রূপান্তর প্রাপ্ত হইল। বাস্তবিক জগতের কোন পদার্থের নাশ বা অস্তিত্ব লোপ হয় না, এক পদার্থ হইতে পদার্থান্তরে পরিবর্ত্তন হয় মাত্র এবং যে যে মূল পদার্থের পরমাণু (বা সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশ) সমষ্টি লইয়া কোন পদার্থ গঠিত হয়, অন্য পদার্থে পরিণত হইলে তাহার একটি পরমাণুও নষ্ট হয় না। সমস্ত জগতের পরমাণু সমষ্টি নিত্য, তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। এই তত্ত্বের নাম পদার্থের অবিনশ্বরত্ব।"

প্রাচীনকালে অগ্নির দহনকার্য্যের ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন ষ্টাল নামে একজন বৈজ্ঞানিক। তাঁহার দহনতত্ত্ব বুঝাইতে আচার্য্যদেব যে সহজ ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন নিম্নে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"...কাষ্ঠাদি দহনশীল পদার্থে অলক্ষিত ভাবে ফ্লজিষ্টন নামক একপ্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ থাকে। বিভিন্ন পদার্থে এই ফ্লজিষ্টন বিভিন্ন পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। দাহ্য বস্তু সমূহে পরস্পর যে পার্থক্যের উপলব্ধি হয়, তাহা কেবল ফ্লজিষ্টনের পরিমাণের তারতম্য ও অন্যতর উপাদানের ধর্ম্ম ভেদে ঘটিয়া থাকে। দহনকালে যে বস্তু দগ্ধ হইতেছে, তাহা হইতে ফ্লজিষ্টন বাহির হইয়া যায় এবং তজ্জন্য আলোক বা অগ্নিশিখা দেখা যায়। ফ্লজিষ্টন বাহির হইয়া গেলে দগ্ধাবশিষ্ট পদার্থ এই হিসাবে লঘু হইয়া যাইবার কথা।"

উত্তরকালে ফ্লজিষ্টনবাদ যখন লাভোয়সিয়ের অমর পরীক্ষায় ঘাতসহ হইল না, এবং আধুনিক-কালের দহনতত্ত্ব, অর্থাৎ দহন হইল দাহ্য বস্তুর সহিত অম্লজানের সংযোগ, সুপ্রতিষ্ঠিত হইল তাহার প্রসঙ্গে আচার্য্যদেব বলিতেছেন:

"প্রীষ্টলি যদিও অম্লজান বায়ু প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তবুও পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ ফ্লজিষ্টনবাদ ত্যাগ করিতে পারেন নাই।...এরূপ অন্ধ সংস্কার বহু স্থানে সত্যের প্রকৃত মূর্ত্তি দর্শনে বাধা জন্মায়; এবং এই জন্যই যাঁহারা এই সংস্কারগুলি ভাঙ্গিয়া সত্যের আলোক সাধারণ মানব সমীপে উপস্থিত করেন. তাঁহারা মহাপুরুষ বা যুগাবতার বলিয়া খ্যাত হয়েন। লাবোয়াজিয়ে একজন মহাপুরুষ তিনি নূতন পথে চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করেন।" দহনতত্ত্বের সঠিক কারণ আবিষ্কার করার পর, "একদিন লাবোয়াজিয়ে ও তাঁহার স্ত্রী প্রাচীন মিশর দেশীয় পুরোহিত ও তৎপত্নী সাজিয়া তখনকার ফ্লজিষ্টনবাদ-দুষ্ট বহু গ্রন্থ অগ্নি প্রদানে ভস্মীভূত করেন এবং বলেন যে, পুরাতনের এই ভস্ম হইতে রাসায়নিক বিদ্যা নূতন উজ্জ্বল মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া লোক সমাজে আদৃত হইবে।"

এইরূপ সুললিত ভাবে পরিবেষণ করা বৈজ্ঞানিক অনুচ্ছেদ আচার্য্যদেবের রচনায় ছড়াইয়া আছে। আচার্য্যদেব হাতে কলমে দেখাইয়া গিয়াছেন যে আমাদের ভাষায় রসায়নের রচনা রসসিক্ত করিয়া বলা সম্ভব। যে কালে তিনি এই সাহসিক প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার বিভিন্ন বিচিত্র প্রতিভার একটু ক্ষণপ্রভ পরিচয় মাত্র। যাহাই হউক যে দীপবর্ত্তিকা তিনি জ্বালাইতে চাহিয়াছিলেন, আজ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ সেই দীপ্ত দীপবর্ত্তিকা লইয়া সুদূরে অভিসারী হইবে ভরসা করি।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

বাঙালী কলেজ ছাত্রদিগের দৈহিক দৈর্ঘ্য ও মস্তকাকারের ভেদ

শ্রীমীনেন্দ্রনাথ বসু

১৯২২ হইতে ১৯২৮ সালের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে বাঙালী কলেজ ছাত্রদিগের যে সকল মাপ্‌জোক লওয়া হইয়াছিল, তাহার উপরে ভিত্তি করিয়া অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গত অধিবেশনে নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সভাপতির ভাষণ দিয়াছেন। মাপ্‌জোক্‌গুলি 'মনাকো সম্মতি' (Monaco Agreement) অনুসারে লওয়া হইয়াছিল। মাপ্‌জোকের জন্য মার্টিন সাহেবের 'এন্‌থ্রোপোমিটার' ও 'স্প্রেডিং ক্যালিপার' যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল। মস্তকের লম্ব ও প্রস্থরেখা ও দৈহিক দৈর্ঘ্যের মাপ্‌ লওয়া হয়। ছাত্রদিগের বয়স উনিশ হইতে পঁচিশের মধ্যে অর্থাৎ গড়ে প্রায় একুশ (২০'৯) বৎসর ছিল।

মাপ্‌জোকের উপাত্তগুলিকে (data) লইয়া বাংলাকে ছয়টী বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে—কলিকাতা, রাঢ় (পশ্চিম বাংলা), বরেন্দ্র (উত্তর ও মধ্য বাংলা), বঙ্গ (পূর্ব্ব বাংলা), চট্টল (দক্ষিণ-পূর্ব্ব বাংলা) ও সমতট (বাংলার ব দ্বীপ অঞ্চল)। নিম্নলিখিত পাঁচটী শ্রেণীও সম্প্রদায়ের লোকের উপর এই মাপ্‌জোক লওয়া হইয়াছে; যথা,—১। ব্রাহ্মণ, ২। বৈদ্য, ৩। কায়স্থ, ৪। অন্যান্য হিন্দুবর্ণ এবং ৫। মুসলমান। ইহারা সাধারণতঃ ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। অতএব বাংলার এই শ্রেণীগুলি ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের বিষয়ে মাপ্‌জোকের দ্বারা সংগৃহীত তথ্য বিশেষ কোন আলোকপাত করে না।

বাংলার বিভিন্ন অংশে যে সকল জেলায় গড়ে বিশেষ কোন ভেদ পরিলক্ষিত হয় না, সেইগুলিকে একত্রে ধরা হইয়াছে। যথা,—হাওড়া ও হুগলী এই জেলা দুইটী যদিও সমতট অঞ্চলের বাহিরে পড়ে, তাহা হইলেও উপরোক্ত বিভাগ অনুসারে সমতটের মধ্যে ধরা হইয়াছে; ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ সমতটের অন্তর্ভুক্ত হইলেও বঙ্গ বিভাগের এবং ত্রিপুরাকে চট্টলের পরিবর্ত্তে বঙ্গে ধরা হইয়াছে।

দেহের দৈর্ঘ্য ও মস্তকাকারের বিভাগীয় ভেদ এইরূপ দেখা গিয়াছে:—

(ক) কলিকাতা ব্যতীত সমগ্র প্রদেশে দৈর্ঘ্যের সমক প্রায় সমভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে। কেবলমাত্র সমতট ও বঙ্গ, সমতট ও চট্টল, কলিকাতা ও অন্যসকল বিভাগের অন্যান্যের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। বিভাগের মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ নাই।

(খ) মস্তকাকারের সমক ও ভেদের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। সমক হইতে বিভিন্ন মাপ্‌জোকের বিস্তৃতি যথেষ্ট প্রসারিত।

(গ) রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গের মধ্যে সাম্যের লক্ষণ বিশেষভাবে নজরে পড়ে।

(ঘ) সমতট ও কলিকাতার অধিক দৈর্ঘ্য ও চওড়া মাথার দিকে সাম্য বিশেষভাবে দেখা যায়।

লেখক উপাত্তগুলিকে বিশেষভাবে প্রমাণ করিবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির দৈহিক দৈর্ঘ্য ও মস্তকাকারের অনুবন্ধ টানিয়া মার্টিন ও হ্যাডনের নির্দ্দিষ্ট বিভাগ নির্ণয়ের পদ্ধতি অনুসারে ৯টী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন:—

খর্ব্বাকৃতি—লম্বা, মধ্যম ও চওড়ামাথা।
মধ্যমাকৃতি—লম্বা, মধ্যম ও চওড়ামাথা।
উচ্চাকৃতি—লম্বা, মধ্যম ও চওড়ামাথা।

ছয়টী বিভাগের উপরোক্ত অনুবন্ধ বিশ্লেষণে দেখা যায় :—

১। মধ্যমাকৃতি মধ্যম মাথার সংখ্যা কলিকাতা ব্যতীত সমগ্র বিভাগেই জনসংখ্যায় বেশী। কলিকাতায় মধ্যমাকৃতি চওড়া মাথার সংখ্যা বেশী।

২। ইহার ঠিক্ পরেই মধ্যমাকৃতি চওড়া মাথার সংখ্যা। এই উভয় প্রকার লোক লইয়া বাংলার অর্দ্ধেক জনসংখ্যা। (এই দুইয়ের সমষ্টির শতকরা—রাঢ় ৪৮'৯৬, বরেন্দ্র ৫০'৪৮, বঙ্গ—৪৮'১০, চট্টল—৪২'৪২, সমতট—৫৪'২৪, কলিকাতা—৫২'৬৮)।

৩। চট্টল ব্যতীত সমগ্র বিভাগে উচ্চাকৃতি মধ্যম মাথার সংখ্যা তৃতীয়স্থান দখল করে।

৪। রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গে মধ্যমাকৃতি লম্বামাথা সমভাবে বিস্তারিত, চট্টলে ইহার সংখ্যা বেশী ও এবং সমতট ও কলিকাতায় ইহার সংখ্যা কম।

৫। সমতট ও কলিকাতা ব্যতীত লম্বাকৃতি চওড়ামাথা ও খর্ব্বাকৃতি মধ্যম মাথার লোক কিছু পাওয়া যায়।

৬। অবশিষ্ট খর্ব্বাকৃতি লম্বামাথা খর্ব্বাকৃতি চওড়ামাথা ও উচ্চাকৃতি লম্বামাথার সংখ্যা সামান্য।

৭। অন্যান্য বিভাগের তুলনায় কলিকাতা ও সমতটের লম্বামাথা খর্ব্বাকৃতি, মধ্যমাকৃতি ও উচ্চাকৃতির সংখ্যা খুবই কম। এই দুই স্থানে উচ্চাকৃতি চওড়মাথার সংখ্যা বেশী।

৮। রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাধান্য একই রূপ।

৯। চট্টলে খর্ব্বাকৃতি লম্বামাথার সংখ্যা খুবই বেশী, তাহার পর মধ্যমাকৃতি মধ্যম মাথার সংখ্যা। উচ্চাকৃতি মধ্যম ও চওড়ামাথার সংখ্যা সামান্য মাত্র।

ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দৈহিক দৈর্ঘ্য ও মস্তকাকারের ভেদ নিম্নে দেওয়া হইল :—

রাঢ়—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ নাই, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকেরই সঙ্গে অন্যান্য হিন্দুবর্ণ ও মুসলমানের সহিত পার্থক্য দেখা যায়। অন্যান্য হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ নাই।

বরেন্দ্র—এইখানে সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যমাকৃতি মধ্যম ও চওড়ামাথারই প্রাধান্য।

বঙ্গ—এইখানে সমগ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যমাকৃতি মধ্যম মাথার সংখ্যা বেশী।

চট্টল—এখানেও মধ্যমাকৃতি মধ্যম মাথারই প্রাধান্য তবে ইহারা ও মধ্যমাকৃতি চওড়ামাথা উভয়ে মিলিয়া প্রায় ৪৩ (৪২'৪১) ভাগ স্থান লইয়াছে।

সমতট—এই বিভাগে মধ্যমাকৃতি মধ্যম ও চওড়ামাথার সংখ্যাই অধিক।

কলিকাতা—মুসলমান ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ নাই। কলিকাতায় যে সকল অল্পসংখ্যক মুসলমানের মাপ্‌জোক করা হইয়াছে, উহারা অধিকাংশ অবাঙালী। অতএব লেখকের মতে উহাদিগের বাদ দেওয়া ন্যায় সঙ্গত।

বিভাগের একই সম্প্রদায়ের দৈহিক দৈর্ঘ্য ও মস্তকাকারের ভেদ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে :—

সমতট ও বঙ্গ, সমতট ও চট্টল, কলিকাতা ও বঙ্গ, কলিকাতা ও চট্টলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের দৈহিক দৈর্ঘ্য ও মস্তকাকারের ভেদ লক্ষিত হয়। সমতট ও রাঢ়, সমতট ও বরেন্দ্র, কলিকাতা ও রাঢ়, বরেন্দ্র ও চট্টল, রাঢ় ও চট্টলের মধ্যে কেবল মাত্র মস্তকাকারের ভেদ দৃষ্ট হয়।

সমতট ও বঙ্গ ব্যতীত বিভিন্ন বিভাগে বৈদ্য সংখ্যার উপাত্ত এত কম যে অন্তর্বর্ত্তী বিভাগ ভেদের বিষয় কোন মন্তব্য করা যায় না। বঙ্গ ও সমতটের বৈদ্যের মধ্যে দৈহিক দৈর্ঘ্য ও মস্তকাকারের ভেদ আছে। সমতটের বৈদ্যেরা বঙ্গের বৈদ্য অপেক্ষা খর্ব্বাকার ও অপেক্ষাকৃত চওড়ামাথা বিশিষ্ট।

সমতট ও বঙ্গ, কলিকাতা ও বঙ্গ, কলিকাতা ও চট্টলের কায়স্থ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান আছে। রাঢ় ও সমতট, রাঢ় ও বঙ্গ, রাঢ় ও চট্টল, রাঢ় ও কলিকাতা, বরেন্দ্র ও সমতট, বরেন্দ্র ও চট্টল, বরেন্দ্র ও কলিকাতা, বঙ্গ ও চট্টল, সমতট ও চট্টলের কায়স্থের মধ্যে কেবলমাত্র মস্তকাকারের ভেদ দৃষ্ট হয়। সমতট ও কলিকাতা এবং রাঢ় ও বঙ্গে ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবলমাত্র দৈহিক দৈর্ঘ্যের ভেদ বোঝা যায়। মোটের উপরে বিভিন্ন বিভাগে কায়স্থের মস্তকাকারের ভেদই বিশেষভাবে বর্তমান।

সমতট ও রাঢ় এবং সমতট ও বঙ্গ ব্যতীত অন্যান্য হিন্দুবর্ণের বিভিন্ন বিভাগে মস্তকাকারের বিশেষ কোন ভেদ নাই, অর্থাৎ সমগ্র প্রদেশে অন্যান্য বর্ণ হিন্দুদিগের মধ্যে বিশেষ সাম্য পরিলক্ষিত হয়।

মুসলমানদিগের মধ্যে দৈর্ঘ্যের ভেদ বিশেষভাবে বিদ্যমান মনে হয়, বিশেষ করিয়া সমতট ও বঙ্গ, রাঢ় ও বঙ্গ, বরেন্দ্র ও বঙ্গ এবং বঙ্গ ও চট্টলের মধ্যে। ইহা ব্যতীত মুসলমানদিগের মধ্যে শতকরা আপতনের সংখ্যা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে,—

ক। মধ্যমাকৃতি মধ্যম মাথার সংখ্যাই বেশী, কেবলমাত্র চট্টলে মধ্যমাকৃতি চওড়ামাথা অপেক্ষাকৃত বেশী।

খ। উচ্চাকৃতি চওড়ামাথার সংখ্যা অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় কম।

বৈজ্ঞানিক অন্বেষণকারী এইরূপ তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া নানাবিধ সন্দেহ দ্বারা পীড়িত হইয়া পড়েন। তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন যে এই নির্ণয়কের দ্বারা অন্তর্বর্তী বিভাগভেদের ঠিক পথ পাওয়া অনিশ্চিত। বিভাগীয় অবস্থার পার্থক্য এই ধরনের ভেদের উৎপত্তির নানাবিধ কারণ দেখাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। ভবিষ্যতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানের জন্য বক্তা বলেন যে বিভাগগুলির পারিপার্শ্বিক অবস্থা জানিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করিলে সঠিক ফল আহরণে সুবিধা হইবে।

মাপ্‌জোকের আলোকে সম্প্রদায় ও বিভাগীয় ভেদ ও দৈহিক দৈর্ঘ্য ও মস্তকাকারের নির্ণয়ে কিরূপ স্থান পাইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল:—

ক। সমতটের ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য হিন্দুবর্ণের মধ্যে দৈহিক দৈর্ঘ্যের ভেদ সমতটের ব্রাহ্মণ ও বঙ্গের ব্রাহ্মণের মধ্য অপেক্ষা বেশী।

খ। বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য হিন্দুবর্ণের মধ্যে দৈহিক দৈর্ঘ্যের ভেদ কম।

গ। সমতট ও বঙ্গের ব্রাহ্মণের মধ্যে মস্তকাকারের ভেদ সমতটের ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য হিন্দুবর্ণের মধ্য অপেক্ষা বেশী।

ঘ। বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও সমতটের হিন্দুবর্ণের মধ্যে মস্তকাকারের ভেদ সমতটের ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য হিন্দুবর্ণের মধ্য অপেক্ষা কম।

এই সকল পার্থক্য কিরূপে ঘটিল? কোন পারিপার্শ্বিক বা অন্য কারণে কতটুকু ভেদ ঘটিল? এ বিষয়ে আমাদের এখন নিরুত্তর থাকিতে হইবে।

মস্তকাকারের উপাত্তগুলিকে রেখাচিত্রে অঙ্কিত করিয়া দেখা গিয়াছে যে রাঢ়, বঙ্গ ও বরেন্দ্র বিভাগে সাম্য বিদ্যমান। সমতট ও কলিকাতার চিত্রও ঐরূপ সাম্যের প্রমাণ দিয়াছে। চট্টলের চিত্র সম্পূর্ণ অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে; সম্ভবত মস্তকাকারের জন্য পৃথক হইয়াছে। ব-দ্বীপ অঞ্চল বা সমতট সহ কলিকাতা ও রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গ বিশেষভাবে সাম্যের পরিচয় দিয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল এই সকল সাম্য কি প্রকারে সম্ভব হইল? উত্তরে বলা যাইতে পারে যে বাংলার লোকদিগের মধ্যে সাম্য বিদ্যমান ছিল, পরে বর্ণপ্রতিষ্ঠা ইহাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই সমস্যা নৃতত্ত্বের দৈহিক শাখার আলোচনার বাহিরে—ইহার উত্তর সামাজিক ইতিহাসের পক্ষে সম্ভব। অথবা পূর্ব্বেকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বাংলার লোককে একই জীবশ্রেণী ভুক্ত করিতে তাহাদের দৈহিক দৈর্ঘ্য ও মস্তকাকারের গঠনে সহায়তা করিয়াছে ও করিতেছে।

উপসংহারে বলা যাইতে পারে যে বাংলার সমস্ত অঞ্চলের বাঙালীদিগের মধ্যে যথেষ্ট আকৃতিগত সাম্য বিদ্যমান।

স্বপ্ন

শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র

প্রাত্যহিক জীবনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে স্বপ্ন দেখা যে তার মধ্যে একটা সেটা আমরা অনেক সময় উপলব্ধি করি না অথবা উপলব্ধি করলেও তার উপর কোনও গুরুত্ব আরোপ কখন করি না। বরং স্বপ্ন বিষয়ে কোনও রকম গুরুগম্ভীর আলোচনা করবার প্রবৃত্তি যাঁদের মধ্যে দেখতে পাই তাঁদের আমরা নিতান্ত দুর্ব্বলচিত্ত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলেই মনে করি। মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলে স্বীকার করে নেবার বিপক্ষে একটা মস্ত বড় যুক্তিই ত' এই যে তথাকথিত মনোবিজ্ঞান জগতের বড় বড় অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার সমূহের (যেমন অ্যাটম্ বম্ প্রভৃতি) দিকে দৃষ্টি না দিয়ে জীবনের যত সব ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনার,—যেমন স্বপ্ন, ভুলে যাওয়া প্রভৃতির আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে থাকে। স্বপ্ন ব্যাখ্যা করা ত' দিদিমা, ঠাকুরমাদের কাজ, বিংশ শতাব্দীর কোনও বৈজ্ঞানিকের ঐ বিষয় নিয়ে মস্তিষ্ক চালনা করা সময় এবং শক্তির নিছক অপব্যবহার মাত্র। উপরন্তু স্বপ্ন ত' একটা অত্যন্ত অসার অলীক অযৌক্তিক ব্যাপার—সাধারণ ভাবেই তার কোন একটা সঙ্গত আলোচনা করা যায় না—বৈজ্ঞানিক আলোচনা আবার কি করে হবে?

যা হোক, স্বপ্ন সম্বন্ধে আলোচনা বৈজ্ঞানিক কি অবৈজ্ঞানিক সে প্রশ্ন উত্থাপন করবার উপস্থিত প্রয়োজন নেই। বহু পুরাকাল থেকে স্বপ্ন বিষয়ে লোকে বিচার বিবেচনা করে আসছে; স্বপ্নের প্রকৃতি, কারণ, উদ্দেশ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা পণ্ডিত নানা মত প্রচার করে গেছেন। মনোবিদরা মানসিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেন, স্বপ্ন একটা মানসিক ঘটনা সুতরাং তাঁদের এ আলোচনায় যোগদান করতে কুণ্ঠিত হবার কোন কারণ ত' নেইই বরং না করাটা হবে তাঁদের কর্ত্তব্যের ত্রুটি। ক্ষুদ্র তুচ্ছ ব্যাপার বলেই কি কোনও বিষয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের অযোগ্য হতে পারে? গাছ থেকে আপেল পড়ে যাওয়াটা কি এমন একটা প্রকাণ্ড ঘটনা? সেই ক্ষুদ্র ঘটনার উপর ভিত্তি করেই পদার্থবিজ্ঞানের একটা বৃহৎ আবিষ্কার হয়। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক তাই আপাত তুচ্ছ হলেও কোন ঘটনাই অনুসন্ধানের অযোগ্য মনে করেন না।

উপরন্তু এক হিসাবে বলা যায় স্বপ্নই মনোবিদ্যা, শুধু মনোবিদ্যা কেন সমস্ত দর্শনশাস্ত্রেরই জন্মদাতা। আদিম যুগে জীবনের যে দুটী ঘটনা মানুষের কৌতূহল প্রবৃত্তিকে সবচেয়ে তীব্রভাবে উত্তেজিত করেছিল তার একটী হচ্ছে স্বপ্ন আর একটী মৃত্যু। এই দুটী ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা থেকেই অশরীরী মন, আত্মা, প্রভৃতি ধারণার প্রথম উদ্ভব হয়। অনেক যুগ ধরে নানা পথ বিপথে ঘুরে বহু তত্ত্বের (ism এর) সৃষ্টি করে মনোবিদরা আজ আবার উপলব্ধি করেছেন যে মনের প্রকৃতি এবং কার্য্যাবলী সম্বন্ধে উপযুক্ত ধারণা করতে গেলে স্বপ্নালোচনা এড়িয়ে গেলে চলবে না। পুরাকালে স্বপ্ন যেমন মন সম্বন্ধে আলোচনার প্রথম সৃষ্টি করেছিল আজ আবার সেই আলোচনাকে এগিয়ে দেবার জন্য সহায়তা করবে। স্বপ্ন তাই আজ মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

স্বপ্ন কাকে বলে সকলেই জানেন এবং বোঝেন। তবে স্বপ্নের দুএকটী বিশেষ লক্ষণের কথা এখানে মনে করে নেওয়া ভাল। প্রথম লক্ষণ নিদ্রার সঙ্গে স্বপ্নের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, না ঘুমুলে আমরা স্বপ্ন

দেখি না—নিদ্রা ব্যতিরেকে স্বপ্ন হতে পারে না যদিও স্বপ্নবিহীন নিদ্রা অনেক সময়েই হয়। সুতরাং স্বপ্ন নিদ্রাবস্থারই একটী মানসিক ঘটনা। দ্বিতীয়ত স্বপ্ন সম্বন্ধে আর একটী লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে স্বপ্ন আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। সমস্ত রাত হয়ত' স্বপ্ন দেখলুম কিন্তু সকালে উঠে' আর কিছুই মনে রইল না। তা বলে সব স্বপ্নই যে একেবারে ভুলে যাই তা নয়। তবে ভুলে যাওয়াটাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঘটে।

তারপর স্বপ্ন চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়—অর্থাৎ স্বপ্ন আমরা দেখি,—শুনি না বা স্পর্শ, আঘ্রাণ প্রভৃতি করি না। নির্ব্বাকচিত্রে (Bioscope) যেমন একটী সাদা পর্দ্দার উপর সমস্ত ঘটনা ঘটে যায় আর আপনি তা দর্শকরূপে শুধু দেখে যান, স্বপ্ন দেখা ব্যাপারটীও ঠিক সেই রকম। একটা আপত্তি বোধ হয় আপনাদের মনে জাগছে। স্বপ্ন কি ঘুমিয়েই দেখি, কেন জেগে জেগে কখন স্বপ্ন দেখি না? তরুণ তরুণীরা, যুবক যুবতীরা জাগ্রত অবস্থাতেই ভবিষ্যতের কত রঙীন স্বপ্নই ত' দেখেন। চাষীর মেয়ে,—সেও ত' মাঠে বসে দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখে, রাজপুত্র এসে তার প্রেমপ্রার্থী হবে, তাকে রাজরাণী করে নিয়ে যাবে। এ রকম স্বপ্ন অল্পবিস্তর আমরা সকলেই দেখি। ভবিষ্যতের এই ধরণের কল্পনাকে জাগর-স্বপ্ন বা দিবা-স্বপ্ন (Day dreams) বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত স্বপ্নের সঙ্গে দিবা-স্বপ্নের একটী বিশেষ প্রভেদ আছে। এই ধরণের কল্পনারাজ্যে যখন আপনি আপনাকে ছেড়ে দেন, তখন এ সবটাই যে নিছক কল্পনা সে বিষয় আপনি সম্পূর্ণ সচেতন থাকেন। কিন্তু ঘুমিয়ে স্বপ্ন যখন দেখেন তখন আপনি স্বপ্ন দেখছেন এ জ্ঞান আপনার আদৌ থাকে না।

যে সমস্ত স্বপ্ন আমরা দেখি সেগুলিকে এক হিসাবে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম, কতকগুলি স্বপ্নের বিষয়বস্তু বেশ সহজ সরল স্বাভাবিক অসামঞ্জস্যবিহীন এবং অর্থপূর্ণ। ছোট ছেলেদের বেশীর ভাগ স্বপ্ন এই ধরণের। স্বপ্ন যা দেখা যায়, জাগ্রত অবস্থায় তা ঘটা আদৌ অসম্ভব নয়। দ্বিতীয়, কতকগুলি স্বপ্ন অসামঞ্জস্য-বিহীন এবং অর্থপূর্ণও বটে, তবে জাগ্রত জীবনের ঘটনাবলীর সঙ্গে স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনার যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন ধরুন একজন স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁর বন্ধু ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হওয়ায় লোকেরা তাঁকে হাঁসপাতালে নিয়ে গেছে এবং সেখানে বন্ধুটীর মৃত্যু হয়েছে। এরূপ ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয় কিন্তু বন্ধু জীবিত আছেন সুতরাং বাস্তব-জীবনের ঘটনার সঙ্গে এই স্বপ্নের খাপ খাওয়ান যায় না। তৃতীয়—কতক-গুলি স্বপ্ন একেবারে অর্থহীন আজগুবি অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ, কোনও ঘটনার সঙ্গে কোনও ঘটনার যোগাযোগ নেই। জাগ্রত জীবনের ধারার সঙ্গে ত' কোনও মিলই নেই—থাকতে পারে না। বেশীর ভাগ স্বপ্ন এই ধরণেরই হয়। শেষোক্ত জাতীয় স্বপ্নে একটা অবাস্তবতার অপরিচয়ের ভাব থাকে। স্বপ্নদ্রষ্টা তাঁর নিজের জীবনের সঙ্গে এদের খাপ খাওয়াতে কোনও রকমেই পারেন না। তাই তিনি মনে করেন, সত্যিই এগুলি একেবারে বাহিরের জিনিস—অন্য পৃথিবীর জিনিস, তিনি যে পৃথিবীতে বাস করেন, যে চিন্তা জগতে বিরাজ করেন, তার সঙ্গে এদের কোন যোগাযোগ নেই।

কিন্তু সত্যিই কি নেই? আপনি ঐ রকম আজগুবি স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা ত' একটা বাস্তব ঘটনা। তার কি কোন কারণ নেই? কারণ ভিন্ন যে কোন কার্য্য হয় না এটা ত' বিজ্ঞান দর্শন সবেরই গোড়ার কথা। কোন একটা চিন্তা যখন আপনার মনে আসে তখন সেটা ত' হঠাৎ বিনা কারণে আসে না, আপনার পূর্ব্ব জীবনের অভিজ্ঞতা, আপনার ইচ্ছা, প্রক্ষোভ প্রভৃতির ভিতরেই তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। আপনার স্বপ্ন দেখা—তা যে স্বপ্ন যত উদ্ভটই হোক—আপনার মনেরই একটা ঘটনা। সুতরাং তার কারণের সন্ধানও নিশ্চয়ই

আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা, ইচ্ছা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, ধারণা প্রভৃতির ভিতর থেকে পাওয়া যাবে। এ কথা আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক (চিকিৎসক) ফ্রয়েডই প্রথম জোর করে বলেছেন। মানসিক রোগগ্রস্তদের চিকিৎসা করতে করতেই তিনি তাঁর নতুন স্বপ্নতত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁর মতে স্বপ্ন কতকগুলি তুচ্ছ অর্থ ও সামঞ্জস্য-হীন মানসিক ব্যাপারের যথেচ্ছ সমাবেশ নয় পরন্তু অত্যন্ত অর্থপূর্ণ, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ মানসিক ঘটনার বিকৃতভাবে বিকাশ। প্রত্যেক স্বপ্নই কোন একটা ইচ্ছা পূরণ করে বা করবার চেষ্টা করে। এ তত্ত্ব মেনে নেবার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই আপনারা অনেক যুক্তির অবতারণা এখনই করতে পারেন। কিন্তু আপত্তি করবার আগে তত্ত্বটা আর একটু বিশদভাবে বোঝবার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

স্বপ্নে যা দেখি তা অর্থপূর্ণই হোক বা অর্থহীনই হোক তাকে স্বপ্নের ব্যক্ত অংশ (Patent or manifest content) বলা যায়। এই ব্যক্ত অংশের এক একটীর প্রকরণ কোনও অবদমিত চিন্তাশ্রেণীর বা প্রক্ষোভের রূপান্তর। অবাধ ভাবানুষঙ্গ প্রণালীর (Free Association Method-এর) সাহায্যে ব্যক্ত অংশটীর বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায় তার নাম স্বপ্নের অব্যক্ত অংশ (latent content)। ব্যক্ত অংশ যতই আজগুবি হোক অব্যক্ত অংশ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অর্থবিশিষ্ট। প্রায়শই এই অব্যক্ত অংশ এমন কোনও একটী বাসনা বা মানসিক অবস্থা, সামাজিক জীবনে যা চরিতার্থ করা বা যার বিকাশ করা সম্ভবপর নয়। সামাজিক আদর্শের বিরুদ্ধে বলেই কতকগুলি চিন্তা ভাব প্রভৃতি অবদমিত হয়ে মনের নির্জ্ঞান স্তরে চলে যায়, মনঃসমীক্ষণ এই শিক্ষা আগেই দিয়েছে আমাদের। কিন্তু নির্জ্ঞান স্তরের জিনিসের স্বভাবই হচ্ছে এই যে তারা ক্রমাগত সজ্ঞান স্তরে (conscious level-এ) আসতে চায়। মনের প্রহরী (censor)—যাকে বিবেক বলে মনে করতে পারেন—তাদের নিজরূপে সজ্ঞানে আসতে দেয় না; তাই তারা ছদ্মবেশে সজ্ঞানে আসে। প্রহরীকে এড়িয়ে সজ্ঞানে আসবার নানা রকম উপায়ের ভিতর স্বপ্নও একটী উপায়। স্বপ্নের ব্যক্ত অংশ তাই মানসিক রোগের লক্ষণের (Symptom-এর) ন্যায় অর্থহীন হয়, প্রকৃত অর্থ লুকিয়ে রাখাই তার কাজ।

অব্যক্ত অংশ কি করে ব্যক্ত অংশে পরিণত হয় তার কতকগুলি সূত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। একটী সূত্রের নাম সংক্ষেপণ (condensation)। অব্যক্ত অংশের অনেকগুলি প্রকরণ মিশিয়ে হয়ত' ব্যক্ত অংশের একটী প্রকরণ সৃষ্ট হয়। স্বপ্নে যে লোককে বেঁটে ও অন্ধ দেখলেন, তিনি হয়ত' আপনার জানা একজন বেঁটে এবং আর একজন অন্ধ—এই দুজনকেই বোঝাতে পারে। আবার একটী লোকের তিনটী গুণ প্রকাশের জন্য স্বপ্নে হয়ত' আপনি তিনটি লোক দেখলেন। লোক সম্বন্ধে যেমন স্থান নাম ইচ্ছা প্রভৃতির সংমিশ্রণ তেমনি ব্যক্ত অংশে একটা অর্থহীন প্রকরণের সৃষ্টি হতে পারে। বোম্বেতে কন্‌ফারেন্সে যাওয়া উচিত না শরীরটা সারাতে বন্ধুর কাছে এলাহাবাদে যাওয়া প্রয়োজন—কদিন ধরে চিন্তা করবার পর স্বপ্নে হয়ত' দেখলেন যে আপনি ট্রেন করে বেড়াতে যাচ্ছেন, একটী ষ্টেশনে নামলেন যার নাম বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে Allambay (Allahabad এবং Bombayর সংমিশ্রণ)। এটা অবশ্য খুব সরল একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। আসলে যা ঘটে তা এর চেয়ে ঢের বেশী জটিল। এই সংক্ষেপণ ব্যাপার শুধু যে স্বপ্নেরই বিশেষত্ব তা নয়। হাস্যরসসৃষ্টিতে (wit), কাব্যালঙ্কারে, ভাষার ক্রমপরিণতিতে সংক্ষেপণের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় সূত্রটীকে অভিক্রান্তি (Displacement) বলা হয়। অনেক সময় ব্যক্ত অংশের কোন একটা ক্ষুদ্র প্রকরণ অব্যক্ত অংশের দামী প্রকরণের প্রকাশক হয়। এর ঠিক বিপরীতও আবার হয়; ব্যক্ত অংশের

খুব বড় রকমের একটা প্রকরণ হয়ত' অব্যক্ত অংশের অকিঞ্চিৎকর কোনও ঘটনার নির্দ্দেশ দেয়। আর এক রকমের অভিক্রান্তি হয় প্রক্ষোভ সম্পর্কে। ছোট একটা ঘটনার সঙ্গে গভীর প্রক্ষোভ যুক্ত হতে পারে। আবার বড় একটা ঘটনা—যেখানে প্রক্ষোভ আশা করা স্বাভাবিক—সেখানে কোন চিত্তবিকারই নেই অথবা অশোভন বিপরীত কোনও ভাবের প্রকাশ দেখা যায়। স্বামীর কোনও নিকট আত্মীয়ের মৃতদেহ সংকারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সঙ্গে অনেক লোক কনসার্ট-এ খুব হাল্কা নাচের গান বাজাতে বাজাতে এবং আনন্দের আতিশয্যে নাচতে নাচতে যাচ্ছে, তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রা দেখছেন। এক মহিলা এই স্বপ্ন দেখেছিলেন। এটা বাস্তব দৃষ্টান্ত। অভিক্রান্তিও প্রকৃত মনোভাব গোপন রাখবার সাহায্যতা করে।

তৃতীয় সূত্রটীর ইঙ্গিত আগেই দিয়েছি। এর নাম নাটন (Dramatisation)। স্বপ্নে সমস্ত ঘটনাই ছবির আকারে আসে। একজন কিছু খাচ্ছেন বা ছেলেকে প্রহাব করছেন এরকম ঘটনা ছবিতে সহজেই দেখান যায়। কিন্তু আপনি আর একজনের উপর যে ঘৃণার বা অবজ্ঞার ভাব পোষণ করেন তা কি করে ছবিতে দেখান যায়। ধরুন ঘৃণিত লোকটীর দেহের উপর কোন একটী ঘৃণ্য জানোয়ারের মাথা দেখলেন। অবজ্ঞা প্রকাশ পেল নাকি? ভাল্লুক বুলডগ প্রভৃতির ছবির ভিতর দিয়ে এক একটা জাতের মানসিক বৈশিষ্টের পরিচয় দেওয়া হয়, তা ত' জানেন। খবরের কাগজে নানা রকমের ব্যঙ্গচিত্র দেখেছেন। স্বপ্নে মানসিক গুণাবলীর প্রকাশ এই ধরণের চিত্রের সাহায্যে হয়ে থাকে। গুণবাচক (adjectives), নঞর্থক (negatives) প্রভৃতি কি ভাবে স্বপ্নের ব্যক্ত অংশে পরিস্ফুট হয় সে বিষয়ে ফ্রয়েড এবং অন্যান্য সমীক্ষকেরা বহু গবেষণা করেছেন এবং বহু তথ্য আবিষ্কার করেছেন।

এই সূত্রের সাহায্যে অদমিত কোন বাসনা সজ্ঞানে প্রবেশ করে নিজেকে চরিতার্থ করে। এই হল স্বপ্নের মোটামুটি তত্ত্ব। এই তত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেক স্বপ্নেরই অর্থ আছে। বিশ্লেষণ করলে সেই অর্থের সন্ধান পাওয়া যায়। বিশ্লেষণ করবার উপায় হচ্ছে অবাধ ভাবানুষঙ্গ (Free Association Method)। ধরুন আপনার সঙ্গে কোন এক ব্যক্তি এমন ব্যবহার করলেন যে আপনি নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন—কিন্তু ঘটনাচক্র এমন ছিল যে লোকটীর বিরুদ্ধে একটা নিষ্ফল আক্রোশের ভাব পোষণ করা ছাড়া আপনার আর কিছু করবার ছিল না। আপনি স্বপ্ন দেখলেন যে, একটী ছোট ছেলে একটী বন্য ভাল্লুককে অস্ত্রাঘাত করতে করতে একেবারে কাবু করে দিলেন ছোট ছেলে যদি আপনি হন এবং বন্য ভাল্লুক যদি সেই অপমানকারী ভদ্রলোক হন, তা হলে স্বপ্নের অর্থ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। বলে রাখি, এটাও একটী কাল্পনিক সহজ দৃষ্টান্ত।

মনোজগতে প্রতীক (Symbols) একটী বিশেষ স্থান অধিকার করে। দেহ, জননেন্দ্রিয়, পিতা, মাতা প্রভৃতি ব্যক্ত করতে কতগুলি এক ধরণের প্রতীক প্রায় সব দেশেই প্রচলিত আছে। স্বপ্নে এই প্রতীক সমূহের যথেষ্ট ব্যবহার হয়। স্বপ্নে সম্রাট বা সম্রাজ্ঞী পিতামাতার প্রতীক, লাঠি গাছ প্রভৃতি পুংলিঙ্গের এবং বাক্স দরজা প্রভৃতি স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের প্রতীক।

শরীরতত্ত্ববিদদের মতে স্বপ্নের একমাত্র কারণ বহিরাগত কোনও উত্তেজনা। মস্তিষ্কে যে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আছে, নিদ্রাকালে তা শিথিল হয়ে আসে। তাই স্বপ্ন অমন এলোমেলো ধরণের হয়। তৃষ্ণার্ত্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়লেন স্বপ্নে দেখলেন জল পান করছেন। সুতরাং শরীরের তৃষ্ণার্ত্ত অবস্থাটাই ঐ স্বপ্নের একমাত্র কারণ। আলোটা জেলে রেখেই ঘুমুলেন; স্বপ্নে দেখলেন কোথাও যেন আগুন লেগেছে। এ স্বপ্নের কারণ ঐ বাস্তব আলোর শরীরের উপর

প্রতিক্রিয়া। বিস্তৃতভাবে এ তত্ত্ব আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। তবে একথা বলা যায় যে স্বপ্নের সাধারণ তত্ত্ব হিসাবে শরীরতত্ত্ববিদদের মত গ্রহণ করা যায় না। তর্কশাস্ত্র এবং বাস্তব ঘটনা দুইই এ তত্ত্বের বিপক্ষে। এক সময় লোকের ধারণা ছিল—এখনও অনেকের আছে—যে স্বপ্ন ভবিষ্যৎ ঘটনার নির্দ্দেশ দেয় বা দূরস্থিত প্রিয়-জনের সংবাদ—(দুঃসংবাদই) বহন করে আনে। আপনি স্বপ্নে দেখলেন যে মাদ্রাজে আপনার বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন পরদিন; সকালে ঠিক ঐ মর্ম্মেই মাদ্রাজ থেকে একখানি টেলিগ্রাম পেলেন। বেশীর ভাগ স্বপ্নই ঐ ধরণের নয়। সুতরাং এ তত্ত্বও স্বীকার করে নেওয়া যায় না। শরীরতত্ত্ববিদ এবং অন্যান্য তত্ত্ববিদরা তাঁদের তত্ত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য যে সমস্ত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন, ফ্রয়েডের তত্ত্ব অনুসারে সে সব দৃষ্টান্তেরই সঙ্গত ব্যাখ্যা হতে পারে। সুতরাং ফ্রয়েডের তত্ত্বই যে সব চেয়ে ব্যাপক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

যদি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহা না করিলেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে ফলবতী হইবে না, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখিতে হইবে। দুই চারি জন ইংরাজিতে বিজ্ঞান শিখিয়া কি করিবেন ?……তাহাতে সমাজের ধাতু ফিরিবে কেন ? সামাজিক 'আবহাওয়া' কেমন করিয়া বদলাইবে ? কিন্তু দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে। কেহ ইচ্ছা করিয়া শুনুক আর নাই শুনুক, দশবার নিকটে বলিলে দুইবার শুনিতেই হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবর্ত্তিত হয়। ধাতু পরিবর্ত্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। অতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।

বঙ্গে বিজ্ঞান (বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক ১২৮৯)

বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান সাহিত্য গঠনের পক্ষে ভাষার কাঠামো

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মাতৃভাষার সাহায্যে দেশে বিজ্ঞান প্রচার করতে হলে প্রথম এবং প্রধান প্রয়োজন ঐ ভাষার মধ্যমে বিজ্ঞান-সাহিত্য গড়ে তোলা। এ জন্য প্রথমেই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, "বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের ভাষার কাঠামো কিরূপ হবে?"

ত্রিশ বৎসরের অধিককাল বঙ্গভাষার সাহায্যে পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্গত বিষয়ের আলোচনা করতে গিয়ে এ কথা স্পষ্টই বুঝতে পেরেছি যে, পারিভাষিক শব্দের অভাব বা অনস্তিত্ব বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের পক্ষে একটা বড় রকমের বাধা নয়। এ বিশ্বাসও জন্মেছে যে, বিজ্ঞানের, বিশেষতঃ পদার্থবিজ্ঞানের অন্তর্গত এমন কোন বিষয় নেই যা আমাদের চল্‌তি ভাষার সাহায্যে অত্যন্ত সরল, অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অত্যন্ত মনোরম ভাবে প্রকাশ না করা যেতে পারে। একথাও বেশ দৃঢ়তাবেই বলা যেতে পারে যে, যদি বিজ্ঞান-সাহিত্য গড়ে তুলতে হয় তবে এ বিষয়ে অন্যান্য ভাষার তুলনায় বাঙালীর মাতৃভাষার ক্ষমতা কোন অংশেই কম নয়, বরং কোন কোন বিষয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী।

তবু যে আজ পর্যন্ত বঙ্গভাষায় পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান-সাহিত্য গঠিত হতে পারেনি তার প্রধান কারণ এ বিষয়ে আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের আগ্রহের অভাব। আত্মকেন্দ্রিক সভ্যতার মোহ আমাদেরকে এমন ভাবে পেয়ে বসেছে যে, আমরা আমাদের দেশবাসীকে আপন বলে ভাবতে শিখিনি। এবং তাদের মূর্খ করে রাখা যে কত বড় অন্যায় এবং দেশের কি প্রকাণ্ড ক্ষতি তাও বুঝতে শিখিনি। বিদ্যালয়েও আমরা শিক্ষকতা করে এসেছি ছাত্রদের মানুষ করে তোলার উদ্দেশ্যে ততটা নয় যতটা চাকরির জন্য। এই দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে হবে। যদি সত্যই আমরা স্বাধীন হয়ে থাকি এবং স্বাধীনতার দায়িত্বজ্ঞানের উন্মেষ আমাদের ভেতর অল্পবিস্তর হয়ে থাকে তবে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে অবিলম্বে আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করাই হবে সব চেয়ে বড় কাজ; আর তার একটা বিশিষ্ট পন্থা হলো মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-সাহিত্য গঠন করে জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহের প্রচার।

দেশে বিজ্ঞান প্রচারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। হাঁটতে চলতে উঠতে বসতে আমাদের বিজ্ঞান-বিদ্যার শরণাপন্ন হতে হয়। আর কোন প্রয়োজনে না হলেও, শুধু বেঁচে থাকার জন্যই, বিজ্ঞানের অন্ততঃ মূল তথ্য গুলির সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় স্থাপনের দরকার। এই জ্ঞান দান দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গেরই কাজ এবং তা করতে হবে জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য ভাষায় ও গ্রহণযোগ্য ভাবে। অপরিণত শিশু-চিত্ত বিকট চেহারার বন্ধুর সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপনে আগ্রহ বোধ করে না। এমন ভাবে কথাগুলি বলতে হবে যা পড়ে বা শুনে জনসাধারণের মনে হয়—বাঃ! বিজ্ঞানের কথাগুলি ত বেশ বোঝা যায়, বিজ্ঞানে ত বেশ রস আছে এবং শিখবার মত অনেক জিনিস আছে। তা যে আছে এবং প্রচুর পরিমাণেই আছে তা আমরা সবাই জানি। জনসাধারণ যদি বুঝতে

পারে যে, বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য হলো সার সত্যের সন্ধান দান এবং লক্ষ্যপথে অগ্রসর হবার পক্ষে তাদেরও অধিকার রয়েছে আর সবারই মত, তবে পথের বাধাগুলো দূর করে দিয়ে ঠিক মত চালিয়ে নিতে চাইলেও তারা অগ্রসর হতে চাইবে না এরূপ অনুমানের কারণ নেই।

এ কথা মানতে হবে যে, বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞান যদি সুস্পষ্ট হয় তবে ভাষাটা বঙ্গভাষা বলে' ভাব প্রকাশে কোন বাধা উপস্থিত হয়না। সত্য কথা এই যে, কি বলতে চাই অনেক সময় নিজেরাই তা ভাল বুঝে উঠতে পারিনে। আম্‌তা-আম্‌তা করে কথা বললে লোকে তা শুনতে বা বুঝতে চায়না। এর জন্য অবশ্য প্রধানতঃ দায়ী—বিষয়ের দুরূহতা। তবু যা কিছু বলবার তা বলতে হবে স্পষ্ট করে এবং যথাসম্ভব মনোরম করে। একথা সত্য যে, বিজ্ঞানের মতবাদগুলি পরিবর্তনশীল এবং তার প্রধান কারণ এই যে, বিজ্ঞান-বিদ্যা প্রগতিশীল। বিজ্ঞানে শেষ কথা বলে কোন কথা নেই। তবু জিনিসটা তলিয়ে বুঝার জন্য যতটা মানসিক শ্রমের প্রয়োজন তা অনেকেই আমরা করিনে। আমাদের ছাত্রেরাও লাভ করে শুধু মুখস্থ বিদ্যা এবং তাও পরীক্ষায় পাসের তাগিদে বা চাকরির প্রলোভনে। ফলে গবেষণা-প্রবৃত্তি আমাদের দেশে বড় একটা জাগতে পারেনি। বিশ্বরহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ার থেকে বেরিয়ে এসেছেন তাঁদের সংখ্যা সামান্য। এই হলো আমাদের গোড়ায় গলদ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশবাসীর প্রতি আমাদের সহানুভূতির অভাব। এরই জন্য বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান তার প্রাপ্য আসন অধিকার করতে পারেনি। এখন যদি কর্তব্য-বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে দেশের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কলম ধারণ করেন তবে বঙ্গভাষার ঐ দৈন্য যে অচিরেই দূর হতে পারে তা অবশ্যই আশা করা যায়।

বঙ্গভাষার মাধ্যমে দেশে বিজ্ঞান প্রচারের চেষ্টা মোটেই হয়নি একথা সত্য নয়। এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হয়েছিলেন ৺অক্ষয় কুমার দত্ত, ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় ও আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। রামেন্দ্রসুন্দরের 'প্রকৃতি' ও 'জিজ্ঞাসা' নামক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তথ্যপূর্ণ পুস্তক দু'-খানার ভাষা অনবদ্য। বলতে পারা যায় বাংলা-ভাষার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচারের জন্য ভাষার কাঠামো গড়ে গিয়েছেন রামেন্দ্রসুন্দরই। অধুনালুপ্ত 'প্রকৃতি' নামক দ্বৈমাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর সত্যচরণ লাহা কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন যে, বঙ্গভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার জন্য তাঁর মনে প্রথম প্রেরণা যোগায় রামেন্দ্রসুন্দরের ঐ পুস্তক দু'খানা। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও দিন কয়েক পূর্বে ঐরূপ কথাই আমাকে বলেছিলেন। তবু রামেন্দ্রসুন্দর স্বয়ং যে তাঁর ভাব প্রকাশের প্রণালীকে ত্রুটিহীন বলে' ভাবতে পারেন নি সে কথাও সত্য। এ সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আমার যে পত্রালাপ হয়েছিল তার কতক কতক নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। বিজ্ঞান-সাহিত্য গঠন সম্পর্কে এই আলোচনার কিছু মূল্য থাকতে পারে। আমার নিকট তাঁর একখানা পত্রের নকল এই :

"তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমি ভাল নাই। অত্যধিক গ্রীষ্মে মস্তিষ্কের যাতনা অধিক হইয়াছিল। এখনও কতকটা কাতর আছি।

" 'প্রকৃতি' সম্বন্ধে তোমার প্রশ্ন ও suggestion গুলি পাইলে সুখী হইব। " 'প্রকৃতি'র নূতন সংস্করণ আর বাহির করিতে পারিব সে আশা নাই। তবে যদি কোন স্থানে ভুল থাকে বা অস্পষ্ট থাকে তাহা জানা বিশেষ দরকার। অন্ততঃ বহিতে marginal correction করিয়া গেলেও ভবিষ্যতে কেহ বাহির করিতে পারিবে। 'জগৎকথা'র ছাপা অগ্রসর হইতেছে না। প্রুফ দেখিবার ক্ষমতা নাই। মাথা চঞ্চল থাকিলে কিছুই ভাল লাগে না। ১১ ফর্মা ছাপা হইয়া বন্ধ আছে। Sound, Heat, Light

পর্যন্ত লেখা আছে—ছাপাইতে পারিব কিনা জানি না।"

এই পত্রের উত্তরও উদ্ধৃত করিতেছি:

"শ্রীচরণে নিবেদন এই, কিছুদিন পূর্বে আপনার একখানা পত্র পাইয়া অনুগৃহীত হইয়াছি। আশা করি আপনার শরীর এখন পূর্বাপেক্ষা সুস্থ হইয়াছে।

"'প্রকৃতি' ও 'জিজ্ঞাসা'য় যে সকল স্থলে আমার খটকা উপস্থিত হইয়াছিল তাহার কতক, কতক লিখিয়া রাখিয়াছিলাম কিন্তু উহা হারাইয়া যাওয়ায় এখন পাঠাইতে পারিতেছি না।

"'সাহিত্য' পত্রিকায় আপনার 'জগৎকথা' পড়িবার পর ঐ প্রবন্ধের কোন কোন স্থলে গোলমাল ঠেকিয়াছিল। উহার বিস্তৃত আলোচনা ভিন্ন কাগজে লিখিয়া ডাকে পাঠাইলাম। আমার নিকট যে সকল খটকা উপস্থিত হইয়াছে এবং সাধারণ পাঠকের নিকটও যাহা গোলমেলে বোধ হইতে পারে মনে হইয়াছে তাহা বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। উহাতে যে সকল প্রশ্ন আছে তাহার উত্তর পাইলে উপকার হইবে। আপনার শরীর যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইবে তখন ঐ সকলের মীমাংসা আপনার নিকট হইতে জানিতে পারিব আশা করিয়া রহিলাম।

"'জগৎকথা'র Sound, Heat ও Light পর্যন্ত লেখা আছে ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। উহা এতদিন ছাপা হইলে বাংলা সাহিত্যের একদিককার অভাব অনেকটা দূর হইত। উহা ছাপিতেই হইবে। এ সম্পর্কে—যে সকল কাজের জন্য আপনার বেগ না পাইলেও চলিতে পারে—যদি ছাত্রের দ্বারা কোন কার্য নিষ্পন্ন হইতে পারিবে বলিয়া মনে করেন—তাহা জানাইলে অত্যন্ত বাধিত হইব। এতদিনেও বঙ্গভাষায় পদার্থবিজ্ঞানের একখানা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল না ইহা অত্যন্ত আক্ষেপ ও লজ্জার বিষয়।"

এই পত্রের তিনি নিম্নোক্ত উত্তর দেন:

"তোমার পত্র ও আলোচনা যথাসময়ে পাইয়াছি। তুমি যেরূপ যত্নের সহিত 'জগৎকথা' পড়িয়াছ তাহাতে যারপরনাই প্রীত হইয়াছি। 'জগৎকথা'র কিয়দংশ ছাপা হইয়াছে। ভাষা কিছু কিছু সংশোধন করিয়াছি, সর্বত্র সংশোধনের আর উপায় নাই। বাঙ্গালায় এ বিষয়ে ভাবপ্রকাশ করা বড় কঠিন। তোমার আলোচনায় দেখিলাম ইহা প্রায় অসাধ্য। Ambiguity থাকিয়াই যাইবে। বর্তমান অবস্থায় আমূল সংশোধন আমার পক্ষে অসাধ্য। গত এক বৎসরে দুইটা ফর্মা মাত্র ছাপাইয়াছি। ইহাতেই আমার অবস্থা বুঝিতেছ। যাহা হউক তোমার লেখা আমার বিশেষ উপকারে লাগিবে।"

বর্তমানে বাংলাভাষায় উল্লেখযোগী বিজ্ঞানের পুস্তকের এত অভাব কেন রামেন্দ্রসুন্দরের উক্ত মন্তব্য থেকে অনেকটা অনুমান করা যায়—শত চেষ্টা সত্ত্বেও ambiguity থেকেই যায়। শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে বিজ্ঞানে পারদর্শিতা লাভ করেছেন এরূপ ব্যক্তির অভাব নেই কিন্তু যে বিদ্যা প্রগতিধর্মী ও স্বভাবতঃই জটিল তার প্রতি সাধারণের অনুরাগ জন্মাতে হলে কি ভাষা ব্যবহার করতে হবে তাই হলো প্রধান সমস্যা। রামেন্দ্রসুন্দরের বিদ্যার অভাব ছিলনা, দেশের প্রতি মমত্ববোধেরও অভাব ছিল না। বিজ্ঞানের আলোচনায় ভাবপ্রকাশে তাঁর সমকক্ষ আজ পর্যন্ত বাংলা দেশে কেউ নেই, অন্য দেশেও অধিক আছেন কিনা সন্দেহ; তবু আমরা দেখতে পাই, কেবল পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনাতে ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। এর মূল কারণ আমরা পূর্বেই বলেছি—বিজ্ঞানে শেষ কথা বলে কোন কথা নেই। অতি সাধারণ বিষয়েরও মূলতত্ত্ব বিজ্ঞান আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারে নি। জড় কি, শক্তি কি, তড়িৎ কি, ইথর কি, দেশ এবং কাল কি পদার্থ এই সকল হলো বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীর পক্ষে গোড়ার প্রশ্ন কিন্তু এর কোনটারই স্বরূপ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত চূড়ান্ত মীমাংসা হতে পারে নি। বিজ্ঞান আজ

অন্ধকারে হাতড়াচ্ছে—কারণবাদ সত্য না অনিশ্চয়তা ও সম্ভাবনাবাদ সত্য, ব্যবহারিক সত্যই খাঁটি সত্য না. গাণিতিক সত্যই বিশ্বের মূল উপাদান, এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা নিয়ে।

সুতরাং মেনে নিতে হয়, যে কার্য সম্পাদনের ভার আমরা নূতন উৎসাহে বহন করতে যাচ্ছি তা অত্যন্ত দুরূহ। দুরূহ অথচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য যথেষ্ট পরিশ্রম, সাধনা ও ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখেই রয়েছে—দেশে বিজ্ঞানপ্রচারের জন্য রামেন্দ্রসুন্দরের অক্লান্ত অধ্যবসায়. তাঁর সাহিত্য পরিষৎ ও সাহিত্য সম্মেলন। তাঁর এই কষ্ট স্বীকার কিসের জন্য?—অর্থের জন্য নয়, মৌলিক গবেষণার জন্য নয়, কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্যও নয়; কেবল যে কার্যে নাম নেই, যশ নেই, যাতে কোনরূপ প্রতিদানের প্রত্যাশা নেই, যার ফল লাভ সুদূরপরাহত এবং ফল লাভ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নেই তারই জন্য; কেবল যাতে জনসাধারণের মধ্যে ধীরে ধীরে বৈজ্ঞানিক মনোভাবের সৃষ্টি হতে পারে, দেশের মাটিতে স্বাধীন চিন্তার বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে, যাতে, যদি কোন কালে এদেশে কেউ ফ্যারাডের প্রতিভা ও অনুসন্ধিৎসা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তবে শুধু বই বাঁধানো কার্যেই তার প্রতিভা নিঃশেষ হয়ে না যায় তারি জন্য। রামেন্দ্রসুন্দরের মস্তিষ্কের ব্যারাম যে অত্যধিক চিন্তার ফল এবং সে চিন্তা যে আমাদেরই জন্য এই সত্য উপলব্ধি না করার মত পাপ যেন আমাদের স্পর্শ না করে।

কথাপ্রসঙ্গে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান চর্চা সম্বন্ধে আপনি কিরূপ উৎসাহ দেন?" উত্তরে তিনি বলেছিলেন: " 'প্রকৃতির' দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয় তের বৎসর পর এবং 'জিজ্ঞাসা'র দ্বিতীয় সংস্করণ হয় দশ বৎসর পরে। যাদের খেয়াল হয় বাংলাতে বিজ্ঞানের আলোচনা করতে পারেন কিন্তু পুস্তকের কাটতি হবার সম্ভাবনা বর্তমানে বিশেষ নেই"। উত্তরে আমি বলেছিলাম: "এ আমাদের দুর্ভাগ্য সন্দেহ নেই কিন্তু এই দুর্ভাগ্য দূর করার জন্যে যাঁরা জীবন পাত করেন তাঁদের গৌরব তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না।" আমার তখন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্ম ও সাহিত্য" নামক প্রবন্ধের কথা মনে পড়ছিল।—"যিনি নাটক নবেল পড়িতে বড় ভালবাসেন তিনি একবার মনে বিচার করিয়া দেখিবেন, কিসের আকাঙ্ক্ষায় তিনি নাটক নবেল পড়েন। যদি সেই সকলে যে সকল বিস্ময়কর ঘটনা আছে তাহাতেই তাঁহার চিত্ত বিনোদন হয় তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি বিশ্বেশ্বরের এই বিশ্ব সৃষ্টির অপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার কোন সাহিত্যে কথিত হইয়াছে? একটি তৃণে বা একটি মাছির পাখায় যত কৌশল আছে কোন উপন্যাস লেখকের লেখায় তত কৌশল আছে? ঈশ্বরের সৃষ্টি অপেক্ষা কোন্ কবির সৃষ্টি সুন্দর? বস্তুতঃ কবির সৃষ্টি ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুকারী বলিয়াই সুন্দর। নকল কখনো আসলের সমান হইতে পারে না।"

রামেন্দ্রসুন্দরের পরেই জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের প্রচেষ্টার পরিচয় পাই আমরা স্বর্গীয় জগদানন্দ রায় ও ডক্টর সত্যচরণ লাহার সাহিত্য সাধনার ভেতর। জগদানন্দ রায় বিজ্ঞানের আলোচনা সুরু করেন পোকা মাকড় ও কীট পতঙ্গকে বিষয়বস্তুরূপে নির্বাচন করে। তারপর তিনি পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনেও কয়েকখানা পুস্তক রচনা করেন। এই সকল পুস্তক সুপাঠ্য ও অল্পবিস্তর সংশোধনসাপেক্ষ হলেও স্কুলপাঠ্য হবার যোগ্য। এ ছাড়া কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্তও ডক্টর সত্যচরণ লাহার 'প্রকৃতি' নামক পত্রিকায় উচ্চাঙ্গের পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাণিবিজ্ঞান, ও উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় মনোরম ভাষায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছিল। দুঃখের বিষয়, কয়েক বৎসর পরেই ঐ পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।' এর থেকে এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে,

এ দেশের সাধারণ পাঠকের মনে বিজ্ঞান সম্পর্কে সাড়া জাগাবার চেষ্টা সহজে সফল হবার নয়।

তারপর বঙ্গভাষার মারফৎ বিজ্ঞান প্রচার প্রচেষ্টার বিশিষ্ট পরিচয় পাই আমরা এক বিশ্ববিশ্রুত কবির সাহিত্য সাধনার ভেতর,—যখন, মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে, বিশ্বের সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় স্থাপনের জন্য বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ অকস্মাৎ নেমে এলেন বিজ্ঞানের আসরে তাঁর 'বিশ্ব-পরিচয়' পুস্তকখানা হাতে নিয়ে এবং স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তা তাঁরই দেশবাসী একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-সেবীর হস্তে সঁপে দিয়ে। পুস্তকখানা যখন প্রথম নজরে পড়লো তখন কতকটা বিস্ময়ে ও কতকটা লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমরা কি এতই অপদার্থ যে শেষকালে কবিকেই নামতে হলো দেশে বিজ্ঞান প্রচারের কার্যে। একথা সত্য যে, কবি ও বৈজ্ঞানিকের মধ্যে প্রকৃতিগত ভেদ নেই। উভয়েই সত্যের উপাসক, উভয়েই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য লালায়িত এবং সম্বন্ধের গৌরবে আত্মহারা। তফাৎ এই, ঐ কবির ঝোঁক বিশেষ করে' বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্যের অনুভূতিতে, আর বিজ্ঞানের লক্ষ্য প্রধানতঃ ওর গৌরবের প্রতিষ্ঠায়। তাই কবির ভাবের অভিব্যক্তি ঘটে কাব্যের উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় আর বৈজ্ঞানিকের ভাষা সংক্ষিপ্ত—formula বা সূত্রের আকারবিশিষ্ট। আমরা চাচ্ছি সর্বশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক তথ্যকে বঙ্গভাষার অন্তর্গত করতে সক্ষম এইরূপ একটি ব্যাপক বিজ্ঞান-সাহিত্য গঠন করতে; সুতরাং আমাদের লক্ষ্য হবে কাব্যের ভাষার সঙ্গে formulaর ভাষার এমন ভাবে সমন্বয় সাধন যে তা হয়ে দাঁড়ায় সুখপাঠ্য সাহিত্য। বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন শিব গড়তে আমরা বানর না গড়ে বসি, যেন "গ্যাস মাত্রেরই প্রেসারের মাত্রা ওয়ান থার্ড রো ভি-স্কোয়ার্ড" এই ধরনের ভাষার সৃষ্টি না করি। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপদেশই বিনা দ্বিধায় আমাদের গ্রহণ করা উচিত'। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন: "বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। তোমাদের পাণ্ডিত্য ও দুরূহ বাক্যজালের আঘাতে শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষণীয় বিষয় যাতে দুঃসহ হয়ে না ওঠে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখো।" আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ যাকে 'পাণ্ডিত্য' আখ্যা দিয়েছেন তার মূল কোথায়। এই আশঙ্কা করেই, আমাদের বিশ্বাস, বিশ্বকবিকে বিজ্ঞানের আলোচনায় কলম ধরতে হয়েছিল।

এ কথা মানতে হয় যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রামেন্দ্রসুন্দরের প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হবার উপক্রম হলো তখন বিশ্বকবির সেখানে উপস্থিত হবার প্রয়োজন ছিল। এ যেন তথাকথিত বঙ্গীয় বৈজ্ঞানিকগণের ওপর তীব্র অভিমানের দুরন্ত কটাক্ষ, যা কবির ভাষাতেই সংক্ষেপে ও স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা যেতে পারে:

"আমার গৌরব তাতে সামান্যই বাড়ে
তোমার গৌরব কিন্তু একেবারে ছাড়ে।"

ভরসার বিষয় এই যে, এই কশাঘাত একেবারে ব্যর্থ হয়নি। এই কয়েক বৎসরের ভেতরেই 'বিশ্ব-পরিচয়ে'র ভাষা অবলম্বনে ছোট ছোট অন্ততঃ দু' ডজন বিজ্ঞানের পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এই সকল পুস্তক চলবে কিনা বা চলা উচিত কি না সে সম্বন্ধে মত প্রকাশ না করে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বিজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথের ভাব প্রকাশের ভঙ্গীকে অনেকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে চান। আমরা বলবো রাবীন্দ্রিক ও রামেন্দ্রিক প্রকাশ-ভঙ্গীর মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নেই। উভয়ের ভাষাই উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশের উপযোগী। তবু প্রত্যেকের লেখার ভেতর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা থাকবেই। বৈজ্ঞানিকের তুলনায় কবি স্বভাবতঃই কিছুটা মিষ্টিক (mystic) হয়ে থাকেন। উভয়েই চেয়েছেন এক অচেনা রাজ্যের সন্ধান জনসাধারণের কানে পৌঁছে দিতে কিন্তু এক জনের ডাকে ফুটে উঠেছে বংশীর আহ্বান আর অপরের ডাকে বীণার ঝঙ্কার।

তুলনার জন্য আমরা উভয়ের লেখা থেকে দুটা অংশ উদ্ধৃত করছি।

ম্যাক্স্ওয়েল ও হার্ৎজের আবিষ্কৃত তাড়িত-তরঙ্গ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দর লিখছেন: "এই নূতন আবিক্রিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সমাজে হর্ষকোলাহল উৎপন্ন করিল। দেশ বিদেশের বৈজ্ঞানিকেরা হার্ৎজের অনুসরণ করিয়া তাড়িত-স্পন্দন সাহায্যে সুহবৃৎ আকাশ তরঙ্গের অস্তিত্ব আবিষ্কারের নব নব উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।......পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক-সমাজ-শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মধ্যে খরতর প্রবাহে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া সেই স্পন্দন অনুভূত হইতে লাগিল। কেবল এই ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত-সমাজে সেই স্পন্দন অনুভূত হয় নাই। ভারতীয় পণ্ডিত-সমাজ তখন পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজের অঙ্গীভূত ছিল না।" এর পরেই রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন, "একদিন প্রাতে উঠিয়া সহসা সংবাদপত্রে দেখা গেল সুদূর সাগর পারে, ব্রিটিশ এসোসিয়েসনের বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর সম্মুখে একজন ভারতবর্ষীয় অধ্যাপক আপনার প্রতিভাবলে উদ্ভাবিত যন্ত্র সাহায্যে তাড়িত-স্পন্দনোৎপন্ন আকাশ-তরঙ্গের গতিবিধি বিস্ময়াকুলিত দর্শকবৃন্দের প্রত্যক্ষগোচর করিতেছেন এবং বয়োবৃদ্ধ লর্ড কেলবিনের সোল্লাস-ঔৎসুক্য বিস্ফারিত নয়নদ্বয়ের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ পূতসলিলা স্বর্গঙ্গার ধারার ন্যায় তাঁহার শ্যামাঙ্গের বর্ণকলঙ্ক ধৌত করিতেছে।" এই ভারতবর্ষীয় অধ্যাপক বাঙ্গালী জগদীশচন্দ্র; আর হার্ৎজের আবিষ্কৃত তাড়িত-স্পন্দন যে অন্ততঃ একজন ভারতবাসীর শিরা ও ধমনীতে তরঙ্গ তুলতে সক্ষম হয়েছিল এবং তখন থেকেই যে ভারতবর্ষীয় পণ্ডিত-সমাজের পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজের অঙ্গীভূত হবার দাবী প্রতিষ্ঠিত হলো এই কথাটাই আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর হৃদয়ের প্রবল আবেগে অথচ অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে ব্যক্ত করেছেন।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের রচনার নমুনা স্বরূপ 'বিশ্ব-পরিচয়' পুস্তকে 'কিরীটিকা' বা করোনার যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা উদ্ধৃত করছি: "সূর্য আপন চক্রসীমাটুকু ছাড়িয়ে বহু লক্ষ ক্রোশ দূর পর্যন্ত জ্বলদ্ বাষ্পের অতি সূক্ষ্ম উত্তরীয় উড়িয়ে থাকে; ঝরনা যেমন জলকণার কুয়াশা ছড়ায় আপনার চারিদিকে। গ্রহণের সময় সেই তার চারদিকের আগ্নেয় গ্যাসের বিস্তার দেখতে পাওয়া যায় দূরবীনে। এই দূর বিক্ষিপ্ত গ্যাসের দীপ্তিকে য়ুরোপীয় ভাষায় বলে 'করোনা', বাংলায় একে বলা যেতে পারে কিরীটিকা।"

এ বর্ণনায় কবিত্ব আছে; সঙ্গে সঙ্গে একটা পারিভাষিক শব্দেরও অবতারণা করা হয়েছে—কিরীটিকা। স্পষ্ট দেখা যায় এই বর্ণনা উপলক্ষেই এই পারিভাষিক শব্দটা কবির কলম থেকে আপনি বেরিয়ে এসেছে। বস্তুতঃ বিষয়বস্তুর স্পষ্ট চিত্রটা যে প্রকাশভঙ্গী নিয়ে আপনা থেকে ফুটে উঠতে চায় তাই হয়ে দাঁড়ায় সর্বোৎকৃষ্ট পরিভাষা। আমাদের মতে পারিভাষিক শব্দ গঠনের এই হলো স্বাভাবিক প্রণালী।

উক্ত বর্ণনাতে রবীন্দ্রনাথের ভাষার আর একটা বিশেষত্বেরও পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন: "গ্রহণের সময় সেই তার চারদিকের আগ্নেয় গ্যাসের বিস্তার দেখতে পাওয়া যায় দূরবীনে।" কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের কলম থেকে ঐ কথাটাই ঠিক ঐ ভাবেই যে বেরোত না একথা নিশ্চিতরূপেই বলতে পারা যায়। সম্ভবতঃ রামেন্দ্রসুন্দর লিখতেন "ঐ চতুর্দিকব্যাপী আগ্নেয় গ্যাসের বিস্তারই গ্রহণের সময় দূরবীন দিয়ে দেখতে পাওয়া যায়।" আধুনিক লেখকগণের লেখার ভেতর রবীন্দ্রনাথের ভাষার এই বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গীর অনুকরণপ্রিয়তা অনেক স্থলে দেখতে পাওয়া যায় এবং এর বাড়াবাড়িও দেখা যায়। কিন্তু তালমান ঠিক না রাখতে পারলে এই বাড়াবাড়ি যে অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায় তাও স্মরণ রাখা দরকার। একটা উদাহরণ নিলে কথাটার অর্থ স্পষ্ট হবে। 'বিশ্ব-পরিচয়ে'র একস্থানে

এইরূপ বর্ণনা আছে: "আপাতত আলোর ঢেউয়ের কথাই বুঝে নেওয়া যাক্। এই ঢেউ একটিমাত্র ঢেউয়ের ধারা নয়। এর সঙ্গে অনেক ঢেউ দল বেঁধেছে। কতকগুলি চোখে পড়ে, অনেকগুলি পড়ে না।" সরল ও স্পষ্ট বর্ণনা। কিন্তু এই কথাগুলিই ঘুরিয়ে এইভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে: "আপাতত আলোর ঢেউয়ের কথাই নেওয়া যাক্ বুঝে। একটি মাত্র ঢেউয়ের ধারা নয় এই ঢেউ। অনেক ঢেউ দল বেঁধেছে সঙ্গে এর। কতকগুলি পড়ে চোখে, অনেকগুলি পড়ে না।" এই ধরনের ভাষা যে, বাংলা সাহিত্যে স্থান পেতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। আমাদের বিশ্বাস রামেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে মিলন ঘটাতে পারলে ভাষাটা যে আকার ধারণ করে, বঙ্গভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-সাহিত্য গঠনের পক্ষে তাই হবে সর্বোৎকৃষ্ট ভাষা।

নিজের লেখা সম্বন্ধে মতপ্রকাশ নীতিবিরুদ্ধ এবং আত্মমর্যাদার হানিজনকও বটে। কিন্তু যেখানে নীতি বা আত্মমর্য্যাদা বড় কথা নয়, বড় কথা বিজ্ঞান-সাহিত্য গঠন তখন এই প্রচেষ্টায় যেটুকু উৎসাহ লাভ করেছি, তা, যাঁরা এপথের পথিক হয়েছেন ও হতে চান তাঁদের কাছে গোপন করা সঙ্গত মনে করিনে। নিরুৎসাহ ঘট্‌বে তাঁদের পদে পদে কিন্তু তা সত্ত্বেও হাল ছেড়ে দেওয়া সঙ্গত হবে না। পূর্বেই বলেছি, ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল বঙ্গভাষার মাধ্যমে দেশে বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে যথাশক্তি চেষ্টা করে এসেছি। চেষ্টা কতদূর সফল হয়েছে বলতে পারিনে কিন্তু এই প্রচেষ্টায় দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট থেকে যে উৎসাহ পেয়েছি তার গোটা কত উদাহরণের উল্লেখ করছি:

প্রায় বছর চল্লিশেক পূর্বে আচার্য জগদীশচন্দ্র যখন গৌহাটিতে যান তখন গৌহাটির বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁকে অভিনন্দন দান উপলক্ষে ওখানকার কার্জন হল নামক লাইব্রেরী গৃহে সম্মিলিত হন। ঐ সভায় গোটাকত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। এবং বর্তমান প্রবন্ধ-লেখকের একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও পঠিত হয়, যার নাম ছিল "উদ্ভিদ ও জড়-জগতে প্রাণের স্পন্দন"। প্রবন্ধটা পাঠ করেছিলেন গৌহাটি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ভুবন মোহন সেন মহাশয়। পরীক্ষাগুলি সম্পন্ন করে অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ হওয়ায় আমি বাসায় চলে যাই। একটু পরেই কার্জন হল থেকে একজন লোক ছুটে এসে আমাকে খবর দিল "আচার্য জগদীশচন্দ্র আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, শীঘ্র আসুন।" তখনি কার্জন হলে ফিরে গেলাম। আচার্য বললেন, "আমার আবিষ্কারগুলি বাংলা ভাষায় এমন সহজ ভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে তা আগে কল্পনা করতে পারি নি। মাতৃভাষার ভেতর দিয়ে আপনারা বিজ্ঞানের প্রচার করতে থাকুন। আশা করি ঐ চেষ্টা সফল হবে।" ঐ ছিল আমার প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং আচার্য জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে হয়েছিল সাক্ষাৎ সম্পর্কে আমার প্রথম পরিচয়।

গৌহাটিতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি শাখা ছিল। ঐ পরিষদের মাসিক অধিবেশনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহেরও আলোচনা হতো। তার মধ্যে কোন কোন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ অ্যাখ্যা পেয়েছিল "sugar coated quinine"।

বছর পঁয়ত্রিশেক আগে আমার তৎকালীন প্রিয় ছাত্র (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক) শ্রীমান অমরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের সহযোগিতায় 'তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা নামক কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের একটা তালিকা প্রস্তুত করেছিলাম। ঐ তালিকা 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেছিলাম এই দেখে যে, ঐ তালিকার অনেকগুলি শব্দ ৺জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানে স্থান পেয়েছে এবং

কতকগুলি আধুনিক লেখকগণের বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখার ভেতর ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে ৺প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় সম্পাদিত 'মানসী ও মর্মবাণী' নামক মাসিক পত্রিকায় "আপেক্ষিকতাবাদের স্থূলকথা" শীর্ষক আমার একটা প্রবন্ধ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে একজন বিজ্ঞানের অধ্যাপক ঐ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে জানিয়েছিলেন যে, অপেক্ষিকতাবাদের মূলতত্ত্বটা তিনি ধরতে পেরেছিলেন ঐ প্রবন্ধ পাঠ করে এবং তার আগে কোন ইংরাজী পুস্তক পাঠ করে পারেননি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঐ প্রবন্ধের ভেতর আইনষ্টাইন বা মিন্‌কৌস্‌কির চতুষ্পাদ জগতের বর্ণনা ছিল, জ্যামিতি ছিল, গাণিতিক সূত্রও ছিল কিন্তু পারিভাষিক শব্দের বাহুল্য ছিল না কিম্বা কোন ইংরাজী শব্দ বা ইংরাজী প্রতীক সমন্বিত কোন সূত্রের অস্তিত্ব ছিল না।

আট নয় বৎসর পূর্বে 'সবিতা' নামক মাসিক পত্রের সম্পাদিকা (বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের সহধর্মিণী) ঐ পত্রের কয়েক সংখ্যা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নিকট উপহার স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। উত্তরে কবি লিখেছিলেন, "তোমার স্বামীর যে লেখাগুলি আমার কাছে পাঠিয়েছ পড়ে আনন্দলাভ করেছি। বিজ্ঞানে যেমন তাঁর অধিকার তেমনি তাঁর ভাষা প্রাঞ্জল। জনসাধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সহজ ও যথাসম্ভব পরিভাষা বর্জিত করে বিবৃত করার ভার যদি তিনি গ্রহণ করেন তবে উপকার হবে।"

প্রায় একই সময়ে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এক পত্রে আমাকে জানান:—"পত্রিকায় আপনার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি পড়ে খুব ভাল লাগলো। তাবচ্চ শোভতে মূর্খঃ যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে। সুতরাং বিষয় সম্বন্ধে কোন মন্তব্য না করে আপনার লেখার পারিপাট্য সম্বন্ধে আমার আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি। দিব্বি রসালো হয়েছে এই প্রবন্ধটি। রসাত্মক বাক্যকে রসিকরা কাব্য আখ্যা দিয়েছেন। আপনার এই লেখাটিতে বিজ্ঞানে রস সঞ্চার করেছেন। তাই রচনাটি হয়েছে সাহিত্য, কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক তথ্যের শুক্‌নো খসড়া নয়। আপনার লেখাটি যথার্থ উপভোগ্য হয়েছে। আপনি মুক্তহস্তে আপনার বৈজ্ঞানিক প্রসাদ বিতরণ করুন। আপনার লিখিত অন্যান্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পড়বার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ হয়েছে। ইতিমধ্যে একদিন আপনার কাছে গিয়ে সেগুলি নিয়ে আসবো।" অধ্যাপক মৈত্র মহাশয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মতই যুগপৎ কবি ও বৈজ্ঞানিক, এঁদের উক্তি স্তোকবাক্য বলে উপেক্ষা করা যায় না। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্য গঠন সম্ভব। এই বিশ্বাস নিয়ে আপনারা কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হতে থাকুন। ফল লাভ সুনিশ্চিত।

নৃতত্ত্বের উপক্রমণিকা

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

ভারতবর্ষের বর্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ এবং ভারতবর্ষের বাহিরের বিভিন্ন জাতির সহিত তাহাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিতগণ যে সকল ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা হইতে যতদূর সম্ভব একটা পরিচ্ছন্ন ধারণায় আসিবার চেষ্টা করা এই আলোচনার উদ্দেশ্য।

কি প্রকার তথ্য ও প্রণালীর সাহায্যে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীগণ এইরূপ সংমিশ্রণ ও সম্পর্ক সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসেন সংক্ষেপে তাহার একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

আলোচ্য বিষয় অনুসারে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানকে দুই অংশে ভাগ করা হইয়াছে, physical anthropology ও cultural anthropology। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পর্যবেক্ষণ ও মাপজোখের সাহায্যে দৈহিক লক্ষণ হইতে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদিগের জাতিলক্ষণ সমূহ (racial characteristics) নির্ণয় করিবার কাজ প্রথম অংশের এলাকায় পড়ে। দেহের দৈর্ঘ্য, মস্তক, নাসিকা, মুখমণ্ডল প্রভৃতির নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের সূত্রমতে মাপ ও গাত্রবর্ণ, চক্ষু, কেশ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণের দ্বারা কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে অধিবাসীদিগের দৈহিক লক্ষণ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ হয় তাহা পরীক্ষা করিতে বসিলে প্রথমে দেখা যায় প্রত্যেকটি লোকের পরিমাপের ফল ভিন্ন। তার পরে বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যায় যে এই সকল পৃথক ফলের কতকগুলির পার্থক্য হয়ত উনিশবিশের মধ্যে। যে সকল ফলের মধ্যে মোটামুটি মিল দেখিতে পাওয়া যায় সেইগুলিকে সাধারণ মানরূপে ব্যবহার করিয়া সেই নির্দিষ্ট অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে মূল বা প্রধান 'টাইপ' স্থির করা হয়। এই সাধারণ মান হইতে ব্যতিক্রম কোন সংমিশ্রণের ফল বলিয়া অনুমান করা হয় এবং লক্ষণগুলি মিলাইয়া পার্শ্ববর্তী বা দূরবর্তী কোন্ টাইপের সঙ্গে সংমিশ্রণ হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা হয়। এজন্য নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ ফরমুলা ধরিয়া অঙ্ক কষিয়া জাতিলক্ষণের দিক দিয়া সাদৃশ্যের বা পার্থক্যের পরিমাণ স্থির করিবার চেষ্টা করেন। এই সাদৃশ্য বা পার্থক্যের পরিমাণ অনুসারে (co-efficients of racial likeness বা co-efficients of racial differeuce) সংমিশ্রণ এবং সম্পর্কের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

ইহা সহজেই বুঝা যায় যে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী যে প্রণালীতে অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ করেন তাহা কেবল জীবিত মানুষের বেলায় যথাযথ প্রয়োগ করা সম্ভব। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানসম্মত মাপ ও পর্যবেক্ষণের দ্বারা সকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে সংমিশ্রণ নির্ণয় করা সম্ভব কিনা এ প্রশ্ন আজকাল নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদের মধ্যে উঠিয়াছে। ইহার কয়েকটি কারণ আছে। একটি কারণ এই যে, যে-প্রণালীতে লক্ষণগুলি নির্ণয় করিবার চেষ্টা হয় সে প্রণালীতে নির্ভরযোগ্য ফল সবসময়ে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। আরেকটি কারণ, রেসিয়াল টাইপ ক্রমাগত পরিবর্তন হইতেছে, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন, সংমিশ্রণ ইত্যাদির ফলে এই পরিবর্তন হয়। কাজেই পৃথিবীতে কোন অমিশ্র জাতি আদৌ আছে কিনা এবং টাইপ স্থির করিবার সূত্রের ভিত্তিতে যে racial classification বা গোষ্ঠী বিভাগ করা

হইয়া থাকে তাহার কতটা বিজ্ঞানসম্মত এ প্রশ্ন উঠিয়াছে। প্রচলিত অনুসন্ধান প্রণালীর পরিপোষক হিসাবে blood grouping হইতে কোনরূপ সহায়তা পাওয়া যায় কিনা কিছুকাল পরীক্ষার পর blood grouping পরীক্ষার ফল শরীর-বিজ্ঞানের কাজে লাগাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

যেখানে জীবিত মানুষের পরীক্ষা চলে না, অতীত বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের করোটি বা কঙ্কালের অংশ হইতে জাতীয় টাইপ নির্দেশ করিবার চেষ্টা হয়, সেখানে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীকে এনাটমিস্ট ও জীববিজ্ঞানীর (palæontologist) উপর নির্ভর করিতে হয়। সম্পূর্ণ কঙ্কাল ও করোটি হইতে জাতীয় টাইপ স্থির করিবার ফরমূলা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর আছে কিন্তু উহার প্রয়োগ এনাটমির উপর, বিশেষভাবে নির্ভর করে। একথা বলা বাহুল্য যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের করোটি প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া এই টাইপ স্থির করিতে হইলে কতকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই অনুমানের ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে পারে, এই অনুমান সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক মনোভাবপ্রসূত হইতে পারে। কিন্তু অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত যে ব্যাখ্যা তাহা ব্যক্তিগত মতামত বটে; বৈজ্ঞানিক তথ্যকে যে মূল্য দেওয়া যায় উহাকে সে মূল্য দেওয়া যায় না।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের প্রচলিত সূত্র ও প্রণালী (anthropometry) মতে গোষ্ঠী বিভাগ বা racial classification অসন্তোষজনক মনে হওয়াতে * নৃতত্ত্ববিজ্ঞান এখন সমাজবিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, Genetics, Racial Biology প্রভৃতির সহিত মিলিয়া নূতন দিকে কাজ আরম্ভ করিয়াছে।

নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের দ্বিতীয় অংশ বা কৃষ্টিমূলক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের এলাকার পড়ে সমাজের ও পরিবারের গঠন, সামাজিক ও পারিবারিক আচার, অনুষ্ঠান, বিধিনিষেধ, খেলাধুলা, কিম্বদন্তী, রূপকথা, ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠান প্রভৃতির বিবরণ সংগ্রহ ও আলোচনা। প্রধানত যাহাদিগকে primitive tribes বলা হয়, অর্থাৎ আধুনিক সভ্যতার বাহিরে এখনও যে সকল মনুষ্য-গোষ্ঠী বা সমাজ বাস করে তাহাদের জীবনযাত্রার সকল অঙ্গের পরিচয় সংগ্রহ করা নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর অনুসন্ধানের বিষয়। সভ্য সমাজে নানাপ্রকার প্রাচীন প্রথা, বিধি নিষেধ এখনও বর্তমান। এইগুলির মূল অনুসন্ধান করা নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীর কাজের মধ্যে। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে প্রাপ্ত মালমশলার সাহায্যে প্রাচীন ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবনযাত্রা ও কৃষ্টির আলোচনা করাও নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের অঙ্গ।

ভারতবর্ষে কৃষ্টিমূলক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনা সম্বন্ধে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে। একথা হয়ত অনেকে জানেন না যে কৃষ্টিমূলক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে প্রধানত সাম্রাজ্যবাদী শাসননীতির প্রয়োজন ও প্রেরণা হইতে। অধীন, অনুন্নত দেশগুলির অধিবাসীদিগের জীবনযাত্রার সকল অঙ্গের পরিচয় সংগ্রহ করা শাসকজাতি সমূহের পক্ষে প্রয়োজন, যাহাতে তাহাদের সামাজিক জীবনের ব্যবস্থায় কোনপ্রকার অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ না করিয়া ও অহেতুক বিরোধের সৃষ্টি না করিয়া "সহানুভূতির" সঙ্গে শাসনকার্য নির্বিঘ্নে চালাইতে পারা যায়। Colonial administration এর এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য এশিয়া, আফ্রিকা, ইন্দোনেশিয়া, পলিনেশিয়া ও মেলানেশিয়ার বিভিন্ন অনুন্নত মনুষ্যগোষ্ঠী সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ (প্রধানত সাম্রাজ্যভোগী জাতির) বিশেষ অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়াছেন। ভারতবর্ষেও কৃষ্টিমূলক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের আলোচনা প্রধানত ঐরূপ প্রেরণা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের Castes এবং Tribes সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের বৃটীশ সভ্যগণ যে এই শ্রেণীর গ্রন্থ রচনায় প্রধান

* "Anthropometry has become well nigh sterile by its persistence in one sole line of research after racial average"—C. S. Myers J. R. A. S. Vol. XXXIX, p. 37.

অংশ গ্রহণ করিয়াছেন ইহা তাৎপর্যহীন ব্যাপার নহে। কিন্তু গোড়ার উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহাদের অনেকে যে সকল প্রামাণ্য বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন সে জন্য তাঁহাদের প্রাপ্য প্রশংসার ভাগ দিতে বা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে এদেশবাসীরা কৃপণতা করে নাই।

Physical anthropologyর প্রধান কাজ জাতীয় টাইপ নির্ণয় করা ও রেসিয়াল শ্রেণী বিভাগ করা। ইহার অর্থ কয়েকটি নির্বাচিত দৈহিক লক্ষণকে ভিত্তি করিয়া পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করা, এই সকল নির্বাচিত লক্ষণ হইল মস্তকের গঠন, নাসিকার গঠন, মুখমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের গঠন, দেহের দৈর্ঘ্য, কেশের প্রকৃতি ও রং, চক্ষুর গঠন ও রং। এই সকল লক্ষণের একটি, দুইটি বা সব কয়টির ভিত্তিতে পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যেমন য়ুরোপীয়গণ গাত্রবর্ণ অনুসারে পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে ভাগ করে—white ও coloured races। কিন্তু তাহাদের শ্বেতজাতির তালিকার মধ্যে কেবল একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের, অর্থাৎ য়ুরোপের শ্বেতজাতিগুলি এবং আমেরিকা, আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানের তাহাদের আত্মীয়গণ পড়ে, এশিয়ার অধিবাসী যে সকল শ্বেতজাতি আছে তাহারা coloured races-এর অন্তর্ভুক্ত। গাত্রবর্ণ অনুসারে এই প্রকারের শ্রেণী-বিভাগ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের শ্রেণী-বিভাগ নহে, রাজনৈতিক শ্রেণী-বিভাগ। বাহির হইতে দেখিলে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের racial classification বা রেসিয়াল থিওরীর মধ্যে কোনপ্রকার অবৈজ্ঞানিক প্রভাব আসিবার কথা নহে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে রেসিয়াল থিওরী ব্যাখ্যার ব্যাপারে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত নানাভাবে প্রভাবিত হইতে পারে। রেসিয়াল থিওরীর অপপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে, বিরল নহে।

একজন প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর মত উদ্ধৃত করা হইতেছে: "Our science has been debased in the interest of false racial theories.... Anthropology is regarded with some suspicion in India. There are several reasons for this. The attempt of certain scholars and politicians to divide the aboriginal tribes from the Hindu community at the time of the census created the impression that science could be diverted to political and communal ends." Dr. Verrier Elwin, Pres. Address, Indian Science Congres, 1944). ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ প্রভৃতি ব্যাখ্যার মধ্যে অবৈজ্ঞানিক মতবাদ কি ভাবে প্রবেশ করিয়াছে পরে তাহার আরও দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিবার অবসর পাওয়া যাইবে।

সুতরাং রেসিয়াল থিওরী মানিয়া লইবার ব্যাপারে সতর্ক হইবার প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের সম্পর্কে আলোচনায় এই সতর্কতার মাত্রা বাড়াইলে ক্ষতি নাই। চল্লিশ কোটি লোকের বাসভূমি এই বিরাট দেশে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে সাদা, কাল, পীত, নানা জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ প্রচার হইয়াছে সেই সকল মতবাদের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কিরূপ পরে দেখা যাইবে।

উপরে কি প্রকারের তথ্য ও প্রণালীর সাহায্যে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ মনুষ্য-সমাজের শ্রেণী বা গোষ্ঠী বিভাগ করেন সাধারণভাবে তাহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এখন এইরূপ শ্রেণী বা গোষ্ঠী বিভাগের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদিগের সম্পর্ক সম্বন্ধে কি জানিতে পারা যায় তাহার কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে।

যে সকল দৈহিক লক্ষণের ভিত্তিতে পৃথিবীর মনুষ্য-সমাজকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করা হইয়াছে

তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সকল লক্ষণের মধ্যে গাত্রবর্ণ, মস্তকের গঠন ও কেশের প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত প্রধান।

গাত্রবর্ণ অনুসারে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন যথা শ্বেত (Leucodermic), পীত (Zanthodenmic) ও কৃষ্ণ (Melanodermic)। এই তিনটি শ্রেণী ছাড়া মিশ্রবর্ণের মানুষের সংখ্যা কম নহে। মিশ্রবর্ণের উৎপত্তির কারণ ভিন্ন গাত্রবর্ণের দুইটি বা ততোধিক গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ হইতে পারে, আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকের দরুণ মূলবর্ণের ক্রমিক পরিবর্তন হইতে পারে। মানুষের গাত্রবর্ণ প্রথমাবধি সাদা, কাল, পীত প্রভৃতি বিভিন্ন রংয়ের ছিল অথবা উহা প্রথমে এক রকমের ছিল এবং আবহাওয়া, পারিপার্শ্বিক, দেহের আভ্যন্তরীণ কোষ সমূহের পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন প্রকারের হইয়াছে ইহা লইয়া অনেক আলোচনা চলিয়াছে ও চলিতেছে এবং অনেক প্রকারের মতবাদের প্রচারে হইয়াছে। সম্ভবত ভবিষ্যতে শরীর-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইবে। আবহাওয়া, পারিপার্শ্বিক ইত্যাদির প্রভাবে ত্বকের রংয়ের পরিবর্তন হয় ইহা মানিয়া লইলে সংমিশ্রণ ছাড়াও যে মানুষের গাত্রবর্ণের পরিবর্তন হইতে পারে তাহা স্বীকার করিতে হয়। সেক্ষেত্রে গাত্রবর্ণ অনুসারে পৃথিবীর অধিবাসীদিগকে বিভিন্ন জাতিতে ভাগ করিবার ব্যাপারে কোনরূপ সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিনা এই প্রশ্ন উঠে। সে যাহা হউক, মনে রাখা আবশ্যক যে গাত্রবর্ণ অনুসারে মনুষ্যগোষ্ঠীর যে জাতি-বিভাগ করা হয় তাহার অর্থ এই নহে যে এক প্রকার গাত্রবর্ণের পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের অধিবাসী এক জাতি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীভুক্ত।

ভারতবর্ষের কথা পরে বলা হইবে। ভারতবর্ষ বাদে কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যগোষ্ঠী দেখিতে পাওয়া যায় প্রধানত ভারতবর্ষের দক্ষিণে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে; পূর্বদিকে আরও অগ্রসর হইলে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বা দ্বীপময় ভারতে, মালয় উপদ্বীপে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে, মাইক্রোনেশিয়ায়, নিউগিনিতে, মেলানেশিয়া নামে পরিচিত পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলিতে এবং অষ্ট্রেলিয়ায়। নিউজিলণ্ড ও তাসমেনিয়ায় আদিবাসী এই গোষ্ঠীভুক্ত। ভারতবর্ষের পশ্চিমে নীলনদের উপত্যকার উত্তর অঞ্চল, সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে মধ্য আফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকার বিস্তৃত অঞ্চল কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যগোষ্ঠীর বাসভূমি। আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণের জাতিগুলির মধ্যে পড়ে নিগ্রো, নিলোট, মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার বান্টু গোষ্ঠীগুলি এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার হেজাইট বা হাবসী গোষ্ঠী সমূহ। দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের দ্বীপসমূহে, দক্ষিণ-পূর্বে মধ্য ও দক্ষিণ মালয়ে, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সুমাত্রায় ও আরও পূর্বে নিউগিনি, অষ্ট্রেলিয়া ও পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপ পর্যন্ত কৃষ্ণবর্ণের মনুষ্যগোষ্ঠীর অঞ্চলগুলি অবস্থিত। পূর্বদিকে এই অঞ্চল মেলানেশিয়া পর্যন্ত গিয়াছে। ভারতবর্ষের পশ্চিমে এই অঞ্চল আফ্রিকার গিনি উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রশ্ন উঠে, বহুদূরব্যাপী ও বিচ্ছিন্নভাবে এই দ্বীপগুলিতে উহারা কোথা হইতে আসিয়াছিল? এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে কোন না কোন প্রধান ভূভাগ হইতে সরিয়া আসিয়া ইহারা এই সকল অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেখা যায় পূর্বে অষ্ট্রেলিয়া, নিউগিনি ও মেলানেশিয়া লইয়া কৃষ্ণবর্ণের অধ্যুষিত মনুষ্যগোষ্ঠীর একটি অঞ্চল ও পশ্চিমে আফ্রিকা আরেকটি প্রধান অঞ্চল। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে হয়ত এই দুইটি প্রধান ভূভাগই উহাদের আদি বাসভূমি ছিল। এই অনুমানের অন্য কোন ভিত্তি আছে কিনা পরে দেখা যাইবে।

শব্দবিদ্যায় রামনের গবেষণা

শ্রীবিভূতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১৯০৯ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত রামন 'মেল্ডির পরীক্ষা' সম্পর্কে নতুন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন এবং তাই দিয়ে কম্পনের মূল ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা করেন। 'নেচার'-এ (নভেম্বর ১৯০৯) ও 'ফিজিক্যাল রিভিউ'-এ (মার্চ ১৯১১) এই গবেষণা প্রকাশিত হয়। রামনের ব্যবস্থাটি ছিল এরূপ: একটি সরু সুতোর কিংবা সিল্কের তার টিউনিং-ফর্ক-এর একটি প্রং-এ লাগানো হয়। টিউনিং-ফর্ক-এ প্রথমে ছড় টেনে, পরে বৈদ্যুতিক উপায়ে, কম্পন সৃষ্টি করা হয়। এই তারটি এমনদিকে রাখা হয় যেন প্রং দুটির লম্ব সমতলে কিন্তু তা'দের কম্পন-রেখার বিশেষ নতিতে থাকে। এই অবস্থায় প্রং-এর গতি দুই উপাংশে বিশ্লিষ্ট হয়। একটি তারের সমান্তরালে, অন্যটি লম্বে। লম্বদিকের উপাংশে যে কম্পন সংস্থাপিত হয়, যদি তারের টান যথাযথ নিয়ন্ত্রিত হয় তবে এর কম্পাঙ্ক হবে ফর্কের কম্পাঙ্কের অনুরূপ। অবশ্য তারের দৈর্ঘ্য এমন হবে যেন তারের কম্পনের অংশগুলি যুগ্ম সংখ্যক হয়। সমান্তরাল উপাংশে যে কম্পন সংস্থাপিত হয় তা'র কম্পাঙ্ক হবে ফর্কের কম্পাঙ্কের অর্ধেক। এই পরীক্ষার সাফল্য কম্পনের উপাংশ দুটিকে লম্ব সমতলে বিচ্ছিন্ন করার উপর নির্ভর করে। এই দুই কম্পনের একটির কম্পাঙ্ক হয় অন্যটির দ্বিগুণ। তাই ব্যবস্থাটির পরিবর্তন প্রয়োজন। তারের এক প্রান্ত সোজাসুজি প্রং-এ না এনে সুতোর একটি আংটায় লাগানো হয়। এই আংটার সুতো প্রং-এর উপর দিয়ে যুক্ত থাকে। দেখা গেছে, এই ভাবে আংটা যুক্ত হওয়ায় পরস্পর সমকোণে অবস্থিত দুই সমতলের কম্পনের কম্পাঙ্ক সামান্য বিভিন্ন হয় অর্থাৎ এই দুটি কম্পনের উপাংশ নিজেদের নির্দিষ্ট সমতলে থাকে। এই ব্যবস্থাটিতে তারের প্রতি বিন্দুর গতি তারের তির্যক সমতলে যে সকল চিত্র সৃষ্টি করে রামন তার আকৃতি নিয়ে গবেষণা করেন। এই সকল চিত্রের গঠন, দুই উপাংশের কম্পনের দশার সম্বন্ধের এবং প্রাথমিক টানের উপর নির্ভর করে। রামন এই সকল পরীক্ষার ফলের যৌক্তিকতা বিভিন্ন গণনার অবতারণা করে প্রমাণ করেন। এই গাণিতিক তত্ত্বের আলোচনা সাধারণভাবে সম্ভব নয়। এই সকল গতির চিত্রকে "লিসেজাস রেখা-চিত্র" বলা হয়। এরূপ লিসেজাস রেখাচিত্র পর্যবেক্ষণের জন্য রামন সুন্দর ব্যবস্থা করেন। সবিরাম আলোকে তারটিকে আলোকিত করা হয়। এই আলোকের কম্পাঙ্ক টিউনিং ফর্ক এর কম্পাঙ্কের দ্বিগুণ হ'লে তারের কম্পনের চারটি বিভিন্ন অবস্থা একসঙ্গে দেখা যায়। এই জন্য স্ট্রোবোসকোপিক্ চাকতি বিশেষ উপযোগী। এই চাকতিতে সরু স্লিট (ছিদ্র) আছে আর মোটরে চলে। মোটরটি টিউনিং-ফর্ক-এর সঙ্গে সমতার করা থাকে। রামন নিজে তিরিশ ও চল্লিশ স্লিট যুক্ত দু'টি 'স্ট্রোবোসকোপিক' চাকতি ব্যবহার করেন। কম্পিত তারটিকে স্ট্রোবোসকোপিক চাকতির স্লিটের মধ্য দিয়ে পর্যবেক্ষণের জন্য উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত করা হয়।

কম্পিত তারের নোড যে গতিহীন স্থিতিবিন্দু নয়, কিঞ্চিৎ গতিযুক্ত এই সিদ্ধান্ত রামন প্রথম 'নেচার'-এ (১৯০৯) প্রকাশ করেন। তিনি পরীক্ষায় এর প্রমাণ দিয়েছেন। একটি টানা তারে পর্যাবৃত্ত বলের সাহায্যে কম্পন সৃষ্টি করা হয়। এই পর্যাবৃত্ত বল তারের একটি বিন্দুতে আড়াআড়িভাবে প্রয়োগ করা

হয়। কম্পনের জন্য তারে যে সকল নোডের সৃষ্টি হয়, রামন বলেন, এই সকল নোড গতিহীন স্থিতি-বিন্দু নয়; কেননা তারের গতির জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা এই বিন্দুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। নোডে এই গতির পর্যবেক্ষণের জন্য সবিরাম আলোকের ব্যবস্থা করা হয়। এই আলোকের কম্পাঙ্ক হবে তারের কম্পনের কম্পাঙ্কের দ্বিগুণ। এই অবস্থায় তারে যে বিশেষ দু'টি স্থানের সৃষ্টি হয়, সেখানে ধীরে গতির পরিচয় পাওয়া যায়। কিঞ্চিৎ গতিযুক্ত এই স্থান দু'টি প্রকৃত গতির বিপরীত দশায় থাকে। রামন বলেন, যদি নোড প্রকৃতই গতিহীন হ'তো, তবে এই স্থান দুটি স্থিতিবিন্দুতে এসে মিলতো। সবিরাম আলোকে যে সকল নোড দেখা যায় তারের কম্পনের প্রকৃত নোড থেকে (অর্থাৎ যে সকল নোড আলোকের অবর্তমানে সৃষ্টি হয়) তাদের দূরত্ব অত্যন্ত অল্প হওয়া উচিত। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে ভিন্ন রূপ। সবিরাম আলোকে যে সকল নোড দেখা যায় তা তারের উপরে বেশ কিছুটা ভ্রমণ করে। এই ভ্রমণের দূরত্ব একটি লুপ-এর সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের সমান। রামন দেখিয়েছেন, নোডের এই ধীর-গতির দশা অবশিষ্ট তারের কম্পনের থেকে এক-চতুর্থাংশে ভিন্ন হয়। এই পরীক্ষার জন্য রামন, স্ট্রোবোস্কোপিকে চাকতি, র‍্যালের মোটর ও টিউনিং-ফর্ক-এর এমন ব্যবস্থা করেন যাতে এদের গতির সমলয় করা যায়।

সাধারণ ভাবে একটি সূতোর একপ্রান্ত বিদ্যুতে সংস্থাপিত টিউনিং-ফর্ক-এ যুক্ত ক'রে, অন্যপ্রান্ত কম্পিত-তারের বিভিন্ন বিন্দুতে যুক্ত করা হয়। দেখা গেছে, লুপগুলিতে যুক্ত হলে ইংরেজী আটের মত (৪) কম্পনের রেখাচিত্র সৃষ্টি হয়। কিন্তু নোড-গুলিতে যুক্ত হ'লে অধিবৃত্তের (প্যারাবোলার) সৃষ্টি হয়। অবশ্য এই ব্যবস্থায়, প্রধান গতি লম্বালম্বিভাবে পরিচালিত হয়। রামন ব্যাখ্যা করেছেন এরূপে: নোডের ধীর-গতি অন্যান্য অংশের দীর্ঘ-গতির এক দশায় নেই। বিভিন্ন চিত্র থেকে দেখা যায়, নোডের ধীর-গতি চরম হয়, যখন অন্য অংশের দীর্ঘ-গতি অবম। অর্থাৎ নোডের ধীর-গতির দশা তারের সাধারণ গতির দশা থেকে কম্পনকালের যথাযথ চতুর্থাংশে ভিন্ন হয়। টিউনিং-ফর্কটি যখন যথার্থ একটি নোডের উপর থাকে তখন এর দশা হবে পরবর্তী নোডের ধীরগতির বিপরীত দশার অনুরূপ এবং তৃতীয় নোডের এক দশা। বিভিন্ন নোডের ধীরগতির দশার পরিচয় নির্ধারণের জন্য রামন গাণিতিক সূত্রের অবতারণা করেন। 'ফিজিক্যাল রিভিউ'-এ (মার্চ ১৯১১) মেল্ডির পরীক্ষা সংক্রান্ত কয়েকটি অবস্থার রামন নতুন ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, 'দুই কম্পাঙ্কযুক্ত বলের সাহায্যে কম্পন সংস্থাপন সম্বন্ধে র‍্যালের সিদ্ধান্ত ও পরীক্ষালব্ধ ফলের যথেষ্ট অমিল রয়েছে।' এই অমিলের কারণও তিনি নির্দেশ করেন। র‍্যালের গাণিতিক সূত্র অনুযায়ী, 'গতির দশা সংস্থাপিত বিস্তার নিরপেক্ষ এবং এই বিস্তার অনির্ণেয়।' রামন র‍্যালের সূত্র অনুসারে দশার সম্বন্ধ পরীক্ষা ক'রে প্রমাণের জন্য একটি ব্যবস্থা করেন। ফর্কের ও তারের কম্পনের মধ্যে দশার সম্বন্ধ নিরূপিত হ'লে পরীক্ষার উদ্দেশ্য সফল হয়। এই দুই কম্পনের একটির কম্পাঙ্ক হবে অন্যটির দ্বিগুণ। রামনের ব্যবস্থাটি ছিল এরূপ: টিউনিং-ফর্কের প্রং-এর অন্তে একটি ছোট আয়না লাগানো হয়। টানা তারের একটি বিন্দু আড়াআড়িভাবে আলোকিত করা হয়। যখন তারটি কম্পিত হতে থাকে তখন এই বিন্দুটি আলোকিত সরল রেখার মত দেখা দেয়। আলোকিত বিন্দু প্রথমে একটি স্থির আয়নায় প্রতিফলিত হ'য়ে, পরে টিউনিং-ফর্কে লাগানো দোলায়মান আয়নায় এসে পড়ে। প্রং-এর কম্পনের সমতল যদি তারের কম্পনের সমতলের সমকোণে রাখা হয়, তবে আলোকিত বিন্দুটি যে সকল লিসে-জাস রেখাচিত্রের সৃষ্টি করে তা থেকে দশার সম্বন্ধ নিরূপণ করা যায়। রামন এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণ

করেন, গতির হ্রাস যে-কোন প্রাথমিক টানের অধীনে সংস্থাপিত বিস্তারের নিরপেক্ষ নয়। বিভিন্ন রেখাচিত্রের ব্যাখ্যার জন্য র‍্যালের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা প্রয়োজন। কারণ, মুক্ত-কম্পনের বিস্তারের সঙ্গে টানের পরিবর্তন বর্তমান এবং এই পরিবর্তন গতির বর্গরাশির সমানুপাত। 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন-এ (মে ১৯১১) রামন টানের পরিবর্তন সম্বন্ধে নিজের পর্যবেক্ষণ এবং তার গাণিতিক ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন।

অনুনাদের সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, কোন একটি ব্যবস্থার উপর পর্যাবৃত্ত বল পরিচালিত হ'লে, যদি এদের পর্যায়কাল প্রায় সমান হয়, তবে অত্যন্ত অল্প গতির বিস্তার সংস্থাপিত হ'তে পারে। অন্যান্য অবস্থায় এই পরিণাম এত অল্প যে গণনার মধ্যেই আসে না। রামন পরীক্ষা করে দেখেন, অনুনাদের এমন অনেক অবস্থা আছে যেখানে এই প্রায় সমান পর্যায়কালের নিয়ম আপাত-ব্যতিরেক মনে হয়। বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে তিনি প্রমাণ করেন, এমন অনেক নির্দিষ্ট অবস্থা আছে, যেখানে এরূপ পর্যাবৃত্ত বল একটি ব্যবস্থার উপর পরিচালিত হ'লে দীর্ঘগতির সৃষ্টি করে। রামন গতি-সংস্থাপনের এই নির্দিষ্ট অবস্থাগুলি টানা তার ও টিউনিং-ফর্ক-এর সম্মিলিত ব্যবস্থায় পরীক্ষা করেন ও এদের গাণিতিক ব্যাখ্যা দেন। একটি টানা তার টিউনিং-ফর্ক-র সঙ্গে যুক্ত ক'রে এতে টানের পর্যাবৃত্ত পরিবর্তন সংস্থাপিত হয়। এই টিউনিং-ফর্কটির প্রং-এর কম্পনের দিক তারের সমান্তরালে থাকে। তারের টান ও কম্পনের পর্যায়কাল এবং টিউনিং-ফর্কের কম্পনের পর্যায়কাল যথাযথ নিয়ন্ত্রিত হয়। দেখা যায়, তারের স্থিতিসাম্য অপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে পড়ে এবং স্থায়ী প্রবল কম্পনেরও সৃষ্টি হয়। লিসেজাস রেখাচিত্রের সাহায্যে এবং উন্নত ধরনের পরীক্ষায় গৃহীত কম্পনের রেখাচিত্র থেকে এই বিষয়টির যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা রামন করেন। 'নেচার'-এ (ডিসেম্বর ১৯০৯) ও ইণ্ডিয়ান এসো-সিয়েশন-এর ২নং 'বুলেটিনে' (১৯১০) এই গবেষণা প্রকাশিত হয়।

'ফিজিক্যাল রিভিউ'-এ (১৯১২) 'অনুনাদের কয়েকটি বিশেষ অবস্থা' এই শিরোনামায় অনুনাদ সম্বন্ধে রামন নিজের গবেষণা প্রকাশ করেন। পর্যাবৃত্ত চৌম্বকক্ষেত্রে তারের কম্পন এবং বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ-গতির জন্য যে প্রাথমিক কম্পনের সৃষ্টি হয়, সেই সকল কম্পন সম্বন্ধেও গবেষণা করেন। হারমোন ও ডেভিসের বিচ্ছিন্ন তরঙ্গ-গতির সিদ্ধান্ত অবলম্বন ক'রে রামন ছড় টানা তারে 'উলফ স্বর' বিষয়টি নিজের পরীক্ষা থেকে ব্যাখ্যা করেন।

বেহালা জাতীয় সকল তারের যন্ত্রে এমন স্বর (নোট) আছে যা সাধারণভাবে ছড় টেনে সৃষ্টি করা অত্যন্ত কঠিন; প্রায় অসম্ভব বলা চলে। বিশ্রী কর্কশ সুরের সৃষ্টি হয় ব'লে এই স্বরকে "উলফ-স্বর" বলা হয় (নেকড়ে বাঘের ডাকের সঙ্গে এর সঙ্গতির জন্য এই নাম)। যখন এই উলফ-স্বরের সৃষ্টি হয়, তখন সমস্ত যন্ত্রটি প্রবলভাবে কম্পিত হ'তে থাকে। এই অবস্থায় তারে ছড়-টানা যায় না এবং স্পষ্ট কোমল সুরের সৃষ্টিও হয় না। ১৯১৫ সালে হোয়াইট এই বিষয়টি পরীক্ষা ক'রে এক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। ১৯১৬ সালে 'নেচার'-এ এবং ১৯১৬ ও ১৯১৮ সালে 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন'-এ রামন ছড়-টানা "উলফ-স্বর"-এর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। ছড়-টানা তারের পরীক্ষা সম্পর্কে নিজের সিদ্ধান্ত অবলম্বন করে বলেন, যখন ছড়ের চাপ, তার থেকে শক্তিক্ষয়ের যে পরিমাণ, তা থেকেও কম থাকে, তখন তারের কম্পনের প্রধান ধারায় প্রাথমিক (fundamental) শুরুতে প্রবল থাকা সত্বেও সেই কম্পন সংস্থাপিত হয় না এবং যে কম্পনে অক্টেভ (octave) প্রবল, তা'র সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় যখন ছড় টেনে তারে কম্পন সৃষ্টি করা হয়, তখন যন্ত্রটির দেহ অর্থাৎ কাঠের ফ্রেম সহকম্প (sympathetic) অনুরণনের জন্য প্রবলভাবে উত্তেজিত হয়। তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত ছড় কম্পনের

প্রাথমিককে প্রধানরূপে সংস্থাপন করতে পারে, শক্তি-ক্ষয়ের পরিমাণ সেই সীমাকেও ক্রমে অতিক্রম ক'রে-বেড়ে চলে। এই কারণে তারের কম্পন পরিবর্তিত হ'য়ে, যে কম্পনে প্রাথমিক অত্যন্ত ক্ষীণ ও অক্টেভ অত্যন্ত প্রবল, সেই কম্পনের সৃষ্টি হয়। আরও সহজে বলা যায়, শুরুতে তারের কম্পনে প্রাথমিক প্রবল থাকে, কিন্তু যন্ত্রের কাঠের অনুরণিত কম্পন-শক্তি টেনে নেয়, ফলে ছড় ও তারের মধ্যে চাপ ক'মে যায়, এবং প্রাথমিক কিছুতেই সংস্থাপন করা সম্ভব হয় না। পূর্বের কম্পন পরিবর্তিত হ'য়ে যে কম্পনের সৃষ্টি হয় তাতে অক্টেভ প্রবল থাকে। পরে কাঠের কম্পনের নিবৃত্তি হলে প্রাথমিক প্রধান হ'য়ে দেখা দেয়। প্রাথমিক ও অক্টেভের মধ্যে এই ক্রম-পরিবর্তন তারের কম্পনের আলোক-চিত্রে দেখা যায়। রামন এই সিদ্ধান্ত তারের ও যন্ত্র-দেহের এককালীন কম্পনের আলোকচিত্র থেকে প্রমাণ করেন।

ফ্যারাডে, মেল্ডি ও র‍্যালে কম্পন-সংস্থাপন সম্বন্ধে গবেষণা করেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন-এর ৬নং 'বুলেটিনে' রামন এ বিষয়ে নিজের পর্যবেক্ষণ ও তা'র ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। তিনি প্রমাণ করেন, সরল একতান বল লম্বালম্বিভাবে টানা তারের উপর পরিচালিত হ'য়ে যখন তারের মুক্ত দোলনের কম্পাঙ্ক ফর্কে কম্পাঙ্কের অর্ধের যে কোন পূর্ণ গুণিতকের প্রায় সমান হয়, তখনই কম্পন সংস্থাপন ক'রতে পারে। কম্পন-সংস্থাপন কিরূপে সম্ভব হয়, তা পর্যবেক্ষণের জন্য রামন উত্তেজিত টিউনিং ফর্ক ও তারের সংস্থাপিত গতির এককালীন কম্পন রেখা সমূহের আলোক-চিত্র গ্রহণের ব্যাবস্থা করেন। বিভিন্ন আলোক চিত্রে তারের গতির কম্পাঙ্ক ফর্কের কম্পাঙ্কর অর্ধের বিভিন্ন গুণিতক রাখা হয়। এই সকল চিত্রের ব্যাখ্যার জন্য রামন যে গাণিতিক আলোচনা করেন, তা থেকে জানা যায়, গতির কয়েকটি সহকারী উপাংশ গতি সংস্থাপনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে। সংস্থাপিত গতির প্রধান উপাংশ ও এই সহকারী উপাংশগুলি রামন সুন্দর শ্রেণীতে সাজিয়েছেন।

রামন দুটি সরল একতান বলের সাহায্যে সম্মিলিত কম্পন সংস্থাপন সম্বন্ধে গবেষণা করেন। এই পরীক্ষার জন্য এমন একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন যাতে এই কম্পনের কম্পাঙ্ক একটা বিস্তৃত সীমার মধ্যে যে কোন নির্দিষ্ট মানে রাখা যেতে পারে। যে সকল অবস্থায় এই ব্যবস্থাটির স্থিতিসাম্য অপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে পড়ে এবং প্রবল কম্পনের সৃষ্টি হয়, সেই পর্যবেক্ষণই পরীক্ষার প্রধান বিষয়। রামনের পরীক্ষার ব্যবস্থাটি ছিল অত্যন্ত সহজ। বিদ্যুতের সাহায্যে সংস্থাপিত দুটি টিউনিং-ফর্ক টেবিলের উপর কিছুটা ব্যবধানে এমনভাবে রাখা হয় যেন এদের প্রংগুলি এক সমতলে খাড়া অবস্থায় এবং কম্পনের গতি সমান্তরালে থাকে। এক কিংবা দুই মিটার লম্বা সরু সিল্কের তার ফর্ক দুটির মধ্যে অনুভূমিতে প্রসারিত রাখা হয়। এই তারের দুই প্রান্ত প্রত্যেক ফর্কের নিকটবর্তী প্রং-এ লাগানো হয়। প্রথমে, টিউনিং-ফর্ক যখন স্থির থাকে তারের টান, একটি ফর্কের দূরত্ব অন্যটির থেকে কমিয়ে কিংবা বাড়িয়ে ঠিক করা হয়। ফর্ক দুটি উত্তেজিত হ'লে তারের টান প্রত্যেকের এককালীন কম্পনের জন্য পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়। কারণ ফর্কের প্রং খাড়া এবং তারটি তা'দের কম্পনের দিকের সমান্তরালে থাকে। এই ব্যবস্থায় যে অনুনাদ কম্পনের সৃষ্টি হয়, রামন তা'র বিশদ গাণিতিক ব্যাখা করেন। তারের মুক্ত দোলনের কম্পাঙ্ক যে কোন নির্দিষ্ট ধারায় $\frac{1}{2}(r\,N_1)$ কিংবা $\frac{1}{2}(s\,N_2)$ হ'লে অনুনাদ কম্পনের সৃষ্টি হবে। এখানে N_1 ও N_2 ফর্ক দুটির কম্পাঙ্ক এবং r ও s পজিটিভ পূর্ণ সংখ্যা। এ ধরণের অনুনাদ সহজেই সৃষ্টি হবে যদি কম্পন সংস্থাপনে যে ফর্কটি কার্যকরী নয় তাকে থামিয়ে দেওয়া হয় এবং অন্য ফর্কটির কম্পন তারের প্রতি রক্ষা ক'রে চলে। এরূপ অনুনাদ ছাড়াও তারের উপর ফর্ক দুটির যুক্ত ক্রিয়ার জন্য আরও বহু কম্পনের প্রবল সংস্থাপন (vigorous maintenance) রামন

পর্যবেক্ষণ করেন। এদের সংখ্যা, বিশেষভাবে বড় কম্পাঙ্কে, এত বেশী হয় যে আলোর বর্ণালীশ্রেণীর রেখা সমূহের সঙ্গে তুলনা করা যায়। রামন বলেন, 'এই সকল "সম্মিলিত অনুনাদ"এর (Combinational Resonance) অবস্থা। উপযুক্ত অবস্থায় এই ব্যবস্থাটির স্থিতিসাম্য অপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে পড়ে এবং যদি মুক্ত দোলনের কম্পাঙ্ক কোন নির্দিষ্ট ধারায় ($\frac{1}{2}$ r $N_1 \pm \frac{1}{2}$ sN_2)-এর প্রায় সমান হয়, তবে প্রবল গতির সংস্থাপন হয়। যে ক্ষেত্রে পজিটিভ চিহ্নের প্রয়োগ হয় তাকে বলে "সংকলিত অনুনাদ" (Summational Resonance) এবং যে ক্ষেত্রে নেগেটিভ চিহ্নের প্রয়োগ হয়, তাকে বলে "বিভেদক অনুনাদ" (Differential Resonance)। সংস্থাপিত গতির কম্পাঙ্ক ($\frac{1}{2}$ r$N_1 \pm \frac{1}{2}$ sN_2)-এর সম্পূর্ণ সমান হয়।' রামন এই পরীক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা করেন, তাতে ফর্ক দুটির কম্পনের ও তারের সংস্থাপিত কম্পনের এককালীন আলোক-চিত্র নেওয়া যায়। কম্পনরেখার এই আলোক-চিত্র থেকে সংস্থাপিত কম্পনের কম্পাঙ্ক সম্মিলিত অনুনাদের সূত্রে কিভাবে যুক্ত আছে তা পরীক্ষা করা হয়। এ সম্বন্ধে রামন যে সকল জটিল গাণিতিক হিসাব করেন সম্মিলিত অনুনাদে তা'র ব্যাপক প্রয়োগ হয়েছে।

রামনের পরবর্তী গবেষণা 'বলের পর্যাবৃত ক্ষেত্রে গতি' সম্বন্ধীয়। বলের পর্যাবৃত্ত ক্ষেত্রে কোন বস্তুর সাম্যাবস্থার চারদিকে তা'র কম্পন সম্বন্ধে পরীক্ষা ক'রে তিনি প্রমাণ করেন সংস্থাপিত কম্পনের কম্পাঙ্ক এই ক্ষেত্রের কম্পাঙ্কের সমান অথবা অর্ধেক অথবা এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ প্রভৃতি, অর্থাৎ ক্ষেত্রের কম্পাঙ্কের যে কোন ভগ্নাংশের গুণিতকের সমান। এরূপে রামন এক নতুন ধরনের অনুনাদ কম্পনের শ্রেণী খুঁজে পেয়েছেন। রামনের পরীক্ষার উদ্দেশ্য হ'লো, একটি তড়িৎ-চুম্বকের কুণ্ডলীতে সবিরাম তড়িৎ পরিচালনায় উৎপন্ন চৌম্বকক্ষেত্রে, সাম্যাবস্থার চারদিকে, সমলয় করা মোটরের আর্মেচার-চাকার কম্পন পর্যবেক্ষণ করা। আর্মেচার-চাকার সংস্থাপিত কম্পনের কম্পাঙ্ক এবং কম্পনের দশা পর্যবেক্ষণের জন্য একটা ব্যবস্থা করা হয়। সবিরাম তড়িৎ পরিচালিত ফর্কের একটি প্রং-এ ছোট আয়না খাড়াভাবে লাগানো হয়। সরু আলোকরশ্মি প্রথমে এসে এই আয়নায় প্রতিফলিত হয়। আর্মেচার-চাকার অক্ষদণ্ডে অনুরূপ আর একটি আয়না আবর্তিত অক্ষের সমান্তরালে থাকে। এই আয়নায় আলোক-রশ্মি দ্বিতীয়বার প্রতিফলিত হয়। ঊর্ধ্বাধ-গতি হয় ফর্কের জন্য ও আনুভূমিক-গতি আর্মেচার-চাকার জন্য। সমস্ত ব্যবস্থাটি এমন থাকে যে, ফর্কের ও আর্মেচার-চাকার কম্পনের জন্য আলোকরশ্মির এই দুই কৌণিক প্রতিফলন একে অন্যের সমকোণে হয়। এই কারণে, আলোকরশ্মি ক্যামেরার লেন্সের মধ্য দিয়ে কাচের পর্দায় এসে প'ড়লে দেখা যায়, লিসেজাস রেখাচিত্রের সৃষ্টি হ'য়েছে। এই রেখাচিত্র থেকে কম্পাঙ্ক এবং ফর্ক ও আর্মেচার-চাকার কম্পনের মধ্যে দশার সম্বন্ধ সহজেই জানা যায়। ছয়টি বিভিন্ন রেখা-চিত্র থেকে রামন প্রমাণ করেন, আর্মেচার-চাকার কম্পনের দশা ফর্কের দশার সমান, দ্বিগুণ, তিনগুণ, চারগুণ, পাঁচগুণ ও ছয়গুণ হয়। অর্থাৎ কম্পাঙ্ক ফর্কের কম্পাঙ্কের সমান বা $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{6}$ প্রভৃতি হয়। এই শ্রেণীর সংস্থাপিত কম্পনের বিশদ গাণিতিক ব্যাখ্যাও রামন করেছেন।*

* অধ্যাপক রামনের বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে মাঝে মাঝে অনুবাদ করা হ'য়েছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্বোধন উৎসব

গত ২৫শে জানুয়ারী, ১৯৪৮, অপরাহ্নে রামমোহন লাইব্রেরী হলে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত অতিথির সংখ্যা ছিল প্রায় চারিশত।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান অধ্যয়ন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আশার বাণী প্রচার করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় ঠিকই হইয়া গিয়াছে, তবে সাফল্য লাভে হয়তো কিছু সময় লাগিতে পারে। কিন্তু আগামী দুই বৎসরেই হউক কি পাঁচ বৎসরেই হউক সাফল্য লাভ হইবেই। তাঁহার মতে, এখন হইতেই ইংরাজী বা বাংলায় প্রশ্নপত্রের উত্তর লেখা পরীক্ষার্থীর ইচ্ছাধীন করিলেই ভাল হয়। *

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় পরিভাষা রচনার ইতিহাস এবং এ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা করেন। অসুস্থতা নিবন্ধন বসু মহাশয় সভাপতির আসন পরিত্যাগ করিবার পর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সভার কার্য নির্বাহ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বিজ্ঞানের দিক হইতে আমাদের জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার তাঁহার অননুকরণীয় ভাষা ও ভঙ্গীতে বর্তমানে আমাদের দেশে সমূহ প্রয়োজন যন্ত্রবিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনেই সবিশেষ মনোযোগী হইতে উপদেশ দেন। সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস বলেন—বর্তমান অবস্থার নূতন নূতন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন এবং বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাদির প্রণয়ন উভয়ই সমভাবে প্রয়োজনীয়। তিনি বিজ্ঞান পরিষদের কার্যপন্থার সমর্থন এবং সাফল্য কামনা করিয়া বক্তৃতার উপসংহার করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়া একটি সময়োপযোগী বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু সভাশেষে ধন্যবাদ প্রদান উপলক্ষ্যে প্রকাশ করেন যে, পরিষদের সদস্য সংখ্যা আশাপ্রদ এবং পরিচালক মণ্ডলী ইতিমধ্যেই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক একখানি মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

সভায় উপস্থিতদের মধ্যে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, নিখিলরঞ্জন সেন, সহায়রাম বসু, জিতেন্দ্রমোহন সেন, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়, সুধাময় ঘোষ, পরিমল গোস্বামী, হিরণ সান্যাল, নীরেন্দ্র রায়, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, বসন্তলাল মুরারকা, গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, পঞ্চানন নিয়োগী, জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, ক্ষিরোদচন্দ্র চৌধুরী, অক্ষয় কুমার সাহা প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে কর্মসচিব বলেন :

প্রায় এগার বৎসর আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় রবীন্দ্রনাথ সক্ষোভে বলেছিলেন, "দুর্ভাগ্য দিনের সকলের চেয়ে দুঃসহ লক্ষণ এই যে সেইদিনে স্বতঃস্বীকার্য সত্যকেও বিরোধের কণ্ঠে জানাতে হয়। এদেশে অনেক কাল জানিয়ে আসতে হয়েছে যে পরভাষার মধ্য দিয়ে পরিস্রুত শিক্ষায় বিদ্যার প্রাণীন পদার্থ নষ্ট হয়ে যায়।

* প্রবেশিকা থেকে ডিগ্রি পরীক্ষা পর্যন্ত বাংলায় প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়া যাবে এই নির্দেশ বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন।—সম্পাদক।

ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই শিক্ষার ভাষা ও শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না।" কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই ১৯৪৮ সালেও উচ্চশিক্ষা মাতৃভাষার মারফৎ হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সর্বপ্রকার আন্দোলন ও আলোড়নের ভিতরেও আমরা যেন এই সহজ সত্যটা ভুলে না যাই যে যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার সর্বোচ্চ শিখরে মাতৃভাষা নিয়োজিত না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে যে শ্রেণীগত প্রভেদ আছে তা দূর হবে না। এই বাংলা দেশেরই স্বনামধন্য শিক্ষাব্রতী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আজও আমরা যদি মাতৃভাষাকে শিক্ষার সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যেতে না পেরে থাকি, বিজ্ঞানে বাংলা ভাষার যে দৈন্য আছে তা দূর করতে সক্ষম না হয়ে থাকি, তার জন্য দায়ী বাংলা ভাষা নয়, দায়ী প্রধানতঃ বিজ্ঞানীরা ও শিক্ষাব্রতীরা। আমরা সচেষ্ট থাকলে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায় শুধু যে জগতের সর্ববিধ ভাব প্রকাশ করা সম্ভব হবে তা নয় আমাদের মাতৃভাষা সর্ববিষয়েই জগতের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারবে। হয়ত আমাদের মধ্যে দু-চারজন আছেন যাঁরা আমাদের সাফল্যে সন্দিহান। তাঁদের আমি একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে নিউটনকে তাঁর বিখ্যাত বই লিখতে হয়েছিল লাটিনে। সপ্তদশ শতকেও ইংরেজী ভাষা বিজ্ঞান চর্চার উপযুক্ত ছিল না, আর আজ! তিনশ' বছর জাতির পক্ষে এমন কিছু লম্বা ইতিহাস নয়।

অনেকেরই একটা ধারণা হয়েছে পরিষদ বুঝি শুধু পরিভাষা সংকলন ও পরিভাষিক শব্দ তৈরী করবেন, হয়তো বা দু চারটে পাঠ্য পুস্তক লিখবেন। যদিও এই দুইটিই বর্তমানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং আমাদের হয়তো প্রথমে এই দিকেই বেশী নজর দিতে হবে। তা সত্ত্বেও পরিষদের পক্ষে এগুলো হবে গৌণ। কারণ সরকার যদি মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলন হয় তাহ'লে ব্যবসার খাতিরেই হোক বা প্রয়োজনের তাগিদেই হোক অচিরেই এই অভাব দূর হবে পরিষদ না গড়ে উঠলেও। প্রকৃতপক্ষে পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে জনগণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা এবং তাদের জীবনের সমস্যাগুলি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার ও সমাধান করা। 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' ব্রতী হবে প্রধানতঃ এই কার্যে। কিন্তু সর্বোচ্চ শ্রেণীর বিশেষজ্ঞদের জন্যও প্রয়োজন হবে প্রবন্ধ, পরিক্রমা ও গবেষণা বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সাধারণ অধিবেশন

গত ২১শে ফেব্রুয়ারি বেলা ৪॥০ টায় সায়েন্স কলেজের ফলিত রসায়নের বক্তৃতা গৃহে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়। বাংলার প্রায় দুইশত বিজ্ঞান অনুরাগী ও লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভার প্রারম্ভে সভাপতির নির্দেশে সমবেত সভ্যগণ এক মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া মহাত্মা গান্ধীর পুণ্যস্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অতঃপর পরিচালক মণ্ডলীর পক্ষ হইতে কর্মসচিব সমাগত সভ্যদিগকে অভ্যর্থনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করা হয়। বর্ষকালের জন্য গৃহীত পরিষদের নিয়মাবলীর খসড়াটি বিবেচনা ও সংশোধনাদির জন্য অধ্যক্ষ শ্রীপঞ্চানন নিয়োগীর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। তাহার পর বিভিন্ন শাখার শতাধিক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি মন্ত্রণা পরিষদ ও কার্যকরী সমিতির নির্বাচন সম্পন্ন হয়। বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে আচার্য শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এবং ডাক্তার শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এই দুইজন প্রবীনতম বিজ্ঞানসেবী সাহিত্যিককে

পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্বাচন করা হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন:—

সভাপতি: শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

সহকারী সভাপতি: শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসত্যচরণ লাহা
শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মি[illegible]

কর্মসচিব: শ্রীসুবোধনাথ বাগচী

সহকারী কর্মসচিব: শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

কোষাধ্যক্ষ: শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত

সদস্য:

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী
শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস শ্রীরুক্মিণীকিশোর দত্তরায়
শ্রীপরিমল গোস্বামী শ্রীজীবনময় রায়
শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য শ্রীসত্যব্রত সেন
শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসুনীলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীসুকুমার বসু

সভায় উপস্থিত সভ্যবৃন্দের মধ্যে শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়, বীরেশচন্দ্র গুহ, জিতেন্দ্রমোহন সেন, রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, দুঃখহরণ চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অমূল্য গাঙ্গুলী, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, কুমুদবিহারী সেন, বীরেন্দ্রনাথ মৈত্র, জনাব আমীর হোসেন চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ভারতে কৃষি গবেষণা

গত ২৭শে জানুয়ারী তারিখে ভারতের কৃষি ও খাদ্য বিভাগের মন্ত্রী শ্রীজয়রামদাস দৌলতরামের সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ—কেন্দ্রীয় কৃষি-গবেষণা পরিষদের—একটি অধিবেশন হয়ে গেছে। খাদ্যশস্য সম্পর্কে ভারতবর্ষ যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে সেই বিষয়ে গবেষণা চালাবার জন্য এই অধিবেশনে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। যে সমস্ত গবেষণা-কার্য করা হবে বলে নির্ধারিত হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে: শস্যের সঙ্করীকরণ, বিশেষ করে জোয়ার, বাজরা, ডাল প্রভৃতি সম্পর্কে; আগাছা নিয়ন্ত্রণ; কন্দজাতীয় বস্তু সম্পর্কীয় গবেষণা; জমি ও সার সম্বন্ধীয় গবেষণা; শস্য ধ্বংসকারী কীটপতঙ্গ সম্পর্কীয় গবেষণা।

আমাদের দেশে সরকারী কৃষি গবেষণার ফল ভোগ করবার সুবিধা দেশের সাধারণ চাষী পায় না, কারণ সরকারী ফার্ম এবং চাষীদের জমি ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের অবস্থার মধ্যে বহু প্রভেদ আছে। আলোচ্য অধিবেশনে সরকারী দৃষ্টি এ বিষয়েও পড়ে। দিল্লী শহরের আশেপাশে কুড়িখানি গ্রাম নিয়ে সমস্ত অঞ্চলটি সম্বন্ধে একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাস্তব অবস্থায় সরকারী গবেষণার ফল কিভাবে সাধারণ চাষীর উপকারে লাগান যায় এবং গবেষণার ফল সর্বতোভাবে কৃষকের উপকারী করবার জন্য সরকারী পরিকল্পনার কি কি পরিবর্তন আবশ্যক। এই দিক থেকে বিচার করলে বর্তমান পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

ভ্রম সংশোধন: 'একটি নূতন ভিটামিন' শীর্ষক অনুচ্ছেদে (পৃঃ ৯৩) প্যাণ্টোথেনিক অ্যাসিড 'ড্যাণ্টোথেনিক' রূপে ছাপা হয়েছে।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত। ডক্টর শ্রীসুবোধনাথ বাগচী, ডি. এস-সি. কর্তৃক গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা, হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

প্রথম বর্ষ মার্চ—১৯৪৮ তৃতীয় সংখ্যা

শক্তির সন্ধানে মানুষ

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু

বস্তুর রাজ্যে বৈচিত্র্যের অবধি নেই। কয়লা, অভ্র, লবণ, হিঙ্গুল ইত্যাদি কত খনিজ রোজ মাটির মধ্য থেকে বেরোচ্ছে। কত উদ্ভিদ্ কীট-পতঙ্গ পশু-পক্ষী পৃথিবীতে জন্মাচ্ছে, নিজের ভাবে বাড়্ছে আবার আয়ু ফুরালে মরছে। প্রাণশক্তির তেজে খাদ্যের পরিপাক চলছে, কায়বস্তুতে তৈরী হ'চ্ছে কত বস্তু, আবার কত বস্তুরও বিকার ঘটছে, নাশ হচ্ছে! প্রাণীর শরীরে সৃষ্টি হ'চ্ছে মেদ মাংস রক্ত রস। প্রাণের রসায়নশালায় কত জিনিষের ভাঙ্গা গড়া চল্ছে! গাছের ফলের মধ্যে বীজের মধ্যে তার কাণ্ড, ত্বকের মধ্যে কত জিনিষ পাশাপাশি মিশে রয়েছে!

জগতের মধ্যে জন্ম মৃত্যু, ভাঙ্গা গড়া, যোগ-বিয়োগ, সবেরই রহস্য বুঝ্তে চায় মানুষ! সে যে শুধু পৃথিবীর কথাই ভাবে তা নয়! সূর্য্য চন্দ্র, গ্রহ তারা, ছায়াপথ, সুদূরের নীহারিকা পর্য্যন্ত সবই সে কৌতূহলের চোখে দেখছে। নিজের বুদ্ধির গণ্ডীর মধ্যে ভরতে চায় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে! দূরে কাছে, এমন কি নীহারিকার মধ্যেও যে সৃষ্টির খেলা চল্ছে, নতুন নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করে তার নিয়ম সে বুঝতে চায়। কি অব্যর্থ নিয়মের বশে বাষ্পময় নীহারিকা জমাট বেঁধে তারা জগতের জন্ম দিলে, আবার কোন দুর্য্যোগের ফলে তারকা ভেঙ্গে-চূরে গ্রহজগতের সৃষ্টি হ'ল, এ সবের সার তথ্য তার কল্পনা, তার প্রতিভা ধর্তে চায়। চোখে দেখা যায় না যে সূক্ষ্মকণারাশির জগৎ, তার কথাও সে ভাবে। প্রকৃতির সকল গোপন রহস্যের উপর নিজের বুদ্ধির আলোক ফেলে জান্তে চায় তার অন্তরের মর্ম্মকথা!

মৌলিক উপাদানের পরমাণুগুলি কি আকর্ষণের বশে মিলিত হ'ল, কিভাবে নিখিল যৌগিকপদার্থের সৃষ্টি হ'ল, অণু-পরমাণুরা কি নিয়ম মেনে কিরূপে সারি বেঁধে কঠিন তরল গ্যাসের আকারে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হ'ল, এই সব তথ্যই তার সাধনার বিষয়। সূর্য্য সারা ব্রহ্মাণ্ডে তেজ ছড়াচ্ছে, পৃথিবীকে দিচ্ছে উত্তাপ, আলো! সেই তেজ, আলো, উত্তাপের সাহায্যে প্রাণ গড়ছে অদ্ভুত জীবজগৎ! অচেতন বস্তুর জড়তাকে দূর করে চেতনের কায়বস্তু গড়তে দরকার বিপুল কার্য্যসম্ভারের, তা'রও চাহিদা যোগায় সূর্য্যের এই তেজ, এই বিপুল কার্য্যক্ষমতার সার কি করে বস্তুর মধ্যে বদ্ধ হ'ল, কি কৌশলেই আবার তা'কে নিজের কাজে

লাগান যাবে, সব সময় এই কথা ভাব্‌ছে মানুষ। যে অবস্থা, যে পরিবেশের মধ্যে সে জন্মেছে, মানুষ তাহাকে নিত্য কি ধ্রুব ব'লে মানে না। সে চায়, মনের মত জগৎ গড়তে যার মধ্যে তা'র প্রাণের প্রেরণা অবাধ স্ফূর্ত্তিলাভ করতে পারবে। জগতের সৃষ্টির খেলার মূলসূত্রগুলি তাই সে খুঁজ্‌ছে। বস্তুর মধ্যে লুকানো শক্তির ভাণ্ডারের চাবিকাটি তাই তার নিতান্ত দরকার। হাজার হাজার বৎসরের ইতিহাসের মধ্যে তার এই সাধনার কথা, প্রতিকূল অবস্থার সহিত এই সংগ্রামের বর্ণনা, লেখা রয়েছে। কত অতিকায় জন্তু লোপ পেয়েছে। ক্ষীণকায় মানুষ হাজার হাজার বৎসর টি'কে আছে! বহু শত পুরুষানুক্রমের অভিজ্ঞতার ফলে সে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের কাজে লাগাতে শিখেছে। প্রকৃতির তাণ্ডবলীলার মধ্যেও সে নিয়তির শাসনের সন্ধান পেয়েছে। নিবিড় পরিচয়ের ফলে ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে কার্য্যকারণের অমোঘশৃঙ্খলা তার কাছে আজ স্পষ্ট। বহুধাবিচ্ছিন্ন বহুশত বৎসরের বহুপুরুষের অভিজ্ঞতা থেকে জমাট ক'রে পেয়েছে বস্তুজগতের ব্যবহারিক সূত্র, তাই দিয়েই সে মানুষের জ্ঞানের চিরন্তন ভাণ্ডার বোঝাই করে চলেছে! গাছ থেকে ফল পড়ে, সৌরমণ্ডলে গ্রহেরা নিজের পথে চলে ফেরে,—মহাকর্ষের একই নিয়মের সূত্রে, এইরূপ বহু বিচিত্র ঘটনাকে এক সঙ্গে যুক্ত করে ফেলেছে সে। অণুর প্রতি অণুর আকর্ষণের রহস্য আজ তার কাছে গোপন নেই। সাধনাতেই সিদ্ধি। বহু যুগের চেষ্টায় সে তার কল্পনাকে বাস্তব করবার পথে কিছু দূর এগিয়েছে। তার কার্য্যতৎপরতার ফলে প্রকৃতিরও ঘটেছে স্থায়ী পরিবর্ত্তন। তারই উদ্ভাবনী শক্তির কল্যাণে এই জগতে এসেছে অনেক নতুন বস্তু, নতুন প্রাণী। নতুন আলোর ছটায় অদৃশ্য পরমাণু-জগৎ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হচ্ছে। বহু বাধা সে অতিক্রম করেছে, অদম্য ইচ্ছার চাপে প্রতিকূল অবস্থাকে করে তুলেছে তার অনুকূল। গভীর অরণ্যের জায়গায় আজ বসেছে লোকপূর্ণ জনপদ নগরী। উচ্ছৃঙ্খল বন্যার জলরাশি তার বাঁধে ধরা পড়েছে, তারই বিপুল শক্তি আজ মানুষের কল্যাণরথের চাকা ঘুরোচ্ছে! প্রচণ্ড উত্তাপের তেজে পাথর গ'লে বেরিয়ে আস্‌ছে শুদ্ধ ধাতুর স্রোত! কারখানায় তৈরী হ'চ্ছে কত নতুন যৌগিক পদার্থ—কাচ, সেলুলয়েড, রবার ইত্যাদি কত দৈনিক ব্যবহারের জিনিষের মালমশলা—উৎকট রোগের প্রতিষেধক কত নতুন ঔষধ—শিল্পীর তুলির জন্য কত বিচিত্র উজ্জ্বল রং। সে আর হিংস্র জন্তুকে ভয় করে না—শাসন-মারণের অসংখ্য অস্ত্র, তার হাতে। বশী-করণেও সে সিদ্ধহস্ত, বন্য জন্তু আজ তার রথ চালাচ্ছে, বোঝা বইছে, বা কৃষির কাজে সাহায্য করছে। বরফ ঢাকা পাহাড়ের মাথায় সে উঠিয়েছে বিজ্ঞানের মন্দির কিংবা স্বাস্থ্যারাম। সমুদ্রের গ্রাস থেকে কেড়ে নিয়েছে উর্ব্বরা জমি! এইভাবে নিজের ইচ্ছামত নতুন জগতের সৃষ্টি করতে বিপুল শক্তির দরকার, তাই প্রকৃতির ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়ার মূল সূত্রগুলি সে আয়ত্ত করতে যত্নশীল। বস্তুর মধ্যে যে অসীম শক্তি লুকান রয়েছে বিজ্ঞানের কৌশলে সে তাকে দখল করবে, ইচ্ছামত ব্যয় করবে ও নিজের সেবায় লাগাবে, এই তার বাসনা। সূর্য্যের অসীম তেজ, সমুদ্র হতে জল বাষ্পাকারে তুলে সুউচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় ঢাল্‌ছে। নদ-নদীর মধ্য দিয়ে সেই বিপুল জলরাশি আবার মহাকর্ষের বশে পাতালের দিকে ছুটছে, তার গতি দুর্ব্বার—কার্য্যশক্তিও অপ্রমেয়, মানুষ তাকে নিজের কল্যাণকর কাজে লাগাতে বদ্ধচেষ্ট। আবার অতীতের হাজার হাজার বৎসরের সূর্য্যতেজ প্রাণশক্তি আহরণ করে মাটির কয়লার মধ্যে জমা রেখেছে। কার্ব্বনের পরমাণু অক্সিজেনের পরমাণুর সহিত সম্মিলিত হয়ে অতীতের আকাশে যে বিরাট পরিমাণ কার্ব্বন ডাইঅক্সাইড চারিদিকে পরিব্যাপ্ত ছিল, প্রাণ সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে তাহাকে বিযুক্ত ক'রে, আধার সেই কার্ব্বন দিয়ে গড়েছিল কোটি

কোটি উদ্ভিদের কায়বস্তু। অতীত যুগের বিরাট অরণ্য মাটির মধ্যে কবে কবর পেয়েছে। আজ তাদের সারবস্তু ভেঙ্গেচুরে কয়লা হয়ে গিয়েছে! তবু তার মধ্যে রয়ে গেছে বহু যুগের সঞ্চিত ধন। কয়লাকে আবার অক্সিজেনের সঙ্গে মিলিত হ'তে দিলে, দাহের ফলে প্রকাশ হবে সেই অতীত যুগের সঞ্চিত তেজ। এর রহস্য মানুষ জানে, দহনক্রিয়া আজ নিয়ন্ত্রিত, তা'র কার্য্যকরী শক্তি মানুষের ইঙ্গিতে মানুষের কল কারখানা চালাচ্ছে! দাহনের উত্তাপ দিচ্ছে অমিত কার্য্যকর বাষ্প, তা'র চাপে নানা যন্ত্র ঘুরছে। শক্তিকে নানাভাবে রূপান্তরিত কর্‌তে শিখেছে মানুষ। অতীতের সম্পদ সে নানাভাবে নিজের কাজে লাগিয়ে ব্যয় কর্‌ছে। মাটির মধ্যে যে তেলের স্রোত বইছে, তাও এক হিসাবে অতীতের সঞ্চিত দান! তাকে উঠিয়ে নিজের কাজে লাগাচ্ছে মানুষ।

মানুষ যতই সভ্যতার ধাপে উঠ্‌ছে, যতই সভ্যতার প্রসার বৃদ্ধি হ'চ্ছে, ততই বেড়ে যাচ্ছে জমান তহবিল হ'তে খরচের হার! পৃথিবী প্রতি দিন যা সূর্য্যের কাছে পাচ্ছে, তারই পরিমিত ব্যয়ে তার সংসারযাত্রা আর চলে না। বর্ত্তমান সভ্যতার চাহিদা মিটান শক্ত তবু সে মোহিনী তাহাকে মুগ্ধ করেছে। কল্পনার কুহকে নিজের খেয়ালে সে পূর্ব্বযুগের তহবিল নিঃশেষ করতে চলেছে। অঙ্গার সম্পদ কিংবা মাটির তেল কিছু চিরদিন থাক্‌বে না। ভাণ্ডার হ'তে যাহা খরচ হয়, তার প্রতিপূরণ হ'চ্ছে না। যে অবস্থায় এই সব সম্পদ সঞ্চয় সম্ভব হয়েছিল, সময়ের সঙ্গে তারও হয়েছে আমূল পরিবর্ত্তন। তাই আজকাল সাবধানী মহলে শোনা যায় সতর্কতার বাণী। আর কতকাল অঙ্গার বা তেল মনুষ্যসমাজের নিত্যবর্দ্ধমান চাহিদা যোগাতে পারবে তারও হিসাব হচ্ছে মাঝে মাঝে, আর মানুষ ছুটছে নতুন কয়লা-খনির সন্ধানে, নতুন তেলের উৎস মাটির বাহিরে আন্‌তে।

সব দেশের মানুষ একই ভাবে জীবনযাত্রা চালায় না। শিক্ষায় কৌশলে, কার্য্যকারিতায় তাহাদের মধ্যে নানা স্তরভেদ আছে! আবার প্রাকৃতিক সম্পদ সারা পৃথিবীতে একই ভাবে ছড়ান নেই। জাতির মধ্যে যারা প্রভাবশালী তারা সমস্ত খনিজসম্পদ নিজেদের দখলে রাখতে উদ্‌গ্রীব। যারা কপালগুণে পৃথিবীর বিত্ত ভাণ্ডারের আজ অধিকারী, তারা তাদের দখল চিরস্থায়ী করতে চায়। অনুন্নত জাতির দেশে যে প্রাকৃতিক সম্পদ আজও অটুট আছে তার উপর অধিকার বিস্তার করতে উন্নত জাতিদের নিয়ত প্রয়াস। ফলে হয় কঠোর প্রতিযোগিতা, প্রবলের সহিত প্রবলের সংঘর্ষ, নির্ম্মম কঠোর সংগ্রাম। এতে সারা বিশ্বের কল্যাণকারী বিত্ত বহু বৎসরের মানুষের আয়াসের সঞ্চিত ধন অল্পদিনে পরিণত হয় ভস্ম ও ধ্বংস স্তূপে। সচ্ছলতার দেশে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ মহামারী। বিজয়লক্ষ্মী যে জাতির প্রতি নিষ্করুণ তারা হয়ত সমৃদ্ধির শিখর হতে সর্ব্বনাশের রসাতলে ডুবে যায়। রক্ত ও বিত্তক্ষয়ে বিজেতারাও হয়ে পড়ে নিস্তেজ। শান্তি সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে তাদেরও লাগে বহুদিন, লোকসান পুরাতে সহ্য করতে হয় অনেক ক্লেশ, অনেক দুঃখ।

জুয়াখেলায় সর্ব্বস্বান্ত হয়েও পাকা জুয়াড়ীর চৈতন্য হয় না। সে ফেরে নতুন বিত্তের সন্ধানে, যা পণ রেখে আবার সেই সর্ব্বনেশে জুয়ায় নিজের ভাগ্যপরীক্ষা নতুন করে করতে পারবে।

মানুষের প্রকৃতি কতকটা এই জাতীয়। খনিজ সম্পদ, তেলের স্রোত যখন এইভাবে বৃথায় ভস্মীভূত হতে বসেছে তখন এই পরিচিত জগতে অন্য কোন ভাবে কার্য্যকরী শক্তি লুকান আছে কিনা তাই সে খুঁজছে! বিজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করছে, ঊর্দ্ধে তারামণ্ডলীর বিরাট তেজোসম্ভারের দিকে চেয়ে ভাবছে এই সব জ্যোতিষ্করা তো তারই মত অমিতব্যয়ী, তেজস্রোতে যা ঢালে তাহাতো ফিরিয়ে পায় না! ওদের অফুরন্ত ভাণ্ডারের রহস্য কি? পৃথিবীতো এক হিসাবে সূর্য্যের কায়বস্তুর

দ্বারাই গড়া, তাই মাটির মধ্যে অন্য কোন তেজের উৎস আছে কিনা তারই সব সময় খোঁজ। পরমাণু জগতের রহস্য বিশ্লেষণ করতে যে বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত, তাঁদের কাছেই মানুষ আজ আবার শক্তির নতুন উৎসের সন্ধান পেয়েছে।

অল্প কয়েকটি মৌলিক উপাদান মিলে গড়েছে সারা বস্তুজগৎ। রসায়নিক বিশ্লেষণে এদের পাওয়া যায়, আবার তারার আলোর বর্ণালীতে মেলে এদেরই বিশেষ বিশেষ বর্ণচ্ছত্র। সুদূর তারকার সঙ্গে এই পৃথিবীর ধাতুগত নিকট আত্মীয়তা রয়েছে। আবার কি কঠিন, কি তরল, কি গ্যাসীয় সকল অবস্থায় মৌলিক বস্তু একই পরমাণুর সমষ্টি। যৌগিক বস্তু অণু অবস্থাবৈগুণ্যে ভেঙ্গে উপাদানিক পরমাণুতে বিযুক্ত হতে পারে। মৌলিক পরমাণু কঠোর তাপে দহন, প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক নির্য্যাতন সহ্য করে তবু বদলায় না। মৌলিক উপাদানের মধ্যে আবার গোত্র বিভাগ আছে; ব্যবহার অনুসারে তাদের পর্য্যায় বিন্যাস চলে, মেণ্ডেলইয়েফের ছক্ ভাল করে দেখলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে, নিকট-ধর্ম্মী উপাদানগুলিকে বেশীর ভাগ ছকের এক স্তম্ভে মিলবে। এই আত্মীয়তার কারণ বহুদিন বিজ্ঞানীরা আলোচনা করছিলেন। এর মধ্যে কি কোন বস্তুগত ঐক্যের রহস্য লুকান রয়েছে অথবা তাদের গঠনমূলক সাদৃশ্যই এই আত্মীয়তার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে, এ ছিল বিজ্ঞান মহলে বহুদিনের কূট প্রশ্ন। পরীক্ষা চলতে লাগলো, বিজ্ঞানীরা সূক্ষ্ম-সন্ধানী যন্ত্রপাতি গড়তে লাগলেন, পরমাণু ভাঙ্গার জন্য লাগাতে শিখলেন তীব্র বৈদ্যুতিক চাপ! সব পরমাণুর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একই ইলেকট্রন। পরমাণুর ভরমান বের করার পদ্ধতিও বিজ্ঞানীর আয়ত্তে এল। বিকিরণের নিয়মও উপলব্ধি হল। ফলে পরমাণুর গঠনের একটা বর্ণনা দেওয়াও সম্ভব হল। প্রত্যেক পরমাণুটি যেন একটি সূক্ষ্ম সৌরমণ্ডল। মধ্যে প্রায় সমস্ত ভর জড় করে রয়েছে +বিদ্যুৎ। কেন্দ্রের চারদিকে একটি খুব ছোট গোলকের মধ্যেই প্রায় সমস্ত ভরবস্তু আটকান ভাবা যায় সে গোলকের ব্যাসার্দ্ধ হবে 10^{-12} সে মি পর্য্যায়ের। কেন্দ্রের +বিদ্যুতের আকর্ষণ বলে দূরে দূরে নিজের কক্ষের মধ্যে ঘুরছে নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেকট্রন। তাহাদের কক্ষচ্যুত করতে বাহিরে কেন্দ্রের শাসনের বাহিরে আনতে কায করতে হয়—বিভিন্ন মাপের কার্য্যমান বিভিন্ন বলয়ে ইলেকট্রনের অবস্থান জানাচ্ছে! একেবারে বাহিরের ইলেকট্রন অল্প আয়াসেই বাহিরে টানা যায়—রসায়নিক সমন্বয়ের সময় বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে তাদের অদল বদল হয় কিংবা যোগসূত্র হিসাবে তারা দুই বিভিন্ন পরমাণুর যৌথ সম্পত্তি হয়ে থাকে। এই কারণেই বাহিরের কোটায় ইলেকট্রনের একভাবী বিন্যাস ও সমান সংখ্যা রসায়নিক ব্যবহারের সাদৃশ্যের কারণ। তারাই বিভিন্ন গোত্র পর্য্যায়ের নির্দ্দেশ দেয়। পরমাণুর সমস্ত ইলেকট্রনের বিদ্যুৎ-সমষ্টি কেন্দ্রের +বিদ্যুতের পরিমাণের সমান, এর জন্যই পরমাণুতে বিদ্যুতসাম্য বজায় রয়েছে। বিদ্যুৎ-বিন্যাসই যদি রসায়নিক ধর্ম্মের কারণ হয়, তবে কেন্দ্রের ভরমানের বিষয় কোন সঠিক সিদ্ধান্ত করা গেল না। একই বিদ্যুৎ মান বহন করে বিভিন্ন ভরের পরমাণু হ'তে পারে কিনা, যাদের ওজনে তফাৎ থেকেও রসায়নিক প্রক্রিয়া মধ্যে একই ব্যবহার দেখা যাবে, এরূপ প্রশ্ন উঠা খুবই স্বাভাবিক! একটি পরমাণুকে তৌল করা এখনও সম্ভব হয় নি, তবে পরমাণু সমষ্টিকে বিভিন্ন ভারের পর্য্যায়ে বাছাই করবার যন্ত্র আজকাল বেরিয়েছে। এই ভরানুগ বিশ্লেষণকারী যন্ত্রের সাহায্যে একই রসায়নিক মৌলিক পর্য্যায়ে যে বিভিন্ন ওজনের পরমাণু থাকতে পারে, তার অকাট্য প্রমাণ আজ বেরিয়েছে! মেণ্ডেলইয়েফের ছকের ঘর জানাচ্ছে মাত্র কেন্দ্রের বিদ্যুৎমান কিংবা সমস্ত পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন সংখ্যা। বিভিন্ন ভরের পরমাণু এর একই পর্য্যায়ে থাকতে পারে, আজ সকল বিজ্ঞানী এ কথা স্বীকার

করেছেন। তেজস্ক্রিয় মৌলিক বস্তুরাই এই সত্যের প্রথম সন্ধান দিয়েছিল। এই শ্রেণীর পরমাণু আপনা হ'তে বিদ্যুৎ, ভরকণা, ও তেজ বিকিরণ ক'রে ভিন্ন প্রকৃতির পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়। ব্যাক্‌রেলের পরীক্ষায় ইউরেনিয়মের এই ক্রিয়াশক্তি প্রথম জানা যায়। পরে ম্যাডাম কুরী, ও রাদারফোর্ডের গবেষণার ফলে অনেক তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের মধ্যেও একরকমের গোষ্ঠী বিভাগ করা যায়। আদি পরমাণু হতে বিকিরণ হলে সে একটা অন্য পরমাণুর জন্ম দেবে! দ্বিতীয়টি হয়ত তেজস্ক্রিয়ই রয়ে গেল—ফলে তৃতীয় একটি পরমাণু এল এইভাবে আদি পরমাণুর পর্য্যায়ক্রমে রূপান্তর চল্‌তে থাকে, একটা গোষ্ঠী পর্য্যায়ের কল্পনাও ফুটে উঠে। ধাপে ধাপে কম্‌তে থাকে কেন্দ্রের ভরসংখ্যা, শেষে হয়ত একটি নিত্যপর্য্যায়ের ধাতুর সঙ্গে রসায়নিক প্রকৃতিতে অভিন্ন অবস্থায় পৌছে এই তেজস্করী ক্ষমতা লোপ পায়। পর্য্যায়ক্রম থেমে যায়। কতগুলি ভরকণা এই পরিবর্ত্তনে ক্রমে বেরোলো, তার থেকে পাওয়া যায় শেষের অণুর ভরমান—কেননা, যে ভরকণার বিচ্যুতির কথা বলেছি, তা হিলিয়মের কেন্দ্রবস্তুর থেকে অভিন্ন, তারও মান জানা, অতএব আদিতে পরমাণুর ভর জানা থাক্‌লে পর্য্যায়শেষের পরমাণুর ভর নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে গেল! ইউরেনিয়ম থেকে স্বরু হয়ে তেজস্ক্রিয়ার ফলে ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর উৎপত্তি হয়ে এই পর্য্যায় থেমে যায় এক পরমাণুতে যে রসায়নিক ব্যবহারে পরিচিত সীসার সমভাবী, অথচ হিসাবে তার ওজন্ দাঁড়ায় সাধারণ সীসার অণুর থেকে ভিন্ন। সীসা পর্য্যায়ে দুইটি ভিন্ন ভরের পরমাণু পাওয়া গেল। রসায়নের নিপুণ বিশ্লেষণও এই সত্যকে সমর্থন করলে।

অতীতে কোন এক সময়ে পৃথিবী ছিল সূর্য্যেরই অংশ। হঠাৎ কোন বিপর্য্যয়ের ফলে সূর্য্যপিণ্ড থেকে সে তফাৎ হয়েছে! সূর্য্যের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ ছিঁড়্‌লো, সে স্বতন্ত্র হয়ে ঘুরতে লাগলো নিজের কক্ষে, আর উগ্র তেজ কম্‌তে কম্‌তে তার তরল বস্তুকায় কঠিন হয়ে গেল! আদিম উপাদানগুলি পাথরে ধরা রইল। এর মধ্যে ইউরেনিয়মও রয়ে গেল নানা খনিজের মধ্যে মিশে! তার তেজস্ক্রিয়ার নিবৃত্তি হল না, খনিজের মধ্যেই তার রূপান্তর চলতে লাগল। পরিণামী পরমাণুও জড় হতে থাকল একই খনিজের মধ্যে। আজ যদি সেই খনিজের বিশ্লেষণ করা হয় তবে মিল্‌বে ইউরেনিয়ম, সঙ্গে এই পরিণামের সীসার সন্ধান। যদি খনিজের সমস্ত সীসাই তেজস্ক্রিয়ার ফল হয় তবে বিশ্লেষণের ফলে দুইটি কথা প্রমাণিত হবে, প্রথম—এই পরিণামী সীসার ভরসংখ্যা সাধারণ সীসার থেকে ভিন্ন। দ্বিতীয়—কতদিনের রূপান্তরের ফলে উক্ত পরিমাণ সীসা জমা হ'তে পারে তারও মোটামুটি একটা নির্দ্দেশ। ফলে কতদিন আগে পৃথিবী তার স্বতন্ত্রতা পেয়েছিল, তারও একটা আন্দাজ পাওয়া অসম্ভব নয়। পরমাণুকে অন্য গোত্রের পর্য্যায়ে বদলান মানুষের বহু পুরানো কল্পনা! সোনা তৈরী করবার চেষ্টা করেছিল সে প্রচুর—যদিও সফলকাম হয়নি, তার নিষ্ফলতাই পুঞ্জীভূত হয়ে বর্ত্তমান কিমিয়া বিদ্যার প্রথম সূচনা করেছে! তেজস্ক্রিয় পদার্থ যখন ধরা পড়্‌লো, পরমাণু ভাঙ্গার চেষ্টায় মানুষ তখন বেশী জোর দিলে! অনেক পরীক্ষাগারেই এর গবেষণা চল্‌তে লাগলো। রাদারফোর্ড হলেন এই দলের অগ্রণী! এই প্রচেষ্টায় বাধা অনেক। কেন্দ্রস্থানে শক্তি প্রয়োগ করা অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার! বলয়িত ইলেক্‌ট্রন রাশি ভেদ করে লক্ষ্যে পৌছতে হ'বে। কেন্দ্রের উপর আঘাত করতে শীঘ্রগতি ভরকণার দরকার, তাতে ভরবেগ অতিমাত্রায় বর্ত্তমান থাকলেই তবে সাফল্যের আশা করা যায়। কেন্দ্রস্থানটি আয়তনে এত ছোট যে বহু লক্ষ অণুকনা এক সঙ্গে ছুড়লে মাত্র দুই চারিটির লক্ষ্যস্থানে

পৌঁছানর সম্ভাবনা। কেন্দ্রের সহিত সংঘর্ষের ফলও অনিশ্চিত। সাধারণ ভরকণায় আশ্রয় করে থাকে +বিদ্যুৎ, অর্থাৎ সব কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎই সম পর্য্যায়ের। বিদ্যুৎ-বিজ্ঞানের নিয়মে তাদের মধ্যে নৈকট্যের সঙ্গে যে বিপ্রকর্ষশক্তি দ্রুত হারে বাড়তে থাকবে তা বুঝতে দেরী হয় না। এর জন্য সংঘর্ষের ফলে প্রতিফলনের সম্ভাব্যতাই বেশী! আবার তীব্রবেগের পরমাণুর স্রোত বহান, এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। বিদ্যুৎ-শক্তিই একমাত্র এই সূক্ষ্ম কণার উপর কাজ করতে পারে—আর সংঘর্ষের ফল আশানুযায়ী পেতে হ'লে কয়েক লক্ষ ভোল্ট বিদ্যুৎ চাপের প্রয়োজন। এইসব বাধার জন্য প্রথমে তেজস্ক্রিয় ধাতুর উৎক্ষিপ্ত ভরকণার দ্বারা পরমাণু ভাঙ্গবার চেষ্টা সুরু হয়। রাদারফোর্ড, এই ভাবে নাইট্রোজেনের পরমাণু বিভক্ত ক'রে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। আবার তাঁর বিজ্ঞানাগারেই তাঁর ছাত্রেরাই প্রথমে কৃত্রিম উপায়ে বিদ্যুৎচাপে হাইড্রোজেনের সার প্রোটনকে তীব্রভাবে চালিত করে লিথিয়মের পরমাণুকে দ্বিখণ্ডিত করলে। সঙ্গে সঙ্গে পরমাণু-ভাঙ্গা প্রচেষ্টায় অধ্যায় সুরু হ'ল। এই প্রবন্ধে সব কথা হয়ত সমীচীন হ'বে না। এই নবতম বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সব অদ্ভুত সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে তাদের সম্যক্ আলোচনাও এখানে অসম্ভব। শুধু এই সব পরীক্ষার ফলে মানুষ যে নতুন শক্তির উৎসের সন্ধান পেয়েছে তার সম্বন্ধে দু'চারটি কথা এইখানে বলে শেষ করা যাক। পরমাণুর মধ্যে প্রকৃতি ভেদের কথা ভাবা যাক্। ইউরেনিয়ম আপনা আপনি ভাঙ্গছে। অথচ লঘু পর্য্যায়ের কণাকে ভাঙ্গা অনেক আয়াস-সাপেক্ষ। এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা সুরু করেছেন মাত্র ৮।১০ বৎসর। তবে সাধারণ ভর-কণা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির নিউট্রনের আবিষ্কারে আমাদের জ্ঞান খুব দ্রুততালে এগিয়ে চলেছে। এই কণাটি ওজনে প্রায় প্রোটন কণার সমান অথচ ইহাতে বিদ্যুতের অস্তিত্ব নাই। রেডিয়ম হইতে বিযুক্ত দ্রুতবেগ এলফা কণার আঘাতের ফলে বেরিলিয়ম নামক লঘু মৌলিক উপাদানের পরমাণু থেকে একে প্রথমে পাওয়া যায়। এর মধ্যে কোন বিদ্যুৎ না থাকায়, ইহা অনায়াসেই যে কোন কেন্দ্রবস্তুতে প্রবেশ ক'রে। এই বিপর্য্যয়ের নানারূপ বিস্ময়কর পরিণতি হয়। পরমাণুর রূপান্তর দ্রুত তালে হ'তে পারে। তা'ছাড়া এই নিউট্রনেরই আঘাতে ইউরেনিয়মের কেন্দ্রবস্তুকে সম্পূর্ণ নূতন ভাবে দ্বিধাবিভক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ভরানুযায়ী বিশ্লেষণ ক'রে ইউরেনিয়ম পর্য্যায়ের মৌলিক পদার্থের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভরের পরমাণু পাওয়া গিয়াছে। ২৩৮ পরমাণুর পরিমাণই বেশী, ২৩৫ পরমাণু শতকরা একভাগেরও কম সাধারণ ইউরেনিয়মে পাওয়া যায়।

এই লঘু ইউরেনিয়ম মন্দগতি নিউট্রনের আঘাতের ফলে ভেঙ্গে যায়, হান ও স্ট্রেশেম্যান নামে দুইজন জার্মান বিজ্ঞানী প্রথমে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেন। দুই খণ্ডের ভর অসমান, আবার প্রত্যেক বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে গড়ে প্রায় তিনটি নিউট্রন। আর একটি আশ্চর্য্যের কথা দুই খণ্ডের ভরমানের সঙ্গে যদি তিনটি নিউট্রনের ভরমান যোগ করা যায় তাহা হলেও আদিম কণার ভরমানের সঙ্গে মেলে না। সকলরকম রসায়নিক পরিবর্ত্তনে ভরমান এক থাকার কথা, অতএব বাকী ভরের কি গতি হ'ল? আইনষ্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকবাদের একটি সিদ্ধান্ত এই গরমিলের হিসাব দিল। আপেক্ষিক-বাদের মতে বস্তুর ভর নিত্য নয়। বস্তুর তেজের পরিমাণের সঙ্গে তাহা কমে বাড়ে, রসায়নশালায় যে ধরণের তেজের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, তার ফলে ভরমানের হ্রাসবৃদ্ধি অতি তুচ্ছ। কাজেই কোন রসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভরসমষ্টির ব্যতিক্রম হয় না বললে ভুল হবে না। তবে পরমাণু ভাঙ্গবার সময় যে তেজ নির্গত হয়, তা' এত বেশী, যে

নিঃসৃত তেজের জন্য ভর কমা ধরা পড়বে। যে ক্ষেত্রে, এই সংখ্যা যত কমিবে, তেজ বিকিরণ অবশ্য সেই ক্ষেত্রে তত অধিক। যদি কল্পনা করা যায় যে আদিতে প্রোটনজাতীয় বস্তুকণার সমন্বয়ের ফলে নিখিল মৌলিক বস্তুকণার উদ্ভব হয়েছে, তবে মোটামুটি এই প্রক্রিয়া সম্ভব হলে বিশেষ কোন ব্যাপারে কত তেজ প্রকাশিত হ'বে তার গণনা করা খুব সোজা। আদি ও অন্তের ভরসমষ্টি তুলনায় তা পাওয়া যাবে। ইউরেনিয়ম বিস্ফোরণে যে প্রভূত তেজ বেরোচ্ছে তার একটা প্রমাণ যে বিস্ফোরণের ফলে ভরমাত্রা শেষে ক'মে যাচ্ছে! এই তেজের পরিমাণ বিস্ময়কর; মাত্র ১গ্রাম ইউরেনিয়মের বিস্ফোরণে যে তেজ পাওয়া যায়, তা কয়েক মণ কয়লা দাহনের সঙ্গে সমপর্য্যায়ের। নতুন শক্তির উৎসের সংবাদ হানের পরীক্ষার খবরের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়া'ল। ইউরেনিয়ম অণুর বিস্ফোরণের সময় ২।৩টি নিউট্রনও যে সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসে, এটা খুব আশার কথা বলে বিজ্ঞানীদের মনে হ'ল! কোন উপায়ে যদি নিঃসৃত নিউট্রনের গতিমান্দ্য ঘটান যায়, ও নতুন আর একটি ২৩৫-ইউরানিয়মের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটান যায় তবে, এক পরমাণুর বিস্ফোরণের পর পর তিনটি পরমাণুর বিস্ফোরণ হ'তে পারে, এবং সুবিধা পেলে এই তিনটি থেকে যে নয়টি নিউট্রন বেরোবে তা' আরও নটি পরমাণুকে ভাঙ্গবে! এইভাবে নিউট্রনের পরিমাণ বেড়ে যাবে দ্রুততালে, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের তেজও দ্রুত মাত্রায় বেড়ে চল্‌বে। এই কাল্পনিক প্রক্রিয়াকে আংশিকভাবে বাস্তব করতে পারলে যে তেজ প্রকট হবে, তা' বিরাট ও অপ্রমেয়। অবশ্য সিদ্ধির পথে অন্তরায়ও অনেক। প্রথম শীঘ্রগতি নিউট্রনের গতিমান্দ্য ঘটানর প্রয়োজন, অথচ তাতে যেন নিউট্রন সংখ্যা না ক'মে। অন্য কোন বস্তু যেন তাকে শোষণ করে প্রক্রিয়াকে বিপথে না চালিত করে। বেশী মাত্রায় ২৩৮ ইউরেনিয়ম পরমাণু তাই সিদ্ধির এক অন্তরায়। তা ছাড়া অল্পমাত্রায় অন্যজাতীয় পরমাণুর মিশ্রণ হ'লেও নিউট্রন বাঁধা প'ড়ে যাবে, তারা আর বিস্ফোরণের কাজে লাগবে না! ২৩৫ ইউরেনিয়মের হার মিশ্র ধাতুতে বাড়ান যায় কিনা, ইউরেনিয়ম ধাতুকে শুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় কিনা, এমন কোন হালকা পদার্থ পাওয়া যায় কিনা, যার সঙ্গে সংঘর্ষ হয়ে বেগ মন্দীভূত হ'লেও নিউট্রন তাতে বাঁধা পড়বে না। এইসব সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান না হ'লে ইউরেনিয়ম বিস্ফোরণ কাজে লাগান যাবে না। গত মহাযুদ্ধ বাধে বাধে এমন সময় হানের গবেষণার কথা ছড়িয়ে পড়্‌ল। যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ই রাষ্ট্রশক্তি বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের পরামর্শ নেন্। সভ্যতার যুগে বাহুবল, এমন কি বাক্যবলের চেয়ে বুদ্ধিবলের কদর বেশী। মরণ বাঁচন পণ, নূতন নূতন মারণ অস্ত্রকে কত দ্রুত তৈরী করতে পারে, এই হ'ল প্রতিযোগিতার বিষয়। কারণ যে যত বিভীষিকার সৃষ্টি করবে জয়ের আশা তার তত অধিক। মহাযুদ্ধের মধ্যে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই ইউরেনিয়ম বোমা তৈরী করতে বদ্ধপরিকর হ'লেন। ভাগ্যলক্ষ্মী এ্যাংলোস্যাকসন্ জাতের উপর প্রসন্ন। প্রচুর অর্থব্যয়ে আমেরিকায় বহু শত বিজ্ঞানীর সমবেত চেষ্টায় প্রত্যেক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হ'ল। ২৩৫ ইউরেনিয়ম প্রায় বিশুদ্ধ অবস্থায় পাবার পদ্ধতি মিলেছে। কার্ব্বনকে অতি শুদ্ধ অবস্থায় পেলে নিউট্রনের গতিমান্দ্য ঘটান যায়—তাতে নিউট্রন সংখ্যারও বিশেষ হ্রাস হয় না। এই সব বিশুদ্ধ দ্রব্যের ব্যবহারে ইউরেনিয়মকে বিশুদ্ধ অবস্থায় আনলে তার স্তূপ থেকে, স্বতঃই তেজ ও নিউট্রন স্রোতের উৎপাদন সম্ভব তার প্রমাণ হয়েছে বহু দেশে। বিস্ফোরণের পথে যে ভীষণ মারণ-যন্ত্রের নির্ম্মাণ সম্ভব, হিরোশিমা ও নাগাসাকী সহরের শোচনীয় অবসান, তা'র জ্বলন্ত নিদর্শন।

নতুন এই তেজের প্রথম ব্যবহার এইরূপ লোকক্ষয়কারী হ'লেও ভবিষ্যতে তাকে মানুষের

কল্যাণে লাগান যাবে, এই হ'ল বিজ্ঞানীদের আশা। অবশ্য এখন পরীক্ষা-প্রণালী ও ফল অনেকাংশে গোপন রয়েছে, তবে বেশীদিন এই বিদ্যাকে নিজস্ব সম্পত্তি ক'রে রাখতে পারবে না—কোন এক জাতি বা দল! ফলে ইউরেনিয়ম খনিজের অধিকার নিয়ে পরস্পরের কলহের সম্ভাবনা অদূর ভবিষ্যতে বেশ আছে।

মানুষের সভ্যতার নানারূপ যুগ বিভাগ করা চলে। যেমন প্রস্তর যুগ, লৌহ যুগ, কয়লার যুগ, তেলের যুগ ইত্যাদি। গত মহাযুদ্ধে ইউরেনিয়ম যুগের সূচনা হল বলা যেতে পারে।

পরমাণুর রূপান্তরে তেজ প্রকাশের মর্ম আজ জানাতে বিজ্ঞানীরা একটা পুরানো সমস্যার উত্তর পেয়েছেন। সূর্য্য যে সহস্রকোটি বৎসর তেজ চতুর্দ্দিকে বিকিরণ কর'ছে অথচ তার ঔজ্জ্বল্য হ্রাসের কোন লক্ষণই নাই। এই অন্তর-তেজের ক্ষতি পূরণের রহস্য আজ আমরা বুঝি। হাইড্রোজেনের কেন্দ্রবস্তু প্রোটন ও নিউট্রন এই দুইই হ'ল যাবতীয় মৌলিক বস্তুকেন্দ্রের প্রধান উপাদান। হাইড্রোজেন হইতে হিলিয়ম হওয়া সম্ভব হ'লে আইনষ্টাইনের গণনা পদ্ধতিতে বুঝা যাবে, তার ফলে বিরাট তেজের বিকাশ সম্ভব। বিখ্যাত বিজ্ঞানী বেতে একটি চক্রবৃত্তের কল্পনা দিয়া বুঝাইয়াছেন—সূর্য্যকেন্দ্রে কোটি সেন্টিগ্রেড উত্তাপমানের ফলে এইরূপ একটি প্রক্রিয়ার নিত্য প্রসার খুবই সম্ভব। সূর্য্যের আকৃতি ও প্রকৃতির মধ্যে সুসঙ্গতি আজ এই কল্পনার কল্যাণে পাওয়া গেছে।

ভারতবর্ষের খনিজ সম্পদের সম্পূর্ণ খবর আমাদের জানা নাই। শোনা যায় গত যুদ্ধের সময় কয়েক টন ইউরেনিয়ম অকসাইড আমরা সরবরাহ করেছিলাম। ত্রিবাঙ্কুরের সিন্ধুসৈকতে প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় খনিজের সন্ধান মেলে। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে নতুন যুগে পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণার প্রভূত প্রসার হবে আশা করা যায়। তার জন্য একনিষ্ঠ এবং অক্লান্ত চেষ্টার প্রয়োজন।

যে কোন জাতির পক্ষে আজ বিজ্ঞানকে তুচ্ছ করা কিংবা তাহার সম্ভাব্যতাকে অবহেলা করা একান্ত বিপজ্জনক; সাময়িক ইতিহাসের সহিত যাঁর পরিচয় আছে তিনিই ইহা স্বীকার করবেন।

———

ভাতের কথা

শ্রীপরিমল সেন

ভাত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে চাই। সচ্ছলতার স্বর্ণযুগে, ধন ধান্য পুষ্পে ভরা বসুন্ধরায়, অন্নচিন্তা নিশ্বাস বায়ুর মতনই ভুলে থাকা সম্ভব ছিল এবং তত্ত্বাভিলাষী বিদগ্ধ সমাজে এ ঔদরিক সমস্যার অবতারণা করতে সংকুচিত হতাম, যদি বর্তমানে জাতীয় খাদ্য ভাণ্ডারের ক্ষীয়মাণ খাদ্য পরিমাণের হিসাব আমাদের চিত্ত আতঙ্কগ্রস্ত ও সভয় দৃষ্টি এর উপর নিবদ্ধ না করত। তাই শতকরা ৯৯·৯ জন বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাতের কথা কিছু আলোচনা করতে সাহসী হয়েছি।

বাঙ্গালী অন্নভোজী অর্থাৎ ভেতো। এই ভেতো কথাটির সাথে, বাঙ্গালীর পেশীশক্তির অপ্রতুলতা, ভীরুতা ও আলস্যপরায়ণাতার অখ্যাতি বিজড়িত। কার্য ও কারণ সম্বন্ধে আমাদের বিচার যে সব সময় প্রমাদমুক্ত নয়, আর আমাদের প্রতিকার পন্থাও যে সময় সময় হাস্যকর হয়ে উঠতে পারে, তা আমাদের সামাজিক ইতিহাসে উল্লিখিত, সুরাপ্রসাদে শৌর্য ও গোমাংস ভক্ষণে বীর্যলাভের করুণ প্রয়াসের কাহিনী হতেই অবগত হই। আজ প্রচলিত ও অভ্যস্ত খাদ্যগুলির ঐকান্তিক অভাব, বিড়ম্বিত বাঙ্গালী ভাগ্যকে সতত দুর্ভিক্ষ-আশঙ্কাক্লিষ্ট করে রেখেছে। আজ বহু অখ্যাতিও, ভাতকে খাদ্যতালিকায় অপাংক্তেয় করতে পারে না। তাই আজ ভাতের খবর নেবার প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে—খতিয়ে দেখা প্রয়োজন হয়েছে এর দোষ ও গুণ, পুষ্টিশাস্ত্রানুমোদিত বিচার পদ্ধতিতে। বিচারে যদি কোন দোষ ও ত্রুটি আমাদের চোখে পড়ে তা হলে পরীক্ষা করে দেখতে হবে সেগুলি দুরতিক্রম্য কিনা। কারণ বাঙ্গালীর খাদ্য তালিকায় ভাতের প্রধান স্থান অধিকার করে থাকবার সম্ভাবনা—কৃষ্টিগত ও কৃষিতাত্ত্বিক ও অর্থ নৈতিক কারণে। সুতরাং বাঙ্গালীর খাদ্য তালিকার ন্যূনতম কতখানি পরিবর্তন করলে, বর্তমান অর্থ নৈতিক কাঠাম তার ভার বহন করতে পারবে ও তা গুরুতর ভাবে অভ্যাস-বিরুদ্ধ হবে না, অথচ হবে পুষ্টিকর, এ আলোচনা হয়ত অপ্রাসঙ্গিক নয়।

এক একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এতই চমকপ্রদ যে কিছু কালের জন্য তা জনসাধারণের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়—অন্ধ করে দেয় তাদের পারিপার্শ্বিক বৈজ্ঞানিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে। সন্দেহের অবকাশ নাই যে পুষ্টি রহস্যে, ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ তেমনি একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার। সুতরাং কোন একটি খাদ্যের উপযোগিতা বিচার করতে হলে, স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন ওঠে, তার ভিটামিন সমৃদ্ধতা সম্বন্ধে। খাদ্য বিচারে শুচিবায়ুগ্রস্ত ব্যক্তি কোন একটি খাদ্যে ভিটামিনের অপ্রতুলতা দেখলে শংকিত চিত্তে সে খাদ্যটিকে ভোজন-তালিকা হতে হয়ত নির্বাসিত করবেন, শুধু ঐ দোষেই। এই রকম খেয়ালী একদর্শী দৃষ্টিভঙ্গী পুষ্টিশাস্ত্র বিরুদ্ধ। এক ইন্দ্রিয়ের ঐকান্তিক অভাব যেমন অন্য ইন্দ্রিয়ের আত্যন্তিক পুষ্টিতে পূরণ হয় না; সর্বেন্দ্রিয়ের সুসম্বদ্ধ ও স্বাভাবিক বিকাশই মানুষকে শক্তিশালী করে তোলে; তেমনি খাদ্যে অতিপ্রয়োজনীয় একটি মাত্র উপাদানের ঐকান্তিক প্রাচুর্য, সেই খাদ্যটিকে সকল দিক হতে সার্থক করে তোলে না, যদি প্রয়োজনীয় সব উপাদানগুলি সেই খাদ্যে

বর্তমান না থাকে। স্মরণ রাখতে হবে, যে পুষ্টি-শাস্ত্র সম্মত সমস্ত গুণ ও উপাদানের অস্তিত্ব কোন একটি খাদ্য বিশেষে পাওয়া সুদুর্লভ। এই জন্য খাদ্যগুলি এমন ভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন তারা পরস্পরের পুষ্টিকর উপাদানগুলির অভাব পূরণ করতে পারে। বলা বাহুল্য, আমাদের আলোচ্য ভাত সর্বগুণাবলীর অধিকারী নয়; সুতরাং এর দোষগুলির প্রতিকারও উক্ত উপায়েই করা সম্ভব। অর্থাৎ যে ব্যঞ্জনগুলি আমরা ভাতের সঙ্গে খাই সেগুলির নির্বাচনের সময় সতর্ক থাকতে হবে যে ভাতে পুষ্টির যা অভাব আছে সেগুলি দিয়ে যেন তার প্রতিপূরণ হয়।

পুষ্টিশাস্ত্র সম্মত খাদ্যের তালিকা তৈরী করতে হ'লে দেখা উচিত, সেটির রাসায়নিক গঠন কোন পর্যায়ের। দেখতে হবে, তাতে কতখানি প্রোটিন, শ্বেতসার ও স্নেহজাতীয় উপাদান বর্তমান—যে পরিমাণ খাদ্যপ্রাণ ওতে বর্তমান তাতে দেহের প্রয়োজন মেটে কিনা—আর শরীরের নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধাতব লবণ সেই খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আছে কিনা। খাদ্যটি সুস্বাদু ও সুপাচ্য কিনা সে বিচারও অবশ্য কর্তব্য।

শরীর পোষণ করার কাজে প্রত্যেকটি উপাদানের একটি বিশেষ মূল্য আছে। কয়লা পেট্রল প্রভৃতি দাহ্য পদার্থের রাসায়নিক গঠনে যে শক্তি সঞ্চিত থাকে তার রূপান্তরিত প্রকাশ দেখি যান্ত্রিক শক্তির বিচিত্র ক্রিয়ায়। সৌর কিরণ হতে আহরিত শক্তি সঞ্চিত থাকে খাদ্যের বিবিধ উপাদানে—প্রোটিনে শ্বেতসারে ও স্নেহবর্গীয় দ্রব্যে। মৃদু অদৃশ্য দহনে, দেহযন্ত্রের বহুজ্ঞাত ও অজ্ঞাত ক্রিয়ায়, সেই শক্তি মুক্তি পায়। এরা শক্তির উৎস। সাধারণ বয়স্ক লোকের প্রতিদিন ২৫০০ বৃহৎ ক্যালরি তাপ উৎপাদনক্ষম খাদ্য প্রয়োজন। অবশ্য পেশীশক্তির প্রয়োগ বাহুল্যে ক্যালরির প্রয়োজনীতাও বেড়ে যায়। এই ক্যালরি যোগায় পূর্বোক্ত খাদ্য উপাদানগুলি। জীবকোষগুলি প্রোটিনে তৈরী। সুতরাং জীবদেহের বৃদ্ধি ও সংস্কার এ উভয়ের জন্যই প্রয়োজন হয় প্রোটিনের। বৈজ্ঞানিকগণ বলে থাকেন যে আমাদের দৈনিক খাদ্য তালিকায় একছটাকের কিছু বেশী (৭০ গ্রাম) উচুদরের প্রোটিন থাকা উচিৎ। ভিটামিনের প্রয়োজন অন্য ধরণের। এদের অভাবে স্বাস্থ্য অবনত ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। শ্বেতসার অথবা স্নেহজাতীয় পদার্থের মত এরা ক্যালরি উৎপাদনক্ষম নয়; কিন্তু জৈবকোষে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে পরমাণুবদ্ধ শক্তি মুক্তি পাচ্ছে, সেই মৃদুদহন ক্রিয়ায় এদের কয়েকটিকে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়। এদের কারো অভাবে হয় অস্থিঘটিত রোগ রিকেট—কারো অভাবে হয় স্কারভি—কারো অভাবে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়। প্রজনন শক্তির উপর কোন কোন ভিটামিনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মোটের উপর এই ভিটামিনগুলি যে আমাদের খাদ্য তালিকায় অতি প্রয়োজনীয় স্থান অধিকার করে আছে তা আমরা সবাই জানি। ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পোটাসিয়াম লৌহ, তাম্র, ম্যাঙ্গানীজ্, আয়োডিন্, ফস্‌ফরাস, ও ফ্লুয়োরিন্ ঘটিত নানাবিধ লবণ শরীরে নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। এরা যদি কোন খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে বর্তমান না থাকে তা হলে পুষ্টিদৈন্য উপস্থিত হয়; এদের প্রয়োজনীয়তা ভিটামিন অথবা খাদ্যের অন্য কোন উপাদান অপেক্ষা কম নয়।

পরীক্ষা করে দেখা যাক চালে কি কি উপাদান বর্তমান আছে। দেহের সব প্রয়োজন মেটাতে চাল যে সম্পূর্ণ অনুপযোগী তা নিম্নলিখিত তালিকা তিনটি পরীক্ষা করলেই বোঝা যাবে।

তালিকা ১

শতকরা এত গ্রাম

দ্রব্য	জল	প্রোটিন	স্নেহজাতীয় পদার্থ	শ্বেতসার ও শর্করা	লবণ
ধান (খোসাসহ)	১১'৭	৮'১	১ ৮	৬৪'৫	৫
আছাঁটা লাল আতপ চাল	১১'২	৯'১	২'০	৭৪'৫	১'১
ঢেঁকী ছাঁটা আতপ চাল	১২'৬	৮'৯	০'৫	৭৭'০	০'৬
কল ছাঁটা সিদ্ধ	১১'৪	৮'২	০'৫	৭৮'০	০'৫
সম্পূর্ণ ছাঁটা সাদা আতপ চাল	১১'৬	৭'৯	০'৩	৭৯'০	০'৫
ভাত	৭১'৯	১'৯২	০'০৫	২৭'০	০'১
চিঁড়ে	৯'৫	৬'৮	০'৩	৮০'০	৩'৬
মুড়ি	৫'৪	৮'১	০'২৩	৮৩'০	৩'০
খৈ	৯	৭'২	০'২৫	৮৩'০	০'৪

তালিকা ২

শতকরা এত গামা *

দ্রব্য	থিয়ামিন	রাইবো-ফ্লাভিন	নিয়াসিন	প্যানটোথে-নিক এ্যাসিড	পিরিডক্সিন
ধান (খোসাসমেত)	২৯৩	৬৭	৪৯২০	—	—
আছাঁটা লাল চাল	৩৫০	৬০	৬০০০	১৭০০	১০৩০
ঢেঁকী ছাঁটা আতপ	১২২	৩২	২৬০০	৭৭০	৫১০
কল ছাঁটা আতপ	৬০	২৬	১৮৫০	৬৪০	৪৫০

তালিকা ৩

শতকরা এত গ্রাম

দ্রব্য	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লৌহ	তাম্র
আছাঁটা লাল চাল	০'০৮৪	০'২৯	০'০০২	০'০০০৩৬
কল ছাঁটা আতপ চাল	০'০০৯	০'০৯৬	০'০০০৯	০'০০০১৯

* গামা = ১।১০০০ মিলিগ্রাম

উল্লিখিত তালিকা কয়টি পরীক্ষা করলে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে; (ক) আছাঁটা লাল চাল সম্পূর্ণ ছাঁটা সাদা চাল অপেক্ষা অনেক পুষ্টিকর, (খ) চাল শ্বেতসার-প্রধান খাদ্য, (গ) চালে প্রোটিনের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। প্রকৃতপক্ষে গম যব প্রভৃতি ধান্যবর্গীয় শস্য ধান হতে অধিকতর প্রোটিন সমৃদ্ধ; যদিও পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে এদের প্রোটি ; চালের প্রোটিন অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। চালের প্রোটিন প্রকৃতপক্ষে পুষ্টিকারিতায় জান্তব প্রোটিনের সঙ্গে তুলনীয়। জানা গিয়েছে যে লাল চালের প্রোটিনের জীবপোষণী মূল্য (Biological value) ৭২'৭%, কলে ছাটা সাদা চালের, চালের কুঁড়ার ও ছানার প্রোটিনের মূল্য যথাক্রমে ৬৬'৬%, ৮২'৯% এবং ৮১'৫%। সুতরাং আমরা বলতে পারি, (ঘ) কলে ছাঁটা চাল হতে যে প্রোটিন পাওয়া যায় তা পরিমাণে ও গুণে লাল আকাঁড়া চালের প্রোটিন অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। (ঙ) ভিটামিন ও লবণের পরিমাণ দিয়ে বিচার করলেও লাল চালকেই শ্রেয়তর বলা চলে। (চ) কলে ছাঁটা সিদ্ধ ও আতপ এ উভয়ের মধ্যে তুলনায় সিদ্ধ চালই অধিকতর পুষ্টিকর।

আমাদের দেশে নাম মাত্র ব্যঞ্জন সহকারে অথবা কেবলমাত্র লবণ সহযোগে ভাত খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে, এ রকম লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বলা বাহুল্য, এতে শরীরে পুষ্টিদৈন্যের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে ওঠা অবশ্যম্ভাবী; কারণ শরীরের প্রয়োজনীয় সমস্ত পুষ্টি কেবলমাত্র ভাত হতে আহরণ করা একান্ত অসম্ভব (তালিকা ৪)।

তালিকা ৪

উপযুক্ত পরিমাণ	দৈনিক যত ছটাক চালের ভাত হতে পাওয়া যায়
প্রোটিন (৭০ গ্রাম)	১২-১৩ ছটাক ঢেঁকী ছাটা ১৩-১৫ ছটাক কল ছাঁটা চাল
ক্যালরী (২৫০০)	১২-১৩ ছটাক ঢেঁকী অথবা কল ছাঁটা চাল
থিয়ামিন (প্রতি ১০০০ ক্যালরির জন্য ০'৬ মিলিগ্রাম হিসাবে)	লাল চাল—১০ ছটাক ঢেঁকী ছাঁটা—২৬ ছটাক কল ছাঁটা সাদা—৫২ ছটাক
রাইবোফ্লাভিন	লাল চাল—৩০ ছটাক ঢেঁকী ছাঁটা—৫০ ছটাক কল ছাঁটা সাদা—৬৬ ছটাক
নিয়াসিন	লাল চাল—২ ছটাক ঢেঁকী ছাঁটা—৪ ছটাক কল ছাঁটা সাদা—৫½ ছটাক
ভিটামিন এ,সি,ডি	চাল হতে পাওয়া যায় না।
ক্যালসিয়াম	আছাঁটা—২০ ছটাক কল ছাঁটা—১৭০ ছটাক
ফসফরাস	আছাটা—৬ ছটাক কল ছাঁটা—১৮ ছটাক

দেখা যায় দেহ কোষের পুষ্টিক্ষুধার তাড়নায় অতি দুর্বলদেহ লোকেও অস্বাভাবিক পরিমাণ অন্ন ভোজনে অভ্যস্ত হয়; তবুও তাদের সমস্ত দেহে পুষ্টিহীনতার সব লক্ষণই প্রকাশ পায়। কারণ চালে যে সব পুষ্টিকর উপাদানের অভাব আছে তা যদি অন্যান্য খাদ্য হতে সংগ্রহ না করা যায় তবে পুষ্টিহীনতার লক্ষণ প্রকাশ পাবেই। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে কেবলমাত্র পুষ্টিকর খাদ্যের আত্যন্তিক অভাবই দেহে পুষ্টিদৈন্য সুপরিস্ফুট করে তোলে—মৃদু পুষ্টিদৈন্য অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত দেহে অনির্দিষ্ট স্বাস্থ্যহীনতার লক্ষণরূপে প্রকাশ

পায়। আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য-হীনতার যে মালিন্য দেখা যায় তা প্রায়ই এই শ্রেণীর। এই সব ম্লান মুখে স্বাস্থ্যের উজ্জল দীপ্তি ফিরে আসতে পারে যদি খাদ্য সুনির্বাচিত হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে এ সম্বন্ধে পুষ্টিশাস্ত্রের বিধান প্রায়ই ব্যঙ্গোক্তির মতন শোনায়। কেবল-মাত্র অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে খাদ্য নির্বাচন করার ব্যবস্থাই ফলপ্রসূ হ'তে পারে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন। স্থানাভাবে অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে এবং প্রসঙ্গ ক্রমে কয়েকটি খাদ্য পরিপূরকের নাম উল্লেখ করা গেল। চাল প্রোটিন সম্পদে দীন, এ দৈন্য পূরণ করা যায় ডাল, দুধ, ছানা, মাছ, ডিম প্রভৃতি প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য সংযোগে। ভিটামিন এ'র ঐকান্তিক অভাব পূরণ হতে পারে বিটা ক্যারটিন যুক্ত সবুজ শাকশব্জী ও ফল দিয়ে অথবা ভিটামিন-এ যুক্ত ডিম, মাখন ও মাছের যকৃতের তেল দিয়ে। থিয়ামিন, রাইবো-ফ্লাভিন প্রভৃতি বি-বর্গীয় ভিটামিনের অভাব ডাল, আটা, ওট, মণ্ট, ডিম, যকৃৎ, ঈস্ট প্রভৃতি খাদ্য তালিকাভুক্ত করে মেটান সম্ভব। অবশ্য বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ প্রণালীর সাহায্যে ধানের নিজস্ব ভিটামিন গুলিও কিছু পরিমাণে রক্ষা করা সম্ভব। ভিটামিন সি চালে একেবারেই নাই—অঙ্কুরিত ডাল, পেয়ারা, আমলকী, নেবু জাতীয় বিভিন্ন ফল ও শাকসব্জী হতে আমরা ভিটামিন সি পেতে পারি। মাছের যকৃতের তেল, মাখন, ডিম, প্রভৃতি খাদ্য ভিটামিন ডি'র জন্য ব্যবহার করা চলে। সূর্যরশ্মির অতি বেগুনী অংশের রিকেট নিবারক গুণ এদেশের ভিটামিন ডি'র অভাব অনেকটা পূরণ করে। চালে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ অত্যন্ত কম। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে কি ধনী কি দরিদ্র সাধারণতঃ সকলের খাদ্যেই এ ধাতুজ লবণের দৈন্য দেখা যায়। সকল প্রকার ক্যালসিয়াম লবণই শরীরের গ্রহণযোগ্য ও ফলপ্রদ নয়। শাক, ডিম, ফল, ছোট মাছ, দুধ প্রভৃতি খাদ্য হতে আমরা শরীরের প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম আহরণ করতে পারি। ডিম, ডাল, গুড় ও নানা প্রকার ফল হতে আমরা প্রয়োজনীয় লোহা আর তামা পাই। দেখা যায়, কোন একটি কি দুইটি বিশেষ খাদ্য হতে শরীরের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করবার চেষ্টা করলে, কোন একটি বিশেষ উপাদানের অভাব হবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু নানা প্রকার খাদ্য হতে পুষ্টি সংগ্রহ করলে এক খাদ্যের উপাদান বিশেষের অভাব, অন্য খাদ্যে বর্তমান উপাদান দিয়ে পূরণ হবার সম্ভাবনা থাকে। চালে পুষ্টিকারিতার যে অভাব আছে তা এই ভাবে অন্যান্য খাদ্য সংযোগে প্রতিপূরিত হয়।

দেখা যাক্ ভাতের পুষ্টিকারিতা অন্য উপায়েও কিছু বাড়ান সম্ভব কিনা। এ প্রচেষ্টায় সামান্য কৃতকার্য হলেও তা দেশের পক্ষে পরম কল্যাণকর হবে। প্রথম প্রচেষ্টা কৃষিবিজ্ঞান ঘটিত। বিভিন্ন শ্রেণীর ধানের রাসায়নিক সংগঠন ঠিক এক রকম নয় আর সব রকম ধানও সব জমির উপযোগীও নয়। এ জন্য উপযুক্ত উচ্চ পুষ্টিমূল্য যুক্ত ধানের বীজের ব্যবহার বাঞ্ছনীয় ও সংকরীকরণ পদ্ধতিতে শ্রেয়তর বীজ উৎপাদনের চেষ্টা করা কর্তব্য। আর একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। দেখা যায় জমির উর্বরতার উপর শস্যের পরিমাণ ও পুষ্টিমূল্যের প্রতুলতা এ উভয়ই নির্ভর করে; সুতরাং উপযুক্ত সার দিলে শুধু যে জমির উৎপাদিকা শক্তি বেড়ে যাবে তা নয়, সে জমি হতে যে শস্য পাওয়া যাবে তা হবে অধিকতর পুষ্টিকর। দ্বিতীয় প্রচেষ্টা উন্নততর প্রণালীতে ধান হতে চাল প্রস্তুত করার কৌশল আয়ত্ত করা। কলে ছাঁটা সুদৃশ্য সাদা চাল বেশীদিন সঞ্চয় করে রাখা সম্ভব হলেও শরীরের পুষ্টি সংগ্রহ করার কাজে ঐ চাল অধিকতর অনুপযোগী, অতএব অবাঞ্ছিত। কলে ছাঁটা সাদা চাল অপেক্ষা লাল চাল অনেক বেশী পুষ্টিকর। অতি প্রয়োজনীয় প্রোটিন, স্বাস্থ্যপ্রদ বি বর্গীয় ভিটামিন, ও লবণ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে

বর্তমান থাকে চালের দানার উপরের প্রথম কয়েক স্তর কোষে। পরিষ্কার সাদা চাল পাওয়ার আগ্রহে এই পুষ্টি আমরা হারাই। আছাটা সিদ্ধ ও আতপ চালের মধ্যে পুষ্টিকারিতায় বিশেষ কোন পার্থক্য নাই কিন্তু কলছাঁটা সিদ্ধ ও আতপ চালের মধ্যে সিদ্ধ চাল পুষ্টিকারিতায় শ্রেয়তর। K.K. প্রদত্ত তালিকায় (তালিকা ৫) দেখা যাবে

তালিকা ৫

গামা/গ্রাম

চাল প্রস্তুত করার প্রণালী	থিয়ামিন	রাইবো-ফ্লাভিন	নিয়াসিন
লাল চাল	৩৫	১'৬০	৬০
মাঝারি রকম ছাঁটা চাল	১'২২	০'৩২	২৬
সিদ্ধ কল ছাঁটা	১'৭৪	০'৩৭	৪০
Earle প্রণালীতে তুষমুক্ত আতপ	৩'১০	০'৪১	৫০
Malekized সিদ্ধ কল ছাঁটা চাল	২'০০	০'৪২	৪৪
কনভারটেড সিদ্ধ কল ছাঁটা চাল	৩১	০'৫০	৪৯

Earle প্রক্রিয়ায় আতপ ও কনভারটেড সিদ্ধচালে অপেক্ষাকৃত অধিক ভিটামিন সংরক্ষিত হয়। এখন পর্যন্ত Earle প্রক্রিয়া বেশী পরীক্ষিত হয় নাই কিন্তু converted সিদ্ধ চালের শ্রেষ্ঠত্ব কয়েক বৎসর পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় ভাঙ্গা খুদ বাদ যায় কম সুতরাং এই প্রক্রিয়ায় চাল প্রস্তুত করলে প্রতি মণ ধান হতে বেশী চাল পাওয়ার সম্ভাবনা। Converted চাল তৈরী করতে হলে লাল চাল নির্বায়ুকৃত পাত্রে রাখা হয়। এই চাল পরে উচ্চচাপে গরম জলে ভিজিয়ে উষ্ণ বাষ্পে ভাপিয়ে লওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ায় চালের উপরের স্তরে বর্তমান ভিটামিন ও প্রোটিন ভিতরের স্তরে প্রবেশ করে; সুতরাং পরবর্তী প্রক্রিয়ায় চাল কলে ছাঁটা হলেও ভিটামিন ও প্রোটিন নষ্ট হয় না।

চালের পুষ্টিকারিতা যাতে নষ্ট না হয় এ সম্বন্ধে তৃতীয় প্রচেষ্টা হচ্ছে রন্ধনশাস্ত্রগত। ভাতের ফেনের সঙ্গে কিছু পুষ্টিকর উপাদান আমরা হারাই, আর কিছু নষ্ট হয় রন্ধনকালীন উত্তাপে। বহু প্রচারে এ তথ্যটি জনসমাজে সুপরিজ্ঞাত, কিন্তু এ জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ যে বহু স্থানেই অবহেলিত তা বলা বাহুল্য। খিচুড়ী প্রভৃতি রান্নাতে ফেন সংরক্ষিত হয় আর ডালের সংযোগে হয় আরো পুষ্টিকর। ভাতের ফেন না ফেলে রান্না করা কষ্টসাধ্য হলেও পুষ্টিশাস্ত্রগত বিচারে প্রয়াসযোগ্য। চালের কুঁড়া ভিটামিন ও প্রোটিন সম্পদে সমৃদ্ধ। ভিটামিন নির্যাস ও পশুখাদ্যে এর ব্যবহার আছে। এ জন্যে পুষ্টিশাস্ত্রবিদদের দৃষ্টি এর প্রতি নিবদ্ধ হওয়া আশ্চর্য নয়। কোন রন্ধনশাস্ত্রজ্ঞ অথবা খাদ্যশিল্পী যদি এর সুব্যবহার করতে পারেন তবে জাতীয় খাদ্যভাণ্ডারের সমৃদ্ধি যেটুকু বাড়ে তাই লাভ।

জুড়ি তারা

গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশে এমন কতকগুলি তারা আছে যারা জোড় বেঁধে একটি অপরটির চারদিকে ঘুরেই চলেছে। স্যার জেমস জীনস এদের অনন্ত ওয়াল্‌টস (waltz) নৃত্যে রত বলে বর্ণনা করেছেন। সাধারণের মনে এদের সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা জাগাবার জন্য এই সরস কল্পনাটি বোধ হয় তাঁর মনে এসেছিল, কিন্তু জুড়ি তারার গল্প এতই আশ্চর্য ও এতই চমকপ্রদ যে তাকে রাস নৃত্যের সঙ্গে তুলনা না করেও অতি চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ এদের প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন।

জুড়ি তারা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর দুই একটি কথা সাধারণের জানা থাকা আশ্চর্য নয়। রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' বইতে (৬০ পৃষ্ঠায়) ও জগদানন্দ রায়ের 'গ্রহনক্ষত্র' পুস্তকে (৩য় সংস্করণের ২৬৭ পৃষ্ঠায়) 'যমক নক্ষত্র' নামক প্রবন্ধে এদের উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ 'জুড়ি তারা' নামটা রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া। এই যুগল নক্ষত্রদের নিয়ে একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিকদের জল্পনারও অন্ত নেই, অপরদিকে তেমনই এদের বিষয় প্রত্যক্ষ ক'রে বস্তুরও অভাব নেই। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে এরা যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কত রসদ, কত চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

আমরা আকাশে যত নক্ষত্র দেখি তার অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ জুড়ি তারা। 'অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ' বলা হ'ল তার কারণ বাকি তারাদের মধ্যে হয়ত এমন জুড়ি তারা লুকিয়ে আছে যারা আমাদের যন্ত্রে এখনও ধরা পড়ে নি।

যে সব জুড়ি তারা চোখে দেখে বোঝা যায় না, দূরবীনও সব সময় তাদের দেখবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। জুড়ি তারা দেখবার ব্যাপারে শক্তিশালী দূরবীনও অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অক্ষম। এসব ক্ষেত্রে জুড়ি তারাকে জুড়ি বলে বুঝে নেওয়ার জন্য বর্ণলিপি (Spectroscope) দরকার। বর্ণলিপি হ'ল এমন একটা যন্ত্র যা আলোকে বর্ণসপ্তকে ভেঙ্গে দেয়। যে কোনও আলোর ভিতর যে সব রং-এর মিশ্রণ আছে তাদের আলাদা করে দেওয়াই বর্ণলিপির কাজ। যে কোনও তারার আলো এই রকম বর্ণলিপি দিয়ে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে রামধনুতে যেমন পর পর রং সাজান থাকে তেমনি বেগুনী থেকে লাল পর্যন্ত সাতটি রং পর পর সাজান রয়েছে; আর কয়েকটি বিশিষ্ট স্থানে কয়েকটি সরু কাল রেখা রয়েছে। যদি কোনও তারার গতি পৃথিবীর দিকে হয় তাহলে এই কৃষ্ণরেখাগুলি তাদের বিশিষ্ট স্থান ছেড়ে একটু বেগুনীর দিকে সরে গিয়ে সংকেতে নিজের গতির কথা জানিয়ে দেয়। অপর পক্ষে যে তারা পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে তার কৃষ্ণরেখাগুলি উল্টোদিকে অর্থাৎ লালের দিকে একটু সরে যায়। সুতরাং কয়েকটি জুড়ি তারাকে দূরবীনে একক তারা বলে ভ্রম হলেও বর্ণলিপিযন্ত্র তাদের যুগল মূর্তির খবর এনে দেয়—কারণ পরস্পরের চারদিকে ঘুরপাক খাওয়ার কারণে এদের মধ্যে একটির গতি থাকে পৃথিবীর দিকে এবং অপরটির থাকে তার উল্টোদিকে; ফলে বর্ণলিপি যন্ত্রে এদের কৃষ্ণরেখাগুলির স্থানচ্যুতি ঘটে বিপরীত দিকে—জোড়ের একটি তারার কৃষ্ণরেখা সরে যায় বেগুনীর দিকে আর অপরটির সরে লালের দিকে। সুতরাং একক তারায় যেখানে একটি কৃষ্ণরেখা থাকার কথা জুড়ি তারায়

সেখানে কাছাকাছি দুটো কৃষ্ণরেখা দেখতে পাওয়া যায়। আবার এই জোড়া কৃষ্ণরেখাগুলির একটি বাঁ থেকে ডাইনে ও অপরটি ডাইনে থেকে বাঁয়ে সরে যেতে থাকে। এবং কিছুকাল পরে যেটি আজ বাঁ থেকে ডাইনে যাচ্ছে সেটি ডাইনে থেকে বাঁয়ে যেতে থাকে। এবং অপরটি (যেটি আজ ডান থেকে বাঁয়ে চলেছে) বাঁ থেকে ডাইনে যেতে থাকে। এর কারণ বোঝা শক্ত নয়। জুড়ির যে তারাটি আজ পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসছে সেটি কিছুদিন পরে পৃথিবী থেকে দূরের পানে ছুটবে আর তার সঙ্গ'টি (যেটি আজ পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে) পৃথিবীর দিকে এগিয়ে আসতে থাকবে। এমনি করে মহাকাশের গায়ে তারাদের যে পরিভ্রমণের খেলা চলেছে বর্ণলিপি যন্ত্রে কৃষ্ণরেখার দোল খাওয়ার তা রূপ পরিগ্রহণ করছে। এই দোল খাওয়ার ধরন দেখে তারাগুলির গতিবিধি ও পরস্পর দূরত্বের সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। অনেক সময় এমনও হয় যে কৃষ্ণরেখা জোড়া নয় কিন্তু তবু সে একা একাই দোল খাচ্ছে। সে ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে জুড়ি তারার একটির আলোই আমরা পাচ্ছি। অন্যটা অত্যন্ত নিস্তেজ অথবা সম্পূর্ণ আলোকশূন্য বা মৃত। তারারা এই জ্যোতিহারা মৃতসঙ্গীকে ত্যাগ করে না কারণ তাদের পরস্পরের মধ্যে যে আকর্ষণ তা নির্ভর করে তাদের ভরের বা মোটামুটি ওজনের উপর; জ্যোতি হারিয়ে তারার যে মৃত্যু ঘটে তাতে আকর্ষণের তারতম্য হয় না।

কৃষ্ণরেখার যে বিচ্যুতির কথা উপরে বলা হ'ল, যার সাহায্যে নক্ষত্র তার গতির বার্তা আমাদের জানায়, তার অনুরূপ ঘটনা আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও নিতান্ত বিরল নয়। কোনও রেলগাড়ি যখন বাঁশি বাজিয়ে আমাদের অতিক্রম করে যায় তখন লক্ষ্য করা যায় যে ঠিক অতিক্রম করার পরেই হুইসিলের সুরটা যেন চড়া থেকে হঠাৎ খাদে নেমে গেল। এর কারণ হুইসিলের শব্দ বাতাসে যে তরঙ্গ তোলে রেলগাড়ির গতি আমাদের দিকে হ'লে সে তরঙ্গ ঘনীভূত হয়ে উঠে—ফলে আমাদের কাছে তা'র আওয়াজটা অপেক্ষাকৃত চড়া ঠেকে। ঠিক অনুরূপ কারণে দূরে যাবার সময় হুইসিলের আওয়াজটা আসল পর্দা থেকে খাদে বলে মনে হয়। আলোর বেলাতেও ঠিক এই ব্যাপারই ঘটে থাকে। আলো জিনিষটা ঈথারে চড়া তরঙ্গই হোক বা ছোট ছোট আলোক কণিকাই (Photon) হোক কাছে আসার দরুণ তা ঘনীভূত হবেই এবং যে হেতু তরঙ্গ বা কণিকার নানারকম ঘনত্ব নানারকম বর্ণের সৃষ্টি করে, সেই হেতু দূরগামী নক্ষত্রের কৃষ্ণরেখা খাদে নেমে যায়। আলোর ক্ষেত্রে এই খাদ হ'ল লালের দিকে। মনে রাখতে হ'বে যে কৃষ্ণরেখার অপসরণের ব্যাপারে দূরত্ব জিনিষটা সম্পূর্ণ উদাসীন; অপসরণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে গতিবেগের উপর।

কিন্তু জানা দরকার যে কোনও তারার কৃষ্ণরেখার অপসরণ দেখলেই সব সময় মনে করবার কারণ নেই যে তারাটি জুড়ি তারা। তারার গতি কৃষ্ণরেখার স্থানচ্যুতি ঘটায় সুতরাং কোনও তারার কৃষ্ণরেখা যদি দোল না খেয়ে মাত্র ঈষৎ স্থানচ্যুত অবস্থায় প্রায় স্থির থাকে তাহলে বুঝতে হবে গতিটি তার সঙ্গী-পরিভ্রমণের গতি নয়—মহাকাশে তার অনন্ত যাত্রার (proper motion) গতি। অনেক সময় এই অনন্ত যাত্রার স্থানচ্যুতি ও সঙ্গীপরিভ্রমণের স্থানচ্যুতি এক সঙ্গে ঘটে থাকে; তখন দেখা যায় যে কৃষ্ণরেখাটি তার বিশিষ্ট স্থান থেকে বিচ্যুত একটা অবস্থার ডাইনে বাঁয়ে দোল খাচ্ছে।

আরও একটা বড়ই অদ্ভুত কারণে কৃষ্ণরেখাদের স্থানচ্যুতি ঘটে থাকে। কোনও ছোট্ট অথচ ভারি বস্তুর অস্তিত্ব স্থান-কালের মাপকাঠিতে সঙ্কোচন বা প্রসারণ ঘটায়, যার ফলে রং-এর সুর একটু খাদে নেমে আসে। একটু বিশদ করে ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া যাক—ভারি বস্তুর কাছের ঘড়িটা ধীরে চলতে আরম্ভ করবে; ফলে তার ঘড়ির হিসাবে সে যদি সেকেণ্ডে পঞ্চাশটা তরঙ্গ (বা আলোকণা)

ছাড়ে তবে আমাদের ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যাবে সে হয়ত সেকেণ্ডে মাত্র আটচল্লিশটা তরঙ্গ (বা আলোকণা) ছাড়ছে। এটা হ'ল বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইনের আবিষ্কার। তিনি নিজের চোখে এটা লক্ষ্য করে আমাদের দেখিয়ে দেন নি। তিনি অঙ্ক কষে বলেছিলেন 'এরকম হ'বে— বৈজ্ঞানিকেরা প্রত্যক্ষ করলেন তাঁর কথা ঠিক। যে তারাটির ক্ষেত্রে এইরকম অপসরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেটি হ'ল লুব্ধক (Sirius) নক্ষত্রের সঙ্গী একটি ছোট তার; সে তারাটি চোখে দেখা যায় না। তার ওজন সূর্যের কাছাকাছি—অথচ ব্যাস (diameter) সূর্যের ব্যাসের তিরিশভাগের এক ভাগ। ফলে এর ঘনত্ব (density) দাঁড়ায় সূর্যের ঘনত্বের তিরিশ হাজার গুণেরও বেশী।

বর্ণলিপি যন্ত্রে তারার বিচারের পথে বিঘ্ন অনেক। তার মধ্যে প্রধান বিঘ্ন তারা থেকে আলো আসে খুব কম। আবার সেই আলোকে বর্ণলিপি দিয়ে টুকরো টুকরো করলে একটি রং-এর টুকরোর আলো যায় আরও কমে কারণ সব রং মিলে মোটমাট যে উজ্জ্বলতা এতক্ষণ পাচ্ছিলাম তাকে ভেঙ্গে পড়তে হয় খণ্ডে খণ্ডে। আবার বর্ণলিপি যন্ত্রও কিছু আলো আত্মসাৎ করে। সুতরাং যথেষ্ট উজ্জ্বল না হ'লে তারার বর্ণলিপির বিচার করা যায় না।

এখানে একটা প্রশ্ন আপনা থেকেই মনে হয়। যে সমস্ত জুড়ি তারা যথেষ্ট তফাৎ নয় অথচ যাদের জ্যোতিও কম তাদের কি তা'হলে খোঁজ পাবার কোনও উপায় নেই? বর্ণলিপি বা দূরবীন উভয়েই এদের খবর দিতে অপারক। কিন্তু তবু এদের অনেকের খবর পাওয়া যায়। ঘোরবার সময় একটা তারা যখন দৃশ্যতঃ আর একটার উপর এসে পড়ে তখন পিছনের তারার আলোটা সামনের তারায় ঢাকা পড়ে যায়; ফলে দুটি তারা মিলিয়ে যতটা আলো পাওয়া যাচ্ছিল ততটা আর যায় না। এই-রকম জুড়ি তারার আলো একটা বিশেষ ধারায় বাড়তে কমতে থাকে। প্রথম যখন একটি তারা অপরটির পিছনে একেবারে লুকিয়ে পড়ল তখন কিছুক্ষণ মাত্র একটি তারার আলো পাওয়া গেল। তারপর সেটা আস্তে আস্তে অন্য তারার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল—ফলে আলোর উজ্জ্বলতা বেড়ে চলল—সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসার পর বেশ কিছুক্ষণ দুই তারার আলো পাওয়া গেলে—তারপর আবার একটি অপরটির পিছনে ধীরে ধীরে লুকোতে লাগল আর আলো কমতে লাগল। এই যে কিছুক্ষণ জোর আলোর সমভাবে থাকা এইটেই হ'ল জুড়ি তারার আলো বাড়া কমার বিশেষত্ব। জুড়ি না হয়েও আপনা থেকে যাদের আলো বাড়ে কমে এমন একক তারাও আছে—তবে তাদের আলো বাড়া কমার এই বৈশিষ্ট্য নেই; তাদের বৈশিষ্ট্য অন্যরকম।

এই রকম আলো বাড়া কমা জুড়ির অস্তিত্ব, প্রথম জানতে পারা যায় ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে। আর বর্ণ-লিপি দিয়ে বোঝা যায় যে সব জুড়ি, তাদের খবর পাওয়া গেছে মাত্র ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে। এটা স্বাভাবিক। তারার আলো বাড়া কমা চোখে দেখে বোঝা যায়। রাতের পর রাত যারা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে তাদের চোখে আলো বাড়া কমা ধরা পড়বেই। বর্ণলিপির বিশ্লেষণ সূক্ষ্ম ব্যাপার, সুতরাং তার আবির্ভাব স্বভাবতঃই পরে ঘটেছে। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে প্রথম মণ্টানারি নামক একজন লোক 'আলগল' তারাটির উজ্জ্বলতা বাড়তে কমতে দেখেন (যদিও তিনি একে জুড়ি বলে বোঝেন নি)—বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই কথা লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু জিনিষটা যখন শুধু-চোখেই দেখা যায় তখন ১৬৭০ খৃষ্টাব্দের আগে যে এটা মানুষের লক্ষ্যগোচর হয়নি এমন কথা জোর করে বলা যায় না—বিজ্ঞানের পাতায় হয়ত সে খবর পৌঁছয় নি। আমাদের পুরাণ আদিতেও এ সংক্রান্ত তথ্য খুঁজে দেখা ফলপ্রসূ হ'বে।

চোখে বা দূরবীনে দেখা জুড়ি তারাও বিজ্ঞানের মতে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দেই প্রথম। তবে এ সম্বন্ধেও আমাদের পুরাণ প্রভৃতি ঘেঁটে দেখা ভাল—আরও

প্রাচীনকালের জ্ঞানের খবর পাওয়া অস্বাভাবিক হবে না। যে তারাটিকে জুড়ি বলে প্রথম সন্দেহ করা হয় সেটা সাধারণের অতি পরিচিত একটি তারা। সপ্তর্ষি-মণ্ডল অনেকেরই অজানা নয়। সপ্তর্ষির গঠন হচ্ছে চারটা তারা নিয়ে একটা চতুর্ভুজ আর চতুর্ভুজের এক কোণ থেকে একটা ল্যাজের মত বেরিয়েছে যাতে সাজান আছে পর পর তিনটি তারা। এই তিনটি তারার মাঝেরটির নাম বশিষ্ঠ—ইংরাজি নাম Mizar, এরই গায়ে আরও একটি ছোট্ট মিটমিটে তারা আছে। সবাই শুধু চোখে এটা দেখতে পায় না—কেউ কেউ পায়। এই তারাটির নাম অরুন্ধতী—ইংরাজি নাম Alcor। বশিষ্ঠ আর অরুন্ধতী মিলে একটা জুড়ি তারা হয়েছে। এরাই হ'ল প্রথম চোখে দেখা জুড়ি। দেশী ও বিদেশী পুরাণ আদিতে এদের সম্বন্ধে অনেক গল্প চলিত আছে।

আমাদের অতি পরিচিত ধ্রুবতারাটিও জুড়ি তারা। তবে শুধু-চোখে এর সঙ্গীটিকে দেখা যায় না।

জুড়ি তারা জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের অনেক খবর জোগায়। তার মধ্যে প্রধান হ'ল যে জুড়ি তারাদের ভর (mass) জানতে মোটেই কষ্ট পেতে হয় না। যে তারার ভর যত বেশী সে তার সঙ্গীকে তত জোরে টানে; ফলে দূরত্ব অনুসারে তারা পরস্পরের চারদিকে ঘুরপাক খায়। দূরত্ব ও গতির ভঙ্গী দেখে তারা দুটির ওজন বোঝা যায়। যে সব তারা আকাশের পথে একা একা ঘুরে বেড়ায় তাদের ভর জানা এত সহজে সম্ভব হয় না এবং বহু একক তারার ভর একেবারেই জানা যায় নি।

আরও একটা মস্ত বড় খবর একটি জুড়ি তারার কাছ থেকে পাওয়া গেছে। ৬১ সিগনি (61 Cygni) নামক একটি জুড়ি তারা তাদের গতির ধরনে জানিয়ে দিয়েছে যে তাদের গ্রহ আছে। যদিও গ্রহের নিজের আলো না থাকায় সেটিকে প্রত্যক্ষ করা যায় না তবুও গ্রহটির টানাটানিতে জুড়ির ঘুরপাকের কিছু বিঘ্ন ঘটে। এটা নেহাৎ ছোট খবর নয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে গ্রহওয়ালা তারা লাখে একটি। সুতরাং কোনও বিশেষ তারার গ্রহ থাকার খবর কম কথা নয়। তবে এ জ্ঞানটি বড়ই নূতন—মাত্র ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে এই খবর জানা গেছে এবং যে ভাবে এই গ্রহের অস্তিত্ব অনুমান হয়েছে এবং গ্রহটির যা ভর হিসাব করা হয়েছে সেটা বড্ড বেশী এবং সে সম্বন্ধেও বহু যুক্তি-তর্কের অবতারণা হ'তে পারে। গ্রহটির ওজন প্রায় বৃহস্পতির ষোলগুণ—অথচ দিল্লীর ডক্টর কোঠারী নামক একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী অঙ্ক কষে প্রমাণ করেছেন যে বৃহস্পতির চেয়ে বড় গ্রহ জগতে কোথাও থাকতে পারে না। সুতরাং ৬১ সিগনীর গ্রহটি অত ভারি হ'ল কী করে এ প্রশ্ন উঠে। আবার কোনও কোনও গণিতজ্ঞ ডক্টর কোঠারীর মতটাকে নির্ভুল বলে মনে করেন না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে কালের প্রহরীর হাতে এ প্রশ্নের বিচার এখনও বাকি। তবু একটা তারার ক্ষেত্রেও গ্রহের অস্তিত্বের আভাস পাওয়াও বিজ্ঞানী ও সাধারণ দুজনের কাছে বড় খবর। ৭০ অফিউচি (70 Ophiuchi) নামে আর একটি জুড়ি তারার বেলাতেও অনুরূপ সন্দেহের কারণ ঘটেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে জুড়ি তারা, শুধু যে একটা মজার জিনিষ তাই নয় এদের কাছে থেকে বহু খবর পাওয়া যায়। যাঁরা দূরবীন বা বর্ণলিপি নিয়ে আকাশে জুড়ি তারার খোঁজ করে বেড়ান তাঁদের অনুসন্ধিৎসা ও দান অবহেলার জিনিষ নয়।

এই জুড়ি তারা কি করে জন্মাল সে নিয়ে অনেক মত প্রচলিত আছে এবং এর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বপরিচয়' বইতে আছে। এ প্রসঙ্গের সবিস্তার আলোচনার জন্য আরও একটি প্রবন্ধের প্রয়োজন।

আকাশে জুড়ি তারা ছাড়াও অন্য রকম তারা আছে যারা তিনটি বা চারটি একত্র কাছাকাছি ঘুরে বেড়ায়। বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর খুব কাছে ঘুরে বেড়ায় অথচ শুধুচোখে দেখা যায় না এমন তারার সন্ধান পাওয়া গেছে। এদের সবিস্তার আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভব হ'ল না।

স্বাস্থ্য ও সূর্য্যরশ্মি

লেঃ কর্নেল সুধীন্দ্রনাথ সিংহ

মানুষে মানুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য অনেক আছে, বর্ণ-বৈষম্য ইহাদের অন্যতম; ইহার ফলে দুঃসাধ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার অনেক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর সমগ্র লোকসংখ্যাকে বর্ণভেদে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়—শ্বেত ও অ-শ্বেত। প্রথমোক্তরা সংখ্যায় চতুর্থাংশ, এবং 'কটা', কালো, ও 'পীত' প্রভৃতি অ-শ্বেতরা তিন-চতুর্থাংশ। সংখ্যালঘুদের বর্ণ-বৈষম্য-জনিত ঔদ্ধত্যের ফলে পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বিরোধ বিসদৃশ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে, ও পৃথিবীময় অশান্তি ও অপ্রীতির বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। অথচ, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন যে এই 'সাদা'রাই রোদ লাগিয়ে নিজেদের 'সাদা' রং রঙ্গীন করবার প্রচেষ্টায় মেতে উঠেছে। নিয়মিতভাবে না পারলেও কাজের ফাঁকে, সুবিধা পেলে তারা গায়ে একটু রোদ লাগিয়ে নেয়। ছুটির দিনে দৈনন্দিন কাজের তাগিদ যখন থাকেনা, দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ, ছেলে মেয়ে এসে হাজির হয় খোলা মাঠে, নদীর ধারে, হ্রদের তটে, সমুদ্র-সৈকতে—যেখানেই একটু রোদ লাগানোর সুবিধা এবং সুযোগ রয়েছে। সকলেরই চেষ্টা রংয়ের প্রলেপ দিয়ে অশোভনীয় 'সাদাত্ব'টাকে ঢেকে দেওয়া। লোকের এই আগ্রহের সুযোগ নিয়ে গড়ে উঠেছে মস্ত এক ফাঁকির ব্যবসা। কারখানা থেকে শিশি, বোতল, কৌটায় বেরিয়ে আসছে রঙ্গীন হওয়ার নানা উপকরণ। মানুষের এই যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর প্রচেষ্টা রঙ্গীন হওয়ার জন্য—বিশেষতঃ যে সব দেশে দিনগুলি সূর্য্যের আলোয় তেমন দীপ্ত থাকে না—এর মূলে আছে সেই স্বাভাবিক আকর্ষণ যার দরুণ জন্ম থেকেই মানুষ চায় সূর্য্যরশ্মির পরশ। সভ্যতার দাবী পূরণ করতে গিয়ে সূর্য্যরশ্মি আর মানুষের ভিতর গড়ে উঠেছে এক প্রাচীর, যার উপাদান হ'লো জামা-কাপড়, পোষাক-পরিচ্ছদের মোহ। "অ-সভ্য" শিশুরা স্বভাবতঃই চায় আলো, চায়না অন্ধকার। যে পঙ্গু, বাইরে চলাফেরা বা কাজ করার শক্তি হারিয়েছে, সে চায় আনন্দময় আলোর পরিবেশ। কিন্তু, অত্যন্ত রুগ্ন, জীর্ণ এবং জরাগ্রস্ত মানুষ (বা ইতর প্রাণী) আলো থেকে দূরে থাকবার চেষ্টাই করে। তাদের জীবনীশক্তি এতই ক্ষীণ যে সূর্য্যের ডাকে সাড়া দেবার সামর্থ্য তাদের নেই। তাই তারা আশ্রয় খোজে আঁধারের কোলে। আবার যে রোগী আরোগ্যের পথে চলেছে সে চায় আলো; সূর্য্যের সঞ্জীবনী শক্তির জন্য তার অফুরন্ত ক্ষুধা; আলোর স্পর্শে সে পায় জীবনের স্পন্দন; দেহমন তার আনন্দে নেচে উঠে। সারা দেহ মন তাই সূর্য্যের ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে না। ঘুমোবার সময় আমরা চাই অন্ধকার; কারণ জাগ্রতাবস্থার উত্তেজনা, উদ্দীপনা কমে গিয়ে দেহমন তখন অসাড় হয়ে আসে। আবার সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেহে ও মনে কর্ম্মতৎপরতা ফিরে আসে; যেন নতুন করে প্রাণসঞ্চার হয়। বোধহয় এই অনুভূতিই রূপ পেয়েছে কবির দীপ্ত-ভাষায়:

"রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি এসেছে দুয়ার ভেদিয়া,
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎবাণ স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।"

যুগের পর যুগ ধরে চলে এসেছে সূর্য্যের উপাসনা। অতীতের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নিদর্শন—প্রাচীন দেবালয় ও অনেক স্থলে নগরীর ধ্বংসাবশেষ

তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। অতীতে ভারতবর্ষে, জীবনের পরিপোষক এবং সর্ব্বপাপনাশক হিসাবে সূর্য্যকে পূজা করা হ'তো। সংস্কৃত ভাষায় সূর্য্যের বহু নামের প্রত্যেকটি তার কোন না কোন বিশেষ গুণের পরিচায়ক। রৌদ্রস্নানাগার (Solarium) প্রাচীন রোম নগরীর প্রত্যেক বসতবাটীর অপরিহার্য্য অঙ্গ ছিল। পম্পেই (Pompeii) নগরীর বসতবাটীর ছাদ-সংলগ্ন রৌদ্র-স্নান মঞ্চের (Sun-porch) চিহ্ন সেই নগরীর ধ্বংসাবশেষে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। স্নান-মঞ্চ এমনভাবে তৈরী হ'তো যেখানে গৃহবাসীরা নিরুপদ্রবে কুতূহলী দৃষ্টির আড়ালে রৌদ্র-স্নান করতেন। খ্রীষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে লিখিত বিবরণী থেকে জানা যায় মিশরবাসীরা তাঁদের মাথার চুল খুব ছোট করে রাখতেন; এবং বেশী রোদ লেগে মাথার হাড় তাঁদের খুব শক্ত হ'তো। কিন্তু অধিকাংশ সময় টুপী ব্যবহারের ফলে মাথায় রোদ খুব কম লাগতো বলে সেকালের পারসিকদের মাথার হাড় নরম থেকে যেত। যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাবের বহু আগে হিপোক্রেটিস্ (Hippocrates) নানাবিধ ব্যাধির চিকিৎসায় সূর্য্য-রশ্মির প্রয়োগের নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। অরিবেসিয়াস্ (Oribasius) নামক প্রাচীন গ্রীসের এক চিকিৎসক লিখে গেছেন: যাদের মাংসপেশীর পুষ্টি ও উন্নতি-সাধন দরকার তাদের পক্ষে সূর্য্যরশ্মির প্রয়োগ অপরিহার্য্য। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও সূর্য্যরশ্মির রোগ-নিবারক ও রোগনাশক শক্তির উল্লেখ আছে।

খ্রীষ্ট ধর্ম্মের আবির্ভাব ও প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে 'পৌত্তলিকতা' সংশ্লিষ্ট অনেক বিধি-ব্যবস্থার উচ্ছেদ সাধন করা হয়—ধর্ম্মের গ্লানিকর বিবেচনায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত অনেক মূল্যবান্ প্রথাও সেই সঙ্গে লোপ পায়। ধর্ম্মোন্মাদনার তাড়নায় সে সব দেশে সূর্য্যপূজাও কিছুকালের জন্য চাপা পড়ে। কিন্তু এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। মানুষ তার ভুল বুঝতে পেরে শোধ্রাতে দেরী করে নাই। সূর্য্যপূজার পুনঃপ্রচলন হয়। অতি প্রাচীন কাল ছেড়ে গত এক শত বছরের স্বাস্থ্যবিধির ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যায় মানুষের শরীরের উপর সূর্য্যরশ্মির প্রভাব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য পাশ্চাত্য দেশে বহু গবেষণা চলে। ফলে, সূর্য্যরশ্মির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এখন আর কোন মতদ্বৈধ নাই। ব্যাধি-প্রতিষেধক ও ব্যাধি প্রতিকারক হিসাবে এর প্রচলন পাশ্চাত্য দেশে হয়েছে। সে সব দেশের লোকেরা এখন জানে যে নিয়মিত সূর্য্যরশ্মির প্রয়োগে শরীর সুস্থ, সবল ও সতেজ থাকে; দুর্ব্বল দেহ সবল হয়—কোন ব্যাধি সহজে আক্রমণ করতে পারে না। তাই রোদের স্পর্শের জন্য সে সব দেশের অধিবাসীদের এমন তীব্র আগ্রহ; 'সাদা' রং রঙ্গীন করার এত প্রচেষ্টা। এর মূলে রয়েছে তাদের বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা, জীবনের প্রতি আকর্ষণ।

মানব দেহের উপর সূর্য্যরশ্মির প্রভাবের বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। অল্প কথায় সে কাজ সেরে নিতে হবে। এই আলোচনা প্রসঙ্গে সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য শরীরের বহিরাবরণ ত্বকের কথা। তার উপর এসে লাগে সূর্য্যকিরণের প্রথম ছোঁয়া। তার পর বিশেষ প্রতিক্রিয়া দ্বারা দেহের প্রয়োজনানু-যায়ী (ও গ্রহণযোগ্য) পরিবর্ত্তনের পর এর প্রভাব শরীরের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সেই প্রভাবে দেহ-যন্ত্র কর্ম্মতৎপর হয়ে উঠে। ত্বকে এই রূপান্তর না ঘটলে সূর্য্যরশ্মির প্রচণ্ড তেজ সহ্য করে মানুষ বেঁচে থাকতে পারতো না। সূর্য্যরশ্মির শক্তিকে আয়ত্তে এনে মানুষের প্রয়োজনের উপযোগী করে দেওয়ার দায়িত্ব ত্বকের রংয়ের পরিবর্ত্তন। রং গাঢ়তর হয়, চলতি ভাষায় বলা হয়, রং 'কালো' হয়। যে বিশেষ পদার্থের (Pigment) উপস্থিতির দরুণ এই পরিবর্ত্তন তার বিশিষ্ট কোন নাম নাই। এবং ঠিক কি ভাবে এর উৎপত্তি তা' এখন পর্য্যন্ত সুনির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানা গেছে যে ত্বকে এর উপস্থিতির দরুণ (১) প্রয়োজনাতিরিক্ত সূর্য্যরশ্মি শরীরের ভিতর

প্রবেশ করতে পারেনা; (২) যে আলোরশ্মি শরীরের ভিতর প্রবেশ করে (শোষিত হয়) তা' তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, ও কারো কারো মতে, আলোশক্তি এমন বিশেষ এক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যা' দেহের প্রতিরোধশক্তির (Resistance) সহায়ক বা পরিপোষক রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করে। বাহ্যতঃ, সূর্য্যকিরণের সংস্পর্শে ত্বকের কোমলতা, মসৃণতা ও স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া, সূর্য্যরশ্মির প্রভাবে ত্বকে (ক) জীবাণুর বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়, এবং অনেক জীবাণু বিনষ্ট হয়; (খ) ভিটামিন "ডি" খাদ্যপ্রাণ তৈরী হয় (কিন্তু প্রয়োগের মাত্রাধিক্যে ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়), (গ) অ্যান্টিবডি (antibody) উৎপন্ন হয়।

শরীরের যে সব অংশ নিয়মিত রোদের সংস্পর্শে আসে সেখানে রক্তশিরার প্রাচুর্য্য এবং শিরাগুলি প্রসারিত (dilated); কারণ রোদে রক্তশিরার প্রসারণ হয়। রক্ত চলাচলও এ সব অংশে বেশী হয়। এ সব অংশ জীবাণুর আক্রমণ সহজে প্রতিরোধ করতে পারে, এবং ঋতুভেদে ঠাণ্ডা এবং গরম দুইই অনায়াসে সহ্য করে। পক্ষান্তরে, যে সব অঙ্গ সাধারণতঃ বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে যেখানে রক্ত চলাচল অপেক্ষাকৃত কম এবং রক্তাল্পতাহেতু সেখানে শরীরের অঙ্গ নিষ্প্রভ ও দুর্ব্বল; ঠাণ্ডা বা গরম সহ্য করার এবং জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার শক্তিও কম। রোদে ত্বকের রক্তশিরার প্রসারণের ফলে রক্ত চলাচল সহজ ও স্বাভাবিক হয়; ভিতরের রক্ত বাইরের দিকে আসতে থাকে। সঞ্চিত রক্তের চাপ থেকে মুক্তি পেয়ে ভিতরের যন্ত্রগুলি কর্ম্মতৎপরতা ফিরে পায়। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখা ভাল যে রক্তশিরার উপর সূর্য্যকিরণের এই অপ্রত্যক্ষ (derivative) প্রভাব নানা প্রকার যাপ্য রোগে (chronic disease) বিশেষ ফলপ্রদ।

শরীরে নিয়মিত সূর্য্যকিরণ প্রয়োগে রক্তের পুষ্টি হয়। কারণ, রক্তকণিকার (blood corpuscle) সংখ্যাধিক্য এবং রোগজীবাণু নাশের ক্ষমতা (bactericidal power) বৃদ্ধি পায়; রক্তে ক্যালসিয়ম্ (calcium), ফস্‌ফরাস্ (phosphorus) প্রভৃতি উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

দেখা, শোনা, ঘ্রাণ নেওয়া, স্বাদ পাওয়া; ঠাণ্ডা এবং গরম বোধ; স্পর্শ, বেদনা বা চাপ অনুভব, অথবা দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা করা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ চলে স্নায়ুর (Nerve) সাহায্যে। স্নায়ুগুলির প্রান্তভাগ বহুধা বিভক্ত হয়ে ত্বকে ছড়িয়ে আছে। এদের কাজ বাইরের জগতের সঙ্গে শরীরের যোগ রক্ষা করা—যাতে সব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এবং সুস্থ ও সতেজ থেকে শরীর আপন কাজ করে যেতে পারে। সূর্য্যকিরণের সংস্পর্শে তন্তুগুলির উত্তেজনা স্নায়ুপথে স্নায়ুকেন্দ্রে পৌছে। তারপর এই উত্তেজনার সাড়া ভিন্ন স্নায়ুপথে শরীরের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হয়। শরীরের কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়; শরীর ক্রমশঃ সুস্থ ও সতেজ হয়।

নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত সূর্য্যকিরণ সংস্পর্শে শরীরের মাংশপেশীর বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন ঘটে। সমুদয় মাশপেশীর সমন্বয় ও সৌষ্ঠব বজায় রেখে এমন পুষ্টি অন্য কোন উপায়ে সম্ভবপর নয়। সূর্য্যরশ্মি-চিকিৎসাধীন, দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী রোগীদের মাংসপেশীর উন্নতি ও পুষ্টি দেখে বিস্ময় লাগে; এবং না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত যে এমন পরিবর্ত্তন সম্ভব।

বিভিন্ন আকৃতির ও আয়তনের হাড়ের সমন্বয়ে গড়েছে মানুষের শরীরের কাঠামো। এই কাঠামো যতক্ষণ শক্ত ও মজবুত থাকে, মানুষের স্বাভাবিক গঠন ও আকৃতির বৈকল্য ঘটেনা। ক্যালসিয়াম (calcium) হাড় ও দাঁতের প্রধান উপাদান, এবং এ পদার্থ আছে বলেই হাড় ও দাঁত শক্ত হয়। এর অভাবে, এদের পুষ্টি ব্যাহত হয়। ভিটামিন "ডি"র (Vitamin D) সহায়তা ছাড়া

শরীর খাদ্য থেকে ক্যালসিয়াম গ্রহণ করতে পারে না। দুই-উপায়ে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়; খাদ্য থেকে, এবং ত্বকের উপর সূর্য্যরশ্মির ক্রিয়ায়। আমরা সাধারণতঃ যে খাদ্য গ্রহণ করি তাতে ভিটামিন ডি বড় একটা থাকে না। কাজেই দ্বিতীয় উপায়ের উপর নির্ভর করাই সঙ্গত। ক্যালসিয়ামের অভাবে ছোটদের রিকেট নামে ব্যাধি দেখা দেয়। বয়স্কদের—বিশেষতঃ গর্ভবতী স্ত্রীলোকদের অস্‌টিওম্যাল্যাসিয়া (osteomalacia) নামক ব্যাধি হয় ক্যালসিয়ামের অভাবে। শরীরের হাড় ক্রমশঃ নরম হয়ে পড়ে। মায়ের শরীর থেকে উপাদান আহরণ করেই গর্ভস্থ শিশুর শরীর পুষ্ট হয়। সেই জন্য গর্ভাবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টির অভাবে ক্ষয় পূরণ না হলে মা'র শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়ে। ফলে গর্ভস্থ শিশুরও অনিষ্ট হয়। মা'র শরীর থেকে ক্যালসিয়াম গিয়ে শিশুর হাড়ের পুষ্টি সাধন করে। কাজেই মার শরীরে এর অভাব ঘটা—গর্ভাবস্থায় খুব স্বাভাবিক। নিয়মিত সূর্য্যরশ্মির প্রয়োগে ক্যালসিয়ামের অভাব-জনিত ব্যধির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

মানুষের শরীরে বিশেষ এক জাতীয় গ্রন্থি (gland) আছে যাদের অন্তঃক্ষরণ (internal secretion) বহন করে নেবার জন্য কোন নালি (duct) নাই। ক্ষরণ সরাসরি রক্তের সাথে মিশে শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। শরীরের উপর এই গ্রন্থিগুলির (অর্থাৎ এদের ক্ষরণের) প্রভাব অপরিসীম, বিশেষ করে শরীরের বৃদ্ধি ও উন্নতি এবং প্রজনন ক্রিয়ার উপর। এই ক্ষরণের ব্যতিক্রম হলে দেহের ক্রিয়া ব্যাহত হয়—অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকৃতি ঘটে। বিভিন্ন শারীরিক ক্রিয়ার উপর গ্রন্থিবিশেষের প্রভাব সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ। কিন্তু সব গ্রন্থিগুলির সমবেত প্রভাবে শরীর সহজ স্বাভাবিক ও সুশৃঙ্খল ভাবে চলে। এই সুশৃঙ্খলার উপর মানুষের দেহের ও মনের পূর্ণ পরিণতি ও পূর্ণ বিকাশ একান্ত ভাবে নির্ভর করে। যে কোন একটি বা একাধিক গ্রন্থির আংশিক বা পূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার ফলে দেহের অনিষ্ট হয়, এমন কি দেহের ও মনের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধা পায়। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে নিয়মিত সূর্য্যরশ্মি প্রয়োগে বিকল গ্রন্থির স্বাভাবিক কর্ম্মক্ষমতা ও তৎপরতা ফিরে আসে; নিষ্ক্রিয় গ্রন্থি সক্রিয় হয়। রোদের অভাবে পশুপক্ষীর প্রজনন-শক্তি হ্রাস পায়। শুনে বিস্মিত হতে হয় যে এসকিমো (Eskimo) দের তুষারাচ্ছন্ন দেশে সুদীর্ঘ শীতকালে যখন মাসের পর মাস সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না তদ্দেশীয়া রমণীরা তখন সাধারণতঃ ঋতুমতী হন না। শীত অন্তে সূর্য্যের আবির্ভাবের সঙ্গে তাঁদের এই স্বাভাবিক ক্রিয়া ফিরে আসে। প্রজনন ক্রিয়ার উপর পিটুইটারি (pituitary) গ্রন্থির যথেষ্ট প্রভাব। অত্যধিক শীতে এই গ্রন্থির কর্ম্মক্ষমতা শিথিল হয়ে পড়ে, ফলে দেহের যে সব ক্রিয়া এর প্রভাবে চালিত হয় সেগুলিও মন্থর বা স্তব্ধ হয়।

অনাহার ও অর্দ্ধাহার অধিকাংশ ভারতবাসীর জীবনের সাথী। আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৭০ জন লোক জানে না পেট ভরে খাওয়া কাকে বলে। সমস্ত দিনে একবার খেতে পেলেই এরা সন্তুষ্ট। এবং এই বিশেষ দয়ার জন্য ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানায়। এর বেশী খাদ্য তাদের জন্য তাদের ভগবান নির্দ্ধারণ করেন নাই—মনে করে। লক্ষ লক্ষ লোক না খেতে পেয়ে মরে এ দেশেই। এই চরম দুর্ভাগ্যকেও বিনা প্রতিবাদে অদৃষ্টের ফল বলেই মেনে নিই। খাদ্যাভাব পূরণ করা সম্ভবপর কিনা আমরা ভাবি না। এই নিশ্চেষ্টতার মুখে রয়েছে আমাদের হৃদয়হীনতা ও চিন্তার দৈন্য বা পঙ্গুত্ব। কারো দুর্ভাগ্যে আমাদের যে সহানুভূতি বা বেদনা বোধ হয়, ক্ষণস্থায়ী হয়ে তা' নিঃশেষিত হয়ে যায়। দেহতত্ত্বজ্ঞরা বলেন উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে দেহের যে ক্ষতি হয় বা হওয়ার আশঙ্কা থাকে তা থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় নিয়মিত

সূর্য্যরশ্মি প্রয়োগে। বিখ্যাত দেহতত্ত্ববিদ লেনার্ড হিল (Sir Leonard Hill) এই সম্পর্কে যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন তা' প্রণিধানযোগ্য। ভিয়েনা সহরে (Vienna), পুষ্টিকর খাদ্য পাচ্ছে না এমন কতকগুলি ছেলেকে নিয়মিত রোদ লাগান হয়। ফলে দেখা গেল যে ছেলেদের রিকেট হ'লো না, এবং যাদের হাড়ে রিকেট দেখা দিয়েছিল, তারা রোগমুক্ত হ'লো। কিন্তু ছেলেদের মধ্যে যারা হাসপাতালে ঘরের ভিতর থাকায় রোদ পায় নাই তাদের সকলেরই রিকেট হয়, মাত্র একজন এই ব্যাধির আক্রমণ থেকে মুক্ত ছিল,—একটা খোলা দরজার পাশে ছিল তার বিছানা এবং তারই ভিতর দিয়ে নিয়মিত রোদ এসে তার শরীরে লাগতো।

বেঁচে থাকতে হলে যে সব খাদ্য অপরিহার্য্য তার অধিকাংশই এদেশের বেশীর ভাগ লোকের ভাগ্যে জোটে না। কিন্তু সূর্য্যরশ্মির অভাব এদেশে নাই। একে কাজে লাগাতে আপত্তি কি? এর প্রয়োগে ব্যয়বাহুল্যও নাই।

আমাদের দেহের অভ্যন্তরে দুটো আপাত-বিরোধী কাজ, পাশাপাশি চলছে—ভাঙ্গা ও গড়া, ক্ষয় ও পুষ্টি—এই ভাঙ্গা গড়ার সমতার অভাব হলেই স্বাস্থ্য ক্ষুন্ন হয়। কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সের পর গড়ার কাজ মন্থর হয়ে আসে—দেহের ভাঙ্গন সুরু হয়। তারপর একদিন ভাঙ্গা গড়ার কাজ শেষ হয়ে যায় জীবনের সমাপ্তিতে। শরীরের কাজ অবিরাম চলেছে, কাজেই দৈহিক যন্ত্রের ক্ষয় হচ্ছে। ক্ষয়পূরণের কাজও পাশাপাশি চলে বলেই দেহ দীর্ঘকাল কর্ম্মক্ষম থাকে। আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি সেগুলি শরীরের ভিতর বিভিন্ন রাসায়-নিক প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে শরীরের পুষ্টি এবং ক্ষয়পূরণের উপাদান উৎপন্ন করে। বিশেষতঃ যে শক্তি শরীর চালায় তা'ও উৎপন্ন হয় এই এক প্রক্রিয়ায়। যে বিশেষ প্রক্রিয়ায় এ রূপান্তর ঘটে তার বৈজ্ঞানিক নাম "মেটাবলিজম্" (metabolism)। ত্বকের উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হয়ে এই প্রক্রিয়াকে বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত করে।

শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে; এ সব কাজের সুচারু সম্পাদনের উপর নির্ভর করে মানুষের স্বাস্থ্য। অঙ্গ বিশেষ বিকল হয়ে পড়লেও শরীর চলবে, কিন্তু সে হবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা। সে অবস্থা কারো কাম্য নয়। সুস্থ সক্ষম দেহই সকলে চায়। শরীরের প্রতি অঙ্গ পৃথকভাবে এবং সমস্ত অঙ্গ একযোগে কাজ করবে এই হ'লো স্বাস্থ্যরক্ষার মূল কথা। এ জন্য চাই যত্ন ও চেষ্টা। শুধু ইচ্ছা করলেই স্বাস্থ্যবান্ হওয়া যায় না। ইতিপূর্ব্বে ত্বকের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সংক্ষেপে যা' বলা হয়েছে তা' থেকে উপলব্ধি করা শক্ত নয় যে এর সহায়তা ছাড়া শরীরের হিত অসম্ভব। প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে শরীরের মঙ্গল বিধানের সহিত এর নিকট সম্পর্ক। কিন্তু দেহের এই অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমরা উদাসীন। আলো ও বাতাসের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হলে শরীরের ত্বক ফ্যাকাশে ও কিয়ৎপরিমাণে রক্তশূন্য হয়ে পড়ে। এবং আবার সুস্থ ও স্বাভাবিক হয় আলো বাতাসের ছোঁয়া পেলে। কোন কোন মা-বাপ তাঁদের সন্তানদের জামা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখেন; রোদ না পেয়ে ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে উঠে। তাঁদের বিশ্বাস নিষ্প্রভ ফ্যাকাশে ত্বক দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে।

অনেকটা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের লোক হয়েও অনাবশ্যক আচ্ছাদনে শরীর ঢেকে রেখে বিধাতার আলো ও বাতাস থেকে আমরা নিজেদের বঞ্চিত করি। ফলে, সভ্য-আমাদের অধিকাংশেরই গায়ের ত্বক ফ্যাকাশে, নিষ্প্রভ ও অল্প-বিস্তর রক্তশূন্য। শুধু যে অংশ ঢেকে রাখা যায় না সেখানে সুস্থ সতেজ ত্বক দেখা যায়। শিশুরাও অনাবশ্যক পরিচ্ছদের বাহুল্য থেকে অব্যাহতি পায় না। সভ্য করবার চেষ্টায় তাদের স্বাস্থ্যহীন ও দুর্ব্বল করা হয়।

প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্ত্রাদি দ্বারা শরীর ঢেকে রাখার ফলে ত্বকের উপরিভাগে এক আর্দ্র আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। এই অস্বাভাবিক আবেষ্টনীতে ত্বক ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এবং তার নির্দ্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করতে পারে না। ত্বকের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অপরাপর অঙ্গেরও কর্ম্মতৎপরতা মন্থর হয়ে আসে; দেহের পুষ্টি ব্যাহত হয়; প্রতিবোধের শক্তি কমে আসে; ব্যাধির আক্রমণে শরীর সহজেই কাবু হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন দেশের অধিবাসীদের আয়ুষ্কালের হিসাবে দেখা যায় গড়পড়তায় ভারতবাসী বাঁচে ২৭ বছর মাত্র। এমন অল্পায়ু পৃথিবীর অন্য কোন দেশের অধিবাসীরা নয়। কেন এ অবস্থা তা' অনুমান করা সহজ হবে এদেশের বাৎসরিক মৃত্যুহার আলোচনায়। প্রতি বছর এদেশে—

কলেরায়	মরে	১,৪৫,০০০
বসন্তে	"	৭০,০০০
প্লেগে	"	৩১,০০০
পেটের ব্যারামে	"	২,৭০,০০০
যক্ষ্মায়	"	৫,০০,০০০
জ্বরে	"	৩৬,৬৭,০০০
	মোট	৪৬,৫৮,০০০

এক বছরের কম বয়স্ক শিশু-মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১৬৭। এই সরকারী হিসাবের বাইরে আরো কত রকমে কত লোক মারা যায় তার কোন হিসাব নাই। সর্ব্বোপরি, অনাহারে যে কত প্রাণ নষ্ট হয় তার হিসাব এদেশে রাখা হয় না।

স্বাস্থ্য অটুট রাখতে হ'লে প্রধানতঃ পুষ্টিকর খাদ্য, ব্যাধির প্রতিরোধ ও চিকিৎসার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। অনাহার বা অর্দ্ধাহার এদেশের অধিকাংশ লোকের নিত্যসহচর। পেট ভরে খাওয়া খুব কমেরই ভাগ্যে জোটে। পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ার সঙ্গতি জন কয়েকের আছে। রোগ প্রতিরোধ সম্ভব হয় যদি জীবনীশক্তি (বা রোগ-প্রতিরোধ-শক্তি) যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। আমাদের এ' দুটোরই অভাব। কারণ পুষ্টির অভাবে আমাদের দেহ ক্ষীণ ও রোগপ্রবণ; ব্যাধির জীবাণু সহজেই আমাদের আক্রমণ করে। ফলে, প্রায় সব রকম ব্যাধির স্থায়ী আস্তানা হয়েছে আমাদের দেশ।

লেনার্ড হিল বলেন পুষ্টিকর খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে পেলে মানুষ এবং ইতর প্রাণী সূর্য্যের আলোকের অভাবেও কিছুকাল বেঁচে থাকতে পারে। উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়; শরীর ভেঙ্গে পড়ে। শরীরে নিয়মিত রোদ লাগালে, খাদ্যাভাব সত্ত্বেও স্বাস্থ্য ঠিক রাখা যায়—লেনার্ড হিল একথাও বলেন। খাদ্যাভাব পূরণের শক্তি সূর্য্যরশ্মির নিশ্চয়ই আছে। নতুবা আমাদের দেশের মৃত্যুর হার আরো বেড়ে যেত।

নানা রকম ব্যাধির—বিশেষতঃ যক্ষ্মার—প্রতিরোধ ও প্রতিকারে ও সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সূর্য্যরশ্মির প্রভাব অনস্বীকার্য্য। সূর্য্যের আলোরও অপ্রাচুর্য্য নেই; তবে আমাদের মত দরিদ্র ও নিরন্ন দেশে চিকিৎসায় সূর্য্যরশ্মির প্রয়োগ প্রচলন কেন হয় না—এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে দেখেছি শিক্ষিত সম্প্রদায় ও প্রধানতঃ চিকিৎসকদের ঔদাসীন্য, অজ্ঞতা ও সংস্কারই এ জন্য প্রধানতঃ দায়ী। দেশবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ও ব্যাধির প্রতিকারের জন্য নানা রকম পরিকল্পনার কথা শুনতে পাই। কিন্তু সূর্য্যরশ্মির প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ কোথাও নাই। অথচ, সূর্য্যরশ্মি-চিকিৎসা পদ্ধতির (Heliotherapy) প্রচলন হওয়া দরকার। সূর্য্যরশ্মির উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লোকের যাতে জ্ঞান জন্মে সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরাই অগ্রণী হবেন এ আশা করা যায়। কারণ বিজ্ঞানের চর্চ্চা শুধুই মানসিক বিলাস নয়, সমাজ-সেবাও ইহার অন্যতম—হয়তো প্রধান—উদ্দেশ্য। এই বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে একমাত্র তাঁদেরই আলোচনা নিরপেক্ষ হওয়া সম্ভব। কেন না যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁরা আলোচনা করবেন তা সংস্কারমুক্ত হবে ও স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হবে না।

নৃতত্ত্বের উপক্রমণিকা

[দ্বিতীয় পর্য্যায়]

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

গাত্রবর্ণ অনুসারে যাহাদিগকে মোটামুটি এক গোষ্ঠীভুক্ত করা হইয়াছে কেশের প্রকৃতি ও মস্তকের গঠন অনুসারে তাহাদিগকে পুনরায় বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কেশের প্রকৃতি অনুসারে মনুষ্য গোষ্ঠী সমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, যথা ulotrichous অর্থাৎ চুল পশমের মত ঘন ও গুটিপাকান (wooly hair or pepper corn hair), leitorichous বা সরল (straight hair) এবং cymotrichous বা মসৃণ, কুঞ্চিত বা ঢেউতোলা (wavy curly hair)। মস্তকের গঠন অনুসারে মনুষ্য গোষ্ঠীকে তিনশ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে, যথা লম্বামুণ্ড (dolichocephalic) গোলমুণ্ড (brachycephalic) ও মধ্যমাকৃতি মুণ্ড (mesocephalic)।

পশমের মত চুল সাধারণত দেখিতে পাওয়া যায় খর্ব্বকায়, গোল বা কতকটা মধ্যমাকৃতি মুণ্ডের আন্দামান, মালয় ও পূর্ব্বস্মুমাত্রার কতকগুলি জাতির মধ্যে ও নিউগিনির তাপিরোদিগের মধ্যে। ইহাদিগকে নেগ্রিটো (Negrito) বলা হয়। আফ্রিকার নিরক্ষ অঞ্চলের অরণ্যের নেগ্রিল্লো, কালাহারি মরুভূমির বুশম্যান ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার হোটেনটট দিগের মধ্যে পশমের মত চুল দেখা যায়। ইহাদের মস্তক মধ্যমাকৃতির কিন্তু গায়ের রং পীতাভ। স্বর্ণ উপকূলের নিরক্ষ অঞ্চলের নিগ্রোদিগের মধ্যে (নেগ্রিটান, পশ্চিম সুদান), পূর্ব্ব সুদানে এবং উত্তর নীলনদের উপত্যকার নিলোট এবং বান্টু ভাষাভাষী নিগ্রোয়েডগণের চুল ঐরূপ, রং কাল কিন্তু মস্তক লম্বা। পূর্ব্ব আফ্রিকায় হেমাইট গোষ্ঠীর রং সাধারণত কাল বা শ্যাম কিন্তু তাহাদের চুল তৃতীয় শ্রেণীর, অর্থাৎ কুঞ্চিত বা ঢেউতোলা।

দেখা যাইতেছে যে কেশের প্রকৃতি বিচার করিয়া যাহাদিগকে এক গোষ্ঠীভুক্ত করা যায় মস্তকের গঠন বিচার করিলে তাহাদিগকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ফেলিতে হয়। গায়ের রং অনুসারে বিচার করিলে এইরূপ পৃথক গোষ্ঠীর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে। নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী সর্ব্বাধিক সমান লক্ষণযুক্ত জাতিগুলিকে এক গোষ্ঠীতে ফেলেন।

পীত, পীতাভকায় এবং সরলকেশ মনুষ্য গোষ্ঠীর অধ্যুষিত অঞ্চল বহু বিস্তৃত। এশিয়ার একটি বৃহৎ মনুষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে পীত ও পীতাভ রং ও সরল কেশের সঙ্গে আরও কতকগুলি দৈহিক লক্ষণ এক সঙ্গে দেখা যায়। এই সকল লক্ষণকে মোঙ্গলীয় লক্ষণ (Mongolian characters) বলা হয়। এই সকল বিশিষ্ট লক্ষণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুখমণ্ডলের গঠন, চোখের গঠন, নাসিকার গঠন ও কেশ। ইহাদের চুল কাল ও সরল, মুখে ও গায়ে চুল কম, গণ্ডাস্থি উচ্চ, মুখের গঠন চেপ্টা, নাকের গোড়া নীচু, মধ্যভাগ মোটা ও চওড়া, নাকের পাটা চওড়া, চোখ টেরছা (oblique) এবং চোখের পাতার উপর একটি চামড়ার ভাঁজ থাকে (epicanthic fold) প্রকৃত মোঙ্গলগোষ্ঠী গোলমুণ্ড কিন্তু এমন অনেক জাতি আছে যাহাদের অন্যান্য মোঙ্গলীয় লক্ষণ থাকিলেও মস্তকের গঠন ভিন্ন প্রকারের। সে যাহা হউক মোটামুটি যাহাদের গাত্রবর্ণ পীত বা পীতের সহিত অন্যবর্ণের মিশ্রণ আছে এবং উপরের

বর্ণিত দৈহিক লক্ষণগুলির কোন কোনটি আছে তাহাদিগকে এক বা সম গোষ্ঠীভুক্ত বলিয়া মানিয়া লইলে দেখা যায় যে উত্তর এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে এই গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা বাস করিতেছে। কতকগুলি শাখা বহু পূর্বে য়ুরোপের নানা অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং কোন কোন শাখা আমেরিকা মহাদেশের মধ্যে অগ্রসর হইয়াছে।

ভারতবর্ষের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের কোন কোন স্থানে এই গোষ্ঠীর সমগোষ্ঠীভুক্ত যে সকল জাতি বাস করে তাহাদের কথা পরে বলা হইবে। ভারতবর্ষের বাহিরে উহাদের সমগোষ্ঠীভুক্ত জাতি দেখিতে পাওয়া যায় উত্তরে তিব্বত, উত্তর-পূর্বে চীন, এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের ব্রহ্ম, শানদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীনের কাম্বোজ, আনাম, টংকিন প্রভৃতি অঞ্চলে, উত্তর মালয় ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। কোরিয়া ও জাপ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী (আইনু বাদে) এই গোষ্ঠীভুক্ত। মাঞ্চুরিয়ায় অধিবাসীও ট্রান্সবৈকালিয়ার টুঙ্গুজগণ মোঙ্গল গোষ্ঠীয়। তিয়েনসান পর্বতমালার উত্তরে জুঙ্গেরিয়া ও তাহার পূর্বে মঙ্গোলিয়ার কালমুখ, তরাঙ্কি, তোরগোদ, তেলেঙ্গেত মোঙ্গল গোষ্ঠীয়। পূর্ব তুর্কীস্থানের হামী, তুরফান, অক্ষু ইত্যাদি ও তারিম অববাহিকার কাশগড়, খোটান, ইয়ারখন্দ ইত্যাদির অধিবাসীদিগের মধ্যে কিছু কিছু মোঙ্গলীয় লক্ষণ দেখা যায়।

সাইবেরিয়ায় লেনা নদীর অববাহিকায় ইয়াকুট ও তাতার নামে পরিচিত গোষ্ঠীগুলি, তুর্কীস্থানের কিরগিজ, কাজাক ও উজবেগ. কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের তুর্কম্যান এবং এশিয়া মাইনর ও য়ুরোপীয় তুর্কীর তুর্কগণ বৃহৎ তুর্কী গোষ্ঠীভুক্ত। প্রাচীন উগুজ ও উইগুর জাতি তুর্কী গোষ্ঠীভুক্ত। তুর্কী গোষ্ঠীতে কিছু পরিমাণ মোঙ্গলীয় লক্ষণ দেখা যায়। এই গোষ্ঠীকে আসোনং হূনদিগের একটি শাখা বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই গোষ্ঠীর একটি শাখাকে পেলিয়ার্টিকাস বা উগ্রিয়ান নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহারা অতি প্রাচীনকালে সাইবেরিয়ার পথে য়ুরোপের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। পূর্ব, মধ্য ও পশ্চিম সাইবেরিয়ার বিভিন্ন জাতি, স্যামোয়েদ ও লাপ জাতি, আমুর নদ অঞ্চলের গিলিয়াক্‌ ও উত্তর শাখালিনের অধিবাসী এই শাখাভুক্ত। পারমিয়াক, মর্দভিন প্রভৃতি শাখা রুশিয়ার অভ্যন্তরে ও লাপগণ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় প্রবেশ করিয়াছে। ফিন, এস্ত, লিভোনীয়ান প্রভৃতি য়ুরোপীয় জাতি এই শাখাভুক্ত।

এই গোষ্ঠীর একটি দলকে দক্ষিণ মোঙ্গলীয় নামে অন্যান্য শাখা হইতে পৃথক করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিব্বত, দক্ষিণ চীন, ইন্দো-চীন ও জাপানের অধিবাসীদিগকে এই দক্ষিণ মোঙ্গলীয় দলভুক্ত বলা হয়। এই দলভুক্ত যে শাখার লোক পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হয় তাহাদিগকে প্রোটো-মালয় বা Oceanic Mongolও নাম দেওয়া হয়।

হাওয়াই হইতে নিউজিলণ্ড ও সামোয়া হইতে ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত অঞ্চলকে পলিনেশিয়া বলে। পলিনেশিয়ার অধিবাসীদিগের মধ্যে নানা জাতির সংমিশ্রণ হইয়াছে। কেহ কেহ তাহাদিগকে প্রোটো-মালয় আবার কেহ কেহ "নেসিয়ট" (Nesiot) নাম দিয়াছেন এবং এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে শ্বেতকায় মনুষ্য গোষ্ঠীভুক্ত।

আমেরিকার আদি অধিবাসী (Amerinds) সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মত এইরূপ যে প্রাচীন কালে বিভিন্ন সময় কতকগুলি জাতি উত্তর-পূর্ব সাইবেরিয়ার পথে আমেরিকার উপকূলভাগে উপস্থিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে দেশের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়ে। আমেরিকার অধিবাসীদের কতকগুলি জাতি সরলকেশ, পীত বা পীতাভকায়, গোল বা লম্বামুণ্ড কিন্তু অন্যান্য মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত নহে। তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে কেহ কেহ এইরূপ মত প্রকাশ

করিয়াছেন যে এশিয়ার একটি মূলগোষ্ঠী হইতে বিভিন্ন শাখা গোষ্ঠীর উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই সকল শাখা গোষ্ঠীর একটি মোঙ্গলীয় ও অন্য একটি আমেরিকান। ব্রিটিশ গায়েনার ওয়াবান, আরওয়াক, ওয়ানিয়ানা, ক্যারিব জাতিগুলির মধ্যে মোঙ্গলীয় লক্ষণ দেখা যায়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষের বাহিরে পূর্বে আসাম সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্ম, শানদেশ, শ্যাম, ইন্দো-চীনে, দক্ষিণ-পূর্বে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, উত্তর-পূর্বে তিব্বত ও চীন হইতে মোঙ্গলিয়া, কোরিয়া ও জাপান পর্যন্ত মোটামুটী সমগোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন জাতির বাসভূমি অবস্থিত। পামীর পর্বতমালার পূর্বে পূর্বতুর্কীস্থান ও উত্তরে ও পশ্চিমে তুর্কম্যানিস্থান পর্য্যন্ত তুর্কী গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার বাস। এই অঞ্চলের উত্তর-পশ্চিমে উরল পর্বতশ্রেণী হইতে পূর্বে বেরিং প্রণালী পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাইবেরিয়ায় সরল-কেশ, পীতাভ রংয়ের কোন কোন মোঙ্গলীয় লক্ষণ-যুক্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী দেখিতে পাওয়া যায়। বেরিং প্রণালীর অপর কূলে আমেরিকা মহাদেশের উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ অংশে ব্রিটিশ গায়েনা ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপগুলিতে এই বৃহৎ গোষ্ঠীর সম্পর্কিত বিভিন্ন জাতি প্রবেশ করিয়াছে।

এখন শ্বেতকায় (leucodermic) মনুষ্য গোষ্ঠীর অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা এই গোষ্ঠীভুক্ত তাহাদের কথা এখানে বলা হইতেছে না।

শ্বেতকায় মনুষ্যগোষ্ঠী বলিতে যাহাদের গায়ের রং সাদা, গোলাপী, কটা, বাদামী বা শ্যাম, যাহাদের চুল ঢেউতোলা বা কুঞ্চিত, চোখ সরল ও সম্পূর্ণ খোলা (straight and widely open) নাক, উচ্চ ও তীক্ষ্ণ (leptorrhine and prominent), গণ্ডাস্থি উচ্চ নয় এবং যাহাদের মধ্যে কোন প্রকার মোঙ্গলীয় লক্ষণ দেখা যায় না এইরূপ মনুষ্য গোষ্ঠী বুঝায়। চুলের রং সোনালী, কাল বা বাদামী হইতে পারে, চোখের তারা কাল, ধূসর বা নীল হইতে পারে, মস্তক গোল, লম্বা বা মধ্যমাকৃতি হইতে পারে কিন্তু মোটামুটি উপরের লক্ষণগুলি যাহাদের মধ্যে দেখা যায় তাহাদিগকে এই গোষ্ঠী-ভুক্ত বলা হয়।

শ্বেতকায় মনুষ্য গোষ্ঠীর মধ্যে য়ুরোপের জাতি সমূহ, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার অধিকাংশ জাতি ও উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার অধিবাসীদিগকে ধরা হয়।

আরবের সেমাইটগণ এই গোষ্ঠীভুক্ত। দক্ষিণ আরবের জাতিগুলি হিম্যারাইট ও উত্তর আরবের জাতিগুলি বেদুইন শাখাভুক্ত বলা হয়। সেমাইট গোষ্ঠী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া হইতে উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আরব, ইরাক, হেজাজ, নেজ্দ, ইমেন, ট্রান্সজর্ডান, মিশর, সিরিয়া, লেবানন, প্যালেষ্টাইন সেমাইট গোষ্ঠীর অধ্যুষিত দেশ। ইয়ুদী জাতি উত্তর-সেমাইট গোষ্ঠীর একটি প্রাচীন শাখা। উত্তর আফ্রিকা হইতে আইবেরিয়ান উপদ্বীপের পথে সেমাইটগণ য়ুরোপের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

আর্মেনিয়া, কুর্দীস্থান, ককেসাসের পূর্ব অঞ্চলের মোঙ্গল-তুর্ক গোষ্ঠীর জাতিগুলি বাদে অন্য কতকগুলি জাতি (জর্জিয়ান বা কার্তালিয়ান গোষ্ঠীর জাতি, আদিঘে বা সিরকাসিয়ান, ওসেট ইত্যাদি) শ্বেতকায় গোষ্ঠীভুক্ত। ইরাণের অধিবাসী এই গোষ্ঠীভুক্ত। ইরাণের অধিবাসী জাতীগুলির মধ্যে আরব ও তুর্কম্যানের সংমিশ্রণে কতকগুলি উপজাতির সৃষ্টি হইয়াছে। পামীরের কারাতেগিন, সিগনান, রোশান, ওয়াখান প্রভৃতি উপত্যকার অধিবাসী এই গোষ্ঠীভুক্ত। ইহারা ইরাণের তাজিক গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা। পামীরের বোখারার (এখন তাজিকীস্থান) অধিবাসীদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ তাজিক গোষ্ঠীয়, বাকী অংশ তুর্কগোষ্ঠীয় উজবেগ শাখা। আফগানীস্থান এবং পশ্চিম ও পূর্ব হিন্দু-

কুশ পর্বতমালার উপত্যকাগুলির অধিবাসী বিভিন্ন-জাতি শ্বেতকায় গোষ্ঠীভুক্ত। ইহার পরে আমরা ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করি।

দেখা যাইতেছে যে শ্বেতকায় গোষ্ঠীর অধ্যুষিত অঞ্চল ভারতবর্ষের উত্তরে হিন্দুকুশ-পামীর হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম আফগানিস্থান, ইরাণ, কুর্দীস্থান, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া ও ককেশাস হইয়া রুশিয়া পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। আজারবাইজানে তুর্ক গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। আরব ও সিনাই উপদ্বীপ ও উত্তর আফ্রিকার সেমাইটগণ এই গোষ্ঠীর একটি শাখা। য়ুরোপীয় জাতি সমূহ শ্বেতকায় গোষ্ঠীর কতকগুলি বিভিন্ন শাখাভুক্ত।

য়ুরোপ শ্বেতকায় মনুষ্য গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান বাসভূমি। এই গোষ্ঠীর য়ুরোপীয় শাখাগুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতে পারে।

য়ুরোপে অধিবাসীগুলির উৎপত্তি স্থান য়ুরোপে নহে অনেকে এইরূপ বলেন। য়ুরোপের লম্বামুণ্ড ও গোলমুণ্ড এই দুই গোষ্ঠীর কথা বলা হইতেছে। মস্তকের গঠন অনুসারে যে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে স্পেন, পর্তুগাল, পশ্চিম ভূমধ্যসাগরের দ্বীপ সমূহ, দক্ষিণ ফ্রান্স, দক্ষিণ ইটালী এবং গ্রীসের দ্বীপগুলিতে লম্বা-মুণ্ড, হালকা গড়নের একটি গোষ্ঠী দেখা যায়। এই গোষ্ঠীকে মেডিটারেনিয়ান গোষ্ঠী নাম দেওয়া হয়। পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এই গোষ্ঠীর উদ্ভব-কেন্দ্র (area of characterisation)। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে Comb Capelle (Proto-Ethiopian বা Eurafrican) ও নিগ্রোগোষ্ঠীর লক্ষণ যুক্ত Grimaldi জাতির সহিত অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত জাতির সংমিশ্রণে এই ভূমধ্য-সাগরীয় গোষ্ঠীর উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ অনুমান করা হয় যে প্রথমে Comb Capelle ও Grimaldi জাতি উত্তর আফ্রিকা হইতে প্রাচীন প্রস্তর যুগের কৃষ্টি বহন করিয়া য়ুরোপে প্রবেশ করে। ইহাদের সহিত অন্যান্য জাতির সংমিশ্রণে পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে যে নূতন গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় নূতন প্রস্তর যুগে সেই গোষ্ঠীভুক্ত জাতিগুলি সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, ফ্রান্সে ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে ছড়াইয়া পড়ে।

লম্বামুণ্ড ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর পরে গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতি (Alpine) এশিয়া মাইনর হইতে য়ুরোপে প্রবেশ করে। এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে এই গোষ্ঠীর জাতিগুলি য়ুরোপে কৃষিকার্য, পশুপালন, তাঁতবুনা এবং ধাতুর ব্যবহার প্রবর্তন করে। য়ুরোপের এই গোলমুণ্ড গোষ্ঠীকে হিমালয়ের পশ্চিম হইতে ইরাণ, আর্মেনিয়া, আনাতোলিয়া হইয়া বল্কান ও আল্‌পস্ পর্বতমালা পর্যন্ত যে পার্বত্য অঞ্চল অবস্থিত তাহার পূর্বাংশের তিনটি মালভূমির (ইরাণ, আর্মেনিয়া ও আনাতোলিয়া) অধিবাসীদের সম-গোষ্ঠীয় বলা হয়। যে সকল গোল-মুণ্ড গোষ্ঠীর জাতি অতি প্রাচীন কালে য়ুরোপে প্রবেশ করে তাহাদের উদ্ভবস্থান আর্মেনিয়া ও আনাতোলিয়ার মালভূমি। এই গোষ্ঠীকে সাধারণ-ভাবে আর্মেনো-আনাতোলিয়ান গোষ্ঠী বলা হয়। য়ুরোপের যে যে অঞ্চলে ইহাদিগকে দেখা যায় তাহার নাম অনুসারে দুইটি শাখায় ইঁহাদিগকে ভাগ করা হয়, যথা আল্পো-কার্পেথিয়ান ও ইলিরিয়ান, দিনারিক বা আড্রিয়াতিক।

মধ্য ফ্রান্সের মালভূমি, জুরা ও আল্পস্ পার্বত্য অঞ্চল, বল্কান, গ্রীস ও রুশিয়ার প্রথম শাখার জাতি-গুলিকে দেখা যায়। দ্বিতীয় শাখার জাতিগুলি দিনারিক আল্পস্ অঞ্চলে বাস করে। রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, আলবেনিয়া, দক্ষিণ অষ্ট্রিয়া ও পশ্চিম গ্যলিশিয়ার (পোল্যাণ্ড) অধিবাসীদিগকে এই শাখাভুক্ত বলা হয়। রুশিয়ায় স্লাভদিগকে প্রথম শাখা বা দক্ষিণ স্লাভ বলিতে যাহাদিগকে বুঝায় তাহাদিগকে দ্বিতীয় শাখাভুক্ত করা হয়।

এই দুইটি লম্বামুণ্ড ও গোলমুণ্ড গোষ্ঠী বাদে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, উত্তর জার্মেনী, হলাণ্ড, বেলজিয়াম,

উত্তর ফ্রান্স, ব্রিটিশ দ্বীপগুলির কোন কোন অঞ্চলে ও দক্ষিণ-পূর্ব বাল্টিক অঞ্চলে কতকটা মধ্য মাকৃতি মুণ্ডের (mesocephalic) গোষ্ঠীকে দেখা যায়। কেহ কেহ এই গোষ্ঠীকে নর্ডিক নাম দিয়াছেন।

নর্ডিক নাম ও নর্ডিক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বিতর্কের বিষয়। বিতর্ক এড়াইয়া এই গোষ্ঠীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়—তাহা সংক্ষেপে এইরূপ: নর্ডিক গোষ্ঠীর উৎপত্তি হইয়াছে প্রোটো-নর্ডিক গোষ্ঠী হইতে। প্রোটো-নর্ডিক নামটি প্রকৃত প্রস্তাবে একটি কল্পিত (hypothetical) গোষ্ঠীর নাম, সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য এই নাম উদ্ভাবিত হইয়াছে। প্রোটো-মালয়, প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড প্রভৃতি নাম এইরূপ নামকরণের অন্যান্য উদাহরণ। মধ্য ও উত্তর য়ুরোপের নর্ডিক গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ যে লম্বামুণ্ড মেডিটারেনীয়ান ও এশিয়া-মাইনর হইতে আগত গোলমুণ্ড গোষ্ঠী নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য প্রোটো-নর্ডিক গোষ্ঠীর কথা তুলিতে হইয়াছে। অনুমান করা হয় যে খৃঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর বা এইরূপ সময়ে দেশময় অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের দরুণ লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীর কতকগুলি জাতি পশ্চিম এশিয়ার তৃণময় অঞ্চল হইতে দক্ষিণ রুশিয়ার পথে য়ুরোপে প্রবেশ করে। ইহাদের কোন কোন দল ভলগা নদীর অববাহিকার দিকে চলিয়া যায়, কোন কোন দল উক্রাইনের মধ্য দিয়া নীপার নদীর গতি অনুসরণ করিয়া পোলাণ্ড, জার্মেনী ও স্ক্যাণ্ডি-নেভিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে, এই গোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রমাণ হিসাবে নীপার ও ভলগা অঞ্চলের কতকগুলি সমাধিস্তূপে (Kurgans) প্রাপ্ত নূতন প্রস্তর যুগের কতকগুলি মনুষ্যদেহাবশেষের উল্লেখ করা হইয়াছে।

এই প্রোটো-নর্ডিক গোষ্ঠী সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য কথা এই যে কোন কোন মতে ইহারা ইন্দো-য়ুরোপীয় ভাষাভাষী ছিল। এই স্বীকৃতির কতকগুলি ফল দেখা যায়। প্রথমত এই মত প্রচারিত হইয়াছে যে আর্যজাতি লম্বামুণ্ড গোষ্ঠীভুক্ত জাতি। দ্বিতীয়ত কল্পিত প্রোটো-নর্ডিক গোষ্ঠীর দেহ হইতে এশিয়ার রক্তটুকু নিষ্কাশিত করিবার বা অস্বীকার করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ইহার প্রতিবাদে আরেকটি মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ পরে করা হইতেছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে প্রোটো-নর্ডিকগণের সঙ্গে এশিয়ার দূর সম্পর্ক থাকিলেও তাহারা বাস্তবিক য়ুরোপের লোক। পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে প্রোটো-নর্ডিকগণ খাঁটি য়ুরোপীয় ও খাঁটি আর্য (আর্য কথার প্রকৃত অর্থ যাহাই হউক) এবং তাহাদের উত্তরপুরুষ নর্ডিকগণ শ্রেষ্ঠ আর্য। প্রোটো-নর্ডিকগণের প্রকৃত গুণপণা অজ্ঞাত হইলেও নর্ডিক আর্যগণের যোগ্য পূর্বপুরুষ হইবার পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক গুণ তাহাদের উপর আরোপিত হইয়াছে। যথা, গ্রীস বিজেতা আকিয়ানগণ প্রোটো-নর্ডিক ছিল। আর্মে-নিয়ার ও সিরিয়ার হিতাইতগণ খৃঃ পূঃ ১৯২৬ সনে হাম্মুরাবির বংশকে পরাজিত করিয়া বাবিলোন লুণ্ঠন করে; হিতাইতগণের মধ্যে প্রোটো-নর্ডিক সংমিশ্রণ ছিল। কাসাইতগণ বাবিলোন জয় করিয়া সেখানে নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করে; ইহাদের নেতৃত্ব করিয়াছিল প্রোটো-নর্ডিকগণ। খৃঃ পূঃ ১৩০০ সনে লিবিয়ান ও অন্য যে সকল জাতি মিলিয়া মিশর আক্রমণ করে তাহাদের মধ্যে প্রোটো-নর্ডিক ছিল। এই সকল অনুমান গড়িয়া উঠিয়াছে ক্ষীণ ভাষার প্রমাণে। সংক্ষেপে বলা যায় যে প্রোটো-নর্ডিকবাদী কেহ কেহ কতকটা এইরূপ মত পোষণ করেন যে য়ুরোপের বাহিরে সর্বত্র এবং য়ুরোপের ভিতরে ভূমধ্যসাগরীয় ও গোলমুণ্ড গোষ্ঠীভুক্ত জাতি সমূহের অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে সকল প্রাচীনযুগের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনার নায়ক প্রোটো-নর্ডিকগণ। তৃতীয় প্রচেষ্টার উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে বর্তমানে এই মত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে যে য়ুরোপের বাহিরে যে সকল আর্য ভাষাভাষী জাতি আছে তাহারা প্রোটো-নর্ডিক গোষ্ঠীর সম্পর্কিত।

প্রশ্ন উঠিতে পারে এশিয়া হইতে আগত য়ুরোপের গোলমুণ্ড গোষ্ঠীর জাতিগুলির স্থান

শব্দবিদ্যায় রমনের গবেষণা

[দ্বিতীয় পর্যায়]

শ্রীবিভূতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শব্দতরঙ্গের প্রতিফলনের জন্য প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হয়। প্রতিধ্বনি বড় দালানের মধ্যে বেশ স্পষ্ট শোনা যায়। দালানের মধ্যে কোনও শব্দ হ'লে দেয়াল, মেঝে, ভিতরের ছাদ থেকে সেই শব্দের প্রতিফলন হয়। লণ্ডনের সেণ্ট পল ক্যাথিড্রালের গ্যালারীতে শব্দের প্রতিফলনের এক আশ্চর্য রূপ ধরা পড়ে। এখানে গম্বুজের নীচে দেয়ালের পাশে কোন স্থানে খুব অল্প শব্দ হলেও, ঐ স্থানের যথাযথ বিপরীত দিকে সেই শব্দ বেশ শোনা যায়। কিন্তু এই গ্যালারীতে মধ্যবর্তী কোনও স্থানে সেই শব্দ একটুও শোনা যায় না।

১৯১৪ সালে লর্ড র‍্যালে বলেন, 'এই অবস্থা শব্দের প্রতিফলনের জন্য হয় না। শব্দ তরঙ্গের বিশেষরূপে গম্বুজের দেয়ালের সঙ্গে জড়িয়ে জড়িয়ে বিস্তৃত হওয়ার জন্য হয়। শব্দ তরঙ্গ বহিরাভিমুখে পরিচালিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গম্বুজের দেয়ালকে জড়িয়ে জড়িয়ে চলে এবং ঘুরে ঘুরে গোলার্ধের যথাযথ বিপরীত অংশে পৌঁছয়। দেয়ালগুলি গম্বুজাকৃতি হওয়ায়, শব্দ তরঙ্গ উপরের দিকে বিস্তৃত হয় না। ১৯২২ সালে রমন ও সাদারল্যাণ্ড সেণ্ট পল ক্যাথিড্রালে পরীক্ষা করেন ও র‍্যালের সিদ্ধান্ত যাচাই করেন। পরীক্ষায় তাঁ'রা দেখেন, র‍্যালের সিদ্ধান্ত বিশেষ একটি অবস্থায় অত্যন্ত উপযোগী। এই বিশেষ অবস্থাটি হলো, যখন শব্দ সোজাসুজি বিপরীত দিকে পরিচালিত না হ'য়ে গ্যালারীর দেয়ালের পাশাপাশি ট্যানজেণ্ট অভিমুখে পরিচালিত হয়। তাঁদের পরীক্ষা থেকে আরও জানা যায়, গ্যালারীর ব্যাসার্ধে ও ট্যানজেণ্টের অভিমুখে শব্দের তীব্রতার যে সাময়িক পরিবর্তন ঘটে, তার ব্যাখ্যা র‍্যালের সিদ্ধান্ত থেকে সম্ভব নয়। সেবাইন বলেন, 'গ্যালারীর ভিতরে ঢালু দেয়ালই শব্দতরঙ্গের এই অবস্থার বিশেষ উপযোগী। এই ঢালু দেয়াল গ্যালারীর সমতলে শব্দতরঙ্গ ধরে রাখে। শব্দতরঙ্গ এরূপে ধরে না রাখলে, গম্বুজের ছাদের ভিতর দিয়ে পালিয়ে যেতো এবং শ্রোতা কখনও শুনতে পেতো না।' রমন সেবাইনের এই

কোথায়? য়ুরোপীয় আর্যবাদের এই প্রকার ব্যাখ্যার ফলে দাঁড়ায় যে ইহাদের ও লম্বামুণ্ড ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠীর জাতিগুলির আর্য নামে কোন অধিকার নাই।

এই সকল আনুমানিক বিবরণের মধ্যে অনেক ফাঁক রহিয়াছে। পণ্ডিতগণ আপনাদের ধারণা ও অভিপ্রায় মত ব্যাখ্যা দিয়াছেন, কাহার কথা ঠিক, কাহার ব্যাখ্যা ভ্রান্ত এ বিচার নিরর্থক। পৃথিবীর অধিবাসীদিগের গোষ্ঠী বিভাগ ও বিভিন্ন গোষ্ঠীর সম্প্রসারণের অঞ্চল সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল। এই বিবরণের মধ্যে ভারতবর্ষের অধিবাসীর কথা বলা হয় নাই। ইহার পর তাহাদের কথা বলা হইবে।*

* মনুষ্য-গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ, শ্রেণীগুলির উৎপত্তি ও নামকরণ সম্বন্ধে মোটামুটি ডাঃ হেডনের (A. C. Haddon, SC.D., F.R.S.) অনুসরণ করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের অধিবাসীদের সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণের প্রচারিত মতবাদগুলির যে ধারাবাহিক আলোচনা করা হইবে বর্তমান প্রবন্ধ সেই আলোচনার ভূমিকা মাত্র।—লেখক।

মতবাদ সমর্থন ক'রে তাঁ'র নিজের পর্যবেক্ষণ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন-এর ৭ নং 'বুলেটিনে' প্রকাশ করেন। রমন পাঁচটি বিভিন্ন গ্যালারীতে পরিধি ও ব্যাসার্ধের নোডাল রেখা পর্যবেক্ষণ করেন এবং বলেন, ব্যাসের বিপরীত অংশে শব্দের তীব্রতা চরম হয়।

ছড়-টানা তার সম্বন্ধে রমনের গবেষণার কিছু পরিচয় পূর্বের প্রবন্ধে দেওয়া হ'য়েছে। যখন তারে ছড় টানা হয়, তার ছড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং যে পর্যন্ত তারের টান স্থির ঘর্ষণের বেশী না হয়, তার ছড়ের সঙ্গেই সঞ্চারিত হয়। তারের টান বেশী হলে ছড়ের সঙ্গে যোগ ছিন্ন হয়। এর পরে ছড়ের সঙ্গে সঙ্গে তারও যখন স্থির হয়ে আসে, তখন তারে আবার ছড় টানা হয়। ১৯১৪ সালে রমন প্রমাণ করেন ছড়ের সঙ্গে সঙ্গে তারও যথাযথ সঞ্চারিত হয়। তিনি বলেন, শব্দরূপে যে শক্তির বিকিরণ হয় ও ঘর্ষণের ফলে যে ক্ষয় হয়, তাকে পূরণের জন্য যে শক্তির ব্যয় হবে তা নির্ভর করবে কয়েকটি কার্যের উপর। সঞ্চরণের সময় তারের উপর ছড়ের জন্য যে কার্য সংঘটিত হয় তা'র পরিমাণ যখন যোগ ছিন্ন হবে তখন ছড়ের উপর তারের জন্য যে কার্য তা' থেকে বেশী। তারের যে কোন বিন্দুতে বেগ কম্পনের দুই অর্ধেই একবিধ অর্থাৎ সমান। এবং গতির রেখাচিত্র দু'টি সরল রেখায় প্রকাশিত হয়। এই রেখাচিত্রে তারের মধ্যবিন্দুতে সরল রেখা দু'টি সমান ঢালু।

ছড়ের চাপ এবং প্রস্থ সম্বন্ধেও রমন গবেষণা করেন। ছড়ের চাপ যদি বৃদ্ধি পায়, কিংবা এর বেগ হ্রাস পায়, তবে যে সময় পর্যন্ত তার ছড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে তা বেড়ে যাবে। রমন পরীক্ষা করে দেখেন, তারের প্রান্তে ছড় টেনে কম্পনের প্রাথমিক (fundamental) সৃষ্টি করতে যে চাপের প্রয়োজন, তা নোড থেকে ছড় টানা বিন্দুর দূরত্বের বর্গরাশির সঙ্গে হ্রাস পায়। এই কারণে বেহালায় সুরের তীব্রতা বৃদ্ধি করতে হলে ছড়ের বেগও বৃদ্ধি করতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের ব্রিজ-এর কাছে ছড় টানতে হয়।

হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎস ছড়-টানা তারের গতি সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। এই গবেষণা গভীরধর্মী। যে কোনও গভীর তত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য হলো, ছড়ের গতি ও তারে ছড় টানা বিন্দুর গতির মধ্যে যে সম্বন্ধ তাকে প্রকাশ করা। হেল্‌ম্‌হোলৎস বলেন, 'যে ব্যবস্থায় ছড়-টানা বিন্দুর গতি দুই পদের বক্রতায় প্রকাশিত হয়, সেখানে অগ্রগতির বেগ মনে হয়, ছড়ের বেগের সমান।' পরবর্তী গবেষণা থেকে জানা যায় এই অগ্রগতির বেগ ছড়ের বেগের 'হয়তো প্রায় সমান'। অর্থাৎ এই বেগের সমতার কোনও প্রমাণ পরীক্ষিত হয় নাই। যদিও প্রমাণের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে; কারণ, হেল্‌ম্‌হোলৎস-এর গবেষণা থেকে জানা গেছে, অনেক ক্ষেত্রেই ছড়-টানা বিন্দুর কম্পন-রেখা দুই পদের বক্রতায় প্রকাশিত হয়। অগ্রগতি ও পশ্চাৎগতির বেগের অনুপাত তারের ছড়-টানা বিন্দুর সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সম্পর্কের যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা হয় নাই।

রমন ছড়ের গতি ও ছড়ের সঙ্গে যুক্ত তারে ছড়-টানা বিন্দুর গতির এককালীন আলোকচিত্র গ্রহণের একটি সুন্দর ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। রমনের ব্যবস্থাটি ছিল এরূপ:- একটি লম্বা তার (ছড় টানবার জন্য) নেওয়া হয়। ধাতুর পাতে একটি ক্ষুদ্র স্লিট কেটে এই তারের পিছনে মুখোমুখি রাখা হয়। তারের সামনে একটি আর্ক-দীপ জ্বালান থাকে। আর্কের ধনাত্মক মেরু তারটিকে উপযুক্তরূপে আলোকিত করে। আলোকিত স্লিট-এর যতটা সম্ভব নিকটের তারের একটি বিন্দুতে ছড়-টানা হয়। ছড়ের মাঝখানে একটি পিন আড়াআড়ি ভাবে যুক্ত থাকে। আলোকচিত্র গ্রহণের যে ব্যবস্থা থাকে তাতে তারের সমান্তরালে একটি ফোটো-প্লেট একদিকে পরিচালিত হয়। এই গতির সঙ্গে সঙ্গে ছড়ে

সংযুক্ত পিনটির ছায়া আলোকিত স্লিট অতিক্রম করে চ'লে যায়। এই ভাবে ছড়ের গতি ও তারের ছড়-টানা বিন্দুর কম্পনের এককালীন আলোকচিত্র নেওয়া হয়। এই পরীক্ষা থেকে রমন প্রমাণ করেন, যে সকল ক্ষেত্রে ছড়-টানা বিন্দুর গতি দুই পদের বক্রতায় প্রকাশিত হয় সেখানে অগ্রগতির বেগ ছড়ের বেগের যথাযথ সমান। রমনের এই সিদ্ধান্ত পর্যাবৃত্ত-গতি সংস্থাপনের গতীয় তত্ত্বের নির্দেশের অনুরূপ।

রমন বলেন, 'হেল্‌ম্‌হোলৎস তারের গতির জন্য যে সূত্র উদ্ভাবন করেছেন এই গতির সংস্থাপনের ব্যাখ্যা তা থেকে সম্ভব নয় এবং তা'র গতীয় সূত্র অসম্পূর্ণ। অতিরিক্ত একটি রাশি এই সূত্রে যোগ ক'রলে গতির সংস্থাপনের ব্যাখ্যা হয়। এই সূত্রে তারে ছড়ের ঘর্ষণের জন্য গতির পরিবর্তন বিবেচনা করা হয় নাই।' হোল্‌ম্‌হোলৎস-এর ধারণা ছিল, 'প্রথমে ছড়ের জন্য তারের নিজের গতির দিকে দু'টি রেখায় বিক্ষেপ হয়। ছড়-টানা বিন্দুতে এই দুই সরল রেখা সূক্ষ্ম কোণে মিলিত হয়।' রমন বলেন, 'দু'টি সরল রেখা নয়, তিনটি সরল রেখা সূক্ষ্ম কোণে এসে মিলেছে। এর মধ্যে দু'টি সরল রেখা সকল ক্ষেত্রেই ছড়-টানা বিন্দুতে মিলিত হয়। এদের মিলিত কোণ সামান্য পর্যাবৃত্ত পরিবর্তনের অধীন। গতির সংস্থাপনের ব্যাখ্যার জন্য এই সামান্য পর্যাবৃত্ত পরিবর্তন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গতীয় সূত্রে কোণের পর্যাবৃত্ত পরিবর্তনের জন্য অতিরিক্ত একটি ক্ষুদ্র রাশি যুক্ত করলে অনেক অনিয়মের মীমাংসা হয়।'

হেলম্‌হোলৎস "কম্পন-অণুবীক্ষণ" নামে একটি যন্ত্রের সাহায্যে কয়েকটি সহজ অবস্থায় ছড় টানা তারের কম্পন-রেখা সমূহ পর্যবেক্ষণ করেন। এই পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি যে ব্যবস্থা করেন তা অত্যন্ত জটিল ও অনুপযোগী। রমন নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্রে বিভিন্ন অবস্থায় কম্পন-রেখার আলোকচিত্র গ্রহণের সহজ ব্যবস্থা করেন। আলোক ব্যবস্থার কনডেন্‌সারটি একটি আচ্ছাদনে অর্থাৎ টুপি দিয়ে ঢাকা হয়। এই টুপির মাঝখানে খাড়াভাবে একটি সরু স্লিট থাকে। ৮০ সেন্টিমিটার লম্বা ইস্পাতের তার ছড় টানবার জন্য নেওয়া হয়। এই তারটি কনডেন্‌সারের সামনে টুপির নিকটে স্লিটকে দ্বিখণ্ডিত করে আনুভূমিকে প্রসারিত থাকে। তড়িৎ-সংস্থাপিত ৬০ কম্পাঙ্কের একটি ফর্ক নেওয়া হয়। ফর্কটি খাড়াভাবে থাকে। ফর্কের একটি প্রং-এ অল্প ফোকাল দৈর্ঘ্যের (৭.৫ সেন্টিমিটার) একটি লেন্স নরম গালা দিয়ে যুক্ত করা হয়। এই লেন্সটি দূরের পর্দায় স্লিটের বর্ধিত প্রতিবিম্ব ফেলে। স্লিটের প্রতিবিম্বের মাঝামাঝি তারের ছায়া এসে পড়ে। স্লিটের মধ্যে তারের প্রতিবিম্ব এত বর্ধিত আকারের হয় যে সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের পক্ষে তা অত্যন্ত অনুপযোগী। ফর্কের কম্পাঙ্কও অল্প হতে হবে সুতরাং খুব সরু তার ব্যবহার করা চ'লবে না। খুব সরু তার এবং বেশী কম্পাঙ্কের ফর্ক ব্যবহার করলে কম্পনের বিস্তার এত অল্প হয় যে উপযোগী অভিক্ষেপণ সম্ভব নয়। এই সব বিবেচনা করে রমন আলোকিত স্লিটের ঠিক বিপরীত দিকের তারের অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ হাতুড়ি পিটিয়ে পাতলা পাতের মত করেন। স্লিটের সামনে এই ক্ষুদ্র অংশের তার ফিতার মত পাতলা হওয়ায় এর পাশাপাশি প্রতিবিম্ব পর্দার উপর খুব সূক্ষ্ম সরু রেখার মত দেখা যায়। তারের বিন্দুমাত্র স্থানের পরিবর্তনের জন্য তারের কম্পনের কোন পরিবর্তন হয় না। এখন তারে ছড় টেনে ও ফর্ককে কম্পনে প্রবৃত্ত করে হেল্‌ম্‌হোলৎস-এর "কম্পন-অণুবীক্ষণ"-এর অনুরূপ চিত্র পাওয়া যায়। রমন শেষে পর্দার বদলে ক্যামেরা ব্যবহার করে বিভিন্ন অবস্থায় কম্পন-রেখার আলোকচিত্র গ্রহণ করেন এবং এদের গাণিতিক ব্যাখ্যা দেন। এই সকল কম্পন রেখার সাহায্যে ছড়-টানা তারের বিভিন্ন গতীয় তত্ত্বের তিনি সুন্দর মীমাংসা করেন।

রমন বিশেষভাবে ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালে যে সকল গবেষণা করেন তা থেকেই ছড়-টানা তারের গাণিতিক সিদ্ধান্তের গোড়াপত্তন হয়েছে। তিনি ছড়-টানা তারের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত বহুচিত্র-সম্বলিত ১৬০ পৃষ্ঠার জার্মানীর Handbuch der Physik-এর একটি পুস্তিকায় প্রকাশ করেন।

১৯১৮ সালে রমন পিয়ানোর তারে শক্ত হাতুড়ির আঘাতের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করেন। হাতুড়ির আহত বিন্দু যখন তারের উপর ক্রমে সরে যায়, তখন আঘাতের স্থায়িত্ব কিরূপ হবে তা' তিনি পর্যবেক্ষণ করেন। আহত তারের কম্পন সম্বন্ধে হেল্‌ম্‌হোলৎস্‌ ও কাউফ্‌ম্যান গবেষণা করেছেন। কাউফ্‌ম্যান নানা অনুমানের উপর তারে আহত বিন্দুর অবস্থা, সংযোগের সময় ও হাতুড়ির অবস্থা নিয়ে এক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। রমনের উদ্দেশ্য ছিল কাউফম্যানের সিদ্ধান্ত যাচাই করা। রমন পরীক্ষায় দেখেন কাউফম্যানের সিদ্ধান্ত আহত স্থানের দূরত্ব অল্প হ'লে সত্য হয়। তিনি এক নতুন সিদ্ধান্তের অবতারণা করেন। এই সিদ্ধান্তে রমন বিবেচনা করেন 'যে গতির সৃষ্টি হয় তা তারের বিস্বর কম্পনের লব্ধি এবং আহত বিন্দুতে তারের একটা ভর আছে, যে ভর হাতুড়ির ভরের সমান।' রমনের সিদ্ধান্ত যে কোনও দূরত্বেই প্রযোজ্য। ১৯৩০ সালে লণ্ডনের Proceedings of the Royal Society তে এই গবেষণা প্রকাশিত হয়।

১৯৩৪ সালে রমন ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র তবলা ও মৃদঙ্গের পর্দার কম্পন সম্বন্ধে গবেষণা করেন। তবলার বায়ুঘর একদিক পর্দায় ঢাকা। মৃদঙ্গের দু'দিকই পর্দায় ঢাকা। যুরোপীয় বাদ্যযন্ত্র দামামার সঙ্গে এদের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। অবশ্য বিভিন্নতাও যথেষ্ট রয়েছে। তবলা ও মৃদঙ্গের পর্দার মধ্যভাগে শক্ত পেষ্টের পুরু স্তর আছে। এবং এই যন্ত্রগুলিতে হারমোনিক-বহুল স্বরের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যুরোপীয় বাদ্যযন্ত্রে এমন হয় না। এই সকল বাদ্যযন্ত্রে কম্পনের বিভিন্ন অবস্থা এবং নোডাল রেখার স্থান নির্দেশ সম্বন্ধ রমন পরীক্ষা করেন।

রমনের বিশেষভাবে ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালে প্রকাশিত গবেষণার ফলেই ছড়-টানা তারের গাণিতিক তত্ত্বের গোড়াপত্তন হয়েছে। ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সালের 'Proceedings of the Indian Academy of Science'-এ রমন 'শব্দোত্তর তরঙ্গ' (Supersonic Waves) সম্বন্ধে এক গাণিতিক তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তার বিশদ আলোচনা সম্ভব হ'লো না।

অধ্যাপক রমন শব্দবিদ্যার গবেষণায় ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ডক্টর রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডক্টর টি. কে. চিন্ময়ানন্দম্‌, ডক্টর পঞ্চানন দাশ, এবং বিশেষভাবে শ্রীযুক্ত আশু দে-র সহযোগিতা পেয়েছেন। রমনের গবেষণায় এদের অংশ বিশেষ স্মরণীয়। ১৮৭৬ সালে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য কলকাতায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেশন অফ সায়েন্স-এর প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমন ভারত গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগে চাকরী নিয়ে কলকাতায় আসেন এবং ১৯০৮ সাল থেকে এই গবেষণাগারে গবেষণা আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং তারই অনুপ্রেরণায় চাকরী ছেড়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিদ্যায় পালিত অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন (১৯১৭ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত)। প্রথম দিকে রমন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে শব্দবিদ্যায় গবেষণা করেন। ১৯১৯ সাল থেকে এই গবেষণাগারেই "আলোকের প্রতিকিরণ" সম্বন্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং ১৯২৮ সালে "রমন পরিণাম" প্রকাশিত হয়।*

*এই প্রবন্ধের প্রথম অংশ গত সংখ্যা (ফেব্রুয়ারী) 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'এ প্রকাশিত হয়েছে।

পৃথিবীর বয়স

শ্রীগিরিজাভূষণ মিত্র

পৃথিবীর বয়স কত তা নিয়ে সত্যকারের আলোচনা শুরু হয়েছে খুব বেশী দিন নয়। পৃথিবীর সন্তান আমরা—পৃথিবী আমাদের জননী। মায়ের বয়স নিয়ে ছেলেদের মাথা ঘামানোর দরকার পড়ে না। পৃথিবীর বয়স সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা তাই প্রাচীন কালের বিদ্বান ব্যক্তিরা করতেন না। যদিই বা কারো মাথায় ঢুকত এ প্রসঙ্গ, তিনি বা তাঁরা পৃথিবীকে অতিবৃদ্ধা অথচ চির-যৌবনা বলে কল্পনা করতেন। কথায় বলে পৃথিবীর বয়সের গাছপাথর নেই। অর্থাৎ গাছ এবং পাথরের বয়স অনন্ত সংখ্যায় গণনা করা যায়। সুতরাং পৃথিবীর বয়স যে সীমাহীন কল্পনার শেষ প্রান্তে এসে অনন্তে লীন হবার উপক্রম করবে তার আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু কি করে বুঝব পৃথিবীর বয়স কত? চিরযৌবনা পৃথিবীর অনন্ত লাবণ্যের দীপ্তি যে বিহ্বল করা—কি করে আন্দাজ করব তার বয়স? কিন্তু এই বেখাড়া যুগের অতি কৌতূহলী বৈজ্ঞানিক, আদুরে ছেলের মত স্নো পাউডারের অন্তরালে বলীরেখার সন্ধান করে—গয়নাগুলায় কতখানি সোনা ক্ষয়ে গেছে তাই থেকে হিসাব করে কতকাল আগেকার সেগুলা। এমনি সব টুকিটাকি প্রমাণ থেকে আন্দাজ করবার চেষ্টা করে পৃথিবীর সত্যকারের বয়স।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় বুঝি পৃথিবীর রূপ অপরিবর্ত্তনীয়। সেই পাহাড় তেমনি দাঁড়িয়ে, সেই সমুদ্র তেমনি গম্ভীর, সেই নদী তেমনি উজ্জ্বল। এক একটা অস্থিরমতি নদী খেয়াল খুসী মত দিক পরিবর্ত্তন করে বটে—তবে তা ছাড়া কয়েক পুরুষের মধ্যে একটা দেশের ভৌগোলিক সংস্থার খুব বেশী পরিবর্ত্তন হয় না। পৃথিবীর বুকে পরিবর্ত্তন আসে অতি ধীরে—প্রায় অলক্ষিতে। (Wegener) ভেগেনারের মতে সমস্ত ভূভাগ একদিন জোড়া ছিল। একদিন ছিল তা এক বিরাট দ্বীপের আকারে। তার পর ধীরে ধীরে স্থলভাগ বিদীর্ণ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে মহাদেশগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। এমনি করে গড়ে উঠেছে পৃথিবীর বর্ত্তমান রূপ। ভাঙ্গা গড়ার বিপুল খেলা চলেছে প্রতিনিয়ত—কিন্তু আমরা তা টের পাচ্ছি না। নদী বয়ে যাবার মুখে সামনের মাটি ধুয়ে নিয়ে যায়। তার স্রোতোবেগ যখন ক্ষান্ত হয় তখন পলি জমতে থাকে। এমনি করে এক অংশের মাটি ক্ষয়ে যায়, অন্য অংশে নতুন ডাঙ্গার সৃষ্টি হয়। সমুদ্রও কিছু স্থলভাগ আত্মসাৎ করে। প্রতি বছর নরফোক আর সাফোকের ৩৬ একর জমি সমুদ্রগর্ভে লীন হয়। এই গতিতে এই কাউন্টি দুটি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হবে ৬০,০০০ বছরে। এমনিতর ঘটনা যে কোন ভূতাত্ত্বিক যুগে একাধিকবার ঘটতে পারে। সুতরাং এক একটা যুগের স্থায়িত্বকাল কয়েক লক্ষ বছর হবে। আবার দেখা গেছে নায়াগ্রা জলপ্রপাতে বছরে এক ফুট করে ক্ষয় হয়। তাই এই জলপ্রপাতের আধার স্বরূপ ৭ মাইল দীর্ঘ গহ্বরটি সৃষ্টি করতে ৩৬,০০০ বছর লেগেছে। এই গহ্বরের খাড়া দেওয়ালে ক্ষয়ের চিহ্নমাত্র নেই। স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় গহ্বরটি অত্যন্ত হাল আমলের। যদি ধরে নেওয়া যায় এক একটা উপত্যকা তৈরী হয় এমনিতর ক্ষয়ের ফলে তবে পূর্ণাঙ্গ একটি উপত্যকা গড়তে এর একশত গুণ বেশী সময় লাগবে।

এইসব হিসাব থেকে কিন্তু পৃথিবীর বয়সের সঠিক পরিমাণ পাওয়া যায় না। শুধু একটা আন্দাজ পাওয়া যায় মাত্র। কিছুটা সঠিক হিসাব পাওয়া যায় ভূমির ক্ষয়হার থেকে। নদীর স্রোতের সাথে কতটা মাটি ভেসে যায় আর তার ফলে নদীর তল কতটা ক্ষয়ে যায় তাই থেকেই এই হিসাব পাওয়া যায়। দুটি উদাহরণ দেওয়া হল :—

নদী	বছরের ক্ষয় × ১০^৬ টন	অববাহিকার আয়তন × ১০^৬ বর্গমাইল	১ ফুট অপসরণের সময় বছর
অরেঞ্জ এবং ভাল	১৩	·০৩৫	১৫০০
মিসিসিপি	৭৩০	১·২৬	৩০০০

উপরের হারে দক্ষিণ আফ্রিকার ৩০০০ ফুট উচ্চ উপত্যকা ক্ষয়ীভূত করতে ৯০ লক্ষ থেকে সাড়ে চার কোটি বছর লাগে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু আরও বেশী সময় লাগবে, কারণ ক্ষয়ের ফলে উপত্যকার ভার কমে গেলে তার উচ্চতা বেড়ে যায়।

নদীধোয়া মাটি সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। ফলে ধীরে ধীরে নূতন ভূভাগ সৃষ্টি হয়। এই ভূকরণের হার প্রায় ২০০০ বছরে এক ফুট। কেম্ব্রিয়ান যুগ থেকে এ পর্য্যন্ত যতটা পলি পড়েছে তার উচ্চতা প্রায় ৩,৬০,০০০ ফুট। এতটা পলি পড়তে লেগেছে অন্ততঃ ৭০ কোটি বছর।

এই হিসাবও কিন্তু সম্পূর্ণ সঠিক নয়। অনেক কিছু আন্দাজের উপর ধরা হয়েছে। তবে এই হিসাবের সুবিধা হচ্ছে এই যে অন্য উপায়ে পাওয়া পৃথিবীর বয়স ঠিক হচ্ছে কিনা তা মিলিয়ে দেখা যায়।

অন্য উপায়ের কথায় মনে পড়ে লর্ড কেলভিনের নাম। পৃথিবীর বর্ত্তমান তাপ পরিমাণ করে তিনি পৃথিবীর বয়স নির্দ্ধারণ করেছেন। তাঁর উপপত্তির কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় পৃথিবীর জন্মের কথা। কান্ট আর লাপ্লাসের মতে পৃথিবী আর অন্যান্য গ্রহের জন্ম হয়েছিল এক সুদূর অতীতে নীহারিকার বক্ষ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে। নীহারিকার কেন্দ্রপদার্থ রূপায়িত হল সূর্য্যে; পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল হয়ে প্রথমে তরল পরে কঠিন আকার ধারণ করল, তারপর ধীরে ধীরে প্রাণের সঞ্চার হল। ভূতাত্ত্বিক সময়কে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়, প্রথমে ছিল (Azoic) এ্যাজোয়িক বা নিষ্প্রাণ যুগ। তখনো প্রাণের সঞ্চার হয় নি। তারপর এল (Paleozoic) প্যালিওজোয়িক বা জীবাণু যুগ। তখন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণের লীলা, প্রাণের প্রথম স্পন্দন, তারপর (Mesozoic) মেসোজোয়িক বা অতিকায় সরীসৃপ যুগ আর (Kainozoic) কোনোজোয়িক বা বর্ত্তমান যুগ।

লর্ড কেলভিন দেখলেন যে ভূগর্ভে ১০০ মিটার নামলে ২° সেন্টিগ্রেড তাপ বেড়ে যায়। ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে আছে উত্তপ্ত লোহা আর নিকেল—তার তাপ প্রায় ৩৯০০° সেন্টিগ্রেড। লর্ড কেলভিন ধরে নিলেন পৃথিবীর তাপ আসিতে ছিল ৩৯০০° সেন্টিগ্রেড। এখন হয়েছে ০° সেন্টিগ্রেড। লর্ড কেলভিন অঙ্ক কষে দেখালেন পৃথিবীর পক্ষে ৩৯০০° থেকে ০° সেন্টিগ্রেডে শীতল হতে লাগে প্রায় ১০ কোটি বছর। কিন্তু আগেই দেখা গিয়েছে পৃথিবীর বয়স অন্ততঃ পক্ষে ৭০ কোটি বছর সুতরাং কোথাও হিসাবের গণ্ডগোল হয়েছে।

লর্ড কেলভিনের হিসাবে যে গণ্ডগোল হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল তেজস্ক্রিয় (radioactive) পদার্থের আবিষ্কারের পর। তেজস্ক্রিয় পদার্থ নূতন করে উত্তাপ সৃষ্টি করে। তাই পৃথিবীর শীতলীভবনের হার লর্ড কেলভিন যা ধরেছেন তার চেয়ে অনেক কম। যদি জানতে পারা যায় পৃথিবীতে সবশুদ্ধ কতটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে, তবে তাই থেকে হিসাব করে পৃথিবীর শীতলীভবনের হার বার করা যায়। কিন্তু মুস্কিল এই যে কি করে জানা যাবে কতটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ আছে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ তো সর্ব্বত্র সমভাবে বিতরিত নয়। পৃথিবীর উপত্বকে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ অন্তস্থলের চাইতে অনেক বেশী।

তবুও তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকেই সুনিশ্চিতরূপে পৃথিবীর বয়স নিরূপণ করা সম্ভব। দেখা গিয়েছে যে সব খনিজে ইউরেনিয়ম আর থোরিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থের আধিক্য তাদের মধ্যে বেশ কিছু পরিমাণে হিলীয়ম গ্যাস থাকে। প্রাচীনতর যুগের খনিজে বেশী পরিমাণে হিলীয়ম থাকে। এই সব খনিজগুলি অনেক সময় দৃঢ়সম্বদ্ধ আর জল বাতাসের সংস্পর্শবিহীন। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় বাইরে থেকে এই হিলীয়ম আসে নি। তবে এল কোথা হতে ?

প্রত্যেকটি পরমাণু যেন এক একটা সৌর-মণ্ডল। সূর্য্যকে কেন্দ্র করে যেমন গ্রহগুলি আবর্ত্তিত হয়, তেমনি একটি নিউক্লিয়সকে (nucleus) কেন্দ্র করে কয়েকটি ইলেকট্রন আবর্ত্তিত হয়। এই নিউক্লিয়স আর ইলেকট্রনের সমবায় হল পরমাণু। নিউক্লিয়স আবার প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদির সমষ্টি। হাইড্রোজেন অণুর গঠন খুব সহজ, একটি মাত্র প্রোটনকে কেন্দ্র করে একটি মাত্র ইলেকট্রন আবর্ত্তিত হচ্ছে। হিলীয়মের নিউক্লিয়সে আছে চারটি প্রোটন। পরমাণুর নিউক্লিয়সের গঠন যখন খুব জটিল হয় তখন ঐ নিউক্লিয়স বিদীর্ণ হয় এবং পরমাণুটি সহজতর রূপ নেয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিউক্লিয়সের গঠন খুব জটিল। তাই ঐ নিউক্লিয়স হতে হিলীয়ম পরমাণু, ইলেকট্রন ও অত্যন্ত হ্রস্ব-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চুম্বক-বৈদ্যুতিক তরঙ্গ—আলফা, বিটা ও গামা রশ্মির আকারে বিকীর্ণ হয়। এমনি করে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণু বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে অবশেষে সীসায় পরিণত হয়। সুতরাং তেজস্ক্রিয় পদার্থ শেষ পর্য্যন্ত সীসা ও হিলীয়মে পরিণত হয়। এই হল ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম-সমৃদ্ধ খনিজে হিলীয়মের আবির্ভাবের কারণ। নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ থোরিয়ম বা ইউরেনিয়ম কতটা হিলীয়ম উৎপন্ন করতে পারে তা সহজেই পরীক্ষা করে জানতে পারা যায়। সুতরাং কিছু পরিমাণ খনিজে কতটুকু ইউরেনিয়ম আর কতটুকু হিলীয়ম আছে তা জানতে পারলেই ঐ হিলীয়ম টুকু জমতে কত বছর লেগেছে তা বোঝা যাবে।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি। সিংহলের খনিজ থোরিয়ানাইটে শতকরা ৬৮ ভাগ থোরিয়ম ও ১১ ভাগ ইউরেনিয়ম আছে। এক গ্রাম থোরিয়ানাইট হতে $৮'৯$ ঘন সেন্টিমিটার হিলীয়ম পাওয়া যায়। এক গ্রাম ইউরেনিয়ম এক সেকেণ্ডে $৯'৭ \times ১০^{৪}$টি আলফা কণিকা বিকীর্ণ করে অর্থাৎ বছরে $১১'০ \times ১০^{-৫}$ ঘন মিলিমিটার হিলীয়ম গ্যাস উৎপন্ন করে। এক গ্রাম থোরিয়াম সেকেণ্ডে $২'৭ \times ১০^{৪}$টি আলফা কণিকা বিকীর্ণ করে, অর্থাৎ বছরে $৩'১ \times ১০^{-৫}$ ঘন মিলিমিটার হিলীয়ম উৎপন্ন করে।

সুতরাং একগ্রাম থোরিয়ানাইট বছরে $(১১ \times '১১ + ৩'১ \times '৬৮)\ ১০^{-৫}$ অর্থাৎ $৩'৩ \times ১০^{-৫}$ ঘন মিলিমিটার হিলীয়ম উৎপন্ন করে, তাই $৮'৯$ ঘন সেন্টিমিটার হিলীয়ম উৎপন্ন করতে লাগবে $\frac{৮'৯ \times ১০^{৩}}{৩'৩ \times ১০^{-৫}} = ২'৭ \times ১০^{৮}$ বছর অর্থাৎ ২৭ কোটি বছর, অতএব থোরিয়ানাইটের বয়স ২৭ কোটি বছর এবং পৃথিবীর বয়স তার চেয়েও বেশী।

কিন্তু হিলীয়মের পরিমাণ থেকেও পৃথিবীর বয়স সম্পূর্ণ সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায় না, কারণ হিলীয়ম যে সবটাই জমে থাকবে এমন কোন কথা নেই। উত্তর ক্যারোলিনার ইউরিয়ানাইট নামক খনিজে শতকরা ৮০ ভাগ ইউরেনিয়ম ও ৪ ভাগ সীসা আছে। এই পরিমাণ সীসা উৎপন্ন হতে প্রায় ২৩ কোটি বছর লাগে। এই সময়ে একগ্রাম খনিজ সাধারণ তাপ ও চাপে ১'৮ ঘন সেন্টিমিটার হিলীয়ম উৎপন্ন হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাওয়া গিয়েছে '১ ঘন সেন্টিমিটার হিলীয়ম। সমস্ত হিলীয়ম টুকুই যদি থেকে থাকে তবে এই সঙ্কোচনের ফলে তার চাপ হবে বায়ুমণ্ডলীর চাপের আঠার গুণ। এতটা চাপ সহ্য করবার ক্ষমতা এই খনিজের নেই। সুতরাং খনিজে ফাটল ধরবে

এবং হিলীয়ম নিষ্ক্রান্ত হবে। প্রকৃতপক্ষে দেখা গিয়েছে অধিকাংশ তেজস্ক্রিয় পদার্থসমৃদ্ধ খনিজে বড় বড় ফাটল থাকে। এই ফাটলের মধ্য দিয়ে জল ঢুকে কিছু পরিমাণ সীসা ধুয়ে নিয়ে যায়। ফলে সীসার পরিমাণ থেকেও যে খনিজের বয়স নিখুঁতরূপে নিরূপণ করা যাবে তার উপায় থাকে না। আবার ইউরেনিয়মের সঙ্গে গ্যালেনা নামক সীসকসমৃদ্ধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে, সুতরাং খনিজের সীসা ইউরেনিয়াম নিষ্ক্রান্ত না বাইরের তা বোঝবার উপায় থাকে না। বেলজিয়ান কঙ্গোর 'কাটাঙ্গা নামে জায়গায় কালো আর হলদে এই দুই প্রকারের পিচব্লেণ্ড পাওয়া যায়। পিচব্লেণ্ড ইউরেনিয়ম সমৃদ্ধ। এই খনিজে সীসার পরিমাণ থেকে এর বয়স নিরূপণ করে পাওয়া গিয়েছে কালো পিচব্লেণ্ডের বয়স ৫৮ কোটি বছর আর হলদে পিচব্লেণ্ডের বয়স ৯৭ কোটি বছর। কিন্তু এই দুই প্রকারের পিচব্লেণ্ড যেরকম অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশ্রিত থাকে তাতে সর্ব্বদাই মনে হয় এরা সমসাময়িক। সুতরাং গণনায় নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে।

কিন্তু এই ভুল সংশোধন করবার উপায়ও আছে। অধিকাংশ মৌলিক পদার্থের মত সীসারও কয়েকটি আইসোটোপ (Isotope) আছে। অর্থাৎ সীসার সবগুলি পরমাণুর ওজন সমান নয়, ভিন্ন ভিন্ন ওজনের পরমাণুযুক্ত সীসা সীসার এক একটি আইসোটোপ। অ্যাস্টনের "ম্যাস স্পেক্‌ট্রোগ্রাফ" নামক যন্ত্রের দ্বারা বিভিন্ন ওজনের পরমাণুর অনুপাত বার করা যায়। দেখা গিয়েছে প্রত্যেকটি পরমাণুর ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের কয়েকগুণ বেশী। একটি পরমাণুর ওজনকে একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের দ্বারা ভাগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তার নাম "ভারসংখ্যা" বা mass number। সীসার চারটি আইসোটোপ আছে। তাদের ভারসংখ্যা যথাক্রমে ২০৪, ২০৬, ২০৭ ও ২০৮। থোরিয়ম পরমাণুর ভারসংখ্যা ২৩২, থোরিয়ম পরমাণু থেকে ছয়টি আলফা কণিকা অর্থাৎ হিলীয়ম পরমাণু নিষ্ক্রান্ত হয়ে সীসা উৎপন্ন হয়। হিলীয়ম পরমাণুর ভারসংখ্যা ৪। সুতরাং থোরিয়াম-উদ্ভূত সীসার ভারসংখ্যা হবে ২৩২ − ৬ × ৪ = ২০৮। ইউরেনিয়মের দুটি আইসোটোপ আছে। একটির ভারসংখ্যা ২৩৮, অপরটির ২৩৫। প্রথমটি থেকে ৮টি হিলীয়ম পরমাণু নিষ্ক্রান্ত হয়, অন্যটি থেকে ৭টি। ফলে ২০৬ ও ২০৭ ভারসংখ্যার সীসার জন্ম হয়। নীচের চিত্রে এইগুলি বোঝান হল।

চিত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ২০৪ ভারসংখ্যার সীসা তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে উদ্ভূত হয় না। সুতরাং কাটাঙ্গা পিচব্লেণ্ডের বিশ্লেষণে যে অসুবিধা হয়েছিল তা দূর হল। অর্থাৎ বোঝা গেল কতটা সীসা তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে এসেছে, আর কতটা এমনিই ছিল। আবার খনিজে যদি থোরিয়ম না থাকে তবে ২০৮ ভারসংখ্যায় সীসাও বাইরে থেকে এসেছে।
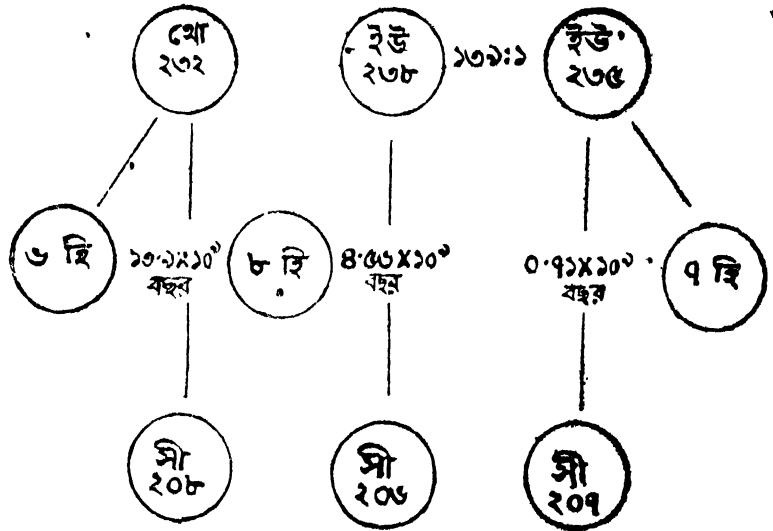
ইউরেনিয়মের দুইটি আইসোটোপের ক্ষয় হয় বিভিন্ন হারে। ২৩৮ ভারসংখ্যার পরমাণুগুলির অর্দ্ধেক ক্ষয় হতে লাগে ৪·৫৬ × ১০⁸ বছর। ২৩৫ ভারসংখ্যার পরমাণুর লাগে ০·৭১ × ১০⁸ বছর। সুতরাং এই দুটি আইসোটোপের অনুপাত যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। বর্ত্তমানে ইউরেনিয়মের ১৪০ ভাগের এক ভাগ ইউরেনিয়ম-২৩৫। ১০ কোটি বছর আগে ছিল ১২৯ ভাগে এক, ১০০ কোটি বছর আগে ছিল ৬২ ভাগে এক। সুতরাং যুগে যুগে ২০৭ আর ২০৬ ভারসংখ্যার সীসার অনুপাতও পরিবর্ত্তিত হয়েছে। বর্ত্তমানে এই অনুপাত ০·০৪৬, একশ' কোটি বছর আগে ছিল
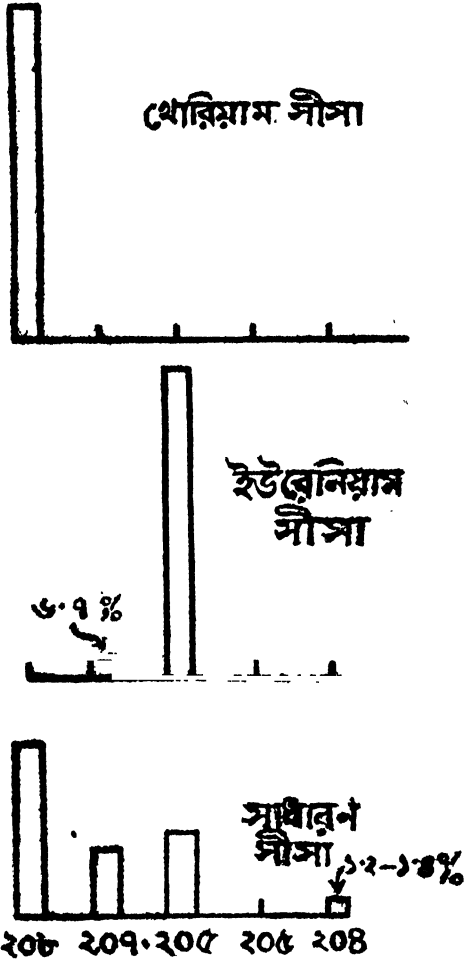
০·১৫৪। যে খনিজের জন্ম হয়েছিল ১০০ কোটি বছর আগে, তার থেকে ১০০ কোটি বছর ধরেই দুই প্রকারের সীসা উৎপন্ন হয়েছে পরিবর্ত্তনশীল অনুপাতে। বর্ত্তমানে এই খনিজে প্রাপ্ত সীসার অনুপাত ১০০ কোটি বছরের বিভিন্ন অনুপাতের গড়। বর্ত্তমানের অনুপাত ০·০৭২। সুতরাং খনিজে প্রাপ্ত সীসায় ২০৭ সীসার অনুপাত থেকে খনিজের বয়স নির্দ্ধারণ করা যায়।

অতএব রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও আইসোটোপ নির্দ্ধারণ দিয়ে খনিজের বয়স নিরূপণ করবার উপায় তিনটি :—

(১) থোরিয়ম/২০৮ সীসার অনুপাত থেকে

(২) ইউরেনিয়ম/২০৬ সীসার অনুপাত থেকে

(৩) ২০৭/২০৬ সীসার অনুপাত থেকে।

অবশ্য খুব কম খনিজই আছে যার উপর তিনটি নিয়মই প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু যা আছে তা থেকে খুব আশাপ্রদ ফল পাওয়া গিয়েছে। গ্ল্যাস্টোন-বেরী, কনেকটিকাট থেকে পাওয়া শেষ ডিভনিয়ান যুগের ইউরেনাইটে আছে শতকরা ৬·৯১ ভাগ ইউরেনিয়ম, ৩·০৫ ভাগ থোরিয়ম, ০·৩১৪ ভাগ সীসা। এই সীসায় ২০৪, ২০৬, ২০৭, ২০৮ আইসোটোপের অনুপাত ০·১৬৭ : ১০০ : ৭·৬০ : ২১·৩। এর থেকে বোঝা যায় ৯% সাধারণ সীসা, ১২% থোরিয়ম ক্ষয়ের ফলে পাওয়া, ৭৫% ইউরেনিয়ম-২৩৮ থেকে পাওয়া এবং ৪% ইউরেনিয়ম-২৩৫ থেকে পাওয়া। এই খনিজের বয়স পাওয়া গিয়েছে :

(১) থোরিয়ম থেকে—২৬·৬ কোটি বছর

(২) ইউরেনিয়ম থেকে—২৫·৩ কোটি বছর

(৩) ২০৬/২০৭ সীসা থেকে—২৮০ কোটি বছর

এই তিনটি ফলের মধ্যে বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য রয়েছে। বিভিন্ন খনিজের বয়সের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

প্রাপ্তিস্থান	খনিজের নাম	ভূতাত্ত্বিক সময়	বয়স কোটি বছর
উড্‌সমাইন, কলোরাডো	পিচব্লেণ্ড	উর্দ্ধ ক্রিটেসাস	৫·৭
গালহোগেন, সুইডেন	কোম	উর্দ্ধ কেমব্রিয়ান	৭৭
প্যারী সাউণ্ড	ইউরিয়ানাইট	—	১০০
হুরোন ক্লেস	মোনাজাইট	—	৩১৮

কাজেই দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর বয়স অন্ততঃ ৩০০ কোটি বছর তো হবেই। এখন পর্য্যন্ত এমন কোন খনিজ পাওয়া যায় নি যার বয়স এর চেয়ে বেশী। অতএব আমরা মোটামুটি ভাবে ধরে নিতে পারি যে পৃথিবীর বয়স প্রায় ৩০০ কোটি বছর।

নীহারিকার কথা

শ্রীনলিনীগোপাল রায়

সৃষ্টির মহাপ্রতীক্ষায় সমস্ত বিশ্ব নিস্পন্দ—যেন যোগমগ্ন। হঠাৎ সমুদ্র চঞ্চল হ'লো। দিগন্তবিসারী পরমাণুর পারাবার কেঁপে উঠলো। অনন্ত আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো সৃষ্টির মহা আয়োজন। নিস্পন্দ নিষ্প্রাণ বিশ্বে প্রাণের সাড়া পড়ে গেল। সীমাহীন শূন্যের অন্তরলোক ভ'রে উঠলো বিশালকায় জ্বলন্ত বাষ্পের কুণ্ডলীতে;—প্রচণ্ড তাদের গতি।

সৃষ্টির আদিপর্ব্বে ছিল ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বাষ্পসমুদ্র—যাকে বৈজ্ঞানিক বলেছেন আদি নীহারিকা বা Primeval chaos। কোন্ বিধানে সেই বাষ্প-সিন্ধুতে সংক্ষোভ দেখা দিল, যার ফলে সতীদেহের মত আদি জননীর দেহ বহুধা হ'য়ে ছড়িয়ে পড়লো· বিশ্বের চারিদিকে? এক চাহিলেন বহু হইতে। অন্তরে যে কথা বলার ছিল কিসে যেন সমস্ত ব্যাহত হ'য়ে শুধু দেহের কাঁপনে তা বহুধা হ'য়ে ভেঙে পড়লো।

বৈজ্ঞানিক হিসাবে গ্যাসের অন্তরে কোথাও কোন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'লেই কতকগুলি পরমাণু এত কাছাকাছি এসে পড়ে যে তাদের আণবিক আকর্ষণ বিকর্ষণের মাত্রা জয় ক'রে নিজেদের এক গোষ্ঠী-ভুক্ত ক'রে নেয়। ক্ষমতার লোভ অপরাজেয়। তাই এই পরমাণু-গোষ্ঠী আশেপাশের সমস্ত পর-মাণুকে দখল করে' আপন গোষ্ঠী বাড়িয়ে তোলে। সংহত হবার এই প্রণালীকে বৈজ্ঞানিক বলেন—সংহতি বা condensation। বিশ্ব-রাজ্যের প্রচার বিভাগ বড় সজাগ ও সক্রিয়। এর কোথাও কোন সংক্ষোভ হ'লেই তার বার্ত্তা ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। অরফিউসের বাঁশীর সুরে যে কেবল বনের পশুই থমকে দাঁড়িয়েছিল, তা নয়। সুদূর নীহারিকা-লোকেও তার সুর বেজে উঠেছিল। হয়ত বা চলার পথে নক্ষত্ররাজিও চমকে উঠেছিল।

Jeans বলেছেন, "Each time the child throws its toy out of its baby-carriage, it disturbs the motion of every star in the universe."

"ধনীর হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি"—এর দৃষ্টান্ত শুধু মাটীর পৃথিবীরই একচেটে নয়। আদি সৃষ্টির সহজাত এই প্রবৃত্তি। সুদূর নীহা-রিকালোকের ইহা দান। মাটীর ছেলেরা কেবল সেই দানেরই উত্তরাধিকারী। এই গ্যাসের কুণ্ডলী তার আশেপাশের ছোট ছোট কুণ্ডলীদের আত্মসাৎ ক'রে নিজের কলেবর বাড়িয়ে চলে। এমনি ক'রে মহাশূন্য জুড়ে জায়গায় জায়গায় বিশালকায় গ্যাস-মেঘের সৃষ্টি হলো। এই মেঘেরই বৈজ্ঞানিক নাম নীহারিকা বা Nebula।

বিজ্ঞান তার সৃষ্টির পর্ব্ব সুরু করেছে আদি নীহারিকা বা Primeval chaos থেকে। তখন অণুপরমাণুর প্রথম সৃষ্টি শেষ হ'য়ে গেছে। কবে কোথায় এই অণুপরমাণুর প্রথম সৃষ্টি হ'লো সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানের কোন সঠিক জবাব নাই।

"In some way matter which had not previously existed, came, or was brought into being." এই রকমের ঘোরাল তাদের জবাব। কোন কোন বিজ্ঞানী বলেছেন, অনধিক $১·৩ \times ১০^{-১৩}$ সেমি দৈর্ঘ্যের বিকিরণ (radiation) যদি বিশ্বের অন্তরে বিক্ষিপ্ত হ'তে থাকে তাহলে এই শক্তি (energy) ভেঙে ভেঙে ইলেকট্রন ও প্রোটন তৈ'রী হ'তে পারে ও

তাদের মিলনে পরমাণুও হতে পারে। কিন্তু এই বিকিরণ-শক্তির (radiant energy) সৃষ্টিরই বা উৎস কোথায়? কোন অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে অবিরল ধারায় এই শক্তি বিশ্বের গহ্বরে বিকীর্ণ হ'তে পারে, যার থেকে অপরিমেয় এই বিশ্ববস্তুর উদ্ভব হয়েছে? এইখানে বিজ্ঞান সংশয়সঙ্কুল। কারণ দৈবের আশ্রয় ছাড়া ঠিকমত জবাব পাওয়া যাচ্ছে না।

Jeans বলেছেন, "If we want a concrete picture of such a creation, we may think of the finger of God agitating the ether." অর্থাৎ ইথার তরঙ্গে ঢেউ খেলিয়ে এই রকমের বিকিরণ-শক্তির সৃষ্টি বিজ্ঞানসম্মত।

রূপ-বৈচিত্র্য বিহীন আদি নীহারিকা থেকে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো নীহারিকার দল জ্বলন্ত গ্যাস বা নক্ষত্রপুঞ্জের অতিকায় সংহতিরূপে। সৃষ্টির অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে তারা বিশ্বময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো প্রচণ্ড বেগে।

কালের তুহিনস্পর্শে তাদের যৌবনের তেজ কমে এলো। দেহের রেখায় রেখায় সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটে উঠ্‌ল। গ্যাসদেহ থেকে তাপ নির্গমনের ফলে তার স্থানে স্থানে ঘনত্ব বেড়ে গেল। এরাই বাষ্পময় নীহারিকার অন্তরে রূপের আগুন জ্বেলে দিল। দূরবীনের মারফতে নানান রকমের নীহারিকার সন্ধান মিলেছে। কেউবা পরিপূর্ণ যৌবনে রূপের নেশায় ঝলমল করছে। তার চাউনিতে বিস্ময়ের গভীরতা। অন্তরে পরিপূর্ণ সৃষ্টির আনন্দ। কেউবা আসন্ন যৌবনের উদগ্র আনন্দে আত্মহারা। দেহতটে অতিক্রান্ত কৈশোর ও আসন্ন যৌবনের প্রথম দেখা। চোখে রোমাঞ্চময় ভীরুতা। প্রাণে অনন্ত সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। বহুযুগ ধরে' এরাই নক্ষত্র সৃষ্টির উপাদান যোগাবে। আবার কেউবা আলো আঁধারের মায়ামূর্ত্তি ধরে শূন্যপথে নিরুদ্দেশ অভিসারে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্র অধিক আশ্চর্য্য। বিশ্বসৃষ্টির ব্যাপারেও সবচেয়ে সেইটেই বেশী করে চোখে পড়ে। সৃষ্টির গোড়ায় যখন ছিল একটা পরিব্যাপ্ত জ্বলন্ত বাষ্প, তখন কোথায় ছিল তার বৈচিত্র্য? অসীম শূন্যময় এক-ঘেয়ে নীরাকার বাষ্পসমুদ্র। যখন সেই বাষ্পীয় ব্যাপ্তি জমাট হ'য়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো, তখনই ফুটে উঠ্‌লো বিশ্বরূপের ছবি। সেইদিন প্রথম দেখা দিল উদয়াচলের বিচ্ছুরিত বর্ণচ্ছটায় দিগন্তের বাপীতটে মায়াজাল। অতিক্রান্ত উষার মহাব্যোম নীলসিন্ধু। আর তিমিরলোকের আকাশভরা অনন্ত বিস্ময়। এইরূপ বৈচিত্র্যে মাটীর মানুষের লাগল নেশা। অরূপকে অজ্ঞাতকে জানবার জন্য তার প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ল। বিপুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সে রূপে রূপে তন্ন তন্ন করে পরম অজ্ঞাতকে খুঁজে বেড়াল। গিরি, প্রান্তর, আকাশ—কোথায় তাঁর আবির্ভাব? এই শাশ্বত প্রশ্নের ভার নিয়ে কেউ হলো বৈজ্ঞানিক, কেউ বা হ'লো কবি আর কেউ বা দার্শনিক। অন্তরে তাদের সেই একই প্রশ্ন, কোথায় সেই পরম অজ্ঞাত।

নীহারিকার দলে সবাই ঠিক একই রকমের নয়। সবার ওজনও এক নয়, চেহারাও এক নয় আর গতিবেগও এক নয়। যত দিন যায় এই গতি বেড়েই চলে। কারণ দেহ যতই ঠাণ্ডা হয়, ততই সঙ্কুচিত হয়। বেগও ততই বেড়ে চলে। অবশেষে কোথায় যে তার পরিণতি তা এখনও সঠিক জানা যায় নি।

বিশ্বধ্বংসের ইতিহাসে যেমন বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, সমস্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী দিনের পর দিন তাদের তাপ খুইয়ে অবশেষে সব ঠাণ্ডা হিম হয়ে যাবে। সেইদিনই বিশ্বের শেষ দিন। অন্যদিকে আর একদল বলেন, যেমন পুরান জ্যোতিষ্কেরা বিলীন হ'চ্ছে, তেমনি সুদূর নীহারিকালোক থেকে নতুন জ্যোতিষ্কের সৃষ্টিও হ'চ্ছে। সুতরাং সৃষ্টি চলতেই থাকবে।

কিন্তু কতদিন? সৃষ্টি যদি আদি নীহারিকা থেকেই হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তার বস্তুভাণ্ড সসীম। তা থেকে যে বিভিন্ন নীহারিকার সৃষ্টি হ'য়েছে তাদেরও বস্তুভাণ্ড সসীম। সুতরাং তাদের থেকে সৃষ্ট জ্যোতিষ্কের সংখ্যাও সসীম। বস্তুপিণ্ড যখন অনন্ত নয়, তখন একদিন না একদিন তার শেষ হ'বেই। তবে নীহারিকার অন্তরলোক থেকে এখনও কত কোটী কোটী জ্যোতিষ্কের যে সম্ভাবনা আছে তার পরিমাণ করা শক্ত।

দূরবীন দিয়ে দেখলে আমরা তারাগুলোকে আলোর এক একটা বিন্দুর মত দেখতে পাই। এর চেয়ে বড়ো করে দেখাতে পারে এমন দূরবীন আজও তৈরী হয় নি। কিন্তু দূরবীনের মধ্যে নীহারিকাগুলো তারার চেয়ে বড় দেখায়—যেন অস্পষ্ট আলোর কুণ্ডলী। বিজ্ঞানীরা নীহারিকা শ্রেণীকে তিনভাগে ভাগ করেছেন।

(১) Planetary Nebulae

(২) Galactic Nebulae

(৩) Extra-Galactic Nebulae

প্রথমোক্ত নীহারিকা শ্রেণীর সকলেরই গ্রহদের মত একপ্রকার সুস্পষ্ট আকৃতি আছে। এরা দেখতে অনেকটা গোলাকার থালার মত। সূর্য্যের চেয়ে দশগুণ বেশী এদের আলো। এরা আমাদেরই নক্ষত্র-পরিবারের (Galactic System) অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় শ্রেণীর নীহারিকাদের কোন সুস্পষ্ট আকৃতি নেই। মনে হয় যেন একটা জ্বলন্ত গ্যাসের মেঘ তারকারাজির উপর বিছান রয়েছে। এরাও আমাদের নক্ষত্রপরিবারেরই লোক। অসংখ্য নক্ষত্র এদের অন্তরে বর্তমান রয়েছে। একটানা আলোর বদলে এদের কোথাও আলো, কোথাও আঁধার। এই আলো-আঁধারের সংমিশ্রণে এদের অন্তরলোকে নানান রকমের অদ্ভুত আকৃতির মত দেখতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় শ্রেণীর নীহারিকাদল সম্পূর্ণ পৃথক রকমের। এদের আকৃতির পূর্ণ সুস্পষ্টতা আছে। এদের থেকে সাধারণতঃ একরকমের সাদা আলো বিকীর্ণ হয়। তাই এদের নাম দেওয়া হয়েছে শ্বেত নীহারিকা (white nebulae)। এরা কিন্তু আমাদের নক্ষত্রগোষ্ঠীর কেউ নয়—অন্য নক্ষত্র-জগতের লোক। আয়তনে এরা অতি বিশাল। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে এই নীহারিকা-পুঞ্জের প্রত্যেকের মধ্যে সূর্য্যের অনুরূপ দেহবিশিষ্ট ২০০ কোটি নক্ষত্র তৈরী করার বস্তু আছে।

আমাদের সূর্য্য ও তার গ্রহপরিবার নিয়ে একটি বৃহৎ নীহারিকার ভিতর রয়েছে। কোটি কোটি নক্ষত্র এর সম্পদ। সব চেয়ে দূরের যে নীহারিকার ছবি পাওয়া গেছে তা থেকে পৃথিবীতে আলো আসতেই লাগে প্রায় ৫০ কোটি বৎসর। এই নক্ষত্রসংগঠিত নীহারিকাগুলি যেন মহাশূন্যে এক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের মত (Island universe)। এরা ছুটে চলেছে প্রচণ্ড গতিতে এক অজানা লক্ষ্যের দিকে।

বর্তমান খাদ্য ও অর্থ-সমস্যায় ডিমের স্থান

শ্রীভবানীচরণ রায়

আমাদের এই অনশন-অর্ধাশনক্লিষ্ট দেশে, যেখানে দুইবেলা দুইমুঠা ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করাটাই জনসাধারণের জীবনের প্রায় একমাত্র সমস্যা, সেখানে পুষ্টিকর খাদ্যের নাম মুখে উচ্চারণ করাটাই হয়তো উপহাসের সামিল বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তবুও এই যে আজ খাদ্যবস্তুর একান্ত অভাব দেশময় একটা যাপ্য ব্যাধির (chronic disease) আকার ধারণ করিয়াছে, সে বিষয়ে কিছু বলিতে গেলে পুষ্টিকর খাদ্যের কথা আপনা হইতেই মনে পড়ে। পুষ্টিকর খাদ্যের একটা মহৎ গুণ এই যে, ইহাতে এক ঢিলে দুই পাখী মারা যায়, খাদ্যের অভাবে যা' তা' খাইয়া একটা যাপ্য ব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের দুরাশায় আর একটা যাপ্য ব্যাধির কবলে গিয়াও পড়িতে হয় না। ইহাতে পেটও ভরে, স্বাস্থ্যেরও জাতিরক্ষা হয়। অধিকন্তু, পুষ্টিকর খাদ্যের সঙ্গে অর্থনীতি-শাস্ত্রের কোনরূপ স্বভাবগত খাদ্যখাদক সম্পর্ক নাই, বরং বাজারে সচরাচর যে সব বিষ উপাদেয় খাদ্যের বেনামীতে দিব্য চলিয়া যাইতেছে, বহুক্ষেত্রেই পুষ্টিকর খাদ্য তাহা হইতে সুলভ ও সহজলভ্য।

এইরূপ একটি খাদ্যবস্তু হইল ডিম। ইহা নিতান্তই দুই-দশজন নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছাড়া হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালীমাত্রেরই খাদ্য; এই একান্ত অভাবের দিনেও মোটের উপর বেশ সহজ-লভ্য; আর এই দারুণ দুর্মূল্যের দিনে প্রায় সকলেরই কাছে যেটা সবচেয়ে মূল্যবান কথা, তাহা হইল এই যে, বাস্তবিকই বস্তুটির দাম বেশী নয়। খাদ্যবস্তুর চলতি তালিকার মধ্যে বোধ করি ইহাই একমাত্র পুষ্টিকর খাদ্যবস্তু যাহাতে কোনরূপ ভেজাল দেওয়া চলেনা। অবশ্য আমেরিকান ডিমগুঁড়ার (Egg powder) কথা স্বতন্ত্র।

তবে একথাও ঠিক যে আজ বৎসর কয়েক যাবৎ বাজারকে বাজার যে লঙ্কাকাণ্ড সুরু হইয়া গিয়াছে ডিমের বাজারও তাহার করাল গ্রাস হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি পায় নাই। সেখানেও দেখি চাহিদার অনুপাতে সেই ঘাটতির ফাঁকা হাসি আর ফাঁকাহাসির শূন্য হাটে সেই অগ্নিমূল্যের বেসাতি। তবে সাদা ডিম বোধ হয় আরও পাঁচটা জিনিষের মত তেমন করিয়া কালোপর্দার আড়ালে গা-ঢাকা দিতে পারে নাই। ডিমের বাজারের এই ঘাটতি ব্যাপারটা হয়তো একেবারেই কারসাজি নয়—চাহিদার অনুপাতে সত্যকারের ঘাটতি সত্য সত্যই হয়তো কিছু আছে। বস্তুতঃ এ বিষয়ে বাংলা সরকারের তরফ হইতে অনেক রাখিয়া ঢাকিয়া যেটুকু সংবাদ আমাদের পাতে পরিবেষণ করা হইয়াছে তাহাতেও আমাদের এ অনুমানের অনেকটা সমর্থন মেলে। আমাদের দেশে হাঁস-পালন আর ডিমের চাষ কার্য্যত গৃহস্থালীর অঙ্গীভূত—সামান্য এক আধটি ক্ষেত্র ছাড়া আর কোথাও বড় কারবারের অন্তর্ভুক্ত নয়। সরকারী সংবাদে প্রকাশ, অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দোষে আর হিংস্র জন্তু ও শিকারী পাখ-পাখালীর দৌরাত্ম্যে এই গৃহস্থালী কারবারে হাঁস-মুরগীর বাচ্চাদের শতকরা নব্বইটিকেই নাকি অকালে প্রাণ দিতে হয়। অবশ্য এত বড় একটা ক্ষতির হিসাবকে স্বভাবত সরকারের 'অতিরঞ্জিত উদাহরণ বলিয়া সন্দেহ করিতে হয়; তবে অত্যন্ত উদার অন্তঃকরণে এতবড় অঙ্কটার

শতকরা পঞ্চাশভাগকেও যদি অতিভাষণ-দুষ্ট বলিয়া বাদ দেওয়া যায় তবুও এই ক্ষতির অঙ্কটা আসিয়া দাঁড়ায় শতকরা ৪৫-এর কোঠায়।

তবুও এ ক্ষতির কথাটা বক্ষ্যমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। আসল কথা হইল উৎপাদনের অল্পতা। বস্তুত স্বাধীন্ ভারতে সর্ববিধ প্রয়োজনীয় বস্তু সম্বন্ধেই এইটিই হইতেছে প্রধান সমস্যা—চাহিদার অনুপাতে উৎপন্ন দ্রব্যের ঘাটতি। এক মাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারাই এ সমস্যার সমাধান হইতে পারে। আর উৎপাদন বৃদ্ধির সহজ উপায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণে একদিকে যেমন ক্ষতির পরিমাণ আশ্চর্যরূপে হ্রাস পাইবে, আর একদিকে তেমনই লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দুইদিক দিয়াই উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা করিবে। নহিলে সমগ্র ভারতীয় রাষ্ট্রের (Indian Union) ত্রিশ কোটি নরনারীও যদি আজ গৃহস্থালী কারবার হিসাবে হাঁস-পালনে মাতিয়া উঠে তবে ডিমের উৎপাদন অবশ্যই বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে কিন্তু তাহারই সঙ্গে সঙ্গে অনর্থক ক্ষতির পরিমাণও প্রায় তদনুপাতেই বাড়িয়া যাইতে পারে। তাহাতে দেশের বুভুক্ষু নরনারীদের ক্ষুধার জ্বালা কতদূর প্রশমিত হইবে জানিনা, কিন্তু দেশের হিংস্রজন্তু আর শিকারী পাখ-পাখালির বংশবৃদ্ধি যে দুর্দান্ত গতিতে নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিতে পারে তাহাতে সন্দেহ করার কোনও সঙ্গত কারণ দেখি না। অন্তত সরকারী হিসাবে ক্ষতির ঘরে ৯০এর অঙ্ক আর যথালাভের ঘরে ১০এর অঙ্ক দেখিবার পর গৃহস্থালী কারবারের উপর ভরসা করিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে ভরসা পাই না। এভাবে চলিতে থাকিলে গৃহপালিত হাঁস-মুরগীর অচিরেই বংশলোপ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। ভাগ্যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে গৃহপালিত হাঁস-মুরগীর এ হেন দুর্দশা নয়, নহিলে আমাদের এই সনাতন ভারতবর্ষে অচিরাৎ বন্য হাঁস-মুরগীকে ধরিয়া আনিয়া নূতন করিয়া সভ্যতায় দীক্ষাদানের প্রয়োজন দেখা দিতে পারিত। তবে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব দিনে দিনে যেরূপ মর্মান্তিক হইয়া উঠিতেছে তাহাতে না দুইচার পুরুষের মধ্যেই আশেপাশের পাহাড়-পর্বত হইতে পুরাতন অনার্য্যজাতির বংশধরদের আসিয়া ভারতীয় জনসংখ্যার ঘাটতি পূরণ করিতে হয়। প্রকৃতির প্রতিশোধের ইহার চেয়েই বা চমৎকার দৃষ্টান্ত আর কোথায় মিলিবে?

ডিমের মধ্যে হাঁস-মুরগীর ভ্রূণ ডিমের জলীয় শ্বেতাংশ শোষণ করিয়া জীবিত থাকে এবং বর্ধিত হয়। তারপর যথাকালে খোলা ভাঙ্গিয়া শাবকের আকারে উহা বাহির হইয়া আসে, বাহির হইয়া আসিবার প্রাক্কালে নাভি-রজ্জুর (naval chord) সাহায্যে উহা ডিমের হরিদ্রাপটল (yolk) শোষণ করিয়া লয়। এই হরিদ্রাপটলই শাবককে তখন খাদ্যরূপে একাদিক্রমে প্রায় ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত পোষণ করে। এইরূপ অবস্থায় খাদ্যপানীয় ব্যতিরেকেই শাবককে অনায়াসে ৪৮ঘণ্টার পথে প্রেরণ করা যায়। ইহার পরে সংস্কারের (instinct) সহায়তায় শাবক মাতার সাহায্য ব্যতীত আপনিই আহার খুঁটিয়া খাইতে পারে। হাঁস ও মুরগী পালনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মূলত এই ব্যাপারটির উপরই প্রতিষ্ঠিত। নিয়মিতভাবে এবং দ্রুতগতিতে হাঁস-মুরগীর বংশবৃদ্ধির কাজে এই ব্যাপারটিই প্রধান সহায়। এভাবে একদিকে যদি প্রত্যহ দলে দলে নূতন শাবক সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে তবে আর মাংসের বাজারের প্রাত্যহিক চাহিদা মিটাইবার জন্য প্রতিদিন নিয়মিতভাবে দলে দলে উৎপাদনক্ষম হাঁস-মুরগীকে অকালে বলিদানের জন্য পাঠাইতে হয় না—প্রজননে অক্ষম অথচ পুষ্টকায় হাঁস-মুরগী সরবরাহের দ্বারাই মাংসাশীদের তৃপ্তিসাধনের ব্যবস্থা হইতে পারে। তবে মাংসের চাহিদা মিটাইবার উপযোগী হাঁস-মুরগীও বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রতিপালিত হওয়া চাই, কেননা অবৈজ্ঞানিক অপপদ্ধতিতে পালিত প্রজননে অক্ষম বয়স্ক হাঁস-

মুরগীর মাংস স্বাদ বা পুষ্টি কোনদিক দিয়াই বিশেষ সুবিধার জিনিষ হয় না,—বাজারে উৎকৃষ্ট বস্তুর অভাব বশত এবং ক্রেতার অজ্ঞতার ফলেই এরূপ জিনিষ কাটিয়া যায়, ব্যবসায়ীরাও শুধু পাখার বাহার দেখাইয়াই ক্রেতাদের ঠকাইয়া থাকে।

উল্লিখিত পদ্ধতিতে ডিম, হাঁস, মুরগী নিয়মিত ভাবে সরবরাহ করিতে হইলে এমন একটি কেন্দ্রের প্রয়োজন, যেখানে ডিম্বাবস্থা হইতে পরিণত বয়স অবধি সকল রকমের হাঁস-মুরগী প্রতিপালিত হয়। এরূপ পালন-কেন্দ্রের পক্ষে আবার একটি স্ফোটনাগার (hatchery) একান্ত প্রয়োজনীয়। স্ফোটনাগারের অপরিহার্য অঙ্গ হইতেছে ডিম ফুটাইবার তা'-কামরা* (incubator), ডিম পরীক্ষার উপযুক্ত বিশেষ এক ধরণের প্রদীপ, ডিমের বর্গ-বিভাগের (grading) জন্য কয়েক রকমের যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ার (appliances), দিনবয়সী (day-old) শাবক স্থানান্তরের পেটিকা (basket), আর বিশেষ কয়েকটি টুকিটাকি জিনিষপত্র। দুঃখের বিষয় এই যে, স্ফোটনাগারের ডিম ফুটাইয়া হাঁস মুরগীর দিনবয়সী ছানাদের স্থানান্তরে চালান দেওয়ার কোন কারবারই ভারতের কোথাও নাই। অন্যান্য বহুবিধ ব্যাপারে যেমন এই বিষয়েও তেমনি আমরা অন্যান্য নানা দেশের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছি। ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের প্রতিবেশী—বৎসর দশ এগারো আগেও ভারতবর্ষেরই একটি প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইত। ১৯৩৮ সাল অবধি হিসাব-নিকাশের যে খতিয়ান মিলে তাহাতে দেখি সেখানে চীনা স্ফোটন-ব্যাপারীদের কৃপায় গড়পড়তা ২০ লক্ষ দিনবয়সী হংসশাবকের চাষ হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বৈদ্যুত-স্ফোটনাগারে জাত দিনবয়সী হাঁস-মুরগীর সংখ্যা বৎসরে ১৪ হাজার কোটী। সেদেশে এইরূপ এক একটি মাঝারি ধরণের স্ফোটনাগার হইতে বৎসরে গড়পড়তা ১,৫০,০০০ ছানা ডিম ফুটিয়া বাহির হয়।

হাঁস-মুরগীর বংশবৃদ্ধি ছাড়া উহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনও স্ফোটনাগারের কার্য্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশী হাঁস-মুরগীর ওজন গড়ে ২ পাউণ্ড হইতে ৫ পাউণ্ডের মধ্যে, ডিম পাড়ার দৌড় বৎসরে ৬০ হইতে ১০০টি ডিমের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। আমেরিকান বা ইংলিশ হাঁস-মুরগীর ওজন ৬ পাউণ্ড হইতে ১৪ পাউণ্ড অবধি, ডিম পাড়ার স্বাভাবিক সীমা বৎসরে ২৫০ হইতে ৩০০টি ডিম পর্যন্ত। ইহার উপর আর কথা চলেনা—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগী পালনের ব্যবস্থা হইলে আমাদের দেশের ভাগ্যেই বা অচিরে এতগুলি ডিম্বলাভ হইবেনা কেন তাহার সঙ্গত কারণ দেখিনা।

একটি প্রজননক্ষম হাঁস বা মুরগী একেবারে আট হইতে দশটির বেশী ডিমে তা' দিতে পারে না। ইহাতে হাঁস-মুরগীর চাষের পক্ষে নানা দিক দিয়াই ক্ষতি হয়। হাঁস ও মুরগীকে এই ডিমে তা' দেওয়ার দায় হইতে উদ্ধার করিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্মিত তা'-কামরায় ডিম ফোটানো নানা দিক দিয়াই লাভজনক—এক একটি তা'-কামরায় এক একবারে লক্ষাধিক ডিমে একই সঙ্গে তা' দিবার ব্যবস্থা হইতে পারে। এভাবে মুরগীর ডিম ফুটাইতে লাগে একুশ দিন, হাসের ডিম ফোটাইতে আটাশ দিন। মাদী হাঁস-মুরগী বৎসরে মাত্র দুইবার ডিমে তা' দিতে বসে; একটি তা'-কামরা দিয়া বৎসরে পুরা দশমাস ডিম ফোটানোর কাজ চলে। তাছাড়া হাঁস-মুরগী ডিমে তা' দিতে বসিলে অনেক রকমের ছোঁয়াচে রোগ ছানাদের মধ্যে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। তা'-কামরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শোধন

* বিজ্ঞানাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কৃত পরিভাষা।

(১) ইংলিশ সিলভার ডরকিং জাতীয় মোরগ ও মুরগী প্রত্যেকটির ওজন প্রায় সাত সের
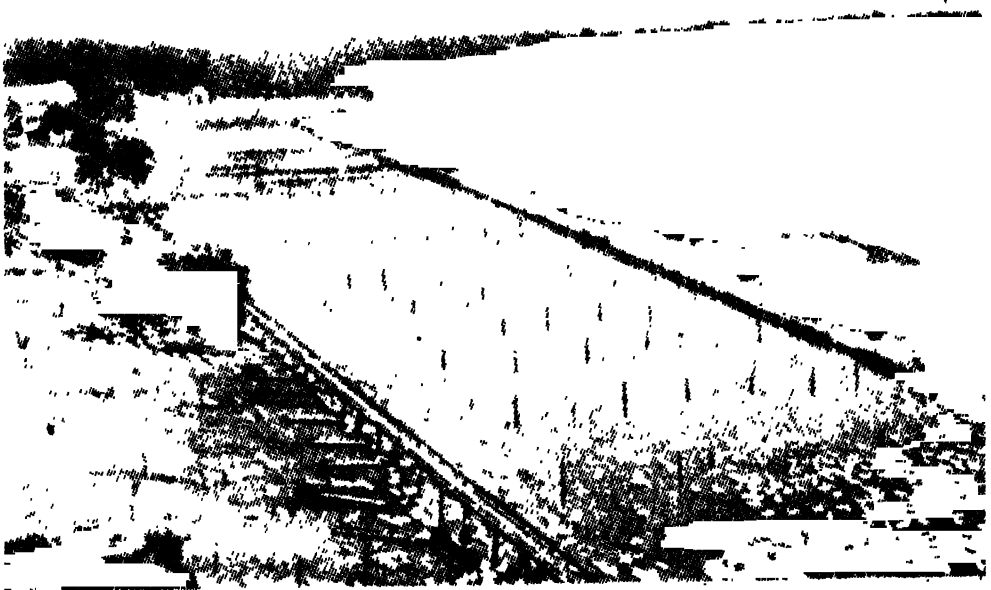
আমেরিকার এক হাঁস-পালন কেন্দ্র: এখানে দুই লক্ষাধিক হাঁসের চাষ করা হয়

শোটিন ব্যাপারী দিনবয়সী মুরগী-শাবক দূরদেশে
চালান দিবার জন্য পেটিকাজাত করিতেছে

আসল মাতার পরিবর্তে বৈদ্যুতিক উপমাতার (Foster-mother)
আওতায় দিনবয়সী মুরগীশাবক পালিত হইতেছে

করা একান্ত সহজ বলিয়া, তা'-কামরায় ডিম ফুটাইলে এ আশঙ্কা বড় একটা থাকেনা। বস্তুত হাঁস-মুরগীর মধ্যে রোগ সংক্রমনের সম্ভাবনা খুবই বেশী; হাঁস-মুরগীর কারবারীদের কাছে ইহা একটি অত্যন্ত গুরুতর সমস্যা। কেবলমাত্র স্ফোটনাগারেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভবপর।

অথচ স্ফোটনাগার স্থাপন করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে হাঁস-মুরগীর চাষ করার একক প্রচেষ্টা সহজসাধ্য তো নয়ই—দস্তুরমতো অসাধ্য। স্ফোটনাগার চালাইবার মত বৈজ্ঞানিক শিক্ষার একান্ত অভাব দেশেতো আছেই, তাহার উপর অর্থাভাবেরও কিছুমাত্র অপ্রতুলতা নাই; অধিকন্তু ডিম ফুটানো হইতে সুরু করিয়া ডিম আর হাঁস-মুরগী বাজারজাত করা পর্যন্ত সমগ্র ব্যাপারটিকে বিজ্ঞানের বল্‌গা পরাইয়া সুপথে চালনা করিতে যে বিপুল প্রয়াসের প্রয়োজন তাহা ব্যক্তিবিশেষের কাছে আশা করা যায় না—অন্তত কাজের গোড়াপত্তনের দিকে করা যায় না। আর কিছু না হউক, এ অবস্থায় ব্যর্থতার আশঙ্কাও যথেষ্টই আছে। একাজে তাই সরকারী সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন।

কলিকাতার মত কেন্দ্রীয় সহরে সরকারী সাহায্যে অনায়াসেই একটি কেন্দ্রীয় স্ফোটনাগার স্থাপন করা যাইতে পারে। পার্শ্ববর্তী পল্লী-অঞ্চল হইতে ডিম আমদানী করিয়া নিয়মিতভাবে ডিম ফোটানো, হাঁস-মুরগীর চাষীদের বিনামূল্যে দিনবয়সী হাঁস-মুরগী-ছানা সরবরাহ করা, চাষীদের এসব বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ব্যাপার হইবে এইরূপ কেন্দ্রীয় স্ফোটনাগারের কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত।

এইভাবে বৎসরকাল কাজ চালাইবার পর আশা করা যায় যে, উন্নত শ্রেণীর হাঁস ও মোরগের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সামান্য চেষ্টায়ই অনুলোম সঙ্গমের * মধ্য দিয়া অপকৃষ্ট শ্রেণীর হাঁস মুরগীর উন্নতিবিধান সম্ভবপর হইয়া উঠিবে। ইহার ফলে যে নূতন বর্ণসঙ্করের উদ্ভব ঘটিবে তাহার মধ্য হইতে হাঁস ও মোরগগুলিকে সঙ্গমের পূর্বেই মাংসের বাজারে চালান দেওয়া দরকার। এভাবে চলিলে বৎসর তিনেকের মধ্যেই হাঁস-মুরগীর বিস্তর উন্নতিবিধানের আশা করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ অন্যান্য যাবতীয় পশুপক্ষী পালনের চেয়ে হাঁস-মুরগীর চাষে দ্রুততর গতিতে আশানুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে,—অন্ততঃ ইংলণ্ড ও আমেরিকার হাঁস-মুরগী পালনের ইতিহাস এইরূপ সাক্ষ্য দিয়া থাকে। কৃষি, গো-পালন প্রভৃতি নানারূপ প্রাথমিক উৎপাদনের (Primary Production) আয়ের সঙ্গে হাঁস-মুরগী চাষের তুলনায়ও দেখিতে পাই ইহা অধিকতম লাভজনক ব্যবসায়। ১৮৮০ সাল হইতে ১৯৩৭ সাল অবধি নানারূপ প্রাথমিক উৎপাদনের মধ্যে আয়ের দিক দিয়া হাঁস-মুরগীর চাষ আমেরিকায় (যুক্তরাষ্ট্রে) কিরূপভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে নীচের তালিকাটিই তাহার একটি প্রমাণ:

প্রাথমিক উৎপাদন
(যুক্তরাষ্ট্র)
শতকরা লভ্যাংশ

	সাল ১৮৮০	১৯৩৭
গোপালন	৯.৫	৯.৭
দুগ্ধজাত খাদ্য	১০.২	১৯.৫
ছাগ ও মেষ	০.৫	১.২
কার্পাস ও কার্পাস-বীজ	১২.৬	১০.৪
তামাক	১.৪	৩.৩
অন্যান্য খাদ্যবস্তু	৪.৮	৪.৩
হাঁস-মুরগী	৪.৮	১১.৭

আমাদের ভারত সরকারের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ ৫০০ কোটী টাকা, আর যুক্তরাষ্ট্রে শুধু হাঁস-মুরগীর চাষেই খাটে ২৫ হাজার কোটী টাকার মতো মূলধন। যুক্তরাষ্ট্রের এই সুবিপুল কারবার আজ প্রশান্ত মহাসাগর ডিঙাইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া ডিমের বাজার গ্রাস করিতে উদ্যত।

* উন্নততর হাঁস ও মোরগের সহিত অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট মাদী হাঁস ও মুরগীর সঙ্গম।

তেল আর ঘি

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

বহু প্রাচীন কাল থেকেই খাদ্য হিসাবে বৃক্ষ বা শস্যজাত বীজ তেল কিম্বা পশুজাত তেল মানুষ ব্যবহার করে আসছে। মনে হয়, শস্যজাত বীজ তেলের ব্যবহার পশুজাত তেলের ব্যবহারের চাইতে প্রাচীন। চীন ও ভারতবর্ষ বহু প্রাচীন দেশ। সরিষা গাছের আদিম বাসস্থান হ'ল চীন-দেশে। শুনলে বিস্মিত হবেন, ভারতবর্ষে চাষ-করবার জন্যে সরিষার বীজ আনা হয়েছিল অন্য দেশ থেকে। কোন্ দেশ তা' ঐতিহাসিকেরা বলতে পারেন না, তবে নিশ্চয়ই কোন গ্রীষ্মপ্রধান দেশ থেকে। চীনদেশে অনেকদিন থেকে সরিষার চাষ হচ্ছে। মঙ্গোলিয়ার তুর্কীজাতি চীন দেশে সর্বপ্রথম সরিষার চাষ প্রচলন করে। আর তুর্কীরা ইরাণীদের কাছ থেকে এই চাষ করা শেখে। সেই সুদূর পারস্য দেশ থেকে ভারতবর্ষের সব গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে সরিষার চাষ করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে ই সীন নামে একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক রাই ও কৃষ্ণ সরিষার চাষ ভারতবর্ষে হয় বলে উল্লেখ করেছেন।

তিল তেলের প্রচলনও কম প্রাচীন নয়। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস বার বার উল্লেখ করেছেন যে ব্যাবিলনবাসীরা কেবলমাত্র তিল তেলের ব্যবহার জানত। সেত আজকের কথা নয়, খৃষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে। তার চেয়েও আগে থেকে তিল তেল আমাদের দেশে ব্যবহার হচ্ছে; অথর্ববেদে এর উল্লেখ আছে। তিলের চাষও আদিমকাল থেকে ভারতবর্ষে হচ্ছে। ঐতিহাসিক প্লিনি উল্লেখ করেছেন যে তিলের চাষ ভারতবর্ষে হয়। তার থেকে আরবীরা তেল তৈরি করে। এর থেকে মনে হয় তিল তেলের অবিষ্কার হয় ভারতবর্ষে। তারপর অন্যদেশে তার প্রচলন হয়। উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা কিন্তু বলেন তিলগাছের আদিম বাসস্থান ভারতবর্ষ নয়। এর জন্মস্থান হ'ল আফ্রিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল, সেখানে বার জাতের তিল দেখা যায়; ভারতবর্ষে মাত্র দুই জাতের। বৌদ্ধ যুগে প্রদীপে তিল তেল জ্বালান হ'ত। এই বিশেষ তেলকে বলা হ'ত অধিমুক্তক। ত্রিরত্নের পাদপীঠে চন্দন, সোম ও চম্পক সুরভিত তিল তেলের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ত। এদেশ

ইহা যুগপৎ আমাদের ভয় ও ভরসা দুইয়েরই কারণ হইয়া উঠিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের ডিম গুঁড়ার কারবার বিপুল মূলধনের বলে যদি একবার আসিয়া ভারতীয় ডিমের বাজারে জাঁকিয়া বসিতে পারে তবে তাহাকে স্থানচ্যুত করিবার জন্য আমাদের পক্ষে আবার না স্বরাজ আন্দোলনের অনুরূপ কোন আয়োজন করিতে হয়। অথচ আমাদের দেশের ডিমের কারবারীরা এ কথা এখনও বুঝিতেছেন না যে, ডিমের মূল্য হ্রাস না করিলে আমেরিকান ডিম গুঁড়ার কারবারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাঁহাদের পরাভব অনিবার্য্য তবে একথাও ঠিক যে, ডিমের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইলে মূল্যহ্রাসের আশাও দুরাশা মাত্র। অথচ একক প্রচেষ্টায় উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভবপরও নয়। দেশের খাদ্যসমস্যা সমাধানের ভার যাঁহাদের উপর ন্যস্ত একমাত্র তাঁহাদের প্রচেষ্টা ও সাহায্যের ফলেই সমাধান সম্ভবপর, নহিলে ডিমের বাজারে দেশের লোকের ভাগ্যে সত্যই ডিম্বলাভ ঘটিবে।

থেকে কালক্রমে তিল তেলের প্রচলন হ'ল পারস্য-দেশ ও মধ্য এশিয়ায়। ক্রমশঃ চলে গেল চীন ও রুষদেশে।

আর একটি প্রাচীন বীজ তেলের নাম করা যেতে পারে, রেড়ির তেল। মিশর দেশে রেড়ির তেলের ব্যবহার করা হ'ত বলে হেরোডোটাস পরিচয় পেয়েছিলেন। মিশরবাসীরা রেড়ির তেল অঙ্গে মাখত ব'লে প্রকাশ। গ্রীস দেশে প্রচুর পরিমাণে রেড়ির গাছ জন্মায়। মিশর দেশে এর বহুল পরিমাণে চাষ হয়। নদী বা দীঘির ধারে, পুকুরের পাড়ে রেড়ির গাছ খুব ভালভাবে জন্মায়। মিশর দেশের প্রাচীন কবর উদ্ঘাটিত করে অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে রেড়ির বীজও পাওয়া গেছে। রেড়ি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার হ'ত বলে মৃতের সঙ্গে কবরেও স্থান পেয়েছিল। বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন তিলের মত রেড়ির আদিম বাসস্থান আফ্রিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে। সেখান থেকে রেড়ির প্রচলন হয় মিশর দেশে, আর মিশর থেকে আমাদের দেশে। ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থে এর উল্লেখ নেই,—বেদে নেই, মনুতে নেই। এমন কি বৌদ্ধ গ্রন্থেও সচরাচর উল্লেখ নেই। পরবর্তীকালে রেড়ির উল্লেখ এরণ্ড ও গন্ধর্ব নামে সংস্কৃত পুস্তকে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ থেকে রেড়ির প্রচলন হয় চীন দেশে, আর মলয়, সুন্দ, যব ও শ্যাম প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে।

আজও ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশি তৈলবীজ উৎপন্ন করে। সরিষা, তিসি, তিল, নারিকেল, সবই এদেশে পেষণ করে তেল বের করা হয়। কর্ষিত ভূমির প্রায় শতকরা ৮ভাগ বর্গক্ষেত্র প্রতি বছর বিবিধ তৈলবীজ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। তুলার বীজ, রেড়ির বীজ, চিনাবাদাম, কপিবীজ ও মহুয়া। সব সমেত ১৬২০লক্ষ মণ বীজ বছরে উৎপন্ন হয়। সম্প্রতি যদিও অনেক বেশি পরিমাণে বীজ উৎপন্ন করা হচ্ছে, ভারতের বাইরে বেশী পরিমাণে পাঠান হচ্ছে না, এদেশেই তা ব্যবহার করা হচ্ছে। তা সত্ত্বেও বছরে ২৭০লক্ষ মণ বীজ এখনও বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। আমেরিকা হ'ল সব চেয়ে বড় ক্রেতা। এর পরে ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী ও হল্যাণ্ড।

বাংলা দেশে ঘরে ঘরে সরিষার তেল ব্যবহার করা হয়। অবশ্য ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও সরিষার তেলের ব্যবহার আছে। সরিষায় দুই প্রকার তেল আছে। একটির জন্যে এর ঝাঁঝালো গন্ধ পাওয়া যায়, তাকে উদ্বায়ী তেল বলে। আর অন্যটিকে বদ্ধ তেল বলে। বদ্ধতেলের পরিমাণ উদ্বায়ী তেলের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশি। সরিষার তেল বলতে বদ্ধ তেল বোঝায়। শুধু সরিষা কেন, তিল, রেড়ি, চিনাবাদাম, নারিকেল, তিসি প্রভৃতি বীজ তেলে বিভিন্ন জাতীয় বদ্ধ তেল থাকে। বদ্ধ তেল বিভিন্ন এসিডের সঙ্গে গ্লিসারিনের যৌগিক পদার্থ। সরিষার তেলে এরিউসিক এসিড, রেড়ির তেলে রিসিনিক এসিড, নারিকেল তেলে পামিটিক এসিড প্রভৃতি গ্লিসারিনের সঙ্গে যুক্ত আছে। বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই সকল এসিডের অবস্থিতি প্রমাণ করা যায়।

রসায়নের মতে মাখন আর ঘি একই জাতীয় জিনিষ। শুধু তাই নয় নারিকেল, সরিষা ইত্যাদি তেলেরও সগোত্র। মাখনেও গ্লিসারিনের সঙ্গে এসিডযুক্ত আছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মাখনে গ্লিসারিন-যুক্ত হয়ে নিম্নলিখিত এসিডগুলি মিশ্রিত আছে।

বিউটিরিক এসিড শতকরা	০'১ ভাগ
কেপ্রইক, কেপ্রাইলিক ও কেপ্রিক এসিড	২'১ ভাগ
মিরিষ্টিক, পামিটিক ও ষ্টিয়ারিক এসিড	৪৯'৪ ভাগ
ওলেয়িক এসিদ্	৩৬'১ ভাগ
গ্লিসারিন	১২'৫ ভাগ

এ ছাড়া মাখনে শতকরা ২০ভাগ জল থাকে। ঘি আর মাখনে একই রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান। কেবল ঘিয়েতে জল থাকে না। আর বর্ণ ও গন্ধের তারতম্য হয়। গ্লিসারিন-যুক্ত এসিডকে উক্ত এসিডের গ্লিসারাইড বলা হয়। যেমন নারিকেল তেলকে রসায়নের ভাষায় বলতে পারি গ্লিসারাইড অফ পামিটিক এসিড অথবা গ্লিসারিন পামিটেট।

মাখন বা ঘিয়ের পরিবর্তে একজাতীয় কৃত্রিম পদার্থ আজকাল বাজারে খুব চলছে, এর নাম মার্জারিন। (তুলার বীজ থেকে নিষ্কাশিত তেলকে হাইড্রোজেন গ্যাস মিশ্রিত করে উত্তপ্ত কাঁচ নলের ভিতর রাখা নিকেল চূর্ণের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করালে তেলটি হাইড্রোজেন যুক্ত হ'য়ে মাখনের মত গাঢ়ত্বা প্রাপ্ত হয়।) কৃত্রিম মাখন হিসাবে ব্যবহারও হ'য়ে থাকে। আমাদের দেশে নারিকেল তেল থেকে উক্ত উপায়ে তথাকথিত 'ভেজিটেবল ঘি' করা হয়, যা' আজকালকার বাজারে দালদা বা ঐ জাতীয় হাইড্রোজেনায়িত বীজ তেলের সমকক্ষ। বলা বাহুল্য দুধ বা মাখন জাতীয় গব্য-পদার্থে ফ্যাট বা স্নেহ ছাড়াও ভিটামিন বা খাদ্য-প্রাণ আছে। (কিন্তু এই রকম কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত স্নেহতে কোন খাদ্যপ্রাণ নেই, একেবারেই নেই।) উপরন্তু এসব বেশিদিন ব্যবহার করলে চক্ষু রোগাক্রান্ত হয় বলে প্রকাশ। তেলকে হাইড্রোজেন ঘটিত করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন দুইজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক, সাবাতিয়ে ও সেণ্ডারেন্স্ (Sabatier and Senderens)। রাসায়নিক প্রণালীটি রসায়নশাস্ত্রে এবং রসায়ন শিল্পে এত বেশি কাজে লাগে যে তাঁরা উত্তরকালে এই আবিষ্ক্রিয়ার জন্যে নোবেল পুরস্কার পান। হায় তখন কি তাঁরা জানতেন যে তাঁদের আবিষ্কার মানুষের স্বাস্থ্যহানির আংশিক কারণ হ'য়ে দাঁড়াবে! গত মহাযুদ্ধের পর থেকে বৈজ্ঞানিক উপকরণ ও তার সঙ্গে বিজ্ঞানই এই রকম যুদ্ধের জন্য দায়ী বলে অনেকেই হুঙ্কার ছাড়ছেন। বৈজ্ঞানিক বলেন বিজ্ঞান হ'ল যন্ত্র, মানুষ তাকে যেমন খুসী কাজে লাগাতে পারে, তাতে বিজ্ঞানের অপরাধ কি? হাতুড়ী দিয়ে মাথাও ভাঙতে পার, আবার মন-ভাল-করা ছবিও টাঙাতে পার। তাতে হাতুড়ীর কৃতিত্ব কোথায়!

যাক সে কথা, এখন কথা হচ্ছে সরিষা, নারিকেল, তিল, চিনাবাদাম প্রভৃতি বীজ তেলের মাখন ও অন্যান্য গাঢ় স্নেহের মত খাদ্যগুণ আছে কি না? যে কোন স্নেহ পদার্থ শরীরে মেদ সঞ্চার করতে সাহায্য করে। আর তা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষ কতটা পরিমাণ স্নেহ পরিপাক বা আত্মসাৎ করতে পারে তার উপর। ধীরে ধীরে অভ্যাস করতে পারলে দৈনিক বেশ খানিকটা পরিমাণ স্নেহ পদার্থ আমরা পরিপাক করতে পারি। যেমন, একজন মাড়োয়ারী যতখানি ঘি একদিনে খেতে পারে একজন বাঙালী তা' পারে না। অবশ্য এমন বাঙালীও আছেন। যিনি সাধারণ একজন মাড়োয়ারীর চাইতে অনেক বেশি ঘি দৈনিক হজম করতে পারেন। তবে বেশি ঘি বা তেল খাওয়ার বিপদ আছে, খেলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পেট ভার থাকে। অম্লরোগ হ'তে পারে। পিত্ত-রোগ ও মেদবাহুল্য ঘটতে পারে। তেমনি আবার কম খাওয়াতেও স্বাস্থ্যহানি হয়। সবচেয়ে বেশি দেখা যায় কোষ্ঠকাঠিন্য আর শারীরিক শীর্ণতা, আর তার উপর গব্যজাতীয় স্নেহের ভিটামিন না পাওয়াতে শরীরের দৌর্বল্য। স্নেহ হিসাবে কৃত্রিম ঘি বা মার্জারিন মাখন বা ঘিয়ের মত অত সহজে পরিপাক হয় না। এমন কি সবটা পরিপাক করবার শক্তিও পাকযন্ত্রের থাকে না। পরীক্ষা করে দেখা গেছে মাখন, শূকরের বা গরুর চর্বি, চিনাবাদামের তেল, জলপাইয়ের তেল, তুলার বীজের তেল প্রভৃতি সম্পূর্ণ হজম হয়, এবং শরীর মেদল করতে সাহায্য করে। চর্বি বা বীজ তেলে ভিটামিন নেই বললেই চলে। গব্যজাত মাখন, দুধ প্রভৃতি স্নেহ পদার্থে ভিটামিন আছে। বেশ খানিকটা বেশি পরিমাণেই আছে। তাই মাখন আর দুধ আদর্শ

মাটি ও জীবজগৎ

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রকৃতির দানের উপর একান্ত নির্ভরশীল মানুষ যখন কৃষিকার্য দ্বারা নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুত করতে শিখল তখন থেকেই সভ্যতার উন্মেষ হ'ল বলা যেতে পারে। ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠায় দেখা যায় একই জমিতে বছর বছর আশানুরূপ ফসল না পাওয়ার দরুণ মানুষ এঃ জমি ছেড়ে নতুন আর এক জমির দিকে ধাবিত হয়েছে। পরিশেষে যাযাবর জীবনে যখন প্রায় পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়ছিল, এক ক্ষুদ্র অনুসন্ধিৎসু মন আকস্মিক আবিষ্কার করে বসল যে নদীতীরবর্তী এবং তাঁর সন্নিকট-ভূমি ফসল তোলা সত্বেও অভূতপূর্ব উপায়ে বছরের পর বছর উর্বরতা বজায় রেখে চলে। তারপর থেকে দেখা গেল বড় বড় সভ্যতার জন্ম ও ক্রমোন্নতি হ'ল নদ ও নদীর তটভূমিকে কেন্দ্র করে। সিন্ধু, গঙ্গা ও নীলের নজীর অনায়াসেই মনে আসে। জীবিকা নির্বাহের প্রশ্ন সমাধান হ'লে দেহরক্ষায় প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ মানসিক চর্চার অবসর পাবে এ আর বিচিত্র কি? মন ও দেহের নিত্য টানা-পোড়েনে ব্যয় বাদে যে অংশটুকু জমা হয় সভ্যতার মণিকোঠায় তারই আসন স্থায়ী হয়ে থাকে। জীবজগতের অন্তরে ও বাইরে অহরহ যে সীমাহীন দ্বন্দ্ব চলেছে, মাটিকে তার জন্য যে ব্যয়ভার বহন করতে হয় তা সামান্য নয়। মাটির এই অকুণ্ঠ সেবার কাহিনী কিছু বলবার চেষ্টা করব—অবশ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।

যে দশ বারোটি উপাদান উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের পোষণ, রক্ষণ ও গঠনকার্যে অত্যাবশ্যক তা প্রধানতঃ মাটি থেকেই আহরণ করা হয়। কিন্তু একথা বলা চলে না যে মাটিতে এই সব উপাদানের সঙ্গে উদ্ভিদ ও প্রাণীর শরীরস্থ পরিমাণের কোন আনুপাতিক সম্পর্ক আছে। বস্তুতঃ কোন সম্পর্কই নাই। মাটিতে সিলিকন, এলুমিনিয়ম ও লোহের পরিমাণ গাছ (যে সব গাছ অথবা তাদের ফল ও ফুল খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ও মানুষের শরীরে ঐ সব উপাদানের পরিমাণের চেয়ে অনেকগুণ বেশী। আবার ক্যালসিয়ম্, পটাসিয়ম্, সোডিয়ম্, গন্ধক, ক্লোরিন, ম্যাগ্নেসিয়াম্ ও ফস্ফরাস্ মাটির চেয়ে গাছ ও মানুষে বহুগুণে বেশী।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই সব পদার্থ বিভিন্ন আকারে মাটি থেকে গাছে সঞ্চারিত হয়। বলা বাহুল্য যে মৌলিক পদার্থ হিসাবে একেবারেই সম্ভব নয়; যেমন ফস্ফরাস্ ও গন্ধক ফস্ফেট্ ও সালফেট্ হিসাবে কিন্তু ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদি প্রধানতঃ আয়নের (ion) আকারে।

নাইট্রোজেন শুদ্ধ উপরি উক্ত উপাদানগুলি থাকা সত্বেও কতগুলি পদার্থ, স্বল্পপরিমাণে (লক্ষ-

---

খাদ্য ও পানীয় বলা চলে। আজকাল বাজারে যা' টিনে ভরা বিদেশি ছাপ মারা মাখন দেখতে পাওয়া যায়, তাতে শতকরা ৮৫ ভাগ বিশুদ্ধ মাখন আছে, আর ১২ ভাগ মার্জারিন আছে। উপরন্তু যা'তে নষ্ট না হ'য়ে যায় তাই লবণ, বেঞ্জোয়েট অফ্ সোডা, ডাই এসেটাইল ইত্যাদি পচননিবারক রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত আছে। বীজ তেলে সামান্য পরিমাণে এ, বি ও ই ভিটামিন আছে। কিন্তু শোধন করবার সময় এই সব ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। সেই জন্যে অনেক সময়ে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত ভিটামিন তেলে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

ভাগের একভাগ কিম্বা তারও কম) প্রয়োজন। সাধারণতঃ মাটিতে এগুলো প্রয়োজনাতিরিক্ত পরিমাণে থাকে। এদের অভাবে উদ্ভিদ ও প্রাণী নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে। ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা, তামা, বোরন, কোবল্ট ও আয়োডিনকে এই জাতীয় উপাদানের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

মৃত্তিকার যে অংশ জলে দ্রবণীয় তাতে যে সব উপাদান থাকে গাছ প্রধানতঃ সেই থেকেই খাদ্য আহরণ করে। মাটি প্রয়োজন ও সাধ্যমত ঐ দ্রবণীয় অংশ নিজের ভাণ্ডার থেকে সরবরাহ করে। দ্রবণীয় অংশের একমণ পরিমাণ জলে মাত্র দুই ছটাক বা ততোধিক শুষ্ক লবণ থাকে। কিন্তু গাছের দেহে ঐ লবণের পরিমাণ বহুগুণ বেশী এবং বিভিন্ন গাছ মাটি থেকে কমবেশী লবণ শোষণ করে। গাছের পাতা বা সম্পূর্ণ গাছের অজৈব অংশের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ঘাস জাতীয় গাছে সিলিকনের, আলু জাতীয় গাছে পটাসিয়মের, শস্যপ্রস্তুতকারী (যথা ধান্য, গম ইত্যাদি) গাছে ম্যাগনেসিয়ম্ ও ফস্‌ফরাসের, বাঁধাকপি ও ফুলকপিতে গন্ধকের প্রাধান্য রয়েছে। সুতরাং গাছের প্রয়োজনীয় উপাদান মাটিতে না থাকলে গাছ সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় কখনও বাড়তে পারে না। কি কি কারণে গাছের এই সব উপাদানের বৈষম্য ঘটে সেই বিষয় আলোচনা করা যাক।

(ক) **মাটির বৈগুণ্য**—মাটির বৈগুণ্য হেতু গাছের উপাদানে যে বিভিন্নতা দেখা দেয় তা সহজেই অনুমেয়, কিন্তু তা প্রমাণ করতে হ'লে একই আবহাওয়ায় অথচ বিভিন্ন মাটিতে একই গাছের উপাদান সমূহ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। অসুবিধা এই যে একই আলো বাতাসে বিভিন্ন প্রকারের মাটি পাওয়া সুদুর্লভ। সুতরাং একমাত্র উপায় হচ্ছে বিভিন্ন জায়গার মাটি সংগ্রহ করে একই আবহাওয়ায় নিয়ে এসে তাতে একই গাছের উৎপত্তি ও পরিণতি লক্ষ্য করা। এই রকম গবেষণার সংখ্যা অধিক নয়। ওট্ ও গম শস্য নিয়ে এমনি এক পরীক্ষায় দেখা গেল যে মাটির পটাসিয়ম্ ও ফস্‌ফরাসের সঙ্গে গাছের ঐ ঐ পদার্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ যে যে মাটিতে ঐ দুটি বেশী আছে, গাছও সেই মাটি থেকে ঐ গুলো অধিকমাত্রায় শোষণ করেছে। শুধু তাই নয়, যে মাটি থেকে বেশী শোষণ করতে পেরেছে সেই মাটিতে ফসলের পরিমাণও হয়েছে বেশী।

(খ) **পর পর চাষ**—ক্রমান্বয়ে যদি একই জমিতে একই ফসল তোলা হয় তবে দেখা যাবে পরবর্তী গাছে যেমন উপাদান গুলির পরিমাণও কমছে, তেমনি ফসলেরও যথেষ্ট হ্রাসপ্রাপ্তি হচ্ছে। অন্যান্য সব পদার্থের মধ্যে পটাসিয়মই সত্বর হ্রাস পেয়ে থাকে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পটাসিয়মের ঘাটতি সঙ্কুলান করবার জন্য গাছ ক্যালসিয়ম ও ম্যাগনেসিয়ম অধিক পরিমাণে শোষণ করতে পারে। কিন্তু এই পরিবর্ত প্রথা সব গাছের বেলা খাটে না। একই মাটিতে বারবার একই ফসল তুলতে যেমন পরবর্তী ফসলের পরিমাণ কম হয়, তেমনি খড় বা ঘাসজাতীয় কোন গাছকে যদি বার বার কেটে নেওয়া যায় তবে প্রত্যেক বারেই পরবর্তী কাটা অংশে বিশেষ করে পটাসিয়াম্ ও ক্যালসিয়ামের অভাব ঘটতে থাকে—অথচ ফস্‌ফরাসের অত ঘাটতি দেখা যায় না।

(গ) **আবহাওয়া**—বিভিন্ন মাটি নিয়ে একই আবহাওয়ার পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি একই মাটি নিয়ে বিভিন্ন আবহাওয়ায় গম শস্য নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। আবহাওয়ার প্রভাব এত বেশী হ'তে পারে যে যে মাটিতে পটাশিয়াম বা অন্য কোন পদার্থ কম আছে উপযুক্ত আবহাওয়ার গুণেই কেবল গাছ ঐসব পদার্থ অপেক্ষাকৃত বেশী শোষণ করতে পারে।

(ঘ) **জল**—জলের পরিমাণ এবং যথোপযুক্ত ব্যবহারের উপর গাছের উপাদানের পরিমাণ

বহুলাংশে নির্ভর করে। যেখানে জল স্বভাবতঃ কম জলের পরিমাণ বৃদ্ধিকালে সেখানে নিশ্চিত শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যে সব মাটিতে গাছের পুষ্টিসাধনের প্রয়োজনীয় উপাদান বহুল পরিমাণে আছে, সেখানেও জলের অভাবে ঐসব অতিরিক্ত উপাদান কোন কাজেই আসে না। জলের পরিমাণেরও একটা সীমা আছে; অধিক জলসেচনে বিপরীত ফল দেখা গিয়েছে।

(৬) **সার**—যে-সার দেওয়া হয় গাছ যে কেবল সেই সারের উপাদানই অধিক পরিমাণে মাটি থেকে শোষণ করে তা নয়। অন্যান্য উপাদানের পরিমাণও নির্দিষ্ট করে দেয়। যেমন দেখা গিয়েছে যে গমের গাছে যদি এমোনিয়ম্ সালফেট্ দেওয়া যায় তবে ফসল বাড়ে বটে কিন্তু শস্যে পটাসিয়াম ও ফস্ফরাসের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তেমনি পটাসিয়ামযুক্ত লবণ প্রয়োগে পটাসিয়ামের পরিমাণ গাছে বেড়ে যায় বটে, কিন্তু অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং পটাসিয়ামের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে গেলে এমন এক সময় আসবে যখন অন্যান্য উপাদানের অনুপাতে পটাসিয়ম এত বেশী দেওয়া হবে, যে এই অনুপাতিক বৈষম্য হেতু ফসলের পরিমাণ কমে যাবে। অন্যান্য সারের বেলাতেও এই সাধারণ নিয়মটি খাটে। ফস্ফরাসের ব্যাপারে একটু গোলমাল আছে, কারণ বাইরে থেকে ফস্ফরাসযুক্ত লবণ দিলেও সব সময়েই যে গাছে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে তেমন কোন খাঁটি নজীর পাওয়া যায় না। মাটিতে বর্তমান লৌহের সঙ্গে যুক্ত হলে ফস্ফরাসকে শোষণ করা সাধারণতঃ গাছের ক্ষমতার বাইরে। অথচ ফস্ফরাসের মতন অতিপ্রয়োজনীয় মূল্যবান সার এই রকম নষ্ট হতে দেওয়া সমীচীন নয়। এই বিষয়ে বহু গবেষণার ফলে জানা গেছে কি উপায়ে এই ক্ষতির পরিমাণ কমান যায়। ভবিষ্যতে এই বিষয়ে বিশদ আলোচনার সুযোগ পাওয়া যাবে।

বহু পরীক্ষার পর বিভিন্ন প্রকার সারের পরিমাণের ও গাছের পরিপাক-ক্ষমতার মধ্যে কতকগুলো নিয়মের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে এবং এই নিয়মের আশ্রয় নিয়ে গাছের সারের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করা সম্ভব। কিন্তু এই নিয়মগুলির যথারীতি প্রয়োগ সময় ও সুযোগ সাপেক্ষ।

গাছের উপাদান প্রয়োজন মত সার প্রয়োগে সামান্য পরিবর্তন করা সম্ভব হ'লেও, গাছের আহরণ প্রক্রিয়া এতই জটিল যে জোর করে কিছু বলা চলে না। অবশ্য কোন কোন গাছের বিশেষ বিশেষ উপাদান শোষণের ক্ষমতা অন্যান্য উপাদানের তুলনায় অধিক।

উপাদানের অভাবের নানাবিধ কারণ সংক্ষেপে নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু এর প্রতিকার করতে কখন এবং কি পরিমাণ সার মাটিতে দিতে হবে তার হিসেব নির্ভুল ভাবে করা সম্ভব হয়নি। নতুন নতুন পরীক্ষালব্ধ ফলাফল মোটামুটি কতকগুলি কার্যকরী সূত্রের সন্ধান দিয়েছে মাত্র।

মাটির রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা মাত্র এইটুকু ধারণা করা যেতে পারে যে কি পরিমাণ উপাদান মাটিতে সঞ্চিত আছে, কিন্তু তা যথেষ্ট কিনা অথবা গাছ সেই পরিমাণের কতটুকু দেহ পোষণ ও গঠন কার্যে লাগাতে পারবে সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হ'য়ে কিছুই বলা যায় না। তবে খানিকটা আভাস পাওয়া যায় এমন পরীক্ষা বহু করা হয়েছে এবং হচ্ছে। যে পরীক্ষা থেকে নির্ভরযোগ্য ফলাফল আশা করা যায় সে হচ্ছে ছোট ছোট খণ্ড জমিতে পরিমিত বিভিন্ন সার সংযোগে শস্য উৎপাদন এবং তার পরিমাণ নির্ণয়। যে সার দিয়ে সব চেয়ে বেশী ফসল পাওয়া যাবে, নিশ্চিতরূপে সেই সারের অভাব বর্তমান। হিসেব করে সেই সার দিলেই আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে। কিন্তু এই পরীক্ষা সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল।

উপরের পরীক্ষা খণ্ড জমিতে পরিচালিত না করে ছোট ছোট মৃৎপাত্রে করা যেতে পারে।

ফসল হওয়া পর্যন্ত গাছকে না বাড়তে দিয়ে কিছু-দিনের পরই যদি সম্পূর্ণ কচি গাছ অথবা গাছের পাতার ভস্ম বিশ্লেষণ করা যায় তবে যে-সার সংযোগে পাতার বা কচি গাছের উপাদানের পরিমাণ সব চেয়ে বেশী পাওয়া যাবে, সেই সারই ফসল বৃদ্ধি করতে সমর্থ হবে। এই নিয়মটি এখনও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলছে এবং বহু ক্ষেত্রে আশাপ্রদ ফল-লাভ করা গেছে।

পাতার রাসায়নিক বিশ্লেষণ ছাড়া কেবলমাত্র চাক্ষুষ পরীক্ষা দ্বারাও মাটির প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব কখনও কখনও সঠিক জানা যায়। পটাসিয়ম্‌, ফস্‌ফরাস্‌, নাইট্রোজেন, ম্যাগনেসিয়ম্‌, লৌহ, ক্যাল-সিয়ম্‌ ইত্যাদি এবং ম্যাঙ্গানিজ, দস্তা, তামা ইত্যাদি এদের একটিরও অভাব যদি খুব বেশী হয় তবে গাছ অল্পদিনের মধ্যেই রোগাক্রান্ত হয়। এই রোগের নিদর্শন পাতায়, ফুলে, ফলে দেখতে পাওয়া যায়। পাতার রংএর পরিবর্তন অথবা পাতায় বিচিত্র রংএর দাগ, পাতা সঙ্কোচন, ফলের অস্বাভা-বিক পরিণতি ইত্যাদি এইরূপ রোগের স্পষ্ট নিদর্শন হিসাবে কাজে লাগান যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে যদি কোন মাটিতে পটাসিয়মের অভাব থাকে এবং তাতে তামাক রোপণ করা হয়—দেখা যাবে যে তামাক গাছ হয়ত বাড়তে লাগল কিন্তু পাতা বিচিত্র রংএ রঞ্জিত হয়েছে; পাতার আগা এবং ধার দাগে ভর্তি হয়ে গেছে; ধারগুলো কুঞ্চিত হয়েছে; কাণ্ড সরু সরু। তামাক পাতায় অন্যান্য উপাদানের অভাবজনিত কি কি বাহ্যিক নিদর্শন লক্ষ্য করা হয়েছে তারও ব্যাপক পরীক্ষা করা হয়েছে। এখানে বলা দরকার যে কোন রকম ছাতকবাহী বা পোকা-মাকড়জনিত রোগ হলেও এই রকম নিদর্শন দেবে এবং একের প্রভাব জানতে হলে অন্যের প্রভাব মুক্ত হতে হবে। তামাকের মত অন্যান্য গাছের বেলাতেও এমনি নিদর্শনের উপর নির্ভর করে কোন বিশেষ পদার্থের অভাব জানতে পারা যায়।

উদ্ভিদ-জীবনের উপর মাটির ব্যাপক প্রভাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাণিজগৎ উদ্ভিদের কাছ থেকেই দেহরক্ষার অধিকাংশ প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে, সুতরাং উদ্ভিদের মধ্যে যদি কোন অপরিহার্য পদার্থের অভাব থাকে প্রাণিজগতেও সেই অভাবের প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। অভাবে যেমন রোগের প্রাদুর্ভাব সম্ভব তেমনি অত্যাধিক্যেও। এই নিয়ম প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ উভয় ক্ষেত্রেই অল্পবিস্তর খাটে। কোন কোন পদার্থের (যেমন, তামা, দস্তা, ম্যাগ-নেসিয়ম্‌ ইত্যাদি) আধিক্য বিষবৎ কাজ করে, আবার কোন পদার্থের (যেমন, পটাসিয়ম, ক্যাল-সিয়ম ইত্যাদি) আধিক্য কেবলমাত্র আনুপাতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে গাছকে রোগপ্রবণ করে তোলে। যে জমিতে ঘাস বা গবাদি পশুর খাদ্য জন্মান হয় সেই জমিতে যদি ফস্‌ফরাসের অভাব থাকে তবে ঐ পশুর দেহেও ফস্‌ফরাসের অভাব পরি-লক্ষিত হয়। আমেরিকায় ফস্‌ফরাসের অভাবজনিত রোগের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়েছে। এই রোগে গরুর হাড় নরম হয়ে পড়ে এবং চরম অভাব ঘটলে গরুর হাড় ভক্ষণ করবার অতৃপ্ত স্পৃহা জন্মে। অন্যদিকে, ম্যাগনেসিয়ম্‌ অধিক পরিমাণে থাকলে গবাদি পশু কাঁপুনি রোগে আক্রান্ত হয়। এই রকম বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে এবং গত দশ-পনের বছরে এই সম্বন্ধে বিস্তর তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

বর্তমান প্রবন্ধে রাসায়নিক উপাদানের মাত্র অজৈব অংশের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। মাটির জৈবাং-শের (Humus) কার্যকলাপ পরে আলোচনা করা হবে। ইহা ব্যতীত, বিভিন্ন আকার ও আয়-তনের মৃত্তিকা-কণিকার ও জৈবাংশের সমাবেশে মাটি কতকগুলি প্রয়োজনীয় ভৌতধর্ম (physical properties) প্রাপ্ত হয়; এই ভৌতধর্মও জমির উর্বরক্ষমতা নির্ধারণ করে। বারান্তরে এই আলোচনাও আরম্ভ করা যাবে।

পরিষদের কথা

প্রথম সাধারণ অধিবেশনের বিবরণী

গত ২১শে ফেব্রুয়ারি শনিবার অপরাহ্ণ ৪৷৷০ টায় বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়নের বক্তৃতা ঘরে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রথম সাধারণ অধিবেশন হয়। সভায় অনুমান দুই শতাধিক সভ্য উপস্থিত ছিলেন। সভার প্রারম্ভে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সভার কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে সভাস্থ সকলে এক মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

অতঃপর সভাপতি কর্তৃক আহূত হইয়া পরিচালক মণ্ডলীর কর্মসচিব শ্রীসুবোধনাথ বাগচী পরিচালক মণ্ডলীর কার্যবিবরণী পাঠ করেন। বিবরণীতে বলা হয় যে এ যাবৎ পরিষদের ৫৫০ জন সাধারণ এবং ১৮ জন আজীবন সভ্য হইয়াছেন। ইহা ভিন্ন শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের বিশেষ দান ৩৫০৲ ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইয়াছে। ২৫শে জানুয়ারী পরিষদের উদ্বোধন হয় এবং ঐ দিনেই "জ্ঞান ও বিজ্ঞান"-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

অতঃপর কোষাধ্যক্ষ শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত পরিচালক মণ্ডলীর খরচ-খরচার হিসাব দাখিল করেন। এ যাবৎ পরিষদের মোট আয় ৮৫৩০-১৪-০ হইয়াছে ও মোট ব্যয় ২৭৩৬-০-৩ হইয়াছে। অবশিষ্টের ৪৬৮৩-১৩-৩ ব্যাঙ্কে আছে এবং বাকি টাকা কর্মসচিবের হাতে আছে।

অতঃপর গঠনতন্ত্রের আলোচনা হয় এবং সভায় স্থির হয় যে বর্তমান গঠনতন্ত্রে নিম্নলিখিত পরিবর্তন কয়টি করার পর উহা সাময়িক ভাবে কার্যকরী হইবে। ইতিমধ্যে একটি 'নিয়মাবলী উপসমিতি' গঠিত করিয়া তাঁহাদের হাতে বর্তমান গঠনতন্ত্রের আলোচনাদির * পূর্ণভার অর্পিত হইবে। এই উপসমিতি ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁহাদের কার্য বিবরণী সভাপতির নিকট দাখিল করিবেন।

গঠনতন্ত্রের বর্তমান পরিবর্তনের তালিকা:

১। বানান ভুল ও ছাপার ভুল সংশোধন করা হইবে।

২। ১নং নিয়মের 'সংক্ষেপে বলা হইবে বিজ্ঞান পরিষদ' অংশটি বাদ যাইবে।

৩। ২ নং নিয়মের 'কার্যকরী সমিতি অন্য ঠিকানা না স্থির করা পর্যন্ত বিজ্ঞান পরিষদের মূল কার্যালয়—৯২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা এই ঠিকানায় অবস্থিত হইবে' অংশটি বাদ যাইবে।

৪। ৮ (ক) ১ নিয়মের 'বিশেষক্ষেত্রে কার্যকরী সমিতি বাকি চাঁদা পূর্ণত বা অংশত রেহাই দিতে পারিবেন' অংশটি বাদ যাইবে।

৫। ৮ (গ) নিয়মের '২৫ জানুয়ারি'র পরিবর্তে '২১শে ফেব্রুয়ারি' লিখিত হইবে।

৬। ১০ নং নিয়মের ২য় পংক্তির 'ভবিষ্যতে' কথাটির পর 'যাঁহার উপর' কথাটি যুক্ত হইবে এবং নিয়মটির শেষে 'কর্মীসভ্য সাধারণ সভ্যের মত চাঁদা দিবেন' বাক্যটি যুক্ত হইবে।

৭। ১১ নং নিয়মের প্রথম পংক্তির 'জ্ঞান-সাধক' কথাটি বাদ যাইবে।

৮। ১২ (ঙ) নিয়মের প্রথম পংক্তির 'বর্ষের চাঁদা বা' কথা কয়টি বাদ যাইবে।

---

* আলোচনার অর্থ হইল আবশ্যকমত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন সংশোধনী প্রস্তাব দাখিল করা।

৯। নিম্নলিখিত নূতন নিয়মটি যোগ করা হইবে:—

১৪ (ঘ) (১) প্রয়োজন হইলে অনধিক তিনজন সভ্যকে কার্যকরী সমিতি অতিরিক্ত সদস্যরূপে মনোনীত করিতে পারিবেন।

১০। ২৮ (ঙ) নিয়মের প্রথম পংক্তির 'দশ' স্থানে 'সাত' হইবে এবং 'এই স্থগিত অধিবেশন পনের দিনের মধ্যে যথাবিধি আহূত হইলে এবং তাহাতে কোনও নূতন আলোচ্য বিষয় পেশ না করিলে সাতজন সদস্যের উপস্থিতিতে কাজ চলিবে' অংশটি বাদ যাইবে।

১১। ২২ (ক) নিয়মের 'একশত' স্থানে 'দেড়শত' হইবে।

নিয়মাবলী উপসমিতি:—

সভাপতি—শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, আহ্বায়ক—শ্রীরমণীমোহন রায়; সদস্য—শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন, শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় শ্রীপুর্ণেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীশুভেন্দ্রমোহন মিত্র, শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী, শ্রীবিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়।

অতঃপর আগামী বৎসরের জন্য কার্যকরী সমিতি নির্বাচিত হয়। নির্বাচনের পূর্বে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে অদ্যকার সভা এই বৎসরের যাবতীয় নির্বাচন কার্য সম্পন্ন করিবে।

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রস্তাবিত হইয়া সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হ'ন।

যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র, শ্রীসত্যচরণ লাহা ও শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সহঃ সভাপতি পদে নির্বাচিত হ'ন এবং শ্রীসুবোধনাথ বাগচী কর্ম-সচিবের পদে, শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় সহসকর্মসচিবের পদে ও শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত কোষাধ্যক্ষের পদে নির্বাচিত হ'ন।

পরিচালক মণ্ডলী কর্তৃক যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া নিম্নলিখিত সভ্যগণ কার্যকরী সমিতির সদস্যপদে নির্বাচিত হন: শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, শ্রীরুক্মিণীকিশোর দত্ত রায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীজীবনময় রায়, শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, শ্রীসুকুমার বসু, শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ, শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপরিমল গোস্বামী, শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীসত্যব্রত সেন, শ্রীসুনীলকৃষ্ণ রায় চৌধুরী, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

অতঃপর নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া মন্ত্রণাপরিষদ গঠিত হয়।

মন্ত্রণা পরিষদ

রসায়ন—শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়,* ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯, শ্রীসুধাময় ঘোষ, ১৫ জাষ্টিস চন্দ্রমাধব রোড কলিকাতা-২৫; শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী, ৪৪।এ নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীদিবাকর মুখোপাধ্যায়, রাসায়নিক গবেষণাগার, বরাহনগর জুট মিল, বরাহনগর, ২৪ পরগণা, শ্রীনির্মলকুমার সেন, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চৌধুরী, ৯৩ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯; শ্রীরমণীমোহন রায়, ২১০ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী, ৯২ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা-৯, শ্রীবীরেশচন্দ্র গুহ, ৯২ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা-৯, শ্রীশান্তিরঞ্জন পালিত,** ২১০ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯; শ্রীমহেন্দ্রনাথ গোস্বামী, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯, শ্রীকুমুদবিহারী সেন, ৯।সি মোহনলাল স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীহীরালাল রায়, যাদবপুর কলেজ, ২৪ পরগণা, শ্রীসুধাময় মুখোপাধ্যায়, ৮৮ এফ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা;

* শাখার সভাপতি যাঁহারা মন্ত্রণা পরিষদের সহকারী সভানায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন।

** শাখার আহ্বায়ক।

† কার্যকরী সমিতির সদস্য যাঁহারা পদাধিকার বলে মন্ত্রণা-পরিষদের সভাসদ আছেন।

শ্রীপুলিনবিহারী সরকার, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯; শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯; শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যক্ষ, বেঙ্গল টেক্স্টাইল ইন্‌ষ্টিটিউট, শ্রীরামপুর, হুগলী; শ্রীসুবোধনাথ বাগচী ✝ ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯; শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ✝, ৬০ জয়মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৫; শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত ✝, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯; শ্রীসত্যব্রত সেন ✝, ৪১।২ডি চারু এভিনিউ, টালিগঞ্জ, কলিকাতা; শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র ✝, ২২ গড়পার রোড, কলিকাতা-৯।

পদার্থবিজ্ঞান—শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু, ৯৩ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯, শ্রীশিশির কুমার মিত্র,* ৯২ আপারসারকুলার রোড, কলিকাতা ৯; শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯; শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, ৩৩১ বি ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা ২০; শ্রীগৌরদাস মুখোপাধ্যায়, ৬১।১ বি ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলিকাতা; শ্রীহৃষিকেশ রক্ষিত **, ৯২ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা ৯; শ্রীপূর্ণচন্দ্র মহান্তি, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯; শ্রীঅনন্তকুমার সেনগুপ্ত, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯; শ্রীচন্দ্রশেখর ঘোষ, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯; শ্রীকুলেশচন্দ্র কর, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা; শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়, ৯৩ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯; শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৪এ বাওয়ালী মণ্ডল রোড, কলিকাতা ২৫; শ্রীস্নেহময় দত্ত, ৩৯ হিন্দুস্থান পার্ক, বালিগঞ্জ, কলিকাতা; শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, ✝ ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯; শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, ✝ ৩ বিপ্রদাস স্ট্রীট, কলিকাতা ৯; শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, ✝ ১০।২ অবিনাশ মিত্র লেন, কলিকাতা ৬

গণিত—শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন,* ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯, শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯; শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ, অধ্যক্ষ, হুগলী মহসীন কলেজ, হুগলী; শ্রীসিতেশচন্দ্র কর, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯; শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ**, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯; শ্রীভূপতিমোহন সেন, ১৬ পাম এভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলিকাতা; শ্রীনলিনীমোহন বসু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রমনা, ঢাকা; শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ✝, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯।

রাশিবিজ্ঞান—শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ*, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা; শ্রীসমরেন্দ্র নাথ রায়, রাশিবিজ্ঞান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; শ্রীবিমলচন্দ্র ভট্টাচার্য, স্টাটিষ্টিক্যাল ইনষ্টিটিউট, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা; শ্রীহরিকিঙ্কর নন্দী, ১৯।৬ সি উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা; শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার বসু, রাশিবিজ্ঞান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; শ্রীবীরেন্দ্র নাথ ঘোষ**, অধ্যাপক রাশিবিজ্ঞান, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা; শ্রীমনীন্দ্রনাথ ঘোষ, রাশিবিজ্ঞান, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ✝ ৩ রাধানাথ বসু লেন, কলিকাতা ৬।

চিকিৎসা বিজ্ঞান—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য, ** ১৬ বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৩; শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাগোবিন্দ কর মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা; শ্রীসুধীন্দ্রনাথ সিংহ, ২৭।বি বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা ১৯, শ্রীঅনিলকুমার রায় চৌধুরী, ৫ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ফ্ল্যাট-১এ, কলিকাতা; শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, চিকিৎসা জগৎ, ২৭।সি আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯; শ্রীসুবোধ চন্দ্র মিত্র, ১।২ গোখেল রোড, কলিকাতা; শ্রীফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়, ৪৭।২ হাজরা রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা; শ্রীধীরেন্দ্রনাথ রায়, ৪।ডি ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, শ্রীসুশীলকুমার সেন, ২৩৩ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা; শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র চৌধুরী, * ৫৬।২ ক্রীক রো, কলিকাতা; শ্রীসতীনাথ বাগছী, ১২৪।৩ মাণিকতলা স্ট্রীট,

কলিকাতা; শ্রীশচীকুমার চট্টোপাধ্যায়, মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা।

শারীরবৃত্ত—শ্রীবিজনবিহারী সরকার, * ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯; শ্রীপরিমল বিকাশ সেন, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯, শ্রীবিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়, ৫৪ গোপীমোহন দত্ত লেন, কলিকাতা-৩; শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, ৫।৪ বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯; শ্রীনিবারণ ভট্টাচার্য, ১৯ হিন্দুস্থান রোড, কলিকাতা ১৯; শ্রীনগেন্দ্র নাথ দাস * * †, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯।

মনোবিজ্ঞান—শ্রীগিরিন্দ্রশেখর বসু, * ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯, শ্রীসুধীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২ পাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪; শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা; শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য; শ্রীসুহৃৎচন্দ্র মিত্র, † ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯; শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯।

কৃষিবিজ্ঞান—শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, ৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯; শ্রীপ্রাণকুমার দে, গভর্ণমেণ্ট কৃষি ফার্ম, চুঁচুড়া, হুগলী; শ্রীপবিত্রকুমার সেনগুপ্ত, * কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্ত, পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা; শ্রীঅশোক রায়চৌধুরী, * * মাখনপুর, হরিণঘাটা, ২৪ পরগণা; শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ৩৭।বি বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯।

উদ্ভিদ-বিজ্ঞান—শ্রীসহায়রাম বসু, ১৩।২এ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা; শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী, ৩৫ বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা-১৯; শ্রীকালিপদ বিশ্বাস, বটানিক্যাল গার্ডেন, হাওড়া; শ্রীযতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ২ বিপিন পাল রোড, কলিকাতা২৬; শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার*, প্রেসিডেন্সী কলেজ কলিকাতা; শ্রীপুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, **প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা; শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ২ কালু ঘোষ লেন, কলিকাতা-৯; শ্রীঅমিয় কুমার ঘোষ, † ৩৫ বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা-১৯।

প্রাণিবিজ্ঞান—শ্রীহিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায়, ৩৫ বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা-১৯; শ্রীদুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়, ৩৫ বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা-১৯; শ্রীপূর্ণেন্দুকুমার সেন, ৩৫এ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-১৯, শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাস, ১৪ সীতারাম বসু লেন, সালিখা, হাওড়া; শ্রীসত্যচরণ লাহা †, ৫০ কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা; শ্রীজ্ঞানেন্দ্র লাল ভাদুড়ী, * * † ৩৫ বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা; শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, † ৯৩ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯।

নৃতত্ত্ব—শ্রীননীমাধব চৌধুরী, ৯৭ বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা ১৯; শ্রীতারক চন্দ্র দাস, * * ৩৫ বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা-১৯; শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ৩ গৌর মুখার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা; শ্রীক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, † ৩৫ বালিগঞ্জ সাকুলার রোড কলিকাতা-১৯; শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, † ১০ প্রিয়নাথ ব্যানার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূতত্ত্ব, খনিজতত্ত্ব ও ভূগোল—শ্রীনির্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়, * ভূতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ; শ্রীপ্রকৃতিকুমার ঘোষ, ২৭ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা; শ্রীবরদাচরণ গুপ্ত, ৬৭ কেয়াতলা রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা; শ্রীপতাকীকুমার চট্টোপাধ্যায়, ২৭ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা; শ্রীভবেশচন্দ্র রায়, ২৭ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা; শ্রীসন্তোষকুমার রায়, অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব বিভাগ, প্রেসিডেন্সি কলেজ; শ্রীরুক্মিণীকিশোর দত্তরায় * * †, ২৭ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা; শ্রীশিবপদ চট্টোপাধ্যায়, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; শ্রীনির্মলকুমার বসু, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; শ্রীকাননগোপাল বাগচী, ভূগোল বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সেচ বিজ্ঞান—শ্রীদেবেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ৬ গোখেল রোড, কলিকাতা; শ্রীসুরেন্দ্রকুমার গুহ,

প্রধান ইঞ্জিনিয়ার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, এ্যাণ্ডারসন হাউস, আলিপুর, কলিকাতা; শ্রীগোপীবল্লভ মণ্ডল, সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, এ্যাণ্ডারসন হাউস, আলিপুর, কলিকাতা; শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার, পি ৩৭৮ সাদার্ন এভিনিউ, কলিকাতা; শ্রীনলিনী কান্ত বসু,** ডিরেক্টর, রিভার রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, এ্যাণ্ডারসন হাউস, আলিপুর, কলিকাতা।

ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিজ্ঞান—শ্রীসতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, যাদবপুর কলেজ, ২৪ পরগণা; শ্রীবীরেন্দ্র নাথ দে, ১১ লোয়ার রডন স্ট্রীট, কলিকাতা; শ্রীঅক্ষয়কুমার সাহা, ৪ গণেশ এভিনিউ, ফ্ল্যাট ১২এ, কলিকাতা; শ্রীঅখিলচন্দ্র চক্রবর্তী**, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ, শিবপুর, হাওড়া।

ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুবিজ্ঞান—শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর, হাওড়া; শ্রীভূপতিকুমার চৌধুরী; শ্রীশচীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫বি মতিলাল নেহেরু রোড, কলিকাতা ২৯; শ্রীমাখনলাল বন্দোপাধ্যায়; শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন*, অধ্যক্ষ শিবপুর কলেজ, শিবপুর, হাওড়া; শ্রীঅমূল্যধন দেব, লোকোমোটিভ বিল্ডিং প্রজেক্ট রেলওয়ে বোর্ড, ১০৫ নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা; শ্রীসুকুমার বসু †, ১৬ আরল স্ট্রীট, কলিকাতা-২৬; শ্রীসুনীলকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, ১৩২।১এ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা-৪।

সাহিত্য বিজ্ঞান—শ্রীবিনয়কুমার সরকার, ৪৫ গিরিশ বসু রোড, কলিকাতা-১৪; শ্রীরাজশেখর বসু, ৭২ বকুল বাগান রোড, কলিকাতা-২৫, বালিগঞ্জ; শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৬ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা; শ্রীভাস্কর মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা করপোরেশন, কলিকাতা; শ্রীঅমল হোম, ১৬৯।বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা; শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, ১২৫ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯; শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ*, ১২।১০ গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা; শ্রীহিরণ সান্যাল, 'পরিচয়', ৩০ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা; শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য, ১৭।১ একতালিয়া রোড, কলিকাতা; শ্রীমিহিরকুমার সেন, ৫০ লেক প্লেস, কলিকাতা-২৯; শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, ৭ ডোভার লেন, কলিকাতা-১৯; শ্রীঅরুণকুমার সেন, ১২১ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা-২৬; শ্রীসজনীকান্ত দাস**, ২৫।২ মোহনবাগান লেন, কলিকাতা; শ্রীগোপাল হালদার; শ্রীনীরেন্দ্র নাথ রায়, ৪৬।৭এ বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১৯; শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ৫ রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা; শ্রীবাণী চট্টোপাধ্যায়, ৩।০ ডাঃ শচীকুমার চট্টোপাধ্যায়, মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা-৬; শ্রীঅতুলচন্দ্র বসু, প্রিন্সিপ্যাল, গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা; শ্রীসুশীলকুমার পাল, রূপবাণী, ৪২এ জয়মিত্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৫; শ্রীনিখিল ভাদুড়ী।

দিল্লী—শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মন্ত্রী ভারত সরকার, নয়াদিল্লী; শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, শাজাহান রোড, নয়াদিল্লী; শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডিরেক্টর, ভারতীয় কৃষি গবেষণাগার, পুসা, নয়াদিল্লী; শ্রীশিখিভূষণ দত্ত, অধ্যাপক, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়; শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত, শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তর, নয়াদিল্লী।

এলাহাবাদ—শ্রীঅমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞান কুটীর, বেলী রোড, এলাহাবাদ।

বোম্বাই—শ্রীশিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩০ এল্টা-মণ্ট রোড, বোম্বাই ২৬।

বারাণসী—শ্রীধীরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

পাটনা—শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, সায়েন্স কলেজ, পাটনা; শ্রীসজনীকুমার চট্টোপাধ্যায়, পাব্লিক হেলথ লেবরেটারী. বাঁকিপুর, পাটনা।

নাগপুর—শ্রীরঘুবীর, ওল্ড এ্যাসেম্ব্লী রেস্ট হাউস, নাগপুর।

জমসেদপুর—শ্রীনলিনবিহারী সেন, ৫ ফস্ক রোড, টাটানগর, জমসেদপুর।

কটক—শ্রীসর্বাণীসহায় গুহ সরকার, র‍্যাভেনশ কলেজ, কটক।

রাঁচী—শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু, ল্যাক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পোঃ নামকুম, রাঁচী।

ঢাকা—শ্রীসতীশরঞ্জন খাস্তগীর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রমনা, ঢাকা; কাজী মোতাহার হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রমনা, ঢাকা।

ধানবাদ—শ্রীজগত্তারণ ধর, ভারতীয় খনি বিদ্যালয়, ধানবাদ।

পুণা—শ্রীশরদিন্দু বসু, ডেপুটি ডিরেক্টর অব অবসারভেটরিজ, গণেশখিণ্ড রোড, পুণা-৫।

ইহার পর শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী কর্তৃক আনীত নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি বিশেষ আনন্দের সহিত সভায় গৃহীত হয়:—

'সদ্যগৃহীত নিয়মাবলীর ১১ সংখ্যক নিয়ম অনুসারে এই প্রথম সাধারণ অধিবেশনে বিশিষ্ট সভ্য নির্বাচন অসম্ভব বলিয়া আমরা প্রস্তাব করিতেছি—যে এই প্রথম অধিবেশনে আচার্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এবং ডাক্তার শ্রীসুন্দরীমোহন দাস এই দুইজন প্রবীণতম বিজ্ঞান-সেবী সাহিত্যিককে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্বাচন করা হউক।'

সভায় শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ ও শ্রীসমরেন্দ্র নাথ রায় হিসাব পরীক্ষক নিযুক্ত হ'ন এবং স্থির হয় যে এই সভার কার্যক্রম নিম্নলিখিত ভদ্রোমহোদয়গণ কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া গৃহীত হইবে।

অনুমোদক মণ্ডলী:—শ্রীবিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরমণীমোহন রায়, শ্রীঅরুণকুমার সেন, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী।

সভাভঙ্গের পূর্বে সভাপতি জানান, যে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের কর্তৃপক্ষ বৎসরকাল ব্যবহারের জন্য পরিষদকে তাঁহাদের মন্দিরের একটি ঘর ছাড়িয়া দিয়াছেন।

সভ্যবৃন্দ একবাক্যে এই প্রস্তাবে আনন্দপ্রকাশ করেন এবং কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সাঃ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, সভাপতি
সাঃ শ্রীসুবোধনাথ বাগচী, কর্মসচিব
সাঃ শ্রীবিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায়
সাঃ শ্রীবিজয়কালী গোস্বামী
সাঃ শ্রীঅরুণকুমার সেন
সাঃ শ্রীরমণীমোহন রায়
সাঃ শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী। তাং ১১ই মার্চ ১৯৪৮

মন্ত্রণাপরিষদের সভা

গত ১৮ই মার্চ সায়েন্স কলেজে রসায়ন বিভাগের বক্তৃতাগৃহে মন্ত্রণাপরিষদের প্রথম অধিবেশন হয়। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সর্বসম্মতিক্রমে শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু এবং শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী যথাক্রমে মন্ত্রণাপরিষদের সভানায়ক ও মন্ত্রণাসচিবের পদে নির্বাচিত হন। সভায় বিভিন্ন শাখার সভানায়ক (যাঁহারা মন্ত্রণা-পরিষদের সহকারী সভানায়করূপে কার্য করিবেন) এবং আহ্বায়ক নির্বাচন করা হয়।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি মন্ত্রণাপরিষদের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম বর্ণনা করেন। উপস্থিত সুধীবৃন্দ ঐ সম্পর্কে আলোচনা করেন। শ্রীঅক্ষয়কুমার সাহা আবিষ্কারকদের সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উল্লেখ করেন এবং তাঁহাদিগকে সাহায্য করা বিজ্ঞান পরিষদের কর্তব্য বলিয়া মন্তব্য করেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হয়:—

সভাপতি—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
আহ্বায়ক—শ্রীঅক্ষয়কুমার সাহা
সদস্য—শ্রীহীরালাল রায়
শ্রীবীরেশচন্দ্র গুহ
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মহান্তি
শ্রীশ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়
শ্রীগিরিজাপতি ভট্টাচার্য

২৬শে জানুয়ারী হইতে ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত প্রতিষ্ঠাকালীন সভ্যদের তালিকা

সা ৪৯৭
শ্রীঅজিতকুমার গুপ্ত
পি ৪৯১ সাদার্ণ এভিনিউ, কলিকাতা

সা ৪৯৯
শ্রীঅজিতকুমার সেন
৭০ কাঁশারীপাড়া রোড, কলিকাতা ২৫

সা ৪৯৫
শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য
১।১ ভৈরব বিশ্বাস লেন, কলিকাতা

সা ৫৩১
শ্রীঅনিলকুমার সেন
৬৮ নং হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সা ২১৪
শ্রীঅবনীকুমার দে
২৭ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা

সা ৫২০
শ্রীঅমিয়কুমার ভট্টাচায
২০৬ কালীচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা ২

সা ৪৯২
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বর্দ্ধন
বিদ্যাসাগর কলেজ
৩৯ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা

সা ৫৪৭
এম, এ, সাবুর এস্কোয়ার
ডিরেক্টর অফ ইণ্ডাষ্ট্রীজ
৭ কাউনসিল হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সা ৫৩৮
শ্রীকালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
২০।১।১ এ চৌধুরী লেন, কলিকাতা ৪

সা ৫০৫
শ্রীকিরণময় সিংহ
৫৬।২।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯

আ ১৮
Sri Kumud Sen
4 Sonehri Bag Road, New Delhi.

সা ৫১৪
শ্রীকৃত্তিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়
২ একডালিয়া রোড, কলিকাতা ১৯

সা ৫১১
শ্রীগণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়
৬৯ পূর্ণ মিত্র প্লেস
টালিগঞ্জ, কলিকাতা

সা ৫৪৬
শ্রীগোপাল হালদার
১৪৫।বি বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা ৬

সা ৫৩২
শ্রীকুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়
৭৬।৪ ইচ্ছাপুর রোড, হাওড়া

সা ৫৪৮
শ্রীচন্দ্রশেখর ঘোষ
২০ হাজরা রোড, কলিকাতা ২৬

সা ৫৪৩
শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী
৭।১ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

সা ৫১৫
শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী
১।১ ২।১ রামচাঁদ নন্দী লেন, কলিকাতা ৬

সা ৫৪০
শ্রীদেবকুমার বসু
১৬ ডি ডোভার লেন, কলিকাতা ১৯

সা ৫৪৫
শ্রীনকুড়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
পোঃ জনাই, গ্রাম—বাকসা
জেলা—হুগলী

সা ৫৪৯
শ্রীনারায়ণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
৪৪ বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সা ৫৩৬
শ্রীনিতাইচাঁদ মিত্র
১৭৭ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সা ৫১৩০
শ্রীনির্ম্মলকুমার সরকার
২৩৫ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া

সা ৫২২
শ্রীনীরজামোহন বসু
সিটি কলেজ, কলিকাতা ৯

সা ৫২১
শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য
বুকল্যাণ্ড লিঃ
১ শঙ্করঘোষ লেন, কতিকাতা

আ ১৭
Sri Pareschandra Bhattacharya
11 Toglak Road, New Delhi

সা ৫০৭
শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য
৪০।১ আমহার্স্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

সা ৫০১
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
পল্লীমধু, বৈদ্যবাটি
জেলা হুগলী

সা ৫০৪
শ্রীপ্রভাতকুমার মিত্র
৩ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলিকাতা ৪

সা ৫০২
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দে
যাদবপুর ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজ, কলিকাতা

সা ৫১৯
শ্রীপ্রশান্তকুমার ঘোষ
৩৪ সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

সা ৫৩১
শ্রীবিজয়কেতু বসু
১৪।১ পার্শীবাগান, কলিকাতা ৯

সা ৫৩০
শ্রীবিনয়কুমার ডালমিয়া
৮ নিউ রোড, কলিকাতা ২৭

সা ৫০৩
শ্রীবিষ্ণুপদ সেনগুপ্ত
পি ৯৪ সদার শঙ্কর রোড, কলিকাতা ২৯

সা ৪৯১
Sri Bhudebchandra Basu
Indian Veterinary Research Institute
Izzatnagar, Bareilly.

সা ৪৯৪
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ গুহ
৩৯ বীডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সা ৫২৫
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
৩ গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

সা ৫৩৫
শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
শিবপুর দীনবন্ধু ইনষ্টিটিউশন, শিবপুর

সা ৪৯৬
শ্রীমৃত্যুঞ্জয়কুমার মিত্র
৫৬।-বি গোপাল মল্লিক লেন, কলিকাতা ১২

সা ৫২৪
শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
৩৭বি বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা ১৯

সা ৫৪৪
শ্রীযতীন্দ্রমোহন দাশশর্ম্মা
৫ মধুসূদন বিশ্বাস লেন, হাওড়া

। ৫৩৯
শ্রীযতীশচন্দ্র গুপ্ত
২০ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা ৯

সা ৪৯০
Sri Raghu Bira
Old Assembly House Street
Nagpur

সা ৫১৭
শ্রীরমেশকুমার ঘোষাল
৩৫ রামানন্দ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সা ৪৯৮
Sri Rameshchandra Roy
B. M. Das Road
Bankipore, Patna

সা ৫৫০
শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়
১৯ রাজা বসন্ত রায় রোড, কলিকাতা ২৯

সা ৫১৬
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস
৯৭ তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা ৬

সা ৫৩৭
শ্রীললিতমোহন দাস
১৭।১৮ বৈরাগীপাড়া লেন
সালিখা, হাওড়া

সা ৫২৬
শ্রীশঙ্করসেবক বড়াল
৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯

সা ৫০০
Sri Sasanka Shekhar Sircar
Anthropological Survey of India
64 Cantonment, Benares Cant.

সা ৫১০
শ্রীশশীভূষণ ভুঁইয়া
পল্লীশ্রী শিক্ষায়তন, উদয়রামপুর
পোঃ বিষ্ণুপুর, ২৪পরগণা

সা ৪৯৩
শ্রীশৈলেন ঘোষ
১০ মার্কেণ্টাইল বিল্ডিং
লালবাজার, কলিকাতা

সা ২২১
শ্রীশ্যামচাঁদ বসু
৮ সি মোহনলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪

সা ৫২৮
Sri Srimohan Gupta
Civil Aviation Training Centre
Saharanpore

সা ৫০৬

শ্রীসচ্চিদানন্দ কুমার

১৩৭।৮ বেলিয়াঘাটা রোড, কলিকাতা ১৫

সা ৫৩৪

শ্রীসতীশচন্দ্র বেরা

সহঃ প্রধান শিক্ষক, বিজ্ঞান বিভাগ

গড় রাইপুর

সা ৫১২

শ্রীসত্যপ্রসন্ন দত্ত

পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

সা ৫১৮

শ্রীসন্ন্যাসীচরণ দে

২২, পাইকপাড়া রো

বেলগাছিয়া, কলিকাতা

সা ৫২৭

Sri Saroj Dutta

Civil Aviation Training Centre

Saharanpore

সা ৫৩৩

শ্রীসরোজকুমার দত্ত

৫ ডাঃ বিপিনবিহারী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪

সা ৫০৮

শ্রীসুধীরকুমার বসু

মনোবিদ্যাবিভাগ

৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা

সা ৫২৯

Sri Sunitykumar Ganguli
Civil Aviation Training Centre
Saharanpore.

সা ৫৪২

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ

৬৯।এ ডব্লু, সি, ব্যানার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সা ৫০৯

Sri Harendranath Roy
Protozoologist,
Indian Veterinary Research Institute
Mukteshwar

সা ৫২৩

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

৯২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯

বিজ্ঞপ্তি

নিয়মাবলীর পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিবর্জন বা সংশোধনাদি সম্পর্কিত প্রস্তাব ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে ২১০, বহুবাজার ষ্ট্রীট, শ্রীরমণীমোহন রায় মহাশয়ের নিকট পাঠাইবার জন্য সভ্যদিগকে অনুরোধ করা হইতেছে।

সুবোধনাথ বাগ্‌চি
কর্মসচিব।

ভ্রম সংশোধন

গত ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় প্রকাশিত "বাঙালী কলেজ ছাত্রদিগের দৈহিক দৈর্ঘ্য ও মস্তকাকারের ভেদ" নামক প্রবন্ধটি শ্রীমীনেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক অনুদিত।

ঐ সংখ্যায় ৯৬ পৃষ্ঠার পর মুদ্রিত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছবিখানি, শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী কর্তৃক গৃহীত ও সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।—সম্পাদক।

ভগ্ন স্বাস্থ্যে
NEURO
LECITHIN
হেল্থ
নিউরোলেসিথিন
ইণ্ডিয়ান হেলথ ইনষ্টিটিউট এণ্ড লেবরেটরী • কলিকাতা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

প্রথম বর্ষ এপ্রিল—১৯৪৮ চতুর্থ সংখ্যা

খনিজ সম্পদ ও বর্তমান সভ্যতা

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভাবগুলি বর্ধিত হইতেছে এবং সেইগুলি মিটাইবার জন্য তাহাকে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হইতেছে।

প্রাচীন সভ্যতা বলিলে আমরা প্রাক্‌যন্ত্রযুগীয় সভ্যতা বুঝি। ইহার প্রথম উন্মেষ কোন্ সুদূর অতীতে হইয়াছিল তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তখন যে ক্ষীণ রেখাপাত হইয়াছিল তাহা বহু শতাব্দীর পুঞ্জীভূত ধূলিকণার নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। তবে ইহাও নিশ্চিত যে প্রাচীন সভ্যতা অতি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া আপন প্রসার বিস্তার করিয়াছিল।

প্রাচীন সভ্যতার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে প্রাচীনেরা শক্তি উৎপাদনের জন্য শক্তির চিরন্তন উৎসগুলি মাত্র ব্যবহার করিতেন। শ্রমশিল্প বলিলে কুটীর-শিল্প বুঝাইত। মানুষের ও গবাদি পশুর কায়িক পরিশ্রম শক্তি উৎপাদনের প্রধান উপায় ছিল। নৌকা, অর্ণবপোত ইত্যাদি পালে চলিত। যানবাহন ইত্যাদির জন্য গো, অশ্ব, হস্তী প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে বর্তমান যুগ যন্ত্রযুগ নামে অভিহিত হইতে পারে। যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে মুখ্যতঃ লৌহ এবং গৌণতঃ তাম্র, দস্তা, নিকেল, এলুমিনিয়ম প্রভৃতি লৌহেতর ধাতুসমূহ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য যন্ত্র-নির্মাণ ভিন্ন পূর্তকার্যেও বহুল পরিমাণে লৌহ ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে যন্ত্র চালাইবার উপযোগী শক্তি উৎপাদনের জন্য পাথুরে কয়লা, খনিজ তৈল ইত্যাদি খনিজ পদার্থের প্রয়োজন। সুতরাং দেখা গেল যে পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থাৎ তথাকথিত "যান্ত্রিক সভ্যতার" যুগে মানুষকে খনিজ পদার্থের উপর অত্যধিক পরিমাণে নির্ভর করিতে হইতেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসের এক অতি প্রাচীন অধ্যায়ে ধাতব পদার্থের ব্যবহার আরম্ভ হয় এবং সেই সঙ্গে প্রস্তর-যুগেরও অবসান হয়। তখন হইতেই খনিজ পদার্থের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান রূপে পৃথিবীর নানাস্থানে দেখা দিয়াছে—অর্থাৎ মানুষে পৃথিবীর কোটি কোটি বৎসরের সঞ্চিত খনিজ-ভাণ্ডারের উপর হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে দুইটি মহাসমর সমগ্র পৃথিবীকে এক কথায় বিধ্বস্ত করিয়াছে, তাহাতে খনিজ পদার্থ যে পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে পূর্বতন কোন পাঁচ শতাব্দীতে যে হয় নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

দেশমাত্রেরই শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি কতকগুলি কাঁচা মালের সরবরাহের উপর নির্ভর করে। এই কাঁচা মাল অংশতঃ কৃষিজাত এবং অংশতঃ খনিজ পদার্থ। কাঁচা মালের প্রথমোক্ত উৎস চিরন্তন, কারণ অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নানা কারণে উৎপন্ন পদার্থের পরিমাণের তারতম্য হইলেও মোটের উপর প্রতিবৎসরই কৃষিজাত পদার্থ কিছু না কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু খনিজ পদার্থের সম্বন্ধে সে কথা একেবারেই বলা চলে না। ইহার ভাণ্ডার স্থান বিশেষে প্রচুর হইতে পারে, কিন্তু অফুরন্ত কোন স্থানেই নহে। এজন্য খনিজ পদার্থের যথোপযুক্ত সরবরাহের উপর যদি কোন স্থানের বর্তমান বা ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ নির্ভর করে তবে সেই স্থানের সম্বন্ধে আমরা কোনরূপেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিনা।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে আমাদের বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার মূলে দুই জাতীয় খনিজ পদার্থ :— ১। যন্ত্র-নির্মাণোপযোগী লৌহ, তাম্র, নিকেল, এলুমিনিয়ম ইত্যাদি ধাতব পদার্থ; এবং ২। শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত পাথুরিয়া কয়লা ও খনিজ তৈল ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ। এই দুইয়ের কোনটির অভাব হইলে আমাদের যান্ত্রিক সভ্যতা একটা অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবে ইহা বলা বাহুল্য।

খনিজ সম্পদ জাতীয় সম্পদ। ইহার সুরক্ষা এবং সদ্ব্যবহারের উপর জাতীয় মঙ্গলামঙ্গল বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এ কারণ ইহার সংরক্ষণের জন্য একটা জাতীয় পরিকল্পনার নিতান্ত প্রয়োজন।

সংরক্ষণ কথাটি এখানে কেবলমাত্র ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। খনিজ পদার্থ যত দিন থাকিবে ততদিন আমরা উহার ব্যবহার না করিয়া পারিব না। সংরক্ষণ বলিলে ইহাই বুঝিব যে ইহার ব্যবহার যেটুকু না করিলে নয় কেবল সেইটুকুই করিতে হইবে। এবং তাহারও যতদূর সম্ভব সদ্ব্যবহার করিতে হইবে।

কেবল সদ্ব্যবহার মাত্র নহে। খনিজ পদার্থের উত্তোলন এবং তাহা হইতে ব্যবহারোপযোগী পদার্থ-সমূহের নিষ্কাশন বা প্রস্তুতকরণেও প্রতিপদেই আমাদের যতদূর সম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। এই সম্পর্কীয় কাজে যাহারা ব্রতী হইবেন তাহাদের সর্বদাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যাহাতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ কোন প্রকারেই জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। যদি কোনস্থলে তাহা ঘটিতে থাকে তবে দেশের শাসনভার যাহাদের হাতে তাঁহারা সেই প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন।

ধাতব পদার্থের মধ্যে লৌহের স্থান সর্বাপেক্ষা উচ্চে। লৌহ নিষ্কাশনের জন্য প্রধানতঃ তিনটি বস্তুর প্রয়োজন, যথা—লৌহপ্রস্তর, চুণা পাথর এবং কয়লা। ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিশেষতঃ ময়ূরভঞ্জে এবং মহীশূরে লৌহপ্রস্তর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। চুণা পাথর ও কয়লাও অনেকস্থানে মিলে। কিন্তু লৌহপ্রস্তরের এবং চুণা পাথরের যেরূপ প্রাচুর্য, কয়লার সেইরূপ প্রাচুর্য নাই—বিশেষতঃ লৌহ নিষ্কাশনে ব্যবহারোপযোগী কঠিন কোক যাহা হইতে প্রস্তুত করা যায় এমন কয়লার। বিশেষজ্ঞদের মতে আমাদের দেশে এই জাতীয় কয়লা যাহা আছে তাহা ৬০ বা ৭০ বৎসরেই নিঃশেষিত হইবার আশঙ্কা আছে। কোন দেশের পক্ষে ৬০ বা ৭০ এমনকি ১০০ বৎসর দীর্ঘকাল নয়, অতএব আমাদের দেশে লৌহ নিষ্কাশনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হইবার বিশেষ কারণ বর্তমান। লোহার ব্যবহার যেমন একদিকে যন্ত্রাদি নির্মাণে তেমনি ইমারত, সেতু নির্মাণ ইত্যাদি পূর্তকার্যে। বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পূর্তকার্যে লৌহের পরিবর্তে রিইন্‌ফোর্স্‌ড কংক্রিট-এর ব্যবহার

প্রবর্তন হইয়াছে এবং ইহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, বিশেষতঃ ইয়োরোপ এবং আমেরিকায়। আমাদের দেশে এখনও অনেকক্ষেত্রে যেখানে রিইন্‌ফোর্স্‌ড কংক্রিট-এর ব্যবহার হইতে পারে সেখানে লৌহ মাত্র ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা আমাদের জাতীয় সম্পদের অপচয়।

ধাতব পদার্থের একটা প্রধান অনুকল্প তথাকথিত "প্ল্যাস্টিক"। অধ্যাপক বেকলাণ্ড কর্তৃক বেকেলাইট নামক প্ল্যাস্টিকের আবিষ্কারের পর এই জাতীয় পদার্থের প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তাহার প্রথম কারণ, এই প্ল্যাস্টিক অনেক ক্ষেত্রে ধাতব পদার্থের পরিবর্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোন প্ল্যাস্টিক গৌণতঃ খনিজ পদার্থ হইতে উদ্ভূত হইলেও এমন অনেক প্ল্যাস্টিক আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা কৃষিজাত পদার্থ হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ যাহার উৎস অফুরন্ত।

কঠিন এবং তরল এই দুই জাতীয় দাহ্য পদার্থ শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। পাথুরে কয়লা প্রথম পর্যায়ের এবং খনিজ তৈল দ্বিতীয় পযায়ের অন্তর্ভুক্ত।

পাথুরে কয়লার সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের দেশ অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। তাহার প্রধান কারণ এই যে বহুদিন হইতে ভারতের খনিজ সম্পদের ব্যবহার বৈদেশিকের স্বার্থ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছিল। ভারত স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশের লোকের দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিবর্তন আবশ্যক তাহা এখন পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় নাই। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে যে, এখনও কাঁচা কয়লা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাঁটিতে পুড়াইয়া কোকে পরিণত করা হয়। ইহার ফলে আমরা কাঁচা কয়লার অন্তর্ধূমপাতন করিলে যে সমস্ত বহুমূল্য বায়বীয় ও তরল পদার্থ উপজাত পদার্থ হিসাবে পাইতে পারিতাম তাহা সমস্তই দগ্ধ হইয়া বাতাসে মিশিয়া যায়। এতদ্ভিন্ন কোক কয়লাও যতটা পাওয়া উচিত তাহার অনেকাংশ ভস্মীভূত হয়।

কেবল ইহাই নহে। ধাতুনিষ্কাশনে ব্যবহারোপযোগী কঠিন কোক হইতে যাহা হইতে প্রস্তুত পারে এমন কাঁচা কয়লাও প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে স্টীম এঞ্জিনের ইন্ধন রূপে ব্যবহৃত হইতেছে, যদিও এই জাতীয় কাঁচা কয়লার এদেশে বিশেষ অভাব।

শক্তি উৎপাদনের জন্য ইন্ধনরূপে ব্যবহারযোগ্য তরল দাহ্য পাদার্থ যাহা খনিজ তৈল হইতে পাওয়া যায়, তাহার চাহিদা পৃথিবীময় দ্রুত বাড়িয়া চলিতেছে। অথচ ভারতে ইহার বিশেষ অভাব।

খনিজ তৈলের সংরক্ষণ প্রধানতঃ দুই প্রকারে হইতে পারে। প্রথমতঃ রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা অঙ্গারের সহিত হাইড্রোজেন যোজনা করিয়া কৃত্রিম বা সংশ্লেষণজাত পেট্রল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইতে পৃথিবীর নানা স্থানে ইহার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা খনিজ পদার্থের স্থান কৃষিজাত পদার্থ দ্বারা পূর্ণ করিতে না পারিলেও যে খনিজ বাস্তবিক অপ্রতুল তাহার স্থান অপর খনিজ, যাহার অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য আছে, তাহা দ্বারা পূর্ণ করিতে পারি। সুখের বিষয়ে যে আমাদের দেশের কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং অনতিবিলম্বে ভারতে কৃত্রিম পেট্রল প্রস্তুত করিবার কারখানা স্থাপিত হইবে ইহা আশা করা যায়।

তরল ইন্ধনরূপে সুরাসার বা কোহল ব্যবহার করা যাইতে পারে। চিনি বা গুড়ের দ্রব খমির দ্বারা সন্ধিত করিলে কোহলের উৎপত্তি হয়। এই কোহল সাধারণতঃ পাওয়ার অ্যালকোহল নামে পরিচিত। মোটর গাড়ীর ইন্ধনরূপে ইয়োরোপের অনেক স্থানেই পেট্রল ও পাওয়ার অ্যালকোহল-এর মিশ্রণ বাধ্যতামূলক হিসাবে প্রচলিত আছে। যখন এদেশের চিনির কারখানাসমূহে চিনি প্রস্তুত করিবার অনুপযোগী চিটা গুড় যথেষ্ট উৎপন্ন হয় অর্থাৎ পাওয়ার অ্যালকোহল প্রস্তুত করিবার

উপাদান যথেষ্ট আছে তখম অন্ততঃ মোটর চালাইবার জন্য পেট্রল ও পাওয়ার অ্যালকোহল-এর মিশ্রণের ব্যবহার প্রবর্তন অবশ্যকর্তব্য। সুদূর ভবিষ্যতে এমন দিন আসিতে পারে যখন কোহলই অন্তর্দহন এঞ্জিনের একমাত্র ইন্ধন হইবে।

ইন্ধন সংরক্ষণের সর্বাপেক্ষা প্রধান উপায় জলস্রোতের সাহায্যে অর্থাৎ বিনা ইন্ধনে শক্তি উৎপাদন করা। পৃথিবীর বহুস্থানে স্বাভাবিক জলপ্রপাতের সাহায্যে প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। নদীর উপত্যকায় বাঁধদ্বারা কৃত্রিম হ্রদ এবং উহা হইতে জলপ্রপাত সৃষ্টি করিয়া সেই জলস্রোতের সাহায্যেও শক্তি উৎপন্ন করা হইয়া থাকে। দামোদর পরিকল্পনা, ময়ুরাক্ষ পরিকল্পনা ইত্যাদি কার্যকরী হইলে আমাদের দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানাদিতে ব্যবহারোপযোগী প্রচুর বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হইবে। কিন্তু যে কোন অবস্থাতে যতই শক্তি উৎপন্ন হউক না কেন, দেশের সীমাবদ্ধ খনিজ সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কোন অবস্থাতেই কমিবে না। বরঞ্চ উত্তরোত্তর বাড়িয়া যাইবে।

ইস্পাত-ঘাটতির প্রতিকার চেষ্টা

ভারত সরকারের প্রাক্তন টিম্বার ডেভেলপ্মেন্ট অফিসার ও উড প্রিজার্ভেশন এক্সপার্ট ডক্টর কামেশম ভারতের বর্তমান ইস্পাত-ঘাটতির প্রতিকারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট একটি পরিকল্পনা পেশ করেছেন। ডক্টর কামেশমের মতে পূর্তকার্যে যেখানে আজকাল ইস্পাত ব্যবহৃত হয়, তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইস্পাতের পরিবর্তে কাঠ ব্যবহার করা চলে। অবশ্য সে জন্যে সাধারণ কাঠকে বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা দৃঢ়তর এবং অন্যান্য গুণসম্পন্ন করা প্রয়োজন। তিনি একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান—টিম্বার ডেভেলপমেন্ট অ্যাডমিনিসট্রেশন—কল্পনা করেছেন। এই প্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন স্থানে ২০টি কেন্দ্র খুলবে। প্রতি কেন্দ্রে কাঠ সংক্রান্ত প্রক্রিয়া এবং এন্জিনিয়ারিং বিদ্যা শেখান হবে। পরিকল্পনাটির ব্যয় অনুমান করা হয়েছে পাঁচ কোটী টাকা। পরিকল্পনাটি বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাধীন। সরকার যদি পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন তাহলে ডক্টর কামেশম ইয়োরোপ ও আমেরিকা থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসে এদেশে একটি টিম্বার এন্জিনিয়ারিং কলেজ খুলবেন বলে মনস্থ করেছেন।

খাদ্যোৎপাদন সমস্যা

শ্রীশুভেন্দ্রকুমার মিত্র

বিশ-পঁচিশ বছর আগে প্রায়ই শোনা যাইত যে ভারতবর্ষের অন্নবস্ত্রের যা কষ্ট সে স্বধু আমরা কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া। যথেষ্ট শিল্পোন্নতি হইলেই আর আমাদের সুখ-সমৃদ্ধির অন্ত থাকিবে না। অবশ্য শিল্পোন্নতি বলিতে যদি এই বোঝায় যে দেশের সমস্ত শিল্পসঞ্জাত দ্রব্যের চাহিদা স্বদেশী শিল্পই মিটাইতে পারিবে তাহা হইলে সে অবস্থা হইতে এখনও আমরা অনেক দূরে আছি। কখনও সে লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারিব কিনা তাহাও সন্দেহ। কিন্তু এটা ঠিক যে সম্প্রতি আমাদের শিল্প-সমৃদ্ধি যথেষ্ট বাড়িয়াছে। সম্প্রতি যে মহাযুদ্ধ শেষ হইল তাহার আওতায় শিল্পোন্নতি বেশ দ্রুত বাড়িয়াছে। ইহা সন্তোষের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এই যুদ্ধেরই ফলে যে বস্তুটা আরও বেশী ও কষ্টদায়ক ভাবে প্রকট হইয়াছে সেটা এই যে আমাদের কৃষি-সমৃদ্ধিও যথেষ্ট নয়। অর্থাৎ যদিও ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোকেই চাষ করিয়া খায় তবু আমাদের চাষের ফসলে আমাদের পেট ভরে না। এই কারণেই একান্ত পেটের দায়ে আমাদের বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়। যদি কোন কারণে বিদেশের আমদানী বন্ধ হইয়া যায় তাহা হইলে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। খাদ্য আমদানীর একান্ত দায়ের সুযোগ লইয়া বিদেশীরা এমন নির্মম ভাবে আমাদের নিকট মূল্য আদায় করিতেছে যে আমাদের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি বানচাল হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই এপ্রিল হইতে যে রাষ্ট্রীয় বর্ষ আরম্ভ হইল তাহাতে প্রায় ১১০ কোটি টাকায় খাদ্যশস্য আমদানী করায় প্রস্তাব আছে। ইহা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের সমগ্র বার্ষিক ব্যয়ের প্রায় অর্ধেক। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে সে ব্যাপারটি কিরূপ গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে।

আমদানী খাদ্যশস্যের মূল্যের বিপুল পরিমাণ ছাড়া আরও একটি কথা ভাবিবার আছে। বিদেশ হইতে কিছু আমদানী করিতে হইলে তাহার বিনিময়ে সেখানে কিছু রপ্তানী করিতে হয়। সচরাচর যে সকল দেশ শিল্পসঞ্জাত দ্রব্য রপ্তানী করে তাহারাই খাদ্যশস্য আমদানী করে। আমাদের দেশে যে সামান্য শিল্পসঞ্জাত দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাতে আমাদেরই অভাব মেটে না। আবার সেগুলি এমন কিছু উৎকৃষ্টও নয় যে বিদেশীরা আদর করিয়া আমদানী করিবে। কাজে কাজেই আমাদের বেশীর ভাগ রপ্তানীই কতকগুলি কাঁচা মাল। ইহার বিনিময়ে আমরা যা কিছু সামান্য মূল্যের দ্রব্য আমদানী করিতে পারি তাহা যদি কৃষিজাত দ্রব্যই হয় তাহা হইলে অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করিব কি দিয়া? আর যন্ত্রপাতি আমদানী না হইলে আমাদের শিল্পোন্নতি কি করিয়া হইবে? শিল্পোন্নতি না হইলে আবার আমাদের স্বাধীনতা রক্ষা হইবে কি উপায়ে? সাম্প্রতিক মহাযুদ্ধে যে জিনিষটা অবিসম্বাদিত রূপে প্রমাণ হইয়াছে যেটা এই যে আধুনিক যুদ্ধ জিতিতে হইলে সাহসী ও নিপুণ সৈনিকের অপেক্ষা শিল্পসম্ভারই বেশী কার্যকরী।

অতএব খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি বর্তমানে আমাদের দেশের সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে। এখন কৃষিজাত সামগ্রীর উৎপাদন বাড়াইতে হইলে হয় বেশী জমি চাষ করিতে হয় (extensive cultiva-

tion) অথবা চাষের প্রণালীর উন্নতি করিতে হয় (intensive cultivation)। ভারতবর্ষের মত ঘন-বসতি দেশে প্রথম প্রথার বিশেষ স্থান নাই। তবু আমাদের প্রাদেশিক সরকাররা এদিকেও চেষ্টা করিতেছেন। যুক্ত প্রদেশ সরকার হিমালয়ের দক্ষিণে অনেক পতিত জমি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সমবায় প্রথায় চাষ করার ব্যবস্থা করিতেছেন। পশ্চিম বঙ্গ সরকারও পতিত জমি নিজায়ত্তে লইয়া সেখানে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত চাষীদের বসতি করাইবার ব্যবস্থা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু মোটের উপর খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াইতে হইলে দ্বিতীয় পন্থাই আমাদের লক্ষ্যবস্তু।

একই পরিমাণ জমিতে বিভিন্ন দেশের উৎপন্ন শস্যের তুলনা করিলে দেখা যায় যে এ বিষয়ে আমাদের উন্নতির যথেষ্ট স্থান আছে। ধানের কথাই ধরা যাক। আমাদের দেশে প্রতি একরে (প্রায় তিন বিঘা) জমিতে গড়ে সাড়ে নয় মণ ধান হয়। সে স্থলে সেই পরিমাণ জমিতে জাপানে ও কালিফোর্নিয়াতে প্রায় সাতাশ মণ এবং ইটালি ও স্পেনে প্রায় ৫৫ মণ ধান উৎপন্ন হয়। বর্তমানে আমাদের খাদ্যের যা ঘাটতি তাহা পূরণ করা যায় উৎপন্ন শস্য শতকরা যোল ভাগ বৃদ্ধি করিলেই। অবশ্য লোকসংখ্যা যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে আমাদের লক্ষ্য আরও উর্ধ্বে রাখিতে হইবে—প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ। ধানের তুলনা হইতে বুঝা যায় যে এই লক্ষ্যে পৌছান কিছুই আশ্চর্য নয়।

কিছুদিন আগে নিখিল ভারত প্রদর্শনীতে ভারতীয় কৃষি গবেষণাগারের অধ্যক্ষ আচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষণে শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম যে সাধারণ যে ধারণা আছে—যে আমাদের দেশের চাষীরা এত পুরাণো ও অকেজো প্রথায় চাষ করে যে অন্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের উৎপাদন হওয়া অসম্ভব যদি না আমাদের চাষের প্রণালীর আমূল পরিবর্তন করা হয়—এই ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। আচার্য মহাশয় তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলেন তাঁহাদের গ্রামে এমন কৃষকও আছে যাহার ক্ষেত্রে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ একর পিছু ৫৫ মণই হয় অর্থাৎ পৃথিবীর সর্বোচ্চ উৎপাদনের সমানই হয়। ইহা হইতে বোঝা যায় যে অবস্থা সর্বতোভাবে অনুকূল হইলে আমাদের দেশের চাষীরাও তাহাদের অভ্যস্ত প্রথাতেই আমাদের খাদ্যের চাহিদা যথেষ্ট মিটাইতে পারে।

চাষে সর্বাপেক্ষা সুফল পাইতে হইলে প্রয়োজন অনুকূল নৈসর্গিক অবস্থা, যথেষ্ট পরিমাণ সার ও যথাসময়ে বপন-রোপন ইত্যাদি। চাষের অনুকূল নৈসর্গিক অবস্থা বলিতে বোঝায় উর্বর জমি, যথেষ্ট সূর্যকিরণ ও পরিমাণমত জল সরবরাহ। আমাদের দেশের কর্ষিত ভূমির বেশীর-ভাগই স্বভাবতঃ যেন উর্বর। সূর্যকিরণের কোথাও কখনও অভাব হয় না। আর সাধারণতঃ গাছে যে বৃষ্টিপাত হয় তাহাতেই জল সরবরাহের কাজ মোটের উপর মিটিয়া যায়। কিন্তু দেশের কোন অংশে অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হইলেই চাষের কাজে একেবারে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। বৃষ্টির জলের উপর এতখানি একান্ত নির্ভর অন্যান্য দেশের চাষীদের করিতে হয় না। যে যে দেশে চাষের কাজ বেশ ভালভাবে হয় সেই সেই দেশে জল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেচের ব্যবস্থা বেশ ভাল ভাবেই আছে। বৈজ্ঞানিক ভাবে সেচকার্য চালাইবার মূলসূত্রগুলি অনেকদিন আগেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্বতন ব্রিটিশ ভারতের পশ্চিম পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে সেচকার্যের ব্যাপক ভাবে ব্যবহারও হইয়া গিয়াছে। ফলে ইহার ব্যবহারিক প্রণালীগুলিও মোটামুটি প্রত্যক্ষভাবে দেখার সুযোগ আমাদের হইয়াছে। কাজেই সেচকার্যের ব্যাপকতর প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা ও ব্যবহারিক সেচবিদ্যায় নিপুণ

পূর্তবিদ। আপাততঃ গবেষণাকারী বিজ্ঞানীয় অভাব বিশেষ অনুভূত হইবে না।

আশু উৎপাদন বৃদ্ধির দিক হইতে দেখিলে উপযুক্ত সার ব্যবহারই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় বিষয়। আবহমান কাল হইতে যে সকল জমিতে চাষ হইয়া আসিতেছে, সে জমির স্বাভাবিক উর্বরতা যতই বেশী থাকুক না কেন তাহা ক্রমশঃ ক্ষয় পাইবেই। ইহার ব্যতিক্রম হয় মাত্র সেই সকল জমিতে, যেখানে বৎসরের পর বৎসর বন্যার জলের পলি পড়ে, যেমন নীল নদের উপকূল। কাজেই জমিতে যথেষ্ট পরিমাণ ও যথোপযুক্ত সার না দিলে পূর্বের মত উৎপাদন হইতে পারে না। এই জন্য সর্বদেশে ও সর্বকালেই চাষীরা জমিতে সার দেয়। এ বিষয়ে একমাত্র বিচার্য উহা উপযুক্ত কি না এবং যথেষ্ট দেওয়া হইল কি না।

সার দুই প্রকারের হইতে পারে; এক প্রাকৃতিক ও অপর রাসায়নিক। প্রাকৃতিক সার দুই ভাবে প্রয়োগ করা যায়। এক পশুপক্ষীর পরিত্যক্ত মূত্রপুরীষ আদি পচনশীল দ্রব্য, খইল ও ক্ষার জাতীয় দ্রব্য মাটিতে মিশাইয়া দেওয়া, আর এক পর্যায়-ক্রমে এমন দুইটি ফসল বপন করা যাহাতে একটি ফসল দ্বারা জমি হইতে যে উপাদান বেশী খরচ হইবে তাহা অন্য ফসলটি দ্বারা পূরণ হইবে। শেষোক্ত প্রথাকেই রোটেশন অফ ক্রপ্স বলে। যদিও এই দুই প্রকারের প্রাকৃতিক সারের ব্যবহারের কথা আমাদের দেশের চাষীদের জানা আছে তবু ইহাদের যথেষ্টভাবে ব্যবহার করা হয় না নানা কারণে। প্রথমতঃ পরিত্যক্ত জৈব বস্তুর মধ্যে মানুষের মলমূত্রের যেরূপ ব্যাপক ব্যবহার চীন-দেশে প্রচলিত আছে আমাদের দেশে তাহা নাই, সম্ভবতঃ ধর্মের অনুশাসনে। দ্বিতীয়তঃ গবাদি পশুর মলের অধিকাংশ শুকাইয়া জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে অনেক পরিমাণ নষ্ট হয়। ফলে এই ধরণের সার যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করা কোন চাষীর পক্ষেই প্রায় সম্ভব হয় না। দ্বিতীয় প্রাকৃতিক উপায়ে জমির উৎকর্ষ সাধন করা যে হয় না তাহার কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে অজ্ঞতা বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঙ্গতির অভাব। প্রথমতঃ, কোন্ ফসলের পর কোন্ ফসল বপন করিলে জমির উপকার হয় সে সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার জ্ঞান অনেক চাষীর নাই। দ্বিতীয়তঃ, সব ফসলের মূল্য সমান নয়। জমির উৎকর্ষ সাধনের জন্য অপেক্ষাকৃত কম অর্থপ্রদায়ী ফসলটি রোপন করার মত সঙ্গতি অনেক চাষীরই থাকে না। যদিও ইহার ফলে ক্রমশঃ তাহাদের ক্ষতি বেশী হইয়া পড়ে তবু আপাত ভাত-কাপড়ের তাগিদে তাহারা অর্থকরী ফসলগুলিকে পর পর বপন না করিয়া পারে না। অবশ্য যথোপযুক্ত প্রথার দ্বারা যদি তাহাদের প্রাকৃতিক সার প্রয়োগের মূল্য বিশ্বাসযোগ্য ভাবে বোঝান যায় তাহা হইলে এই বিষয়ে চাষীদের অভ্যস্ত প্রণালীর পরিবর্তন করা খুব সহজেই ঘটিতে পারে।

নাইট্রোজেন ও ফস্ফোরাস ঘটিত কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যের সার হিসাবে ব্যবহার অনেক দেশেই চলিত আছে। এই সম্পর্কে অ্যামোনিয়াম ফসফেট ও সুপারফসফেটের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এইগুলির ব্যবহারে অনেক দেশে যে আশ্চর্য ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের দেশে কিন্তু এগুলির ব্যবহার খুব বেশী প্রচলন নাই। তাহার কারণ জ্ঞানের অভাব এবং সরবরাহের অভাব। এই দুই প্রকারের রাসায়নিকই বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হয়, কাজেই দামও বেশী পড়ে। এই অভাব দূরীকরণের জন্য ভারত সরকার বিহারের অন্তর্গত সিন্দ্রী নামক স্থানে অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈয়ারী করায় বিরাট কারখানা নির্মাণ করিতে-ছেন। এই কারখানা চালু হইলে এই দ্রব্যটি সুলভে পাওয়া যাইবে। তাহা ছাড়া অন্যান্য স্থানে জল-স্রোতের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে সমস্ত ব্যবস্থা হইতেছে সেই সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকরী হইলেও

নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক বস্তুগুলি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারিবে। কিন্তু এই সমস্ত রাসায়নিকগুলি যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেলেও যে ইহাদের প্রয়োগ-সমস্যা মিটিয়া গেল তাহা নয়।

বিখ্যাত কৃষিবিদ হাওয়ার্ড ও তাঁহার অনুচর আরও অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিলে জমির স্থায়ী ক্ষতি হয় এবং এই প্রকার সার ব্যবহারের ফলে যে সকল ফসল জন্মায় তাহার স্বাদও ভাল হয় না এবং তাহার পুষ্টিকারিতাও আশানুরূপ থাকে না। ইহার ফলে এই প্রকারে উৎপন্ন খাদ্যসকল যাহারা নিয়মিতভাবে খায় তাহারা রোগপ্রবণ হয়। এই অভিযোগগুলি এত গুরুতর যে বলাই বাহুল্য যে এই মতগুলি যদি সর্ববাদিসম্মত হইত তাহা হইলে আর কেহই রাসায়নিক সার ব্যবহার করার কথা উল্লেখই করিত না। আসলে উক্ত মতবাদ সকল কৃষিবিদ স্বীকার করেন না। ইহা লইয়া বহু তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে। উপরে আচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যে ভাষণের উল্লেখ করিয়াছি, সেই ভাষণে তিনি বলেন যে যদিও ইহা অবিসম্বাদিত সত্য যে কোন কোন দেশে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার না বুঝিয়া প্রয়োগ করার ফলে উর্বর জমি মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে তবুও ইহাও সত্য নয় যে সব ক্ষেত্রেই এইরূপ হইবে। তিনি বলেন যে মৃত্তিকায় যে সকল উপাদান থাকিলে রাসায়নিক সার ব্যবহার করা ক্ষতিকর সেগুলি বহুদিন হইল গবেষণার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই বিষয়ে এখনও যে তর্ক-বিতর্ক হইতেছে সে শুধু অজ্ঞতা জনিত।

আচার্য মহাশয়ের বক্তৃতা শোনার কিছুদিন পরে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে আর একটি আলোচনা শুনিবার সুযোগ হইয়াছিল। ঐ দিনের প্রধান বক্তা মিঃ ফস্টার জোর দিয়া বলেন 'যে উৎপন্ন শস্যের স্বাদ ও পুষ্টিকারিতার উপর রাসায়নিক সার প্রয়োগের যে প্রভাব হাওয়ার্ড প্রমুখ বিজ্ঞানীরা আরোপ করেন তাহা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ হয় নাই। তিনি ইহাও উল্লেখ করেন যে চীনদেশে ব্যাপকভাবে মল-সার প্রয়োগের জন্য সেখানকার ফসল সম্বন্ধেও এরূপ নিন্দা তিনি শুনিয়াছেন, যে ঐ সব ফসল খাইয়া চীনারা সংক্রামক রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। এমন কি এই জন্য গত যুদ্ধের সময় সেখানকার আমেরিকান সেনা বিভাগ স্থানীয় উৎপন্ন শস্য ও ফলাদি খাওয়া বারণ করিয়া দিয়াছিলেন। অথচ চীনের লোকসংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সকল দেশের অপেক্ষা বেশী এবং সেখানে ঐ সার এত ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয় যে অভিযোগটির সত্যতা সম্বন্ধে স্বতঃই সন্দেহ হয়। যাই হোক্ চীনের ঘটনা হইতে প্রমাণ হয় যে এই প্রকারের অভিযোগ শুধু রাসায়নিক সার সম্বন্ধেই আবদ্ধ নয়।

লেখকের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ফস্টার কিন্তু স্বীকার করেন যে স্বাভাবিক সার যেরূপ চোখ বুজিয়া যেখানে সেখানে ব্যবহার করা যায়, সেরূপ ভাবে রাসায়নিক সার ব্যবহার করিলে জমির ক্ষতি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা। তবে রাসায়নিক সার কেন ব্যবহার করিব ইহার উত্তরে তিনি বলেন যে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইলে যে পরিমাণ সার ব্যবহার করা প্রয়োজন তত প্রাকৃতিক সার আমাদের দেশে পাওয়া অসম্ভব। কাজেই কিছু পরিমাণ রাসায়নিক সার না ব্যবহার করিয়া উপায় নাই। সেদিনকার দীর্ঘ আলোচনার ফলে মনে হইল যে মিঃ ফস্টার প্রমাণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, মৃত্তিকার উপাদানগুলি বিশ্লেষণ দ্বারা স্থির করিয়া যথোপযুক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ করিতে পারিলে আশু-উৎপাদন বৃদ্ধিত হয়ই এবং জমির কোন ক্ষতি না হইয়া উহার উৎপাদিকা-শক্তি স্থায়ীভাবে বাড়িয়া যায়।

কিন্তু কথা হইতেছে যে প্রত্যেক অঞ্চলের মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিয়া কতখানি এবং কোন বিশেষ

রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে তাহা স্থির করা চাষীদের পক্ষে সম্ভব নয়। এইখানে বিজ্ঞানীর স্থান। কিন্তু বড় বড় কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে সমবেত হইয়া বিজ্ঞানীরা এই কার্য করিতে পারিবেন না। আচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথের মতে, আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের ক্ষেত্রে ও অন্যান্য সরকারী খামারের জমি সম্বন্ধে তথ্যের কিছু অভাব নাই। সেখানকার সকল প্রকার বিশ্লেষণ ভাল ভাবেই করা হইয়াছে। কিন্তু চাষীরা যেখানে নিজেরা চাষ করে সেখানকার নৈসর্গিক অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের একান্ত অভাব। আরও গবেষণাগার বাড়াইয়া বা সরকারী খামারে আদর্শ চাষ করিয়া দেখাইয়া এই অভাব পূরণ করা সম্ভব হইবে না। ইহার জন্য বিজ্ঞানীকে চাষীর কাছে গ্রামে গ্রামে যাইতে হইবে। চাষীরা বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা পুরুষানুক্রমে শিখিয়াছে। কাজেই তাহাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিলে বোঝা যাইবে যে চাষীরা এমন অনেক কথা জানেন যাহা বিজ্ঞানীরা জানেন না আর বিজ্ঞানীরা এমন অনেক কথা জানেন চাষীরা যা জানেন না। এবং এই দুই পক্ষের সহযোগিতা চাষের ক্ষেতে সুফল করিতে হইবে। গবেষণাগারে মৌলিক গবেষণা করিয়া আপাততঃ বিশেষ সুবিধা করা যাইবে না। কেন না লেখাপড়া জানা লোক যে সব প্রচার করেন চাষীরা তাহা স্বতঃই সন্দেহের চোখে দেখেন।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীকে গ্রামের দিকে মুখ ফিরাইতে হইবে। বেশী কিছু বিদ্যার প্রয়োজন নাই, ইহার জন্য টাকা পয়সা খরচ করিয়া বিদেশে বিদ্যা অর্জন করিতে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। শুধু চাই বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও চোখ-কান খোলা রাখার অভ্যাস, আর সর্বোপরি চাই চাষীর প্রতি সহানুভূতি ও সশ্রদ্ধ মনোভাব। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে আমাদের দেশেও এমন চাষী আছেন যাঁহার উৎপাদন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কৃষকের উৎপাদনের সমান। তাঁহার প্রণালী বৈজ্ঞানিক ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া অন্যান্য চাষীদের কাছে পরিবেশন করিতে হইবে। এইরূপ করিতে করিতেই দেখা যাইবে যে কোন কোন স্থানে উৎপাদনের অল্পতার জন্য দায়ী চাষের প্রথা নয়, জমির কোন দোষ বা নৈসর্গিক কোন কারণ। সেইগুলি দূর করার জন্য বিজ্ঞানী তাঁহার বিদ্যার ব্যবহার করিবেন। তাঁহার কাছে হয়ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকিবে না। কিন্তু তিনি সেখানকার মৃত্তিকা কেন্দ্রীয় গবেষণাগারে বিশ্লেষণ করিতে পাঠাইতে পারিবেন এবং নৈসর্গিক ব্যাপারেও সেখানকার পরামর্শ লইতে পারিবেন। পরামর্শ পাইলে সেগুলির ব্যবহারিক উপকারিতা তিনি তাঁহার ক্ষেত্রস্থ অভিজ্ঞতা হইতে বিচার করিতে পারিবেন ও চাষীর সহিত আলোচনা করিয়া যেগুলি যথোপযুক্ত প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

অনেক স্থলে চাষের যথোপযুক্ত উন্নতি করিতে হইলে রাষ্ট্রীয় উদ্যমের প্রয়োজন। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে শুধু যে সেচেরই দরকার তা নয়। অন্ততঃ বাংলা দেশে অনেক জায়গা আছে যেখানে সেচের অপেক্ষা জলনিকাশের ব্যবস্থার বেশী দরকারে। অতিরিক্ত জল সঞ্চারের জন্য এসব স্থানে জমির উর্বরতা-বর্ধক অনেক উপাদান ধুইয়া যায়। তাহা ছাড়া জল জমার জন্য পানীয় জল খারাপ হয় এবং মশা প্রভৃতি জন্মাইয়া ঐস্থানের স্বাস্থ্যও খারাপ করিয়া দেয়। মনে হয় যে উপযুক্ত ভাবে জলনিকাশের ব্যবস্থা করিতে পারিলে পশ্চিম বঙ্গে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অনেক কমিয়া যাইবে। এছাড়া যথাসময়ে বীজ, সার বা বলদ ও লাঙ্গল সংগ্রহ করিবার সঙ্গতি না থাকায় অনেক চাষী যথাসময়ে বপন-রোপন ইত্যাদি করিতে পারেন না। এ জন্যও শস্যের সমূহ ক্ষতি হয়। এ সকল অভাব দূর করা যায় গ্রামে গ্রামে সমবার সমিতি স্থাপন করিয়া। ইহার জন্য এই সকল সমিতির পিছনে চাই রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা ও উৎসাহ। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা যাহাতে যথাস্থানে ও

যথোপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করা যায় তাহার জন্যও চাই স্থানীয় অভিজ্ঞতাযুক্ত বিজ্ঞানীর উপস্থিতি। রাষ্ট্রীয় সাহায্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নিয়ন্ত্রিত না করিলে তাহার ফল সরকারী Grow More Food বা "ফসল বাড়াও" চেষ্টার ন্যায়ই সম্পূর্ণ বিফলতায় পরিণত হইবে। সহরে বসিয়া গবেষণাই করা যাক বা কল্পনাই করা যাক তাহার বিশেষ সাফল্য নাই।

মহাত্মা গান্ধী মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসের যে মূর্তি কল্পনা করিয়াছিলেন তাহার নাম দিয়াছিলেন "লোক সেবা সঙ্ঘ", তাহার প্রধান কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত করিয়াছিলেন ভারতের ছয়লক্ষ গ্রাম। আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চেতনা এইরূপে একটি বিজ্ঞানীদের দ্বারা গঠিত "লোক সেবা সঙ্ঘ" সম্ভব করার মত যথেষ্ট প্রবুদ্ধ হইবে কি ?, না হইলে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সুদূর স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে।

আমেরিকায় সেচ

ভারতবর্ষের মত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বহু জমি জলাভাবে চাষের অযোগ্য হয়ে আছে। এই রকমের জমি আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলেই বেশী। আমেরিকার সরকারী রিক্লামেশন ব্যুরোর চেষ্টায় নদী নিয়ন্ত্রণ করে এই রকম অনেক জমি বর্তমানে সেচপ্রাপ্ত হয়েছে। পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রে ৪ কোটী একর চাষযোগ্য জমির মধ্যে ২ কোটী ১০ লক্ষ একর জমি এইভাবে চাষের কাজে লাগান সম্ভব হয়েছে।

কলাম্বিয়া নদীতে গ্র্যাণ্ড কুলি বাঁধ এবং কলোরাডো নদীতে হুভার বাঁধ পৃথিবীর বৃহত্তম বাঁধগুলোর অন্যতম। জমির উন্নতি সাধন ছাড়া প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তিও এই সব বাঁধের জলস্রোত থেকে তৈরী হচ্ছে। নতুন আরও কয়েকটি পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছে। এগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ হচ্ছে মিসৌরী উপত্যকা পরিকল্পনা। এই বাঁধ তৈরী হলে ৫০ লক্ষ একর জমি সেচ পাবে এবং ১৫ লক্ষ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হবে। পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হতে ৮ বছর সময় লাগবে এবং এর জন্য ব্যয় পড়বে ২৪০ কোটী ডলার।

রেডার

শ্রীসুনীলকুমার সেন

বিগত যুদ্ধে বিজ্ঞানের যে সমস্ত উন্নতি হয়েছে তার মধ্যে আণবিক বোমা এবং রেডার যন্ত্রের আবিষ্কার অন্যতম। প্রকৃত পক্ষে আণবিক বোমা ও রেডার যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলেই এক-পক্ষ এ যুদ্ধে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। সেই রেডার সম্বন্ধে গোটা কয়েক কথা লিখছি।

ইংরেজী তে '*RA*dio *D*etection *A*nd *R*anging' কে সংক্ষেপে RADAR বলা হয়। দূর বা নিকটস্থ কোন জড়বস্তুর উপস্থিতি ধরা পড়ে এই যন্ত্রে বেতারের সাহায্যে। শুধু উপস্থিতি বললে ভুল হবে, দূরের কোন বস্তুর অবস্থান-স্থল এই যন্ত্র সাহায্যে সঠিকভাবে নির্ণীত হয়ে থাকে। বাধাবস্তুর (১) দূরত্ব (২) দিগংশ এবং (৩) উচ্চতা—এই তিনটী তথ্য সমান ভাবে রেডার যন্ত্রে নির্ণীত হয়। '১ নং ছবি থেকে সমস্ত বোঝা যাবে। এই ছবিতে একটী এরোপ্লেনকে বাধাবস্তু ধরা হয়েছে। (১) দূরত্ব বলতে আমরা বুঝি—এরোপ্লেনটা আমাদের যন্ত্র থেকে কতদূরে অবস্থিত। (চিত্রে নির্দিষ্ট ক খ রেখা)। (২) দিগংশ জানতে পারলে আমরা অনায়াসে বস্তুটীর দিক্‌নির্ণয় করতে পারি। কারণ ১নং ছবিতে দেখতে পাই, এরোপ্লেনটী আমাদের যন্ত্রের উত্তরপূর্ব সীমার 'গ' কোণের ভেতর রয়েছে। (৩) উচ্চতা আমাদের জানায়, এরোপ্লেনটী আমাদের যন্ত্র থেকে কতখানি উঁচুতে উপস্থিত হয়েছে।

১নং চিত্র
বাধাবস্তুর অবস্থান

রেডারের সাহায্যে কি ভাবে এ সমস্ত তথ্য আমরা একই সময়ে জানতে পারি সে কথা বুঝতে হলে গোড়াতেই বেতার সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয় জানা দরকার।

ঘরে বসে বেতারে আমরা বহুদূরের কথা,

গান, বক্তৃতা, প্রভৃতি শুনে থাকি। আশ্চর্য বোধ হয়, কোনোরূপ সংযোগ নেই, অথচ কি উপায়ে সম্ভব হোল এটা। এটা সম্ভব হয়েছে এক প্রকার তরঙ্গের সাহায্যে। বেতার-তরঙ্গ ইহার নাম। এই তরঙ্গই আমাদের নিকট দূরের কথা বা গান বহন করে আনে। যে তরঙ্গে বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক উভয় প্রকৃতিরই লক্ষণ আছে, তাকে তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ বলা হয়।

২নং চিত্র
প্রতিপ্রভ পর্দায় গৃহীত ছবি

আমাদের বেতার-তরঙ্গও ঐ প্রকৃতির তরঙ্গ এবং উহার গুণাগুণ তড়িৎ-চুম্বকীয় প্রবাহেরই অনুরূপ। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অনুযায়ী তড়িৎ-চুম্বকীয় প্রবাহের বিভিন্ন নামকরণ করা হয়েছে। যেমন বেতার-তরঙ্গ, আলোক-তরঙ্গ প্রভৃতি। আলোক-তরঙ্গ বেতার-তরঙ্গ হতে ছোট দৈর্ঘ্যের, কিন্তু উভয়ে একই প্রকৃতির তরঙ্গ। শব্দও তরঙ্গের আকারে প্রবাহিত হয়, তবে এই প্রবাহের জন্য বাতাস, জল বা অন্য কোন জড়-মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। বায়ুহীন স্থানে যে শব্দ প্রবাহিত হতে পারে না এ কথা বোধ হয় সকলেরই জানা আছে। কোন মাধ্যম না থাকলে শক্তির প্রবাহ হতে পারে না—যেমন জলে ঢিল ফেললে যে ঢেউ আমরা দেখতে পাই, সেখানে জলই ঢেউয়ের প্রবাহের সাহায্য করে বা ঢেউয়ের মাধ্যম হয়। ইথার নামক এক সর্বব্যাপী কাল্পনিক পদার্থকে বেতার-তরঙ্গ প্রবাহের মাধ্যম বলে ধরা হয়। ইথার ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, দেখা যায় না। আমাদের সমস্ত জগৎ যেন ইথারে ডুবে আছে। এবং এই ইথারের সাহায্যেই আলো ক বা বেতার-তরঙ্গ এক স্থান হতে আর এক স্থানে যায়।

রেডার যন্ত্রেও এই বেতার-তরঙ্গের সাহায্য নেওয়া হয়। তবে ইহার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য সাধারণ বেতার-তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হতে অনেক ছোট। উদাহরণস্বরূপ কলকাতা বেতার কেন্দ্র হতে যে মধ্যম তরঙ্গ পাঠান হয় তার দৈর্ঘ্য, ৩৭০'৪ মিটার অর্থাৎ প্রায় ৪০৫ গজ এবং রেডার যন্ত্র হতে প্রেরিত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ক্বচিৎ ১ মিটারের বেশী হয়। সাধারণতঃ ইহা কয়েক সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। (১০০ সেন্টিমিটার=১ মিটার=প্রায় ৪০ ইঞ্চি)।

রেডার যন্ত্রের প্রেরক অংশ হতে অত্যন্ত অল্প-ক্ষণস্থায়ী এবং খুব ছোট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ-প্রক্ষেপ রশ্মির আকারে (Beam) ইথার মারফৎ আকাশের কোনো নির্দিষ্ট দিকে পাঠান হয়। অদূরস্থিত এরোপ্লেনে এই তরঙ্গ-প্রক্ষেপ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং

সেখান হতে বিচ্ছুরিত হয়ে আবার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কোনো বাধাবস্তু হতে বিচ্ছুরিত হওয়া তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গের একটা গুণ। এখানে বাধাবস্তুর আয়তন অত্যন্ত ছোটো সুতরাং যথেষ্ট পরিমাণ বিচ্ছুরণ পাওয়ার জন্য খুব ছোট দৈর্ঘ্যের রশ্মি প্রেরণ করা হয়। বিচ্ছুরণের জন্য আদি (original) রশ্মি-শক্তির যথেষ্ট পরিমাণ হ্রাস হয়। কারণ উহার বেশীর ভাগই নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাধাবস্তু হতে বিচ্ছুরিত রশ্মিকে যন্ত্রের গ্রাহক অংশে (receiver) ধরে নেওয়া হয়। রেডার-রশ্মির (Radar beam) গতিবেগ আলোক-তরঙ্গের গতিবেগের সমান (সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল)। সুতরাং রেডার-রশ্মির প্রেরণ ও গ্রহণের মধ্যে যে সময়-ব্যবধান সেটা জানতে পারলেই যন্ত্র থেকে এরোপ্লেনের দূরত্ব আমরা অনায়াসে পেয়ে যাব। যেমন ট্রেনের গতিবেগ এবং কতক্ষণে ট্রেন কলকাতা থেকে বর্ধমানে গেছে জানলে কলকাতা থেকে বর্ধমানের দূরত্ব জানা যায়। এই সময়কাল বাধা-বস্তুর দূরত্বের উপর নির্ভর করে সন্দেহ নাই, তবে সচরাচর যে সব কাজে রেডার যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাতে তা অত্যন্ত কম। কখন কখন প্রায় এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র। সাধারণ ভাবে কখনও ইহা নির্ধারণ করা যেতে পারে না। তদুপরি বেতার-তরঙ্গ যন্ত্রের প্রেরক অংশ ছেড়ে যাওয়ার সময়টা আমাদের পক্ষে সঠিক নির্ণয় করা অসম্ভব। এজন্য আমরা ক্যাথোড রে অসিলোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে থাকি। এই যন্ত্রের প্রতিপ্রভ (fluorescent) পর্দায় বাধাবস্তু হতে বিচ্ছুরিত রেডার-রশ্মির নির্দেশ পাওয়া যায়। পর্দাটীতে দুটী মাপকাঠি বা স্কেল আছে। একটী খাড়া অপরটী আড়াআড়ি (horizontal) (২নং ছবি)। আড়াআড়ি মাপকাঠিটী সময়ের এবং খাড়া মাপকাঠিটী বৈদ্যুতিক চাপের নির্দেশ দেয়।

রেডার যন্ত্রে প্রেরক অংশ ও গ্রাহক অংশ সামান্য দূরে থাকার জন্য পর্দায় দুটো ছবি আমরা দেখি (২নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

যে রেডার রশ্মি একেবারে সোজাসুজি প্রেরক অংশ থেকে গ্রাহক অংশে এসে পড়ে সেটা ২নং চিত্রের নির্দিষ্ট প্রথম ছবিটি নির্দেশ করে। দ্বিতীয়টী বাধাবস্তু হতে প্রতিফলিত রেডার রশ্মির নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে পর্দায় দুটো ছবির যে ব্যবধান সময়-নির্দেশকারী মাপকাঠিতে দেখি তার কারণ এই যে, সোজা (direct) রশ্মি গ্রাহক অংশে পৌছতে প্রতিফলিত রশ্মি হতে অনেক কম পথ অতিক্রম করে। ফলে প্রতিফলিত রশ্মি সোজা রশ্মির সামান্য পরে এসে গ্রাহক অংশে ধরা পড়ে। সময়-নির্দেশকারী মাপকাঠিতে ছবি দুটীর ব্যবধান বস্তুত রেডার-রশ্মির প্রেরণ ও গ্রহণের মধ্যে সময়-ব্যবধানই নির্দেশ করে। আগেই বলে এসেছি, রেডার-রশ্মির গতিবেগ আমাদের জানা আছে। সুতরাং বাধাবস্তুর দূরত্ব ঐ সময় থেকে সহজেই নির্ধারণ করতে পারি। কার্য্যত সময়-নির্দেশকারী মাপকাঠিটী আলোর গতিবেগ সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল অনুযায়ী দূরত্বের মাপে (মাইল কিংবা গজে) নির্দিষ্ট থাকে (৩ নং চিত্র)। তা হলে একেবারে পর্দার ছবি থেকেই আমরা বাধাবস্তুর দূরত্ব জেনে যাব। যেখানে এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলে না, সেখানে আবার কাগজ কলম নিয়ে সময় এবং গতিবেগ থেকে অঙ্কে কষে দূরত্ব বের করা সম্ভব নয়। সেজন্য এবং সুবিধার জন্যও ঐ ব্যবস্থাই করা হয়।

বাধবস্তুর দিগংশ এবং উচ্চতা এক সঙ্গে মাপা হয়। আগে বলেছি, রেডার যন্ত্রের আকাশ-তার থেকে রশ্মির এক সরু ফালি সৃষ্টি করে উপরে পাঠান হয়। এজন্য আকাশ-তারের পেছনে একটি ধাতুর প্রতিফলক আছে। প্রতিফলকটী একটি বিরাট 'প্যারাবোলোইড'। আকাশ-তারটী মাপে রেডার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অর্ধেক (half wave dipole) এবং প্রতিফলকটীর মাঝখানে উহার অক্ষের সহিত আড়াআড়ি করে খাটান। ফলে রেডার

যন্ত্র হতে প্রেরিত শক্তি-প্রক্ষেপ একটা নির্দিষ্ট ঘন-কোণের (solid angle) ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে (৪নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। অজানা বাধাবস্তুর উপস্থিতি জানবার জন্য আকাশ-তারটী সহ প্রতিফলকটীকে দিক্‌চক্রবালের চারদিকে প্রদক্ষিণ করান হয়। এজন্য প্রতিফলকটী একটী লোহার স্তম্ভের উপর বসান থাকে এবং স্তম্ভের বেদীটাকে বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে ঘোরান হয় (৪ নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। বাধাবস্তুটী যখনই শক্তি প্রক্ষেপের ঐ ঘন-কোণের ভেতর এসে পড়ে কেবলমাত্র তখনই রেডার-রশ্মি উহা হতে প্রতিফলিত হয় এবং যন্ত্রের গ্রাহক অংশ হেলান যায় এবং সেই হেতু কোন নির্দিষ্ট নিশানা হতে প্রতিফলকটীর যে কোন অবস্থানকেই উহার নিজস্ব দিগংশ এবং উচ্চতা হিসাবে নির্ধারণ করা চলে। প্রতিফলকের দিগংশ নির্ধারণ করা হয় উত্তর দিক হতে। সুতরাং প্রতিফলকের দিগংশ এবং উচ্চতা জানা থাকলে, তা থেকেই বাধাবস্তুর দিগংশ এবং উচ্চতা আমরা পেয়ে যাই। প্রতিনিয়ত এরোপ্লেনের অবস্থানের পরিবর্তনের জন্যে আমাদের প্রতিফলটীর অবস্থানও ঐ সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বদলাতে থাকে, এরোপ্লেনের নতুন অবস্থান নির্ণয় করার জন্যে। কাজেই বাধাবস্তুটী সর্বদা আমাদের চোখের সামনেই থেকে যায় এবং কেবলমাত্র প্রতিফলকটীর গতি নির্ণয় করেই বাধাবস্তুর নতুন অবস্থান জানতে পারি।
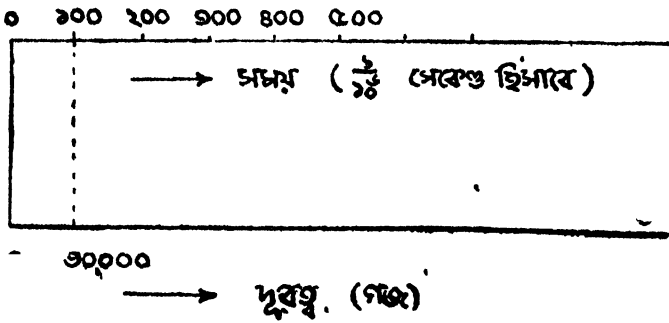
৩নং চিত্র
সময়-নির্দেশকারী মাপকাঠি, দূরত্বের মাপে পরিবর্তিত হইতেছে

শত্রুপক্ষের বোমারু বিমানের অবস্থানই শুধু এ যন্ত্রে ধরা পড়ে না। নির্ভুলভাবে অপরপক্ষে বোমারু বিমানকে গোলা ছোড়ার কাজে, নৌ-কামান ও বিমান-ধ্বংসকারী কামানকে এই যন্ত্র সাহায্য করে। সেল্‌সিন (Selsyn) মোটরের সাহায্যে সর্বদাই প্রতিফলকের অবস্থান, অর্থাৎ দিগংশ, উচ্চতা, প্রভৃতি যন্ত্রস্থিত কামান-পরিচালক (gun director) অংশে পাঠান হতে থাকে এবং সেই অনুসারে যন্ত্রস্থিত কামান, বন্দুকগুলিও নির্দিষ্ট দিকে চালিত হয়। আগেই জেনেছি, প্রতিফলকটীর অবস্থান হতে কি ভাবে বাধাবস্তুর অবস্থান জানতে সক্ষম হই। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে যন্ত্রস্থিত কামান বন্দুকগুলি বাধাবস্তুর অবস্থান অনুসারেই ঘুরে যাবে।

কার্যকরী হয়। চিত্রের ক খ রেখার সোজাসুজি সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি প্রেরিত হয়ে থাকে। সুতরাং ক্যাথোড রে অসিলোগ্রাফ যন্ত্রের পর্দায় অবস্থিত খাড়া মাপকাঠিতে যখনই প্রতিফলিত রশ্মির সর্বাধিক পরিমাণ বৈদ্যুতিক চাপ নির্দিষ্ট হবে, তখনই জানব, বাধাবস্তুটী আমাদের ক খ রেখার সমসূত্রে অবস্থিত। আকাশ-তারের দৈর্ঘ্য, অবস্থান এবং প্রতিফলকটীর আকৃতি অনুসারে এই ক খ রেখাই হচ্ছে, প্রতিফলকটীর অক্ষ।

বাধাবস্তুর অন্বেষণ কাজে প্রতিফলটীকে ওঠান, নামান, কিংবা নিজ অক্ষের চারিদিকে ঈষৎ

বাধাবস্তুর দূরত্ব, দিগংশ, উচ্চতা এই তিনটী তথ্য সেল্‌সিন মোটরের সাহায্যে পৃথক ভাবে কামান-পরিচালক অংশে প্রেরিত হয়, যাতে আমাদের বিমান-ধ্বংসকারী কামানগুলির দূর পাল্লা, দিগংশ ও উচ্চতাও সেই অনুপাতে ঠিক হয়। বাধাবস্তুকে একবার রেডার-রশ্মি দিয়ে ধরবার পর থেকে যন্ত্রের এ সমস্ত কাজও আপনা-আপনি হতে থাকে। এ ভূতুড়ে মনে হয়। যে এরোপ্লেন চালাচ্ছে, সে জানতেও পারছে না যে যত চুপিসাড়ে সে মেঘ বা কুয়াশার আড়ালে আসুক না কেন, অন্যপক্ষের একটা সদা সতর্ক চোখের কাছে তার কোন গতিবিধিই গোপন নেই, এবং প্রায় নিশ্চিত মরণের মধ্যেই তার সকল কৌশল পর্যবসিত হচ্ছে। ইংলণ্ডে যখন প্রচণ্ডবেগে ভি-২ বোমার আক্রমণ আরম্ভ হয়েছিল
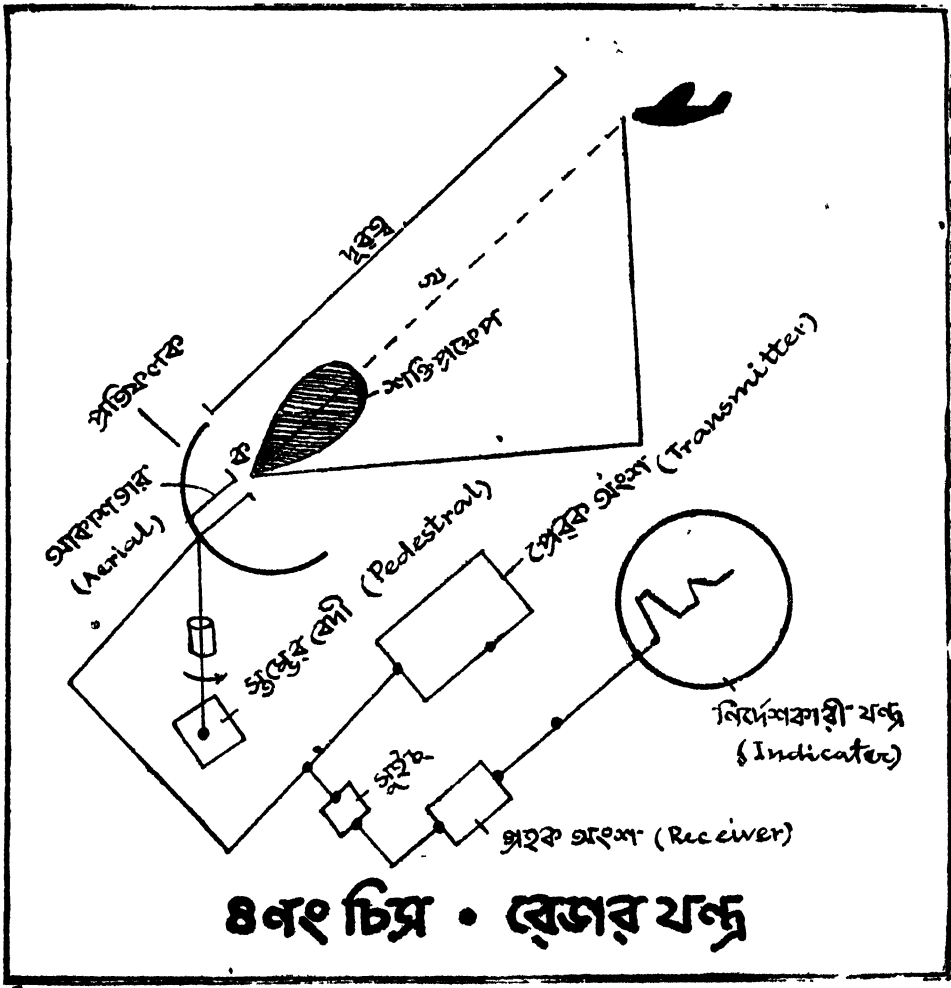
৪নং চিত্র • রেডার যন্ত্র

ভাবে লক্ষ্যবস্তুটী যখনই কামানের পাল্লার ভেতর এসে পড়ে তখনই গোলা ছোড়া হয়।

একটী মানচিত্রে কিছুক্ষণ পরপর রেডারযন্ত্রে গৃহীত এরোপ্লেনের সঠিক অবস্থান আঁকা হয়। এ থেকে এরোপ্লেনের গতি বেগ ও পথ অতি সহজেই আমরা জেনে যাই। ব্যাপারটা সত্যিই তখন এই রেডার যন্ত্রই শেষ পর্যন্ত সে আক্রমণকে ব্যর্থ করতে এবং ইংলণ্ডকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

বাধাবস্তুর অবস্থান নির্ণয় করা ছাড়া রেডার-যন্ত্র দিয়ে অদৃশ্য বাধাবস্তুর অবস্থান, আকার ও আয়তন সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করা যায়। রশ্মি যত সরু ফালির আকারে পাঠান যায় ততই

নির্দোষভাবে বাধাবস্তুর অবস্থান, আকার ও আয়তন নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

যে কোন বাধাবস্তু হতে প্রতিফলিত রেডার-রশ্মির শক্তি সমান হয় না। বাধাবস্তুর আয়তন, উহার গতি এবং দূরত্বের উপর ইহা নির্ভর করে। অতি ছোট দৈর্ঘ্যের তড়িৎ-চুম্বকীয় প্রবাহের ইহা একটা বিশেষ গুণ যে, যে-কোন রকম বাধাবস্তু হতেই কিছু না কিছু প্রতিফলিত হবে। তবে বাধাবস্তুর আকার, আয়তন এবং দূরত্ব অনুযায়ী প্রতিফলিত রশ্মি-শক্তির তারতম্য হয়। বাধাবস্তুর পৃষ্ঠদেশ যদি অমসৃণ বা উঁচুনীচু থাকে তা হলে রেডার-রশ্মি তা থেকে চতুর্দিকে প্রতিফলিত হবে এবং খুব অল্পই যন্ত্রে ধরা পড়বে। জাহাজ এবং উড়োজাহাজের পৃষ্ঠদেশ অনেকটা অমসৃণ। বাধাবস্তু হতে বিচ্ছুরণ-ক্রিয়ায় সেজন্য প্রেরক অংশ থেকে প্রেরিত রশ্মি-শক্তির বেশীর ভাগই নষ্ট হয়। যাতে এ অবস্থাতেও রেডার যন্ত্র দ্বারা প্রতিফলিত রশ্মি গ্রহণ করা যায়, সেজন্য প্রেরক অংশ হতে অতি প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন রশ্মি পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। কোন কোন রেডার যন্ত্র হতে এক অথবা অর্ধ লক্ষ ওয়াট শক্তি-সম্পন্ন রশ্মি প্রেরিত হয়। কিন্তু এই শক্তি কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর এবং খুব অল্প সময়ের জন্য পাঠাবার ফলে গড়ে শক্তি খুব কমই ব্যয় হয়।

যুদ্ধের সময় রাত্রিবেলা শত্রুবিমানকে নীচে নামিয়ে আনা, টহলদারী বিমান হতে শত্রু জাহাজ অন্বেষণ করা, এ সমস্ত কাজে রেডার যন্ত্রের সাহায্য অপরিহার্য। তা ছাড়া অন্ধকারে এবং যে কোন আবহাওয়াতেই রেডার যন্ত্রের ব্যবহার হয় বেশী রকম। এ থেকেই বোঝা যায় রেডার যন্ত্রের আবিষ্কার মানব জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছে।

বিজ্ঞান ও বাঙ্গালা ভাষা

যদি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহা না করিলেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে ফলবতী হইবে না, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখিতে হইবে। দুই চারি জন ইংরেজিতে বিজ্ঞান শিখিয়া কি করিবেন?... তাহাতে সমাজের ধাতু ফিরিবে কেন? সামাজিক 'আবহাওয়া' কেমন করিয়া বদলাইবে? কিন্তু দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে। কেহ ইচ্ছা করিয়া শুনুক আর নাই শুনুক, দশবার নিকটে বলিলে দুইবার শুনিতেই হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবর্তিত হয়। ধাতু পরিবর্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। অতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।

বঙ্গে বিজ্ঞান (বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১২৮৯)

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী

শ্রীসুকুমার বসু

প্রতি বৎসর সমাবর্তন উৎসবে ভাইস-চানসেলর মহাশয় যেকালে কয়েক শত উত্তীর্ণপাঠ তরুণ-তরুণীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির ছাপ দিয়া ভবের হাটে ছাড়িয়া দেন সেকালে স্নাতক-বৃন্দ তাঁহার কাছ হইতে একটা হুকুম লইয়া বাহির হইয়া পড়ে। হুকুমটি এই: "ভাইস-চানসেলরের পদাধিকার বলে আজ আমি তোমাদিগকে অমুক ডিগ্রিতে অলংকৃত করিলাম। আর এই আদেশ দিলাম যে তোমরা যে অমুক ডিগ্রি প্রাপ্তির যোগ্য, জীবনযাত্রায় ও কথোপকথনে চিরকাল তাহার পরিচয় দিতে থাকিয়ো।" 'জীবনযাত্রায় ও কথোপকথনে' এই কথা কয়টি লক্ষ্য করিবার বিষয়।

এই ব্যাপারে মনে হইতে পারে যে, যিনি যে বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছেন তিনি আমরণ বাক্যে ও ব্যবহারে অন্তত সেই বিষয়ের যোগ্য মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে কসুর করেন না। বিজ্ঞানের উচ্চানুচ্চ ডিগ্রিধারী শত শত ব্যক্তি প্রতি বৎসর দেশে ছাড়া পাইতেছেন, তাই সহসা মনে হইতে পারে যে দেশ বুঝি বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিতে ভরা। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া এ ধারণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো কিছু পাওয়া যায় না। না পাওয়ার কারণ এই যে আমাদের সমাজমন ও ব্যক্তিমন যে মানসিকতার আবহাওয়ায় সেকাল হইতে গড়িয়া উঠিয়া আজও বাস করিতেছে তাহা বৈজ্ঞানিকতার অনুকূল নহে।

মনুষ্য-সমাজের ইতিহাসের গোড়ার দিকে দেখি আদিম মানুষের কাছে কার্যকারণের সম্বন্ধটা তত পরিষ্কার ছিল না, তাই তাহারা অস্বাভাবিকে স্বতঃই আস্থাপূর্ণ ছিল। যে ঘটন তাহাদের বুদ্ধির বাহিরে ছিল তাহা তাহারা ভূতের কার্য বলিয়া ধরিয়া লইত। সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যে সীমারেখা ছিল ক্ষীণ। আজ মানুষের বুদ্ধিশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে, কার্যকারণের সম্বন্ধ তাহার মনে অধিকতর স্পষ্ট, জ্ঞানের অধিকতর প্রসার হইয়াছে, বিজ্ঞানে সে অনেক অগ্রসর হইয়াছে, তাই ভূতের সংখ্যাও অনেক কমিয়াছে। কিন্তু মানুষের সেই আদিম সংস্কার সম্পূর্ণরূপে কাটাইয়া উঠিতে আজও সে কি পারিয়াছে? বোধহয় একবিন্দু রহিয়া গিয়াছে, তাই বর্তমানেও শিক্ষিত মানুষের সজ্ঞান মনের নীচের স্তরে কোন একটা অন্ধকার জায়গায় ভূতের অস্তিত্বের প্রতি যেন একটা আগ্রহ দেখা যায়। সেই আগ্রহে অঘটন-ঘটনে বিশ্বাস স্থাপনের পথে প্রমাণ প্রয়োগের অনিচ্ছা দেখা দেয়। যুক্তি ও আদিম সংস্কারে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়া তাহার স্বাধীন চিন্তাকে কাবু করিয়া দেয়। অথচ লজ্জার মাথা খাইয়া ভূতে বিশ্বাস স্বীকার করিবার সৎসাহসও নাই! অন্তরের ইচ্ছাটা এই যে যদি কোন নামকরা আধুনিক বিজ্ঞানী সহসা একদিন এই সকল যুক্তিবিরোধী বিশ্বাসকে সমর্থন করিয়া ডংকা বাজান তাহা হইলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচি।

তাহা ছাড়া ধর্ম ও দেশাচারের প্রবল হস্ত ইহাতে আছে। অনেকগুলি বড় বড় ধর্মমত অস্বাভাবিক ও অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিতা হইয়া আজও বিদ্যমান রহিয়াছে। শিক্ষিত ধার্মিক মনে অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের সঙ্গে যখন যুক্তির লড়াই বাধে, ধর্মান্ধতা তখন যুক্তিকে বিনাশ করে, কোনমতেই তাহাকে জয়যুক্ত হইতে দেয় না। দেশ ও দেশাচারের প্রেমে উচ্চশিক্ষিত মানুষকেও কুযুক্তির পথে টানে। নিরর্থক আচার এবং

অর্থহীন আচরণ চক্ষুর সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইলেও তিনি দেখিয়াও তাহা দেখেন না, বরং ভাবদৃষ্টিতে বিচার করিয়া সে সকলকে সমর্থন করেন, হয়তো বা তাহাতে আধ্যাত্মিক অর্থসকল আরোপ করিয়া সে সকলকে প্রশংসার চক্ষে দেখেন।

অতিশয়োক্তি বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি গঠনের পরীপন্থী। কিন্তু কাব্যে, সাহিত্যে, রূপকথায়, প্রবচনে, গানে, গল্পে সর্বত্র অতি প্রাচীনকাল হইতে সেদিন পর্যন্ত অতিরঞ্জন ও অতিশয়োক্তির প্লাবন বহিয়া বাস্তব কল্পনা, সম্ভব অসম্ভব, সত্য মিথ্যা একাকার করিয়া মানুষের মনোবৃত্তিকে ঘোলাটে করিয়া দিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় এমন কি সৎসাহিত্য দর্শন ইতিহাস, জ্যোতিষ চিকিৎসাশাস্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্রও অতিরঞ্জন ও রূপকের ভারে ভারাক্রান্ত। বাংলার পুরাতন কাব্যসাহিত্যের তো কথাই নাই। যেখানে বিদ্যার রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে—

মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া
অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া।

বর্তমান জগতে মানুষের মন বিবর্তন ও সংস্কৃতির বশে সেকালের চেয়ে অনেক অগ্রসর হইয়াছে। আদিম সংস্কারের পিছটান কাটাইয়া মানুষকে সামনে আসিতে হইলে দেশের ও দশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি ও প্রসার করিতে হইবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ যে কয়টি উদ্দেশ্য লইয়া ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই সৃষ্টিকার্য ও প্রসারকার্য তাহাদের অন্যতম। দেশের জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞান শিক্ষা পৌঁছিয়া দিতে হইলে ও সেই শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে বাংলা ভাষার মারফতেই তাহা হওয়া উচিত। বিজ্ঞানশিক্ষা দেশে যতটা অগ্রসর হইয়াছে বৈজ্ঞানিকতা ততটা হইতে পারে নাই কি জন্য তাহার কিছু কারণ আগেই বলিয়াছি। যাহা হইয়া গিয়াছে তাহাতে আমাদের হাত নাই। কিন্তু ইচ্ছা করিলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আমরা নিজের হাতে কতকটা গড়িয়া তুলিতে পারি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার সহজ হয় যদি বিজ্ঞান শিক্ষাটি আমরা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করি, ব্যবহারিক ভাবে লইয়া সুধু কিতাবতি বিদ্যা হিসাবে পরীক্ষা পাসের কাজে না লাগাই। সেইজন্য বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জীবনে তাহার প্রয়োগ যাহাতে হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

বৈজ্ঞানিকতা বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কি বস্তু তাহা বুঝিতে হইলে বিজ্ঞানবিদ্যা কি ভাবে আহরণ করিতে হয়, ইহার বিশেষত্ব কি, পদ্ধতি কিরূপ, তাহার একটু আলোচনা করিলে জিনিসটা হয়তো পরিষ্কার হইবে।

মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিক্ষালাভ করিতে আরম্ভ করে, তারপর যতদিন বাঁচে শিক্ষা করিতে করিতে বাঁচে। এই ব্যাপার সমস্ত সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ নামক জীবেই যে সুধু হয় এমন কথা জোর করিয়া বলা না গেলেও এটুকু বলা যায় যে, কথাটা মানুষ সম্বন্ধে যতটা খাটে মানবেতর প্রাণীতে ততটা খাটে না। জৈব বিবর্তনের পর্যায়ের শীর্ষস্থানে মানুষ নামক জীব। এই পর্যায়ে বিপরীত কয়েক ধাপ মাত্র অবতরণ করিলে যে সকল জীব দেখা যায় সেই সকল জীবে জীবন ধারণের জন্য শিক্ষার কোন প্রয়োজন হয় না। তাহাদের ভিতর প্রকৃতিদত্ত সহজ বুদ্ধির প্রেরণা অতিশয় প্রবল। যেটুকু বুদ্ধি আছে তাহা সহজ, জন্মের সহিত আসে, কাজেই শিক্ষার স্থান কোথায়? অথচ এই সহজে পাওয়া সংস্কারের বলে যে উর্ণনাভ জীবনে কখনও জাল বুনা দেখে নাই প্রথম চেষ্টাতেই সে সর্বাঙ্গসুন্দর জাল বুনিয়া দেয়, মৌমাছির দল প্রথম চেষ্টাতেই বিচিত্র সুন্দর মধুচক্র রচনা করে।

একদা প্রাতঃকালে গৃহ হইতে কর্মক্ষেত্রে বাহির হইবার পূর্বে দেখিয়া গেলাম যে গাভী একটি বৎস প্রসব করিয়াছে। অপরাহ্নে ফিরিয়া দেখি নূতন বাছুরটি এদিক-ওদিক চলিয়া বেড়াইতেছে। সুধু তাহাই নহে, বাগানে জল নিকাশের জন্য যে ছোট বাঁধান ড্রেনটি আছে বাছুর মহাশয় সেটি জোড় পায়ে

লাফাইয়া পার হইতেছেন। ঘণ্টা দশ আগে যে জীব পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হয় নাই ইহারই মধ্যে ড্রেন সে কখন চিনিল আর অমন অবলীলায় জোড় পায়ে পার হইবার কৌশল কে তাহাকে শিক্ষা দিল? এই প্রশ্নের অবশ্য জবাব এই যে সহজ সংস্কারের বশেই মানবেতর প্রাণীরা সম্পূর্ণ নূতন অবস্থাকে আয়ত্ত করিয়া লয়, নতুবা চেষ্টা করিয়া তাহাদের কিছু শিখিতে হয় না। তাহারা ঠেকিয়া শেখে না।

মানব শিশু জোড় পায়ে ড্রেন পার হওয়া তো দূরের কথা তাহার মায়ের অঙ্গুলিটি ধরিতে শিখিতেই তাহার অনেক দিন যায়। বার বার দেখিয়া হাত বাড়াইয়া দূরত্বের বোধ আসে। হাতের নাগাল কতদূর তাহা বুঝিতে, আঙুলটা চাপিয়া ধরিতে ক্রমে ক্রমে শিখিতে হয়। এই ভাবে বুদ্ধি বিকাশের প্রথম অবস্থা হইতেই মানব শিশুকে কিছুটা অন্তত স্বকীয় চেষ্টায় শিখিতে হয়। সে ঠেকিয়া শেখে।

মানবেতর প্রাণীতে ও মানুষে এইখানে তফাৎ। ঊর্ণনাভের জাল ও মৌমাছির মধুচক্র কোন অদৃশ্য প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি মাত্র, উহার ব্যতিক্রম উহাদের দ্বারা হইবার নয়। উহাদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি স্তিমিত নিদ্রিত অবস্থায় আছে, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত অচেতনভাবে সংস্কারের তাড়নায় গতানুগতির পথে তাহারা চালিত হয়।

মানুষের ভিতর সহজ বুদ্ধির প্রেরণা ততটা প্রবল নয়, সহজ বুদ্ধির সহায়তা মানুষ কতকটা পাইলেও সারা জীবন তাহাকে ঠেকিয়া শিখিতে হয়। সহজ সংস্কার যাহার যত বেশি আছে—চেষ্টা তাহার তত অল্প করিতে হয় একথা সত্য হইলেও মনুষ্য-জীবনের কৃতিত্ব, জীবন সংগ্রামে জয়ী হইবার ক্ষমতা এই সকল অর্জন করা তাহার ঠেকিয়া শিখিবার সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে—একথা বলা অত্যুক্তি নহে।

শিক্ষার এই ঠেকিয়া শেখার পদ্ধতিরই অপর নাম বিজ্ঞান পদ্ধতি—ইহাই বিজ্ঞানীর অবলম্বন। এই দিক দিয়া দেখিলে মানুষ মাত্রেই বিজ্ঞানী।

বিজ্ঞানে আমরা শিক্ষা করি স্বভাব কি নিয়মে চলে। কোন একটা স্বাভাবিক নিয়ম পাইতে হইলে কয়েকটা ধাপ দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় সেই ধাপগুলির নাম আছে—প্রথমে অবেক্ষণ ও পরীক্ষণ, তাহার পর বিচার ও সিদ্ধান্ত।

একটা স্বাভাবিক নিয়ম বলা গেল:—খাঁটি সোনা সমান আয়তনের জলের চেয়ে ১৯গুণ ভারি।

এই নিয়মটা পাইতে হইলে আমাদের প্রথম ধাপের কার্য হইবে—দেখা। লক্ষ্য করা, পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষণ করা এই সব কয়টা মিলাইয়া যে কার্যটি হইল তাহা অবেক্ষণ, ইংরেজিতে observation।

একতাল সোনালি বর্ণের, উজ্জ্বল, ভারী ধাতব পদার্থ হাতে লইলাম। সোনা বলিয়া বোধ হইতেছে। পদার্থটাকে লক্ষ্য করিয়া, টিপিয়া, পিটিয়া, ঘষিয়া, ভাঙ্গিয়া, স্পর্শ করিয়া, আঘ্রাণ লইয়া, তাহার উপর ছুরি দিয়া দাগ কাটিয়া দেখা গেল বর্ণে ভারে কাঠিন্যে ইত্যাদিতে সব দিক দিয়া সোনার সহিত ইহা মিলিয়া যাইতেছে। তবে ওটা স্বর্ণখণ্ডই বটে। অপেক্ষা করা হইল।

এবার দ্বিতীয় ধাপের কাজ পরীক্ষা করা। ইংরেজিতে যাহাকে বলে experiment। পরীক্ষণ যাহাতে নির্ভুল হয় বিজ্ঞানী সেদিকে যতদূর সম্ভব যত্নবান হন এবং সে বিষয়ে কোন ক্লেশ ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নন। এমন কি তিনি ভুলভ্রান্তির নূতন নূতন সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া সেগুলির উচ্ছেদে লাগিয়া যান। এ বিষয়ে তিনি নিজেকেও সন্দেহের চক্ষে দেখেন।

সোনার তালটার আকৃতি সুসমঞ্জস নহে, বিষম আকারের, ত্যাবড়ান গঠন। ইহার সম আয়তনের জল লওয়া দরকার। সে কাজ কিছু কঠিন নয়। একটা পাত্র কানায় কানায় জলে পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে তালটিকে নিক্ষেপ করা যায়। যে জলটুকু উপচাইয়া পড়ে সেটুকু নিশ্চয়ই সোনার তালের সম আয়তনের পরিমাণ জল। এখন এই উপচান জলটুকু নিক্তিতে চড়াইয়া সযত্নে

তাহার ভারের অঙ্কটা লইয়া নোট করিয়া রাখা হইল। তাহার পর সোনার তালটা নিক্তিতে ওজন করিয়া ভারের অঙ্কটি খতাইয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে জলের ভার হইতে সোনার ভার উনিশ গুণ বেশী হইয়াছে।

এই ভাবে যতবার যতস্থানে সোনা ওজন করা হইয়াছে ততবারই দেখা গিয়াছে যে সোনার ওজন সমায়তন জলের ১৯ গুণ ভারি। আজ পর্যন্ত ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় নাই। সোনা যদি খাঁটি সোনা হইয়া থাকে, জল যদি খাঁটি জল হইয়া থাকে, পরীক্ষা যদি নির্ভুল ভাবে করা হইয়া থাকে তো সোনা জলের ১৯ : ১ সম্বন্ধের ব্যতিক্রম অদ্যাবধি হয় নাই। এই সকল বিচার ও বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত হইল যে নিয়মটা একটা স্বাভাবিক নিয়ম।

পরীক্ষা যতবার হয় এবং যত রকমে, যত অবস্থায়, যত লোকের দ্বারা, যত স্থানে হয় ততই ভাল। তথ্যসংগ্রহ বিজ্ঞানীর একটা বড় কাজ। তথ্যগুলির সঠিক প্রয়োগ চাই, যাহার সহযোগে বিচার দ্বারা সিদ্ধান্তে পৌঁছি। প্রমাণগুলির প্রয়োগ-নৈপুণ্য চাই। স্বভাবতই জগৎব্যাপারে একটা সঙ্গতি আছে, একটা নিয়মানুবর্তিতা আছে বলিয়া আমরা জানি, সেইজন্য কয়েকবার পরীক্ষা করিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া আমরা নিশ্চিন্ত হই। আজ যাহা সিদ্ধান্ত বলিয়া জানি তাহার ব্যতিক্রম নাই বা কোন কালে হইতে পারে না এমন কথা কেহ বলে না। যদি ব্যতিক্রমের প্রমাণ পাই তবে তাহাই মানিয়া লইব, বর্তমান সিদ্ধান্ত আর গ্রাহ্য করিব না—তাহাকে বদলাইয়া লইব। এখন যতদূর জানি সিদ্ধান্তটা সত্য, এখানেও সত্য, সেখানেও সত্য, কামস্কাটায় সত্য, টিমবাকটুতে সত্য। কাজেই হঠাৎ যদি শুনি অমুক স্থানে অমুক ব্যক্তি একতাল সোনা জলে নিক্ষিপ্ত করায় সেটা জলের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে তাহা হইলে সহসা কথাটা বিশ্বাস করা দায় হইয়া পড়ে। কেহ যদি বলিয়া বসেন—"আপনার বৈজ্ঞানিক নিয়মের অন্যথা কি হইতে পারে না মহাশয়?" বিজ্ঞানী তাহাতে বলিবেন—"হইতে হয়তো পারে। কিন্তু হইতে পারা আর হওয়া কি একই জিনিস? আপনার কথাও সত্য হইতে পারে যদি সংবাদটা ঠিক হয়, ঘটনাটা ঠিক হয়; কিন্তু তাহার প্রমাণ চাই।" অন্যান্য সাধারণ লোক যেরূপ প্রমাণে বিশ্বাস করে বিজ্ঞানী তাহাতে আস্থাবান নহেন। সোনাটা সোনাই তো ছিল? তাহাতে কি ভেজাল কিছু ছিল? জলটা খাঁটি জল ছিল, না তাহাতে দ্রবীভূত কিছু ছিল? জলের কুড়িগুণ ওজনের কোন পদার্থ যদি থাকে এবং তাহা বেমালুম জলে মিশিয়া যায় তবে সেই মিশ্রিত জলে সোনা ভাসিয়া উঠা বিচিত্র নহে আর তাহাতে নিয়মের ব্যতিক্রমও হয় না। ভানুমতিকা খেল দেখিতে গিয়া আপাতদৃষ্টিতে স্বভাব-বিপরীত কত ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইতে দেখি—পরীক্ষায় তাহা টেঁকে কি?

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ব্যক্তি তাই অস্বাভাবিক ব্যাপারে বিশ্বাস করিতে চান না। বিশ্বাস না করা তাঁহার একটা বাতিক। ভদ্রলোকের কথায় অবিশ্বাস করা সামাজিক আচরণ নয়, কিন্তু কি করা যাইবে, বিজ্ঞানীর স্বভাবই ঐরূপ। ভদ্রলোক যে মিথ্যা কথা বলিতেছেন তাহা নহে। কিম্বা তাঁহার সততায় সন্দেহ করা হইতেছে তাহা নহে। সন্দেহটা এই যে ভদ্রলোক ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাঁহার রিপোর্টটা ভুল, নয়তো তাঁর বিচারের ভুল—তিনি স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও ঠিক দেখিতে পান নাই।

"বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ব্যক্তি" কথাটা বেয়াড়া শুনাইতেছে। আজ আমরা ঐ ব্যক্তিকে বিজ্ঞানী নামে অভিহিত করিয়াছি—বৈজ্ঞানিকতা যাঁহার স্বভাব এবং বৈজ্ঞানিক যাঁহার মেজাজ। তাই ঐ বেয়াড়া কথাটার পরিবর্তে শেষ পর্যন্ত শুধু বিজ্ঞানী শব্দটা ব্যবহার করিয়া যাইব।

দেখা গেল বিজ্ঞানীর স্বভাবে সন্দেহ বাতিকটা

মজ্জাগত। তিনি তাঁহার সধর্মী অপর বিজ্ঞানীকে পর্যন্ত সন্দেহ করিয়া চলেন, এমন কি নিজেকেও সন্দেহ করিতে ছাড়েন না। তাঁহার স্বভাবের আর একটু পরিচয় দিলেই আমাদের কাজ শেষ হয়।

বিজ্ঞানী দেখেন এবং দেখিতে জানেন। কথাটা বোধ হয় একান্ত নিরর্থক ঠেকিল। যাহার চক্ষু আছে সেই তো দেখে! কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাই? তাহা যদি হইত তো একই ঘটনায় উপস্থিত থাকিয়া বা একই স্থান হইতে উভয়ে আসিয়া দুইজনে দুই প্রকার সংবাদ দেয় কেন? কেহ বেশি দেখে, কেহ কম দেখে, আবার কেহ বা মোটেই দেখে না। বলিবার কিছু পায় না। জনৈক বন্ধু কেবল ভ্রমণ-কারণ নহে, কর্মব্যপদেশে ভারতের নানা দেশ করি পর্যটন অবশেষে প্রত্যাবর্তন করিলেন এই কলিকাতা শহরে। কিন্তু তাঁহার কাছ হইতে নানা প্রদেশে তাঁহাদের স্থানীয় অপিস এবং স্থানীয় হোটেল এই দুই বৃত্তান্ত ছাড়া আর কোন প্রসঙ্গ চেষ্টা করিয়াও বাহির করিতে পারা গেল না। চোখে কিছুই তাঁহার পড়িল না, সবইতো সাধারণ ব্যাপার, দেখিবার বলিবার মত আছে কি!

বিজ্ঞানীর কিন্তু দেখিবার মত জিনিসের অন্ত নাই, উপভোগ করিবার ক্ষমতাও তাঁহার প্রচুর; তাঁহার কাছে সবই ইনটারেস্টিং। বিজ্ঞানীর সহিত সাহিত্যিকের এইখানে মিল। তফাৎ সুধু এই যে বিজ্ঞানী তাঁহার দৃষ্টিতে কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসা মিশাইয়া আরও বেশী দেখেন, এবং সাহিত্যিক তাঁর দেখার আনন্দের ভাগ আরও বেশী করিয়া অপরকে বিতরণ করিবার কৌশল জানেন।

তাহা ছাড়া বিজ্ঞানী যাহা দেখেন তাহা পরীক্ষার দৃষ্টিতে দেখেন। আপাতদৃষ্টির গোচর কোন অসাধারণ ব্যাপারকে সহসা অসাধারণ বলিয়া না মানিয়া সত্যই তাহা অসাধারণ কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া লন। তিনি নির্বিচারে কিছু গ্রহণ করেন না, আবার কোন বিষয়েই 'তাড়াতাড়ি একটি মত গঠন করিয়া লইবার আগ্রহ তাঁহার নাই। প্রত্যেক বিষয়ে একটা অকাট্য মত থাকিতেই হইবে এমন কি কথা আছে?

স্বদেশী বিদেশী পণ্ডিত মূর্খ সকলকে লইয়াই জগতের অধিকাংশ সাধারণ লোক চিন্তা করিতে নারাজ। ভাবনা ও বিচারে আমাদের যত কুণ্ঠা এমন আর কিছুতে নহে। তাই পরের গড়া চিন্তা ও মতামত আমরা স্বকীয় বলিয়া ভাবি। এ বিষয়ে বিজ্ঞানীর স্বভাব একেবারে সম্পূর্ণরূপে ও সমূলে বিপরীত। তিনি স্বয়ং চিন্তা করেন। ইহা একটা অতি অসাধারণ ঘটনা। তাহা যদিও না হইত তবে জগতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর এত অপ্রাচুর্য হইত না। বিজ্ঞানী স্বয়ং চিন্তা ও বিচার করেন বলিয়া কাহারও মতামতে আপনার মনকে বিকাইয়া দেন না। আমরা যাহা কিছু চিন্তার ভার বাহিরে খবরের কাগজের সম্পাদক এবং গৃহে স্বকীয় গৃহিণীর উপর ছাড়িয়া দিয়া ভাবনা হইতে ছুটি লই—নির্ঝঞ্ঝাট নিশ্চিন্ত জীবন যাপনের জন্য। বিজ্ঞানী তাহা পারেন না, কারণ তাঁহার মতে সম্পাদক মহাশয় ও গৃহিণী মহাশয়া, উভয়েই তোমার আমার মত সাধারণ মানুষ, ভুলভ্রান্তি যাঁহাদের নিত্যই হইতে পারে এবং হয়। আর ঝঞ্ঝাট পোহানো তো বিজ্ঞানীর জীবনের একটা প্রধান কর্ম, যাহার জন্য তিনি সদাই প্রস্তুত।

উচ্চশিক্ষার ধারও ধারেন না এমন বহু অতি-সাধারণ নরনারীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত প্রখর ভাবে আছে এরূপ দেখা গিয়াছে। এই সব লোকের মধ্যে বৈজ্ঞানিকতা একরূপ সহজাত ও মজ্জাগত। আবার বৈজ্ঞানিকতা যাহাদের সহজাত নহে, সুধু বিদ্যাবুদ্ধির প্রাচুর্য, এমন কি বিজ্ঞান-শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান, তাঁহাদের বৈজ্ঞানিকতা দিতে পারে না, যদি না তাঁহারা জীবনে ও আচরণে বিজ্ঞানের পদ্ধতি সম্যক্ প্রয়োগ করেন। এই পদ্ধতি কিরূপ বর্তমান প্রবন্ধে তাহাই বলিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদেরও বিজ্ঞান-বিদ্যার চর্চাই তাঁহাদের প্রধান সহায়।

পরজীবী

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পরের অনুগ্রহে যে জীবন ধারণ করে আমরা সাধারণতঃ তাকে 'পরজীবী' আখ্যা দিয়ে থাকি। কিন্তু পরজীবী বলতে যদি কেবল পরমুখাপেক্ষী বা পরানুগ্রাহী বোঝায় তাহলে আমরা সকলেই যে অল্প-বিস্তর পরজীবী সে কথা কোনো মতেই অস্বীকার করা চলে না। অথচ নিজেদের সম্বন্ধে 'পরজীবী' কথাটি প্রয়োগ করতে কেমন যেন একটু দ্বিধা জাগে। বরং 'পরভৃতিক' কথাটি সহ্য করা যায়, কিন্তু 'পরজীবী' নৈব নৈবচ।

পরভৃতিকের সঙ্গে পরজীবীর প্রভেদ আসলে এইখানেই। প্রকৃত পরজীবী যে সে পরের অনুগ্রহের অপেক্ষা রাখে না—আশ্রয়দাতার কাছ থেকে দস্যুর মত নিগ্রহপূর্বক সে নিজের পরিপুষ্টি আদায় করে নেয়। লোকে তাই পরজীবীকে ভয় করে, ঘৃণা করে, দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। বিজ্ঞানী কিন্তু তাকে নিয়েই সাগ্রহে অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। কারণ পরজীবীর প্রকার, প্রভাব ও পরিণাম সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত না হলে সুষ্ঠুভাবে তাকে নিয়ন্ত্রিত করা যাবে কেমন করে?

পরজীবীর ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'প্যারাসাইট'। পূর্বেই বলেছি, অবজ্ঞাবশতঃ অনেকেই পরজীবীর বিচিত্র জীবন, দেহ-সংগঠন, সংক্রমণশীলতা প্রভৃতি সম্বন্ধে উদাসীন—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবে প্রয়োজনের তাগিদ না থাকায় প্যারাসাইট বা পরজীবীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় ঘনীভূত হতে পারেনি। কাব্যপিপাসু মন কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে কাব্য রচনা করে। অধ্যাপক এ. সি. চ্যাণ্ডলার তাই কাব্যিক ভঙ্গীতে আমাদের মনকে আকর্ষণ করেছেন প্রকৃতির বাস্তব দিকটার প্রতি ফিরে তাকাতে। প্রকৃতির আপাত-শান্ত মনোহারিত্বের মধ্যেও প্রতিটি জলাশয়ে, প্রতিটি প্রান্তরে, প্রতিটি বনানীতে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সর্বত্রই চলেছে হত্যা, লুণ্ঠন, অনশন ও ক্লেশবরণ—চলেছে অভিনব আতিথ্য গ্রহণ ও নাটকীয় প্রতিদান।

সংজ্ঞা—'পরজীবী' ও 'পরজীবিতার' সংজ্ঞা নানাজনে নানাভাবে নির্দেশ করেছেন। হেগ্‌নার বলেছেন, যে উদ্ভিদ্ অথবা যে প্রাণী অপর কোন জীবের উপরিভাগে বা দেহাভ্যন্তরে অবস্থান পূর্বক আশ্রয়দাতার জীবিকার বিনিময়ে জীবন ধারণ করে সেই উদ্ভিদ্ অথবা প্রাণীকে 'পরজীবী' আখ্যা প্রদান করা যেতে পারে। আবার চ্যাণ্ডলারের মতে 'পরজীবিতা' (parasitism) হল এমন এক বিচিত্র জীবন-ধারা যেখানে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জীব কোন বৃহত্তর জীবের মধ্যে অথবা উপরিভাগে অধিষ্ঠিত হয়ে সেই বৃহত্তর জীবের জীবন ও পরিপুষ্টির বিনিময়ে স্বীয় পরিপুষ্টি সংগ্রহ করে নেয়। আমাদের মতে পরজীবিকার শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞাটি নিরূপণ করেছেন অধ্যাপক আর. এস. লাল। রিচার্ড লাল বলেছেন, পরজীবিতা হল উদ্ভিদ্ অথবা প্রাণিগণের এমন এক ইতর সম্মেলন যেখানে পরজীবী যৎসামান্য আয়াসেই নিজের খাদ্য ও নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে যায় কিন্তু সেই ইতর সম্মেলনের পরিণাম আশ্রয়দাতা জীবের পক্ষে সাধারণতঃ ক্ষতিকর ও সময়ে সময়ে সাংঘাতিক প্রতিপন্ন হয়ে থাকে।

পরজীবীর অভ্যুদয়—কতকগুলি পরজীবী বর্তমানে এমনতর বৈশিষ্ট্য লাভ করছে যে স্তরে স্তরে তাদের ক্রমবিকাশ নির্ণয় করতে যাওয়া

দুরূহ ঠেকবে। তবে মোটামুটিভাবে সংক্ষেপে আমরা এইটুকু বলতে পারি—

১। পরজীবিক বৃত্তিকে একপ্রকার সাম্প্রতিক অর্জিত অভ্যাস বলা যায়। আজ যারা পরজীবী হয়ে অন্যের জীবিকাপেক্ষী হয়ে রয়েছে পূর্বে তারা সকলেই আত্মনেপদী ছিল। কারণ সহজ স্বচ্ছন্দচারী জীব ব্যতীত পরজীবিক জীবনে অভ্যস্থ হওয়ার অবকাশ ও সুযোগ কোথায়?

২। পরজীবিতা বলতে এখন যে ইতর সম্মেলন বোঝায় সূচনায় সে সম্মেলন ঠিক এমনতর ছিল না—দুটি জীব কেবল একত্রে কেউ কারো অনিষ্ট বা ক্ষতিসাধন না করে বাস করত। ক্রমে একটি জীব সম্ভবতঃ তার দেহ-সংগঠনে এমন কোন বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল, যার ফলে মধ্যে মধ্যে সে অপর জীবটির খাদ্যে ভাগ বসিয়ে অথবা তাকে শোষণ করে পরিপুষ্ট হতে লাগল। এইভাবে কালক্রমে সেই সাময়িক শোষণকারী জীবটি পূর্ণ পরজীবীতে পরিণত হল।

৩। স্বচ্ছন্দচারী (free living) জীবন থেকে প্রথমে বহিঃ-পরজীবী (ectoparasites) এবং পরে অন্তঃ-পরজীবীর (endoparasites) আবির্ভাব ঘটেছে।

১নং চিত্র
পরজীবী ট্রাইপ্যানোসোম

৪। একই জাতের জীবের মধ্যে কতকগুলি স্বচ্ছন্দচারী এবং কতকগুলি পরজীবী রূপে দেখা যায়। এই ব্যাপার থেকে এই প্রমাণিত হয় যে প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পৃথক্ ভাবে পরজীবিক বৃত্তির বিকাশ ঘটেছে।

৫। জীবনের মানদণ্ডে পরজীবিতার আশ্রয়দাতা জীবাপেক্ষা সাধারণতঃ নিম্নতর পর্যায়ে অবস্থান করে—অর্থাৎ সে হল প্রাচীনতর। কোন কোন জাতের প্রোটোজোয়া কুকুরের বা মানুষের পরজীবীরূপে পরিগণিত হয়, কিন্তু মানুষ দূরের কথা, কোন জাতের কুকুরই সেই প্রোটোজোয়ার পরজীবী হতে পারে না। কয়েকজাতীয় উদ্ভিদ্ অবশ্য প্রোটোজোয়ার পরজীবী প্রতিপন্ন হয়ে থাকে।

৬। কয়েকপ্রকার পরজীবী কেবল একজাতীয় আশ্রয়দাতার মধ্যে নিবদ্ধ থাকে, আবার কতকগুলি জীবান্তরে পরিক্রমণ করে বেড়ায়। এই শেষোক্ত পরজীবিগণ আসলে প্রাচীনতর বলে বোঝা যায়। কারণ একাধিক জীবের মধ্যে যে নিশ্চিন্তে বসবাস করতে পারে, পরিবর্তিত পরিবেশের মধ্যে যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, তার অভিযোজন ক্ষমতা (power of adaptation) বা অভিযোজ্যতা (adaptability) যে একাশ্রয়ী পরজীবীর চেয়ে বেশী সে কথা অনস্বীকার্য। আর এই উচ্চতর অভিযোগ্যতা অর্জন করতে তার সময়ও বড় কম লাগেনি। সুতরাং তার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি।

পরজীবিতার ফলে যদিও পরজীবিগণের দেহসংগঠনে অল্পবিস্তর অপকর্ষ, ক্রমাবনতি ও অবলোপ ঘটতে দেখা যায়, তবু জীবন-সংগ্রামে বেঁচে থাকবার পক্ষে পরজীবিতা চমৎকার অমোঘ উপায়।

পরজীবীর প্রকারভেদ—আচরণভেদে পরজীবিগণের নিম্নলিখিত শ্রেণি-বিভাগ করা যেতে পারে:—

১। সাময়িক পরজীবী—(Temporary, or periodic parasites) যারা জীবনের খানিকটা পরজীবী এবং খানিকটা স্বচ্ছন্দচারী রূপে অতিবাহিত করে। কুকুরে-মাছি শৈশবে মাটীর ফাটলে বাস করে এবং পরিণত বয়সে কুকুরের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ ছাড়া মশা, জোঁক প্রভৃতি বহুপ্রকার সাময়িক পরজীবীর উল্লেখ করা যেতে পারে।

২। চিরস্থায়ী পরজীবী (Permanent parasites)—যারা জীবনের সর্বাবস্থায় আশ্রয়ী জীবের উপর নির্ভর করে থাকে। যথা—কৃমি-কীট।

৩। ইচ্ছাধীন পরজীবী (Facultative parasites)—ইচ্ছাধীন পরজীবী এক আশ্রয় ছেড়ে অপর এক আশ্রয় অবলম্বন করতে পারে।

৪। বাধ্যতামূলক পরজীবী (Obligatory parasites)—বাধ্যতামূলক পরজীবী তার আশ্রয়-দাতা জীবকে কোন ক্রমেই পরিত্যাগ করতে পারে না।

৫। বহিঃ-পরজীবী (External parasites) —যারা আশ্রয়ী জীবের বহিত্বকে বাস করে। যথা—উকুন।

৬। অন্তঃ-পরজীবী (Internal parasites) —যারা আশ্রয়ী জীবের দেহাভ্যন্তরে বাস করে। যথা—কয়েক প্রকার প্রোটোজোয়া, ব্যাক্‌টেরিয়া বা জীবাণু প্রভৃতি।

৭। ভ্রান্ত পরজীবী (Erratic parasites) —যারা ভুলক্রমে যে ইন্দ্রিয়ে অবস্থান করবার কথা সেই ইন্দ্রিয়ে না গিয়ে অন্যত্র ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে।

৮। ঘটনাচক্রে পরজীবী (Incidental parasites)—যারা আকস্মিকভাবে এমন এক জীবদেহে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে যা সাধারণতঃ তাদের আশ্রয়ী জীবরূপে বিবেচিত হয় না।

পরজীবীর উদাহরণ—পরজীবিতার শ্রেষ্ঠ বৈচিত্র্যগুলি প্রাণি-জগতের নিজস্ব সামগ্রী বলা চলে। প্রাণিগণের প্রত্যেক বড় বড় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু না কিছু পরজীবী দেখতে পাওয়া যায়। বর্গ ও শ্রেণী অনুযায়ী আমরা এখানে কয়েকটির নামোল্লেখ করছি।

১। প্রোটোজোয়া :—

(ক) সারকোডিনা—মানুষ ও নিম্নতর প্রাণীতে পরজীবী এ্যামিবা।

(খ) ম্যাষ্টিগোফোরা—মানুষ ও নিম্নতর প্রাণীর অন্ত্রে ও রক্তে বাসকারী পরজীবী, যথা ট্রাইপ্যানো-সোম।

(গ) ইনফিউজোরিয়া—যথা, মানুষে ব্যালান্টি-ডিয়াম্ কোলাই।

(ঘ) স্পোরোজোয়া—যথা, কক্‌সিডিয়া ও ম্যালেরিয়া পরজীবী। এই শ্রেণীর অন্তর্গত সকলেই চিরস্থায়ী অন্তঃ-পরজীবী।

২। প্ল্যাটিহেলমিন্‌থ্‌ বা চ্যাপ্টা কীটবর্গ :—

(ক) টারবিলেরিয়া—এই শ্রেণীর অধিকাংশই স্বচ্ছন্দচারী।

(খ) ট্রিমাটোডা—সাধারণতঃ যকৃৎবাসী পর জীবী ফ্লুক (flukes)

(গ) সেস্‌টোডা—সাধারণতঃ অন্ত্রবাসী পরজীবী ফিতাকৃমি (tape worms)।

৩। নিম্যাটহেলমিন্‌থ্‌ বা গোল কীটবর্গ :—যথা, হুক-কীট (hook worms), ট্রাইচিনা প্রভৃতি।

৪। এ্যানিলিডা বা শূকপদী বর্গ :—কতকগুলি স্বচ্ছন্দচারী (যথা কেঁচো) এবং কতকগুলি পরজীবী (যথা জোঁক)।

৫। আরথ্রোপডা বা যুক্তপদী বর্গ :—

(ক) ক্রাস্‌টেসিয়া—অধিকাংশই মাছের পর-জীবী। যথা, মাছের গিল্‌ (gills) বা কান্‌কো-নিবাসী পরজীবী আরগেসিলাস (Ergasilus)।

(খ) ইন্‌সেক্টা—যথা, কেশকীট উকুন।

(গ) অ্যারাক্‌নিডা—যথা, কুকুরে-মাছি বা এঁটুলি-পোকা।

পরিফেরা বা স্পঞ্জ, সিলেণ্টারেটা, একাইনোডার্মেটা এবং মোলাস্কা বর্গের অন্তর্গত অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে পরজীবিক জীব অপেক্ষাকৃত বিরল।

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে প্রকৃত পরজীবীর অস্তিত্ব নেই বললেই চলে, তবে হ্যাগ-ফিশ্ (Hag-fishes) বা 'ডাইনীমাছে'র হিংস্রতা লক্ষ্য করে' তাদের পরজীবীর পর্যায়ভুক্ত করা চলে।

পরজীবীর প্রভাব—আশ্রয়ী জীবের উপরে পরজীবীর প্রভাব যে কতখানি গভীর ও ব্যাপক তা বোধ হয় কারো অজানা নেই। জাতির জীবনে দেশের উন্নতির পথে তাই পরজীবী-নিয়ন্ত্রণ প্রবলতম সমস্যারূপে দেখা দেয়। সাম্প্রতিক দাঙ্গায় যত লোক হতাহত হয়েছে, প্রতি বছরে একমাত্র বাংলা দেশেই তার চেয়েও বেশী লোক মারা পড়ে ম্যালেরিয়া পরজীবীর প্রকোপে। গত বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনী দূরপ্রাচ্যের রণাঙ্গনে প্রথম দিকটায় যে বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল—যেরূপ ভীষণভাবে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল—তার মূলে ছিল পরজীবীর আক্রমণাত্মক অভিযান। সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি সামরিক বাহিনী ম্যালেরিয়া পরজীবী বা কলেরা-আমাশয় জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়ে, তাহলে লড়াই করবে কে? তাই দুরন্ত পরজীবী

২নং চিত্র

স্বাভাবিক পরিণত স্ত্রী-ইনেকাস
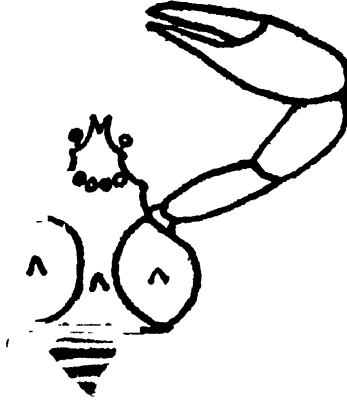
স্বাভাবিক পরিণত পুরুষ-ইনেকাস

স্যাকুলিনা আক্রান্ত পুরুষ-ইনেকাস

স্ত্রী-ইনেকাসের উদর-দেশ
(পরজীবী আক্রমণের পূর্বে)

স্ত্রী-ইনেকাসের উদর-দেশ
(পরজীবী আক্রমণের পরে)

নিয়ন্ত্রণের উপায় উদ্ভাবনের জন্যে সৈন্যবাহিনীতে দক্ষ বিজ্ঞানী ও গবেষকবৃন্দকে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁরই ফলে আজ প্যালুড্রিন, ডিডিটি, প্রভৃতি আমাদের হস্তগত হয়েছে।

শুধ্ মানুষ নয় গবাদি গৃহপালিত পশু ও পরজীবীর আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পায় না। শস্যশালী সমৃদ্ধিশালী দেশকে শ্মশানে পরিণত করতে যুদ্ধের চেয়েও পরজীবীর প্রকোপ সাংঘাতিক। আফ্রিকার সৌভাগ্য-সূর্য আজও রাহু স্বরূপ ট্রাইপ্যানোসোম পরজীবী দ্বারা সমাচ্ছন্ন রয়েছে, সেখানে মানুষ এবং পশু সময়ে সময়ে সেট্‌সি মাছির (tsetse fly) সংস্পর্শে এমন কালঘুমে নিপতিত হয় যে সে ঘুম আর ভাঙে না। অধ্যাপক চ্যাণ্ডলার বলেছেন, বিষুবরেখাবস্থিত আফ্রিকার ভাগ্য আজ নির্ভর করছে বিজ্ঞানের পরজীবী প্রতিরোধকারী শক্তির উপর। সেট্‌সি মাছির আক্রমণ তথা ট্রাইপ্যানোসোম পরজীবীর প্রাদুর্ভাব বিজ্ঞান যদি কোন প্রকারে বন্ধ করতে পারে, তবেই আফ্রিকার উন্নতির [illegible] করা যায়। এইখানে একটু অবান্তর হলেও পাঠকবৃন্দকে একটা সুখবর, একটু আশার বাণী, শুনিয়ে দিই। মাত্র গত ১২ই মার্চ ১৯৪৮, বৃটেনের বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা বিভাগ (Department of Scientific and Industrial Research) থেকে জানানো হয়েছে যে, তাঁদের প্রচেষ্টায় "ফেনান্‌থ্রিডিনিয়াম-১৫৩" (Phenanthridinium-153) নামে যে ঔষধটি উদ্ভাবিত হয়েছে তাতে গবাদি পশুতে সেট্‌সি মাছি সঞ্চালিত দুরন্ত "নাগানা" ব্যাধি (Nagana) শুরু হয়ে যাবে।

এখন আমরা পুনরায় আলোচ্য প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করছি। পরজীবিতার বিষময় প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ডক্টর ইক্‌ল্‌স (Dr. Eccles) বলেছেন, প্রাগৈতিহাসিক প্রাণিগণের অবলোপের মূলে পরজীবীর কারসাজি আছে অনেকখানি।

কিন্তু তাই বলে পরজীবিতা যে সব সময়েই জীববিশেষের ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে সেকথা মনে করলে ভুল হবে। বরং রিচার্ড সোয়ান লালের মতে পরজীবী তার নিজের স্বার্থের খাতিরেই আশ্রয়ী জীবের জীবনান্ত ঘটাতে চায় না; কারণ তাহলে সেইখানে তারও তো অভিযাত্রায় পূর্ণচ্ছেদ পড়বে।

সাধারণতঃ দেখা যায় পরজীবিতার প্রভাবে আশ্রয়ী জীব যথোপযুক্ত পূর্ণতা লাভ করতে পারে না এবং ফলে তার বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনাও বিলুপ্ত হয়ে থাকে। একথা অবশ্য বিশেষভাবে পতঙ্গ শ্রেণীর পক্ষে প্রযোজ্য।

আশ্রয়ী জীবের উপরে আশ্রিত পরজীবীর প্রভাব যে কিরূপ গভীর হতে পারে সে সম্বন্ধে গিয়ার্ড (Giard) ভারী চমৎকার উদাহরণ প্রদর্শন করেছেন। পুরুষ-কাঁকড়া ইনেকাস্ (Inachus) পরজীবিক ক্রাস্‌টেসিয়া স্যাকুলিনার (Sacculina) আক্রমণে স্ত্রী-কাঁকড়ায় রূপান্তরিত হয়। এই প্রকার যৌন পরিবর্তনের মূলে স্যাকুলিনা-আক্রান্ত পুরুষ ইনেকাসের উভলিঙ্গ-প্রবণতা বিশেষভাবে কার্যকরী প্রতিপন্ন হয়। স্ত্রী-ইনেকাস্ এই স্যাকুলিনার আক্রমণে পৌরুষত্ব প্রাপ্ত না হলেও তার প্রজনন-ক্ষমতা অন্তর্হিত হয়।

এছাড়া আশ্রয়ী ইনেকাসের গৌণ যৌন-চিহ্ন-গুলিতেও অল্প-বিস্তর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। আক্রান্ত স্ত্রী-ইনেকাসের দীর্ঘ সন্তরিকাগুলি (swimmerets বা সন্তরণপদগুলি) এবং বিশেষভাবে তাদের অন্তষ্পাদগুলি (endopodites), আকারে ও আয়তনে অনেক ছোট হয়ে যায়। আক্রান্ত পুরুষ-ইনেকাসের দীর্ঘ বলিষ্ঠ সঙ্গমকারী সাঁড়াশী পদটি শুধ্ যে ক্ষুদ্রতা প্রাপ্ত হয় তা নয়—তা একেবারে স্ত্রী-ইনেকাসের সাদৃশ্য পেয়ে থাকে।

দেহের সাধারণ গঠনভঙ্গনে (general metabolism) পরজীবিতার প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন জীবে বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। রাইজোকেফালা আক্রান্ত ব্র্যাকিউরায় পরিণতির প্রাক্কালে যে ক্রমান্বয়ে ত্বক্ মোক্ষণ হতে থাকে তা বন্ধ হয়ে যায়। অথচ

তপস্বী কাঁকড়া ইউপাগুরাসের নির্মোচন (ecdysis) কিছুমাত্র ব্যাহত হয় না, বরং পরজীবীর উপস্থিতিতে দৈহিক বৃদ্ধি আরো দ্রুত সম্পন্ন হয়ে থাকে।

প্রকৃতিতে সমতা বজায় রাখতে পরজীবিতা প্রধানতম অংশ গ্রহণ করে—অতিদ্রুত প্রজননক্ষম প্রাণিগণের সংখ্যা এইভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

অতীত এবং বর্তমানের প্রায় সকল প্রাণীতেই অল্প-বিস্তর পরজীবীর অবস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়—পরজীবীরাও আবার অন্য পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে।

বিশেষ বিশেষ পরজীবী বিশেষ বিশেষ আশ্রয়ী জীবে বিশিষ্ট ধরণের ব্যাধি সংক্রামিত করে থাকে। কালক্রমে কোন আশ্রয়ী জীব কোন বিশেষ রোগ-প্রবণতা থেকে বিমুক্তি (immunity) লাভ করলেও সেই বিশেষ রোগ-সংক্রমণকারী পরজীবী থেকে অব্যাহতি লাভ করে না—উক্ত পরজীবী তার আশ্রয়দাতার মধ্যে রোগ-চিহ্ন প্রকটিত না করেও স্বচ্ছন্দে বসবাস ও বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। এই ধরণের আশ্রয়দাতাকে তখন 'বাহক' বা সংক্রামক জীব বলা হয়। আফ্রিকার নূ (Gnu) বা কৃষ্ণসার, আরণ্য মহিষ প্রভৃতি দুরন্ত ট্রাইপ্যানোসোম-রোগের বাহক স্বরূপ। পরজীবী ট্রাইপ্যানোসোম কোনপ্রকার বহির্লক্ষণ প্রকাশ না করে স্বচ্ছন্দে তাদের রক্তে বাস করে, কিন্তু যেই কোন সেট্‌সি মাছির দ্বারা নীত হয়ে সেই ট্রাইপ্যানোসোম কোন গৃহপালিত সুস্থ প্রাণিদেহে সঞ্চালিত হয়, তখন সেই প্রাণী রোগ-জর্জরিত হয়ে আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে থাকে।

পরজীবীর পরিণাম—স্বচ্ছন্দচারী জীবের তুলনায় পরজীবীর জীবনযাত্রা অনেক সহজ। জীব-জগতে জীবন-সংগ্রাম বড় কঠোর—প্রতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অবিরত সংঘর্ষের সম্ভাবনা। প্রকৃতির স্বচ্ছন্দচারী জীবকে আত্মরক্ষার জন্যে ও খাদ্য সংগ্রহের জন্যে অনেক উপায় অবলম্বন করতে হয় এবং এইরকম জটিল জীবন-যাত্রার ফলে তার দেহসংগঠনেও নানাপ্রকার জটিলতা এসে পড়ে। কিন্তু পরজীবীর সেসব বালাই নেই—চেষ্টা বা কষ্ট করে তাকে কিছুই করতে হয় না। পরজীবীর আশ্রয়টি এমন নিরাপদ যে সহসা সেখানে বহিঃশত্রুর আবির্ভাব ঘটতে পারেনা।

৩নং চিত্র

শূকরের অন্ত্রস্থিত ফিতাকৃমি
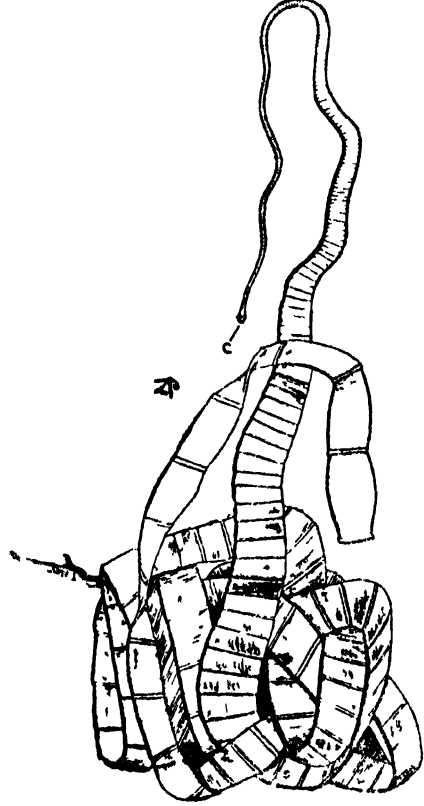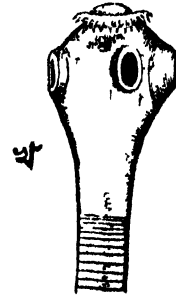
ফিতা কৃমির মুখ (বর্ধিত আকার)

আবার খাদ্য তো মুখের সামনে উপস্থিত। শুধু তাই নয়—তাকে খাদ্যপরিপাকের শ্রমটুকুও স্বীকার করতে হয় না, কারণ সাধারণতঃ পরিপক্ক খাদ্যই সে গ্রহণ করে থাকে।

এই রকম নিক্রিয় জীবন-যাপনের ফলে পরজীবীর দেহ-সংগঠন এত সরল ও সাধারণ হয়ে পড়ে যে সময়ে সময়ে তাকে দেখলে কোনমতেই চেনা যায় না কোন্ জাতের জীব সে। তাই পরজীবীর আত্মজীবনে পরজীবিতার প্রথম ও প্রধান ফল-স্বরূপ আমরা দেখতে পাই তার দৈহিক অপকর্ষ।

পরজীবীর স্থিতিশীলতার উপর তার এই অপকর্ষ বা অবনতির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। সাময়িক পরজীবীতে দৈহিক অপকর্ষ অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু চিরস্থায়ী পরজীবীতে অবনতির গভীরতা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

তবে আবার এমন পরজীবীও আছে যাদের পরজীবিক জীবন-যাত্রার ফলে অবনতি ঘটেছে বলে মনে করলে ভুল হবে। জীবনের মানদণ্ডে তারা বহু প্রাচীন বলেই অজটিল দেহ-সংগঠনের অধিকারী হয়েছে। ক্রাস্টেসিয়া শ্রেণীর অন্তর্গত স্যাকুলিনা যখন পরজীবিক জীবনের ফলে তার স্বাভাবিক শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য হারিয়ে এক টিউমার সদৃশ পিণ্ডবৎ আকৃতি প্রাপ্ত হয়, তখন তার অবনতির কথা স্বীকার করা চলে। কিন্তু তাই বলে পরজীবিক জীবনের ফলে এ্যামিবার অবনতি ঘটেছে একথা বলা যেমন হাস্যকর তেমনি ভ্রান্তিজনক।

অনেক পরজীবী আছে যাদের বিশেষ ঘোরাফেরা করতে হয় না—আশ্রয়ী জীবের উপরেই তাদের সঞ্চালন নির্ভর করে। ফলে তাদের পা, পাখ্না ও অন্যান্য সঞ্চরণকারী দেহেন্দ্রিয়গুলি বিলুপ্ত হয় ও তৎ-পরিবর্তে আশ্রয়দাতার দেহে দৃঢ় অবলম্বনের জন্যে শুঁড়, শোষক-যন্ত্র প্রভৃতি উদ্ভূত হতে দেখা যায়।

সঞ্চরণক্ষমতা অবলুপ্ত হওয়ায় সঞ্চরণে সাহায্য-কারী ইন্দ্রিয়গুলিও (যথা, চোখ, কান, feeler বা অনুভূতিসূচক শুঁয়া প্রভৃতি) প্রয়োজনাভাবে অদৃশ্য হয়ে থাকে। কেবল প্রখর স্পর্শানুভূতিটুকু বিদ্যমান থাকে—তাও প্রোটোপ্লাজমেরই ক্রিয়াবিশেষ বলা চলে।

জটিল দেহেন্দ্রিয় না থাকায় স্নায়ুমণ্ডলী ও সাদাসিধা ধরণের হয়ে থাকে। কারণ স্নায়ুমণ্ডলী দেহেন্দ্রিয়ের কার্যকারিতার অনুপাতেই জটিলত্ব প্রাপ্ত হয়।

আশ্রয়ী জীবেরই পরিপক্ব খাদ্য গ্রহণ করে বলে পরজীবীর পরিপাক-প্রণালীও খুব সরল। তার পরিপাক গ্ল্যাণ্ড নেই এবং কোন কোন ক্ষেত্রে পৃথক্ পরিপাক-নলীর অস্তিত্বও থাকে না। অন্ত্রবাসী ফিতাকৃমিকে সরাসরি তার দেহ-প্রাকার দিয়েই পুষ্টিরস গ্রহণ করতে দেখা যায়।

নিশ্চলভাবে অবস্থিতির দরুণ পরজীবীর দেহ-তন্তুর গঠনভঙ্গনক্রিয়া অতি মন্থরভাবে সম্পাদিত হয়। ফলে উন্নত ধরণের শ্বাস-প্রণালী এবং প্রবহ-যন্ত্রের (circulatory organs) প্রয়োজন হয় না। অধিকাংশ পরজীবীতেই তাই এই দুই প্রণালী খুব সাদাসিধা ধরণের হয়ে থাকে।

পরজীবীর প্রজনন-যন্ত্রগুলির কেবল কোন ক্ষতি সাধিত হয় না, বরং তা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে থাকে। অন্তঃ-পরজীবিগণের জীবনেতিহাস পর্যা-লোচন করলে বোঝা যায়, এক আশ্রয়দাতা থেকে অন্য জীবে পরিক্রমণকালে সমূহ প্রাণহানির আশঙ্কা থাকে। এই ধরণের অপচয় পরিপূরণের জন্যে তাকে দ্রুত তীব্র প্রজননশক্তির অধিকারী হতে হয়েছে। ফলে স্ব-নিষেক (self impregnation) সম্পাদনের জন্যে অধিকাংশ পরজীবী উভলিঙ্গ (hermaphro-dite) হয়ে থাকে।

অনেক পরজীবী তাদের শৈশবাবস্থায় স্বচ্ছন্দচারী মুক্ত জীবরূপে অবস্থান করে। সঞ্চরমান পরজীবী শিশুকে তাই পূর্ণবয়স্ক পরজীবী অপেক্ষা উন্নততর ও জটিলতর দেহসংগঠনের অধিকারী হতে দেখা যায়।

উপসংহার—বিভিন্ন বিচিত্র বিস্ময়কর জীবনে-তিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জ্ঞাত না হলে তাদের প্রকৃত বংশপরিচয় নিরূপণ করা যায় না। এছাড়া প্রত্যেকটি পরজীবীর পৃথক্ পৃথক্ বৈশিষ্ট্যমূলক

জীবনেতিহাসের সম্যক্ জ্ঞান না থাকলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা দুরূহ হয়ে ওঠে।

আমরা কেবল পরজীবীর ক্রমাবনতি ও অপকর্ষের কথাই এতক্ষণ ধরে আলোচনা করেছি; কিন্তু নিরপেক্ষ মন নিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে জানা যায়, আমরা যাকে অবনতি বলছি এক হিসেবে তাকেই আবার চরম উন্নতি বলা যেতে পারে। পরিবেশের সঙ্গে এমন চমৎকার সংহতি স্থাপন, এমন অপূর্ব অভিযোজন একমাত্র পরজীবী ছাড়া কি বিশ্বের আর কোন প্রাণীর পক্ষে সম্ভব হয়েছে? প্রকৃতির বিধানে কেবল কল্যাণকল্পেই পরজীবি-দেহে অদ্ভুত পরিবর্তনগুলি সংঘটিত হয়ে থাকে।

৪নং চিত্র

ক ও খ—স্যাকুলিনার লার্ভা বা শৈশবাবস্থা

কার্সিনাস্ কাঁকড়াস্থিত স্যাকুলিনার পরজীবিক অবস্থা

ভারতে রঞ্জন-শিল্প

শ্রীদুঃখহরণ চক্রবর্তী

অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে রঞ্জন-শিল্প সমধিক প্রসার লাভ করিয়াছিল এবং ঐতিহাসিকগণের মতে কৃত্রিম রঞ্জন দ্রব্যের আবিষ্কারের পূর্বে রঞ্জন শিল্পে ভারতবর্ষই অগ্রণী ছিল। কাঁচা রংকে পাকা করার কৌশল সর্বপ্রথমে আবিষ্কার করিয়াছিলেন ভারতীয়েরা এবং তাঁহাদেরই অনুসন্ধানের ফলে ফট্‌কিরি রাগবন্ধক হিসাবে ব্যবহৃত হইত। পত্রপুষ্পের নির্যাসের দ্বারা নীল, পীত, লোহিত অলক্তক রঙে রঞ্জিত বেশ উৎসবাদির ও ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত ছিল এবং ফট্‌কিরির সাহায্যে অস্থায়ী রংকে স্থায়ী করার প্রণালী আমাদের দেশে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত গ্রন্থে ব্যানক্রফ্‌ট্ এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, 'রঞ্জন শিল্পের ইতিহাসে ফট্‌কিরির আবিষ্কার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং এ বিষয়ে রঞ্জন শিল্প ভারতবর্ষের নিকট সমধিক ঋণী।'

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'দেশী রং' নামক পুস্তকে নিতান্তই খেদের সহিত লিখিয়াছেন, 'রসায়ন বিদ্যা জানা না থাকিলেও রঞ্জকগণ যে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন সে অমূল্য রত্ন আমরা হারাইয়াছি। আমাদের উচ্চতর জাতীয়েরা রঞ্জকদিগকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছেন। সেই অনাচরণীয় কলাবিদ্ রঞ্জকদিগের বংশানুক্রমলব্ধ বিদ্যা আজ মাথা কুটিলেও উচ্চতর জাতিরা ফিরাইয়া আনিতে পারিবেন না। যুগযুগের সাধনা যে শিল্পকে গড়িয়া তুলিয়াছিল আমাদের অল্পদর্শী পূর্বীয়গণ তাহা হেলায় নষ্ট করিয়াছেন। একেত ব্যবহার পদ্ধতি লিখিয়া রাখিলেও তদনুযায়ী ঠিক জিনিষটা জন্মান কঠিন, তারপর আবার রঞ্জকেরা নিজেরা কেহ বোধ হয় লিপিকার ছিলেন না। বংশ পরম্পরায় যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হইয়াছিল এখন ত আর তাহার ব্যবহার বড় নাই। হেলায় যে সম্পদ দেশ হইতে নষ্ট হইয়াছে তাহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা একজনের বা একদিনের কাজ নহে।... উদ্ভিজ্জ রং এদেশ হইতে লুপ্ত হওয়ায় দেশের অতিশয় ক্ষতি হইয়াছে। এই রং-এর সকলগুলি এদেশ হইতে বিলাতে পাঠাইয়া এ্যানিলিনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা না চলিতে পারে, কিন্তু দেশে ঘরে এই রংগুলির সহিত কোনও বিলাতি রং প্রতিযোগিতায় পারিবে না। খয়ের ও নীল এই দুইটি দেশীয় রং এবং তাঁহা দ্বারা রঞ্জন পদ্ধতি আধুনিক শাস্ত্রানুমোদিত।'

প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র ভারতবর্ষের বনে জঙ্গলে অযত্নবর্ধিত অগণিত তরুলতাদির পত্রে, পুষ্পে, বল্কলে, মূলে স্বভাবজাত রঞ্জন পদার্থের প্রাচুর্য ইংরাজ বণিক্‌গণেরও লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৮৭৫ সালে টমাস্ ওয়ারডল ভারত সচিবকে লিখিয়াছিলেন: 'পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে রংএর উপাদান জন্মে। ভারতবর্ষ আমাদের (ইংরাজের) বলিয়া অন্যান্য দেশ অপেক্ষা আমাদের (ইংরাজের) একটা স্বাভাবিক প্রাধান্য আছে।'

প্রকৃতিজাত রঞ্জন পদার্থ অধিকাংশ স্থলেই কার্পাসবস্ত্রের উপর পাকা স্থায়ী রং করিতে পারে না। রঞ্জিত বস্ত্র ক্ষারসংযোগে কিংবা বেশীদিন রৌদ্রের সংস্পর্শে ম্লান ও হীনপ্রভ হইয়া যায়। তবে ফট্‌কিরি, তুঁতে, হীরাকস প্রভৃতির সাহায্যে কোন কোন ক্ষেত্রে স্থায়ী উজ্জ্বল রং করা সম্ভবপর।

প্রকৃতিজাত রঞ্জন পদার্থকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; (১) উদ্ভিজ্জ (২) প্রাণিজ। উদ্ভিজ্জ রঞ্জন পদার্থ আবার কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, যেমন:—

(ক) পুষ্পজাত রঞ্জন দ্রব্য—পুষ্পজাত রঞ্জন দ্রব্যের প্রচলন ভারতবর্ষেই প্রথম। উদাহরণ স্বরূপ এই কয়টি ফুলের বিশেষ উল্লেখ করা যাইতে পারে—পলাশফুল, কুসুমফুল, শেফালিকা ফুল, কুমকুম, মান্দার ফুল, গাঁদা ফুল, ধাইফুল, তুণফুল, পাটোয়া ফুল। পূর্বে ভারতবর্ষ হইতে যে সব প্রাকৃতিক রং ইউরোপে প্রেরিত হইত, তন্মধ্যে নীলের পরই কুসুমফুলের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল। মিশর দেশের প্রাচীন কালের রক্ষিত শবাধারের মধ্যে শবের পরিহিত বস্ত্রাদি প্রায়শঃই কুসুমফুলের দ্বারা রঞ্জিত। কুমকুমের জন্য ভারতবর্ষের বিশেষ খ্যাতি ছিল এবং বহুপরিমাণে কুমকুম বিদেশে রপ্তানি হইত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে বর্তমানে কুমকুম বিদেশে ত রপ্তানি হয়ই না, উপরন্তু ভারতের বাজারে বিক্রীত জাফরান প্রায়শঃই সম্পূর্ণ বিদেশজাত।

(খ) বৃক্ষকাষ্ঠ ও বল্কল—এই পর্যায়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে বকম কাষ্ঠ, কাঁঠাল কাষ্ঠ, রক্তচন্দন, দারুহরিদ্রা, অশোকছাল, গরাণছাল প্রভৃতি।

(গ) মূল—মঞ্জিষ্ঠা দেশ বিদেশে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। মঞ্জিষ্ঠার শিকড়ে এ্যালিজারিন নামক রাসায়নিক পদার্থ আছে এবং ইহাতে পাকা লাল রং করা হইত। হরিদ্রাও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) বৃক্ষপত্র—মেহেদীপাতা প্রসাধনের জন্য বহু দিন হইতেই আদৃত হইয়াছে। রঞ্জন দ্রব্যের জন্য নীলগাছের চাষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই হইত। ভারতবর্ষই নীলের জন্মস্থান এবং ভারতবর্ষ হইতে পারস্য, সিরিয়া, আরব ও মিশরে ইহার ব্যবসায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। অধুনা কৃত্রিম নীলের আবির্ভাবের পর নীল চাষ একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং আমরা এই নীলের জন্যও বিদেশের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া আছি। নীলকুঠীর ধ্বংসাবশেষ পূর্বেকার নীলচাষের স্মৃতি জাগরূক করিয়া দেয়।

(ঙ) খয়ের ও কসায়িন জাতীয় জিনিষও রঞ্জন দ্রব্যের জন্য প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষে কসায়িন উপকরণের অভাব নাই এবং রাগবন্ধকের সাহায্যে প্রধানতঃ লৌহসংযোগে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। এখনও হরিতকী আমরা বিদেশে রপ্তানি করিয়া থাকি।

(চ) ফল—যেমন, লটকান ফল, পেঁয়াজের খোসা, ডালিমের খোসা প্রভৃতি।

(২) প্রাণিজ রংএর মধ্যে কীটজাত লাক্ষা রং বহু প্রচীন। গোরোচনা, অথবা পিউরী নামে প্রচলিত রং 'ভারতীয় লোহিত রং' নামেই আখ্যা পাইয়াছে। পিউরী মুঙ্গেরে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত। গরুকে আমের পাতা খাওয়াইয়া গরুর মূত্র হইতে এই রং পাওয়া যাইত।

প্রকৃতিজাত রঞ্জন পদার্থের জন্য গৌরবান্বিত ভারতবর্ষের রঞ্জন শিল্পে অমূল্য দান স্মরণ করিয়া আমরা স্বতঃই গর্ব অনুভব করি। বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে ও স্থায়িত্বে রসায়নাগারে প্রস্তুত রঞ্জন পদার্থ প্রাকৃতিক রঞ্জন দ্রব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। রসায়নাগারে প্রস্তুত নীল ও মঞ্জিষ্ঠার উপাদান এ্যালিজারিন স্বভাবজাত দ্রব্য অপেক্ষা অল্প দামে বিক্রয় করা সম্ভবপর, সুতরাং কৃত্রিম রঞ্জন দ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহারাও পরাভূত হইয়াছে। আজ আমরা রঞ্জন দ্রব্যের জন্য বিদেশের মুখাপেক্ষী—বিদেশ হইতে রং আসিলেই আমরা আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের রঙীন শাড়ীর ব্যবস্থা করিতে পারি এবং দোল দুর্গোৎসবে নয়নাভিরাম রঙের সৌষ্ঠব করিতে পারি। রঞ্জন শিল্পের এই শোচনীয় অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য আমাদের অবহিত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন এবং রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে সব সর্ববাদিসম্মত উৎকৃষ্ট রঞ্জন-দ্রব্যের প্রচলন হইয়াছে সেইগুলি আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে প্রস্তুত করার ব্যবস্থা অনতিবিলম্বেই করা উচিত।

শুধু তাহাই নহে, রাসায়নিকগণের গবেষণার সাহায্যে নূতন রঞ্জন দ্রব্যের আবিষ্কার করিয়া ভারতের ভবিষ্যৎকে আরও গৌরবোজ্জল করার দায়িত্ব আমাদেরই উপর। এই প্রসঙ্গে একটি কথার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারি না—বাডিশে আনিলিন উণ্ড সোডা ফাব্রিক কোম্পানী কৃত্রিম নীল রসায়নাগারে প্রস্তুত করিবার গবেষণার জন্যই ৯ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ১ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

কৃত্রিম রঞ্জন পদার্থ প্রস্তুত করার একমাত্র মূলীভূত দ্রব্য আলকাতরা। এই আলকাতরা পাওয়া যায় কয়লা হইতে, বাতাসের সংস্পর্শে না রাখিয়া কয়লাকে তপ্ত করিলেই, কয়লার গ্যাসের সঙ্গে আলকাতরার সৃষ্টি হয়। এই পাতন প্রণালীকে আমাদের ঋষিগণ 'অন্তর্ধূমপাতন' বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন। কয়লার গ্যাস আমরা নানা কাজের জন্য ব্যবহার করিতে পারি, রন্ধনের জন্য, আলো জ্বালাইবার জন্য এবং তাহাতে সুবিধা এই যে আমরা নির্ধূম অগ্নিশিখা পাইতে পারি। আল্‌কাতরা সংগ্রহ করিয়া পৃথক্‌ভাবে গরম করিলে আমরা নানা জাতীয় তরল রাসায়নিক পদার্থ পাইতে পারি, এবং সেই তরল পদার্থকে পৃথক্‌ভাবে পাতিত করিলে আমরা বেন্‌জিন, ন্যাপথালিন নামক পদার্থ পাই এবং এইগুলি রাসায়নিকের হাতে অমূল্য সামগ্রী। এই বেন্‌জিন, ন্যাপথালিন হইতেই নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম রঞ্জক দ্রব্যের উপাদান প্রস্তুত হয়। কাজেই সর্বপ্রথমে প্রয়োজন কয়লাকে অপচয় না করিয়া আলকাতরা প্রস্তুত করা এবং আলকাতরাকে আবর্জনার মত উপেক্ষা না করিয়া তাহা হইতে বেন্‌জিন, ন্যাপথালিন প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা। সাধারণতঃ ১ টন কয়লা হইতে ১০ হইতে ২০ গ্যালন আলকাতরা পাওয়া যায়। ১০০ ভাগ আলকাতরা হইতে পাওয়া যায়—

বেন্‌জিন, টলুইন, জাইলিন প্রভৃতি	১'৪০ ভাগ
কার্বলিক অম্ল	'২০ ভাগ
ন্যাপথালিন	৪'০০ ভাগ
ক্রিয়োসোট তৈল	২৪'০০ ভাগ
অ্যান্থ্রাসিন	'২০ ভাগ
পিচ্ (এই পিচ্ দিয়াই আমরা রাস্তানির্মান করি)	৫৫'০০ ভাগ
জল	১৫'০০ ভাগ

এইভাবে আলকাতরার পাতনপ্রণালী দ্বারা আমরা যে সব সামগ্রী পাইব তাহা কেবলমাত্র রঞ্জন দ্রব্য প্রস্তুতের জন্যই যে কাজে লাগিবে তাহা নহে—এইগুলি হইতেই আমরা বিভিন্ন রাসায়নিক প্রণালীতে সৃষ্টি করিতে পারিব কৃত্রিম প্রসাধন সামগ্রী, খাদ্য সম্ভার এবং অমূল্য ঔষধাবলী।

চলিত কথায় আমরা কৃত্রিম রঞ্জন দ্রব্যকে এ্যানিলিন-ঘটিত রঞ্জন দ্রব্য বলিয়া থাকি। তাহার কারণ প্রায়শঃই এ্যানিলিন হইতে এইগুলি সৃষ্টি হইয়া থাকে। আলকাতরা হইতে উদ্ভূত বেন্‌জিন হইতে নাইট্রিক ও সালফিউরিক অম্লের সংযোগে নাইট্রো-বেঞ্জিন নামক তরল রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় এবং নাইট্রোবেন্‌জিন লোহা এবং হাইড্রোক্লোরিক অম্লের ক্রিয়ায় এ্যানিলিন সৃষ্টি করে। এ্যানিলিন রঞ্জক দ্রব্যের জন্য, ঔষধাবলীর জন্য একান্তই প্রয়োজন। সুতরাং আমাদের রাসায়নিক কারখানায় অপর্যাপ্ত এ্যানিলিন প্রস্তুত করার জন্য সনির্বন্ধ চেষ্টা করার প্রয়োজন।

রাসায়নিক মালমসলার অফুরন্ত সরবরাহ পাইলেই রঞ্জনদ্রব্যের অভাব মোচন করা সম্ভব। অবশ্য এইজন্য রাসায়নিক গবেষণারও একান্ত প্রয়োজন এবং তজ্জন্য সরকারের আনুকূল্য ও সাহচর্য আমরা অবশ্যই পাইব, এই আশা আমরা পোষণ করিতে পারি। রাসায়নিকগণ ও কলকারখানার শিল্পিগণ একযোগে চেষ্টা করিলে রঞ্জনশিল্পের ভবিষ্যৎ সহজেই গৌরবোজ্জল হইতে পারে এবং অদূর ভবিষ্যতে রঞ্জনশিল্পে ভারতবর্ষ তাহার লুপ্ত গৌরব ফিরাইয়া পাইতে পারে। 'দেশী রং' পুস্তিকায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র প্রকৃতিজাত রঞ্জনদ্রব্যকে রসায়নশাস্ত্র সম্মতভাবে ব্যবহার করিবার জন্য যে বিধানাবলীর নির্দেশ দিয়াছেন তাহাও বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য এবং এই লুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার কুটীরশিল্প হিসাবে সম্ভবপর হইলে তাহাও উপেক্ষা করা উচিত নহে।

ভারতের কয়লা সম্পদ ও তাহার সংরক্ষণ

শ্রীনির্মলনাথ চট্টোপাধ্যায়

রত্নপ্রসূ ভারতের বিভিন্ন খনিজ পদার্থের মধ্যে কয়লা একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং বর্তমান যুগে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে পাথুরে কয়লা যে অপরিহার্য বস্তু তাহা সকলের নিকট সুবিদিত। যদিও বর্তমান বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ফলে খনিজ তৈল ও বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে তথাপি কয়লার প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই। ভারতের কয়লা সম্পদের পরিমাণ ও পরমায়ু কত সে বিষয়ে বর্তমান প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করা হইতেছে। এই প্রসঙ্গে সমগ্র পৃথিবীর কয়লা সম্পদের বিষয়ে দু' এক কথা বলা হইলে নিতান্ত অবান্তর হইবে না।

ভূতত্ত্ববিদ্গণ, বহু দিনের পরিশ্রমের ফলে যত দূর জানিতে পারিয়াছেন তাহা হইতে বলা যায় যে পৃথিবীর নানা দেশে ভূগর্ভে ছয় হাজার ফুটের মধ্যে স্থিত বিভিন্ন স্তরে সর্বসমেত প্রায় ৭,৪০,০০০ কোটী টন কয়লা মজুত আছে। তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর 'এনথ্রাসাইট' কয়লা শতকরা ৬·৭৫ ভাগ, 'বিটুমিনাস' শ্রেণীভুক্ত কয়লা ৫২·৭৫ ভাগ ও 'লিগনাইট' প্রভৃতি কয়লা ৪০·৫ ভাগ বর্তমান। পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের কয়লা সম্পদের পরিমাণ হইতে জানা যায় যে আমেরিকায় শতকরা ৬৯·০ ভাগ, এশিয়ায় ১৭·৩ ভাগ, ইউরোপে ১০·৬ ভাগ, ওশিয়ানিয়ায় ২·৩ ভাগ ও আফ্রিকায় মাত্র ০·৮ ভাগ কয়লা মজুত আছে।

বিভিন্ন দেশে মোট কয়লা সম্ভারের শতকরা কত ভাগ বিদ্যমান তাহা নিম্নে দেখান হইল :—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৫১·৮ %
কানাডা	১৬·৮ „
চীন	১৩·৫ „
জার্মানী	৫·৭ „
গ্রেট ব্রিটেন	২·৬ „
সাইবেরিয়া	২·৩ „
অষ্ট্রেলিয়া	২·২ „
রাশিয়া	০·৮ „
আফ্রিকা	০·৮ „
ভারতবর্ষ	প্রায় ১·০ „

ভারতের ভূতত্ত্ব পর্যালোচনা করিলে জানা যে অতীতে প্রধানতঃ দুইবার অর্থাৎ গণ্ডোয়ানা যুগে (২০ কোটী বৎসর পূর্বে) ও টারসিয়ারী যুগে (৬ কোটী বৎসর পূর্বে) তৎকালীন উদ্ভিদরাজির ধ্বংসাবশেষ হইতে বহু পরিমাণে পাথুরে কয়লার সৃষ্টি হইয়াছে। এই দুই যুগ ব্যতীত অপরাপর যুগেও যে একেবারে কয়লার উৎপত্তি হয় নাই, তাহা নহে, তবে উহার পরিমাণ এত অল্প যে, সে সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ এ প্রবন্ধে করা হয় নাই।

১। গণ্ডোয়ানা কয়লা সম্পদ

ভারতের ভূগর্ভে প্রায় ২০০০ ফুটের মধ্যে এক বা ততোধিক গভীর যে সমস্ত কয়লা স্তর বিদ্যমান আছে তাহাদের হিসাব লইলে সর্বসমেত কয়লার পরিমাণ হইবে প্রায় ৬০০০ কোটী টন। তবে বর্তমান খনিবিদ্যার সাহায্যে চার ফুটের কম গভীর কোন কয়লা স্তর হইতে কয়লা উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় না এবং যে কয়লার শতকরা ২৫ ভাগ বা তদূর্ধ্ব ভস্ম বর্তমান সে কয়লাও শিল্প

প্রতিষ্ঠানে বিশেষ কার্যোপযোগী হয় না। এই দুই কারণে দেখা যাইতেছে যে, যদিও ভারতের ভূগর্ভে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সর্বসমেত ৬০০০ কোটী টন কয়লা নিহিত আছে, তথাপি সমস্ত কয়লা উদ্ধার করা বর্তমানে আমাদের সাধ্যাতীত। এই প্রকার আলোচনার ফলে আমরা বলিতে পারি যে ভারতে চার ফুট বা তার বেশী গভীর কয়লা স্তরের সম্পদ হইবে মাত্র ২০০০ কোটী টন। বর্তমান বৈজ্ঞানিক খনন-প্রণালীর সম্যক উন্নতি না হইলে বাকী ৪০০০ কোটী টন কয়লা দেশের কোনও উপকার সাধন করিতে পারিবে না। নিম্নে প্রদত্ত তালিকায় গণ্ডোয়ানা যুগের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মোট (Total Reserve) ও কার্যকরী (Workable Reserve) কয়লা সম্ভারের সবিশেষ বিবরণ দেওয়া হইল।

গণ্ডোয়ানা যুগের কয়লা ক্ষেত্র	মোট সম্পদ কোটী টন	কার্যকরী কয়লা সম্পদ কোটী টন
দার্জিলিং ও পূর্ব হিমালয়ের পাদদেশ সমূহ	১৫	২
গিরিডি, দেওঘর, রাজমহল পাহাড়	৩৫	১৩
দামোদর নদ-তীরবর্তী রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, বোকারো, কারাণপুরা প্রভৃতি	২২০০	১০০০
শোন নদ তীরবর্তী আউরাঙ্গা, উমারিয়া প্রভৃতি	১০০০	২০০
ছত্রিশগড় ও মহানদী তীরবর্তী স্থান	৮০০	১২০
মোপানী, কানহান ও পঞ্চনদ তীরবর্তী স্থান	১৫০	২৫
ওয়ার্ধা ও গোদাবরী তীরবর্তী স্থান	১৮০০	৬৪০
মোট কোটী টন	৬০০০	২০০০

২। টারসিয়ারী কয়লা সম্পদ

টারসিয়ারী যুগের কয়লা ক্ষেত্রের সবিশেষ বিবরণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই; তবে মোটামুটি যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে সর্বসমেত অল্পাধিক ২১০ কোটী টন কয়লা মজুত আছে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন। নিম্ন তালিকায় তাহার সংক্ষিপ্ত হিসাব দেওয়া হইল :—

উত্তরপূর্ব আসাম	১০০ কোটী টন
খাসিয়া, জয়ন্তিয়া ও গারো পাহাড়	১০০ কোটী টন
বিকানীর (রাজপুতানা)	১০ কোটী টন
মোট	২১০ কোটী টন

এস্থলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতের সকল কয়লা ক্ষেত্রে ভূতত্ত্ববিদের বিশেষ অনুসন্ধান প্রণালী সমভাবে পরিচালিত করা সম্ভব হয় নাই, সে কারণে উপরে বর্ণিত কয়লা সম্পদের হিসাব যে ভবিষ্যৎ গবেষণার ফলে কিছু পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত হইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সুখের বিষয় যে ইতিমধ্যেই ভূতত্ত্ববিদগণের অনুসন্ধানের ফলে কয়েক স্থানে (মাদ্রাজ, গারো-পাহাড় ইত্যাদি) আরও কিছু কয়লা স্তরের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়াছে, তবে তাহাদের সঠিক পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই।

এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে গণ্ডোয়ানা যুগের কয়লা বিটুমিনাস শ্রেণীভুক্ত; কিন্তু ভস্মের পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক ও টারসিয়ারী যুগের কয়লা লিগনাইট্ শ্রেণীভুক্ত হইলেও অনেক স্থলে ভস্মের ভাগ অত্যন্ত অল্প পরিমাণ হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে গণ্ডোয়ানা যুগের স্তরে

মোট ২০০০ কোটী টন কার্যকরী কয়লা আছে। তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস কয়লার (অর্থাৎ ভস্মের পরিমাণ শতকরা ১৬ ভাগের কম) পরিমাণ হইবে প্রায় ৫০০ কোটী টন ও বাকী ১৫০০ কোটী টন অপকৃষ্ট বিটুমিনাস কয়লা। নিম্নে বিভিন্ন ক্ষেত্রের কেবল মাত্র উচ্চশ্রেণীর কয়লার পরিমাণ দেখান হইল :—

গিরিডি	...	৪	কোটী টন
রাণীগঞ্জ	...	১৮০	" "
ঝরিয়া	...	১২৫	" "
বোকারো	...	৮০	" "
কারাণপুরা	...	৭৫	" "
হুটার, জোহিল্লা ইত্যাদি		৫	" "
কুরাশিয়া, ঝিলমিলি প্রভৃতি		৩	" "
তালচের ইত্যাদি		২০	" "
কানহান ও পঞ্চনদের তীরবর্তী ক্ষেত্রগুলি		৩	" "
বল্লারপুর, সিঙ্গারেণী প্রভৃতি		৫	" "
মোট		৫০০	কোটী টন

উপরোক্ত উৎকৃষ্ট বিটুমিনাস কয়লার মধ্যে অল্পাধিক ২০০ কোটি টন কোক্ উৎপাদনকারী কয়লা (অর্থাৎ ইহা হইতে ধাতুশিল্পের উপযোগী উৎকৃষ্ট কোক্ প্রস্তুত হইতে পারে) ও অবশিষ্ট ৩০০ কোটী টন কোক্-অনুৎপাদনকারী কয়লা ভূগর্ভে মজুত আছে। কোক্-অনুৎপাদনকারী কয়লা ধাতু নিষ্কাশন কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে না বটে, তবে অপরাপর নানাবিধ কার্যের জন্য বিশেষ উপযোগী। এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে আজ পর্যন্ত লৌহ কারখানার বিশাল চুল্লীতে ব্লাস্ট ফার্নেস্ ধাতু নিষ্কাশন কার্য কোক্ কয়লা ব্যতীত অপর কোন বস্তু দ্বারা সুচারুভাবে সম্পন্ন হয় না বলিয়াই এই শ্রেণীর কয়লার যথেষ্ট চাহিদা রহিয়াছে। অনেক ছোট ছোট চুল্লীতে কাঠকয়লার ব্যবহার অবশ্য আছে কিন্তু অতিকায় ও উন্নত শ্রেণীর বিশাল চুল্লীতে কোক্ কয়লা অপরিহার্য। তবে ভবিষ্যতে কোক্ কয়লার অভাবে অন্য কোনও উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারিবে কি না তাহা এখনও জানা যায় নাই। কোক্-উৎপাদনকারী কয়লা যে সকল মজুত আছে তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল।

১। গণ্ডোয়ানা যুগ রাণীগঞ্জ—২৫ কোটী টন
ঝরিয়া—৯০ " "
গিরিডি—৩ " "
বোকারো—৪৭ " "
কারাণপুরা—৩৫ " "
মোট ২০০ কোটী টন

২। টারসিয়ারী যুগ—উত্তর-পূর্ব আসাম—৬০ কোটী টন। ইহাতে গন্ধকের ভাগ কিছু অধিক মাত্রায় বর্তমান বলিয়া ধাতু নিষ্কাশন কার্যের বিশেষ উপযোগী নহে; তবে গন্ধকের ভাগ কোন উপায়ে বিদূরিত করিতে পারিলে এই কয়লা ভারতের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কোক্-উৎপাদনকারী কয়লা বলিয়া সমাদর লাভ করিবে। সম্প্রতি গবেষণার ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে আসাম কয়লার গন্ধকের ভাগ অনেক পরিমাণে বিদূরিত করিয়া উচ্চ শ্রেণীর কোক্ উৎপন্ন হইতে পারিবে। এই গবেষণার ফল কার্যকরী হইলেই মঙ্গল।

যে খনন পদ্ধতি বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন কয়লা-ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে তাহার দ্বারা ভূগর্ভস্থ স্তর হইতে অর্ধেকের বেশী কয়লা উত্তোলন করা সম্ভবপর নহে। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে যদি কোনরূপ খনি দুর্ঘটনা দ্বারা উদ্ধার কার্যে বাধার সৃষ্টি না হয় তবে ভূগর্ভস্থ কয়লা সম্পদের মাত্র অর্ধেকাংশ আমাদের হস্তগত হইয়া ব্যবহৃত হইতে পারিবে। "বালুকাভরণ" (Sand Stowing) প্রথার আইন যদি বিধিবদ্ধ হইয়া সকল ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অবিলম্বে প্রচলিত হয় তবে তিন-চতুর্থাংশ বা ততোধিক কয়লা খনি হইতে উদ্ধার

করা সম্ভব হইবে এবং তৎসহ খনি-দুর্ঘটনার লাঘব হইয়া খনি শ্রমিকদেরও যথেষ্ট নিরাপত্তার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ যে পরিমাণ উৎকৃষ্ট কয়লা খনি-দুর্ঘটনার ফলে প্রজ্বলিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে এবং বর্তমানে অসঙ্গত উপায়ে ব্যবহৃত হইয়া উচ্চ শ্রেণীর কয়লার যে পরিমাণ অপচয় ঘটিতেছে তাহা ভারতের কয়লা সম্পদের পরমায়ু বা স্থায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আশঙ্কার কারণ হইয়া পড়িয়াছে। এই অপব্যয়ের ফলে ধাতু নিষ্কাশনের উপযোগী কয়লার অভাব ঘটিবে ও তজ্জন্য ভারতে লৌহ ও অন্যান্য ধাতুশিল্পের ভবিষ্যৎ যে খুব উজ্জ্বল নহে তাহাও অনেক বৈজ্ঞানিক বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন। এখনও এ বিষয়ে অবহিত হইলে ও সমুচিত প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিতে পারিলে দেশের কয়লা সম্পদের একটী জটিল সমস্যা সমাধান করা হইবে।

ভারতের কয়লা সম্পদ যাহাতে বহুকাল স্থায়ী হইয়া ভারতবাসীর ও দেশের নানাবিধ শিল্প ও কারখানার প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারে ভারতবাসী মাত্রেরই উহা কাম্য। দেশের কয়লা সম্পদের পরমায়ু বা স্থায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে বসিলে সর্বাগ্রে দুইটী কথা মনে উদিত হয়। যথা—

১। বিজ্ঞানসম্মত উন্নত খনন প্রণালীর আশু প্রবর্তন।

২। বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার যথাযথ সদ্ব্যবহার।

এই দুই প্রণালীর দ্বারাই ভারতের কয়লা-সম্পদের সম্যক সংরক্ষণ ও পূর্ণ পরমায়ু লাভ সম্ভব হইতে পারিবে। খননকার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে ভূগর্ভ হইতে অধিক পরিমাণ কয়লা উত্তোলিত হইতে পারিবে। বর্তমানে অধিকাংশ খনিতে প্রায় অর্ধেকের বেশী কয়লাই ভূগর্ভে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে ও ভবিষ্যতে তাহার পুনরুদ্ধার একেবারেই অসম্ভব। ইহাই বর্তমানে অনেক খনিতে অগ্নিকাণ্ড, বিস্ফোরণ প্রভৃতি দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। ইহার জন্য ভারত সরকারের ১৯২৫ সালের বিধিবদ্ধ কোল গ্রেডিং বোর্ডের (Coal Grading Board) কার্যপ্রণালীকে ও বর্তমান অপরিমার্জিত খনন প্রণালীকে অনেকে দায়ী করিয়াছেন। এই দুই বিষয়ের আশু সংশোধন ও পরিবর্তন না হইলে ভারতের কয়লা খনিগুলিতে এইরূপ দুর্ঘটনা ক্রমশঃ বর্ধিত হইবে এবং ঘন ঘন অগ্নিকাণ্ডের ফলে কয়লা সম্পদ অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। সুখের বিষয় এই যে খনি ও খননকার্যে শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য কিছুকাল পূর্বে ভারত সরকার আংশিকভাবে 'বালুকাভরণ' প্রণালীর আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য কয়লার উপর নির্ধারিত শুল্ক আদায় করিয়া খনির মালিকদিগকে কিছু কিছু সাহায্য করিতেছেন। বর্তমানে কোন কোন খনিতে এই-রূপ বালুকাভরণ প্রথা ক্রমশঃ অধিকতর ভাবে প্রবর্তিত হইতেছে বটে, কিন্তু এই প্রথা আরও ব্যাপক হওয়া বা ইহার প্রচলন সমস্ত খনিতে বাধ্যতামূলক হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে সাফল্য অর্জন করার জন্য শুল্কভাণ্ডার ও সাধারণ কোষাগার হইতে সমস্ত খনি মালিকদিগকে যথা-যোগ্য অর্থ সাহায্য করা সরকারের অবশ্যকর্তব্য। সে কারণে যদি স্টোয়িং বিল কিঞ্চিৎ সংশোধিত করা বা কয়লার উপর শুল্কের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি করা আবশ্যক হয় তাহারও ব্যবস্থা করা সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয় এবং তাহার দ্বারা দেশের উপকারই সাধিত হইবে। ছোট ছোট খনি মালিকদিগকে এজন্য কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে বলিয়া আশঙ্কা; তবে তাহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া এক একটী বড় প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা করিতে পারেন তবে তাহারা সকল বাধা বিপত্তি সহজে অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। বিশিষ্ট শ্রেণীর কয়লার যথাযথ সদ্ব্যবহার বাধ্যতামূলকভাবে প্রবর্তিত হইলে উচ্চশ্রেণীর কয়লা সম্পদ যে অধিকতর কাল স্থায়ী হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

বর্তমানে ভারতে গড়ে প্রায় তিন কোটী টন কয়লা বৎসরে খনি হইতে উত্তোলন করা হয়। এই কয়লার মধ্যে প্রায় দেড় কোটী টন উৎকৃষ্ট কোক্-উৎপাদনকারী ও অবশিষ্ট কোক্-অনুৎপাদন-কারী শ্রেণীভুক্ত কয়লা। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে যত কোক্-উৎপাদক কয়লা ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করা হয় তাহার সমস্তই কি ধাতু নিষ্কাশন কার্যে ব্যবহৃত হয় না? উৎপাদন ও ব্যবহারের হিসাব নিকাশ লইলে জানা যায় যে খনি হইতে উৎপন্ন দেড় কোটী টনের মধ্যে ধাতু নিষ্কাশনের জন্য মাত্র ৩০-৪০ লক্ষ টন কয়লা ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং অবশিষ্টাংশ রেলওয়ে ও অপরাপর শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হয়। এ প্রসঙ্গে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পাবে যে ভারত সরকারের রেলপথ বোর্ড তাহাদের বাষ্পীয় শকটের জন্য কেবলমাত্র কোক্-অনুৎপাদক কয়লা ব্যবহার না করিয়া বহু পরিমাণে উৎকৃষ্ট কোক্-উৎপাদক কয়লাও ব্যবহার করিয়া থাকে এবং বে-সরকারী অপরাপর প্রতিষ্ঠানে ও নানাবিধ কলকার-খানায় এই শ্রেণীর অল্লাধিক এককোটী টন কয়লা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এইরূপ অপব্যবহারের ফলে উচ্চশ্রেণীর কোক্-উৎপাদনকারী কয়লার সম্ভার যে অচিরে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি! এ বিষয়ে মধ্যে মধ্যে অনেক প্রতিবাদ ভারত সরকারে পেশ করা হইয়াছে কিন্তু এ পর্যন্ত বিশেষ সুফল লাভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ১৯৪৬ সালের সরকার কর্তৃক নিয়োজিত "মাহিন্দ্র কমিটি"ও এই সফল প্রশ্নের সমাধানের জন্য অনেক পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন। তাহাদের সুপারিশগুলি শীঘ্রই কার্যে পরিণত হইলে কয়লা সম্পদের সংরক্ষণ ও কয়লাশিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধন সম্ভব হইবে। এ বিষয়ে ভারত সরকার বিশেষ তৎপর ও সক্রিয় হইলেই দেশের ও দশের মঙ্গল। ভারতের বিভিন্ন স্থানের পাহাড়ে যে অফুরন্ত লৌহপ্রস্তর বিদ্যমান তাহার সন্ধান ভূতত্ত্ববিদগণ আবিষ্কার করিয়াছেন কিন্তু উৎকৃষ্ট কোক্ কয়লার অভাবে ভবিষ্যতে ধাতুনিষ্কাশন কার্য যে বিপন্ন হইবে সে বিষয়েও বৈজ্ঞানিকগণ ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং সাধারণের তথা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার এবং দেশের কয়লাশিল্প ও অপরাপর প্রতিষ্ঠান যদি অবিলম্বে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার সদ্ব্যবহার বিষয়ে বিশেষ মনো-যোগ দেন তবেই দেশের প্রভূত কল্যাণ হইবে। এজন্য সর্বসাধারণের চেষ্টায় উচ্চশ্রেণীর কয়লার ব্যবহার বিধি সম্বন্ধে যদি কোনরূপ বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা করিতে পারা যায় তবেই মঙ্গল এবং এইরূপ হইলে কয়লার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যাইবে। কয়লার সম্যক উত্তোলন ও যথাযথ ব্যবহারের প্রচলন হইলে বৎসরে গড়ে ৫০ লক্ষ টন কোক-উৎপাদক কয়লা উদ্ধার করিলেই সমস্ত ধাতুনিষ্কাশন কার্য সুচারুরূপে চলিবে ও তাহার ফলে এই শ্রেণীর কয়লার পরমায়ু হইবে অল্পাধিক ২০০ বৎসর; কিন্তু যদি বর্তমান দূষিত ব্যবহারবিধি চলিতে থাকে তবে ইহার পরমায়ু হইবে মাত্র ৫০ বৎসর। বালুকাভরণ প্রথা ব্যাপকভাবে প্রবর্তিত হইলে অবশ্য খনির নিরা-পত্তা ও কয়লাসম্পদের স্থায়িত্ব আরও বর্ধিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। যদি এরূপ আন্দোলনের ফলে কয়লার উত্তোলন প্রণালীর ও যথাযথ ব্যবহার বিধির সম্যক উন্নতি অবিলম্বে পরিলক্ষিত না হয় তবে দশের সরকারকে কয়লা শিল্প জাতীয়করণে প্রণোদিত করিতে হইবে, অথবা সরকারের তত্ত্বাবধানে ব্যাপক বালুকাভরণ প্রথার ও কয়লার সদ্ব্যবহার বিধির আশু প্রবর্তন ও বাধ্যতামূলক করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পরিবে। নতুবা দেশের কয়লা সম্পদ সুচারুভাবে সংরক্ষণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে ভারতের উচ্চশ্রেণীর কয়লা সম্পদ মোট ৫০০ কোটী টন, কিন্তু নিকৃষ্ট কয়লার পরিমাণ যথেষ্ট অর্থাৎ ১৫০০ কোটী টন। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা উচিত যে ভবিষ্যতে যদি গবেষণার ফলে ও সর্বসাধারণের চেষ্টায় নিম্নশ্রেণীর কয়লা বহুবিধ কার্যে

উন্নত প্রণালীতে নিয়োজিত হইতে থাকে এবং নানা প্রকার ব্যবহার বিধি বাধ্যতামূলক হয় তবে উচ্চ শ্রেণীর কয়লার পরমায়ু আরও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে সন্দেহ হয় নাই। এরূপ সাফল্যের অনেক দৃষ্টান্ত অপরাপর দেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কিছু কিছু চলিতেছে, তবে আরও অধিক চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। সুখের বিষয় এই যে অধুনা ভারত সরকারের মনোযোগ এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে ও নূতন গবেষণাগার স্থাপিত হইতেছে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে ও সর্বসাধারণের চেষ্টায় এবং প্রয়োজন হইলে আইন প্রণয়নের দ্বারা কয়লার উন্নত খনন-প্রণালী ও যথাযথ ব্যবহার বিধি প্রবর্তিত হইয়া ভারতের কয়লা সম্ভার নানাবিধ ধাতু ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি করুক ইহাই আমাদের কামনা।

বৈজ্ঞানিক পন্থা

সমগ্র মানবসমাজের জন্য বৈজ্ঞানিক পন্থা কি আশা এবং আশঙ্কা নিয়ে এসেছে? প্রশ্নটি এরূপ ভাবে উত্থাপন করা আমি সঙ্গত মনে করি না। মানুষের হাতের এ অস্ত্রটি যে কি পরিণাম সৃষ্টি করবে, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে যে সব অন্তিম লক্ষ্যের অভিমুখে মানবজাতি আজ সজাগ হয়ে উঠেছে, তাদের স্বভাব এবং স্বরূপের উপর। বৈজ্ঞানিক পন্থা এসব লক্ষ্যে উপস্থিত হ'বার কেবল মাত্র উপায় জোগায়, কিন্তু এসব লক্ষ্যের সৃষ্টি করতে পারে না। সম্পূর্ণ লক্ষ্যহীন বৈজ্ঞানিক পন্থার একান্ত অনুসরণে আজ মানুষের অবস্থা হয়ে উঠত নিরুদ্দেশ যাত্রীর মত; এমন কি এসব পন্থার সৃষ্টিও সম্ভবপর হ'ত না, যদি সত্যকে মোহনির্মুক্ত ভাবে উপলব্ধি করবার প্রবল প্রেরণা মানুষ সকল সময়ে অনুভব করতে না পারত। পন্থাকে নিখুঁত ও পরিপূর্ণ করে তোলা, এবং লক্ষ্য বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ও অনিশ্চিত হওয়া, আমি মনে করি এ হচ্ছে বর্তমান যুগের একটি বিশেষ দুর্লক্ষণ। মানুষের প্রতিভার স্বাধীন বিকাশ, তার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও নিরাপত্তা যদি আমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয় হয়, তবে ঐ মহৎ লক্ষ্যে উপস্থিত হওয়ার পথের অভাব আমাদের হবে না। যদি সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে মুষ্টিমেয় লোকও এ লক্ষ্যের জন্য সচেষ্ট হয়, পরিণামে তাদেরই জয় অবশ্যম্ভাবী।

—আলবার্ট আইনষ্টাইন

শিল্পী ও বিজ্ঞানী

শ্রীঅমূল্যধন দেব

আমাদের ভারতবর্ষে শিল্প বলিতে আগে কুটীর শিল্পই বুঝাইত। ঢাকার মসলীন বা কাশ্মীরী শাল বা মোরাদাবাদের বাসন বা মহীশূরের কাঠের কাজ আমাদের গৌরবের ছিল। প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য বা কৃষ্টি বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা বা আদর্শ হইতে ভিন্ন ছিল। প্রারম্ভে যান্ত্রিক সভ্যতা আমাদের মনীষীদের আদর্শভ্রষ্ট করে নাই, তাঁহাদের চিন্তাধারা উচ্চ দার্শনিক আদর্শের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ঘটনার আবর্তনে আজ আমরা যান্ত্রিক সভ্যতায় বিশ্বাসী। আমরা বুঝিতেছি বা আমাদিগকে বুঝান হইতেছে যে উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পের উন্নতি সাধন না করিতে পারিলে আমাদের ঐহিক কষ্টের লাঘব হইবে না। কাজেই দার্শনিক মনোবৃত্তির পরিবর্তে আমাদের এখন যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্যাগুলি দেখিতে হইবে। যে কোনও পরিবর্তনের সময়েই অন্তর্বর্তীকালে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইতে হয়। আমরাও আজ এই পরিবর্তনের প্রাক্কালে বিপর্যয়ের সম্মুখীন।

আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে যাহাদের চাষবাসের সুবিধা নাই, সাধারণত তাহারাই শিল্প (কুটীর শিল্প বা কারখানার কারিগরী বৃত্তি) জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করে। ইহাদের অধিকাংশই অশিক্ষিত, যদিও তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তার তেমন অভাব নাই। তাহারা শিক্ষার সুযোগ পায় নাই বলিয়াই অশিক্ষিত রহিয়াছে। উৎপাদন বাড়াইতে হইলে, শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে, নব নব উদ্ভাবন-শক্তির বিকাশ হইবার সুযোগ দিতে হইলে, আমাদের দেশের সহস্র সহস্র কারিগর বা শিল্পীদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে। এখানে শিক্ষা বলিতে স্কুল বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী শিক্ষা বুঝাইতেছে না। যিনি যে বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিতে বা সম্যক জ্ঞান উপলব্ধি করিতে যেটুকু বিজ্ঞানের প্রয়োজন তত-টুকু শিক্ষাই বুঝাইতেছে। এখন অনেকেই না বুঝিয়া অন্ধের মত অনুকরণ করেন। যদি প্রাথমিক বিজ্ঞান জানা থাকে, তবে অনুকরণ না করিয়া নিজেই চিন্তা করিয়া (আরও অধিকতর দায়িত্বের সহিত) কাজ করিতে পারিবেন এবং উৎকর্ষ সাধনেও প্রয়াসী হওয়া সম্ভব হইবে।

অন্যান্য স্বাধীন দেশে কারিগরদের এই রকম শিক্ষা দিবার জন্য "নাইট স্কুল" বা নৈশ বিদ্যালয় আছে। তাহাদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য (data) ও ফরমূলা (formulae) সম্বলিত পকেট বই ও প্রকাশিত হয়। এই ভাবেই সেই সব দেশের কারিগরদের শিক্ষার পথ সুগম করা হয়। আমাদের দেশেও ইহা হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞান পরিষদ, বিভিন্ন কারিগরী বিদ্যা বিষয়ক উল্লিখিত পকেট বই বা ম্যানুয়াল বা হ্যাণ্ডবুক রচনা ও প্রকাশ করিলে কারিগরদের উপকার হইবে। এই ভাবে বিজ্ঞানীরা শিল্পীদের মান উন্নীত করিতে সহায়ক হইতে পারিবেন এবং দেশেরও উন্নতি সাধনে সহায়ক হইবেন। শিল্পের প্রসারে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক সার্থকতা। বিজ্ঞানের প্রসারে শিল্পীর উৎকর্ষলাভ।

শিল্পী ও বিজ্ঞানীদের ভবিষ্যৎ সামজিক সমস্যা সম্বন্ধেও এখন হইতেই সজাগ হওয়া উচিত। শিল্পী ও বিজ্ঞানীদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবন সমস্যা-বহুল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে

ইহার সমাধান প্রয়োজন এবং আমি বিশ্বাস করি ইহা অবশ্যম্ভাবী। শতমুদ্রা মাসিক আয় হইলেই আমাদের একটী চাকরের প্রয়োজন হয়। সমাজতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চাকর রাখার প্রথা বিলুপ্ত হইবে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সচ্ছল ও সরল করিবার জন্য তখন অন্য পন্থা অবলম্বন করিতে আমরা বাধ্য হইব। স্বাধীন দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সমাজজীবন বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে তথায় সমবায় নীতির সাহায্যে দৈনন্দিন জীবন বেশ সুগম হইয়াছে। "কুপন" কিনিবার অর্থ থাকিলে ঘরের দরজায় ঠিক সময় মত, নির্দেশ অনুযায়ী দুধ, সজ্জী, মাছ, ডিম, জ্বালানী, পৌছাইয়া দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া বাড়ীতে জলের কল, গ্যাস, বিজলী থাকে। হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। স্কুলে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্য মাথা ঘামাইতে হয় না। বর্তমানে আমাদের অনেকেই হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর বাড়ী ফিরিয়া গৃহস্থালীর নানা অভিযোগে বিব্রত হন। পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হয়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রা যাহাতে শান্তিময় হয়, লোকের দুর্ভাবনা কমে, সমাজ-ব্যবস্থা সেই ভাবে ঢালাই করিতে হইবে। বর্তমানে আমার মধ্যপথে বা পরিবর্তনের মধ্যে আছি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সময় আসিয়াছে। বিজ্ঞানীরা পথ দেখাইলে রাষ্ট্র ও জনসাধারণ এ বিষয়ে অবশ্যই সচেতন হইবে।

ইন্দোনেশিয়ায় প্রাচীন সংস্কৃত লেখপ্রাপ্তি

১৭ই এপ্রিলের একটি সংবাদ প্রকাশ যে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী যোগ্যকর্তার নিকটবর্তী পরমবনম মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনুসন্ধানের ফলে একটি প্রাচীন সংস্কৃত লেখ আবিষ্কৃত হয়েছে। লেখটি ১১০০ বৎসরের প্রাচীন এবং একটি স্বর্ণপত্রের উপর উৎকীর্ণ।

লেখটি আবিষ্কৃত হওয়ার পর ইন্দোনেশিয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের মন্ত্রী ডক্টর আলী শাস্ত্রঅমিজ্জল সেখানকার ভারতীয় কনসাল শ্রীযুক্ত রাঘবনের মারফৎ ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদদের লেখটি পরীক্ষা করবার জন্য ইন্দোনেশিয়ায় গমনের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। লেখটি পরীক্ষা করা ছাড়া পুরাতত্ত্বের দিক্ থেকে ইন্দোনেশিয়ার যে-সব স্থান গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোও তাঁরা পরিদর্শন করবেন। ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপন ছাড়া ইন্দোনেশীয় পুরাতত্ত্ববিদরা ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিদদের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবেন, মন্ত্রী মহাশয় এইরূপ মন্তব্য করেছেন।

নিখিল ভারত প্রদর্শনী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কলিকাতার ইডেন উদ্যানে যে নিখিল ভারত প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছে এরূপ বিরাট প্রদর্শনী ভারতে এই প্রথম। সাজসজ্জার জাঁকজমক, নানাবিধ পণ্যের জলুষ, আমোদ-প্রমোদের অকৃপণ ব্যবস্থা ও আলোঝলমল পরিবেশ প্রদর্শনীটির দুর্নিবার আকর্ষণ। কিন্তু শুধু নয়নের খোরাক ইহার একমাত্র সম্পদ নহে, মনের খোরাকের বিচিত্র উপকরণ-সমাবেশই ইহার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ও বিভব। বস্তুতঃ প্রদর্শনীটিকে ভারতীয় শিল্প, কলা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি-সমৃদ্ধির নিদর্শন বলা যাইতে পারে।

ভারতের নানা প্রদেশ ও নৃপতিপ্রধান রাষ্ট্রসমূহ হইতে নানাবিধ দ্রব্য ও শিল্পের নমুনা প্রদর্শনীতে আহৃত হইয়া ভারতীয় প্রগতির সম্ভাবনাকে ভারতবাসীর নিকট স্পষ্টতর ও স্ফুটতর করিয়া তুলিয়াছে। ইহা যেন স্বাধীন ভারতের ঐশ্বর্যের একটি জ্ঞানকেন্দ্র। এখানে প্রদর্শিত হইয়াছে ভারতের ইতিহাস ও রাষ্ট্রসংরক্ষণের উপকরণ, খনিজ ও বনজ সম্পদের নিদর্শন, কারুশিল্পের অভিজ্ঞান এবং কৃষির উন্নতিমূলক ব্যবস্থা ও গৃহপালিত পশুপক্ষীর প্রজনন-পালন-প্রথার বিস্তারিত বিবরণ। এক কথায় এখানে আছে অল্প পরিসরের মধ্যে বহুমুখী জ্ঞান-আহরণের সুব্যবস্থা।

বিক্রেয় দ্রব্যের দোকানপাট (স্টল) ছাড়া প্রদর্শনীটিকে মোটামুটিভাবে নিম্নোক্ত অংশে বিভক্ত করা যায়:—

জাতীয় জীবন-পরিপ্রেক্ষণ: জাতির সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতি, জন ও গণের অবস্থা ও স্বাস্থ্য, সমাজ ও জাতীয় দেহের দোষ-ত্রুটি প্রভৃতির নিদর্শন এবং সংশোধনের প্রয়োজন ও উপায় সম্পর্কে জ্ঞান-আহরণের উপকরণ সমাবেশ। বস্তুগতভাবে এই অংশকে সজ্জিত করা সম্ভবপর নহে। তাই মানচিত্র, সংখ্যা-তালিকা, চিত্র ও নক্সা দ্বারা নানা তত্ত্ব ও তথ্য প্রকটিত হইয়াছে। এই সমুদয় তালিকা হইতে ভারতীয় কৃষি-সম্পদ, জলজ ও বনজ সমৃদ্ধি এবং খনিজ ঐশ্বর্যের সন্ধান মিলিতে পারে। আধুনিক পৃথিবীর দ্রুতগতিশীল অন্যান্য জাতির তুলনায় আমাদের সমাজদেহে যে কি বিপুল স্থবিরতা আসিয়াছে তাহাও স্পষ্ট করিয়া দেখানো হইয়াছে। পরাধীনতার নাগপাশে আমাদের যত ক্লৈব্যই ঘটিয়া থাকুক, আজ স্বাধীন ভারতে আর তাহার প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। কিন্তু উপায়ই বা কি? এই উপায়ের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে এই অংশে প্রদর্শিত প্রগতিসূচক নিদর্শনগুলি হইতে। ভারতে নারীর প্রতি অবজ্ঞা জাতিকে পঙ্গু করিয়াছে; অযত্নবর্ধিত শিশু সৃষ্টি করিয়াছে জাতীয় দেহে এক বিরাট ক্ষত। এই পঙ্গুত্বদূরীকরণের ও ক্ষতনিরাময়ের সন্ধান রহিয়াছে এই অংশে। ভারতীয় কৃষি-বাণিজ্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকেও পরিস্ফুট করিয়া তোলা হইয়াছে। ভারতীয় ঐতিহ্যের উপাদান এবং এশিয়াখণ্ডে ভারতের দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক দানের নিদর্শনগুলি এই অংশের বিশেষ আকর্ষণ।

ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাস: প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত জাতীয়-সংগ্রাম মৃতকল্প-ভারতকে ত্যাগ ও আত্মপ্রতিষ্ঠা দ্বারা কিরূপে মহিমান্বিত স্বাধীনতার পথে অগ্রসর করিয়াছে এখানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহার আনুপূর্ব

ইতিহাস। ব্যবসায়বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের স্থান ও প্রাধান্যের ইতিকথা এবং ভবিষ্যৎ ভারতের সমুজ্জ্বল আলেখ্য এই অংশের বৈশিষ্ট্য।

শিশু-মহল : শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি ও শিশু মনের বিকাশসাধনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া এই শাখা সজ্জিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে হাতের কায, মূর্তি, চিত্র, আলোকচিত্র, ফসিলের নমুনা, ডাক টিকিট, পোকা-মাকড়, শিশু সাময়িক-পত্র, মৃত শিশু-সাহিত্যিকের চিত্র, শিশু-মন-স্ফুরণের নানাপ্রকার বিদেশী নক্সা সঞ্চয়ন ও সঙ্কলন, শরীরচালনা ও ব্যায়ামের চিত্রাবলী এই বিভাগে সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ড্রিল, লাঠিখেলা, ম্যাজিক, হাসি, নাচ, গান, নাটক ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদর্শনের ব্যবস্থাও আছে।

নারী বিভাগ : এই শাখায় দেশের সমৃদ্ধিতে নারীর দান বিশেষভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। জাতীয় শিল্প-কলায়, অঙ্কনে, চিত্রে, সূচীকর্মে তাহাদের নানা অবদানের নিদর্শনে নারী-শাখা বিশেষভাবে পরিকল্পিত ও সজ্জিত।

সাংবাদিক শাখা : বিশ্ব-জ্ঞানের ক্ষেত্রে সংবাদ ও সাংবাদিক প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্য এবং প্রচার ও সংস্কৃতি-প্রসারের পক্ষে সাংবাদিকতার নীতিসংক্রান্ত নিদর্শন এই শাখার বৈশিষ্ট্য।

ক্রীড়া-কৌতুক বা রঙ্গ বিভাগ : এই অংশে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যগঠনে নানাপ্রকার ক্রীড়া-কৌতুক, শরীর-চালনা, মুষ্টিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতির উপযোগিতা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্বাস্থ্য বিভাগ : ভারতীয় গণস্বাস্থ্যের রূপ, দৈহিক মানসিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যবিকাশের উপকরণ, আহার-বিহার-প্রণালী এবং খাদ্যের গুণাগুণ সম্পর্কিত নানা নিদর্শনসম্ভারে এই বিভাগ সমৃদ্ধ। বৈজ্ঞানিকমতে রোগ-নিরাময় অপেক্ষা রোগ-প্রতিষেধ গণস্বাস্থ্যের অধিকতর পরিপোষক। সুতরাং খাদ্যাখাদ্য নিরূপণ ও দেহ মনের পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে প্রত্যেকের অবহিত থাকা প্রয়োজন। জাতির স্বাস্থ্যসম্পদ রক্ষার দায়িত্ব প্রত্যেক নাগরিকের। খাদ্য-নির্বাচন, পারস্পরিক পরিচ্ছন্নতা-রক্ষা এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি সম্পর্কে নানা শিক্ষণীয় বিষয় এই বিভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

স্থাপত্য (গৃহনির্মাণ, নগর-স্থাপন) ও বিদ্যুৎসরবরাহ বিভাগ : আমাদের দেশে নগর-নির্মাণ কচিৎ স্বাস্থ্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা অনুসারে হইয়া থাকে। কলকারখানাগুলির ঘর-বাড়ি-ইমারতও মালিকের সুবিধা ও খেয়ালমত নির্মিত—অধিবাসিগণের স্বাস্থ্যের দিকে মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হয় না। গ্রামাঞ্চলের গৃহাদিও কোন সুনিয়ন্ত্রিত বা সুপরিকল্পিত প্রণালীর ধার ধারে না। এই বিভাগে আদর্শ সংস্থাপনা দ্বারা উপরোক্ত বিষয়-গুলির প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। বর্তমান যুগের অগ্রগতির দিনে শহর ও পল্লীর সুসংস্থাপন এবং আদর্শ গৃহনির্মাণ জনসমাজের সর্বতোমুখী উন্নতির নিমিত্ত একান্ত প্রয়োজন। সকল ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হইয়াও অন্ধ-কারায় বন্দীর জীবন যাপন স্বাধীন ভারত আর কেন করিবে? তাহার জাগরণ আজ অনুরণিত হইবে পল্লীপ্রান্ত হইতে নগরের প্রত্যন্ত প্রদেশে। গঠন করিবে সে নূতন গ্রাম, নূতন শহর, নূতন স্বাস্থ্যকর আবাস। তাহারই সুসংবদ্ধ পরিকল্পনার আদর্শ (মডেল) দর্শকগণ এই বিভাগে দেখিতে পাইবেন।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে বিদ্যুৎ মানব-জীবনের অপরিহার্য উপকরণ। বিদ্যুৎ-সরবরাহের পরিকল্পনা তাই এই বিভাগকে অধিকতর বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। তদুপরি বহু-আলোচিত দামোদর পরিকল্পনার নক্সা ও নমুনা (অনুকৃতি) দর্শকদের মনে অপূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টি করে। দামোদর পরিকল্পনার অন্তরালে পূর্বদেশের বিজ সম্পদ ও

সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে, একথা আমরা গত কয়েক বৎসর যাবৎ শুনিয়া আসিতেছি। প্রদর্শনীতে এই পরিকল্পনার অনুকৃতি (মডেল) সন্নিবেশিত করিয়া সে সম্ভাবনার মূল্যনির্দেশ ও তাহার কার্যকরী দিকটির প্রতি আমাদের আগ্রহ জাগ্রত করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা সার্থক হইলে দামোদরের বন্যা নিয়ন্ত্রিত হইবে; বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী ও হাওড়ার বহু বর্গমাইল জমিতে চাষের জল সরবরাহ করা চলিবে—তাহাতে ধান জন্মিবে ১,০৮,০০,০০০ মণ, রবিশস্য উৎপন্ন হইবে প্রায় ৫ কোটি টাকা মূল্যের। আর এই বাঁধ হইবে বিপুল বিদ্যুৎ-শক্তির উৎস।

দেশ-রক্ষা বিভাগ : দেশ-রক্ষার উপযোগী আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত অস্ত্র-শস্ত্র, যান বাহন ইত্যাদি নানাপ্রকার সামগ্রী এই বিভাগে প্রদর্শিত হইয়াছে। দর্শকগণের নিকট এ সকলের প্রয়োজনীতা ও ব্যবহারবিধি ব্যাখ্যা করিবার ব্যবস্থাও আছে। ভারতীয় নৌ-বাহিনী, স্থল-বাহিনী ও বিমান-বাহিনীর অস্ত্রাদি ও আনুষঙ্গিক সামরিক দ্রব্য-সম্ভার, সংবাদ-আদান-প্রদানের যন্ত্রপাতি, চিকিৎসা বিভাগের সাজসরঞ্জাম বস্তুগতরূপে অথবা আদর্শ অনুকৃতি ও নক্‌সার সাহায্যে দেখানো হইয়াছে। দেশ-রক্ষার প্রয়োজনে বিশিষ্ট অস্ত্র-শস্ত্র-নির্মাণের কলা-কৌশলের নিদর্শনও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে দেশ-রক্ষার কার্যে কি আমাদের প্রয়োজন, কি আমাদের আছে আর কি চাই—এ সকল বিষয়ের একটা সুস্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে।

বিজ্ঞান বিভাগ : বিশেষজ্ঞগণের তত্ত্বাবধানে বিজ্ঞানের জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয়গুলির সুচারু সন্নিবেশ। বিষয় অনুসারে বিজ্ঞানের পরিবেশন হইয়াছে বিভিন্ন শাখায়। এই পরিবেশন মনোরম ও উপভোগ্য। বিভাগটিতে আছে—

(ক) অভিব্যক্তিবাদ শাখা : পৃথিবীর জন্ম হইতে অণুৎপাদন কাল পর্যন্ত স্থাবরজঙ্গমের বিবর্তন ও সংস্কৃতির উন্মেষ নক্‌সা (চার্ট) দ্বারা বুঝানো হইয়াছে। পৃথিবীর জন্ম, মৃত্তিকা-স্তরের ক্রম-সন্নিবেশ, ভূতত্বানুযায়ী জীব ও উদ্ভিদের জন্ম, নৃবিজ্ঞানসম্মত-ভাবে মানবের জন্ম ও বিবর্তন, প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রের উদ্ভব এবং শক্তির আদিমতম প্রকাশ অণুৎপাদন প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে এই শাখা সমৃদ্ধ।

(খ) পদার্থবিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞান শাখা :—এই শাখায় আমাদের দেশে পদার্থবিজ্ঞানে অতিপ্রথম যে সকল তথ্যমূলক পরীক্ষা সম্পাদিত হইয়াছিল তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। একান্ত প্রয়োজনীয় নানাবিধ যন্ত্রপাতির নমুনা দেখাইয়া তাহাদের কার্যকলাপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আচার্য জগদীশ-চন্দ্র তাঁর উদ্ভাবিত যে সকল যন্ত্রসাহায্যে যুগান্ত-কারী পরীক্ষাগুলি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাদের কোন কোন যন্ত্র—বিশেষতঃ তাঁর অণু-তরঙ্গ-উৎপাদক অভিনব সূক্ষ্ম যন্ত্রটি এবং রামন-এফেক্ট্-সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলি দেখানো হইয়াছে। সাইক্লোট্রন যন্ত্র, পথবীক্ষণ যন্ত্র (রাডার), ষ্টিম ইঞ্জিন, পেট্রল ইঞ্জিন, বিমানপোত প্রভৃতির অনুকৃতিসমূহও প্রদর্শিত হইয়াছে।

(গ) রসায়ন শাখা :—প্রাচীন ভারতে রসায়ন শাস্ত্রে যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস এবং আধুনিক ভারতীয় রসায়নচর্চার জনক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের অবদানের কথা এই শাখার শ্রেষ্ঠ উপচার। নাগার্জ্জুন, চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন মনীষিগণের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির অনুকৃতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পাদিত নানা রাসায়নিক গবেষণার ফলাফলও এই অংশে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

(ঘ) ভূবিজ্ঞান শাখা :—অনুকৃতি, নক্‌সা ও রঙীন্ চিত্রাদি দ্বারা ভূতাত্ত্বিক তথ্যগুলির ব্যাখ্যা এই অংশের উপকরণ। যুগাবর্তের ফলে ভূস্তরের পরিবর্তন-বিবর্তন এবং জীব-জন্তু-উদ্ভিদের উৎপত্তি ও বিলয় পর্যায়ক্রমে দেখানো হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন খনিজ সম্পদের বিবরণ, অবস্থান ও সন্নিবেশ ইত্যাদির তথ্যও এখানে আহৃত হইয়াছে।

(ঙ) ভূগোলবিজ্ঞান শাখা :—প্রকৃতির খেয়ালে ভূপৃষ্ঠের যে পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন ঘটিয়াছে মানচিত্র, নক্‌সা ও অনুকৃতি প্রভৃতির দ্বারা সুস্পষ্ট-রূপে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঋতু-পরিবর্তন, নদনদীর উৎপত্তি ও বিলোপ এবং তাহার কারণ, পৃথিবীর ধ্বংসলীলা, ভূপৃষ্ঠস্থ জীবজগতের জীবন-সংগ্রাম, যোগ্যতমের প্রতিষ্ঠা, বিজিত-বিজয়ীর পরিচয়, ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ, ভারত-পর্যটন-সংক্রান্ত তথ্যাবলী এই শাখার উপাদান।

(চ) প্রাণিবিদ্যা শাখা :—জীবের আবাস, জীব-জগতের দ্বন্দ্ব ও সখ্য, প্রাণীর আত্মগোপন-চেষ্টা, আত্মরক্ষার প্রেরণা ও প্রয়াস, বৃদ্ধি-বৃত্তের জয়যাত্রা ইত্যাদি বিষয়ের চিত্তাকর্ষক নক্‌সা ও অনুকৃতি দ্বারা এই শাখা অলঙ্কৃত।

(ছ) উদ্ভিদ্‌বিদ্যা শাখা :—পৃথিবীর বুকে উদ্ভিদ রাজ্যে চলে এক ছুটোপাটি, ঝাপটাঝাপটি;—তাহার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে এই শাখায়। উদ্ভিদের জীবনেতিহাস, আদিমতম উদ্ভিদ, কীটভুক্ গুল্ম-লতা, ছত্রাক, ছত্রাকজাত প্রতিষেধক ঔষধাদি, ফুলফলের জন্মনিয়ন্ত্রণ, ফসল ত্বরান্বিত করণের উপায় ইত্যাদি বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানসঞ্চয়ের ব্যবস্থা এই শাখার বিশেষত্ব।

(জ) নৃতত্ত্ব শাখা :—মানবজাতির উৎপত্তি, দৈহিক গঠন, মানসিক বৃত্তি, বংশানুবর্তন, সুপ্রজনন, জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তথ্য, অলঙ্কার ও অঙ্গাবরণসম্পর্কিত নানা উপকরণ সমাবেশে এই শাখা সমৃদ্ধ।

(ঝ) মনোবিজ্ঞান শাখা :—মানবমনের স্ফূর্তি ও বিকৃতি, বিকৃতির কারণ, মন ও দেহের প্রেরণা, শ্রমশক্তি ও অবসাদ প্রভৃতি নানাপ্রকার মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সহিত পরিচয়ের সুযোগ ঘটে এই শাখায়।

বস্তুতঃ জাতির জীবনগঠনে এই ধরণের প্রদর্শনীর উপযোগিতা অপরিসীম। ইহা কেবল জাতির ঐতিহ্য ও সম্পদ ঘোষণা করে না, পরন্তু দেশের যুবশক্তিকে—জাতির ভাবী কর্ণধারগণকে স্বদেশ ও স্বজাতির মঙ্গলকর্মে উদ্বোধিত ও অনুপ্রাণিত করে। লোকশিক্ষার যেমন ইহা প্রকৃষ্ট বাহন, সংগঠন-পরিকল্পনার তেমনি পথনির্দেশক।

ভারতের নদীসম্পদ ও জলবিদ্যুৎ

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়

আধুনিক জগতে একটী জাতির স্বাধীন অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহার বৈজ্ঞানিক উন্নতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর। বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধন এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে কল্যাণ-কার্যে নিয়োজিত করিতে পারিলে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের দিক হইতে বিচার করিলে অখণ্ড ভারতের সহিত পৃথিবীর কোনও দেশের তুলনা হয় না; কিন্তু খণ্ডিত ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ আজ দ্বিধাবিভক্ত। ভারতবর্ষ পাইয়াছে শিল্প, খনি ও বিদ্যুৎ আর পাকিস্থান পাইয়াছে খাদ্য, জল ও কৃষি সম্পদ। অখণ্ড ভারতের মোট সেচব্যবস্থার অর্ধেকের বেশী পাকিস্থানের ভাগে পড়িয়াছে। এইদিক দিয়া ভারতবর্ষ পাকিস্থান অপেক্ষা যে দরিদ্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—কারণ ভারতবর্ষ একটী কৃষিপ্রধান দেশ। এই প্রবন্ধে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের অন্যতম নদীসম্পদ ও তাহার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে পৃথিবীর অন্যান্য বৃহৎ রাষ্ট্রের একটী তুলনামূলক আলোচনা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

১৯৩৮ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে একটী জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি, ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি, গঠিত হইয়াছিল। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির আলোচনা করিয়া জাতির উন্নতির জন্য এমন একটী বৈপ্লবিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাহা দ্বারা সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। ইহার জন্য ভারতের বিশেষজ্ঞদের লইয়া ২৯টী উপসমিতি বা সাবকমিটি গঠন করা হয়। এই উপসমিতিগুলি আলোচনা আরম্ভ করেন ১৯৩৯ সালে এবং ১৯৪০ সালের মধ্যেই তাঁহাদের আলোচনা শেষ করেন। এই সমস্ত উপসমিতিগুলির আলোচনার ধারাবাহিক বিবরণী সম্প্রতি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই ২৯টী উপসমিতির মধ্যে শক্তি ও জ্বালানী উপসমিতি (পাওয়ার অ্যাণ্ড ফুয়েল সাবকমিটি) এবং নদী ও সেচ উপসমিতি (রিভার ট্রেনিং অ্যাণ্ড ইরিগেশন সাবকমিটি) অন্যতম। প্রথমটীর সভাপতি ডক্টর মেঘনাদ সাহা এবং দ্বিতীয়টীর সভাপতি হায়দ্রাবাদের নবাব আলি ইয়ার জঙ্গ।

আজিকার দিনের পৃথিবীর দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুৎ একটী অপরিহার্য উপাদান। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দুই প্রকার; প্রথমটী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বা থার্মাল স্টেশন এবং দ্বিতীয়টী জলবিদ্যুৎ বা হাইড্রোইলেকট্রিক কেন্দ্র। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রের আদিচালক বা টারবাইন চালাইবার জন্য বাষ্প-উৎপাদন কেন্দ্রের বয়লার হাউস প্রয়োজন হয় কিন্তু জলবিদ্যুৎকেন্দ্রে জলকে বাষ্পে পরিণত করার প্রয়োজন হয় না; জলকে সরাসরি তুর্বিণ বা টারবাইন চালাইবার কার্যে নিয়োজিত করা হয়। দুই প্রকার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে ইহাই মূলগত পার্থক্য। এই দুইপ্রকার বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে সুবিধা অসুবিধা দুইই বর্তমান। তবে সবদিক হইতে বিচার করিলে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সুবিধা অনেক। প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার খরচ সামান্য কিছু বেশী হইলেও—একবার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে ইহার পরিচালন খরচ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র অপেক্ষা অনেক কম। দ্বিতীয় সুবিধা—পীক লোড বা সবচেয়ে বেশী শক্তির

চাহিদা যে সময় আসে তখন সেই চাহিদাকে পূরণ করিবার জন্য প্রয়োজন মত একটী অথবা দুইটি বয়লার 'ব্যাঙ্ক' করিয়া রাখার প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ এমনভাবে বয়লারের উত্তাপ সংরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত করা হয়, যাহাতে প্রয়োজন মাত্রই সেই বয়লার হইতে বাষ্প সরবরাহ করা যায়। কিন্তু তবুও দেখা গিয়াছে যে পীক লোড আসার সময় এবং বয়লার হইতে পূর্ণমাত্রায় বাষ্প সরবরাহ করার সময় পর্যন্ত এই মধ্যকালীন সময়টুকুতে বাষ্পচাপের অবনতি ঘটে এবং তাহার ফলে সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্রগুলির সাধারণ কার্যক্রম ব্যাহত হয়। কিন্তু জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে শক্তি সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় না; কেবলমাত্র জলনিয়ন্ত্রণের দ্বারাই অতি সত্বর এই পীক লোড বহন করিবার জন্য শক্তির চাহিদা মিটাইতে পারা যায়। এই সুবিধাটা জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের সুবিধার মধ্যে অন্যতম। তৃতীয় সুবিধা—জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র অপেক্ষা অধিক কাল কার্যক্ষম থাকে।

নদীসম্পদকে বহুভাবে ব্যবহার করা যায়:—যেমন (১) সেচ, (২) জলপথের উন্নতি, (৩) বন্যা নিবারণ, (৪) অল্পখরচে বিদ্যুৎ উৎপাদন, (৫) পানীয় জলের সংরক্ষণ, (৬) গ্রাম্যজীবনের উন্নতি সাধন, (৭) কৃষির উন্নতি, (৮) স্বাস্থ্যের উন্নতি ইত্যাদি। নদীসম্পদ ব্যবহারের এইরূপ পরিকল্পনাকে বলা হয় 'বহুবিধ পরিকল্পনা' বা মাল্টিপারপাস প্রজেক্ট।

এই প্রবন্ধে নদীসম্পদের ব্যবহারের দ্বারা অল্প খরচে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন একমাত্র আলোচ্য বিষয়। জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অনেক উন্নত। ইহার কারণ কিছুই নহে—পরাধীনতার অভিশাপ মাত্র। ভারত একটী মহাদেশ এবং তাহার আয়তনের পরিমাপের সহিত পৃথিবীর সমায়তন অন্যান্য অংশের একটী তুলনামূলক সংখ্যাতত্ত্ব দেখান হইতেছে।

তালিকা ১

	নিহিত কিলোওয়াট শক্তি Potential Kw.	উৎপাদিত শক্তি Developed Kw	শতকরা ভাগ Percentage
ভারতবর্ষ (পাকিস্থান সমেত)	৬২০০	৪৬৮	৭·৬
ইউরোপ (রুশিয়া ছাড়া)	৫৫০০০	২২০০০	৪০
রুশিয়া	১০০০০০	২২০০০	২২

এখন ভারতবর্ষ সমস্ত তাপ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে মোট ১০ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদন করিতেছে, সেক্ষেত্রে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ৪৬০ লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদন করে।

ভারতবর্ষে কয়েকটী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত, আর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় পূর্ব ভারত অগ্রগামী—কারণ পূর্ব ভারতে খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য। নিম্নে সারা ভারতবর্ষের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির প্রকারভেদ, শক্তি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার একটী সংখ্যা-তালিকা দেওয়া হইল।

তালিকা ২

প্রদেশ	পরিকল্পনা (Project)	অবস্থান-কেন্দ্র Power Station	প্রকার-ভেদ Type	প্রতিষ্ঠিত শক্তি Installed Capacity (কিলোওয়াট)	চরম শক্তি Ultimate Capacity (কিলোওয়াট)
বোম্বাই	টাটা পাওয়ার কোং	ভিরা	জল	৮৭৫০০	১০৬০০০
	অন্ধ্র ভালী পাওয়ার সাপ্লাই	ভিপপুরী	ঐ	৫৮০০০	৬৪০০০
	টাটা হাইড্রোইলেক্ট্রিক পাওয়ার	খোপোলী	ঐ	৪৮০০০	৪৮০০০
	জি. আই. পি. রেলওয়ে	কোলা	বাষ্পীয়	৪০১০০	৫০০০০
	আমেদাবাদ ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই কোং	আমেদাবাদ	ঐ	৩৭৫০০	৮০০০০
দিল্লী	দিল্লী সি. ই. আর. এ. লিঃ	দিল্লী	ঐ	১৯০০০	১৯০০০
মধ্যপ্রদেশ	নাগপুর ইলেকট্রিক সাপ্লাই	নাগপুর	ঐ	৫৭০০	১৫০০০
মাদ্রাজ	মাদ্রাজ সরকারী	পাইকারা	জল	৩৯৬৫০	৫০০০০
	ঐ	মেত্তুর	ঐ	৪২০০০	৪২০০০
	ঐ	পাপনাশম্	ঐ	১৭৫০০	১৭৫০০
	ঐ	ময়ার	ঐ	—	২০০০০
	মাদ্রাজ ইলেকঃ সাপ্লাই কর্পোঃ	মাদ্রাজ	বাষ্পীয়	৪১৫০০	৪১৫০০
মহীশূর	মহীশূর সরকারী	শিবসমুদ্র	জল	৪৫০০০	৪৫০০০
		শিমসা	ঐ	১৬০০০	১৬০০০
		জগ ফল্স্	ঐ	৪৮০০০	১২০০০০
ত্রিবাঙ্কুর	ত্রিবাঙ্কুর সরকারী	পল্লীবাসল	জল	২১০০০	৩৬০০০
বাঙলা	ইণ্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং	বার্ণপুর	বাষ্পীয়	২৬০০০	৪৬০০০
	ক্যালকাটা ইলেঃ সাপ্লাই কর্পোঃ	কলিকাতা	ঐ	২৯৫০০০	৪০০০০০
	ডিসেরগড় পাওয়ার সাপ্লাই	ডিসেরগড়	ঐ	১৬০০০	১৬০০০
	গৌরীপুর পাওয়ার সাপ্লাই	গৌরীপুর	ঐ	২৮০০০	২৮০০০
	এসোসিয়েটেড্ লিঃ	শিবপুর	ঐ	৭৫০০	৭৫০০
বিহার	পাটনা ইলেকট্রিক সাপ্লাই	পাটনা	ঐ	৬০০০	১২০০০
	টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং	জামসেদপুর	ঐ	১২৫০০০	১৫৫০০০
যুক্তপ্রদেশ	যুক্তপ্রদেশ সরকারী	গঙ্গা	জল	১৮৯০০	২৩০০০
	ঐ	ক্যানাল	বাষ্পীয়	২৯০০০	২৯০০০
পাঞ্জাব	পাঞ্জাব সরকারী	যোগীন্দর নগর	জল	৪৮০০০	৭২০০০
	লাহোর ইলেকট্রিক সাপ্লাই	লাহোর	বাষ্পীয়	১৭৪৫০	২৫০০০
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	সরকারী	মালাকন্দ	জল	৯৬০০	২০০০০
হায়দ্রাবাদ	সরকারী	হায়দ্রাবাদ	বাষ্পীয়	১৭২৫০	২০০০০
বরোদা	টাটা কেমিক্যাল্স্	ওখাপোর্ট	ডিসেল	১৭৫০	
			বাষ্পীয়	১২০০০০	২০০০০০
সিন্ধু	করাচী ইলেকট্রিক সাপ্লাই	করাচী	ডিসেল	৯৩০০	১০০০০

ভারতবর্ষে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সর্বাগ্রগামী—মহীশূর কাবেরী পরিকল্পনা। আরও একটী এখন প্রস্তুতির পথে। ইহার সাকুল্য শক্তি হইবে ১০০০০০ কিলোওয়াট। বোম্বাই প্রদেশে টাটা কোম্পানী অগ্রগামী হইয়া জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করেন। গত প্রথম মহাযুদ্ধে ইহার ক্ষমতা ছিল ৪৮০০০। এখন টাটার সবকয়টী জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের যুক্ত শক্তি ১৮৩৫০০ কিলোওয়াট।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

আসাম, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে—দামোদর পরিকল্পনা, মহানদী পরিকল্পনা। দামোদর পরিকল্পনাতে জলবিদ্যুৎ ৬৫০০০ কিলোওয়াট ও তাপবিদ্যুৎ ১৫০০০০ কিলোওয়াট উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা হইবে। মহানদী পরিকল্পনার হীরাকুণ্ড বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর ১৯৪৬ সালের ১৫ই মার্চ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে—ইহা সম্পন্ন করিতে পাঁচ বৎসর সময় লাগিবে।

মাদ্রাজ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দ্রাবাদের উৎপাদিত শক্তি ৩০০০০০ কিলোওয়াট। ভবিষ্যৎ ১০ বৎসরে চাহিদা ৫০০০০০ কিলোওয়াট হইবে আশা করা যায়। নূতন পরিকল্পনা, তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা —ইহাতে হায়দ্রাবাদ ও মাদ্রাজের দুই তীরে ২৮০০০ কিলোওয়াট করিয়া পাওয়া যাইবে। গোদাবরী পরিকল্পনার শক্তি হইবে ৭৫০০০ কিলোওয়াট এবং তাহা উড়িষ্যার সীমান্ত হইতে মাদ্রাজের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সরবরাহ করিতে পারিবে। মাদ্রাজের পাপনাশম পরিকল্পনা সবেমাত্র চালানো হইয়াছে।

বোম্বাই ও মহীশূরের কিয়দংশ হইতে সিন্ধুর সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে জগ পরিকল্পনা ১০০০০০ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন হইবে। জলবিদ্যুৎ-অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক মনে করেন বোম্বাই হইতে ১২০ মাইল এবং পুণা হইতে ১০০ মাইল দূরে কয়জনা নদীতে বাঁধ দিলে ২২০০০০ কিলোওয়াট শক্তি পাওয়া যাইবে এবং তাহা টাটার পরিকল্পনাগুলির সহিত যুক্ত করা যাইবে। বোম্বাইতে কালিয়া, পঞ্চ্রী, কানেবা, সপ্তা, তাম্রী, হিরণ্যকেশ প্রভৃতি নদীগুলিতে ১৮০০০০ কিলোওয়াট পাওয়া যাইতে পারে। এই অঞ্চলে ৩০০০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে এবং সাকুল্যে ৬০০০০০ কিলোওয়াট শক্তি তৈয়ারী করিবার মত শক্তি নিহিত আছে বলিয়া বৈজ্ঞানিকদের ধারণা।

উত্তরাঞ্চলে ২৫০০০০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদিত হইতেছে; ভবিষ্যতে ৫০০০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত উৎপাদন করা যাইবে।

মধ্যভারতে ৫০০০০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপাদিত হইতেছে। এই অঞ্চলের লৌহ, বকসাইট প্রভৃতি খনিজ ও তূলা ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ সম্পদের সদ্ব্যবহার করিলে, চাহিদা ১ লক্ষ কিলোওয়াট পর্যন্ত বাড়িয়া যাইবে। যন্ত্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে রাজপুতানার চম্বল নদীকে কোটা রাজ্যের কাছে বাঁধিলে প্রায় ৭৫০০০ কিলোওয়াট শক্তি পাওয়া যাইবে।

দামোদর পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ যথেষ্ট। এই দামোদর পরিকল্পনা যদি কার্যকরী হয় তবে এই উপত্যকা অঞ্চল হইতে তিন লক্ষ টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্য আমরা পাইব বলিয়া আশা করিতেছি এবং এই পরিকল্পনার দ্বারা যে সকল সুযোগ-সুবিধা পাইব তাহা দ্বারা পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের প্রায় অর্ধ কোটী লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নীত হইবে। ভারত গভর্নমেণ্ট এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে ৫৫ কোটী টাকা ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে শুধু যে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য পাওয়া যাইবে তাহা নহে—বিদেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আমদানী কতকাংশে বন্ধ হইবে এবং ভারতবর্ষ বিদেশী মুদ্রার সহিত বিনিময়ের জন্য অর্থ সঞ্চয়ও করিতে পারিবে।

দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন বিলটী ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্টে গৃহীত হইয়াছে। ১লা এপ্রিল

১৯৪৮ হইতে দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন গঠিত হইবার কথা। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী শীঘ্রই তিলাইয়া বাঁধটীর গঠনকার্য স্থরু হইবে। ইহার জন্য বর্তমান বৎসরে ভারত সরকার দুই কোটী টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার জন্য মোট ব্যয় ৩৪ কোটী টাকা ধরা হইয়াছে। এই হিসাব দাখিল করিয়াছেন সেণ্ট্রাল টেকনিক্যাল পাওয়ার বোর্ড। এই পরিকল্পনাতে ঠিক হইয়াছে সব কয়টী বাঁধই বরাকর ও দামোদরের সঙ্গম স্থান হইতে উপরের দিকে নির্মিত হইবে। এই সম্বন্ধে গবেষণা স্থরু হইয়াছে ১৯৪৪ সাল হইতে। ইহাতে ৮টী বাঁধ যথাক্রমে—আইজার, কোনার, বোকারো, বারমো, সোনালাপুর, তিলাইয়া, দেওলবাড়ী এবং মাল্‌মো নামক স্থানে নির্মিত হইবে। সব কয়টী বাঁধের মোট পরিমাপ হইবে ৪৭০০ একর-ফুট। এক একর-ফুট অর্থে বুঝায়—এক একর জমিতে, এক ফুট গভীর বরাবর জল থাকিলে যত জল ধরে, অর্থাৎ ৪৩০০০ ঘন ফুট এবং ২৭ লক্ষ গ্যালন। ম্যাথুস্ সাহেবের মতে এই পরিকল্পনাতে সর্বঋতুতে বৎসরে ৮০০০ লক্ষ উইনিট তৈয়ারী হইবে—বিশেষ ঋতুতে ৬৫০০০ কিলোওয়াট এবং সর্ব সময়ে ৬৫০০০ কিলোওয়াট শক্তি উৎপন্ন করিতে সক্ষম হইবে।

কিন্তু আমাদের দেশ নদীবিজ্ঞান চর্চাতে অনেক পশ্চাতে। রুশিয়াতে নদীবিজ্ঞার গবেষণার জন্য স্রোতপরিমাপক কেন্দ্র (বা স্ট্রীম গেজ) আছে ৫২০০টী; আমেরিকায় ১০০০০টী; আর ভারতবর্ষে মাত্র ২০০।৩০০টী; তাহাও আবার বেশীর ভাগ পাকিস্থানের ভাগে পড়িয়াছে।

এখন পৃথিবীতে T. V. A. বা টেনেসী ভ্যালী অথরিটি সমধিক বিখ্যাত। শুধু টেনেসী নদীর উপর সাতটী এবং শাখানদীগুলির উপর নয়টী বাঁধ আছে। সব চেয়ে বড় একক বিদ্যুৎ কেন্দ্র হইল কেণ্টাকী ড্যাম ইলেকট্রিক সাপ্লাই, ইহার বাঁধটী ৮৫০০ ফুট লম্বা, ১৬৫ ফুট উঁচু, তীরদৈর্ঘ্য ২২০০ মাইল—ভরণ-ক্ষমতা (Storage Capacity) ৬১ লক্ষ একর ফুট। শাখানদী গুলিতে সব চেয়ে বড় বাঁধটীর নাম ফন্‌টানা বাঁধ—দৈর্ঘ্য ২৩০০ ফুট, উচ্চতা ৪৬০ ফুট, ভরণ-ক্ষমতা ১৫ লক্ষ একর-ফুট। সমস্ত বাঁধগুলির সাকুল্যে ভরণ-ক্ষমতা ২ কোটী ২০ লক্ষ একর ফুট। পরিকল্পনাটীতে সর্বশুদ্ধ ২৮ লক্ষ ৫০ হাজার কিলোওয়াট শক্তির যন্ত্রাদি বসাইবার পরিকল্পনা আছে, তন্মধ্যে ২০ লক্ষ কিলোওয়াটের যন্ত্রপাতি প্রায় চলিতেছে। বিদ্যুৎ প্রেরণী দৈর্ঘ্য (Transmission Length) ৬০০০ মাইল। এই ৬০০০ মাইলের বিদ্যুৎ-চাপ ১৫৪০০০ ভোল্ট। ইহার মোট ব্যয় ২৫০ কোটী ডলার বা ৭৫০ কোটী টাকা। এই টেনেসী পরিকল্পনার প্রাথমিক সংখ্যাতত্ত্ব সংগ্রহ করিতে ২৫ বৎসর কাল গবেষণা চালানো হয়। এই পরিকল্পনাতে এখন ২৮টী বড় এবং ১৩টী ছোট ছোট প্ল্যাণ্ট কাজ করিতেছে। ইহা ব্যতীত আমেরিকায় কলাম্বিয়া প্রজেক্ট, ক্যালিফর্নিয়া প্রজেক্ট প্রভৃতি জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা কাজ করিতেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ক্যালিফোর্নিয়া পরিকল্পনাতে কলারাডো নদীর উপর বোলডার বাঁধ পৃথিবীর সব চেয়ে বড় বাঁধ—উচ্চতা ৭২৬ ফুট।

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে ইংলণ্ডও যথেষ্ট আগাইয়া গিয়াছে। স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস্-এর কার্যরত শক্তি

৩৬৩৭২০ কিলোওয়াট। দশ বৎসর মেয়াদী পরিকল্পনায় ৮১১০০০ কিলোওয়াট শক্তির যন্ত্রপাতি বসাইবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। গ্রেট ব্রিটেনের প্রায় সমস্ত জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র উত্তর স্কটল্যাণ্ডে অবস্থিত। আপাততঃ স্কটল্যাণ্ডের জন্য ৩৭৪০০০ কিলোওয়াট শক্তির ২১টী যন্ত্র তৈয়ারী হইতেছে। আগামী দশবৎসরে স্কটল্যাণ্ডে ২৭টী বৃহদাকার জলবিদ্যুৎকেন্দ্র পরিচালিত হইবে।

এই জলবিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার দুইপ্রকার পদ্ধতি আছে। একটী পুরাতন সাধারণ পদ্ধতি। তাহাকে বলা হয় কাপ্‌লান প্ল্যাণ্ট (Kaplan Plant) এবং দ্বিতীয়টী জার্মান পদ্ধতি, তাহার নাম Unter-wasserkraftwerk বা আণ্ডার ওয়াটার পাওয়ার প্ল্যাণ্ট, শেষোক্ত পদ্ধতিতে স্থাপত্যে খরচ অনেক কম। ব্যাভেরিয়াতে ইলার (Iller) এবং লুখ (Luch) নামক স্থানে এই শেষোক্ত পদ্ধতির উৎপাদনকেন্দ্র আছে। রুশেরা শেষোক্ত পদ্ধতি বেশী পছন্দ করে। তাহারা ভলগা নদীর শাখা কামা নদীতে ১৯৫০ সালের মধ্যে সমগ্র উরাল প্রদেশে সরবরাহের উপযুক্ত একটী আণ্ডার ওয়াটার পাওয়ার প্ল্যাণ্ট নির্মাণের চেষ্টা করিতেছে।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের একটী শতকরা হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যক্ষ জর্জ কুরিয়ান বলেন—ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা ১ কোটী ২০ লক্ষ কিলোওয়াট, সে স্থলে আমরা মাত্র ৫ লক্ষ কিলোওয়াট উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছি। ইহা শতকরা মাত্র ৬ ভাগ। সে তুলনায় সুইট্‌সারল্যাণ্ড শতকরা ৭২, ইতালী ৪৭, জাপান ৩৭, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ৩৩ এবং কানাডা শতকরা ২৫ ভাগ সম্ভাব্য ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিয়াছে।

সম্প্রতি খবর পাওয়া গেল জগ পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হইয়াছে। আপাততঃ ইহার শক্তি ৪৫০০০ কিলোওয়াট। মহীশূর অধিপতি মহাত্মা গান্ধীর স্মরণার্থে পরিকল্পনাটীর নাম বদল করিয়া নূতন নামকরণ করিয়াছেন মহাত্মা গান্ধী হাইড্রো-ইলেকট্রিক সাপ্লাই। ইহার জন্য ৬ কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে।

রসায়নশিল্পের কতিপয় প্রবর্তক

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে আধুনিক যুগে রসায়নশিল্প সকল শিল্পের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। নব্য মানবের শত সহস্র রকমের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা ছাড়াও, রসায়নশিল্প, কল্পতরু মত, আজকালকার যত কিছু শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য প্রভৃতি যাহা চাহিতেছে তাহাই জোগাইবার ব্যবস্থা করিতেছে। বয়নশিল্প, স্থাপত্যশিল্প, যন্ত্রশিল্প এবং আরও অন্য অনেক শিল্পকেই রসায়নশিল্পের সাহায্য পদে পদে লইতে হয়। ভাবিয়া দেখিলে কিন্তু আশ্চর্য হইতে হয় যে একশত বৎসরের কিছু পূর্বেও রসায়নশিল্পের কোন অস্তিত্ব ছিল না। পুরাকালে কিছু কিছু বস্ত্ররঞ্জনের রং, সফেদা, গৈরিক প্রভৃতি পার্থিক রঞ্জনসামগ্রী, বস্ত্র পরিষ্কারের জন্য ক্ষার এবং অল্পস্বল্প ঔষধাদি প্রস্তুত হইত সত্য, কিন্তু রসায়নশিল্প বলিতে আমরা এখন তাহা বুঝি সেরূপ কিছু ছিল না। ক্রমে সামান্য পরিমাণ গন্ধকাম্ল, নানারূপ ক্ষারীয় পদার্থ এবং তুঁতে, হিরাকস প্রভৃতি ধাতব লবণ উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হয়; কিন্তু সে সময়ে উৎপাদন-বিধি এত সময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর ছিল যে অতি অল্প পরিমাণ দ্রব্যই তৈয়ারী হইতে পারিত এবং উহাতে নিকটবর্তী স্থানেরই চাহিদা মিটান কঠিন হইত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও নাম করিবার মত কোন রসায়নশিল্প আরম্ভ হয় নাই। রসায়ন-বিজ্ঞান কিন্তু তখন, শীলে, লাভোআজিয়ে প্রৃস্টলি, ডল্টন, ডেভি এবং বার্জিলিউসের হাতে দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল। পৃথিবীর বহুস্থানে, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশসমূহে অল্প অল্প করিয়া শ্রমশিল্পের বিকাশ আরম্ভ হইতেছিল। শ্রমশিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন অনুভূত হইতে লাগিল। ইচ্ছা থাকিলেই পন্থা আবিষ্কার হয় এবং যে জিনিষের চাহিদা আছে, তাহা সরবরাহ হইতে বিলম্ব হয় না। এজন্য ধীরে ধীরে, কিন্তু সুনিশ্চিত ভিত্তির উপর, রসায়নশিল্প গড়িয়া উঠিতে লাগিল। আজিকার দিনে বিভিন্নরূপ আর্থিক মন্দার সময়ও রসায়নশিল্পের অবস্থা প্রায় পূর্বের মতই বর্ধিষ্ণু আছে।

রসায়নশিল্পের স্থাপয়িতাদের নাম করিতে গেলে প্রথমেই নিকোলা ল্যব্লাঁর নাম করিতে হয়। অর্লিয়াঁর নিকট ইস্যুদাঁ গ্রামে ল্যব্লাঁ ১৭৫৩ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলের পড়া শেষ করিয়া প্রথমে তিনি একটী ঔষধের দোকানে শিক্ষানবিস হন। সেখানে কিছুদিন ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিয়া তিনি ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করেন এবং অবশেষে অর্লিয়াঁর ডিউকের পারিবারিক ডাক্তার ও অস্ত্রচিকিৎসক নিযুক্ত হন। সেই সময়, বহুযুদ্ধের এবং ফ্রান্স অবরোধের ফলে সেদেশে সোডার অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল, কারণ নানা প্রকার অসুবিধার জন্য বাহির হইতে সোডা আমদানী করা সম্ভব হইতেছিল না। সোডার অভাব দূর করিবার জন্য ১৭৭৫ খৃঃ ফরাসী একাডেমি, সাধারণ লবণ হইতে সব চাইতে সস্তা ও সুবিধাজনক প্রণালীতে সোডা প্রস্তুত করিবার জন্য ২৪০০ লিভ্র্ (প্রায় ১৫০০৲ টাকা) একটী পুরস্কার ঘোষণা করেন। বহু লোক সোডা তৈয়ারী করিবার নানারূপ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। কিন্তু ল্যব্লাঁ প্রস্তাবিত প্রকরণই সর্বাপেক্ষা সহজ ও সস্তা পরিগণিত হইয়াছিল।

ল্যব্লাঁ প্রবর্তিত সোডিয়াম কার্বনেট প্রস্তুত পদ্ধতি অনেকেরই হয়ত জানা আছে। ইহাতে প্রথমে সাধারণ লবণকে সালফিউরিক এসিডের সহিত

গরম করিয়া সোডিয়াম সালফেটে পরিবর্তিত করিতে হয়। গরম করিবার সময় লবণাম্ল (হাইড্রোক্লোরিক এসিড) বাষ্পরূপে নির্গত হয়। পরে সোডিয়াম সালফেটের সহিত খড়ি ও কয়লার গুঁড়া মিশাইয়া খুব চড়া আঁচে বিশেষ চুল্লীর ভিতর পুড়াইবার পর যে কাল ভস্ম পাওয়া যায় তাহা বার বার জলে ধৌত করিয়া সেই জল ফুটাইলে সোডিয়াম কার্বনেট কেলাসিত হয়।

ইতিমধ্যে বাহির হইতে সোডা পুনরায় আসিতে আরম্ভ হওয়ায় ল্যব্লাঁকে যে পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ফরাসী একাডেমি ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহা দিতে অস্বীকার করেন। ১৭৯১ খৃঃ অর্লিয়াঁর ডিউকের নিকট হইতে মূলধনের জন্য কিছু টাকা কর্জ করিয়া স্বাবিষ্কৃত পন্থানুসারে সোডা প্রস্তুত করিবার জন্য ল্যব্লাঁ একটী কারখানা স্থাপন করেন। কিন্তু অল্পদিন পরে ফরাসী বিপ্লবীদের হাতে অর্লিয়াঁর ডিউককে প্রাণ হারাইতে হয় এবং ডিউকের অর্থে আরব্ধ বলিয়া ল্যব্লাঁর কারখানাও "স্বাধীনতা, একতা ও ভ্রাতৃত্বের" বন্ধুদের নিকট হইতে রক্ষা পায় নাই। 'ভ্রাতৃত্বে'র পৃষ্ঠপোষকেরা ঐ কারখানা বাজেয়াপ্ত করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই; ক্ষতিপূরণের জন্য ল্যব্লাঁকে এক পয়সা দেওয়াও তাঁহারা প্রয়োজন মনে করেন নাই। ল্যব্লাঁ গভীর দুঃখ ও দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হইলেন। দশ-বার বৎসর দুঃখকষ্টের সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং ক্ষতিপূরণের ও তাঁহার বহুমূল্য আবিষ্কারের প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়া তিনি ঘোর নিরাশাসাগরে মগ্ন হন। অবশেষে ভিক্ষাপুষ্ট জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া ১৮০৬ খৃঃ ১৬ই জানুয়ারী তিনি আত্মহত্যা করেন। এইরূপ রসায়নশিল্পের প্রথম প্রবর্তকের জীবন অবসান হয়।

যে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে ল্যব্লাঁ তাঁহার সোডার কারখানা হারাইয়াছিলেন, সেই বৎসর ডাব্লিন সহরে একটী বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি পরে রসায়নশিল্পে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম জেমস্ মাসপ্র্যাট। মাসপ্র্যাটের কর্মজীবন একটা বড় ঔষধালয়ের শিক্ষানবিসরূপে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার পর কিছুদিন তিনি সামরিক বিভাগে ও নৌবাহিনীতে কাজ আরম্ভ করেন। এই সব ছাড়িয়া পরে তিনি ডাব্লিন সহরে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন এবং গুটিকতক রাসায়নিক দ্রব্য তৈয়ারী করিবার জন্য একটী ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপন করেন। কিছুদিন পরে অ্যাবট নামে এক ব্যক্তি তাঁহার অংশীদার হন, এবং উভয়ে মিলিয়া পটাসিয়াম সায়ানাইড প্রস্তুত করিতে থাকেন। তাহাতে বেশী লাভ হইতে থাকে, কারণ ঐ সময় খনিজধাতু হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য নিষ্কাশন করিবার জন্য পটাসিয়াম সায়ানাইডের চাহিদা খুব বাড়িয়া গিয়াছিল।

বেশী দিন অতিবাহিত হইবার পূর্বেই কিন্তু মাসপ্র্যাট এই যৌথ কারবার হইতে নিজের সংযোগ ছিন্ন করেন এবং ইংলণ্ডে চলিয়া আসেন। ল্যব্লাঁ প্রণালীতে সোডা প্রস্তুত করিবার একটী কারখানা খুলিবার কথা বহুদিন হইতেই মাসপ্র্যাটের মনের মধ্যে ঘুরিতেছিল কিন্তু ঐরূপ একটী কারখানা খুলিবার উপযুক্ত মূলধন না থাকায় তাঁহার ইচ্ছা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই। সেজন্য বাধ্য হইয়া তিনি ইংলণ্ডে আসিয়াও প্রথম প্রথম পটাসিয়াম সায়ানাইড তৈয়ারীর ব্যবসা করিতে থাকেন। অবশেষে রসায়নশিল্পের আর একজন প্রবর্তক, জোসিয়া ক্রিস্টফার গাম্বল, মাসপ্র্যাটের সহিত যোগ দেন এবং উভয়ে মিলিয়া সেণ্ট হেলেন্সের নিকট একটি সোডার কারখানা খোলেন। ইংলণ্ডে ১৮২৮ খৃঃ এইখানেই প্রথম ল্যব্লাঁ পদ্ধতি অনুযায়ী সোডা প্রস্তুত আরম্ভ হয়। মাসপ্র্যাট-গাম্বল যৌথ কারবার বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই দুই অংশীদার পৃথক হন। গাম্বল সোডার কারখানায় রহিয়া যান; আর মাসপ্র্যাট নূতন রাজ্য জয়ের চেষ্টায় বাহির হন।

[ক্রমশঃ

কথোপকথন

শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

[অনেক ছাত্রের মনে একটা ভুল ধারণা আছে ১÷০=∞ যদিও তারা ∞ প্রতীকটির অর্থ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। এই ধারণা বহু গোলযোগের সৃষ্টি করে। ছাত্রদের মনে এ সম্বন্ধে যাতে সঠিক ধারণা হয় সেই উদ্দেশ্যে নিচে একটি ছাত্র ও একটি শিক্ষকের মধ্যে একটা কাল্পনিক কথোপকথনের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে]

শিক্ষক। কি হে, মুখ দেখে বোধ হচ্ছে একটা মস্ত কিছু আলোচনা করতে এসেছ। কি ব্যাপার ?

ছাত্র। আজ একটা খুব মজার জিনিষ শিখলুম।

শিক্ষক। শুনি, তোমার মজার জিনিষটা।

ছাত্র। এককে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে কত হয় ?

শিক্ষক। (অল্প হাসিয়া) আমি ত জানি এ প্রশ্নের কোনও জবাব নেই—তুমি কী শিখেছ ?

ছাত্র। [একটি কাগজে লিখিয়া শিক্ষককে দেখাইল:—

১÷০=∞]

শিক্ষক। (কপট বিস্ময়ে) ওরে বাবা। ওই কাৎ করা চারটা আবার কী জীব ?

ছাত্র। ওটাকে 'ইনফিনিটি' বলে।

শিক্ষক। সেটা আবার কী হল ?

ছাত্র। সে একটা ম-অ-স্ত বড় সংখ্যা—যার চেয়ে বড় সংখ্যা আর নেই। যার চেয়ে বড় সংখ্যা আমরা—

শিক্ষক। আরে থাম থাম—তুমি অনেক কথা বলে ফেলছ। ম-অ-স্ত বড়—যার চেয়ে বড় হয় না—এগুলো কি সব এক কথা হল ? হ্যাঁ আর কী বলতে যাচ্ছিলে ? যার চেয়ে বড় আমরা—

ছাত্র। যার চেয়ে বড় আমরা ভাবতে পারি না।

শিক্ষক। বেশ; তোমার বক্তব্যগুলো এবার একটা কাগজে স্পষ্ট করে লেখা যাক। [একটি কাগজ লইয়া লিখিলেন :—

∞—মস্ত বড় সংখ্যা

—যার চেয়ে বড় সংখ্যা নেই-

—যার চেয়ে বড় সংখ্যা আমরা ভাবতে পারি না]

এইবার তুমি নিজে বলত এ সমস্ত কথার মানে কি এক ?

ছাত্র। (চিন্তিতমুখে) আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে আমি যেটা শিখেছি সেটা বলি—

শিক্ষক। সেটা আমি পরে শুনব—আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও। ভাগ করা মানে কি ?

ছাত্র। দু'টি সংখ্যার একটিকে অন্যটি দিয়ে ভাগ করা মানে এমন একটি তৃতীয় সংখ্যা বার করা যাকে দ্বিতীয়টি দিয়ে গুণ করলে প্রথম সংখ্যাটি পাওয়া যায়।

শিক্ষক। বাঃ ! ভাগের সংজ্ঞাটা চমৎকার মনে আছে তোমার। প্রথমটিকে বলে ভাজ্য, দ্বিতীয়টিকে ভাজক, তৃতীয়টিকে ভাগফল—সে

কথা যাক। এখন বলত কোন সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে এক হয়—

ছাত্র। কেন 'ইনফিনিটিকে'।

শিক্ষক। অর্থাৎ তোমার নূতন শেখা সংখ্যাটি। তোমার পুরাণ সংখ্যাগুলির মধ্যে কাউকে পাওয়া যাবে?

ছাত্র। না—পুরাণ সংখ্যাগুলির ভিতর এমন সংখ্যা নেই যাকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে এক হয় কাজেই 'ইনফিনিটি' বলে একটা নূতন সংখ্যা সৃষ্টি করা হ'ল, যেমন করে দুই থেকে চার বাদ দেওয়ার জন্য ঋণাত্মক * সংখ্যার সৃষ্টি হয়েছিল।

শিক্ষক। ঠিক কথা, তবে ঋণাত্মক সংখ্যার সৃষ্টি করে আমাদের কোনও অসুবিধায় পড়তে হয় নি; কিন্তু 'ইনফিনিটি' বলে নূতন সংখ্যার সৃষ্টি করলে অসুবিধায় পড়তে হবে। [একটি কাগজে লিখিয়া দেখাইলেন :—

$$০ = -০$$
$$\therefore ১ + ০ = ১ + (-০)$$
$$\therefore \infty = -\infty$$
$$\therefore \infty = ০]$$

কাজেই 'ইনফিনিটি' বলে এই নূতন সংখ্যার আমদানি করে কোনও লাভ নেই, সেইজন্য গণিতজ্ঞেরা ভাগের বেলায় একটা ব্যতিক্রম মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। সেটা হল—'শূন্য দিয়ে কোনও সংখ্যাকে ভাগ করা যায় না।' এইবার বল তুমি কী ভাবে 'ইনফিনিটি'র তত্ত্বটি শিখলে?

ছাত্র। এক-কে বা অন্য কোনও বিশেষ সংখ্যাকে যদি একটা ছোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে ভাজকটি যতই ছোট হয় ভাগফল ততই বড় হয়। কাজেই ভাজক শূন্য হলে ভাগফল হবে সবচেয়ে বড় সংখ্যা।

শিক্ষক। তোমার কথাটা খানিকটা ঠিক। ভাজককে ছোট করলে ভাগফল বাড়তে থাকে একথা ঠিক; কিন্তু ভাজক শূন্য হলে যা হয় সে সম্বন্ধে তোমার ধারণা ভুল—সবচেয়ে বড় সংখ্যা বলে কোনও সংখ্যা নেই। তোমার প্রথম কথাটি এই ভাবে লেখা হয়। [কাগজ লইয়া লিখিলেন :—

$$\text{যখন } ক \longrightarrow ০$$
$$১ \div ক \longrightarrow \infty \ ]$$

এর মানে হ'ল ধনাত্মক † ভাজককে যথেষ্ট পরিমাণে ছোট করে ভাগফলকে যত বড় ইচ্ছা তত বড় করা যায়। কিন্তু ভাজক শূন্য হ'লে কী হবে সে সম্বন্ধে কোনও কথা নেই—এটা ভাল করে মনে রেখো।

* Negative number.

† Positive uumber,

বিবিধ প্রসঙ্গ

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে পরমাণু গবেষণাগারের ভিত্তিস্থাপন

গত ২১শে এপ্রিল ভারত গভর্নমেন্টের শিল্প ও সরবরাহ সচিব ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পশ্চিম প্রাঙ্গণে পরমাণুতত্ত্ব গবেষণাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। এ উপলক্ষ্যে ডক্টর মুখোপাধ্যায় বলেন—প্রায় ৩ বছর আগে পরমাণু-বোমার আঘাতে জাপানের দুটি শহর বিধ্বস্ত হবার পর পরমাণুর-শক্তি সম্বন্ধে বিশ্ববাসী সচেতন হয়ে ওঠে। এ ঘটনা অচিরেই মানুষের মন থেকে মুছে যাবে এবং প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে আবিষ্কৃত বাষ্প-শক্তির মত শান্তির সময় পরমাণু-শক্তি প্রয়োগের দ্বারাও পৃথিবীর রূপান্তর সাধিত হবে। এ-শক্তিকে পৃথিবীর যে কোনও স্থানে যে কোন কাজে নিয়োগ করে মানুষ মর্ত্যলোকে স্বর্গসুখ অনুভব করবে।

দ্বিতীয়তঃ, পরমাণু শক্তি সম্পর্কিত গবেষণা, চিকিৎসা ব্যাপারে মানুষের হাতে নতুন ক্ষমতা প্রদান করবে।

তৃতীয়তঃ, গাছপালা, জীবজন্তু কি ভাবে বৃদ্ধি পায় সে সম্পর্কিত গবেষণার ব্যাপারে পরমাণু-শক্তি থেকে নতুন তথ্য আহরণ করা সম্ভব হবে এবং এ থেকে উন্নত উপায়ে খাদ্য উৎপাদনের হদিশও মিলবে। অন্যান্য দেশে যখন পরমাণু-শক্তি সম্পর্কে গবেষণা চলছে তখন ভারতবর্ষ চুপ করে বসে থাকতে পারে না। প্রথম আগুন আবিষ্কারের যুগে যেরূপ অবস্থা ঘটেছিল, পরমাণু-যুগের এই সূচনায় ভারতের অবস্থাও ঠিক সেরূপ। আগুনের আবিষ্কর্তা যেমন জানতো না, আগুনের সাহায্যে স্টীম-ইঞ্জিন ও অন্যান্য যন্ত্রাদি শক্তি উৎপাদন করতে পারে, পরমাণু-শক্তির ব্যাপারেও সেরূপ ঘটতে পারে। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া পরমাণু-শক্তি সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। সুইডেন, হল্যাণ্ড ও নরওয়ের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশেও পরমাণু-শক্তির গবেষণার জন্যে সুব্যবস্থা করেছে। ভারত গভর্নমেণ্টও এ সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং ভারতীয় আইন-সভায় আলোচনার জন্যে 'পরমাণু-শক্তি বিল' নামে একটি বিল উত্থাপন করা হয়েছে। প্রায় দু'বছর আগে পরমাণু সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে একটি বোর্ডও গঠন করা হয়েছে। গৌরবের কথা এই যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বপ্রথম পরমাণু-শক্তি গবেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়েছিল। প্রায় বছর সাতেক আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ সম্পর্কে প্রথম ব্যবস্থা অবলম্বন করে। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং সরকারের ঔদাসীন্যের ফলে এর কাজ বেশী দূর এগুতে পারে নি। যুদ্ধের পর একাজে আরও অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। কারণ ভারতকে বাইরে থেকে বিজ্ঞানের গবেষণার জন্যে যন্ত্রপাতি আমদানী করতে হয়। জার্মানী এবং ইয়োরোপের আরও কয়েকটি দেশ এবং স্বাধীন ভারতকে যুদ্ধোত্তর কালের পৃথিবীর পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে। ভারত সরকার বোম্বাইয়ের অধ্যাপক জি. আর. পরাঞ্জপের সভাপতিত্বে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে যন্ত্রপাতি তৈরীর পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যে একটি কমিটি নিয়োগ করেছেন। বর্তমানে জাপান থেকে যন্ত্রপাতি আমদানীর আর কোন উপায় নেই। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা যে পরিমাণ যন্ত্রপাতি তৈরী করছে সে-সব তাদেরই কাজে

লাগছে। ভারত গভর্নমেণ্ট এ পর্যন্ত ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের প্রস্তাবগুলো পরীক্ষা করে দেখতে না পারলেও শীঘ্রই তাদের প্রত্যেকটি প্রস্তাব পরীক্ষা করে দেখবার ব্যবস্থা করবেন। পরমাণু-তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষা ও গবেষণার জন্যে এখানে যে অর্থ ব্যয় হচ্ছে, ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার তুলনায় তা' কিছুই নয়।—এই গবেষণাগারের বাড়ী তৈরীর জন্যে বাংলা সরকার ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তিনি আশা করেন, এ ব্যাপারে যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে, বাংলা সরকার তারও ব্যবস্থা করবেন এবং দেশের ধনী ও শিল্পপতিরাও এ প্রতিষ্ঠানে অর্থ দান করবেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা পরমাণু গবেষণা বিভাগে অর্থদাতাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ দু'লক্ষ টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন এবং আরও দু'লক্ষ টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বর্তমান প্রধান মন্ত্রী একাজে যথাসাধ্য সাহায্য করবেন বলে তিনি আশা করেন। তিনি বলেন—এই গবেষণাগারে পরমাণু সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের গবেষণা করা হবে। কিন্তু এর প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। কারো কারো ধারণা, এখানে বুঝি অ্যাটম বোমা তৈরী হবে। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তার জন্য যে বিরাট আয়োজনের দরকার তা যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ব্যবস্থা করা অসম্ভব। এই গবেষণাগারে পরমাণু-শক্তি সম্পর্কে জ্ঞান বিস্তার ও জ্ঞান অর্জনের কাজ চলবে। মৌলিক তথ্য এবং তত্ত্বের অনুশীলনই হবে এর লক্ষ্য।

পাশ্চাত্য দেশসমূহের পরমাণু গবেষণার বিষয় বর্ণনা করে ডক্টর সাহা বলেন, সেখানে দুরকম প্রতিষ্ঠানে পরমাণুতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণার কাজ চলে। প্রথমতঃ আধা-সামরিক গবেষণাগার—এগুলোতে শিল্প ও সামরিক প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে ফলিত বিজ্ঞানের পথে কাজ হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শ্রেণীর গবেষণাগারগুলোতে তত্ত্বগত গবেষণা চালানো হয়।

যদিও অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের তুলনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরমাণু গবেষণার জন্যে নিতান্ত সামান্য সাহায্য পেয়ে থাকেন তবুও এখানকার কর্মীদের গবেষণাসমূহ বিশিষ্ট বিদেশী বৈজ্ঞানিকদের কাছে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছে।

পণ্ডিত জওহরলালের চেষ্টায় কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রতিষ্ঠানে ৭০ হাজার টাকা সাহায্য দিয়েছেন। ঐ টাকায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদি কেনার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর নাগ চৌধুরীকে আমেরিকায় পাঠিয়েছেন। সেখানে সমস্ত জিনিষ সংগ্রহ করতে পারলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইক্লোট্রোন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যন্ত্রগুলোর সমকক্ষ হবে।

পরমাণু গবেষণার জন্যে বিদেশী প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে ভারতীয় ছাত্রদের প্রায়ই বিশেষ বেগ পেতে হয়। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত সাত বছর যাবৎ এবিষয়ে ভাল শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ায় এখানের ছাত্রেরা সহজেই সফলতা লাভে সমর্থ হতে পেরেছেন। এবিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালর ভারতে সর্বাগ্রগণ্য। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে দশ জন ছাত্র বর্তমানে বিদেশে গবেষণা করছেন তারা ফিরে আসলে তাদের ব্যয়ভার বহন করতে পারলে কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় এবিষয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

ডক্টর সাহা আরও বলেন যে, ভারতের প্রধান-মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রসারে যেরূপ আগ্রহশীল পৃথিবীর আর কোন রাষ্ট্রনায়কই সেরূপ নহেন। কাজেই তাঁর সাহায্যে যে এইসব ব্যাপারে খুব দ্রুত উন্নতি হবে এতে কোনই সন্দেহ নেই। সভার প্রারম্ভে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীপ্রমথনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় ডক্টর মুখোপাধ্যায়কে ভিত্তি-স্থাপনের অনুরোধ জানিয়ে বলেন যে, ১৯৪০ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ব্যক্তিগত চেষ্টায় এবং বোম্বাইয়ের টাটা ট্রাস্টের দানের ফলে এই গবেষণা-গারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু একাজের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের তুলনায় প্রাপ্ত সাহায্য খুবই সামান্য; কাজেই সরকার ও দেশের বদান্য ব্যক্তিদের মুক্তহস্তে সাহায্যের জন্যে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

অধ্যাপক রামনের বক্তৃতা

ইডেন গার্ডেনে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রদর্শনীর বক্তৃতামঞ্চ হইতে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সার সি. ভি. রামন বলেছেন:—বৃত্তি হিসাবে বিজ্ঞানকে রাজনীতির অধিক মর্যাদা দিয়ে দেশের শাসনকার্যে বৈজ্ঞানিকের উপদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। আমাদের নেতৃবৃন্দ যদি একথা বোঝেন, তবেই দেশের মঙ্গল হবে। ভারতীয় নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করে শ্রীযুক্ত রামন বলেন—আগের আই. সি. এস.-রা কৃষি, শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ে নিজেদের সবজান্তা বলে মনে করতেন। বর্তমানে অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গীই নেতাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। নেতারা ভাবেন যে, কৃষি, আইন, শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রভৃতি সব বিভাগেই তাঁরা পারদর্শী। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষের বর্তমান অগ্রগতি যেন চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান বুদ্ধিকে মর্যাদা দিতে না পারলে দেশের মঙ্গল হবে না। বিজ্ঞানের কাণ্ডারী যদি বৈজ্ঞানিক হন তবেই দেশের ও বিজ্ঞানের মঙ্গল সম্ভবপর। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও দেশের শিল্পক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রকৃতির মূলরহস্য আবিষ্কারে দার্শনিক মন নিয়ে বৈজ্ঞানিক কাজ করেন। সেখানে তিনি নিতান্তই নিঃসঙ্গ যাত্রী। মাইকেল ফ্যারাডে ও ম্যাডাম কুরীর জীবনাদর্শের উপর তিনি আলোকপাত করেন। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার এই দিককে তিনি প্রশংসা করে বলেন যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রে এই ব্যক্তিগত ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। বিজ্ঞানই শিল্পকে চালনা করে—এ দেশের শিল্পপতিরা কিন্তু বিপরীতটাই বুঝে থাকেন। তাঁরা একশত টাকা মজুরির বিনিময়ে বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা ক্রয় করতে চান। ফলে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্ফুরণ ব্যাহত হয়। বিজ্ঞানকে প্রয়োজনে লাগাতে হলে শিল্পপতিকে বৈজ্ঞানিকের কাছে করজোড়েই আসতে হবে, মনিবের মত নয়। বৈজ্ঞানিক ও শিল্পপতির সহ-যোগিতা বৃদ্ধি পেলে এ দেশের বিজ্ঞানের উন্নতি অনিবার্য, নতুবা নয়। বিজ্ঞান তো জ্ঞানই এবং জ্ঞান পরমব্রহ্মের মত সকলের উপর বিরাজিত। বিজ্ঞানের পথ দুর্গম এবং সেখানে দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পথ চলতে হয়।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমেরিকা ও রাশিয়ার তুলনা-মূলক আলোচনা করে তিনি আমেরিকাকে বিজ্ঞানের স্বর্গপুরী বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, সেখানে বৈজ্ঞানিককে প্রচুর অর্থ সাহায্য করে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের পথ সুগম করা হয়েছে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে সে আবিষ্কারকে কাজে লাগাবার ফলে দেশ ডলারে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমেরিকায় যেখানে বৈজ্ঞানিকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা সম্ভবপর, রাশিয়ার পদ্ধতি সেখানে অন্য রকমের। রাশিয়া অবশ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অদ্ভুত উন্নতিসাধন করেছে। বিজ্ঞান অনুশীলনে উৎসাহ দিলেও রাশিয়ায় কিন্তু বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা নিয়ন্ত্রিত এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে সেখানে উৎসাহ দেওয়া হয় না। আমি অবশ্য আগে রাশিয়ায় গিয়েছি, কিন্তু কিছুদিন আগে যখন আমার সেখানে যাবার ডাক এসে-ছিল তখন ইচ্ছা করেই সেখানে যাইনি। রাশিয়ার বিজ্ঞান সম্পর্কিত পরীক্ষা আমি দূর হতেই দেখব মনে করেছি। বৈজ্ঞানিকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করা আমি নিজে পছন্দ করি না। তবে

একথা সত্য যে, যেখানে বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগিয়ে বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি করা হয়েছে। মোটের উপর ধনতন্ত্র বা সাম্যতন্ত্রের কোন নিগড়েই বিজ্ঞান বন্দী হবার নয়। তিনি আরও বলেন যে, বিদেশ থেকে বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা অথবা বিজ্ঞান-সম্ভূত জিনিষপত্র এদেশে আমদানী না করাই শ্রেয়ঃ। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকেরা একত্রিতভাবে কাজ করলে ভারতীয় বিজ্ঞানের উন্নতি অনিবার্য। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এসেছে বটে; কিন্তু যতদিন বৈজ্ঞানিক চিন্তার স্বাধীনতা না আসে ততদিন রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক এমন কি স্বকুমার শিল্পের ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক চিন্তার গুরুত্ব রয়েছে।

ভারতীয় জাহাজনির্মাণ শিল্প

১৪ই মার্চ, ১৯৪৮, ভারতের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন, জাহাজনির্মাণ-শিল্প লুপ্ত হয়ে যাওয়ার প্রায় ১১৬ বছর পর এদিন ভারতের প্রধান নাগরিক পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভিজিগাপট্টমে ভারতীয় কারখানায় তৈরী 'জল-উষা' নামে জাহাজখানা জলে ভাসাবার অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছেন। সিন্ধিয়া স্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদের মানপত্রের উত্তরে পণ্ডিতজী বলেন, আজ যে জাহাজখানা জলে ভাসানো হচ্ছে পর পর এর চেয়ে ছোটবড় আরও বহু জাহাজ পৃথিবীর সর্বত্র ভারতের বার্তা নিয়ে থাক এই আমি কামনা করি।

দেশের যুবকদের নৌ-বিদ্যা শিক্ষার আহ্বান জানিয়ে পণ্ডিতজী বলেন—এই ভিজাগাপট্টম বন্দরে আমরা যে শুধু জাহাজনির্মাণ-শিল্প গড়ে তুলছি তা নয়; আমাদের এ কথাই আজ মনে রাখতে হবে যে, ভিজাগাপট্টম ভারতের একটা গুরুত্বপূর্ণ নৌ-ঘাঁটি। সমুদ্রতটে এত গুরুত্বপূর্ণ আর নৌ-ঘাঁটি নেই। আমি চাই এই নৌ-ঘাঁটির উন্নতি ও পরিবর্ধন। আমাদের যুবক-সমাজ নৌ-বাহিনীর বিভিন্ন কাজে যোগদান করুক এই আমার ইচ্ছা। যুবক থাকলে আমি নিজেই একাজে যোগদান করতাম, কেননা বিমান-বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর কাজ ছাড়া অপর কোন লোভনীয় কাজের কথা আমার জানা নেই। দুর্ভাগ্যবশতঃ অদৃষ্ট আমার প্রতি বিরূপ, কেননা আমাকে আজ অফিসের কাজেই ব্যস্ত থাকতে হয়। ভারত সরকার জাহাজ-শিল্পের উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই শিল্প পরিচালিত হলেও দেশোন্নয়নের সঙ্গে এটা এমনভাবে জড়িত যে, সরকার একে নিজস্ব শিল্প বলে' মনে করতে বাধ্য এবং এর পরিবর্তনের জন্যে সব রকমের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করবেন। জাহাজ-শিল্পের উন্নতির জন্যে সরকার যাথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। জাহাজ-শিল্প যদি সত্যসত্যই দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হয় তবে সরকারও তার উন্নতির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে বাধ্য। কারণ এর সঙ্গে তাদের স্বার্থ জড়িত।

ভারতে তৈরী পাল দেওয়া প্রথম জাহাজখানা ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে শেষবারের জন্যে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বৃটেন পর্যন্ত গিয়েছিল। তারপর এই 'জল-উষাই' ভারতে তৈরী প্রথম জাহাজ। বর্তমান ভারত সরকার এদেশে জাহাজ-শিল্প গড়ে তোলবার যে পরিকল্পনা করেছেন, সেই পরিকল্পনারই প্রথম ফলস্বরূপ—এই জাহাজখানা। জাহাজখানা যদিও ছোট তবু জাহাজনির্মাণ-শিল্পের প্রথম সার্থকতা এবং বৃহত্তর সম্ভাবনার প্রথম সূচনা হিসাবে এ-তারিখের অনুষ্ঠানটি চিরকাল গৌরবোজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার উদ্বোধন

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী বাংলার সেচবিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত ভূপতি মজুমদার ময়ূরাক্ষী বাঁধ পরিকল্পনার

প্রথম খালের মাটি কেটে উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন. খালটি লম্বায় ১৩ মাইল, চওড়ায় ১০২ ফুট এবং গভীরতায় হবে ১৫ ফুট। পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হলে সেচখালগুলোর মোট দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৬০০ মাইল। এতে ৬ লক্ষ একর জমি সেচ-ব্যবস্থার সুবিধা পাবে। তাছাড়া এথেকে ৩০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করবার ব্যবস্থা হবে এবং বর্ষার সময় আরও একহাজার কিলোওয়াট বেশী শক্তি পাওয়া যাবে।

হীরাকুণ্ড বাঁধের ভিত্তিস্থাপন

গত ১২ই এপ্রিল ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহওরলাল নেহরু উড়িষ্যার মহানদী নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে হীরাকুণ্ড বাঁধের ভিত্তিস্থাপন করেছেন। বাঁধ তৈরী করতে ব্যয় হবে মোট ৪৭ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। নির্মাণ-কার্য শেষ করতে প্রায় ৬ বছর সময় লাগবে বলে অনুমান। পরিকল্পিত জলাধার তৈরী হলে ছটি গ্রাম জলে ডুবে যাবে। গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে পণ্ডিতজী বলেন—হীরাকুণ্ড বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনায় সঙ্গে দেশের উন্নতির বিরাট সম্ভাবনা জড়িত রয়েছে। এই পরিকল্পনার জন্যে কতক লোককে অবশ্যই কিছু কষ্ট ভোগ করতে হবে। দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্যে তাদের সে কষ্ট স্বীকার করা উচিত। যে-সকল গ্রামবাসীর বাড়ী-ঘর ডুবে যাবার সম্ভাবনা তারা কোন প্রতিবাদ জানান নি। পণ্ডিত নেহরু অতঃপর বাঁধ অঞ্চল ঘুরে বিদ্যুৎ-উৎপাদন গৃহ, কারখানা, বয়নাগার ও অন্যান্য গৃহগুলো পরিদর্শন করেন।

ভারতের খনিজ-সম্পদ

গত ১৩ই মার্চ, ইউনাইটেড্ সার্ভিস ক্লাবের ভোজ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন—১৯৩৯ সালের পর থেকে আজ পর্যন্ত ভারতের খনিজ-শিল্পের বহু উন্নতি সাধিত হয়েছে। এ সময়ে ভারতে সর্বপ্রথম অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদন, জাওয়ারের লুপ্তপ্রায় সীসা ও দস্তার খনি, ক্ষেত্রীর তামার খনি, কোহি সুলতানের গন্ধক-খনির উন্নতি সাধিত হয়। মূল্যের অনুপাতে হিসেব করলে দেখা যায় ১৯৩৫ সালে ৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার খনিজ-সম্পদ উৎপন্ন হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে তা' বৃদ্ধি পেয়ে ৭৭ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। ভারতের খনিজ-শিল্প উন্নয়নে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ছ'দিক দিয়ে প্রেরণা যুগিয়েছে। এক দিকে, বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য এবং ধাতু-দ্রব্যের ভারতে আমদানী ব্যাহত হয়ে যায়; অপর দিকে, সুদূর প্রাচ্য ও মধ্য প্রাচ্যের মিত্রশক্তির সরবরাহ-ঘাঁটি-রূপে ভারতের উপর এক গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। এর ফলে খনিজ শিল্পবস্তু উৎপাদনে এক অভূত-পূর্ব প্রেরণা দেখা দেয়। এসকল খনিজ-সম্পদের মধ্যে কয়লা, লোহা, ইস্পাত ও পেট্রোলিয়াম সব চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য এবং এগুলোর উপরই বিশ্বের রাষ্ট্র সমূহকে বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়। এসকল জিনিষ উৎপাদনে ভারত পিছিয়ে থাকে নি। সে সময়ে ভারতে গুলী-নিরোধক সাঁজোয়া গাড়ীর বর্ম নির্মানের জন্যে একরকমের ইস্পাত তৈরী হয় যা আমদানী-করা যে-কোন ইস্পাতের সঙ্গে তুলনীয়। আফ্রিকার রণক্ষেত্রে সংগ্রামের জন্যে এই ইস্পাত দিয়ে ২৫০০০ টন সাঁজোয়া গাড়ী তৈরী হয়েছিল। তা ছাড়া ছোট জাহাজ, মাইন-তোলা জাহাজ, প্রভৃতি তৈরীর জন্যেও ভারতীয় ইস্পাত ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে যে কেবল মাত্র উৎপাদনই বৃদ্ধি পেয়েছে তা' নয়, পরন্তু সম্পদের পরিমাণ ও গুণাগুণ সম্পর্কেও গবেষণার বহু উন্নতি হয়েছে। যুদ্ধের সময় নতুন খনিজ-সম্পদ ও অপরাপর সম্পদের অবস্থান সম্পর্কে যে অনুসন্ধান চলেছিল, যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পরও সে অনুসন্ধান শেষ হয় নি। প্রকারান্তরে নতুন রাজ-নৈতিক ব্যবস্থাপনার ফলে স্বাধীন ভারতের দেশ-

রক্ষা ও শিল্পোন্নয়নের জন্যে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় করবার জন্যে এদিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়ার সময় এসেছে। ভারতের খনিজ-সম্পদের মধ্যে কয়লা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মূল্যের অনুপাতে হিসাব করলে দেখা দেখা যায়—১৯৪৫ সালে উৎপন্ন সমগ্র খনিজ-সম্পদের মধ্যে কয়লা শতকরা ৭০ ভাগ। কয়লা উৎপাদন হিসেবে ভারত, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে নবম স্থান অধিকার করেছে। ১৯৪৫ সালে সব সমেত ৩ কোটি টন কয়লা তোলা হয়, তার মধ্যে বিহারে শতকরা ৫৫ ভাগ ও বাংলায় শতকরা ২৮ ভাগ। উৎপাদন বৃদ্ধি যতটা প্রয়োজন তার চেয়ে উন্নততর উৎপাদন-ব্যবস্থা আরও বেশী প্রয়োজন।

খনিজ জ্বালানীর মধ্যে কয়লার পরেই পেট্রোলের স্থান। অন্যান্য অনেক দেশের মত ভারতেও পেট্রোলের অভাব রয়েছে। কাজেই কয়লা থেকে কৃত্রিম পেট্রোল উৎপাদন করে সে অভাব পূরণ করা যায় কিনা তার সমস্ত সম্ভাব্য পন্থা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখতে হবে। ভারত এ বিষয়ে বৃটেন, জার্মানী এবং জাপানের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। দেশগুলো কয়লা থেকে কৃত্রিম পেট্রোল উৎপাদনের বহু পরিকল্পনা চালু করেছে।

ভারতের ধাতুজাতের খনিজ-শিল্পের মধ্যে লোহাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের অপরিশোধিত লোহার মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ বিশুদ্ধ লোহা পাওয়া যায়। এই লোহা গলাবার কাজে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ কয়লা সর্বত্র সহজপ্রাপ্য নয় এবং প্রথম শ্রেণীর কয়লার পরিমাণও খুব কম।

খনিজ-সম্পদের মধ্যে সোনার কথাও উল্লেখযোগ্য। মূল্যের অনুপাতে হিসেব করলে দেখা যায়, ভারতে উৎপন্ন সোনার মূল্য ৩ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা এবং সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন সোনার শতকরা ৩ ভাগ। কোলার খনি থেকেই ভারতের শতকরা ৯৮ ভাগ সোনা পাওয়া যায়। বর্তমানে কোলার খনি থেকে নিকৃষ্ট ধরণের সোনা পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় ৯ হাজার ফুট নীচে কাজ চলতে থাকায় তোলবার খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই নতুন স্বর্ণখনি সন্ধানের এক বিরাট দায়িত্ব ভূতত্ত্ববিদদের উপর ন্যস্ত হয়েছে।...আজ রাষ্ট্রের সাহায্যের জন্যে বৈজ্ঞানিক, ভূতত্ত্ববিদ, খনি-তত্ত্ববিদগণ এগিয়ে এসে দেশকে অধিকতর সমৃদ্ধিশালী ও সুখী করবে এই হচ্ছে তাঁদের নিকট কামনা।

ভারত সরকারের শিল্পনীতি

গত ২১ শে এপ্রিল ইস্টার্ন চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক সম্মেলনে ভারত সরকারের শিল্পসচিব ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁদের শিল্পনীতি এবং শ্রমিক ও মালিকের সম্বন্ধ বিষয়ে বলেন যে, শিল্পপতিদের সময়ের গতির সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে। যে অর্থ জনসাধারণের উপকারে আসে না, ভারতের আজ যে অর্থের কোন প্রয়োজন নেই। গভর্নমেণ্ট বা শ্রমিক, প্রত্যেককেই আজ জনসাধারণের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এদেশে তথাকথিত সম্পদের মাঝখানে দুঃখ ও দারিদ্র্য প্রকট হয়ে উঠছে। অবিলম্বেই যদি এর প্রতিকারের কোন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা করা-না হয় তবে অবস্থা এমন ঘোরালো হয়ে উঠবে যে, তার ফলে ধনিক সমাজ উচ্ছন্ন হবে এবং যাঁদের হাতে বর্তমান শাসন-পরিচালনা-ভার ন্যস্ত আছে—তাঁদেরও গ্রাস করবে। আমাদের ইচ্ছা নয় যে জনসাধারণের স্বার্থ বিপন্ন করে একদল লোকের হাতে দেশের সম্পদ স্তূপীকৃত হোক। এবং এটাও আমাদের ইচ্ছা নয় যে বর্তমানেই এমন বৈপ্লবিক পন্থা অনুসৃত হোক যাতে দেশের প্রচলিত বৈষয়িক কাঠামো ধ্বংস হয়ে যায়। আমরা এমন অবস্থারই সৃষ্টি করতে চাই যাতে দেশের সমগ্র বৈষয়িক ব্যবস্থা একীভূতভাবে জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে।

শিল্পের জাতীয়করণ সম্পর্কে সরকারী নীতির কথায় ডক্টর মুখোপাধ্যায় বলেন, জনসাধারণের কল্যাণের জন্যেই বর্তমান রাষ্ট্র। দেশের প্রধান প্রধান শিল্পগুলো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আসাই বাঞ্ছনীয়। কয়লা, লোহা, ইস্পাত, বিবিধ সাজসরঞ্জাম ও জাহাজ-নির্মান-শিল্পগুলোকে এখনই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা যেত। কিন্তু যেসব শিল্প জাতির উল্লেখযোগ্য সেবা করেছে তাদের সম্পর্কে আমাদের বিশেষ ভাবে বিবেচনা করা উচিত। এরূপ নানা বিষয়ে চিন্তা করে গভর্নমেণ্ট সিদ্ধান্ত করেছেন যে, দশ বছর কাল এসকল শিল্পকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন করা হবে না, তবে গভর্নমেণ্ট এসকল শিল্প সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয় ভাবে বসে থাকবে না। এসময়ের মধ্যে শিল্পগুলো যাতে জাতীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নতি সাধন করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে। যদি দেখা যায় যে, প্রয়োজনানুরূপ উন্নতি হচ্ছেনা তখন গভর্নমেণ্ট সুবিধা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। অনেকে আশঙ্কা করেন, গভর্নমেণ্ট শিল্পগুলো হাতে নিলে কর্মোদ্যম হ্রাস পাবে কিন্তু সেকথা ঠিক নয়, গভর্নমেণ্ট সরকারী শাসনযন্ত্রের মারফৎ শিল্প পরিচালনার জন্য স্ট্যাটুটারী কর্পোরেশন গঠন করবেন। ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্টে এবং বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাদেশিক আইন-সভায় আইন প্রণয়ন করে যথাবিহিত ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া তিনি গ্রামে গ্রামে কুটীর-শিল্প প্রবর্তন করে জনসাধারণ যাতে শহরবাসী না হয়ে গ্রামে গিয়ে বাস করতে পারে সেরূপ পরিকল্পনা গ্রহণের পরামর্শ দেন।

•

ইংরেজীর বদলে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান

নয়াদিল্লী ১লা মার্চের খবরে প্রকাশ ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্টে শিক্ষাসচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছেন যে, প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট সমূহ মাতৃভাষাকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম করবার নীতি গ্রহণ করেছেন। একে কার্যকরী করবার জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা চলছে। শিক্ষা-বিভাগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড ও শিক্ষা সম্মেলন উভয়েই এই সুপারিশ করেছেন যে, শিক্ষার মানের ক্ষতি না করে ক্রমে ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করা উচিত। এই সুপারিশের ভিত্তিতে স্থির হয়েছে যে পাঁচ বছর ধরে শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থা এমনভাবে পরিবর্তন করা হবে যাতে ষষ্ঠ বছরে ভারতীয় ভাষাসমূহই সকলপ্রকার শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে। তবে ইংরেজী ভাষা স্নাতকোত্তর ছাত্রদের পাঠ্যবিষয় এবং দ্বিতীয় ভাষারূপে বর্তমান থাকবে।

•

পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রভৃতি ঔষধকে অধিকতর কার্যকরী করার ব্যবস্থা

পেনিসিলিন শরীরের মধ্যে ইনজেকশন করে দিলেও বেশীক্ষণ থাকে না, প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়, এজন্যে ঘন ঘন ইনজেকশন দিতে হয়; এ ব্যবস্থা যেমন অসুবিধাজনক তেমনি ব্যয়সাপেক্ষ। অন্য কোন জিনিষ সহযোগে ঔষধগুলোকে আরও বেশীক্ষণ শরীরের মধ্যে রাখা যায় কিনা এ নিয়ে অনেকদিন ধরেই পরীক্ষা চলছে। দেখা গেছে—বিভিন্ন রকমের তেল বা মোম জাতীয় পদার্থের সহযোগে পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, ইনসুলিন প্রভৃতি ঔষধ ব্যবহার করলে তা' শরীরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ফোলা, ব্যথা বা অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয়। তখন আর পেনিসিলিন দেওয়া চলে না। সম্প্রতি জানা গেছে—তেল বা মোমের পরিবর্তে পেকটিন ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। পেনিসিলিনের চেয়ে স্ট্রেপ্টোমাইসিনের সঙ্গে পেকটিন ব্যবহারে ফল অনেক ভাল হয়, পেকটিন সহযোগে আধ গ্র্যাম স্ট্রেপটোমাইসিন প্রায় দু'দিন পর্যন্ত শরীরের মধ্যে থাকতে পারে। পেকটিন

ছাড়া ব্যবহার করলে এ সময়ের মধ্যে প্রায় ৬ গ্র্যাম ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়। পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন প্রভৃতি অ্যান্টিবায়োটিক ছাড়াও হৃদ্‌রোগের ঔষধ অ্যাড্রেন্যালিন, বহুমূত্রের ইনসুলিন, হাঁপানি রোগের এফেড্রিন্ প্রভৃতি পেকটিন সহযোগে ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া গেছে। বিভিন্ন জাতের ফল থেকে পেকটিন্ পাওয়া যায়।

অরভিল রাইট

এরোপ্লেনের উদ্ভাবক হিসেবে আমেরিকার রাইট ভ্রাতাদের নাম পৃথিবীর সর্বত্র পরিচিত। জ্যেষ্ঠভ্রাতা উইলবার রাইট ১৯১২ সালে পরলোক গমন করেন। অপর ভ্রাতা অরভিল-রাইট গত ৩১শে জানুয়ারী, ৭৭ বছর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন।

অরভিল রাইট জন্মগ্রহণ করেন—১৮৭১ সালের ১৯শে আগষ্ট। ১৮৮৮ সালে দু'ভাই মিলে নতুন ধরণের এক মুদ্রাযন্ত্র তৈরী করেন। হাতে চালানো কলের চেয়ে এ যন্ত্রে অনেক তাড়াতাড়ি কাজ হতো। ১৮৯২ সালে তারা দু'জনে এক সাইকেলের দোকান খোলেন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনে' নিজেরাই সাইকেল তৈরী এবং মেরামতের কাজ করতেন। সেই বছরেই অরভিল অঙ্ক-কষবার এক রকমের যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। ১৮৯৬ সালে উড়ন-যন্ত্রের উদ্ভাবক লিলিয়েন্‌টাল আকাশে ওড়বার সময় দুর্ঘটনার ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন, এ ব্যাপার থেকেই রাইটভ্রাতৃদ্বয় আকাশ-বিহারের জন্যে উন্নততর যন্ত্র উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন। ১৮৮৫ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত অনেক কর্মকুশল বৈজ্ঞানিক আকাশে ওড়বার প্রকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবনের জন্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের চেষ্টা সাফল্য লাভ করতে পারেনি। রাইট ভায়েরা এসব বিফলতা সম্পর্কে সতর্কভাবে অনুসন্ধান করে বর্তমান এরোপ্লেনের আদিম উড়ন-যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। ১৯০০ সালে কিটিহক দ্বীপে তাঁদের উড়ন-যন্ত্রের প্রথম পরীক্ষা হয়। ১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর বিমান চালনার ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিন। অরভিল রাইট এদিন সর্বপ্রথম যন্ত্র চালিত এরোপ্লেন পরিচালনা করেছিলেন। ১৯০৮ সালে আমেরিকান সিগন্যাল্ কোর ২৫০০০ ডলারের বিনিময়ে তাঁদের বিমান তৈরীর পরিকল্পনা কিনে নেন। তা'ছাড়া কিছু শেয়ার এবং রয়ালটি দেবার ব্যবস্থাও তাঁরা করেছিলেন। সেবছরই সমর-বিভাগের জন্য বিমান-চালনা দেখাবার সময় প্লেন-দুর্ঘটনায় অরভিলের একখানা পা জখম হয় এবং পাঁজরার কয়েকখানা হাড় ভেঙ্গে যায়। এর পর থেকেই তিনি সমর-বিভাগের বিমান-চালকদের শিক্ষার কাজে নিযুক্ত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পরলোকগমনের পর অরভিল, কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট হন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অরভিল, মেজরের পদে যোগদান করেন এবং বিমান বিষয়ক গবেষণার কাজ চালাতে থাকেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এ কাজেই লিপ্ত ছিলেন। অরভিল ছিলেন চিরকুমার এবং পরিবারের সকলেই মারা যাওয়ায় অনেকদিন থেকেই একাকী বাস করছিলেন। তিনি স্বদেশ ও বিদেশের বহু গভর্ণমেন্ট, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিবিধ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন।

তারকার জন্ম সম্বন্ধে নতুন মতবাদ

তারকার উৎপত্তি সম্বন্ধে উটরেখটের ডক্টর এইচ. সি. ফান ডে হুলস্ট নতুন এক মতবাদ প্রচার

করেছেন। প্রচলিত মতানুসারে মহাশূন্যে বিরাট ব্যবধানে এক একটা তারা অবস্থিত। কোটি কোটি মাইল দূরে দূরে অবস্থিত তারকাগুলোর মাঝে যে কিছু থাকতে পারে একথা কেউ ভাবেনি। ডক্টর ফান হুলসটের অনুমান—এই শূন্যস্থানে আণবিক অবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণা রয়েছে। তাঁর ধারণা আমাদের ছায়াপথের প্রায় অর্ধেক পরিমিত শূন্যস্থানে পদার্থসমূহ আণবিক অবস্থায় রয়েছে, গড়পড়তা হিসেবে এসব আণবিক কণিকার ব্যাস হবে প্রায় এক ইঞ্চির চার লক্ষ ভাগের একভাগ মাত্র। মহাশূন্যে অবস্থিত এসব কণিকার উত্তাপ পরম শূন্য থেকে সামান্য কিছু বেশী। ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল অণুগুলো যখন এরূপ কোন কণিকার ধাক্কা খায় তখন তারা তাতে আটকে যেতে পারে। এভাবে ক্রমশঃ কণিকাগুলো বড় হতে থাকে। বড় হতে হতে তারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করতে থাকে। এসব ক্রমবর্ধমান কণিকাগুলোর উপর চতুর্দিকের তারকাসমূহ থেকে বিকীর্ণ শক্তি ক্রিয়া করে। এর ফলে সেগুলো ক্রমশঃ নিরেট পিণ্ডে পরিণত হয়। ছায়াপথে এরকমের বহু বস্তুপিণ্ড রয়েছে। এদের অনেকের ব্যাস কয়েকহাজার কোটি মাইল বলে অনুমিত হয়। আকর্ষণ ও বিকিরণের চাপের ফলে এসব পিণ্ডের বাইরের দিকের অণুগুলো ক্রমশঃ উত্তেজিত হতে হতে কয়েক শত কোটি বছরে অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং আলোক বিকিরণ করতে থাকে ডক্টর ফান ডে হুলসটের মতে এই হলো তারকার উৎপত্তির কারণ। প্রচলিত মতানুসারে দু'টি তারকার সংঘর্ষ ঘটলে অথবা খুব কাছাকাছি সরে আলে প্রবল আকর্ষণের ফলে একটার বা উভয়ের কতকাংশ ভেঙে যেতে পারে। ভাঙা টুকরাগুলো বৃহত্তর অংশের চারিদিকে পরিভ্রমণ করতে থাকে। এ ভাবে সৌরজগতের উৎপত্তি ঘটে। ডাক্টর হুলসটের তারকার জন্মতত্ত্বের মতবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে হারভার্ডের বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডক্টর ফ্রেড. এল. হুইপল্ বলেন যে, গ্রহ, উপগ্রহ সমেত সৌরজগতের উৎপত্তি অন্যভাবেও হতে পারে। তাঁর মতে বিশাল বস্তুপিণ্ড সঙ্কুচিত হবার সময় কিছু কিছু অংশ তা'থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে সৌর পরিবারের সৃষ্টি করতে পারে।

পরিষদের কথা

কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে প্রধান প্রধান বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৪ঠা মার্চ বৃহস্পতিবার কার্য-করী সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। নিয়মাবলীর ১৪ (ঘ) (১) ধারা অনুসারে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে কার্য-করী সমিতির সভ্য মনোনীত করা হয়।

নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া পত্রিকা-প্রকাশ সমিতি গঠিত হয়:—

সভাপতি—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র মিত্র

আহ্বায়ক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

সদস্যগণ—শ্রীসজনীকান্ত দাস

শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত

শ্রীসুকুমার বসু

শ্রীপরিমল গোস্বামী

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

শ্রীসত্যব্রত সেন

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

শ্রীজীবন্ময় রায়

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীসুবোধনাথ বাগচী

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

সদস্যগণ—শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন—শ্রীকামাখ্যারঞ্জন সেন

শ্রীহেমলাল সাহা

শ্রীজ্যোৎস্নাকান্ত বসু

শ্রীসুশীলকুমার আচার্য

শ্রীবৈদ্যনাথ ঘোষ

শ্রীভূতনাথ ভাদুড়ী

শ্রীবিজয়রতন মিত্র

শ্রীদ্বিজেন্দ্রকুমার সান্যাল

শ্রীমনীন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

শ্রীসুধীরকুমার চন্দ্র

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত

শ্রীসুশীলকুমার সিদ্ধান্ত

শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

প্রথম বর্ষ | মে—১৯৪৮ | পঞ্চম সংখ্যা

ধূমকেতুর অভিযোগ

শ্রীনিখিলরঞ্জন সেন

কিছুদিন পূর্বে রয়টারের খবরে প্রকাশ যে জাপান হইতে পশ্চিমাকাশে দুইটি ধূমকেতু দেখা গিয়াছে। অনেকে হয়তো মনে করিবেন জাপানে ধূমকেতু দেখার সময় সত্যই এখন উপস্থিত। পৃথিবীর সকল দেশেই প্রাচীনকাল হইতে ধূমকেতুর সহিত দুর্ভিক্ষ, মহামারীও নানাবিধ বিপদের একটা যোগাযোগ মানুষ কল্পনা করিয়া আসিয়াছে। কথিত আছে, জুলিয়াস সিজারের হত্যার পূর্বে রোমের আকাশে ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল। অঘটনের আশঙ্কায় সিজার-পত্নী ক্যালফুর্নিয়ার ভীতিপূর্ণ ব্যাকুলতাকে সেক্সপিয়ারের অমর লেখনী রূপ দিয়া গিয়াছে। এযুগেও আমরা অনিষ্টকারীকে ধূম-কেতুর সহিত তুলনা করিয়া থাকি। কিন্তু জ্যোতি বিজ্ঞানীরা বলেন, মাভৈঃ! ধূমকেতুগুলি দূরাকাশের দূত মাত্র। আমাদের কোন অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা তো ইহাদের নাই-ই, পরন্তু সৌরজগতে ইহারা অতি দুঃখী ও নির্যাতীত জীব, সুতরাং কৃপার পাত্র। কথাটা একটু খুলিয়া বলা দরকার।

সাধারণ লোকের নিকট ধূমকেতু ভয়াবহ হইলেও একথা স্বীকার করিতে হইবে যে জ্যোতি-র্বিজ্ঞানীর নিকট ধূমকেতু অনেকাংশে আজও একটি প্রহেলিকা। ইহাদের সম্বন্ধে যে কয়টি প্রশ্ন স্বতঃই মনে হয় তাহা এই:—এই আকাশচারী বস্তুগুলি অন্যান্য জ্যোতিষ্ক হইতে কি প্রকারে বিভিন্ন এবং কেনইবা আকাশে ইহারা "ক্ষণিকের অতিথি"? সূর্য, গ্রহ ও উপগ্রহ লইয়া যে সৌরপরিবার, ধূমকেতু কি তাহার অন্তর্ভুক্ত? ইহাদের অদ্ভুত দেহ এবং তাহার গঠন-রহস্য কি? আর সবচেয়ে আমাদের দরকারী কথা এই যে, ইহারা আমাদের অনিষ্ট করিবার ক্ষমতাই বা কি রাখে? এই সবগুলি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারেন, একথা জ্যোতির্বিজ্ঞানী আজও হলফ্ করিয়া বলিবেন না।

ধূমকেতু আমরা খালি চোখে খুব কমই দেখিতে পাই। কোন এক ব্যক্তির জীবনে খালি চোখে সাত আটটির অধিক ধূমকেতু দেখা ঘটিয়া উঠে না। কিন্তু দূরবীন ও ক্যামেরার সাহায্যে প্রতি বৎসরই পাঁচছয়টি নূতন ধূমকেতুর সন্ধান আকাশে পাওয়া যায়। ১৯৩২ সালে এইরূপ ১৩টি ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল। প্রায় প্রতি রাত্রিতেই দূরবীনের সাহায্যে আকাশের কোন না কোন স্থানে

এক-আধটি ধূমকেতু দেখা যায়। কিঞ্চিদধিক সওয়া তিনশত বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে দূরবীনের ব্যবহার প্রচলিত হয়। তাহার পূর্বের ধূমকেতুর বিবরণও প্রাচীন লেখকেরা রাখিয়া গিয়াছেন। এই সমুদয় বিবরণ হইতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে শতবৎসরে প্রায় হাজার ধূমকেতু সূর্যের চতুষ্পার্শ্ব পরিভ্রমণ করিয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কিন্তু কতকগুলি বার বার ফিরিয়া আসে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে ধূমকেতুগুলি সংখ্যায় একেবারে নগণ্য নয়। এস্থলে অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে সমুদয় সৌরজগতে এযাবত ৯টি মাত্র গ্রহ ও সহস্রাধিক উপগ্রহ ও গ্রহকণিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তাহার তুলনায় ধূমকেতুর সংখ্যাকে উপেক্ষা করা চলে না।

গ্রহ ও ধূমকেতুর সূর্য-প্রদক্ষিণের কারণ একই। জড় আকর্ষণের ফলে সূর্যের প্রবল টানে আকাশে ইহাদের পথ নির্দিষ্ট। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আকাশের পথকে কক্ষ বলেন। গ্রহগুলির কক্ষ ঠিক বৃত্ত নয়। গণিতের হিসাবে দেখা যায় জড় আকর্ষণের ফলে গ্রহের যে পথ তাহা এক একটি প্রায়বৃত্ত, যাহার ইংরাজী নাম ইলিপ্স্। ইহাদের ছবি দেখিলে মনে হয় বৃত্তকে চাপিয়া চ্যাপ্টা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রায়বৃত্তের ভিতর দুইটি বিশিষ্ট বিন্দু আছে যাহা বৃত্তের নাই। এই বিন্দু দুইটির ইংরাজী নাম ফোকস্। আমরা বাংলায় তাহাকে কিরণকেন্দ্র বলিব। বলবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে প্রত্যেকটি গ্রহের কক্ষ এক একটি প্রায়বৃত্ত এবং সূর্য তাহার একটি কিরণকেন্দ্রে অবস্থিত। কিরণকেন্দ্রটি প্রায়বৃত্তের কেন্দ্রের মত নয়। বৃত্তের কেন্দ্র হইতে বৃত্তের যে কোন বিন্দুর দূরত্ব সমান; কিন্তু প্রায়বৃত্তের বিন্দুগুলি কিরণকেন্দ্র হইতে বিভিন্ন দূরে অবস্থিত। প্রায়বৃত্তের একটি বিন্দু কিরণকেন্দ্রের সবচেয়ে কাছে আর একটি বিপরীত বিন্দু সবচেয়ে দূরে। বিজ্ঞানীরা ইহাদিগকে পেরিহেল বিন্দু ও আফেল বিন্দু বলেন। পয়লা জানুয়ারীর কাছাকাছি পৃথিবী সূর্যের সবচেয়ে কাছে অর্থাৎ তাহার কক্ষের পেরিহেল বিন্দুতে এবং পয়লা জুলাইয়ের কাছাকাছি আফেল বিন্দুতে পৌঁছায়। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহের বেলা দেখা যায়, তাহাদের কক্ষের পেরিহেল ও আফেল বিন্দু দুইটির সূর্য হইতে দূরত্বের তারতম্য বেশী নয়। ফলে গ্রহগুলির কক্ষ মোটামুটি সাধারণ বৃত্তেরই মত, তাহারা সামান্য একটু বেশী চ্যাপ্টা। সূর্য হইতে ইহাদের দূরত্বের তারতম্য কখনও খুব বেশী হয় না বলিয়া ইহাদের চলার পথে গতিবেগের তারতম্যও কম। প্রত্যেকটি গ্রহই সূর্যপ্রদক্ষিণকালে মোটামুটি সমভাবেই সূর্যকিরণ পাইয়া থাকে। সূর্যশক্তি ভোগের বিশেষ তারতম্য ইহাদের হয় না। সৌর জগতে ইহারা সৌর কৃপাভোগী সুখী জীব। ধূমকেতুর ভাগ্যে কিন্তু ইহা ঘটে না।

সূর্যের আকর্ষণের ফলে ইলিপস্ বা প্রায়বৃত্তই একমাত্র সম্ভাব্য কক্ষ নয়। বলবিজ্ঞানের মতে ইলিপস্ ছাড়া আরও দুইটি গতিপথ সম্ভবপর। ইহারা ইলিপসের সহিত একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, গণিত শাস্ত্রে তাহাদের নাম পারাবোল্ ও হিপারবোল্। ইলিপস্, পারাবোল ও হিপারবোল লইয়া যে রেখাগোষ্ঠী হয় তাহাকে বলা হয় শঙ্কুচ্ছেদ। একটি মোচার মাথা কাটিলে একটি শঙ্কু পাওয়া যায়। এই শঙ্কুকে ঠিক আড়াআড়ি কাটিলে যে ছেদরেখা হয় তাহা একটি বৃত্ত। ঠিক আড়াআড়ি না কাটিয়া একটু বাঁকা কাটিলে যে ছেদ রেখাটি পাওয়া যায় তাহা একটি ইলিপস্। কিন্তু কাটিবার ছুরিটি যদি শঙ্কুর গায়ের সরলরেখার সমান্তরাল ধরিয়া কাটা যায় তখন ছেদ রেখাটির দুইটি দিক বিভক্ত থাকে। শঙ্কুটি যতই বড় হউক না কেন ছেদরেখাটির দুই দিক ইলিপসের ন্যায় কখনও যুক্ত হইবে না। সরলরেখার ন্যায় এই শঙ্কুচ্ছেদটি দুই প্রান্তে অসীম। ইহার নাম পারাবোল্। পারাবোলের ছেদ অপেক্ষা অধিকতর তির্যক ছেদও পারাবোলের মতই একটি বিযুক্ত রেখা। এই রেখাটির ধর্ম পারাবোল

হইতে বিভিন্ন। ইহার নাম হিপারবোল্। গ্রীক হিপার অর্থ অতিরিক্ত, বোল্ অর্থ ক্ষেপন; বাংলা তর্জমায় দাড়াইবে অপচ্ছেদ্। কিন্তু গ্রীক পণ্ডিতের ভাষাই আমরা ব্যবহার করিব। পারাবোল্ ও হিপারবোলের দুই পার্শ্ব বিযুক্ত এবং অসীম হওয়াতে কোন জ্যোতিষ্কের কক্ষ পারাবোল ও হিপারবোল বলিলে বুঝিতে হইবে যে, ইহা অসীম শূন্যের একদিক হইতে আসিয়া সূর্যকে বেষ্টন করিয়া আবার অসীম শূন্যে অপর এক দিকে চলিয়া যায়। ইলিপস্ রেখাটি যুক্ত বলিয়া ইলিপস্ পথে জ্যোতিষ্ক সূর্যকে ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করিতে থাকে।

ধূমকেতু সূর্যের নিকটে আসিলে ইহার গতি পর্যবেক্ষণ করিয়া ইহার কক্ষ গণনা দ্বারা স্থির করা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, এইরূপে নির্ধারিত বহু ধূমকেতুর কক্ষই পারাবোল। ইলিপস্-কক্ষে চলে এইরূপ ধূমকেতুও দেখা যায়। তাহারাই নির্দিষ্ট কাল পর পর আকাশে আমাদের নিকট ঘুরিয়া আসে। ১৯১০ সালে হ্যালির ধূমকেতু ৭৫ বৎসর পর আমাদের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছিল। এন্‌কের ধূমকেতুকে প্রায় পাঁচ বৎসর পর পর দেখা যায়। এইরূপ ধূমকেতুর কক্ষ গুলি এক একটি ইলিপস্। কিন্তু বহুক্ষেত্রেই ধূমকেতুর কক্ষগুলি দাড়ায় পারাবোল্, কোন কোন স্থলে হিপারবোল কক্ষও পাওয়া গিয়াছে। এই গণনা যদি সত্য হয় তবে ধরিতে হইবে সাধারণ ধূমকেতুগুলি সৌরজগত বহির্ভূত অসীম শূন্যের বস্তু। চলার পথে দৈবাৎ সৌরজগতের নিকটবর্তী হইয়া পড়িলে সূর্যের প্রবল আকর্ষণে ইহারা সৌরজগতে প্রবেশ করে ও সূর্যকে বেষ্টন করিয়া সৌরজগত ছাড়িয়া আবার অসীম শূন্যে ধাবিত হয়। কিন্তু এই পরিকল্পনার পরিপন্থী ঘটনাও আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বহু পর্যবেক্ষণের ফলে স্থির করিয়াছেন যে সূর্য সমুদয় গ্রহ-উপগ্রহ-মণ্ডিত সৌরজগতকে সঙ্গে লইয়া আকাশের একটি নির্দিষ্ট দিকে সেকেণ্ডে প্রায় ২০ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। ধূমকেতুগুলি যদি সৌরজোগত বহির্ভূত জ্যোতিষ্ক হয় তবে অধিক সংখ্যক ধূমকেতুকে সৌরজগতের পথের সম্মুখদিক হইতে সৌরজগতে প্রবেশ করিতে দেখা যাইবে। অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক ধূমকেতু যাহাদের গতিবেগ মোটামুটী সৌর জগতের গতিবেগকেও অতিক্রম করে তাহারাই মাত্র বিপরীত দিক হইতে সৌরজগতে প্রবেশ করিবে। কিন্তু ধূমকেতুগুলিকে আকাশের প্রায় সকলদিক হইতে সমান সংখ্যায় সৌরজগতে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। এইসকল কারণে এবং ধূমকেতুর কক্ষগণনা-পদ্ধতির সূক্ষ্ম বিচার করিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা স্থির করিয়াছেন যে সাধারণ ধূমকেতুর কক্ষগুলি বস্তুতঃ ইলিপস্‌ই, কিন্তু এত লম্বা বা চ্যাপ্টা ইলিপস্ যে এই ইলিপসের সূর্যের নিকটবর্তী অংশ একটি পারাবোল্ হইতে অভিন্ন। একটি বড় ইলিপস্‌কে টানিয়া ছিঁড়িয়া তাহার কিরণকেন্দ্রের নিকটবর্তী অংশকে একটি পারাবোলের অনুরূপ করা যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ধূমকেতুকক্ষের এই অংশটুকুই মাত্র পর্যবেক্ষণ করিতে পারেন। সুতরাং আপাতঃদৃষ্টিতে পারাবোল হইলেও সাধারণ ধূমকেতুর কক্ষগুলিকে বস্তুতঃ খুব লম্বা বা চ্যাপ্টা ইলিপস্‌ই মনে করিতে হইবে। অতএব ধূমকেতুগুলি সৌরজগতেরই অন্তর্ভুক্ত। ইহারা প্রকৃতপক্ষে সৌরজগত বহির্ভূত বস্তু নয়। যে সকল ধূমকেতুর কক্ষ এইরূপ লম্বা ইলিপস্ নয় তাহারাই আমাদের সুপরিচিত। কয়েক-বৎসর পর পর ইহাদের দেখা যায়। সাধারণ ধূমকেতুর লম্বা ইলিপস্ পথে প্রত্যাবর্তনকাল এত দীর্ঘ যে, তাহারা বহুশতবৎসর পর ফিরিয়া আসিলে তাহাদের কেহ চিনিতে পারেনা। পৃথিবীর লোক তাহাদিগকে নূতন অতিথি বলিয়াই মনে করে।

লম্বা ইলিপসের একটা পরিমাপ দরকার। প্রকৃতপক্ষে শঙ্কুচ্ছেদের ব্যাপকভাবে একটি পরিমাপ

পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি শঙ্কুর সরল ছেদ একটি বৃত্ত। তির্যক ছেদের কতকগুলি ইলিপ্স, একটিমাত্র পারাবোল্ আর অন্যগুলি হিপারবোল। এই ছেদগুলি বৃত্ত হইতে যত ভ্রষ্ট হয় তাহার পরিমাপকে শঙ্কুচ্ছেদের উৎকেন্দ্রমান (ইং eccentricity) বলা যাইতে পারে। এই হিসাবে বৃত্তের উৎকেন্দ্রমান শূন্য। ইলিপসের উৎকেন্দ্রমান শূন্য হইতে একের কম যে-কোন ভগ্নাংশ হইতে পারে। পারাবোলের উৎকেন্দ্রমান ঠিক, হিপারবোলের উৎকেন্দ্রমান ১ অপেক্ষা বড় একটি সংখ্যা। অপর দিকে ইলিপস্গুলি যত বেশী চ্যাপ্টা হয় তাহাদের উৎকেন্দ্রমানও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া ১ এর তত কাছে যায়। ইলিপসের মধ্যে যেগুলি খুব বেশী চ্যাপ্টা তাহাদিগকে অতিমাত্রায় উৎকেন্দ্রিক আর যেগুলি কম চ্যাপ্টা তাহাদের স্বল্পমাত্রায় উৎকেন্দ্রিক বলা যায়। গ্রহের কক্ষগুলি স্বল্পমাত্রায় উৎকেন্দ্রিক আর সাধারণ ধূমকেতুর কক্ষগুলি অতিমাত্রায় উৎকেন্দ্রিক। বস্তুতঃ ইহারা এত অধিকমাত্রায় উৎকেন্দ্রিক যে তাহাদের উৎকেন্দ্রমান প্রায় ১। সুতরাং পারাবোল বলিয়া তাহাদের ভুল করা মোটেই আশ্চর্য নয়।

অতিমাত্রায় উৎকেন্দ্রিক ইলিপস্পথে ভ্রমণ করে বলিয়া ধূমকেতুর জীবনযাত্রা যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়। দূরবীনের সাহায্যে যখন ধূমকেতুটি প্রথম আকাশে দেখা যায় তখন তাহা প্রায়ই পুচ্ছহীন ছোট একটি ধোঁয়াটে বস্তু মাত্র। এইরূপ একটি ধূমকেতু যখন সূর্যের নিকটবর্তী হইতে থাকে তখন তাহাকে ক্রমশঃই বড় দেখায়। কিছুকাল পরে সূর্যের সম্মুখীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং ইহার দেহ হইতে একটি সুন্দর পুচ্ছ সূর্যের বিপরীত দিকে আকাশে নির্গত হয়। এরূপ অবস্থায় ধূমকেতু ক্রমেই প্রবলতর বেগে সূর্যের দিকে ধাবিত হইতে থাকে এবং সূর্যের সান্নিধ্যে ইহার অবয়বও সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রথমতঃ পুচ্ছ ক্রমেই দীর্ঘতর হয় এবং সম্মুখে ললাটের উপর একটি সুন্দর উজ্জল তারকা ফুটিয়া উঠে। বস্তুতঃ এই তারকাটিকে ধূমকেতুর সম্মুখের গ্যাসীয় অবয়বের মধ্যেই দেখা যায়। এরূপ অবস্থায় ধূমকেতু তাহার কক্ষের পেরিহেল-বিন্দু অতিক্রম করে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সূর্য বেষ্টনেরও সমাপ্তি সুরু হয়। এইবার সূর্যকে পিছনে ফেলিয়া অনন্ত শূন্যপথে তাহার যাত্রা আরম্ভ হয়। সূর্যকে পিছনে ফেলিয়া যখন চলে তখনও তাহার পুচ্ছটিকে সূর্যের বিপরীত-দিকে দেখা যায়। মনে হয়, ধূমকেতু সূর্যের দিকে পশ্চাৎ না ফিরিয়া নিজেই ক্রমশঃ পিছন দিকে সরিয়া যাইতেছে। পশ্চাদপসরণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার গতি ক্রমশঃ মন্দ হয় পুচ্ছটিও ছোট হয়। কিছুকালের মধ্যে পুচ্ছটি সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় এবং দেহও অস্পষ্ট হইয়া উঠে। পরে দূরবীনের সাহায্যে তাহাকে পুনরায় শূন্যে মাত্র একটি ছোট ধোঁয়াটে বস্তু বলিয়া মনে হয়। ক্রমশঃ তাহাও লুপ্ত হইয়া যায়। পণ্ডিতেরা বলেন, পুচ্ছমণ্ডিত ধূমকেতুর সমুদয় সৌন্দর্যের কারণ সূর্যের সান্নিধ্য। তপনদেবই অন্তঃ-সৌরমণ্ডলের এই নবীন অতিথিকে নিজের কিরণ-স্রোতে প্লাবিত করিয়া ঐশ্বর্যশালী করিয়া তোলেন। অতি অল্প সময়েই ধূমকেতুর গৌরব-ময় জীবন শেষ হয়। তাহার পর সম্মুখে কেবল শৈত্য, অন্ধকার, মন্দগতি ও নিষ্প্রভ জীবন। আমরা কল্পনা করিতে পারি যে, ধূমকেতুটি আকাশে দূরবীনদৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া ক্রমশঃ সূর্যের বিপরীত-দিকে মন্দগতিতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। সূর্য হইতে অপসৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা সম্পূর্ণ শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। ধূমকেতুর কক্ষ অত্যধিক লম্বা অর্থাৎ অতিমাত্রায় উৎকেন্দ্রিক ইলিপস্ বলিয়া ইহাকে সূর্য হইতে বহুদূরে চলিয়া যাইতে হইবে। একটির পর একটি গ্রহের কক্ষ বা তদনুরূপ দূরত্ব অতিক্রম করিয়া শূন্যের গভীরতর প্রদেশে ইহা ক্রমশঃ প্রবেশ করিবে। সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণ সূর্যরশ্মি

হইতেও ক্রমশঃ বঞ্চিত হইয়া প্রবল শৈত্যময় শূন্যে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবে। এইরূপে হয়তো কয়েক শত বৎসর চলিয়া শীতে জমিয়া অতি মন্দগতিতে ক্লান্তদেহে ধূমকেতুটি অবশেষে তাহার ইলিপস্‌পথের অপর প্রান্তবিন্দু (আফেল বিন্দু) অতিক্রম করিবে। তাহার পর ধূমকেতুর আবার নবীন জীবন আরম্ভ। এখন হইতে ধূমকেতুটি আবার সূর্যের দিকে চলিতে থাকিবে। শতাধিক বৎসর সম্মুখে চলার পর সূর্যরশ্মিস্পর্শে ইহার আবার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইবে। গ্রহগুলি যে ইহাদের তুলনায় নিতান্ত সুখী জীব তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শূন্যের গভীরতম প্রদেশে যাতায়াত করিলেও ধূমকেতু সৌরজগতের বহিঃসীমা অতিক্রম করে না। কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে এই বহিঃসীমার পদার্থ-দ্বারাই ধূমকেতুর অবয়ব গঠিত। এই পদার্থ সৌর আকর্ষণের বশীভূত হইয়া নানা অবস্থান্তরের পর বিশাল পথ অতিক্রম করিয়া বহু বৎসর পর পর ধূমকেতুরূপে আমাদের দেখা দেয়।

কিন্তু শূন্যে ধূমকেতুর পথ মোটেই নিরাপদ নয়। সৌরজগতের নির্জন পথে গ্রহগুলিদ্বারা ইহারা প্রায়ই ধর্ষিত হয়। গ্রহগুলির কক্ষ অতিক্রম করিবার সময়টি ধূমকেতুর পক্ষে বড় সঙ্কটজনক। গ্রহের নিকটবর্তী হইলে তাহার আকর্ষণে ইহারা কক্ষচ্যুত হয়। কোন কোন স্থলে এরূপও হয় যে ইহারা অতিমাত্রায় উৎকেন্দ্রিক কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্রতর ইলিপ্‌স্‌ পথে চলিতে থাকে। এই ইলিপসের একদিকে সূর্য অপর দিকে ঐ গ্রহ। ধূমকেতুটি অনন্তর ইলিপস্‌ পথে উভয়কেই পরিক্রমণ করিয়া চলে, শূন্যের গভীরতর প্রদেশে তাহাকে আর প্রবেশ করিতে হয় না। আবার কখনও বা গ্রহের আক্রমণটি এরূপ ঘটে যে, ধূমকেতু স্বীয় দীর্ঘ ইলিপস্‌ পথ পরিত্যাগপূর্বক হিপারবোল পথে সৌরজগৎ পরিত্যাগ করিয়া চিরকালের জন্য অসীম মহাশূন্যে অন্তর্হিত হইয়া যায়। ধূমকেতু-ধর্ষণ বিষয়ে আকাশে বৃহস্পতির বড় দুর্নাম। বৃহস্পতি বৃহত্তম গ্রহ সুতরাং ইহার আকর্ষণ-শক্তিও প্রবল। প্রায় ত্রিশটি ধূমকেতুকে সূর্য ও বৃহস্পতি এই উভয়কে পরিক্রমণ করিতে দেখা যায়। ইহাদের পরিক্রমণকাল তিন হইতে আট বৎসরের মধ্যে। এই সময়ের মধ্যে এই ধূমকেতুগুলিকে বার বার আকাশে দেখা যায়। সম্ভবতঃ ইহারা সকলেই বৃহস্পতি দ্বারা ধর্ষিত। জ্যোর্বিজ্ঞানীরা ইহাদিগকে "বৃহস্পতি পরিবারের" ধূমকেতু বলেন। এইরূপ দুইটি ধূমকেতু লইয়া শনি পরিবার, আটটি লইয়া নেপচুন পরিবার, এবং দুইটি লইয়া ইউরেনাশ পরিবার। আমাদের সুপরিচিত হ্যালির ধূমকেতু নেপচুন পরিবারের অন্তর্ভূক্ত। ১৮৮৬ সালে ব্রুকস্‌ ধূমকেতু নামে একটি ধূমকেতু বৃহস্পতির অতি নিকট দিয়া যাইবার কালে এই গ্রহদ্বারা আক্রান্ত হয়। বৃহস্পতির প্রবল আকর্ষণে এই ধূমকেতুর কক্ষতো পরিবর্তিত হয়-ই পরন্তু ইহা দুই টুকরা হইয়া যায়। ১৮৮৯ সালে যখন ইহাকে আবার দেখা যায় তখন ইহা বস্তুতঃ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। ওই দুই অংশকে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইতেও দেখা গিয়াছিল। বৃহৎ গ্রহের পরিবারভুক্ত ধূমকেতুও নির্ভয়ে আকাশে চলিতে পারে না। অপর গ্রহগুলির পথে পড়িলে তাহারাও ইহাকে টানাটানি করিয়া কক্ষচ্যুত করিতে দ্বিধা করে না। এজন্য এইসকল ধূমকেতুর পরিক্রমণকালও সব সময় ঠিক একই থাকে না। সুতরাং ধূমকেতুর জীবন যে কেবল দুঃখময় তাহা নয়, ইহা বড়ই বিপদসঙ্কুল।

আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন, ধূমকেতুর অদ্ভুদ দেহের রহস্য কি? সূর্যের নিকটে আসিলে দেখা যায় যে, ধূমকেতুর মস্তক বা সম্মুখ অংশ একটি গ্যাসীয় বস্তুদ্বারা গঠিত। গ্যাসীয় অংশের সীমারেখাটি খুব সূক্ষ্ম না হইলেও দেখিতে মোটামুটি একটি দীর্ঘাকৃতি ইলিপসের সম্মুখদিকের ন্যায়। এই অংশকে বিজ্ঞানীরা বলেন 'কমা'। কমার মধ্যে উজ্জল তারার মত দেখিতে ধূমকেতুর একটি

বীজবিন্দু (nucleus) আছে। ধূমকেতুর দেহের এই বীজবিন্দুটিকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা দূরবীনের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। ধূমকেতু সূর্যের নিতান্ত সম্মুখে না আসিলে কোন কোন ক্ষেত্রে এই বীজবিন্দুটি দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার কতকগুলি ধূমকেতুর বীজবিন্দু মোটেই দেখা যায় না। কমা হইতে ধূমকেতুর সুন্দর একটি পুচ্ছ নির্গত হয়। পুচ্ছটি কমার নিকট একটু বেশী উজ্জল এবং ধূমকেতুর দেহের ইহাই বিশেষ ও দীর্ঘতম অংশ। কোন কোন ক্ষেত্রে এই পুচ্ছ বহু লক্ষ, এমনকি, বহুকোটি মাইলও দীর্ঘ হয়। দেখিলে মনে হয়, পুচ্ছটি সম্পূর্ণই ধূলিকণার মত অতি সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা গঠিত। বস্তুতঃ পুচ্ছের মধ্য দিয়া আকাশে ধূমকেতুর পিছনের তারাগুলি বেশ উজ্জলই দেখা যায়। পুচ্ছসহ ধূমকেতুর উজ্জলতা সকল সময় একই থাকে না। সূর্যের নিকটবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধূমকেতু ক্রমশঃ বেশী উজ্জল হয় এবং পেরিহেল-বিন্দু অতিক্রম করিবার সময় ছয় সাত ঘণ্টাকাল ইহার উজ্জলতা বহু গুণে বাড়িয়া যায়।

ধূমকেতুর পুচ্ছটি দেখিয়া মনে হয় ইহার মস্তক বা কমা নামক অংশ হইতে ধূলিকণার মত সূক্ষ্ম বস্তু কোন কারণে সূর্যের বিপরীত দিকে প্রক্ষিপ্ত হইতেছে এবং এই প্রক্ষিপ্ত কণাগুলি প্রায় সরলপথে শূন্যে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার জন্যই পুচ্ছের সৃষ্টি হইয়াছে। কথাটি প্রকৃতপক্ষেই সত্য। কোন কোন স্থলে পুচ্ছস্থিত কতকগুলি ছোট কুণ্ডলীকে দূরবীনের সাহায্যে পুচ্ছের শেষ দিকে ছুটিয়া চলিতে দেখা গিয়াছে। কুণ্ডলীগুলি যত বাহিরের দিকে চলে ততই তাহাদের গতিবেগ বাড়িয়া যাইতে দেখা যায়। এই ক্রমবর্ধমান বহির্মুখী গতিবেগের কারণ কিছু অস্পষ্ট। কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে ধূমকেতুর কমায় অবস্থিত পদার্থের কোন অজ্ঞাত বিকর্ষণশক্তির ফলে তাহার ধূলিবৎ ক্ষুদ্রকণাগুলি কমা হইতে নির্গত হইয়া প্রবলবেগে আকাশে ধাবিত হয়। যে সকল পুচ্ছ হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত সেগুলি খুব লম্বা। কেননা, হাইড্রোজান কণাগুলি খুব হালকা। যেগুলিতে অঙ্গারকণা বেশী সেই পুচ্ছগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু মোটা, আর যেগুলি ধাতুকণা দ্বারা গঠিত সেগুলির পুচ্ছ অংশ অতি সামান্য। কণাগুলির গতিবেগ যতই হউক না কেন একথা স্পষ্ট যে চলন্ত এঞ্জিন হইতে পশ্চাৎদিকে যে ধোঁয়ার রেখা বাহির হয় ধূমকেতুর পুচ্ছ সেপ্রকারের বস্তু নয়। মনে হয় ধূমকেতু যেন তাহার মাথা হইতে এই কণারূপী পদার্থ জোরে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেয়। এই বহিস্কৃত অংশ ক্রমশঃ আকাশে বিলুপ্ত হইয়া যাওয়াতে পুচ্ছদ্বারা ধূমকেতুর দেহের ক্ষয়ই হয়। কতকগুলি ছোট ধূমকেতু প্রায় পুচ্ছহীন। খুব সম্ভব এই ধূমকেতুগুলির কমায় সঞ্চিত কণাঅংশগুলি সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হইয়াছে। ধূমকেতুর পুচ্ছের অংশ যে ক্ষয় হয় তাহার চাক্ষুষ প্রমাণও আছে। ১৯১০ সালে যে হ্যালির ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল এই সালের ৪ঠা জুলাই তাহার পুচ্ছের এক অংশ ধূমকেতুর দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই বিচ্ছিন্ন অংশটিকে পরে কমা হইতে ক্রমেই দূরে চলিয়া যাইতেও দেখা গিয়াছিল। সুতরাং পুচ্ছ দ্বারা ধূমকেতু দেহের ক্রমাগত ক্ষয়ই চলিতেছে।

বিকর্ষণ মতবাদটি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করিতে নারাজ, কারণ জড়জগতে (জড়) আকর্ষণই দেখা গিয়াছে, বিকর্ষনের অভিজ্ঞতা কোন ক্ষেত্রেই হয় নাই। বরং তাহারা বিশ্বাস করেন যে, ধূমকেতুর পুচ্ছটির কারণ, আলোকের চাপ দেওয়ার ক্ষমতা। ইংরাজ পণ্ডিত ম্যাক্সওয়েল দেখাইয়াছেন যে, আলোক একটি তরঙ্গ বিশেষ। জলের উপর কোন একজায়গায় আলোড়ন উপস্থিত হইলে সেই শক্তি ঢেউয়ের আকারে চারিদিকে বিস্তৃত হয়। এই শক্তিবিস্তার বস্তুতরঙ্গের সাহায্যে ঘটে। আলোক-শক্তির বিস্তার কিন্তু বস্তুতরঙ্গ দ্বারা হয় না। আলোক তরঙ্গে তড়িৎ ও চুম্বক

শক্তি দুই-ই থাকে সুতরাং আলোকতরঙ্গকে তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গ বলা চলে। বস্তুতরঙ্গ না হইলেও আলোকতরঙ্গের বস্তুর উপর চাপ দেওয়ার ক্ষমতা আছে। ম্যাক্সওয়েলের মতবাদ হইতেই গণিতের সাহায্যে এই সিদ্ধান্তে পৌছান যায়। পরীক্ষাগারেও ইহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আলোকের চাপ খুব অল্প এবং সাধরণতঃ জড় আকর্ষণের তুলনায় এই চাপ নগণ্য। কিন্তু গণিতের হিসাবে দেখা যায় যে, বস্তু কণার ক্ষুদ্রত্বের দুইটি মাপ আছে। এই দুই মাপের মধ্যে যাহাদের আকৃতি সেই কণাগুলিতে জড় আকর্ষণ অপেক্ষা আলোকের চাপ অনেক গুণে বেশী দাঁড়ায়। ধূমকেতুর পুচ্ছের কণাগুলি যদি ঐ জাতীয় মনে করা যায় তবে সহজেই বোঝা যায় যে, কেন আলোকের চাপেই এই কণাগুলি ধূমকেতুর কমা হইতে বাহির হইয়া ক্রমবর্ধমান বেগে বাহিরের দিকে ছুটিয়া চলে। ক্রমে এই কণাগুলি পুচ্ছ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শূন্যে মিশিয়া যায়। ধূমকেতুর পুচ্ছ কেন সকল সময়েই সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকে তাহার কারণ এখন পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়। আলোর চাপই তাহার কারণ।

কমা বা ধূমকেতুর মস্তকে তারার ন্যায় যে বীজবিন্দুটি দেখা যায় তাহার গঠন অতি রহস্যময়। ধূমকেতুর আলোক বিশ্লেষণ করিয়া পাওয়া গিয়াছে যে, তাহাতে প্রথমতঃ সূর্যালোক আছে। ধূমকেতুর গায়ে সূর্যালোক প্রতিফলিত হওয়াই নিশ্চয় তাহার কারণ। তাহা ছাড়া বেগুনে (ভায়োলেট) রঙের আরও একটি আলোক পাওয়া যায় যাহা ধূমকেতুর নিজস্ব। এই আলোর উৎপত্তির ঠিক কারণ এখনও অজ্ঞাত। কোন কোন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে ধূমকেতুর কণাগুলি প্রথমতঃ সূর্য্যোলাক শোষণ করে, এবং পরে তাহারাই বেগুনি রঙের তরঙ্গ বিকিরণ করিয়া দেয়। ইহা ছাড়াও ধূমকেতুর আলোক বিশ্লেষণ করিয়া তাহার দেহে অঙ্গার ও অঙ্গার-সংবলিত যৌগিক বস্তু, যেমন কারবন্ মনক্সাইড, সাইনোজেন গ্যাস, নাইট্রোজেন গ্যাস, লোহ, সোডিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি ধাতব পদার্থের সন্ধানও পাওয়া গিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই, ধূমকেতুর আলোক কি তাহার নিজস্ব? কেহ কেহ মনে করেন, কমার মধ্যস্থিত তারাটির আলো তাহার নিজস্ব। কিন্তু এই আলো সূর্যের কিংবা তারার আলোর ন্যায় জলন্ত গ্যাস হইতে উদ্ভূত আলো নয়। কোন কারণে ঐ তারার পরমাণুগুলি হইতেই এই আলো নির্গত হয় এবং সূর্যালোকই পরমাণুগুলিকে এই কাজে উদ্দীপিত করে। ধূমকেতুর আলো প্রকাশ মাত্র, তাহাতে তাপ বা জ্বালা নাই।

ধূমকেতুর দেহ বিশাল হইলেও তাহার ওজন বা ভর অতি নগণ্য। কোন কোন উপগ্রহের সহিত বিশালকায় ধূমকেতুর সাক্ষাৎ হইতে দেখা গিয়াছে। তাহাতে ক্ষুদ্রকায় উপগ্রহের গতির কোনই পরিবর্তন হয় নাই। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, ধূমকেতু বিশালাকায় হইলেও তাহার ভর এত ক্ষুদ্র যে, তাহার জড়-আকর্ষণ ক্ষুদ্রকায় উপগ্রহেরও অতি সামান্য কক্ষবিচ্যুতি ঘটাইতে পারে না। ধূমকেতুর প্রকাণ্ড দেহ অতিমাত্রায় হালকা পদার্থে গঠিত। সুতরাং ধূমকেতুর সহিত পৃথিবীর সংঘর্ষণ হইলেও আমাদের কোন বিপদের আশঙ্কা তাহাতে নাই। ধূমকেতুটিরই ছিন্নবিছিন্ন হইয়া যাইবার কথা। দ্বিতীয়তঃ, ধূমকেতুর দেহে যে সাইনোজেন ও কারবন্ মনোক্সাইড্ গ্যাসের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এইগুলি বিষাক্ত। সুতরাং ধাক্কা দিয়া না মারিলেও বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগে আধুনিক সভ্যজগৎ সমাদৃত উপায়ে আমাদের মরবার আশঙ্কার কথা স্বতঃই মনে হয়। কিন্তু তাহার পরীক্ষাও হইয়া গিয়াছে। ১৯১০ সালের হ্যালির ধূমকেতুর পুচ্ছের এক অংশের সহিত তখন পৃথিবীর এককালে সাক্ষাৎ হয়। আমরা পুচ্ছের ঐ অংশের মধ্যদিয়া নির্বিঘ্নে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছি। বস্তুতঃ, পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন যে, ধূমকেতুর পুচ্ছ এত অতিমাত্রায় লঘু পদার্থে গঠিত

যে, তাহার অংশ বিষাক্ত বস্তু হইলেও এই নগণ্য-মাত্রার বিষ আমাদের কোন অনিষ্টই করিতে পারে না। ধূমকেতু হইতে কোন আশঙ্কার কারণ জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা খুঁজিয়া পান না।

ধূমকেতুর কমা বা সম্মুখের অংশও প্রকাণ্ড শিলা-ময় পদার্থদ্বারা গঠিত বলিয়া জ্যোর্বিজ্ঞানীরা মনে করেন না। তাঁহাদের মতে উল্কাজাতীয় খণ্ড পদার্থ লইয়া ধূমকেতুর কমা অংশের সৃষ্টি হয়। এই পদার্থ-খণ্ডগুলি কিছু বড় হইলেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন। অনেক সময় পৃথিবীতে রাত্রির আকাশে যে উল্কা বৃষ্টি হইতে দেখা যায় তাহা প্রকৃতপক্ষে ধূমকেতুরই ধ্বংসাবশেষ। ধূমকেতুর কমার মধ্যস্থিত অংশগুলি জড়-আকর্ষণের ফলে মোটামুটি একত্রিত অবস্থায়ই থাকে। গ্রহ উপগ্রহ কিংবা সূর্যের আকর্ষণ হেতু যদি তাহারা কখনও বিছিন্ন হইয়া পড়ে তবে তখনও তাহারা দলবদ্ধ উল্কাখণ্ড (কিংবা প্রস্তরখণ্ড) রূপে শূন্যে ইলিপস্ পথে সূর্য প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। এইরূপ দল পৃথিবীর কক্ষের সম্মুখীন হইলে উল্কাখণ্ডগুলি বাতাসের মধ্যে চলিতে চলিতে জ্বলিয়া উঠে। তাহা হইতেই রাত্রির আকাশে উল্কাবৃষ্টি হয়। এইরূপে কখনও কখনও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে লক্ষাধিক উল্কাপাত হইতে দেখা গিয়াছে। ১৮৪৬ সালে "বিয়েলার ধূমকেতু" নামক ধূমকেতুটি বৃহস্পতির আকর্ষণের ফলে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। একটির স্থলে দুইটি কমা ও দুইটি পুচ্ছের সৃষ্টি হয়। তাহার পর এই ধূমকেতুটিকে আর মোটেই দেখা যায় নাই। কিন্তু প্রতি বৎসর ২৫শে নভেম্বরের রাত্রিতে ঐ লুপ্ত ধূমকেতুর কক্ষ অতিক্রম করিবার কালে পৃথিবীর বুকে ঝাঁকে ঝাঁকে উল্কাপাত হইয়া থাকে।

এখন ধূমকেতুর একটি অভিযোগ আমাদের শুনিতে হইবে। পাঠকগণ তাহার সত্যাসত্য বিচার করিবেন। ধূমকেতুর অভিযোগ এই:—আমি আকাশের অতি নগণ্য পদার্থ। তোমরা বল আমি জ্যোতিষ্মানও নই. সূর্যের নিকট হইতে ধার করা আলোতে আমার সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলি। আমার দেহ বিশাল কিন্তু এত লঘু যে, এই প্রকাণ্ড দেহ সংযত ও সংরক্ষণ করিয়া রাখিবার শক্তিও আমার নাই। প্রবল প্রতাপান্বিত মার্তণ্ড দেবের কৃপা হইতে আমি বঞ্চিত। গ্রহগুলিকে সূর্যদেব কখনও নিজের নিকট হইতে বহুদূরে যাইতে দেন না। তাহারা সৌররশ্মি আকণ্ঠ পান করিয়া তৃপ্ত থাকে। প্রত্যেকটি গ্রহই প্রায় সমগতিতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। তাহাতে তাহাদের শ্রান্তি নাই, শীতাতপের বৈষম্যও নাই। বড় বড় গ্রহগুলিকে প্রকৃতি একাধিক সঙ্গী দিয়া তাহাদের নিঃসঙ্গতা দূর করিয়াছেন। তাহারা রজনীতে গ্রহগুলিকে জ্যোৎস্নায় প্লাবিত করিয়া জীবন কত মধুময় করিয়া তোলে। আমাকে কিন্তু শূন্যে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতে হয়। অতি অল্পকাল সৌরকৃপা ভোগ করিয়া জীবনের অধিকাংশই আমাকে শ্রীহীন অবস্থায় শূন্যের শৈত্যময় গভীরতর প্রদেশে নির্বাসনে কাটাইতে হয়। তখন ক্লান্তি ও অবসাদে আমার গতি শিথিল হইয়া পড়ে। তোমরা বল শূন্য অতি নির্জন স্থান। তাহার কোটি কোটি মাইল দূরে দূরে এক একটি গ্রহের বাস। কিন্তু এই নির্জন পথে চলিতেও আমার সমূহ বিপদ। ছোট বড় গ্রহ উপগ্রহ কাহারও পথে পড়িলেই তাহারা কেহই আমার উপর গুণ্ডামি করিতে দ্বিধাবোধ করে না। আকাশমার্গে এই ডাকাতির কোন প্রতিবিধান নাই। আমাকে ধরিতে না পারিলেও কখনও কখনও বড় গ্রহগুলি আমাকে তাড়া করিয়া সৌর জগৎ হইতে একেবারে বহিষ্কার করিয়া দেয়। তখন গভীর শূন্যে আমাকে চিরনির্বাসনে যাইতে হয়। আমার এই দুঃখময় জীবনের ক্ষুদ্র অংশমাত্রে সূর্যের সান্নিধ্যে যখন আমি নিজেকে সজীব করিবার অবকাশ পাই তখনই পৃথিবীর লোকেরা বলিয়া উঠে, অপদেবতার আবির্ভাব হইয়াছে। ইহার অপচেষ্টার অন্ত নাই; যুদ্ধ, মহামারী কিংবা অপঘাত মৃত্যু সন্নিকট। আমি শত শত বৎসরে একবার দেখা দিলেই তোমরা তোমাদের লোভ, হিংসা ও দ্বেষের সমুদয় কুফলের বোঝা আমার উপর চাপাইয়া দেও! সূর্যের সম্মুখীন হইবামাত্র সূর্যালোকের ঝড় আমার উপর দিয়া বহিয়া যায়। সে চাপ সহ্য করিবার ক্ষমতার অভাবে আমি ক্রমশঃই ক্ষয়প্রাপ্ত হই। আমার দেহের অংশ ছিন্ন হইয়া তখন আকাশে মিশিয়া যায়। সে আমার মৃত্যু যন্ত্রণা। তোমরা তখন সূর্যালোকভূষিত ধূমকেতুর পুচ্ছের গরব দেখিয়া মুগ্ধ হও—**The most unkindest cut of all**।

বিজ্ঞানের প্রচার

অমূল্যধন দেব

জানুয়ারী, ১৯৪৮ সংখ্যা 'আয়রণ এণ্ড ষ্টীল' পত্রিকায় (লণ্ডন) "Technical films" (টেক্‌নিক্যাল্‌ ফিল্মস্‌) নামে একটী নিবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সংবাদ বা তথ্য-প্রচার আমাদিগকে নূতন প্রেরণা জোগাইতে পারে, মনে করিয়া নিম্নে উহার সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। যে চারখানি টেক্‌নিক্যাল ফিল্ম বা যন্ত্র-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ছায়াচিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা এই। (১) পেটার্ন ফর প্রগ্রেছ—(ক্রম বিবর্ত্তনের নমুনা)—এই ছায়াচিত্রে কয়লা, খনিজপদার্থ ও চুণাপাথর হইতে ব্ল্যাষ্ট ফার্‌নেসে ও বিসিমার কনভার্টার এর সাহায্যে কি করিয়া লোহা তৈয়ার হয় এবং সর্বশেষে লোহার পাতকে কি করিয়া টিনএর দ্বারা আবৃত করা হয় তাহা দেখান হইয়াছে। বাজারে অনেক সময় যাহা 'টিন' নামে বিক্রয় হয়—যেমন ঢেউ টিন, কেরোসিন টিন—বস্তুতঃ তাহা টিন দ্বারা আবৃত লোহার পাত। এই চিত্রটি প্রস্তুত করিয়াছেন 'রিচার্ড থমাস এণ্ড বল্ডউইনস্‌, লিমিটেড,' ইহা দেখাইতে ৪৭ মিনিট সময় লাগে।

(২) এটমিক রিসার্চ—(আণবিক গবেষণা)—এই ছায়াচিত্রটি ৫ খণ্ডে বিভক্ত। যথা (ক) ১৮০৮ সালে ডেল্টন্‌ যখন আণবিক তথ্য প্রথম প্রতিপন্ন করেন তখন হইতে মেণ্ডেলিফ এর আপেক্ষিক মান (Periodic Table) পর্য্যন্ত। (খ) কেথোড্‌ রশ্মি, রঞ্জন রশ্মি, ধনাত্মক অনু পর্য্যন্ত। (গ) বেকারেল, কুরী-দম্পতির গবেষণা, রাদারফোর্ড এর আণবিক গঠন সম্বন্ধে উপপাদ্য ও এইস্‌ জি, মজলের গবেষণা। (ঘ) নিউট্রন এর আবিষ্কার, কক্‌রক্ট ও ওয়াল্টন কর্ত্তৃক ১৯৩২ সালে লিথিয়াম এর পরমাণু বিশ্লেষণ। (ঙ) ইউরেনিয়ামকে বিদীর্ণ করা ও আণবিক বোমার আবিষ্কার। উপসংহারে আণবিক শক্তির সম্ভাব্য শান্তিকালীন ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই চিত্রটী দেখাইতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগে। 'জি. বি, ইনষ্ট্রাক্‌সনেল' কর্ত্তৃক এই চিত্রটী তৈয়ার হইয়াছে।

(৩) থ্রু দি মিল—(কারখানার চলার পথে) —এই চিত্রে কি করিয়া টিউব (লোহার নল) তৈয়ার হয়, তাহাই দেখান হইয়াছে। লোহার পাত কাটা, উক্ত পাতকে গোল করিয়া বাকানো, ঝালাই করা, পরিষ্কার করা, উপরে রাং করা এবং পরীক্ষা করা ইত্যাদি।

(৪) উপরোক্ত চিত্রের সহায়ক হিসাবে নল এর বিভিন্ন কার্যকারিতা দেখান হইয়াছে। ইহা সবাক চিত্র, অর্থাৎ চিত্রের দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি বক্তৃতা দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই চিত্রগুলি প্রস্তুত করিয়াছেন 'ষ্টুয়ার্ট এণ্ড লয়েড্‌ লিমিটেড্‌' এবং ইহার স্পেনীয় এবং পর্তুগীজ সংস্করণ ও আছে।

যাহারা বিজ্ঞানের প্রচারে আগ্রহশীল, উপরোক্ত ছায়াচিত্রের কথা তাহাদিগকে বিজ্ঞান প্রচারের নূতন পথ খুঁজিতে সাহায্য করিবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে। নীরস বক্তৃতা বা পুঁথি অপেক্ষা চিত্রের সাহায্যে প্রচার মনস্তাত্তিক দিক্‌ হইতে বেশী সাফল্য লাভ করিবে, ইহা নিশ্চিত। সরকারী সাহায্যের আওতায় বা

পৃষ্ঠপোষকতায় এখন যে ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয় তাহা প্রধানতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই। সরকার যে প্রচার বিভাগের জন্য এত টাকা খরচ করিয়া চিত্র সংগ্রহ ও প্রদর্শন (বিনামূল্যে) করান, তাহার পিছনে বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্য আছে বলিয়া আমরা জানি না, প্রমাণও পাই নাই। সরকার যদি এ বিষয়ে মত পরিবর্তন করেন তবে দেশে বিজ্ঞান প্রচারের সহায়ক হইতে পারিবেন। আমাদের বিজ্ঞান পরিষদ এ বিষয়ে সরকারের নিকট পরিকল্পনা পেশ করিয়া দেখিতে পারেন, সরকার কতটুকু সহানুভূতিশীল।

রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলিয়াছিলেন যে "শিক্ষাকে কলের জলের মত বাড়ী পৌছাইয়া দিতে হইবে।" শিক্ষাকে যতদূর সম্ভব সহজবোধ্য, সরল ও অধিগম্য করাই বোধহয় তাঁহার উক্তির লক্ষ্য ছিল। ছায়াচিত্রের সাহায্যে ব্যবহারিক-বিজ্ঞান, যন্ত্র-বিজ্ঞান, তড়িৎ-বিজ্ঞানের প্রচার খুবই আকর্ষণীয় হইবে বলিয়া মনে হয়।

একটি বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে—যেন বিজ্ঞান প্রচারের উপলক্ষ করিয়া আত্ম-প্রচার বা ব্যবসায়ের প্রচার করা না হয়। আমাদের অজ্ঞানতার সুযোগে অনেক ক্ষেত্রেই তাহা হইতেছে। সম্প্রতি ইডেন উদ্যানে যে প্রদর্শনী হইতেছে তাহা কি জন-শিক্ষার জন্য, না যে ব্যবসায়ী কোম্পানীটি প্রদর্শনীর প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাদের ব্যবসার উন্নতির জন্য, তাহা একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ব্রিটীশ ইণ্ডাষ্ট্রীজ ফেয়ার যে পরিকল্পনা অনুযায়ী দেখান হয়, তাহার সঙ্গে এই প্রদর্শনীর কোনও মিল নাই। ইহাতে অলঙ্কারের দোকান, সাবানের দোকান এর মাঝে যান্ত্রিক কল কারখানার দোকানও রহিয়াছে। হ-জ-ব-র-ল। স্থাপয়িতা যেমন যত সম্ভব দোকান যে কোনও জায়গায় পরিকল্পনাবিহীনভাবে বসাইয়াছেন, দর্শকরাও তেমনি অলঙ্কার-এর দোকান এবং কলকারখানায় উৎপাদিত কল এর নমুনা সমান উদাস দৃষ্টিতেই অবলোকন করিতেছেন। দুই একটী কারখানা সংক্রান্ত দোকানে খোঁজ করিয়া জানিয়াছি যে, অনুসন্ধিৎসা নিয়া কচিৎ তাহাদিগকে প্রশ্ন করা হয়। দর্শকরা (মহিলারাও) শুধু চলার পথে চোখের চাহনি হানিয়াই চলিয়া যান। কলকারখানা সংক্রান্ত যাবতীয় দোকান যদি এক প্রান্তে রাখা হইত—যেমন সিনেমা, খেলা, তাহা হইলে যাহারা তথায় যাইতেন তাহারা অন্তরে অনুসন্ধিৎসার ভাব নিয়াই যাইতেন। কিন্তু প্রদর্শনী কর্তৃপক্ষ সেই রকম পরিকল্পনা করেন নাই। ১৯২৯ সালে পার্কসার্কাসে যে প্রদর্শনী হইয়াছিল—তাহাও খুব বিরাট ছিল—মহাত্মা গান্ধী তাহাকে "ফিলিস সার্কাস" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। বর্তমান প্রদর্শনী শেষ হইলে ইহার বিস্তারিত সমালোচনা হইবে আশা করি। পাটোয়ারী বুদ্ধি কি রকম ভাবে খাটানো হয় তাহার নমুনা "ডিস্‌কভারী অফ ইণ্ডিয়া" বই, অর্থাৎ পণ্ডিত জহরলালের পরিকল্পনা অনুযায়ী নৃত্য প্রদর্শন। যে সব নৃত্য দেখান হয় তাহা জহরলাল যদি বই না লিখিতেন তবুও নটনটীরা অর্থ উপার্জনের জন্য দেখাইতেন। জহরলালএর নাম লাগানো বা ভাঙ্গানো শুধু সস্তায় প্রচারের জন্য, লোকের দুর্বলতা বা মোহের সুযোগ গ্রহণ করার জন্য। "রাজবন্দীর জুতার দোকান," "বাঙ্গালীর পাঠার দোকান" এই সব পর্য্যায়ের প্রচারে আমরা অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। প্রচারের 'খারাপ' দিকটা সম্বন্ধে আলোচনা করার উদ্দেশ্য, যাহাতে প্রস্তাবিত বিজ্ঞান প্রচারের সময় উদ্যোক্তারা যথোচিত সতর্ক থাকেন।

বৃক্ষায়ুর্বেদ ফলং মনোহরং শাস্ত্রতঃ সিদ্ধম্

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন মজুমদার

যাদের অতীত ছিল গৌরবের তাদের ভবিষ্যৎ যে গৌরবান্বিত হবেই, সে বিষয়ে আমার নিজের কোন সন্দেহ নাই। আমরা বিজ্ঞানের সাধনায় পিছিয়ে আছি, তার সঙ্গত কারণও আছে। কিন্তু অতীতে আমরা ছিলাম এ বিষয়ে সকলের অগ্রণী। এখন পিছিয়ে থাকার হেতু আর নাই।

অতীতে উদ্ভিদ বিদ্যায় আমাদের বিজ্ঞানী পূর্ব-পুরুষ কতখানি এগিয়েছিলেন তার আভাস অতি অল্প কথায় এখানে দিতে চেষ্টা করব। যখনকার কথা বলছি সময় ও কাল বিবেচনা করলে দেখা যাবে সেটা যে-কোন জাতির পক্ষে গৌরবের বিষয় বলে বিবেচিত হতে পারে। অথচ উদ্ভিদ বিদ্যার ইতিহাস যারা লিখছেন ভারতবর্ষের দানের কথা তাঁরা স্বীকার করেন নি, বোধ হয় অজ্ঞতার জন্যেই। কিন্তু আমার কাছে আমাদের অতীত অবদানের মার্যাদা অনেকখানি। আমি আশা করি যে উদ্দেশ্য নিয়ে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমার কথা তার অন্তরায় না হয়ে সে উদ্দেশ্যের সহায়কই হবে, আর সেই বিশ্বাসেই বর্তমানকে বাদ দিয়ে উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে প্রাচীন ভারতের অবদানের পরিচয় দিতে বসেছি। যার অতীত আছে তারই না ভবিষ্যৎ!

'বৃক্ষায়ুর্বেদ ফলং মনোহরং শাস্ত্রতঃ সিদ্ধম্'—কথাটী খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে একজন বিজ্ঞানী উদ্যানরচক (horticulturist) 'উপবন বিনোদ' নামক একটী সংস্কৃত গ্রন্থ রচনার প্রারম্ভে লিখে গিয়েছেন। গ্রন্থখানি উদ্যান রচনায় উদ্ভিদ বিদ্যার প্রয়োগের প্রামাণিক গ্রন্থ, আমাদের অতীত গৌরবের একটী অকাট্য নিদর্শন।

উক্ত পাঁচটী কথার মধ্যে গাছপালা সম্বন্ধে কতখানি জ্ঞান তাঁদের ছিল তার পরিচয় পাই। বৃক্ষায়ুর্বেদ কথাটীর অর্থ কি? বৃক্ষের আয়ু সম্বন্ধে বেদ, অর্থাৎ যে বেদশাস্ত্র বা বিজ্ঞান বৃক্ষের জীবনী সম্বন্ধে সন্ধান দেয় সেইটাই বৃক্ষায়ুর্বেদ (Knowledge of plant life)। পরবর্তীকালে উদ্ভিদ পরিচয়ের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই বেদের আর একটী নাম দেওয়া হয়েছিল গুল্মবৃক্ষায়ুর্বেদ। হয়তো বৃক্ষ দিয়েই এই বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয়েছিল আমাদের দেশে, তারপর বোধ হয় অন্যান্য গাছপালার কথাও ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে এই বেদের চর্চার মধ্যে এসে পড়ে। কারন আমরা দেখি ঋগ্বেদে বৃক্ষ এবং বন একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যাঁরা এই বিদ্যা আয়ত্ত করতেন তাঁদের বলা হতো বৃক্ষায়ুর্বেদজ্ঞ, গুল্মবৃক্ষায়ুর্বেদজ্ঞ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে আমরা আরও জানতে পারি—এই বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বিষয় ছিল বীজ সংগ্রহ ও পরীক্ষা, অঙ্কুরোদ্গম, গাছের নানাপ্রকার কলম করা, গাছ রোপন, পোষন ও পালন করা, নানাপ্রকার জমি বা ক্ষেত্রের নির্বাচন; এমন কি গৃহপ্রাঙ্গণে, গৃহসংলগ্ন বাগানে কোন্ কোন্ গাছ কি ভাবে সাজিয়ে রোপন করতে হবে, সেটাও জানা উদ্ভিদবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এছাড়া গাছের জাতি, আকৃতি, বর্ণ, বীর্য, রস, প্রভাব ইত্যাদি ছাত্রকে হাতে কলমে পরীক্ষা করে নির্ণয় করতে হতো, জানতে হতো 'সম্যগববোধকৃত শ্রমোঽপি মুহ্যত্যবশ্যমনবেক্ষ'। এ সম্বন্ধে সন্দেহ করার অবকাশ পাই না, যখন দেখি জীবককে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র ক'রে ৪ যোজনের মধ্যে যত গাছপালা ছিল তাদের সংগ্রহ করে এনে তাদের জাতি নির্ণয় এবং গুণাগুণ বর্ণনা করতে হয়েছিল। জীবক রাজা বিম্বিসারের চিকিৎসক ছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়; খ্রীষ্টিয় শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার বহু

পূর্বেই আমাদের দেশে উদ্ভিদবিদ্যা বহু পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করছিল। আমি অন্যত্র দেখিয়েছি উদ্ভিদের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্বন্ধ আরম্ভ হয় নবপ্রস্তর যুগে—যখন সে বনজঙ্গল ছেড়ে ঘরবাড়ী বেঁধে কথঞ্চিৎ ভদ্রভাবে জীবন যাত্রা সুরু করে। বৈদিক যুগে এই সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ এবং প্রসারিত হয়েছিল, কারণ সুখসম্পদের জন্য গাছপালার দামের উপর তাদের নির্ভরতা বেড়েই চলেছিল। আর এই জন্য তাকে গাছপালার পরিচয় ও জীবন যাত্রা জানার ও জানিয়ে দেবার উপায়গুলি আয়ত্ত করতে হয়। প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় গাছপালার সংখ্যা যতই বেশী হতে লাগলো উদ্ভিদ সম্বন্ধে এই জ্ঞানের ততই প্রসার হয়ে চললো। উত্তরকালে এই জ্ঞানই সূত্রিত (Systematised) হয়ে বৃক্ষায়ুর্বেদে পরিণত হয়। বৈদিক সাহিত্যে (১৫০০—৮০০ খৃঃ পূঃ) এই জ্ঞানের ক্রমপ্রসারের বা বিকাশের ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। গাছপালার ঋণ অপরিশোধ্য মনে করেই বৈদিক ঋষি গাছপালাকে উদ্দেশ করে বললেন—ওগো সমগ্র মানবজাতির মাতৃস্বরূপিনী উদ্ভিদ, তোমাকে আমি অভিনন্দিত করি! (ঋঃ বেঃ ১০।৯৭।৪)।

'বৃক্ষায়ুর্বেদ ফলং'—উদ্ভিদবিদ্যা আয়ত্ত করে উদ্ভিদ সম্বন্ধে যে জ্ঞান পাওয়া গেল, সেই জ্ঞান কাজে লাগিয়ে মানব তার অনেক কিছু সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয়েছিল। তার খাদ্যোপকরণ শস্য, ঘর বাড়ী, আসবাব পত্রের উপাদান, তার শিল্প বাণিজ্যের পণ্যসম্ভার, তার প্রিয়জনকে সাজাবার প্রসাধন, তার উৎসবে, ব্যসনে দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবের নিত্য সঙ্গী হিসাবে সর্ব অবস্থায়, সর্বকালে কোন না কোন প্রকারে গাছপালার উপর তাকে নির্ভর করতেই হয়। বৈদিক ঋষিরা এই নির্ভরতা সম্যক উপলব্ধি করেই উদ্ভিদবিদ্যার অনুশীলন আরম্ভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে সেই জ্ঞানের ভিত্তিতেই ভারতবর্ষ সমসাময়িক জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছিল। সেই আসন যে ভারত আবার অদূর ভবিষ্যতে ফিরে পাবে সেটা কবিই বলে গিয়েছেন। বৃক্ষায়ুর্বেদ ফল সেটা সম্ভব করে তোলার সহায়ক হবে।

গাছপালা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে নিজের কাজে তাকে প্রয়োগ করে যে ফল পাওয়া যায় সেটা অপ্রীতিকর নয়—সেটা আনন্দদায়ক, মনোহর! একটা ফলের গাছ উৎপাদন করে তার প্রথম ফল পেলে কার মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে না ওঠে! বাগানে ফুলের গাছে একটা ফুল ফোটাতে পারলে কার প্রাণ না উল্লাসিত হয়! ফুল ফলে ভরা, নিজের হাতে গড়া, বাগানের সামনে দাঁড়িয়ে মনের অবস্থা উপলব্ধি করতে একবার চেষ্টা করুন। তাই না বিজ্ঞানী বললেন—বৃক্ষায়ুর্বেদ ফলং মনোহরং।

তবে অনেকেই বলবেন চাষী চাষ করে সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করেই, মালী ফুল ফলের বাগান করে গাছের জীবনযাত্রার নিয়মকানুন না জেনেই। কিন্তু সে কথা সত্য নয়। আমাদের উদ্ভিদ-বিদ্যা-বিজ্ঞানী এ রকম তর্ক উঠতে পারে অনুমান করেই বলবেন—না, "এটা চাষীর কিংবা মালীর নিজস্ব সাধারণ জ্ঞান নয়—সে এটা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। এই জ্ঞান শাস্ত্রতঃ সিদ্ধম্। বৃক্ষায়ুর্বেদের ফল, যার প্রয়োগ আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে করে থাকি,—সেটা বিজ্ঞানীর অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধ অর্থাৎ প্রতিপন্ন জ্ঞান।

আমাদের দেশে উদ্ভিদ সম্বন্ধে যে জ্ঞানের পত্তন ও ক্রমোন্নতির নিদর্শন আমরা বৈদিক ও তার পরবর্তী সাহিত্যে দেখতে পাই, তারই বিজ্ঞান দেখতে পাই বৃক্ষায়ুর্বেদ শাস্ত্রে। দেশের দুর্ভাগ্য হিসাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধনায় যে অন্তরায় এসেছিল আজ সেটা অপসারিত হয়েছে। আমরা আমাদের সেই লুপ্ত গৌরব আবার ফিরিয়ে আনবো। কবির স্বপ্নকে আমরা বাস্তব করে তুলবো।

পণ্যোৎপাদন বাড়াতে হলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা চাই

শ্রীপ্রমথ ভট্টশালী

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ এর সৃষ্টিই নাকি সাহিত্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু কোন্‌টা সত্য, শিব কাহাকে বলে, সুন্দরই বা কী, এ নিয়ে তর্কের অবসান আজও হ'ল না এবং যত মত তত পথ এই কথারই সার্থকতা প্রমাণ করার জন্যই হয় তো চিরকালই থাকবে। তেমনি সাহিত্য কী, এ নিয়েও মত-ভেদের অন্ত নেই। তবে সাহিত্য যেহেতু মানুষেরই সৃষ্টি সেইজন্য মানুষের গতির একটা ইঙ্গিত আমরা সাহিত্যে পাই। সাহিত্য সমাজ জীবনের আলেখ্য ঠিক না হ'লেও যে পরিবেশে সাহিত্য সৃষ্ট হয়, সে রেখে যায় সাহিত্যের উপর একটা ছাপ, সাহিত্যও তেমনি পরিবেশকে করে রূপায়িত।

বেঁচে থাকার প্রয়াস জীবনের ধর্ম। উন্নত জীব মানুষ সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকতে চায়। এরই চেষ্টায় সে সৃষ্টি ক'রে চলেছে কত না বেসাতি। আর এই সৃষ্টি প্রচেষ্টায় তার প্রয়োজন হয় নিয়ম ও শৃঙ্খলার। অন্তহীন এই বিশ্বে অবিরাম গতিতে চলেছে কোটী কোটী তারকা ও সূর্য কোন এক অজানার উদ্দেশ্যে। এই বিশ্বেরই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মানুষও চলেছে অন্তহীন পরিবর্তনের পথে। এই চলার পথে তার আজকের বেসাতি কাল হয়ে পড়ে অকেজো। কেজো-অকেজোর তখন লাগে দ্বন্দ। আগেকার শৃঙ্খলা শৃঙ্খল হয়ে অকেজোর হয় সহায়। দেহকে করে সে ক্লিষ্ট, মনকে পঙ্গু—সমাজ জীবনে আনে এক আলোড়ন, সাহিত্যে দেয় নবরূপ।

ভারতের সমাজ জীবনে আজ বুঝি বা সে আলোড়ন এসেছে। তাই বুঝি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে, জাতীয় সরকারের মন্ত্রীবর্গের বাণীতে, তথা মিল মালিকের ভোজ সভায় এই ধ্বনি ব্যক্ত হচ্ছে, 'উৎপাদন বাড়াও, নইলে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাবে।'

এই তো সেদিন পরাধীনতার শৃঙ্খল আমাদের পায়ে থেকে ঘুচেছে, এরই মধ্যে কী এমন অঘটন ঘটলো যে পরাধীনতার কঠিন নিগড়ে যখন আমাদের শরীর ও মন ছিল বাঁধা, তখন বদ্ধ হস্তে যে পরিমাণ পণ্য আমরা উৎপাদন করেছি আজ বন্ধন মুক্ত হ'য়েও তেমনটি কেন করতে পারছি না!

ভারতের দারিদ্র্য আজ আর অংক কষে কাউকে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু কেন এই দারিদ্র্য? বিদেশী শাসনই কী একমাত্র কারণ? একথা অবশ্য স্বীকার্য যে বিদেশী শাসনের ফলে বৈদেশিক ঋণের সুদ বাবদ ও এদেশে নিয়োযিত বিদেশী মূলধনের মুনাফার দরুণ এদেশে সৃষ্ট সম্পদের এক বৃহৎ অংশ প্রতিনিয়ত বাইরে চলে যাচ্ছিল। স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই কিন্তু কেবল যে বিদেশী ঋণের অধিকাংশই পরিশোধ হয়ে গেছে তাই নয়, পূর্বের ঋণদাতা আজ ঋণগ্রহীতায় পরিণত হয়েছে। বিদেশী মূলধনও আজ বিলুপ্তপ্রায়। এর ফলে কোনরূপ বিনিময় ব্যতীত যে সম্পদ দেশের বাইরে চলে যেত তা' আজ আর যাচ্ছে না। তাতে দারিদ্রের কতকটা তো উপশম হওয়া উচিত ছিলো,

---

জামসেদপুর চলন্তিকা-সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জামসেদপুর বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে (১৯৪৮) পঠিত।

কিন্তু আমাদের অনুভূতি তো তা নয়। কেন এই বিপরীত অনুভূতি? অর্থাভাব? কিন্তু আমরা দেখছি অর্থের কিছু ছড়াছড়িই আজ রয়েছে। ১৯৪০-এর ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে দুই শত আটান্ন কোটি উনষাট লক্ষ টাকার নোট এদেশে চালু ছিল, আর ১৯৪৭-এর ঐ তারিখে তা' দাঁড়িয়েছে ১২৫৮ কোটীতে। দেখা যাচ্ছে, ১৯৪০ এ যে পরিমাণ অর্থ লোকের হাতে ঘুরছিল আজ তার পাঁচগুণেরও বেশী হাত ফেরতা হচ্ছে। অনেকেই বল্‌বেন্‌ এই কাগজের নোটই যত সর্বনাশের মূল। তাদের মতে এই কাগজের নোটের পেছনে যদি যথোপযুক্ত সোনা থাক্‌তো তা'হলে এই হাহাকার উঠতো না। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন' গল্পের ছড়া—

"পায়ে ধ'রে সাধা
রা নাহি দেয় রাধা
শেষে দিলো রা
পাগোল ছাড়ো পা।"

ও তার মর্মোদ্ধার করে পৃথিবীর গহ্বরে লুক্কায়িত অতুল স্বর্ণ ঐশ্বর্য্য পাওয়ার জন্য গল্পের নায়ক গৃহস্থ মৃত্যুন্‌জয় ও তার সন্ন্যাসী কাকা শংকরের কি অমানুষিক চেষ্টা। তারপর যখন সে স্বর্ণ ঐশ্বর্য্য মৃত্যুন্‌জয়ের হস্তগত হলো অথচ তার বিনিময়ে তার ভোগের তুচ্ছতম বস্তু হ'লো দুর্লভ, তখন সেই স্বর্ণ ঐশ্বর্য্যই হ'লো মৃত্যুন্‌জয়ের আতঙ্কের কারণ। দেখা যাচ্ছে প্রয়োজন মিটাতে না পারলে আমাদের নোটের তাড়া ও মৃত্যুন্‌জয়ের সোনার তাল উভয়ই তুল্যমূল্য। এর অন্তর্নিহিত সত্য এই যে, কাগজের টাকাই হোক কিংবা স্বর্ণমুদ্রাই হোক উহা পণ্য বিনিময়ের বাহক মাত্র, অর্থাৎ সম্ভাব্য ক্রয় ক্ষমতার নির্দেশক। তাই টাকা বেশী থাকা বা কম থাকা তুলনা-মূলক ব্যাপার। অর্থাৎ বিক্রয় উপযোগী পণ্যমূল্য হ'তে টাকার পরিমাণ বেশী না কম। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে খাদ্য ও বস্ত্রের স্থান অতি উচ্চে। এই দুই সম্পদের ১৯৪০-৪১ সরবরাহের সহিত আজকের তুলনা করলে দেখা যাবে—আজকের সরবরাহ বিশেষ কম নয়। ১৯৪০-৪১ এ চাউল ও গম উৎপন্ন হয় প্রায় ৩৫ কোটী টন, বস্ত্র উৎপন্ন হয় ৬৫০ কোটী গজ। এর থেকে মশারী হাসপাতালের ব্যাণ্ডেজ, ক্যানভাস্‌ প্রভৃতি বাদ দিলেও মাথাপিছু প্রায় ১২ গজ সরবরাহ হয়ে থাকে।

তবু কেন এই হাহাকার রব? ব্যাপার এই যে, যুদ্ধের প্রয়োজন মিটাবার জন্য প্রায় অগণিত লোক এমন কাজে নিযুক্ত হয় যা মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজনের উপযোগী পণ্য সৃষ্টি করত না, করত রাস্তাঘাট, যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম। শ্রমের বিনিময়ে কিন্তু তারা ক্রয়ক্ষমতার নির্দ্দেশক নোটের মালিক হলো। এই সব লোক আগে ছিলো বেকার। ১৯৪০-৪১ এর খাদ্য বস্ত্রের ক্রেতা এরা ছিলো না। ১৯৪৩ হ'তে এই নব্য ক্রেতার দল বাজারে দেখা দিলো। অর্থাৎ একই পরিমাণ খাদ্যবস্ত্রের ক্রেতার সংখ্যা হলো অনেক বেশী, তাই যারা আগে ৫০ গজ কাপড় ব্যবহার করতো তাদের ভাগেও পড়লো সেই মাথাপিছু ১২ গজ। যারা আগে দিন কাটাতো বছরে ৯ মাস ভুট্টা, ছোলা, সমরখন্দ আলু খেয়ে, তারাও চাউল গমের দাবিদার হওয়ায় যারা আগে ভরপেট খেত তাদের ভাগ হ'লো হ্রাস। অর্থাৎ উৎপন্ন পণ্যের পরিমান কোনো দিনই আমাদের প্রয়োজনের উপযোগী ছিলো না,— এই অর্থনৈতিক সত্য যা এতদিন আমাদের অগোচরে ছিলো, আজ তা' রুদ্ররূপে দেখা দিয়েছে। কাজেই যখন বলা হয় পণ্যোপোদন বাড়াও, নইলে জীবনযাত্রা-প্রণালীর উন্নতি সাধন সম্ভব নয়, অর্জ্জিত স্বাধীনতাও হয়তো টিক্‌বেনা, তখন দ্বিমত করার কিছু থাকে না। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে—কোন্‌ কোন্‌ পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে? দেশরক্ষা শিল্প ব'লে পরিচিত যে সব শিল্প, কেবল তাহাই কী বিদেশী আক্রমণ

হ'তে আমাদের রক্ষা করতে পারবে? যে প্রণালীতে আজ পণ্যোৎপাদন হয়, তাহাই কী বৃদ্ধির পক্ষে শ্রেষ্ঠ পন্থা? পণ্য বিতরণ অর্থাৎ স্বল্পমূল্য নির্দ্ধারণের যে মান আজ আছে তাহাই কী যথোপযুক্ত উৎসাহব্যঞ্জক? সর্বশেষের প্রশ্ন এই যে, স্বাধীনতা লাভের পর উৎপাদনের এই যে হ্রাস—এরই জন্য বা দায়ী কে?

উৎপাদন হ্রাস রোধ করা তথা উৎপাদন আরোও বাড়াবার জন্য উপদেশ দেওয়া ও ভয় দেখান হচ্ছে দেশের অজ্ঞ শ্রমিকগণকে। নাই নাই বলতে সাপের বিষও থাকে না, প্রবাদ প্রচলিত আছে আমাদের দেশে। অর্থাৎ একটা মিথ্যা কথা বারবার বল্‌লে তা সত্য বলে প্রতীয়মান হয়, উৎপাদন হ্রাসের জন্য শ্রমিকরাই কেবল দায়ী এবং শ্রমিকরা ইচ্ছা করলে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে, এই কথা যাচাই করার সময় হয়েছে।

উৎপাদন বৃদ্ধি বা হ্রাসের সঙ্গে উৎপাদন প্রণালী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যে প্রণালীতে আজ দেশে পণ্যোৎপাদন হয় তাহাতে উৎপাদন যন্ত্র বা জমির মালিক, ব্যক্তি—জাতি নয়। এই প্রথায় উৎপন্ন পণ্যের মূল্যের কতকাংশ পায় শ্রমিকেরা, কতক অংশ যন্ত্রপাতির ক্ষয় পূরণের জন্য বিনিয়োগ হয়। বাকীটা মুনাফা হিসাবে মালিক নিজে রাখেন। এই মুনাফার কতকাংশ তিনি নিজে ভোগ করেন এবং অপরাংশ তিনি নূতন শিল্পে বিনিয়োগ করেন। কাজেই এই প্রথায় পণ্যের উদ্বৃত্ত মূল্যের নিয়ন্ত্রণ করেন ব্যক্তি, জাতির সমষ্টিগত বুদ্ধি এই ব্যাপারে সাহায্যের অবকাশ পায় না। এই প্রথাই পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে শ্রেষ্ঠ কি না সে সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদ, শিল্পপতি ও শ্রমিক নেতাদের মধ্যেই যে কত ভেদ আছে তা নয়, জাতীয় সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যেও রয়েছে। Indian Finance নামক সাপ্তাহিক কাগজখানি অর্থনীতি জগতের অন্যতম বিশিষ্ট মুখপত্র। কোনো বামপন্থীদলের সহিত তার যোগ আছে, এই অপবাদ কেহ দিতে পারবে না। উৎপাদন প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে Indian Finance ১০।১।৪৮ সংখ্যায় নিম্নলিখিত মন্তব্যসমূহ করেছে :—

"The Spokesmen of Government often speak in more or less discordant voices. Those discords are in striking contrast to the unity of the source of Governmental power and the monolith character of the Congress as a Politcal organisation. The public are no doubt well acquainted with the cleavage of opinion amongst the high command on questions of social and economic reconstruction. The Deputy Prime Minister speaks at every function as if the placating of private enterprise is the highest priority in the programme of to-day." জাতীয় সরকারের অন্দরমহলে এই যে সিদ্ধান্তের অভাব তা' জাতীয় অগ্রগতিকে ব্যাহত করে কী না সে কথা সুধিগণ বিচার করবেন। কিন্তু আজও যে উৎপাদন প্রণালী চালু রয়েছে তার বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে যে, এই প্রণালীতে মূল উৎপাদক শিল্পপতিগণ। ১৯৪৫ হ'তে ১৯৪৬ এ কিঞ্চিদধিক ৩৫ কোটী গজ কম কাপড় উৎপন্ন হয়।

"Indian Finance এর ১৯৪৭ এর বার্ষিক সংখ্যায় ১৬॥ কোটী গজ বস্ত্র উৎপাদন হ্রাসের কারণ দেখান হয়েছে—শ্রমিক ধর্মঘট, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শ্রমিকের অভাব ও শ্রমিকদের সাধারণ অনুপস্থিতি। জানা থাকা ভালো, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা এই অনুপস্থিতির কতকটার জন্য দায়ী। কাজেই দেখা যাচ্ছে শ্রমিকদের দায়ীত্ব অর্দ্ধেকেরও কম। বাকীটার জন্য দায়ী কে? এই সম্বন্ধে আলোচনা করতে

"Indian Finance" ২৪।১।৪৮ তারিখে মন্তব্য করেছে—"Of this lack of will to work, both capital and labour may be said to be more or less equally guilty."

সরকারের "Textile Control Board" এর Industrial Committee (যার অধিকাংশ সদস্য শিল্পপতিগণ) নিজেরাই ১৯৪৬ এর বস্ত্রোৎপাদন হ্রাস সম্বন্ধে নিম্নে লিখিত কারণগুলি দেখিয়েছে।

১। মূল্য নিয়ন্ত্রণ কাজে লাগাবার জন্য সরকারের যথোপযুক্ত সংগঠনের অভাব।

২। বিভিন্ন মিলের বয়স ও যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা সমান নহে, অথচ সমস্ত মিলকে একই পরিকল্পনার অঙ্গ করা হয়েছে :—

৩। শ্রম মূল্যের অসমতা।

৪। বস্ত্রের অসম মূল্য নির্ধারণ।

Indian Finance" এর ১৯৪৭ এর বার্ষিক সংখ্যায় বস্ত্রবয়নশিল্পের প্রবন্ধের লেখক নিম্নলিখিত কারণগুলি দেখিয়েছেন :—

১। যুদ্ধকালে মিলসমূহে যে অতিরিক্ত কাজ হয়েছে তদ্দরুণ মিলের কার্যকারিতার হানি।

২। কাঁচা মাল, কয়লা ও অন্যবিধ সরঞ্জামের সরবরাহের অভাব।

৩। শ্রমিকদের সাপ্তাহিক কাজের সময় ৫৪ ঘণ্টার স্থলে সরকার কর্তৃক ৪৮ ঘণ্টা করা।

৪। ধর্মঘট ইত্যাদি।

এই তিন নম্বরের কারণটা আর একটু তলিয়ে দেখা দরকার। কারখানা-আইন অনুযায়ী সপ্তাহে একদিন ছুটি পেলে সাপ্তাহিক ৫৪ ঘণ্টা মানে বাকী ছয়দিন দৈনিক ৯ ঘণ্টা হিসাবে হ'তো, অথবা সপ্তাহে ৫ দিন ১০ ঘণ্টা হিসাবে ও একদিন ৪ ঘণ্টা হিসাবে কাজ হ'তো। এই নিয়মে প্রতি মিলে দুই দল কাজ করতে পারে। এই দুই দলে দিনে ১৮ হ'তে ২০ ঘণ্টা কাজ করলে বাকী ৪ ঘণ্টা বা ৬ ঘণ্টা মিল বন্ধ থাকে। সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা ও একদিন ছুটিতে প্রতি শ্রমিককে দিন ৮ ঘণ্টা কাজ করতে হবে। এতে কিন্তু ছুটির দিন বাদ দিয়ে বাকী ৬ দিন ২৪ ঘণ্টা মিল চালু রাখা সম্ভব। ২৪ ঘণ্টা মিল চালু থাকলে এই সব মিল আগে থেকে ⅓ অংশ বেশী বস্ত্র উৎপাদন করতে পারে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট চেয়েছিলেন তাই। বোম্বাইয়ের মিল-মালিক সমিতিও রাজী ছিলো। এই থেকে এই প্রমাণ হয় যে দৈনিক আরোও ৪ বা ৬ ঘণ্টা মিল চালু রাখলে মিলের ক্ষতির আশঙ্কা মালিকগণ করেন নি। কিন্তু কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের এই যুক্তিসঙ্গত অনুরোধে বাধা দিলেন বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট তথা আমেদাবাদ শ্রমিক সংঘ। বোম্বাইয়ের শিল্প ও শ্রমিকসচিব শ্রীগুলজারীলাল নন্দ আমেদাবাদ শ্রমিক সংঘেরই ভূতপূর্ব সম্পাদক। আর এও জেনে রাখা ভালো, আমেদাবাদ শ্রমিক সংঘ কোনো বামপন্থী দলের আওতায় কোনোদিন আসে নি।

আমাদের এই সহরের লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের দিকে তাকালেও এই অদ্ভুত যোগাযোগ দেখা যাবে। ১০৪৬এ Scobএর কারখানা ৫ মাস ধর্মঘটের জন্য বন্ধ থাকে। অর্থাৎ ১৯৪৬এ Scobএর উৎপাদন ক্ষমতা ১২ ভাগের ৫ ভাগ কমে যায়। এই ধর্মঘট যাহারা পরিচালনা করেন আমেদাবাদের শ্রমিক সংঘের সহিত তাদের নাড়ীর যোগ রয়েছে। টাটা শ্রমিকের নেতৃত্বও তাদেরই হাতে। টাটার শ্রমিক চাঞ্চল্য সুরু হয় ১৯৪৬এ, ১৯৪৭এ এই চাঞ্চল্যের প্রকোপ খুব বৃদ্ধি পায়। এতটা বৃদ্ধি পায় যে এই কারণেই নাকি উৎপাদন হ্রাস হয় শতকরা ৪০ ভাগ। এই সময়েই ইস্পাতশিল্প মূল্যবৃদ্ধির দাবী সরকারকে জানায়। ১৯৪৮এর প্রথম ভাগে সরকার এই দাবী বহুলাংশে পূরণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সময় হতেই উৎপাদন আবার বৃদ্ধির দিকে যেতে সুরু করে। এই সম্পর্কে "Indian Finance"এর লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধের নিম্নলিখিত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :—

Delay (by Govt) in agreeing to the

representation of the industry for an increase in prices has retarded production."

শিল্পপতিগণের মূল্যবৃদ্ধির দাবী কতটা যুক্তি-সহ তাহা নিঃস্বার্থপর অর্থনীতিবিদগণের দ্বারা যাচাই হওয়া প্রয়োজন। "Indian Finance"-এর ২৪।১।৪৮ তারিখের মন্তব্য এই—

All available evidence only tends to build up a strong prima-facie case against the contention of Industry that profit margin has been narrow."

উৎপাদন হ্রাসের জন্য অজ্ঞ শ্রমিক চাষীকে দোষ দেওয়া সহজ। কিন্তু তা' ক'রে উৎপাদন সমস্যার সমাধান হয় না।

পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করে' মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি হয়তো সম্ভবপর হ'তে পারে। তা'তে যে পণ্যের মুনাফা বেশী হওয়ার সম্ভাবনা তারই উৎপাদন হবে, কিন্তু যে কোনো পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করলেই জীবনযাত্রার মান যে উন্নততর হয় না, যুদ্ধকালীন উৎপাদন বৃদ্ধিই তার প্রমাণ।

মানুষের মত বাঁচতে হ'লে প্রত্যেকেরই একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য, যথোপযুক্ত বস্ত্র, সুপরিবেশে তৈরী গৃহ ও মনের প্রসারের উপযোগী শিক্ষা ও অসুখ-বিসুখে সুচিকিৎসার প্রয়োজন। মানবজীবনের এই যে দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য সমগ্র জাতির উপযোগী তাহা উৎপন্ন হ'লে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির তাঁহা ক্রয়ের ক্ষমতা থাকলেই জীবনযাত্রার মান উন্নততর হ'তে পারে।

উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হ'লে প্রথমেই উৎপাদন পরিকল্পনার মূল নীতি স্থির করতে হ'বে। উৎপাদনের উদ্দেশ্য মুনাফা অথবা দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা প্রত্যেকের জীবনযাত্রা প্রণালীর উন্নতি সাধন। দেশ-রক্ষার জন্যও উৎপাদনের প্রয়োজন আছে, কিন্তু দেশ-রক্ষার শিল্প ব'লতে যে সব শিল্প বোঝায় কেবলমাত্র তা'দেরই প্রসারে যে শেষ পর্যন্ত দেশ রক্ষা সম্ভব নয়—জার্ম্মানী তা'র জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। দেশ-রক্ষা শিল্পের মূল, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। গত মহাযুদ্ধের প্রাক্‌কালে সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে যে পরিমাণ ইস্পাত প্রস্তুত হ'ত জার্ম্মাণীতে হ'ত তার দেড় গুণ। কেবল তাই নয়, সৈন্য ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামে একক দেশ হিসাবে জার্ম্মাণ-প্রস্তুতির তুলনা ইতিহাসে মেলা ভার। অথচ আজ সেই জার্ম্মানী ধূলায় ধূসর, আর বৃটেন আজও টিকে আছে। দেশ-রক্ষা মানে দেশবাসী মানুষের রক্ষা—যা'তে দেশবাসী প্রত্যেক ব্যক্তি তা'র দেহ ও মনের প্রসার করতে পারে বিনা বাধায়। যে উৎপাদন প্রণালী তা'র দেহ-পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করবে না, তার সহজ স্বাধীনতা করবে ব্যাহত, মনের প্রসারে দিবে বাধা, তাহা জনকয়েক লোকের মুনাফা সৃষ্টি করতে পারে,—জনকয়েক লোককে তা'দের নাম ইতিহাসের পাতায় এঁকে রাখবার সাহায্য করতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানুষ ঐ উৎপাদনের প্রবর্ত্তক, নেতা বা গভর্ণমেণ্টকে মেনে চলে না শেষ পর্যন্ত। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর নজীর রয়েছে। এই প্রসঙ্গে জাতীয় গভর্ণ-মেণ্টের অন্যতম মন্ত্রী বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ডাঃ মাথাইএর দিল্লীর রোটারী ক্লাবের বক্তৃতাংশ মনে পড়ে:—It is the well-known lesson of history that popular revolutions tend to be utilised by the rich for their own benefit. Indian-Demos has to guard against being overtaken by a similar fate.

আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষার অজুহাতে অর্থনৈতিক জগতের রাস্তাঘাট সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে expert বলে পরিচিত ব্যক্তিগণ যাতে আমাদের বিপথে চালাতে না পারে, তার উপায়, উৎপাদন পরিকল্পনার মূলনীতি নিম্ন-লিখিত সমীকরণের ভিত্তিতে স্থাপিত কিনা তা' যাচাই করে দেখা।

দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মোট পরিমাণ—প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন × সমগ্র জন সংখ্যা।

এই পরিমাণ Consumer goods প্রস্তুত করতে যে পরিমাণ আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হ'বে তার আমদানী ও প্রস্তুতি এবং কাজে যত সংখ্যক শ্রমিক প্রয়োজন হবে—সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তি হ'তে সেই সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে। বাকী লোক Non Consumer goods উৎপাদনে ও Service personel-এ নিয়োগ করা চলবে। আদর্শে পৌছবার পূর্বে এই সমীকরণ ঠিক রাখতে হবে।

Total value of consumer goods
— Purchasing power of producers of consumer goods
+ Producers of non-consumer goods
+ Service personel.

Consumer goods-এর প্রধান অংশ অন্ন ও বস্ত্র। অন্ন মানে পুষ্টিকর খাদ্য। বোম্বাই পরিকল্পনায় ২৮০০ কালরী পুষ্টিকারক খাদ্য প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন ধরা হয়েছে। অনেকের মতে উহা নিম্নতম প্রয়োজন ৩২০০ কালরী হ'লে ভালো হয়। নিম্ন-লিখিত খাদ্যতালিকায় ২৬০০ কালরী আছে।

চাউল বা গম—৮ ছটাক বা ১ পাউণ্ড। তৈল জাতীয় ½ ছটাক। ডাল ১½ ছটাক। চিনি ১ ছটাক। শব্জী ৩ ছটাক। দুধ ৪ ছটাক বা ডিম মাছ, মাংস ৬ ছটাক ও ফল।

এই হিসাবে চাউল ও গম জাতীয় খাদ্যের মোট প্রয়োজন প্রায় ৪'৫ কোটী টন। ১৯৪০-৪১এ মোট চাউল উৎপন্ন হয় ৩'৫ কোটী টন।

মোট ডালের প্রয়োজন ৮০ লক্ষ টন।

মোট চিনির পরিমাণ প্রায় ২½ কোটী টন।

১৯৪০-৪১এ এদেশে প্রস্তুত হয় ১ কোটী ১৩ লক্ষ টন।

খাদ্যতালিকার অবশিষ্ট কয়টির উল্লেখ না করলেও বুঝতে কষ্ট হ'বে না যে, একমাত্র খাদ্য খাতেই দেশকে শুধু স্বাবলম্বী করতে হলে কি পরিমাণ মূলধন নিয়োগ ও কৃষিপ্রথার কি আমূল পরিবর্ত্তন করতে হবে।

কাপড়ের হিসাবে আমরা দেখেছি বর্ত্তমান উৎপাদন ক্ষমতা মাথাপিছু ১২গজ। যে সমস্ত মিল ২৪ ঘণ্টা চালাবার উপযুক্ত সেগুলোকে পুরো চালালে বর্ত্তমান উৎপাদন শক্তিতে মাথাপিছু ১৪।১৫গজের বেশী উৎপাদন সম্ভব নয়। বছরে ১৪।১৫গজ মানে ২ খানা ধুতী বা শাড়ীর উপর সামান্য কিছু বেশী। বলা বাহুল্য, এতে ভদ্রভাবে থাকা চলে না। মাথাপিছু ৪৫গজ করতে হ'লে সমগ্র ভারতে আজ যত মিল আছে তার ত্রিগুণ বৃদ্ধি করতে হবে।

বিজ্ঞান আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সুখময় করে তোলার জন্য কতই না সামগ্রী প্রকৃতি থেকে আহরণ করে দিতে পারে। এই সামগ্রীর ক্রমবৃদ্ধি করাও সম্ভবপর। অবশ্য একদিনেই আমরা এদেশকে আমেরিকায় পরিণত করতে পারব না। তাই পরিকল্পনা ১০-১৫ বৎসর ব্যাপীও হ'তে পারে। কিন্তু তা এরূপ হওয়া চাই যে, প্রতি বছরই কিছু নির্দ্দিষ্ট ফল পাওয়া যায়। এরূপ পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে হ'লে ক্রমবর্ধমান মুলধনের প্রয়োজন হবে। এই মূলধন সংগ্রহ করা যায় বিদেশ থেকে ধার করে। বিদেশী ঋণের সুদ বহন করা মানে, হয় পুরানো সাম্রাজ্যসাহী শাসনেরই নূতন রূপে প্রবর্ত্তন, নয়তো ভবিষ্যতে ঋণ শোধ করবো না মনে রেখে ঋণ দাতার সহিত লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হওয়া। এই শেষ পন্থা যে বাঞ্ছনীয় নয় তা বলাই বাহুল্য। মূলধন সংগ্রহের দ্বিতীয় রাস্তা মুদ্রাস্ফীতি। কোনো কোনো তথাকথিত expert প্রায় ৪০০০ কোটী মুদ্রাস্ফীতির সাহায্য নেওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। ১০০০ কোটী মুদ্রাস্ফীতির ফলে ৩৫ হ'তে ৪০ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটেছে। ৪০০০ কোটীতে মৃত্যুসংখ্যা তার ৪গুণ হতে হবে। সে

পরিকল্পনার প্রতি জনসাধারণের আস্থা থাকতে পারে না। অতএব রাস্তা থাকে আমাদের, উৎপন্ন পণ্য বিনিময়ে উহা সংগ্রহ করা। যে সব দেশ থেকে যন্ত্রপাতি আনতে হবে তাদের কারখানা শিল্পের উৎপাদিকা শক্তির কথা মনে রাখলে দেখা যাবে, কৃষিজাত পণ্যই একমাত্র বিনিময় উপযোগী থাকে। অতএব জমি থেকে কেবল যে আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আহরণ করতে হবে তা নয়, দেশীয় শিল্পের খোরাক তথা রপ্তানী উপযোগী কাঁচা মালও তৈরী করতে হবে। পাট, শণ, বিবিধ তৈল-বীজ প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। আমরা দেখেছি আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্যই আজ উৎপন্ন হয় না। এই অতিরিক্ত কৃষি-পণ্যের জন্য প্রয়োজন হবে দেশের কর্ষণ-উপযোগী সমস্ত অনাবাদী জমি চাষের যোগ্য করে তোলা। সেচ ও কৃত্রিম সারের সাহায্যে জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। এর জন্যে দরকার হবে ভূমিস্বত্ব আইনের আমূল পরিবর্তন। কৃষি-পণ্যের মূল্য এরূপভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যে, কৃষক তার সমস্ত প্রয়োজন কৃষি-আয় হতে মিটাতে পারে। তাকে দিতে হবে এরূপ শিক্ষা যাতে সে পারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিয়োগ করতে, গড়ে তুলতে পারে উৎপাদক-সমবায়-সমিতি। রাষ্ট্রকে দিতে হবে এই সব সমিতিকে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য। অর্থাৎ উৎপাদন পরিকল্পনার কেন্দ্র হবে কৃষি। কৃষিসম্পদই যে মূল সম্পদ, এই সত্যকে অবহেলা করে ত্রেতাযুগে রাবণ রাজা গড়ে তুলেছিল স্বর্ণ লংকাপুরী। কৃষি-শক্তির প্রতীক নব দুর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের হাতে তাই তার পরাজয়। আজকের দিনেও আণবিক বোমা আমেরিকার শক্তির উৎস নয়, তার উদ্বৃত্ত কৃষি-পণ্য তাকে বলীয়ান করে তুলেছে 'মার্শাল প্ল্যান' এর সাহায্যে অর্ধ ইউরোপের মোড়লী করতে। কৃষি ও কারখানা শিল্পের অসামঞ্জস্যে যে দ্বন্দ্ব রুদ্ররূপে সে দিন সমস্ত পৃথিবীকে ছারখার করতে চলেছিলো, ২৫ বৎসর পূর্বে তারই আভাস পেয়ে দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন,

"পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে
আয় রে চলে আয়।"

"বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিষগুলি কেবলি ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারি অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রেও আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।"

রবীন্দ্রনাথ

ব্যবহারিক মনোবিদ্যা

—বৃত্তি নির্ণয়—

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের মূল্য কতখানি তা আজকে আর কাকেও বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার হয় না। সভ্য জগতে বিজ্ঞানের দান প্রতি পদেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি। ধ্বংসেও যতখানি, সংরক্ষণেও তদনুরূপ।

বিজ্ঞান বলতে এতদিন আমরা রসায়ণ, পদার্থ-বিদ্যা, শরীরতত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলিকেই বিজ্ঞানের অন্তর্গত বলে জেনে এসেছি। মনোবিদ্যা যে বিজ্ঞানের পর্যায় পড়ে তা আমরা বিশ্বাসই করে উঠতে পারতুম না। মনোবিদ্ ডাঃ স্পিয়ারম্যান (Dr. Spearman) এক জায়গায় বলেছেন যে, তাঁকে একদিন একজন অতি বুদ্ধিমতী ও বিদুষী ইংরাজ-মহিলা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে "মনোবিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষয় কি?" তাতে ডাঃ স্পিয়ারম্যান উত্তর দিয়েছিলেন "মনের সূত্র নির্ধারণ করাই মনোবিদ্যার উদ্দেশ্য।" এই শুনে মহিলাটি বলেছিলেন "আমি কিন্তু সর্বদাই ভেবেছি যে 'মন' কোন্ নিয়ম মানে না।" মহিলার উত্তর শুনে সেখানে উপস্থিত সেনাবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী বললেন "আপনি ঠিকই বলেছেন মহাশয়া, জড় জিনিষের উপরই নিয়ম খাটে,—'মনের' উপর নয়।" প্রাচীনকাল থেকে মনোবিদ্যার আলোচনা দর্শন শাস্ত্রের আওতায় চলে এসেছে বলে, এই রকম ধারণা সম্ভবপর হয়েছে। মাত্র গত শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে অর্থাৎ হ্বুণ্ডের (Wündt) সময় থেকে মনোবিদ্যা বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত হয়েছে। এখন আমরা ভাবতে শিখেছি যে, মন সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মতে আলোচনা সম্ভব। এই আলোচনা যদি শুধু তত্ত্বীয় আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকে তবে তার স্থান পাঠ্য পুস্তকেই। কেননা, তা হয়ে দাঁড়ায় মস্তিষ্ক চালনার এক ব্যায়াম বিশেষ, জনসমাজের কোন কাজেই আসে না। কথায় বলে 'জ্ঞানই শক্তি'। সেই জ্ঞান যদি সমাজের সেবায় না লাগল তবে সেই জ্ঞানের শক্তি পরীক্ষা কোথায়? যে জ্ঞানকে সমাজের কল্যাণে ব্যবহার করি তাকেই আমরা ব্যবহারিক বিজ্ঞানের আখ্যা দিই। উদাহরণ হিসাবে ধরা যাক—নিউটন (Newton) পদার্থবিদ্যার অন্তর্গত একটি তত্ব 'গতিসূত্র' (Laws of motion) আবিষ্কার করলেন। জলপ্রপাতের উচ্ছলিত জলের গতি এই গতিসূত্রেরই নিয়মাধীন। আমরা যদি শুধু এই পর্যন্ত জেনে থেমে যাই, আর অগ্রসর না হই তবে জ্ঞানের অপচয় হয়। প্রপাতের জলরাশির অন্তর্নিহিত মহাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে এক বিরাট তড়িৎ-উৎপাদন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারলে মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করা যায়, এই জ্ঞানই ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যা। তত্ত্বীয় জ্ঞানকে সমাজ সেবায় নিয়োজিত করবার নামই ব্যবহারিক মনোবিদ্যা। বৃত্তি-নির্ণয় (Vocational guidance) ব্যবহারিক মনোবিদ্যার আলোচনাভুক্ত বিষয়।

বৃত্তি আমাদের জীবনের কেন্দ্রস্থল, সুখ সম্পদ যা কিছু বৃত্তিকে কেন্দ্র করেই গ'ড়ে ওঠে, কাজেই বৃত্তি-নির্ণয়ন বিষয়ে কোনরূপ ত্রুটি ঘটলে জীবন হ'য়ে ওঠে ভারাক্রান্ত, অশান্তিময়। আমাদের দেশে যে সব ছেলেমেয়েরা উচ্চ শিক্ষা পায় তাদের

অনেকের মধ্যে আমরা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের একান্ত অভাব দেখতে পাই। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, "লেখাপড়া শেষ হ'লে কি করবে"—উত্তর যা পাওয়া যায় তাতে সুচিন্তা-প্রসূত পরিকল্পনার অভাব অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়। লেখাপড়া শেষ হলেই এদের মুস্কিল—তবু যে কদিন স্কুল কলেজে নাম থাকে লোকের কাছে মান বজায় থাকে যে একটা কিছু কর্‌ছি—পড়া শেষ হ'লেই যত বিপদ, 'কি করা যায়' এই সমস্যাই তখন বড় হ'য়ে দেখা দেয়। এ রকম অবস্থায় একটা কিছু কর্‌তেই হয় এবং তা যত সহজে যোগাড় করা যায় ততই সুবিধা—বৃত্তিটি নিজের বুদ্ধি, শক্তি বা মানসিক প্রবৃত্তির অনুকূল হোক বা না হোক। বৃত্তি গ্রহণই বৃত্তি সমস্যার সমাধান এই আমাদের দেশের প্রচলিত ধারণা। ভেবে দেখি না যে, বৃত্তির প্রতিকূল গুণসম্পন্ন ব্যক্তি কিছুতেই সেই বৃত্তিতে সাফল্য লাভ ক'রতে পারে না। এই অসাফল্যের জন্য তার জীবন উদ্বেগময় ও আর্থিক অসাচ্ছন্দময় হ'য়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক যে, একজন মুখচোরা লোককে দোকানে জিনিষপত্র বিক্রি ক'রে দেওয়ার ভার দেওয়া হ'ল (salesman), ফল যা দাঁড়াল তা মোটেই দোকানের স্বার্থের অনুকূল নয় এবং যার ওপর বিক্রির ভার ছিল, মুখচোরা ভাবের জন্য সে প্রতিপদে নিজের অকর্মণ্যতা দেখে আস্তে আস্তে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলল। পরজীবনে আর সে কোন বৃত্তিতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারল না। আমাদের সমাজে এই রকম বৃত্তিবিষয়ে অমিলের সংখ্যা খুবই বেশী। এই সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টাই আমাদের দেশের শাসনবিধিতে দেখতে পাই না। এটা যেন ব্যক্তি বিশেষের সমস্যা, সমাজের কোন দায় নেই। কিন্তু পাশ্চাত্যদেশে বৃত্তি-সমস্যাকে নানাদিক দিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে এবং এই থেকেই উদ্ভব হয়েছে বৃত্তিনির্ণয় ও নির্দেশ দেওয়ার পদ্ধতি। সেখানে প্রায় সব বিদ্যালয়েই একজন করে বৃত্তিনির্ণায়ক শিক্ষক (career master) নিযুক্ত আছেন। তিনি বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার পূর্বে প্রত্যেক বালক বালিকাকে বিভিন্ন অভীক্ষার (tests) ভিতর দিয়ে পরীক্ষা করে নেন। ছাত্র-ছাত্রীদের অভীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল এবং তাদের সম্বন্ধে প্রাপ্ত নানাবিধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে তাদের উপযুক্ত বৃত্তিবিষয়ে উপদেশ দেন। অভীক্ষাগুলি এমনি ভাবে তৈরী করা হয় যাতে তার ফলাফল থেকে ব্যক্তিবিশেষের গুণাগুণের অস্তিত্ব ও পরিমাপ করা যায়। সংখ্যাবিদ্যার সাহায্য নিয়ে ফলাফলের মান (standard) স্থির করা হয়। অভীক্ষা সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা বারান্তরে দেওয়ার ইচ্ছা রইল।

এখানে উল্লেখ করলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, প্রাচীন ভারতে বৃত্তি সমস্যা বর্ণাশ্রম প্রথায় সমাধানের চেষ্টা হয়েছিল। তখন সামাজিক অবস্থা এত জটিল হয়ে পড়েনি, কাজেই 'গুণ কর্ম বিভাগশঃ' এই নীতি অনুসরণ করে বৃত্তিসমূহ চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। প্রত্যেক শ্রেণীর আবশ্যকীয় গুণাগুণ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। যারা যেরকম গুণের অধিকারী তারা সেই রকম বৃত্তি গ্রহণে সমর্থ হতেন। কালের পরিবর্তনে গুণাগুণ বংশগত অধিকার বলে স্বীকৃত হ'ল এবং এক একটি বর্ণের জন্য এক একটি বিশিষ্ট বৃত্তি নির্ধারিত হল, যাতে সংমিশ্রণের ফলে গুণাগুণ নষ্ট হয়ে না যায়, তার জন্য ব্যবস্থা হল সমবর্ণে বিবাহাদি প্রশস্ত, অসবর্ণ বিবাহ নিন্দনীয়। এ সত্ত্বেও অসবর্ণ বিবাহের ফলে যে সব সন্তানাদি হ'ত তাদের উভয়বর্ণের নিম্নতর বর্ণের পর্যায়ভুক্ত করা হত। আজও এই বর্ণভেদ-বিধি ভারতে চলে আসছে; কিন্তু পটভূমিকার পরিবর্তন হেতু বৃত্তি সমস্যা সমাধানে আমাদের ভাবধারায়ও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী।

রাশি-বিজ্ঞানের প্রস্তাবনা

ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

বিজ্ঞানের জগতে রাশি-বিজ্ঞান বা সংখ্যা-বিজ্ঞান (Statistical Science) অপেক্ষাকৃত নবীন আগন্তুক। রাশি-তথ্য (Statistical data) সংকলন অবশ্য বহু পুরাকাল থেকেই প্রচলিত; এমন কি, খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থ বাইবেলেও জন-সংখ্যা গণনার উল্লেখ আছে। কিন্তু বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতিতে রাশি-তথ্য বিশ্লেষণ ও সংকলনের প্রবর্তন হয়েছে অনেক পরে, প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে। আর অল্প কয়েকজন বিশেষজ্ঞের গোষ্ঠী ছাড়িয়ে জনসাধারণের দরবারে রাশি-বিজ্ঞান সমাদর লাভ করতে সমর্থ হয়েছে মাত্র কয়েক বছর। সেজন্য অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় বিশেষ জটিল না হলেও, সাধারণের সঙ্গে এ-বিজ্ঞানের প্রকৃত পরিচয় কম এবং তারই ফলে রাশি-তত্ত্বের অপব্যবহার ও অসাধু প্রয়োগের আধিক্য এত লক্ষিত হয়। অন্য দিকে অনেক অতি-উৎসাহী রাশি-বিজ্ঞানীও এ বিজ্ঞানের কার্যকারিতা সম্বন্ধে অসংগত অতিশয়োক্তি ক'রে জল আরও ঘোলা করেছেন। এ-সব কারণে রাশি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেকের মনে বহু ভুল ধারণা ও অবিশ্বাস রয়েছে। এ-অবস্থা নিরাকরণের অন্যতম প্রধান উপায় হলো রাশিবিজ্ঞানের প্রকৃত তত্ত্ব ব্যাপকভাবে প্রচার করা। এই প্রবন্ধে রাশি-বিজ্ঞান কী, এর প্রয়োগের ক্ষেত্রের ব্যাপকতা কতটা, আর তার পরিধিই বা ঠিক কোনখানে, এ-সব প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে দেবার চেষ্টা করব।

রাশি-বিজ্ঞানের মূল কথা হলো, কোনও সমষ্টির সংখ্যা-গত বা রাশি-গত (numerical) গুণ বর্ণনা করা। এখানে সমষ্টিই (aggregate) প্রধান নায়ক, সমষ্টির মধ্যে যেসব একক বা ব্যষ্টি (individual) আছে, ব্যষ্টি-হিসাবে তাদের কোনও মূল্য নেই। উদাহরণ স্বরূপ কোনও পরীক্ষায় ছাত্রেরা যা নম্বর পেয়েছে, সেগুলির সমষ্টি নেওয়া যেতে পারে। সাহিত্যে বেশী নম্বর উঠল, না ইতিহাসে, সাহিত্যের নম্বরের সঙ্গে ইতিহাসের নম্বরের সমষ্টি-গত কোনও যোগসূত্র আছে কি না,—এ ধরণের বিচার রাশি-বিজ্ঞানে হতে পারে। কিন্তু কোনও বিশেষ ছাত্রের পরীক্ষার ফল, তার ইতিহাস ও সাহিত্যের নম্বরের সম্বন্ধ,—এসব আলোচনা রাশি-বিজ্ঞানে চলে না। জীবজগতের বিবর্তন-বাদে (theory of evolution) ডারুইন দেখিয়েছেন যে, প্রকৃতিদেবী তাঁর সন্ততিদের প্রতি জাতি-হিসাবে (species) মনোযোগী, কিন্তু ব্যক্তি-হিসাবে উদাসীন। রাশি-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীও প্রকৃতিদেবীরই অনুরূপ।

অবশ্য যেকোনও রাশি-সমষ্টিই রাশি-বিজ্ঞানের এলাকায় পড়ে না। শূন্য ডিগ্রী থেকে নব্বই ডিগ্রী (সমকোণ) পর্যন্ত, এক ডিগ্রী অন্তর সব কোণ গুলির সাইন (Sine) নিয়ে যে রাশি-সমষ্টি হবে, তার বর্ণনার জন্য যে রাশি-বিজ্ঞানের কোনও প্রয়োজন নেই, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু যেসব রাশি-সমষ্টি এরকম নির্ভুল সুনিয়ন্ত্রিত গাণিতিক সূত্রে বাঁধা নয়, যাদের মধ্যে অন্ততঃ কিছু পরিমাণেও অনিয়ন্ত্রিত সঙ্কলন (variation) আছে, তাদের বিশ্লেষনের জন্যই রাশি-বিজ্ঞানের সৃজন হয়েছে। দুটি ভিন্ন লক্ষণের রাশির পারস্পরিক সম্বন্ধের কথাই ধরা যাক। এই সম্বন্ধ তিন রকমের হতে

পারে: সুনিয়ন্ত্র (exact), সমষ্টিগত (statistical) বা পরস্পর নিরপেক্ষ (independent)। প্রথমটির উদাহরণ হলো, যে-কোনও গোলকের ব্যাস ও আয়তনের মধ্যে সম্বন্ধ: আয়তন বা ব্যাস যে কোনটি জানা থাকলেই অন্যটি নির্ভুলভাবে নির্ধারণ করা যাবে। পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন (physics, chemistry) প্রভৃতিতে সূত্র ও নিয়ম বেশীর ভাগ এই ধরণের বলে ও-গুলিকে "সুনিয়ন্ত্রবিজ্ঞান', (exact science) বলা হয়। (এ বিষয়ে পরে আরও বিস্তারিত আলোচনা আছে।) কোনও জাতির প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষদের দৈর্ঘ্য (height) ও ওজনের মধ্যে সম্বন্ধটি দ্বিতীয় ধরণের, অর্থাৎ সমষ্টিগত। কারও দৈর্ঘ্য জানা থাকলে তার ওজন সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়, আবার দৈর্ঘ্য ও ওজন সম্পূর্ণ পরস্পর-নিরপেক্ষও নয়। সব পুরুষদের সমষ্টি সমগ্রভাবে বিচার করলে দৈর্ঘ্য ও ওজনের একটা মোটামুটি সমষ্টিগত সম্বন্ধ পাওয়া যাবে,—কম ওজনের সঙ্গে কম দৈর্ঘ্যের, ও বেশী ওজনের সঙ্গে বেশী দৈর্ঘ্যের সমষ্টিগত সংযোগ লক্ষ্য করা যাবে। যদিও কোনও বিশেষ ব্যক্তির বেলা ওজন বেশী হলেও দৈর্ঘ্য কম, বা ওজন কম হলেও দৈর্ঘ্য বেশী দেখা যেতে পারে। দৈনিক বারিপাতের সঙ্গে উষ্ণতা বা তাপের (temperature) সম্বন্ধ অথবা বারিপাতের সঙ্গে বায়ুর আর্দ্রতার সম্বন্ধও এই ধরণের সমষ্টিগত। আর নিরপেক্ষতার উদাহরণ হিসাবে কোনও শ্রেণীর ছাত্রদের দৈর্ঘ্য ও তাদের গণিতে পারদর্শিতার সম্বন্ধ নেওয়া যেতে পারে। দৈর্ঘ্যের সঙ্গে পরীক্ষায় গণিতের নম্বরের কোনও সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নয়, এ দুটি গুণ পরস্পর-নিরপেক্ষ। উপরোক্ত তিন রকম সম্বন্ধের মধ্যে দ্বিতীয়টি—অর্থাৎ সমষ্টিগত সম্বন্ধ রাশি-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। অবশ্য অন্য দু'ধরণের সম্বন্ধকেও (সুনিয়ন্ত্র ও নিরপেক্ষ) সমষ্টিগত সম্বন্ধেরই দুটি প্রান্তিকরূপ (limiting form) বলে ভাবা যেতে পারে।

অতএব সাধারণভাবে বলা যায় যে, রাশি-বিজ্ঞান হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির এমন একটি শাখা, যার সাহায্যে সমষ্টিগত রাশি-তথ্যের গুণ বর্ণনা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যায়। আর রাশি বিজ্ঞানের বিষয় বস্তু হলো সেই সব রাশি-সমষ্টি, যেগুলি নির্ভুল সুনিয়ন্ত্র সূত্রে বাঁধা নয়, যাদের মধ্যে অন্ততঃ কিছু অনিয়ন্ত্র ও অজানা সঙ্কলন আছে। বিচিত্রা প্রকৃতিতে অহরহ যে-সব সমষ্টি চোখে পড়ে, সেগুলি প্রায় সবই এই ধরণের অনিয়ন্ত্র।

রাশি-সমষ্টি বর্ণনার দুটি ভিন্ন উপায় আছে। সমষ্টিটি সম্পূর্ণভাবে জানা আছে, বা জানা যেতে পারে ধরে নিয়ে, সেটির বিশ্লেষণ ও বর্ণনার উপায় স্থির করা যায়। অথবা, সমগ্র সমষ্টিটি না জেনেও, তার অংশ-বিশেষ পর্যবেক্ষণ করে সমগ্রটির গুণ ও বৈশিষ্ট্য অনুমান করা যেতে পারে। যেমন, কলিকাতাবাসীদের গড় আয় জানার জন্য, সব অধিবাসীর (ধরা যাক ৪০ লক্ষ লোকের) আয় নির্ণয় করে তাদের গড় কষা যায়; অথবা, ঐ ৪০ লক্ষ লোকের একটি ছোট অংশ বা নমুনা—যেমন মাত্র ৪ হাজার লোক—নির্বাচন ক'রে, শুধু তাদেরই আয় জেনে, সমগ্র সমষ্টিটির (৪০ লক্ষ লোকের) গড় আয় অনুমান করা যেতে পারে। এই ধরণের ৪০ লক্ষ লোকের মূল সমষ্টিটিকে 'পূর্ণক' বা 'সমগ্রক' সমষ্টি বলে; আর তার নির্বাচিত অংশটিকে (৪ হাজার লোকের) "অংশক বা নমুনা" সমষ্টি বলে। পূর্ণকটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে ধ'রে নিয়ে তাকে বর্ণনা করার পদ্ধতিকে "পূর্ণক-বর্ণনা" বলা হয়; আর অংশকের জ্ঞান থেকে পূর্ণককে অনুমান করার সংশ্লিষ্ট তত্ত্বকে বলে "অংশক-তত্ত্ব।"

পূর্ণক-বর্ণনায় প্রথম ধাপ হলো সংক্ষেপ করা বা "সারীকরণ" (summarisation)। ৮৫৮৫টি লোকের দৈর্ঘ্য নিয়ে যদি একটি পূর্ণক সমষ্টি হয়, এতগুলি রাশিকে একত্রে ধারণা করা বা আলোচনা করা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই রাশি-বিজ্ঞানীর প্রথম কাজ হলো অতগুলি রাশিকে কমিয়ে অল্প কয়েকটি রাশিতে সুসম্বদ্ধ ক'রে রূপান্তরিত করা। প্রথমে

দৈর্ঘ্যের পুরো প্রসারটিকে (range) অল্প কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। যেমন প্রসারটি যদি ৫৭ ইঞ্চি থেকে ৭৯ ইঞ্চি হয়, সেটিকে দু-ইঞ্চি অন্তর, ৫৭"—৫৯" ৫৯"—৬১",…৭৭"—৭৯" এই ১১টি শ্রেণীতে ভাগ করা হলো। এখন ৮৫৮৫ দৈর্ঘ্যরাশিকে এই ১১টি শ্রেণীতে সাজিয়ে, প্রত্যেক শ্রেণীতে কটি দৈর্ঘ্যরাশি পড়ল সেই সংখ্যাগুলি নির্ণয় করতে হবে; এই সংখ্যাগুলিকে 'পরিসংখ্যা' বলা হয়, আর বিভিন্ন শ্রেণীতে পরিসংখ্যাগুলি সাজানোকে বলে 'পরিসংখ্যা নিবেশন' (frequency distribution) ১ নং ছকে (table) ব্রিটেনের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের একটি দৈর্ঘ্য সমষ্টির পরিসংখ্যা-নিবেশন দেখানো হয়েছে। এ ভাবে ৮৫৮৫টি রাশিকে কমিয়ে মাত্র ১১টি পরিসংখ্যা দিয়ে সমষ্টিটিকে বর্ণনা করা হলো। চিত্র-রূপেও (graphically) পরিসংখ্যা-নিবেশন দেখানো যেতে পারে, যাতে সহজেই সমষ্টিটির ধারণা করা যায়।

১নং ছকঃ দৈর্ঘ্যরাশির পরিসংখ্যা-নিবেশন

দৈর্ঘ্য (ইঞ্চিতে)	পরিসংখ্যা
৫৭" ৫৯"	৬
৫৯"-৬১"	৫৫
৬ "-৬৩"	২৫২
৬৩"-৬৫"	১০৬৩
৬৫"-৬৭"	২২১৩
৬৭"-৬৯"	২৫৫৯
৬৯"-৭১"	১৭০৯
৭১"-৭৩"	৫৯৪
৭৩"-৭৫"	১১১
৭৫"-৭৭"	২১
৭৭"-৭৯"	২
যোগফল	৮৫৮৫

২নং ছকঃ বিজলীবাতির জীবন-কালের পরিসংখ্যা-নিবেশন

জীবন-কাল (ঘণ্টায়)	পরিসংখ্যা
০— ২০০	১
২০০— ৪০০	৩
৪০০— ৬০০	২
৬০০— ৮০০	১০
৮০০—১০০০	১৯
১০০০—১২০০	২১
১২০০—১৪০০	২৩
১৪০০—১৬০০	১৮
১৬০০—১৮০০	১৭
১৮০০—২০০০	১০
২০০০—২২০০	৮
২২০০—২৪০০	৫
২৪০০—২৬০০	৫
২৬০০—২৮০০	৪
২৮০০—৩০০০	২
৩০০০—৩২০০	১
৩২০০—৩৪০০	১
যোগফল	১৫০

অনেক সময় এ রকম ১১টি পরিসংখ্যা জানারও দরকার থাকে না, সমষ্টিটিকে বোঝার জন্য অল্প কয়েকটি বৈশিষ্ট্য-সূচক অঙ্ক জানলেই চলে। যেমন ১ নং ছকের সমষ্টিটির মাঝামাঝি দৈর্ঘ্য-রাশিটি জানার জন্য গড় (mean) দৈর্ঘ্য রাশিগুলির নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্যের পরিমান জানার জন্য 'গড় পার্থক্য বা 'সমক পার্থক্য (mean deviation or standard deviation) ; লঘু ও গুরু দৈর্ঘ্যরাশির পরিসংখ্যায় প্রতিসাম্য (symmetry) আছে কিনা বোঝার জন্য 'অপ্রতিসাম্য' বা 'প্রতি-বৈষম্য' (asymmetry or skewness) এবং মধ্যবর্তী দৈর্ঘ্যের পরিসংখ্যার সঙ্গে উভয় প্রান্তস্থ (লঘুও গুরু) দৈর্ঘ্যের পরিসংখ্যার

তুলনার জন্য পরিসংখ্যা-নিবেশনের 'তীক্ষ্ণতা' (kurtosis or peakedness)। বহুক্ষেত্রে পরিসংখ্যা-নিবেশনের এই চারটি বৈশিষ্ট্য জানলেই যথেষ্ট। ১নং ছকের ৮৫৮৫ দৈর্ঘ্যরাশির গড়—৬৭'৫", সমক পার্থক্য—২'২৬", প্রতি-বৈষম্য (r_1) =—০'০১, তীক্ষ্ণতা (r_2)—০'১৫। ২ নং ছকে পরিসংখ্যা-নিবেশনের আর একটি উদাহরণ দিয়েছি: কোনও বিজলী বাতি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সব শুদ্ধ যতক্ষণ জ্বলে, সেই সময়টিকে ঐ বাতির "জীবন-কাল" বলা যেতে পারে। ইংলণ্ডের কোনও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তাদের তৈরী বিজলী বাতিগুলি পরীক্ষার জন্য ১৫০টি বাতি বেছে নিয়ে সেগুলির জীবন-কাল নির্ধারণ করে, তার ফল ২নং ছকে দেখানো হয়েছে। (এটি অবশ্য একটি অংশক সমষ্টি, পূর্ণক নয়।) এই সমষ্টিটির গড় (জীবনকাল)—১৪৫২ ঘণ্টা, সমক পার্থক্য—৫৯৯ ঘণ্টা, প্রতিবৈষম্য—০'৬, তীক্ষ্ণতা—০'৩। উপরের বর্ণনা থেকে অবশ্য এই বৈশিষ্ট্য চারটি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা হতে পারে না, কিন্তু এ-প্রবন্ধে এর বেশী ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার পরিসংখ্যা-নিবেশনের রূপটিকে গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে সঠিকভাবে বর্ণনা করা যায়। যেমন, ধরা যাক ১নং ছকের সমষ্টির কোনও শ্রেণীতে (যথা, ৫৯"-৬১") পরিসংখ্যা কত হবে (অর্থাৎ ৫৫), তা শ্রেণীটির মান (value) থেকেই কোনও গাণিতিক নিয়ম দিয়ে নিভুর্লভাবে বার করা যাবে। গণিতের ভাষায়, পরিসংখ্যাটি শ্রেণীর মানের কোনও সুনিয়ন্ত্র অপেক্ষক (exact function) হবে। এ-রকম ক্ষেত্রে সুবিধা অনেক, কেননা পরিসংখ্যা-নিবেশনের গাণিতিক সূত্রটি জানা থাকলেই পূর্ণক-সমষ্টিটিকে সঠিকভাবে জানা যাবে। এখানে অবশ্য লক্ষ্য করতে হবে যে, গাণিতিক সূত্রটি পূর্ণকের সঠিক বর্ণনা দেবে সমগ্র-ভাবে। পূর্ণকের অন্তর্গত একক বা ব্যষ্টিগুলির ব্যষ্টি-হিসাবে নিভুর্ল বর্ণনা দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। যেমন ১নং ছকের সমষ্টির কোনও ব্যক্তি বিশেষের দৈর্ঘ্য কত হবে, তা সঠিকভাবে বলা যাবে না। কেননা, পূর্ণক-সমষ্টিটি যে মূলতঃ অনিয়ন্ত্র, সুনিয়ন্ত্র নয়, তা স্মরণ রাখতে হবে।

পূর্ণকের মাত্র একটি গুণ বা লক্ষণ আলোচনা না করে, একই সঙ্গে দুই বা ততোধিক লক্ষণও বর্ণনা করা যেতে পারে: যেমন কোনও জন-সমষ্টির দৈর্ঘ্য ও ওজন, অথবা দৈর্ঘ্য, ওজন, বক্ষের প্রসার, ভারোত্তলন ক্ষমতা, অথবা একসঙ্গে অনেকদিনের দৈনন্দিন বারিপাত, লঘিষ্ঠ উষ্ণতা (minimum temperature), গরিষ্ঠ উষ্ণতা, বায়ুর আর্দ্রতা প্রভৃতি রাশির সমষ্টি। একটি লক্ষণের জন্য বর্ণিত সারীকরণের পদ্ধতিগুলিকে যথাযোগ্য সম্প্রসারণ ও পরিবর্তন করে এ সব ক্ষেত্রের উপযোগী করা যায়। তবে এ সব পূর্ণকে এমন কতকগুলি নূতন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব হতে পারে, যাদের অনুরূপ কোনও বৈশিষ্ট্য একটিমাত্র লক্ষণযুক্ত পূর্ণকে থাকতে পারে না: যেমন, দুটি লক্ষণের (যথা, দৈর্ঘ্য ও ওজনের) মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ। এ রকম নূতন বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনার জন্য নূতন কৌশলেরও প্রয়োজন হয়। একটি উদাহরণ দিই: দুটি লক্ষণের পারস্পরিক সম্বন্ধটি যদি সরল (linear) হয়, তাহলে সেই সম্বন্ধের তীব্রতা মাপার জন্য "সহগাঙ্কের" (correlation coefficient) কল্পনা করা হয়েছে। লক্ষণ দুটি সম্পূর্ণ পরস্পর-নিরপেক্ষ হলে, অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ না থাকলে, সহগাঙ্কের পরিমাণ হবে শূন্য: যেমন ছাত্রদের দৈর্ঘ্যের সঙ্গে গণিতের নম্বরের সহগাঙ্ক। অন্যদিকে সহগাঙ্কটির পরিমাণ এক হলে সম্বন্ধটি হবে তীব্রতম, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে সুনিয়ন্ত্র ও নিভুর্ল: বৃত্তের ক্ষেত্রফল (area) ও তার ব্যাসের বর্গ, এ দুটি লক্ষণের মধ্যে সহগাঙ্কের পরিমাণ হবে এক। (এখানে সম্বন্ধটি সরল রাখার জন্য, ব্যাসের বদলে ব্যাসের বর্গ নেওয়া হয়েছে)। অন্যান্য ধরণের (সমষ্টিগত) সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সহগাঙ্কের পরিমাণ

শূন্য থেকে একের মধ্যে থাকবে: যেমন কোনও সমষ্টিতে পিতার দৈর্ঘ্যের সঙ্গে তার প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের দৈর্ঘ্যের সহগাঙ্ক প্রায় ০·৫ পাওয়া গেছে। সহগাঙ্কটি অবশ্য "সদৃশ" (Positive) অথবা 'বিপরীত' (negative)—দু'রকমের হতে পারে। লক্ষণ দু'টি সমষ্টিগতভাবে একই সঙ্গে বাড়লে (ও একই সঙ্গে কমলে) তাদের সহগাঙ্ক সদৃশ (+ve) হবে, যেমন জন-সমষ্টির দৈর্ঘ্য ও ওজনের সহগাঙ্ক, অথবা পিতা ও পুত্রের দৈর্ঘ্যের সহগাঙ্ক। আর একটি লক্ষণ বাড়লে যদি অপরটি কমে, তাহলে সহগাঙ্ক বিপরীত (—ve) হবে, যেমন বারিপাতের সঙ্গে উষ্ণতার সহগাঙ্ক। পূর্ণক-বর্ণনার আরও জটিল অনেক পদ্ধতি আছে; সেগুলি এখানে উল্লেখ করলাম না।

এখন অংশক-তত্ত্বে আসা যাক। অংশ বা নমুনা পর্যবেক্ষণ করে পুরো সমষ্টিটি সম্বন্ধে অনুমান করার মধ্যে নূতন বা চমকপ্রদ কিছু নেই। মানব ইতিহাসের প্রায় গোড়া থেকেই এর প্রচলন আছে, আর দৈনন্দিন জীবনে প্রায়ই এর প্রয়োগ দেখা যায়। যখনই আমরা কোনও জিনিষের সবটা পরীক্ষা করতে পারি না, বা চাই না, তখন তার একটা ছোট অংশ নমুনা হিসাবে পরীক্ষা করে সবটা অনুমান করি: যেমন আমের ঝুড়ি থেকে একটা বা দুটো আম নিয়ে সব আম যাচাই করি, অথবা কোনও গৃহিনী উনুনে চড়ানো হাঁড়ি থেকে কয়েকটা ভাত তুলে নিয়ে দেখেন, হাঁড়ির সব ভাত ঠিক সিদ্ধ হলো কি না। এ সব সাধারণ ব্যাপারের জন্যে যদি কেউ অংশক-তত্ত্বের সূক্ষ্ম গবেষণা করতে বসে, তাকে পাগল ভাবাই স্বাভাবিক এবং সংগত। কিন্তু জটিলতর ক্ষেত্রে, যেমন অংশকের সাহায্যে কলিকাতাবাসীদের গড় আয় অনুমানের ব্যাপারে, কেবল সাধারণ বুদ্ধির উপর নির্ভর করা যায় না। সহজ বুদ্ধিতে আমরা যে ভাবে অংশক বা নমুনা নির্বাচন করি, বা যেভাবে অংশক থেকে পূর্ণক সম্বন্ধে অনুমান করি, তাতে পরীক্ষক বা গবেষকের স্বকীয় দক্ষতার উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়; কাজেই সেভাবে কোনও বিজ্ঞান-সম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায় না। বহু পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, নমুনা নির্বাচনের ব্যাপারে প্রতি ব্যক্তিরই কোনও না কোন বিশেষ ধরণের ঝোঁক (bias) থাকে, অনেক সময় তার নিজের অজ্ঞাতসারেই; সেজন্য এভাবে নির্বাচিত অংশক যথাযথভাবে পূর্ণকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। এই দোষ মোচনের জন্য রাশি-বিজ্ঞানে এমন এক নির্বাচন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা সম্পূর্ণ ব্যক্তি-নিরপেক্ষ (objective), নির্বাচকের ব্যক্তিগত দক্ষতার উপর যা মোটেই নির্ভরশীল নয়। এ ভাবে নির্বাচন করলে, পূর্ণকের প্রতিটি একক বা ব্যষ্টির পক্ষে অংশকে নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা একেবারে সমান রাখা হয় বলে, এ-পদ্ধতির নাম "সম-সম্ভাব্য" (random) নির্বাচন-পদ্ধতি। (এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, ইংরাজী (random) শব্দটির সাধারণ অর্থ হলো এলোপাতাড়ি বা haphazard; সম-সম্ভাব্য পদ্ধতিটি কিন্তু এলোপাতাড়িভাবে নির্বাচনের পদ্ধতি নয়। কার্যক্ষেত্রে সম-সম্ভাব্য নির্বাচনের সহায়তার জন্য রাশি-বিজ্ঞানীরা একরকম "সম-সম্ভাব্য সংখ্যার বা রাশির সারি" (random number series) নির্মাণ করেছেন। এই সারির প্রয়োগ কৌশল বর্ণনা করতে গেলে প্রবন্ধটি অত্যন্ত দীর্ঘকায় হয়ে পড়ে। সম-সম্ভাব্য অংশক নির্বাচনে সম্ভাবনা-গণিতের (probability mathematics) নিয়ম ব্যবহার করা হয় বলে এরকম অংশকের সঙ্গে পূর্ণকের পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্ভাবনা-গণিতের সাহায্যেই নিরূপন করা যেতে পারে। সিদ্ধান্তগুলিও অবশ্য সম্ভাবনা সম্বলিত হবে। একটি কাল্পনিক উদাহরণ দিই: ধরা যাক, বহু-সংখ্যক দৈর্ঘ্য-রাশির একটি পূর্ণকের গড় ৬৫" ও সমক পার্থক্য ৪", আর এই পূর্ণক থেকে মাত্র ১০০টি দৈর্ঘ্য রাশি নিয়ে একটা সম-সম্ভাব্য অংশক নির্বাচন করা হয়েছে; পূর্ণকটি যদি একটি বিশেষ ধরণের—"সুষম" (normal)—হয়, তাহলে আমরা

বলতে পারি যে, ঐ অংশকের গড়, ৬৪" থেকে ৬৬" (৬৫"+১") এই অন্তরের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা শতকরা ৯৯ ভাগ হবে। এভাবে অংশকের গড় সম্বন্ধে সিদ্ধান্তটি সম্ভাবনার ভাষায় করা হলো। ঐ ধরণের অন্তরকে (৬৫"+১") "আস্থা-সূচক অন্তর" (confidence interval) বলে। অংশকের সংখ্যা ১০০ থেকে যত বাড়ানো যাবে, আস্থাসূচক অন্তরটিও তত ছোট হবে, অর্থাৎ অংশকের গড়ও তত সূক্ষ্মভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে। রাশি-বিজ্ঞানে অংশক চয়নের আরও কতকগুলি জটিলতর পদ্ধতি আছে, কিন্তু সবগুলির মূলেই সম-সম্ভাব্য চয়নের নীতিটি রয়েছে। সেজন্য অংশক-তত্ত্বের মধ্যে সম্ভাবনা-গণিতের কত বেশী প্রভাব আছে, তা সহজেই বোঝা যায়। অনেক ঘটনা আছে যাদের সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না, কেবল সম্ভাবনার ভাষাতেই তাদের বর্ণনা সম্ভব: যেমন তাসের খেলায় কী রকম হাত পাওয়া যাবে, পাশা বা লুডো খেলার চালে কত পড়বে, বন্দুক বা তীর-ধনুকে লক্ষ্যভেদ করার সময় কোনদিকে কতটা ভুল হতে পারে, কোনও ব্যক্তিবিশেষ কতদিন বাঁচবে,—ইত্যাদি। এসব ঘটনার বিশ্লেষণ রাশি-বিজ্ঞানের অংশক-তত্ত্বের সাহায্যেই করা যেতে পারে। জীবন-বীমা কোম্পানীগুলি তাদের লাভ-ক্ষতির সম্ভাবনার হিসাব কষার জন্য এই তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে থাকে।

অংশক-তত্ত্বের সমস্যাকে দুটি বিপরীত থেকে দেখা যেতে পারে। প্রথমটি হলো পূর্ণকের জ্ঞান থেকে অংশককে অনুমান করার "অবরোহী" (deductive) সমস্যা, আর দ্বিতীয়টি, অংশকের জ্ঞান থেকে পূর্ণককে অনুমান করার "আরোহী" (inductive) সমস্যা। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের প্রায় সব সময়েই দ্বিতীয় ধরণের সমস্যারই সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়ে, প্রথম সমস্যাটি অবরোহী বলে তার সমাধান করা সহজ; বিশেষতঃ সম্ভাবনা-গণিত (যার সাহায্যেই অংশক-তত্ত্বের বিকাশ সম্ভব হয়েছে)—নিজেও মূলতঃ অবরোহী-যুক্তিপ্রধান। তবে সুবিধা এই যে, প্রথম সমস্যার সমাধান করা হলেই কার্যতঃ দ্বিতীয় সমস্যারও সমাধান হয়ে যায়। একটি সহজ উদাহরণ দিচ্ছি: পূর্ণকের গড়কে যদি "ক" বলি, আর অংশকের গড়কে "খ", তাহলে কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে হয়ত প্রথম ধরণের সমস্যার সমাধান ক'রে বলা গেল যে, খ-এর পরিমাণ ক−১ থেকে ক+১ অন্তরের মধ্যে থাকার সম্ভাবনা ৯৯% (এখানে "ক" জানা, আর "খ" অজানা); আগের অনুচ্ছেদে দৈর্ঘ্যরাশির উদাহরণে যেমন বলেছি। এখন সহজেই বোঝা যায় যে, একই ক্ষেত্রে যদি "খ" জানা থাকে, আর "ক" অজানা হয় (দ্বিতীয় ধরণের সমস্যা), তাহলে ক-এর পরিমাণ খ−১ থেকে খ+১ অন্তরের মধ্যে থাকার সম্ভাবনাও ৯৯% হবে। পূর্বে উল্লিখিত দৈর্ঘ্যরাশির উদাহরণে অংশকের গড়টি যদি ৬৫·৪" বলে জানা থাকে, তাহলে অজানা পূর্ণকের গড়ের পরিমাণ ৬৪·৪" থেকে ৬৬·৪"-এর মধ্যে থাকার সম্ভাবনা হবে ৯৯%। এখানে অবশ্য একটু সাবধান হওয়া দরকার। পূর্ণকের গড়ের সম্বন্ধে যে সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে, সেটি অবশ্য আরোহী-যুক্তিবিশিষ্ট সম্ভাবনা। সাবেকী সম্ভাবনা-গণিতে এ-রকম "আরোহী" সম্ভাবনার বিশেষ স্থান নেই। এই নূতন ধরণের সম্ভাবনাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাশিবিজ্ঞানীদের অনেক অভিনব যুক্তি ও কল্পনার অবতারণা করতে হয়েছে, বাহুল্য-ভয়ে সে সব আলোচনা এখানে বাদ দিলাম।

রাশি-বিজ্ঞানে অংশক তত্ত্বের বিকাশ হয়েছে খুবই পরে; বিংশ শতাব্দীর আগে এ-তত্ত্ব প্রায় কিছুই জানা ছিল না, বলা চলে। কিন্তু এখন প্রধানতঃ অংশক-তত্ত্বের কল্যাণেই রাশি-বিজ্ঞানের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রও প্রসারিত হচ্ছে। তত্ত্বের দিক দিয়েও রাশি-বিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশ হচ্ছে মুখ্যতঃ অংশক তত্ত্বেরই নব নব রূপ-উদ্ঘাটনে। আধুনিক রাশি-

বিজ্ঞানের বেশীর ভাগ স্থানই অংশক-তত্ত্ব অধিকার করে রয়েছে।

এখন রাশি-বিজ্ঞানের প্রয়োগের ব্যাপকতা সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে। আগেই দেখেছি যে, যেসব সমষ্টির সঙ্কলন অন্ততঃ আংশিকভাবে অনিয়ন্ত্র, যাদের লক্ষণগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পূর্ণ সুনিয়ন্ত্র নয়, সে-সব সমষ্টির আলোচনা রাশি-বিজ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বহু শাখায় এ-ধরণের সমষ্টি পাওয়া যায়: জীব-বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, প্রজন-তত্ত্ব, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, চিকিৎসাশাস্ত্র, ফলিত মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, কৃষিতত্ত্ব, পশুপালনতত্ত্ব, আবহাওয়া বিজ্ঞান, নদী বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে রাশি-বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ হতে পারে। এমন কি, একটু সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করলেই বোঝা যাবে যে, পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান রসায়ণ প্রভৃতির মত বনেদী ও তথাকথিত, সুনিয়ন্ত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ফলে যে সব রাশি পাওয়া যায়, সেগুলিও সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত বা সুনিয়ন্ত্র হয় না: ঐসব রাশিতেও কিছু কিছু অনিয়ন্ত্র-ভুল বা বিচ্যুতি থেকে যায়, যদিও পরিমাণে তা' প্রায়ই খুব কম হয়। যে সব পরিস্থিতিতে ঐ অনিয়ন্ত্র বিচ্যুতিগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, সেখানেই তাদের যথাযথ বিশ্লেষণের জন্য রাশি-বিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়। আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞানে, বিশেষতঃ পরমাণু-বিজ্ঞানে আবার অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়, যেগুলিতে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের ত্রুটি ছাড়াও, রাশিগুলি নিজেরাই মূলতঃ অল্পবিস্তর অনিয়ন্ত্র: যেমন, রেডিয়ামের আল্‌ফা-কণা বিকিরণে অথবা কস্‌মিক রশ্মির আবির্ভাবের নিয়মে। এসব ছাড়াও, পদার্থ-বিজ্ঞানের কোনও কোনও শাখায় সাঁবেকী সম্ভাবনা-গণিতের বহু ব্যবহার আছে। যেগুলিকে অবশ্য রাশি-বিজ্ঞানের প্রয়োগ বলে দাবী করছি না: যেমন, গ্যাস পরমাণুর গতিতত্ত্বে (kinetic thorey of gas), কোয়ান্টাম-তত্ত্বের সম্ভাবনা গণিতে, হাইসেন্‌বার্গের অনিশ্চয়তা-বাদে (principle of indeterminacy)। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে সম্ভাবনাতত্ত্ব যে বেশী আসর জমিয়েছে, সেকথা সুবিদিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বলবিজ্ঞানের (mechanics) নিয়মে, উনবিংশ শতাব্দীতে তড়িৎ বিজ্ঞানে, আর বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় আপেক্ষিক তত্ত্বের জ্যামিতিতে প্রকৃতির মূল সূত্রের অনুসন্ধান করা হতো; অথচ এখন অনেকেই মনে করেন যে, সম্ভাবনা-গণিতই প্রকৃতির সব লীলাখেলা নিয়ন্ত্রণ করে। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক দর্শনে সম্ভাবনা-তত্ত্বের প্রভাব কতবেশী। রাশি-বিজ্ঞানেরও এই গুরুত্বপূর্ণ সম্ভাবনা-তত্ত্বের এক বিশেষ রূপের বিকাশ হচ্ছে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিচিত্র ও বহুবর্ণ তত্ত্বের ক্ষেত্র ছাড়াও, সমাজের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নানাভাবে রাশি-বিজ্ঞানের প্রয়োগ আজ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটি মাত্র বিষয়ের উল্লেখ করছি: আবহাওয়া সম্বন্ধে ভাবিষ্যদ্বাণী করার পদ্ধতি, অপক্ক অবস্থাতেই শস্যের উৎপাদনের পরিমাণ অনুমান, শিল্পজ দ্রব্যের গুণ নিয়ন্ত্রণ, কৃষি কর্মে বিভিন্ন সার, রোপন পদ্ধতি ইত্যাদির তুলনামূলক পরীক্ষা, পশুপালনে বিভিন্ন খাদ্যের উপযোগিতা, বিভিন্ন ঔষধের রোগ-নিরাময় করার ক্ষমতা, বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক দক্ষতা বা বুদ্ধি পরীক্ষা জীবন বীমার হিসাব ইত্যাদি। তা ছাড়া রাশি-বিজ্ঞানের সম্ভাব্য আংশিক পর্যবেক্ষণের (random sampling survey) পদ্ধতিটি ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে সহজে অল্পব্যয়ে ও অল্প সময়ের মধ্যে যে কোনও বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। শস্যের উৎপাদনের হার, জনসমষ্টির আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষার বা স্বাস্থ্যের অবস্থা; দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতির ফলাফল; কোনও বিষয়ে (রাজনৈতিক সামাজিক) বা কোনও বিশেষ দ্রব্য-সম্বন্ধে (যথা চা, কফি, সাবান, সংবাদপত্র) জনসাধারণের মতামত ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে সম-সম্ভাব্য আংশিক

পর্যবেক্ষণের সাহায্যে সফলভাবে তথ্য-সংগ্রহ করা হয়েছে ও হতে পারে। এরকম পর্যবেক্ষণের পরিকল্পনা উত্তমরূপে করার কৌশল রাশি-বিজ্ঞানে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

এসব পড়ে মনে হতে পারে যে, লেখকের দাবী হলো সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই রাশি-বিজ্ঞানের প্রয়োগ ক্ষেত্র, কাজেই পূর্বনিন্দিত অতি-উৎসাহী রাশি-বিজ্ঞানীর সঙ্গে লেখকও একমত। এ-ধারণা অপসারণের জন্য রাশি-বিজ্ঞানের কার্যকারিতার সীমাও আলোচনা করা দরকার। সব সময়েই একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য, যে রাশি-বিজ্ঞান স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়,—(কেবল রাশি-তত্ত্বের স্বকীয় গবেষণার ক্ষেত্র ছাড়া),—অন্য কোনও বিষয়ে প্রয়োগেই এর সার্থকতা। গণিতের মতরাশি-বিজ্ঞানও একটি যন্ত্রমাত্র, যা অন্যের ব্যবহারে লাগে, কিন্তু আলাদাভাবে নিজস্ব কোনও ব্যবহার নেই। কাজেই রাশি-বিজ্ঞান তখনই ফলপ্রসূ হতে পারে, যখন প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্বন্ধেও উপযুক্ত জ্ঞান গবেষকের থাকে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে রাশি-বিজ্ঞান প্রয়োগ করতে হলে, অর্থনীতির জ্ঞানও অপরিহার্য। রাশি-বিজ্ঞানীর নিজের ঐ বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান না থাকলে তাঁকে কোনও, অর্থনীতি বিশেষজ্ঞের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করতে হবে। এই রকম অন্য যে কোনও বিষয়ে যেমন আবহ-বিজ্ঞানে বা কৃষিতত্ত্বে—রাশি-বিজ্ঞান প্রয়োগ করতে গেলে, সে-বিষয়েও যথাযথ জ্ঞান থাকা দরকার। সেজন্য রাশি-বিজ্ঞানের প্রয়োগ নিয়ে উচ্চাঙ্গের গবেষণা করতে হলে, রাশি-বিজ্ঞানীকে বিভিন্ন প্রয়োগক্ষেত্রের (অর্থনীতি, আবহবিজ্ঞান প্রভৃতি) যে-কোনও একটিতে নিবদ্ধ থেকে, সেই বিষয়ে বিশেষভাবে জ্ঞানসঞ্চয় করতে হবে। কেবল রাশি-বিজ্ঞানের পদ্ধতি জেনে, অন্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর না করে, সব বিষয়েই মাথা গলাতে গেলে তার ফল প্রায়ই অর্থহীন, এমন কি হাস্যকরও হয়ে পড়ে। কোনও কোনও হাতুড়ে রাশিবিদদের এরকম অনধিকার চর্চার ফলে জনসাধারণ রাশি-বিজ্ঞানের উপরই বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন,—যদিও দোষটা রাশি-বিজ্ঞানের নয়, ঐ সব "রাশিবিদ্‌দের"। অবশ্য এর বিপরীত দোষও অনেক সময় দেখা যায়: রাশি-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও যুক্তি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম না করেই, অনেকে রাশি-বিজ্ঞানের পদ্ধতি ভুলভাবে প্রয়োগ করেন, আর তার ফলও ভ্রান্তিপূর্ণ হয়।

দ্বিতীয় স্মরণীয় কথা হলো, রাশি-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি যে একেবারে নির্ভুল হতে পারে না, সেগুলি সম্ভাবনার ভাষায় করা হয়, তা স্পষ্ট স্বীকার করা উচিৎ। এরকম স্বীকারোক্তির ফলে রাশি-বিজ্ঞানের উপর সাধারণের আস্থা কমবে না, বরং বাড়বে। অথচ সে-কথা এড়িয়ে গেলে, রাশি-বিজ্ঞানের কোনও সিদ্ধান্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে না মিললে লোকে রাশি-বিজ্ঞানের পদ্ধতিকেই সম্পূর্ণভাবে অবিশ্বাস করবে। আবহাওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করার সময় ঐ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়ার (বা বিফল হওয়ার) সম্ভাবনা কত, সেকথাও বললে ভাল হয়; কোনও ছাত্রের মানসিক দক্ষতা পরীক্ষার ফলে যে সিদ্ধান্ত করা হবে, সে-সিদ্ধান্তটি ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কত, তাও জানান দরকার।

রাশিবিজ্ঞানের কার্যকারিতার সীমা সম্বন্ধে সচেতন না থাকার ফলে, এরকম নানা অপপ্রয়োগের উদাহরণ অনেক দেখা যায়। এই প্রবন্ধে সবগুলি তালিকাবদ্ধ করা সম্ভব নয়, বা তার প্রয়োজনও নেই। আর দু'একটি উদাহরণ দিলেই আশা করি যথেষ্ট হবে। অনেক সময় কোনও বিষয়ে প্রাথমিক রাশিতথ্যগুলি খুব সূক্ষ্মভাবে সংকলন করা হয় না, বা করা যায় না, সেগুলি অল্পবিস্তর ত্রুটিপূর্ণ হয়; এই রকম রাশিতথ্য নিয়ে খুব সূক্ষ্ম গবেষণা করলে তার ফলও অর্থহীন হওয়া সম্ভব। কোনও কোনও রাশিবিদকে এইরকম গবেষণাতেও ব্যাপৃত থাকতে দেখা যায়। আবার কোনও রাশিবিদ অসংগত ভাবে দাবী করেন যে রাশি-বিজ্ঞান হলো সর্বরোগ-ধন্বন্তরী বা আলাদ্দীনের আশ্চর্য প্রদীপ: যে কোনও জটিল বিষয় বা পরিস্থিতি শুধু রাশি-বিজ্ঞান প্রয়োগ

করলেই সরল হয়ে যাবে। যেমন, কেউ কেউ ভাবেন যে কেবল প্রয়োজনীয় রাশিতথ্য জানা না থাকার জন্যই রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিতে এত গণ্ডগোল হয়, শুধু রাশিতথ্যগুলি ঠিকমত জানা থাকলেই নীতিটি নিজে হতে নির্ধারিত হয়ে যাবে। কিন্তু একই রাশিতথ্যের ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকরা একপথে যেতে পারে, আর প্রগতিশীলরা অন্যপথে, সেকথা বলা বাহুল্য। জটিল বিষয় সরল করার কাজে ক্ষেত্রবিশেষে রাশি-বিজ্ঞান খুবই সাহায্য করে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা মুখ্যতঃ নির্ভর করে বিষয়টির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের উপর।

রাশি-তথ্যের ইচ্ছাকৃত অসাধুপ্রয়োগ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলার দরকার নেই, কেননা অনেকের কাছেই তা সুপরিচিত। রাশিতথ্যকে নিজের সুবিধামত সাজিয়ে ভুল সিদ্ধান্তের বাহক করার উদাহরণ প্রায়ই পাওয়া যায়। আবার অনেক অসাধু রাশিবৃত্তিজীবী বা রাশি-ব্যবসায়ী (professional statistician) সাধারণকে ধাঁধাঁয় ফেলে নিজেদের গুরুত্ব বা দক্ষতা জাহির করার জন্য সরল বিষয়কেও অনাবশ্যকভাবে খুব জটিল পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেন। রাশি-বিজ্ঞানকে নিজেদের একচেটিয়া ব্যবসায়রূপে নিবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে তারা রাশি-বিজ্ঞানের সরল পদ্ধতিগুলিকেও খুব দুর্বোধ্য ও রহস্যময় বলে প্রচার করেন, যাতে জনসাধারণের রাশিতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগ্রহ কমে যায়।

উল্লিখিত সব রকম ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন ও সাবধান থেকে রাশিবিজ্ঞান সার্থকভাবে প্রয়োগ করার যথেষ্ট সুযোগ যে বহুক্ষেত্রে রয়েছে, এ দাবী বিনা দ্বিধায় করা চলে। বহু ভুল ধারণা সত্ত্বেও যে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞেরা একথা ক্রমেই উপলব্ধি করছেন তা খুবই আশাপ্রদ। অপব্যবহার ও অসাধু প্রয়োগের হাত থেকে রাশি-বিজ্ঞানের সুনাম রক্ষা ক'রে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য ও জ্ঞান আহরণের জন্য এই বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করার একটি প্রধান উপায় হলো, এর তত্ত্বকে ব্যাপকভাবে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, সে কথা গোড়াতেই বলেছি। তার একটি পথ হলো অন্যান্য বিজ্ঞানের মত এই বিজ্ঞানকেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ নীচু শ্রেণী থেকেই (অন্ততঃ আই-এ বা আই-এস্‌সি শ্রেণী থেকে) পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন খুবই অল্প সংখ্যক ছাত্রের জন্য বি-এস-সি ও এম, এস্‌-সি শ্রেণীতে রাশি বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই সামান্য। এদিকে আমাদের দেশের শিক্ষাব্রতীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকাল অনেক রকম জাতীয় পরিকল্পনার কথা প্রায়ই শোনা যায়। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানব-সম্পদকে পূর্ণ মাত্রার শিল্প, কৃষি ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিকশিত ক'রে জনগণের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের ব্যবস্থা করতে হলে, অন্যান্য বিজ্ঞানের সমন্বয়ে রাশি-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও ব্যবহার নিয়েও যে আরও ব্যাপকভাবে গবেষণা করা দরকার, আশাকরি দেশপ্রেমিকরা সে কথা হৃদয়ঙ্গম করবেন।*

* এই প্রবন্ধে কলিকাতা রাশি-বিজ্ঞান সমিতি কর্তৃক সংকলিত পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে—লেখক।

কয়লা খরচের পরিকল্পনা

শ্রীঅক্ষয়কুমার সাহা

কয়লা খরচের আলোচনা—উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করিয়া ১৯৪৬ সালের মধ্যেই যাহাতে বাৎসরিক ৪১০০০,০০০ টন কয়লা পাওয়া যায়, ভারতীয় অন্তর্বর্তী গভর্ণমেণ্ট সেবিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন। আশাকরি, কয়লা ব্যবহারের মিতব্যয়িতার বর্ত্তমান এই পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইবে।

যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত নিয়ম অনুসারে কয়লা ব্যবহার-করিবার প্রথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সংক্ষেপে ভারতে সাধারণতঃ কি কি কাজে কয়লা খরচ হয়, তাহাই আলোচনা করিব। ১৯৩৮ হইতে ১৯৪৩ সন পর্য্যন্ত গড়ে ২৮,০০০,০০০ টন কয়লা প্রতি বৎসর খনি হইতে তোলা হইয়াছে। ইহা ধরিয়া লইলে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক কয়লা খরচের হিসাবে এইরূপ দাঁড়াইবে—

১। রেলবিভাগের জন্যই সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ প্রথম পর্যায়ের কয়লা, এমনকি পোড়া পাথুরিয়া কয়লাও ব্যয়িত হয়। এই বিভাগ প্রায় ৮,০০০,০০০ টন কয়লা প্রতি বৎসর ব্যবহার করে।

২। কয়লা খরচের দিক হইতে ইহার পরেই লোহা ও ইস্পাতের কারখানা গুলির স্থান। ইহাদের জন্য প্রতি বৎসর গড়ে ৬,০০০,০০০ টন কয়লার প্রয়োজন হয়।

৩। কেবলমাত্র কয়লার খনিগুলির কাজ চালাইবার জন্য যে কয়লা খরচ হয় এবং যাহা নষ্ট হয়, তাহার পরিমাণ একত্রে প্রায় ২,৫০০,০০০ টন দাঁড়ায়।

৪। কাপড়ের কল, চটকল ও কাগজের কল গুলির জন্য প্রায় ৩,৫০০,০০০ টন কয়লা প্রতিবৎসর ব্যয় হয়।

৫। গৃহস্থালী ব্যবহারের জন্য (উনান, segries, রাঁধিবার জন্য এবং কুকার ইত্যাদিতে) আনুমানিক ২,৫০০,০০০ টন খরচ হয়।

৬। অদাহ্য ইট ও মাটির বাসনপত্র তৈয়ারীর কাজে প্রায় ২,০০০,০০০ টন খরচ হয়।

অবশিষ্ট যে ৩,৫০০,০০০ টন উদ্বৃত্ত থাকে তাহা নৌবহর, নৌবিভাগ, পোর্ট ট্রাষ্ট ও জাহাজ তৈয়ারী ইত্যাদির জন্য ব্যয়িত হয়।

"কয়লার যুক্তি সঙ্গত ব্যবহার"—এই শব্দ সমন্বয়টি দুই দিক হইতে বিচার করা যায়। প্রথমতঃ, ইহা দ্বারা ক্ষতির পরিমাণ যত দূর সম্ভব কমান, দ্বিতীয়তঃ উপযুক্ত মানের কয়লা যাহাতে বিভিন্ন শিল্পের জন্য ব্যবহৃত হয়। ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস, উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিরই নামান্তর। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় দাহন ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে ক্ষতির পরিমাণ বহুল পরিমাণে হ্রাস করা যায়। গভর্ণমেণ্ট যে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এত ব্যগ্র, এই পরিকল্পনাটিও তাহার সহিত সমতালেই চলিবে।

কয়লার যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার

যে সকল প্রতিষ্ঠানে অধিক পরিমাণ কয়লা ব্যবহৃত হয়—তাহাতে কিভাবে কয়লা নষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষতির প্রতিকারের পথগুলি নির্দ্দেশ করিলেই এখন আমাদের যথেষ্ট হইবে।

১। সর্বাপেক্ষা বড় ক্ষতি হয় খড়ের গাদা পুড়িয়া নরম পাথুরিয়া কয়লা এবং মৌচাক হইতে

শক্ত পোড়া পাথুরিয়া কয়লা সরবরাহ করিবার ব্যাপারে। প্রত্যেক বৎসর কেবল মাত্র ঝরিয়া কয়লা কেন্দ্রেই প্রতি নমুনা হইতে ৬০,০০০,০০০ গ্যালনের অধিক আলকাতরা পুড়িয়া বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায়। ইহা ২০০,০০০ টন কয়লা ক্ষতির পরিমাণের সমান। অতি অল্প উত্তাপে কয়লাকে অঙ্গারে পরিণত করিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়া এই ক্ষতি পূরণ করা যায়। ইতিমধ্যে এই প্রথা ইংল্যাণ্ড, জার্মানী এবং রাশিয়াতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিদেশী পরিকল্পনা (installation) গুলি ক্রয় করাও ব্যয়সাপেক্ষ। এ বিষয়ে আমার সনদের (Patent) উল্লেখ করা যাইতে পারে—দরখাস্ত নং ৩৬৬০৯, তাং ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭।

২। খনির কাজ চালাইতে যে ক্ষতি হয়—যে সকল খনিতে পোড়া পাথুরিয়া কয়লা পাওয়া যায়, সেই সব খনির কাজ চালাইবার জন্যও এই কয়লাই ব্যবহৃত হয়। নিকটবর্ত্তী খনির সহিত কয়লা বিনিময় দ্বারা সহজেই এই প্রকার অপব্যবহার প্রতিরোধ করা যায়।

৩। রেল বিভাগ তাহাদের সঞ্চরণ-সহায়ক যন্ত্র (locomotive) চালাইবার জন্য প্রথম মানের কয়লা, এমনকি পোড়া পাথুরিয়া কয়লাও ব্যবহার করে। সময় সময় রেলগাড়ী কোয়েটা হইতে নকুণ্ডি-জহিদান পর্য্যন্ত যাতায়াত করিবার সময় বাংলা দেশ হইতে কয়লা লইয়া যায়। স্থানীয় নিম্ন মানের কয়লা ও ধূলা এবং ভাঙা পাথর খণ্ডের সহিত গুড় মিশাইয়া এবং তাহার পর ইহাকে ছোট ইটের আকারে অঙ্গারে পরিণত করিয়া ইঞ্জিনের অগ্নিকুণ্ডে সহজেই ব্যবহার করা যায়। ইহা অন্য ভাবে ব্যবহার করিবার উপায় নাই। ইহা আমার পরিকল্পনায়, ৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৭ তারিখে ৩৭৩০৩নং দরখাস্তে) বিবৃত হইয়াছে। জ্বালানি মিতব্যয় করিতে গুড় ব্যবহার করিলেও অনেকের আপত্তি থাকিতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, ভারতবর্ষে ১৯৪৪-৪৫ সনে ৪৭১,০০০ টন গুড় উৎপন্ন হয় এবং ১৯৪৫-৪৬ সনেই উৎপন্নের হার বৃদ্ধি পাইয়া ৪৩৩,০০০ টনে দাঁড়ায়। এই বৃহৎ পরিমাণের সামান্য এক অংশ (৫০,০০০ টন মাত্র) হইলেই বর্ত্তমানে যে নয়টি পরিস্রাবণ-গৃহ (distillery) আছে তাহার চাহিদা মিটিয়া যায়। বাকী প্রধান অংশ যাহা আপাতঃদৃষ্টিতে নষ্ট হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তাহা জ্বালানির মিতব্যয়িতার জন্য, বিশেষ করিয়া কয়লা সম্পদ সংরক্ষণের জন্যই ব্যবহৃত হইতে পারে।

৪। ধূলার আকারে কয়লার ক্ষয়—খনি হইতে কয়লা উত্তোলনের সময় শতকরা ২০ অংশ ধূলাতে পরিণত হয় এবং এই অংশ হইতে মাত্র ১০% ব্যবহারের উপযুক্ত করা হয়। অবশিষ্ট ১০% অব্যবহার্য বস্তু হিসাবে নষ্ট হইয়া যায়। এই ১০% অংশ বাৎসরিক ২,৮০০,০০০ টন কয়লার সমান। ইষ্টক আকারে অঙ্গার সরবরাহ করিয়া এই ক্ষতিপূরণ করা যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আমেরিকার মত দেশে যেখানে কয়লা সম্পদ আরও ৬০০০ বৎসর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিবে বলিয়া মনে হয়, সেখানে গভর্ণমেণ্ট বেশ কিছুদিন হইতে ইষ্টকাকারে অঙ্গার সরবরাহ কার্যে খুব উৎসাহ দিতেছেন। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীতেও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত। এইসব দেশে বৎসরে প্রায় ২,০০০,০০০ টন অঙ্গার উৎপাদন করা হয়।

৫। পোড়া পাথুরিয়া কয়লা চূর্ণের ক্ষতি—যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, বৎসরে ১,০০০,০০০ টন নরম পোড়া পাথুরিয়া কয়লা সরবরাহ করা হয় তবে ধূলার পরিমাণ দাঁড়ায় শতকরা ২০ অংশ এবং এই অংশ হইতে মাত্র ১০% গরুর চাড়ি ও মাটির গামলা তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত হয়। যে ধূলা নষ্ট হয় তাহার পরিমাণ বৎসরে ১০০,০০০ টন হয়। ইটের আকারে অঙ্গার তৈয়ারী করিতে উৎসাহ দেওয়া হ'লে এই অপব্যয় প্রতিরোধ করা যায়। সমস্ত ধূলা সংরক্ষণ করিয়া বৎসরে ৩,০০০,০০০ টন কয়লা পাওয়া যাইবে। এই কয়লা ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপার ও গৃহস্থালীর ব্যাপার উভয়েরই উপযোগী।

বৈজ্ঞানিক প্রথায় কয়লা ব্যবহার

বৈজ্ঞানিক প্রথায় কয়লা ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করিলে প্রথমেই মনে হয় কয়লা ব্যবহারের সাফল্য, অর্থাৎ কোন্ প্রথায় কয়লার দাহনক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইবে, কোন পদার্থ গ্যাসে রূপান্তরিত হইয়া বায়ুমণ্ডলে না মিশিয়া যায়, এবং যে উত্তাপ নষ্ট হয় তার পুনর্ব্যবহারের ব্যবস্থাও যেন হয়। দ্বিতীয়তঃ জ্বালানি ব্যবহারে অতি আধুনিক প্রথার প্রয়োগ।

১। রেল বিভাগ—বর্তমানে প্রচলিত সঞ্চরণ-সহায় যন্ত্রগুলিতে ঘনকরণ প্রথা প্রবর্তন করিলে জ্বালানি ব্যবহার শতকরা ১৫ হইতে ২০ অংশ পর্যন্ত হ্রাস করা যায়। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ঘনীভবন সঞ্চরণ-সহায় যন্ত্রগুলি ৬২০ হইতে ১০০০ বার জল না লইয়া কাজ চালাইতে পারে। ইহাতে শতকরা ১৫ হইতে ২০ অংশ জ্বালানি বাঁচিয়া যায়।

২। শক্তি উৎপাদনে বাষ্প উত্তোলন—বাষ্পযন্ত্র বা boiler খুব উৎকৃষ্ট প্রকৃতির এবং আধুনিক পরিকল্পনানুযায়ী হওয়াই বিধেয়। যদি প্রাচীন প্রথায় নির্মিত বাষ্পযন্ত্র একান্তই ব্যবহার করা হয়, যেমন ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইতেছে তবে ইহাদের পুনরায় বললাভ করিবার যন্ত্রের সহযোগ হওয়া প্রয়োজন, যাহা দ্বারা শতকরা পাঁচ হইতে দশ অংশ জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস করা যায়।

৩। অদাহ্য ইঁটের চুল্লীতে, কাচনির্মাণের অগ্নিকুণ্ডে, ঢালাই কাজের কারখানা ইত্যাদিতে নষ্ট উত্তাপ পুনর্ব্যবহারের জন্য ইউরোপ ও আমেরিকায় বললাভ করিবার যন্ত্র (Recuperator) এবং বল-উৎপাদনকারী যন্ত্রের (Regenerator) বহুল প্রচলন আছে। ইহার জন্য আমার ভারতীয় সনদও (দরখাস্ত নং ৩৫৩২৭, তাং ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬) সহজলভ্য।

গৃহস্থালী কার্য্যের জন্য জ্বালানির ব্যবহার—ইউরোপ, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা এবং রাশিয়ায় গৃহস্থালী ব্যাপারে জ্বালানি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাপ সঞ্চরণের জন্য ব্যবহৃত হয়; ইহার পর সেখানে রন্ধন কার্যের স্থান। ভারতবর্ষে তাপ সঞ্চরণের প্রয়োজন খুবই কম এবং কোথাও ইহার প্রয়োজন হইলেও অল্পক্ষণের জন্যই হয়। সুতরাং ধরা যাইতে পারে যে, গৃহস্থালী ব্যাপারে জ্বালানি পুরাপুরি রন্ধনের জন্যই ব্যবহৃত হয়। ভারতের অর্থাৎ উষ্ণমণ্ডলের উপযোগী রন্ধন কার্য্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত হইলেই কয়লা ও অন্যান্য জ্বালানি খরচের পরিমাণ ৫০% এর মত হ্রাস হইয়া যাইবে। এ বিষয়ে আমি সানন্দে আমার নুভেন (nuven) এর উল্লেখ করিতেছি, পেটেণ্ট নং ৩৪০৯২ তাং ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৬)। ইতিমধ্যেই ইহা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এবং বাংলার জ্বালানি প্রতিষ্ঠানগুলির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং তাহারা মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

সম্ভাবিত কয়লা সঞ্চয়

উপরি উক্ত বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত প্রথাগুলি প্রয়োগ করিলে যে মিতব্যয়িতা দৃষ্ট হইবে তাহা এইরূপ—

১। লোহার ও ইস্পাতের কারখানা হইতে কমপক্ষে ৫% সঞ্চিত হইবে। ইহাতে পাওয়া যাইবে ৩০০,০০০ টন।

২। রেলপথ হইতে কমপক্ষে ৫% সঞ্চিত হইবে, ইহার পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪০০,০০০ টন।

৩। কাপড়, চট ও কাগজের কলগুলি হইতে ৫ হইতে ১০% এর মত সঞ্চয় করা যায় এবং সেই সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ হয় ৩৫০,০০০ টন।

৪। গৃহস্থালীর ব্যবহারেও শতকরা ২০ হইতে ৫০ অংশ হ্রাস করা যায়। হ্রাসের পরিমাণ গড়ে ৩৫% ধরিয়া সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ দাঁড়াইবে ৮৭৫,০০০ টন।

৫। কোলিয়ারীগুলির কয়লা ব্যবহারের পরিমাণ

৫ হইতে ১০% হ্রাস করিয়া যাহা সঞ্চিত হয় তাহার পরিমাণ ১৮৭,০০০ টন।

৬। অদাহ্য ইট ও মাটির জিনিষপত্র তৈয়ারীর ব্যাপারেও কয়লা ব্যবহার শতকরা ১০ হইতে ২০ অংশ কমান যায়, তাহাতে আয় হয় ৩০০,০০০ টন।

৭। কাচ নির্মাণের কারখানা ও চুনের চুল্লীগুলি হইতেও ১৬% কয়লা সঞ্চয় করা যায় যাহার পরিমাণ হইবে ২৫০,০০ টন।

৮। অল্পতাপে অঙ্গারীকরণ-প্রথা প্রবর্তন করিয়া যে আয় হইতে পারে তাহার পরিমাণ ৩,০০০,০০০ টন।

মোট আয়…………৫,৭৬২,০০০ টন।

উপরে যে হিসাব করা গেল, তাহা অতি সহজ উপায়ে এবং স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যেই পাওয়া যাইবে। এস্থলে উইলিয়ম, এ, বসুর "কয়লা ও ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যবহার" এর (২০ পৃষ্ঠা) কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

"সাম্রাজ্যে যে কয়লা ব্যবহৃত হয় তাহা হইতে যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কয়লা আয় হইতে পারে তাহার হিসাব কয়লা সরবরাহের দ্বিতীয় রয়েল কমিশনের ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের রিপোর্ট হইতে পাওয়া যাইবে। বৎসরে ব্যয়িত ১৬৭,০০০,০০০ টন কয়লা হইতে যে আয় হইতে পারে তাহার পরিমাণ ৪০ হইতে ৬০ কোটী টনের মত।"

কয়লা ব্যবহারের দিক হইতে বিচার করিলে ভারতবর্ষ আজ যে অবস্থার মধ্যে আসিয়া পৌছিয়াছে তাহা ১৯০৫ সনের ইংলণ্ডের অবস্থার সমতুল্য।

সিদ্ধান্ত

যে সকল মৌলিক তথ্য ভিত্তি করিয়া কয়লা খরচের পরিকল্পনা করা হইয়াছে সেগুলি এইরূপ :—

১। যেখানে কয়লা জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয় সেখানে ঠিক প্রয়োজন মত বায়ুর মধ্যে ইহার দাহন সম্পূর্ণ হইবে।

২। দাহন ক্রিয়ায় যে উত্তাপ সঞ্চারিত হয় তাহা যাহাতে নষ্ট না হইয়া সম্পূর্ণাংশই নানাবিধ প্রয়োজনীয় কার্যে ব্যবহার করা হয়।

৩। কয়লাকে অঙ্গারে পরিণত করিবার সময় যে সকল উপজাত পদার্থ পাওয়া যায় সেগুলিকে পুরাপুরি উদ্ধার করা।

৪। উপযুক্ত পর্যায়ের কয়লা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা।

যদি এই চারিটি বৈজ্ঞানিক তথ্য কার্যে প্রয়োগ করা যায় তবে বর্তমানে যে কয়লা খরচ হয় তাহার পরিমাণ শতকরা ২০ হইতে ২৫ অংশ হ্রাস করা যায় এবং ১৯৫৬ সনেই ৩২,০০০,০০০ টন কয়লা উৎপাদন করিয়া ৪১,০০০,০০০ টন কয়লার প্রয়োজন মিটিয়া যাইবে—ইহা ১৯৪৬ সনে Coldfield committee নির্দ্ধারণ করিয়াছে। উৎপাদন ও ব্যবহার এই দুইটি দিক একই সময়ে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমাদের জাতীয় সঙ্কট দূর হইয়া যাইবে। উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করিয়াই যেন অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক প্রথায় কয়লার ইচ্ছামত খরচ করা না হয়, কারণ ইহাতে জাতীয় সম্পদের অপচয়ই হইবে।

এই পরিকল্পনাটি প্রবর্তন করিতে বর্তমানে প্রচলিত প্রথাগুলিতে সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিলেই চলিবে এবং কাজের মধ্যেও প্রতিবন্ধকতা করিয়া ইহা বিশেষ বিঘ্ন ঘটায় না। অবশ্য বৈজ্ঞানিক উপায়গুলিও সর্বদা উৎপাদন বৃদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষ লাভের সহিত সমান্তরালেই চলিয়া থাকে।

"কয়লা খরচের পরিকল্পনা"র যে নক্সাটি এখানে পেশ করা হইল তাহা বুঝিবার জন্য যে সকল মৌলিক তথ্য ও সাধারণ নিয়ম কানুন জানা প্রয়োজন—

(ক) ব্যবহারিক প্রথা

১। যে স্থানে জ্বালানি ব্যবহার হয় সেইরূপ ফ্যাক্টরী বা কারখানাতে সরকার-নিযুক্ত দক্ষ

কর্মচারীদের সে সকল স্থান পরিদর্শন। উপজাত গ্যাস সমূহের তাপ নির্ণয় এবং ইহাদের বিশ্লেষণ করাও এই কর্মচারীদের কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে। যদি এই গ্যাসের তাপ ২৫০° সেন্টিগ্রেডের বেশী হয়, অথবা যদি কয়লা চালিত কেন্দ্রে ১%এর বেশী এবং তৈল বা গ্যাসের জ্বালানিতে ০·৫%এর বেশী কার্বন-মনক্সাইড্ বর্তমান থাকে তবে ম্যানেজার যেন প্রগতিশীল দেশসমূহে প্রচলিত, সুপরিচিত ও সুপ্রমাণিত বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রয়োগ করেন। এই সকল দক্ষ ব্যক্তি পরিদর্শন, পরিচালন ও নক্সাগঠনের জন্য পারিশ্রমিক আদায় করিতে পারেন।

২। অগ্নিকুণ্ড বা বাষ্পযন্ত্রের তাপ নির্ণয় করিয়া দক্ষ ব্যক্তি যদি দেখেন যে, ইহার তাপ ১০° সেঃ এর বেশী হইয়াছে, তবে তিনি ম্যানেজারকে তাপ পরিচালনার প্রতিবন্ধক বস্তু ব্যবহারের নির্দেশ দিবেন।

৩। ঘনীভূত বাষ্পের তাপ ৭০° সেন্টিগ্রেডের ঊর্দ্ধে না উঠে, ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যদি কোন প্রকারে তাপ ইহার ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায় তবে দক্ষ ব্যক্তিগণ কারখানার কাজের উপযোগী অতিরিক্ত বাষ্প ব্যবহারের জন্য উপদেশ দিবেন।

৪। গভর্ণমেণ্ট নিজে প্রথম নরম পোড়া পাথুরিয়া কয়লা সরবরাহের জন্য একটি পরিকল্পনা করিয়া পথ প্রদর্শন করিবেন, যাহাতে উপজাত পদার্থগুলি উদ্ধার করিবার উপায়ও নির্দিষ্ট হইবে। কোন কোলিয়ারীর নিকটে এই কাজ চালান যাইতে পারে, যেখানে মধুচক্র হইতে উৎপাদিত পাথুরিয়া কয়লার চুল্লী আছে। সামান্য অদলবদল করিয়া এই চুল্লীগুলিই নরম ও শক্ত উভয় প্রকার পোড়া পাথুরিয়া কয়লা সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। এই প্রথায় উপজাত দ্রব্যগুলিও উদ্ধার করা সহজ হইবে। ঝরিয়া কয়লা খনিতে প্রায় ৩০০টি মৌচক্র পাথুরিয়া কয়লার চুল্লী আছে। (১) ভগতদি কুজামা—৭২ টি চুল্লী। (২) ইষ্টইনা ৪০, (৩) ভগতদি ৫৪, (৪) নিউ মেরিন ৫০, (৫) ধানসুর ২০ ইত্যাদি। প্রত্যেক চার্জ্জে একটি চুল্লী ৬ টন ধারণ করিতে পারে এবং নরম পাথুরিয়া কয়লা উৎপাদনের জন্য প্রত্যেক বার ৮ঘণ্টা সময় লাগে, অর্থাৎ প্রতিদিন এক একটি চুল্লী ১৮ টন নরম পোড়া পাথুরিয়া কয়লা প্রস্তুত করিতে পারে।

৫। আধুনিক সঞ্চরণ-সহায় যন্ত্রগুলির ব্যবহারোপযোগী বাষ্পযন্ত্রের নক্সা এবং সংগঠণ সরকারনিযুক্ত দক্ষ কর্ম্মচারীগণই পরিকল্পনা করিবেন।

৬। এই কর্ম্মচারীগণই ছোট ইটের আকারে অঙ্গার প্রস্তুত করিবার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের কল তৈয়ার করিবেন, যাহাতে বড় আকারে ও ছোট আকারে এইরূপ ইট সরবরাহ করা চলে। যথা—

(ক) বিরাম-বিহীন পেষণ যন্ত্র।

(খ) সবিরাম যন্ত্র—যাহা নির্দিষ্ট সময়ান্তরে স্বয়ং গতিশীল হয়।

৭। সরকারী কর্ম্মচারীগণ জ্বালানি আয় করিবার বিভিন্ন যন্ত্র (যথা—বললাভ করিবার যন্ত্র, বাষ্পযন্ত্র, গ্যাস উৎপাদনকারী যন্ত্র ও বল উৎপাদনকারী যন্ত্র) চালাইবার নিয়ম নির্দেশ করিয়া এবং তাহাদের প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন কলের মালিকদের নিকট বিজ্ঞপ্তিমূলক চিঠি পাঠাইবেন।

৮। উন্নতিশীল দেশসমূহে প্রচলিত আধুনিক প্রথা ও নিয়মগুলি আমাদের দেশেও প্রচলনের জন্য গভর্ণমেণ্টকে দৃঢ় প্রচারকার্য্য চালাইতে হইবে এবং সেগুলি শিক্ষা দেওয়ার জন্য নানা স্থানে কেন্দ্র খুলিতে হইবে। ভারতবর্ষ আজও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে, আজও সে পূর্ববর্ত্তী গবেষণার প্রসার ও প্রচলনের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া নূতন গবেষণামূলক তথ্য আবিষ্কারের উপর দৃষ্টি দিতে পারিতেছে না।

(খ) ব্যবস্থাপন

আমাদের দেশে জ্বালানি, বিশেষ করিয়া কয়লার, প্রাকৃতিক সম্পদ যাহাতে অন্যায়ভাবে নষ্ট না হয়

তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ চালাইতে হইলে নিম্নলিখিত আইন সমূহ প্রয়োগ করিতে হইবে—

১। শক্ত অথবা নরম পোড়া পাথুরিয়া কয়লা উৎপাদন করিবার সময় উপজাত পদার্থসমূহ অবশ্য উদ্ধার করিতে হইবে।

২। কারখানা বা ফ্যাক্টরী হইতে ২৫০° সেন্টিগ্রেডের অধিক তাপে ধূম নির্গত হইতে দেওয়া চলিবে না।

৩। কয়লা পরিচালিত অগ্নিকুণ্ডগুলি হইতে যে ধূম নির্গত হইবে তাহাতে যেন শতকরা এক অংশের বেশী, এবং তৈল বা গ্যাস পরিচালিত অগ্নিকুণ্ড হইতে নির্গত ধূমে যেন ০·৫০% এর বেশী কার্বন-মনক্সাইড্ না থাকে।

৪। অতিরিক্ত বাষ্প যেন নষ্ট না হয় এবং ৭০° সেন্টিগ্রেডের বেশী উত্তাপের বাষ্প ঘনীভূত হইলেও কাজে লাগাইতে হইবে।

৫। যে পাত্রে তাপ সংযোগ করা হয়, তাহার বাহিরের প্রাচীরের উত্তাপ যেন ৭০° সেন্টিগ্রেডের উর্দ্ধে না উঠে, অর্থাৎ পাত্রগুলি যাহাতে তাপ পরিচালনের প্রতিবন্ধক হয় তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৬। সাধারণ কয়লা, পোড়া পাথুরিয়া কয়লা এবং অঙ্গার-চূর্ণ যাহাতে খুব বেশী পরিমাণ ভাঙ্গা পাথরের টুকরার সহিত না মিশিয়া যায়, বা ইহার সহিত একত্রে না পোড়ান হয়, তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কয়লার গুঁড়া প্রথমতঃ ছোট ছোট ইটের আকারে অঙ্গারে পরিণত করিয়া, অথবা চূর্ণ করিয়া অবশেষে দাহকে (Burner) ব্যবহার করিতে হইবে।

৭। পোড়া পাথুরিয়া কয়লা যাহাতে বাষ্পযন্ত্র বা অগ্নিকুণ্ডে ব্যবহার না করা হয়, ইহা কেবলমাত্র ধাতু উত্তোলনের জন্যই ব্যবহৃত হয়, ইহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

"সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণ বিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব। একথা যদিও অনেক পরিমাণে সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত তাহা হইলে অন্য দেশে যেখানে পরীক্ষাগার নির্ম্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে সেস্থান হইতে প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার হইত। কিন্তু সেরূপ সংবাদ শোনা যাইতেছে না। আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য, কিন্তু পরের ঐশ্বর্য্যে আমাদের ঈর্ষা করিয়া কি লাভ? অবসাদ ঘুচাও। দুর্বলতা পরিত্যাগ কর, মনে কর আমরা যে অবস্থাতে পড়ি না কেন সেই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা। ভারতই আমাদের কর্ম্মভূমি, এখানেই আমাদের কর্ত্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরষ হারাইয়াছে সেই বৃথা পরিতাপ করে।"

—আচার্য জগদীশচন্দ্র

মাটির জৈবাংশ

শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

আমরা সচরাচর বিভিন্ন রংএর মাটি দেখতে পাই। মাটিতে অবস্থিত নানা রাসায়নিক সংযুক্তি-সম্পন্ন লৌহভস্ম ও জৈব-বস্তুর মিশ্রণে এই সব রঙীন মাটির সৃষ্টি হয়। কালোর প্রলেপ থাকলে বুঝতে হবে যে, মাটিতে জৈব বস্তুর প্রাধান্য রয়েছে। কালোর গাঢ়তা জৈব-বস্তুর পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, সাধারণতঃ রৌদ্রে শুকানো মাটির রং বিচার করাই সমীচীন; কারণ জলের কম বেশীতে একই মাটির রং ফিকে বা গাঢ় মনে হ'তে পারে। কৃষকদের কাছে কালো বা গাঢ় বাদামী রংএর মাটির কদর খুব বেশী—এ থেকেই বোঝা যায়, জৈব বস্তুর মূল্য সম্বন্ধে তারা কতখানি সচেতন।

কৃষিশস্য উৎপাদিত না হ'লে মাটিতে আগাছা জন্মাবেই। আগাছা বাড়তে দিলে অনায়াসে ঝোপ-ঝাড় থেকে আরম্ভ করে এমনকি, বড় বড় গাছও হ'তে পারে। এমনি করেই বন-জঙ্গলের সৃষ্টি হয়। কৃষি-শস্যের বেলা তাদের অবশিষ্ট অংশ (কাণ্ড বা শিকড় ইত্যাদি) এবং বন-জঙ্গলে বা অন্যত্র গাছের ঝরা পাতা মাটিতে ক্রমশঃ সঞ্চিত হ'তে থাকে। রৌদ্র, জল, বাতাস এবং নানাবিধ জীবাণুর প্রভাবে সঞ্চিত উদ্ভিজ্জ বস্তুর পচনক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই পচনক্রিয়ার গতি-পরিণতি খানিকটা নির্ভর করে রৌদ্র, জল, বাতাস ও জীবাণুর কার্যের তীব্রতা ও সময়ের ব্যাপ্তির উপর এবং আংশিকভাবে মূল উদ্ভিজ্জ বস্তুর রাসায়নিক উপাদানের উপর। উপরিউক্ত প্রভাবগুলির তীব্রতা অধিকমাত্রায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হ'লে জৈবাংশ সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট হ'তেও পারে। কিন্তু সাধারণতঃ এই পচনক্রিয়ার সম্পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটে না, এবং এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন তার গতিমাত্রা অত্যন্ত শ্লথ হ'য়ে পড়ে। সেই অবস্থায় যে রাসায়নিক মিশ্র পদার্থের উদ্ভব হয় তার বর্ণ ঘোর কালো অথবা বাদামী। অজৈব অংশ, বিশেষ ক'রে রঙীন লৌহভস্ম ও এই জৈব বস্তুর সংমিশ্রণে মাটি বিভিন্ন বর্ণাভা প্রাপ্ত হয়। এই প্রায় অপরিবর্তিত জৈবাংশের নাম দেওয়া হয়েছে 'হিউমাস' (humus)।

উৎপত্তি—হিউমাস বহুবিধ রাসায়নিক উপাদানে গঠিত একটি মিশ্র অথবা অসংলগ্ন যৌগিক পদার্থ। যৌগিক পদার্থের উপাদানগুলির মধ্যে যে দৃঢ় বন্ধন থাকে, হিউমাসে তার অভাব পরিলক্ষিত হয়, অথচ সেই বন্ধন ভাঙ্গারও কোন সহজ প্রক্রিয়া নেই। এই উপাদানগুলিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) শর্করা জাতীয় (সেলুলোজ, লিগনিন্); (২) প্রোটিন জাতীয়; এবং (৩) চর্বি, রজন ও মোম জাতীয়। সাধারণতঃ প্রথম দুই জাতীয় উপাদানের পরিমাণ ও প্রভাবই হিউমাসের ধর্ম নির্ধারণ করে।

মূল উদ্ভিজ্জ বস্তুর পরিমাণের উপর হিউমাসের পরিমাণ নির্ভর করাই স্বাভাবিক। অত্যধিক জীবাণু বা রৌদ্র-জল-বাতাসের প্রভাবে হিউমাস সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট হয়ে কার্বন-ডাইঅক্সাইড, জল এবং সামান্য অজৈব লবণে পরিণত হ'তে পারে। এই লবণাংশের উৎপত্তি মূল উদ্ভিজ্জের উপাদান থেকে। এই চরম অবস্থায় মাটিতে জৈবাংশের পরিমাণ একেবারে

থাকে না বললেই চলে। যেখানে তাপ কম, জীবাণুর কার্যক্ষমতাও অপেক্ষাকৃত শ্লথ, সেখানে যদি উদ্ভিজ্জের পরিমাণ অপ্রচুর ন হয় তবে হিউমাসও অনেক বেশী সঞ্চিত হ'তে পারে। এই কারণে শীতপ্রধান অথবা নাতিশীতোষ্ণ দেশের মাটিতে হিউমাসের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু উষ্ণপ্রধান দেশে, যেমন ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই, হিউমাসের পরিমাণ অত্যন্ত কম (সাধারণতঃ ১% এরও কম); এবং সম্পূর্ণ গলিত অবস্থায় পরিণত হয় ব'লে বৎসরের কোন সময়েই অধিক পরিমাণে হিউমাস মাটিতে জমতে পারে না। যেখানে নিয়মিত কৃষিশস্যাদি জন্মানো হয়, সেখানে পচনক্রিয়া প্রবলতর হয় বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হিউমাসের সৃষ্টিও হয়। যেখানে চাষ করা হয় না সেখানে হিউমাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়—এই জন্যই দেখা যায়, পতিত জমির মাটির বর্ণ হিউমাস থাকার জন্য অধিকতর কালো।

হিউমাসের কাজ ও ধর্ম—হিউমাসের পচনক্রিয়ার গতি ও পরিণতি মাটির উর্বর-ক্ষমতা বহুলাংশে নির্ধারণ করতে পারে। পচনের ফলে যে তেজোৎপত্তি ঘটে তা দ্বারা জীবাণুর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সব জীবাণুর মধ্যে কতকগুলো জীবাণু বাতাসের নাইট্রোজেনকে গাছের উপযোগী করে আহরণ করতে পারে। এদের সংখ্যা যত বাড়বে নাইট্রোজেনও গাছের খাদ্যে পরিণত হবে সেই পরিমাণে। তা'ছাড়া এই সব জীবাণুর দেহাবশেষ মাটির নাইট্রোজেন বৃদ্ধি করে।

গাছের শরীর গঠন ও রক্ষণ কার্যে পটাসিয়ম, ফসফরাস, ক্যালসিয়ম ইত্যাদি অজৈব পদার্থের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা মার্চ সংখ্যার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' এ করা হয়েছে। সাধারণতঃ মাটির সহায়তায় গাছ উপাদানসমূহ গ্রহণ করে; হিউমাসের ধারণশক্তি মাটির অজৈব অংশের তুলনায় ৩—৫ গুণ বেশী। এইজন্য মাটির উর্বরক্ষমতা রক্ষাহেতু হিউমাসের পরিমাণ যথেষ্ট থাকা প্রয়োজন। এছাড়া মাটির ভৌতধর্ম সুষ্ঠু রাখতে হিউমাসের তুলনা নাই।

মোটামুটি বলা যেতে পারে যে, পাহাড় পর্বতের শিলাখণ্ড ভেঙ্গে ভেঙ্গে জল বাতাসের প্রভাবে মাটির উৎপত্তি হয়। কিন্তু একই রকম শিলাখণ্ড থেকে বিভিন্ন প্রকারের মাটি উৎপন্ন হওয়ার নজীর রয়েছে। এই বিভিন্নতা সৃষ্টির মূলে হিউমাসের প্রভাব প্রধান তম। হিউমাস অধিকপরিমাণে জমা হয় মাটির আস্তরণের উপর। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হিউমাস মাটির আস্তরণস্থিত অজৈব মৃত্তিকা কণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত থাকে, কখন কখন একটা পৃথক আস্তরণেরও সৃষ্টি করে। জলের স্বাভাবিক আধোগতির ফলে প্রায়ই হিউমাস অল্পবিস্তর নীচের দিকে বাহিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে তথায় অবস্থিত মাটির ভৌতধর্মের উন্নতি সাধন করে। তৃণাচ্ছাদিত জমিতে হিউমাস অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হতে পারে, এই জন্য যে সব জমির হিউমাস বহুলাংশে হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছে তাকে তৃণাচ্ছাদিত রাখবার প্রথা প্রচলিত আছে। রাশিয়া ও আমেরিকার বিখ্যাত উর্বর চেরনোজেম (chernozem) মাটিতে এক একরে ৩১৫ হাজার মণ পর্যন্ত হিউমাস সঞ্চিত থাকে। এই পরিমাণ হিউমাস খাদ্যবস্তু দ্বারা বছরে ১'৫—৮ শত মণ মাটিতে সংরক্ষিত হয়। ভারতের নাগপুর, মধ্য ভারতের কয়েকটি স্থান এবং মাদ্রাজে কালোমাটির উর্বরক্ষমতা বহুপরিচিত। কেহ কেহ এই কালো মাটির সঙ্গে চেরনাজেমের তুলনা করেন, কিন্তু ভারতীয় কালোমাটির ধর্মের জন্য হিউমাসই যে প্রধাণতঃ দায়ী, তা বলা চলে না।

মাটির অজৈব অংশের সঙ্গে যে বহুমূল্য উপাদানটির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সে হ'ল নাইট্রোজেন। গাছের প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেনের প্রধান ভাণ্ডার হিউমাস। হিউমাসের সঙ্গে নাইট্রোজেনের যৌগিক মিলন এত সুদৃঢ় যে, হিউমাসের অবস্থিতিতে নাইট্রোজেন মাটি থেকে নষ্ট হতে পারেনা। গাছ ও

জৈব নাইট্রোজেন গ্রহণে অপারগ। গাছের সহায়তা করে অসংখ্য জীবাণু, জৈব অংশই আবার এই জীবাণুর জীবনধারণ ও সংখ্যাবৃদ্ধির কাজে সাহায্য করে। জীবাণুগুলি নাইট্রোজেনকে নাইট্রেট্ লবণে পরিণত করে এবং গাছ এই আকারেই নাইট্রোজেন গ্রহণে সমর্থ হয়। জৈব-পদার্থের পচনক্রিয়ার ফলে মাটিতে প্রায়ই অ্যাসিডের উদ্ভব হয়। অ্যাসিডের পরিমাণ খুব বেশী হলে একদিকে যেমন ক্যাল সিয়মের ঘাটতির আশঙ্কা করা যায়, অন্যদিকে অ্যাসিডের অবস্থিতির দরুণ জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধি এবং ক্রিয়া স্থগিত থাকে। এই জন্য জৈব-পদার্থের পচনক্রিয়াকালীন উদ্ভূত অ্যাসিডের আধিক্য যাতে না ঘটে অ্যাসিড প্রশমনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ চুণ থাকা প্রয়োজন। চুণের পরিমাণ এবং প্রয়োগ কাল এমনভাবে নির্ণয় করা যায়, যতে জীবাণুর সাহায্যে পরিণত নাইট্রেট লবণ, গাছ উপযুক্ত সময় পেতে পারে।

জৈব-বস্তুর সংস্পর্শে ফস্‌ফরাস্ যে সব যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত করে গাছ সেই ফস্‌ফরাস্ গ্রহণে অসমর্থ। তা'হলে দেখা যাচ্ছে, জৈবপদার্থের প্রয়োগে ফস্‌ফরাস্ গ্রহণে বাধার সৃষ্টি হ'তে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, যদি জৈব-বস্তুর সঙ্গে পরিমিত চূণ থাকে তবে জৈব-বস্তুর পচনক্রিয়াকালীন উদ্ভূত যবক্ষারযান বা কার্বন-ডাই অকসাইড্ ফস্‌ফরাসকে ক্যালসিয়ম ফসফেটে রূপান্তরিত করতে পারে। বেশী কার্বন-ডাই অকসাইড্ থাকলেই গাছ এই প্রকার ফস্‌ফেট্ আহরণ করতে সমর্থ হয়, সুতরাং কার্বন-ডাই অকসাইডের চাহিদা মেটাবার জন্য যথেষ্ট হিউমাস মাটিতে থাকা দরকার।

কেহ কেহ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, জৈব-সার সাহায্যে উৎপন্ন শস্য যে কেবলমাত্র পরিমাণেই বেশী হয় তা নয়, শরীর পুষ্টির জন্যও ঐ শস্য অধিকতর কার্যকরী। এইরূপ ধারণা করা হয় যে, সম্ভবতঃ জৈব-সারের প্রয়োগে শস্যের অভ্যন্তরে হরমোন জাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং তারই ফলে প্রাণীর দেহের পুষ্টি সাধিত হয়।

হিউমাসের নাশ ও তার প্রতিকার— হিউমাসের মত বহুমূল্য বস্তু কিভাবে নষ্ট হয় এবং কি উপায়েই বা তাহা পুনরুদ্ধার সম্ভব, তা জানা দরকার। পতিত জমির উর্বরক্ষমতা আমাদের কৃষকদের কাছে অবিদিত নয়। উর্বরতার প্রধান কারণ হল অধিক পরিমাণে হিউমাস সঞ্চয়। ক্রমাগত চাষের ফলে হিউমাস ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সুতরাং লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে হিউমাস উৎপাদনকার্যও নিয়মিত সম্পন্ন হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অর্দ্ধগলিত জৈব-বস্তু গাছের কোন উপকারেই লাগেনা। যে পর্যন্ত না পচনক্রিয়ার ফলে হিউমাস প্রস্তুত হয় সে পর্যন্ত ঐ জৈব-বস্তু মূল্যহীন। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে যে, মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে জৈব-বস্তু রয়েছে কিন্তু জল নিষ্কাশনের বন্দোবস্ত না থাকায় মাটির উপরিভাগে হয়ত জল সঞ্চিত হয়েছে এবং অভ্যন্তরে বাতাস চলাচল বন্ধ হয়েছে। এইরূপ অবস্থার উদ্ভবহেতু পচনক্রিয়া ঠিকমত সম্পন্ন হতে পারেনা এবং জৈব-বস্তু অধিকপরিমাণে থাকলেও কার্যকরী হয়না। ঐ জৈববস্তুকে হিউমাসএ পরিণত করতে হলে জল ও বাতাস চলাচলের সুবন্দোবস্ত দরকার। তা হলেই সঙ্গে সঙ্গে জীবাণুর ক্রিয়া আরম্ভ হয়। মোট জৈব-বস্তুর পরিমাণ হ্রাস প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু কার্যকারিতা বহুগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হিউমাসের কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত ১০ : ১। মাটির কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত ১০ : ১ এর কম বা বেশী হলে বুঝতে হবে যে, মাটির কাজ সুষ্ঠুভাবে চলছে না, সুতরাং ঐ অনুপাত ১০ : ১-এ আনবার বন্দোবস্ত করতে হবে। এই অনুপাতের মূল্য ১০: ১ থেকে অন্যথা হ'লে যে গাছ বাঁচতে পারবে না, এমন ধারণা করা ঠিক হবে না, তবে নিয়মিতভাবে বাড়বার পক্ষে বাধা জন্মাতে পারে। টাট্‌কা জৈব-

বস্তুর প্রয়োগে কার্বন, নাইট্রোজেনের অনুপাত বাড়ে, কারণ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে কার্বন দেওয়া হ'ল। এই প্রয়োগের ফলে যদি ১০ : ১ এর থেকে খুব বেশী বাড়ে তবে জীবাণুর ক্রিয়া মন্দীভূত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে জৈব-বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে অল্প পরিমাণ নাইট্রোজেনযুক্ত লবণ থাকা ভাল। অন্যথা যদি ১০:১ এর চেয়ে কম হয় তখন বুঝতে হবে যে, জীবাণুর ক্রিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত হারে চলেছে। সুতরাং এই হারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখবার জন্য টাট্‌কা জৈব-বস্তুর প্রয়োগ অবশ্য প্রয়োজনীয়।

চাষের ফলে কি পরিমাণ হিউমাস নষ্ট হয় পার্শ্ববর্তী পতিত জমির সঙ্গে কর্ষিত জমির তুলনা করলেই বোঝা যাবে। দেখা গিয়েছে যে, ৬০ বৎসর ক্রমাগত ফসল তোলার ফলে ১০০ বৎসরের সঞ্চিত হিউমাসের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে। হিউমাসের অভাবে মাটির আনুষঙ্গিক ভৌতধর্মেরও যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হয় এবং মাটির উৎপাদন শক্তি বা ফলনক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়।

দেখা যায় যে, হিউমাসের পরিমাণই মাটির উর্বরক্ষমতার পরিমাপক নয়। হিউমাসকে কার্যকরী অবস্থায় রাখতে হ'লে উপযুক্ত আবেষ্টনীর (যথা—জল, বাতাস, তাপ ও চুণ) প্রয়োজন, নয়তো হিউমাস সম্পূর্ণ অকেজো হ'য়ে প'ড়ে থাকবে। হিউমাসের পচনক্রিয়ার ফলেই গাছ নানাবিধ প্রয়োজনীয় উপাদান মাটি থেকে আহরণ করার সুযোগ পায়, সুতরাং স্বাভাবিক আবহাওয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখে মাটিতে হিউমাসের প্রয়োগের পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে। তাপ, জল ও বাতাসের প্রখরতা যত বেশী, হিউমাসের স্বাভাবিক চাহিদাও ততোধিক। এই নিয়মেই কৃষিকার্যের তীব্রতার সঙ্গেও সামঞ্জস্য রেখে হিউমাসের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। কার্বন, নাইট্রোজেন অনুপাত ১০ : ১ মূল্যে রাখতে হ'লে কেবলমাত্র খড়ের মত কার্বনবহুল বস্তু দিলেই চলবে না. কারণ তাতে জীবাণুর ক্রিয়ার গতিহার বৃদ্ধি করা যায় বটে, কিন্তু পরিশেষে কার্বন, নাইট্রোজেন অনুপাত তেমন বাড়ে না। এইজন্য নাইট্রোজেন-বহুল বা নাইট্রোজেন আহরণে পটু লেগিউম্ জাতীয় (শিম, অরহর, ধঞ্চে ইত্যাদি) সবুজ সারই প্রকৃষ্ট। এই ব্যবস্থায় একই সময়ে মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণ কার্বন ও নাইট্রোজেন দেওয়া যেতে পারে এবং এই কারণে সবুজ সারের বহুল প্রচলন নিতান্ত প্রয়োজন। খড়ের সঙ্গে যদি বাইরে থেকে নাইট্রোজেনযুক্ত লবণ প্রয়োগ করা যায়, তাতেও শেষ পর্যন্ত কার্বন, নাইট্রোজেনের অনুপাত ঠিক রাখা সম্ভব। এই প্রথা য়ুরোপের বহু জায়গায় প্রচলিত। এই সম্পর্কে গোবর-সারের মত সস্তা ও উপযুক্ত সার আর দ্বিতীয় নেই। কম্পোস্ট প্রস্তুত প্রণালীতে খড় ইত্যাদি কার্বনবহুল জৈব-বস্তুকে উপযুক্ত সারে রূপান্তরিত করার মূলে একই নির্দেশ রয়েছে।

অপচয় প্রতিরোধ করাও উদ্ধারের এক উপায়। অবাঞ্ছিতভাবে শস্য বপন করা এবং ফসল তোলা বন্ধ করা দরকার। ঢালু জমিতে জলের প্রকোপে প্রায়ই মাটির আস্তরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই আস্তরণে অবস্থিত হিউমাসের ক্ষয়ই অত্যধিক। তৃণজাতীয় উদ্ভিদের প্রভাবে একদিকে যেমন এই ক্ষয় প্রতিরোধ করা সম্ভব, অন্যদিকে হিউমাস প্রস্তুতিকার্যেরও সহায়তা হয়। সুতরাং মাঝে মাঝে (তিন বৎসর পর-পরই যথেষ্ট) তৃণাচ্ছাদন কৃষিকার্যের অঙ্গীভূত করা সমীচীন। এই তৃণাচ্ছাদন মাটিতে পরিমিত জল সংরক্ষণ কার্যেও প্রভূত সাহায্য করে। আমেরিকায় ও অন্যান্য দেশে তৃণাচ্ছাদন প্রথাকে চালুকরার জন্য বহু অনুসন্ধান ও প্রচার কার্য করা হয়েছে ও হচ্ছে। দেখা গেছে যে, তিনবছর পরপর তৃণাচ্ছাদনের ফলে নিয়মিত চাষ করলেও জৈব-বস্তু তথা হিউমাসের পরিমাণ অন্যান্য প্রক্রিয়ার তুলনায় খুব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশেও যে এই বিষয়ে অনুসন্ধানের যথেষ্ট দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আছে, সে কথা অনস্বীকার্য।

ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়

নেগ্রিটো সংমিশ্রন

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন মনুষ্য গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের ক্রমিক স্তরবিন্যাস (ethnic stratification) সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী সমাজে যে মত প্রচলিত মোটামুটি তাহা এইরূপ :—

নেগ্রিটো নিষাদ (অন্যান্য নাম প্রোটো অষ্ট্রালয়েড, বেদ্দাইক, প্রাক্-দ্রাবিড়, মুণ্ডা ইত্যাদি)।

মোঙ্গলয়েড, মেডিটারেনীয়ান (অন্যান্য নাম ব্রাউন জাতি, দ্রাবিড়, বাদারিয়ান, প্যালী মেডিটারেনীয়ান, ইণ্ডাস টাইপ, ওরিয়েণ্টাল ইত্যাদি)।

পাশ্চাত্য গোলমুণ্ড (অন্যান্য নাম আলপাইন, আর্মেনয়েড, আল্পোদিনারিক, পামীরী, অবৈদিক আর্য ইত্যাদি)

আর্য সম্পর্কিত লম্বামুণ্ড (অন্যান্য নাম ইন্দো-এরিয়ান, ইন্দো-আফগান, বৈদিক আর্য, প্রোটো নর্ডিক, নর্ডিক ইত্যাদি) এই ethaic stratification সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবন্ধে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করা হইবে। প্রথম আলোচ্য বিষয়, নেগ্রিটো সংমিশ্রণ।

কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিত মনে করেন, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সংমিশ্রণের যে স্তরবিন্যাস দেখা যায় তাহার মধ্যে প্রথম স্তর নেগ্রিটো সংমিশ্রণ। তাঁহাদের মত এইরূপ যে, ভারতবর্ষের প্রচীনতম অধিবাসী ছিল নেগ্রিটো গোষ্ঠী। যে ভাবেই হউক ভারতবর্ষের মধ্যে এই গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নেগ্রিটো গোষ্ঠীর লোক, এই মত অনেক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের প্রথম আপত্তি, যাহাকে নেগ্রিটো লক্ষণ বলা হয় সেই সকল লক্ষণ সম্বন্ধে। তাঁহাদের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, অতিশয় সীমাবদ্ধ অঞ্চলে এই সকল লক্ষণের যে সামান্য পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নেগ্রিটো ছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক। এই দলের কেহ কেহ মনে করেন ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ নাই। কেহ কেহ আবার বলেন, যে-টুকু সংমিশ্রণ দেখা যায় তাহা ভারতবর্ষের বাহিরের নেগ্রিটো অঞ্চল হইতে আসিয়াছে।

এ সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীগণের দুই পক্ষের যুক্তি ও মতের সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে। এই আলোচনার ফলে কিরূপ সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব দেখা যাইবে।*

দক্ষিণ ভারতের অরণ্য ও পার্বত্য অঞ্চলের কাদার, পুলায়ান প্রভৃতি কয়েকটি উপজাতির কোন কোন লোকের মধ্যে নেগ্রিটো গোষ্ঠীর কোন কোন দৈহিক লক্ষণের সহিত কিছু সাদৃশ্য de Quatrefages, Deniker, প্রভৃতি নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর ক্রমে এই মত দানা বাঁধিতে থাকে যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে প্রাচীনতম স্তর নেগ্রিটো গোষ্ঠী। ইটালীয়ান নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী Giuffrida Ruggeri Huising, Biasutti

---

* দুই পক্ষের প্রমাণ ও যুক্তি নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের সূত্র মতে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের Races of India নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ (Anthropological papers, New Series No 4, 1935, Calcutta University দ্রষ্টব্য)।

ও Sergi-র অভিমত মানিয়া হইয়া নেগ্রিটো-বাদের সমর্থনে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। ইঁহাদের পরে বাঙ্গালী নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহ নূতন করিয়া দক্ষিণ ভারতে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ আবিষ্কার করিবার দাবী করিয়াছেন। অন্যান্য গ্রন্থের উল্লেখ না করিয়া বলা যায় যে, Giuffrida Ruggeri-র First outlines of a Systematic Anthropology of Asia-র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। ১৯২৮ ও ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে Nature পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া ডাঃ গুহ বলিতেছেন যে, তাঁহার অনুসন্ধানের ফলে সর্বপ্রথম কাদার, মলয় প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ আবিষ্কৃত হয় ("...disclosed for the first time the presence of a negrito racial strain among these tribes")। আসামের ভূতপূর্ব ডেপুটি কমিশনার ও প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ডাঃ হাটন, ডাঃ গুহের এই দাবী মানিয়া লইয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে নেগ্রিটো গোষ্ঠীর মানুষের উপস্থিতি ডাঃ গুহ নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করিয়াছেন। শুধু এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই, ভারতবর্ষের সভ্যতা ও কৃষ্টি, নেগ্রিটো গোষ্ঠীর মানুষের নিকট কি পরিমাণে ঋণী তাহাও নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন।

দক্ষিণ ভারতের পেরাম্বিকুলাম ও আন্নামালাই পর্বত অঞ্চলে কাদার, পুলায়ান প্রভৃতি উপজাতিকে নিগ্রিটো গোষ্ঠীর বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কয়েকটি লোকের কেশের বৈশিষ্ট্যের (Spirally curved hair) জন্য। ডাঃ হাটন বলেন, দক্ষিণ ভারত ছাড়া আসাম ও ব্রহ্মের মধ্যবর্তী অঞ্চলে নেগ্রিটোর অনুরূপ কেশবিশিষ্ট (frizzly hair) লোক অঙ্গমী নাগাদের মধ্যে দেখা যায়। তারপর রাজমহল অঞ্চলে পশমের মত কেশ বিশিষ্ট (wooly hair) এক বাগ্‌দী আবিষ্কৃত হইয়াছে। নেগ্রিটো গোষ্ঠীর অন্যান্য দৈহিক লক্ষণের কথা বিশেষ বিবেচনা না করিয়া শুধু কেশের বৈশিষ্ট্যের জন্য এইরূপ মত প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্তে অঙ্গমী নাগা, রাজমহলের বাগ্‌দী ও দক্ষিণ ভারতের কাদার প্রভৃতি উপজাতি নেগ্রিটোগণের বংশধর।

নেগ্রিটো গোষ্ঠীর অন্যান্য দৈহিক লক্ষণ ইহাদের মধ্যে কতখানি দেখা যায় তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। Sergi ও Biasutti উভয়েই কাদারদিগের মধ্যে পশমের মত চুল, চ্যাপ্টা নাক ও নিগ্রোলক্ষণযুক্ত মুখ দেখিতে পাইয়াছেন। ডাঃ গুহের বর্ণনা ইহাদের বর্ণনার সঙ্গে মিলে না। আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের আদিম অধিবাসীদিগকে প্রকৃত নেগ্রিটো বলা হয়। ডাঃ গুহের মত এইরূপ যে, কাদার দিগের দৈহিক লক্ষণের সহিত আন্দামানের নেগ্রিটো অপেক্ষা মালয়ের সেমাং ও মেলানেশিয়ার (নিউগিনি) আদিম অধিবাসীদের দৈহিক লক্ষণের সাদৃশ্য বেশী দেখা যায়। ডাঃ হাটন নিজে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আসাম ও ব্রহ্ম সীমান্তে যে নেগ্রিটো প্রাচীন স্তরের কথা বলা হইয়াছে প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাকে মেলানেশিয়ান সংমিশ্রণের পরিচয় বলা যাইতে পারে। রাজমহলের আবিষ্কারেও কেশের বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। ডাক্তার গুহ, হাটন প্রভৃতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিতে হয় যে, দক্ষিণ ভারত ও আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তের উল্লিখিত উপজাতিগুলির মধ্যে নেগ্রিটো অপেক্ষা মেলানেশিয়ান সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়।

সে যাহা হউক, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে এইভাবে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ আবিষ্কৃত হওয়ার পরে প্রশ্ন উঠিয়াছে, এই সংমিশ্রণ কিভাবে আসিল। যাহারা নেগ্রিটোবাদের সমর্থন করেন উপরে উল্লিখিত প্রমাণের উপর থিওরী দাঁড় করাইবার জন্য তাঁহাদিগকে বলিতে হইয়াছে যে, সমগ্র ভারতবর্ষে নেগ্রিটো গোষ্ঠীর লোক ছিল আদিম অধিবাসী। বাস্তবিক আসাম ও ব্রহ্মের সীমান্ত অঞ্চলে, দক্ষিণ ভারতের শেষ প্রান্তে ও বঙ্গদেশের

সীমান্তে রাজমহল পাহাড়ে আবিষ্কৃত নেগ্রিটো সংমিশ্রণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইলে এরূপ অনুমান করিতে হয় যে, এক কালে সমগ্র ভারতবর্ষে এই গোষ্ঠীর মানুষ ছড়াইয়া ছিল। ভারতবর্ষে নেগ্রিটোবাদের প্রচারে এইভাবে তিনটি পর্যায় দেখা যাইতেছে। প্রথমে শুধু দক্ষিণ ভারতের প্রান্ত সীমায়, তারপর ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে নেগ্রিটো সংমিশ্রণের কথা বলা হইয়াছে। শেষ পর্যায়ে দেখা যাইতেছে, নেগ্রিটো গোষ্ঠী ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের করোটি, কংকাল প্রভৃতি মনুষ্যদেহের যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে এই অনুমান সমর্থিত হয় না। এ জন্য এই থিওরী সম্বন্ধে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। এই সন্দেহ দূর করিতে পারে এরূপ যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া নেগ্রিটোবাদের সমর্থনকারী পণ্ডিতগণ অন্য পথে গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, নেগ্রিটো গোষ্ঠী শুধু ভারতবর্ষের নহে, পরন্তু সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আদিম অধিবাসী।

এই প্রসঙ্গে Huising-এর অনুসরণ করিয়া 'Giuffrida Ruggeri' যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের পশ্চিমে অবস্থিত অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক যুগের অধিবাসীদিগের আনুমানিক স্তরবিন্যাস হইতে ভারতবর্ষে নেগ্রিটোর উপস্থিতির সূত্র পাওয়া যাইতে পারে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এখানে প্রমাণের অনুসন্ধানে ভারতবর্ষের বাহিরে এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগ পর্যন্ত যাওয়া হইতেছে। তাঁহার মতে নেগ্রিটো গোষ্ঠীর সংজ্ঞায় পড়ে এরূপ দৈহিক লক্ষণ-যুক্ত (with equatorial characters) আদিম অধিবাসীদের অস্তিত্বের প্রমাণ এই অঞ্চলে পাওয়া যায়। Huising-এর মতে উপকূল ভাগের অধিবাসী একটি নেগ্রিটো জাতিকে ভারতবর্ষ ও পারশ্য উপসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাসী রূপে দেখা যায়। ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভকাল পর্যন্ত সুসীয়ানায় পশমের মত কেশবিশিষ্ট নেগ্রিটো-গণ বর্তমান ছিল। Huising আরও বলেন যে, ইরানের প্রাচীন অধিবাসীদিগের মধ্যে সম্ভবতঃ দ্রাবিড় জাতিও ছিল। Huising-এর এই অনুমানকে ভিত্তি করিয়া Giuffrida Ruggeri মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইরাণ হইতে দ্রাবিড় ও নেগ্রিটোগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং দক্ষিণ ভারতে যে গোলমুণ্ড ও কৃষ্ণবর্ণের মানুষ দেখা যায় তাহারা নেগ্রিটো গোষ্ঠীভুক্ত বা নেগ্রিটোর সহিত সংমিশ্রণের ফল। ইহার পর তিনি বলিতেছেন যে, দক্ষিণ এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে, সম্ভবতঃ আরবেও নেগ্রিটো গোষ্ঠির মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় ("A band of Negritos is spread along the southern regions of Asia, and probably also Arabia")। এখানে southern regions of Asia-এর অর্থ এশিয়ার বৃহৎ ভূভাগের দক্ষিণের সামুদ্রিক অঞ্চল। এই প্রসঙ্গে আরবের উল্লেখ সম্পূর্ণ অনুমানমূলক এবং এই উল্লেখ করিবার কারণ এশিয়ার ভৌগোলিক সংস্থানে দক্ষিণ ভারতীয় উপদ্বীপ ও আরব উপদ্বীপের অবস্থানের মধ্যে সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইহার পর তিনি বলিতেছেন যে, শুধু আরবের অধিবাসীদের মধ্যে নহে হিব্রুদিগের (তাঁহার মতে Proto Semites) মধ্যেও নেগ্রিটো সংমিশ্রণ রহিয়াছে। Giuffrida Ruggeri-র এই নেগ্রিটোবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার মতে দক্ষিণ এশিয়ার এই নেগ্রিটো গোষ্ঠী আফ্রিকা হইতে আসে নাই ('According to my opinion Africa did not intervene at all in peopling Asia')।

সে যাহা হউক, দক্ষিণ ভারতের নেগ্রিটো লক্ষণযুক্ত বলিয়া বর্ণিত অধিবাসীদের সম্বন্ধে এই পর্যন্ত জানা যাইতেছে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ হয় সমুদ্রপথে পারশ্য উপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চল হইতে অথবা স্থলপথে ইরাণ হইতে ভারবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।

de Quatrifages দক্ষিণ ভারতে কয়েকটি

উপজাতির মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণের কথা বলিতে গিয়া নেগ্রিটো গোষ্ঠীর দুইটি প্রধান লক্ষণ, গোল মুণ্ড ও পশমের মত বা গুটি-পাকানো কেশ, আমলে আনেন নাই, কৃষ্ণবর্ণের উপর বেশী জোর দিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতবর্ষের খর্বকায়, কৃষ্ণবর্ণের অধিবাসীদের মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ আছে এবং দ্রাবিড় জাতিগুলির মধ্যেও এই সংমিশ্রণ রহিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, ভারতবর্ষের পূর্বদিকের ইন্দোচীনের অধিবাসীদের মধ্যে এবং পশ্চিমে পারস্যের লুরীস্থানের অধিবাসীদের মধ্যে নেগ্রিটো বা দ্রাবিড়ী সংমিশ্রণ বর্তমান। ডাঃ হেডনের মতে লুরীস্থানের অধিবাসী লম্বামুণ্ড ভূমধ্যসাগরীয় গোষ্ঠী ভুক্ত। দ্রাবিড় জাতি যাহাদিগকে বলা হয় তাহারাও অনেকে লম্বামুণ্ড। de Quatrifages নেগ্রিটো গোষ্ঠীর গোলমুণ্ড ও অন্য গোষ্ঠীর লম্বামুণ্ডের মধ্যে পার্থক্য উপেক্ষা করা তাঁহার থিওরীর পক্ষে মারাত্মক হইতে পারে মনে করেন নাই।

Colonel Sewellএর মত এইরূপ যে, এশিয়ার প্রধান ভূভাগ হইতে উত্তর-পূর্ব পথে মানুষ প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং এই অভিযাত্রী দল ছিল গোলমুণ্ড নেগ্রিটো গোষ্ঠীর লোক।

এ পর্যন্ত ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে প্রচীনতমস্তর হিসাবে অথবা দক্ষিণভারতের প্রান্তসীমার পর্বত ও অরণ্যময় অঞ্চলের কয়েকটি উপজাতির মধ্যে সংমিশ্রণ হিসাবে যাঁহারা নেগ্রিটোবাদের সমর্থন করেন তাঁহাদের মতের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পর এই মতের বিরোধী পণ্ডিতগণের যুক্তির উল্লেখ করা হইবে।

যে সকল নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী পণ্ডিত ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ জাতি সংমিশ্রণের (ethnic stratification) প্রথম স্তর এই মত গ্রহণ করেন নাই। তাঁহাদের পক্ষের প্রথম কথা এই যে, দক্ষিণ ভারতের প্রান্তসীমার কাদার, পুলায়ান প্রভৃতি উপজাতিকে দৈহিক লক্ষণ অনুসারে নেগ্রিটো গোষ্ঠীভুক্ত করা চলে কিনা সন্দেহ। তারপর প্রাগৈতিহাসিক আমলে যে সকল মনুষ্যগোষ্ঠী ভারতবর্ষে উপস্থিত ছিল বলিয়া অনুমান করা হয় সেই সকল গোষ্ঠীর বলিয়া স্বীকৃত করোটি প্রভৃতি নিদর্শন পাওয়া গেলেও নেগ্রিটোর বলিয়া স্বীকৃত প্রাগৈতিহাসিক আমলের করোটি, কংকাল প্রভৃতি কোন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া দাবী করা হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের তিনেভেলীর করোটি Dixon এর মতে নিগ্রোয়েড, কিন্তু সাধারণ মত এই যে, উহা লম্বামুণ্ড প্রোটো অষ্ট্রালয়েড। যদিও গোটা ভারতবর্ষের কোথাও প্রাচীনযুগে বা বর্তমানে নেগ্রিটোর অস্তিত্বের সন্দেহাতীত কোনরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় নাই, তথাপি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নেগ্রিটো গোষ্ঠীয় বলা হইয়াছে এই কারণে যে, নেগ্রিটো গোষ্ঠীর যেরূপ কেশের বৈশিষ্ট্য (Ulotrichous) দেখা যায় কতকটা সেইরূপ কেশের বৈশিষ্ট্য কয়েকজন লোকের মধ্যে দেখা গিয়াছে।

ফিলিপাইনস, আন্দামান ও মলকায় নেগ্রিটোর অস্তিত্ব মানিয়া লইয়া Meyer এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে নেগ্রিটোর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাই। Callamandএর মতে ভারতবর্ষে নেগ্রিটোবাদের সমর্থন দুঃসাহসিক মতবাদের unedoctrine aventureuse প্রচার বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। ইঁহাদের ও এই দলের অন্যান্যের মত এই যে, প্রকৃত নেগ্রিটোকে ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী aboriginals বলিয়া কোনমতে স্বীকার করা যায় না।

জার্মাণ নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী Sickstedt এই দলের না হইলেও এই সঙ্গে তাঁহার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে দক্ষিণ ভারতের কাদার প্রভৃতি জাতির মধ্যে নেগ্রিটো গোষ্ঠীর দৈহিক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যদিও তাহাদের কেশের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিবার জন্য তিনি Proto-Negrito সংমিশ্রণের কল্পনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ও সম্পর্ক সম্বন্ধে Sickstedt যে সকল

নূতন মত প্রচার করিয়াছেন তাহার একটির উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে দক্ষিণ ভারতের মেলানিড জাতি (ইহার মধ্যে তামিল জাতি পড়িতেছে) Indo Negrid বা Great Negro race এর পূর্বশাখার বংশধর। তিনি অনুমান করেন, এই ইন্দোনেগ্রিড জাতির প্রস্তর যুগের সভ্যতার সঙ্গে আফ্রিকার উত্তর কাঙ্গা অঞ্চলের তুম্বা যুগের সভ্যতার সংযোগ থাকা সম্ভব। সংযোগ দেখান সম্ভব হউক বা না হউক লক্ষ্য করিতে হইবে যে, দক্ষিণ ভারতের প্রচীনতম সভ্য-জাতি (তামিল বা দ্রাবিড়) তাঁহার মতে আফ্রিকা হইতে আগত নিগ্রো গোষ্ঠীর প্রবাসীদিগের উত্তর পুরুষ। এই মত নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী সমাজে অনেকে গ্রাহ্য করেন নাই।

ভারতবর্ষে নেগ্রিটো সংমিশ্রণের প্রশ্নে আরও দুইজন পণ্ডিতের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্যার হারবার্ট রিজলে তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থে (Peoples of India) দক্ষিণ ভারতে বা ভারতবর্ষের অন্য কোন অঞ্চলে নেগ্রিটোর লক্ষণযুক্ত কোন জাতির অস্তিত্বের উল্লেখ করেন নাই। এডগার আর্সটন তাঁহার বৃহৎ গ্রন্থে (Castes and Tribes of Southern India) ভারতবর্ষের কোন জাতির মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ স্বীকার করেন নাই। দক্ষিণ ভারতের জাতিগুলি সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। যে পশমের মত চুল লইয়া এত বিতর্কের উৎপত্তি তাহার সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, "I have seen only one individual with wooly hair in Southern India and he was of mixed Tamil and African parentage."

ভারতবর্ষে নেগ্রিটোবাদ প্রচারের প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

(১) নেগ্রিটোবাদ প্রচারের মূলে কি ধারণা থাকিতে পারে;

(২) দক্ষিণ ভারতের কাদার প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ আছে, একথা বলিবার প্রকৃত ভিত্তি কি;

(৩) ভারতবর্ষের অন্য কোথাও নেগ্রিটোর অস্তিত্ব বা সংমিশ্রণ প্রমাণিত হইয়াছে কি না; এবং

(৪) নেগ্রিটো সংমিশ্রণের প্রমাণ পাওয়া যায় স্বীকার করিলে এই সংমিশ্রণের পরিমাণ কিরূপ ও কিভাবে ইহা ঘটিয়াছে।

শেষের তিনটি বিষয়ের আলোচনা উপরে করা হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে কাদার প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ অনেকে অস্বীকার করেন। যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহাদের পক্ষের একমাত্র প্রমাণ দাঁড়ায় কেশের বৈশিষ্ট্য। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় "The question of Negrito strain finally centres round the nature of the hair of the Kaders." তাঁহার মত এই যে, কাদার, অঙ্গমী নাগা প্রভৃতির কেশ নেগ্রিটোর কেশের অনুরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায় না; frizzly hair ও wooly hair এক বস্তু নহে। তাহাদের মস্তকের গঠনও নেগ্রিটোর অনুরূপ নহে। অধিকন্তু frizzly hair দেখা যায়, এরূপ মাত্র অল্প কয়েকজন কাদার পাওয়া গিয়াছে। বাস্তবিক পক্ষে এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধানের ফলে প্রকৃত তথ্য নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত কাহারও ব্যক্তিগত মতকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ আবিষ্কারের ভিত্তি আরও দুর্বল। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, প্রমাণ প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া কেহ কেহ ছোটনাগপুরের হো ও বিরহর দিগের মধ্যে নেগ্রিটো সংমিশ্রণ আবিষ্কার করিয়াছেন। অঙ্গমী নাগা সম্বন্ধে ডাঃ হাটন নিজে প্রথমে নেগ্রিটো, পরে মেলানেশিয়ান সংমিশ্রণের কথা বলিয়াছেন। মেলানেশিয়ান ও নেগ্রিটোকে কেহ এক গোষ্ঠীভুক্ত বলে না। তর্কের খাতিরে সামান্য পরিমাণ নেগ্রিটো সংমিশ্রণ দক্ষিণ ভারতে দেখা যায় স্বীকার করিলে, কি ভাবে এই সংমিশ্রণ

ঘটিয়াছে সে সম্বন্ধে অনেক রকম অনুমাণ করা হইয়াছে। একটি অনুমান এইরূপ যে, দক্ষিণভারত ও আফ্রিকার মধ্যে যোগাযোগের ফলে,—ইতিহাস এরূপ যোগাযোগের কথা বলে,—উপকূলবাসী কোন কোন উপজাতির মধ্যে সামান্য পরিমাণে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভব। এই স্বীকৃতির দ্বারা নেগ্রিটো গোষ্ঠী সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী এই অনুমানের কিছুমাত্র পোকষতা করা হয় না।

উপরে যে চারিটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে এইবার তাহার প্রথমটির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নেগ্রিটো গোষ্ঠী ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী, এই মত প্রচার করিবার মূলে কি ধারণা থাকা সম্ভব? প্রকৃত প্রমাণের অবস্থা যাহা দেখা যায় সেইরূপ প্রমাণের বলে এই ধরণের মত প্রচার করিবার হেতু কি হইতে পারে? একটি হেতু এই যে নেগ্রিটো প্রভৃতি গোষ্ঠীকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানবসমাজের মধ্যে প্রাচীনতম গোষ্ঠী বলিয়া মনে করা হয়। ভারতবর্ষে নৈগ্রিটো সংমিশ্রণ স্বীকার করিয়া লইলে নেগ্রিটোকে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসী বলিবার একটা সূত্র পাওয়া যায়। দ্বিতীয় হেতুর কথা বলা হইতেছে।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের গাত্রবর্ণ সাধারণতঃ কাল। য়ুরোপীয় গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, তাহাদের এক বৃহৎ অংশের ভাষা ইন্দো-য়ুরোপীয়ান ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত এবং তাহারা য়ুরোপীয় শ্বেতকায় জাতিদিগের জ্ঞাতি। প্রশ্ন উঠিয়াছে ইহাদের গাত্রবর্ণ কৃষ্ণ হইল কেন? উত্তরে বলা হইয়াছে, ইহার অন্যতম কারণ আর্যজাতির এই পূর্ব শাখার ভারতবর্ষের কৃষ্ণবর্ণের আদিম অধিবাসীদিগের সহিত রক্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই কৃষ্ণবর্ণের আদিম অধিবাসী কাহারা? রমাপ্রসাদ চন্দের মতে তাহারা নিষাদ, Giuffrida Ruggeri র মতে প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড, কোন কোন পণ্ডিতের মতে তাহারা দ্রাবিড় জাতি। মোট কথা, তাহারাই ভারতবর্ষের অনার্য আদিম অধিবাসী। শ্বেতকায় আর্যদিগের বংশধরগণের চর্মের কৃষ্ণত্বের জন্য ইহারাই দায়ী। এখন ভারতবর্ষের এই কৃষ্ণবর্ণের অধিবাসীদিগের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেছে। ভারতবর্ষের দক্ষিণে আন্দামানে নেগ্রিটো, সিংহলে বেদ্দা রহিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্বে অষ্ট্রেলিয়ায় রহিয়াছে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী ও মেলানেশিয়ার অধিবাসী। পশ্চিমে রহিয়াছে আফ্রিকার নিগ্রো জাতিগুলি। ইহারা সকলেই কৃষ্ণকায়। কৃষ্ণকায় মনুষ্যগোষ্ঠী অধ্যুষিত এই বিস্তৃত অঞ্চল প্রায় বলয়াকারে ভারতীয় উপদ্বীপকে বেষ্টন করিয়া আছে। ভারতবর্ষের কৃষ্ণকায় অধিবাসীদিগের স্বরূপ নির্ণয় করিতে বসিয়া পণ্ডিতগণের দৃষ্টি এই সকল কৃষ্ণকায় মনুষ্যগোষ্ঠীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। এজন্য এই প্রসঙ্গে নিগ্রো, ইথিওপীয়ান, মেলানেশীয়ান, নেগ্রিটো, অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসী প্রভৃতির ঘন ঘন উল্লেখ দেখা যায়। নেগ্রিটো গোষ্ঠীকে প্রাচীনতম মনুষ্যগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ধরা হয়। এ জন্য ভারতবর্ষে এই গোষ্ঠীই আদিম অধিবাসী, এই মত প্রচারিত হইয়াছে যুক্তিসহ প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়াই।

উপরে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে কেহ মনে করিতে পারেন যে, সম্ভবতঃ এই সকল কৃষ্ণকায় জাতি তাহাদের বর্তমান বাসভূমি হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু পণ্ডিতগণের অনুমান অন্যরূপ। "The general tendency of migration and culture in South East Asia seems to have been from north to south, rather than from the islands to the mainland" (I. II. Hutton) ইহার অর্থ এই যে, কৃষ্ণকায় মনুষ্যের যতগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীকে ভারতবর্ষে দেখা যায় বা যাহাদের উপস্থিতির নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহারা সকলেই এশিয়ার প্রধান ভূভাগ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এখানে বসবাস করিবার পর তাহাদের

বর্তমান বাসভূমিতে চলিয়া গিয়াছে, এইরূপ অনুমান করিতে হইবে। তাহাদের কেহ কেহ তাহাদের বর্তমান বাসভূমি হইতে জলপথে ভারতবর্ষের উপকূল অঞ্চলে উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহাদের সহিত সংমিশ্রণের পরিচয় যাহা পাওয়া যাইতে পারে তাহা উপকূল অঞ্চলেই পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা, এরূপ অনুমান করা কেন চলিবে না তাহার সন্তোষজনক কারণ নির্দেশ করা হয় নাই। দক্ষিণ-ভারতের বেদ্দা-গোষ্ঠীর কয়েকটি উপজাতি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। কাদার প্রভৃতি উপজাতির সঙ্গে আন্দামানের নেগ্রিটো অপেক্ষা মালয়ের সেমাং প্রভৃতি উপজাতির দৈহিক লক্ষণের সাদৃশ্যের কথা কোন কোন নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী তুলিয়াছেন; তাহাও এই অনুমানের পোষকতা করে। সুতরাং এই অনুমানকে সহজে উড়াইয়া দেওয়া চলে না।

উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে, ভারতবর্ষে নেগ্রিটো গোষ্ঠী প্রাচীনতম অধিবাসী, এই মতবাদ প্রচারের মূলে কি ধারণা কার্য করিতেছে ও ইহার সপক্ষে কতখানি যুক্তিসহ প্রমাণ আছে। এই আলোচনা হইতে আরও জানা যাইবে যে, ভারতীয় নৃতত্ত্ববিজ্ঞানীদিগের মধ্যে যাঁহারা এ সম্পর্কে নূতন আবিষ্কারের বা নূতন মতবাদ প্রচার করিবার কৃতিত্ব দাবী করেন তাহাদের দাবী অমূলক। তাঁহাদের পূর্বগামী ও পৃষ্ঠপোষক বহু য়ুরোপীয় নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী এই মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং অনেকে আবার এই মত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। দক্ষিণ ভারতের প্রান্তসীমায় অতিশয় সীমাবদ্ধ অঞ্চলে কোন কোন ক্ষেত্রে বহিরাগত নেগ্রিটো সংমিশ্রণ ঘটা অসম্ভব নহে, মাত্র এইটুকু বিনা দ্বিধায় স্বীকার করা চলে, কিন্তু সন্দেহ থাকে এই সংমিশ্রণ বাস্তবিক নেগ্রিটো অথবা মেলানেশিয়ান (Pacific Negro)। মেলানেশিয়ান সংমিশ্রণের কথা পরে আলোচনা করা হইবে।

বিশ্বজগৎ আপন অতি-ছোটকে ঢাকা দিয়ে রাখল, অতি বড়োকে ছোটো করে দিল, কিংবা নেপথ্যে সরিয়ে ফেলল। মানুষের সহজ শক্তির কাঠামোর মধ্যে ধরতে পারে নিজের চেহারাটাকে এমনি করে সাজিয়ে আমাদের কাছে ধরল। কিন্তু মানুষ আর যাই হোক সহজ মানুষ নয়। মানুষ একমাত্র জীব যে আপনার সহজ বোধকেই সন্দেহ করেছে, প্রতিবাদ করেছে, হার মানাতে পারলেই খুশি হয়েছে। মানুষ সহজ শক্তির সীমানা ছাড়াবার সাধনায় দূরকে করেছে নিকট, অদৃশ্যকে করেছে প্রত্যক্ষ, দুর্বোধকে দিয়েছে ভাষা, প্রকাশ লোকের অন্তরে আছে যে অপ্রকাশ লোক, মানুষ সেই গহনে প্রবেশ করে বিশ্বব্যাপারের মূল রহস্য কেবলি অবারিত করছে। যে সাধনায় এটা সম্ভব হয়েছে তার সুযোগ ও শক্তি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষেরই নেই। অথচ যারা এই—সাধনার শক্তি ও দান থেকে একেবারেই বঞ্চিত হলো তারা আধুনিক যুগের প্রত্যন্ত দেশে এক ঘরে হয়ে রইল।

—রবীন্দ্রনাথ

কৃষি বিজ্ঞান—কৃষক ও দেশ*

শ্রীসুবোধনাথ বাগচী

পৃথিবীর খাদ্য-সমস্যা এক বিষাক্ত চক্রের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। অল্প কিছুদিন পূর্বে স্যার জন বয়েড অর যে উক্তি করেছেন তাতে দেখা যায় যে, প্রচুর শস্য উৎপাদন সত্বেও এই সমস্যা কিরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় এসেছে। ভারতবর্ষে ত এ সমস্যা ক্রমিক ব্যাধিরই আকার ধারণ করেছে। অচিরেই খাদ্যসমস্যার অন্ততঃপক্ষে কিঞ্চিৎ সমাধান না করতে পারলে দেশের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠবে।

পৃথিবীর সভ্যতার উন্মেষ হয়েছে কৃষিকার্যে মানুষের জ্ঞান হওয়া থেকেই এবং মানুষ যদি বেশ কিছুদিন পৃথিবীতে বাস করতে চায় তবে তাকে এই কৃষিকার্যের উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করতে হবে। শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে সভ্যতার ক্রমবিকাশ। তাই সভ্যতার বিভিন্ন যুগের নামাকরণ হয়েছে শিল্পের মূল রসদ খনিজ পদার্থ থেকে, যথা লৌহযুগ; কয়লাযুগ, তৈলযুগ। যুদ্ধোত্তর যুগকে আমরা ইউরেনিয়ম এবং প্ল্যাস্টিকের যুগ বলতে পারি। কিন্তু পৃথিবীতে খনিজ সম্পদ ত অফুরন্ত নয়। তাই দেশে দেশে এত বিদ্বেষ, তাই এক মহামারণ যজ্ঞ শেষ হতে না হতেই আবার প্রলয়ের ডাক ভেসে আসছে। এই প্রলয়ের পরও যদি মানুষ টিকে থাকতে চায়, সভ্যতাকে যদি উন্নততর স্তরে নিয়ে যেতে হয়, তবে শিল্পকে উদ্ভিজ্জ পদার্থের উপরই নির্ভর করতে হবে। তাই পুনরায় কৃষি বিজ্ঞানের উপরই সভ্যতাকে নির্ভরশীল হ'তে হবে। হাজার হাজার বছরের নদীতীরবর্তী সভ্যতার দিকে চেয়ে আমরা ভেবেছিলাম যে মাটি বুঝি আপনা থেকেই চিরকালের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় ক্ষুধা মিটিয়ে দেবে। কিন্তু আজ সে ভুল ভেঙ্গেছে। তবে আশার কথা এই যে, মাটিকে যদি সুচারুরূপে ব্যবহার করতে পারি—মাটির প্রতি যদি যথোপযুক্ত দৃষ্টি দিতে পারি তবে সে চিরযৌবনা থেকে আমাদের ক্ষুধা মিটিয়ে দিতে পারবে, যা খনিজ পদার্থের পক্ষে অসম্ভব। কৃষি ও মৃত্তিকা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হল মাটিকে চিরযৌবনা করে রাখা।

কৃষি-বিজ্ঞানের বিষয়কে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা :—

(১) মাটি

(২) মাটি ও গাছপালা

(৩) মাটি ও কৃষক

(৪) মাটি ও দেশ

(১) কৃষি বিজ্ঞানের সব কিছুই প্রধানতঃ নির্ভর করে মাটির ওপর। কালপ্রবাহে, রোদে, বৃষ্টিতে ধীরে ধীরে শিলা থেকেই মাটির জন্ম। তাই মাটির ধর্ম বহুলপরিমাণে শিলা ও আবহাওয়ার প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। মাটির সবচেয়ে বেশী কার্যকরী অংশ থাকে তার কণাদলে। এই কণাদল অংশ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ অজৈব খনিজ পদার্থে যথা: কেওলিনাইট বা মণ্টমরিলনাইটে গড়া। সুপরিচিত চীনামাটি ও লালমাটির প্রধান অংশই এই কেওলিনাইট, আবার এটেলমাটি বা যে সব মাটিতে তুলা ভাল জন্মায়; তা মণ্টমরিলনাইটে গড়া। মাটির উপরিভাগের প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক ধর্মের উপর জমির উৎপাদন বিশেষভাবে নির্ভর করে।

---

* কলিকাতা বেতারকেন্দ্রে ৯ই এপ্রিলের বক্তৃতার সারাংশ কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত।

(২) মাটি থেকে আমরা দুরকম ফসল চাই, যা আমাদের আহার্য বস্তু জোগাবে ও যা থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় বস্তু ও শিল্পসম্ভার তৈরী করা সম্ভব হবে। কোন্ জমিতে কি ফসল হবে, তার পরিমাণই বা কতটা হবে তা বিশেষভাবে নির্ভর করে মাটির প্রকৃতির উপর, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, জলের ব্যবস্থা ও প্রাকৃতিক আবহাওয়ার উপর। গাছপালা ও জীবজগৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদের দেহ গঠন করছে মাটি থেকে; স্থতরাং মাটি থেকে যে সম্পদ আমরা নিচ্ছি তাকে তা আবার ফিরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, যদি তার কার্যক্ষমতায় হানি করতে না চাই। তাই মাটিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রয়াসে প্রথম মনে আসে সারের কথা। সারকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়, অজৈব ও জৈব সার। অজৈব সারের মধ্যে ফস্ফেট, নাইট্রোজেন ও পটাসিয়াম এই তিনটিই প্রধান। অজৈব সারের অভাব আমাদের অত্যন্ত বেশি। সম্প্রতি সিন্ধ্রিতে (বিহার) এমোনিয়ম-সালফেট তৈরী করার ব্যবস্থা হচ্ছে; কিন্তু তাও চাহিদার তুলনায় অত্যন্ত কম। মুস্কিল এই যে, নাইট্রোজেন সার তৈরী করা বহু ব্যয় সাপেক্ষ। উপরন্তু বিশেষজ্ঞের ও যন্ত্রপাতির জন্য পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। তবে আশার কথা এই যে, নাইট্রোজেনের অভাব জৈব সার দিয়ে বেশ কিছু মেটান যায়। কিন্তু ফস্ফেট সারের জন্য অজৈব সারের উপরই নির্ভর করতে হয়। আমাদের দেশে ফস্ফেট সারের খুব অভাব; অথচ সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা না থাকায় পশুপক্ষীর হাড়ের প্রচুর অপচয় হয় এবং যেটুকু সংগ্রহ হয় তাও বিদেশে চালান যায়। অথচ স্বল্পায়াসেই আমাদের দেশে এই হাড় থেকে উৎকৃষ্ট ফস্ফেট্ সার, সুপার ফস্ফেট—তৈরী করা যেতে পারে। স্থতরাং আমি এদিক থেকে জনসাধারণকে ও সরকারকে বিশেষভাবে অবহিত হতে অনুরোধ করছি। পটাস সারের জন্য কচুরীপানার সদ্ব্যবহার করলে দেশের স্বাস্থ্যেরও মঙ্গল হবে।

জৈব সারের মধ্যে গোবর বহুকাল থেকেই চলে আসছে। সবুজ সার, যথা—ধনচে, সীম প্রভৃতি ও কম্পোষ্ট সার সম্পর্কে কৃষকদের সচেতন করে দেওয়া উচিত। চীন দেশে বহু প্রাচীন কাল থেকেই মল ও পরিত্যক্ত আবর্জনা সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বর্তমান যান্ত্রিক ও রাসায়ণিক যুগে রুচিবিকার না ঘটিয়ে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সার হিসাবে মল ও পরিত্যক্ত আবর্জনার ব্যবহার করা আমাদের দেশে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কর্তব্য।

কৃষিকার্যে জলকেও সার হিসাবে দেখা উচিত। প্রয়োজনানুরূপ জলের অভাবে শস্যের ক্ষতি সর্বজন-বিদিত এবং আমাদের কৃষিব্যবস্থায় জলসেচনের আবশ্যকতা অনেকদিন থেকেই সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষন করেছে এবং আশার কথা, উন্নত পরিকল্পনাও সরকার হাতে নিয়েছেন।

আর একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, কতকগুলি অজৈব উপাদানের যথা—তামা, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ, বোরন ইত্যাদির লক্ষ ভাগের এক ভাগের অভাবেই ফসলের প্রচুর ক্ষতি-বৃদ্ধি হতে পারে। অনেক ফসলের ও তদ্ভোজী পশুর ব্যাধির কারণ এই সব পদার্থের উপযুক্ত মাত্রার অভাব বা বৃদ্ধি।

(৩) জমি আশানুরূপ ভাল থাকলেও কৃষকের অজ্ঞতা বা শক্তির অভাবে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষে উৎপাদন-ক্ষমতা এত কমে যাওয়ার প্রধান কারণ অজ্ঞতা নয়—কৃষকের যথোপযুক্ত শক্তির অভাব। অবশ্য বর্তমানকালীন উন্নততর ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মাটির উৎপাদন ক্ষমতাও বহুল পরিমাণে বেড়ে যাবে যাতে আমরা খাদ্যসম্পর্কে স্বাবলম্বী হতে পারব। এদিক থেকে বিশেষভাবেই প্রয়োজন কৃষককে শিক্ষা দেওয়া। কোন্ জমিতে কখন কি ফসল লাগান উচিত এবং কোন্ ফসলের পর কোন ফসলের চাষ করা উচিত, এ সম্পর্কে কৃষককে বিজ্ঞানসম্মত

উপায়ে ব্যক্তিগতভাবে অবহিত করা বিশেষ কর্তব্য। আমরা যদি ভাল ফসল চাই তবে তাদের ভাল বীজ দেওয়া প্রয়োজন এবং এটাও দেখা উচিত যেন তারা অভাবে প'ড়ে সেই বীজই না খেয়ে ফেলে। আবার যে সব বীজ থেকে তাড়াতাড়ি ফসল পাওয়া যেতে পারে সে সব বীজই দেওয়া উচিত। কৃষক যাতে স্বাস্থ্য সম্পদ না হারায় তার দিকে আশু দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। সে যাতে জমির চাষের সঙ্গে সঙ্গে হাঁস, মুরগী, গরু, শূকর ইত্যাদি পশুপক্ষী পালন করতে পারে সেদিকেও সাহায্য করা দরকার। এতে তার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে, আর আর্থিক স্বচ্ছলতা বেড়ে যাবে। গ্রামে কৃষকের অবস্থা যতদিন ভাল না হচ্ছে ততদিন শিল্পোন্নতি হলেও দেশের দুর্বলতা ও ব্যাপক ব্যাধি কখনই ঘুচতে পারে না।

আমাদের দেশে অনেক অনুর্বর প্রান্তর আছে যেখানে ফসল উৎপাদন বহু ব্যয়সাধ্য ও আশানুরূপ লাভজনক নয়, অথচ স্বভাবতঃই প্রচুর তৃণাদি জন্মায়। সেখানকার অধিবাসীদের কর্তব্য হবে, এই সব জমি ফসলের জন্য ব্যবহার না করে পশুপক্ষীর, চারণক্ষেত্র রূপে ব্যবহার করা। এই সব প্রদেশের পক্ষে শস্য উৎপাদনের চেয়ে পশুপক্ষী পালন, ডেইরী ইত্যাদি ব্যবসা অধিকতর লাভজনক হবে এবং সমগ্র দেশের পক্ষেও তা মঙ্গলময় হবে। সরকারের উচিত, এদিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া এবং স্থানীয় অধিবাসীদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা ও সাহায্য দেওয়া।

প্রতিদিন ভেজালের জ্বালায়, সুখাদ্যের অভাবে আমাদের ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ছে। এমন কি, যারা যথোপযুক্ত অর্থব্যয় করতে পারেন বা করেন তাঁরাও পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। আমাদের খাদ্যদ্রব্যগুলি যথাসম্ভব ঘরে তৈরী করে নেওয়া সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতি গৃহস্থেরই (বিশেষতঃ গ্রামে ও মফঃস্বল সহরে) উচিত হবে নিজ বাগানে ভিটামিনযুক্ত স্বাস্থ্যকর খাদ্য যথা টমেটো, গাজর, স্যালাড পাতা ইত্যাদি জন্মান। এটা খুব ব্যয়সাধ্য বা পরিশ্রম সাপেক্ষও নয়।

(৪) কৃষককে তার প্রয়োজনীয় খবর জানিয়ে দেবার প্রধান দায়িত্ব সরকারের এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন ব্যবস্থাও সরকারের করা উচিত, যাতে কৃষকের তথা সমগ্র দেশের পক্ষে সম্ভব হয় নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উন্নত ধরণের চাষ করা, যার ফলে আমাদের ফসল বহুল পরিমানে অচিরেই বৃদ্ধি পেতে পারে।

সরকারের উচিত হবে সুদূরপ্রসারী ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা, যাকে রূপ দেবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সত্বর অবলম্বন করতে হবে। এদিক থেকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে:—

(ক) মাটির অপচয় যাতে না হয়,

(খ) মাটিকে পুনরুজ্জীবিত করা, বহুব্যয়সাধ্য হয়ে পড়বে এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা দেওয়া,

(গ) যান্ত্রিক চাষের জন্য উপযুক্ত ধরণের ট্র্যাক্টর প্রভৃতি তৈরীর ব্যবস্থা করা,

(ঘ) সমাজব্যবস্থা ও লোকশিক্ষা ধীরে ধীরে তদনুযায়ী করে তোলা,

এছাড়া, বর্তমান সঙ্কট কাটিয়ে উঠবার জন্য এখনই এই সব ব্যবস্থা কার্যকরী ক'রে তুলতে হবে:—

(ক) প্রতি মহকুমায় উপযুক্ত পরিমান ভাল বীজ সংগ্রহ ক'রে রেখে কৃষকদের মধ্যে সময়মত যাথোপযুক্ত উপদেশ দিয়ে বিলি করা,

(খ) চাষের ভাল লাঙ্গল ও গরু সংগ্রহ করে বিনাসুদে ধার দেওয়া,

(গ) প্রত্যেক গ্রামে এবং প্রত্যেক হাটে বেতার-যন্ত্র প্রতিষ্ঠা ক'রে প্রতি সপ্তাহে কোন্ অঞ্চলে সেই সময় কি ফসল লাগান বা কাটা উচিত, কোন আসন্ন দুর্যোগের হাত থেকে কি করে রক্ষা পেতে পারে, কি ক'রে ফসল ভালভাবে মজুত রাখা যায়, তার বিশেষ নির্দেশ দেওয়া,

(ঘ) প্রত্যেক গ্রামে সমবায় প্রথায় চাষআবাদ ও গৃহপালিত পশুপক্ষী পালনের যথোপযুক্ত

ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং তাদের এর উপকারিতা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত করা। খণ্ড জমির দোষ সবাই জানে, অথচ অনেকখানি জমি এক নাগারে পেলে তার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ফসলের আবাদ করলে জমির উৎপাদন ক্ষমতা অনেকগুণে বেড়ে যাবে এবং প্রত্যেক কৃষকই তার অভাব মেটাতে পারবে।

গ্রামবাসীদের সন্দেহ দূর করার জন্য সরকারের উচিত হবে কয়েকটি আদর্শ বা মডেল গ্রাম প্রতিষ্ঠা ক'রে পাশের অধিবাসীদিগকে চোখে আঙুল দিয়ে এই ব্যবস্থার সুবিধার কথা দেখিয়ে দেওয়া,

(ঙ) উপরোক্ত নির্দেশ দেবার জন্য প্রয়োজন হবে দেশের মাটির (প্রতি গ্রামের মাটির) প্রকৃতি, তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া, রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় তথ্যাদির জরীপ করা এবং তাকে উপযুক্ত ভাবে কৃষকদের সাহায্যার্থে প্রয়োগ করা,

(চ) প্রত্যেক প্রদেশে সরকারী কৃষি গবেষণাগার সত্যকার কার্যকরী অবস্থায় রাখা, যেখানে শুধু অন্যান্য সরকারী দপ্তরের মত ফাইলের বোঝা-ই বেড়ে উঠবে না—যেখানে হবে দেশের প্রয়োজনানুযায়ী সত্যকার গবেষণা, যার উপর ভিত্তি ক'রে কৃষকদের দৈনন্দিন জীবনের কাজে নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হবে। গবেষণাগারে তৈরী হবে উন্নত ধরণের বীজ, এমন সব বীজ যা সাধারণের হাতে এক চতুর্থাংশ সময়ের মধ্যেই ফসল দেবে, কিংবা যে বীজ দেবে চিরফলপ্রসূ গাছ।

পরিশেষে শুধু এই কথাটুকু বলতে চাই যে, এগুলো শুধু কাগজের উপর পরিকল্পনা বা রঙ্গমঞ্চের ফাঁকা বক্তৃতা নয়। অন্য দেশ এই সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে, আমাদের দেশেই বা সম্ভব হবে না কেন? শুধু চাই আমাদের বলবতী ইচ্ছা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা।

বিভিন্ন শাখা বিজ্ঞান যে বিজ্ঞানের সেবায় নিয়োজিত, যে বিজ্ঞানের সাথে সভ্যতার উন্মেষ, যে বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা বেঁচে আছি এবং বেঁচে থাকবার কামনা করছি সেই বহুরূপী বৈচিত্রময়ী কৃষি-বিজ্ঞানের সাধনায় দেশবাসী ও দেশনেতারা সম্যক অবহিত হন এই কামনা করি।

"শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙ্গিনায় তাদের প্রবেশ করা আবশ্যক।"

রবীন্দ্রনাথ

"বিদেশী ভাষার সাহায্যে পাঠ্যবস্তুর মধ্যে প্রবেশ, অনধিকার প্রবেশ; তাহাতে প্রবেশ ঘটে কিন্তু অধিকার ঘটে না।"

রসায়নশিল্পের কতিপয় প্রবর্তক

পূর্ব্বানুবৃত্তি

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়

আয়র্ল্যাণ্ডের অন্তর্গত এনিস্‌কিলেন নামক স্থানে ১৭৭৬ খৃঃ জোসিয়া ক্রিষ্টফার গাম্বল জন্মগ্রহণ করেন। গ্লাসগোতে পড়াশুনা শেষ করিয়া প্রথমে তিনি নিজ জন্মসহর প্রেসবিটারীর পুরোহিত হন। পরে পৌরোহিত্য করিতে বেলফাষ্টে যান এবং অবসর সময়ে রসায়ন সম্বন্ধে পাঠ ও পরীক্ষা আরম্ভ করেন। দিন দিন পৌরোহিত্যে তাঁহার আগ্রহ কমিয়া রসায়নে আনুরক্তি বাড়িতে লাগিল। অবশেষে পুরোহিতের কাজ ছাড়িয়া দিয়া তিনি অল্পস্বল্প রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে সুরু করেন। মাস্‌প্রাটের মত তিনিও রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসা ডাব্লিনেই আরম্ভ করেন এবং পরে তাঁহারা ল্যাঙ্কাশায়ারে সেণ্টহেলেন্‌স্ প্রদেশে সোডার কারখানা করিতে মিলিত হন।

ল্যাঙ্কাশায়ারের সোডার কারখানা শীঘ্রই জনসাধারণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিল। ল্যাব্লাঁ পদ্ধতিতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড বাষ্প বাহির হয়; ঐ এসিড গ্যাস পারিপার্শ্বিক গ্রামসমূহে বিশেষ অনিষ্ট করিতে লাগিল। সবুজ শস্যক্ষেত্র এবং পশুচারণের তৃণাবৃত মাঠ সকল পুড়িয়া গেল, গাছপালা সব শুকাইতে লাগিল এবং ঐ এসিড বাষ্প যে জিনিসের গায়ে লাগিল তাহাই নষ্ট হইল। তখন আইন করিয়া সোডা প্রস্তুতকারীদের কারখানা হইতে এসিড গ্যাস বাহিরে যাওয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। সোডা প্রস্তুতকারীরা এই অনিষ্টকর বাষ্পনির্গম রুদ্ধ করিবার অনেক রকম চেষ্টা করিল, কিন্তু সুবিধাজনক কোন উপায় বাহির করিতে পারিল না। বাধ্য হইয়া শেষে মাসপ্রাট্‌-গাম্বলের প্রকাণ্ড সোডার কারখানা বন্ধ করিয়া দিতে হইল।

কিছুদিনের মত পরিত্যক্ত হইল বটে, কিন্তু ল্যাব্লাঁ পদ্ধতি একবারে মরিল না। কয়েক বৎসর পরেই আবার ইহা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। ১৮৩৬খৃঃ উইলিয়াম গসাজ মিনারের সাহায্যে হাইড্রোক্লোরিক গ্যাস ছড়াইয়া পড়া বন্ধ করিবার পরীক্ষা সম্পূর্ণ করিলেন। গসাজের আবিষ্কৃত পন্থা খুবই সহজ ও সুলভ ছিল। একটী উচ্চ মিনার বা বুরুজ তৈয়ারী করিয়া তাহা পাথুরিয়া কয়লায় পূর্ণ করিতে হয় এবং মিনারের ছাদ হইতে জলের ধারা কয়লার গা বাহিয়া নীচে পড়িতে দিতে হয়। নির্গত হাইড্রোক্লোরিক এসিড গ্যাস মিনারের নিম্নদেশ হইতে উপরে যাইবার পথে ঠাণ্ডা জলের সংস্রবে আসিয়া দ্রবীভূত হইয়া পতনশীল বারিধারার সহিত নীচে নামিয়া আসে। গসাজের আবিষ্কারের কথা শুনিয়া মাসপ্রাট কৌতুক অনুভব করিয়াছিলেন। মাসপ্রাট বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, সামান্য বারিধারা নির্গত অজস্র এসিড গ্যাসের বহির্গমন বন্ধ করিতে পারিবে। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার কারখানা হইতে এক ঘণ্টায় যে গ্যাস বাহির হয় তাহা ধরিতে বালীশানন্ নদীর সমস্ত জলও সক্ষম হইবে না।" মাসপ্রাট কিন্তু ভুল করিয়াছিলেন। তিনি জানতেন না যে, হাইড্রোক্লোরিক এসিড গ্যাস জলে কত বেশী দ্রবণীয়। ঘনমান হিসাবে ১ ভাগ জলে সাধারণ তাপে ৫২৫ ভাগ এসিড গ্যাস গুলিয়া যায়। গসাজের মিনার শীঘ্রই কাজে লাগান হইল এবং দেখা গেল যে, সামান্য গ্যাসও মিনারের

বাহিরে আসিতেছে না। যে অনিষ্টকারী গ্যাসের জন্য সোডা তৈয়ারীর কারখানা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, পরে তাহাই ল্যব্লাঁ প্রণালীকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য মূল্যবান সামগ্রী হইয়াছিল। গসাজের নিকট মাসপ্রাটের কৃতজ্ঞ হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল।

রসায়ন-শিল্প প্রবর্ত্তকদের গগনমণ্ডলে উইলিয়াম গসাজ একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তিনি লিন্‌কন্‌সায়ারের বারো-ইন-দি-মার্স নামক একটী ছোট্ট গ্রামে ১৭৯৯ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার এক কাকার রাসায়নিক পদার্থ ও ঔষধ বিক্রয় করিবার একটী দোকান ছিল। সেইখানে শিক্ষানবিসরূপে তিনি জীবন আরম্ভ করেন। পরে তিনি লিমিংটন সহরে লিমিংটন লবণ প্রস্তুত করিবার জন্য নিজে একটী কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যবসায় তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই, কারণ দুই এক বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে আমরা উর্স্টারসায়ারের অন্তর্গত স্টোকপ্রায়র নগরে ফার্ডনের অংশীদাররূপে ক্ষার ও লবণ প্রস্তুত করায় ব্যাপৃত দেখিতে পাই।

গসাজ রসায়ন শিল্পকলার নানারূপ উন্নতি করিয়াছিলেন এবং রসায়ন-শিল্পের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে অনেক পেটেণ্ট লইয়াছিলেন। গসাজকেই প্রথম রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার বলিতে পারা যায়, কারণ তিনিই প্রথম দেখাইয়াছিলেন যে, রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ারিং অন্য সকল প্রকার এঞ্জিনিয়ারিং হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গসাজের সময় অবশ্য রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ারিং রসায়ন ও এঞ্জিনিয়ারিংয়ের একটী আকারহীন মিশ্রিত রাশি ছিল। আজকালকার মত তখন ইহা একটী নূতন পেশারূপে দানা বাঁধিয়া উঠে নাই, কিম্বা ইহা ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিংয়ের মত পূর্ত বিদ্যার একটা বিশেষ শাখা বলিয়াও পরিগণিত হয় নাই।

রসায়ন শিল্পের ইতিহাসে গসাজের পরই ওয়াল্টার ওয়েলডেনের নাম উল্লেখ করিতে হয়। তিনি ১৮৩২খৃঃ লো-বরোতে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বাবিংশ বৎসর বয়সে তিনি সাংবাদিক হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করিবার আশায় লণ্ডনে আসেন। ১৮৬০খৃঃ তিনি "ওয়েলডেনস্ রেজিষ্টার অফ ফ্যাক্টস্ অ্যাণ্ড অকারেন্‌সেস্ লিটারেচার, সায়েন্স অ্যাণ্ড আর্টস", নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন, কিন্তু ঐ পত্রিকা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। তিনি "ওয়েলডেন্‌স্ জর্ণাল" নামক পত্রিকারও উদ্ভাবক ও প্রকাশক হইয়াছিলেন। ইহা আদর্শ ও সুডৌল পোষাক, পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে একখানি জনপ্রিয় মাসিকপত্র এখনও পর্যন্ত ইহা বিদ্যমান আছে।

ইহা সৌভাগ্যের বিষয় যে, সাহিত্যানুরাগ ত্যাগ করিয়া ওয়েলডন কিমিতি-চর্চায় আসক্ত হন। অবশ্য পূর্বেও তিনি এই বিষয়ে কিছু পড়াশুনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে বয়নশিল্পের প্রসারের সহিত বিরঞ্জকচূর্ণ প্রস্তুত করিবার জন্য ক্লোরিনের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্লোরিন সাধারণ লবণ, মাঙ্গানীজ ডাইঅক্সাইড ও সালফিউরিক এসিডের মিশ্র তপ্ত করিয়া তৈয়ারী হইত, কিন্তু এই প্রস্তুতপ্রণালী খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইহাতে অব্যবহার্য উদ্বর্তের সহিত দুই তৃতীয়াংশ ক্লোরিন এবং সমস্ত মাঙ্গানীজ নষ্ট হইত।

১৮৬৫খৃঃ ওয়েলডেন রসায়ন শিল্পের প্রথম পেটেণ্ট লইয়াছিলেন। এই পেটেণ্টটী আজকাল ওয়েলডেনের পুনরাবর্তন পদ্ধতি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ক্লোরিণ প্রস্তুতের পরিত্যক্তাংশ হইতে মাঙ্গানীজ উদ্ধার করাই ইহার উদ্দেশ্য। নিজ উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে নানালোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার বৃথা চেষ্টার পর, ওয়েলেডন জোসিয়াস্ গাম্বল নামক এক ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। সেণ্ট হেলেন্‌সে গাম্বল নিজের ক্লোরিনের কারখানায় ওয়েলডেনকে স্বীয় পদ্ধতির সমাধান করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃঃ ওয়েলডনের পুনরাবর্তন পদ্ধতি বৃহৎ ভিত্তিতে প্রথম পরীক্ষিত হয় এবং ইহার সাফল্য সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়। ক্লোরিন

উৎপাদনের অব্যবহার্য উদ্বর্তে বর্তমান মাঙ্গানীজের শতকরা নব্বই ভাগ উদ্ধার করিতে পারা গিয়াছিল এবং বিরঞ্জক চূর্ণের মূল্য মন প্রতি চারিটাকা কমিয়া গিয়াছিল। ওয়েলডেন-পদ্ধতি বয়নশিল্পজগতের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। ১৮৮২ খৃঃ ওয়েলডন রয়েল সোসায়িটীর সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং প্রধানতঃ তাঁহারই প্রচেষ্টায় লণ্ডনে 'সোসায়িটী অফ কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্রী' স্থাপিত হইয়াছিল।

রসায়নশিল্পের আলোচনায় ওয়েলডেনের পরই মণ্ডের সুদূরব্যাপী নামের উল্লেখ করা উচিত। লাডুবিগ মণ্ডের নিকট রসায়নশিল্প বহুবিষয়ে ঋণী। ১৮৩৯ খৃঃ তিনি কাসেল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। হাইডেলবর্গে তিনি বিখ্যাত রাসায়নিক ও শিক্ষক বুন্‌সেনের নিকট অধ্যয়ন করেন, কিন্তু ডিগ্রী লইতে সক্ষম হন নাই। অনেকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়া সাফল্যের সহিত উদ্ভাবন করিবার পর, ১৮৬২ খৃঃ মণ্ড ইংলণ্ডে প্রথম আগমন করেন। ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি তাঁহাকে ঐদেশের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং মানচেষ্টারে তাঁহার কয়েকটী আত্মীয় থাকায় সেই প্রদেশে তিনি বসবাস আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে তিনি জার্মানী ফিরিয়া যান, কিন্তু দুই বৎসর পরই ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন এবং অবশেষে ঐদেশের নাগরিকে পরিণত হন।

ল্যাব্লা পদ্ধতির সোডার কারখানার পরিত্যক্তাংশ হইতে গন্ধক উদ্ধার করিবার একটী প্রণালী মণ্ড আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সোডা নিষ্কাশনের পরিত্যক্তাংশ বায়বীক দহনের পর জলে গুলিয়া যদি সেই গোলার সহিত হাইড্রোক্লোরিক এসিড মিশ্রিত করা হয়, তাহা হইলে গন্ধক অধঃপাতিত হয়, এবং এই গন্ধক সংগ্রহ মণ্ড-প্রণালীর ভিত্তি। ১৮৮২ খৃঃ আলেকজাণ্ডার চান্‌সের অধিকতর কার্যকরী গন্ধক পাইবার পদ্ধতি বাহির হইবার পূর্ব পর্যন্ত মণ্ডের প্রক্রিয়াই গন্ধক উদ্ধারের একমাত্র উপায় ছিল।

ইংলণ্ডে আসিবার অল্পদিন পরই মণ্ড তাঁহার আবিষ্কৃত প্রণালী অনেকগুলি ক্ষারপ্রস্তুতকারীর নিকট বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাহা ক্রয় করিতে প্রস্তুত ছিলেন না, কারণ তাঁহারা ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। অবশেষে মণ্ড উয়িড্‌নেস্ সহরের জন হাচিন্‌সন নামক এক ক্ষারব্যবসায়ীর সহিত অংশিত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। হাচিনসনের কারখানায় মণ্ড তাহার পদ্ধতির বিশেষ বিশেষ অংশের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার পদ্ধতি আশাতীত সফলতা লাভ করিয়াছিল এবং ক্ষারপ্রস্তুত প্রণালীতে অনেক টাকার সাশ্রয় হওয়ায় সোডার দাম কমিয়া গিয়াছিল। লাডুয়িগ মণ্ড রসায়নশিল্প জগতে বাস্তবিকই প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৮৭০ খৃঃ কাছাকাছি আর্ণেষ্ট সল্‌ভে বেলজিয়ামে লবণকে ক্ষারে পরিণত করিবার একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। ইহা এখন 'আমোনিয়া সোডা' পদ্ধতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। ইহাতে লবণ জলকে প্রথমে আমোনিয়া গ্যাস দ্বারা পরিপৃক্ত করা হয়, এবং পরে এই আমোনিয়াযুক্ত লবণ জলের সহিত কার্বনিক এসিড গ্যাস অতিরিক্ত চাপে সংশ্লিষ্ট করা হয়। ইহার ফলে ঐ দ্রবে আমোনিয়াম ক্লোরায়িড এবং সোডা বাইকার্বনেট জন্মে। অল্পদ্রাব্য সোডা বাইকার্ব দানাবদ্ধ হইয়া নীচে পড়িয়া যায় এবং অবশিষ্ট আমোনিয়াম ক্লোরায়িড দ্রব চুণের সহিত ফুটাইয়া পুনর্ব্যবহারের জন্য আমোনিয়া নিষ্কাশনের কাজে লাগান হয়।"

সল্‌ভে-পদ্ধতি দ্বারা সোডা তৈয়ারী সম্ভব হইলেও বৃহৎ পরিমাণে সোডা প্রস্তুতের জন্য তখনও পর্যন্ত সিদ্ধিলাভ করে নাই। ইহার প্রধান কারণ ছিল যে, আমোনিয়া নাশ নিবারণ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। মণ্ড কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই পদ্ধতি ইংলণ্ডে ব্যবহার করিবার জন্য তিনি সল্‌ভের নিকট হইতে সনদ লইয়াছিলেন এবং হাচিন্‌সনের ক্ষারকারখানার

ভূতপূর্ব এক মুহুরী জন ক্রনারের সহিত একযোগে চেসায়ারের অন্তর্গত উনিংটন নামক স্থানে সল্‌ভে পদ্ধতি অনুসারে সোডা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপে বিখ্যাত ক্রনার-মণ্ড কারবারের সূত্রপাত হয়। ক্রমে আরও অনেকগুলি কারবার ইহার সহিত মিলিত হয় এবং ১৯২৬খৃঃ ইহা য়ুনাইটেড্ আলকালি কোং, নোবেল্‌স্ কোং ও ব্রিটিশ ডাইস্টাফ করপোরেসনের সহিত একত্রীভূত হইয়া প্রায় ৯০ কোটি টাকা মূলধন লইয়া 'ইম্পিরিয়েল কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ'তে পরিণত হইয়াছিল।

রসায়ন-শিল্পের উন্নতির জন্য লাডুয়িগ মণ্ড অনেক কিছু করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে মণ্ডের নিকেল নিষ্কাশন প্রণালীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বলা বাহুল্য যে, মণ্ড নিকেল পৃথিবীর সর্ব্বত্র রসায়ন শিল্পের বিশেষ কলারূপে পরিগণিত হইয়াছিল, এবং ধাতু-নিষ্কাশন বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও লৌহ সঙ্কর ধাতুর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে খাঁটী নিকেলের চাহিয়া অভূতপূর্ব পরিমানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

টেনেণ্ট, ডীকন, স্পেন্স ও মেসেলের নাম রসায়নশিল্পের ভিত্তিস্থাপনের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে চার্লস টেনেণ্ট দেখিলেন যে, তাঁহার পূর্ব ব্যবসায় বস্ত্রবয়নাপেক্ষা বস্ত্রবিরঞ্জন অধিক লাভজনক। সেই জন্য তিনি গ্লাসগোতে গিয়া নক্স নামক এক অংশীদারের সহিত পারী হইতে আনীত 'লো দ্য জাভেল'—জাভেলের জল দ্বারা বস্ত্র বিরঞ্জন আরম্ভ করেন। পরে তিনি বিরঞ্জকচূর্ণ আবিষ্কার করেন। ইহাতে তাঁহার ব্যবসায় অতি দ্রুত বৰ্দ্ধিত হয় এবং সে সময় তাঁহার বিরঞ্জন কুটী পৃথিবীর মধ্যে এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ছিল।

হেনরী ডীকন ১৮২২খৃঃ লণ্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। সুবিখ্যাত মাইকেল ফারাডের সহিত তাঁহার পরিবার-বর্গের বন্ধুত্ব ছিল। সেই জন্য হেনরী গুণী ফারাডের পরীক্ষাগারে প্রায়ই যাইতেন এবং সেখানে তাঁহার পরীক্ষাকার্যে নানারূপ সাহায্য করিতেন। কিছুদিন শিক্ষানবিশির পর ডীকন সেণ্টহেলেন্‌সে এক কাঁচের কারখানায় চাকরি পান। নানাস্থানে চাকরির পর, ১৮৫৫ খৃঃ তিনি গাসকেল নামক এক ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া 'গাসকেল, ডীকন এণ্ড কোং' নামে রাসায়নিক দ্রব্য তৈয়ারী করিবার একটী কারখানা স্থাপন করেন। কৈমিতিক কলায় ডীকন অনেকগুলি নূতন পদ্ধতি দান করিয়াছেন। তাহার মধ্যে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বায়বিক দহনের দ্বারা ক্লোরিন প্রস্তুত প্রণালীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

১৮৪৭ খৃঃ রুডল্‌ফ মেজেল ডার্মষ্ট্রাডটে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্পর্শ পদ্ধতিতে সালফুরিক এসিড প্রস্তুত করার সম্পর্কে তিনি অনেককিছু করিয়াছিলেন। এই পদ্ধতিতে সালফার ডায়ক্সাইড্ হাওয়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত যোজকের উপর দিয়া প্রেরণ করিতে হয়। ইহাতে মিশ্র গ্যাসের কিয়দংশ মিলিত হইয়া সালফার এ্যক্সাইডে পরিণত হয় এবং এই শেষোক্ত দ্রব্য জলে গুলিয়া সালফুরিক এসিড হয়। ১৯২০খৃঃ মেজেলের মৃত্যু হয়। তাঁহার বিশাল সম্পত্তির অধিকাংশ তিনি 'রয়েল সোসায়িটী' ও 'সোসায়িটী অফ্ কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্রী'কে দান করিয়া গিয়াছেন।

১৮৫৬ খৃঃ একটী অষ্টাদশ বর্ষীয় বালক ইষ্টারের ছুটীতে বাড়ী আসিয়া একটী ঘরে—যাহা তিনি পরীক্ষাগাররূপে সজ্জিত করিয়া লইয়াছিলেন—উৎসাহের সহিত এক পরীক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এলায়িল টলুয়িডিন, পটাস-ডাইক্রোমেট ও সালফুরিক এসিডের সহিত গরম করিয়া কুইনিন প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু কুইনিনের পরিবর্তে তিনি এক লাল চূর্ণ পাইয়াছিলেন। এলায়িল টলুয়িডিনের বদলে এনিলিন ব্যবহার করিয়া এই প্রক্রিয়া পুনর্বার করিলে তিনি এক কাল চূর্ণ প্রাপ্ত হন। এই চূর্ণ সুরাসার কিম্বা জলে সহজে গুলিয়া যায় এবং উজ্জ্বল বেগুনী রংয়ের দ্রব পাওয়া যায়। এইরূপে মানুষের তৈয়ারী প্রথম রংয়ের মসলা প্রস্তুত হয়।

এই ছাত্রের নাম উয়িলিয়াম হেনরী পার্কিন। তাঁহার নূতন চূর্ণের প্রয়োগের সম্ভাবনা পার্কিন তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি এই চূর্ণের নমুনা পার্থের বস্ত্র-রঞ্জক ব্যবসায়ী পুলার কোম্পানীর নিকট পাঠান। তাঁহারা ইহার রঞ্জনগুণ সম্বন্ধে খুব ভাল অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৫৬ খৃঃ আগষ্ট মাসে পার্কিন প্রথম কৃত্রিম রংয়ের মসলার পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। তিনি, তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা সকলে মিলিয়া এই নূতন বেগুনী রংয়ের মসলা তৈয়ারী করিবার জন্য একটী কারখানা স্থাপন করেন।

এই রং তৈয়ারী করিবার উপাদান সামগ্রী নাইট্রোবেন্‌জীন ও এনিলিনের অভাবে প্রথম প্রথম অসুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু পার্কিন নিজেই ইহা প্রস্তত করিতে আরম্ভ করার পর 'পার্কিন এণ্ড সন্সে'র কারবার দ্রুত উন্নতি লাভ করিতে থাকে। পৃথিবীর মধ্যে ইহাই সংযোজিক রঞ্জন-দ্রব্য তৈয়ারীর প্রথম কারখানা। পার্কিনের সামান্য আবিষ্কারের মধ্যে একটা বিশাল রসায়নশিল্পের বীজ নিহিত ছিল। এখন এই শিল্পে কোটী কোটী টাকা এবং সহস্র সহস্র লোক নিযুক্ত আছে। বলা বাহুল্য পার্কিনের "বেগুনী"র আবিষ্কারের পর নূতন নূতন সংযোজিক রঞ্জনদ্রব্য দ্রুত উদ্ভাবিত হইতে লাগিল এবং ঐ সমস্ত প্রস্তুত করিবার জন্য অসংখ্য কারবার স্থাপিত হইল।

উইলিয়াম হেনরী পার্কিন ১৮৩৮ খৃঃ জন্মলাভ করেন এবং ১৮৭৪ খৃঃ ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতে ১৯০৭ খৃঃ তাঁহার মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি রসায়নের গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৬০ খৃঃ তিনি রয়েল সোসাইটীর ফেলো হন এবং ১৯০৬ খৃঃ "নাইট" পদবী প্রাপ্ত হন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে ও বিংশ শতাব্দীতে রসায়নশিল্প এত দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে যে, তাহাদের সম্পূর্ণ হিসাব দিতে হইলে একটী প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া পড়িবে। এই সময়ের রসায়ন শিল্পীর সংখ্যা এত অধিক এবং এ বিষয়ে তাঁহাদের দান এত গুরুত্বপূর্ণ যে নাম নির্বাচন করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তাহা ছাড়া ইহারই মধ্যে এই প্রবন্ধ এত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে যে আর দুই তিনটীর অধিক রসায়ন শিল্পীর নাম উল্লেখ করা সম্ভব হইবে না। আধুনিক রসায়ন শিল্পের বিস্ময়কর শ্রীবৃদ্ধির গল্প পরে একদিন বলিবার ইচ্ছা রহিল।

১৮৮৪ খৃঃ কাউণ্ট হিলেয়ার দ্য সারদোনে সুরাসার-ইথারে নাইট্রোসেলুলোসের দ্রব সূক্ষ্ম ছিদ্র-যুক্ত পিচকারীর ভিতর হইতে বেগে নিক্ষেপ করিয়া কৃত্রিম রেশমের সুতা তৈয়ারী করিয়াছিলেন। তিনি এই পদ্ধতির পেটেণ্ট লইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রস্তুত কৃত্রিম রেশম ১৮৮৯ খৃঃ পারী পরিদর্শনীতে দেখাইয়াছিলেন। দুই বৎসর পর কাউণ্ট দ্য সারদোনে বাসাঁসোঁতে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত করিবার জন্য একটী কারখানা স্থাপন করেন। ঐ কারখানায় দিনে ৫০ সের আন্দাজ রেশমী সুতা প্রস্তুত হইত, কিন্তু আধুনিক কৃত্রিম রেশমের কারখানায় এক মিনিটে উহার অধিক সুতা প্রস্তুত হয়। দ্য সারদোনের পদ্ধতি ছাড়াও "ভিসকোজ" প্রভৃতি আরও অনেক রকম কৃত্রিম রেশম তৈয়ারীর প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং অধুনা এই সব প্রণালী অনুসারেই অধিকাংশ কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত হয়।

এযুগের রসায়ন শিল্প প্রবর্ত্তকদের মধ্যে ডাঃ এল্ এইচ বেকলাণ্ডের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বেকলাণ্ড ১৮৬৩ খৃঃ বেলজিয়মের ঘেণ্ট সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ঘেণ্ট ও ব্রুজেসে কিছু দিন রসায়নের অধ্যাপকের কাজ করিবার পর ১৮৮৯ খৃঃ তিনি নিউইয়র্কে চলিয়া যান। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি "ভেলক্স" নামক সুবিখ্যাত আলোকচিত্র ছাপিবার কাগজ প্রস্তুত করেন। ১৯০৭ খৃঃ বেকলাণ্ড ফেনোলের সহিত

ফর্মাল্ডিহাইড ও তদ্রূপ সামগ্রীর প্রতিক্রিয়া জানিবার জন্য কুতূহলী হইয়াছিলেন। ইহার ফলে "বেকলাইট" আবিষ্কৃত হয় এবং ইহাতে একটী সম্পূর্ণ নূতন রসায়নশিল্প—প্লাস্টিক বা ছাঁচোপকরণ প্রস্তুত শিল্প—আরম্ভ হইয়াছিল। অধুনা নানা রকমের প্লাসটিক আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ছাঁচোপকরণ প্রস্তুত-শিল্প দিন দিন অপরিমেয় শক্তিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

১৯১৩ খৃঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এক বৎসর পূর্বে, জার্মান বৈজ্ঞানিক ডাঃ হাবের, বৃদ্ধ লাডুয়িক মণ্ডের সময় হইতে রসায়নশিল্পীদের স্বপ্ন—সাধারণ হাওয়ার নিষ্প্রয়োজন অংশ নাইট্রোজেনকে দরকারী কোন দ্রব্যে পরিবর্ত্তন—বাণিজ্যভিত্তিতে কার্যে পরিণত করিতে সফল হইয়াছিলেন। তিনি নাইট্রোজেন হাড্রোজেনের মিশ্রণকে উচ্চ চাপে ও উচ্চ উত্তাপে আমোনিয়ায়, অথবা কার্যতঃ আমোনিয়াম্-লবণে পরিণত করিয়া আবহিক নাট্রোজেনের সংবন্ধন করিতে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। এই আবিষ্কারের জোরে জার্মানী প্রথম বিশ্বযুদ্ধ লড়িয়াছিল। অবশ্য হাওয়ার নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন তাড়িৎ নিঃস্রাবের সাহায্যে সরাসরি সংযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা নাইট্রিক এসিড প্রস্তুত করিবার প্রণালীও আবিষ্কৃত হইয়াছে। রসায়ন শিল্পের এই সিদ্ধিতে জমির সারের অভাব চিরদিনের জন্য সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়াছে।

রসানয়শিল্প প্রবর্ত্তকদের দশমাংশের এক অংশের নামও উল্লেখ করা হয় নাই। যে কোন রসায়ন-শিল্প কিম্বা রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার সফলতার ভিতর কত পরীক্ষা, কত চেষ্টা, কত ক্ষতি স্বীকারের কাহিনী লুক্কায়িত আছে। বাস্তবিকই তাহা সময়ে সময়ে এত বিস্ময়কর ঘটনা সমাবেষ্টিত যে অদ্ভুত উপন্যাস বলিয়া মনে হয়।

রসায়ন-শিল্পের সম্পাদ্য বিষয় এখনও অনেক আছে এবং তাহার জন্য এখনও যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন। উহা কমিবার পরিবর্ত্তে প্রতি বৎসর বাড়িয়াই চলিয়াছে। মানুষের প্রয়োজনের শেষ নাই। নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার সহিত নূতন নূতন উপাদান সামগ্রীর দরকার হইতেছে এবং পুরাতন দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার জন্য তাহার সুলভ বদলীর চাহিদাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। সেইজন্য প্রায় শত বৎসরের রসায়ন-শিল্প-চর্চ্চার পরও নূতন নূতন প্রবর্ত্তক ও উদ্ভাবকের প্রয়োজন এখনও শেষ হয় নাই। তাঁহার কার্য করিবার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্য অতীতের যে কোন সময়ের অপেক্ষা কমে নাই, বরং বাড়িয়াছে। রসায়ন-শিল্পের উন্নতি কিন্তু বিশুদ্ধ রসায়নের শ্রীবৃদ্ধির উপরে নির্ভর করিতেছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রামসে যখন সাধারণ হাওয়া হইতে "নিয়ন" প্রভৃতি জড় প্রকৃতির পাঁচটি বিভিন্ন বায়ু পৃথক করিয়াছিলেন, তখন কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই, জড় বায়ু কোন কাজে লাগিবে। কিন্তু এখন উজ্জ্বল "নিয়ন" আলো পৃথিবীর সমস্ত সহরে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর নানারূপ বিজ্ঞাপন প্রচার করিতেছে। রসায়ন শিল্প ও বিশুদ্ধ রসায়নকে চিরদিনই পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

মৌমাছি পালনের গোড়ার কথা

শ্রীবিমলচন্দ্র রাহা

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই মৌমাছি পালনের কথা জানেন না। কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহা একটি উন্নত শিল্প। তথায় মধু উৎপাদন ব্যতিরেকে মৌমাছি দ্বারা পরাগযোগ (**Pollinaton**) ক্রিয়াও সম্পন্ন হইয়া থাকে। ভারতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৌমাছি পালনের সম্ভাবনার প্রতি প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তার-বিভাগের জন ডগ্‌লাস নামক জনৈক ইংরাজ। বহু চেষ্টায় তিনি বাংলা গভর্ণমেণ্টকে মৌমাছি পালনে রাজি করাইয়া ১৮৮৪ সালের নিকটবর্তী সময় ইউরোপীয় মৌমাছি দ্বারা বাংলায় প্রথম মৌমাছি পালনের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইহা যে কিছুকাল পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল তাহা তাহার পুস্তকের পরিশিষ্টের বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায়। মৌমাছি পালনে তাহার পর হইতে বাংলায় যে অন্ধকার যুগ আরম্ভ হইয়াছে তাহা এখনও সম্পূর্ণ অবসান হইবার কোনও লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। সুদূর অতীতে ভারতের বাংলা প্রদেশে প্রথম যে মৌমাছি পালনের সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা কেন কৃতকার্য হয় নাই বা স্থায়ী হইয়া উত্তরোত্তর তাহার শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই তাহা বর্তমান বাংলার মনোবৃত্তি হইতেই কিছুটা বুঝিতে পারা যায়। সাধারণভাবে বলা যায়, নতুন কোনও বিষয়ের প্রতি অনাগ্রহ আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। তবুও কালের গতিরোধ করা যায় নাই তাই অতীত ও আধুনিকতম বহু বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুবিধা ভোগ করিলেও আমরা সনাতন লাঙ্গল ও গোয়ালের পূজারীই রহিয়া গিয়াছি। পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় আমরা সর্ব বিষয়েই শত বৎসর পশ্চাৎগামী। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মধারার যদি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন সম্ভব না হয় তাহা হইলে আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

যাহা হউক, শতাব্দীর প্রথমে মাদ্রাজ প্রদেশে ফাদার নিউটন পুনরায় মৌমাছি পালন আরম্ভ করেন ও তথা হইতে ইহা ক্রমে মহীশূর, বোম্বাই, পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশেও অল্পাধিক বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে যদিও পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে মৌমাছি পালনের শিক্ষাকেন্দ্র আছে, কিন্তু মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশেই অধিক সংখ্যক মৌমাছি পালক্ আছেন। কিন্তু বাংলা দেশে যেখানে প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রথমে মৌমাছি পালনের সূত্রপাত হইয়াছিল সেখানে একমাত্র খাদি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত উল্লেখ-যোগ্য অন্য কেহই নাই বলিলেই হয়। অথচ মৌমাছি পালনের পক্ষে অনুকূল স্থান ও অবস্থা যে বাংলা দেশে নাই তাহাও নহে। এই অনগ্রসরতার কারণ, অতীতে বাংলা গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ উদাসীনতা। বর্তমান স্বাধীন বাংলার গভর্ণমেণ্টও যদি সেইরূপই উদাসীন থাকেন তাহা হইলে মৌমাছি পালনের উন্নতি ও ব্যবসা হিসাবে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইতে বহু বিলম্ব হইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বর্তমান গভর্ণমেণ্ট যদি সত্যই মৌমাছি পালনের প্রসার ও প্রচার চান তাহা হইলে সর্বাগ্রে ব্যবসা হিসাবে মৌমাছি পালনের পক্ষে উপযোগী কোনও স্থানে মৌমাছি পালনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে এবং বাংলা দেশের মৌমাছি পালনের পক্ষে উপযোগী স্থানগুলিকে কয়েকটি কেন্দ্রে বিভক্ত করিয়া প্রতি কেন্দ্রে একজন করিয়া বিশেষজ্ঞ

রাখিতে হইবে। তাহারা মৌমাছি পালনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে সর্ব্ব বিষয় সাহায্য করিবেন। এ বিষয়ে সম্পন্ন ও শিক্ষিত ধনী ব্যক্তিরাও একটু অবহিত হইলে দেশের অশেষ কল্যান হয়।

আধুনিক মৌমাছি পালনের অপ্রাচুর্য্যতার জন্য শত শত মণ পুষ্পরসের (Nectar) অপচয় হইতেছে। যদিও মধু ও মৌমাছি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ অশিক্ষিত লোকেরা কিছু পরিমান মধু জঙ্গলের বা গ্রামের স্বভাবজাত মৌমাছির চাক হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে মৌমাছির ডিম্ব ও শূকের রস নিংড়ানোর কালে মিশ্রিত হইয়া যায় বলিয়া তাহা শীঘ্রই গাঁজিয়া উঠে ও আহারের অনুপযুক্ত হইয়া যায়। সামান্য চেষ্টায় বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা এই মধুও সচ্ছন্দে নিষ্কাশিত মধুর ন্যায় স্বাদে গন্ধে অতুলনীয় হইতে পারে। তবে চাকের সমস্ত মৌমাছি ধ্বংস করিয়া মধু সংগ্রহের আদিম প্রথা যত শীঘ্র সম্ভব বন্ধ করিয়া মৌমাছি পালন দ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রথায় মধু সংগ্রহের পদ্ধতি প্রবর্তিত হওয়াই শ্রেয়ঃ। বৈজ্ঞানিক প্রথায় মৌমাছি পালনের ফলে পুষ্পরসের অপচয় বহু পরিমাণে নিবারিত হইবে, উপরন্তু মৌমাছিরা পরোক্ষভাবে পুষ্পরস সংগ্রহের জন্য পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে যাইয়া পরাগযোগ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া অধিক সংখ্যক ফল ধরিতে সহায়তা করে। পরাগযোগ ক্রিয়ার মাধ্যম হিসাব অন্যান্য কীট-পতঙ্গ হইতে মৌমাছির শ্রেষ্ঠতা সর্ব্বজন-স্বীকৃত।

সমস্ত ব্যবসায়ের মধ্যে মৌমাছি পালনই এক মাত্র ব্যবসায়, যাহা সামান্য অবস্থায় আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে শতাধিক মৌমাছি গৃহের বিরাট ব্যবসায়ে রূপান্তরিত করা সম্ভব। সময় ও পরিশ্রম হিসাবে এক মাত্র মৌমাছির গৃহ হইতে উপযুক্ত পরিমাণ লাভ আশা করা যায়। এবং এই লাভের অর্থ দ্বারাই ধীরে ধীরে ইহার পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব। কাজেই যাহার কয়েক বৎসর এইরূপ ভাবে টিকিয়া থাকিবার সামর্থ্য আছে তাহার পক্ষে কালে মৌমাছি পালন দ্বারা বহু ধনের অধিকারী হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। এইরূপ যোগ্য ব্যক্তির পক্ষে মৌমাছি পালন ক্ষেত্রে বহু সম্ভাবনাও রহিয়াছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, বাংলা দেশের সাধারণ শিক্ষিত যুবকের অর্থোপার্জনের তাড়না এতই প্রবল যে, তাহার পক্ষে ধীরে ধীরে কোনও কিছু গড়িয়া তোলা প্রায় অসম্ভব বলিলেই হয়। তাহার পর মৌমাছি পালনের পক্ষে উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত স্থান নির্ণয় এতাবৎ গভর্ণমেণ্টের উদাসীনতার জন্য সম্ভব হয় নাই; অবস্থা দেখিয়া মনে হয় শীঘ্র হইবারও কোন আশা নাই। কোথায় কোন্ পুষ্প বৃক্ষ, লতা বা গুল্ম মৌমাছি পালনের উপযুক্ত সংখ্যায় বিদ্যমান, কোন্ পুষ্পের রস কখন কি অবস্থায় ক্ষরণ হয় বা ক্ষরণ বন্ধ হইয়া যায় তাহার সম্যক জ্ঞান না থাকিলে মৌমাছি পালনে বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হয় ও মৌমাছি পালকের এই জ্ঞান লাভের জন্য বহু সময় ও অর্থের অপব্যয় হয়। সাধারণকে এই শিক্ষাদানে গভর্ণমেণ্টের মৌমাছি পালন বিভাগের উদ্যোগী হওয়া উচিত। গভর্ণমেণ্টের বিভাগীয় কার্য ও গবেষণার দ্বারা প্রজাসাধারণ উপকৃত ও লাভবান হইবে ইহাই গভর্ণমেণ্টের কাম্য হওয়া উচিত। গবেষণা বা পরীক্ষাগার দ্বারা সাধারণে যে জ্ঞান লাভ করে তাহাই গভর্ণমেণ্টের লাভ। সকল ক্ষেত্রেই গবেষণা বা পরীক্ষাগার দ্বারা আর্থিক লাভ হওয়া সম্ভব নয়।

যাহা হউক, সকলের সমবেত চেষ্টায় সুজলা সুফলা বাংলা দেশকে দুগ্ধ ও মধু দ্বারা প্লাবিত করা মোটেই অসম্ভব নয়। ইহার জন্য প্রয়োজন পূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, অদম্য উৎসাহ ও প্রচেষ্টা এবং জনসাধারণের সহিত সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা।

বিবিধ প্রসঙ্গ

মনুষ্যদেহে আণবিক-বিকিরণের প্রভাব

বৃটিশ আণবিক-গবেষণা-কেন্দ্রে যাঁরা আণবিক গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন—তাঁদের মধ্যে প্রায় কুড়ি জন কর্মী অনুযোগ করেছেন যে, আণবিক-বিকিরণের প্রভাবে তাঁদের পুরুষত্বহানি ঘটেছে। এ'নিয়ে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়; ফলে আভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রাদির ওপর আণবিক-বিকিরণের প্রভাবে কিরূপ কুফল হতে পারে, সেবিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যে চিকিৎসকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। অ্যাটম-বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত জাপানের হিরো-সিমা ও নাগাসাকীতে যাঁরা প্রাণে বেঁচে গেছেন তাঁদের সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্যাদি সংগ্রহ করে দেখা গেছে যে, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রজনন-শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।

বংশানুক্রম সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর জে, বি, এইচ, হালডেনের ধারণা—আণবিক-বিকিরণের প্রভাবে যে পুরুষত্ব বা প্রজনন শক্তি নষ্ট হবেই এমন কোন কথা নেই, তবে অনেক ক্ষেত্রে ঘটতে পারে; কিন্তু যেক্ষেত্রে প্রজননশক্তি নষ্ট হবে না সেক্ষেত্রে এমন সন্তান উৎপন্ন হতে পারে যাদের আকৃতি অথবা মানসিক শক্তি হবে অদ্ভুত। এর ফলে, কয়েক পুরুষ অন্তে সমগ্র মানব জাতির আকৃতি ও প্রকৃতির আমূল পরিবর্ত্তন ঘটা কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার নয়। প্রোফেসর মুলারও হ্যালডেনের অভিমত সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে, আণবিক-শক্তি প্রভাবে সমগ্র মানব জাতির এরূপ কোন পরিবর্তন ঘটতে হাজার বছরেরও বেশী কেটে যাবে। প্রোফেসর মুলার অনেকদিন থেকেই ফল-মাছির ওপর আণবিক-বিকিরণের প্রভাবের বিষয় পরীক্ষা করে আসছেন। আণবিকশক্তির প্রভাবে ফল-মাছির দৈহিক গঠনের অনেক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটতে দেখা গেছে। কোন কোনটার শরীরের রং হয়েছে অদ্ভুত, কারোর হয়েছে অদ্ভুত চোখ, আবার কারো কারোর হয়েছে তিনটে ডানা।

আণবিক-বিকিরণ মনুষ্যদেহে কিরকম প্রভাব বিস্তার করতে পারে বর্তমানে এবিষয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রশস্ত ক্ষেত্র হচ্ছে জাপান। জাপানী বৈজ্ঞানিকেরা ইতিমধ্যেই হিরোসিমা ও নাগাসাকি থেকে আণবিক বিকিরণে প্রভাবান্বিত প্রায় একলক্ষ যাটহাজার রোগীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন। জাপানীদের ওপর আণবিক বোমার প্রভাব সম্পর্কে গবেষণার জন্যে বিদেশী বৈজ্ঞানিক দলের অধিনায়ক ষ্ট্যাফোর্ড ওয়ারেন্স্ বলেছেন যে, অন্ততঃ বছর দশেকের কমে এ সম্বন্ধে প্রাথমিক কোন সিদ্ধান্ত করাও সম্ভব হবে না। ভবিষ্যতে মানুষের আকৃতি-প্রকৃতিগত কোন পরিবর্তন আসবে কিনা, অন্ততঃ পঞ্চাশ বছরের আগে সেবিষযে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা চলে না।

পিতামাতার বীজ-কোষের মধ্যস্থিত 'ক্রেমো-সোমে' নিহিত 'জিন্‌স্' (Genes) নামক পদার্থই সন্তানের আকৃতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ ক'রে থাকে। উদ্ভিদ বা মানুষ্যেতর প্রাণীদের ওপর এক্স-রে বা আণবিক-বিকিরণের পরীক্ষার ফলে এরূপ কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। আণবিক-বিকিরণের প্রভাবে 'জিন্‌স্'-এর কোন পরিবর্ত্তন ঘটে থাকলে বংশধরদের কেউ কেউ 'মিউট্যান্ট' রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। অথবা কয়েক পুরুষ পর্যন্ত সুপ্ত থেকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে সমধর্মী 'জিনসে'র সঙ্গে মিলতে পারলে তার পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্যকে বিকশিত করতে পারে। 'জিনসে'র পরিবর্তনে স্থায়ী বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত 'মিউট্যান্ট' আত্মপ্রকাশ করে এবং তা' বংশানুক্রমে সমভাবেই চলতে থাকে। কাজেই আণবিক বিকিরণে যদি সত্যসত্যই 'জিন্‌স্'-এর পরিবর্তন ঘটে থাকে তবে

আকৃতি প্রকৃতিতে অভিনব মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব মোটেই অসম্ভব নয়।

ডি-ডি-টি'র অপকারিতা

গত যুদ্ধে যেসব আশ্চর্য রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে অব্যর্থ কীট-নাশক পদার্থরূপে ডি-ডি-টি'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করার জন্যে আজকাল প্রায় সর্বত্র ডি-ডি-টি ব্যবহৃত হচ্ছে। ডি-ডি-টি'র সংস্পর্শে মশা, মাছি, ছারপোকা উকুন প্রভৃতি কীট-পতঙ্গের ধ্বংস অনিবার্য। কিছুকাল আগে 'ওয়ার্লড্ হেল্থ্ অরগ্যানিজেশন্' ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের জন্যে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায় 'অ্যানোফেলিস্' মশা। কাজেই মশা ধ্বংস করতে পারলে ম্যালেরিয়ার প্রভাবও কমবে নিশ্চয়। এজন্যে এ-প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিভিন্ন দেশে মশক-ধ্বংসের কাজ সুরু হয়ে গেছে। এ-পরীক্ষার ফলে অনেক ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুর হার শতকরা ৮০ থেকে প্রায় শতকরা ৫ অবধি নেমে এসেছে। প্রধানতঃ ডি-ডি-টি ব্যবহার করেই তাঁরা সুফল লাভ করেছেন। কিন্তু ডি-ডি-টি ব্যবহারের পর এমন কতকগুলো ব্যাপার দেখা গেছে, যার ফলে ডি-ডি-টি'র উপকারিতার সঙ্গে তার অপকারিতার বিষয়ও বিশেষভাবে অনুধাবন করবার কারণ ঘটেছে। ডি-ডি-টি'র সংস্পর্শে যেমন মশা মরে তেমন সাধারণ মাছিও মরে। 'অ্যানোফেলিস' মশা যেমন ম্যালেরিয়ার বীজাণু বহন করে, মাছিও তেমনি টাইফয়েড, কলেরা আমাশয় প্রভৃতি রোগবীজাণু ছড়িয়ে দেয়। কোন কোন স্থানে প্রায় বছর দুই ধরে' ডি-ডি-টি ছড়ানোর পর দেখা গেছে—সেখানে সাধারণ মাছি মরে গেলেও এমন এক জাতের মাছির উদ্ভব হয়েছে যাদের উপর ডি-ডি-টি'র কোনই প্রভাব দেখা যায় না। পরীক্ষার ফলে কিছুদিন আগেই জানা গেছে, কেবল মাছির ব্যাপারেই নয়, লঘুমাত্রায় প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগে বিভিন্ন জাতের রোগোৎপাদক আণুবীক্ষণিক ব্যাক্টেরিয়ার ক্ষেত্রেও এরূপ 'মিউট্যাণ্ট' আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু ডি-ডি-টি প্রয়োগে মশককুলের মধ্যে এরূপ কোন 'মিউট্যাণ্ট'এর সন্ধান মিলেনি। তবে বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন—দু'বছরের জায়গায় চারবছর ডি-ডি-টি ব্যবহারের পর যে ডি-ডি-টি প্রতিরোধকারী মশকের আবির্ভাব ঘটবে না এমন কোন নিশ্চয়তা নেই।

তা'ছাড়া ডি-ডি-টি ব্যবহারে যেমন অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ মারা যায়, তেমনি আবার মানুষের উপকারী পোকা-মাকড়ও ধ্বংস হয়ে যায়। অনিষ্ট-কারী পোকা-মাকড় নষ্ট করবার জন্যে ডি-ডি-টি ছড়ানোর ফলে গ্রীসের একটি অঞ্চলের সব মৌমাছি মরে যায়; ফলে মধু-ব্যবসায়ীদের মধ্যে হাহাকার পড়ে যায়। উত্তর ইটালীতে এক জায়গায় গুঁটি-পোকার চাষ হতো। ডি-ডি-টি ছড়ানোর ফলে সেখানের অনেক গুঁটি-পোকা নষ্ট হয়ে যায়। এতদিন জানা ছিল—কীট-নাশক ঔষধের মধ্যে ডি-ডি-টিই সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা মনে করেন—শীঘ্রই ডি-ডি-টির চেয়ে আরও উৎকৃষ্টতর কীটনাশক ঔষধ আবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে।

'য়্যানিমিয়া' বা রক্তাল্পতা রোগের নূতন ঔষধ

বৃটিশ ইন্‌ফমেশন সার্ভিসের খবরে প্রকাশ, বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা রক্তাল্পতা রোগের বিশেষ শক্তিশালী একটা নতুন ঔষধ আবিষ্কার করেছেন। সম্প্রতি ৮০টি রোগীর ওপর এ-ঔষধটি পরীক্ষা করে' দেখা হয়েছে। এ-ঔষধের এক আউন্সের মাত্র দু'লক্ষ ভাগের এক ভাগ প্রয়োগেই আশ্চর্য সুফল পাওয়া যায়। এ-ঔষধ ব্যবহারে রক্তে রক্ত-কণিকার পুনরাবির্ভাব তো ঘটেই, তাছাড়া এ-রোগে স্নায়ু জালের এবং মেরুদণ্ডের যেসকল উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলোও দূর হয়ে যায়।

এ-আবিষ্কারের অনেকখানি কৃতিত্ব হচ্ছে, গ্লাক্সো রিসার্চ লেবরেটরীর ডাঃ লেষ্টার স্মিথের। সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্যে ব্যাপকভাবে এ-ঔষধ তৈরী করবার চেষ্টা এখনও আরম্ভ হয়নি।

আণবিক শক্তি বিষয়ক প্রদর্শনী

বি, ই, এস'এর খবরে প্রকাশ, আণবিক শক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলবার উদ্দেশ্যে বৃটেনে একটি ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। গত কয়েকমাস ধরে বিভিন্নস্থানে লক্ষাধিক লোক এই প্রদর্শনী দেখবার সুযোগ পেয়েছে। মডেল ও চিত্রের সাহায্যে পরমাণু সম্বন্ধে যাবতীয় বিষয় এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছে। এখানে এলে একজন সাধারণ দর্শকও পরমাণুর গঠন, আণবিক শক্তির প্রকৃতি ও প্রয়োগ-কৌশল সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা নিয়ে যেতে পারেন।

পদার্থের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ যে পরমাণু, তারা জগতের কি অপরিসীম কল্যাণ এবং কি ভয়াবহ ধ্বংস সাধন করতে পারে, প্রদর্শনীর একটি বিভাগে তা' দেখানো হয়েছে। লণ্ডনের একটি মানচিত্রে সহরের কেন্দ্রস্থলকে কেন্দ্র করে একটি লাল বৃত্ত এঁকে দেখানো হয়েছে যে, ওইখানে একটি অ্যাটম-বোমা পড়লে কতখানি জায়গা বিধ্বস্ত হবে। আণবিক-শক্তির প্রয়োগে চিকিৎসা, শ্রমশিল্প ও কৃষিকার্যে কি বিরাট উন্নতির সম্ভাবনা আছে—অন্যদিকে তারও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আণবিক-শক্তিকে কেমন করে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করা যায়, বৃটিশ বৈজ্ঞানিকেরা এখন সে-চেষ্টাতেই ব্যাপৃত আছেন। শ্রমশিল্পে কয়লা বা পেট্রোলের পরিবর্তে আণবিক-শক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে। হারওয়েলের আণবিক গবেষণাগারে পরমাণু থেকে কিয়ৎ পরিমাণ উত্তাপ সৃষ্টিকরা সম্ভব হয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা এখন চেষ্টা করছেন—কিভাবে এই উত্তাপকে এঞ্জিন চালানো বা সহরের জন্যে প্রয়োজনীয় তাপ ও বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজে লাগানো যেতে পারে। ১৫০০ টন কয়লা পুড়িয়ে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়, মাত্র এক পাউণ্ড ইউরেনিয়ামের মধ্যে সেই তাপ সঞ্চিত আছে।

আণবিক-শক্তির সাহায্যে কেমন করে কৃষিকার্যের উন্নতি বিধান করা যায় বৈজ্ঞানিকেরা সে-চেষ্টাতেও ব্যাপৃত আছেন। উন্নত ধরণের সার তৈরী, কীট পতঙ্গ বিধ্বংসী ঔষধ তৈরী, গাছপালার ব্যাধির চিকিৎসা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে নানারকম গবেষণা চলছে।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, শ্রম-শিল্পে আণবিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহার আগামী দশবছরের মধ্যে যদিও সম্ভব হয়ে উঠবে না তবু চিকিৎসার ব্যাপারে শীঘ্রই এর প্রয়োগ দেখা যাবে। ক্যান্সার-রোগের চিকিৎসায় এবং কতকগুলো রোগের প্রকৃতি নির্ণয়ে তেজস্ক্রিয় 'আইসোটোপে'র ব্যবহারে বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে।

বৃটেনের আণবিক বৈজ্ঞানিক সংসদের উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বর্তমানে আমাদের দেশও আণবিক গবেষণায় কারুর পিছনে পড়ে নাই। অন্ততঃ সাধারণভাবেও এদেশীয় বৈজ্ঞানিকেরা এরকমের কোন প্রদর্শনীর আয়োজন করলে তা' জনসাধারণকে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন করে গড়ে তোলবার কাজে যথেষ্ট সহায়ক হবে।

ভারতীয় ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা

দোরালায় বিজ্ঞান-কলাভবনের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষ্যে ভারতের শিক্ষা-সচিব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন যে, ভারতের শিক্ষা-পদ্ধতি সুষ্ঠু ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কারণ, ১৬০ বছর আগে ইংরেজী ভাষাকেই ভারতের শিক্ষার মাধ্যম করা হয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে ভারতীয়দের পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের সংকল্প সাধু ছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু তা' ইংরেজীর মাধ্যমে হওয়ায়

আমাদের মহা অসুবিধায় ফেলা হয়েছে। ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হলে ভারতীয়দের কাছে বিজ্ঞানশিক্ষা যে কেবল সহজসাধ্যই হয়ে উঠত তা' নয়, এতদিনে এক নতুন ভাষাও গড়ে উঠত। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে এ-ত্রুটি দূর করে জাতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা এখন আমাদের জাতীয় সরকারেরই কর্তব্য। ভারত সরকার এখন যে পদ্ধতি গ্রহণের প্রস্তাব করেছেন উক্ত প্রতিষ্ঠান ৫ বছর পূর্বেই তা' গ্রহণ করায় মৌলানা আজাদ তাঁদের অভিনন্দন জানান।

পরিভাষা সম্পর্কে শিক্ষা-মন্ত্রী বলছেন যে, যে-ভাবে ভারতীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দ অনূদিত হচ্ছে তা' ঠিক নয়। প্রত্যহই নতুন নতুন শব্দ তৈরী হচ্ছে এবং সেগুলোও কোন বিশেষ দেশের ভাষার নিজস্ব নয়, এগুলিতে সকলেরই অধিকার আছে। মিশরে বৈজ্ঞানিক পরিভাষাকে আরবীয় ভাষায় অনূদিত করার চেষ্টা হয়েছিল; কিন্তু মিশরের পণ্ডিতেরা ওই সকল শব্দ ইউরোপীয় ভাষায় রাখাকেই বিশেষ সুবিধাজনক এবং প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছেন।

পরিভাষা

ইংরেজী ছিল এতকাল আমাদের রাষ্ট্র ভাষা, আমাদের সব রকমের কাজই করা হত ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে। এখন স্বাধীনতা লাভের পর পশ্চিম বাংলা সরকার বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষারূপে অনুমোদন করেছেন, সরকারী দলিল-দস্তাবেজ এবং লেখাপড়ায় এখন থেকে বাংলা ভাষাই ব্যবহৃত হবে। এজন্যে পশ্চিম বাংলা সরকার কয়েক জন ভাষা ও শব্দতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত নিয়ে যে পরিভাষা-সমিতি গঠন করেছেন অল্পকালের মধ্যেই তাঁরা নির্বাচিত পরিভাষাসমূহের একটা প্রাথমিক খসড়া তৈরী করেছেন। বাংলা ভাষার অনেক পরিভাষা প্রণেতারা প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষার উপরই নজর দিয়েছেন। শব্দই সস্কৃত থেকে এসেছে, কিন্তু ইংরেজী, উর্দ্দু, ফার্সি এবং দেশজ শব্দ এতে কম নেই। সেগুলোকে বাদ দিলে ভাষার সরলতা, মাধুর্য্য এবং সহজ বোধগম্যতা অনেকাংশে ব্যাহত হতে বাধ্য। 'সেক্রেটারিয়েট' কথাটা সরকারী 'দপ্তরখানা' ও 'মহাপেজখানা' রূপে বরাবর চলে আসছে—সেখানে 'মহাকরণ' করার কি প্রয়োজন ছিল? এরূপ 'ডাক'কে 'প্রৈশ' 'কেরানী'কে কারণিক, 'পুলিস'কে 'আরক্ষ' করিয়া কি সুবিধা করা হয়েছে? সংস্কৃত শব্দ চয়ন করে ভাষার কৌলিন্য বজায় রাখার জন্যই কি এরূপ করা হয়েছে?

পশ্চিমবাংলা সরকার প্রবর্তিত নতুন পরিভাষা অবলম্বনে লিখিত বিষয় কিরূপ সুখবোধ্য হবে 'যুগান্তর' থেকে নমুনা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"সম্প্রতি আমরা কলিকাতার এধ সমস্যা সম্বন্ধে জনৈক সংস্থা-করণিকের এক পত্র পাইয়াছি। পত্রখানি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রবর্তিত নূতন পরিভাষা অবলম্বনে লিখিত। এই পত্রে প্রকাশ যে, এধার্থী উক্ত সংস্থা করণিক এক পরিপত্র দৃষ্টে এধের নিমিত্ত আপ্ত-করণিকের নিকট যান। আপ্ত-করণিক বলেন, ন্যাসপালের নিকট গেলেই আপনার এধের সমাচার মিলিবে। ন্যাসপাল বলেন, এখানে নয়, মহা-আরক্ষ পরিদর্শকের নিকট যান। মহা-আরক্ষ পরিদর্শক জানান, অগার সহায়কের স্মারক ভিন্ন কিছুই হইবে না—নিবেশন-অধিকারিকও দাবী করেন, ব্যাপার নির্বাহকের অনুস্মারক চাই। ইতিমধ্যে এক কারণিক তাঁহাকে জানান যে, এ বিষয়ে ভুক্তিপতি ভিন্ন কাহারও কোন ক্ষমতা নাই। অবশেষে তিনি ভুক্তিপতির গোচরে হাজির হন। তখন আপতিক পরিচর তাঁহাকে ডাকিয়া বলেন—এদিকে আসুন। সেখানে গেলে, আগম নিয়ামকের কৃপায় অনুমতি মিলিল। অনেক ভোগান্তির পর ভদ্রলোক সফলকাম হইয়াছেন ইহাতে আমরা সুখী হইলাম। কিন্তু এধাহরণ লইয়া কলিকাতাস্থ জনগণকে আজ কিরূপ বেগ পাইতে হইতেছে, তাহার পরিচায়করূপে এই প্রাঞ্জল ও সর্বজনবোধ্য পত্রখানির গুরুত্ব যে সবিশেষ, তাহা আশা করি বঙ্গীয় মহাকরণের কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করিবেন না।"

পরিষদের কথা

১৫ই মার্চ, সোমবার ও ২৯এ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার কার্যকরী সমিতির যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনদ্বয়ের প্রধান কার্য গুলির বর্ণনা নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। নিয়মাবলীর ১৪ (ঘ) ও ১৪ (ঘ) (১) ধারা অনুসারে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র শ্যাম, শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীশঙ্করসেবক বড়াল মহাশয় কার্যকরী সমিতির অতিরিক্ত সভ্য মনোনীত হ'ন।

২। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণকে লইয়া পুস্তক প্রকাশনী সমিতি গঠিত হয়; শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীসুহৃৎকুমার মিত্র, শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, শ্রীসুকুমার বসু, শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য, শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুবোধ নাথ বাগচী।

৩। নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণ (ইহাদের মধ্যে এযাবৎ যাহারা চাঁদা দেন নাই, তাঁহাদের চাঁদা দেওয়া সাপেক্ষে) নূতন সদস্য নির্বাচিত হন :—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ (শিবপুর) শ্রীভক্তকুমার ঘোষ, শ্রীসুজিতকুমার মহলানবিশ, শ্রীবৈদ্যনাথ বাগচী, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ (শান্তিনিকেতন বোর্ডিং) শ্রীস্নেহময় দত্ত, শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীবিধান বিহারী ঘোষ, শ্রীবলাইচন্দ্র দত্ত, শ্রীলোকনাথ দে, শ্রীহৃষিকেশ রায়, শ্রীনিখিলরঞ্জন মণ্ডল, শ্রীনলিনীমোহন বসু, শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব, শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরকুমার বন্দ্যোপোধ্যায়, শ্রীমনীন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীঅমিয়নাথ সেন, শ্রীরবীন্দ্রলাল আচার্য, শ্রীনীরোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত, শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীজ্ঞানেন্দ্র সুন্দর সান্যাল, শ্রীকান্তিলাল চৌধুরী, শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ লাহা, শ্রীপশুপতি বসাক, শ্রীশচীন্দ্রকুমার বসু, শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ, শ্রীনির্মলনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীসুধীরকুমার দে, শ্রীজ্যোতিপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীমণীধন সেনগুপ্ত, শ্রীসুবলচন্দ্র রায়, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুবোধকুমার মজুমদার. শ্রীরাসবিহারী ঘোষ, শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅরুণকুমার মজুমদার, শ্রীবিবুধনারায়ণ সেন, শ্রীনারায়ণচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীনির্মল ঘোষ, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীগুরুদাস সিংহ, শ্রীগনেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিহর সরকার, শ্রীসুধীর কুমার বিশ্বাস, শ্রীসুরপতি চক্রবর্ত্তী. শ্রীশম্ভু সাহা, শ্রীঅনিলবরণ রায় চৌধুরী, শ্রীসাধন ভট্টাচার্য, শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মৈত্র, শ্রীগিরীন্দ্র শেখর বসু, শ্রীরমেশ মজুমদার, শ্রীসুহৃৎ চন্দ্র সিংহ, শ্রীবিশ্বনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীশিবপ্রসাদ দাশগুপ্ত, শ্রীপার্বতীকুমার সরকার, শ্রীমীনেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীনরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শ্রীক্ষীরোদবন্ধু শর্ম্মা, স্বামী অমৃতানন্দ।

বিজ্ঞপ্তি

পরিষদের যে সমস্ত সদস্য মাত্র অর্ধ বৎসরের চাঁদা জমা দিয়াছেন, বা যাঁহারা মাত্র অর্ধবৎসরের চাঁদা দিয়া 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র গ্রাহক হইয়াছেন, তাহাদিগকে সসম্ভ্রমে অনুরোধ করা যাইতেছে, যেন তাঁহারা বাকী অর্ধ বৎসরের চাঁদা যথাসম্ভব পরিষদের ঠিকানায় পাঠাইয়া বাধিত করেন। পরিষদ কর্তৃপক্ষ সদস্য ও গ্রাহকবর্গের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা কামনা করিতেছেন।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

প্রথম বর্ষ | জুন—১৯৪৮ | ষষ্ঠ সংখ্যা

মাধ্যাকর্ষণ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বিংশ শতাব্দীতে জড় বিজ্ঞানের নানা শাখায় দুর্বোধ্য রহস্যের সমাধান মিলিয়াছে, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন। ফলিত বিজ্ঞানের নানা ব্যবস্থা আমাদের চতুষ্পার্শে বর্তমান সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে সর্বদা রূপায়িত হইতেছে। ঘরে আরামে বসিয়া বহু সহস্র মাইল দূরের কথাবার্তা আলাপ-সালাপ আমরা শুনিতেছি। বিদেশ হইতে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে অনুষ্ঠিত নানা ঘটনার ছবি আমাদের সংবাদপত্রে ছাপা দেখিতেছি। ফলতঃ বর্তমান বিজ্ঞান দূরত্বের সংজ্ঞার ওলটপালট করিয়া দিয়াছে। এমন দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার সাহায্যে মহাকাশ-স্থিত ২৯×১০^{২০} মাইল দূরের বস্তুও দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। এমন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহার সাহায্যে সূক্ষ্ম জীবাণুর ছবি তোলা সম্ভবপর হইতেছে। বস্তুতঃ মানবের জ্ঞান কি পরিমাণ সুদূরপ্রসারী হইতেছে তাহা চিন্তা করিতে গেলে নির্বাক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যাইতে হয়।

আমরা বিজ্ঞানের অন্য কোন তথ্য জানিবার সুযোগ পাওয়ার পূর্বেই নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তথ্যের কথা শুনিয়াছি। কিন্তু এই ক্রিয়ার প্রকৃত কারণ নির্ণয় এতাবৎ কাল সম্ভব হয় নাই। বর্তমান শতকে আইনষ্টাইন তাঁহার অসামান্য ধীশক্তি প্রভাবে এই তথ্যের রহস্য যে ভাবে উদ্ঘাটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অভিনব। কোনও মতবাদ, তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তাহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সকল যুক্তি বিবেচনা করিতে হয়। কারণ তত্ত্বটি যে কেবল সমস্ত জ্ঞাত ঘটনার কারণ নির্ণয় করিবে তাহা নহে, উহা হইতে কোন অজ্ঞাত অসম্ভাবনীয় ঘটনার অস্তিত্ব সূচিত হইবেনা। এই বিবেচনার সাহায্যে দেখা যাক মাধ্যাকর্ষন তথ্যের কারণ নির্ণয়ে কি কি প্রয়াস হইয়াছে।

প্রথমতঃ গণিতশাস্ত্রের প্রয়োগ দেখা যাক। গণিতের সাহায্যে নিউটন প্রতিপন্ন করেন যে, মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি জনিত বলের প্রাখর্য শক্তির প্রভব হইতে দূরত্বের বর্গফলের ব্যস্ত-অনুপাতে ধার্য। এই নিয়ম বিজ্ঞানে তড়িৎ, চুম্বক, তাপ, শব্দ প্রভৃতি সর্বপ্রকার শক্তি সম্ভূত বলের ক্রিয়ায় সত্য দেখিতে পাওয়া যায়। তবে দূরত্ব অতি সামান্য হইলে

নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে। ইহা সকলেরই জানা আছে যে, আকাশস্থিত গ্রহ, উপগ্রহাদির গতিবিধি মাধ্যাকর্ষণ-জনিত বলিয়া উপরের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। নিয়মের অতি সামান্য ব্যতিক্রমও বহুবর্ষে পুঞ্জীভূত হইয়া গতিবিধির এমন বৈষম্য ঘটাইবে যাহাকে অবহেলা করা চলিবে না। কিন্তু সেরূপ অবস্থা এখনও ঘটে নাই। কেবল একবার এই নিয়মের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইয়াছিল।

সে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে। Leverrier বিজ্ঞাপিত করেন যে, বুধগ্রহের গতিতে একটু বৈষম্য লক্ষিত হইতেছে। তাহার ব্যবহৃত যন্ত্র বা পর্যবেক্ষণ-রীতির উপর উক্ত বৈষম্য আরোপ করা চলে না। এই বৈষম্য পরে অনেকেরই নিকট ধরা দেয় ও তখন নিউটনের নিয়মকে একটু পরিবর্তিত করার প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। ব্যস্ত-অনুপাতে দূরত্বের ঘাত ২ না ধরিয়া ২.০০০০০০১৬১২ ধরিলে সমস্যার সমাধান হয় বলিয়া মনে হয়। এই প্রস্তাব করেন মঙ্গল-গ্রহের আবিষ্কারক Asaph Hall ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে। Newcomb প্রমুখ বহু জ্যোতির্বেত্তা এই সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করিলেও পরে শোনা যায় যে, ইহার ফলে চন্দ্রের গতিতে এমন এক বৈষম্য আসে যাহা পরীক্ষার ফলে পাওয়া যায় না। সুতরাং সংশোধন প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয় ও বুধগ্রহের গতি-বিধির বৈষম্য প্রহেলিকার ন্যায় রহিয়া যায়।

নিউটন প্রস্তাবিত দূরত্বের বর্গফলের ব্যস্ত-অনুপাতের নিয়ম পরীক্ষাগারে নানা প্রকার অল্পকায় বস্তু সহায়ে পরীক্ষিত হইয়াছে। পৃথিবীর আকর্ষণ-জনিত গতিবেগ বৃদ্ধি সকল বস্তুতেই সমান। নিউটন নানা দৈর্ঘ্যের দোলনে নানা পদার্থের গোলক ব্যবহার করিয়া তাহার নিয়মের যাথার্থ প্রতিপন্ন করেন। তাহার পর Bassel ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে আরও সূক্ষ্মতর পরীক্ষায় সেই মতেরই পোষকতা করেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে উক্ত দোলন পরীক্ষাই Eotvos ও তাঁহার সহকর্মিগণ পুনরায় সম্পাদন করেন। তাঁহারা গোলকের জন্য বহু দ্রব্য নানা অবস্থায় ব্যবহার করেন। স্ফটিক, কঠিন অবস্থায় ও তাহার জলীয় দ্রবণ. নানা প্রথার রাসায়নিক দ্রব্য একক অবস্থায় ও পরে তাহাদের সংশ্লেষণে উৎপন্ন নব পদার্থ, গোলকে ব্যবহার করিয়াও নিয়মে কোন ব্যতিক্রম পান নাই। স্ফটিক গোত্রের কোয়ার্টজ, আইসল্যাণ্ড স্পার প্রভৃতি বিশিষ্ট গঠনের পদার্থের ধর্ম অভ্যন্তরে সকল দিকে এক নহে। ইহাদের গোলক ব্যবহার করিয়াও দেখা গিয়াছে যে, দোলকের দোলনরীতি একই অব্যাহত ধারায় নিয়ন্ত্রিত।

আবার ইহাও সত্য যে, পদার্থের উপর আলোক বিদ্যুতাদি শক্তির কার্য উষ্ণতার ক্রমে পরিবর্তিত হইতে দেখা যায়; শক্তি হিসাবে মাধ্যাকর্ষণও একই ধর্মী কি-না তাহার পরীক্ষা করেন Shaw (P.E) ১৯২২ খৃষ্টাব্দে। তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই শক্তির ক্রিয়া উষ্ণতার উপর নির্ভর করে না। ইহার প্রমাণ জ্যোতিঃশাস্ত্র হইতেও পাওয়া যায়। কোন ধূমকেতু আকাশপথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখনই সূর্যের সন্নিকটে আসে তখন তাহার উষ্ণতা বর্ধিত হয় ও মাধ্যাকর্ষণ বস্তুর উষ্ণতায় পরিবর্তিত হইলে ধূমকেতুর কক্ষের পরিবর্তন আশা করা যাইতে পারে। কিন্তু বিশিষ্ট ধূমকেতুর গতিপথ পর্যবেক্ষণ করিয়াও উক্ত প্রথার পরিবর্তন লক্ষিত হয় নাই। ধূমকেতু চিরকাল একই কক্ষে ভ্রমণ করে।

আলোক, তাপাদি শক্তির ক্রিয়া সময় সাপেক্ষ। কারণই হারা নির্দিষ্ট গতিবেগে প্রধাবিত হয়। মাধ্যাকর্ষণের ঐ প্রকার গতিবেগ আছে কি না তাহারও পরীক্ষা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হইয়াছে। তাহাতে এই শক্তির কোন গতিবেগ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ইহার গতিবেগ অসীম না হইলেও আলোকের অপেক্ষা বহুগুণ অধিক হইবে। শক্তির তুলনায় মাধ্যাকর্ষণের এক বিশেষ পার্থক্য এই যে ইহা দ্বিমুখী শক্তি। সূর্য পৃথিবীকে যে শক্তিতে আচ্ছন্ন করে পৃথিবীও সূর্যকে সেই শক্তিতে আচ্ছন্ন

করে আর বস্তু সকলের এই পরস্পর আকর্ষণ সকল দিকে সমভাবে বর্তমান থাকায় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নির্দিষ্ট দিক নির্দেশ করা যায় না।

অন্যান্য শক্তির সহিত মাধ্যাকর্ষণের এক বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। সকল শক্তির ক্রিয়া প্রহত করিয়া রাখিতে পারে এমন অনেক পদার্থ দেখা যায়। সেই সকল পদার্থের পর্দা সাহায্যে শক্তির ক্রিয়া স্থান বিশেষে নিবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ প্রহত রাখিতে পারে এমন কোন পর্দার অস্তিত্ব জানা নাই। এমন কোন স্থান বা দেশ প্রস্তুত করা যায় না যেখানে মাধ্যাকর্ষণ ক্রিয়মান নহে। এই সমস্যা লইয়াও বহু পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, চন্দ্র গ্রহণ কালে পৃথিবীকে পর্দারূপে ধরিলে প্রত্যেক চন্দ্র গ্রহণে চন্দ্রের উপর সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ ক্রিয়া কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হইবে তাহা হিসাব করা যায়। পর্দার দরুণ আকর্ষণ-ক্রিয়া সামান্য হ্রাস পাইলেও কয়েক বৎসরের গ্রহণ উপলক্ষে পুঞ্জীভূত ক্রিয়া পরিমাপ যোগ্য হইত ও চন্দ্রের গতিবেগে পরিবর্তন লক্ষিত হইত। কিন্তু এরূপ ক্রিয়ার কোন আভাষ পাওয়া যায় না।

উপরের পর্যালোচনায় ইহা বোধগম্য হয় যে, মাধ্যাকর্ষণ অতি দুরধিগম্য তত্ত্ব। নানা পরীক্ষায় এই সত্যই প্রকট হয় যে দুই বস্তুর পরস্পর আকর্ষণ তাহাদের ত্রিমাত্রিক দেশে অবস্থান ও ভর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। ইহার অন্য কোন প্রকার গুণ বা ধর্ম সূক্ষ্মতম পরীক্ষায়ও ধরা যায় না। এই তত্ত্বের রহস্য এক দুর্ভেদ্য কবচে আচ্ছাদিত। উহার কোন আভাষই কোন দিক দিয়া পাওয়া যায় না। তবে স্বভাবজাত অনুসন্ধিৎসার তাড়নায় মানুষ প্রাচীনকাল হইতেই ইহার স্বরূপ উদ্ঘাটনে প্রয়াস পাইয়াছে।

কোন কোন পদার্থ উর্ধে প্রক্ষিপ্ত হইলে ভূপৃষ্ঠে আপতিত হয়। আবার ধূম ও বাষ্পাদি হাওয়ায় ভাসে। এই তথ্যের সমাধানকল্পে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টোটল পদার্থে গুরুত্ব ও লঘুত্ব এই দুই গুণের আরোপ করেন। বায়ুতে ধূম ভাসে আর জলে কাঠ ভাসে, ইহা যে পদার্থের প্লাবিতা গুণে সম্ভব হয়, এ-জ্ঞান তখন ছিল না। অ্যারিষ্টোটলের প্রভাবে তাঁহার মতবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল। এই মতে বিশ্বাস করিয়াই মণ্টগলফার্ ভ্রাতৃগণ প্রথমে ধূম পরিপূর্ণ বেলুন ব্যবহার করেন। তাহাদের ধারণা ছিল ধূম ব্যতীত আর কোন লঘুতর গ্যাস নাই, যাহা বায়ুতে ভাসে। কিন্তু প্লাবিতাধর্ম পরিজ্ঞাত হওয়ার পরে ক্রমে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ম আকাশ-যান বেলুনে ব্যবহৃত হইতে থাকে। আবার অ্যারিষ্টোটলের মতে এই ভুল কথাও প্রচলিত ছিল যে, পতনশীল পদার্থের গতি বেগ তাহার ওজনের সমানুপাতিক। গ্যালিলিও এই মতের অযথার্থতা প্রমাণ করেন। অ্যারিষ্টোটল হইতে আরম্ভ করিয়া গ্যালিলিওর সময় ১৫৬৪-১৬৪২ সাল পর্যন্ত প্রায় ২০০০ বৎসরেও মাধ্যাকর্ষণের মূল কারণ সম্পর্কে কোন প্রকার গবেষণা হয় নাই। এমনকি, নিউটনও কারণ নির্ণয়ের কোন প্রয়াস করেন নাই। নানাপ্রকার প্রচলিত মতবাদের মধ্যে জেনেভার বিজ্ঞানী Le sage. ১৭০০ খৃষ্টাব্দে মাধ্যাকর্ষণের কারণ সম্বন্ধে যে তত্ত্ব প্রচার করেন, তাহাও উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে বিশ্বজগৎ এক প্রকার অপার্থিব অভিনব কণায় পরিপূর্ণ। এই সকল কণা গ্যাসীয় অণুর বেগে সর্বদিকে ধাবমান ও দুইটি পদার্থকে প্রতাড়ন বলে পরস্পরের নিকটতর করিতে চেষ্টা করে। এই মতের বিরুদ্ধে বহু যুক্তি থাকা স্বত্বেও ইহাকেই অবলম্বন করিয়া আরও অনেক মতবাদ প্রবর্তিত হয়। এমন কি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে অলিভার লজ বৈদ্যুতিক আকর্ষণকেও প্রতাড়ন বলের ক্রিয়ারূপে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। সর্ব ব্যাপারে উক্ত অপার্থিব কণার আবাহন তখনকার দিনে এক ফ্যাসনে দাঁড়াইয়াছিল ও ইথর তত্ত্ব এই কণাবাদেরই পরিণতি বলা যাইতে পারে।

বিজ্ঞানের এমনি অবস্থাতেই কেলভিন ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার আবর্ত গতির মত প্রচার করেন।

এই মতে ইথরে আবর্ত গতির উদ্ভব হইয়াই পরমাণুর সৃষ্টি। কিন্তু আবর্ত গতি হইতে গণিতের সহায়তায় ম্যাকস্‌ওয়েল, টমসন প্রমুখ বিজ্ঞানিগণ মাধ্যাকর্ষণের কোনও কারণ নির্ণয়ে সমর্থ না হওয়ায় ঐ মতবাদ পরিত্যক্ত হয়।

এইরূপে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মাধ্যাকর্ষণের কারণ রূপে বহু মত প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু সকল মতের প্রয়োগেই বিরাট বাধা স্বরূপ দাঁড়াইল পর্দার অভাব—যাহার ভিতর মাধ্যাকর্ষণ প্রহত হয়। সুতরাং নিউটনের পর ৪০০ বৎসরের মধ্যে প্রকৃত তত্ত্বের সন্ধান মিলে নাই। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সহিত অন্যান্য সকল প্রকার শক্তির সাদৃশ্য কেবল এক বিষয়ে দেখা যায়; সকল প্রকার শক্তির ক্রিয়ার প্রাখর্য, দূরত্বের বর্গফলে চাপের অনুপাতে নির্ধারিত হয়। ইহা ভিন্ন আর সর্বপ্রকারে এই শক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পর্যায়ের বলিয়া মনে হয়। বর্তমান শতাব্দীতে আইনষ্টাইন নির্দেশ দিলেন যে ইনারসিয়া বা জাড্য ধর্মের ন্যায় বস্তুর আর একটি ধর্ম আছে। তাহা দেখা যায়, অপকেন্দ্র বলের প্রয়োগে। লোহার একটি গোলক রজ্জু সংযুক্ত করিয়া রজ্জুর অপর প্রান্ত ধরিয়া ঘুড়াইলে বুঝা যায় যে, ঘুর্ণায়মাণ গোলকটি যেন হস্তচ্যুত হইয়া দূরে সরিয়া যাইতে চায়। গোলকটী যে বৃত্তকক্ষে ঘুরিতেছে তাহার কেন্দ্র রহিয়াছে হস্তধৃত রজ্জুপ্রান্তে। সেই কেন্দ্র হইতে দূরে চলিয়া যাওয়ার কারণ অপকেন্দ্র বল। এই বল মাধ্যাকর্ষণ জনিত বলের ন্যায় বস্তুর ভর ও দেশ-কালে অবস্থান ব্যতীত আর কিছুর উপর নির্ভর করে না। এ সম্বন্ধে আইনষ্টাইন একটি পরীক্ষার উল্লেখ করিয়াছেন।

অনেকেই নাগরদোলা দেখিয়াছেন। একটি বৃহৎ বৃত্তাকৃতি দণ্ডে পর পর বসিবার আসন ঝুলান থাকে ও বৃত্তটি তাহার কেন্দ্রদেশে অপর একটি মৃত্তিকা প্রোথিত দণ্ডে আবদ্ধ থাকে। বৃত্তটি ঘুরাইলে আসনোপবিষ্ট দর্শকগণও দণ্ডটী প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুড়িতে থাকে। এক্ষণে মনে করা যাক্ কোন একটি আসন দর্শক সহ একটি বৃহৎ গোলকের অভ্যন্তরে রহিয়াছে। বৃত্তটি সমবেগে ঘুরাইলে গোলকের অভ্যন্তরস্থ দর্শক তাহার গতি বুঝিতে পারিবেনা। যেমন পৃথিবী ঘুরিলেও আমরা কোন গতি বুঝিনা। স্থির অবস্থায় গোলকটীর ভিতরে চলিয়া বেড়াইতে দর্শক কোন অস্বস্তি বোধ করিবেনা; কিন্তু ঘূর্ণায়মান অবস্থায় ঐরূপ চলিতে গেলে সে গোলক সহ নিজের গতি না বুঝিলেও একটি বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারিবে। গোলকের কেন্দ্রস্থল হইতে যে কোন স্থানে গেলে সে এমন একটি অপকেন্দ্র বলের অনুভূতি পাইতে যাহা তাহাকে দূরে অপসৃত করিতে চাহিবে। সে কেন্দ্র হইতে যত দূরে যাইবে এই অপকেন্দ্র বিকর্ষণ ততই বাড়িবে। সুতরাং ঘূর্ণায়মান গোলকটি যেন এক মধ্য-বিকর্ষণ ক্ষেত্রে পরিণত হইবে। ইহা জানা আছে এই বিকর্ষণ-বল বস্তুসংজাত। গোলকের কেন্দ্রে উহার প্রভব নহে; কিন্তু কেন্দ্রাপসারী দর্শকে উহার উদ্ভব ও সেইজন্য কেন্দ্র ও দর্শকের মাঝখানে কোন পর্দা রাখিলে বলের কোন প্রকার তারতম্য ঘটিবেনা। এই দৃষ্টান্তে ইহাই সুস্পষ্ট হয় যে, গতির ফলে বস্তুতে মাধ্যাকর্ষণ বলের সহিত উপমেয় যে-বলের ক্রিয়া দেখা যায় তাহা গতিলোপের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পায়। এ সম্বন্ধে আর একটি দৃষ্টান্ত প্রণিধানযোগ্য। এক বৃহৎ বাক্সে একজন দর্শক আছেন। বাক্সটির উপর বাহিরের কোন শক্তির ক্রিয়া হইতেছেনা। বাক্সটির স্থির অবস্থায় বাহির হইতে উহার উপর গুলি ছাড়িলে তাহা বিপরীত প্রান্তের দেয়াল ভেদ করিয়া বাহির হইবে ও বাক্সের অভ্যন্তরে গুলির গতিপথ দর্শকের নিকট সরল অনুভূমিক রেখা বলিয়া প্রতীত হইবে। কিন্তু বাক্সটী সমবেগে উর্ধে গতিশীল হইলে গুলির গতিপথ সরল বোধ হইলেও অনুভূমিক হইবেনা; উহা ভূমির সহিত কোণ উৎপন্ন করিবে। আবার বাক্সটি অসমগতিতে উত্থিত হইতে থাকিলে গুলির গতিপথ এক উত্তোলিত বক্ররেখা রূপে প্রতীত

হইবে। দর্শক গুলিটির এইরূপ গতিপথের কারণ মনে করিবেন (১) গুলির আদিম সরল গতি ও (২) অন্য কোন অজ্ঞাত বলের ক্রিয়া যাহা গুলিটিকে বাক্সের তলের দিকে আকর্ষণ করিতেছে, এই দুই বলের সম্মিলিত ক্রিয়া। কিন্তু এই দ্বিতীয়োক্ত অজ্ঞাত বলের কোনও কারণ দেখা যায় না। বরং আসল ব্যাপার হইতেছে দর্শকের নিজ গতি, যেজন্য মুহূর্তে মুহূর্তে তাহার অবস্থান পরিবর্তিত হইতেছে।

এই ভাবে মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রের পরিকল্পনা যথার্থ না হইলেও এই আলোচনায় আইনষ্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব বুঝিবার সুবিধা হইবে। তাঁহার মতে বস্তুর অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে যে জাড্য-ক্ষেত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইবে মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র তাহারই সমতুল্য। ত'ব উহা বুঝিতে হইলে যথাযোগ্য স্থানাঙ্ক নির্দেশ-বিধির প্রয়োজন। স্বীয় প্রতিভাবলে আইনষ্টাইন যে স্থানাঙ্ক নির্দেশক বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব অতি সহজে বোধগম্য করা সম্ভবপর।

এজন্য একটী যথার্থ অনুভূম সমতলের প্রয়োজন। মনে করা যাক, কোন বৃহৎ হ্রদের জল শীতে জমিয়া বরফ হইয়াছে। বরফের উপরিতল সম্পূর্ণ অনুভূম ও এত মসৃণ যে কোনও বস্তু উহাতে গড়াইয়া গেলে ঘর্ষণ জনিত শক্তির অপচয় হয় না। অতএব নিউটনের গতির নিয়মানুযায়ী এই সমতলে চলমান কোন প্রস্তর খণ্ড সমগতিতে সরল পথে চলিতে থাকিবে। গতিপথ কোথায়ও অসরল হইলে ইহাই মনে করিতে হইবে যে, ঐস্থল হয়ত উচ্চ বা নীচ, আশেপাশের তলের সহিত সমতল নহে। আবার মনে করা যাক, বরফের সমতলে এক স্থানে এক বৃহৎ প্রস্তর খণ্ড রহিয়াছে। উহার চাপে উহারই চতুঃপার্শ্বের তলে উন্নতি বা অবনতি উৎপাদিত হইবে। এখন দূরের সমতলে যদি একখণ্ড প্রস্তর এরূপে চলমান করা হয় যে, উহার গতিপথ বৃহৎ প্রস্তরটির সন্নিকটস্থ উন্নত অংশের উপর দিয়া নির্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রথমে সরল হইলেও উন্নত স্থানে আসিয়া গতিপথ ক্রমে বক্র ভাবাপন্ন হইবে। যদি উভয় প্রস্তরে কোন আকর্ষণ না থাকে তবে গতিপথের পরের অংশ আবার সরলই হইবে। কিন্তু উন্নত স্থান অতিক্রম করিতে গতিবেগে বৈষম্য আসিয়াছে এবং সেই জন্য প্রথম সরল পথ ও শেষের সরল পথ এক সরল রেখায় অবস্থিত হইবে না। অর্থাৎ প্রস্তরটীর গতিতে দিক বিপর্যয় ঘটিয়াছে। যে দর্শক উক্ত তলের উন্নতি দেখিতে পায় না সে নিউটন তত্ত্বের আশ্রয় লইয়া বলিবে যে, বৃহৎ প্রস্তরের আকর্ষণ ক্ষুদ্র প্রস্তরের দিক বিচ্যুতি ঘটাইয়াছে। কিন্তু আইনষ্টাইন তত্ত্বের আশ্রয়ে আসিলে বলিতে হইবে যে, এস্থলে কোন প্রকার আকর্ষণের ক্রিয়া নাই। ক্ষুদ্র প্রস্তরের জাড্য ও তলের বক্রতাই গতি-বিপর্যয় ঘটাইয়াছে। বৃহৎ প্রস্তরের অতি সন্নিকটে চলিলে এমনও হইতে পারিত যে, ক্ষুদ্র প্রস্তর গর্তে পড়িয়া যাইত ও উঠিতে না পারিয়া গর্তের চারিদিকের দেয়ালে চক্রপথে ঘুরিতে থাকিত। এই চক্রকক্ষের আকৃতি গর্তের রূপ ও প্রস্তরটির গতিবেগের উপর নির্ভর করিবে। সাধারণ আপেলের বোঁটার নিকট যেরূপ গর্ত থাকে, সেইরূপ গর্ত হইলে চক্রপথ বুধ গ্রহের কক্ষের ন্যায় হইবে।

এইরূপে, আইনষ্টাইন দ্বিমাত্রিক তলে তৃতীয় মাত্রায় গর্ত কল্পনা করিয়া মাধ্যাকর্ষণ বুঝাইতে চান। আবার তিন অপেক্ষা অধিক মাত্রার দেশেও তিনি উক্ত তত্ত্ব বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তারকা হইতে বিকীর্ণ আলোক-রশ্মি আমাদের পৃথিবী হইতে বহুদূরে কোটি কোটি মাইল পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ঐ সময় রশ্মির পথ সরলও থাকে। কিন্তু সৌর অবয়বের সমীপবর্তী হইলে রশ্মি-পথ কিরূপ হইবে? প্রচণ্ড-ভর সূর্যের চতুস্পার্শ্বের দেশে থাকিবে গর্ত ও মোচড়। সেই গর্ত বা মোচড় অতিক্রম করিতে রশ্মির দিক বিপর্যয় ঘটিবে।

উক্ত প্রকারে মাধ্যাকর্ষণ ধারণা করিতে গিয়া আমরা দিশাহারা হইয়া যাই। আইনষ্টাইনের এই তত্ত্ব দুরূহ গণিতে প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে ত্রিমাত্রিক জ্যামিতির আশ্রয় লইলেই চলে না। নিউটন তাহাই করিয়াছিলেন। এজন্য প্রয়োজন বহু মাত্রিক জ্যামিতির প্রয়োগ। এইরূপে আইনষ্টাইন মাধ্যাকর্ষণ রহস্য অধিকতর পরিস্ফুট করিয়াছেন মাত্র। তবে কাল অনন্ত, সৃষ্টিও অনন্ত, আর যে মহাক্ষণে সৃষ্টিকর্তা বিশ্বরূপ দর্শন করান, তাহা এখনও আসে নাই। যথাসময়ে সেই মহামানবের আবির্ভাব হইবে যিনি প্রকৃতির যথার্থ প্রকৃতি প্রকট করিতে সক্ষম হইবেন।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্রমবিকাশ

শ্রীঅজিতকুমার সাহা

জীবজগতে ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন একটা সুপ্রমাণিত তথ্য। প্রাণের প্রথম মৃদু স্পন্দন থেকে বিভিন্ন ধারায় ক্রমবিকাশের ফলে আমরা আজ কত বিচিত্র উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর সমাবেশ দেখছি, তার ইতিহাস সত্যই বিস্ময়কর; কিন্তু সে ইতিহাস এখনও সম্পূর্ণ নয় এবং এখন পর্যন্ত নানারকম মতবাদে কণ্টকিত।

অবশ্য এবিষয়ে আমাদের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার যথেষ্ট কারণ আছে। জীবজগতের ক্রমবিকাশ নির্ণয় কেবলমাত্র বর্তমানকালীন জীব পরীক্ষা করেই সম্ভবপর নয়। অতীতে বিভিন্ন যুগে কত বিচিত্র জীবের আবির্ভাব এই পৃথিবীতে হয়েছিল, কালক্রমে যারা হয়েছে নিশ্চিহ্ন, তাদের সম্বন্ধে কিছু না জানলে পৃথিবীর বর্তমানকালীন জীবসমষ্টির উদ্ভব কিভাবে হয়েছে সে সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা অসম্ভব। এই সমস্ত অতীত যুগের জীবের কাহিনী লুকান আছে বিভিন্ন যুগে সঞ্চিত ভূপৃষ্ঠের পাললিক শিলার মধ্যে। পাললিক শিলার মধ্যে জীবাশ্মই তাদের সত্তার একমাত্র নিশ্চিত নিদর্শন। কিন্তু জীবাশ্ম থেকে কদাচিৎ কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ সম্বন্ধে একটা নিঁখুত ধারণা করা যায়; বিশেষতঃ সব জীবেরই জীবাশ্ম পাথরের বুকে সঞ্চিত হয়নি। সেজন্য অতীত যুগের জীবের আকৃতি, প্রকৃতি ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক জায়গায় পণ্ডিতেরা কল্পনার সাহায্য নিয়েছেন। জীবাশ্ম ও বর্তমানকালীন জীব, এই দু'য়ের সূক্ষ্ম ও তুলনামূলক অধ্যয়নের ফলেই ক্রমবিকাশ নির্ণয় সম্ভব; কিন্তু সেখানেও মতভেদের যথেষ্ট কারণ আছে।

বর্তমান যুগে মেরুদণ্ডী-প্রাণী জীবজন্তুদের অন্যান্য শাখার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। কিন্তু ভূপৃষ্ঠের প্রস্তরশ্রেণী পরীক্ষা করে পৃথিবীর যে ইতিহাস এখন তৈরী হয়েছে, সেই ইতিহাস আলোচনা করলে আমরা দেখি যে, চিরকাল এই অবস্থা ছিল না। পৃথিবীর বয়সের ২০০ কোটী বছরের মধ্যে প্রথম ১৫০ কোটী বছরে জীবজগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সন্ধান মেলে না। যা' সামান্য কিছু জীবাশ্ম পাওয়া যায় সে যুগের পাথরের মধ্যে তা'ও অতি নিম্নস্তরের জীবের। ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের (৫০ কোটী বছর আগে) প্রারম্ভে প্রাণীজগৎ বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছিল; যদিও তখন সমস্ত প্রাণীই ছিল অমেরুদণ্ডী। প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব হয় অর্ডোভিসিয়ান যুগের শেষভাগে বা সিলুরিয়ান যুগের গোড়ার দিকে (প্রায় ৩৮ কোটী বছর আগে)।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর উৎপত্তি

প্রাণীজগৎকে নয়টি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। অমেরুদণ্ডী প্রাণী ৮টি শাখায় বিভক্ত এবং প্রাণী-জগতের নবম শাখা হ'ল কর্ডাটা। মেরুদণ্ডী প্রাণী কর্ডাটা শাখার এক অংশ। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের সঙ্গে কর্ডাটার অন্তর্গত প্রাণীদের তফাৎ এই যে, এদের দেহের মাঝামাঝি বরাবর জিলাটিন জাতীয় পদার্থে গঠিত এক অক্ষদণ্ড আছে; একেই বলা হয় নটোকর্ড। আসল মেরুদণ্ডী প্রাণীতে এই নটোকর্ডকে ঘিরে আছে অনেকগুলো হাড়ের এক সারি। এই সারিকেই বলা হয় মেরুদণ্ড।

মেরুদণ্ডী প্রাণী যে অমেরুদণ্ডী প্রাণীর কোন বিশেষ শাখার ক্রমবিকাশের ফলে উৎপন্ন হয়েছে এবিষয়ে সকলেই একমত। কিন্তু এদের পূর্বপুরুষ ঠিক কোন শাখার অন্তর্গত প্রাণী সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতের যথেষ্ট গড়মিল আছে। কেউ কেউ বলেন মেরুদণ্ডী প্রাণীর পূর্বপুরুষ কীট শাখার অন্তর্ভুক্ত। আবার অনেকের মতে তারা অরথ্রোপোডা' বা কাঁকড়াজাতীয় প্রাণী। যাহোক, মেরুদণ্ডী প্রাণীর ঠিক পূর্বতন আদিপুরুষ য়্যাম্ফিয়ক্সাস্ জাতীয় কোন প্রাণী একথা অনেকটা নিশ্চিত। য়্যাম্ফিয়ক্সাস্, কর্ডাটার অন্তর্গত এক নিম্নস্তরের জল-জীব। এর সঙ্গে আদিম মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা যায়। এর দেহের মাঝামাঝি লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত বরাবর নটোকর্ড বিস্তৃত এবং তার ঠিক উপরেই সমান্তরালভাবে একটা লম্বা স্নায়ু রজ্জু আছে। এর গলদেশে ফুলকার সঙ্গে যুক্ত কতকগুলো সরু ফাঁক আছে। তা'ছাড়া এর রক্তচলাচলের যন্ত্রপাতিও অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সঙ্গে তুলনীয়। অবশ্য য়্যাম্ফিয়ক্সাস্ এর কয়েকটা বিশেষত্ব আছে যার জন্য একে মেরুদণ্ডী প্রাণী দের ঠিক পূর্বতন আদিপুরুষ বলা চলে না। তবে এই জাতীয় কোন আদিম প্রাণী থেকেই মেরুদণ্ডী প্রাণীর উৎপত্তি হয়েছে। Fish

মাছের ক্রমবিকাশ

সবচেয়ে নিচুস্তরের প্রাচীন মেরুদণ্ডী-প্রাণী হ'ল চোয়ালবিহীন মাছ বা cyclostomata. এদের উদ্ভব হয় অর্ডোভিসিয়ান যুগের শেষভাগে বা সিলুরিয়ানের গোড়ার দিকে (প্রায় ৩৮ কোটী বছর আগে)। এদের নটোকর্ডের বাইরের অংশটা কার্টিলেজ দিয়ে তৈরী এবং দেহের সম্মুখভাগে এই কার্টিলেজ চেপ্টা হ'য়ে গিয়ে করোটি বা মাথার খুলি গঠন করেছে। সিলুরিয়ান ও ডেভোনিয়ান (নিম্ন) স্তরের মধ্যে এইরকম অনেক চোয়ালবিহীন মাছের জীবাশ্ম পাওয়া যায়—যেমন cephalaspis, Pteraspis, Draepenaspis ইত্যাদি।

তারপর এল চোয়ালযুক্ত আসল মাছ ডেভোনিয়ান যুগে (প্রায় ২৫ কোটী বছর আগে)। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন জীব Elasmobrancht. তারপর এল Holococephalus জাতীয় মাছ; এদের থেকেই উদ্ভব হয় Osteichthyes বা হাড়যুক্ত মাছের। এদের মেরুদণ্ডের হাড় প্রায় সম্পূর্ণরূপেই কার্টিলেজের স্থান পূরণ করল এবং মেরুদণ্ডের গঠনও ক্রমশঃ অনেক জটিল হয়ে উঠল।

স্থলচর প্রাণীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।

Osteichthyes জাতীয় মাছের কোন বিশেষ বিভাগ থেকেই স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। আমেরিকার পেনসিলভেনিয়াতে ডেভোনিয়ান যুগের শেষ ভাগের স্তরে স্থলচর জন্তুর পদচিহ্ন দেখ্‌তে পাওয়া গেছে। এথেকে অনেকে অনুমান করেন যে, ডেভোনিয়ান যুগের মধ্যভাগে কিংবা শেষভাগে (৩১-৩৩ কোটী বছর আগে) স্থলচর মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব হয়। জলচর মাছের, স্থলচর প্রাণীতে রূপান্তর সম্ভব হয়েছে তার দৈহিক গঠনের কতকগুলো বিশেষ পরিবর্তনের ফলে। যেমন মাছের পাখ্‌নার স্থলচারী জন্তুর হাতপায়ে রূপান্তর এবং বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস নেবার ক্ষমতা লাভ। এই সমস্ত রূপান্তর নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে বংশ-পরম্পরায় সংঘটিত হয়েছে এবং এই সমস্ত পরিবর্তনের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন জীব এক সময়ে নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু এই সমস্ত পরিবর্তনের মাঝামাঝি অবস্থায় রয়েছে, এরকম কোন জীবের জীবাশ্ম এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

Osteichthyes দের মধ্যে Dipnoi (lung fish জাতীয়) এবং Crossopterygii এই দুই জাতীয় মাছের সঙ্গেই প্রাচীন স্থলচর প্রাণীদের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। ডিপ্‌নয় জাতীয় মাছ ফুসফুস দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয়; সুতরাং এদের থেকে স্থলচর জন্তুর উদ্ভব হওয়া সম্ভব। কিন্তু এদের পাখ্‌নার গঠন এরূপ যে, তা'থেকে হাত পায়ের উদ্ভব কল্পনা করা

একটু শক্ত। তাই অনেক বিশেষজ্ঞের মতে স্থলচর প্রাণীর উদ্ভব ডিপনয় জাতীয় কোন মাছ থেকে হয়নি। অন্যদিকে crossopterygii জাতীয় মাছের কয়েকটা genus (যেমন osteolepis) এর সঙ্গে প্রথম স্থলচর (উভচর) Embolomeryএর বিশেষ সাদৃশ্য আছে, হাড়ের গঠনের দিক দিয়ে। সমস্ত স্থলচর জন্তুর মতই crossopterygii দের মাথার খুলির মাঝখানের হাড়গুলো এক এক জোড়া হিসেবে সাজান আছে এবং মুখের কিনারার হাড়গুলো সংগঠিত।

প্রথম স্থলচর জীবেরা ছিল উভচর জাতীয়। জীবনের গোড়ার দিকের কতকাংশ এরা জলে কাটায় এবং কোন জলা-জায়গায় এদের ডিম পাড়তে হয়।

কার্বনিফারাস্ যুগের কোনও সময়ে (২৫-৩০ কোটী বছর আগে) উভচর প্রাণী থেকে উদ্ভব হল সরীসৃপদের। এই উদ্ভবের সঙ্গে যে কয়েকটা পরিবর্তন সংঘটিত হল তাদের মধ্যে প্রধান হল এই :—

(১) ফুলকি দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ;

(২) ডিমের সংখ্যার কম্‌তি এবং প্রত্যেক ডিমের চারধারে একটা শক্ত খোলার গঠন। এই খোলার অভাবেই উভচর প্রাণীকে কোন জলা-জায়গায় ডিম পাড়তে হয়, যাতে ডিম শুকিয়ে না যায় এবং তাদের জীবনের প্রথমাংশ জলেই কাটাতে হয়।

(৩) ডিমের পীতাংশ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে ভ্রূণ ডিমের ভিতর বেশীদিন ধরে পুষ্ট হতে লাগল।

স্তন্যপায়ী প্রাণীর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

হাক্সলির মতে স্তন্যপায়ী জন্তু সোজাসুজি উভচর প্রাণী থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। এখন অবশ্য এ-মত চলে না। এখনকার বিশেষজ্ঞদের মতে, উভচর এবং স্তন্যপায়ী জীবদের মধ্যে একটা মাঝামাঝি স্তর আছে। সেই স্তরের প্রাণী ফুল্‌কি দিয়ে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া ছেড়ে দিয়েছিল, অথচ স্তন্যপায়ী জীবের আকৃতি, প্রকৃতি পায়নি ; অবশ্য সেই সমস্ত আকৃতি-প্রকৃতির পূর্বাভাষ এদের মধ্যে ছিল। খুবসম্ভব সরীসৃপ শাখার অন্তর্গত অধুনা নিশ্চিহ্ন থেরোমর্ফা জাতিই সেই স্তরের প্রাণী। থেরোমর্ফা সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীদের মধ্যে একটু নীচু স্তরেরই জীব ; কিন্তু স্তন্যপায়ীদের গঠন প্রকৃতির সূচনার লক্ষণ কিছু কিছু এদের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন :—

(১) এদের মাথার গঠন স্তন্যপায়ীদের মাথার গঠনের সঙ্গে তুলনীয়।

(২) এদের দাঁতের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ হতে আরম্ভ হয়েছিল। সরীসৃপদের দাঁত সবই এক রকমের ; কিন্তু স্তন্যপায়ীদের দাঁত চার রকমের। যথা :—ছেদক, কর্তক, চর্বক ও পেষক।

(৩) এদের নীচের চোয়ালের গঠন সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীদের মাঝামাঝি। সরীসৃপদের নীচের চোয়ালে অনেকগুলো হাড় থাকে, আর স্তন্যপায়ীদের চোয়ালে থাকে মাত্র একটা হাড়। থেরোমর্ফা দের নীচের চোয়াল একটা বড় হাড় ও কয়েকটা ছোট ছোট হাড়ে গঠিত।

থেরোমর্ফা জাতীয় কোন্ genus থেকে স্তন্যপায়ীদের উৎপত্তি, তা' এখনও অনিশ্চিত। স্তন্যপায়ীদের উৎপত্তিকাল মধ্য-পারমিয়ান যুগের আগে নয়, বা নিম্ন ট্রিয়াসিক যুগের পরে নয় (প্রায় ২০ কোটী বছর আগে)। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে সব চেয়ে নিম্নস্তর প্রোটোথেরিয়া। এরা স্তন্যপায়ী হলেও ডিম পাড়ত। এরকম একটি জীব, হংস-চঞ্চু অষ্ট্রেলিয়াতে এখনও পাওয়া যায়। প্রোটোথেরিয়ার পরের স্তর মেটাথেরিয়া। এদের বাচ্চা অত্যন্ত অপরিপুষ্ট এবং মায়ের পেটের তলায় একটা থলিতে কিছুদিন ধরে পুষ্ট হয় ; বর্তমান কাঙ্গারু এই শ্রেণীর প্রাণী। ইউথেরিয়াতে (অধিকাংশ স্তন্যপায়ী যার অন্তর্গত) জরায়ুর গঠন অনেক উন্নত এবং বাচ্চা বেশ পুষ্ট অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। ইউথেরিয়া খুব সম্ভব প্রোটোথেরিয়া থেকে উদ্ভূত। ট্রিয়াসিক যুগেই

স্তন্যপায়ীদের তিনটে শাখা দেখা দিয়েছিল; কিন্তু ইয়োসিন যুগের আগ পর্যন্ত (৬ কোটী বছর আগে) এরা জীবজগতে অতি নগণ্য ছিল—অতিকায় সরীসৃপদের ভয়ে সর্বদা শঙ্কিত। আকারেও ছিল ক্ষুদ্রকায়, তারা ইঁদুরের মত বা বড়জোর কুকুরের সমান। ইয়োসিন যুগ থেকে স্তন্যপায়ীরা প্রাধান্য লাভ করল। ইউথেরিয়ার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে, কীটভুকেরা, এবং অন্যান্য বিভাগের স্তন্যপায়ীরা কীটভুকদের ক্রমবিকাশের ফলে উৎপন্ন হয়েছে, এরকম মনে করা হয়। মানুষ ও বাঁদর জাতীয় অন্যান্য প্রাণী প্রাইমেট বিভাগের অন্তর্গত। মানুষ খুব সম্ভবতঃ লাঙ্গুলবিহীন শিম্পাঞ্জী-গরিলা জাতীয় অধুনা নিশ্চিহ্ন কোন জীব থেকে উৎপন্ন, বর্তমানে পণ্ডিতদের এই মত। মানুষের আবির্ভাব অতি আধুনিক ঘটনা,—আনুমানিক ১০ লক্ষ বছর আগে!

পাখীর উৎপত্তি

পাখীদের উৎপত্তি হয়েছে জুরাসিক যুগে (১৫-১৬ কোটি বছর আগে), সরীসৃপ শ্রেণীর কোন অজানা জীব থেকে। সরীসৃপের সামনের পায়ের পাখাতে রূপান্তর এবং শরীরের কতকগুলো উদ্গত অংশের পালকে রূপান্তরের ফলেই পাখীদের উৎপত্তি হয়েছে। সরীসৃপ ও পাখীর মধ্যে আরও তফাৎ আছে। যেমন, পাখীদের রক্ত গরম, আর সরীসৃপদের রক্ত ঠাণ্ডা; সরীসৃপদের দাঁত আছে, আর আধুনিক পাখীর দাঁত নাই। অবশ্য আদিম পাখীদের অধিকাংশই ছিল দাঁতবিশিষ্ট। ক্রমে ক্রমে বর্তমানে পাখী তাদের দাঁত হারিয়ে ফেলেছে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীর ইতিহাসের কয়েকটা প্রধান প্রধান ঘটনার তালিকা দিলাম:—

মেরুদণ্ডী প্রাণীর উদ্ভব—প্রায়		৩৮	কোটী	বছর	আগে।
চোয়ালযুক্ত মাছের "	"	৩৫	"	"	"
প্রথম উভচরের "	"	৩১-৩৩	"	"	"
সরীসৃপের "	"	২৫-৩০	"	"	"
স্তন্যপায়ীর "	"	২০	"	"	"
পাখীর "	"	১৫-১৬	"	"	"
মানুষের "	"	১০ লক্ষ		"	"

কয়লা হইতে পেট্রল

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ সেন

কয়লা হইতে পেট্রল প্রস্তুত করিবার মূলগত প্রধান সূত্রগুলি ১৯১৩ খৃঃঅব্দে সর্বপ্রথম বার্জিয়াস্ কর্তৃক বিশদভাবে বর্ণিত হয়। সেই সময় হইতে ১৯২৪ খৃঃঅব্দ পর্যন্ত কয়লা হইতে পেট্রল তৈরী করিবার আর কোনও পন্থা জানা ছিল না। ১৯২৫ খৃঃঅব্দে জার্মানীর কাইসার উইলহেলম্ প্রতিষ্ঠানের কৃতী বৈজ্ঞানিক ফ্রাঞ্জ ফিসার এবং হানস্ ট্রপস্ কয়লা হইতে পেট্রল ও অন্যান্য জৈব-রাসায়নিক দ্রব্য তৈরী করিবার এক দ্বিতীয় এবং উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কয়লা হইতে জৈব-রাসয়ানিক দ্রব্য তৈরীর ইতিহাসে উক্ত বৈজ্ঞানিকদ্বয়ের আবিষ্কার এক নতুন যুগের অবতারণা করে।

উপরোক্ত উভয় পন্থাই জার্মানীতে বিশেষ উন্নতি এবং প্রসার লাভ করে এবং প্রকৃতপক্ষে গবেষণা এবং উন্নতি কার্যের অধিকাংশ জার্মানীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। বার্জিয়াস, ফিসার এবং ট্রপস্—ইহাদের আবিষ্কারের পিছনে ছিল বহু বৎসরের বৈজ্ঞানিক সাধনা। বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ১৮৯৪ খৃঃ অব্দ হইতেই বৈজ্ঞানিকগণ কয়লা এবং তজ্জাতীয় অঙ্গার হইতে তরল দাহ্য পদার্থ সংশ্লেষণ চেষ্টায় নিয়োজিত ছিলেন। মৎস্য তৈলের অন্তর্ধূমপাতন (destructive distillation) দ্বারাই এ্যাঙ্গলার কৃত্রিম পেট্রল তৈরী করিতে সমর্থ হন এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই স্বাভাবিক পেট্রলের উৎপাদন সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে সেবাটীয়ার নিকেল অনুঘটকের সহায়তায় ইথিলিন গ্যাস হইতে এক বায়বীয় মিশ্রণ, তরল হাইড্রোকার্বন এবং পোড়া কয়লা জাতীয় এক কঠিন পদার্থ পান। ১৮৯৯ খৃঃঅব্দে তিনিই আবার নানা প্রকার অনুঘটকের উপর দিয়া এসিটিলিন এবং এসিটিলিন ও হাইড্রোজেন মিশ্রণ সাধারণ চাপে চালিত করিয়া পেট্রল জাতীয় তরল পদার্থ তৈরী করিতে সমর্থ হন। ১৯০১ খৃঃ অব্দে ইপাটিভ, ইথিলিন হইতে ক্লোরাইড জাতীয় অনুঘটকের সাহায্যে বিভিন্ন গুণ সম্পন্ন হাইড্রোকার্বন মিশ্রণ পান।

উপরে বর্ণিত উপায়গুলিতে দেখা যায় যে, মূল দ্রব্যগুলি অত্যধিক ব্যয়সাধ্য, সুতরাং উক্ত প্রণালীগুলির ব্যবসায়গত বিশেষ কোনও গুরুত্ব থাকিতে পারে না। কেবলমাত্র কয়লা বা তজ্জাতীয় দ্রব্যই বিশেষ সন্তোষজনক মূল পদার্থ হিসাবে গৃহীত হইতে পারে।

১৯০৮ খৃঃ অব্দে অরলভ দেখিলেন যে, কয়লার উপর অতি উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে যে অনুপাতে কার্বন-মনক্সাইড এবং হাইড্রোজেন মিশ্রণ পাওয়া যায় তাহা নিম্নতাপে (১০০° সে) নিকেল এবং প্যালেডিয়াম মণ্ডিত অ্যাস্‌বেসটস্ অনুঘটকের ভিতর দিয়া চালিত করিলে পেট্রল জাতীয় তরল হাইড্রোকার্বন পাওয়া যায়। কিন্তু উক্ত অনুঘটকের কার্যকারিতা দ্রুত হ্রাস পায় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে কার্যকারিতা সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া যায়। অরলভের এই পর্যবেক্ষণ ফিসার অনুমোদন করেন এবং ইহা কতক পরিমাণে ফিসার এবং ট্রপসের আধুনিকতম আবিষ্কারের ভবিষ্যদ্বাণী করে। ১৯১৩ খৃঃঅব্দে 'বডিসি এনিলিন অ্যাণ্ড সোডা ফ্যাক্রিক' এর প্রথম ঘোষনায় দেখা গেল যে,

উচ্চতাপ এবং চাপে অনুঘটকের সংস্পর্শে ওয়াটার-গ্যাস হইতে অধিকতর জটিল জৈব-রসায়নের মিশ্রণ প্রস্তুত করা সম্ভব। ফিসার এবং ট্রপস ওয়াটার-গ্যাস লইয়া গবেষণার প্রারম্ভে ক্ষার অনুপ্রবিষ্ট লৌহ-অনুঘটক ব্যবহারে সিনথল নামক এক তরল মিশ্রণ পাইলেন। প্রমাণিত হইল যে, ইহা মোটর গাড়ীর ব্যবহার যোগ্য স্বাভাবিক পেট্রলের স্থান অধিকার করিতে পারে। তাঁহাদের প্রথম পরীক্ষায় উচ্চচাপ ব্যবহার করা হইয়াছিল। সিন্থল বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গেল যে, তাহাতে হাইড্রোকার্বনের পরিমাণ খুবই অল্প এবং ইহার প্রধান উপাদান হইল এ্যালকোহল, এ্যালডিহাইড, অম্ল, এ্যাসিটোন এবং এষ্টারের সংমিশ্রণ। অধিক পরিমাণ অক্সিজেনের উপস্থিতি হেতু সিন্থল পেট্রলের মত সুবিধাজনক হইল না।

ফিসার এবং তাহার সহকর্মিগণ দেখিলেন যে, চাপ কমাইয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিনথলের অক্সিজেন-ধারী রাসায়নিকের পরিমাণ কমিতে থাকে। আরো দেখা গেল যে, প্রতিক্রিয়া-বেগও সেই সঙ্গে কমিয়া যাইতে থাকে এবং সাধারণ বায়ু-চাপে প্রতিক্রিয়া চালাইবার জন্য, অধিকতর কার্যকরী অনুঘটকের প্রয়োজন। ১৯২৫ খৃঃ অব্দে ফিসার এবং ট্রপস্ ঘোষণা করিলেন যে, ২:১ অনুপাতে হাইড্রোজেন এবং কার্বন-মনক্সাইড্ মিশ্রণ, উন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত অতিশক্তিশালী নিকেল, কোবাল্ট এবং লৌহ অনুঘটকের মধ্য দিয়া সাধারণ বায়ু-চাপে এবং ১৮০° সে হইতে ৩০০° সে উত্তাপে চালিত করিলে সম্পূর্ণরূপে অক্সিজেন শূন্য বিভিন্ন ধরণের হাইড্রোকার্বন মিশ্রণ পাওয়া যায় এবং এই উপায়ে মিথেন হইতে আরম্ভ করিয়া কঠিন মোমের উপকরণ পর্যন্ত সকল প্রকার মুক্ত-শৃঙ্খল হাইড্রোকার্বন তৈরী করা সম্ভব।

উপরোক্ত যুগান্তকারী গবেষণা ও কার্যোন্নতি ছাড়াও ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে হইতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক কার্যধারা একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ কয়লা হইতে কৃত্রিম পেট্রল উৎপাদনে ব্যাপৃত ছিল। ঐ বৎসর স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক বার্থোলেট দেখাইলেন যে কয়লার সহিত ১০০ ভাগ হাইড্রোক্লোরিক অম্ল ১৭০° সে উত্তাপে ২৪ ঘণ্টাকাল রাখিলে ৬০% তৈল ৩০% বিটুমেন জাতীয় অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়। বার্থোলেট কর্তৃক প্রাপ্ত উক্ত তৈলে এ্যারোমেটিক এবং ন্যাপথেনিক হাইড্রোকার্বন ছিল। তিনি আরো পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, শুষ্ক ও আংশিক অঙ্গারীকৃত কাষ্ঠ ব্যবহারে অনুরূপ জৈব-রাসায়নিক মিশ্রণ পাওয়া যায়; কিন্তু পোড়া কয়লা ও কৃষ্ণসীস্ হাইড্রোক্লোরিক অম্ল দ্বারা কোনরূপ বিকৃত হইল না। বার্থোলেট এর অভিজ্ঞতা পরীক্ষা করিয়া ফিসার এবং ট্রপস্ দেখিলেন যে বিভিন্ন ভূসংগঠন যুগের কয়লাকে হাইড্রোক্লোরিক অম্ল ও ফস্ফরাস এর সাহায্যে দ্রবীভূত করা সম্ভব।

১৯১৩ খৃঃ অব্দে বার্জিয়াস ১০০ বায়ু-চাপে এবং ৩৪০° উত্তাপ প্রয়োগে "সেলুলোজ" হইতে প্রাপ্ত কৃত্রিম কয়লার উপর উক্ত চাপ সমেত হাইড্রোজেনের ক্রিয়া তুলনা করিয়া দেখিলেন। ১৯১৪ খৃঃ অব্দে বার্জিয়াস ৩০০° সে হইতে ৫০০° সে উত্তাপে কয়লা ও অন্যান্য কঠিন অঙ্গার জাতীয় পদার্থের 'দ্রবীভবন' পন্থা পেটেণ্ট করাইলেন। পন্থাটি ব্যবসায়ের ভিত্তিতে পরীক্ষার জন্য ১৯১৪ খৃঃঅব্দে 'বেনজিন একটিয়েন-গেসেলসাফট ফুর কোলে' এবং 'এরডওলকেমি' প্রতিষ্ঠিত হইল। যুদ্ধের জন্য ১৯২৪ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত বিশেষ কোনও উন্নতি সাধিত না হইলেও ১৯১২ খৃঃ অব্দের শেষ দিকে দৈনিক ১টন কয়লা লইয়া কার্য করিবার উপযোগী একটী যন্ত্র চালিত হয়।

বার্জিয়াস প্রণালী

কয়লা হইতে বার্জিয়াস প্রথা অনুযায়ী পেট্রল তৈরী করিবার প্রণালী নিম্নে বর্ণিত হইল।

কয়লাকে সূক্ষ্মচূর্ণে পরিণত করিয়া তাহার সহিত সমপরিমাণ ঘন জৈব-তৈল এবং শতকরা ৫ভাগ আয়রন-অক্সাইড উত্তম রূপে মিশ্রিত করা হয়। উক্ত কাঁই ইস্পাত-নলের ভিতর দিয়া

হাইড্রোজেন সহযোগে ১০০ হইতে ২০০ বায়ুচাপে প্রতিক্রিয়াশীল ধাতব পাত্রে পাম্পের সাহায্যে চালিত করা হয়। সাধারণতঃ তিনটি প্রতিক্রিয়াশীল ইস্পাত নির্মিত ধাতব পাত্র পরস্পর সংযুক্ত থাকে এবং গ্যাস প্রজ্বলিত গলিত সীসকে উত্তপ্ত করা হয়। কয়লা এবং তৈল সংমিশ্রিত কাথ অনুঘটক এবং হাইড্রোজেন মিশ্রণ প্রথম প্রতিক্রিয়া পাত্রে চালিত করা হয়।

প্রথম দিকে বার্জিয়াস-পন্থা অনুগামী কয়লা হইতে জাত দ্রব্যাদি নিকৃষ্ট শ্রেণীর ছিল। পরে জার্মানীর জী, গে, ফারবেন ইণ্ডাষ্ট্রী এ, গি এমন কতকগুলি অনুঘটক আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন যাহার ফলে প্রতিক্রিয়া-বেগ বর্ধিত হইল এবং জাত দ্রব্যাদিও উন্নত গুণসম্পন্ন হইল। উক্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বার্জিয়াস প্রণালীর নানা প্রকার উন্নতি সাধন করে এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এই প্রণালীতে বৃহদাকার শিল্প গড়িয়া তুলিতে চেষ্টিত হয়। দশবছর পরে এই শিল্পগুলি এত উন্নতি লাভ করে যে, একমাত্র লুনাতে যে-যন্ত্র স্থাপিত হয় তাহাতেই বৎসরে ৩০০০০০ টন মোটর জ্বালানী তৈরী হইত। 'হাইডেরিয়ার ভেকে সোলেনে'র যন্ত্রে বছরে ১০০,০০০ টন মোটর জ্বালানী তৈরী হইত। 'ব্রাউনকোহলে বেনজিন এ-গি' বৎসরে ১৫০,০০০ ও ১৭০,০০০ টন মোটর জ্বালানী তৈরী করিতে সক্ষম দুইটী যন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিল। ১৯৩৮ খৃঃঅব্দে জার্মানীতে কয়লা হইতে মোট ১,৫০০,০০০ টন মোটর জ্বালানী আলোচ্য প্রণালীতে তৈরী হইয়াছিল।

গ্রেটবৃটেনের আই, সি, আই লিঃ বিলিংহামে একটী বার্জিয়াস্-যন্ত্র স্থাপন করে। ১৯৩৫ খৃঃঅব্দ হইতে কাজ আরম্ভ হয় এবং ইহা হইতে বৎসরে ১৫০,০০০ টন হিসাবে মোটর জ্বালানী তৈল তৈরী হইত। সমসাময়িক কালে জাপান, কানাডা এবং, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সেও পরীক্ষামূলক যন্ত্র স্থাপিত হয়। যদিও আলোচ্য যন্ত্রের গঠন এবং পরিচালনা পদ্ধতি বিভিন্ন সাময়িক সংবাদপত্রে এবং পুস্তকে বাহির হইয়াছে তথাপি শিল্প সংক্রান্ত অত্যাবশ্যক তথ্যাদি খুব কমই প্রকাশিত হইয়াছে।

এই প্রণালীতে জাত প্রাথমিক বিশুদ্ধ বিভিন্ন জৈব-রাসায়নিক মিশ্রণ পরিশ্রুত করিয়া স্ফুটনাঙ্ক অনুসারে নিম্নলিখিত তিনটী ভাগে ভাগ করা হয়ঃ—

গ্যাসোলিন	স্ফুটনাঙ্ক ১০০° সে
মিড্‌ল অয়েল	২০০° সে হইতে ৩০০° সে
হেভী অয়েল	৩০০° সে এর উপর

হেভী অয়েল উত্তমরূপে পরিশোধনের পর চূর্ণ কয়লার সহিত মিশ্রিত করিয়া বর্ণিত পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করা হয়।

ফিসার-ট্রপস্ প্রণালী

(কয়লা হইতে পেট্রল, যন্ত্র পিচ্ছিলকারক তৈল, সাবান, ভোজ্য-চর্বি, রঞ্জন এবং মসৃণকারক দ্রব্য প্রস্তুত-করণ পদ্ধতি।)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য প্রণালী কাইজারউইলহেলম্ প্রতিষ্ঠানের ফ্রাঞ্জ ফিসার এবং হান্‌স্ ট্রপস্ ১৯২৫-২৬ খৃঃ অব্দে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, হাইড্রোজেন এবং কার্বন-মনক্সাইড ২:১ অনুপাতে লৌহ. কোবাল্ট এবং নিকেল অনুঘটকের মধ্য দিয়া ১৮০° সে হইতে ২৫০° সে তাপে এবং সাধারণ বায়ুচাপে চালিত করিলে এ্যালিফ্যাটিক হাইড্রোকার্বন তৈরী হয়।

প্রথমদিকে বিশুদ্ধ কোবাল্ট, নিকেল এবং লৌহ অনুঘটক ব্যবহৃত হইত। পরে দেখা গেল যে, অমিশ্রিত অবস্থায় উক্ত ধাতুত্রয় অতি সূক্ষ্ম চূর্ণাকারে প্রাপ্ত হইলেও তাহাদের কার্যকারিতা বিশেষ অবধারনীয় হয় না। উক্ত তিনটি অনুঘটকের মধ্যে লৌহের কার্যকারিতা সবচেয়ে কম পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যৌগিক অনুঘটক, যেমন লৌহ, তাম্র, ম্যাঙ্গানিজ, ক্ষার ও সিলিকা-জেল মিশ্রণ এবং লৌহ, তাম্র কিসেলগার মিশ্রণ প্রভৃতির কার্যকারিতা অনেক বেশী। অনুঘটকের কার্যকারিতা এবং তাহার

স্থায়িত্ব বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় নিকেল অথবা কোবাল্টকে মূল উপাদান করিয়া একাধিক যৌগিক অনুঘটক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ-সম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ অনুঘটকই ম্যাঙ্গানিজ, এ্যালুমিনিয়াম, ইউরেনিয়াম, সিলিকন, থোরিয়াম, বেরিয়াম প্রভৃতি মৌলিক ধাতুর এক অথবা একাধিক, কোবাল্ট এবং নিকেলের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রস্তুত। নিম্নে অনুরূপ কয়েকটী যৌগিক অনুঘটকের সমবায় দেওয়া হইল ঃ—

নিকেল অনুঘটক

নিকেল—থোরিয়া (১৮%) ফিসার এবং মেয়ার, ১৯৩১ খৃঃ

নিকেল : সিলিকা = ৪:১ ; ৯:১ মুজকাট ১৯২৪

নিকেল : বেরিয়াম অক্সাইড = ৯:১ „ „

নিকেল : থোরিয়া = ৯:১ „ „

নিকেল : এ্যালুমিনা = ৯:১ „ „

কোবাল্ট অনুঘটক

কোবাল্ট—থোরিয়া (.৮%) ফিসার এবং কক্ ১৯৩২

কোবাল্ট : তাম্র : থোরিয়া = ৯:১:২ „ „

কোবাল্ট—ম্যাঙ্গানিজ (১৫%) „ „

কোবাল্ট : তাম্র : থোরিয়ম : ইউরেনিয়াম = ৮:১ : ০.২ : ০.১ ফুজিমুরা এবং সুনিওকা ১৯৩২

১৯৩৪ খৃঃ অব্দে জার্মানীতে ফিসার-ট্রপস্ শিল্প গঠনের ভার 'রুর কেমি এ-জি' এর উপর ন্যস্ত হয় এবং ১৯৩৬ খৃঃ অব্দেই প্রথম ফিসার-ট্রপস্ যন্ত্র স্থাপিত হয়। নাৎসি সরকারের চতুর্বার্ষিক শিল্প-পরিকল্পনা গৃহীত হইবার পর স্বল্পকালের মধ্যেই আরও কয়েকটি যন্ত্র গড়িয়া উঠে। ১৯৩৯ খৃঃ অব্দের মধ্যে মোট নয়টি ফিসার-ট্রপস্ যন্ত্র স্থাপিত হয় এবং তাহাতে বৎসরে মোট ৭,৪০,০০০ মেট্রিক টন কৃত্রিম তৈলের উৎপাদন হয়। ফরাসী দেশের উত্তরাঞ্চলে একটি এবং জাপানে কয়েকটি ছাড়া জার্মানীতেই এই শিল্পটির ক্রমোন্নতি সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য গ্রীনউইচের 'ফুয়েল রিসার্চ বোর্ডে' এই প্রণালী সম্বন্ধীয় তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য বহুদিন হইতেই গবেষণা চলিতেছে এবং এই গবেষণালব্ধ আবিষ্কারের পরিমাণও কম নহে। তাহা হইলেও জার্মানীর গবেষণার প্রাচুর্যের তুলনায় তাহা বিশেষ ধর্তব্য নহে। যুদ্ধের সময় এবং তাহার পূর্বে 'রুর কেমি' এই পদ্ধতির কৌশলাদি এরূপভাবে গোপন রাখিয়াছিলেন যে, কোন উপায়েই তাহা জানা সম্ভব হয় নাই। পৃথিবীর সমস্ত জাতি, বিশেষ করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ জার্মানীর এই লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিতেছিলেন।

সবগুলি ফিসার-ট্রপস্ যন্ত্রই ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের শরৎ ও শীতকালে বোমা-বর্ষনের ফলে ধ্বংস হয় এবং এখন পর্যন্তও পরিত্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে।

যুদ্ধাবসানের পর যখন বৈজ্ঞানিক সন্ধানীদল জার্মানীতে প্রেরিত হন তখন এই শিল্পগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিটি গবেষণা-কেন্দ্রই বিশেষভাবে অনুসন্ধানের ফলে মূল্যবান গোপনীয় তথ্যাদি হস্তগত হয়। সন্ধানীদলের লব্ধ বিবরণ পরে গ্রীনউইচের 'ফুয়েল রিসার্চ বোর্ড' হইতে প্রকাশিত হয়।

ফিসার—ট্রপস্ পদ্ধতির শিল্পপ্রণালী

পোড়া কয়লাকে ১০০০° সে তাপে রক্ষিত করিয়া তাহার ভিতর দিয়া অতি উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প চালনা করিলে প্রায় সম-আয়তনের হাইড্রোজেন এবং কার্বন-মনক্সাইড্ গ্যাস মিশ্রণ পাওয়া যায়। এই মিশ্রণ ওয়াটার-গ্যাস নামে পরিচিত। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে উচ্চতর হাইড্রোকার্বন পাইতে হইলে মূল গ্যাস-মিশ্রণে হাইড্রোজেন এবং কার্বন-মনক্সাইড্ ২:১ অনুপাতে থাকা প্রয়োজন।

'রুর কেমির' যন্ত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কার্যোপযোগী হার মিটান হইত।

লব্ধ ওয়াটার-গ্যাসের এক তৃতীয়াংশ জলীয় বাষ্পের সহিত মিশ্রিত হইয়া একটি প্রতিক্রিয়া-

কক্ষে উচ্চতাপে রক্ষিত লৌহ-অনুঘটকের মধ্য দিয়া চালিত করা হইত। ইহার ফলে এই অংশের কার্বন-মনক্সাইড সম্পূর্ণরূপে কার্বন-ডাইঅক্সাইডে পরিণত হয় এবং হাইড্রোজেনের মাত্রা বর্ধিত হয়। এক্ষনে এই কার্বন-ডাইঅক্সাইড ও হাইড্রোজেন মিশ্রণ হইতে কার্বন-ডাইঅক্সাইড অপসারিত করিয়া লব্ধ হাইড্রোজেন, রক্ষিত দুই তৃতীয়াংশ ওয়াটার-গ্যাসের সহিত মিশ্রিত করিলে কার্যোপযোগী হারে হাইড্রোজেন এবং কার্বন-মনক্সাইড পাওয়া যায়।

কার্যোপযোগী ১ কিলোগ্রাম হাইড্রোকার্বন তৈরী করিতে ৬'৫ হইতে ৮ কিউবিক মিটার মূল গ্যাস-মিশ্রণ প্রয়োজন। এই প্রচুর পরিমাণ গ্যাস সহজে এবং কম খরচে না পাওয়া গেলে হাইড্রোকাবন তৈরীর ব্যবসায়গত কোনও গুরুত্ব থাকে না। সেজন্য বৈজ্ঞানিকেরা যাহাতে কয়লা হইতেই মূল গ্যাস-মিশ্রণ পাওয়া যাইতে পারে তাহার জন্য চেষ্টিত ছিলেন। এ-সম্বন্ধে অধুনা অনেক রচনাও লেখা হইয়াছে; কিন্তু তাহার বিশদ ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা বর্তমান আলোচনায় সম্ভব নহে।

ফিসার-ট্রপস্ প্রণালী বিরাট আকারে পরিচালনার জন্য অনুঘটক তৈরী এবং তাহার কার্যকারিতা নির্ধারণই প্রধানতম পর্যায়। এইজাতীয় বিশেষ গুণসম্পন্ন অনুঘটক অতি সহজেই গন্ধক, আর্সেনিক জাতীয় পদার্থে দুষিত হইয়া অতিদ্রুত নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। সেইজন্য অনুঘটকের কার্যকারিতা দীর্ঘকাল স্থায়ী রাখিবার জন্য সর্বপ্রথমে প্রয়োজন মূল গ্যাস-মিশ্রণ হইতে অনুরূপ অনুঘটক-বিষ দুরীভূত করা। কয়লা হইতে তৈরী মূল গ্যাসে নানাবিধ গন্ধকধারী রাসায়নিক দ্রব্য থাকে। শিল্প হিসাবে কৃত্রিম তৈল সাফল্যের সহিত প্রস্তুত করিতে হইলে মূল গ্যাস হইতে গন্ধক অপসারণ অবশ্য করনীয়। বহুকাল ইহাই শিল্প-প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকরূপে বিদ্যমান ছিল। মূল গ্যাসকে দুইধাপে গন্ধকমুক্ত করা হয়। প্রথম ধাপে হাইড্রোজেন সাল্‌ফাইড্ অপসারিত করা হয়। হাইড্রোজেন সালফাইড বিমোচনের জন্য মূল গ্যাস সাধারণ তাপেই হাইড্রেটেড আয়রন অক্সাইডের মধ্য দিয়া চালনা করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে জান্তব গন্ধক বিমোচন করা হয়। জান্তব গন্ধক দূর করাই কঠিন সমস্যা। ইহার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা হয়। ফিসার এবং অটোরোলেন্ এবং অন্যান্য অনেকে এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়াছেন। 'রুর কেমি' নিম্নলিখিত উপায়ে জৈব-গন্ধক বিমোচন করিত :—

সারি সারি কতকগুলি গম্বুজের মধ্যে ৭০% আয়রন অকসাইড এবং ৩০% সোডিয়াম কার্বোনেট্ মিশ্রণ দানা বাঁধাইয়া পরিপুরক দ্রব্য সমভিব্যহারে রক্ষিত হইত। মূল গ্যাস মিশ্রণকে ৩০০° সে তাপে তুলিয়া এই গম্বুজগুলির মধ্য দিয়া চালনা করা হয়। এই পরিশোধণের ফলে যে গ্যাস পাওয়া যায় তাহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে গন্ধক-মুক্ত। এই প্রণালীতে 'রুর কেমি' বিশেষ আশাপ্রদ ফল লাভ করিয়াছেন; কিন্তু কাঁচা কয়লা হইতে যে গ্যাস তৈরী হয় তাহা গন্ধক-মুক্ত অবস্থায় পাইতে হইলে ভিন্ন এবং উন্নততর প্রণালী অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ফিসার-ট্রপস্ প্রক্রিয়া-কক্ষের নির্মাণ যন্ত্রশিল্পের এক প্রকৃষ্টতম অবদান বলা যাইতে পারে। জাতদ্রব্যের গুণাগুণ এবং অনুঘটকের কার্যকারিতা এবং তাহার স্থায়িত্ব, উত্তাপের তারতম্যের উপর নির্ভরশীল। বিরাট আয়তনের ফিসার-ট্রপস্ যন্ত্রের বহু পরিমাণ অনুঘটককে যে-কোনও দীর্ঘ সময়ের জন্য যে-কোনও নির্ধারিত তাপ মাত্রায় রাখিবার প্রয়োজন হয়। উন্নত ধরণের তাপ প্রকরণ ও নিরসণের উপায় অবলম্বনেই তাহা সম্ভব। বস্তুতঃ ফিসার-ট্রপস্ প্রক্রিয়া হইতেও যথেষ্ট পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়। বলাবাহুল্য ইহাতে তাপ বিমোচন সমস্যা আরও জটিল হয়। 'রুর কেমি' উত্তাপের বিভিন্ন সঞ্চালন প্রণালীর সুবিধা ও অসুবিধা চিন্তা করিয়া পরিশেষে অনুঘটকের মধ্যে সারিসারি

ইস্পাত নির্মিত নলের মধ্য দিয়া জল পরিচালনার প্রণালী অনুসরণ করে। ইহা ছাড়া তাহাদের নির্মিত প্রক্রিয়া-কক্ষের গঠন-ভঙ্গিও যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল যাহার বিবরণ বর্তমান আলোচনায় দেওয়া সম্ভব নহে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, উপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন অনুঘটক তৈরী, আলোচ্য প্রণালীর গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল অংগ। ফিসার কর্তৃক আবিষ্কৃত সর্বাপেক্ষা উপযোগী অনুঘটকের সমবায় হইতেছে কোবাল্ট ১০০, থোরিয়া ১৮, কিসেলগার ১০০। 'রুর কেমির' গবেষণার ফলে স্বল্পকালের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠতর ও অল্পদামী অনুঘটক আবিষ্কৃত হয়, যাহার সমবায় হইতেছে কোবাল্ট ১০০, থোরিয়া ৫, ম্যাগনেসিয়া ৮ এবং কিসেলগার ২০০। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই অনুঘটকই সমস্ত জার্মাণ যন্ত্রে ব্যবহৃত হইত। সর্ব প্রথম সাধারণ বায়ুচাপে ফিসার-ট্রপস্ যন্ত্র পরিচালনার দিকে লক্ষ্য থাকিলেও পরে মধ্যম বায়ু চাপে (৯ হইতে ১১ বায়ু-চাপ) কার্যকরী যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা হয়।

উৎপন্ন দ্রব্যের গরপড়তা সমবায়

	সাধারণ বায়ু-চাপে উৎপন্ন	মধ্যম বায়ু-চাপে উৎপন্ন
মিথেন	১৮%	১৪%
৩ হইতে ৪ কার্বন পরমাণু সমন্বিত হাইড্রোকার্বন	১১%	৬%
মোটর স্পিরিট (স্ফুটনাঙ্ক ২০০° সে)	৪৩%	৩৩%
কোগাজিন (স্ফুটনাঙ্ক ২০০° হইতে ৩২০° সে)	২০%	২৬%
মোম (নরম এবং কঠিন)	৮%	২১%

উৎপন্ন দ্রব্যাদির ব্যবহার

এই আলোচনায় জার্মানীতে এই প্রণালীতে উৎপন্ন দ্রব্যাদি যে ভাবে ব্যবহৃত হইত তাহাই বর্ণনা করা হইবে। কারণ অন্য কোনও দেশেই এই শিল্পের উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি হয় নাই।

৩ হইতে ৪ কার্বন পরমাণু সমন্বিত গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন উচ্চচাপে তরলীকৃত হয়। একটি যন্ত্রে এই অংশের আলিফাইন জাতীয় হাইড্রো-কার্বনকে সালফিউরিক অম্লের উপস্থিতিতে জল সংমিশ্রনে 'প্রপাইল' এবং 'বুটাইল' এলকোহলে পরিণত করা হয়।

মোটর-স্পিরিট অংশ অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর এবং ইহাকে কার্যকরী করিবার জন্য মিশ্রণাগারে পাঠান হইত। সেখানে ইহা 'বেনজল' এবং 'টেট্রাইথাইল লেড' এর সহিত মিশ্রিত হইয়া জার্মানীর যান্ত্রিক সৈন্য বাহিনীর মোটর-জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হইত। অপরপক্ষে জাত 'ডিজেল তৈল' উচ্চ শ্রেণীর এবং এই অংশ নিম্ন শ্রেণীর 'পেট্রলিয়ামের' গুণ বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হইত।

মারসোলেট্

উৎপন্ন ভারী তৈল যাহাকে 'রুর কেমি' 'কোগাজিন' নামে অভিহিত করিয়াছিল, তাহা হইতে নিম্নোক্ত প্রণালীতে মারসোলেট্ (যাহা সাবানের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে পারে) তৈরী করা হইত।

সর্বপ্রথম উক্ত অংশকে উত্তমরূপে পরিশোধণ করা হয়। ইহার সহিত, অনুঘটকের সাহায্যে পরিমিত হাইড্রোজেন মিশ্রিত হইবার পর 'ক্লোরিন' এবং 'সালফারডাইঅক্সাইডের' সহিত মিশ্রিত করা হয়। এই মিশ্রণ 'আলট্রা-ভায়োলেট্' রশ্মির সহায়তায় সাল্‌ফোক্লোরাইড্ নামক দ্রব্যে পরিণত করা হয়। এই সাল্‌ফোক্লোরাইড 'মারসল' নামেই অধিক পরিচিত। এই 'মারসলের' সহিত সোডিয়াম-ক্ষার যোগ করিলে 'সোডিয়াম সালফোনেট' যাহার অপর নাম 'সোডিয়াম মারসলেট্' তৈরী হয়। জার্মাণীতে এই 'মারসলেট্', সাবানের পরিবর্তে প্রচুর ব্যবহৃত হইত।

লুব্রিকেটিং বা যন্ত্রপিচ্ছিলকারক তৈল

তাপ সহযোগে উৎপন্ন নরম মোম এবং ভারী তৈলের পরমাণু-ভাঙ্গন প্রণালী অনুসরণ করিয়া অলিফাইন পাওয়া যায়। এই অলিফাইন 'এ্যালুমিনিয়ম ক্লোরাইডের' উপস্থিতিতে 'পলিমারাইজ' করিয়া উন্নত গুণ সম্পন্ন যন্ত্রপিচ্ছিলকারক তৈল পাওয়া যায়।

সাবান

ফিসার-ট্রপস্ প্রণালীতে প্রস্তুত সমস্ত নরম মোম অনুঘটকের সাহায্যে "অক্সিডাইজ" করিয়া চর্বি-অম্লে পরিণত করা হইত। এই অম্লের প্রায় অর্ধাংশই সাবান প্রস্তুত করিবার (যাহা জার্মাণীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল) গুণসম্পন্ন ছিল। এই চর্বি-অম্লের সহিত সাধারণতঃ সোডিয়াম-ক্ষার মিশ্রিত করিয়া সাবান তৈরী করা হইত।

ভোজ্য চর্বি

উপরোক্ত চর্বি-অম্ল "গ্লিসারিন" মিশ্রণে খাদ্যোপযোগী চর্বিতে পরিণত করা হইত। জার্মাণীর স্বাস্থ্য সংরক্ষণ বিভাগ যদিও এই কৃত্রিম চর্বি, খাদ্য হিসাবে ব্যবহার অনুমোদন করিয়াছিলেন তথাপি ইহা খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইবার বিরুদ্ধে জার্মাণীর বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে তীব্র মতদ্বৈধ ছিল। যুদ্ধের সময় এই কৃত্রিম চর্বি জার্মাণীর খাদ্য সমস্যা সমাধানে এক উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

যে সমস্ত চর্বি-অম্ল সাবান তৈরীর অনুপযুক্ত তাহা নানাবিধ রাসায়নিক-শিল্পে ব্যবহৃত হইত। বিশেষ করিয়া "গ্লিপট্যাল রঞ্জন" ইমালসান। লুব্রিকেণ্টস্ তৈরীতে ইহা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত।

কঠিন মোম যাহা প্রধানতঃ মধ্যম চাপের যন্ত্র হইতে তৈরী হইত তাহা উত্তমরূপে পরিশোধণের পর নানাপ্রকার মসৃণকারক দ্রব্য, ইলেকট্রিক্যাল ইন্সুলেটিং দ্রব্য এবং জল নিরোধক কাগজ তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হইত।

গলিত কঠিন মোমকে আংশিকভাবে অক্সিজেন সংমিশ্রণ ঘটাইলে চর্বি-অম্ল এবং অন্যান্য অক্সিজেনধারী জৈব-রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ তৈরী হয়। এই মিশ্রণ হইতে ইমালসান পলিস্, যন্ত্রপিচ্ছিলকারক দ্রব্য তৈরী হইত।

পন্থা দুইটির মূলগত সূত্র এবং কার্য্যপ্রণালী সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এক্ষণে দেখা যাক এই দুইটির কোনটি আমাদের দেশে শিল্পোৎপাদক ভিত্তিতে পরিচালনা সম্ভব। একই সমস্যা সমাধানে উভয় পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং পন্থা দুইটি পরস্পর প্রতিযোগী তো নহে-ই, বরং একে অপরের পরিপূরক। বার্জিয়াস্-পন্থায় অতি উচ্চ চাপের প্রয়োজন। সেইজন্য বার্জিয়াস-যন্ত্র স্থাপন অত্যন্ত ব্যয়-সাধ্য এবং ইহার পরিচালনও জটিল। উপরন্তু এই প্রণালীতে উৎকৃষ্ট উৎপাদন লাভের জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লার প্রয়োজন। কিন্তু ভারতবর্ষের ধাতু-শিল্পের চাহিদা মিটাইবার জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা স্তর সংরক্ষিত রাখিতে হইবে। অপর পক্ষে ফিসার-ট্রপস্ পন্থা সাধারণ এবং মধ্যম বায়ু-চাপেই অনুসৃত হয়। সেজন্য ফিসার-ট্রপস্ যন্ত্র গঠনের খরচ বার্জিয়াস-যন্ত্র হইতে কম পড়িবে। উপরন্তু মূল গ্যাস-মিশ্রণ অল্পদামী নিম্নশ্রেণীর কাঁচা কয়লা হইতে তৈরী করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে এইরূপ কয়লা প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, যাহাকে ভিত্তি করিয়া ফিসার-ট্রপস্ যন্ত্র গড়িয়া উঠিতে পারে। উপরোক্ত কারণ সমূহ এবং অশেষ পরিবর্তন সুযোগ ও মূল্যবান সহজ-লভ্য দ্রব্যাদির প্রাচুর্যহেতু ভারতবর্ষে এই শিল্পের প্রচুর সম্ভাবনা রহিয়াছে।

এলুমিনিয়াম

শ্রীসুধীরচন্দ্র নিয়োগী

আজকাল যে-সমস্ত ধাতুর ব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে তাদের মধ্যে এলুমিনিয়াম সর্বপ্রথম। প্রায় ৫০-৬০ বৎসর আগে এই ধাতু অতীব দুর্মূল্য ছিল; কিন্তু এখন ইহা সুলভ ও নানা কাজে অপরিহার্য। নূতন বৈজ্ঞানিক উপায়ে এখন এলুমিনিয়াম প্রায় সকল দেশেই প্রস্তুত হইতেছে। এমনকি ভারতবর্ষেও গত তিন চার বৎসর যাবৎ কিছু পরিমাণে ইহা প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে ইহার দাম এত বেশী যে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশের সহিত তুলনা সম্ভব নয়।

এলুমিনিয়াম প্রস্তুত করিবার জন্য যে-সমস্ত উপাদান আবশ্যক তাহাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা উচিত। প্রথম বক্সাইট নামক একটি খনিজ পদার্থ অপরিহার্য। বক্সাইট মূলতঃ এলুমিনিয়াম ও অক্সিজেনের যৌগিক পদার্থ। যদিও এলুমিনিয়াম অক্সাইড পৃথিবীর সকল দেশেই মাটির সঙ্গে পাওয়া যায় প্রধানতঃ এলুমিনিয়াম সিলিকেট হিসাবে তথাপি আজ পর্যন্ত মাটি হইতে এলুমিনিয়াম তৈয়ারি করিবার কোন সহজও সুলভ বৈজ্ঞানিক পন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই। সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে এই সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায় (যেমন রাশিয়া মাটি হইতে এলুমিনা তৈয়ারি করিতেছে) কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন কারখানা মাটি হইতে এলুমিনিয়াম তৈয়ারী করিতেছে তাহার কোন প্রমাণ নাই। ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় বক্সাইট পাওয়া যায় এবং এলুমিনিয়াম তৈয়ারি করিবার সেগুলি খুবই উপযুক্ত। কিন্তু বক্সাইট ভিন্ন যে সমস্ত জিনিষ এলুমিনিয়াম তৈয়ারি করিবার জন্য দরকার সেগুলি ভারতবর্ষে বিশেষ সুলভ নয়। ক্রাইওলাইট নামে আর একটি খনিজ পদার্থ এই কাজের জন্য অপরিহার্য। কিন্তু এই খনিজ পদার্থটি পৃথিবীতে একমাত্র গ্রীনল্যাণ্ডে পাওয়া যায়। কিছুদিন আগে পর্যন্ত পৃথিবীর সমস্ত দেশই এই উপাদানের জন্য গ্রীনল্যাণ্ডের উপর নির্ভর করিত। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে জার্মানী বহুল পরিমাণে কৃত্রিম ক্রাইওলাইট তৈয়ারি করিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক এলুমিনিয়াম তৈয়ারি করিয়াছিল। কিন্তু এই জিনিষটির কত দাম তাহার কোন ঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রও কিছু পরিমাণ কৃত্রিম ক্রাইওলাইট ব্যবহার করে; কিন্তু একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই খনিজ পদার্থটির উৎপাদন ও বিক্রয় এখন নিউইয়র্ক হইতে নিয়ন্ত্রিত হয়, যদিও এই খনিটির মালিক কোপেনহাগেনের একটি যৌথ কোম্পানী। আমাদের দেশে এলুমিনিয়াম তৈয়ারী করিবার অসুবিধার ভিতর ক্রাইওলাইটের দাম অন্যতম। যুদ্ধের আগে ইহার দাম ছিল প্রতি টন প্রায় ৪০০৲। কিন্তু এখন বোধহয় ভারতবর্ষে আমদানী করিতে হইলে প্রতি টনে ১৬০০৲ টাকা দিতে হয়। অবশ্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র কিংবা কানাডাতে ইহার দাম এত বেশী নয়। কৃত্রিম ক্রাইওলাইট তৈয়ারি করিবার চেষ্টা এদেশে কিছুদিন যাবত হইয়াছিল। ফ্লুরাইড খনিজের অভাব ও সালফ্যুরিক এ্যাসিডের অত্যন্ত বেশী দাম থাকাতে কৃত্রিম ক্রাইওলাইট তৈয়ারি করিবার খরচ এখানে খুবই বেশী হইবে। যতদূর মনে হয়, যুদ্ধের সময় ভারত সরকার কৃত্রিম ক্রাইওলাইট তৈয়ারী

করিবার কথা বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন ইহার দাম টন প্রতি প্রায় ২৫০০৲ টাকা পড়িত। কাজেই যতদিন এখানে ক্যালসিয়াম ফ্লুরাইড পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া না যাইবে ও সালফ্যুরিক এ্যাসিডের দাম এইরূপ অসম্ভব থাকিবে ততদিন এলুমিনিয়াম তৈয়ারি করিবার এই আবশ্যকীয় খনিজ পদার্থটির জন্য আমাদের অন্য দেশের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

বক্সাইট এবং ক্রাইওলাইট বাদে এলুমিনিয়াম তৈয়ারির জন্য আরও কয়েকটি জিনিষ দরকার। যথা:—কষ্টিক সোডা, পেট্রোলিয়াম কোকএবং কার্বন ব্লক। ইহাদের মধ্যে কষ্টিক সোডা এদেশে এখনওবেশী পরিমাণে তৈয়ারি হয় না। কাগজ তৈয়ারি করিবার জন্য ইহার যথেষ্ট প্রয়োজন এবং এইজন্য কাগজের কলগুলি এইটিকে নিজেরা তৈয়ারী করিতে সচেষ্ট থাকে। টাটা কেমিক্যাল মিঠাপুরে সোডিয়াম কার্বোনেট তৈয়ারী করে এবং গুজরাটে আর একটী কারখানায় সোডিয়াম কার্বোনেট তৈয়ারি হয়। I. C. I. কিছুদিন আগে খয়রাতে আর একটী কারখানা খুলিয়াছে। মিঠাপুর ও গুজরাটের কারখানায় যে সোডা তৈয়ারী হইতেছে তাহার দাম অত্যন্ত বেশী ও ইহা হইতে কষ্টিক সোডা তৈয়ারী করিলে দাম আরও বেশী হইবে। টাটা কেমিক্যাল কিছুদিন আগে প্রতি হন্দর ৬৫ টাকায় কষ্টিক সোডা দিতে রাজী ছিল। যদি রেলপথে ইহা কলিকাতা কিংবা বিহারের কোন কারখানায় আনাইতে হয় তবে বোধহয় প্রতি হন্দর ৮০—৮৫৲ টাকা দাম পড়িবে। কিন্তু এত বেশী দাম সত্ত্বেও দরকার মত কষ্টিক সোডা পাওয়া যায় না। আসানসোলের নিকট যে এলুমিনিয়াম কারখানাটি আছে, কষ্টিক সোডা অভাবে তাহাদের কাজকর্মের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে এবং মারির নিকট যে নতুন কারখানাটি তৈয়ারী হইয়াছে প্রয়োজন মত কষ্টিক সোডা না পাওয়াতে সেখানে এখনও কাজ আরম্ভ করিতে পারে নাই।

পেট্রোলিয়াম কোক ভিন্ন অন্য কোন সুলভ জিনিষ আজ পর্য্যন্ত ইলেকট্রোড তৈয়ারী করিবার জন্য ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। মোটা তৈল হইতে পেট্রল ইত্যাদি তৈয়ারী করিবার সময় প্রচুর পরিমাণে পেট্রালিয়াম কোক বিনা খরচায় পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর আগে ইহার কোন ব্যবহার ছিলনা। দামও কতকটা কম ছিল। টন প্রতি ৮৲-১০৲ টাকা। কিন্তু আজ কাল ঐ জিনিষের দর প্রায় টন প্রতি ৬০৲-৭০৲ টাকা। ইহার উপর ডিগবয় হইতে জল কিংবা রেলপথে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা করা কঠিন। ইলেকট্রোড তৈয়ারী করিবার জন্য যে নরম পিচ দরকার হয় তাহা এখন এখানে তৈয়ারী করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু আলকাতরার দাম বেশী বলিয়া এই নরম পিচের দাম যুদ্ধের আগের চেয়ে প্রায় ৪ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত জিনিষ ঠিক মত না পাইলে এলুমিনিয়ামের কারখানা চলিতে পারে না। কাজেই সমস্ত জিনিষের দাম বাড়িয়া যাওয়ার ফলে আমাদের এখানে তৈয়ারী এলুমিনিয়ামের দাম কখনও কম হইতে পারে না।

এলুমিনিয়াম তৈয়ারী করিবার চুল্লীগুলির ভিতরে ব্যবহারের জন্য কার্বন ব্লক দরকার। এদেশে এইরূপ জিনিষ তৈয়ারী করা অসম্ভব নয়; কিন্তু ইহার বিক্রয় এত বেশী নয় যে, একটি কারখানা কেবল এই জিনিষ তৈয়ারী করিয়া চলিতে পারে। কাজেই কিছুদিন পর্যন্ত আমাদিগকে বিদেশ হইতে এই ব্লক গুলি ক্রয় করিতে হইবে। পূর্বে জার্মানী হইতে এই জিনিষ যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়া যাইত এবং দামও খুব বেশী পড়িত না। কিন্তু যুদ্ধের পর কেবলমাত্র আমেরিকা হইতে ইহা পাওয়া সম্ভব এবং দামও অত্যন্ত বেশী।

এই সমস্ত জিনিষ বাদে এলুমিনিয়াম তৈয়ারী করিবার জন্য আর একটি জিনিষের দরকার। সেটি হইতেছে বৈদ্যুতিক শক্তি। এক টন এলুমিনিয়াম তৈয়ারী করিতে প্রায় ২২০০০-২৪০০০ K.W.H বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন। কাজেই

দেখা যায় যে, এলুমিনিয়ামের দামের বেশীর ভাগ খরচ হয় বৈদ্যুতিক শক্তির জন্য এবং যে-দেশে এইটি যত কম দরে পাওয়া যায়—অন্য উপাদানগুলি না থাকিলেও সেই দেশে এলুমিনিয়াম তৈয়ারী করা সুলভ হইবে। পৃথিবীর মধ্যে নরওয়ে এবং কানাডা এই দুইটি দেশে বৈদ্যুতিক শক্তি খুব কম খরচায় উৎপাদিত হয়। নরওয়েতে প্রায় ৮৭৬০ ইউনিট বৈদ্যুতিক শক্তির দাম প্রায় ১৭৲ টাকা এবং কানাডাতে প্রায় ২৫-৩০৲ টাকা। এই দুইটি দেশে জল-প্রপাত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি সংগ্রহ করা হয়। আমাদের দেশে কয়েক জায়গায় জল-প্রপাত হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি তৈয়ারী করা হয়; কিন্তু নানা-কারণে তাহার দাম অত্যন্ত বেশী পড়ে। যতদূর মনে হয়, পাইকারা স্কীম হইতে ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়াম কম্পানী সবচেয়ে কম খরচায় বৈদ্যুতিক শক্তি পাইয়া থাকে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও প্রায় ৮৭৬০ ইউনিটে ইহার দাম প্রায় ৬০৲ টাকার কম হয় না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের খুব বড় ষ্টীম ষ্টেশনে যে বৈদ্যুতিক শক্তি তৈয়ারী হয় তাহার দামও ইহার চেয়ে কম পড়ে এবং সেই কারণে ঐ দেশে বহুল পরিমাণ এলুমিনিয়াম তৈয়ারী হয়। যুদ্ধের আগে যখন আসানসোলের নিকট একটি এলুমিনিয়ামের কারখানার পরিকল্পনা করা হইতেছিল তখন ঐ স্থানের কয়লা হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের খরচ প্রতি ইউনিট এক পাই করিয়া হিসাব করা হইয়াছিল। কিন্তু তখন কয়লার দাম টন প্রতি ১২ আনা ছিল আর এখন সেই জায়গায় কয়লার দাম প্রায় ৮-১০ টাকা। কাজেই বৈদ্যুতিক শক্তির দাম এখন খুবই বেশী হইয়া পড়িয়াছে। যতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রতি ইউনিট এক পাই বা আরও কম দামে পাওয়া না যাইবে ততদিন ইলেকট্রো কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিগুলি স্থাপন করিবার বিশেষ সুবিধা হইবে না, যদি পৃথিবীর অন্য দেশের সহিত আমাদিগকে সমান দামে জিনিষ তৈয়ারী ও বিক্রয় করিতে হয়।

এলুমিনিয়ামের কারখানার জন্য যন্ত্রপাতির দামের কথা বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে, আমাদের দেশে যতদিন যন্ত্র তৈয়ারী করিবার কারখানা স্থাপিত না হয় ততদিন এই সমস্ত জিনিষ কিনিবার জন্য অত্যন্ত বেশী দাম দিতে হইবে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছুদিন আগে যখন আসানসোলের নিকট প্রত্যহ ১০ টন এলুমিনিয়াম তৈয়ারী করিবার মত একটি কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করা হয় তখন ইহার জন্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছিল। অবশ্য এই খরচের মধ্যে যন্ত্র ইত্যাদি আমদানীর খরচ, এখান হইতে যে সমস্ত যন্ত্র পাওয়া যায় কিংবা এখানকার জিনিষ হইতে যে সমস্ত যন্ত্র তৈয়ারী করা সম্ভব ও কারখানা তৈয়ারীর খরচ ধরা হইয়াছিল। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, যুদ্ধের দরুণ কি অসুবিধা হইয়াছিল এবং কত বেশী দাম দিতে হইয়াছিল। পাওয়ার-হাউস, ইলেকট্রিক জেনারেটর, সুইচ-গিয়ার ইত্যাদি স্কোডা প্রায় ১৫ লক্ষ টাকায় দিতে রাজী হইয়াছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার ফলে ডি, সি, জেনারেটর এবং সুইচ-গিয়ার স্কোডার নিকট হইতে পাওয়া যায় নাই। এই দুইটী যন্ত্র ইংল্যাণ্ডের এক বিখ্যাত কারখানা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের চাপে সরবরাহ করে; কিন্তু ইহার জন্য প্রায় ৮৷৷০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হয়। জাহাজ ভাড়া, ইনস্যুরেন্স, আমদানী শুল্ক ইত্যাদি ধরিলে বোধহয় প্রায় ১০ লক্ষ টাকা এই যন্ত্রের জন্য খরচ করিতে হয়। প্রত্যেক পদে এইরূপ অসম্ভব খরচ বৃদ্ধি হওয়াতে আসানসোল কারখানা সম্পূর্ণ করিতে প্রায় এক কোটী টাকা খরচ হয়। এই এক কোটী টাকার সুদ ও কারখানার যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি যদি ১০ লক্ষ টাকা ধরা হয় তবে প্রত্যহ ১০ টন বা বৎসরে ৩০০০ টন এলুমিনিয়াম তৈয়ারী করিলে শুধু এই হিসাবে প্রতি টন এলুমিনিয়ামের দাম ৩৩৩৲ টাকা বেশী হইবে। কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্রে গত বৎসর প্রায় ৮০০ টাকা টন এলুমিনিয়াম পাওয়া যাইত; কিন্তু আমাদের দেশে মাত্র টাকার সুদ ও যন্ত্রপাতির

ক্ষয়ক্ষতির জন্য প্রতি টন এলুমিনিয়ামে ৩৩০৲ টাকা দিতে হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে কি করিয়া আশা করা যায় যে, আমাদের দেশের এই শিল্পটি পৃথিবীর অন্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে।

এলুমিনিয়ামের উৎপাদন যে কিছুদিনের মধ্যে এত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, বিশুদ্ধ এলুমিনিয়ামের চাহিদা খুব বেশী বাড়ে নাই। বিশুদ্ধ এলুমিনিয়াম কেবল মাত্র বাসনপত্র তৈয়ারি করিতে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অন্য ধাতুর সংমিশ্রণে যে সমস্ত মিশ্র-ধাতু তৈয়ারী হয় তাহাদের কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ থাকায় এলুমিনিয়ামের ব্যবহার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে ও ভবিষ্যতে আরও বেশী হইবে বলিয়া আশা হয়। কিন্তু এই সমস্ত মিশ্র-ধাতু তৈয়ারী করিতে যে ধাতুগুলির প্রয়োজন সেগুলির মধ্যে কেবল মাত্র তাম্র এদেশে পাওয়া সম্ভব। অন্য সমস্ত গুলিই অত্যন্ত বেশী দামে আমদানী করিতে হইবে। আমাদের দেশের যে অবস্থা তাহাতে এই ধাতুগুলি তৈয়ারী করিবার ব্যবস্থা করাও ঠিক সম্ভব নয়। নূতন মিশ্র-ধাতু তৈয়ারী করিবার জন্য গবেষণা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। মন্ট্রিল এলুমিনিয়াম লেবরেটরীতে প্রায় ৩০০ উচ্চশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক কেবল নূতন 'এলয়' তৈয়ারী করা সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছেন। আমাদের দেশে কয়জন এইরূপ কাজে নিযুক্ত তাহা জানা নাই।

এলুমিনিয়াম ও অন্যান্য ইলেক্ট্রো-কেমিক্যাল কিংবা ইলেক্ট্রো-মেটালার্জিক্যাল শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইলে গুটিকয়েক কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। প্রথমতঃ, বৈদ্যুতিক শক্তি কম দামে ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ, দেশে যদি এই শিল্পগুলির সমস্ত উপাদান না পাওয়া যায় তবে গবেষণা করিয়া দেশীয় পদার্থ হইতে এই সমস্ত উপাদান তৈয়ারী করিতে হইবে। আমদানীর উপর নির্ভর করিলে বোধহয় ভাল হইবে না। তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত উদ্বৃত্ত পদার্থ পাওয়া যাইবে সেগুলির ঠিক মত ব্যবহার করিতে হইবে। চতুর্থতঃ, নূতন পন্থা ও নূতন ব্যবহার আবিষ্কার করিতে হইবে।

"পরীক্ষা সাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিঘ্ন আছে। আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তরদৃষ্টিকে উজ্জ্বল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই ম্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যাহারা লালায়িত হইয়া উঠে তাহারা সত্যের সন্ধান পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্য্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না, দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কিন্তু সত্যকে যাহারা যথার্থ চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ দেবী সরস্বতীর যে নির্ম্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম।"

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

রবার

শ্রীপ্রবোধরঞ্জন সিংহ

রবার কয়েকটী বিভিন্ন জাতীয় গাছের আঠা। এই গাছগুলির ত্বকচ্ছেদ করিলে দুগ্ধসদৃশ্য পদার্থ নির্গত হয় যাকে বলা হয় ল্যাটেক্স। ল্যাটেক্সে রবার ও অন্যান্য অনেকগুলি জৈব ও অজৈব পদার্থ অবলম্বিত ও দ্রবীভূত অবস্থায় বর্তমান। রবার জলের মধ্যে দ্রবীভূত হয় না। ল্যাটেক্সে রবারকণা লম্ববান অবস্থায় থাকে। ল্যাটেক্সের রাসায়নিক বিশ্লেষণ মোটামুটি এইরূপ :—

জল	৬০ ভাগ
রবার	৩৫ "
প্রোটিন	২ "
সাবান ও স্নেহজাতীয় পদার্থ	১ "
শর্করা, অ্যামিনো অম্ল ইত্যাদি	০·৬ "
কিউব্রাকিটল	১ "
অজৈব পদার্থ	০·৪ "

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রধানতঃ ব্রাজিলের জঙ্গলের বিভিন্ন জাতীয় গাছ থেকেই রবার নেওয়া হত। ক্রমশঃ শুধু হিবিয়া জাতীয় রবারই বেশী প্রচলিত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে হিবিয়া জাতীয় গাছের চাষ মালয়ে আরম্ভ হয় এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই রবার তার উৎকর্ষের জন্য ব্রাজিলের বুনো-রবারকে বাজার থেকে হটিয়ে দেয়। বর্তমানে পৃথিবীর সমগ্র রবার উৎপাদনের অল্প অংশই বুনো-রবার। ১৯৪৬ সালে বিভিন্ন দেশের রবার উৎপাদনের হিসাব নীচে দেওয়া হল :—

মালয়	৪০৩,৭১৯ টন
নেদারল্যাণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিজ	১৭৫,০০০ "
থাইল্যাণ্ড	২০,০০০ "
ইন্দোচীন	১৯,৯০৪ "
সিংহল	৯৪,০০০ "
ভারতবর্ষ	১৫,৭৫৭ "
এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল	২১,৫৫০ "
মধ্য আমেরিকা	৭,০০০ "
দক্ষিণ "	৩৩,০০০ "
আফ্রিকা	৪৫,০০০ "
ওশেনিয়া	১,০৬৫ "
মোট—	৮৩৫,০০০ টন

এশিয়ার বাহিরে অন্যান্য অঞ্চলে বুনো-রবার ও হিবিয়া ছাড়া অন্য জাতীয় নিকৃষ্ট শ্রেণীর রবার উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত তালিকা থেকে বুঝতে পারা যায় যে, ১৯৪২ সালে প্রথম চারিটি দেশ জাপানের অধিকারে যাওয়ায় রবারের অভাবে মিত্রশক্তিকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। আমেরিকান রাসায়নিকবৃন্দের বিরাট উদ্ভাবনী শক্তির ফলে সংশ্লিষ্ট-রবার শিল্প এই সময় গড়ে উঠে।

সাধারণতঃ হিবিয়া গাছের বয়স পাঁচ বছর হলে, রবার নিষ্কাশন সুরু করা হয়। কতকটা খেজুর গাছ থেকে রস নেবার পদ্ধতিতে রবার-ল্যাটেক্স নেওয়া হয়। প্রথমেই গাছের সর্বোচ্চ স্থান থেকে ত্বকচ্ছেদ করতে সুরু করা হয় এবং আস্তে আস্তে নীচের দিকে কাটা চলতে থাকে। ল্যাটেক্স একটী ছোট পাত্রে জমা হয়। এই ভাবে বিভিন্ন গাছ থেকে ল্যাটেক্স নিয়ে কারখানায় একসঙ্গে জমা করা হয়। ল্যাটেক্স রেখে দিলে তার অন্তঃস্থিত ব্যাক্টেরিয়া ও এনজাইমের স্বাভাবিক পচনক্রিয়ার ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে রবার জল থেকে ছানার

মত বেরিয়ে আসে। রসায়নশাস্ত্রে একে বলা হয় তঞ্চন (coagulation)। ল্যাটেক্স-পাত্রে তঞ্চন বন্ধ করার জন্য অল্পপরিমাণ এমোনিয়া বা সোডিয়াম সালফাইড দেওয়া হয়। ল্যাটেক্সকে এই অবস্থায় রাখতে গেলে সাধারণতঃ শতকরা ০'৫ ভাগ এমোনিয়া দেওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে, সরাসরি ল্যাটেক্স থেকে রবারের খুব অল্পসংখ্যক দ্রব্যই প্রস্তুত করা যায়। তার মধ্যে রবারের চুষি-কাটি, ড্রপার, স্পঞ্জ, বেলুন, খেলানা, রবারের সূতা ইত্যাদিই প্রধান।

রবার চাষের কারখানায় ল্যাটেক্স থেকে রবারের চাদর তৈয়ারী করা হয়। ল্যাটেক্সের মধ্যে সাধারণতঃ শতকরা ২ ভাগ ফর্মিক-অম্ল বা অ্যাসি-টিক-অম্ল দেওয়া হয়। এই অম্লকে বলা হয় তঞ্চক (coagulant)। দেশীয় অধিবাসীরা উপরোক্ত অম্লের পরিবর্তে সঞ্চিত নারিকেলের জল ব্যবহার করে। তঞ্চক দেওয়ায় ল্যাটেক্স আস্তে আস্তে আরও ঘন হয় এবং ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে রবার একটা মোটা পাতে পরিণত হয়। এই পাত পরপর যুগ্ম রোলারের মধ্য দিয়ে চালাবার পর সর্বশেষ এক জোড়া খাঁজ কাটা রোলারের মধ্যে দিয়ে চালান হয়, যার ফলে রবারের চাদরের উপর খাঁজ কাটা ছায়া থাকে। রোলারের মধ্য দিয়ে চালানর সময় প্রচুর জলের সাহায্যে রবারকে ধৌত করা হয় এবং শেষে রবারের চাদর গতিশীল জলরাশির মধ্যে ১৫-৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখা হয়। তারপর চাদরগুলিকে ছায়ায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তখন জল ঝরে পড়ে। তারপর ধুমঘরে সেগুলিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং গাছের পাতা ও কাঠের আগুনে শুকান হয়। এই সময় ঘরের মধ্যে উষ্ণতা রাখা হয় ৩৮°-৫৫° সেন্টিগ্রেড। সম্পূর্ণ শুষ্ক হতে ৫-১২ দিন লাগে। পাতা ও কাঠ পোড়ালে ধোঁয়া হয়, তার ফলে রবারের রঙ হয় ঘোর বাদামী বা কাল্‌চে বাদামী এবং এই চাদরকে বলা হয় ধূম্রপক্ক রবার চাদর। আর এক পদ্ধতিতে তঞ্চনের পর পাতগুলিকে যুগ্ম রোলার যন্ত্রে খুব ভাল করে' জল দিয়ে ধোয়া হয় এবং যন্ত্রের সাহায্যে রবারের চাদরের উপর বুটিদার বা ক্রেপ ছাপ দেওয়া হয়। পরে চাদর-গুলি লম্বমান অবস্থায় স্বাভাবিক উষ্ণতায় ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। এই রবারকে বলা হয় ফিকে ক্রেপ রবার। এই রবার খুব পরিষ্কার এবং ফিকে ঘিয়ে রঙের হয়। তা'ছাড়া ল্যাটেক্সের পাত্রে বা অন্যান্য স্থলে যে রবার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তঞ্চিত হয়ে থাকে সেগুলিকে একত্রিত করে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ক্রেপ রবার করা হয়। এগুলির রং একটু বাদামী হওয়ায় বলা হয়, বাদামী ক্রেপ।

ধূম্রপক্ক রবারের ব্যবহার সবচেয়ে অধিক। মোটর, সাইকেল বা এরোপ্লেনের টায়ার, জুতা, বিদ্যুৎবাহী তারের আবরণ, বর্ষাতি এবং ছাঁচে তৈয়ারী অনেক রকম রবার-দ্রব্যের জন্য ধূম্রপক্ক রবার ব্যবহৃত হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, সমগ্র পৃথিবীর রবার ব্যবহারের শতকরা ৬৬ ভাগ টায়ার নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। পাতলা রবার দ্রব্য এবং ফিকে বা সাদা রঙের রবার দ্রব্য নির্মাণে ফিকে ক্রেপ আবশ্যক। অনেক জিনিষ তৈয়ারীতে ধূম্রপক্ক রবারের সঙ্গে অল্পাংশে ক্রেপ রবার দেওয়া হয়। বাদামী ক্রেপ ধূম্রপক্ক রবারের সঙ্গে অল্পাংশে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

প্রাকৃতিক রবার যা' পাওয়া যায়, তার সঙ্গে অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ না মিশিয়ে কোন বস্তু তৈয়ারী করলে সেই বস্তুর স্থায়িত্ব বেশী দিন হয় না; উপরন্তু সেই বস্তুর উপযুক্ত ভৌত ধর্ম পরিলক্ষিত হয় না। রবারের সঙ্গে গন্ধক মিশিয়ে তাপ দিলে গন্ধকের সঙ্গে রবারের রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার ফলে রবারের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের উৎকর্ষ হয়। এই প্রক্রিয়াকে ভালকেনাইজেশন বলে। ভালকেনাইজেশনের ফলে রবারের যে সব পরিবর্তন ঘটে, তার মধ্যে এইগুলি প্রধান:—(১) নমনীয়তা হ্রাস (২) দ্রবণীয়তা হ্রাস (৩) চটচটে ভাবের হ্রাস (৪) স্থিতি-

স্থাপকতার উৎকর্ষ (৫) ভারসহনক্ষমতার উৎকর্ষ (৬) ক্ষয়ের গতিমন্দন। ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের এই উৎকর্ষের সম্যক কারণ এখনও অজ্ঞাত। গন্ধকের সঙ্গে রবারের রাসায়নিক-যোজনের কারণ মনে করা যেতে পারে; কিন্তু দেখা গেছে যে, গন্ধক ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি রাসায়নিক, যথা সেলেনিয়ম, বেনজোইল পেরক্সাইড, বিভিন্ন ক্লোরো-বেনজোকুইনোন ইত্যাদি। কোন রাসায়নিকের অবর্তমানে শুদ্ধমাত্র আলট্রা-ভায়োলেট বা ক্যাথোড-রশ্মি দিয়েও ভালকেনাইজেশনের কাজ ভাল রকমেই চলে। ভালকেনাইজেশন ব্যতীত রবারের খুব কমসংখ্যক দ্রব্যই ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন জিনিষ জোড়া লাগাবার জন্য রবারের আঠা সাধারণতঃ ভালকেনাইজ করা হয় না। জুতার তলার ক্রেপ রবার ভালকেনাইজেশন ছাড়া ব্যবহৃত হয়। ভালকেনাইজেশনে যদিও রবারের সহিত গন্ধকের যোজন হয়, তথাপি তার ফলে কোন নির্দিষ্ট পদার্থ উদ্ভূত হয় না, কিম্বা যুক্ত গন্ধকের পরিমাণ এক হওয়া আবশ্যক নয়। রবারের সঙ্গে যেসব রাসায়নিক মিশ্রিত হয়, সেগুলিকে নিম্নলিখিতকয়েকশ্রেণীতে ভাগ করা যায় :-

(ক) ভালকেনাইজেশন কারক (খ) ত্বরক (গ) উত্তেজক (ঘ) ক্ষয়রোধক (ঙ) পূরক (চ) নমনীয়কারক (ছ) রঞ্জক।

(ক) ভালকেনাইজেসন কারক :—গন্ধক, গন্ধকের যৌগিক-পদার্থ, সালফার ক্লোরাইড বা থায়ুরাম সালফাইড এবং সেলেনিয়াম ব্যবহৃত হয়; তার মধ্যে গন্ধকের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী, অন্যগুলি খুব অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

(খ) ত্বরক :—কেবলমাত্র গন্ধক দ্বারা ভালকেনাইজেশন করতে কয়েকঘণ্টা সময় লাগে। এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য ত্বরক ব্যবহৃত হয়, যার ফলে কয়েকমিনিট থেকে একঘণ্টার মধ্যে ভালকেনাইজেশন করা যায়। ত্বরক ব্যবহারের পূর্বে মিশ্রিত গন্ধকের পরিমাণ রবারের ৮-১০% প্রয়োজন হত। এখন ত্বরক বর্তমানে সেটা কমে কমে ০·৭৫-৩% দাঁড়িয়েছে। কয়েক বৎসর পূর্বে অজৈব ত্বরক ব্যবহৃত হত। এখন জৈব ত্বরক বেশী প্রচলিত। কয়েকটী প্রধান জৈব ত্বরকের নাম, যথাঃ- মারক্যাপটো-বেনজোথায়াজোল, ডাইফিনাইলগুয়ানিডিন; জিংক্ ডাইইথাইল ডাইথায়োকার্বামেট, অ্যাসিট্যালডিহাইডঅ্যানিলিন।

(গ) উত্তেজক :—ত্বরকের কার্যে উত্তেজনার জন্য ব্যবহৃত হয়, যথা জিংক্ অক্সাইড, স্টিয়ারিক অ্যাসিড, লিথার্জ। এইগুলি অল্প পরিমাণে মিশ্রণ করায় ত্বরকের কার্যে সহায়তা করে। কোন কোন ত্বরকের সহিত উত্তেজক ব্যবহৃত হয় না।

(ঘ) ক্ষয়রোধক :—বিভিন্ন কারণে রবারের জিনিষ নষ্ট হয়। তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান :— রাসায়নিক প্রকৃতির জন্য অক্সিজেন বা ওজোন এর সহিত রাসায়নিক যোজন (২) সূর্যালোক (৩) উত্তাপ (৪) ঘর্ষণ। (৫) বারংবর মোচরান ও চাপ দান (৬) রবার দ্রব্যের মধ্যে স্বল্প পরিমাণে তাম্র ও ম্যাঙ্গানিজের উপস্থিতি। ক্ষয়নিরোধের জন্য অনেকরকম রাসায়নিক উদ্ভূত হয়েছে; তবে কোন একটির দ্বারাই সমস্তরকম ক্ষয়নিরোধ করা যায় না। রবার দ্রব্যের ব্যবহার অনুযায়ী ক্ষয়রোধক এক বা একাধিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন অ্যালডিহাইড অ্যামাইন, ডাইফিনাইলঅ্যামাইন, অ্যাসিটোন অ্যানিলিন ইত্যাদি ক্ষয়রোধকরূপে ব্যবহৃত হয়।

(ঙ) পূরক :—সাধারণ অর্থে কতকগুলি অকেজো সস্তা জিনিষ, যেগুলি দিয়ে দ্রব্যের ওজন ও আয়তন বাড়ানো হয়। কিন্তু রবারের দ্রব্য নির্মাণে দু'রকম পূরক প্রচলিত আছে। প্রথম রকমের পূরক, যথা—চিনমাটি, ট্যাল্‌ক, ব্যারাইটিস্ ইত্যাদি রবারের ভৌতধর্মের কোন উপকর্ষ সাধন করে না; শুধুমাত্র সস্তা করবার জন্য এগুলি ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় রকমের রবার পূরক, যথা—অঙ্গারক, ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট, হোয়াইটিং, জিংক্ অক্সাইড ইত্যাদি রবারের ভৌত ধর্মের উপকর্ষ সাধন করে।

(চ) নমনীয়কারক :—রবারের সহিত অন্যান্য পদার্থ মিশ্রণের প্রক্রিয়ায় সহায়তার জন্য ও রবার দ্রব্য নরম করার জন্য নমনীয়কারক ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ খনিজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল, মোম, রজন আলকাতরা, পিচ, বিটুমেন ইত্যাদি নমনীয়কারকরূপে ব্যবহৃত হয়।

(ছ) রঞ্জক :—রবার দ্রব্য রঙীন করার জন্য নানারকম জৈব ও অজৈব রঞ্জক ব্যবহৃত হয়। অঙ্গারক দিয়ে কাল রং করা হয়। লিথোপোন ও জিংক্ অক্সাইড দিয়ে সাদা করা হয়। অন্যান্য রং করতে আজকাল জৈব-রঞ্জকই বেশী প্রচলিত।

এই প্রসঙ্গে কঠিন রবার বা এবোনাইট সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা দরকার। ১০০ ভাগ রবারের সঙ্গে ৪৭ ভাগ গন্ধকের রাসায়নিক যোজন হলে রবার, গন্ধক সংপৃক্ত যৌগিক পদার্থ উদ্ভূত হয়। যে কোন রবার দ্রব্যে যুক্ত গন্ধকের পরিমাণ রবারের ২৫-৪৭% হলে তাকে কঠিন রবার বা এবোনাইট বলা হয়। রবারের সঙ্গে এইরূপ বেশী পরিমাণ গন্ধক যুক্ত হলে রবারের রং কাল হয়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কঠিন রবারের মধ্যে যুক্ত গন্ধকের পরিমাণ ৩৫-৪৫ ভাগ থাকে এবং তার মধ্যে কোন পূরক থাকে না। ত্বরক ব্যবহারও আবশ্যিক নয়। রবারের সঙ্গে প্রয়োজন মত গন্ধক, নমনীয়কারক, কঠিন রবারচূর্ণ ও কখন কখন ত্বরক মিশ্রিত করে বহুক্ষণ ধরে উত্তপ্ত করলে কঠিন রবার প্রস্তুত হয়।

"ইংরেজী ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার যে কিছু আবিষ্কার সম্প্রতি বিদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহা সর্ব্বাগ্রে মাতৃভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এবং তাহার প্রমাণার্থ পরীক্ষা এদেশে সাধারণ সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার একান্ত দুর্ভাগ্য বশতঃ এদেশের সুধীশ্রেষ্ঠদিগের নিকট তাহা বহুদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। আমাদের স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ও বিদেশের হল-মার্কা না দেখিতে পাইলে কোন সত্যের মূল্য সম্বন্ধে একান্ত সন্দিহান হইয়া থাকেন। বাঙ্গালাদেশে আবিষ্কৃত, বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত তত্ত্বগুলি যখন বাঙ্গলার পণ্ডিতদিগের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিল, তখন বিদেশী ডুবারীগণ এদেশে আসিয়া যে নদীগর্ভে পরিত্যক্ত আবর্জনার মধ্যে রত্ন উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইবেন, ইহা দুরাশামাত্র।"

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

কলকাতার এই প্লেগ

ডাঃ অরুণকুমার রায় চৌধুরী

কলকাতার এই প্লেগ সম্বন্ধে ডিরেক্টর অব্ পাবলিক হেলথ বলেছেন যে, বেহার ও উত্তর ভারত হতে আমাদের যে খাদ্য শস্য আসে তার ভেতরে করেই বহু সংখ্যক ইঁদুর (Rattus Rattus) এবং প্লেগ-বীজাণু বহনকারী কীট (Rat-flea) কলকাতায় এসেছে এবং সেজন্যই প্লেগ হচ্ছে। কিন্তু এর ভেতরেও একটু 'কিন্তু' রয়ে যায়, যেমন :—

(ক) বর্ত্তমানে উত্তর ভারত বা বেহারে প্লেগ রোগী নেই কেন? সব ইঁদুর ও প্লেগ-বীজাণু বহনকারী কীট তো বাংলায় চলে আসা সম্ভব নয়!

(খ) যদি পূর্বে ঐ রোগী থাকতে খাদ্য-শস্য এসে থাকে তবে, তখনই হল না কেন? এতদিন পরে "মারী" আরম্ভ হল কেন? খাদ্য-শস্য তো আজ আসছে না, বহুদিন ধরেই আসছে, তখন তো দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি কারণে লোকের সাধারণ স্বাস্থ্য আরোও খারাপ ছিল।

(গ) বাংলা দেশের যা' জলবায়ুর অবস্থা তাতে কলকতায় প্লেগের আক্রমণ বিশেষভাবে হওয়া উচিত শীতকালে, কেননা প্লেগ-বীজ-বহনকারী কীটগুলি ৮৫° ফাঃ এর উপরে তাপ গেলে নিজেরা নিস্তেজ হয়ে পরে এবং তাদের বংশ-বৃদ্ধিও বন্ধ হয়ে যায়। কৈ রোগ আরম্ভ তো শীতকালে হয়নি, হয়েছে তো সবে এই এপ্রিলে। কাজেই ধরতে হবে যে, বাংলায় প্লেগের বীজাণুও প্রবেশ করেছে ঐ এপ্রিল মাসেরই কাছাকাছি কোনও সময়।

(ঘ) খাদ্য-শস্য প্রথম চটের থলে ইত্যাদিতে করে গভর্ণমেণ্ট রেশন ষ্টোর্সে আসে এবং প্লেগ আক্রান্ত ইঁদুর বা প্লেগ বীজাণু বহনকারী কীট থাকলে গভর্ণমেণ্ট ষ্টোর্স বা রেশনের দোকানের কর্মচারীদেরই সব চেয়ে আগে বহুল পরিমাণে প্লেগে আক্রান্ত হওয়া উচিত ছিল। কৈ সেরূপ তো কিছুই হয়নি! আক্রমণ তো হচ্ছে দূর দূর পাড়ায় পাড়ায়। তা'ও এক একটি করে এমন সব লোকেদের ভেতর, যারা পরস্পর পরস্পরের প্রায় কোনরূপ সংস্পর্শেই আসেনি।

আমার মনে হয়, এসম্বন্ধে আরোও ভালকরে অনুসন্ধান ও গবেষণা করা দরকার। হয়ত প্লেগ সম্বন্ধে তাতে নতুন কোনও সত্য বে'র হয়ে পড়তে পারে। কারণ কোনও সংক্রামক রোগের বিষয় এ প্রায় অসম্ভব যে, সে এক বাড়ীর একজনকেই কেবল আক্রমণ করবে; কি এক পাড়ায় কেবল মাত্র একটি রোগীই দেখা দেবে। আরোও বিশেষ কথা এই যে, কলকাতায় টিকার কোনও ব্যবস্থা পূর্বে কখনও হয়নি, এবং শেষ প্লেগ আক্রমণ যেখানে পঞ্চাশ বছর আগে হয়েছে, কাজেই সাধারণ লোকেদের ভেতর সেখানে রোগ-প্রতিরোধক শক্তি বা Immunity মোটেই নেই। তবে কি এ রোগ ঠিক প্লেগ নয়—তারই কোন শক্তি হীন (attenuated form) বীজাণু সম্ভূত?

(২) কেউ কেউ আবার এ আক্রমণকে মালয়ের ট্রপিকাল টাইফাসের সঙ্গে এক কিনা তাই ভেবে দেখতে বলেছেন। কিন্তু তার উত্তরে ক্যাম্পবেল হাসপাতালের ডাঃ দত্তগুপ্ত বা প্যাথলজিষ্ট পাঞ্জার রিপোর্টের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। তাতে দেখা গেছে যে, হাসপাতালে প্রেরিত বহু রোগীর শরীরে প্লেগ রোগের বীজাণু পাওয়া গেছে।

কাজেই এ-রোগ যে প্লেগ সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। তবে হয়ত হতে পারে প্রকার ভেদে আক্রমণের তীব্রতা বর্তমানে খুবই কম।

(৩) সৌভাগ্যক্রমে বাংলার বর্তমান প্রধান মন্ত্রী ভারতের শ্রেষ্ঠতম চিকিৎসকের অন্যতম। পত্রিকায় দেখলাম তিনি বলেছেন যে, প্রফুল্লভাবে যারা থাকবে তাদের আক্রমণ হবে কম, আর যারা ভীত হয়ে থাকবে তাদের আক্রমণ হবে বেশী। উপরের একথাটা যদি তিনি কলকাতার লোককে আতঙ্কিত না হবার জন্যে আশ্বাস দিয়ে থাকেন তবে অবশ্য বলবার কিছু নেই, কিন্তু তা' না হলে বলতে হয় যে, এত কষ্ট ও বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও যদি কোনও কৌশলে আমরা মুখে কৃত্রিম হাসি টেনে প্রফুল্লতা দেখতে পারি তবেই আমরা রোগ থেকে পরিত্রাণ পাব. এ-কথাটা কিন্তু বিজ্ঞান গ্রাহ্য নয়।

যাঁরাই এখন কলকাতায় চিকিৎসা করেন তাঁরাই জানেন যে কতরকমের রোগী তাদের কাছে আজ-কাল সামান্য কারণেও এসে প্রায়ই প্লেগাক্রান্ত হয়েছে কিনা, সে আশঙ্কা প্রকাশ করে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই কথাটা আপনাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

একটী বয়স্ক অধ্যাপক, মহাপণ্ডিত মানুষ, কিন্তু প্লেগের কথা শুনেই ভদ্রলোক একেবারে চঞ্চল হয়ে পড়েন। কোথাও স্থির হয়ে থাকতে পারেন না। ঘুম মোটেই হয়না, সর্বদা বুক টিপ টিপ করে। অক্ষুধা, কোনও কিছুতেই মন বসাতে পারেন না। ডাক্তারের কাছে বার বার খবর পাঠান। অবশেষে বাড়ীর সবার প্লেগের টিকা নেওয়ার পরই কিন্তু তাঁর সব গ্লানির গেল শেষ হয়ে। এত ভয় ও আতঙ্ক সত্ত্বেও কিন্তু তাঁর প্লেগের আক্রমণ মোটেই হয়নি। যদিও তাঁরই পাশের পাড়ার নিশ্চিন্ত ভাবনাহীন একটি আট দশ বছরের বালক প্লেগাক্রান্ত হল, কোনও কিছু চিন্তাগ্রস্ত বা আতঙ্কিত হবার বহুপূর্বে।

আর একটী অতি বুদ্ধিমতী প্রৌঢ়ার কথাও বলতে পারি। তিনি প্লেগের কথা শুনে হাতে পায়ের ব্যথা, মাথায় যন্ত্রনায় বিশেষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন; কিন্তু তার সব কষ্টও প্লেগের টিকা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায়। সেরকম দক্ষিণ কলকাতার এক অতি আধুনিকার কথা জানি, যার চলন-ভঙ্গী সাবলীল, দেখলেই মনে হয়, বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ের ছবি। কিন্তু ইনিও প্লেগের ভয়ে এত ভীত হয়ে পড়েন যে, একদিন নাকি সত্য সত্যই ফিট্ হয় গেছলেন। কোনও আশা ও আশ্বাসই তাঁর মুখের হাসি বা মনের শান্তি ফেরাতে পারেনি; কিন্তু টিকা নেওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে যেন সব যাদুমন্ত্রের ন্যায় অদৃশ্য হয়ে গেল। এরকম আমি দেখেছি অসংখ্য জায়গায় এবং সব বয়সের এবং সব রকমের পুরুষ ও স্ত্রীর ভেতরেই। এসব জায়গায় মনে স্বাভাবিক ভয় এসেছে বলেই যে প্লেগ হতে হবে তার কোন মানে নেই। প্লেগ হতে গেলে প্লেগের বীজাণুর শরীরের ভেতর প্রবেশ করা একান্ত দরকার। প্লেগ-বীজাণু শরীরে প্রবেশ করলে শত প্রফুল্ল থাকলেও, যদি রোগ-প্রতিরোধক ক্ষমতা না থাকে বা টিকা না লওয়া থাকে তবে প্লেগের আক্রমণ হবেই হবে, এর অন্যথা হবেনা। এই হল বিজ্ঞান সম্মত কথা, কাজেই আতঙ্কগ্রস্ত না হওয়া যেমন দরকার তেমন ও-কিছু-নয় ভাবটাও ঠিক নয়। সকলেরই টিকা ও উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক সাবধানতা অবলম্বনের পরে, নিজ নিজ দৈনন্দিন স্বাভাবিক জীবনযাপন করাই উচিত।

উপসংহারে, প্লেগের আধুনিক যে চিকিৎসা পদ্ধতি চলছে সে সম্বন্ধে দু'য়েকটি কথা বলেই আমাদের বক্তব্য শেষ করব। আমরা জানি, পূর্বে প্লেগের মৃত্যুর হার ছিল শতকরা ষাট হতে নব্বইয়ের উপর। কিন্তু বর্তমানে প্রায় ১২৫টীর রোগীর মধ্যে হাসপাতালে মাত্র ৮টি কি ৯টি রোগী মারা গেছে। এ অসাধ্য সাধন হয়েছে দু'রকমের ঔষধের দ্বারা।

(১) সালফা ঔষধ—এদের ভেতর সালফা থিয়াজল, সালফা ডায়াজিন, সালফা মেরাজিন,

সালফা মেথাজিন খুব বেশী মাত্রায় ৪ঘণ্টা এবং কোথাও দু'ঘণ্টা অন্তর দেওয়ায় প্লেগে বেশ সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

(২) ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন—ঔষধটি যুদ্ধোত্তর এবং খুবই নতুন। এ ঔষুধ প্লেগে প্রায় অব্যর্থ; কিন্তু এ ঔষধের অসুবিধা হচ্ছে (অ) চাহিদার তুলনায় বাজারে আছে অত্যন্ত অল্প। (আ) এর চিকিৎসা খরচ অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। (ই) এদিয়ে চিকিৎসা করাতে হলে একজন ডাক্তারকে প্রায় সবসময়ে রোগীর কাছেই থাকতে হয়। এসব কারণে এ ঔষধ বর্তমানে কেবল মাত্র ধনিক সম্প্রদায় ব্যবহার করতে পারেন।

প্রত্যেক খারাপ জিনিষেরও একটা ভাল দিক আছে। কলকাতায় প্লেগ হওয়ায় কলকাতার ডাক্তাররা সাক্ষাৎভাবে প্লেগ চিকিৎসায় এই নতুন ঔষধগুলোর প্রয়োগ দেখতে পারলেন।

* * * জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতার পথে সবই যে আমরা বুঝি তাও নয় আর সবই সুস্পষ্ট না বুঝলে আমাদের পথ এগোয় না একথাও বলা চলে না। জলস্থল বিভাগের মতোই আমরা যা বুঝি তার চেয়ে না বুঝি অনেক বেশি, তবুও চলে যাচ্ছে এবং আনন্দ পাচ্ছি। কতক পরিমাণে না বোঝাটাও আমাদের এগোবার দিকে ঠেলে দেয়, যখন ক্লাসে পড়াতুম এই কথাটা আমার মনে ছিল। আমি অনেক সময়েই বড়ো-বয়সের পাঠ্য-সাহিত্য ছেলে-বয়সের ছাত্রদের কাছে ধরেছি, কতকটা বুঝেছে তারা একরকম ক'রে অনেকখানি বোঝা যা মোটে অপথ্য নয়। এই বোধটা পরীক্ষকের পেনসিল মার্কার অধিকারগম্য নয় কিন্তু এর যথেষ্ট মূল্য আছে, অন্তত আমার জীবনে এই রকম পড়ে পাওয়া জিনিস বাদ দিলে অনেকখানিই বাদ পড়বে।

রবীন্দ্রনাথ

বিজ্ঞান কুশলী আলভা এডিসন

শ্রীহৃষীকেশ রায়

বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বঞ্চিত হয়ে অসামান্য প্রতিভাবলে জগদ্বরেণ্য বৈজ্ঞানিক হতে সক্ষম হয়েছিলেন আল্‌ভা এডিসন। বাল্যে তাঁর যা' কিছু প্রাথমিক শিক্ষা তা' তিনি লাভ করেন একমাত্র তাঁর মাতার নিকট। এডিসনের মাতা ছিলেন একজন শিক্ষয়িত্রী। আল্‌ভা বিদ্যালয়ে গেছলেন, কিন্তু শ্লেটে ছবি আঁকা ছাড়া আর কিছু তিনি করেছেন বলে জানা যায় না; শিক্ষক মহাশয়েরও তাঁর উপর কোন আশা-ভরসা না থাকায় তাঁকে বিদ্যালয় ত্যাগ করতে হয়। মাতা কিন্তু পুত্রের অসামান্য বুদ্ধিমত্তা লক্ষ্য ক'রে তাঁকে সযত্নে শিক্ষা দেন। মৌলিক বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কারের দাবী বিশেষ না থাকলেও অন্যের আবিষ্কৃত বা ইঙ্গিত বহু মূল সূত্র এডিসনের কুশলী হস্তে ব্যবহারিক রূপ পেয়ে জগৎ-কল্যাণে নিয়োজিত হয়েছে। এবং তাদের সংখ্যা এত অধিক যে, মনে হয় যেন এডিসনের পর বৈজ্ঞানিকগণের আর কিছু করবার থাকল না। তাই এডিসনকে নররূপী বিশ্বকর্মা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

টমাস্ আল্‌ভা এডিসন ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী মিলান নগরে জন্মগ্রহণ করলেও প্রকৃত পক্ষে তাঁরা ওলন্দাজ বংশোদ্ভব। এদের পূর্বপুরুষ কানাডায় এসে বসতি স্থাপন করেন। টমাসের পিতা স্যামুয়েল এডিসন একসময় ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন এবং পরাজিত হয়ে সস্ত্রীক যুক্তরাজ্যের ইরিহ্রদের তীরে ওহিওর অন্তর্গত মিলানে এসে বসতি স্থাপন করেন।

বাল্যে এডিসনের প্রকৃতি ছিল অদ্ভুত। তাঁর 'কেন'র উত্তর দিতে পিতাকে অনেক সময় বিব্রত হ'তে হয়েছে। মুরগী ডিমে তা' দিচ্ছে দেখে বালক এডিসন মুরগীর ন্যায় ডিমে তা' দিতে বসলেন, তাঁর ধারণা মুরগীর মত যে-কেহ ডিমে তা' দিলে ডিম থেকে মুরগীর বাচ্চা বের হবে। মৌমাছির তত্ত্ব অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাদের হুলের জ্বালায় এডিসনকে অস্থির হ'তে হয়েছে। এডিসনের প্রশ্নবাণে কেহই রেহাই পেতেন না। স্বভাবতঃ দুর্বল হলেও তাঁর প্রকৃতি ছিল শান্ত। জিজ্ঞাসু বালক এডিসনের বাল্যের কার্যকলাপ তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করে। 'কেন'র উত্তর পাওয়ার চেষ্টায় তাঁর জীবন কতবার বিপন্ন হয়েছে; কিন্তু তিনি সে চেষ্টায় বিরত হননি।

মিলানে রেলপথ হওয়ায় স্যামুয়েলের ব্যবসার ক্ষতি হয়। তাই স্যামুয়েল মিচিগানের কাছে পোর্ট হিউরণে চলে এলেন। এ সময়ে আলভার বয়স মাত্র সাত বৎসর। আল্‌ভার আদরের নাম ছিল 'অ্যাল'। এখানে মাইকেল ওট্‌স্ নামে একটি বালক তাঁর সঙ্গী হ'ল। তার সঙ্গে শাকসব্জী বোঝাই ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ফিরি করে এক বছরে অ্যাল দেড়শ পাউণ্ড পর্যন্ত উপার্জন করলেন।

কিন্তু জগৎ-কল্যাণে যাঁর জন্ম, তাঁর এ সামান্য শাকসব্জীর ব্যবসায়ে রত থাকলে চলে না! সেজন্য মাত্র দশ এগার বৎসর বয়সে তাঁর রসায়ন-শাস্ত্রে অনুরাগ দেখা যায়। পোর্ট হিউরণের বাড়ীর একটি কুঠরীতে তাঁর গবেষণাগার স্থাপিত হ'ল। শিশি-বোতল আর নানাবিধ রাসায়নিক পদার্থে কুঠরী

বোঝাই। সব শিশির গায়েই 'বিষ' লেবেল লাগান। পরীক্ষা আরম্ভ হল। বেলুন গ্যাস ভর্তি হ'য়ে যদি আকাশে উঠতে পারে, মানুষই বা পারবে না কেন? যেমন চিন্তা অমনি কাজ। সামনে ছিল বন্ধু মাইকেল ওট্‌স্। খাওয়ান হ'ল তাঁকে খানিকটা গ্যাস উৎপাদক সিড্‌লিজ পাউডার, যা বিরেচক ঔষধরূপে ডাক্তার বাবুরা ব্যবহার করেন। বেচারা ওট্‌স্! আকাশে উঠবার তার কোন লক্ষণই নেই, কিন্তু পেটের যন্ত্রনায় সে অস্থির। বাধ্য হয়ে পিতা স্যামুয়েল বেত মেরে পুত্রের জ্ঞান পিপাসার নিবৃত্তি করলেন।

এডিসনের ব্যবসা বুদ্ধিও মন্দ ছিল না। এ সময় পোর্ট হিউরণ থেকে ডেট্রয়েট পর্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হ'ল। এতে তাঁদের শাকসব্জী ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ডেট্রয়েট থেকে মাল আনারও ব্যবস্থা করতে হ'ল। যাতায়াতের খরচা তোলবার জন্যে এডিসন ট্রেনে "ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস" নামক সংবাদপত্র বিক্রয় করতে আরম্ভ করলেন। আবার ব্যবসায়ের ফাঁকে যেটুকু সময় পেতেন সে সময়ে ডেট্রয়েটের সাধারণ পাঠাগারে অধ্যয়নে রত থাকতেন। ষ্টেশন থেকে বাড়ী ফেরবার সময়টুকু বাঁচাবার জন্যে তিনি রেলরাস্তার পাশে প্রচুর বালি ফেলে রাখতেন। ট্রেন সেখানে এলে তিনি লাফিয়ে পড়তেন আর তাঁর বন্ধু ওট্‌স্ তাঁকে ঘোড়ার গাড়ী করে বাড়ী পৌঁছে দিতেন।

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি একটি ছোট ছাপাখানা কিনে তাকে ট্রেনের কামরায় বসালেন, আর নিজেই The Weekly Herald নামে ট্রেনের কামরায় সর্বপ্রথম সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তাঁদের ব্যবসার মালপত্র ট্রেনের যে-কামরায় থাকত সংবাদপত্রের অফিসও ছিল সেই কামরাতেই। এডিসন নিজেই সেই সংবাদপত্রের সম্পাদক থেকে বিক্রেতা পর্যন্ত সব কিছু। ইতিমধ্যে সেই কামরায় তাঁর ছোট ল্যাবরেটরীও স্থানান্তরিত হয়েছিল। অ্যালের একাগ্রতা, কর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণে আকৃষ্ট হ'য়ে রেলের কর্মচারীরাও তাঁকে ভালবাসতেন, আর সর্বরকমে তাঁকে সাহায্য করতেন।

এইভাবে কিছুদিন গত হলে, তাঁর বয়স যখন পনের, সে সময় একদিন ট্রেন লেট হ'য়ে যায়। চালক জোরে গাড়ী চালাতে ঝাঁকুনির জন্যে অ্যালের ল্যাবরেটরীতে রক্ষিত ফসফরাসের শিশি উল্টিয়ে গাড়ীর মেঝেয় অগ্নিকাণ্ড বাধিয়ে দিলে। এডিসন আগুন নেবাবার বহু চেষ্টা করলেন; কিন্তু আগুন ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করে চালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। চালক গাড়ী থামিয়ে আগুন নেবাবার ব্যবস্থা করলেন। তারপর ছাপাখানা, তরিতরকারী, ল্যাবরেটরীর ঔষধ প্রভৃতি এডিসনের যা' কিছু সব গাড়ীর বাইরে ফেলে দিয়ে তাঁর কানে মারলেন এক ঘুসি। ফলে এডিসন হলেন চির-বধির আর তাঁর প্রথম ছাপাখানা ও ল্যাবরেটরীর হ'ল পরিসমাপ্তি। উক্ত দুর্ঘটনার কিছুদিন পরে তিনি চেষ্টা করলেন টেলিগ্রাফী শিখবার। সুযোগও মিলে গেল। তাঁর বন্ধু ম্যাকেঞ্জী ছিলেন কোন রেল ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ-কর্মী। একদিন সেই বন্ধু-কন্যাকে এডিসন চলন্ত গাড়ীর সামনে থেকে নিজের প্রাণ সংশয় করে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল হ'তে বাঁচালেন। এর প্রতিদানে ম্যাকেঞ্জী এডিসনকে টেলিগ্রাফের ব্যবহার ও তার সাংকেতিক শব্দ (Morse Code) শিখান। অতি শীঘ্র এই কাজে দক্ষতা লাভ করে এডিসন রেলে টেলিগ্রাফ অপারেটরের একটি চাকুরী পেলেন। মাত্র পনেরো বৎসর বয়সে এডিসনের জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হলো।

টেলিগ্রাফ অপারেটরের কাজেও আমরা এত অল্প বয়সেই এডিসনের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাই। এই কার্য উপলক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু স্থানে তাঁকে যেতে হয়েছে। তাঁর কাজের সময় ছিল রাত্রিকাল, আর দিনের বেলায় তিনি নিজের নানা পরীক্ষা কার্যে ব্যস্ত থাকতেন। রাত্রিতে তাঁর অন্যতম কর্তব্য ছিল সাংকেতিক শব্দের দ্বারা প্রতি ঘণ্টায় জেনে নেওয়া যে, কর্মচারীরা সব জেগে

আছেন কি না। এর জন্যে এডিসনকেও জেগে থাকতে হ'ত। তিনি এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করলেন যার দ্বারা কর্মচারীদের ফাঁকী ধরা পড়ত, আর তিনি নিজে ঘুমাতেন। কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর এ কৌশলের তারিফ হলেও তিনি পেলেন ভর্ৎসনা। এই সময় এডিসন সঠিকভাবে ভোট গণনার জন্যে একটি যন্ত্র এবং রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা ভীষণ বিস্ফোরক গান-কটন আবিষ্কার করলেন। অফিস ঘরে টেবিলের উপর রক্ষিত খাদ্যদ্রব্য আরসুলার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যে টেবিলের চারিদিকে টিনের পাতের বেষ্টনী দিয়ে তাকে বৈদ্যুতিক ব্যাটারীর সঙ্গে যুক্ত করলেন। আরসুলা ঐ টিনের পাত অতিক্রম করতে গেলেই বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার ফলে মরে যেত। নানা বিষয়ে মনঃসংযোগ করেও তিনি টেলিগ্রাফীর কাজে এরূপ দক্ষতা লাভ করেন যে, সে সময়ের তিনি একজন বিখ্যাত টেলিগ্রাফার বলে খ্যাতি অর্জন করেন।

এইভাবে কিছুদিন গত হবার পর বোষ্টনে থাকার সময় তিনি কয়েকটি বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কার করেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে টেলিগ্রাফীর দ্বিত্ব প্রণালী অর্থাৎ একই তারে সংবাদ আদান-প্রদানের পদ্ধতি। কিন্তু এই আবিষ্কার তখন জনসমাজে বিশেষ আদর পায়নি। পরে তিনি নিউইয়র্কে থাকার সময় তিন বৎসরের কঠিন পরিশ্রমে ইহাকে চতুর্গুণ এবং বহুগুণ প্রণালীতে পরিণত করেন। ইহাতে টেলিগ্রাফ কোম্পানীর তার বসাবার খরচ বহু পরিমাণ বেঁচে গেলেও এডিসন বিশেষ লাভবান হতে পারেননি। কারণ সরল বিশ্বাসে যে-লোকটির হাতে এই যন্ত্রের এবং স্বয়ংক্রিয় টেলিগ্রাফ যন্ত্রের স্বত্ব দেন, সে লোকটি এডিসনকে কিছুই দেয়নি। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের এক শুভ প্রভাতে ভাগ্যান্বেষী এডিসন নৌকাযোগে কপর্দকশূন্য অবস্থায় এসে পৌছালেন নিউইয়র্ক মহানগরীতে। রাস্তায় রাস্তায় সমস্ত দিন ঘুরে, বিনামূল্যে এক কাপ চা খেয়ে সন্ধ্যার সময় তিনি এক টেলিগ্রাফ অপারেটরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁর কাছে এক ডলার (দু'টাকা আট আনা) ধার নিলেন। রাত্রি-যাপনের জন্যে তিনি গোল্ড ইণ্ডিকেটর কোম্পানীর যন্ত্রপাতিপূর্ণ একটি ঘরে থাকার অনুমতি পেলেন। সে-সময় যুক্তরাষ্ট্রে গৃহ-যুদ্ধের অবসানে আর নূতন সোনার খনি আবিষ্কারে আর্থিক-জগতে বিপর্যয় উপস্থিত। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাজার দরের পরিবর্তন হচ্ছে। নিউইয়র্কের ষ্টক-এক্সচেঞ্জ, ওয়াল ষ্ট্রীটে এসব সংবাদ জানবার জন্যে দালালরা পরস্পরের মধ্যে বিশেষ একরকমের টেলিগ্রাফ যন্ত্র ব্যবহার করতেন। তার পরিচালনার ভার ছিল ঐ গোল্ড ইণ্ডিকেটর কোম্পানীর উপর। কোন এক দুর্ঘটনায় প্রেরক যন্ত্রটি বন্ধ হয়ে গেল; ফলে সব গ্রাহক-যন্ত্রই নিস্তব্ধ।

এডিসন মাত্র তিন দিন তখন নিউইয়র্কে এসেছেন। কোম্পানীর কর্মচারীরা একে একে সকলে বিফল মনোরথ হ'লে বালক এডিসন সাহসে নির্ভর করে প্রধান কর্মকর্তার কাছে গেলেন, কলটি সারাবার অনুমতি প্রার্থনা করতে। দু'ঘণ্টার মধ্যে কলটি চালু হ'ল। গুণমুগ্ধ কর্মকর্তা মাসিক তিনশত ডলার বেতনে এডিসনকে সেই কারখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত করলেন। সে-সময়ে এডিসনের বয়স মাত্র বাইশ বৎসর।

এই কোম্পানীর অধীনে অতি অল্পদিনের মধ্যে এডিসন একটার পর একটা নূতন আবিষ্কারের দ্বারা টেলিগ্রাফ গ্রাহক-যন্ত্রের বহু উন্নতি সাধন করেন এবং ৪০,০০০ ডলার পুরস্কার লাভ করেন। নিউ জার্সিতে তখন তিনি এই অর্থের দ্বারা নিজস্ব একটি পরীক্ষাগার স্থাপন করে' তাতে প্রায় ২৫০ জন কর্মচারী নিযুক্ত করলেন। টেলিগ্রাফ গ্রাহক-যন্ত্রের তিনি এমন উন্নতি সাধন করেন যে, মিনিটে তিন হাজার শব্দ স্বয়ংক্রিয়-যন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ হবে। পূর্বে আবিষ্কৃত শতাধিক যন্ত্রের তিনি কয়েকবৎসরে বহু উন্নতি সাধন করেন। এ সকল কার্যের দ্বারা তাঁর বহু অর্থাগমের সুবিধা হ'ল। উদ্ভাবনী শক্তি তাঁর এত

তীব্র ছিল যে, তিনি এই সময়েই টাইপরাইটার যন্ত্রের আবিষ্কারেও সহায়তা করেন।

মাত্র পাঁচ ছয় বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে এডিসনের পূর্ব অবস্থার পরিবর্তন হল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে নিউইয়র্কের নিকটবর্তী মেণ্টোপার্ক নামক স্থানে তিনি একটি বিরাট কারখানা স্থাপন করলেন। এইখানেই তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র হ'ল। এই কারখানাতেই তিনি গ্র্যাহাম বেল আবিষ্কৃত টেলিফোন যন্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। গ্র্যাহাম বেলের প্রেরক-যন্ত্রের সাহায্যে প্রেরিত শব্দ বেশ ভালভাবে শোনা যেত না। কিন্তু এডিসন তাতে অঙ্গার-কণা ব্যবহার করে যন্ত্রটির এমন উন্নতি সাধন করলেন যে, শব্দ স্পষ্ট ও জোর হল। এখনও সর্বত্র টেলিফোনে এই প্রণালী অনুসৃত হয়। ওয়েষ্টার্ণ ইউনিয়ন টেলিগ্রাফ কোম্পানীর নিকট উন্নত ধরণের এই টেলিফোন যন্ত্র বিক্রয় করে' তিনি এক লক্ষ ডলার পেলেন। মেণ্টোপার্কের এই কারখানাতেই তিনি গ্রামোফোন, ইলেকট্রিক বাল্ব, মাইক্রোফোন প্রভৃতি যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

এডিসনের চিন্তাধারা তৎকালীন বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারা হইতে ভিন্নমুখী ছিল। তাঁরা প্রথমে সূত্র আবিষ্কারে মনোনিবেশ করতেন এবং পরে সেই আবিষ্কৃত সূত্র কি ভাবে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত করা যায় তারই উপায় অনুসন্ধান করতেন। কিন্তু এডিসন চিন্তা করতেন—কি তাঁর সম্পাদ্য বিষয়, আর কিভাবে তার সমাধান করলে মানুষের সুখ-সুবিধা বাড়ে। এই নূতন ধারায় চিন্তা করে তিনি যেসব বৈজ্ঞানিক-তথ্যের সন্ধান এবং তার মীমাংসা করেছেন তাতে আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে।

এডিসন. একদিন তাঁর মেণ্টোপার্কের কারখানায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন যন্ত্রে কাজ করতে করতে লক্ষ্য করলেন যে, কথা কওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহক-যন্ত্রের ধাতব পাতটি কাঁপছে। এ-ঘটনা তাঁর অজানা নয়; কিন্তু যেই ধাতব পাতের ঐ কম্পন লক্ষ্য করা, অমনি তাঁর মতলব হল যে, কোন উপায়ে ঐ ধাতব পাতকে যদি পুনরায় ঐ একই ভাবে কাঁপান যায় তবে কথার পুনরাবৃত্তি হবে। অবশ্য তিনি বেশ জানতেন যে, কি-ভাবে টেলিফোন যন্ত্রে শব্দ-বহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সমস্ত রাত্রি চিন্তা ক'রে তিনি এক উপায় স্থির করেন এবং তাঁর নিপুণ কর্মী ক্রুসিকে যন্ত্রটি নির্মাণ করতে দেন। ক্রুসি যখন জানতে পারলেন যে, নক্সা অনুযায়ী তৈরী হলে যন্ত্রটি কথা কইবে, তখন সে মনে করেছিল যে, তার প্রভু তার সঙ্গে তামাসা করছেন। দু'দিন পরে ক্রুসি অবাক হয়ে দেখলে যে, তারই তৈরী যন্ত্রটি সত্যই কথা কয়। যন্ত্রটির গঠন প্রণালী এত সরল যে, দেখে বিশ্বাস করা কঠিন যে, এ-যন্ত্র আবার কথা কইবে। কারখানার কর্মী আর বৈজ্ঞানিকগণ চারদিকে ভীড় করে দাঁড়িয়েছেন আর এডিসন যন্ত্রটির সামনে মুখ রেখে বলছেন :—

"Mary had a little lamb,
Its fleece was white as snow;
And everywhere that Mary went
The lamb was sure to go."

সঙ্গে সঙ্গে সিলিণ্ডারে জড়ান টিনের পাতের উপর একটি পিনের দ্বারা শব্দ-তরঙ্গের হ্রস্ব, দীর্ঘ দাগ ফুটে উঠল। যন্ত্রটি পুনরায় ঘুরিয়ে টিনের পাতের উপর দিয়ে পিনটি যেতেই আবার সেই **Mary had a little lamb** এর পুনরাবৃত্তি আরম্ভ হয়ে গেল। এইভাবে ১২ই আগষ্ট, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ফনোগ্রাফ (যা' এখন অনেক পরিবর্তিত হয়ে গ্রামোফোন হয়েছে) আবিষ্কৃত হল। হাজার হাজার লোক ও বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ এসে মেণ্টোপার্কে জমা হলেন, এই নূতন যন্ত্রটি দেখবার জন্যে। যন্ত্রে মানুষের মত কথা কয় একথা কেউ বিশ্বাস করতেই চায় না। রাশিয়ায় যিনি এ-যন্ত্র নিয়ে গেলেন তাঁর তো জেলই হয়ে গেল। অবশেষে এডিসনের ডাক পড়ল রাজধানী ওয়াশিংটনে, যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিকে ঐ যন্ত্রটি দেখাবার জন্যে।

বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে যে আলো জ্বালান যায় এ-তথ্য এডিসনের পূর্বে আবিষ্কৃত হলেও, এডিসনই বৈদ্যুতিক আলোকের বর্তমান রূপ দান করেন। নানা পরীক্ষা করে তিনি দেখালেন যে, একমাত্র প্ল্যাটিনাম বা ইরিডিয়াম নামক মূল্যবান ধাতুর তারই, বৈদ্যুতিক প্রবাহে যে অত্যধিক তাপ উৎপন্ন হয় তা' সহ্য করতে সক্ষম। কিন্তু তাতে দরিদ্রের পক্ষে বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহারের সুযোগ থাকে না। এডিসনের সতত লক্ষ্য ছিল যাতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করা যায়। তিনি আরও পরীক্ষা করে দেখালেন যে, বায়ু শূন্য কাঁচের আধারে কার্পাস সূতাকে অঙ্গারে পরিণত করলে যে অঙ্গারীভূত সূত্র পাওয়া যায় তা' ৪৫ ঘণ্টা বৈদ্যুতিক আলো দান করতে সক্ষম। কিন্তু দেখা গেল, বাঁশের তন্তু সর্বাপেক্ষা কার্যকরী। ইহা ৬০০ ঘণ্টা আলো দিতে পারে। এইরূপে এডিসন ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ২১ শে অক্টোবর ইন্‌ক্যান্‌ডেসেণ্ট ল্যাম্প আবিষ্কার করেন। যথাযোগ্য তন্তু আবিষ্কারের জন্য, শোনা যায় তিনি দেশ দেশান্তরে লোক পাঠিয়ে বহু সহস্র ডলার খরচ করেছিলেন। ফনোগ্রাফের ন্যায় বৈদ্যুতিক আলো দেখবার জন্যে মেণ্টোপার্কে আবার হাজার হাজার লোক সমাগত হতে লাগল। এই সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত ষ্টেশন কর্মচারী ম্যাকেঞ্জীর নামও স্মরণীয়, কারণ তিনি এডিসনকে এ-বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেন। আশ্চর্যের বিষয়, এ সময়ে সোয়ান নামক ইংলণ্ডের এক বৈজ্ঞানিকও ইনক্যান্‌ডেসেণ্ট ল্যাম্প আবিষ্কার করেন। এডিসন এবং সোয়ান উভয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে মিত্রভাবে এডিসোয়ান নামে তাঁদের আরও উন্নত ধরণের বৈদ্যুতিক আলো বাজারে প্রচলিত করেন।

বৈদ্যুতিক আলোকের উন্নতি করতে হলে যে, উন্নত ধরণের বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদক যন্ত্রের আবশ্যক একথা তিনি বুঝেছিলেন। তাই তিনি নতুন ধরণের জেনারেটর ও মোটর নির্মাণে মনঃসংযোগ করেন এবং অচিরেই কৃতকার্য হন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে সাধারণভাবে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার প্রচলিত হয়।

এডিসন যে-সমস্ত আবিষ্কার করে' যশস্বী হয়েছেন, তার তালিকা দিতে গেলে একখণ্ড বিরাট পুস্তকের আবশ্যক। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে তিনি টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক বাতি, ষ্টোরেজ ব্যাটারী, গ্রামোফোন, চলচ্চিত্র প্রভৃতি আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দবিধানকারী নানা যন্ত্রের আবিষ্কার ও পূর্ব-আবিষ্কৃত নানা যন্ত্রের উন্নতি সাধন করে প্রায় ২৫০০০ পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। তাঁর আবিষ্কৃত পন্থায় যন্ত্র-বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসারের দ্বারা লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকার্জনের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

জাগত অবস্থায় এডিসন এক মুহূর্তও নিশ্চিন্ত ভাবে অতিবাহিত করতেন না। হঠাৎ এক সময় তাঁর মনে হ'ল, যদি গতিশীল কোন পদার্থের পর পর দ্রুত ফটো তোলা যায় এবং সেই ফটোগুলি পূর্বগতিতে ম্যাজিক লণ্ঠনের ভিতর দিয়ে পর্দায় ফেলা যায়, তা'হলে পদার্থের গতিশীল ছবি দেখা যাবে। যেমনি এই চিন্তা মনে উদয় হওয়া, অমনি কাজে লেগে গেলেন। ফলে আমরা পেলাম চলচ্চিত্র। কিন্তু এডিসন এতে সন্তুষ্ট হলেন না, তিনি চাইলেন নির্বাক ছবির মুখে ভাষা দিতে। তাঁর চেষ্টা সফল হল ১৯১২ খৃষ্টাব্দে সবাক চিত্রের যন্ত্র-রূপে।

এ যেন যাদুকরের যাদুদণ্ড। যা' মনে করছেন ইন্দ্রজালের প্রভাবে তাই যেন সফল হচ্ছে। বিজ্ঞান-জগতে এডিসনের এ-সকল অপূর্ব দান থাকা সত্ত্বেও কেন যে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাঁকে নোবেল পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করে সুইডেনের গুস্তাভকে সে পুরস্কার দেওয়া হল, তা' আজও রহস্যাবৃত। এই অনন্যকর্মা মনীষী ৮৪ বৎসর বয়সে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে নশ্বর জগত ত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব পর্যন্তও তিনি এরূপ উৎসাহী ও

কর্মঠ ছিলেন যে, তাঁর যুবক সহকারীরা বিশ্রামের কথা ভাবতেই পারতেন না।

এডিসনের ব্যক্তিগত জীবন আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, আহার নিদ্রার তাঁর কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। ঘুমেরও কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না—ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রিত হতেন। কোনদিন চার পাঁচ ঘণ্টা আবার কোনদিন বা একবারও ঘুমোতেন না। খাদ্যেরও কোন বিশেষ বিচার ছিল না, তবে তিনি সিগারেট বা মদ খেতেন না। সময়ের সদ্ব্যবহার করতে এমন অভ্যস্ত ছিলেন যে, কখনও সময়ের অভাব অনুভব করতেন না। সময় যেন তাঁর অনুগামী ছিল। এডিসনের হৃদয় ছিল "বজ্রাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি।" একবার সেই ম্যাকেঞ্জী চাকুরীর জন্য তাঁর দ্বারস্থ হলে এডিসন তাঁকে চাকুরী না দিয়ে, ফায়ার এলার্ম আবিষ্কার করতে সাহায্য করে ৫০০০ ডলার পুরস্কার লাভের ব্যবস্থা করে দেন এবং নিজের ল্যাবরেটারীতে কাজ করতে নিয়ে তাঁর জীবিকার্জনের সুযোগ করে দেন। তিনি অক্ষমতাকে আদৌ পছন্দ করতে পারতেন না। একমাত্র এডিসনই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে সভ্যজগতে যে প্রতিষ্ঠা দিয়ে যান, তা' আর কোন বৈজ্ঞানিকের দ্বারা সম্ভব হয়নি।

"বিজ্ঞান-চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিষগুলি কেবলি ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতায় জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারি অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হ'য়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।"

* * * *

"ইংরেজি ভাষায় অবগুণ্ঠিত বিদ্যা স্বভাবতই আমাদের মনের সহবর্তিনী হয়ে চলতে পারে না। সেই আমরা যে পরিমাণে শিক্ষা পাই সে পরিমাণে বিদ্যা পাইনে।"

* * * *

"গল্প কবিতা নাটক নিয়ে বাংলা সাহিত্যের পনেরো আনা আয়োজন। অর্থাৎ, ভোজের আয়োজন, শক্তির আয়োজন নয়।"

ফুস্‌ফুসের যক্ষ্মায় সূর্যরশ্মি-চিকিৎসা

লেঃ কর্ণেল সুধীন্দ্রনাথ সিংহ

ফুস্‌ফুসে যক্ষ্মা হয় ইহা সকলেই জানেন; কিন্তু অনেকেই—এমনকি শিক্ষিতদের ভিতরেও—জানেন না যে, শরীরের চামড়া, হাড়, সন্ধি, গ্রন্থি, কিড্‌নি, অন্ত্র প্রভৃতিও যক্ষ্মা দ্বারা আক্রান্ত হ'তে পারে এবং আমাদের দেশে এরূপ রোগীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। অনেক ক্ষেত্রে সন্ধি বা হাড়ের যক্ষ্মাকে "বাত" বলে মনে করা হয় এবং অন্ত্রের যক্ষ্মা "আমাশয়" বা "গ্রহণী" বলে চিকিৎসা করা হয়। সাধারণের এ অজ্ঞতার জন্য চিকিৎসকেরাও কি কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী ন'ন? যারা সভাসমিতি করে যক্ষ্মা নিবারণ করার চেষ্টা করে আসছেন, লোকের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস দূর করার জন্য তারা বিশেষ কোন উৎসাহ দেখিয়েছেন বা দেখাচ্ছেন এরূপ মনে হয় না। লোকের অজ্ঞতা দূর ক'রে তাদের বলতে হবে যে, শরীরের যে-কোন অংশেই যক্ষ্মার আক্রমণ হ'তে পারে। ফুস্‌ফুস্ ছাড়া শরীরের অন্য অংশে যক্ষ্মা হয়েছে এরূপ রোগীর সংখ্যা আমাদের দেশে নগণ্য—চিকিৎসকদের মধ্যেও এরূপ ধারণা আছে। সুতরাং তাঁরা এ-নিয়ে মাথা ঘামান নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। এরূপ ধারণা নিয়ে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হ'লে ঠিক রোগ ধরা শক্ত বই কি!

যক্ষ্মার আক্রমণ ফুস্‌ফুসের বাইরে শরীরের অন্য যে-কোন অংশে দেখা দিলে তাকে সাধারণতঃ অস্ত্রোপচার-সাপেক্ষ যক্ষ্মা বলা হয়। চিকিৎসকগণ মনে করতেন যে, যক্ষ্মা অঙ্গবিশেষের ব্যাধি এবং রোগের বীজাণু শুধু আক্রান্ত অংশেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং আক্রান্ত অংশ চেঁছে ফেললে বা যেখানে সম্ভব অস্ত্রোপচার দ্বারা বাদ দিলে, দেহ ব্যাধি মুক্ত হবে। এ-থেকেই এ-নামের উদ্ভব এবং আজও এ-নাম চিকিৎসা-জগতে প্রচলিত আছে। বহু কাল ধরে এ-রোগীদের চিকিৎসা এই পদ্ধতিতে চলে এসেছে। কিন্তু বিজ্ঞানীর মন তা'তে সন্তুষ্ট হতে পারে না। কেননা, সে দেখেছে যে, এ চিকিৎসায় রোগের সাময়িক উপশম হলেও বেশী দিন যেতে না যেতেই শরীরের অপর এক অংশে রোগ দেখা দিয়েছে এবং বারবার অস্ত্রোপচার করেও রোগীকে নীরোগ করা সম্ভব হয় নাই। যা'হোক, চিকিৎসকরা ক্রমে বুঝতে পারলেন যে, বিশেষ কোন এক অংশে ব্যাধির প্রকাশ হলেও এর বীজাণু শরীরময় ছড়িয়ে থাকে। যে-কোন সময় যে-কোন স্থানে আক্রমণ সুরু হ'তে পারে। অস্ত্রোপচার দ্বারা একের পর এক অঙ্গ বাদ দেওয়া চলে, কিন্তু তা'তে রোগ নির্মূল হ'লো এমন কথা বলা যায় না। এই অভিজ্ঞতা থেকেই ফুস্‌ফুসেতর যক্ষ্মার চিকিৎসা প্রণালীর আমূল পরিবর্তন এবং অস্ত্রোপচার চিকিৎসার স্থলে সূর্যরশ্মি চিকিৎসার প্রবর্তনের সূত্রপাত হয়। পাশ্চাত্যে এখন এই প্রণালীই এ-জাতীয় যক্ষ্মার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বলে মনে করা হয়। সূর্যরশ্মির অভাব না থাকলেও এই পদ্ধতির প্রচলন এ-দেশে প্রায় নেই।

ব্যাধি মাত্রই যন্ত্রণাদায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু যন্ত্রণায় এই ব্যাধি সকলকে ছাড়িয়ে গেছে। সূচনাতে রোগ সাধারণতঃ ধরা পড়ে না। রাত্রির অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে চোর গৃহস্থের ঘরে সিঁদ কাটে, গৃহস্বামী টের পায় না। তেমনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে যক্ষ্মাবীজাণু তার আক্রমণ চালায়।

নিশ্বাসনে যখন ধরা পড়ে, তখন সিঁদ কেটে চোর অনেক কিছুই নিয়ে গেছে। তেমনি আক্রান্ত অংশের অনেকখানি নষ্ট হওয়ার পর সাধারণতঃ রোগ ধরা পড়ে। ফুস্‌ফুস্‌ ছাড়া শরীরের অন্যান্য অংশেও যক্ষ্মা হয়, এ-কথা মনে রেখে ব্যাধির প্রথমাবস্থায় যেসব উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলি ঠিক পর্যবেক্ষণ করলে রোগ চেনা ও চিকিৎসা সহজ-সাধ্য হয়। একথাও মনে রাখা দরকার যে, একই সময়ে ফুস্‌ফুস্‌ এবং শরীরের অন্য যেকোন অংশ আক্রান্ত হ'তে পারে।

রোগের স্থচনায় আক্রান্ত অংশে সামান্য ব্যথা হয়। কখনও কখনও আবার আক্রান্ত অংশ থেকে দূরে অন্য কোন অঙ্গে ব্যথা হ'তে পারে। প্রধানতঃ নড়াচড়া বা চলাফের'র সময় ব্যথা বোধ হয়। রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে ব্যথা প্রায় সব সময়েই থাকে। ক্রমে ব্যথা এমন তীব্র হয় যে; সামান্য মাত্র নড়াচড়াও অসহনীয় যন্ত্রণাদায়ক হয়। যন্ত্রণায় শান্তিতে ঘুমানো রোগীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। এরপর আস্তে আস্তে আক্রান্ত অঙ্গের বিকৃতি দেখা দেয়। অঙ্গের স্বাভাবিক গঠন-সামঞ্জস্য বজায় থাকলে নড়াচড়া হবেই এবং তা'তে ব্যথা বাড়ে। তাই আক্রান্ত অঙ্গ একটু একটু করে এমন অবস্থানভঙ্গী অবলম্বন করে যার ফলে নড়াচড়া খুবই কমে যায়, আক্রান্ত অংশ বিশ্রাম পায়। এটা শরীরের আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রচেষ্টা। কিন্তু সময়মত প্রতিকারের ব্যবস্থা না করলে বিকৃত অবস্থা স্থায়ী হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় বাইরে থেকে পচনোদ্দীপক জীবাণু যক্ষ্মার "ঘা" আক্রমণ করে। তার ফলে যে পুঁজ হয় তা' বের হ'তে থাকে। সাধারণতঃ এসব নালীপথ সহজে বন্ধ করা যায় না এবং সেই জন্যই মূলব্যাধি দুরারোগ্য হ'য়ে পড়ে। অনেক স্থলে এ-অবস্থা অস্ত্রোপচারেরই পরিণতি!

ফুস্‌ফুসের যক্ষ্মার চিকিৎসায় যে পরিমাণ আগ্রহ দেখান হয় ও যত্ন নেওয়া হয় শরীরের অন্য অংশের যক্ষ্মায় তা' হয় না। এর প্রধান কারণ ফুস্‌ফুসের যক্ষ্মায় প্রাণহানির আশঙ্কা বেশী। পক্ষান্তরে অন্য প্রকারের যক্ষ্মায় সে অশঙ্কা কম। ফুস্‌ফুসের যক্ষ্মার চিকিৎসার সামান্য ব্যবস্থা আমাদের দেশে আছে বটে, কিন্তু তা' প্রয়োজনের অনুপাতে খুবই কম এবং খরচ-সাপেক্ষ ব'লে সাধারণের ক্ষমতার বাইরে। কিন্তু অপর জাতীয় যক্ষ্মার আধুনিক চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা কোন হাসপাতালে নাই। যক্ষ্মা হাসপাতাল এবং সেনাটেরিয়ামে এসব রোগীর স্থান হয় না। অন্যান্য হাসপাতালেও এদের 'প্রবেশ নিষেধ'। অতএব, অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, নিজগৃহে চিকিৎসার ব্যবস্থার সঙ্গতি যাদের নেই দু'টী মাত্র পথ তাদের জন্য খোলা আছে—বিনা চিকিৎসা বা কু-চিকিৎসায় মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া। অথবা কোন রকমে মৃত্যুকে এড়াতে পারলে পঙ্গু হ'য়ে বেঁচে থাকা। পথে ঘাটে মাঝে মাঝে "ন্যুব্জ দেহ কুব্জ পৃষ্ঠ" বা খোঁড়া লোক চোখে পড়ে; এরাই সাধারণতঃ সেই সব রোগী, যারা যক্ষ্মার আক্রমণে মারা না গিয়ে সেরে উঠেছে—কিন্তু বিকলাঙ্গ হ'য়ে।

বর্তমান যুগে চিকিৎসা-জগতে ডাক্তার রোলিয়ার নাম সুবিদিত। 'হেলিওথেরাপি' বা সূর্যরশ্মি-চিকিৎসার প্রবর্তক হিসাবে তিনি সুপরিচিত। ফুস্‌ফুসেতর যক্ষ্মায় এবং নানাবিধ ক্রনিক বা যাপ্যরোগে সূর্যরশ্মি-চিকিৎসা দ্বারা রোগীকে আরোগ্য করার কৃতিত্ব তাঁরই।

১৯০৩ খৃঃ অব্দে সুইজারল্যাণ্ডের আল্পস্‌ পর্বতে অবস্থিত লেজাঁ নামক একটী গণ্ডগ্রামে ডাক্তার রোলিয়া এই চিকিৎসা আরম্ভ করেন। গোড়ার দিকে প্রধানতঃ ফুস্‌ফুসেতর যক্ষ্মারোগীদের তিনি এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেন। অল্পদিনের ভিতর এই চিকিৎসার খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন দেশ হ'তে রোগীরা লেজাঁয় রোলিয়ার চিকিৎসাধীনে আসতে থাকে। হাসপাতালের পর হাসপাতাল সেখানে গড়ে উঠতে লাগলো। দেশ বিদেশ হ'তে রোগীরা সব প্রাণের দায়ে রোলিয়ার

কাছে আসতে সুরু করলো, তাদের রুগ্ন, ভঙ্গুর, পঙ্গু দেহ আবার সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক করবার আশায়। কেননা তারা শুনেছে বা দেখেছে যে তাদেরই মতন অনেকে লেজ্যাঁ হতে ফিরে এসেছে সুস্থ দেহ নিয়ে। বর্তমানে সেখানে রোলিয়ার তত্ত্বাবধানে ৩২টী ক্লিনিকে কমপক্ষে এক হাজার রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। সেখানে ফুসফুসের যক্ষ্মা ও অপর নানাপ্রকার রোগের চিকিৎসা চলছে। এই চিকিৎসা প্রণালীর সঙ্গে 'হাতে কলমে' পরিচিত হবার জন্য বিভিন্ন দেশের চিকিৎসকেরাও লেজ্যাঁয় আসেন। প্রতি বছর লেজ্যাঁয় সূর্যরশ্মি-চিকিৎসা সম্বন্ধে এক বিরাট সম্মেলন হয়। তাতে সমগ্র ইউরোপ থেকে চিকিৎসক ও (চিকিৎসা) বিদ্যার্থীরা সমেবত হয়ে এ-চিকিৎসার ফলাফল আলোচনা করেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে সূর্যরশ্মি চিকিৎসা-কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসায়—রোগের প্রকাশ শরীরের যে-কোন অংশেই হোক না কেন—সাফল্য নির্ভর করে রোগীর সাধারণ প্রতিরোধ-শক্তির উপর। সেই জন্য রোগীর এই শক্তি উদ্দীপিত করা যক্ষ্মা চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ। স্থানিক চিকিৎসার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু সেই সঙ্গে জীবনীশক্তি ও প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে তোলবার চেষ্টা না করে শুধু স্থানিক চিকিৎসাদ্বারা আরোগ্য করার প্রচেষ্টা, গাছের গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার মতন নিষ্ফল হবে। দেখা গেছে যে, ডাক্তার রোলিয়ার প্রবর্তিত চিকিৎসায়, স্থানিক চিকিৎসা ও সাধারণ প্রতিরোধ-শক্তির উদ্দীপনা উভয়ই সন্তোষজনক ভাবে হয়। অস্ত্রোপচার-সাপেক্ষ যক্ষ্মায় সূর্যরশ্মি-চিকিৎসার মুখ্য উদ্দেশ্য :—

১। অনাবৃত চামড়ায় সূর্যরশ্মি প্রয়োগ;

২। রোগাক্রান্ত অংশের গঠন-সামঞ্জস্য ও কর্মশক্তি বজায় রাখার প্রচেষ্টা;

৩। অস্ত্রোপচার ও প্লাষ্টার-আবরণ বর্জন করে যেখানে প্রয়োজন সাধারণ ও হাল্কা ধরণের Splint ব্যবহার করা। এতে আক্রান্ত অংশ বা সমস্ত শরীর আলো, বাতাসের সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত না হয়েও রোগের প্রয়োজনে যান্ত্রিক সাহায্য পায়।

৪। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন।

মার্চমাসের 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত 'স্বাস্থ্য ও সূর্যরশ্মি' নামক প্রবন্ধে মোটামুটি ভাবে বলা হয়েছে, সূর্যরশ্মি কি ভাবে দৈহিক ক্রিয়া প্রভাবান্বিত করে। সূর্যরশ্মি চিকিৎসা কি প্রণালীতে হয় অতি সংক্ষেপে এখানে বলবো।

বিছানায় শোয়া অবস্থায় রোগী শরীরে রোদ লাগাবে এই হল সাধারণ নিয়ম। রোগীর অবস্থা পর্যবেক্ষণের পর রোদের মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। সব রোগে বা রোগীর সকল অবস্থায় একই মাত্রায় রোদ লাগান চলে না। আবার এমন অবস্থাও হতে পারে যখন রোগীকে সরাসরি রোদ দেওয়া চলবে না, দিলে অনিষ্ট হবে। অধিকন্তু যেস্থানে রোদ লাগান হবে সেখানকার আবহাওয়ার মোটা-মুটি হিসাব রাখতে হবে—মাত্রা নির্ধারণ করার সময়।

গোড়ার দিকে অতিশয় সতর্কতার সঙ্গে অল্প মাত্রায় শরীরের নীচের দিক্ থেকে রোদ দেওয়া সুরু হবে। তারপর রোদের প্রতিক্রিয়া এবং রোগীর অবস্থা বুঝে অল্প অল্প করে রোদের মাত্রা বাড়ান হবে এবং আস্তে আস্তে শরীরের উপরের অংশে রোদ লাগতে দেওয়া হবে। রোদের মাত্রা অধিক হলে মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, বমির ভাব, শরীরের তাপ বৃদ্ধি, অক্ষুধা, নিদ্রাল্পতা প্রভৃতি অবাঞ্ছনীয় উপসর্গ দেখা দিতে পারে। কিন্তু আরম্ভে সাবধান হলে এবং সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে চালিয়ে গেলে কোন অনিষ্ট হয় না। ধীরে ধীরে রোগী রোদ সহ্য করে নেয় এবং শরীরের উন্নতি হতে থাকে। মাত্র কয়েকদিন রোদ দেওয়ার পরই ব্যথার তীব্রতা কমে আসে এবং আস্তে আস্তে ব্যথা দূর হয়। ক্রমশঃ রোগী নিজেই বুঝতে পারবে যে, মাসের পর মাস ধরে যে অসহ্য যন্ত্রণায় সে কষ্ট পাচ্ছিল তা' কমতে

সূর্যরশ্মি চিকিৎসার পূর্বের অবস্থা

সূর্যরশ্মি চিকিৎসার পরের অবস্থা

সূর্যরশ্মি চিকিৎসার পূর্বের অবস্থা
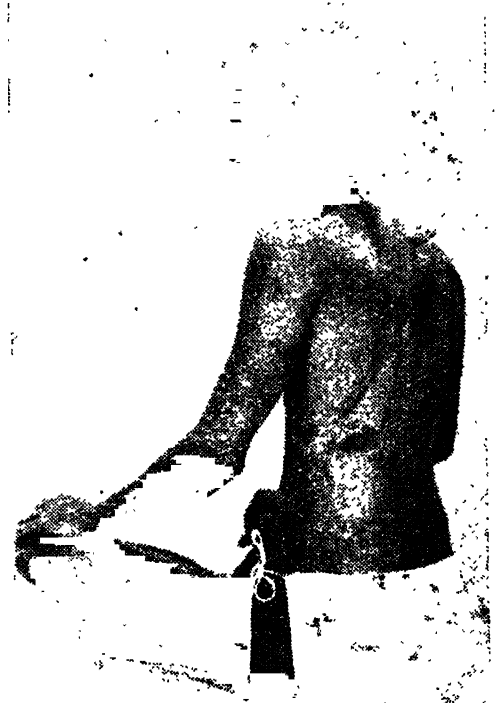
সূর্যরশ্মি চিকিৎসার পরের অবস্থা

আরম্ভ করছে। অতৃপ্ত ঘুমে দেহ তার অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, আবার সে ঘুমিয়ে তৃপ্তি পাচ্ছে। আহারে তার রুচি ছিলনা, তা আবার ফিরে আসছে। এইভাবে সে নিজেই বুঝতে পারবে যে, তার শরীরের উন্নতি হচ্ছে। এ উপলব্ধির সঙ্গে ফিরে আসবে তার মনের স্ফূর্তি। রোগ জয় করা তার পক্ষে সহজ হবে।

অনেকের ধারণা আমাদের দেশের আবহাওয়া সূর্য্যরশ্মি চিকিৎসার অনুকূল নয়। কেবল মাত্র পাহাড়ের উপর—তাও, সুইজারল্যাণ্ডের পাহাড় হওয়া চাই—এ চিকিৎসা সম্ভব। এ ধারণা ভ্রান্ত এবং ভিত্তিহীন। সূর্য্যরশ্মি-চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা বলেন যেখানে রোদ পাওয়া যায় সেখানেই এ চিকিৎসা সম্ভব। এ চিকিৎসায় আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, স্থানীয় আবহাওয়া অনুযায়ী রশ্মি প্রয়োগের সময় ও মাত্রা নির্দ্ধারণ করে দিলে ফল হয়ই। রোলিয়া নিজেও তাই বলেন। সম্ভবপর হ'লে করাই উচিত। কিন্তু গরীব ভারতবাসীর জন্য ব্যবস্থা করতে হবে প্রায় বিনা খরচের চিকিৎসা। আদর্শ অবস্থায় বা আদর্শ আবহাওয়ায় চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'জন ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব? এ মূলকথাটি মনে রেখেই সকলের চলা উচিত।

সূর্য্যরশ্মি চিকিৎসার উপকারীতা সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। এ বিষয়ে এদের যা কিছু জ্ঞান সাধারণতঃ বই পড়েই হয়েছে এবং তার বাইরে বড় একটা যায় নাই। অনেকের আবার পুঁথিগত বিদ্যাও নাই। এদের প্রায় কেহই কোন রোগীকে এ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেন নাই; এবং যারা (হয়তো) সে চেষ্টা করেছেন, চিকিৎসা পদ্ধতির সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে তাদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। নিয়ম মেনে চললে সূর্য্যরশ্মি চিকিৎসায় ফল পাওয়া যাবেই। নতুবা খামখেয়ালী রোদ লাগিয়ে গেলে রোগীর অনিষ্টই হবে। চিকিৎসক এবং রোগী উভয়ের একথা মনে রাখা দরকার। সঙ্গের ছবি দুটো থেকে স্পষ্ট ধারণা হবে, সূর্যরশ্মি চিকিৎসায় কি রকম বিস্ময়কর উন্নতি হয়।

যক্ষ্মা ছাড়া অন্য রোগেও সূর্য্যরশ্মি চিকিৎসা বিশেষ ফলপ্রদ। নানা প্রকার যাপ্য-রোগ যথা, ব্রংকাইটিস্, হাঁপানি, বাতের ব্যারাম, জরায়ু-ঘটিত ব্যারাম, অজীর্ণতা, রক্তশূন্যতা, রিকেট ও হাড়ের পুষ্টির অভাবজনিত বিবিধ ব্যারাম, পোড়া ও অন্যান্য ক্ষত প্রভৃতি এ-চিকিৎসায় আরোগ্য হয়। চিকিৎসকেরা সাধারণতঃ যেসব রোগীকে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বায়ুপরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়ে থাকেন নিয়মিত ও নিয়ন্ত্রিত সূর্য্যরশ্মি প্রয়োগে তাদের সুস্থ ও সবল করা যায় এ আমার নিজেরও অভিজ্ঞতা।

"প্রতি জীবনে দুইটি অংশ আছে। একটি অজর, অমর; তাহাকে বেষ্টন করিয়া নশ্বর দেহ। এই দেহরূপ আবরণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে।

অমর জীববিন্দু প্রতি পুনর্জন্মে নূতন গৃহ বাঁধিয়া লয়। সেই আদিম জীবনের অংশ, বংশপরম্পরা ধরিয়া বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। আজ যে পুষ্পকলিকাটি অকাতরে বৃন্তচ্যুত করিতেছি, ইহার প্রতি অণুতে কোটি বৎসর পূর্ব্বের জীবনোচ্ছ্বাস নিহিত রহিয়াছে।" **আচার্য্য জগদীশ**

—যন্ত্রযুগের-কৃষি—

শ্রীঅশোককুমার রায় চৌধুরী

প্রগতিশীল জগতে যখন সব কিছুরই পরিবর্ত্তন চলছে তখন কৃষি-পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন যে ঘটবে সেটা বিচিত্র নয়। পরিবর্ত্তনের ঢেউ সব দেশে সমান ভাবে আসেনি। প্রাচ্যে, বিশেষভাবে ভারতে কৃষি-পদ্ধতি সেই কারণে পাশ্চাত্য জগতের কৃষি পদ্ধতির বহু পশ্চাতে পড়ে রয়েছে। সেই পরিবর্ত্তনের ঢেউ কেন সমান ভাবে সব দেশে আসেনি তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, আমাদের দেশের অগণিত জনসংখ্যা ও অবনমিত আর্থিক অবস্থা এর মূলে রয়েছে।

প্রাচীনযুগে মানুষের কৃষি পদ্ধতি ছিল অনেক সরল। পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল কম। সেই তুলনায় জমির অভাব ছিল না। জঙ্গল পরিষ্কার করে মাটি কুপিয়ে কোন রকমে জমিকে বীজ বপনের উপযোগী করা হত। তারপর সেই জমিতে বছরের পর বছর চাষ আবাদ চলত। সার প্রয়োগের বালাই ছিল না। জমির উৎপাদিকা শক্তি কমে গেলে সেই জমি পরিত্যাগ করে অন্য জমিতে কাজ আরম্ভ হত। সরল জীবন যাত্রায় আর জমির প্রাচুর্যে অল্প উৎপাদনেই পরিবারের অন্ন সংস্থান হয়ে যেত। অনুরূপ পদ্ধতি এখনও কোন কোন জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে পাহাড়ী ও বুনোদের মধ্যে।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও সভ্যতার বিকাশের ফলে মানুষের চাহিদা গেছে অনেক বেড়ে। অল্প জমি থেকে কি উপায়ে, বেশী উৎপাদন করা যায় তারই চেষ্টা করতে লাগল মানুষ নানা রকমে। ফলে নতুন নতুন চাষ-পদ্ধতির আবিষ্কার হতে লাগল। ভারবাহী গৃহপালিত পশুকে কৃষিকার্যে ব্যবহার করে মানুষ নিজের শ্রমলাঘব করল অনেকখানি। লাঙ্গল, কোদাল, মই, বিদা, কাস্তে প্রভৃতি কৃষি-যন্ত্রের হল আবিভাব। ঐ সকল যন্ত্রগুলির উন্নতি সাধনের চেষ্টা অপ্রতিহত গতিতে চলতে লাগল, উন্নত জাতের বীজ, সার ও উপযুক্ত জলসেচনের হল প্রচলন। পৃথিবীর প্রায় সব সভ্য দেশই এই পর্যন্ত অগ্রসর হবার সুযোগ পেয়েছে।

তারপর এল প্রাচ্যে এবং সেই সঙ্গে আমাদের দেশে এক অন্ধকারের যুগ যে সময় পাশ্চাত্য দেশ গুলি এগিয়ে গেল জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে। সেই জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে শিল্প বানিজ্য ও কৃষি জগতে এসে গেল বিপ্লব। পাশ্চাত্য দেশগুলি এগিয়ে গেল সমৃদ্ধিশালী হয়ে। আমরা রইলাম পেছনে পড়ে, প্রাচীন পদ্ধতিকে আকড়ে—দারিদ্র্যের পদানত হয়ে। পাশ্চাত্য দেশের এই বিপ্লবের ঢেউ যে শুধু তাদের পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে তা' নয় আমাদেরও দোলা দিয়ে গেছে ভীষণভাবে। পাশ্চাত্য দেশের বানিজ্য সম্ভারের বন্যা আমাদের কুটির-শিল্পগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। পরাধীনতার শিকলে আবদ্ধ হয়ে কোন শিল্পই প্রসার লাভ করবার সুযোগ পায়নি। জীবিকার্জনের একটী বিশেষ পথ আমাদের কাছে অবরুদ্ধ হয়ে দেশের জনসমুদ্রের একটি বৃহৎ অংশকে বাধ্য করেছে কৃষিকার্যের দ্বারা জীবিকার্জন করতে। মোট আবাদী জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ। কাজেই অগনিত জনসংখ্যা কৃষিকে জীবনধারণের প্রধান

উপজীবিকা হিসাবে গ্রহণ করার ফলে কৃষিজীবির পক্ষে জমির আয়তন হয়ে পড়েছে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এখন আমাদের দেশে সেই জমির পরিমাণ এত ক্ষুদ্র যে, তাতে না হয় কৃষক পরিবারের অন্নসংস্থান, না হয় পরিবারের কার্যক্ষম লোকদের সারা বছরের কাজের জোগাড়। বেশীর ভাগ কৃষকদের পক্ষেই বেকার সমস্যা প্রচ্ছন্নভাবে রয়ে গেছে। অর্থনৈতিক অবস্থা হয়ে চলেছে নিম্নাভিমুখী। দেশের জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে দেশবাসীর দারিদ্র্য বাড়িয়ে, আর অর্থ নৈতিক অবস্থাকে জটিলতর করে'। শ্রমিক হয়েছে সুলভ—কাজের সংস্থান কম। অল্প পয়সাতেই পাওয়া যায় খাটবার লোক। কৃষক তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত জমিগুলিকে চাষ করে চলেছে সেই মামুলী লাঙ্গল, মই আর কাস্তের সাহায্যে। প্রচুর অবসর থাকার ফলে তাড়াতাড়ি কাজ করবার তাগিদ নেই। প্রয়োজনও নেই তাই আধুনিক শ্রমসঞ্চয়ী কৃষি-যন্ত্রের। অন্যান্য কারণে যদি বা আধুনিক ও উন্নত কৃষিযন্ত্র কেনার প্রয়োজন হয় চাষীর তা' কেনার উপায় নেই মূলধনের অভাবে। আমরা তাই এখনো রয়েছি প্রাচীন-পন্থী, বিশেষ করে কৃষিকার্যের ব্যবস্থায়।

বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে মোট জনসংখ্যার অনুপাতে কৃষিজীবিদের সংখ্যা গেছে কমে। ফলে, এক এক চাষী অনেক পরিমাণ জমি আবাদ করার সুযোগ পেয়েছে। শ্রমিক হয়েছে দুর্লভ, আর মজুরী গেছে বেড়ে। তার ফলে জনপ্রতি কার্য-ক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়েছে। সেই প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে বিজ্ঞানের সাহায্যে বিভিন্ন যন্ত্রের হয়েছে উদ্ভাবন। যার ফলে একজনই অল্পায়াসে বহুলোকের কাজ করার ক্ষমতা লাভ করেছে। যন্ত্র-যুগের কৃষি যে আবহাওয়ায় গড়ে উঠেছে সেখানে মজুরী বেশী, মজুর কম, অথচ কাজ রয়েছে অনেক। আমাদের দেশ ঠিক এই অবস্থায় আগে কখনও পড়েনি। তাই যন্ত্র-যুগের কৃষিও দেখা দেয়নি এই দেশে। যেটুকু আমরা এদিক সেদিক দেখে বা শুনে এসেছি সেটুকু শুধু ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানগত চেষ্টারই ফল, বলা যেতে পারে। দেশী শিল্পের প্রসার হলে দেশের জনসংখ্যার একটি বিশেষ অংশ কৃষিকার্য থেকে সরে এসে অন্য উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহের সংস্থান করবে। কৃষিজীবিদের পক্ষে অধিক পরিমাণ আবাদী জমি সংগ্রহের সুযোগ ঘটবে। আর্থিক অবস্থা হবে উন্নত। কৃষকপ্রতি আবাদী জমির আয়তন বাড়লে যন্ত্রযুগের কৃষির প্রসারের সুযোগ হবে। কৃষকের উন্নতি ও যন্ত্রযুগের কৃষির প্রসার শিল্প-প্রসারের উপর বাংলাদেশে নির্ভর করছে।

বর্ত্তমানে কৃষি জগতে প্রয়োজনীয় শক্তির জন্য নির্ভর করতে হয় পশুজগতের উপর। আমাদের দেশে বলদ সেই শক্তির উৎস। কাঠের লাঙল ও মই দিয়ে জমি বার বার চাষ করে বীজ বপনের উপযোগী করা হয়। সার বিশেষ প্রয়োগ করা হয় না। যখন করা হয় তখন হাতে করেই ছড়ান হয়। বীজ বপন বা চারা রোপনের কাজও করা হয় হাতে। আগাছা বাছা হয় নিড়ানী দিয়ে। জল সেচের প্রয়োজন হলে সুবিধামত 'দোন' বা 'সেউতির' উপর নির্ভর করি। সুবিধা না থাকলে জল সেচ করাই হয় না। তারপর আসে চাষীদের সব চেয়ে প্রিয় কাজ ফসল কাটা। "কাস্তে" নিয়ে বসে যায় ছেলে বুড়ো সবাই। ফসল কেটে মাঠেই কয়েকদিন ফেলে রাখা হয়। তারপর আনা হয় ঘরে—মাথায় করে অথবা গরুর গাড়ীর সাহায্যে। ফসল কাটার কাজ শেষ হলে আরম্ভ হয় "মাড়াই"এর কাজ। এই ভাবেই আমাদের দেশে বছর বছর চাষী চাষ করে চলেছে কত শত বৎসর ধরে তা' কেউ বলতে পারে না। প্রগতিশীল জগতে মূর্তিমান নিশ্চলতা। পশুশক্তি ও মানুষের শক্তি খুব অল্প পরিমাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই কৃষিকার্য খুব দ্রুতগতিতে চালান সম্ভবপর হয় না। ফলে আমাদের দেশে কৃষকপ্রতি উৎপাদনও খুব কম।

যন্ত্র-যুগের কৃষিতে পশু শক্তির প্রয়োজন খুব কমে গিয়েছে—নেই বল্লেই হয়। সেখানে শক্তির উৎস ট্র্যাক্টর। ট্র্যাক্টরকে অনেকে 'কলের লাঙল' বলে থাকেন। যদি বলতেই হয়, তবে কলের বলদ বলাই ঠিক হবে, কারণ ট্র্যাক্টরের কাজ বলদের কাজেরই অনুরূপ। অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হওয়ায় তার কার্যক্ষমতা অনেক বেশী। কার্য অনুপাতে শ্রমিকের প্রয়োজন হয় কম। কাজ হয় বেশী—অল্প আয়াসে। জনপ্রতি উৎপাদন বেশী হওয়ার ফলে উৎপাদন হয় কম খরচে। ইঞ্জিনের আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইঞ্জিনকে কৃষিকার্যে ব্যবহার করার অনেক চেষ্টা হয়েছিল। ট্র্যাক্টরের আবিষ্কার সেই প্রচেষ্টার ফল। ট্র্যাক্টরের আবির্ভাব কৃষি জগতে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এর ফলে কৃষিযন্ত্রগুলির বিশেষ পরিবর্তন ও উন্নতিসাধন সম্ভবপর হয়েছে। যে কাজ আগে করতে হত সম্পূর্ণরূপে মানুষের হাতের সাহায্যে সে কাজও আজ কাল করা হয় যন্ত্রে।

এই সকল কৃষিযন্ত্রগুলিকে বিভিন্ন কার্য অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যেমন :—

১। **কর্ষণ যন্ত্র :**—উল্টে পাল্টে জমির মাটি চষে গুঁড়ো করে বীজ বপনের উপযোগী করা এবং ফসল জন্মাবার পর মাটি আঁচড়ে আগাছা উপড়ে ফেলবার কাজ যে সকল যন্ত্র সাহায্যে করা হয় সেইগুলোকে এই পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। উন্নতধরণের একাধিক ফালযুক্ত লাঙল দিয়ে মাটি চষে ফেলা হয়, ডেলা ভাঙা হয় জমি অনুসারে 'কালটিভেটর' এবং 'হ্যারো' দিয়ে। রোলার দিয়ে মাটি গুঁড়ো করে জমি সমান করা হয়। মাটি আচড়ানোর কাজের জন্য প্রয়োজন হয় কালটিভেটর, হ্যারো অথবা হো। এই সকল যন্ত্রগুলি প্রত্যেকটি একরকমের নয়। প্রয়োজন অনুসারে তাদের আকার ও প্রকার বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। ফসল বিশেষেও বিশেষরূপ যন্ত্রের ব্যবহার হয়।

ভূমিকর্ষণের কাজ সাধারণতঃ উপরোক্ত একাধিক যন্ত্রের সাহায্যে হয়ে থাকে। তবে আজকাল এমন অনেক যন্ত্র বেরিয়েছে যেগুলির একটিই জমিকে বপন উপযোগী করে তুলতে পারে। রোটারী হো, রোটারী কাল্টিভেটর, রোটো-টিলার, জাইরো-টিলার প্রভৃতি যন্ত্রগুলি এই পর্যায়ভুক্ত।

২। **সার দেবার যন্ত্র :**—জমিতে সার প্রয়োগ করাই এই যন্ত্রগুলির কাজ। কার্য অনুযায়ী এরও আকৃতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন রকমের। সাধারণ সার-বপন-যন্ত্রগুলি রাসায়নিক সার ছড়াবার উপযোগী। গোবর বা কম্পোষ্ট ছড়াবার জন্য প্রয়োজন হয় বিশেষ গঠনের যন্ত্রের। এই যন্ত্রকে 'ম্যানিয়র স্প্রেডার' বলা হয়।

৩। **বীজ বপন যন্ত্র :**—বীজবপন যন্ত্রগুলি সাধারণতঃ দু'প্রকারের। কতক গুলো শুধু বীজ ছড়াবার জন্য তৈরী—হাতে করে বীজ বপনের অনুকরণ করে'। এগুলোকে 'ব্রডকাষ্ট সিডার' বলা হয়। অপরগুলো বীজ সারিবদ্ধ ভাবে মাঠের মধ্যে পুতে দিয়ে যায়। এগুলোর নাম—সিড-ড্রিল। তুলা, ভুট্টা প্রভৃতি ফসলের জন্য বিশেষ ধরণের যন্ত্রের প্রয়োজন। আলুর বীজ বা আখের ডগা পোতার জন্য রোপন যন্ত্র বা প্ল্যান্টিং মেসিনের ব্যবহার আছে। অবশ্য একই যন্ত্রে দু'রকম ফসল রোপন করা চলে না।

সার দেওয়া ও বীজ বোনা একসঙ্গে করতে পারলে খরচ কম লাগে, সারেরও দরকার হয় কম। আজকাল তাই বীজ ছড়ানো, বীজ বোনা ও বীজ পুতে দেওয়ার যন্ত্রগুলোর সঙ্গে সার প্রয়োগের বন্দোবস্ত এমনভাবে করা হয়েছে যাতে দু'কাজ একসঙ্গেই চলতে পারে।

৪। **কর্ত্তন যন্ত্র :**—কর্ত্তন-যন্ত্রগুলোর গঠন একটু জটিল। সব চেয়ে যেগুলো সরল ভাবে নির্মিত সেগুলো শুধু ফসল কেটে মাটির উপর ফেলে রেখে যায়। 'রীপার' এবং 'মোয়ার' ঐগুলোর অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটির ব্যবহার হয় খাদ্যশস্যের জন্য, শেষেরটি ঘাস কাটার কাজ করে। যেগুলো আরও বেশী জটিলভাবে নির্মিত সেগুলো ফসল

কেটে, আঁটি বেঁধে মাঠের উপর সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখে; গাড়ীতে তুলে নিলেই হল। 'বাইণ্ডার' নামক যন্ত্রটি এই পর্যায়ভুক্ত। আখ ও ভুট্টার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত কর্তন-যন্ত্রের প্রয়োজন আছে। তুলার জন্য আহরণ-যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। আলু তুলতে হয়—মাটি খুঁড়ে। 'পোটেটো ডিগার ও 'পোটেটো স্পিনার' এই কাজ করে।

৫। **মাড়াই যন্ত্র :**—মাড়াই যন্ত্রগুলোও বেশ জটিল। ফসল থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে শস্য ঝাড়াই করা এই যন্ত্রগুলোর কাজ। ধান, গম, যব প্রভৃতি শস্যের জন্য যেসব যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, সেগুলি ভুট্টা, তুলা, প্রভৃতির বেলায় কোন কাজে আসেনা। ফসল বিশেষে যন্ত্রেরও রূপ বিভিন্ন।

আধুনিক অনেক মাড়াই ও কর্তন-যন্ত্র পরস্পর এমনভাবে সংলগ্ন যে, ফসল কাটা ও মাড়াইয়ের কাজ একই সঙ্গে চলে। পাকা ধানের ক্ষেতের উপর এই যন্ত্র চালালে যন্ত্রটির এক দিক থেকে বেরোয় বস্তাবন্দী ধান, আর এক দিক থেকে বেরোয় খড়। এইগুলিকে 'যুক্ত কর্তন ও মাড়াই যন্ত্র' বলা হয়।

উপরোক্ত বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত যন্ত্রগুলো ছাড়া আরও অনেক যন্ত্র আছে যেগুলো যন্ত্র যুগের কৃষকদের নিত্য প্রয়োজনীয়।

ট্র্যাক্টরের আকৃতি ও প্রকৃতি অনেক রকমের। ব্যবহৃত কৃষিযন্ত্রের আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ভর করে কিরূপ ট্র্যাক্টরের প্রয়োজন তদনুযায়ী। আবার ট্র্যাক্টরের শক্তি ও গঠন অনুযায়ী নির্বাচন করতে হয় কৃষিযন্ত্রের। জমির আয়তন, কৃষিক্ষেত্রের বিস্তৃতি, ফসল ও জমির প্রকারভেদের উপর নির্ভর করে ট্যাক্টর ও কৃষি-যন্ত্রের নির্বাচন। একই ধরণের যন্ত্র বিভিন্ন কারখানায় তৈরী হয়ে বাজারে আসে। চাষীকে বিভ্রান্ত হতে হয় নির্বাচন-পর্ব শেষ করতে। যন্ত্রগুলির জন্য মূলধন ঢালতে হয় অনেক। কাজেই যন্ত্রের নির্বাচন ও তার সুপ্রয়োগের উপর কৃষি ব্যবসায়ের সাফল্য নির্ভর করে অনেকখানি। আমাদের দেশে এ বিষয়ে যাঁরা অগ্রগামী তাঁদের বিদেশের অভিজ্ঞতা, পুঁথিগত বিদ্যা ও যন্ত্রব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরের উপরই নির্ভর করে' কাজে নামতে হয়েছে। বিদেশে যে-যন্ত্রটি সাফল্য লাভ করেছে সেটি যে আমাদের দেশেও সাফল্য লাভ করবে, এ কথা কেউ জোর করে বল্‌তে পারেন না। ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনের সত্যাসত্য বিচার করাও শক্ত। যন্ত্র নির্বাচন ও প্রয়োগের কাজে তাই আমাদের অনেক পথ-প্রদর্শক সাফল্য লাভ না করতে পেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যন্ত্র-যুগের কৃষির উপর বীতরাগ হয়ে উঠেছেন। যন্ত্রযুগের কৃষির ব্যবহারে সাফল্য লাভ না করতে পারলে আমাদের অজ্ঞতাকে দোষ দেওয়া যেতে পারে, যন্ত্র-যুগের কৃষিকে নয়।

যন্ত্র-যুগের কৃষি-পদ্ধতি ব্যাপকভাবে প্রয়োগের সময় আমাদের দেশে এখনও আসেনি, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সাধারণতঃ আমাদের দেশের যা অবস্থা তার মধ্যে যদি চাষীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি একত্রিত করে আবাদী জমির আয়তন বৃদ্ধি করে যন্ত্রযুগের কৃষি প্রবর্তন করা হয়, তাহলে শ্রমিকপ্রতি উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। এতে আবার কুফলও ফলতে পারে। আগেই বলা হয়েছে যে, চাষীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যা প্রবলভাবে রয়েছে। যোগ্যতা বৃদ্ধির ফলে অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন হবে না। প্রচ্ছন্ন বেকার সমস্যা উদ্ঘাটিত হবে এবং দেশের বেকার-সমস্যা প্রকট হয়ে উঠবে। জীবনযাত্রার মান হবে নিম্নাভিমুখী। শ্রমিকের মজুরী যাবে এত কমে যে, যন্ত্র-যুগের কৃষির আর্থিক সফলতা সুনিশ্চিত নাও হতে পারে।

এই যুক্তি স্থান, কাল, পাত্র নির্বিশেষে প্রযোজ্য নয়। যুদ্ধোত্তর যে অবস্থায় আমরা এসে পৌছেছি তাতে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি যে-করেই হোক আমাদের করতে হবে। পতিত জমি আবাদযোগ্য করার কার্যে আধুনিক কৃষি-যন্ত্রগুলোর তুলনা নেই। এই কার্যের জন্য আধুনিক কৃষিযন্ত্রের প্রয়োজন

আছে। তদুপরি আমাদের দেশে শস্যাদির দাম এখন বেশী। শ্রমিকের মজুরীও বেড়ে গেছে। পূর্বে বলা হয়েছে, এই আবহাওয়া যন্ত্র-যুগের কৃষি প্রসারের অনুকূল। কাজেই যে সব কৃষকের বিস্তৃত জমি আছে তাঁদের 'আধুনিক কৃষি-যন্ত্রের ব্যবহার করা উচিত। ফলে এগুলোর চাহিদা যাবে বেড়ে। আমাদের শিল্প নতুন পথে প্রসারিত হবার সুযোগ পাবে। শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জীবনধারণের মান হবে উন্নত, শ্রমিক হয়ে উঠবে দুল ভ। যন্ত্র-যুগের কৃষির অগ্রগতি অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে, আর সুযোগ হবে শিল্প-প্রসারের। পরস্পরের সাহায্যে শিল্প ও কৃষি দু'টিই হবে উন্নত। আমাদের দেশে সেইরূপ সময় কিছু কিছু দেখা দিচ্ছে। ট্র্যাকটর ও কৃষি-যন্ত্রের আমদানীর চেয়ে চাহিদা অনেক বেশী, অনেক ক্রেতাকেই ফিরতে হয় নিরাশ হয়ে, নতুবা অপেক্ষা করতে হয় মাসের পর মাস। বিদেশ থেকে আমদানী করার ফলে এগুলির দাম পড়ে বেশী, যন্ত্রগুলি হঠাৎ খারাপ হয়ে গেলে অনেক সময় লাগে সারাতে। কারণ, প্রয়োজনীয় অংশগুলো সব সময় বাজারে পাওয়া যায় না—আমদানী করতে হয় বিদেশ থেকে। দেশী শিল্পগুলো গড়ে উঠলে, ট্র্যাকটর ও কৃষি-যন্ত্রগুলো এদেশে নির্মিত হতে থাকলে এই অসুবিধাগুলো দূর হবে। যন্ত্রগুলো পাওয়াও যাবে অল্প দামে। চাষীকে মূলধন ঢালতে হবে কম। কৃষি ব্যবসায়ে সাফল্য লাভের সুযোগ হবে বেশী। ব্যাপকভাবে যন্ত্র-যুগে কৃষির প্রয়োগের সময় না এসে থাকলেও স্থান, কাল, পাত্র বিশেষে এই পদ্ধতি প্রবর্তন করা উচিত।

"বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে জ্ঞান সার্ব্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশিলায় দেশদেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তখনই আমরা মহৎরূপে দান করিয়াছি। ক্ষুদ্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্ব্ব জীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, তাহাই আমাদের আরাধ্য।"

"যে হতভাগ্য আপনাকে স্বস্থান ও স্বদেশ হইতে বিচ্যুত করে, যে পর-অন্নে পালিত হয়, যে জাতীয়-স্মৃতি ভুলিয়া যায়, সে হতভাগ্য কি শক্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? বিনাশ তাহার সম্মুখে, ধ্বংসই তাহার পরিণাম।"

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র

ফোটো তোলার দু'এক কথা

শ্রীসতীপতি ভট্টাচার্য্য

ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলায় যারা প্রথম শিক্ষার্থী তাঁদের একটু সাহায্য করাই আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ছবি তোলা আমাদের দেশে একটা ব্যয়সাধ্য সখ, কারণ ক্যামেরা থেকে আরম্ভ করে ছবির 'প্রিণ্ট' অবধি সব কিছুই এখন অগ্নিমূল্য। কিন্তু ক্যামেরার নেশা যে প্রচণ্ড নেশা, একথা নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করবেন না। প্রথম ক্যামেরা হাতে নিয়ে সকলকেই প্রায় দেখা যায়, আশেপাশের যাবতীয় লক্ষ্যনীয় অলক্ষ্যনীয় বস্তু—মানুষ থেকে আরম্ভ করে গ্যাসপোস্ট অবধি—সব কিছুরই দিকে নির্ব্বিকার চিত্তে ক্যামেরা তাগ করতে। তারপর ডেভেলপ ও প্রিণ্ট করবার জন্যে ফোটোগ্রাফীর দোকানে ফিল্ম নিয়ে ছোটা এবং অধীর উত্তেজনায় ফলাফলের অপেক্ষা করা। ডেভেলপ করার পর নেগেটিভ দেখে প্রায়ই আসে ক্ষুব্ধ নৈরাশ্য। কারণ, হয়ত দেখা গেল অধিকাংশ ছবিই উত্তেজনার মুহূর্ত্তে এ ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে' অর্থহীন জটলার সৃষ্টি করেছে, অথবা দেখা গেল ফিল্ম একেবারে পরিষ্কার। আঁকাবাঁকা ছবি বেশী বা কম এক্সপোজ্‌ড্‌ ছবি, ফোকাস না হওয়ার দরুণ ঝাপসা ছবি, ছবি তোলার আদিপর্ব্বে এতো নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে যদি একটু ধৈর্য্য ধরে ছবি তোলার কয়েকটি অতি সোজা নিয়ম মনে রেখে, ভেবে চিন্তে শাটার টেপা যায় তবে শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই দেখতে পাবেন, ছবি হয়েছে নিখুঁত। ক্যামেরার বা ডেভেলপিং এর ওপর দোষ দেওয়া বৃথা। ছবির দোষের জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী যিনি তুলেছেন, তিনিই এবং সেই জন্যে ক্যামেরা যা-ই হোক না কেন নীচেকার এই কয়েকটি নিয়ম যদি মেনে চলেন মোটামুটি ভালো ছবি আপনি নিশ্চয়ই পাবেন। ছবির উৎকর্ষ আসবে তার পরে অভিজ্ঞতার ক্রমগতির সঙ্গে। নিয়মগুলি হচ্ছে এই :—

(১) ফিল্ম বা প্লেট কখনও পুরোণো ব্যবহার করবেন না।

(২) ফিল্ম ভর্ত্তি করবার আগে ক্যামেরার লেন্স পরিষ্কার করে নেবেন।

(৩) ক্যামেরার ফিল্ম ভরবেন ছায়ায় বা ঘরের ভেতর যেন রৌদ্র বা কোনো প্রখর আলো না লাগে।

(৪) ছবি তোলবার সময় লেন্সের মুখে যেন রৌদ্র না লাগে।

(৫) "শাটার" টেপবার সময় ক্যামেরা কিছুতেই যেন না নড়ে।

(৬) ক্যামেরার "ভিউ ফাইণ্ডারে" [যাদের ক্যামেরায় ঘষা কাঁচ আছে তাঁরা তাতেই] ভালো করে দেখে নেবেন কি ছবি তুলছেন। ক্যামেরা সোজা রাখবেন, যাতে লোকজনদের বেলা যেন হাত, পা বা কাঁধ কেটে না যায়, অথবা দৃশ্যের বেলায় ঘর বাড়ি যেন বেঁকে বা কাৎ হয়ে না যায়।

(৭) যে ফিল্ম বা প্লেট ব্যবহার করছেন তার গতি অনুযায়ী লেন্সের ছিদ্র বা য়্যাপারচার বড় বা ছোট করবেন। কত কম সময় পর্য্যন্ত এক্সপোজার দেওয়া যেতে পারে এ তার ওপর নির্ভর করে। আলোর প্রখরতা ও দৃশ্যের চাঞ্চল্যের

ওপর ছিদ্রের মাপ ও এক্সপোজারের সময় নির্ভর করে। সেই ভাবে এক্সপোজারের কাঁটা ঠিক রাখবেন।

(৮) ক্যামেরা ধরবার সময় আঙ্গুল বা কালো ওড়নার কোণ যেন লেন্সের মুখ ঢেকে না দেয়।

(৯) "শাটার" টিপে "এক্সপোজারের সময়টুকু ধৈর্য্য ধরে থাকতে হবে। এই সময় ক্যামেরা যেন একটুও না নড়ে। তারপরেই ক্লিক—এবং একটি ছবি তোলা হয়ে গেল। নিজের হাতে তোলা ছবির দাম অনেক। কাজেই যাতে এই ফিল্মের ওপর আবার ভুল করে দ্বিতীয়বার ছবি না উঠে যায়, সেইজন্যে ছবি তোলার পর সঙ্গে সঙ্গে ফিল্ম পরের নম্বরে গুটিয়ে রাখবেন।

এখানে একটা কথা বলা হয়নি, সেটা হচ্ছে "ফোকাস" করার কথা। যাঁদের ফিক্স্‌ড্‌ ফোকাস্‌ ক্যামেরা তাঁদের ফোকাস করবার দরকারই নেই। তবে তাঁরা যেন আন্দাজ আট থেকে দশ ফুটের ভেতর কোনো ছবি না তোলেন। আর যাদের ফোকাস করে তুলতে হয় তাঁরা অবশ্যই ক্লিক করার আগে ফোকাস করে নেবেন। সাধারণ ছবি তোলবার জন্য ফোকাস করা বিষয়ে ততটা সাবধান হবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু ক্যামেরা যেন না নড়ে এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। তার কারণ, দেখা গেছে নেগেটিভ ফোকাসের বাইরে হলেও বেশ ভালো ছবি হয়, কিন্তু ক্যামেরা একশ ভাগের এক ভাগও যদি কাঁপে, তবে সে ছবির মাধুর্য্য একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। অনেকে বড়াই করে বলেন, আমি এক সেকেণ্ড ধরে' খালি হাতে এক্সপোজার দিতে পারি। এদেরই পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এক সেকেণ্ডের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ সময়ে এক্সপোজার দিতে গিয়ে হাত পাঁচ থেকে এগারোবার কেঁপে গেছে।

তাই যাঁদের ক্যামেরা বড়, তাঁরা অন্তত ১।২৫ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত এক্সপোজার হাতে দিতে পারেন এবং তার জন্য অভ্যাস করতে হবে। এর বেশী সময় ধরে' কখনও শুধু হাতে ছবি তুলবেন না। সেরকম দরকার হলে, হয় স্ট্যাণ্ডের ওপর রেখে অথবা কোন টুল, টেবিল, রেলিং বা পাঁচিল বা কোন স্থির শক্ত জিনিসের ওপর রেখে তুলবেন। আর যাঁদের ক্যামেরা ছোট, অর্থাৎ নেগেটিভকে এনলার্জ করে তবে প্রিণ্ট করতে হবে, তাঁদের শুধু হাতে ছবি তোলবার সব থেকে বেশী সময় হচ্ছে ১।১০০ সেকেণ্ড।

এই হচ্ছে ছবি তোলার মোটামুটি নিয়ম। অত্যন্ত সহজ, আপনারা বলবেন। সহজ বই কি, কিন্তু এই সহজ প্রণালীগুলি প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে একসঙ্গে মেনে চলা, দেখা গেছে, সব সময় সম্ভব হয় না। এগুলি যদি মনে রাখতে পারেন তবে ফোটোগ্রাফারের দোকানে সকলের সামনে অনেক লজ্জা ও নিরর্থক অর্থব্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবেন, এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

এবারে নেগেটিভ কি করে ডেভেলপ করা যায় সে কথা বলব। প্রথমেই প্রয়োজন একটা ডার্করুম বা অন্ধকার ঘর। অনেকে বাড়িতেই সে বন্দোবস্ত করে নিতে পারেন; যাঁরা পারবেন না তাঁরা রাত্রে একটা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে নেবেন, ফুটো ফাটা বন্ধ করবার তাতে দরকার হবে না। তার পরেই দরকার একটা লাল আলো। একটা ল্যাম্পের সামনে লাল কাঁচ লাগিয়ে নিলেই প্রয়োজন মিটে যাবে। যাদের ইলেকট্রিক লাইট আছে, তাঁদের আরো সুবিধা। লাল ইলেট্রিক বাল্‌ব কিনতেই পাওয়া যায়। কিন্তু যাঁরা প্যানক্রোম্যাটিক ফিল্মে ছবি তুলেছেন তাঁদের সমস্ত কাজই অন্ধকারে করতে হবে।

এরপরে একটা টেবিলের ওপর চারখানা ডিশ (ডেভেলপিং) একটা ঘড়ি আর পাশে একটা তোয়ালে চাই। প্রথম ডিশে ডেভেলপার, দ্বিতীয় ডিশে জল, তৃতীয় ডিশে শতকরা দু' ভাগ এসিটিক এসিড দ্রাবণ এবং চার নম্বর ডিশে থাকবে ফিক্সিং বাথ বা হাইপো-দ্রাবণ।

প্রথম ডিশে—

ডেভেলপার:—সাধারণ ছবির জন্যে নিম্নলিখিত ডেভেলপার খুব ভালো কাজ দেয়:—

একটা বড় কাঁচের বিকারে প্রায় ·ডু'আউন্স অল্প গরম জল নিয়ে তাতে খুব কম, এক চিমটে Sodium Sulphite (Anhydrous) দেবেন, এবং মেটল (Metol) চার গ্রেণ দিয়ে কাঁচের কাঠি দিয়ে গুলে দেবেন। বেশ মিশে গেলে পর ওজন করে এই জিনিষগুলো ঢালবেন:—

	Sodium Sulphite (Anhydrous)	১৪৬ গ্রেণ
মিশে গেলে,	Hydroquinone	১৬ গ্রেণ
মিশে গেলে,	Sodium Carbonate (Anhydrous)	৬৬ গ্রেণ
মিশে গেলে,	Potassium Bromide	৪ গ্রেণ

এর পরে মিশ্রিত দ্রাবণটিকে একটি লাল রঙের চার আউন্সের শিশিতে ঢালবেন। পরে অল্প পরিমাণ পরিষ্কার জলে বিকারটি ধুয়ে, সেই ধোয়া জল শিশিতে ঢালতে থাকবেন যতক্ষণ না সাড়ে তিন আউন্স অবধি হয়। তার জন্যে সাড়ে তিন আউন্স কোথায় পৌঁছায় আগে থেকে জল দিয়ে মেপে শিশিতে দাগ দিয়ে রাখবেন। এর পরে শিশিটি রবারের ছিপি দিয়ে বন্ধ করে রেখে দেবেন। এই মিশ্রিত দ্রাবণটি প্রায় ছয়মাস কাল অটুট থাকে। ব্যবহারের সময় এর এক আউন্সের সঙ্গে আরো দু'আউন্স জল মিশিয়ে এক নম্বর ডেভেলপিং ডিশে প্রস্তুত রাখবেন।

দ্বিতীয় ডিশে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল রাখবেন।

তৃতীয় ডিশে থাকবে ষ্টপ বাথ ও ক্লিয়ারিং দ্রাবণ। এটি তৈরী করতে হলে একটি বোতলে ২০ আউন্স পরিষ্কার জল নেবেন। তাতে প্রায় আধ আউন্স (অল্প কম বেশীতে কিছু আসে যায় না) গ্লেসিয়াল এসিটিক এসিড ঢেলে দেবেন। ব্যবহারের সময় এমনিই ব্যবহার করবেন। এই ব্যবহৃত দ্রাবণে আরো চার খানা ফিল্মের রোল ধোওয়া যেতে পারে। এই বোতলের ছিপি শোলার অথবা কাঁচের হলেই ভালো। চার নম্বর ডিশে থাকবে ফিক্সার। এই দ্রাবণটি তৈরী করতে হলে একটা বড় কাঁচের বিকারে নেবেন:—

অল্প গরম জল	১২ আউন্স
হাইপো	৫½ আউন্স ৬০ গ্রেন
সোডিয়াম সালফাইট (অনার্দ্র)	½ আউন্স।

এগুলিকে আগের মত বেশ করে মেশাবেন। তারপর আর একটি মাঝারি সাইজের বিকারে অল্প গরম জল ৬ আউন্স ও ক্রোম য়্যালাম ½ আউন্স ২৫ গ্রেন ভালো করে মিশিয়ে আগের বিকারটায় ঢেলে দেবেন। অতঃপর একটা ২৪ আউন্সের বোতল নিয়ে তাতে ২০ আউন্সের একটা দাগ দিয়ে বিকারের দ্রাবণটি ঢেলে রাখবেন এবং পরিষ্কার জল মিশিয়ে সবটা কুড়ি আউন্স করবেন। কুড়ি আউন্স পর্য্যন্ত ঢালা হয়ে গেলে এবারে ১৪ ফোঁটা গাঢ় সালফিউরিক এসিড এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে ঢেলে বোতল ভালো করে নেড়ে রাখতে হবে। শোলার ছিপি ব্যবহার করবেন। এই দ্রাবণে দশ থেকে বারোটি ফিল্ম ফিক্স্ করা যায়।

চারখানা ডিশ এইরকম পর পর সাজানো হয়ে গেলে পর এবার শুনুন এর ব্যবহার-বিধি:—

ফিল্ম খুলে প্রথমে ২নং ডিশের জলে ভিজিয়ে নেবেন। ফিল্মের দু'ধার ধরে দু'হাত উঁচু নিচু করে ফিল্ম ধুতে হয়। একমিনিট পর ১নং ডিশের ডেভেলপারে দুই থেকে তিন মিনিট পর্য্যন্ত (শীতকালে চার মিনিট) এইরূপে ধুয়ে, ছবি যখন বেশ উঠবে, তখন ২নং ডিশের জলে ১৫ সেকেণ্ড ধুয়ে নেবেন। পরে ৩নং ডিশের স্টপ বাথে আধ মিনিট ধোয়ার পালা শেষ হলে আসবে ৪নং ডিশের ফিক্সারে ১০ মিনিট ধোয়ার কাজ।

এইবারে জলের কলের মুখে ক্লিপ দিয়ে আটকে অথবা খুব বড় গামলায় দু'ধারে ক্লিপ দিয়ে ফিল্মটিকে আটকে কল খুলে দিয়ে ২০ মিনিট ধরে ধুতে হবে। তার পর একটা মোটা সুতায় ক্লিপ দিয়ে আটকে ফিল্ম শুকোতে দেবেন। ফিল্মের শেষ প্রান্তে আর একটা ক্লিপ লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যাতে ফিল্ম সোজা ঝুলে থাকে। এইভাবে ফিল্ম ডেভেলপ্ করবার সময় যেন কখনও ভিতরে হাত বা আঙ্গুলের ছাপ না লাগে।

ফিল্ম শুকিয়ে গেলে কাঁচি দিয়ে একখানা একখানা করে কেটে প্রত্যেকটি আলাদা খামে নম্বর দিয়ে রেখে দেবেন। তাহলেই ফিল্ম ডেভেলপ করা শেষ হোল। নিজের হাতে ডেভেলপ করায় খরচ কম, আনন্দ বেশী। উপরোক্ত সব রাসায়নিক পদার্থগুলিই ফোটোগ্রাফারের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। অভ্যাস ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নৈপুণ্য আসতে দেরী হবেনা, তখন ফোটো তোলা ও ডেভেলপ করা খুব সহজ বলেই মনে হবে।

"যদি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহা না করিলেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে ফলবতী হইবে না, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখিতে হইবে। দুই চারিজন ইংরাজীতে বিজ্ঞান শিখিয়া কি করিবেন?...তাহাতে সমাজের ধাতু ফিরিবে কেন? সামাজিক আবহাওয়া কেমন করিয়া বদলাইবে? কিন্তু দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে। কেহ ইচ্ছা করিয়া শুনুক আর নাই শুনুক, দশবার নিকটে বলিলে দুইবার শুনিতেই হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবর্ত্তিত হয়। ধাতু পরিবর্ত্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। অতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।"

পুষ্টি-শাস্ত্রজ্ঞের নিবেদন

শ্রীপরিমলবিকাশ সেন

অনুসন্ধিৎসাকে জাগ্রত করে অভাববোধ। বর্তমানে খাদ্যের অপ্রতুলতা ও পুষ্টির অভাব, আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে পুষ্টি-বিজ্ঞানের প্রতি। সাময়িক পত্রিকা, বেতার ও বাজারের পেটেন্ট ঔষধের কল্যাণে, পুষ্টিশাস্ত্র আজ জনসাধারণের কাছে অজানা নয়। কিন্তু সমাজের সকল স্তরে এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কৌতূহলের গণ্ডি ভেদ করে সহজ হয়ে ওঠে নাই। এ এখনো বাগানের মরসুমী ফুল, শুধু চমক লাগায়; আতপদগ্ধ প্রান্তরের মহীরুহের মত জনসাধারণের সহজ আশ্রয় এ আজো হয়ে উঠতে পারে নাই। নবীন দ্বিচক্রযান শিক্ষার্থী ভারকেন্দ্র ঠিক রাখবার প্রবল প্রয়াসে যেমন প্রতিমুহূর্তে ভারসাম্য হারিয়ে হাস্যাস্পদ হন, তেমনি আমাদের এই নবলব্ধ জ্ঞানের অসম-প্রয়োগের ফলে, বহু স্থানে পুষ্টিশাস্ত্রজ্ঞ হন জন-সাধারণের বিদ্রূপভাজন। এজন্য আংশিকভাবে দায়ী খাদ্যশুচিবাইগ্রস্ত পুষ্টিশাস্ত্র-দরদী বন্ধুজন; যাদের আলমারী ভিটামিন বটিকা ভারাক্রান্ত এবং ভোজ্য রসনারস পরিশোধ্য। যে সামঞ্জস্য জ্ঞান জীবনে সর্ব-সুষমার আধার ও শক্তির উৎস তার অভাবে এই সব পুষ্টিশাস্ত্র-দরদীদের শুভ ইচ্ছাও পর্যবসিত হয় ব্যর্থতায়। আমরা ভুলে যাই পুষ্টিবিজ্ঞান শুধু ভিটামিন সম্বন্ধে জ্ঞান নয়, উত্তাপ কখনই খাদ্যের একমাত্র প্রয়োজন নয় এবং আহার গ্রহণই শরীরকে সুপুষ্ট ও সুস্থ রাখবার একমাত্র উপায় নয়। জীবনী শক্তি সহস্র পরিবর্তনশীল কারণ-ধারায় নিয়ন্ত্রিত, পরিপুষ্ট ও পল্লবিত। এইজন্য পুষ্টিশাস্ত্রজ্ঞের দৃষ্টি কেবলমাত্র একটি সমস্যায় কেন্দ্রীভূত হলে ফল আশানুরূপ না হওয়ার সম্ভাবনাই প্রচুর। রণকুশলী সেনানায়কের মত তাঁদের দৃষ্টি থাকবে চতুর্দিকে প্রসারিত, যাতে স্বাস্থ্য-পরিপন্থী সহস্র সম্ভাবনার কোন একটিও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে না যেতে পারে।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতা পুষ্টিশাস্ত্রজ্ঞের নির্ধারণ বিরোধী। তখন মনে বহু প্রশ্নের উদয় হয়, যার আলোচনা প্রয়োজন। এইজন্য পুষ্টিশাস্ত্রঘটিত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

এ প্রশ্ন ত প্রায় সবারই মনে জাগে, আমাদের কি পরিমাণে কোন কোন খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ লোকের মানসিক প্রবৃত্তির সহিত আহার রুচির সুনিবিড় সম্বন্ধ লক্ষ্য করে' খাদ্যকে সাত্ত্বিক, রাজসিক, ও তামসিক পর্যায়ভুক্ত করেছেন। সুতরাং খাদ্য নির্বাচন করবার সময় জনসাধারণের সুস্থ রুচি-বৈচিত্র্যের প্রতি যথাসম্ভব দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন; যদিও খাদ্যরুচির ঐকান্তিক বিভিন্নতা একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়। সুস্থ রুচি-বৈচিত্র্য যাতে রুচি-বিকারের রূপ গ্রহণ না করে, সে দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। খাদ্য হবে পুষ্টিকর, রস্য, হৃদ্য ও সুপাচ্য এ কথা ত সর্বজনগ্রাহ্য। যে খাদ্যে আমাদের মনে জুগুপ্সার উদয় হয় তাতে আশানুরূপ ফল না পাওয়ারই সম্ভাবনা। মনের প্রসন্নতার সঙ্গে খাদ্য পরিপাক করার সম্বন্ধ সর্বজনবিদিত; সুতরাং খাদ্য নির্বাচনের সময় খাদ্যের পুষ্টিকারিতার সঙ্গে উক্ত বিষয়গুলিও বিবেচনা করা প্রয়োজন।

আমাদের আহারের পরিমাণ কতখানি হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে বহুনির্দেশ বিবিধ পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠায় ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর প্রাচীর ও প্রচার-পত্রে পরিকীর্ণ। আপনাদের অবগতির জন্ত পুষ্টি-শাস্ত্র-বিশেষজ্ঞদের নির্দ্ধারিত খাদ্য পরিমাণের তালিকা উদ্ধৃত করছি।

১নং তালিকা

	ক্যালরী	প্রোটিন (গ্রাম)	চুন (গ্রাম)	লৌহ (মিলিগ্রাম)	ভিটামিন					
					এ I. U.	বি১ মিলিগ্রাম	সি মিলিগ্রাম	রাইবোফ্লাভিন মিলিগ্রাম	নিয়াসিন মিলিগ্রাম	ডি I. U.
পুরুষ-আনুমানিক ওজন পৌনে দুই মণ										
সাধারণ পরিশ্রমী	৩০০০	৭০	০'৮	১২	৫০০০	১'৮	৭৫	২'৭	১৮	সৌরকিরণ দেহে এই খাদ্যপ্রাণ উৎপাদন করে। সৌর কিরণের অভাবে এই ভিটা-মিন দেয়।
কঠিন দৈহিক পরিশ্রমী	৪৫০০	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩'৩	ঐ	২'৩	২৩	
মস্তিষ্কজীবি	২৫০০	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১'৫	ঐ	২'২	১৫	
নারী-আনুমানিক ওজন ১ মন ১০ সের										
সাধারণ পরিশ্রমী	২৫০০	৬০	০'৮	১২	৫০০০	১'৫	৭০	২'২	১৫	
কঠিন দৈহিক পরিশ্রমী	৩০০০	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৮	ঐ	২'৭	১৮	
মস্তিষ্কজীবি	২১০০	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১'২	ঐ	১৮	১২	
গর্ভিণী	২৫০০	৮৫	১'৫	১৫	৬০০০	১'৮	১০০	২'৫	১৮	৪০০-৮০০
স্তন্যদায়িণী	৩০০০	১০০	২'০	১৫	৮০০০	২'৩	১৫০	৩'০	২৩	ঐ ঐ
শৈশবে ও বাল্যে	প্রতি সেরে	প্রতি সেরে								
এক বৎসরের নিম্নে	১০০	৩-৪	১'০	৬	১৫০০	০'৪	৩০	০'৬	৪	ঐ ঐ
এক হইতে তিন বৎসর	১২০০	৪০	১'০	৭	২০০০	০'৬	৩৫	০'৯	৬	ঐ ঐ
চার " ছয় "	১৬০০	৫০	১'০	৮	২৫০০	০'৮	৫০	১'২	৬	ঐ ঐ
সাত " নয় "	২০০০	৬০	১'০	১০	৩৫০০	১'০	৬০	১'৫	১০	ঐ ঐ
দশ " বার "	২৫০০	৭০	১'২	১২	৪৫০০	১'২	৭৫	১'৮	১২	ঐ ঐ
কৈশোর-যৌবন										
স্ত্রী ১৩—১৫	২৮০০	৮০	১'৩	১৫	৫০০০	১'৪	৮০	২'০	১৪	সৌরকিরণ ভিটামিন ডি তৈরী করার সাহায্য করে
ঐ ১৬—২০	[illegible]	৭৫	১'০	ঐ	ঐ	১২	৮০	১'৮	১২	
পুরুষ ১৩—১৫	৩২০০	৮৫	১'৪	ঐ	ঐ	১'৬	৯০	২'৪	১৬	
ঐ ১৬—২০	৩৮০০	১০০	১'৪	ঐ	৬০০০	২'০	১০০	৩'০	২০	

আমাদের দেশে প্রচলিত খাদ্য পরিমাণের তুলনায় উধৃত তালিকা কিছু সচ্ছল জনোচিত মনে হতে পারে। স্মরণ রাখা কর্তব্য এ তালিকা প্রস্তুত করবার সময় বৈদেশিক পুষ্টিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মনে এ-সমস্যা জাগে নাই যে, আমরা কত কম আহার করে বেঁচে থাকতে পারি। তাঁরা নির্দেশ দিয়েছেন কি পরিমাণে আহার করলে দেহ-পুষ্টি অব্যাহত থাকবে। অবশ্য খাদ্যের পরিমাণ ও গুণ নির্ণয়ে অতি সূক্ষ্ম বিচার নিষ্প্রয়োজন, যদি কয়েকটি সাধারণ বুদ্ধি-প্রসূত নিয়ম মেনে চলা যায়। একদিন খাদ্যের ক্যালরী-মূল্য দুই কি তিন শত বেশী বা কম হলে অথবা ভিটামিন কিংবা প্রোটিনের পরিমাণের সামান্য আধিক্য ঘটলেই যে স্বাস্থ্যহানি হবে এরূপ সম্ভবনা নাই; কারণ একদিনের অকিঞ্চিৎকর ন্যূনতা সাধারণ অন্যদিনের খাদ্যপ্রাচুর্যে পূরিত হয়। বহুদিনব্যাপী স্বল্প অথবা অসম আহারই পুষ্টি-দৈন্য আনে। এই জন্য সাধারণভাবে জানা প্রয়োজন কোন কোন খাদ্যদ্রব্যগুলো শ্বেতসার প্রধান, কোনগুলো দেহ গঠনোপযোগী প্রোটিন সমৃদ্ধ এবং কোনগুলোতে তৈলজাতীয় উপাদানের পরিমাণ বেশী। প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত পরিমাণে উক্ত তিনজাতীয় খাদ্যের সংমিশ্রণে স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য নির্বাচন করা যায়। প্রতি গ্র্যাম শ্বেতসার অথবা প্রোটিন হতে চার ক্যালরী ও স্নেহবর্গীয় দ্রব্য হতে নয় ক্যালরী পরিমাণ উত্তাপ সংগ্রহ করা সম্ভব। সুতরাং খাদ্যের রাসায়নিক সংগঠন জানা থাকলে খাদ্যবিশেষ হতে কত ক্যালরী উত্তাপ পাওয়া সম্ভব, তা হিসাব করা কঠিন নয়। যাঁদের পক্ষে এই বিশেষজ্ঞ সুলভ হিসাব ক্লান্তিকর তাঁদের সুবিধার জন্য বাংলায় প্রচলিত কয়েকটি খাদ্য হতে অনুমানিক কত ক্যালরী উত্তাপ পাওয়া সম্ভব নিম্নে তার একটি তালিকা দেওয়া হল :—

২নং তালিকা

খাদ্য	পরিবেশণের মাপ	ক্যালরী	শ্বেতসার %	প্রোটিন %	স্নেহ %
শ্বেতসার প্রধান—					
ভাত	এক কাপ	১৩০-১৫০	৩০	৩২	০'৬
মুড়ি	ঐ	৭৫	১৭	১'৫	—
চিড়ে (শুখনা)	এক ছটাক	২০০	৪৪	৫	০'৭
পাউরুটি	এক টুকরা ৩'৫"×৩'৫"×০'৫"	৭৮	১৬	৩	০'৫
হাতে গড়া রুটি	½ ছটাক	১১০	২০	৪	১'৩
আলু	আধ পোয়া	৯০	২১	২	—
লাল আলু	ঐ	১৩০	৩০	২'৫	০'৫
কচু	ঐ	৫০-৭০	১২-১৬	১'৩	—
কাঁচ কলা	মাঝারি একটি	৭০	১৭	১	—
চিনি	চায়ের চামচের এক চামচ	২০	৫	—	—
গুড়	ঐ	৪০	১০	—	—
প্রোটিন প্রধান—					
ডিম	একটি	৭০	—	৬'৫	৫
দুধ	এক পোয়া	৮৫	৫	৫	৫
মাছ	এক ছটাক	৬০	—	৬'৫	৩'৫

খাদ্য	পরিবেশণের মাপ	ক্যালরী	শ্বেতসার %	প্রোটিন %	স্নেহ %
মাংস	আধ পোয়া	১৪৪	—	১৪	১০
ডাল	আধ কাপ (ঘন)	১৩০	২০	১০	১
ছানা (জল ঝরা)	আধ পোয়া	২১০	২	১৫	১৬
স্নেহ বর্গীয়—					
মাখন	আধ ছটাক	১১৭	—	০.৫	১৩
তেল	ঐ	১৩৫	—	—	১৫
তরকারী—					
বেগুন	এক পোয়া	৩০	৬	১	—
বিলাতী বেগুন	ঐ	২২	৪	১	—
সীম	ঐ	৪২	৭.৫	২.৫	—
বাঁধা কফি	ঐ	২৪	৪	১.৫	
বিট	ঐ	৪৪	৯.৫	১.৫	
গাঁজর	ঐ	৪০	৯	১.৫	
ফল—					
আনারস	আধ পোয়া	৬৮	১৬	০.৫	
কালজাম	ঐ	৪০	৯	০.৫	
কলা	মাঝারী	১০০	২৪	১	
কমলা	ঐ	৫০	১১	১	
আম	ঐ	১২০	২৮	১.২	
পেঁপে	এক পোয়া	৭০	১৬	১	

কোন একটি মাত্র খাদ্যে দেহের সকল অবস্থায় সকল প্রয়োজন মেটাতে পারে না। কয়েকটি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য সমন্বিত মিশ্র-ভোজ্য পুষ্টির অধিকতর উপযোগী, কারণ কোন একটি বিশেষ খাদ্যের কোন একটি বিশেষ উপাদানের অভাব আনুসঙ্গিক খাদ্যের উপাদানে পরিপূরিত হওয়া সম্ভব। অধুনা অর্থনৈতিক আঘাতে সংক্ষিপ্ত হলেও বাংলার আদর্শ আহার পঞ্চ-ব্যঞ্জন সমৃদ্ধ। সুনির্বাচিত হলে বাঙ্গালীর লঘুপাক ভোজ্যে প্রয়োজনীয় উপাদানের দৈন্য ঘটবার সম্ভবনা কম। বাঙ্গালীর রুচি অনুযায়ী ভোজ্য সংকলনে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা বিধেয়।

১। বাঙ্গালীর প্রচলিত ভোজ্যে প্রোটিন ও বি-বর্গীয় খাদ্য-প্রাণের অপ্রতুলতা লক্ষনীয়। আমাদের খাদ্য বিজ্ঞানানুমোদিত করতে হলে আরো কিছু অধিক পরিমাণে মাছ, দুধ, ডাল, ডিম, ছানা প্রভৃতি সংযোগে প্রোটিন ও আছাটা চাল ও জাঁতা-ভাঙ্গা আটা সহযোগে বি-খাদ্যপ্রাণ সমৃদ্ধ করে নিতে হবে।

২। তরকারী ও শাক আমাদের দৈনিক ভোজ্য-তালিকায় অবশ্য গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। যদিও এরা প্রচুর ক্যালরী-উৎপাদক বা প্রোটিন-সমৃদ্ধ নয়। খাদ্যপ্রাণ ও ক্ষার-গুণান্বিত বিবিধ ধাতব লবণের অস্তিত্বের জন্যই এগুলো অবশ্য গ্রহণীয়। বাঙ্গালী মৎস্যপ্রিয়, আর আমাদের খাদ্যে মৎস্যের পরিমাণ বাড়ান

ঋতু, উৎপত্তির স্থান ও রন্ধনের বৈচিত্র্যহেতু উল্লিখিত মূল্যগুলির পরিমাণ ১০% ন্যূনাধিক হতে পারে।

কর্তব্য; কিন্তু দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন যেন মাছ পাওয়া গেলে তরকারী ও শাক খাদ্যতালিকা থেকে বাদ না পড়ে।

৩। বাংলার জন সাধারণ যে-খাদ্যে জীবন ধারণ করে তা' ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ নয়। মজবুত ও মোটা হাড় গঠনের জন্য ভোজ্যে যথোপযুক্ত ক্যালসিয়াম থাকা প্রয়োজন। এই ক্যালসিয়াম পাওয়া যেতে পারে, দুধ, ডিম, ছোটমাছ ও বিবিধ শাকশব্জী হতে। সূর্যালোক উদ্ভাসিত ভারতবর্ষে খাদ্যপ্রাণ ডি'র অভাবে রিকেট হয় না, প্রধানতঃ ক্যালসিয়ামের অভাবেই হয়ে থাকে।

৪। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রচলিত খাদ্যের তুলনায় বাঙ্গালীর খাদ্যে তৈলবর্গীয় উপাদানের দৈন্য উল্লেখযোগ্য। এই উপাদানটির আতিশয্য ও ন্যূনতা উভয়ই স্বাস্থ্যের পরিপন্থী। উপযুক্ত পরিমাণে তৈলজাতীয় উপাদান, ক্যালসিয়াম ও ক্যারোটিন দেহায়ত্ব করবার জন্য প্রয়োজনীয়। স্নেহবর্গীয় দ্রব্য প্রচুর ক্যালরী উৎপাদক।

৫। উন্নত খাদ্য-তালিকায় ফলের স্থান অতি উচ্চে। বাংলার জনসাধারণ গ্রীষ্মঋতু ব্যতীত অন্য ঋতুতে যথোপযুক্ত ফল পাওয়ার সুযোগ পান না—কারণ বাংলায় যথোপযুক্ত ফল জন্মায় না। বাংলায় চাষযোগ্য জমির ক্রমবর্ধমান অভাব ও এখানকার জল বায়ু এজন্য আংশিকভাবে দায়ী। একথা সত্য হলেও বাংলার খাদ্য-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার জন্য প্রতি পল্লীতে পেঁপে, কলা, আনারস, বাতাবী লেবু, আম ও পেয়ারা প্রভৃতি ফল উৎপন্ন করার সযত্ন প্রয়াস কর্তব্য।

৬। পুষ্টির মূল্যেই খাদ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়। অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের খাদ্যও পুষ্টিগুণে দুর্মূল্য ভোজ্যের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে। খাদ্য উৎপাদনের ক্ষমতা যখন সীমাবদ্ধ, তখন জাতীয় উদ্যম খাদ্য-বিলাস হতে পুষ্টি-প্রয়াসে কেন্দ্রীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমাদের বিজ্ঞান-বিমুখ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই হোক, কি নৈসর্গিক কারণেই হোক খাদ্যোৎপাদন সমস্যা জটিল আকার ধারণ করেছে। এর কারণ নির্ণয় প্রয়োজন আর প্রয়োজন নিষ্করুণভাবে সর্ব বাধা দূর করা। কিন্তু পুষ্টিশাস্ত্রজ্ঞ, জৈব-রাসায়নিক ও রসায়নশাস্ত্রবিদ এ সমস্যাকে সহজতর ও সহনীয় করবেন যদি তাঁদের প্রতিভার যাদুদণ্ড স্পর্শে জাতীয় অন্নের গোলা নূতনতর খাদ্যে ভরে ওঠে। অদূর ভবিষ্যতে কেবলমাত্র ক্ষেত্রজ শস্য ও জান্তব খাদ্যে ক্ষুন্নিবৃত্তি করা অসম্ভব হবে। জনসাধারণকে অভ্যস্ত হতে হবে রাসায়নিক কারখানায় প্রস্তুত তথাকথিত কৃত্রিম খাদ্যে। আমাদের ভোজ্য-তালিকায় নব আগন্তুকদের আবির্ভাব সম্ভাবনায় যাঁরা শঙ্কিত, তাদের এই বলে আশ্বস্ত করা প্রয়োজন, যে শিল্পী-মনের সহিত রাসায়নিক প্রতিভার সংযোগ হলে খাদ্য-জগতে এই সব নবসৃষ্টি হবে পুষ্টিকর ও স্বাদু এবং আশাকরি কালক্রমে এই সব কৃত্রিম খাদ্য স্বাভাবিক আহার্য বলেই পরিগণিত হবে।

পুষ্টিতত্ত্বজ্ঞের নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করেও অনেকে জীবন কাটান চিররুগ্ন হয়ে ও অপেক্ষাকৃত পুষ্টিহীন আহার করা সত্ত্বেও বহু ব্যক্তি নিরোগদেহে সংসারযাত্রা নির্বাহ করেন, এরূপ উদাহরণ বিরল নয়। স্বভাবতঃই এই সব উদাহরণ পুষ্টিশাস্ত্রের ভিত্তির উপর জনসাধারণের বিশ্বাস শিথিল করে। কোন বিজ্ঞানই এখন পর্যন্ত সকল সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু যত্নের সঙ্গে অনুধাবণ করলে বহু ক্ষেত্রেই এই সব আপাত-বিরুদ্ধ উদাহরণের মূলগত তথ্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব।

পূর্বেই বলেছি, আমাদের স্বাস্থ্য কেবলমাত্র পুষ্টি-গ্রহণের উপরই নির্ভর করে না। বংশানুক্রমিক প্রবণতা, আহারগত পুষ্টি, দেহায়ত্ব করবার মত শারীরিক কুশলতা ও মানসিক প্রসন্নতা এবং এই রকম বহু কারণই আমাদের স্বাস্থ্য ও বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে। পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে এই সব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। যে সব

কারণে দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি-প্রবণতা ব্যাহত হয় সংক্ষেপে তার উল্লেখ করছি।

সন্তান পিতামাতার দৈহিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এবং বহুক্ষেত্রে জনক-জননীর রোগ-প্রবণতারও উত্তরাধিকারী। সুনির্বাচিত খাদ্য এই স্বাভাবিক রোগ প্রবণতাকে বহুলাংশে খণ্ডিত করতে পারে। এমন কি অতি অস্বাভাবিক অবস্থায়ও পুষ্টি-শাস্ত্রগত স্বাস্থ্যবিধি পালন করে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়। গত যুদ্ধের দুর্বহতম পরস্থিতির সম্মুখীন হয়েও অতি সাধারণ পুষ্টি-বিজ্ঞানসম্মত খাদ্য গ্রহণ করে ব্রিটেন তার স্বাস্থ্যসম্পদ ক্ষুণ্ণ হতে দেয় নাই; বরং দেখা গেছে যে, সেই নিদারুণ অশান্তির মধ্যেও যে সকল শিশু ব্রিটেনে জন্মগ্রহণ করেছে, তারা ওজনে ও দৈর্ঘে পূর্বজ শিশুগণ অপেক্ষা উন্নততর। অতএব বংশানুক্রমিক রোগ প্রবণতাকে ব্যাহত ও জীবন-সংগ্রামের প্রচণ্ডতম আঘাতের সম্মুখীন হতে হলে জীবনযাত্রার ধরণ করতে হবে বিজ্ঞানানুগ। অত্যধিকশ্রম কিংবা অন্তঃস্রাবী থাইরয়েড গ্রন্থির অতি ক্রিয়াশীলতার ফলে আমাদের শরীরে ক্যালরীর দাবী বেড়ে যায়। এই পরিমাণ উত্তাপ যদি খাদ্য হতে না পাওয়া যায়, তবে শরীর নিজে দগ্ধ হয়ে এ উত্তাপ যোগায়। ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত শরীর হয়ে যায় ক্ষীণ। গর্ভিণীর দেহস্থ ভ্রূণ পোষণের জন্য ও মাতার স্তনে দুগ্ধ সৃষ্টির নিমিত্ত উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজন। পুষ্টির অভাব, শিশু ও জননী উভয়েরই স্বাস্থ্য-হানিকর।

অন্ত্রস্থিত কৃমিকীট অনেক সময় কৃশতার কারণ। এই সব পরজীবি আমাদের খাদ্যের পুষ্টির অংশ গ্রহণ করে বেঁচে থাকে ও বাড়ে। কৃমির অবস্থান হেতু অন্ত্রে যে বিষ উৎপন্ন হয় তার ফলে খাদ্য-গত পুষ্টি সম্পূর্ণ দেহায়ত্ব করা সম্ভব হয় না। এ জন্য উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করেও কৃমি রোগাক্রান্ত শরীর কৃশ ও দুর্বল।

এমন বহু রোগ আছে যা প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করার আগে ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যের মূলে আঘাত করতে থাকে। অজীর্ণতা, কর্কটরোগ ও যক্ষ্মা সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করার আগে বহুদিন সুগুপ্ত বিষক্রিয়ায় শরীরকে স্বাস্থ্যহীন করে—এদের প্রভাবে পুষ্টিকর খাদ্য আহার করেও আশানুরূপ সুফল পাওয়া যায় না।

খাদ্য শরীর-যন্ত্রের ইন্ধন। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে যে-খাদ্য উপযোগী ও স্বাস্থ্যপ্রদ, বিকল শরীর-যন্ত্রের উপর সেই খাদ্যের ক্রিয়াই বিষবৎ। সুনির্মিত দীপে যে তেল দেয় উজ্জল ও নির্ধূম প্রদীপ শিখা, বায়ুপ্রবাহ ব্যাহত হলে সেই তেল হতেই প্রধূমিত হয় মসীকৃষ্ণ অঙ্গার-কলঙ্ক। এই জন্য মধুমেহে, বৃক্কের প্রদাহে ও মেদ রোগের প্রাবল্যে খাদ্য সংকলনের ধরণ ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ বাঞ্ছনীয়।

লোভে অথবা স্বাস্থ্যোন্নতির প্রবলতম উৎসাহে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার স্বাস্থ্যহর—অতএব পরিত্যজ্য। এতে দেহে স্বাস্থ্যের জ্যোতি জ্বলে না, শরীরকে করে অলস, মেদযুক্ত ও স্বাস্থ্যহীন। উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচন করে শরীরকে স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধ করার কৌশলকে বলা হয় পুষ্টিবিজ্ঞান। এই স্বাস্থ্য মানুষের স্বাভাবিক সম্পদ—অতি কৌশলীর পক্ষেও অস্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান হওয়া অসম্ভব। সুতরাং যথোপযুক্ত খাদ্য আহার করা সত্বেও শরীর আশানুরূপ নীরোগী ও স্বাস্থ্যদীপ্ত না হলে, বুঝতে হবে এর নিগূঢ় কিছু কারণ আছে। তখন সুচিকিৎসকের বিধান গ্রহণ করা বিধেয়; কারণ স্বাভাবিক নীরোগী দেহে আমাদের প্রয়োজন খাদ্যের; রোগগ্রস্থ দেহ-যন্ত্রের জন্য দরকার হয়, পথ্যর। তার প্রয়োগ কৌশল স্বতন্ত্র, অতএব বারান্তরে আলোচ্য।

বাঁচুন আগে

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

আমার তপস্যায় তুষ্ট হয়ে বিজ্ঞান-দেবী আজ যদি আমার কাছে বরদারূপে আবির্ভূতা হন, তা'হলে প্রথমে কোন বরটি তাঁর কাছে চাইবো? তিনি যদি বলেন যে তোমাদের বাংলা দেশের জন্য যা' চাইবে তা-ই পাবে; কিন্তু একটির বেশী দু'টি বর চাইবেনা, তা'হলে কোন বরটি সব চেয়ে কাম্য বলে মনে হবে? কিসের অভাব এই বাংলা দেশে সব চেয়ে বেশী? তা'কি আর ভেবে চিন্তে বলতে হয়? অভাব স্বাস্থ্যের, অভাব নীরোগ থাকার।

অবশ্য আমাদের এই বাংলা দেশের মধ্যে বহু রকমের দুঃখ আর বহু রকমের অভাব আছে। তবু এটা ঠিক যে নানা দুঃখের মধ্যে অস্বাস্থ্যই হলো আমাদের সুজলা সুফলা বাংলা দেশের সব চেয়ে প্রধান দুঃখ। আমরা খুব সূক্ষ্ম অনুভূতি সম্পন্ন' বুদ্ধিমান জাতি। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, কলায়, কাব্যে, সাহিত্যে আমাদের হয়তো তুলনা নেই, কিন্তু প্রত্যেকের ঘরের ভিতরে ঢুকলেই দেখবেন যে, আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা সব চেয়ে বেশি রোগা আর অসুস্থ। গৃহিণীরা অধিকাংশই রক্তশূন্য, লাবণ্যশূন্য; আর গৃহকর্তারা পঞ্চাশে পৌছাতে না পৌছাতেই কোমর ভেঙে নুয়ে পড়া, অথর্ব, অকর্মণ্য, বা রোগে জর্জরিত। স্বাস্থ্য-দৈন্য আমাদের এই বাঙালী জাতের মতো আর কারোই বোধ হয় নেই। সকলেই জানেন এমন কতকগুলি বিশিষ্ট রোগ আছে যা' আমাদের এই দেশটুকুর মধ্যেই মৌরুসী দখল নিয়ে বসে লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করছে, ঘরে ঘরে লোকের সর্বনাশ করছে, অনেকেরই খেটে খাবার ক্ষমতাকে পঙ্গু করে দিচ্ছে, আর অনেকেরই পরমায়ু কমিয়ে দিচ্ছে। সব চেয়ে সর্বনেশে হল বাংলা দেশের ম্যালেরিয়া। অন্য অন্য দেশেও ম্যালেরিয়া হয়, কিন্তু সে আমাদের মতো এমন নয়। অনেক দেশেই লোকের ম্যালেরিয়া হয়ে থাকে, আবার একটুতেই সেরে যায়। কিন্তু এমন করে এ রোগ কোথাও বারমাস লেগে থাকেনা। এমন করে কাউকে নিত্য নিত্য কাবু করেনা। তারপর ধরুন কলেরা। এটা যেন নেহাৎ বাংলা দেশেরই একচেটে রোগ। জগতের অন্য কোথাও এতবেশী কলেরা হয় না। এমন করে গ্রামের পরে গ্রাম কিংবা পাড়ার পরে পাড়া উজার করতে থাকেনা। এ দেশে আমরা সকলেই জানি যে, প্রত্যেক বছর একবার করে কলেরা দেখা দেবেই দেবে। তারপরে রয়েছে টাইফয়েড। শহরেই বাস করি অথবা গ্রামেই বাস করি এর হাত এড়িয়ে কোনো গৃহস্থেরই বছর কাটবার উপায় নেই। এমন ধরণের ঘরে ঘরে টাইফয়েড জ্বরই বা আজকাল কোন দেশে আছে? তারপরে আরো অন্যান্য পাঁচ রকমের রোগবালাই তো আছেই। পেটের অসুখ আর রক্তামাশা আছে, বসন্ত আছে, ব্রঙ্কাইটিস আছে, নিউমোনিয়া আছে, আর সব চেয়ে বড়ো রোগ রয়েছে যক্ষ্মা। বছরের পর বছর এই রোগটির আধিপত্য ক্রমশঃ নির্বিবাদে যেন বেড়েই চলেছে। নিতান্ত দৈবক্রমে প্লেগ রোগটি এখানে হয় না, তা ছাড়া অন্য কোন রোগেরই কমতি নেই। আমরা এই দেশকে সুজলা সুফলা বলে থাকি, তার সঙ্গে আরো একটি বিশেষণ জুড়ে দেওয়া উচিত। এদেশ হলো রোগ প্রসবা। এ দেশে যারা বাস করে, রোগ আসে তাদের ঘরে ঘরে। আজ এটা কাল ওটা, নিত্য লেগেই আছে।

বাংলা দেশের অবস্থা কেন এমন হলো? অনেকে বলে থাকে যে, এ দেশের জলহাওয়াটাই নাকি এমনি খারাপ, তাই এখানে এত বেশি রোগ হয়। অনেকের মুখেই শোনা যায় যে, পশ্চিমে আমরা খুব ভাল থাকি, আর দেশে ফিরে এলেই আবার সেই নানারকম রোগ ধরে। এ দেশের

মাটি থেকেই যেন সব কিছু রোগ গজিয়ে ওঠে। কিন্তু সত্যিই কি সেটা এখানকার মাটির দোষ, না এখানকার জলহাওয়ার দোষ? অন্ধ-বিশ্বাসের দিনে এমন কথা যদিও বলা চলতো. কিন্তু এখনকার বিজ্ঞানের দিনেও কি তাই বলা চলবে? স্বাস্থ্য সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কথা আপনারা সকলে শুনেছেন কিনা জানি না। তাঁরা বলেন যে, জগতে এমন কোনো দেশ থাকতে পারে না, যেখানে বুদ্ধি আর ব্যবস্থার দ্বারা সুস্থ থাকবার মতো সব কিছু উদ্ধার করে নিলে তবুও মানুষ সুস্থ থাকতে পারবে না। শুধু মুখের কথায় নয়, এটা সেদিন বিদেশী বৈজ্ঞানিকের দল এসে আমাদের চোখের উপর প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিয়ে গেছে। গত মহাযুদ্ধের সময় হাজারে হাজারে বিদেশী সৈনিকরা এসে আমাদের এই রোগপ্রসবা বাংলা দেশেই কয়েক বছর কাটিয়ে গেল। তারা অজ পাড়াগাঁয়ের মধ্যেও থেকেছে, বনে-জঙ্গলেও বাস করেছে, আর বাংলা দেশের বর্ষা, বাদলা, শীত. গ্রীষ্ম সব কিছুই তারা ভোগ করেছে। তাদের পাশাপাশি থেকে আমরা যথারীতি নানারকম রোগে ভুগেছি, বরং অভাবে পড়ে ঐ কয়েক বছর আরো বেশি ভুগেছি। তবু আমাদের কাছাকাছি থেকেও তাদের কিন্তু আমাদের মতো এমনভাবে ম্যালেরিয়ায়ও ধরেনি, এমন কলেরা, টাইফয়েড, রক্তামাশা প্রভৃতিও হয়নি। একেবারে যে হয়নি তা অবশ্য বলা যায় না, কিন্তু আমাদের তুলনায় সে কিছুই নয়। আমাদের সামান্য পরিশ্রমের সাংসারিক কাজের তা-তে কতই ক্ষতি হ'য়ে গেছে, কিন্তু তাদের কড়া পরিশ্রমের যুদ্ধের কাজে এখানে থেকেও কিছুই ক্ষতি হয়নি। কেমন করে এটা সম্ভব হলো? শুধুই বিজ্ঞানের বুদ্ধি অনুযায়ী যথাকর্তব্য ব্যবস্থাগুলি করার দ্বারা। সেই সব ব্যবস্থার দ্বারাই তারা দেখিয়ে দিয়ে গেছে যে, এ দেশেও মানুষের সুস্থ থাকা সম্ভব হতে পারে। এ দেশের মানুষ সুস্থ না থাকাতে দেশের কোন দোষ নেই, দোষ হলো মানুষের নিজেরই। সুস্থ থাকার সম্বন্ধে আমাদের কোনো ব্যবস্থা নেই। দেশ ছেড়ে আমরা সমস্ত বাঙালী কখনো বিদেশে গিয়ে বাস করতে পারবো না। এই দেশেই আমাদের থাকতে হবে, এই দেশকেই উচিত ব্যবস্থায় দ্বারা স্বাস্থ্যকর করে নিতে হবে। আমাদের মধ্যে তো বিজ্ঞানশিক্ষার কোনো অভাব নেই, ভালো বৈজ্ঞানিকেরও অভাব নেই। যদি আমরা সকলে মিলে নিজেদের দেশকে রোগশূন্য করতে না পারি তাহলে আমাদের এত জ্ঞান বিজ্ঞান শেখার সার্থকতা কি?

মাত্র অল্প কয়েকজনের কথা তো এখানে নয়! সারা. বাংলা দেশের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই যদি স্বাস্থ্য খারাপ থাকে, প্রায়ই যদি অনেক লোক রোগে ভুগে কাজে অপারগ আর দেহে মনে দুর্বল হ'য়ে থাকে, তবে কাদের দিয়ে আমরা কাজ করাবো? কাদের দিয়ে কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, ব্যবসার উন্নতি করাবো? সহস্র রকমের আয়োজন করেও ঐ সব দিক দিয়ে কোনোই কিছু উন্নতি হতে পারেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত আগে সকলের স্বাস্থ্যের উন্নতি না হয়। অন্যান্য সব দেশের পক্ষে যে-কোনো সমস্যা যতই বড়ো হয়ে উঠুক না কেন, আমাদের দেশের পক্ষে স্বাস্থ্যের সমস্যাটাই সব চেয়ে গুরুতর। এর মীমাংসার জন্যই আমাদের সব চেয়ে বেশি করে উঠে পড়ে লাগতে হবে।

এ দেশে যারা সাবধানী, যারা নিজেদের স্বাস্থ্যটি বজায় রেখে রোগ বাঁচিয়ে চলতে জানে, যারা তফাতে তফাতে পালিয়ে রোগভয়শূন্য শহরে এসে কায়ক্লেশে মাথা গুঁজে বাস করে, তারা হয়তো কোনোরকমে কতকটা সুস্থভাবে দিন কাটায়। কিন্তু কোনোগতিকে শুধু নিজেদের সম্বন্ধে সুবিধা করে নিয়ে অল্পসংখ্যক লোকে যদি মনে করে যে অধম জনদের বাদ দিয়ে কেবল আমরা সুস্থ থাকলেই হলো, কারণ আমরাই দেশের কথা ভাববো, আর আমরাই দেশের উন্নতি করবো তা'হলে সেটা তো হলো ফাঁকির কাজ। তাতে

শেষ পর্যন্ত সকলকেই ঠকতে হবে। অল্প কয়েকজন লেখাপড়াজানা শহুরে মানুষদের নিয়েই দেশ নয়। যারা নিরক্ষর, যারা কোনো রোগকে মোটে নিবারণ করতেই জানেনা, অসহায়ের মতো নিত্য নিত্য অসুস্থ হয়ে যারা হাত গুটিয়ে বসে থাকে, তারাই দেশের জনসাধারণ, সাবধানী লোকদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি। তারা সকলে সুস্থ ও সবল থেকে পুরামাত্রায় কাজে লাগতে না পারলে দেশের কোনোই উন্নতি নেই। আজকাল সাম্যবাদের খুব ধুঁয়ো উঠেছে। দেশের মঙ্গলের জন্য যথার্থই যে সাম্য এখন সব চেয়ে বেশি দরকার, তা এই সুস্থ থাকবার দিক দিয়ে, তা এই বেঁচে থাকবার দিক দিয়ে। সকলেই যখন স্বাধীন, তখন সকলেরই এখন সুস্থ হ'য়ে বেঁচে থাকবার সমান অধিকার। আর শুধু তাই নয়—অল্পের ভাগ লোক যদি সুস্থ থাকে, আর বেশির ভাগ লোক যদি অসুস্থ থাকে, তাহ'লে দেশ থেকে আন্তরিক অসন্তোষের আবহাওয়া কখনো দূর হয় না। যারা সুখে নেই তারা অসন্তুষ্ট হবেই। মানুষের স্বাভাবিক চরিত্রকে বিকৃত ক'রে দেয় দুটি জিনিসে, একটি হলো অসুস্থতা, আর একটি হলো অভাব। অভাবেরও প্রধান কারণ হলো অসুস্থতা, আর তার দরুণ অবশ্যম্ভাবী অকর্মণ্যতা। সুস্থ সবল মানুষ অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকে খুবই কম। কিন্তু উপার্জনের শক্তি হারিয়ে দারিদ্র্য এসে পড়লেই তখন মানুষের বুদ্ধি বাঁকা হয়ে যায়। তার থেকেই সৃষ্টি হয় যত আক্রোশ আর বিদ্বেষ, রেষারেষি, হানাহানি। দেশের মানুষ সুস্থ থাকলে তখন দেশের সম্পদ আপনিই বেড়ে যাবে, সকলের মন থেকে সমস্ত রকমের অসন্তোষ আপনিই ঘুচে যাবে। যাঁরা দেশরক্ষার ভার নেবেন তাঁদের সব চেয়ে প্রথম কাজ হলো দেশের লোককে ব্যাধিমুক্ত করা। তার জন্য অকৃপণ হাতে অনেক অর্থব্যয় করতে হবে, অনেক বুদ্ধি খাটাতে হবে, বিজ্ঞানের অনেক রকম সাহায্য নিতে হবে।

এ দেশে স্বাস্থ্যরক্ষার কাজ শুরু করতে হবে বহু রকমের দিক দিয়ে। যদিও সে সব কথা বিশেষজ্ঞদেরই বিচার্য, তবু সাধারণের তরফ থেকেও সেগুলি মোটামুটিভাবে কিছু কিছু জানা দরকার।

প্রথম কথা, শহরের স্বাস্থ্যসমস্যা হলো আলাদা, আর শহরগুলি ছাড়া দেশের বাকি অংশের স্বাস্থ্যসমস্যা হলো আলাদা। চেষ্টা করলে শহরকে একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থার বাঁধনে বাঁধা যায়; তার কারণ লোকবহুল হলেও তবু শহর একটা সীমাবদ্ধ স্থান। যদিও তেমন চেষ্টা আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে সফল হয়নি, তবু আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে শহরে স্বাস্থ্যরক্ষার হয়তো অভাব হবেনা। শহরের দিকে আজকাল সকলেরই মনোযোগ। কিন্তু এখন কেবল শহরের লোকদের বাঁচালেই চলবেনা, সারা প্রদেশকেই বাঁচিয়ে তুলতে হবে। এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে দেশের কোনো অঞ্চলই অস্বাস্থ্যকর না থাকে, কোনো অংশের লোকই বিনা চিকিৎসায় রোগে ভুগে না মরে। শহরেই থাকবে যত বড়ো বড়ো হাসপাতাল, শহরেই ভিড় করবে যত ভালো ভালো ডাক্তার বৈদ্য, আর অন্য সব জায়গার লোকেরা জড়িবুটি আর জলপড়ার ব্যবস্থা করে দৈবের মুখ চেয়ে যত নিবার্য আর আরোগ্যসাধ্য সামান্য সামান্য রোগগুলিতে ভুগে মরবে;—এমন অন্যায়কে পরাধীন দেশেই প্রশ্রয় দেওয়া চলতে পারে, কিন্তু স্বাধীন দেশে নয়। জগতের কোনো স্বাধীন দেশেই মানুষের জীবনরক্ষা নিয়ে এমন অদ্ভুত অসামঞ্জস্য নেই যে অবস্থাপন্ন শিক্ষিত লোকেরা যেখানে বাস করে সেখানকারই স্বাস্থ্য ভালো, আর যেখানে গরিব অশিক্ষিত লোকেরা থাকে সেখানকারই স্বাস্থ্য খারাপ। স্বাধীন যুগে এমন হ'তেই পারেনা। আমেরিকায় দেখুন, রাশিয়াতে দেখুন, সকল অঞ্চলের লোকের জন্যে সমান স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যবস্থা করা আছে। কোথাও কোনো সংক্রামক রোগ উপস্থিত হলে, কোথাও লোকে বেশি সংখ্যায় রোগে ভুগতে থাকলে সেখান-

কার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের তার জন্য রীতিমত জবাবদিহি করতে হয়। এখানেও সকল জেলা, সকল মহকুমা, সকল পল্লী সংগঠনের জন্য তেমনি উপায় করতে হবে যাতে সব জায়গাতেই সমান স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা থাকে, যাতে আরোগ্যের সর্বোত্তম ঔষধগুলি সকলেরই পক্ষে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হতে পারে, আর যাতে পয়সা নেই বলে পীড়িত লোক বিনা চিকিৎসায় বা কুচিকিৎসায় না মারা পড়ে। এটুকু না হলে স্বাধীনতার কোনো অর্থই নেই।

তারপরে বাংলা দেশের একান্ত একচেটে রোগগুলিকে অবশ্যই দূর করে দিতে হবে। ম্যালেরিয়াকে দমন করা বিশেষ কিছুই কঠিন নয়, অনেক দেশ থেকেই তা বিতাড়িত করে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। ম্যালেরিয়ার অনেক ভালো ভালো ঔষধও বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে, আর ম্যালেরিয়াবাহী মশাকে মারবার অনেক ভালো ভালো উপায়ও এখন জানা গেছে। ব্যাপকভাবে চেষ্টা করলে চিকিৎসা আর মশা-নিবারণের দ্বারা এ রোগকে দমিয়ে ফেলা খুব সহজ। এ রোগকে প্রশ্রয় দেওয়া যে কোনো বুদ্ধিমান জাতির পক্ষে একটা কলঙ্ক। আর কলেরা, টাইফয়েড, রক্তামাশা প্রভৃতি পেটের ব্যারামগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলের দোষেই হয়। বাংলা দেশের লোক সাধারণতঃ পুকুরের কিংবা নদীর জলই ব্যবহার করে থাকে, তাই এ দেশে ঐ সব পেটের রোগের এত প্রকোপ। পানীয় জল যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহলে এগুলির কোনোটাই হতে পারেনা। জল দূষিত কোরোনা, লোককে এ কথা বলে কোনোই লাভ নেই। উপায় নেই বলেই লোকে জল দূষিত করে, আর সেই জলই ব্যবহার করে। শুধু মুখের উপদেশ না দিয়ে দেশের সর্বত্র বিশুদ্ধ পানীয় জলের কিছু উপায় স্থায়ীভাবে ক'রে দেওয়া খুব যে বেশি কঠিন তা মনে হয় না। দেশে বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করবার উপায় বিজ্ঞান নিশ্চয় জানে। তা-ই করে দিলে যত ময়লা নদী ও পুকুরের জল ব্যবহার করার অভ্যাস লোকে আপনা থেকেই ছেড়ে দেবে। হাতের কাছে ভালো জল পেলে কেউ ময়লা জলে হাতই দেবেনা, আর তাতেই এ দেশের যাবতীয় পেটের রোগের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক কমে যাবে। শিশু থেকে বুড়ো পর্যন্ত যাবতীয় লোকের পেটসম্পর্কীয় রোগ সমূহের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলই হ'লো দায়ী। যেখানে জলে রোগের বীজাণু নেই সেখানে অনেক রোগই নেই।

তারপরে আরো অনেক রকমের সমস্যা রয়েছে। বিশেষ করেই বলতে হয় যক্ষ্মা রোগটির কথা। এই সর্বনেশে রোগটি কি কিছুতেই নিবারিত হতে পারেনা? নিশ্চয়ই পারে, যদি তেমনভাবে চেষ্টা করা যায়। নইলে অন্য সব দেশে এর সংখ্যা এত কমে যাচ্ছে কেমন করে? নোংরা আবহাওয়াতে বদ্ধ গুদোমঘরের মধ্যে মাথা গুঁজে বাস করবার রীতিটা তুলে দিয়ে যদি খোলা হাওয়ার মধ্যে বাস করবার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হয়, যদি উপযুক্ত রকমের পুষ্টিকর খাদ্য সকলের পক্ষে সুলভ করে দেওয়া হয়, আর যদি যক্ষ্মা রোগীদের পৃথকভাবে রাখবার জন্য স্থানে স্থানে স্যানাটোরিয়মের ব্যবস্থা করা হয়, তা'হলে দুই চার বছরের মধ্যেই এ রোগের প্রকোপ আশ্চর্যভাবে কমে যেতে পারে। নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি ছোটো ছোটো দেশ এটা খুব ভালো ভাবেই দেখিয়ে দিয়েছে। অথচ আমাদের এত বড়ো এই বাংলা দেশটাতে মাত্র দুই তিনটির বেশি স্যানাটোরিয়মই নেই। যাদের যক্ষ্মা রোগে ধরে তাদের কি বিড়ম্বনা! স্থানীয় ডাক্তার বৈদ্য তাদের জবাব দিয়ে দেয়, হাসপাতালে ঢুকতে গেলে তাদের উপযুক্ত স্থানাভাবে তাড়িয়ে দেয়, আর ঘরের লোকেও তাদের পর করে দেয়। জগতের সব দেশের লোকই এ রোগে উৎকৃষ্ট রকমের সেবাযত্ন পেয়ে সেরে উঠে, কেবল বাংলা দেশের রোগীরাই দারুণ অভিসম্পাত নিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুতে

মরে। আর কি কিছুকালের জন্যও এমন হ'তে দেওয়া উচিত ?

শুধু যক্ষ্মা রোগেই বা কেন, কোনো রোগেই এ দেশের লোকে ভালো চিকিৎসা পায়না, কেবল বড়ো বড়ো কয়েকটা শহরে ছাড়া। এ দেশে সাধারণ লোকদের সংক্রামক রোগগুলিই আক্রমণ করে বেশির ভাগ। সে সব রোগের অব্যর্থ রকমের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা এখন বাঁধাধরা রুটিনের মতোই দাঁড়িয়ে গেছে। রোগটি জানা গেলে আর তার নির্দিষ্ট ঔষধটি জানা থাকলে পাঁচ রকম হাতড়ে বেড়াবার কোনই দরকার হয় না। চিকিৎসা আজকাল খুবই সহজ, কারণ বিজ্ঞান এখন রোগ চেনানো এবং রোগ সারানো দুইএরই উপায় নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু তার ব্যবস্থা কোথায় ? শহরে ছাড়া অন্য কোথাও তার উচিত মতো ব্যবস্থা হয় না। শহরের লোক তাই পল্লীগ্রামে যেতেই ভয় পায়। বলে যে, রোগ হলে সেখানে তার ওষুধ মিলবে না। এটা কি আজকালকার দিনে খুব লজ্জার কথা নয় ? প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে শিক্ষিত চিকিৎসক সুলভ হওয়া দরকার, আর ওষুধও সুলভ হওয়া দরকার, এ কথা বলাই বাহুল্য।

শেষকালে বলতে হয় মাতৃমঙ্গলের কথা ও শিশুমঙ্গলের কথা। সুস্থ ও কর্মঠ প্রজাদের নিয়েই দেশের সম্পদ। কাজ করবার উপযোগী প্রজাবৃদ্ধি মানেই দেশের সম্পদ-বৃদ্ধি। সকল স্বাধীন দেশ সেই কথাই বলে। কিন্তু পরাধীনতার যুগে সে কথা আমরা শিখিনি। আমরা শিখে এসেছি যে, ঘরে একটি শিশু জন্মানো মানেই খানিকটা জঞ্জাল বাড়া। আমাদের দেশে তাই মায়েদের যত্নের অভাবে প্রায়ই তাঁদের স্বাস্থ্য ভেঙে যায়, আর অধিকাংশ শিশু যত্নের অভাবে প্রায়ই অকালে মারা যায়। এর প্রতিকারও আমাদের করতে হবে।

এমনি অনেক দিক দিয়ে অনেক কাজই করা আমাদের পক্ষে বিশেষ দরকার। সারা বাংলা দেশটাই এখন ব্যাধিগ্রস্ত, স্বাস্থ্যহীন, নিরুদ্যম, অকর্মণ্য। শরীর ভালো থাকলে তখন বিদ্বান হওয়া চলে, বিজ্ঞানী হওয়া চলে, আইনজ্ঞ হওয়া চলে, চেষ্টার দ্বারা সব কিছুরই সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু মানুষ রোগগ্রস্ত হলে তখন সব কাজ ফেলে আগে তাকে ডাক্তার ডাকতে হয়, তারই পরামর্শ নিয়ে চলতে হয়। আমাদের এই দেশ রোগজীর্ণ। এ দেশের পক্ষে এমনই কর্ণধারের দরকার যিনি প্রথমে আমাদের আরোগ্য করে তুলতেই চেষ্টা করবেন, যিনি স্বাস্থ্যদৈন্যের কথাটাকেই সব চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেবেন।

কিন্তু কেবল কর্ণধার হলেই সব কাজ সফল হয় না। দেশের স্বাস্থ্য ভালো হোক, এই কামনাটি সকল জনের মন থেকে একযোগে আন্তরিকভাবে জাগা চাই। আজ আমাদের অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, সে কথা সবাই বলছে। কিন্তু আমাদের যে স্বাস্থ্য নেই, ঠিক তেমনিভাবে সে কথা কেউই বলে না। দুই-ই একসঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে বলা দরকার। স্বাস্থ্য না ভালো হলে ইচ্ছা করলেও দেশে অন্ন, বস্ত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্নই হতে পারবে না। স্বাধীন দেশের লোকের নীরোগ থাকবার কামনা করার অধিকার সব চেয়ে বেশি, এ কথাটিও আমাদের নতুন করে শিখতে হবে। তার জন্য যথেষ্ট প্রচার চাই। আজকাল পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ যে সকলের পক্ষে সম্ভব হতে পারে, এই কথাটাই অনেকের জানা নেই। অন্নের দাবীর মতো স্বাস্থ্যের দাবীও জনসাধারণের মনে উগ্র হয়ে জেগে উঠুক। গণচৈতন্য জাগাবার প্রয়োজন এই দিক দিয়েই সব চেয়ে বেশি। দেশের সকল মানুষের মনে স্বাস্থ্যবোধ জেগে উঠুক, বিজ্ঞানবোধ জেগে উঠুক। বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত বিধানের প্রতি সকলের আস্থা জেগে উঠুক। দেশের লোককে নীরোগ করবার চেষ্টা করা, দেশের লোকের স্বাস্থ্য ভালো করবার চেষ্টা করা, এই ছিল মহাত্মা গান্ধীর অহিংসানীতির অষ্টাদশ সূত্রের একটি বিশেষ সূত্র। তিনি বলতেন যে স্বাস্থ্যনীতির জ্ঞান আর স্বাস্থ্যরক্ষার কৌশল হলো সকলের বিশেষ রকমে আয়ত্ত করবার জিনিস। যে দেশ সমৃদ্ধ এবং সুখী, সেখানকার প্রত্যেকেই স্বাস্থ্যের নিয়ম জানে আর তা' নিষ্ঠার সঙ্গে প্রত্যেকেই পালন করে। সে নিয়ম জানিনা আর জানলেও পালন করিনা বলেই আমরা এত বেশি রোগে ভুগি। রোগে ভোগা আমাদের পক্ষে অপরাধ। যে ভাবে আমরা গ্রামকে আর গ্রামের লোককে অবহেলা করি তাও আমাদের শিক্ষিত লোকদের পক্ষে অপরাধ। আমাদের প্রত্যেকের পক্ষেই এই অপরাধগুলি স্খালন করবার চেষ্টা করা উচিত।

ছোটদের পাতা

[ছেলে-মেয়েরা যাতে সহজে বুঝতে পারে অথবা হাতে-কলমে কিছু কিছু সাধারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে পারে সে-উদ্দেশ্যে এ-বিভাগে সহজবোধ্য ও সহজসাধ্য বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহ আলোচিত হবে। ছেলে-মেয়েরা এ-বিষয়ে তাদের সাফল্যের কথা, নিজস্ব কোন পরীক্ষার কথা অথবা জীব, উদ্ভিদ বা প্রাকৃতিক কোন বিষয়ের অভিজ্ঞতার কথা লিখে পাঠালে উপযুক্ত বিবেচিত হলে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র ছোটদের পাতায় প্রকাশিত হবে। জ্ঞা-বি-স]

করে দেখ

গাছের পাতায় ফটোগ্রাফী

কাগজের উপর যেমন করে ফটোগ্রাফের ছবি তোলা হয় গাছের পাতার উপরও ঠিক তেমনি করেই ছবি তোলা যেতে পারে। তোমাদের অনেকেই হয়তো কথাটা বিশ্বাস করতে চাইবে না। কিন্তু উপায়টা বলে দিচ্ছি—ধৈর্য ধরে একটু চেষ্টা করে দেখো, সবাই একাজে সাফল্য লাভ করতে পারবে।

যেকোন রকম হাতে-আঁকা ছবি, হাতের লেখা বা ফটোগ্রাফের ছবি গাছের পাতার উপর তুলতে হবে। গাছের পাতা ছিঁড়ে নেবার দরকার নেই, গাছের গায়ে পাতা যেমনি আছে তেমনিই থাকবে। তোমরা হয়তো ভাবছ—পেন্সিল, কালি, কলম বা তুলি দিয়ে পাতার উপর ছবি তোলবার কথা বলছি। কিন্তু মোটেই তা' নয়, কাগজের উপর যেমন করে নেগেটিভ থেকে ফটোগ্রাফের ছবি তোলাহয়, পাতার উপরও ঠিক সেই রকমেই ছবি ফুটে উঠবে এতে কালি, কলম বা রং তুলির প্রয়োজন নেই। কেমন করে ছবি তুলতে হবে বলছি :—

যেসব গাছের পাতা মসৃণ—প্রথম পরীক্ষার সময় সেসব গাছই বেছে নেবে। কারণ প্রথমেই খস্‌খসে বা উঁচু শিরা তোলা পাতা নিলে সুবিধা করতে পারবে না। এজন্যে প্রথমে গুঁড়ি-কচুর পাতা, ক্যানাফুল বা ট্রপিওলাম প্রভৃতির পাতা বেছে নিতে হয়। তা'ছাড়া ছবি তোলবার জন্যে এমন জায়গার পাতাই বেছে নেওয়া দরকার যেগুলো প্রায় সারা দিনই কিছু

না কিছু আলো পায়। কিন্তু আবার খুব তীব্র রোদ হলেও প্রথম প্রথম সুবিধা করতে পারবে না। এখন ছোট ছোট দু'খানা সাদা কাচ সংগ্রহ করে বেশ পরিষ্কার করে নেবে। কাচ দু'খানা চারইঞ্চি চৌকো বা তার চেয়ে ছোট হলেও চলবে। একখানা কাচের ওপর 'চাইনিজ ইঙ্ক' বা ওই রকমের কোন ঘন কালো কালি দিয়ে যেকোন রকম ছবি আঁক বা নাম সই কর। কিছুক্ষণ রোদে রাখলেই কালির আঁকা ছবি বা লেখাটা শুকিয়ে যাবে। যে পাতাটার উপর ছবি বা তোমার নাম তোলবার ইচ্ছা, সে-পাতাটার উপর নাম সই করা বা ছবি আঁকা কাচ খানা চাপা দাও। আঁকা দিকটা উপরে থাকবে। অপর সাদা কাচখানাকে পাতাটার নীচে রেখে কাঠের ছোট ছোট ক্লিপ দিয়ে পাতাসমেত উপর ও নীচের কাচ দু'খানাকে এমন ভাবে চেপে রাখ যেন উপরের কাচ ও পাতার মধ্যে কোন ফাঁক না থাকে অথচ পাতাটাও জখম নাহয়। কাচের ভারে পাতাটা যাতে ছিঁড়ে না পড়ে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। কয়েক ঘণ্টা রোদ পাবার পর কাচ দু'খানা খুলে ফেললেই দেখবে পাতার গায়ে তোমার আঁকা ছবি বা নাম অবিকল ফুটে উঠেছে। কোন্ পাতায় কতক্ষণ রোদ লাগানো দরকার সেটা তোমরা পরীক্ষা করে করে ঠিক করে নেবে। কোন কোন অবস্থায় হয়তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ছবি ফুটে উঠবে, কোন কোনটাতে আবার একদিন, দু'দিনও লাগতে পারে। ফটোগ্রাফের যেকোন একখানা নেগেটিভ এভাবে পাতার উপর চাপিয়ে দিলেও দেখবে, ফটোগ্রাফের ছবিটি পাতার উপর ফুটে উঠবে। কিন্তু লক্ষ্য রাখবে রোদ খুব তীব্র না হয়। তীব্র রোদে কাচ তেঁতে গিয়ে পাতাটাকে ঝল্‌সে দিতে পারে। কাচ ছাড়া যে কোন স্বচ্ছ জিনিষে ছবি এঁকেও এভাবে পাতার গায়ে তোলা যেতে পারে। একটু পুরু কালো কাগজে নক্সা কেটে নিয়ে তাকে পাতার উপর বসিয়ে দিলেও কিছুক্ষণ রোদ পাবার পর হুবহু সেই নক্সা পাতার গায়ে ফুটে উঠবে।

ব্যাপারটা কেমন করে ঘটে মোটামুটি একটু বুঝিয়ে বলছি—ঘাসের উপর ইট বা কোন কিছু পদার্থ চেপে থাকলে কিছুকাল পরে তুলে ফেললে দেখা যায়—চাপা-পড়া ঘাসগুলো সম্পূর্ণ সাদা হয়ে গেছে। তার মানে, রোদ না পেলে গাছের পাতার সবুজ রংটা তৈরী হয় না। কাচের গায়ে কালো কালিতে ছবি আঁকার ফলে কালির রেখারগুলোর ভিতর দিয়ে পাতার গায়ে রোদ পড়তে পারেনা। কাজেই যে-জায়গাটায় রোদ পড়ে সেটা বেশ সবুজই থাকে; কিন্তু রোদ না-পাওয়া জায়গাগুলো ক্রমশঃ ফ্যাকাশে হতে থাকে। এ-কারণেই সবুজ পাতার ওপর ফ্যাকাশে বা ফিকে সবুজ রঙের ছবি দেখা যায়। আইওডিন সলিউশনে ডুবিয়ে অবশ্য এ-ছবিগুলোকে ফটোগ্রাফের ছবির মতই পাতার উপর স্থায়ী করা যায়; কিন্তু তাতে পাতাটাকে জীবন্ত অবস্থায় রাখা চলে না। অবশ্য অতটা না করেও তোমরা সোজাসুজি পাতার গায়ে ছবিটাকে ফুটিয়ে তোলবার পরীক্ষাটা করে দেখতে পার।

কাগজের চলন্ত-মাছ

তোমাদিগকে এরচেয়ে আরও একটা সহজ পরীক্ষার কথা বলছি। এ-পরীক্ষাটা তোমরা প্রত্যেকে অনায়াসেই করতে পারবে। পোষ্টকার্ডের মত পুরু এবং মসৃণ একখণ্ড কাগজ লও। কাঁচি দিয়ে কাগজটাকে কেটে একটা মাছের মত তৈরী কর। মাছটার শরীরের মধ্যস্থলে একটা ছিদ্র কর। ছিদ্রটা পেন্সিলের মত মোটা হলেই চলবে। এবার মাছটার লেজের মধ্যদিয়ে গোলাকার ছিদ্রটা পর্যন্ত সোজাসুজি খানিকটা ফাঁক করে সরু একফালি কাগজ কেটে ফেলে দাও। মাছটাকে দেখে মনে হবে যেন, মধ্যস্থলে গোল গর্ত থেকে লেজ পর্যন্ত সোজা একটা নালা চলে গেছে। কোন বড় চৌবাচ্চায়ই হোক কি কোন পুকুরেই হোক কাগজের মাছটাকে আস্তে জলের উপর ছেড়ে দাও। মাছটা জলের উপর বেশ ভাসতে থাকবে। এবার একটা কাঠির ডগায় করে গোলাকার ছিদ্রটার মধ্যে এক ফোঁটা তেল ছেড়ে দিলেই দেখবে কাগজের মাছটা সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছে। লক্ষ্য রেখ—জলটা বেশ পরিষ্কার হওয়া চাই। জলের উপর সামান্য সরের মত পদার্থ থাকলেও পরীক্ষা চলবে না। যদি চৌবাচ্চার জলে পরীক্ষা করতে চাও তবে প্রথম বার, পরীক্ষার পর চৌবাচ্চার জলের উপর তেল ছড়িয়ে পড়লে সেটাকে তুলে না ফেলা পর্যন্ত সেখানে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করা মুস্কিল হবে, কাজেই পুকুরের জল বা ট্রে'র মত কোন অগভীর পাত্রে জল রেখে পরীক্ষা করাই ভাল। ট্রে'র জলে একবার তেল ছড়িয়ে পড়লে তা' ফেলে দিয়ে আবার জল ভর্তি করে পরীক্ষা করা চলে।

কেন এমন হয়? পরীক্ষাটা করে দেখলেই সেটা বুঝতে পারবে। জলের উপর এক ফোঁটা তেল ফেলে দিলে দেখবে তৎক্ষণাৎ সেটা পাতলা সরের মত ছড়িয়ে পড়ে। কাগজের গোলাকার ছিদ্রটা খুবই ছোট্ট জায়গা। তেলটা ওখানে ছড়িয়ে পরবার সুবিধা না পেয়ে নালার মত লম্বা ফাঁক দিয়ে সোজা লেজের দিকে বেরিয়ে যায়। সেই ধাক্কায় কাগজের মাছটা সামনের দিকে এগিয়ে চলে। আজকাল তোমরা যে রকেট বা জেট-প্রোপেলড্ এরোপ্লেনের কথা শুনতে পাও সেগুলো ঠিক এমনি করেই প্রচণ্ড গ্যাসের ধাক্কায় ছুটে চলে। উভয়েরই চলবার মূল রহস্য এক, পার্থক্য কেবল শক্তির তারতম্যে। আরও বড় হয়ে যখন এবিষয়ে আলোচনা করবে তখন একথা ভালকরে বুঝতে পারবে।

পাতার নাচন

এবার তোমাদিকে জলজ উদ্ভিদের একটা পরীক্ষার কথা বলব। পরীক্ষাটা খুবই সহজ, যদি একটু কষ্ট করে কোন পুকুর থেকে উদ্ভিদগুলো যোগাড় করতে পার।

খাল, বিল, পুকুরের জলে একরকমের লতানে গাছ জন্মে। তেঁতুলের পাতা দেখতে যেমন হয় এই জলজ লতার পাতাগুলোও অনেকটা সে-রকমের। এক একটা সরু লম্বা ডাঁটার চারদিকে পাতাগুলো যেন স্তরে স্তরে সাজানো থাকে। এই লতানে গাছগুলো সাধারণতঃ জল-ঝাঁঝি নামে পরিচিত। ইংরেজীতে বলে—হাইড্রিলা। পাড়াগাঁয়ে তো অভাবই নেই, কলকাতার মধ্যেও অনেক পুকুরে এগাছগুলোকে প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়।

একটা কাচের গ্লাসের অর্ধেকের কিছু বেশী জল ভর্তি কর। অল্প কয়েকটা পাতাসমেত জল-ঝাঁঝির কয়েকটা ডগা কেটে নিয়ে সেগুলোকে গ্লাসের জলে ছেড়ে দাও। দেখবে—কয়েকটা জলের তলায় ডুবে যাবে আবার কয়েকটা হয়তো ভেসে থাকবে। যেগুলো জলের তলায় ডুবে গেছে তার মধ্য থেকে দু'একটা ভারী ডগা রেখে বাকীগুলো ফেলে দাও। গ্লাসটাকে এবার এমন একটা জায়গায় রাখ যেখানে বেশ একটু আলো আছে।— আমরা যে সোডা-ওয়াটার খাই সেরকমের সাধারণ এক বোতল সোডা-ওয়াটার নিয়ে এসো। বোতলটা খুলে গ্লাসের জলে কয়েক ফোঁটা আন্দাজ সোডা-ওয়াটার ঢেলে দাও। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেই দেখবে—জল-ঝাঁঝির ডগাগুলো নীচ থেকে এবার ধীরে ধীরে জলের উপরের দিকে উঠে আসছে। জলের উপরে এসেই কাটা দিক থেকে খুব ছোট্ট এক ফোঁটা বুদ্বুদ ছেড়ে দিয়ে আবার আস্তে আস্তে গ্লাসের তলার দিকে নেমে যাবে। তারপর থেকে ডগাটা ক্রমাগতই এরূপ উপরে নীচে ওঠা-নামা করতে থাকবে।

একটু ভারী এবং সুবিধাজনক পাতা বাছাই করবার ওপরই এপরীক্ষার সাফল্য নির্ভর করে। পরীক্ষাটা একটু বুদ্ধি খাটিয়ে করতে হবে। যদি দেখ, পাতাটা ঠিকমত ওঠা-নামা করছে না, তবে ডাঁটা থেকে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে গ্লাসের জলে ফেলবে। দেখবে—প্রত্যেকটা পাতাই ওভাবে ওঠা-নামা করছে। যদি তাতে সুবিধা না হয় তবে আরও কয়েক ফোঁটা সোডা-ওয়াটার জলে ফেলে দিবে। পরীক্ষাটা যদি ঠিকমত করতে পার তবে নিজেই বুঝতে পারবে—কেন পাতাগুলো ওভাবে ওঠা-নামা করে এবং এথেকে আরও অনেক রকমের পরীক্ষার কথা তোমরা নিজেরাই উদ্ভাবন করতে পারবে। গ. চ. ভ

বিবিধ প্রসঙ্গ

পেনিসিলিনের উন্নত সংস্করণ

য়্যান্টিবায়োটিক্‌স্ এর মধ্যে পেনিসিলিনই বিশেষভাবে কার্যকরী। কিন্তু এর সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও প্রয়োগবিধি খুবই জটিল। পেনিসিলিনের এসব অসুবিধা দূর করবার জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা অনেকদিন থেকেই চেষ্টা করে আসছেন। খবর পাওয়া গেল—ফিলেডেলফিয়ার প্রসিদ্ধ ঔষধ-প্রস্তুতকারক ওয়াইয়েথ ইনকর্পোঃ সম্প্রতি উন্নত ধরণের পেনিসিলিন আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন। এই নতুন পেনিসিলিন প্রয়োগে নাকি নিউমোনিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা খুবই সহজসাধ্য হয়েছে। এই নতুন পেনিসিলিনের নাম দিয়েছেন তাঁরা "ওয়াইসিলিন" বা কৃষ্ট্যালাইন বোকেন পেনিসিলিন-জি। ঠাণ্ডা জায়গায় না রাখলেও শুষ্ক চূর্ণ অবস্থায় ওয়াইসিলিন অনেক কাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে। জলের সঙ্গে মিশিয়ে সাতদিন রেখে দিলেও এর শক্তি কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। সাধারণ পেনিসিলিন যেমন দিনে অন্ততঃ তিনবার ইনজেক্‌শন্ করতে হয়, ওয়াইসিলিন তেমন বারবার দেবার প্রয়োজন নেই। দিনে একবার ওয়াইসিলিন ইনজেক্‌শন্ দিলেই যথেষ্ট। বর্তমানে অবশ্য তৈলদ্রাবণে মিশ্রিত পেনিসিলিন অনুরূপ কাজ করে থাকে।

ভারতে শীঘ্রই ওয়াইসিলিন আমদানী করা হবে বলে জানা গেছে।

কয়লা থেকে ভারতে পেট্রল তৈরীর ব্যবস্থা

'হিন্দবার্তার' খবরে প্রকাশ, ভারত যাতে পেট্রল সম্পর্কে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল হতে পারে তার জন্যে পিঙ্গল বর্ণের এক রকম কয়লা থেকে কৃত্রিম পেট্রল উৎপাদন করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। ভারতে এ ধরণের পিঙ্গল বর্ণের কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমেরিকান, চেক ও ফরাসী বিশেষজ্ঞেরা এই কয়লার নমুনা নিয়ে সম্প্রতি যে পরীক্ষা করেছেন তার ফল খুবই সন্তোষজনক। রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে সম্প্রতি এধরণের কিছু কয়লা আমেরিকায় পাঠানো হয়েছে। ইতিমধ্যে ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ দপ্তর কৃত্রিম পেট্রল তৈরী করবার জন্যে একটি কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্য বিশেষজ্ঞদের উপদেশ ও টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্যে একটি আমেরিকান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা করছেন। আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট যদি সুবিধাজনক বিবেচিত হয় তবে ভারত সরকার ২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বছরে দশ লক্ষ টন কৃত্রিম পেট্রল তৈরী করবার উপযোগী একটি কারখানা স্থাপন করবেন।

সামুদ্রিক পীড়ার ঔষধ

বি, আই, এস-এর খবরে প্রকাশ—সম্প্রতি সমুদ্র পীড়ার একরকমের অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে। সামুদ্রিক-পীড়ায় সমুদ্র-ভ্রমনের সমস্ত উৎসাহ ও আনন্দ একেবারে নষ্ট করে দেয়। কুড়ি বৎসর পূর্বেও চিকিৎসকদের ধারণা ছিল যে সামুদ্রিক-পীড়ার কোন ঔষধ নেই। বিগত মহাযুদ্ধের সময় যখন দেখা গেল যে, নৌ-বাহিত আক্রমণকারী সৈন্যরা সামুদ্রিক-পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ছে তখন চিকিৎসকরা এই রোগের কোন ঔষধ আবিষ্কার করবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। তাঁদের চেষ্টা ফলবতী হয়েছে। সম্প্রতি হায়োসিন (Hyoscine) নামে একটি ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে যার প্রয়োগে সামুদ্রিক-পীড়ার উপশম হয়।

ঔষধটি বেলেডোনা জাতীয় বিষাক্ত গাছগাছড়া থেকে তৈরী। ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে নৌকায় করে অনেক লোক নিয়ে গিয়ে তাদের ওপর এই ঔষধ পরীক্ষা করে দেখা হয়। পরীক্ষায় আশ্চর্য সুফল পাওয়া যায়। ঔষধটির অতিসামান্য পরিমাণ প্রয়োগেই (১·২ মিলিগ্রাম) কাজ হয় এবং এই ঔষধ সেবনের ফলে শরীরে অন্য কোন উপসর্গ দেখা দেয়না।

'টাইফাস্' রোগের নূতন ঔষধ

বি, আই, এস খবর দিয়েছেন—'পেনিসিলিন' এবং 'ষ্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের' মত আর একটি ঔষধের আবিষ্কার নিয়ে বৃটিশ রাসায়নিক গবেষকগণ পরীক্ষা কার্যে ব্যাপৃত আছেন। ঔষধটির নাম 'ক্লোরো-মিকোটিন' (Chloromycotin)। 'টাইফাস্' রোগের বিরুদ্ধে ঔষধটির কার্যকারিতা অত্যাশ্চর্য। ঔষধটি বিষাক্ত নয় বলে সেবন-যোগ্য এবং প্রয়োজন-মত তার ইন্‌জেক্‌সনও গ্রহণ করা যায়। বর্তমানে মালয় দেশে এই ঔষধটি সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা হচ্ছে।

ভারতে ঔষধ ও রঙের কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা

১৭ই জুন, ইউ, পি'র খবরে প্রকাশ, ভারত সরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে রাঁচী সেক্রেটারিয়েট ভবনে দামোদর উপত্যকায় রাসায়নিক-শিল্প প্রতিষ্ঠা পরিকল্পনা কমিটির এক বৈঠক হয়ে গিয়েছে। বৈঠকের উদ্দেশ্য—দামোদর উপত্যকায় ঔষধ ও রঙের কারখানা স্থাপন সম্পর্কে আলোচনা। ভারত সরকার, দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন, বিহার ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ বৈঠকে যোগদান করেন।

প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ও রঞ্জক পদার্থ তৈরীর পরিকল্পনা ও বিবরণী পেশের জন্য ভারতে একদল জার্মান অভিজ্ঞ আনয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ভারতের যেসকল আবশ্যকীয় রং ও ঔষধপত্র প্রয়োজন স্যার জ্ঞানচন্দ্র তৎসম্পর্কে তথ্য ও সংবাদ পেশ করেন। ছয় থেকে আট মাসের মধ্যে যাতে পরিকল্পনা কার্যকরী হয় সেজন্য ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত হয়।

ভারতে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ প্রতিরোধক পদার্থ প্রস্তুত সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয় এবং তৎসম্পর্কে চার মাসের মধ্যে পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে রিপোর্ট দিবার জন্য কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হয়। বৈদ্যুতিক প্রণালীর সাহায্যে কষ্টিক সোডা, ক্যালসিয়াম কারবাইড প্রভৃতি যেসকল রাসায়নিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়, ভারতে সেরূপ কারখানা স্থাপন সম্পর্কে সভায় আলোচনা হয়।

আগামী জুলাই মাসে যুক্ত কমিটির পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে এবং তখন এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হবে।

'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র প্রবন্ধাদি কিরকম হওয়া উচিত

'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত প্রবন্ধাদির দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে অনেকেই অনুযোগ করছেন। জনৈক সদস্য লিখেছেন—শুনেছিলাম, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' প্রধানতঃ জনসাধারণের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলবার কাজে ব্রতী হবে এবং আশা করেছিলাম এর প্রবন্ধগুলো সর্বথা সুখপাঠ্য না হলেও সর্বজনবোধ্য হবে। সে আশাতেই বৈজ্ঞানিক না হয়েও বিজ্ঞান-পরিষদের সভ্য হয়েছিলাম। কিন্তু একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবন্ধই সাধারণ শিক্ষিত লোকের পক্ষে দুর্বোধ্য এবং কোন কোনটা কিঞ্চিৎ বোধগম্য হলেও তা' দুষ্পাচ্য। লেখকদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রেখেও একথা বলতে হচ্ছে যে, এসকল প্রবন্ধের বক্তব্য বা ভাবার্থ ব্যাহত না করেও সহজবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করা কিছুমাত্র অসম্ভব

নয়। কারো কারো অভিমত এই যে, প্রকাশিত বেশীরভাগ প্রবন্ধের বিষয়বস্তুই এমনভাবে নির্বাচিত হয়েছে যাতে বিজ্ঞান বিষয়ে জনসাধারণের কৌতূহল উদ্রিক্ত হওয়া দূরে থাক, একটা ভীতির ভাবই জাগ্রত করবে। জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার এবং তাদের বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি সম্পন্ন করে তোলাই যদি 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তা'হলে এধরণের প্রবন্ধাদি প্রকাশে সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, দেশের জনসাধারণ যাতে মাতৃভাষার সাহায্যে বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি পরিচয় লাভে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে সে উদ্দেশ্য নিয়েই 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' আত্মপ্রকাশ করেছে, একথা একাধিক বার সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু লোকরঞ্জক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদির সংখ্যাল্পতা ও অন্যান্য কারণে আমাদের আশানুরূপ প্রবন্ধাদি প্রকাশকরা সম্ভব হয়ে উঠছে না। তবে আশাকরি, অদূর ভবিষ্যতেই সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূর করে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' জনসাধারণের তৃপ্তি বিধান করতে সমর্থ হবে। আমরা যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় যথোপযুক্ত ভাব-প্রকাশক প্রবন্ধাদি প্রকাশ করতেই ইচ্ছুক। তবে বিজ্ঞানের এমন অনেক বিষয়বস্তু আছে যা' ভাষার সরল প্রকাশভঙ্গীকে কতকটা নিয়ন্ত্রিত করবেই। তাছাড়া গল্প উপন্যাসের মত মনোরম ও সুখপাঠ্য ভাষায় বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ই আলোচনা করা দুরূহ ব্যাপার। বিজ্ঞানের প্রধান বিষয় হলো তত্ত্ব ও তথ্যাদির নির্ভুলতা ও যথার্থতা বজায় রাখা। কাজেই ভাষার মাধুর্য রক্ষা করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তথ্যের যাথার্থতার হানি ঘটা অসম্ভব নয়। সে বিষয়ে লেখককের সর্বদাই সতর্ক থাকা দরকার। লেখা একটা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। বিশেষজ্ঞ হলেই যে, সুখবোধ্য প্রবন্ধরচনা-কৌশল তাঁর আয়ত্বাধীন হবে এমন কোন কথা নেই। এবিষয়ে বিশেষ চর্চার প্রয়োজন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-সাহিত্য চর্চা অপেক্ষাকৃত খুব কম লোকেই করে আসছেন। দেশের স্বাধীনতা লাভের পর এখন সব কিছুরই পরিবর্তণ ঘটছে। বাংলাভাষা আমাদের দেশে এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধান্য লাভ করছে। কাজেই বিজ্ঞান-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এ অভাব আমাদেরই দূর করতে হবে। দেশের বিজ্ঞানীরা তাঁদের বিজ্ঞান চর্চা মাতৃভাষায় প্রকাশ করতে আরম্ভ করলে বাংলা-সাহিত্যের এ অভাব পূরণে বেশী দেরী হবে না।

বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ এবং বিজ্ঞান চর্চায় নিযুক্ত প্রত্যেককে আমরা সাদর আহ্বান জানাচ্ছি যেন তাঁরা অন্ততঃ বিজ্ঞানের সাধারণ ও চিত্তাকর্ষক বিষয়গুলো সহজ সরল ভাষায় 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানের' পৃষ্ঠায় আলোচনা করতে অগ্রসর হন। বিষয় যদি বলবার মত হয় তো সুষ্ঠু ভাষায় প্রকাশ করতে না পারলেও যথাযথ বিবরণী লিখে পাঠালে আমরা তার যথোচিত ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করবো। সর্বশেষে লেখকদের প্রতি এই অনুরোধ জানাচ্ছি—তাঁরা বিশেষজ্ঞদের জন্যে লিখছেন না, লিখছেন জনসাধারণের জন্যে—এ কথা মনে রেখেই যেন প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচন এবং বক্তব্য পরিবেশনের ব্যবস্থা করেন।

ভ্রম-সংশোধন

গত মে সংখ্যার 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে' প্রকাশিত 'রাশি-বিজ্ঞানের প্রস্তাবনা' নামক প্রবন্ধের লেখকের নাম হবে শ্রীবীরেন্দ্র নাথ ঘোষ, ভুলক্রমে শ্রীধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ ছাপা হয়েছে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

প্রথম বর্ষ   জুলাই—১৯৪৮   সপ্তম সংখ্যা

বিজ্ঞানের খুঁটি

শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

আমাদের শাস্ত্রে বলেছে ধর্মের চারটি খুঁটি; তাই ধর্মকে চতুষ্পদ বৃষরূপে কল্পনা করা হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও তাঁদের পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বিজ্ঞানেরও তিনটি খুঁটি। এ খুঁটি তিনটির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়াই হচ্ছে এ লেখার প্রধান উদ্দেশ্য।

বিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ এ তিনটি খুঁটিকে তিনটি সাঙ্কেতিক অক্ষরে প্রকাশ করে থাকেন, এরা হচ্ছে রোমান বর্ণমালার তিনটি অক্ষর—সি (*c*), জি (*g*), ও এইচ (*h*)। দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ যেমন 'ক' বললে কৃষ্ণকে কিম্বা 'হ' বললে হরিকে স্মরণ করতেন, সেরূপ বিজ্ঞানীদের নিকট 'সি' হচ্ছে আলোর গতিবেগ, 'জি' হচ্ছে বেগের বৃদ্ধিহার এবং 'এইচ' হচ্ছে ক্রিয়ার একক। বিজ্ঞানের গ্রন্থে তাই এদের তিনটি বিশিষ্ট সংখ্যাবাচক অক্ষররূপে গণ্য করা হয়। কারণ, আলোর গতিবেগ, বেগের বৃদ্ধিহার বা ক্রিয়ার একককে সংখ্যার সাহায্যেই আমরা প্রকাশ করে থাকি। এখন এদের প্রত্যেকটির সঙ্গে পাঠকগণের পরিচয় করে দেবার চেষ্টা করব। প্রায় ২৫০ বছর আগে বিজ্ঞানীরা প্রথম খুঁটি দুটির (সি এবং জি) আবিষ্কার করেন; যদিও আধুনিক যুগের পরীক্ষার ফলে এদের সম্বন্ধে এমন সব নূতন খবর পাওয়া গেছে যাতে তাদের অবয়ব গেছে অনেক বদল হয়ে। বাকী খুঁটিটি (এইচ) হচ্ছে আধুনিক যুগের আবিষ্কার।

১ নং খুঁটি—আলোর গতিবেগ—'সি (*c*)'

বড় একটি অন্ধকার হল ঘরে রাত্রে প্রবেশ করে বিজলী বাতির চাবিকলে টিপ্ দিয়ে যখন আলো জ্বালা হয়, সঙ্গে সঙ্গেই যে বাতিটি জ্বলে উঠে তা আমরা দেখতে পাই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ বিজলী বাতির জ্বলে ওঠা এবং আমাদের পক্ষে প্রথম আলোর অস্তিত্ব অনুভব করা, এ দু'ঘটনার মধ্যে সময়ের কোন ফাঁক থাকতে পারে কি না? অর্থাৎ বিজলী বাতি হতে আলো বেরিয়ে আমাদের চোখে এসে পড়তে আদৌ কোন সময়ের দরকার হয় কি না? এ প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করেন প্রথমে ডেনমার্ক-নিবাসী জ্যোতির্বিদ রোমার ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে। বৃহস্পতিগ্রহের কয়েকটি উপগ্রহ আছে। এরা সব বৃহস্পতির চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, চন্দ্র যেমন

আমাদের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে বেড়ায়। বৃহস্পতির প্রথম উপগ্রহের পর পর গ্রহণ কালের তারতম্য হতে তিনি প্রমাণ করেন যে, আলোর গতিরও একটি নির্দিষ্ট বেগ আছে; এ অসীম বা অপরিমেয় নয়। তবে এ বেগ এত বেশি যে, তা' আমাদের সহজ অনুভূতিতে আসে না। এ বেগের মান হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল। অর্থাৎ আলোক-তরঙ্গ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে চলে। এ বেগের পরিমাণের ধারণা করতে হ'লে একটি কাল্পনিক দৃষ্টান্তের সাহায্য নিতে হয়। মনে করা যাক, হিমালয়ের সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেষ্টের উপর একটি প্রকাণ্ড বিজলী বাতি বসান হয়েছে। এ বাতিটি আবার একটি কালো রংএর বাক্সের মধ্যে রাখা হয়েছে। এ বাক্সের এক পার্শ্বে একটি ছিদ্র এবং তার উপর একটি ঢাকনি আছে। অমাবস্যার রাত্রে যদি ঐ বিজলী বাতিটি জ্বালান যায় এবং তার বাক্সের ছিদ্রের উপরের ঢাকনিটি সরান হয় তবে সে ছিদ্রপথে যে আলো বেরিয়ে আসবে, তাকে যদি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গের উপর বড় বড় আর্শি এবং লেন্স রেখে কৌশলে পুনরায় তার উৎপত্তি স্থানে ফিরিয়ে আনা হয়, তবে দেখা যাবে যে, সমস্ত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসতে তার লাগবে মাত্র এক সেকেণ্ডের ৭ ভাগ কি ৮ ভাগের এক ভাগ সময়। অর্থাৎ এক সেকেণ্ডে আলোক-তরঙ্গ যতখানি পথ চলে, তাতে সে ৭ বার কি ৮বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারে।

১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ জ্যোতির্বিদ ব্রেডলি, ১৮৪৯ এবং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বিজ্ঞানী ফিজো ও ফুকো এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মার্কিন বিজ্ঞানী মিকেলসন আলো-চলার বেগ নির্ণয় করবার জন্য বিশেষ কৌশল ও সতর্কতা সহকারে নূতন নূতন পরীক্ষার উদ্ভাবন করেন। এর মধ্যে মিকেলসনের পরীক্ষাই সবচেয়ে নির্ভুল এবং নিখুঁত বলে বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন। এর ফলে আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬,৩১৭ মাইল হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে। যাকে বিজ্ঞানের ১নং খুঁটি বা "সি" বলা হয়েছে তার মান হচ্ছে সুতরাং ১৮৬,৩১৭ মাইল। পাঠক হয়ত প্রশ্ন করবেন, বিজ্ঞানে আলোর বেগ নির্দেশক "সি" মার্কা এ সংখ্যাটির এত মূল্য কেন? এখন এ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মিকেলসন ও মরলি বিভিন্ন-দিকে আলোর গতিবেগ নির্ণয়ের যে পরীক্ষা করেন তাতে এক অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত তথ্যের আবিষ্কার হয়। তাঁদের পরীক্ষায় দেখা গেল যে, পৃথিবীর চলার পথের দিকে এবং ঐ পথের ডাইনে বা বাঁয়ে সমান পথ অতিক্রম করতে আলোর সমান সময় লাগে। তখনকার বিজ্ঞানীদের ধারণামতে এ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। কারণ, যে দিকে পৃথিবীর গতি সে দিকের এক মাইল দূরবর্তী কোন স্থান হতে আলো প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় দর্শকের নিকট ফিরে আসতে যে সময় লাগবে তা পৃথিবীর গতিবেগের সহিত আলোর গতিবেগ ও দিক সংযোগ করে গণনায় নির্ণয় করা যায়। সেরূপ পৃথিবীর গতির ডাইনে বা বাঁয়ে একমাইল দূরবর্তী কোন স্থান হতে আলো প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় দর্শকের নিকট ফিরে আসতে যে সময়ের দরকার হয়, তাও গণনায় ঠিক করা যায়। এরূপ গণনার ফলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর চলার দিকে আলোর যাতায়াতের সময়, সমান পথে তার ডাইনে বা বাঁয়ে যাতায়াতের সময় হতে অনেক বেশি হয়। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল যে এ দু'দিকেই আলোর সমান পথে চলতে সমান সময় লাগে। পরীক্ষা এবং গণনার মধ্যে ঐ বৈষম্যের সমাধান করতে গিয়ে পরম বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছেন। পাঠক, হয়ত জানতে চাইবেন, এরূপে দুই ভিন্ন দিকে সমান পথে আলোর যাতায়াতের সময় যে সমান হবেনা, এরূপ প্রত্যাশা করবার কোন সঙ্গত কারণ ছিল কি? এ কথা সহজে বোঝাবার

জন্য একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ঘণ্টায় ৬ মাইল চলতে পারে যদি এরূপ একটি ষ্টীম-লঞ্চ যোগাড় করা যায় তবে এর সাহায্যে আমরা যে কোন নদীর উপর দিয়ে যাতায়াত করতে পারি। মনে করা যাক, গঙ্গাবক্ষে প্রিন্সেপস্‌ ঘাটের সামনে লঞ্চটি বাঁধা আছে। গঙ্গায় যখন ভাঁটা পড়ে তখন স্রোতের বেগ হয় দক্ষিণমুখী ডায়মণ্ডহারবারের দিকে। লঞ্চটি খুলে এখন যদি নদীর ওপারে পাড়ি দিয়ে ঘাটে ফিরে আসা যায়, ধরা যাক তাতে ঠিক দু'মাইল পথ লঞ্চে করে চলা হয়, এবং এতে আধঘণ্টা সময় লাগে। এখন যদি আবার সে লঞ্চে করে দক্ষিণমুখে স্রোতের অনুকূলে এক মাইল পথ গিয়ে আবার স্রোতের প্রতিকূলে ঘাটে ফিরে আসা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, এবার ঐ সমান পথেই চলাচল করতে লঞ্চের সময় লেগেছে আধঘণ্টারও অনেক বেশি। স্রোতের বেগ জানা থাকলে এ উভয় ক্ষেত্রের প্রত্যেক দিকে লঞ্চে চলাচল করতে কত সময় লাগবে তা' গতিবিদ্যার গণনায় হিসাব করা যায়। এবং এ হিসাব পরীক্ষিত ঘটনায় যে সময়ের বৈষম্য দেখা যায় তার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলে যায়। কাজেই আলো-চলার বেলায় যখন দুই ভিন্ন দিকে সমান পথে চলার সময় সমান হতে দেখা যায়, তখন তা' যে অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক বলে মনে হবে, এতে আর সন্দেহ করবার কারণ কি? আলো-চলার বেগ যদি সকল ক্ষেত্রেই এক থাকে তবে গণনার ফলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরীক্ষার ফলের এ ব্যতিক্রমের কারণ কি, এরই মীমাংসা করেছেন আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বে।

আইনষ্টাইনের মতে যাকে আমরা প্রকৃতির বিধান বা নিয়ম বলে মেনে নিতে পারি তা হবে সকল ক্ষেত্রেই, সকল অবস্থাতেই, সকল কালে এবং সকল দেশে অপরিবর্তনীয়। এ স্বীকার করে না নিলে বিজ্ঞান চলতে পারে না। কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটলে তার কারণ খুঁজতে হবে অন্যত্র। প্রকৃতির বিধান বা নিয়ম মাত্রকেই স্বতঃসিদ্ধ বা স্বতঃস্বীকার্য রূপে গ্রহণ করতে হবে। এরাই হচ্ছে নিত্য শাশ্বত ও সনাতন সত্য। আলো-চলার বেগ, যাকে আমরা "সি" বলে প্রকাশ করি এবং যার মান হচ্ছে নির্বাতদেশে সেকেণ্ডে ১৮৬,৩১৭ মাইল, এও হচ্ছে এরূপ একটি পরমসত্য বা প্রকৃতির বিধান, একেই ভিত্তি করে আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। এখানে একটি কথা বিশেষ করে বলা আবশ্যক যে, যখনই আমরা আলো-চলার বেগ বা "সি" এর উল্লেখ করি, তখনই বুঝে নিতে হবে যে, এ হচ্ছে নির্বাত স্থানে বা দেশে আলো-চলার বেগ।

মিকেলসন ও মরলির পরীক্ষার অপ্রত্যাশিত ফলের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানী ফিটজগেরাল্ড ও লোরেঞ্জ সিদ্ধান্ত করলেন যে, কোন বস্তুর বেগ যখন বাড়তে থাকে তার বেগের অভিমুখী বিস্তারও ঐ অনুপাতে কমতে থাকে। কিন্তু আইনষ্টাইন এরূপ ব্যাখ্যায় সায় দিলেন না। তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, ঐ অবস্থায় কোন স্থির-দর্শক বস্তুর বিস্তারের কমতির সঙ্গে সঙ্গে সময়ের বিস্তারের বাড়তিও ঘটছে এরূপই প্রকৃতপক্ষে অনুভব করে। অর্থাৎ কোন অচল দর্শক যদি দূরবীনযোগে প্রচণ্ডবেগে চলনশীল কোন উড়োজাহাজে ঝোলান ঘড়ির কাঁটার চলাচল পরীক্ষা করেন, তাহলে তাঁর বোধ হবে যে, ঐ ঘড়ির কাঁটা খুব আস্তে আস্তে চলছে। অর্থাৎ তাঁর নিজের হাতের ঘড়ির কাঁটা যখন ১ মিনিট চলে সেই সময়ে ঐ উড়োজাহাজের ঘড়ির কাঁটা চলবে এক মিনিটেরও কম। অঙ্কযোগে দেখান যায় যে, যদি উড়োজাহাজের বেগ আলোর বেগের সমান হয় তবে ঐ জাহাজের ঘড়ির কাঁটা হবে একেবারেই অচল। অর্থাৎ আমাদের দর্শকের তখন বোধ হবে যে ঐ উড়োজাহাজে কালের প্রবাহ গেছে লোপ হয়ে। ফিটজগেরাল্ড ও লোরেঞ্জের সিদ্ধান্তেও এ অবস্থায় বেগের অভিমুখে বস্তুর বিস্তার হয়ে যায় লোপ। এরূপ অবস্থা উভয়ক্ষেত্রে কল্পনাতীত।

কাজেই বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করলেন যে, জড় জগতের কোন বস্তুই আলোর মত ঐরূপ প্রচণ্ড বেগে চলতে পারেনা। একথার প্রমাণ আরো একটি পরীক্ষায় পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানী কাউফমান (১৯০১ খৃঃ অঃ) ইলেকট্রনের ভর ও গতিবেগের সম্বন্ধ নির্ণয়ের পরীক্ষার ফলে দেখতে পেলেন যে, গতিবেগের বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনের ভরও ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। এ ক্ষেত্রেও অঙ্কযোগে দেখা যায় যে, যদি ইলেকট্রনের বেগ আলোর বেগের সমান হয়, তাহলে তার ভর হয়ে যাবে অসীম ; এ তখন সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ভরকেও যাবে অতিক্রম করে। একটি সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম, আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিদ্যুৎকণার ভর হবে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ভরের চেয়েও বেশি, ঘটনায় এরূপ কখনো ঘটতে পারেনা। এ যেন একটা সৃষ্টিছাড়া অর্থহীন আজগুবি সিদ্ধান্ত। তাই বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন যে বিশ্ব-জগতের কোন বস্তুই আলো-চলার সমান বেগে চলতে পারে না, তাই আলোর বেগ হচ্ছে সকল বেগের চরম বেগ। যাঁরা গীতা পাঠ করেন তাঁরা হয়ত একারণে আলোর বেগকে ভগবানের বিভূতি বলে আখ্যা দেবেন।

আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বের সাহায্যে বস্তুর ভর ও শক্তির মধ্যে একটি নূতন সম্বন্ধ আবিষ্কার করেছেন, যার সঙ্গে আলোর বেগের বা আমাদের "সি" মার্কা খুঁটির বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে। তিনি প্রমাণ করেছেন, শক্তি এবং বস্তুর ভরের পরস্পর বিনিময় ঘটতে পারে ; এদের মধ্যে মূলতঃ কোন ভেদ নাই। উভয়েই একই সত্তার এপিঠ ওপিঠ মাত্র। অর্থাৎ ভরকে শক্তির মানে, শক্তিকে ভরের মানে প্রকাশ করা যেতে পারে। কোন বস্তুর ভর যদি ৫ গ্রাম হয় তবে তাকে শক্তিতে প্রকাশ করতে হলে তার মান হবে আমাদের 'সি' এর বর্গফলের ৫ এর পুরক। 'সি' এর বর্গফল বলতে কি বুঝায়, একথা পাঠক ভেবে দেখবেন। বিজ্ঞানীদের চলতি প্রথায় 'সি' এর মান হচ্ছে প্রায় সেকেণ্ডে তিন হাজার কোটি সেন্টিমিটার (৩০০,০০০,০০০,০০) অর্থাৎ প্রায় ১৮৬,০০০ মাইল। এই তিন হাজার কোটি সেন্টিমিটারের বর্গ-ফলকে ৫ দিয়ে পূরণ করলে যে সংখ্যা হবে সে পরিমাণের শক্তি আমরা পাব ৫ গ্রাম ওজনের কোন বস্তুকে ভাঙিয়ে। এ হ'তে পাঠক অনুমান করতে পারেন, কি অফুরন্ত শক্তির ভাণ্ডার হচ্ছে এক একটি ক্ষুদ্র জড়কণা বা জড়াণু। গণনায় দেখান যায় যে, আধসের ওজনের বালিকে যদি সম্পূর্ণভাবে ভাঙিয়ে শক্তিতে পরিণত করা যায়, তবে দশ লক্ষ টন ডিনামাইটের সমান হবে তার ধ্বংসের ক্ষমতা। একথায় যদি কারো বিশ্বাস না জন্মে, তবে তিনি একবার জাপানে গিয়ে হিরোশিমা ও নাগাসাকি সহর দুটোর ধ্বংসাবশেষ দেখে আসতে পারেন।

আলোর বেগকেই পরম বেগ মেনে নিয়ে আধুনিক বিজ্ঞান অভাবনীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়েছে। তাই বিজ্ঞানের বহু সূত্র, রাশি, সমীকরণ ও তত্ত্বের মধ্যে "সি" এর এত প্রাধান্য দেখা যায়। এ কারণে আলো চলাচলের বেগ বা 'সি' হয়েছে বিজ্ঞানের একটি প্রধান খুঁটি।

২নং খুঁটি—বেগের বৃদ্ধিহার—জি (g)

এখন আমরা ২নং খুঁটি সম্বন্ধে আলোচনা করব। বিজ্ঞানে এর ডাক নাম হচ্ছে 'জি'। 'জি' বলতে বোঝায়—কোন পতনশীল বস্তুর বেগের বৃদ্ধি-হার। কোন বস্তু কি করে উপর হতে মাটির দিকে পড়তে থাকে তার প্রথম পরীক্ষা করেন ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও। তিনি দেখলেন ভারী, হাল্কা, ছোট, বড় সব জিনিষই নির্বাত স্থানে এক সঙ্গে ছেড়ে দিলে এক সঙ্গেই মাটিতে এসে পড়ে। কিন্তু বিজ্ঞানী নিউটনকেই এর আবিষ্কর্তা বলা যায়। গাছ থেকে আপেল পড়বার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি মহাকর্ষ-বলের প্রতিষ্ঠা ও 'জি' এর আবিষ্কার করেন। এসব কথা হয়ত অনেকেই অবগত আছেন। তিনি পরীক্ষায় দেখতে পেলেন

যে 'জি' এর মান হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে ৩২ ফিট। অর্থাৎ উড়োজাহাজে করে যাবার সময় কেহ যদি একটি পাথরের টুকরা ঐ জাহাজ হ'তে ফেলে দেয়, তবে উহা অল্প সময়ের মধ্যেই মাটিতে এসে পড়বে। এর মাটির দিকে পড়বার গতিবেগ যদি নির্ণয় করা যায়, তাহ'লে দেখা যাবে যে, প্রথম সেকেণ্ডের পর পাথরখণ্ডটির বেগ হবে ৩২ ফিট, দ্বিতীয় সেকেণ্ডের পর এর বেগ হবে ২×৩২ ফিট, তৃতীয় সেকেণ্ডের পর এর গতিবেগ হবে ৩×৩২ ফিট……ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যায় যে, প্রতি সেকেণ্ডে এর বেগের মান বেড়ে যায় ৩২ ফিট করে। এরূপে বেগ বাড়বার হারকে 'জি' বলে নামকরণ করা হয়েছে। একেই আশ্রয় করে নিউটন বলের সংজ্ঞা এবং গতির নিয়ম প্রতিষ্ঠা করেন। এবং এদের ভিত্তি করেই বল-বিজ্ঞানের অপূর্ব সৌধ ও বিজ্ঞানের হেতুবাদ বা কার্যকারণ-তত্ত্ব গড়ে উঠেছে। ফলে, উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা বিশ্বজগতের স্বরূপ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করেছেন, তাকে এ কারণে নিউটনের বিশ্বজগৎ বলা হয়ে থাকে। তাই 'জি' হয়েছে বিজ্ঞানের আর একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য খুঁটি। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে এর অক্ষুন্ন প্রতিপত্তি। যদিও বিংশ শতাব্দীতে আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার পর এর মাহাত্ম্য গেছে কিছু খর্ব হয়ে, তথাপি তার প্রাধান্যের কিছু হানি ঘটেনি, শুধু এর নিদান-তত্ত্ব গেছে বদলে। নিউটনের মতে বিশ্বজগতের শৃঙ্খলার মূলে ছিল মহাকর্ষ-বল। এবং মহাকর্ষ-বল ছিল পতনবেগের বৃদ্ধিহার 'জি' এর জন্মদাতা। আইনষ্টাইনের বিশ্বজগতে এ মহাকর্ষ-বল গেছে বাতিল হয়ে। দেশের অবয়ব বা জ্যামিতির বিশেষত্ব হ'তেই এখন গ্রহ উপগ্রহাদি হতে আরম্ভ করে সকল জড় পদার্থের গতিবিধি বর্ণনা করা যেতে পারে। পাঠক হয়ত জিজ্ঞাসা করবেন, দেশের অবয়ব বা জ্যামিতি আবার কি? দেশ বলতে আমাদের যে সাধারণ ধারণা তা হচ্ছে ঊর্ধ্ব, অধঃ, অগ্র, পশ্চাত এবং ডাইনে বাঁয়ে আকাশের বা শূন্যের বিস্তার। এ দেশকে তাই আমরা সাধারণতঃ ত্রৈমাত্রিক বলে থাকি। কিন্তু আইনষ্টাইনের প্রবর্তিত দেশের জ্যামিতি হচ্ছে চতুর্মাত্রিক। আমাদের ব্যবহারিক ত্রৈমাত্রিক দেশের সঙ্গে একমাত্রিক কালের সংযোজনা করে এ চতুর্মাত্রিক দেশের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ চতুর্মাত্রিক দেশের জ্যামিতি হচ্ছে অসমতল। পতনশীল পদার্থের বেগ বৃদ্ধির হার বা 'জি' এর মান এ হতে সঠিক নির্ণয় করা যায়। পাঠক হয়ত আপত্তি করবেন যে, বিষয়টিকে আমি একেবারে দুর্বোধ্য এবং জটিল করে তুলছি। অতএব এ নিয়ে আর অধিক আলোচনা করা সংগত নয়। সত্যই বিষয়টা জটিল। তবে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞানের ইতিহাসে 'জি' এর স্থান নির্ণয়। তাই বৈজ্ঞানিক মতবাদের গুরুত্বের দিক হতে ভেবে দেখলে বলা যায় যে, বিজ্ঞানের ২নং খুঁটি হ'বার এ সম্পূর্ণ উপযোগী।

৩নং খুঁটি—ক্রিয়ার একক—এইচ (h)

ক্রিয়ার একক হচ্ছে বিজ্ঞানের ৩নং খুঁটি। এর সাঙ্কেতিক নাম দেওয়া হয়েছে 'h'। জার্মান বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক হচ্ছেন এর প্রবর্তক এবং আইনষ্টাইন হচ্ছেন এর পরিপোষক। আধুনিক বিজ্ঞানে এর অপ্রতিহত প্রতিপত্তি। ক্রিয়ার একক বলতে কি বোঝায় প্রথমেই এর উত্তর দিতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, তেজঃশক্তি সর্বব্যাপী ইথর বা ব্যোমের মধ্যে স্পন্দন তুলে স্রোতের মত চলাচল করে; অর্থাৎ একে দানাদার বা কণিকা বিশিষ্ট বলা যায় না। এক মুঠো বালির মধ্যে একটি কণা যে আর একটি কণা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, এ আমরা সহজে দেখতে পাই। কিন্তু জলের উপর যখন ঢেউ খেলে যায় তখন সে ঢেউএর পংক্তিতে কোন বিরাম থাকে না; এও আমরা সর্বদা দেখতে পাই, এবং সাধারণতঃ বিশ্বাস করি। জলাশয়ের স্থির জলে কোন জায়গায় ঢিল

পড়লে তার আন্দোলন যেমন চারধারে তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে যায়, সেরূপ তেজঃশক্তিও ছড়িয়ে পড়ে শূন্যাকাশে বা ইথরের মধ্যে তরঙ্গ তুলে। ফলে জড়ের বিশিষ্ট ধর্ম যে অণু-প্রকৃতি এবং শক্তির বিশিষ্ট ধর্ম যে তরঙ্গ-প্রকৃতি, অর্থাৎ মেসিনগানের বা কলের কামানের গুলির মত যে, শক্তির চলাচল হতে পারে না, ইহাই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত। আলো-চলাচল সম্বন্ধে কিন্তু নিউটনের ধারণা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। নিউটনের মতে কোন দীপ্তিমান পদার্থ হতে যে আলোকরশ্মি চারদিকে ছড়িয়ে যায় তা সব আলোকণিকার সমষ্টিতে গঠিত; আলোকণিকার ধারাবর্ষণে দীপ্তিমান পদার্থ সমূহ তাদের সন্নিহিত প্রদেশ আলোকিত করে।

১৯০০ খৃঃঅব্দে বিজ্ঞানী প্লাঙ্ক তাপরশ্মির বিকিরণের নিয়ম পরীক্ষায় প্রমাণ করলেন যে, তাপশক্তির বিকিরণ ও শোষণ একটানা বা অবিরাম ঘটতে পারে না। এর ফলে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, তাপরশ্মিকে তাপ-কণিকার সমষ্টিরূপে মনে করা যেতে পারে। ইহাই হল প্লাঙ্কের শক্তিকণিকা বাদ। আলোকশক্তির বেলাতে ও যে এরূপ কণিকার ধর্ম বর্তমান রয়েছে, তা' প্রচার করলেন আইনষ্টাইন। এসব আলোক-কণিকার নাম হচ্ছে ফোটন। আলোর গতিবেগের সমান হচ্ছে এদের গতি। নিউটনের আলোক-কণিকা বাদ যেন এতে পুনর্জন্ম লাভ করল। এতে প্রমাণ হল যে, তেজঃশক্তি ও অবস্থাবিশেষে জড়ের বিশিষ্ট ধর্ম—অণুপ্রকৃতি গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এসব তেজাণু ও জড়াণুর মধ্যে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। আমরা জানি, জড় জগতে ৯২ প্রকার মৌলিক পদার্থ রয়েছে। এরা ৯২ প্রকার বিভিন্ন অণুতে গঠিত। এর সঙ্গে যদি একস্থানিক (isotopes) মূল পদার্থগুলিকে ও যোগ করা যায়, তা হ'লে এসব বিভিন্ন জড়াণুর সংখ্যা আরো কিছু বেড়ে যাবে। কিন্তু প্লাঙ্কের মতে তেজঃশক্তির বিভিন্ন অণুর সংখ্যার কোন নির্দিষ্ট সীমানা নেই। তেজ-তরঙ্গের প্রত্যেক দৈর্ঘ্যের বা প্রত্যেক স্পন্দনমাত্রার অনুযায়ী এক এক প্রকার তেজাণুর সৃষ্টি হতে পারে। এক একটি তেজাণুর অন্তর্নিহিত শক্তি তেজ-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বা কম্পনমাত্রার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বেশি হলে বা তার কম্পনমাত্রা কম হলে তেজাণুর শক্তিসমষ্টিও যায় কমে। তেজাণুর শক্তির সহিত তার কম্পনমাত্রার যে সঠিক সম্বন্ধ তা প্রকাশ করা হয় একটি ধ্রুবক বা নিত্যসংখ্যার সাহায্যে। এরই সাঙ্কেতিক চিহ্ন হচ্ছে "এইচ"। কোন বিশিষ্ট তেজ-রশ্মির কম্পন মাত্রাকে যদি নিত্যসংখ্যা "এইচ" দিয়ে গুণ করা যায় তবে সে গুণফলই হবে উক্ত তেজাণুর শক্তির মান। কম্পন বা স্পন্দন মাত্রা কাকে বলে তা হয়ত পাঠক জানতে চাইবেন। প্রতি সেকেণ্ডে কোন স্থানে তেজ-তরঙ্গের যতটা পূর্ণ স্পন্দন বা কম্পন হয় তাকেই তার স্পন্দন বা কম্পন মাত্রা বলা হয়। ইহা তেজ-তরঙ্গের গতিবেগ ও দৈর্ঘ্যের ভাগফল। তেজাণুর শক্তি ও তেজ-তরঙ্গের কম্পনমাত্রার মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়কারী নিত্যসংখ্যা "এইচ"-কে প্লাঙ্কের ধ্রুবক বা প্লাঙ্কের নিত্যসংখ্যা বলা হয়। এ হচ্ছে প্রকৃতির একটি সনাতন বা শাশ্বত নিত্যসংখ্যা। এ ধ্রুবক বা নিত্যসংখ্যার সাহায্যে আধুনিক বিজ্ঞানের বহু জটিল সমস্যার সমাধান হয়েছে। একেই কেন্দ্র করে আধুনিক বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে বললে কিছু মাত্র অত্যুক্তি হয় না। এ ধ্রুবকের মান হচ্ছে—৬.৫৫×১০^{-২৭} আর্গ সেকেণ্ড। একে 'ক্রিয়ার একক' বলা হয়; কারণ এ হচ্ছে শক্তি এবং তেজ-তরঙ্গের একটি মাত্র কম্পনের কালের গুণফল। বল-বিজ্ঞানে শক্তি এবং কালের গুণফলের নাম হচ্ছে **'ক্রিয়া'**। এসব তেজাণু বা ফোটনের একটি অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে। যদিও এরা শক্তি সামর্থ্যে সবাই সমান হয় না, তথাপি এরা যখন আকাশপথে ছোটাছুটি করে তখন এদের সবারই গতিবেগ হয় সমান। এ গতিবেগ হচ্ছে আলোর গতিবেগ অর্থাৎ প্রতি

সেকেণ্ডে ১৮৬,৩১৭ মাইল। ফোটনের দেশে রাষ্ট্রতন্ত্র হচ্ছে পুরাদস্তর কমিউনিষ্টিক, এখানে ধনী দরিদ্রে জাতিভেদ নেই। ২নং খুঁটির আলোচনায়ও আমরা দেখেছি যে ছোট বড় মাঝারি ভারী হাল্কা সকল রকমের জিনিষই যখন এক সঙ্গে আকাশ হতে মাটির দিকে পড়তে থাকে তখন তাদেরও গতিবেগ সব সমান হয়। তেজাণু এবং জড়াণুর ধর্ম এখানে যাচ্ছে মিলে।

বিজ্ঞানে এ শক্তিকণিকাবাদের প্রবর্তনের ফলে জড়ের ও শক্তির স্বাতন্ত্র্য গেছে ঘুচে। সে সব বিষয় এখানে বিস্তারিত আলোচনা করবার উপযোগী স্থান নয়।

ক্রিয়ার একক বা 'এইচ' আধুনিক বিজ্ঞানের যে একটি প্রধান খুঁটি এই ছিল আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। পরমাণু বিজ্ঞানের যাবতীয় তত্ত্ববাদ একেই আশ্রয় করে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

বিজ্ঞানের বিশ্বরাজ্যকে বিজ্ঞানীরা তিনটি বিভিন্ন প্রদেশে ভাগ করে থাকেন, সূক্ষ্ম, বিশাল ও মাঝারি। বিজ্ঞানের এ তিনটি প্রদেশ এ তিনটি খুঁটিকে আশ্রয় করে অবস্থিতি করছে; অণুপরমাণুরূপ সূক্ষ্ম রাজ্যের আশ্রয় হচ্ছে ৩নং খুঁটি 'এইচ,' আমাদের ব্যবহারিক মাঝারি জগতের ভিত্তি হচ্ছে ২নং খুঁটি 'জি,' এবং বিশাল নক্ষত্র রাজ্য যার উপর অবস্থিতি করছে সে হচ্ছে ১নং খুঁটি 'সি'।

বিজ্ঞানের তিনটি খুঁটির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া গেল। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি ধর্ম যদি চতুষ্পদের সম্মান দাবী করতে পারে, বিজ্ঞানের দাবীও তা হ'তে বড় কম যায় না।

নিউ মেক্সিকো হতে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা সংলগ্ন ভি-২ রকেট ছেড়ে ১০০ মাইল উপর থেকে পৃথিবীর এই ফটোগ্রাফটি তোলা হয়েছে। ২০০,০০০ বর্গমাইলেরও বেশী জায়গার ছবি উঠেছে। পৃথিবীর এই আংশিক ফটোগ্রাফ থেকেই পৃথিবী যে গোল তার পরিষ্কার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। —'এণ্ডেভার' থেকে গৃহীত

গ্রামোফোন-রেকর্ড প্রস্তুত প্রণালী

শ্রীশচীন্দ্রকুমার দত্ত

মানুষের দেহ নশ্বর কিন্তু তার কণ্ঠস্বরকে অবিনশ্বর করে তোলার জন্যে বিজ্ঞানীর চেষ্টার বিরাম নাই। কণ্ঠস্বরকে যন্ত্রের ভেতর চিরকালের জন্যে আটকে রাখার প্রণালী আবিষ্কার করেন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক টমাস্ আলভা এডিসন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে। প্রথমতঃ মোমের তৈরী রেকর্ডে শব্দ-তরঙ্গ গৃহীত হ'ত, সেই মোম নির্মিত রেকর্ড থেকেই আবার শব্দের পুনরুৎপাদন করা হ'ত। ১৮৯৫ সালে এমিল বারলিনার-ই প্রথম আধুনিক লাক্ষা নির্মিত রেকর্ড তৈরী করেন। লাক্ষা, ছেঁড়া কম্বল, বেরিয়ম সালফেট, ট্রিপোলি পাউডার, প্রদীপের কালি ইত্যাদি এক সঙ্গে মিশিয়ে ভাল করে গুঁড়ো করা হয়। তারপর উত্তপ্ত রোলারের ভেতর দিয়ে চালনা করার ফলে মসৃণ কাল প্লেটে পরিণত হয়। ঠাণ্ডা করার পর, এই প্লেটগুলো বেশ শক্ত হয়ে যায়। রেকর্ড তৈরীর কারখানায় প্রধানতঃ তিনটি বিভাগ আছে, এই তিনটি বিভাগে ক্রমান্বয়ে রেকর্ডিং বা শব্দ গ্রহণ, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং এবং রেকর্ডের পূর্ণরূপ প্রদান করা হয়ে থাকে।

স্টুডিও ঘর গায়িকার সুললিত কণ্ঠস্বরে মুখরিত হয়ে উঠেছে,—সঙ্গে সঙ্গে তার সেই কণ্ঠসঙ্গীত যন্ত্রের ভিতরে বন্দী হয়ে চলেছে চিরকালের জন্যে। একটা ঘূর্ণায়মান টেবিলের ওপর স্থাপিত থালার মতো আকৃতি পুরু মোমের প্লেটের ওপর শব্দ-তরঙ্গ গৃহীত হয়ে থাকে। এই প্লেট প্রধানতঃ প্যারাফিন ও মৌচাকের মোম এবং ষ্টিয়ারিক এসিড, সোডিয়ম ষ্টিয়ারেট প্রভৃতি সংমিশ্রণে তৈরী করা হয়। ষ্টিয়ারিক এসিড, কষ্টিক সোডা, এলুমিনিয়াম হাইড্রেট এবং জাপানী মোম সহযোগেও এই ধরনের প্লেট তৈরী করা যায়। এগুলো গলিয়ে ছাঁচে ঢালা হয়। সাধারণতঃ এই প্লেটগুলোর ব্যাস ১২ থেকে ১৪ ইঞ্চি এবং দেড় থেকে তিন ইঞ্চি পুরু হয়ে থাকে। এই মসৃণ মোমের প্লেট ঘূর্ণায়মান টেবিলের ওপর রেখে শব্দগ্রাহক যন্ত্রের সূচের অগ্রভাগ সেই প্লেটের এক প্রান্তে স্থাপন করা হয়। সেই যন্ত্রের শব্দ-গ্রহণ-কক্ষে কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের পাতলা পর্দা বা ঝিল্লী স্পন্দিত হয়ে ওঠে। সেই স্পন্দন সংক্রামিত হয় যন্ত্রসংলগ্ন সূচের অগ্রভাগে, আর সেই স্পন্দনশীল সূচ উঁচু নীচু আঁকাবাঁকা রেখা অঙ্কিত করে চলে ধীরে ধীরে ঘূর্ণায়মান মোমের প্লেটের ওপর। পরিধির এক প্রান্ত থেকে সূচের পরিক্রমণ সুরু হয়, আর ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে প্লেটের কেন্দ্রস্থলে এসে তার যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটে। রেকর্ডের প্রারম্ভিক গঠন এখানেই শেষ হয়।

তারপর আসে রেকর্ড গঠনের দ্বিতীয় পর্যায়। মোমের তৈরী রেকর্ড খানা ইলেক্ট্রোপ্লেট করার জন্যে রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত পাত্রে ডোবান হয়, বিদ্যুৎ পরিবাহনের ফলে রেকর্ডের ওপর তামার একটা স্তর পড়ে যায় এবং সেই রেকর্ডের গায়ে অঙ্কিত উঁচু নীচু গর্ত বা খাদের ভেতর পর্যন্ত তামাদ্বারা ভর্তি হয়ে যায়। তামার স্তর বেশ পুরু হবার পর সেটা খুলে নেওয়া হলে দেখা যায় যে, মোমের প্লেটের ওপর অঙ্কিত রেখা গুলো তামার প্লেটের ওপর স্পষ্ট ছাপ রেখে গেছে। এই তামার প্লেটকে বলা হয় মাষ্টার প্লেট। আঁলোক-চিত্রের নেগেটিভের মতো এটাও মোমের প্লেটের ওপর অঙ্কিত শব্দ-তরঙ্গের হুবহু প্রতিলিপি বা নেগেটিভ। মোমের প্লেট থেকে এই একটি মাত্র নেগেটিভ তৈরী করাই সম্ভব, কারণ একবার তাম্র স্তরীভূত করার

পর মোমের প্লেটের ওপর অঙ্কিত খাদগুলো নষ্ট হয়ে যায়। তামার প্লেটের ওপর পূর্ব প্রক্রিয়া অনুসারে আবার নিকেল স্তর গঠন করা হয়। নিকেল প্লেটে অঙ্কিত রেখাগুলো পূর্বে মোমের প্লেটের গায়ে অঙ্কিত রেখার অনুলিপি বা ডুপ্লিকেট। এই নিকেল প্লেটকে বলা হয় মাদার প্লেট। এই ধরণের নিকেল প্লেট অনেকগুলো তৈরী করা সম্ভব। এই ভাবে প্রত্যেক নিকেল প্লেট থেকে আবার পূর্বোক্ত প্রণালীতেই নতুন প্লেটে ছাপ তোলা হয়, এই নতুন তৈরী প্লেটগুলোই আসল রেকর্ডের ছাঁচ। এটা সহজেই বোঝা যায় যে, এই ছাঁচগুলো আসল রেকর্ড ও মোম নির্মিত রেকর্ডের নেগেটিভ মাত্র, কারণ মাদার প্লেটে অঙ্কিত খাদ বা গভীর দাগগুলোর ছাঁচ রেকর্ডের গায়ে উঁচু রেখায় পরিণত হয়েছে।

এইবার ছাঁচ থেকে আসল রেকর্ড তৈরী করার পালা। প্রথমেই বলা হয়েছে যে, রেকর্ডের প্রধান উপাদান হল লাক্ষা বা চাঁচগালা। এই কাজে যে গালা ব্যবহৃত হয় তাতে অদ্রবনীয় পদার্থ ও মোমের পরিমাণ কম থাকা প্রয়োজন। গালাকে ১৫০° সেন্টিগ্রেড তাপে গালিয়ে কিছুক্ষণ রাখার পর ঠাণ্ডা করলে ক্রমে ঘন হয়ে শক্ত চামড়ার মতো আঁশযুক্ত পদার্থে পরিণত হবে। চাঁচগালা প্রধাণতঃ লাক্ষা থেকেই তৈরী হয়, তাতে শতকরা ৫।৬ ভাগ মোম থাকে; তার সঙ্গে শতকরা চার পাঁচ ভাগ কোপাল-গাম নামক আঁঠাল পদার্থ মিশিয়ে দিলে গালার গুণ বেড়ে যায়। গালার সঙ্গে অন্যান্য খনিজ ও রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন—বেরাইটাস, কেওলিন নামক এক প্রকার মাটি, শ্লেটের গুঁড়ো, বালি ইত্যাদি মিশিয়ে দেওয়া হয়। এই সমস্ত পদার্থ খুব মিহি করে গুঁড়িয়ে সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত চালুনীতে ছেঁকে নেওয়া হয়। গালা গুঁড়ো করা খুবই অসুবিধাজনক, কারণ রোলারের ঘর্ষণে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাতে গালা গলে যাবে। গঁদ, রজন, প্রভৃতি গুঁড়ো করার জন্যে বিশেষভাবে তৈরী হাতুড়ীযুক্ত যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই ধরণের কলে গালাও গুঁড়ো করা হয়ে থাকে। তারপর সমস্ত উপাদানগুলো নির্দিষ্ট পরিমাণে মিশিয়ে গরম রোলারের সাহায্যে আঁঠাল পদার্থে পরিণত করা হয়। বাষ্পের সাহায্যেও এই যন্ত্রকে গরম রাখা যায়। অতঃপর এই প্ল্যাষ্টিকসের মতো পদার্থ ঠাণ্ডা রোলারের চাপে শক্ত হয়ে প্রায় ⅛ ইঞ্চি পুরু লম্বা পাতের আকারে যন্ত্র হ'তে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে, তখন এগুলোকে বড় বড় খণ্ডে কাটা হয়। তারপর সেগুলোর উপর ছাপ মারার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়।

ছাপ মারার জন্যে বিশেষভাবে তৈরী যন্ত্র আছে, সমস্ত কাজ এতে নিজ থেকেই চলে। একটি টেবিলকে ক্রমান্বয়ে গরম ও ঠাণ্ডা করার জন্যে বাষ্পবাহী নল ও ঠাণ্ডা জল পরিবাহী নল আছে। এই টেবিলের ওপর গালায় তৈরী প্লেট স্থাপন করা হয়, তার ওপর ছাপ-দেবার জন্যে পূর্ব প্রক্রিয়ায় তৈরী নেগেটিভ নিকেল-রেকর্ড-সংযুক্ত চাপমান দণ্ড ধীরে ধীরে নেমে আসে। সঙ্গে সঙ্গে বাষ্প পরিবাহনের ফলে টেবিলটি গরম হয়ে ওঠে এবং গালা গরম হয়ে যায়, কাজেই তার গায়ে স্পষ্ট ছাপ পড়ে যায়। এই চাপের পরিমাণ প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে প্রায় ¾ টন অর্থাৎ প্রায় ২০ মণ। তারপর বাষ্প প্রেরণ বন্ধ করে ঠাণ্ডা সঞ্চারিত করা হয় এবং ধীরে ধীরে চাপ-দণ্ড উপরে উঠে যায়। রেকর্ডের গায়ে স্পষ্ট ছাপ অঙ্কিত হয়ে থাকে। সেটা সরিয়ে নিয়ে আবার নতুন রেকর্ড সেখানে স্থাপন করা হয় এবং একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে। একটা রেকর্ডে ছাপ মারতে এক মিনিটেরও কম সময় লাগে। রেকর্ডগুলোকে গোলাকার করে কেটে নেওয়ার পর কাজ শেষ হয়ে যায়। এগুলোকে কালো রং করার জন্যে সাধারণতঃ নিগ্রোসিন, প্রদীপের কালি, অথবা জন্তুর হাড় পোড়ান কালি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বর্তমানে ধাতুর তৈরী রেকর্ড প্রচলনের চেষ্টা চলছে। এলুমিনিয়াম ধাতুর তৈরী রেকর্ডের ওপরে গালা ইত্যাদির আস্তরণ দেওয়ার পর তাতে বেশ ভাল ছাপ পড়ে। এই ধরণের রেকর্ডগুলো গরমে নষ্ট হয় না এবং খুব টেঁকসই হয়। একশ'বার বাজলেও রেকর্ড-নিঃসৃত স্বরধ্বনির কোন বিশেষ বিকৃতি ঘটে না। আজকাল প্ল্যাষ্টিক্‌স্ বা জৈব-কাঁচ নির্মিত জিনিষের খুব প্রচলন হয়েছে। ভূট্টা-নিঃসৃত প্রোটিন ফরমালডিহাইডের সঙ্গে মিশিয়ে এক ধরণের রজন জাতীয় জিনিষ তৈরী হয়। এই রজন গালার সঙ্গে মিশ্রিত করে উৎকৃষ্ট দাগহীন প্ল্যাষ্টিক্‌সের গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে প্ল্যাষ্টিক্‌সের আরও উন্নত ধরণের রেকর্ড তৈরী হবে এবং এগুলো হবে সস্তা, সুরম্য ও ঘাতসহ।

চাষ-আবাদের সহিত আমার পরিচয়

শ্রীঅরবিন্দকুমার দত্ত

ভারতবর্ষে প্রায় শতকরা ৭০।৭৫ জন লোক চাষ-আবাদের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ভাড়াটিয়া চাষী মাত্র, আর অনেকেই যাহারা নিজের জমি চাষ করেন, তাহাদের জমির আয়তন দুই হইতে ছয় একরের বেশী নয়। আমাদের দেশে কয়লা বা কাঠের অভাবে লোক জমির

নিউইয়র্কের বল্ডুইন গ্রামের কৃষিক্ষেত্রে লেখক ও তাঁর সহকর্মী জমিতে সার দিতেছেন

'সার' (গোবর) পোড়াইয়া থাকেন। ফলে, এক একর জমি এক টন 'সার' হইতেও কম পায়। হাড়, তৈলবীজ, মাছের 'সার' প্রভৃতি বৃটিশ আমলে আমাদের দেশ হইতে অবাধে রপ্তানী হইত এবং রাসায়নিক 'সার' আজও আমাদের দেশে ব্যবহার হইতেছে না বলিলেই চলে। ভূমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ ঘাস ও শিম জাতীয় গাছের চাষের অবসর নাই, কারণ চাষীকে একই জমিতে ক্রমাগত ধান, গম, বা তুলা চাষ করিয়া অতি কষ্টে অন্ন সংস্থান করিতে হয়।

সব রকমের চাষের জন্য অনুন্নত ধরণের লাঙ্গল ও গরু প্রভৃতির উপর আমাদের দেশের চাষীকে নির্ভর করিতে হয়। যে দেশে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা জগতের সর্বোচ্চ এবং যে দেশে ঐ সকল পশু সমস্বরে ডাকিয়া উঠিলে আমেরিকার সমগ্র ট্রাক্টরের মিলিত ধ্বনি কোথায় মিলাইয়া যাইবে—সেই ভারতবর্ষে চারণভূমি একরূপ নাই বলিলেই চলে। গবাদি গৃহপালিত পশু বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য হইয়া পড়িলে উহাকে বধ করা আমাদের দেশে অনেকেই রীতি-বিরোধী কার্য বলিয়া মনে করেন।

আমাদের দেশে অনেক স্থানে জল নিষ্কাশন ও সিঞ্চনের ব্যবস্থা না থাকায় লক্ষ লক্ষ একর জমি পতিত হইয়া রহিয়াছে। যানবাহন ও রাস্তাঘাটের অভাববশতঃ সমভাবে সকল অংশে কৃষি-উৎপন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। আধুনিক উন্নত ধরণের শস্যাগারের ও শস্য সংরক্ষনের ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি বৎসর বহু শস্য নষ্ট হয়। কৃষককুল অশিক্ষিত থাকার দরুণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উন্নত ধরণের চাষের জ্ঞান তাহাদের মধ্যে বিস্তার করা কঠিন। তদুপরি তাহাদের আয়ও অতি সামান্য, উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রণালী কাজে লাগানো তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ লোক ও গবেষণাকারীর সংখ্যা আমাদের দেশে নগণ্য; আবার মধ্যবিত্ত

শিক্ষিত বৈজ্ঞানিকগণ চাষীদিগকে নিতান্ত অবজ্ঞার চোখে দেখিয়া থাকেন। উপরন্তু ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কৃষিকার্যে পড়াশুনারও তেমন সুবিধা নাই।

উল্লিখিত কারণবশতঃ আমাদের দেশে কৃষককুল একান্ত দরিদ্র। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ প্রতি একরে অতি কম। ফলে এক বিরাট সংখ্যক অর্ধভুক্ত মানুষ ও পশুর দল ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া অসহায় ভাবে অকালে প্রাণত্যাগ করে।

আমাদের দেশে কৃষিকার্যে রত শিক্ষিত কর্মীরা সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায় কখনও নিজের হাতে চাষ করে না, অথচ এই সম্প্রদায়ের লোকেরাই কৃষিকার্যের উন্নতিকল্পে নিযুক্ত হইয়া থাকেন। নিজের হাতে চাষ-আবাদ করা তাহারা জঘন্য ও ঘৃণিত পেশা বলিয়া মনে করেন। চাষীদিগকে তাহারা সমাজের একদল বলদ বলিয়া মনে করেন—যাহাদের সমাজের কাছে কোন পদবী বা সম্মান দাবী করিবার অধিকার নাই।

আমিও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ছেলে। আমেরিকায় আসাকালীন আমার নিজের ও আমার শ্রেণীর চিন্তাধারায় বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার পর যদি আমেরিকান ছাত্রেরা কখনও আমাকে জিজ্ঞাসা করিত—আমি নিজে কৃষক কি না, অথবা আমি নিজে কৃষিকার্য করিতে পছন্দ করি কিনা, তাহা হইলে আমি বিরক্ত হইয়া জবাব দিতাম—"না"। কি বেয়াদবী প্রশ্ন! ভাবিতাম, কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিবার আমার প্রধান উদ্দেশ্য কৃষকের অবোধগম্য সমস্যা লইয়া লেবরেটরীতে তথাকথিত মানসিক শক্তি দ্বারা গবেষণা করিয়া ডক্টরেট উপাধি লাভ করা। আমাদের দেশীয় অধ্যাপকেরা এই রকম চিন্তাধারাই মনে পোষণ করিয়া থাকেন এবং ছাত্রদের তাহাদের চিন্তাধারারই প্রতিমূর্তি করিয়া কৃষিবিজ্ঞানে শিক্ষিত করিয়া তোলেন। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ আজও বিদ্যমান, সেখানেই এই রকম চিন্তাধারা প্রচলিত। এমন কি, বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক শিল্পবাণিজ্যে উন্নত দেশগুলি অতীতে যখন সামন্ততন্ত্রে নিহিত ছিল, তখন এই রকম চিন্তাধারা সেই সমস্ত দেশেও প্রবাহিত হইত।

আমার ডক্টরেট কমিটির সভাপতি ডক্টর রিচার্ড ব্রেডফিল্ডের সঙ্গে আমার গবেষণার বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া আমি আমার চিন্তাধারায় মস্ত এক ঘা খাইলাম। তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে

এই যন্ত্র সাহায্যে জমির সর্বত্র সার ছড়ান হয়

বলিলেন যে, ভারতবর্ষ, চীন, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে কম শস্য উৎপন্ন হয়, তাহার একটি কারণ এই যে, তথাকার গবেষণাকারীগণ প্রত্যক্ষভাবে কৃষকদের সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা করেন না—বিজ্ঞানাগারের কাগজপত্রেই তাহাদের গবেষণা নিবদ্ধ থাকে। তিনি আরও বলিলেন যে, দেশে ফিরিয়া আমার লেবরেটরীতে গবেষণা করিবার সুযোগের অভাব হইবে না। কিন্তু যদি আমাদের দেশের চাষীদের সমস্যা সমাধানের সহায়ক হইতে

হয়, তাহা হইলে আমেরিকার কৃষিক্ষেত্রেই আমার গবেষণার প্রধান কেন্দ্রস্থল হওয়া কর্তব্য। তাঁহার মতে, অনুন্নত দেশগুলির কৃষিকার্যে উন্নতি সাধনের জন্য এই রকম দৃষ্টিভঙ্গীই আজ একান্ত প্রয়োজন। আর একটি আলোচনার দিন ধার্য করিয়া ডক্টর ব্রেডফিল্ড আমাকে গুরুত্বের সহিত চিন্তা করিয়া তাঁহাকে আমার মতামত জানাইতে বলিলেন।

কথাটা আমার মনঃপূত হইল না। সেই সময়ে ডক্টর ব্রেড্‌ফিল্ডের যুক্তিতর্কে মাঠে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমার মনে মোটেই দৃঢ় বিশ্বাস উৎপাদিত হয় নাই। ভারতীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তির সামাজিক কাঠামো মাঠে কাজ করার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল, আর তাহার দার্শনিক প্রতিলিপি মাঠের কঠোর পরিশ্রমে জড়িত অশ্রু ও ঘর্মের পশ্চাতে কোন চাকচিক্য ও রোমান্স লুক্কায়িত আছে কি না তাহা উপলব্ধি করিবার প্রয়াস করিতেছিল। দর্শনশাস্ত্রের চিন্তাধারা প্রায় আমার প্রত্যেকটি দেশবাসীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য। সম্ভবপর না হইলেও তাহার সাহায্যে অসাধ্যকে সাধন করিবার জন্য (যেমন অর্দ্ধভুক্ত বা শূন্য উদরকে পূর্ণ করা) চেষ্টার ত্রুটী হয় না।

আমার কমিটির সহকারী সভাপতি ছিলেন ডক্টর রাসেল। তরুণ বয়স্ক ও কর্মঠ অধ্যাপক। কয়েকদিন বাদে ডক্টর রাসেল্‌ ও আমাকে শস্যের মাঠে দেখা গেল। শিম জাতীয় গাছের মাঠে ভুট্টা রোপিত হইয়াছিল। সেখানে আমরা দুই জনে কোদাল দিয়া মাটী খুঁড়িয়া শিমের শিকরের রন্ধ্রে ভুট্টার শিকরের বিস্তার পরীক্ষা করিতাম। দুই চার কোঁদাল মাটী খুঁড়িয়া আমি হাপাইতেছি দেখিয়া অধ্যাপক আসিয়া আমাকে সাহায্য করিতেন। আমার লজ্জানত দৃষ্টির সম্মুখে তিনি দেখিতে দেখিতে কাজটা সম্পন্ন করিয়া ফেলিতেন। ক্রমে ক্রমে দৈহিক পরিশ্রমের সঙ্গে আমার পরিচয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিছু দিনের মধ্যে কর্মে ও শক্তিতে আমি মাঠের কাজের উপযুক্ত হইয়া উঠিলাম।

ইহার পরে আমার নিজের গবেষণার কাজ সুরু হইল। জমিতে নানা রকম লাঙ্গল দেওয়া, ‘সার’ দেওয়া, বীজ বপন, আগাছা নির্মূল করা, শস্য সংগ্রহ করা প্রভৃতি কাজ আমাকে নিজের হাতে করিতে হইত। এক গ্রীষ্মে আমি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি-পরীক্ষাকেন্দ্রের কাজ করিলাম। ইত্যবসরে ডক্টর ব্রেডফিল্ডের আলোচনার অর্থ ও তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে আরম্ভ করিলাম। আমাদের দেশের মাটির ও চাষীর দারিদ্র্য এবং আমাদের চাষপ্রণালীর রিক্ততা আমার মনকে সংঘর্ষে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। কয়লা খননের ন্যায় আমরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আমাদের মাটীর উর্বরাশক্তিকে শস্য দ্বারা নিঃস্ব করিয়া চলিয়াছি।

ক্ষেতে আমার হাতে কলমে কাজ এই খানেই পরিসমাপ্ত হইল না। দার্শনিক দৃষ্টি লইয়া পাশ্চাত্য দেশের বাস্তবতার প্রাচুর্য আরও সহজ ও সরল ভাষায় বুঝিতে উৎসুক হইলাম। ধূলা মাটি ঘাটিয়া মানুষ কি করিয়া বাঁচিবার উপায় করে, কি করিয়া সমাজের নিমিত্ত প্রচুর ফসল ফলাইয়া তোলে, তাহারই সন্ধানে আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়া চাষ আবাদের একটি অঙ্গ শিখিতে সমর্থ হইয়াছি, কিন্তু আর একটি অঙ্গ শিখিতে হইলে আমার আমেরিকান চাষী ও তাহাদের গবেষণা-সমিতির সঙ্গে কাজ করা যে একান্ত প্রয়োজন—এই চিন্তাধারা আমার মনকে তোলপাড় করিয়া তুলিল। ডক্টরেট ডিগ্রী লইবার পরে একটি সবজী বাগানে দুই মাস হাতে কলমে কাজ করিলাম। মাটি চাষ করা, রাসায়নিক ‘সার’ ছড়ানো, ফসল সংগ্রহ করা, রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে গাছের পোকামাকড় মারা, রাসায়নিক বিজ্ঞানের সাহায্যে গাছের ও মাটির কি পরিমাণ নিউট্রিয়েন্টস্‌ দরকার তাহা

নির্ধারণ করা ইত্যাদি সমস্ত কাজ আমাকে করিতে হইত। অপরাহ্নে বাগানের কাজ হইতে অবসর মিলিলে আমি মাছধরা বা বাগানেই অবস্থিত আমার নিজের এক ক্ষুদ্র পরীক্ষা-ক্ষেতে ব্যস্ত থাকিতাম। সবজী বাগানের কাজ শেষ হইবার পরে তুলার চাষের জমি ও 'সারের' সম্বন্ধে কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষিবিভাগের সহিত তিন মাস হাতে কলমে মিসিসিপি ও এলাবামা প্রদেশে কাজ করিলাম।

মানুষের বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে জ্ঞান উপার্জন করিবার উপাদানগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাদের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা খুব সরল ও অর্থবোধক। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম একে অন্যের সহিত অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। এককে বাদ দিয়া অপরের চলে না, এককে জানিতে গেলে অপরকেও জানিতে হয়। মার্কিন দেশের কৃষিকার্যের সমৃদ্ধিশালীতার চাবী অনুসন্ধান করিতে গিয়া সে চাবী প্রস্তুত করিবার উপাদানগুলির সহিত আমার সত্যিকারের পরিচয় হইল।

আপনারা আমাকে প্রশ্ন করিতে পারেন—কি সেই সব উপাদান এবং সেই সব উপাদান সাহায্যে আমাদের মাটির সঙ্গতি হইতে চল্লিশ কোটী লোকের জন্য অন্ন সংগ্রহ সম্ভবপর কি না। আপনাদের প্রশ্নের প্রথম অংশের জবাব দিতে আমি কতগুলি উপাদানের নাম একদমে বলিয়া যাইতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ, জমিদারীপ্রথা রদ করিয়া জমি চাষীর হাতে দিতে হইবে, বড় কৃষি প্রতিষ্ঠান ও যৌথ-চাষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, এবং প্রয়োজনীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি স্থাপন করিতে হইবে, রাসায়নিক সারের ব্যবস্থা, জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় এইরূপ ফসলের চাষ ও কৃষিকার্যের ব্যবস্থা, ধীরে ধীরে প্রাচীন লাঙ্গলের স্থলে উন্নত ধরনের লাঙ্গলের প্রয়োগ, কৃষিকার্য প্রসারণ বিভাগ ও কৃষি বিষয়ক শিক্ষাদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ব্যবস্থা, চাষীর সহিত শিক্ষিত গবেষণাকারীর ঘনিষ্ঠ যোগ, অত্যধিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পথ শিক্ষা দ্বারা বন্ধ করা প্রভৃতি। কিন্তু এই বক্তৃতাকে বাস্তবে পরিণত করিবার পথে
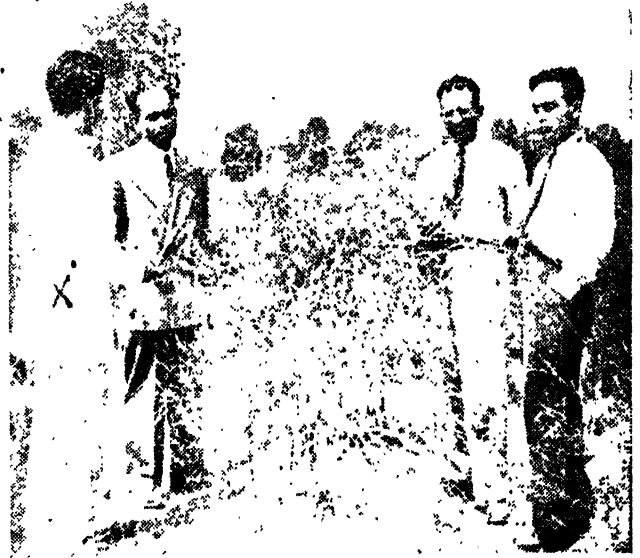
নিউইয়র্কের বল্ড্‌ইন গ্রামের জমিতে লেখক (ক্রশ্‌ চিহ্নিত) কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রকে এস্‌পারেগাস্‌ চাষ, সার দেওয়া ও ফসল সংগ্রহের বিষয় বুঝাইয়া দিতেছেন

সকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হইতেছে যে, আমাদের দেশের বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আমরা কত শীঘ্র ও কতখানি উপাদান আমাদের কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য প্রয়োগ করিতে পারি, সেইটা দেখিবার বিষয়।

আপনাদের প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের জবাবে আমি এইটুকু বলিতে চাই যে, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ কৃষিকার্যে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ও উপায় অবলম্বন করিয়া শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহার ব্যবহার আজও আমাদের দেশে অজ্ঞাত। যখন

আমরা ঐ সমস্ত ব্যবস্থা ও উপায় আমাদের কৃষিকার্যে প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইব, তখনই আমরা আমাদের সারা বৎসরব্যাপী উৎপাদক ঋতুর ও আমাদের মাটির নিহিত শক্তি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিব—আমাদের দেশের চল্লিশ কোটী লোকের জন্য শস্য উৎপাদন করা সম্ভব কি না।

আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের দেশে এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি হইবে। ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করিলে মালথাস্‌পন্থী অর্থনীতিবিদেরা সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি নিরীক্ষণ করিয়া জানিতে পারিবেন—ভারতবর্ষে চল্লিশ কোটী লোকের সংখ্যা রক্ষনা-বেক্ষনের সঙ্গতির মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে কি না।
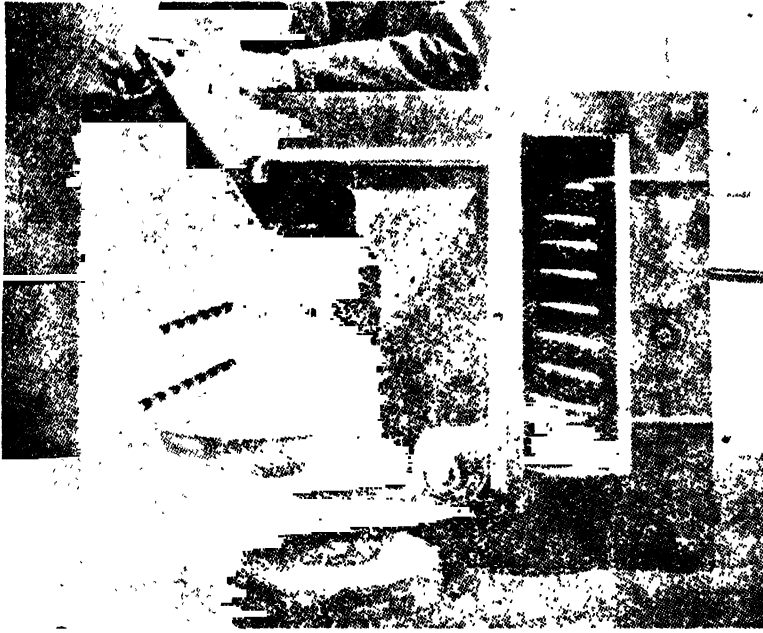
অ্যাটমিক-পাইল

অদূর ভবিষ্যতেই আমাদের শক্তির উৎস হবে—অ্যাটমিক-পাইল। নির্দিষ্ট আয়তনে গ্র্যাফাইট-ব্লক পর পর সাজিয়ে অ্যাটমিক-পাইল তৈরী করা হয়। পরমাণুর শক্তিকে আমাদের কাজে লাগাবার জন্যে এই যন্ত্র পরিকল্পিত হয়েছে। ছবির বাঁ-দিকে এই অ্যাটমিক-পাইলের মধ্যে ইউরেনিয়াম বা অন্যান্য পদার্থের ভংগপ্রবণ (ফিশনেব্‌ল্‌) পরমাণুগুলো শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ছবিতে যে হাতে ধরা লাঠির মত একটা পদার্থ দেখা যাচ্ছে ওটা এমন একটা ধাতু দ্বারা তৈরী যার পরমাণুগুলো একটা বিশেষ অবস্থায় সহজেই ভেঙে গিয়ে তাপরূপে প্রচণ্ড শক্তি উৎপাদন করে। নীচের দিকের ডোরাকাটা দণ্ড দু'টো শক্তির উৎপাদন অর্থাৎ 'চেন-রিয়্যাকশন' নিয়ন্ত্রিত করে। পাইলের ভিতর দিয়ে যে তরল পদার্থ চালানো হয় তা' উত্তপ্ত হয়ে 'হিট-এক্‌চেঞ্জার' বা ডানদিকের গরম প্রকোষ্ঠে পরিচালিত হয়। জল যাতে মারাত্মক রকমে রেডিওঅ্যাকটিভ না হয়ে উঠে এখানে তার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থায় জল বাষ্প হয়ে ষ্টীমটারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ বা অন্যান্য যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদন করে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীগগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়

কথামালায় শিখেছি যে, আকাশের দিকে তাকিয়ে পথ চললে কুঁয়ায় পড়তে হয়। মোটামুটিভাবে নীতিটা ঠিক হ'লেও এর ব্যতিক্রমের ক্ষেত্র আছে। গ্যালিলিও বা টাইকো-ব্রাহে তাঁদের জীবনের বেশ একটা মোটা অংশ আকাশের দিকে তাকিয়ে কাটিয়েছেন। ভারতেও যাঁদের জ্ঞান ও মহিমার আমরা গর্ব করি তাঁদের অনেকেই আকাশের আলোক-বিন্দুগুলির প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। জগতে এমন কতকগুলি সৃষ্টিছাড়া জীব সকল সময়েই থাকেন যাঁরা আপাতদৃষ্টিতে অতি-প্রয়োজনীয় বাস্তবটাকে ছেড়ে এমন কোন ভাব, চিন্তা বা পরীক্ষার রাজ্যে বিচরণ করেন যা', সাধারণের চোখে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়—কিন্তু কালের প্রবাহ এদের দানকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাস্তবের রাজ্যে নিয়ে আসে। কিন্তু এঁরা কাজ করেন ভবিষ্যতে তাঁদের দান ব্যবহারে লাগবে, সে কথা ভেবে নয়—তাঁরা কোন অদৃশ্য শক্তির তাড়নায় নিজের কাজ করে যান, যার কারণ তাঁদের নিজেদের কাছেও স্পষ্ট নয়। কবি যেমন জানেন না যে তাঁর কাব্য প্রেরণার উৎস কোথায়—বৈজ্ঞানিকও তেমনি জানেন না নিজের মনের খবর।

পৃথিবীর লোক আজ বিজ্ঞানের মূল্য বুঝেছেন—তাঁরা বুঝেছেন যে, বিজ্ঞানকে যে জাতি অবহেলা করবে কালের প্রতিযোগীতায় সে পেছিয়ে পড়তে বাধ্য। তাই বিজ্ঞানের প্রতি সাধারণের কিছু অনুসন্ধিৎসা জেগেছে। তবে বাস্তবের প্রয়োজনের ক্ষেত্রটা সাধারণের চোখে বিজ্ঞানের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে—সুতরাং বিজ্ঞানের যেসব অংশ বাস্তবের সঙ্গে নেহাৎ গায়ে গায়ে লেগে নেই সেগুলির উপর সাধারণের আস্থা বড় কম। জ্যোতির্বিজ্ঞানটা দুর্ভাগ্য-বশতঃ এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে যায়। তাই কথামালার নীতি কথার স্থূল অর্থটা সাধারণে আজও ভুলতে পারেন নি। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বাস্তবের উপর প্রভাবটা একটু অদ্ভুত রকমের—সেটা সাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। যদিও বাস্তবের প্রয়োজনীয়তা কোনও বিজ্ঞানেরই চরম সার্থকতা বলে স্বীকার করা যায় না, তবু বাস্তবের উপর জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রভাব সাধারণের জেনে রাখা প্রয়োজন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ফলনের ক্ষেত্র কোথাও কোথাও আমাদের জীবনের সঙ্গে এতই ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত যে আমরা সব সময় তার কথা মনে রাখি না। আলো বাতাসের মত সেগুলি আমাদের বোধ-রাজ্যকে ছুঁয়ে থাকে মাত্র, তাতে আঁচর টানতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ আমাদের ঘড়ি ও পাঁজির উল্লেখ করা যেতে পারে। সূর্যের গতিবিধির সঠিক মাপজোক না হ'লে উপযুক্ত সময় নিরূপণের মাপ কাঠি কখনও তৈরী হ'তে পারত না।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের আর একটা মস্ত বড় ফলনের ক্ষেত্র হ'ল—নৌ-বিদ্যায়। দিকনির্ণয়ের কাজে জ্যোতির্বিজ্ঞানের দাম বড় সামান্য নয়। পুরাতণ সভ্যতাগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর থেকে নবজাগরণের (রেনসাঁর) সময় পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশ জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা প্রায় ভুলেই ছিল। নবজাগরণের দিনে নৌ-বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানও বেড়ে উঠতে লাগল। পৃথিবীর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গেলে তারা ও সূর্যের অবস্থান দৃশ্যতঃ বদলে যায়। এবং এদের অবস্থান দেখে সমুদ্রগামী জাহাজ বুঝতে পারে সে কোথায় রয়েছে।

কিন্তু উপরোক্ত উদাহরণ অনেকের পক্ষে যথেষ্ট না-ও মনে হ'তে পারে। কারণ এগুলি জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রায় প্রাথমিক বিদ্যার ফলন মাত্র। আজ

কাল জ্যোতির্বিজ্ঞানে যে সমস্ত সূক্ষ্ম পরীক্ষা ও গভীর তত্ত্বালোচনা চলেছে তা সবে তার প্রয়োজনীয়তা কী? তারার অভ্যন্তরের তাপ ও চাপ নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে সব তর্ক ও আলোচনা করেন বা সূর্যের ছটা-মণ্ডলের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করা হয় সে সমস্তই বাস্তববাদীদের কাছে নিরর্থক মনে হওয়া স্বাভাবিক। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখলে মাউন্ট প্যালোমারের জন্য ২০০ ইঞ্চি বিশাল দূরবীনটাকে ধনগর্বিত আমেরিকান জাতের খামখেয়াল ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

কিন্তু বস্তুতঃ তা' নয়। রেনেসাঁর দিনের মত জ্যোতির্বিজ্ঞানের বাস্তবের উপর পূর্ণ প্রভাবের দিন বোধহয় আবার এগিয়ে আসছে। কারণ আজ আমরা আণবিক যুগে এসে পড়েছি। আজ অণু, পরমাণুর গঠন ও রূপান্তর বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, কারণ পরমাণুর শক্তির উৎসের সন্ধান পেয়ে সমস্ত বিজ্ঞানজগৎ ব্যগ্র হয়ে উঠেছে সেই শক্তি করায়ত্ত করতে। এই পরমাণু জগতের বহু খবর পাওয়া যেতে পারে নক্ষত্রদের মারফৎ। বস্তুতঃ কিছু খবর পাওয়া গেছেও। খবর পাওয়া গেছে যে, সূর্যে এবং অন্যান্য বহু নক্ষত্রেই হাইড্রোজেন ক্রমাগত হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং এই রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে যে শক্তি ক্ষরিত হচ্ছে সেই শক্তিই এদের উজ্জলতাকে বহুকাল ধরে অম্লান রেখেছে এবং রাখবে। বৈদ্যুতিক শক্তি সম্পন্ন একটা নুতনরকম হাইড্রোজেন-অণুরও খোঁজ পাওয়া গেছে সূর্যের অভ্যন্তরে। এ সম্বন্ধে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী চন্দ্রশেখরের অনেক কাজ আছে।

নক্ষত্রে যে পরিমাণ তাপ থাকে পৃথিবীর কোনও পরীক্ষাগারেই তা' পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং নক্ষত্রে এমন বহু আণবিক ঘটনা ঘটতে পারে যা' পৃথিবীর পরীক্ষাগারে ঘটান সম্ভব নয়। সুতরাং অণু, পরমাণুর জ্ঞান যাচাই করা ও সে সম্বন্ধে নুতন তত্ত্ব আবিষ্কার করবার একটা মস্ত বড় ক্ষেত্র হল, নক্ষত্র। অসুবিধা শুধু এইটুকু যে, নক্ষত্রে যে সমস্ত ব্যাপার ঘটছে তা প্রত্যক্ষ করার অসুবিধা। এই অসুবিধাটাকে জয় করাই জ্যোতির্বিজ্ঞানীর প্রধান কাজ। ইতিপূর্বেই এই জয়ের অভিযান বহুদূর এগিয়েছে। নক্ষত্রের মধ্যে কোন্ পদার্থ কী অনুপাতে আছে মোটামুটি তা' বলে দেওয়া যায়, নক্ষত্রের আবরণের তাপটা অনুমান করা যায় প্রায় সঠিকভাবে, সূর্যের আবরণের উত্থান পতনের ছবি ঠিক ঠিক ধরা পড়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর যন্ত্রে; কিন্তু তবু মেনে দিতে বাধ্য হতে হয় যে, এ সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানের পরিধি আরও বাড়ান দরকার। নক্ষত্রের মধ্যে অণু, পরমাণুর যে খেলা চলেছে তাকে সঠিক ভাবে জানতে হবে—কারণ আশা করতে পারা যায় যে, তা' থেকে আমাদের অণু-পরমাণু সম্বন্ধে জ্ঞান আরও সঠিক আকার ধারণ করবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার জন্য ভারতবর্ষ অনুকূল স্থান। বৎসরের কয়েকটা মাস ছাড়া ভারতের আকাশ খুব পরিষ্কার থাকে। পরিষ্কার আকাশ যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর কাছে কত মূল্যবান তা' সহজেই বোঝা যাবে যদি আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানের কথা চিন্তা করা যায়। পরিষ্কার আকাশের অভাবে ইংলণ্ড জ্যোতির্বিজ্ঞানে যথেষ্ট উৎসাহী হয়েও অনেক অসুবিধা ভোগ করছে। প্রাচীন সভ্যতাগুলির ইতিহাস খুললে দেখা যাবে, যেসব দেশের আকাশ স্বচ্ছ সেই সব দেশেই আকাশ ও নক্ষত্রের অধ্যয়ন চলেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একমাত্র কোদাই-কানাল ভিন্ন ভারতে আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান নেই যেখান থেকে আকাশ অধ্যয়নের কাজ চলতে পারে। কোদাইকানালেরও ব্যবস্থা প্রধানতঃ সূর্য অধ্যয়নের জন্য মাত্র। পরমাণু গবেষণায় সফলকাম হতে হলে অবিলম্বে ভারতবর্ষকে এ বিষয়ে অবহিত হ'তে হ'বে। মনে রাখতে হ'বে যে, ভাল মানমন্দির তৈরি করতে হ'লে তা' সহরের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়—সহরের ধুলো, ধোঁয়া ও রাতে সহরের আলো আকাশ দেখার কাজে বিঘ্ন ঘটায়।

সাধারণ লোকের রাশি-বিজ্ঞান

শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বসু

১। রাশিশাস্ত্র কি বিজ্ঞান?

বিজ্ঞানের কাজ নিক্তির মাপে সত্য যাচাই করা, যাবতীয় ব্যাপারকে বাঁধাধরা নিয়মকানুন এবং পরিমাপের মধ্যে এনে বুঝতে চেষ্টা করা। লর্ড কেল্‌ভিন আর এক কাঠি এগিয়ে ব'লেছিলেন, কোন জিনিষ সম্বন্ধে জ্ঞান সম্পূর্ণ হোল তখনই যখন তাকে সংখ্যায় হিসেব এবং প্রকাশ করা গেল। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন কোন বিজ্ঞানী রাশি-শাস্ত্রকে বিজ্ঞানের জাতে তুলতে চান না। কারণ, রাশি-শাস্ত্রের কারবার সম্ভাবনা নিয়ে, নিশ্চয়তা নিয়ে নয়। বছরে কতলোক মরতে পারে, ফসলের আবাদ কতো হওয়া সম্ভব, মিল-মজুরের গড়পরতা আয় কতো, এসব খবরকে যথাযথ বলা চলে না। এসব খবরে কতকটা অনুমানের ওপরই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়; কারণ তাদের সম্বন্ধে কড়ায় ক্রান্তিতে নির্ভুল তথ্য জোগাড় করা এতো ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ যে একরকম অসম্ভব। এবং এই প্রায়-সত্য অল্প-ভুল-সাপেক্ষ অনুমানে আমাদের কাজও চলে যায়। রাশি-শাস্ত্রের কাজ অনুমানটাকে যথাসম্ভব সত্যের কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং ভুলের মাত্রাটা যথাসম্ভব সংকীর্ণ ক'রে দেওয়া।

মাপাজোখা বাঁধাধরা হিসেব দিতে না পারলেও রাশি-শাস্ত্রকে আমরা বিজ্ঞানই বলবো, কারণ এর অনুমান-ফলগুলি ব্যক্তিবিশেষের আন্দাজে গড়া ফল নয়, ব্যক্তি-অনুমানে যে ভুলচুক বা পক্ষপাত থাকে তার ঢুকবার রাস্তা এতে বন্ধ, এই ফলগুলি বাইরের জগত হ'তে সংগৃহীত তথ্য থেকে কষা। ব্যক্তির আন্দাজে গড়া সিদ্ধান্তে প্রচুর দোষ ত্রুটি থাকতে বাধ্য। রাশি-বিজ্ঞানের সামষ্টিক অনুমানে ভুল-সম্ভাবনা অনেক কম তো বটেই, ঠিক কতটুকু তাও জানা থাকে। যেমন হিসেব করে বেরুল কল্‌কাতায় গাড়ি চাপা প'ড়ে বছরে অনুমান ৫০০ লোক মরে। ৫০১ বা ৪০৯ ও হ'তে পারে, তার সম্ভাবনা শতকরা ৪০; ৫১০ বা ৪৯০ হবার সম্ভাবনা শতকরা ১০; ৫২৫ বা ৪৭৫ হবার সম্ভাবনা শতকরা ৩; ইত্যাদি। এতখানি নিশ্চয়তা ব্যক্তি-অনুমানে সম্ভব নয়। অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো রাশি-বিজ্ঞানও পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মারফৎ সত্য নির্ণয় করে।

২। রাশি-বিজ্ঞানের রীতিনীতি

আমাদের মনগড়া আন্দাজে ভুল থাকে অসংখ্য এবং তারা আমূল পরস্পর-বিরোধী। যেমন পূর্ব-পাকিস্তানে অমুসলমানদের বাস্তুত্যাগ ও পশ্চিম-বংগে আগমন। এ সম্বন্ধে পাকিস্তান-বাসী মুসলিমের এবং পশ্চিম-বংগবাসী হিন্দুর আন্দাজ একরকম হবে না। মুসলমানের তুলনায় হিন্দুর আন্দাজ অনেক উচু সংখ্যায় গিয়ে ঠেকবে। গড়ের মাঠের মিটিং-এ সেদিন কত লোক হয়েছিল, এ সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকের আন্দাজ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, ১ লাখ থেকে ২০ লাখ পর্যন্ত তারতম্য হচ্ছে। মনগড়া আন্দাজ হয় জনে জনে আলাদা। রাশি-বিজ্ঞান তার জায়গায় দেয় একটা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ নির্দিষ্ট অনুমান কতক-গুলি বাস্তব তথ্য-তালিকার ওপর ভিত্তি ক'রে।

যেমন পূর্ব-পাকিস্তান থেকে অমুসলমানদের বাস্তু ছেড়ে পশ্চিম বাংলায় আসা। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুমান পেতে হলে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলায় কয়েকটী গ্রাম, আধা-সহর এবং সহর (কিম্বা সহরের কোন কোন এলাকা) বেছে নিতে হবে, যার জনসংখ্যা প্রদেশের মোট অমুসলমান জন-সংখ্যার

শতকরা একভাগ বা ঐরকম একটা অংশ। এই এই এলাকায় বাস্তত্যাগীদের সংখ্যা গুনে গুনে সংগ্রহ করতে হবে। একই কাজ করতে হবে পশ্চিম বাংলার বাছা বাছা গ্রাম সহর ও কল্‌কাতা এলাকায়। দেখা যাবে, বাস্তত্যাগীর তুলনায় আগন্তুকের সংখ্যা সামান্য কম, কারণ কিছু লোক পশ্চিম বাংলায় না এসে অন্য জায়গায় গেছে। এই সংখ্যা দুটোকে ১০০ দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যাবে, অনুমান কতো লোক পূর্ব বাংলা ছেড়েছে এবং কতো লোক পশ্চিম বাংলায় এসেছে। খবরগুলো একটু বিশদভাবে জোগাড় করলে আরো জানা যাবে—এর মধ্যে মজুর, ব্যবসাদার, চাকুরে, উকিল-মোক্তার, ডাক্তার-বৈদ্য, ছাত্র, হরিজন, ব্রাহ্মণ, ইত্যাদি বিভিন্ন বৃত্তি বা স্তরের লোক কতো বা কি হারে আছে।

৩। নমুনা

এখন কথা উঠবে যে, গোটা জন-সংখ্যার হিসেব ত' নেওয়া হোল না,—নেওয়া হোল শতকরা এক-জনের। এই কয়েকটা বাছা এলাকার ওপর নির্ভর করার যুক্তিই বা কি? ধরা হয়েছে কুমিল্লার কালিগুচ্ছ গ্রাম, মৈমনসিং-এর নেত্রকোণা মহকুমা-নগর এবং ঢাকা সহরের টিকাটুলি। অথচ, কে বলবে হয়ত ঠিক এই সব জায়গায় হিন্দু-মুসলমান কতক সদ্‌ভাবে থাকার দরুণ বাস্তত্যাগ কম হয়েছে। তাহলে হিসাবটা হয়ে যাবে একতরফা, কমের দিকে ভুল। কিম্বা যদি তা না-ও হয় তা হ'লেও ঐ শতকরা এক ভাগ থেকে কি ক'রে পুরো সংখ্যাটার হিসেব মিলবে? এক এক ক'রে ধরা যাক। প্রথমে শেষের প্রশ্নটা।

আমরা নমুনা দিয়ে জিনিষের কদর ঠিক করি। বাজারে পাঁচটী ময়রার দোকান আছে। যদি সেরা দইটী কিনতে চান তবে ক্রেতা সব দোকান থেকে এক ভাঁড়ের একটু ক'রে দই চেখে দেখবেন। ঐ নমুনার স্বাদ থেকে বুঝবেন কোন দোকানের দই সবচেয়ে সরেস। যে ভাঁড়ের দই তিনি চাখেন নি, সে ভাঁড়টাও নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে ঐ দোকান থেকে তিনি কিনে নেবেন। এ ভাবে নমুনা এক এক শ্রেণীর মুখপাত্র হয়ে কাজ করে। কিন্তু তা করতে হলে দুটো জিনিষ ধরে নিতে হয়। প্রথমতঃ শ্রেণীর মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য আছে. দ্বিতীয়তঃ শ্রেণীর ভেতরে পরস্পরে যেটুকু অনৈক্য আছে সেটুকু নমুনার ভেতরেও যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ময়রার দোকানের দইএর মধ্যে এই শ্রেণীগত ঐক্য যথেষ্ট পরিমাণে আছে, কাজেই একটা ভাঁড়ের এক চামচে দইতে নমুনার কাজ হোল। পূর্ব-পাকিস্তানের অমুসলমানদের মধ্যেও মূলগত ঐক্য বা শ্রেণীভাব আছে, তবে অনৈক্যও যথেষ্ট। শতকরা একভাগ নমুনা যদি এই অনৈ-ক্যের ঠিক প্রতিনিধি হয় তা হলে এ থেকে খাঁটি খবর মিলবে।

এখন প্রথম প্রশ্নটায় ফিরে আসা যাক। এমন ভাবে নমুনা বাছতে হবে যাতে তারা মূল জ্ঞাতব্য শ্রেণীর সবগুলি স্তর বা পার্থক্যকে প্রতিফলিত করে। বাস্তত্যাগ সন্ধানের আগে এলাকাগুলি এমন ভাবে নির্বাচন করা চাই যাতে তাদের থেকে গোটা পূর্ব পাকিস্তানের ছবিটী পাওয়া যায়, যাতে এক জায়গায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দরুণ অতিমাত্রায় বাস্তবাসী পড়ে গেলে সেটা পুষিয়ে যায়, অন্যত্র বিপরীত কারণে অত্যধিক বাস্তত্যাগী পাওয়া যাবার ফলে। তার মানে পূর্ব-পাকিস্তানে যেমন সর্বত্র আতংক ও উৎপীড়ণ সমান নয়, কাজে কাজেই বাস্তত্যাগও সমান নয়, নমুনা বা বাছাই এলাকাগুলিতেও তেমন আতংক, উৎপীড়ণ ও বাস্তত্যাগ সমান হবে না; কোথাও হবে বেশী, কোথাও কম, কিন্তু গড়পরতায় গিয়ে মূল সংখ্যার কাছাকাছি দাঁড়াবে।

৪। সমসম্ভব নমুনা

তাহলে নমুনা নির্বাচনের কাজটা হোল আসল। যদি বিজ্ঞানী বা তথ্য-গ্রাহক এটা নিজের খুসীর ওপর রাখেন তাহলে পক্ষপাত এসে পড়বেই;

এমন ভাবে নমুনাগুলো বেছে বসবেন যাতে ঝোকটা একদিকে গিয়ে পড়বে, গোটা শ্রেণীর প্রতিনিধি তারা হবে না। সংগে সংগে ফলও হবে একতরফা। স্থতরাং দেখতে হবে নমুনা চয়নে কারো হাত না থাকে, কলের মতো তারা বেরিয়ে আসবে আপনা থেকে। আর দেখতে হবে নমুনার সংখ্যা গোটা শ্রেণীর অনুপাতে খুব কম না হয়। শ্রেণী যত অসম, শ্রেণীঅনুপাতে নমুনার সংখ্যা ততো বেশী হতে হবে। এই কটা বিষয়ে খেয়াল রাখলে নমুনাগুলি ঠিক খবরই দেবে। শ্রেণীর চেহারা বা চরিত্র থেকে ব্যতিক্রম হবার সম্ভাবনা তাদের বিশেষ থাকবে না।

এই কলের মতো অপক্ষপাত নমুনা-নির্বাচন কেমন করে সম্ভব ? একটা সোজা উপায় ধরা যাক। বর্ণমালাক্রমে পূর্ব-পাকিস্তানের সব গ্রামগুলোর নাম পর পর সাজানো হোল এবং প্রত্যেকটীর একটা করে ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া হোল, ১, ২, ৩, ৪,...১০০০, ...২০০০, ইত্যাদি। এই তালিকা থেকে প্রতি ৯৯টা অন্তর একটা করে গ্রাম নেওয়া হোল নমুনার মধ্যেও—১০০, ২০০, ৩০০, ইত্যাদি নম্বরের গ্রাম। এই সব গ্রামের অমুসলমান অধিবাসীদের কাছ থেকে তাদের ও প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য খবর জোগাড় করা হোল। সহরের বেলা এ প্রণালী প্রয়োগ করা যাবে না, কারণ সহরের সংখ্যাই একশ'র চেয়ে কম। একটী দুটী আধা সহর এবং অর্ধেক বা সিকি পরিমাণ সহর নিলে কাজ চলবে না, কারণ সেই অংশটা পূর্ব-পাকিস্তানের সহর অঞ্চলের যথার্থ প্রতিচ্ছবি হবে না। আবার গ্রামের সংগে সহর অঞ্চলের অনুপাতটা ঠিক রাখতে হবে, বেশী নেওয়া চলবে না। এখানে এরকম একটা উপায় অবলম্বন করা যায়। প্রথমে সহরগুলোর একটা ক্রমিক তালিকা করে প্রতি পঞ্চম সহরটা নেওয়া গেল। তারপর এই সহরকটার প্রত্যেকের ১।২০ ভাগ এলাকা নেওয়া ঐ রকম কোন নিরপেক্ষ উপায়ে। আধা সহরগুলোর বেলাও ঐ একই পথ নেওয়া চলে। নির্বাচন-প্রণালীকে আরো সূক্ষ্ম ও জটিল করলে ভুল-সম্ভাবনা বা পক্ষপাতকে বেশী ক'রে নিরাকরণ করা যায়।

এই অপক্ষপাত বা নিরপেক্ষ অনুমানটাকে রাশি-বিজ্ঞানী এই প্রকারে দেখাবেন।

পূর্ব-পাকিস্তানে অমুসলমান অধিবাসীর বস্তুত্যাগ—

অমুসলমান অধিবাসী—		...লক্ষ
বাস্তুত্যাগী		...হাজার
শতকরা "		...
	ক। সহরে	...
	খ। আধা-সহরে	...
	গ। গ্রামে	...
	ক। চাষী	...
	খ। ব্যবসায়ী	...
	গ। চাকুরে	...
	ঘ। ছাত্র	...
	ইত্যাদি	
ক। চাষীর মধ্যে শতকরা		...
খ। ব্যবসায়ীর " "		...
গ। চাকুরের " "		...
	ইত্যাদি	

এই খবরগুলোকে টেব্‌ল্ বা ছক্ কেটে সাজালে চোখের সামনে ফুটে উঠবে বিভিন্ন সমাজ স্তর বা স্থানের ওপর চাপের তারতম্য। যদি তথ্য সংগ্রহের সময়ে আয় ও আর্থিক অবস্থাটাও জেনে নেওয়া হয়, তাহলে এও ছক্ কেটে দেখানো যাবে, আর্থিক সচ্ছলতার সংগে সংগে বাস্তুত্যাগের হার বেড়েছে কিনা এবং বেড়ে থাকলে কি হারে বেড়েছে। বলা বাহুল্য, বাস্তুত্যাগ বন্ধ বা পুনর্বসতির ব্যবস্থা করতে হলে এসব খবর অপরিহার্য।

৫। রাশির ভাষা

বহুকে নিয়ে কোন উন্নতি বা সুব্যবস্থার কাজে হাত দিলেই রাশি-বিজ্ঞানের দরকার হয়ে পড়ে। যেমন, দেখতে হবে দামোদর উপত্যকায় নতুন সেচ-বিন্যাসের ফলে ফলন কতো বাড়ল। দামোদর

পরিকল্পনার ভেতর থেকে এবং বাইরে থেকে কিছু জমিনমুনা নিয়ে তাদের ফলন মাপা হোল, দেখা গেল তাদের তুলনামূলক হার ৩ : ১ বা ঐ রকম একটা কিছু, মানে ফলন তিনগুণ বেড়েছে। এইটে দেখে খাজনা বাড়ানো যায়-ডবল বা আড়াই গুণ। দুটী স্কুলের মধ্যে কোনটাতে ভালো পড়ানো হয়, দশটী গোশালার মধ্যে কোনটার বন্দোবস্ত ভালো, ইত্যাদি তুলনা গুটিকয় নিরপেক্ষ নমুনাকে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে অনায়াসে ব'লে দেওয়া যায়।

বিভিন্ন নমুনার খবরগুলিকে আলাদা আলাদা দেখিয়ে কোন লাভ হয় না। তাদের দেখানো হয় আনুপাতিক হার, শতকরা হার, কিম্বা গড়পরতার আকারে। যেমন, বাস্তত্যাগী, বাস্তবাসীর অনুপাত ২ : ৮৩ বা ঐ রকম কিছু,—বাস্তত্যাগীর হার শতকরা ২'২—প্রতি গ্রাম থেকে গড়ে ৪০ জন বাস্তত্যাগ করেছে। নানান্ রকম ছবি, ছক্ বা রেখা দিয়ে বিভিন্ন স্তরের, স্থানের বা সময়ের বাস্তত্যাগ-সংখ্যাকে খুব সহজবোধ্য ও চিত্তাকর্ষক ক'রে প্রকাশ করা যায়।

৬। গড়পরতা ও বিস্তৃতি

একগাদা রাশিকে সংক্ষেপে ও জনবোধ্যভাবে দেখাবার সবচেয়ে সরল ও চল্‌তি উপায় হচ্ছে গড়পরতা হিসেব। যখন নমুনা বা শ্রেণীর মধ্যে বেশী পার্থক্য থাকে না তখন গড়পরতা অনুমানটা কাজ চালাবার, কিম্বা একটা ধারণা জন্মাবার পক্ষে মন্দ নয়। কিন্তু যখন নমুনা বা শ্রেণীর মধ্যে বেশী পার্থক্য থাকে তখন গড়পরতা অনুমান আমাদের বিশেষ কাজে লাগে না, বরং একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি করে। যেমন, বলা হোল পশ্চিম বাংলায় ধেনো জমিতে বিঘাপ্রতি গড়ে ১০ মণ ধান উৎপন্ন হয়। নমুনার মধ্যে দেখা যাচ্ছে, কোথাও ২২ মণও হয়, আবার কোথাও মোটে ২½ মণ। এই যে অসাম্য, নমুনাগুলির কেন্দ্র বিচ্যুতি বা বিস্তৃতি তা গড়পরতা হিসেবে ধরা পড়ল না। আবার ধরা যাক বলা হোল—বর্ধমান ক্যানেল এলাকার জমিতে বিঘা প্রতি গড়ে ২০ মণ ধান হয়। এখানে নমুনাগুলি এক জাতের, কাজেই ফল ঘন-সন্নিবিষ্ট, ফারাক বড় জোর ২৩ মণ থেকে ১৮ মণ। শ্রেণীর ভিতরকার সাম্য বা অসাম্য, ঘনতা বা বিস্তৃতি বোঝানো হয় ভেদ-মানের অংক দিয়ে। এর হিসেব গড়-ফল থেকে প্রত্যেকটি নমুনা-ফল বাদ দিয়ে তার বর্গফল নেওয়া,—তারপর এদের গড়ফল নিয়ে তার বর্গমূল বের করলে সেটাই হোল ভেদ-মান। মান-অংক যতো ছোট ততো শ্রেণীসাম্য বেশী, যতো বড় ততো শ্রেণীভেদ বেশী। উদাহরণ নেওয়া যাক, পশ্চিম বাংলার জমি থেকে যদি ৫ টী নমুনা নেওয়া হয়, যার ফল ২২, ১১, ৯½, ৫ এবং ২½ মণ, তা হলে ১০ মণ এই গড়ফলের ভেদ-মান হবে—

$$\sqrt{\frac{(১০-২২)^২+(১০-১১)^২+(১০-৯\frac{১}{২})^২+(১০-৫)^২+(১০-২\frac{১}{২})^২}{৫}} = \pm ৬\cdot৭$$

আর ক্যানেল জমির ৫টী নমুনার ফল যদি হয় ২৩, ২০½, ২০, ১৮½ এবং ১৮ মণ, তা হলে ২০ মণ এই গড়ফলের ভেদ-মান হবে—

$$\sqrt{\frac{(২০-২৩)^২+(২০-২০\frac{১}{২})^২+(২০-২০)^২+(২০-১৮\frac{১}{২})^২+(২০-১৮)^২}{৫}} = \pm ১\cdot৮$$

৭। সহগতি

দুই সেট সংখ্যার মধ্যে সম্পর্ক, অর্থাৎ দুই (বা ততোধিক) পরিবর্তন ধারার মধ্যে যোগাযোগ দেখানো হয় সহগতির অংক দিয়ে। যেমন একটা স্কুলে ছেলেদের বয়েস আর ওজন নেওয়া হোল। যদিও বয়েস বাড়ার সংগে সংগে সব সময়ে যে ওজন বাড়ে তা নয়, তবু যদি এথেকে প্রত্যেক বয়েসের ছেলের গড়পরতা ওজন নেওয়া হয়, তবে দেখা যাবে মোটামুটিভাবে বয়েসের সংগে ওজন বাড়ছে। কোথাও কোথাও এই সহগতি সম্পূর্ণ পরস্পর-নির্ভরশীল। যেমন, ফলনের বাড়া-কমা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে আবাদী জমির পরিমাণ ও উর্বরাশক্তির ওপর। কোথাও বা এই সহগতি আংশিক পরস্পর-নির্ভরশীল। যেমন,

জন-সংখ্যা বৃদ্ধি কিছুটা নির্ভর করে জন-সাধারণের আর্থিক উন্নতির ওপর। এখানে অন্য কারণও আছে যার সংগে জন-সংখ্যা সহগতিশীল। একটা ঘটনাধারার পেছনে বহু কারণের মধ্যে যেকোন একটা কারণ কতখানি জোরে কাজ করছে তার হিসেব মেলে সহগতিসূচক অংক দিয়ে। সহগতি ০ থেকে ১এর মধ্যে যোগ বা বিয়োগচিহ্ন নিয়ে নড়াচড়া করে। +চিহ্ন হলে প্রভাবটা অনুকুল,—চিহ্ন হলে প্রতিকুল এবং অংকটা ১ এর যতো কাছকাছি আসে ততো প্রভাব বেশী বা সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ।

৮। সূচী-সংখ্যা

সময়ের সাথে সাথে কোন জিনিষের সংখ্যায় যে পরিবর্তন হয় তা দেখাবার সেরা উপায় সূচী-সংখ্যা। যেমন চালের দাম। কোন একটা স্বাভাবিক বছরের—যথা, লড়াইর আগে ১৯৩৯ সালের চালের দামকে মূল বা ভিত্তি ক'রে তার অনুপাতে বছর বছরের দামটাকে দেখানোকে বলে সূচী-সংখ্যা।

	সাল	মণের দাম		সূচী-সংখ্যা
(মূল)	১৯৩৯	১৫৲		= ১০০
	১৯৪০	২০৲	$\frac{১০০ \times ২০৲}{১৫৲}$	= ১৩৩·৩
	১৯৪১	৩০৲	$\frac{১০০ \times ৩০৲}{১৫৲}$	= ২০০
	১৯৪২	৩২৲	$\frac{১০০ \times ৩২৲}{১৫৲}$	= ২১৩·৩
	১৯৪৩	৮০৲	$\frac{১০০ \times ৮০৲}{১৫৲}$	= ৫৩৩·২

এতে খুব সহজে বোঝা যায় বছর বছর চালের দাম কিরকম বেগে বাড়ছে। এমনি ক'রেই দেখানো চলে জীবনযাত্রার ব্যয় কি হারে বাড়ে বা কমে। কয়েকটা নমুনা পরিবারে খাওয়া, পরা, বাস ইত্যাদি খাতে মাসে গড়পরতা যে পরিমাণ বস্তু ব্যবহার হয় তার হিসাব নেওয়া হোল। মূল সনে সেই সব বস্তুর দাম ধরে গড়ে পরিবার-প্রতি মাসিক খরচ পাওয়া গেল। তারপর বছর বছর চালের দাম, কাপড়ের দাম, বাড়ি-ভাড়া ইত্যাদি বাড়া-কমা থেকে খরচ বাড়া-কমার হিসেব মিলবে। এখন মূল বছরের খরচটাকে ১০০ ধরে সেই অনুপাতে প্রতি বছরের ব্যয়-অংকটাকে দেখালেই সেই সংখ্যাগুলি হোল জীবন ধারণের ব্যয়-নির্দেশক সূচী-সংখ্যা।

* * *

এমনি সংখ্যার পর সংখ্যা সাজিয়ে সমাজের অনেক জরুরী খবর সহজে সংগ্রহ করা এবং সহজ ভাবে প্রকাশ করা যায়। রাশি-বিজ্ঞান হোল রাশির খেলা—রাশিকে সাজিয়ে গুছিয়ে সংক্ষেপ ক'রে তাদের দিয়ে কথা বলানো। লম্বা বক্তৃতা দিয়ে যা বোঝানো যায় না, গুটিকয়েক চার্ট-টেব্‌ল্, ছক্-রেখা দিয়ে তা অনায়াসে বুঝিয়ে দেওয়া যায় এবং সে বোঝানোর মধ্যে আন্দাজ, অতিরঞ্জন, ইত্যাদি ফাঁকির অবসর নেই, যদি যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করা হয়। কাজেই জনশিক্ষা এবং জনকল্যাণে মানুষকে তার নিজের ভালোমন্দ সম্বন্ধে বোঝানো এবং মানুষের সত্যিকারের উন্নতি সাধন—এই দুইকাজের জন্যে রাশি-বিজ্ঞানের সহায়তা ছাড়া এক পা চলবার উপায় নেই।

জীবিত ও জড়

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার ভৌমিক

আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রাণের উৎস ও পদার্থের গঠন সম্বন্ধে তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া যেসব তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে তাহা হইতে ক্রমে এই একটা লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, প্রাণ ও পদার্থের মধ্যে আপাতঃদৃষ্টিতে যে পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে উহা যেন ধ্রুব বলিয়া আর গ্রহণ করা চলিতেছে না। সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিতে যাইয়া আর জীবিত ও জড়ের মধ্যে ব্যবধান থাকিতেছে না। আজ আমরা এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

জীবিত প্রাণীর মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, উহারা আয়তনে বড় হইতে থাকে। কিন্তু উহাদের বৃদ্ধি ভিতর হইতে হইয়া থাকে। যাহাদের জড় বলা হইয়া থাকে তাদেরও বৃদ্ধি সম্ভব। যদি কোন যৌগিক পদার্থের অত্যধিক সংতৃপ্ত দ্রবণের মধ্যে সেই যৌগিক পদার্থের কোনও দানা রাখা হয় তবে দানাটি বর্ধিত হইতে থাকে। কিন্তু ইহার বৃদ্ধি হয় বাহির হইতে। এইরূপ বৃদ্ধি পর্বতের প্রস্তরেও সম্ভব হয়। জীবিত প্রাণীর মধ্যে আরও দুইটি গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদের চেতনা আছে এবং উহারা উহাদের শিশুর জন্ম দিয়া থাকে। গোলাপ, জবা প্রভৃতির চারা উহাদের মাতৃ বৃক্ষের ডাল হইতে জন্মিতে পারে। আবার মানুষ, পশু, পাখী ও অন্যান্য বৃক্ষ যথা—আম, জাম, কুমড়া, শশা প্রভৃতি—ইহাদের ডিম্বকোষ ও শুক্রকোষের মিলনের ফলে শিশুর জন্ম হয়। এককোষ বিশিষ্ট এমন অনেক প্রাণী আছে, যথা— এ্যামিবা, ইষ্ট ও ব্যাক্টিরিয়া, ইহাদের বর্ধিত হইবার, সাড়া দিবার ও জন্ম দিবার ক্ষমতা আছে। এক কোষ-বিশিষ্ট ইষ্ট ইহার দেহের উপর ছোট ছোট বুটী তৈয়ার করে। এই বুটীগুলি পরে ইহার দেহ হইতে চলিয়া আসিয়া নূতন শিশুকোষে পরিণত হয়। প্রাণিগণের জীবিত অংশের দ্বারা জীবিত শিশুর জন্ম হইতেছে। ইহার ব্যতিক্রম এখন পর্যন্ত সম্ভব হয় নাই। অধুনা রাশিয়ার কৃষিতত্ত্ববিদ্‌গণ বিভিন্ন জাতীয় কীটের মধ্যে সঙ্গম করাইয়া এক অদ্ভুত জাতীয় কীটের জন্ম দিয়াছেন। এই কীটগুলি আজ তাহাদের বহু উপকারে আসিতেছে। ইহারা শস্যের শত্রু অপর কীটগুলি খাইয়া ফেলে। এই ভাবে সেই দেশে শস্যের উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি যে, বৃক্ষের ডাল হইতে, এমন কি পাতা হইতে (পাথরকুচি গাছ) বৃক্ষ-শিশুর জন্ম হয়। কিন্তু যদি উহাদিগকে উপযুক্ত স্থান বা আলো বাতাস না দেওয়া হয় তবে উহাদের দ্বারা বৃক্ষ শিশুর জন্ম সম্ভবপর হয় না। বরং উহারা ক্রমে শুষ্ক হইয়া উহাদের প্রাণশক্তি হারাইয়া ফেলে। অনুরূপভাবে যদি কোনও জীবিত প্রাণীর হৃৎপিণ্ডটি কাটিয়া আনিয়া একটি বিশিষ্ট মাধ্যমে রাখা হয় তবে উহা বেশ কয়েক দিন কাজ করিয়া থাকে। কি অদ্ভুত! প্রাণীটি মরিল, আর হৃৎপিণ্ডটি বাঁচিয়া রহিল! কিন্তু যদি উহা কাটিয়া আনিয়া ঐ মাধ্যমে রাখা না হয় তবে উহা কিছুক্ষণের মধ্যে মরিয়া যায়। এখন আমাদের দেখিতে হইবে কি কারণে হৃৎপিণ্ডটি বাঁচিয়া থাকে এবং কেনই বা উহার মৃত্যু ঘটে। হৃৎপিণ্ডটিকে বিশিষ্ট মাধ্যমে রাখার পর যদি উহার উপর কয়েক ফোঁটা পটাসিয়ম সায়ানাইড দেওয়া হয় তবে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ইহা কাজ করিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে। ইহার নিষ্ক্রিয়তার মূলে রহিয়াছে পটাসিয়ম সায়ানাইডের বিষ-ক্রিয়া। ইহা হৃৎপিণ্ডের মধ্যস্থিত এক প্রকার বিশেষ রাসায়নিক

প্রক্রিয়ার অবসান ঘটায়। এই বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নাম এন্‌জাইম-প্রক্রিয়া। বিভিন্ন জীবদেহে এই প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য খুব বেশী। ১৯২৬ সনে জে, বি, এস, হালডেনের পরীক্ষা হইতে জানা যায়, সবুজ গাছ পালাও এক ধরণের পতঙ্গ আর ইঁদুরদের এন্‌জাইম একই। ইহার পরবর্তী পরীক্ষাগুলি হইতে ইহা চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। সামান্য ইষ্ট দেহের এন্‌জাইমগুলিও মানব দেহের কয়েকটি এন্‌জাইমের (যথা—D.P.N, T.P.N, Phosphatase, Co-carboxylase, Diastase প্রভৃতি) অনুরূপ। এন্‌জাইম-প্রক্রিয়া কোনও প্রকারে বন্ধ হইলে প্রাণিগণের মৃত্যু ঘটে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই প্রক্রিয়া প্রাণীদেহে চলিতে থাকে ততক্ষণ ইহা প্রাণীদেহের জীবনী-শক্তির উৎস। কিন্তু এন্‌জাইমের প্রাণ নাই। ইহারা জড় পদার্থ।

অম্লের সহিত ক্ষারের রাসায়নিক মিলনের ফলে তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপ বা তাপ-শক্তি অম্ল এবং ক্ষারের মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিল। ইহাদের রাসায়নিক মিলনের ফলে তাপ-শক্তির সৃষ্টি হইয়াছে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে শুধু তাপ-শক্তি উৎপন্ন হয়, এমন নয়। ইহার ফলে বৈদ্যুতিক শক্তিও পাওয়া যায়, যেমন ভল্টেইক সেল। এন্‌জাইমগুলিও অনুরূপ ভাবে অপর বস্তুর সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা তাপ-শক্তি, বৈদ্যুতিক-শক্তি, রাসায়নিক-শক্তি ও নানা প্রকার কার্য-শক্তি সৃষ্টি করে। এই সব শক্তিই প্রাণীর জীবনী শক্তির উৎস। এই শক্তির মূলাধার প্রাণিগণের খাদ্যের অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি সমূহ। এন্‌জাইমগুলি বিভিন্ন প্রকার অপক্ব ও পরিপক্ব খাদ্য সমূহকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভাঙ্গিয়া ও গড়িয়া উহাদের অন্তর্নিহিত শক্তি সমূহকে প্রাণীর নানাবিধ কাজের উপযুক্ত করে। এই প্রক্রিয়া কোনও প্রকারে বন্ধ হইলে প্রাণীর মৃত্যু হইয়া থাকে। এখন বলা যায় যে, প্রাণের মূল অর্থ এন্‌জাইম প্রক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়। স্থূল কথায় প্রাণের অপর নাম শক্তি।

একবার জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন, বিশ্বের সকল দৃশ্যমান পদার্থেই প্রাণ আছে। তিনি বলিতেন, ইট, পাথর সকলেরই প্রাণ আছে। কিন্তু তাঁহার এই পরিকল্পনাকে প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ একেবারেই অলীক বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। তাঁহারা গাছের প্রাণ আছে, ইহা স্বীকার করিলেন, কিন্তু ইট, পাথর প্রভৃতিকে জড় পদার্থ বলিয়া ধরিয়া লইলেন। ইট, পাথরের তথাকথিত প্রাণ না থাকিলেও ইহাদের গঠন সম্বন্ধে চিন্তা করিলে অবাক হইতে হয়। এই জড় পদার্থের ভিতরেও যে এত সব অদ্ভুত শৃঙ্খলা থাকিতে পারে তাহা কল্পনাতীত। পদার্থমাত্রই ক্ষুদ্র অণুদ্বারা গঠিত। এই অণুগুলি আবার পরমাণুদ্বারা গঠিত। মৌলিক পদার্থের অণুগুলি একই জাতীয় পরমাণু দ্বারা গঠিত। কিন্তু যৌগিক পদার্থের অণুগুলি বিভিন্ন দলীয় পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত। এক একটি পরমাণু আবার একটি বিরাট সৌরজগতের সঙ্গে তুলনীয়। সূর্যের পরিবর্তে পরমাণুর মধ্যে আছে পরমাণু কোষ; ইহা নিউট্রন, প্রোট্রোন, পজিট্রন, মিসন প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত। গ্রহের পরিবর্তে ইলেকট্রনগুলি পরমাণু কোষের চতুর্দিকে বিভিন্ন চক্রপথে ঘুরিতেছে। আবার এই ইলেকট্রনগুলি পৃথিবীর মত স্ব স্ব মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে একবার করিয়া পাক খাইতেছে। বস্তু উত্তপ্ত হইলে যে তাপ এবং আলো আমরা অনুভব করি তাহা এই ইলেকট্রনগুলির স্ব স্ব চক্রপথ হইতে পতন ও স্খলনের ফল। আবার রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জন্যও এই ইলেকট্রনগুলিই দায়ী। পরমাণু কোষের বাহিরে সর্বশেষ চক্রপথের উপর অবস্থিত ইলেকট্রনগুলি বিভিন্ন পরমাণুর মধ্যে পরস্পর বিনিময় ও মিলিত হইয়া যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাহার ফলে আমাদের প্রাণ চলিতেছে—ট্রাম, মটর, রেল প্রভৃতিও চলিতেছে। এখানে পরমাণুর বহিরাবরণের ইলেকট্রন গুলির শক্তি সম্বন্ধে মোটা মুটি কিছু বলা হইল। এখন দেখিব,

ইহাদের গঠন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় কিনা? লুই দ্য ব্রোগলি, হাইসেন্‌বার্গ, শ্রোডিংগার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, প্রত্যেকটি ইলেক্‌ট্রন তরঙ্গের সমষ্টির সমন্বয়ে গঠিত। ডেভিসন, গার্‌মার্‌ ও টমসন্‌ পরীক্ষার দ্বারা এই পরিকল্পনার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। এই আবিষ্কারের সঙ্গে জড়-বিজ্ঞানের মূল চিন্তাধারা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। তাই বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যেক পদার্থ-কণাকে তরঙ্গের সমষ্টি বলিয়া ভাবিয়া থাকেন।

অপরদিকে পদার্থ-বিদারণ-প্রক্রিয়া দ্বারা ইহা জানা যায় যে, পরমাণুকোষের মধ্যে অসীম শক্তি বর্তমান। আইন্‌স্টাইন বলিয়াছেন যে, একগ্রাম মৌলিক পদার্থকে যদি শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তবে ৯×১০^২০ আর্গ কাজ পাওয়া যাইতে পারে। আণবিক বোমার শক্তির উৎসই এই পরমাণুকোষের মধ্যে অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি। দেখা যায়, শক্তি রূপান্তরিত হইয়া যেন বস্তুতে পরিবর্তিত হইয়া রহিয়াছে।

বিদ্যুত কণিকার সমন্বয়ে পরমাণুর কোষ ও বহিরাবরণ গঠিত—কিন্তু কতকগুলি বিভিন্ন বিদ্যুত কণিকা একত্র জড় করিয়া এপর্যন্ত কোনও মৌলিক পদার্থের পরমাণু গঠন করা সম্ভব হয় নাই। সম্ভব হইয়াছে, পদার্থ বিদারণ প্রক্রিয়ার দ্বারা। একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু, যেমন নাইট্রোজেনের পরমাণু কোষটিকে যদি আল্‌ফা-কণা দ্বারা বিদারণ করা হয়, তবে অপর একটি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। এই মৌলিক পদার্থটির নাম অক্সিজেন। প্রাপ্ত মৌলিক পদার্থটি অক্সিজেনের একটি আইসোটোপ।

পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি, প্রাণ বলিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়; আবার পদার্থও শক্তির সুপ্তাবস্থা। তাই এখন প্রাণীর দেহ ও প্রাণ এই উভয়ই "অনন্ত শক্তির" অংশ। আর এখন এক টুকরা নিরেট পাথর ও তথাকথিত প্রাণের মধ্যে তফাৎ সহজেই অনুমেয়। উহারা সকলেই "বিশ্ব শক্তির" অংশ মাত্র।

"য়ুরোপ যখন বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে বিশ্বের রহস্য নিকেতনের দরজা খুলতে লাগলো তখন যেদিকে চায় সেই দিকেই দেখে বাঁধা নিয়ম। নিয়ত এই দেখার অভ্যাসে তার এই বিশ্বাসটা ঢিলা হয়ে এসেছে যে, নিয়মেরও পশ্চাতে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে আমাদের মানবত্বের অন্তরঙ্গ মিল আছে।*** একঝোঁকা আধ্যাত্মিক বুদ্ধিতে আমরা দারিদ্র্যে দুর্বলতায় কাত হয়ে পড়েছি, আর ওরাই কি একঝোঁকা আধিভৌতিক চালে একপায়ে লাফিয়ে মনুষ্যত্বের স্বার্থকতার মধ্যে গিয়ে পৌচচ্ছে।"

রবীন্দ্রনাথ

মধ্য বাঙলায় অরণ্য

শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

প্রকৃতির নিয়মে সব দেশেরই বেশীর ভাগ ভূমি এককালে অরণ্যে আবৃত ছিল। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বসতির বিস্তার যতই বেড়ে চলেছে এই সব অরণ্যের ধ্বংসও ততই হয়ে আসছে। ভারতবর্ষে ঐতিহাসিক কালের মধ্যেও যে সকল জায়গায় গভীর অরণ্য ছিল আজকাল সেখানে এমন কি একটা বড় গাছও দেখতে পাওয়া কঠিন। মৌর্য যুগে কোসাম্বীর নিকটে অরণ্যে হাতী ছিল। এখন সে অরণ্যের লেশ মাত্রও নেই। 'অরণ্য কাটিয়া নগর বসানো' পুণ্যকাজের সামিল বলে গণ্য করা হয়। প্রকৃতির দান অরণ্য-সম্পদ আমরা হেলায় নষ্ট করেছি—আজও করছি। অরণ্যের কি কোন সার্থকতা নেই?

বাংলা দেশের উত্তর আর দক্ষিণ সীমান্তে এখনও অরণ্য আছে। পশ্চিম সীমান্তে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর অঞ্চলে এখনও কিছু কিছু অরণ্য আছে। কিন্তু সমস্ত মধ্য-বাংলায় প্রচুর ঝোপ জঙ্গল আর পতিত জমি থাকলেও যাকে অরণ্য বলা যায় তা একেবারেই নেই। এমনকি নদীর ধারে বা প্রান্তরের মধ্যে যা দুএকটা বড় গাছ আগে দেখা যেত গত যুদ্ধের দৌলতে তাও প্রায় অদৃশ্য হয়েছে।

যতদিন দেশ পরাধীন ছিল ততদিন দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হিতের জন্য যা কিছু কর্তব্য তা করার আমাদের হাত বিশেষ ছিল না, তাছাড়া সে সমস্তই বিদেশী রাজার করণীয় মনে করে আমরা এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিলাম। স্বাধীন ও প্রজাতন্ত্রের দেশে এখন আর তা চলবে না, সাধারণের হিতের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কর্তব্যের দায়িত্ব সাধারণ লোকেরই নিতে হবে।

ইংরেজ রাজের স্থাপিত একটা সরকারী বনবিভাগ এদেশে আছে। কিন্তু দেশের অরণ্য না থাকায় বেশীর ভাগ বাঙালীর জীবনে অরণ্যের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় হয় না,—অরণ্যের উপকারীতার বিষয়েও অধিকাংশ লোক প্রায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ। স্বাধীন দেশে আজ দেশবাসীরই দেখতে হবে অরণ্য সংরক্ষণ দরকারী কি না। যদি অরণ্যের প্রয়োজন না থাকে তো এই অরণ্য বিভাগে বৃথা অর্থব্যয় না করে যত শীঘ্র পারা যায় অরণ্য ধ্বংস করে দেওয়াই ভালো। আর যদি অরণ্যের প্রয়োজন থাকে তাহলে দেখতে হবে অরণ্য বিভাগের কর্মচারীরা সে প্রয়োজন যথাযথরূপে ও বৃথা ব্যয়বাহুল্য না করে সাধন করছেন কিনা।

অরণ্যের প্রয়োজনীয়তা—

অরণ্যের কি প্রয়োজন? এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বলা যায় যে, আমাদের প্রাচীন পুরাণ শাস্ত্রে পঞ্চাশোর্ধে বনগমনের নির্দেশ আছে; ভারতের সংস্কৃতির মূলস্বরূপ উপনিষদ আরণ্যকাদি শাস্ত্র অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত ঋষিদের আশ্রমে রচিত হয়েছিল; যদি বলা যায় যে, জীবন-সংগ্রামে বিপর্যস্ত কর্মব্যস্ত মানুষের কথঞ্চিৎ শান্তির জন্যে মাঝে মাঝে অরণ্যবাসে তার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল আছে এবং এই সকল কারণেই অরণ্যের প্রয়োজন, তাহলে হয়তো পাঠকের কাছে হাস্যাস্পদ হব। তাছাড়া আর্থিক আর খাদ্যের প্রয়োজনই যাঁরা আজকাল একমাত্র প্রয়োজনের মধ্যে গণ্য বলে মনে করেন তাঁরা তো লেখকের উপর বিরক্তই হবেন।

খাদ্য উৎপাদনে অরণ্য—

খাদ্য যে মানুষের মূল প্রয়োজনীয়ের মধ্যে গণ্য

সে কথা অবশ্যই স্বীকার্য। সভ্যতাই বলুন, সংস্কৃতিই বলুন, দেশে খাদ্যের অভাব হলে কিছুই টিঁকতে পারে না। মাটির চাষ করে সভ্য মানুষকে তার খাদ্য উৎপাদন করতে হয়, সেই জন্যে অরণ্যের ধ্বংস করে সেই মাটিতে শস্য উৎপাদন করা যে দরকার তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

মধ্য বাংলায় এখন অরণ্যের ধ্বংসের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু তাতেও দেখা যাচ্ছে যে, সমস্ত জমিতে ফসল উৎপাদন কার্যতঃ হচ্ছে না। পশ্চিম বাংলার অধিকাংশ জেলার প্রায় চতুর্থাংশ অনুর্বর আর 'পতিত' হয়ে রয়েছে, এ সংবাদ সরকারী রিপোর্টে পাওয়া যায়। এতটা জমি অনুর্বর হয়ে থাকার কারণ কি, তাই দেখা যাক।

কী রকমের ভূমিতে শস্য হয়? শুধু পাথরের উপর বীজ রোপন করলে তো আর শস্য জন্মাবার সম্ভাবনা হয় না। ভূমির উপরিভাগের যে অংশে শস্য হয় সেই মাটি নরম হওয়া চাই। সে মাটিতে মাটি আর বালির পরিমাণ উপযুক্ত অনুপাতে থাকা চাই। মাটির সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ উদ্ভিদ উৎপাদনের উপযোগী রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণ চাই। সে মাটির উপযুক্ত পরিমাণে আর্দ্রতা চাই।

এই ফসল উৎপাদনের শক্তি, যার নাম উর্বরতা, সাধারণতঃ কোন চাষের জমিতেই মাটির উপরিভাগ ছাড়া বেশী নীচে থাকে না। কাজেই এই চাষের উপযুক্ত উপরের মাটি যদি কোন কারণে ক্ষয় হয়ে যায় তাহলে ভূমির ফসল উৎপাদনের শক্তি থাকে না, অর্থাৎ সে জমি অনুর্বর হয়ে যায়।

মাটির ক্ষয় কি ভাবে হয়—

(১) মাটির ক্ষয় সাধারণতঃ দুই রকমে হয়, জলে আর বাতাসে। ভূমি যেখানে বন্ধুর বা পার্বত্য, জলের দ্বারা সেখানেই মাটির ক্ষয় হবার সম্ভাবনা বেশী। পশ্চিম বঙ্গের দারজিলিং জেলা তো পার্বত্য। তাছাড়া জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর জেলার অনেকাংশের ভূমি বন্ধুর। এই সকল জায়গায় জমির ক্ষয়-নিবারক কোন ব্যবস্থা না করে যদি চাষ করা হয়—তা হলে বৃষ্টির জলে উপরিভাগের উর্বর অংশ অতি শীঘ্রই ধুয়ে চলে যাবে—এতো সহজ কথা। কথাটা অতীব সহজ হলেও আমাদের এই অদ্ভুত দেশে ক্ষয় নিবারক কোনও ব্যবস্থা বড় একটা না করেই চাষ করা হয়। ফলে বাঁকুড়া জেলার বহু অংশের মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। দারজিলিং জেলা যখন প্রথম বৃটিশ অধিকারে আসে তখন প্রায় সমস্তটাই অরণ্যে ঢাকা ছিল। এই জেলার অনেক স্থানে, যেমন কালিম্পং মহকুমার অনেক অংশে, অরণ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস করে মাটির ক্ষয়-নিবারক কোন ব্যবস্থা না করেই চাষের জন্য জমি বিলি করা হয়। স্মরণাতীত কাল থেকে এখানে অরণ্য থাকায় পাতা, গাছ, উদ্ভিজ্জ বস্তু ইত্যাদি পচে এখানকার জমিতে ৭।৮ ফুট গভীর উদ্ভিজ্জ সার জমে ছিল। কাজেই সেই কালে এখনকার জমির অসাধারণ উর্বরতা ছিল। কিন্তু অরণ্যের আবরণ লোপ হওয়ায় মাত্র কয়েক বছরের চাষের ফলে বৃষ্টিতে এই সার সমস্তটা ধুয়ে চলে গেল। এখন জমির উর্বরতা প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে, তাছাড়া ক্রমাগত জমির ভাঙ্গন হচ্ছে ও বহু স্থানে ধ্বস্ নামছে। ৮০ বছর আগে যতটা মাটি চাষের উপযুক্ত ছিল—শীঘ্রই তার অর্দ্ধেকও থাকবে না, তাছাড়া অনুর্বরতা সর্বত্র বেড়ে চলেছে।

জমির ক্ষয় নিবারণে অরণ্যের কাজ—

আমাদের দেশে আবহাওয়ার অবস্থা এই যে, বছরের মধ্যে কয়েক মাস প্রচুর বর্ষা হয়, আর বাকী কয়েক মাস বৃষ্টি প্রায় হয়-ই না। যে পর্বতে সমস্ত অরণ্য ধ্বংস হয়েছে, কয়েক বছরের বৃষ্টিতেই তার মাটির উপরের নরম অংশ সম্পূর্ণ ধুয়ে চলে যায়। তারপরে যে পাথর বেরিয়ে পড়ে ক্রমশঃ সেই

পাথরের ক্ষয় হতে আরম্ভ হয়। জলে ভিজে ভিজে আর জলের তুমুল স্রোতে পাথর ভেঙ্গে গিয়ে বালি আর পাথরের টুকরোয় পরিণত হয়। জলের তোড়ের সঙ্গে সেই বালি আর পাথরের টুকরো ভূমির ক্ষয় কাজের সহায়তা করে। মাটি সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ায় বৃষ্টির জল কোথাও শোষিত হয়ে থাকতে পারে না, কাজেই বর্ষার সমস্ত জলটাই তোড়ের সঙ্গে অজস্র ঝরণা দিয়ে নদীতে গিয়ে পড়ে। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ নদীতে হয় সাময়িক বন্যা। আবার শীত-কালে যখন একেবারেই বৃষ্টি হয় না, তখন পর্বতের উপরিভাগে আর নদীতে উভয় স্থানেই জলের অভাব হয়।

অন্য পক্ষে পাহাড়ের উপরিভাগ যদি অরণ্যে ঢাকা থাকে, তাহলে কি হয়? বছর বছর লতা, গুল্ম, ঝড়া পাত, ডাল ইত্যাদি পড়ে পড়ে অরণ্যের মাটিতে পাতা-সার জমতে থাকে। পাহাড়ের উপরেও অনেক জায়গায় অরণ্যের মধ্যে ৮।১০ ফুট গভীর এই পাতা পচা সার বা হিউমাস থাকে। এই হিউমাস কোমল ও সচ্ছিদ্র। এই রকম জায়গায় অরণ্যের উপর যখন বর্ষা নামে, তখন বৃষ্টির জলটা মাটির উপরে সরাসরি সজোরে পড়তে পারে না। গাছের ডালপাতায় বাধা পেয়ে তার তোড় যায় কমে। তারপরে আস্তে মাটিতে হিউমাসের ওপর পড়ে। হিউমাস কোমল ও সচ্ছিদ্র হওয়ায় তার মধ্যে বেশীর ভাগ জলটাই থেকে যায়। আর বাকী ভাগটা আস্তে আস্তে চলে যায়, সবটুকু তোড়ে বেড়িয়ে যেতে পারে না। এই জন্যে যে সব পর্বতের উপরে অরণ্য আছে সেখানে বছরের কোন সময়েই জলের সম্পূর্ণ অভাব হয় না। আর সে অরণ্য-ঢাকা পর্বতে যে সব নদীর উৎপত্তি সে সব নদীতে যেমন কখন জলের অভাব ঘটে না, তেমনি সহজে ভীষণ বন্যাও হয় না। সারা বছর জলের পরিমাণ অনেকটা সমান ভাবে থাকে।

দামোদর নদ ও তাহার আনুসঙ্গিক কয়েকটা নদ নদী যে বছরের অধিকাংশ সময়েই অতি শীর্ণ অবস্থায় থাকে, আর প্রতি বৎসর বর্ষার সময় বন্যায় ভাসিয়ে দেয়, তার এক মাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, দামোদর নদের উৎপত্তিস্থল যে ছোটনাগপুরের পার্বত্যপ্রদেশে সেই প্রদেশের সমস্ত অরণ্য ধ্বংস করা হয়েছে। দামোদরের ভীষণ বন্যা নিবারণের একমাত্র উপায় হচ্ছে ছোটনাগপুরের পর্বতে পুনরায় অরণ্য রোপণ করা। নদীতে বাঁধ বেঁধে বন্যার ধ্বংস কাজের সাময়িক নিবারণ হওয়া সম্ভব বটে, কিন্তু বছর বছর নদীর ভীষণ বন্যা বন্ধ করা সম্ভব নয়। আনন্দের বিষয় এই যে, প্রদেশে অরণ্য রোপণের কাজ আরম্ভ হয়েছে বলে শোনা যায়।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফেরা যাক্।—তবে কি পর্বতে ভূমি চাষ করলে মাটির ক্ষয় অনিবার্য? তা নয়। তবে ক্ষয়-প্রতিরোধক ব্যবস্থা করতে হবে, যথা ১। টেরেসিং অর্থাৎ ভূমির ধাপে ধাপে চাষ।

২। যেখানে ভূমির ঢাল খুব বেশী সেখানে চাষ না করে ঝোপ জঙ্গল বা যে কোন উদ্ভিদ রোপন।

৩। যে সব জায়গায় ধ্বস্ নামতে সুরু হয়েছে, সেখানে বাঁধ দেওয়া।

৪। ভূমির ঢাল অনুসারে ৫০।৬০ বা ১০০ ফুট নীচে নীচে এক এক সারি অরণ্য রোপন করা। ইত্যাদি।

মাটির ক্ষয় (২) বাতাসের দ্বারা—

পশ্চিম বঙ্গের নদীয়া জেলার সঙ্গে আমার কিছু ঘনিষ্ট পরিচয় আছে, সেখানে বৎসরে ৫৪।৫৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালে মাটির নীচে জলের লেভেল বা তল ৪০।৫০ ফুট নিম্নে। কূপের জল এই গভীরে পাওয়া যায়, উপরের মাটি ভয়ানক শুক্নো। আবার মাঘ থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত কয়মাস প্রায় সমস্ত দিন প্রচণ্ড বেগে গরম শুক্নো বাতাস বইতে থাকে। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হয় এই যে, মাটিতে বালির অংশ বাড়তে থাকে, কারণ ভূমির মাটি অংশটুকু বালি থেকে হালকা হওয়ায় মাটিটুকু ক্রমশঃ হাওয়ায় উড়ে চলে যায়। এইভাবে চল্‌তে থাক্‌লে

নদীয়া ও পারিপার্শ্বিক অন্যান্য জেলা যে ক্রমশঃ মরুভূমিতে পরিণত হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

আমার এই উক্তি শুনে হয়তো পাঠক আশ্চর্য বোধ করতে পারেন। কিন্তু অরণ্যের এই ধ্বংসের পরিণাম পৃথিবীর বহু স্থানে হয়েছে, তাহার বহু প্রমাণ আছে। টাইগ্রিস উপত্যকায় বেবিলোনিয়া, মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধযুগে প্রসিদ্ধ টুর্ফান ইত্যাদি একদা সমৃদ্ধ স্থান আজ মরুভূমিতে পরিণত। প্রাগ-ঐতিহাসিক ভারতের মহেঞ্জোদারো মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে। এই সহরে যে অসংখ্য ইটের তৈরী বাড়ী ছিল, সেই ইট পোড়াবার কাঠ অবশ্য কাছেরই অরণ্যে ছিল। তাছাড়া পুরাকালের সেই যুগে যে ঐ দেশে গণ্ডার ইত্যাদি অরণ্য-সুলভ জীব বাস করতো তার প্রমাণ আছে। তখনকার দিনের আবহাওয়ার বিষয় যতটা জানতে পারা যায় তাতে অনুমান হয় যে, সে সময় সেখানে অরণ্য ছিল। অবিবেচনায় অরণ্য ধ্বংস করার ফলেই সম্ভবতঃ এখানকার সভ্যতার ধ্বংস হয়েছে।

জমির ক্ষয় নিবারনে অরণ্যের কাজ—

এখন দেখা যাক নদীয়া ইত্যাদি স্থানে অরণ্য রোপন করলে এ বিষয়ে কি উপকার হওয়ার সম্ভাবনা। আগেই বলা হয়েছে যে, অরণ্যের মধ্যে ক্রমাগত উদ্ভিজ্জ বস্তু জমে' আর পচে' হিউমাসে পরিণত হয়। আর এই হিউমাস বর্ষার জল ধরে রাখবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এতে লাভ হয় এই যে, মাটির নীচে জলের তল গ্রীষ্মকালেও খুব নীচে চলে যেতে পারে না। একথা অরণ্যের ভিতরের জমি সম্বন্ধে যেমন খাটে অরণ্যের নিকটের ভূমি সম্বন্ধেও তেমনি। কাজেই এক মাইল দুই মাইল অন্তরে যদি অরণ্যের সারি রাখবার ব্যবস্থা করা যায়—তাহলে প্রথম লাভ হবে এই যে, কৃষি-কাজের জন্যে জল সহজলভ্য হবে।

দ্বিতীয়তঃ অরণ্যের ভিতরে সহজে রোদ প্রবেশ করতে না পারায় আর সিক্ত হিউমাসের দরুণ অরণ্যের ভিতরের বাতাস তত বেশি শুকনো হয় না, আর গরমও হয় না। তাছাড়া মধ্যে মধ্যে অরণ্য থাকলে অবাধে অত হাওয়াও চলতে পারে না। ফলে বায়ুর গতিতে যে মাটির ক্ষয় হয়—সেই ক্ষয় প্রতিরোধ হতে পারে।

মাঝে মাঝে অরণ্য থাকলে কৃষিকাজের আরও কতকগুলি সহায়তা হয়। আজকাল দেখা যায় যে, মাঠে যত গোবর পড়ে তার প্রত্যেক টুকরো সযত্নে কুড়িয়ে এনে ঘুটে তৈরী করা হয়। জমিতে সার দেওয়াই গোবরের ন্যায্য ব্যবহার। সমস্ত গোবর ঘুটে করে জালিয়ে দেওয়া যে অত্যন্ত অন্যায় একথা অনেকের মুখেই শোনা যায়। কিন্তু চাষার উনান জ্বালাবার জন্যে আর কি উপায় আছে? পাথুরে কয়লা কতটা সহজলভ্য তা আজকের দিনে কাউকে বলার প্রয়োজন নেই। আগে অরণ্য স্থাপন করে জ্বালানি কাঠ সস্তায় ও সহজে পাওয়ার ব্যবস্থা করে' তারপর গোবরের ন্যায্য ব্যবহারের কথা উত্থাপন করলেই সমীচীন হয়।

চাষের লাঙ্গল, গরুর গাড়ি তৈরির কাঠ, ঘরের খুঁটি ইত্যাদি চাষার নানা কাজের সহায়তা হয় যদি তার গৃহের অল্প দূরেই অরণ্য থাকে।

দেশে অরণ্য থাকলে শুধু চাষারই নয়, দেশের সর্বসাধারণেরও অসংখ্য বনজ সামগ্রী পেতে সুবিধা হয়। এ বিষয়ে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, দেশের সম্পূর্ণ উপকারে আসতে হলে অরণ্যের সংস্থানও উপযুক্ত হওয়া চাই। পশ্চিম বঙ্গের উত্তরে বহু মূল্যবান অরণ্য আছে, কিন্তু তাতে মধ্যবাংলার ভূমির ক্ষয় নিবারণ হয় না, বা মধ্যবাংলার অধিবাসীদের বনজ দ্রব্যের প্রয়োজনও মেটে না। প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক গ্রামের নিকটে নিকটে অরণ্য স্থাপন করা দরকার।

এখন দেখা যাক—অরণ্য স্থাপনের কাজ করবে কে? কৃষিকাজের ফল প্রায় সদ্যই পাওয়া যায়। অরণ্য সৃষ্টির ফল পেতে হলে বা বনজ জিনিষ

(যেমন বাহাদুরী কাঠ) পেতে হলে অরণ্য স্থাপন করবার পর অনেক বছর অপেক্ষা করে বসে থাকতে হয়। কোন কাজে টাকা ফেলে লাভের জন্য অতদিন বসে থাকা কোন ব্যক্তি-বিশেষের বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাধ্য নয়। তাছাড়া অরণ্য ধ্বংসের কুফল নিশ্চিৎ ও মারত্মক হলেও সদ্য সদ্য সেটা চোখে পড়ে না। সেই কুফল এত আস্তে হয় যে, হয়তো ৩০০।৪০০ বছর পর্যন্ত দেশের অধিবাসীরা বুঝতেই পারে না যে, দেশ আস্তে আস্তে মরুভূমিতে পরিণত হতে চলেছে। অরণ্য সংরক্ষণ ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জন্যই বিশেষ করে করা দরকার।

এই সকল কারণে অরণ্য রোপন ও রক্ষণের দায়িত্ব সরকারের দায়িত্ব। সরকার বলতে আমি এখানে রাষ্ট্র বা State ছাড়াও অন্য কোন জন সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠান বা মিউনিসিপালিটির কথাও ধরছি, যারা এই কাজের দায়িত্ব নিতে পারেন।

জার্মানিতে কোন কোন সহরের সংশ্লিষ্ট অরণ্য মিউনিসিপালিটির দ্বারা পরিচালিত হয়। সেই সকল অরণ্যে লোকে বনজ জিনিষ সহজে পায় ও অরণ্যসংরক্ষণের 'লভ্যাংশ মিউনিসিপ্যালিটি করদাতাদের মধ্যে বণ্টন করেন। অনেক সময়ে এই লভ্যাংশ মিউনিসিপ্যালিটির কর থেকেও পরিমাণে বেশী হয়। বৃটিশ আমলেও এদেশের স্থানে স্থানে, যেমন দারজিলিং, মুশুরীর কাছে চক্রাটায় সৈন্যদের বনজ জিনিষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ছাউনীর সংশ্লিষ্ট অরণ্য সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা হয়েছে।

এই জন্য অরণ্য রোপন আর সংরক্ষণের দায়িত্ব শুধু সরকারেরই, এই কথা মনে করে' নিশ্চিন্তে নিদ্রা দেওয়া চলবে না। সাধারণের এই বিষয়ে অবহিত হতে হবে; আর সরকার, মিউনিসিপ্যালিটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা তাঁদের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করছেন কিনা সেদিকে নজর রাখাও সাধারণতন্ত্রের দেশে সাধারণেরই দায়িত্ব।

নতুন অরণ্য রোপন করতে হলে প্রথমে কিছু অর্থব্যয় করতে হবে, আর তার মুনাফা পেতেও কিছু দেরী হবে। তবে ৮।১০ বছরের পর থেকেই জ্বালানি কাঠ, ঘাস ইত্যাদি বাবদ কিছু কিছু লাভ হবার সম্ভাবনা। অরণ্য রোপনের প্রাথমিক ব্যয় যদি অযথা বেশী না হয় তাহলে খরচের টাকা চক্র-বৃদ্ধিহারে সুদ শুদ্ধ ধরলেও পরে বনজ জিনিষ থেকে তার বহুগুণ লাভ আদায় করা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। রোপনের ৭০।৮০ বছরের পর থেকে আর্থিক ও অন্যান্য সকল রকম উপকার সম্পূর্ণভাবে পাওয়ার আশা করা যায়। সুবিধা হলে অরণ্য সৃষ্টি দ্বারা কী ভাবে অরণ্য রোপন ও সংরক্ষণ করা হয়, আর সুব্যবস্থিত সুরক্ষিত অরণ্য থেকে কী উপায়ে মোটামুটি সমানভাবে বাৎসরিক লাভ চিরকাল পাওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, সে সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা পাঠকদের দিতে পারব আশা করি।

দেশের জীবনরক্ষার জন্য অরণ্য যে একান্ত প্রয়োজন একথা দেশের লোক উপলব্ধি করলে এর জন্যে দেশবাসী অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত হবে না।

আবার সেইজন্যে দেশের লোকের অজ্ঞতার সুবিধা নিয়ে অযথা টাকার অপব্যয়ের স্বপক্ষেও কিছু বলা চলে না। একথা বলবার বিশেষ কারণ আছে। বছর দুই হল বাংলা সরকার মধ্যবাংলায় নতুন অরণ্য স্থাপন করবার কাজ আরম্ভ করেছেন। আমার মতে ও অভিজ্ঞতায় নতুন অরণ্য রোপনের কাজে একর-প্রতি ১০০৲ টাকার বেশি ব্যয় হওয়া মোটেই উচিত নয়। সেদিন 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' পত্রে দেখলাম নদীয়া জেলায় এই দুই বছরে মাত্র ২০ একর অরণ্য রোপন করা হয়েছে। একজন বা দুজন মালী আর একজন ফরেষ্টার বা বনরক্ষক নিযুক্ত করলেই যে কাজ হতে পারতো সেখানে মালী তো নিযুক্ত আছেই, অধিকন্তু সেই মালীর কাজের তদারক করবার জন্য একজন বিভাগীয় বন কর্মচারি, জনকয়েক ফরেষ্ট রেঞ্জার ও ফরেষ্টার,

জনকয়েক ফরেষ্ট গার্ড, জনকয়েক কেরানী, পিয়ন, পেয়াদা, আরদালি ইত্যাদি পুষ্ট হচ্ছেন। যেখানে ২।৩ হাজার টাকার অধিক ব্যয় হওয়া উচিত ছিলনা, সেখানে লক্ষাধিক টাকা অপব্যয় হয়ে গিয়েছে এবং আরও হচ্ছে। এই সংবাদের সরকারী কোন প্রতিবাদ না হওয়ায় সংবাদটি সত্য বলেই ধরে নিতে হয়। কিন্তু সরকার এর কোন প্রতিকার করছেন, অথবা সাধারণের অর্থের এই অপব্যয় নিবারণের কোন ব্যবস্থা করছেন বলে জানা যাচ্ছে না। সাধারণের অর্থের অপব্যয় বেপরোয়া ভাবে করার অভ্যাস দেশের নিঃশঙ্ক 'সাধারণ ভৃত্যদের" মজ্জাগত হয়েছে।

মেদিনীপুর জেলাতেও গত দুই বছর ধরে অরণ্য রোপনের কিছু কিছু কাজ হয়েছে বলে শোনা যায়, কিন্তু কাজ কতটা হয়েছে আর ব্যয়ের পরিমাণ কিরূপ তা জানি না। তবে শোনা গেল যে, সেখানে ইতিমধ্যে ডিভিসনাল ফরেষ্ট অফিসারের বাসের জন্য সুরম্য সৌধ নির্মিত হয়েছে—তার প্রত্যেক ঘরে আছে মোজেইক ফ্লোর!
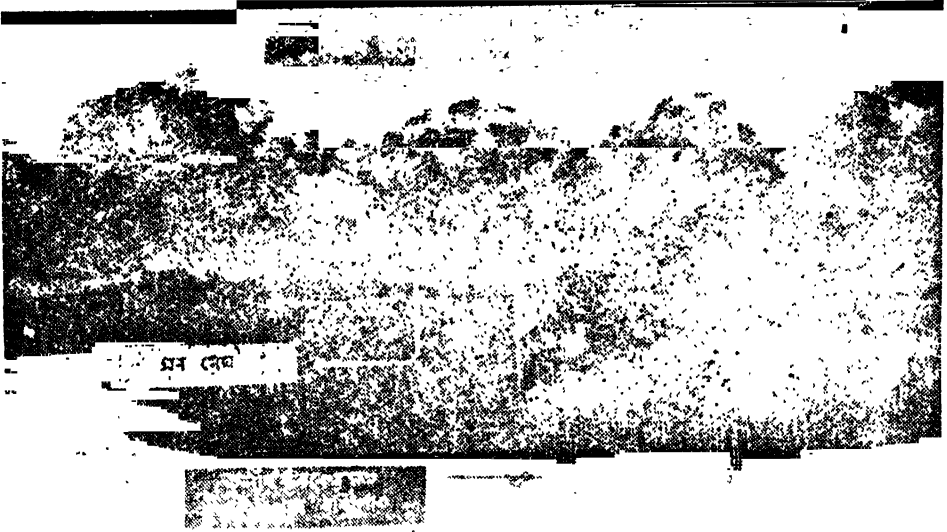
কৃত্রিম উপায়ে মেঘ থেকে বৃষ্টি নামানোর ব্যবস্থা

আবহাওয়া-তত্ত্ববিদ বায়ুমণ্ডলের চাপ, আর্দ্রতা, উষ্ণতার বিষয় পরীক্ষা করে ঝড়-জল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। কিন্তু সে ভবিষ্যদ্বাণী যে কাঁটায় কাঁটায় নির্ভুল হবে এমন কোন কথা নেই। সে যা-ই হোক, ঝড়-জল প্রভৃতি প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবার কৌশল মানুষ আয়ত্ত করতে পারেনি। অথচ, এ বিষয়ে তাদের চেষ্টার বিরাম নেই। অনেক কাল পূর্ব থেকেই বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকরা এ সম্বন্ধে কোন কার্যকরী উপায় আবিষ্কারের জন্যে চেষ্টা করে আসছেন; কিন্তু তাতে কিছু সাফল্য লাভ হলেও তা পরীক্ষাগারের সীমার বাইরে কার্যকরী করা সম্ভব হয়নি। মাত্র কিছু কাল পূর্বে এ বিষয়ে একটা কার্যকরী ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়েছে। অনেক সময়েই দেখা যায় আকাশে মেঘ রয়েছে অথচ একফোঁটা বৃষ্টি নেই। এরূপ ক্ষেত্রে এরোপ্লেন থেকে মেঘের মধ্যে শুকনো-বরফের (সলিড কার্বনডাইঅক্সাইড) গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলে মেঘের জলীয়বাষ্প তুষারকণিকায় রূপান্তরিত হয়ে নীচের উষ্ণতর পরিবেশে পুনরায় জল কণিকায় পরিণত হয় এবং বৃষ্টির ফোঁটার আকারে পড়তে থাকে। মেঘের মধ্যে শুষ্ক বরফের গুঁড়ো ছড়ানোর পরে অল্প সময়ের মধ্যেই মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য স্থানে এই কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের ব্যবস্থা খুব সাফল্যলাভ করেছে

ক্যাথোড-রে অসিলোগ্রাফ

শ্রীসুনীলকুমার সেন

এমন কোন গবেষণাগার কিংবা হাসপাতাল নেই যেখানে ক্যাথোড-রে অসিলোগ্রাফ যন্ত্রের ব্যবহার হয় না। বিজ্ঞানের দৈনন্দিন প্রায় সমস্ত কাজেই এই যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। ক্যাথোড-রে অসিলোগ্রাফ-যন্ত্র এত কাজে ব্যবহৃত হয় যে, উহার সমস্ত বর্ণনা দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। আধুনিক ক্যাথোড-রে টিউবের মোটামুটি একটি বর্ণনা দেওয়া হোল।

একটি কাঁচের নলে বাতাসের অল্পচাপে ক্যাথোড ও অ্যানোড রাখা হয়। বিদ্যুতের সাহায্যে ক্যাথোড-টিকে গরম করে তা থেকে ইলেক্ট্রন বের করা হয়। এখানে অ্যানোডের মাঝখানে একটি গর্ত করা থাকে। সুতরাং ক্যাথোড হতে নির্গত

১নং চিত্র

ক্যাথোড-রে অসিলোগ্রাফ

ইলেক্ট্রন অ্যানোডের এই গর্ত দিয়ে অপর দিকে এক সরু রশ্মির আকারে বের হয় এবং নলের অপরদিকে একটি ফ্লোরেসেণ্ট স্ক্রীন বা প্রতিপ্রভ পর্দায়-গিয়ে পড়ে। পর্দার যেখানে ইলেক্ট্রনের সংঘর্ষণ হয়, টিউবের বাইরে থেকে আমরা সেখানটায় একটি তীব্র আলোকবিন্দু দেখ্‌তে পাই।
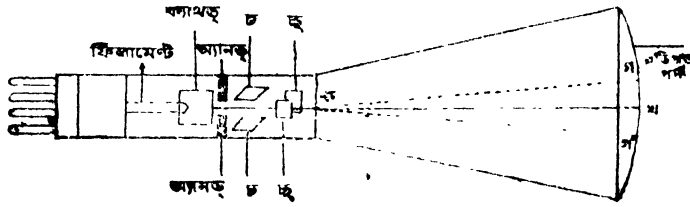
ক্যাথোড-রে টিউবের মূলসূত্র আমাদের কাছে নতুন নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্যাথোড-রশ্মির আবিষ্কার হয়। বায়ুর অল্প চাপে যখন কোন দুটি তড়িৎদ্বারে প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক চাপ প্রয়োগ করা হয়, তখন ক্যাথোড হতে এক প্রকার বিদ্যুৎকণা সোজাপথে অ্যানোডের দিকে ধাবিত হয়। ক্রুকস, পেরাঁ এবং টম্‌সন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা দেখান যে, ক্যাথোড যে কোন ধাতু নির্মিত হোক না কেন, উহা হতে একই প্রকার বিদ্যুৎকণা বের হয়। এই কণাগুলি নেগেটিভ বিদ্যুৎ বহন করে এবং বৈদ্যুতিক ও চৌম্বিক প্রভাবে ইহাদিগকে সুবিধামত যে কোন দিকে চালনা করা যেতে পারে। এই কণাগুলিকে ইলেক্ট্রন বলা হয়।

এই আবিষ্কারের ওপর ভিত্তি করে' ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ব্রণ্‌ প্রথম ক্যাথোড-রে টিউব নির্মাণ করেন। ইহার পর এই যন্ত্রের অনেক উন্নতি হয়েছে। নিম্নে

যন্ত্রের এই ইলেক্ট্রন প্রবাহকে যেকোন দিকে চালনার জন্য অ্যানোড ও পর্দার মাঝখানে এক-জোড়া প্লেট রাখা হয়। (১ নং চিত্রে চ-চিহ্নিত প্লেট)। স্বাভাবিক অবস্থায় প্লেট দুটিতে যখন কোন বৈদ্যুতিক চাপ থাকে না, তখন ইলেক্‌ট্রনগুলি সোজাপথে পর্দায় গিয়ে পড়ে এবং পর্দার মাঝখানে আলোক বিন্দুটিকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

কিন্তু প্লেট দুটিতে যখনই কোন বৈদ্যুতিক চাপ প্রয়োগ করা হয়, তখন চাপের মাত্রা অনুযায়ী ইলেক্‌ট্রণগুলো উহাদের সোজা গতিপথ হতে সরে

যায় এবং পর্দার আলোকবিন্দু আগে থেকে ওপরে কিংবা নীচুতে দেখ্‌তে পাওয়া যায় (চিত্রের ক গ রেখা)। কাজেই দেখা যাচ্ছে, প্লেট দুটির বৈদ্যুতিক চাপের মাত্রার ওপর ইলেকট্রনের গতি-পথ নির্ভর করে।. স্থতরাং অন্যভাবে আমরা যদি পর্দার ওপর বিন্দুটি আগে থেকে কতখানি বেঁকেছে জান্‌তে পারি, তাহলে তা থেকে প্লেট দুটির ওপর বৈদ্যুতিক চাপের মাত্রা অনায়াসে জেনে যাব, যেমনিভাবে গ্যালভেনোমিটারের কাঁটাটি কতখানি সরেছে জান্‌লে তথেকে বৈদ্যুতিক চাপ জান্‌তে পারি। তাহলে দেখা যায়, ক্যাথোড-রে টিউবের ইলেকট্রন-রশ্মিই গ্যালভেনো-মিটারের কাঁটার কাজ করে থাকে। কিন্তু পার্থক্য হোল এই যে, গ্যাল-ভেনোমিটারের কাঁটার একটি নিজস্ব ওজন থাকাতে ওটাকে ক্যাথোড-রে টিউবের ইলেক-ট্রন-রশ্মির ন্যায় অত তাড়াতাড়ি এবং স্বচ্ছন্দ গতিতে চালনা করা যায় না। ফলে, সেখানে অতি অল্প সময়ের জন্য খুব কম বৈদ্যুতিক চাপের নির্দেশ সঠিক জানা যেতে পারে না।

এ যন্ত্র সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, যে কোন ঘটনাকেই আমরা চোখে দেখ্‌তে সক্ষম হই। বিশেষতঃ যে সমস্ত ঘটনা সময়ের সঙ্গে বদলাতে থাকে, তার নির্ভুল ছবি আমরা একই সময়ে দেখ্‌তে পাই এই যন্ত্রের সাহায্যে। এত সহজ ও নির্ভুলভাবে কোন যন্ত্রই এ সমস্ত কাজ করতে পারে না। তাছাড়া দরকার'মত যে-কোন ঘটনার ফটো তোলার জন্য এই যন্ত্রের পর্দার সঙ্গে ক্যামেরা লাগানর ব্যবস্থা আছে।

এই যন্ত্রের সাহায্যে আমরা তরঙ্গের আকার দেখতে পারি। তরঙ্গের আকার বলতে আমরা বুঝি সময়ের সঙ্গে তরঙ্গের বিস্তার কিভাবে বদলায়। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যেতে পারে পরিবর্তনশীল অথবা অলটারনেটিং প্রবাহকে (২নং চিত্র)। এখানে যখন তরঙ্গের কোন বিস্তারই নেই তখন থেকে আমরা আমাদের সময় রাখছি। তাহলে দেখা যায়, সময়ের সাথে বিস্তার ক্রমশঃ বাড়ছে এবং এক সময়ে সবচেয়ে বড় হয়ে আবার ক্রমশঃ কম্‌তে কম্‌তে একেবারেই থাক্‌ছে না। আবার উহা অন্যদিকে বেড়ে যায় এবং আরেক সময়ে অপরদিকে সবচেয়ে বড় হয়ে ফের কম্‌তে কম্‌তে একেবারে কিছুই থাক্‌ছে না। বিস্তা-রের এই সম্পূর্ণ ছবিটাকে আমরা আসলে তরঙ্গের ছবি বলে থাকি।
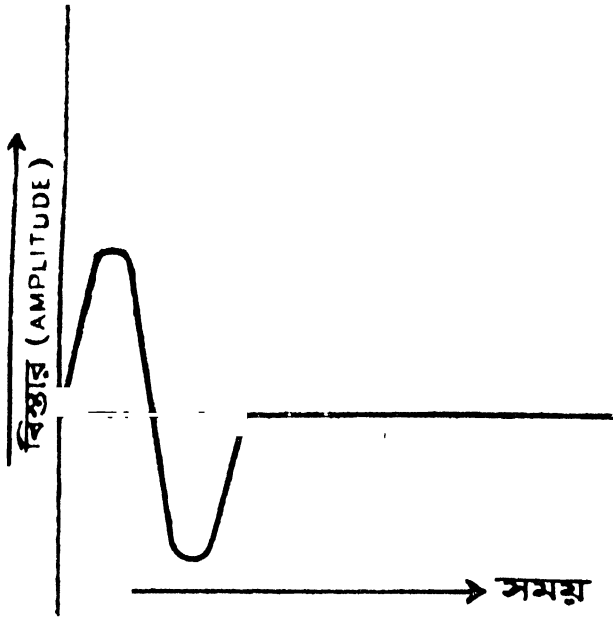
২নং চিত্র
পরিবর্তী প্রবাহের ছবি

যেখানে সদাসর্বদা তরঙ্গের বিস্তার বদলাচ্ছে, সেখানে একই সময়ে কিভাবে আমরা তরঙ্গের ছবি দেখতে পাই সেটাই হোল প্রশ্ন। এর মীমাংসা করেছে, ক্যাথোড-রে অসিলোগ্রাফ। এজন্য এ যন্ত্রে আরও এক জোড়া প্লেট থাকে (চিত্রে ছ-চিহ্নিত প্লেট)। এ দুটি প্লেট অপর দুটির সঙ্গে লম্বালম্বি করে বসানো আছে। যে তরঙ্গের ছবি আমরা দেখতে ইচ্ছুক, তার বৈদ্যুতিক চাপ চ-প্লেটে প্রয়োগ করা হয়। অপর ছ-প্লেটের ওপর বৈদ্যুতিক চাপ সময়ের সঙ্গে ক্রমশঃ শুধু বাড়ান হতে থাকে

(৩নং চিত্র)। এজন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই সময়কাল অনির্দিষ্ট নয়। ইহার সময়কাল চ-প্লেটে প্রযুক্ত তরঙ্গের দোলনকালের (Period) সমান রাখা হয়।

ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াল এই যে, চ-প্লেটের ওপর বৈদ্যুতিক চাপ যখন সময়ের সঙ্গে বদলাচ্ছে, ঠিক সেই সময়ে আবার ছ-প্লেটের বৈদ্যুতিক চাপ ক্রমশঃ বেড়েই চল্‌ছে। সুতরাং একটি ইলেক্‌ট্রন যখন একই সময়ে এই তুজোড়া প্লেটের ভেতর দিয়ে যাবে, তখন চ-প্লেটের বৈদ্যুতিক চাপ উহাকে ওপর কিংবা নীচের দিকে টান্‌বে এবং একই সময়ে আবার ছ-প্লেটের বৈদ্যুতিক চাপ ইলেক্‌ট্রনটিকে পাশে একদিক হতে আরেক দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইবে। ফলে ইলেক্‌ট্রনটি একটি মধ্যম (Resultant) পথ অবলম্বন করবে। ইলেক্‌ট্রনের এই মধ্যম গতিপথের নিশানা নির্ভর করবে ঠিক সে সময়কার চ এবং ছ-প্লেটের যৌথ বৈদ্যুতিক চাপের মাত্রার ওপর। যেহেতু প্রতি মুহূর্তে উভয় প্লেটের বৈদ্যুতিক চাপ বদলাচ্ছে, সেহেতু ইলেক্‌ট্রনের মধ্যম পথও প্রতি মুহূর্তে অন্য রকম হচ্ছে। আগে বলেছি, ছ-প্লেটের ক্রমবর্ধমান বৈদ্যুতিক চাপের সময়কাল এবং চ-প্লেটে প্রযুক্ত তরঙ্গের দোলনকাল সমান রাখা হয়। সুতরাং সেক্ষেত্রে ইলেক্‌ট্রনের মধ্যম গতিপথ আসলে চ-প্লেটের তরঙ্গের আকারের ন্যায় হয় এবং তরঙ্গের ছবি যেটাকে আমরা বলি, সেটা প্রকৃতপক্ষে যন্ত্রের পদায় ইলেক্‌ট্রনের মধ্যম গতিপথেরই নির্দেশ দেয়।

এখানে কিন্তু মনে রাখ্‌তে হবে যে, কোন একসময়ে ইলেক্‌ট্রন কেবলমাত্র একটি মধ্যমপথ অবলম্বন করে, যদিও সময়ের সঙ্গে তার সেই গতিপথের ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। কাজেই প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে, কি ভাবে একই সময়ে আমরা পর্দায় ইলেক্‌ট্রন-গতিপথের সম্পূর্ণ ছবি দেখে থাকি। তার কারণ আমাদের চোখের একটি দোষ। এই দোষকে বলা হয় Persistence of vision অর্থাৎ সম্মুখের কোন জিনিষ অদৃশ্য হওয়ার পরও আমাদের চোখ অল্প সময়ের জন্য তা দেখ্‌তে পারে। সুতরাং যন্ত্রের পর্দায় ইলেক্‌ট্রন যখন সময়ের সঙ্গে তার গমনপথের নির্দেশ দিয়ে যায়, তখন আমাদের চোখ একসঙ্গে ইলেক্‌ট্রনের সেই গমনপথ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখ্‌তে পায়।
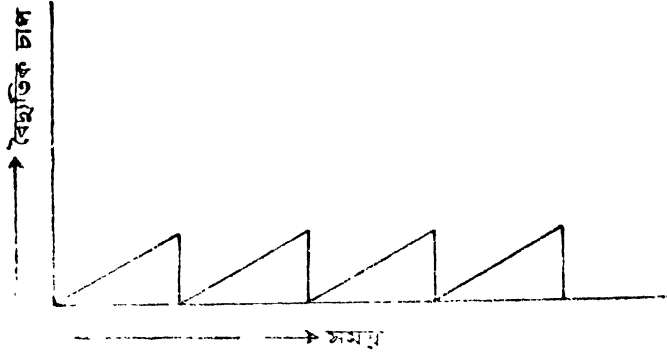
৩নং চিত্র

'ছ' প্লেটে প্রযুক্ত বৈদ্যুতিক চাপের ছবি

ক্যাথোড-রে অসিলোগ্রাফ যন্ত্রের অসাধারণ বিশ্লেষণ-শক্তি অনেক জটিল সমস্যা সমাধানের সুযোগ দিয়েছে। টেলিভিশনে আজকাল এই যন্ত্র একেবারে অপরিহার্য বললেই চলে। তাছাড়া বিজ্ঞানের প্রায় সমস্ত শাখায়ই দরকারমত এই যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। বেশীরকম ব্যবহার হওয়ার দরুণ বিদেশের অনেক কোম্পানী এই যন্ত্র নির্মাণ করে থাকেন।

টিস্যু কালচার

শ্রীনগেন্দ্রনাথ দাস

দ্রোণী বা ঘট থেকে সন্তানোৎপত্তি অথবা মাংসপিণ্ডের মনুষ্যাকৃতি পরিগ্রহণ প্রভৃতি অনেক অদ্ভুত ঘটনার কথা পৌরাণিক কাহিনীতে শুনতে পাওয়া গেলেও সে সব কথার সত্যতায় আস্থা স্থাপন করা যায় না; অথচ আধুনিক যুগের বিজ্ঞান এ ধরণের অনেক অসম্ভব ব্যাপারকেই সম্ভব করে তুলেছে। আজকাল জীবিত দেহাংশকে শরীর থেকে

১নং ছবি
হৃৎপেশীর ফাইব্রোব্লাষ্টের ঝুলন্ত-ফোঁটা কালচার। অরঞ্জিত অবস্থায় অনুবীক্ষণ যন্ত্রে যেরূপ দেখা যায়।

বিচ্ছিন্ন করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জীবিত রাখা যায় এবং শুধু তাই নয়, দিনে দিনে সে বৃদ্ধি প্রাপ্তও হতে থাকে। প্রকৃতির এই অদ্ভুত প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কন্‌হিম প্রথম আমাদের জ্ঞাত করান। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই টিস্যু কালচার আরম্ভ হয়। কারেল (১৯০৭) আমেরিকায় তার বিজ্ঞান মন্দিরে বহু গবেষণাদ্বারা সম্যক উপলব্ধি করেন যে, বিভিন্ন পরীক্ষামূলক অবস্থায় তন্তু-কোষ সম্বন্ধে মূল তথ্যানুসন্ধান সম্ভব হ'তে পারে।

বারো এবং কারেল এক অদ্ভুত কৌশলের দ্বারা দেহের প্রায় সর্বপ্রকার তন্তুর কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি সাধন করেন। প্রথমে ভ্রূণজ তন্তু, পরে পূর্ণবয়স্ক প্রাণী-তন্তু ও নবজাত কোষকে তিনি বিচ্ছিন্ন ভাবে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হন। অধ্যাপক কারেলের এই কৃত্রিম উপায়ে তন্তুর জীবনরক্ষা ও বৃদ্ধি-সাধন, ইংরেজীতে যাকে বলা হয়—টিস্যু কালচার, সম্বন্ধে অবদান অতুলনীয়। মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা যে আলোকপাত করেছে তা ভবিষ্যতে অনেক নূতন পথের সন্ধান দিবে।

বহু দেশে শারীরতত্ত্ব সম্পর্কিত তথ্যানুসন্ধানের জন্য টিস্যু কালচারের প্রথা প্রচলিত হলেও এদেশে এ-উপায়ে গবেষণা বিরল। শরীর-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণাক্ষেত্রে এর যথেষ্ট আবশ্যকতা রয়েছে।

কৃত্রিম ব্যবস্থায় দেহের তন্তু শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে জীবিত রাখা একটী অভাবনীয় উপায় এবং এর দ্বারা এই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কোষগুলো মূলতঃ অমর। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন মৃত্যু বহু প্রকার। দেহের মৃত্যুতে তৎক্ষণাৎ সমষ্টিগত কোষগুলোর মৃত্যু হয় না। মৃত্যুতে এই হয় যে, দেহযন্ত্রগুলো পরস্পরের সহিত সুসংবদ্ধ ভাবে কাজ করতে পারে না। মৃত্যুর ফলে দেহ শীতল হতে পারে, কিন্তু কতকগুলো কোষ হয়তো তখনও জীবিত আছে এবং যথাযথ ব্যবস্থায় মাধ্যম রসে রাখলে এই কোষগুলো বহুকাল পর্যন্ত জীবিত থাকে এবং সংখ্যা বৃদ্ধিও করে। ১৯১১ সালে কারেল ভ্রূণজ হৃৎপিণ্ডের কোষ বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেন, তার বংশধারা কৃত্রিম মাধ্যম-রসের ভিতর আজও অব্যাহত আছে।

কোষের বৃদ্ধি বাইরের প্রভাবের উপরও নির্ভর করে। পরীক্ষণীয় বিষয় হিসাবে প্রত্যেকটি কোষ অসীম সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। বৃদ্ধির উপর যেসব

প্রভাব কাজ করে শুধু তাই নয়, অনিষ্টকর পদার্থভূত বা জীবাণুঘটিত আবহাওয়া কি ভাবে প্রভাবান্বিত করে অথবা বিভিন্ন প্রকার কোষের পারস্পরিক সম্বন্ধ, এই সমস্তই এই উপায়ে অনুশীলন করা সম্ভব। জীববিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলো টিস্যু কালচারদ্বারা অত্যন্ত সহজে করা সম্ভব। সম্পূর্ণ জন্তুর উপর পরীক্ষা এক এক প্রকার কোষের উপর পরীক্ষা দ্বারা পরিপূরণ করা হয়।

টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ তথ্য এখানে বলা সম্ভব নয়। এখানে আমরা শুধু কোষের দৈহিক ও বংশানুক্রমিক বৃদ্ধি সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য তথ্য সমূহের আলোচনা করব।

কোষের বৃদ্ধির জন্য দুটি উপাদান প্রয়োজন: (১) কাঠাম, (২) পুষ্টি।

পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, কোন তন্তু একটি পুষ্টিকর রসে ঝুলিয়ে রাখলে কোষগুলো সংকুচিত হয়, আর কোন ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। বৃদ্ধির জন্য কাঠাম প্রয়োজন। সূক্ষ্ম কাচ-আবরণী বা তন্তু রাখার জন্য অন্য কোন তল কিয়ৎপরিমাণে এই অভাব পূরণ করে। কিন্তু দেহের সংযোজনী তন্তুর অনুকরণে একটি সূক্ষ্ম জাল সর্বোৎকৃষ্ট। বিভিন্ন পদার্থ পরীক্ষা করে দেখা গেছে ফাইব্রিনের জালই আদর্শ কাঠাম। জমাট বাঁধার বিরুদ্ধে যথাযোগ্য সাবধানতা অবলম্বন করে যদি কোন প্রাণী থেকে পিচকারী দিয়ে রক্ত টেনে হিম-শীতল পরীক্ষানলে শীতল অবস্থায়ই সেন্ট্রিফিউজের প্রক্রিয়ায় প্লাজমা বা লাসিকা পৃথক করে শীতল অবস্থায় রাখা হয় তাহলে দীর্ঘকাল জমাট না বাঁধিয়ে রাখা সম্ভব। টিস্যু কালচারের জন্য কাচ আবরণীর উপর এক ফোঁটা লাসিকা ছড়িয়ে দেওয়া হয়; তন্তুটীর সহিত স্বজাতীয় ভ্রূণরস মিশাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই জমাট বেঁধে যায়। এই জমাট বাঁধা ফাইব্রিনই কোষবৃদ্ধির পক্ষে উপযুক্ত কাঠাম।

টিস্যু কালচারের প্রায় সব মাধ্যমই জান্তব উপাদানে প্রস্তুত। রক্তে যে সকল অজৈব লবণ থাকে সেগুলির একটী দ্রবও প্রয়োজন, যথা রিঙ্গারের দ্রব। কখনও কখনও গ্লুকোজ যোগ করা হয়।

মাধ্যমের মধ্যকার একটি রস কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। এই রসে সাধারণতঃ দেহ-বর্দ্ধক হরমোন থাকে। জীবিত কোষে বিশেষতঃ ভ্রূণেও এই হরমোন আছে। সাত থেকে দশদিন কৃত্রিম উপায়ে তা' দেবার পর ডিমের ভ্রূণগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে কেটে টাইরোডের দ্রব এর সহিত সেন্ট্রিফিউজ প্রক্রিয়ায় পৃথক করা হয়। উপরকার পরিষ্কার রসটি ভ্রূণরস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। টিস্যু কালচারের অপর উপাদান সিরাম। লাসিকা নেওয়া হলে অবশ্য সিরামই রয়েছে।

২নং ছবি
হৃৎপেশীর ফাইব্রোব্লাষ্টের ঝুলন্ত-ফোঁটা কালচার। রঞ্জিত অবস্থায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভ্রূণজ তন্তুর রস, লাসিকা ও অজৈব লবণ কৃত্রিম উপায়ে টিস্যু কালচারের কার্যে ব্যবহৃত হয়। সংক্ষেপে প্রক্রিয়াটির বিবরণ দেওয়া যাক। কাচ আবরণীর উপর ঝুলন্ত ফোঁটাই সাধারণতঃ এই কাজে ব্যবহৃত হয়। প্রয়োজনীয় রস সমূহ তৈরী হ'বার পর ভ্রূণজ বা অপর কোন তন্তু লাসিকার সঙ্গে কাচ আবরণীর উপর রাখা হয়। একটি গর্তযুক্ত পরীক্ষা কাচ বা সাধারণ পরীক্ষা কাচের উপর একটী পিতলের আংটী স্থাপন করে তার উপর কাচ আবরণীটি রেখে (যাতে তন্তুটি গর্তের ভিতর থাকে) মোম দিয়ে রন্ধ্রহীনভাবে আটকে দেওয়া হয়। মাধ্যম তৈরী ও টিস্যু কালচারের সময় প্রত্যেকটি কাজ বীজাণুসংশ্রব শূণ্য হওয়া প্রয়োজন।

কৃত্রিম উপায়ে তাপ দিবার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি আরম্ভ হয়। কালচারটি বাঁচিয়ে রাখার জন্য সাব-কালচার করা হয়। বর্ধমান তন্তু থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা কেটে অপর একটি কাচ অবরণীর উপর পূর্বোক্ত উপায়ে স্থাপন করা হয়। কালচারটি স্থায়ী করতে হ'লে প্রতি দু' তিন দিন অন্তর এই প্রক্রিয়া চালাতে হয়। কতকগুলো উপায়ে অবশ্য কয়েক সপ্তাহ ধরে কালচারটির অবাধ বৃদ্ধি বজায় রাখা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে মাধ্যম রসটি বার বার পরিবর্তণ করা সম্ভব এরূপ একটী বৃহৎ ধারক বা পাত্র প্রয়োজন। এরূপ যন্ত্রের মধ্যে কারেলের ফ্লাস্ক বহু পরিচিত। এই যন্ত্রটির একদিকে একটি উর্ধবাহু বহির্গমন পথ আছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা (১নং
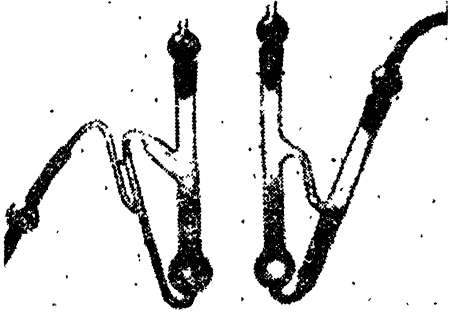
৩নং ছবি
অবিরাম মাধ্যম-রস পরিচালন যন্ত্র।

চিত্র) বা ক্যামেরা লুসিডার সাহায্যে আয়তন মেপে বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। কাচ আবরণীস্থিত কালচারটির ভিতর দিয়ে দৃষ্টি সম্ভব, কারণ বৃদ্ধির অর্থ বর্তমান ক্ষেত্রে কোষ-সমষ্টির একটি পাত বা সিট (২নং চিত্র)। আরও আধুনিক কার্যকরী পন্থা এখন অবলম্বন করা হয়, যেমন কারেল পাম্প (৩নং চিত্র), লিণ্ডবার্গ গ্যাস-ফ্লাস্ক।

কোষের বৃদ্ধি ও নিয়ন্ত্রণকারী-প্রভাব সমূহ টিস্থ কালচারদ্বারা সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর কোষের সংখ্যাবৃদ্ধির ধারা বিভিন্ন। ফাইব্রো ব্লাষ্ট নামক এক প্রকার কোষ মাত্র দেহের বাইরে দীর্ঘকাল সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে। কতকগুলো কোষ একেবারে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে চায় না, কি অবস্থায় এগুলো বাঁচতে পারে তার সমস্ত তথ্য এখনও অজ্ঞাত। দেহের বাইরে কোন কোষসমষ্টির আয়ু তার জাতির উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক তন্তুতেই ফাইব্রোব্লাষ্ট আছে এবং টিস্থ কালচারের প্রথম ফল ফাইব্রোব্লাষ্টগুলোর সংখ্যাবৃদ্ধি। ভ্রূণজ হৃৎপেশী কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টার ফল এই দাঁড়ায় যে, পেশীর কোষগুলোর বৃদ্ধি না হ'য়ে ফাইব্রোব্লাষ্টগুলো বৃদ্ধি পায়। রক্তের মিশ্রিত শ্বেত কণিকাগুলোর কালচার করতে গেলে পরিশেষে বৃহৎ এককেন্দ্রী কণিকাগুলোকেই মাত্র বেঁচে থাকতে দেখা যায়।

বার বার সাব-কালচার ক'রে কতকগুলো কোষের বিশুদ্ধ বংশধর পাওয়া সহজ। যে কোন কোষের দেহের বাইরে বৃদ্ধির একটি বৈশিষ্ট্য হলো পৃথকীভবন অর্থাৎ কোষগুলো এরূপ পরিবর্তিত হ'য়ে পড়ে যে, পরীক্ষাগারের পোষা কোষ বলা চলে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপরই কোষের স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা নির্ভর করে।

অতি সহজভাবে না হ'লেও টিস্থ কালচারের ব্যবহার দু'ভাগে ভাগ করা যায় (১) শারীরতত্ব সম্বন্ধীয় (২) ব্যাধিবিজ্ঞান সম্বন্ধীয়।

কোষের জীবন-ক্রিয়া ও সংখ্যাবৃদ্ধি প্রণালী এই উপায়ে পরীক্ষিত হয়েছে :—কতকগুলো পদার্থ সাধারণ অবস্থায় কোষবৃদ্ধি ত্বরান্বিত ক'রে দেয়। বিভিন্ন উত্তাপে জীবনী শক্তি বৃদ্ধির উপর অম্ল ও ক্ষারের বা দ্রব-আকর্ষণী শক্তির প্রভাব, ঔষধের ক্রিয়া এবং অন্যান্য সহজ ও মূল প্রশ্নের সমাধান ইতিমধ্যেই হ'য়ে গেছে। কোষের ভিতর সূক্ষ্ম পরিবর্তন অন্ধকারভিত্ আলোকীকরণ প্রথায় অনুশীলন হয়েছে। ক্যান্টি একটি সিনেমা ফিল্ম প্রস্তুত করেছেন যাতে মাইটোকণ্ড্রিয়া ও তাদের গতি ছাড়াও কোষের মাইটোটিক সাইক্ল্ বা

সম্পূর্ণ বিভক্তিভবন-চক্রের সমস্ত অবস্থায় ভিতরের যেকোন ক্ষুদ্র বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়। এই সমস্ত শারীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনুশীলনী টিস্যু কালচার দ্বারা সম্ভব হয়েছে।

টিস্যু কালচার দ্বারা বিভিন্ন উপায়ে রোগ-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষার চেষ্টা হয়েছে। যেসব দেহরসে এমন জিনিষ আছে যেগুলো কোষের জীবন প্রভাবান্বিত করে সেগুলো সম্বন্ধেও কাজ হয়েছে। রক্তের সিরামে দেহ বৃদ্ধিকারী ও বৃদ্ধি নিবৃত্তিকারী বস্তু আছে যেগুলো উত্তাপ দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবান্বিত হয়। আরও অন্যান্য জিনিষ আছে যেগুলো জীবিত কোষের পক্ষে মারাত্মক, যেমন সাইটোটক্সিন। বৃদ্ধি নিবৃত্তিকারী বস্তু ও সাইটোটক্সিনের মধ্যে পার্থক্য তুলনামূলকভাবে বুঝান যেতে পারে। মাধ্যমস্থিত কোন একটী বস্তু এক জাতীয় অণু-জীবের বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল না হতে পারে কিন্তু ধ্বংসাত্মক নয়; পক্ষান্তরে একটি বীজাণুনাশক ইহাদের মৃত্যু ঘটায়। যে-জাতীয় কোষের উপর কার্যকরী হওয়া প্রয়োজন সেই জাতীয় কোষ যদি জীবদেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে সেই জীবের রক্তে সাইটোটক্সিন তৈরী হয়, অনেকটা যেমন বীজাণু প্রবেশ করালে ব্যাধি-প্রতিরোধক পদার্থ উৎপত্তির মত কোন কালচারে যদি সাইটোটক্সিন দেওয়া যায় তাহলে কোষের বৃদ্ধি ও গতি বন্ধ হয়ই, কোষগুলিকে সংকুচিত হয়ে মৃত্যুমুখী হতে দেখা যায়। এই অনিষ্টকর প্রভাব সাইটোটক্সিনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। সামান্য পরিমাণে থাকলে কালচারের বৃদ্ধি বন্ধ হওয়া লক্ষ্য করে টক্সিন ধরা সম্ভব। ল্যাম্বার্ট ও হয়েজ ইঁদুরকে 'মাউস সারকোমা ইন্‌জেকসন দিয়ে রোগপ্রতিরোধক করে দেখলেন যে, সেই ইঁদুরের সিরাম, টিউমার এবং স্বাভাবিক আচ্ছাদনী তন্তুরও বৃদ্ধি বন্ধ করে। সুতরাং এই প্রতীতি হচ্ছে যে, ইঁদুরের সমস্ত প্রকার কোষের সাইটোটক্সিন এক। কিন্তু এটাও জ্ঞাত আছে যে, ম্যালিগন্যান্ট ও স্বাভাবিক কোষের সাইটোটক্সিন বিভিন্ন।

টিস্যু কালচার প্রক্রিয়া জীবিত কোষের উপর এক্স-রে, নিউট্রন ও রেডিয়ামের প্রভাব পরীক্ষাই অধিক কার্যকরী হয়েছে। যথাযথ অবস্থায় কোষের জীবনধারা অনুশীলন দ্বারা জটিল সমস্যা সমূহকে সহজসাধ্য করা সম্ভব হয়েছে।

জীবাণুতত্ত্ব অনুশীলনীতেও টিস্যু কালচার ব্যবহৃত হচ্ছে। ছাকনির ভিতর দিয়ে যেতে পারে এরূপ জীবাণু সাধারণ মাধ্যমে বাঁচান বা বৃদ্ধি সম্ভব নয়; কিন্তু জীবন্ত কোষের সান্নিধ্যে এরা সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে। শুধু টাট্‌কা তন্তুর সান্নিধ্যই যথেষ্ট নয়, জীবিত তন্তুটিকে এমন একটি মাধ্যমে রাখতে হবে যেখানে সে বৃদ্ধি পেতে পারে। এই অবস্থায় জীবাণু দিলেই জীবাণুগুলো বাড়তে পারে। ভ্যাক্সিনিয়ার জীবাণুর এরূপ বৃদ্ধি দেখান সম্ভব হয়েছে। কোষের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার জন্য টিস্যু কালচারে বীজাণু যোগ করা হয়েছে। এরূপভাবে যক্ষ্মার ঘা-এর বৈশিষ্ট্য বৃহৎ কোষগুলোর বৃদ্ধিপ্রাপ্তি দেখে যক্ষ্মা-বীজাণু ধরা গিয়েছে। যে সমস্ত বীজাণু ক্ষিপ্রগতিতে বৃদ্ধি পায় সেগুলো ব্যবহার করা যায় না, যেহেতু এদের জীবন-ক্রিয়া কোষের ক্রিয়াকে ছাড়িয়ে যাওয়ার ফলে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই সহজ কথাটিই ব্যাধিবিজ্ঞানে টিস্যু কালচারের অপেক্ষাকৃত ব্যর্থতার কারণ হতে পারে। টিস্যু কালচারের এখনও যথেষ্ট উন্নতির অবকাশ রয়েছে।

কাষ্ঠ-গাত্রে ছত্রাক-সূত্রের অণুপ্রবেশ

শ্রীজিতেন্দ্রকুমার সেন ও শ্রীরাজেন্দ্রনাথ গায়েন

কাঠের দেহে ছত্রাকের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রাথমিক ক্রিয়াকলাপ খুব ধীর এবং সন্তর্পিত। প্রধানতঃ সংক্রমণের ফলেই এরা আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। ছত্রাকের সূক্ষ্ম বীজ বায়ু তাড়িত হয়ে অথবা অন্য কোন উপায়ে কাঠের উপর আশ্রয় নেয়, তারপর অনুকূল অবস্থা পেলেই কিছু সময়ের মধ্যে জীবনের বিকাশ সুরু করে। এদের অস্তিত্ব প্রথমটা টের পাওয়াই শক্ত। ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে এদের বৃদ্ধি। প্রথমে থাকে একটা সূত্রাকার দেহাংশ, পরে শাখা প্রশাখায় বাড়তে বাড়তে জালের মত পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। আমরা কাঠের গায়ে যে সব বিভিন্ন আকৃতির ডেপ্‌নো, মাইসা প্রভৃতি ছাতা দেখে থাকি সেগুলো ওসব সূত্রাকার পদার্থেরই পরিণতি। তারপরেই দেখা যায় কাষ্ঠ-ধ্বংসী ছত্রাকের বিরাট উপনিবেশ।

প্রথমে দেখা দরকার কাঠের গঠন প্রকৃতিটা কি রকমের। এক কথায় বলা চলে, কাঠের দেহ অসংখ্য মৃত কোষের সমষ্টিমাত্র। কাঠের সবটাই প্রায় সেলুলোজ, লিগ্নিন এবং কোষগাত্রের আরো কয়েকটি উপাদানে গড়া। কাঠের প্রধান উপাদান হল লিগ্নিন। আগে মনে করা হত লিগ্নিন বুঝি একটা বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ এবং একটা রাসায়নিক সূত্রের দ্বারা তার আণবিক গঠনও নিরূপিত হয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞানীদের বর্তমান ধারণা অন্যরকম। তাঁরা বলেন লিগ্নিন বলে কোনও একটা বিশেষ পদার্থ নেই, এটা হচ্ছে সগোত্রীয় কতকগুলি রসায়নের একত্র সমাবেশ, যাকে বলা চলে 'লিগ্নিন কমপ্লেক্স'। এই লিগ্নিন জাতীয় দারুপদার্থ কোষের সেলুলোজ আবরণের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে ধীরে ধীরে কোষগাত্রের দৃঢ়তা সম্পাদন করতে থাকে। বৃক্ষদেহের বহিঃস্তরের কোষগুলিতে এই দারুপদার্থের সমাবেশ হতে দেখা যায়। ঐ ব্যাপারটা ঘটে কোষজীবনের যৌবনাবস্থায়। ক্রমে বহিঃস্তরের সজীব উপাদানগুলি নষ্ট হয়ে গিয়ে স্থবিরত্ব এসে পড়ে। রস-সংবহন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। শেষে দারুময় কঠিনাবয়ব ধারণ করে' বৃক্ষদেহের অভ্যন্তরে এক নূতন স্তরের সৃষ্টি করে, যাকে বলা যেতে পারে আন্তঃস্তর।

কাঠের দেহে আন্তঃস্তরের চেয়ে বহিঃস্তরই হল ছত্রাক-আক্রমণের প্রশস্ত জায়গা। তবে কয়েকশ্রেণীর ছত্রাক উভয় স্তরকেই আক্রমণ করে, অথবা শুধু মাত্র আন্তঃস্তরেই আঘাত হানে।

কাঠের দেহাভ্যন্তরে ছত্রাক-সূত্রের অগ্রগতির স্বরূপ নির্ণয় করা বেশ একটু জটিল ব্যাপার। কাঠের মৃত কোষসমূহের প্রাচীরস্তর ভেদ করে আত্মপ্রতিষ্ঠা করা ছত্রাকের পক্ষে যে কেবলমাত্র বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগেই সম্ভব নয়, এবিষয়ে অনেকেই একমত হয়েছেন। বিশেষ পর্যবেক্ষণের দ্বারা ছত্রাকসূত্রের সূক্ষ্মাগ্রে কয়েক শ্রেণীর এনজাইম বা কিণ্বরসের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই কিণ্বরস ক্ষরণের প্রেরণা আসে কাঠের কঠিন কোষগাত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ফলে। নিছক দেহশক্তি যেখানে অচল এই জারকরস সেখানে অমোঘ অস্ত্র। এই জারকরসের ক্রিয়ায় কোষগাত্রের দারুপদার্থ বিনষ্ট হয়ে গিয়ে সেখানে ছিদ্রের সৃষ্টি হয়। ছত্রাক-সূত্রের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ তখন ঐ ছিদ্রপথে কোষপ্রাচীর ভেদ করে অগ্রসর হতে থাকে।

অধিকাংশ দারুভুক্ ছত্রাকেরই অন্ততঃপক্ষে দু'রকমের ছত্রাক-সূত্র থাকে। একরকম হচ্ছে সরু আর ছোট; এরা আগাগোড়া সমান ব্যাসবিশিষ্ট। আর একরকম হচ্ছে মোটা আর বড় আকারের। ক্ষয়ের প্রাথমিক অবস্থায় এই দ্বিতীয় শ্রেণীর ছত্রাক-সূত্র যখন কোষগাত্র ভেদ করতে থাকে তখন এদের যে অংশটা কোষপ্রাচীরের মধ্যে সংলগ্ন

সেটুকু হয়ে যায় ক্ষীণাকার, আর দুপাশের অংশ মোটাই থেকে যায় (চিত্র ১নং)। এই ক্ষীণত্বপ্রাপ্তির কারণ হচ্ছে ছত্রাকসূত্রের স্পর্শকাতরতা। কোষগাত্রের স্পর্শের প্রভাবেই এই রূপান্তর ঘটে।

কার্টরাইট (১৯৩০) অনেকক্ষেত্রে কোষগাত্রের সংস্পর্শে আসার আগেই ছত্রাকের সূত্রমুখকে সূক্ষ্মাকার হয়ে যেতে দেখেছেন এবং তিনি এই ব্যাপারটাকে কোষগাত্র ভেদের একটা যান্ত্রিক উপায় বলে মনে করেন। তাঁর মতে সূচের বেধনক্রিয়ার মত
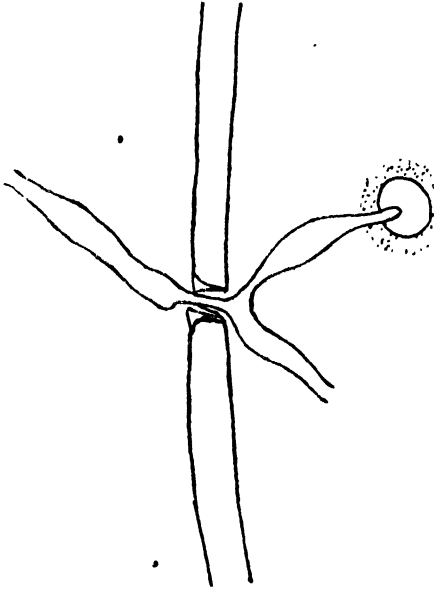
১নং চিত্র

ছত্রাক-সূত্রের এই সূক্ষ্ম সূচীমুখ কোষপ্রাচীর ভেদের ব্যাপারে স্পষ্টতঃই যান্ত্রিক সহায়তা করে থাকে।

কোষগাত্র ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করতে গিয়ে ছত্রাক-সূত্র যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে সেই অবস্থাকে বিশ্লেষণ করে প্রোকটর (১৯৪১) যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা কিণ্বরসের ক্রিয়া সম্পর্কিত মতবাদের অনুকূল। কোষগাত্র বিদারণের আণুবীক্ষণিক ফটোগ্রাফ নিয়ে তিনি দেখেছেন যে. প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ছত্রাক-সূত্র কোষগাত্রে যে ছিদ্রপথ সৃষ্টি করে তার ব্যাস ছত্রাক-সূত্রের ব্যাসের চেয়ে কিছু বড়। শুধু বড়ই নয়, ছিদ্রপথটা বরাবর সমান সুডৌল। বাইরের কোন চাপের ফলে যে খাঁজ, ভাঁজ, ফাঁটল ইত্যাদির সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক, তার কোন কিছুই দেখা যায় নি। এথেকে শুধু এ-সিদ্ধান্তেই আসা যায় যে, বাইরের কোন চাপের প্রভাবে কোষগাত্রে ছিদ্রপথের সৃষ্টি হয়নি। বরং কিণ্বরসের প্রভাবেই ছিদ্রপথের এরকম সুডৌল চেহারা গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। ছত্রাক-সূত্রের সূক্ষ্ম সূচীমুখের গঠনের মধ্যে বেশ একটা সমতা লক্ষ্য করা যায়। এই গঠন-সাম্যের দরুণ সূচীমুখের কিণ্ব-স্রাব কোষগাত্রের ছিদ্রপথে চারদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কিণ্ব-রসের সুষম ক্রিয়াশীলতায় ছিদ্রপথের চেহারাটা হয়ে পড়ে গোল এবং নলাকার। হাতুড়ির ঘায়ে একটা পেরেককে কাঠের মধ্যে প্রবেশ করাতে গেলে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে। প্রথমতঃ কাঠের গায়ে যে ছিদ্রপথের সৃষ্টি হবে পেরেকটা তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হয়ে থাকবে। ছিদ্রপথটা যদিও বা কিছু বড় হয়, সেই তুলনায় কোষগাত্রের নলাকার ছিদ্রপথের ব্যাস ছত্রাক-সূত্রের ব্যাসের চেয়ে অনেক বড় হতে দেখা গেছে (চিত্র ১নং) দ্বিতীয় কথা, পেরেকটাকে কাঠের মধ্যে প্রবেশ করাতে গেলে চাপের ফলে ছিদ্রপ্রাচীরের কোন কোন অংশ চিড়্ খেয়ে ফেঁটে গিয়ে এবং কোন কোন অংশ উদ্গত বা অবনমিত হয়ে গিয়ে ছিদ্রপথটাকে অমসৃণ করে তুলবে।

সজীব উদ্ভিদদেহে কয়েক শ্রেণীর পরভোজী ছত্রাক দেখা গেছে, যারা গাছের সেলুলোজে তৈরী নরম কোষগাত্রকে শুধুমাত্র দৈহিক বলপ্রয়োগ ভেদ করে খাদ্যবাহী নালিকাগুচ্ছের মধ্যে প্রবেশ করে থাকে, এবং সরাসরি সেখান থেকে খাদ্য শোষণকার্য চালায়। কোষগাত্র-বিদারণ কার্যে দৈহিক বলপ্রয়োগ পদ্ধতির সপক্ষে এটাই সবচেয়ে নিখুঁত দৃষ্টান্ত। কিম্বা এমনও বলা যায় যে, দৈহিক বলপ্রয়োগের মতবাদটাই জন্মলাভ করেছে এই দৃষ্টান্ত থেকে।

কিন্তু উপরোক্ত পরভোজী ছত্রাকের ক্রিয়াকলাপ নির্জীব কাষ্ঠদেহের দারুভুক্ ছত্রাকের কার্যপ্রণালীর

সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, কোষদেহে অন্তঃপ্রবেশের বলপ্রয়োগ নীতি শেষোক্ত শ্রেণীর ছত্রাকের পক্ষে ততটা সমর্থনযোগ্য নয়, আপাতঃ দৃষ্টিতে যতটা মনে হয়। সজীব বৃক্ষদেহের পরভোজী ছত্রাক যে কোষশ্রেণীর ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে চলে তাদের দেহপ্রাচীর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাতলা সেলুলোজ স্তর দিয়ে তৈরী। এই কোমল সেলুলোজ স্তর শুধু মাত্র বল প্রয়োগে ভেদ করে যাওয়া ছত্রাক-সূত্রের পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু দারুভুক্ ছত্রাককে যে কোষগাত্র ভেদ করতে হয়, তা সুপরিণত, দারু-পদার্থের সমাবেশে স্থূল এবং দৃঢ়। সেই দারুময় দৃঢ়তাকে ভেদ করে যাওয়া খুব সহজ কথা নয়; অন্ততঃ নিছক বল-প্রয়োগ সেখানে কার্যকরী নাও হতে পারে। হিউবার্ট (১৯২৪) এক্ষেত্রে এনজাইম বা কিণ্বতত্ত্বকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

কার্টরাইট যে বর্ণনা দিয়েছেন তা মোটামুটি এই:—ছত্রাক-সূত্রের অগ্রভাগ দীর্ঘাকৃতি কোষ-গাত্রের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে অথবা কিছু আগেই ছত্রাক-সূত্রের মুখাগ্রে রসপদার্থ গাঢ়তর হয়ে ওঠে। এর পরেই ছত্রাক-সূত্রের মুখাগ্র থেকে এক সূক্ষ্মতর সূত্রাকার অংশ উদ্গত হয়। এই সময়ে কোষপ্রাচীরে ইংরাজী V অক্ষরের মত একটা খাঁজের সৃষ্টি হয়; এবং এর ঠিক পরবর্তী অবস্থায় ছত্রাক-সূত্রকে কোষপ্রাচীর ভেদ করে অপর দিকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। কার্টরাইট মনে করেন, কোষগাত্রে V অক্ষরের মত খাঁজ সৃষ্টি হবার পরেই ছত্রাক-সূত্রের ক্রিয়াকলাপ অত্যন্ত দ্রুত হয়ে পড়ে; কেন না V-য়ের মত খাঁজ সৃষ্টি এবং কোষগাত্রের অপর পৃষ্ঠে ছত্রাক-সূত্রের বহির্গম অনুবীক্ষণের কঠোর তল্লাসী সত্ত্বেও এ দুয়ের মধ্যবর্তী কোন অবস্থার সন্ধান পাওয়া যায় নি। কোষগাত্রের অপর পৃষ্ঠে পৌঁছাবার পরেই ছত্রাক-সূত্র আবার তার স্বাভাবিক স্থূলত্ব ফিরে পায়। কোষগাত্রের নলাকার ছিদ্রপথটা এ অবস্থায় সূক্ষ্মই থাকে, কিন্তু পরে ধীরে ধীরে তার ব্যাসের আকার বেরে গিয়ে মোটা হয়ে পড়ে।

এনজাইম মতবাদকে তিনি কিন্তু একেবারে ঠেলে ফেলতে পারেন নি। ছিদ্রপথের ভিতরটা কিরূপে আগাগোড়া সুডৌল মসৃণাকার পায়, এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি দু'টি সম্ভাবনার কথা আলোচনা করেছেন। প্রথম, ছত্রাক-সূত্রের ক্ষিপ্রকারিতা; দ্বিতীয়, কিণ্বরসের ক্রিয়া। এদের মধ্যে প্রথমটিকে নিছক অনুমান বলেই মনে হয়, বিশেষ যখন কার্টরাইট নিজেই বলেছেন যে, এই ক্ষিপ্র-কারিতার স্বরূপ অনুবীক্ষণের ব্যাপক অনুসন্ধানেও
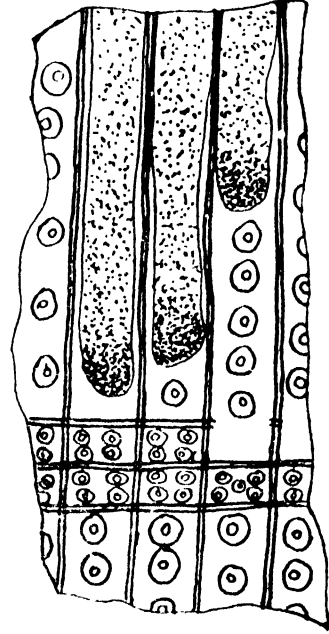
২নং চিত্র

ধরা পড়ে নি। অন্ততঃ এই 'ক্ষিপ্রকারিতা' কথাটার মধ্যে ব্যাপারটাকে অনুধাবন করার চেয়ে এ সম্বন্ধে অজ্ঞতাই বেশী প্রকট হয়ে পড়েছে। আর এ কথাও ভেবে দেখা দরকার যে, ছত্রাক-সূত্রের গঠন উপাদানের মধ্যে কঠিনাবয়ব এমন কিছুই নেই যা কোষগাত্রের দারুময় প্রতিরোধকে শুধু মাত্র ক্ষিপ্র বলপ্রয়োগের সাহায্যেই ভেদ করে যেতে পারে। দ্বিতীয় কারণটিকে কিন্তু বেশী যুক্তিসহ বলেই মনে হয়—এর মধ্যে ব্যাখ্যার একটা প্রয়াস আছে। কিণ্বরস-প্রভাবে কিরূপে একটা সুডৌল

ছিদ্রপথ সৃষ্টি হতে পারে প্রোকটরের অভিমত সম্পর্কে সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এসম্বন্ধে কার্টরাইট যে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেচেন তা এই যে, ছত্রাক সূত্রের অন্তঃপ্রবেশের ব্যাপারটা আংশিক কিণ্বরসের-ক্রিয়াপ্রসূত এবং আংশিক বলপ্রয়োগের ফল। অর্থাৎ কিণ্ব-রসের প্রভাবে কোষপ্রাচীরের দারুপদার্থ যখন পরিবর্তিত ও দ্রবীভূত হয়ে যায়, ছত্রাক-সূত্র তখন সহজেই সেপথে এগিয়ে চলে।

স্তরের উপর উভয় দিক থেকে নূতন নূতন স্তরের সঞ্চার হতে থাকে। শেষে এই নূতন স্তর সংস্থানের ফলে কোষগাত্র বেশ পুরু এবং সম্পূর্ণাবয়ব হয়ে ওঠে। এই নূতন স্তরগুলি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এরা লম্বালম্বিভাবে বিন্যস্ত অতি সূক্ষ্ম সেলুলোজ-সূত্রকের সমাবেশ। লিগ্নিন ও হেমি-সেলুলোজধর্মী কয়েকটি পদার্থের দ্বারা এই সেলুলোজ-সূত্রকগুলি এবং অনুরূপ ভাবে ঐ নূতন স্তরগুলি পরস্পরের সঙ্গে সুগ্রথিত।

৩২ চিত্র

কাষ্ঠখণ্ডের অভ্যন্তরে ছত্রাক-সূত্র প্রবেশ করে কিরূপে অনিষ্ট সাধন করেছে উপরের কাষ্ঠখণ্ডের ক্রস্‌-সেক্‌সনের ছবি থেকে তা' পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে

ছত্রাক-সূত্রের অন্তঃপ্রবেশ সম্বন্ধে বিশদভাবে জানতে হলে দারুময় কোষগাত্রের গঠন-প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা দরকার। রিটার (১৯৩৪) রেইলি ও তাঁর সহকর্মীদের (১৯৩৭) গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, দুই সন্নিহিত কোষের মাঝখানে প্রথম থেকেই সেলুলোজের একটা পাতলা স্তর গড়ে ওঠে, যাকে পরে বলা হয় মধ্য-স্তর। পরে কোষ যতই পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে ততই এই মধ্য-

কোষগাত্রের এরূপ গাঁথনির মধ্য দিয়ে শুধু মাত্র দৈহিক বলপ্রয়োগে ছিদ্রপথ সৃষ্টি করে অগ্রসর হওয়া আদৌ সম্ভব হলেও, সে পথ যে মোটেই সরল এবং সুডৌল হবে না তা সহজেই অনুমেয়। চাপের ফলে কোষগাত্রের স্তরগুলির মধ্যে একটা বিপর্যয় সহজেই কল্পনা করা যায়। এই বিপর্যয়ের মুখে অতি-পেলব ছত্রাক-সূত্রের গতিপথটা নানা ঘাতপ্রতিঘাতের প্রতিক্রিয়ায় একটা বক্রকুটিল রেখার

আকারে পর্যবসিত হবে। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই যখন ছিদ্রপথের বক্রতা লক্ষ্য করা যায় নি, তখন কোষগাত্র বিদারণ-ব্যাপারে বলপ্রয়োগ নীতির সমর্থন পাওয়া শক্ত। বর্তমান লেখকরাও অনেক ক্ষেত্রে এরূপ সুডৌল মসৃণ ছিদ্রপথই লক্ষ্য করেছেন।

আক্রমণের প্রথম অবস্থায় ছত্রাক-সূত্র সাধারণতঃ কোষগাত্রকে ভেদ করে আড়াআড়িভাবে অগ্রসর হয়। অনেক সময় কোষগাত্রে অবস্থিত স্বাভাবিক ছিদ্রগুলির মধ্য দিয়েও এদের যাতায়াত করতে দেখা যায়। কখনও আবার কোষগাত্রের উপর লম্বালম্বিভাবে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে এরা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ছিদ্রপথ সৃষ্টি করে নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে কাঠের অভ্যন্তরে ছত্রাকের প্রতিষ্ঠা যখন বেশ পোক্ত হয় এবং কাঠ যখন ক্ষয়ের পথে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যায়, তখন ছত্রাক-সূত্রগুলি আকারে ক্রমশঃ বেশ বাড়তে থাকে। শেষে অসংখ্য ছিদ্র সৃষ্টির ফলে কোষগাত্র ঝাঁঝরা হয়ে গিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সময় সুপুষ্ট ছত্রাক-সূত্রগুলি কোষগাত্রকে যথেচ্ছ আক্রমণ করে খাদ্য শোষণ করতে থাকে। ভগ্নপ্রায় কোষের শূন্য অভ্যন্তরভাগ বৃহদাকার ছত্রাক-সূত্রের সমাবেশে একেবারে পূর্ণ হয়ে যায়। কয়েকটি ছত্রাকের কার্যকলাপ পরীক্ষা করে আমরা দেখেছি যে, কাঠ যখন ক্ষয়ের শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছায় তখন ছত্রাক-সূত্রগুলি এতই বৃহদাকার ধারণ করে যে, আকারে তারা পূর্ণাবয়ব দীর্ঘাকৃতি কোষগুলির প্রায় সমায়তন হয়ে পড়ে এবং তারা যখন কোষগাত্র বরাবর লম্বালম্বিভাবে অগ্রসর হয়ে সর্বগ্রাসী শোষণকার্য চালায়, অনুবীক্ষণের ভিতরে দিয়ে হলেও তাকে দানবীয় ব্যাপার না বলে পারা যায় না (চিত্র ২)।

এ প্রবন্ধে অন্তঃপ্রবেশের রাসায়নিক ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস থাকায় বলপ্রয়োগের মতবাদকে কিছুটা খাটো করা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে একথা বলা চলে না যে, শেষোক্ত মতবাদটা ভ্রমাত্মক একটা কিছু। কার্টরাইট যে সব যুক্তির অবতারণা করে বলপ্রয়োগ নীতিকে প্রাধান্য দিতে চেয়েছেন তা মোটেই দুর্বল নয়। রাসায়নিক মতবাদের সপক্ষে যথেষ্ট অকাট্য প্রমাণ থাকলেও বলপ্রয়োগের পদ্ধতিকে অস্বীকার করার মত সুতীক্ষ্ণ প্রমাণের অভাব খুব স্পষ্ট। এবিষয়ে গবেষণার পথ উন্মুক্ত রয়েছে।

অন্তঃপ্রবেশ সম্বন্ধে খুব সাধারণভাবে এখানে আলোচনা করা হল। বিভিন্ন ছত্রাকের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য তাদের অন্তঃপ্রবেশ-ক্রিয়ায় যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেই সব খুঁটিনাটির মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা এখানে করা হয়নি। এ প্রবন্ধ রচনায় যে সব ঈক্ষণ-বীক্ষণের প্রভাব এসে পড়েছে তাঁদের মধ্যে হিউবার্ট, বয়েস, প্রোকটর, কার্টরাইট, রিটার বেইলি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

"বিদেশী ভাষার সাহায্যে পাঠ্যবস্তুর মধ্যে প্রবেশ, অনধিকার প্রবেশ, তাহাতে প্রবেশ ঘটে কিন্তু অধিকার ঘটে না।"

কেলাস বিদ্যায় আচার্য রমনের আধুনিক গবেষণা

শ্রীপিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের ও জগতের বৈজ্ঞানিক মহলে আচার্য রমনের নাম এবং আলোক-বিদ্যায় তাঁর গবেষণা প্রায় সর্বজন-পরিচিত। তাই আচার্যের আধুনিক গবেষণা সম্পর্কে কৌতূহল জাগা অস্বাভাবিক নয় এবং সেই কৌতূহল মেটানই বক্ষ্যমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সত্য অক্ষুন্ন রেখে রমনের সাম্প্রতিক গবেষণার দুজ্ঞেয় বার্তা অবৈজ্ঞানিক সাধারণ মানুষের সহজ বোধের উপযুক্ত করে পরিবেশন করা দুষ্কর। তবে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, আচার্য রমন ও তাঁর সহকর্মী গবেষক গোষ্ঠী. সম্প্রতি কেলাসি-কঠিনে (ক্রিস্টালাইন সলিড) পরমাণু সজ্জার রহস্য উন্মোচনের উদ্দেশ্যে গবেষণা করছেন। তাদের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে হীরার কেলাসে (ক্রিস্টাল) কার্বন পরমাণুদের সাজান গোছানর,ওপর যথেষ্ট আলোকপাত হয়েছে। আচার্য রমনের আধুনিক গবেষণাকে যখন ব্যবহারিক শিল্পে কাজে লাগান সম্ভব হবে তখন বিশেষভাবে কেলাসিত কঠিনের সাহায্যে কেবল মাত্র অদৃশ্য বেগুনী পারের আলো দিয়েই ঝলমলে দীপালী বাতি জ্বালান চলবে। দীপালি বাতি তৈরী করবার জন্য এখনকার মত সে সময় দীপালি বাতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে ও পারদ-বাষ্প বা নিয়নের মত বিরল বায়ু ভরতে হবে না।

হীরা হ'ল মাণিক শ্রেষ্ঠ এবং জগতের কঠিনতম পদার্থ। হীরার কেলাসের রূপ-বৈচিত্র্য গঠন-রহস্য পদার্থবিদের চিরকালের কৌতূহলের বস্তু। হীরার কেলাসে কার্বন পরমাণুদের পরিসজ্জা অবস্থান-সমাবেশের রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা কঠিন পদার্থের গঠন সম্পর্কে নিত্য নতুন তথ্য জানতে পারছেন। হীরার গঠন সম্পর্কিত গবেষণায় আচার্য রমনের পরিচালনায় বা তাঁর উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে গবেষণা করে কৃষ্ণান প্রমুখ বহু সহকর্মী গবেষক রমনকে তাঁর আধুনিক গবেষনায় যথেষ্ট সাহায্য করছেন এবং রমনের সহকর্মীদের মধ্যে দু'জন ভারতীয় মহিলা বিজ্ঞানীও আছেন। আচার্য রমন ও অন্যান্য কেলাসবিদ্‌দের গবেষণার ফলে প্রমাণ হয়েছে যে, কার্বন পরমাণুদের অবস্থান-সমাবেশের বৈশিষ্ট্য অনুসারে হীরার কেলাস গঠনের চারটি বিভিন্ন জ্যামিতিক রূপের উদ্ভব হতে পারে। হীরার কেলাসে কার্বন পরমাণুদের অবস্থান-সমাবেশে চারতলকি প্রতিসাম্য থাকলে কেলাসের গঠনের দুটি বিভিন্ন জ্যামিতিক রূপের উদ্ভব হয় এবং তার বাকী দুটি জ্যামিতিক রূপ আসে অঙ্গার পরমাণুদের অবস্থান সমাবেশের আটতলকি প্রতিসাম্য থেকে। হীরার কেলাসের চারটি বিভিন্ন রূপের গঠনের অস্তিত্ব জটিল যুক্তি ও দুরুহ অঙ্কের সাহায্যে কেবল মাত্র 'কাগজে-কলমেই' আচার্য রমন প্রমাণ করেন নি, 'হাতে-কলমে' পরীক্ষার সাহায্যেও তাকে যাচাই করে নিয়েছেন। চারটি বিভিন্ন রূপের গঠনের মধ্যে পার্থক্য খুব কম, সাদৃশ্য খুব বেশী। কাজেই যে কোনও বিশেষ একটি হীরার কেলাসে দুটি বা চারটি বিভিন্ন রূপের গঠনের ঐকত্রিক সমাবেশ ঘটা মোটেই আশ্চর্য নয়। চারতলকি প্রতিসাম্য সমন্বিত গঠনের দুটি বিভিন্ন রূপের ঐকত্রিক সমাবেশ যদি কোনও হীরার কেলাসে ঘটে তাহলে কেলাসটির পদার্থ-ধর্ম সব দিকেই সমান হয়, অর্থাৎ কেলাসটি হয় দিকে সমধর্মী, আইসোট্রোপিক, কিন্তু হীরার কোন কেলাসে

যদি আটতলকি প্রতিসাম্য সমন্বিত গঠনের দুটি বিভিন্ন রূপের ঐকত্রিক সমাবেশ ঘটে তাহলে কেলাসটির পদার্থ-ধর্ম সব দিকে সমানভাবে প্রকট হবে না, অর্থাৎ কেলাসটি হয়ে যাবে 'দিকে অসমধর্মী' অ্যানাইসোট্রোপিক। চারতলকি প্রতিসাম্য সমন্বিত গঠনের যে কোন একটি রূপের সঙ্গে আট-তলকি প্রতিসাম্য সমন্বিত গঠনের রূপের ঐকত্রিক মিলন হীরার কেলাসে ঘটলেও কেলাসটি 'দিকে অসমধর্মী' হয়ে যায়। বিভিন্ন হীরার টুকরার মধ্য দিয়ে দৃশ্য আলোকের দ্বি-প্রতিসরণতা, অদৃশ্য বেগুনী পারের আলো দিয়ে উদ্ভাসনের ফলে বিভিন্ন হীরার টুকরায় দৃশ্য আলোকের বিভিন্ন বর্ণের প্রতিপ্রভা ও অনুপ্রভা, বিভিন্ন হীরার টুকরা থেকে এক্স-রশ্মির প্রতিফলনতা, বেগুনী পারের আলোকে বিভিন্ন হীরার টুকরার স্বচ্ছতা, তাদের বেগুনী-পারের আলোক সঞ্চারী ক্ষমতা, বিভিন্ন হীরার টুকরা থেকে বিকিরিত বেগুণী পারের আলোর বর্ণালী ও হীরার অন্যান্য পদার্থ-ধর্মের মর্মোদ্ধারের ফলে আচার্য রমনের সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়েছে।

অতি-বেগুণী অর্থাৎ বেগুণী পারের আলোকে হীরার সন্দীপ্তির বিভিন্ন বৈচিত্র্য সম্পর্কে ব্যাপকভাবে গবেষণা করেছেন আচার্য রমনের সহকর্মী গবেষক শ্রীযুক্তা আন্না মানি। শ্রীযুক্তা মানির পরীক্ষামূলক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, বিভিন্নরূপে গঠিত হীরার কেলাসদের যদি বেগুণী-পারের আলো দিয়ে উদ্ভাসিত করা যায় তাহলে কতকগুলি কেলাস সন্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং কতকগুলি কেলাস একেবারেই সন্দীপ্ত হয় না। কেলাস ভেদে সন্দীপ্তির তীব্রতার তারতম্যও ঘটে। হীরার যে সব কেলাস অতি-বেগুণী আলোকে সন্দীপ্ত হয়ে ওঠে তাদের সন্দীপ্তির ফলে বিকিরিত আলোকের বর্ণালীকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

যতক্ষণ পর্যন্ত অদৃশ্য বেগুণী পারের আলোক ফেলা যায় ততক্ষণ কেলাসগুলি উজ্জ্বল নীল রঙের আলো বিকীরণ করতে থাকে। এভাবে এক তরঙ্গ মাত্রার উদ্ভাসী আলোক শোষণ করে অন্য তরঙ্গ মাত্রার আলোক বিকিরণ করাকে 'ফ্লুরেসেন্স' বলে। উদ্ভাসী বেগুণী পারের আলো যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত হীরার সন্দীপনশীল কেলাসগুলির নীল রঙের প্রতিপ্রভা থাকে। উদ্ভাসী বেগুণী পারের আলো বন্ধ করে দিলে বা সরিয়ে নিলে প্রতিপ্রভ কেলাসগুলির কতকগুলি নীল রঙের এবং বাকীগুলি সবুজাভ হলুদ রঙের আলো বিকীরণ করতে থাকে। উদ্ভাসী আলোকের অনুপস্থিতিতে আলোক বিকীরণ করাকে বলা হয় অনুপ্রভা। হীরার কেলাসদের অনুপ্রভার ফলে বিকিরিত নীল আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে শ্রীযুক্তা মানি বেগুনী রঙের এলাকায় ৪১৫২ তরঙ্গ মাত্রার একটি উজ্জ্বল রেখা ও সেই রেখাটির সংশ্লিষ্ট আরো কতকগুলি রেখা এবং পটি আবিষ্কার করেছেন। কেলাসদের সবুজাভ হলদে রঙের প্রতিপ্রভার আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে তিনি হলুদ রঙের কাছঘেঁষা সবুজ রঙের এলাকায় ৫০৩২ তরঙ্গ মাত্রার একটি উজ্জ্বল রেখা ও তার কাছাকাছি তরঙ্গ মাত্রার কয়েকটি রেখা ও পটি আবিষ্কার করেছেন।

শ্রীযুক্তা মানির আবিষ্কারের মর্মোদ্ধার করে জানা গেছে, কেলাস গঠনের চারতলকি প্রতিসাম্য সমন্বিত দুটি রূপের ঐকত্রিক সমাবেশ হীরার যে সমস্ত কেলাসে ঘটে, সেই সমস্ত কেলাসদের অনুপ্রভার আলো হয় নীল রঙের এবং কেলাস গঠনের আট-তলকি প্রতিসাম্য সমন্বিত রূপের সঙ্গে চার-তলকি প্রতিসাম্য সমন্বিত রূপের মিলন যে সব কেলাসে ঘটে তাদের অনুপ্রভা হয় সবুজাভ হলদে। অপর পক্ষে কেলাস গঠনের আটতলকি প্রতিসাম্য সমন্বিত দুটি রূপের ঐকত্রিক সমাবেশ হীরার যে সমস্ত কেলাসে ঘটে সেগুলি বেগুণী পারের আলোয় মোটেই সন্দীপ্ত হয় না।

বেগুণী পারের আলো দিয়ে উদ্দীপ্ত করার পর হীরার অনুপ্রভ পাতকে একটি ফটোগ্রাফিক প্লেটের ওপর কিছুক্ষণ রাখলে ও তারপরে প্লেটটিকে ডেভেলপ

করলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হীরার পাতের বিভিন্ন দিকে অনুপ্রভার উজ্জলতার তারতম্যের জন্য হীরার পাতটির মধ্যে আলপনার মত বিচিত্র জ্যামিতিক নক্সা ফুটে উঠেছে। শ্রীযুক্তা মানির আবিষ্কারের ব্যাখ্যা দিয়ে ফটোগ্রাফিক প্লেটে জ্যামিতিক নক্সা ফুটে ওঠার ব্যাখা করা চলে। শ্রীযুক্তা সুনন্দা বাই বর্ণালী বিশ্লেষণের সাহায্যে বেগুনী পারের আলোয় বিভিন্ন হীরার টুকরার স্বচ্ছতা পরীক্ষা করে শ্রীযুক্তা মানির সিদ্ধান্তেই উপস্থিত হয়েছেন।

হীরার কেলাসের অনুপ্রভা সম্পর্কে শ্রীযুক্ত ভি চন্দ্রশেখরন একটি অভিনব আবিষ্কার করেছেন। চন্দ্রশেখরনের আবিষ্কারের ফলে জানা গেছে যে, বেগুনী-পারের আলোতে হীরার যে সব কেলাস অনুপ্রভ হয়ে ওঠে, তাদের যদি লাল রঙ্গের আলো দিয়ে উদ্ভাসিত করা যায় তাহলে হীরার কেলাসদের মধ্যে সঞ্চিত অতিরিক্ত শক্তি দৃশ্য-আলোক রূপে বেরিয়ে আসে এবং স্বাভাবিক অনুপ্রভার চেয়ে এক্ষেত্রে আলোর বিকিরণটা অনেক তাড়াতাড়ি ঘটে। শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখরনের পরীক্ষায় আরো দেখা গেছে যে, যখন হীরার সন্দীপনশীল কেলাসগুলিকে ছোট তরঙ্গের বেগুনী পারের আলোয় ধরে প্রথমে সক্রিয় করে তোলা হয় প্রতিপ্রভার ফলে বিকিরিত আলো তখন অত্যন্ত ক্ষীণ হয়। কিন্তু ছোট তরঙ্গের বেগুনী পারের আলো দিয়ে সক্রিয় করে তোলার পর কেলাসগুলির ওপর যদি লাল আলো ফেলা যায় তাহলে কেলাসগুলি তীব্র ঝলকে নীল রঙের আলো বিকীরণ করে। কেলাসগুলির মধ্যে সঞ্চিত অতিরিক্ত শক্তি হঠাৎ ছাড়া পায় বলেই নীল আলোর ঝলকানি ওঠে। সক্রিয় কেলাসগুলির উপরে লাল আলো না ফেলে তাদের কেবল মাত্র বেশী মাত্রার উষ্ণতায় যদি গরম করা হয় তাহলেও তাদের মধ্যে সঞ্চিত অতিরিক্ত শক্তিকে মুক্ত করা যেতে পারে। ছাড়া পাওয়া সঞ্চিত শক্তি তখন উজ্জল নীল আলো রূপে দেখা দেয় এবং সেক্ষেত্রে সক্রিয় কেলাস গুলি তাদের স্বাভাবিক উষ্ণতার অনুপ্রভার সবুজাভ হলদে রংঙের আলো বিকিরণ করে না।

ডাঃ আর এস কৃষ্ণান বিভিন্নরূপে গঠিত হীরার কেলাস থেকে নানা পদ্ধতিতে একস্-রশ্মি প্রতিফলিত করেছেন এবং হীরার কেলাস থেকে প্রতিফলিত একস-রশ্মির তীব্রতার তারতম্য বিশ্লেষণ করে যে ফল পেয়েছেন তাতেও পূর্বোক্ত গবেষকদের সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন হীরার কেলাস গঠনের আটতলটি প্রতিসাম্য সমন্বিত দুটি রূপের ঐকত্রিক সমাবেশ ঘটলে কেলাসের মধ্যে টানের সৃষ্টি হয় এবং কেলাসটি থেকে প্রতিফলিত একস রশ্মির তীব্রতা সবচেয়ে বেশী হয়। হীরার কেলাস গঠনের চারতলকি প্রতিসাম্য সমন্বিত দুটি রূপের ঐকত্রিক সমাবেশ ঘটলে প্রতিফলিত একস্-রশ্মির তীব্রতা সবচেয়ে কম হয় এবং চার তলকি প্রতিসাম্য সমন্বিত রূপের সঙ্গে আটতলকি প্রতিসাম্য সমন্বিত রূপের সমাবেশ ঘটলে প্রতিফলিত একস্-রশ্মির তীব্রতা মাঝামাঝি ধরণের হয়। কেলাস-গঠনের বিভিন্নরূপের 'দিক সজ্জায়' পরমাণুদের অবস্থান সমাবেশ কোনও পার্থক্য থাকলে সেই পার্থক্যও প্রতিফলিত একস্-রশ্মির সাহায্যে জানতে পারা যায় এবং ডাঃ আর এস্ কৃষ্ণান্ হীরার আটতলকি প্রতিসাম্য সমন্বিত কেলাস গঠনের দুটি বিভিন্ন রূপের 'দিক-সজ্জায়' পরমাণুদের অবস্থান সমাবেশের পার্থক্য প্রতিফলিত এক্স-রশ্মির সাহায্যে ধরতে পেরেছেন। তিনি প্রমাণ করছেন যে, হীরার কোন একটি কেলাসের মধ্যে পাশাপাশি স্তরে দুটি বিভিন্ন রূপের গঠনের সমাবেশ যদি ঘটে তাহলে ব্রাগের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে কেলাসটি থেকে প্রতিফলিত এক্স-রশ্মির আলোক চিত্রে উর্মিলতা ফুটে ওঠে, বা দেখতে পাওয়া যায়। ডাঃ কৃষ্ণান হীরার কেলাস গঠনের বিভিন্ন রূপের দিক-সজ্জার তারতম্যের জন্য তাদের কার্বন পরমাণুদের বর্ণ-লৈপিক কাঁপন মাত্রায় যে পার্থক্য দেখা দেওয়া উচিত সেই পার্থক্যের অস্তিত্বের

প্রমাণও পরীক্ষার সাহায্যে পেয়েছেন। ডাঃ আর এস্ কৃষ্ণান কেম্ব্রিজে পরমাণু ভাঙ্গার গবেষণার সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি হীরার বিভিন্ন রূপে গঠিত কেলাসদের আলোক বিক্ষেপণ নিয়ে ব্যাপক ভাবে গবেষণা করেছেন। জলে ঠাণ্ডা করা স্ফটিক-পারার ঝলক-বাতি থেকে বিকিরিত বেগুনী পারের আলো হীরার পাতকে উদ্ভাসিত করার পর তিনি সুক্ষ্মবিশ্লেষি বর্ণালী-লিখ যন্ত্র দিয়ে হীরার পাত থেকে বিক্ষিপ্ত আলোর আলোক-চিত্র গ্রহণ করেছেন এবং হীরার রমন-বর্ণালী নির্ণয় করেছেন। ডাঃ কৃষ্ণানের পরীক্ষায় হীরার রমন-বর্ণালীতে সুনির্দিষ্ট কাঁপন মাত্রার সুস্পষ্ট দশটি রেখা ফুটে ওঠে এবং তাদের কাঁপন মাত্রার পরিমাপগুলি আচার্য রমন প্রবর্তিত কেলাস-গতি-বিদ্যার তত্ত্বীয় গণনার সঙ্গে মিলে যায়। এর ফলে আচার্য রমনের প্রকল্প সমর্থিত হয়েছে।

পদার্থ-প্রকৃতি বিদ্যার প্রচলিত সনাতন মতানুসারে যে কোনও কঠিনের কেলাসে পরমাণুদের স্পন্দনের কাঁপন মাত্রাগুলি সপ্তবর্ণী আলোর একটানা বর্ণালী বিকিরণ করে এবং কেলাসি-কঠিনের বর্ণালীতে কোনও বিশেষ তরঙ্গমাত্রার বা রঙের আলোর প্রতি পক্ষপাত থাকে না। কিন্তু আচার্য রমনের সিদ্ধান্ত বলে কঠিনের কেলাসে পরমাণুদের স্পন্দন-বর্ণালী সনাতনী একটানা বর্ণালীর মত অত জটিল নয় এবং অপেক্ষাকৃত অল্প কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কাঁপন মাত্রার স্পষ্ট রেখার মধ্যেই সে সীমাবদ্ধ। আচার্য রমনের এবং শ্রীযুক্তা মানি, ডাঃ কৃষ্ণান প্রমুখ তাঁর সহকর্মী গবেষকদের পরীক্ষায় আচার্য রমনের সিদ্ধান্ত বারংবার সমর্থিত হয়েছে। আচার্য রমন ও তাঁর সহকর্মী গবেষক গোষ্ঠির গবেষণা কার্যের এখনও শেষ হয় নি।
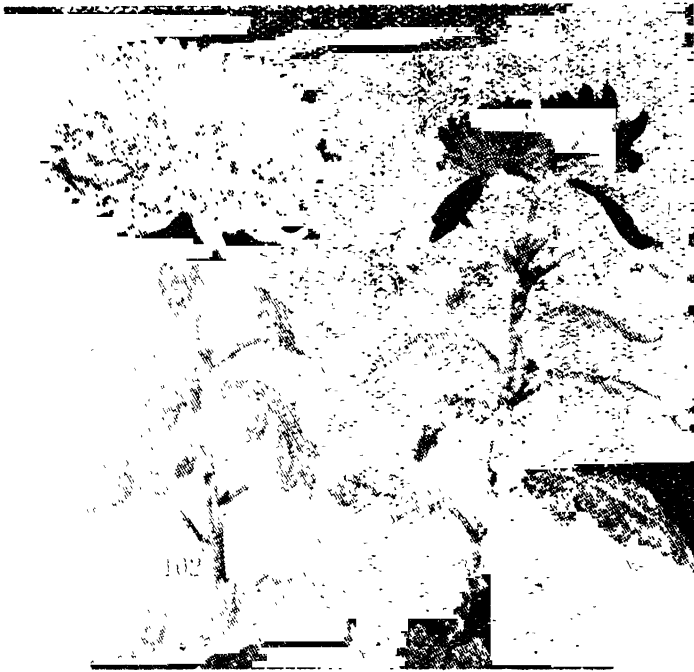
উদ্ভিদের অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ ধ্বংসের জন্য নতুন ঔষধ সোডিয়াম সেলিনেট পরীক্ষার ফল। বাঁ দিকের গাছটিতে সোডিয়াম সেলিনেট প্রয়োগ করা হয়েছিল ডানদিকের গাছটিতে কিছুই দেওয়া হয় নাই।

প্লেগ

শ্রীঅনিলেন্দ্রবিজয় রায় চৌধুরী

ঐতিহাসিক তথ্য:—আজ ৫২ বৎসর পর কলিকাতায় প্লেগ দেখা দিয়েছে। ১৮৯৬ সালে কলিকাতায় ও বোম্বেতে প্লেগ দেখা দিয়েছিল। সেবার কলিকাতায় প্রকোপ খুবই সামান্য হয়েছিল, কিন্তু বোম্বেতে মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিল। সেবার রোগের উৎপত্তি হয়েছিল চীনদেশ হতে। সেখান থেকে হংকং ও ক্যান্টন এবং বাণিজ্য জাহাজের রাস্তা ধরে সারা পৃথিবীময় (ভারতবর্ষে ১৮৯৬, আমেরিকায় ১৯০৪, অষ্ট্রেলিয়ায় ১৯০৪, ইউরোপে ১৯০৮ এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯০৮ সালে) ছড়িয়ে পড়েছিল।

কলম্বো, শ্যামদেশ, ইরাক, ফরাসী ইন্দো-চীন এবং চীন প্রভৃতি দেশে এ রোগ মাঝে মাঝে দেখা দেয়।

বাইবেলেও এই রোগের উল্লেখ আছে। খৃঃ পূঃ ১৩৩৬ সালে 'ব্ল্যাকডেথ' বা কালো-মৃত্যু বলে এই মহামারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। লণ্ডনে ১৬০৩, ১৬২৫, ১৬৬৫ সালে এই রোগ মহামারীরূপে দেখা দিয়েছিল। ভারতের বাদশাহ জাহাঙ্গীরের ডায়রীতে খৃঃ অঃ ১৬১৮ সালে (হিজরী ১০২৮ মহরম মাসে) প্লেগের সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়। ইঁদুরের সঙ্গে অসুখের যোগাযোগ এবং রোগের লক্ষণ সমস্তই উত্তমরূপে বর্ণিত হয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নূতন সহর ফতেপুরসিক্রি যে প্রায় রোগ-শূন্য ছিল, যদিও আশে পাশে রোগের যথেষ্ট প্রকোপ ছিল, একথাও তাহাতে বর্ণিত আছে। বাদশাহকে কিছুদিন এই রোগের ভয়ে তাঁর উদ্যানে বাস করতে হয়েছিল। ১৮৯৬ সালে আরব্ধ প্লেগে ১৮৯৮ হতে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে ১২,২০৯,০৩৬ লোক মারা যায়। তন্মধ্যে বোম্বেতে হাজারকরা ১২৩৮জন এবং বাংলাদেশে মোটে ১·৫ জন লোকের মৃত্যু হয়েছিল। মহামারীর প্রথম অবস্থায় রোগে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে সমস্ত আই, এম, এস ডাক্তার-দের মিলিটারীতে ডেকে নেওয়া হয়েছিল।

হাফ্‌কিন নামক এক সাহেব কলেরার টীকার উপকারিতা মানুষের উপর পরীক্ষা করবার জন্য ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ১৮৯৮ সালে ৮ই অক্টোবর প্লেগ সম্বন্ধে গবেষণা ও বিশেষ করে প্লেগ নিরোধ টীকা প্রস্তুত করার জন্য তাঁকে নিয়োজিত করা হয়। মানুষের শরীরে টীকা কোন ক্ষতি করে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি নিজের শরীরে প্রথম টীকা দিয়েছিলেন। গবেষণা সুরু হওয়ার তিনমাস পরেই (১৮৯৭,১৬ই জানুয়ারী) তিনি তাঁর পরীক্ষার ফলাফল ও টীকা তৈরীর কথা ঘোষণা করেন। তিনি প্রথমে বোম্বের Grant Medical College এর Petil Laboratoryতে ১৮৯৬ সালে অক্টোবর মাসে, পরে মালাবার হিলের দি ক্লিফ্‌এ ১৮৯৭, এপ্রিল মাসে, আগাখাঁর বাড়ীর খসরু লজএ ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এবং সর্বশেষে প্যারেলে পুরাতন গভর্ণমেণ্ট হাউসে ১৮৯৯, জুলাই মাসে গবেষণা করেন। ইহাই উত্তরকালে ক্রমশঃ 'প্লেগ রিসার্চ লেবরেটরী' এবং ক্রমশঃ বম্বে 'ব্যাক্টেরিওলজিক্যাল লেবরেটরী' নামে অভিহিত হয়ে হাফকিনস্-ইনষ্টিটিউট্ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ইঁদুরের রোগ মানুষেরও হয়—

প্লেগ একটি সংক্রামক ইঁদুর-রোগ। ইঁদুরের গায়ের মাছি হলো প্লেগ জীবাণুর বাহক। কাজেই

ইঁদুরের মাছির মধ্যস্থতায়ই এই রোগ মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়। পেষ্টিস্ নামক এক প্রকার অতি-ক্ষুদ্র জীবাণু এই রোগের স্রষ্টা।

ইঁদুরের মাছি ইঁদুরের গায়ের লোমের ভিতর লুকিয়ে থাকে, আর বেঁচে থাকে তার শরীরের গরম রক্ত খেয়ে। প্লেগ রোগে ইঁদুর মারা গেলে মৃত্যুর ফলে ইঁদুরের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়, মাছিগুলো তখন গরম রক্তের সন্ধানে অন্য ইঁদুরের খোঁজে বেড়িয়ে পড়ে। ক্ষুধার্ত মাছি কাছাকাছি অন্য ইঁদুরের অভাবে (প্লেগের সময় অসুখে মরে ইঁদুরের সংখ্যা কমে যাওয়ার জন্যে) মানুষের গায়ে বসে' তার রক্ত খায়। রোগাক্রান্ত ইঁদুরের রক্ত খাওয়ার দরুণ এদের মুখ, গলা, পাকস্থলী জীবাণুতে ভর্তি হয়ে থাকে। মানুষকে কামড়াবার সময় সেগুলো মাছির মুখ থেকে উপ্‌চে মানুষের রক্তে মিশে যায় এবং যথাসময়ে মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

নানা জাতীয় ইঁদুর ও তাদের স্বভাব—

ইঁদুরই যখন জীবাণুর আধার তখন এদের সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। ইঁদুর নানা জাতীয়। সাধারণতঃ যে সব ইঁদুরের বা ইঁদুর জাতীয় জীবের সংস্পর্শে আমরা আসিয়া থাকি তাদের এইরূপে ভাগ করা যায় : —

১। প্রকৃত ইঁদুর (রোডেন্টস্)। এদেরও আবার তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

(ক) বন্য বা নালা নর্দমাস্থিত ইঁদুর। এদের রং বাদামী বা ধূসর। লেজ শরীর থেকে ছোট। কান ও চোখ অপেক্ষাকৃত ছোট। এরা মানুষের সংস্পর্শে কম আসে, কেবলমাত্র রাত্রে মানুষের বাড়ীতে আসে। এরা ভাল সাঁতার দিতে পারে। এরা মাটির নীচে গর্ত করে বাস করে। কলকাতায় এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। এদের গায়ে বড় বড় লোম থাকে, এবং শরীরে সবচেয়ে বেশী মাছি থাকে। এরা বহুদূর পর্যন্ত চলা ফেরা করে বলে একজায়গা হতে অন্য জায়গায় রোগ ছড়িয়ে বেড়ায়। বোধহয় এদেরই সর্বপ্রথম প্লেগ হয়, এবং এরাই রোগ জীইয়ে রাখে।

(খ) মানুষের বাসস্থানে ইঁদুর। এদের রং কালো বা লালচে। লেজ শরীর হতে বড়। কান ও চোখ অপেক্ষাকৃত বড়। এরা ঘরের শস্যাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে, সুতরাং মানুষের সংস্পর্শে আসে এবং মানুষের রোগের জন্য এরাই প্রধানতঃ দায়ী। কলকাতায় এদের সংখ্যা, নর্দমার ইঁদুর হতে কম। এদের গায়ে ৪।৫টি করে মাছি থাকে।

(গ) মানুষের বাসস্থানে আর একপ্রকার ইঁদুর দেখা যায়, তাদের গায়ের মাছির সংখ্যা প্রায় ৫ টার বেশী হয়না।

২। নেংটী ইঁদুর; এরাও মানুষের বাসস্থানে থাকে। এদের গায়ে খুবই কম মাছি থাকে।

৩। ছুঁচো; এরা প্রকৃত পক্ষে ইঁদুরই নয়। এদের গায়ে ৩ হতে ৪টীর বেশী মাছি থাকে না।

ইঁদুরের সংখ্যা খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়। তিন মাসেই স্ত্রী ইঁদুর সন্তান ধারণক্ষম হয় এবং এক সঙ্গে ৪।৫টী করে সন্তান প্রসব করে। সারা পৃথিবীতে মানুষের ও ইঁদুরের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। কলকাতায় ইঁদুরের সংখ্যা এক পল্লী হতে অন্য পল্লীতে অনেক তফাৎ, কিন্তু তার উপর প্লেগ রোগের সংখ্যা ও প্রকোপ সব সময় নির্ভর করে না।

ইঁদুর-মাছির জাতিভেদ ও তাদের স্বভাব—

ইঁদুরের গায়ে একপ্রকার পোকা থাকে, যদিও তাদের ডানা নেই এবং উড়িতে পারে না, তবুও তাদের মাছি বলা যেতে পারে। সাধারণ মাছি যেমন কলেরার জীবাণু বহন করে বেড়ায় ও রোগ ছড়ায়, এরাও তেম্নি প্লেগের জীবাণু বহন করে বেড়ায়। তবে তফাৎ এই যে, এরা গায়ে, পায়ে বহন করে না. মুখে ও গলায় বহন করে এবং সাধারণতঃ কেবলমাত্র দংশন দ্বারা মানুষে রোগ সংক্রামিত করে। জীবাণু ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে এমনভাবে

এদের গলা বন্ধ করে দেয় যে, কোনও লোকের রক্ত খাবার জন্য দংশন করতে গেলেই এদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও এবং অজ্ঞাতসারেই মুখ হতে জীবাণু উপচে পড়ে মানুষের রক্তে মিশে যায়।

দেশ ভেদে ইঁদুর পিছু মাছির সংখ্যার তারতম্য হয়। কলকাতায় ইঁদুর পিছু মাছির সংখ্যা হবে ৫ হতে ৬। এই সংখ্যা শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায় তফাৎ দেখা যায় [শীতে ৯ হতে ১০ ; গ্রীষ্মে ৫ হতে ৬, বর্ষায় ৩ হতে ৪।—রাঘবেন্দ্র রাও কর্তৃক ১৯৩৪, ১৯৩৬ সালে কলিকাতার গণনা]

ইঁদুরের জাতিভেদেও মাছির সংখ্যার তারতম্য হয় তাহা পূর্বেই বলা হয়েছে।

এই মাছি দুই জাতের। শিওপিজ এবং য়্যাষ্টিয়া। প্রত্যেক ইঁদুরেই প্রায় দুই জাতের মাছি পাওয়া যায়। তবে দেশভেদে আনুপাতিক সংখ্যার তারতম্য হয়। যদিও কেহ কেহ বলেন য়্যাষ্টিয়া প্লেগ-জীবাণু বহন করে না। কিন্তু এ কথা নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয় না, কারণ কলম্বো, মাদ্রাজ ও যুক্তপ্রদেশে য়্যাষ্টিয়ার সংখ্যাই বেশী। অথচ গত প্লেগ মহামারীতে মাদ্রাজে রোগ খুব কম হলেও কলম্বো ও যুক্তপ্রদেশে যথেষ্ট হয়েছিল। আবার কলকাতায় শিওপিজ্ যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও সেবার রোগ খুবই কম হয়েছিল, যদিও এবার যথেষ্টই হয়েছে।

কলকাতায় বাসস্থানের ইঁদুরে শিওপিজের সংখ্যা বেশী। নালা-নর্দমার ইঁদুরে য়্যাষ্টিয়ার সংখ্যা বেশী। ইঁদুর জীবিত থাকলে ডিম পাড়ার সময় ব্যতীত এরা ইঁদুরের শরীর ছেড়ে কোথাও যায় না। এরা লাফিয়ে চলে, উর্ধসংখ্যা ৪—৫ ইঞ্চি পর্যন্ত যেতে পারে। এরা রক্ত না খেয়ে সাতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে এবং মানুষের রক্ত খেয়ে ২৬ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। ইঁদুরের প্লেগ-দুষ্ট রক্ত খেয়ে এরা নিজেরা প্লেগে মরবার আগে ২১ দিন পর্যন্ত বেঁচে থাকে। সুতরাং ২১ দিন পর্যন্ত এরা রোগ সংক্রামণ করতে পারে।

কি ভাবে রোগ ছড়িয়ে পড়ে—

নিম্নলিখিত উপায়ে এই দুরারোগ্য ব্যাধি দূর হতে দূরান্তরে বিস্তার লাভ করে :—

১। ছোট ইঁদুর বেশী দূর চলাফেরা করে না বলে রোগ ছড়ায় কম। বড় ইঁদুর অনেক দূরে দূরে চলাফেরা করে বলে ছড়ায় বেশী।

২। পোষাক পরিচ্ছদের সঙ্গে মানুষ ইঁদুরের মাছি এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়।

৩। ধান, চাল, ডাল, গম প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে ইঁদুর ও তার মাছি এক সহর হতে অন্য সহরে চালান যায়। জাহাজ ও রেলের মাল গাড়ীতে ইঁদুর দেশ দেশান্তরে চলে যায়।

সংক্রমণ—

১। ইঁদুর-মাছি দ্বারা—ইঁদুর হতে মানুষের দেহে ইঁদুর-মাছি দ্বারা রোগ সংক্রমিত হয়। কিন্তু গ্রন্থিস্ফীতি প্লেগে রুগ্ন মানুষের শরীরের রোগ-বীজ অন্য মানুষের দেহে মাছির দ্বারা সংক্রামিত হয় না।

২। মানুষের দ্বারা—যদি কোন প্লেগ রোগীর ফুস্‌ফুসের প্রদাহ থাকে তাহলে তার হাঁচি, কাশির সঙ্গে বা ফুস্‌ফুস্-প্রদাহ-প্লেগ রোগীর হাঁচি বা কাশির সঙ্গে ফোয়ারার মত বিক্ষিপ্ত জীবাণু ২ হাত দূরে অবস্থিত সুস্থ লোকের শ্বাসপথে প্রবেশ করতে পারে। নিউমোনিয়া বা ইনফ্লুয়েঞ্জাও এই ভাবে সংক্রামিত হয়। এইরূপ সরাসরি সংক্রমণে সুস্থ লোকের পক্ষে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

ফুস্‌ফুস্‌প্রদাহ-প্লেগ অপেক্ষাকৃত বেশী মারাত্মক। তবে সুখের বিষয় এই যে, এই জাতীয় প্লেগ খুবই কম হয়। এই জাতীয় রোগীর মল, মূত্র ও গয়ারেও জীবাণু থাকে। যদিও এই গুলির দ্বারা সংক্রমণ কমই হয়।

রোগের প্রচ্ছন্নকাল—

সংক্রামিত হওয়ার সময় হতে অসুখের বাহ্য প্রকাশ পর্যন্ত সময়কে প্রচ্ছন্নকাল বলা হয়। ইহা

সাধারণতঃ ৪।৬ দিন হয়। তবে রোগ সংক্রমণের ১½ দিন পরেও হতে পারে আবার ৭ দিন পরেও হতে পারে। এই সময়ের মধ্যে টিকা নিলে প্রচ্ছন্ন-কাল ১০ দিন পর্যন্ত বাড়তে পারে। টিকার পরে রোগের প্রকাশ যদি কখনও হয়-ও তা সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত মৃদু হয়।

রোগের লক্ষণ—

১। জ্বর; সাধারণতঃ ১০৩° পর্যন্ত উত্তাপ হতে পারে।

২। গ্রন্থি-স্ফীতি-প্লেগ—প্রথমতঃ কুঁচকির গ্রন্থি জ্বরের ২য় বা ৩য় দিনে স্ফীত হয়; একে বাগী বলে। পরে বগলের ও ঘাড়ের গ্রন্থি স্ফীত হয়। সাধারণতঃ দেহের দুই দিককার গ্রন্থিই এক সঙ্গে স্ফীত হয় না। এই জাতীয় প্লেগে ফুস্ফুসের প্রদাহও থাকতে পারে।

ফুসফুস প্রদাহ-প্লেগ—নিউমোনিয়ার মত কাশি, রক্তযুক্ত গয়ার নির্গমণ, বুক ব্যাথা প্রভৃতি এর লক্ষণ।

রক্ত-দুষ্টি প্লেগ—অতিরিক্ত বিষক্রিয়া জনিত অবস্থার দ্রুত অবনতি এবং অতিরিক্ত বা অতি স্বল্প জ্বর। মনের বিকার ও প্রলাপ, এবং অজ্ঞান হয়ে যাওয়া প্রভৃতি হতে পারে।

রোগ নির্ণয়—

জীবাণু পরীক্ষা। গ্রন্থিস্ফীতি রোগের বাগী পিচকারী দিয়ে ফুটো করে এক ফোটা রস বের করে তা কাচের প্লেটে মাখিয়ে, শুকিয়ে, বিশেষ রঞ্জক দ্রব্য দ্বারা রাঙিয়ে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখ্লে জীবাণুর বিশেষ আকার দ্বারা এই রোগ চেনা যায়। বাগী পাকিয়া গেলে অর্থাৎ পুঁয হলে জীবাণু পাওয়ার সম্ভাবনা কম্।

ফুস্ফুস্ প্রদাহ-রোগে গয়ার ও রক্তদুষ্টি রোগে রক্ত এই ভাবে পরীক্ষা করলেও জীবাণু পাওয়া যায়। নিশ্চিত ভাবে জানতে হলে সরাসরি কাল্চার অর্থাৎ রোগ-জীবাণু বর্ধন ব্যবস্থা বা তাতেও না পাওয়া গেলে গিনিপিগে ঐ রস ইন্জেকশন করে তার প্লীহা থেকে রস নিয়ে কাল্চার করে দেখ্তে হয়।

২। রোগীর লক্ষণ পরীক্ষা:—নিম্নলিখিত রোগ হতে এর পার্থক্য বুঝে নিতে হবে।

(ক) উপদংশ জাতীয় রোগ, যাকে সাধারণতঃ বাগী বলা হয়।

(খ) বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি।

(গ) নিউমোনিয়া, ইন্ফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি জ্বর।

প্রতিকারে বিশেষ স্মরনীয়—

১। প্লেগ প্রধাণতঃ ইঁদুরের রোগ। ইঁদুরই রোগ জীবাণুর আধার।

২। মানুষের রোগের পূর্বে ইঁদুরের প্লেগ হয়ই। সুতরাং অজ্ঞাত কারণে মৃত ইঁদুর দেখ্লে সাবধান হতে হবে।

৩। ইঁদুর-মাছি রোগ জীবাণুর বাহন।

৪। ইঁদুর না মরলে ডিম পাড়ার সময় ব্যতীত মাছি ইঁদুরের শরীর ত্যাগ করে না ও মানুষকে কামড়াবার সুযোগ পায় না। অতিরিক্ত গরম ও অতিরিক্ত শুষ্ক আবহাওয়ায় মাছি বেশীদিন বাঁচতে পারে না।

৫। ইঁদুর প্রত্যেক বাড়ীতেই প্রচুর পরিমাণে থাকে ও বাড়ীর শস্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকে। সুতরাং মানুষের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

৬। সংগে সংগে ফুস্ফুসের প্রদাহ না থাকলে গ্রন্থিস্ফীতি-প্লেগ সরাসরি সংক্রামিত হয়না।

৭। ফুস্ফস্-প্রদাহ প্লেগ হাঁচি, কাশি এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা সংক্রামিত হয়।

৮। ভয়ে ভয়ে ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন রোগ ছড়াতে সাহায্যই করে; নিজেকে বা অন্যকে রোগমুক্ত করতে সাহায্য করেনা।

প্রতিকারের উপায়—

সর্বপ্রথম মনে রাখা দরকার সম্মিলিত অভিযান ও লোকশিক্ষা ব্যতীত কোন উপায়ই কার্যকরী হতে পারে না।

গভর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটি, চিকিৎসক-সমাজ হাসপাতাল, ক্লাব, রেল কর্তৃপক্ষ, জাহাজ কর্তৃপক্ষ এবং সর্বোপরি জনসাধারণ, এদের সম্মিলিত অভিযান বিশেষ প্রয়োজন।

জনশিক্ষার জন্য চাই সাধারণের বোধগম্য বক্তৃতা, আলোচনা, প্রদর্শনী, ইস্তাহার ও রেডিও যোগে বক্তৃতা। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরাও যাতে অবহিত হতে পারেন তার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা দরকার। যাঁরা এই বিষয়ে কাজ করবেন তাঁদের আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার উপর কার্যকারিতা নির্ভর করবে।

প্রতিকারের উপায়গুলোকে মোটামুটি ৩ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১। ইঁদুর ও তার মাছি সম্বন্ধীয়।

(ক) ইঁদুর ধরা ও মারা। ইঁদুর ধরার কল ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। বিষাক্ত ঔষধ ব্যবহার না করাই ভাল। কারণ ইহাতে অসাবধানতাবশতঃ মানুষেরও মৃত্যু হতে পারে।

(খ) ইঁদুরের বাসস্থান নষ্ট করা। দেওয়ালের বা বেড়ার ফাঁক বন্ধ করা, আবর্জনা দূর করা প্রভৃতি।

(গ) রাস্তার ডাষ্টবিন পরিষ্কার রাখা। ইহাতে কর্পোরেশনের দায়িত্ব বেশী।

(ঘ) বাড়ীর চাল, ডাল, গম প্রভৃতি শস্যাদি সযত্নে এমনভাবে রাখা উচিত যে, ইঁদুর তার নাগাল না পায়।

(ঙ) খাদ্যশস্যের বড় গুদাম লোকালয়ের কাছে না রাখতে পারলে ভাল হয়। নিতান্ত রেশনের জন্য রাখতে হলে ইঁদুরের প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। গভর্ণমেণ্ট আপাততঃ কলকাতায় রেশনের দোকানের ইঁদুর মারবার কিছু কিছু চেষ্টা করছেন।

(চ) যে জায়গায় প্রথম প্লেগ দেখা দেয় সে জায়গায় নিশ্চয়ই প্লেগরোগাক্রান্ত ইঁদুর আছে। সুতরাং বাইরে থেকে যাতে ইঁদুর না আসতে পারে বা সেখানকার ইঁদুর বাইরে যেতে না পারে এবং মানুষের পোষাক পরিচ্ছদের সঙ্গে ইঁদুর-মাছি বাইরে যেতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

২। রোগী সম্বন্ধীয়—

(ক) বাধ্যতামূলক বিজ্ঞপ্তি। কোথাও কারও এই রোগ হয়েছে জানতে পারলে তা মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষকে জানানো চিকিৎসকের পক্ষে বাধ্যতামূলক। না জানালে তিনি দণ্ডনীয় হবেন। কর্তৃপক্ষ খবর পেয়ে রোগের বিস্তার বন্ধ করার যাবতীয় ব্যবস্থা করতে পারবেন।

(খ) পৃথকী-করণ। যার রোগ হয়েছে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে আলাদা করা দরকার। ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ রোগে এটা বিশেষ করণীয়।

(গ) জীবাণু নাশ। ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ প্লেগের রোগীর পোষাক পরিচ্ছদ জীবাণুনাশক দ্রব্যে শোধন করা দরকার। গ্রন্থিস্ফীতি প্লেগে রোগীর পোষাক পরিচ্ছদ কেরোসিন বা ডি, ডি, টি দ্বারা মাছি শূন্য করা দরকার। জীবাণুনাশক দ্রব্যে শোধন করার দরকার নেই।

৩। সুস্থ ব্যক্তি সম্বন্ধীয়।

(ক) নজর বন্দী। যাঁরা রোগের সংস্পর্শে এসেছেন তাঁদের ৭—১০ দিন পর্যন্ত নজরবন্দী করে রাখা দরকার। ইতিমধ্যে যদি জ্বর না হয় তবে তাঁদের কোন ভয় নেই।

(খ) প্লেগ নিরোধক টীকা। বম্বে হাফকিনস্‌ ইন্‌ষ্টিটিউটে এই টীকার ঔষধ তৈরী হয়। এই টীকা নিলে ছয় মাস হতে ১ বৎসর পর্যন্ত এর গুণ থাকে।

আজকের টীকার ঔষধ তৈয়ার প্রণালীর দিক থেকে মূলতঃ এক হলেও হাফকিনের প্রস্তুত টীকা হতে উন্নত-তর। এই উন্নতির মূলে কর্ণেল সকির গবেষণা ও চেষ্টা নিহিত রয়েছে। এখানকার টিকার ঔষধের পরিমাণ সেই সময় হতে অর্ধেক।

এখনকার মাত্রা দুই সি, সি, বা এক সি, সি, করে এক সপ্তাহ অন্তর দুইবার। এককালীন দুই সি, সি, নিলে জ্বর ও শারীরিক গ্লানি অপেক্ষাকৃত

বেশী হয়। এখনকার টীকায় রোগ-নিরোধক শক্তি সম্পূর্ণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও শারীরিক গ্লানি পূর্বাপেক্ষা অনেক কম হয়।

(গ) যথাসম্ভব মুক্ত বাতাসে অবস্থান করা।

(ঘ) অপসারণ বা সেবার জন্য রোগীর সংস্পর্শে আসতে হলে নিম্নলিখিত উপায়গুলো অবলম্বন করলে সংক্রমণ হতে পারে না।

(১) সারা দেহ ঢাকতে পারে এমন পোষাক পরা।

(২) ভিতরে আধ ইঞ্চি পুরু তুলো দিয়ে দুভাঁজ করা কাপড় নাক ও মুখের সামনে বেঁধে নেওয়া।

(৩) হাতে রবারের দস্তানা ব্যবহার করা।

(৪) রবারের বড় উঁচু জুতা ও পুরু মোজা ব্যবহার করা। জুতা বা দস্তানার অভাবে হাতে ও পায়ে তৈলাক্ত কিছু মাখা যেতে পারে, তাতে মাছি বসবার সুযোগ পায়না।

(৫) কাজের পর পোষাক পরিচ্ছদ, দস্তানা, জুতা প্রভৃতি কেরোসিন বা ডি. ডি. টি দ্বারা শোধন করা উচিত।

(৬) ব্যাপক মহামারী দেখা দিলে সমস্ত লোকের অপসারণ দরকার হতে পারে। এমন অবস্থা হলে কোন ফাঁকা ময়দানে নূতন ছাউনীতে লোক অপসারণের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

এবারকার প্লেগ পরিস্থিতি

কলুটোলা এলাকায় বিহারী মুসলমানের এই রোগ প্রথম হয়। অল্প সময়ের মধ্যে কলকাতার সহরতলীর সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। সুখের বিষয় এবারকার রোগ মৃদু আকারের হয়েছিল; হাসপাতালে যাঁরা প্লেগ সন্দেহে ভর্তি হয়েছেন তাঁদের মধ্যে লক্ষণাদির দ্বারা প্রমাণিত শতকরা ৮০জনই যথার্থ প্লেগ রোগী। সময় ও সুযোগের অভাবে জীবাণু পরীক্ষিত এদের মধ্যে অবশ্য অনেকেই নয়।

ষ্ট্রেপটোমাইসিন, সালফাডায়াজিন প্রভৃতি অধুনা আবিষ্কৃত ঔষধ প্রয়োগের জন্য এবার মৃত্যুর হার খুবই কম। এপ্রিল মাস পর্যন্ত যত রোগী ক্যাম্বেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তন্মধ্যে মাত্র ৩।৪টী ফুস্‌ফুস্‌-প্রদাহ প্লেগ রোগী, রক্তদুষ্টি প্লেগ বোধহয় একটীও নেই। এবারকার গ্রন্থিস্ফীতি রোগের বিশেষত্ব এই যে, বগলের গ্রন্থির বদলে সর্বাগ্রে অনেকেরই ঘাড়ের গ্রন্থি স্ফীত হয়েছিল। এই পর্যন্ত মাত্র ১০.জন লোক মারা গিয়াছেন।

কলকাতায় স্থায়ী প্লেগ নিরোধক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা চলেছে।

'জীবাণু বা ভাইরাস ঘটিত ব্যাধির প্রধান বিপদ কোথায়? জীবাণু এবং ভাইরাসের পরিবর্তনশীলতা এবং বিপর্যস্ত অবস্থায় মানিয়ে চলবার ক্ষমতা অপরিসীম। অনিষ্টকারী রাসায়নিক পদার্থের অপ্রীতিকর পরিবেশে, অবস্থায় সামান্য তারতম্যে এদের প্রতিরোধশক্তি সম্পন্ন 'মিউট্যান্ট' উৎপন্ন হয়ে বংশ বিস্তার করতে থাকে। তাদের উপর আর নির্দিষ্ট প্রতিশেষধক ওষুধের কোন ক্রিয়াই হয় না।'

করে দেখ

(১)
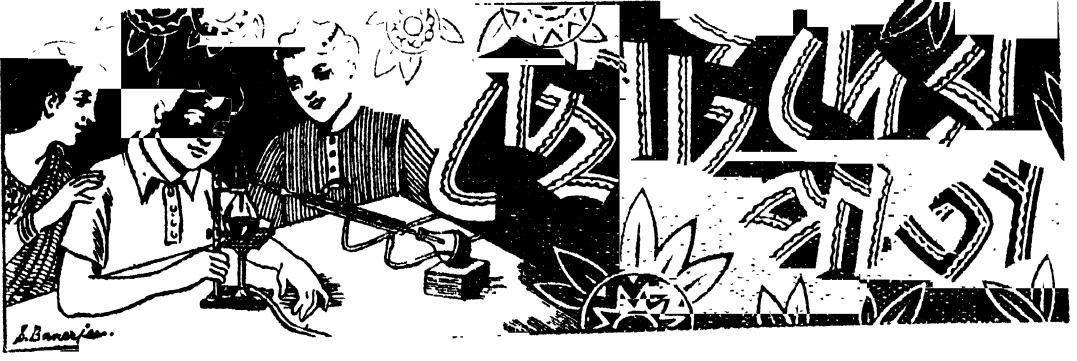
ঠাণ্ডা দিয়ে জল ফোটানো

একটা পাত্রে জল রেখে সেটাকে জ্বলন্ত উনুনে চাপিয়ে দিলে কিছুক্ষণ বাদেই জলটা টগবগ করে ফুটতে থাকে—এটা তোমরা সবাই দেখেছ। উপযুক্ত উত্তাপ পেলে জল টগবগ করে ফুটবে—এটা কিছুমাত্র অদ্ভুত ব্যাপার নয়। কিন্তু উত্তাপের পরিবর্তে ঠাণ্ডা দিলে জল যদি টগবগ করে ফুটতে থাকে তবে সেটাকে তোমরা নিশ্চয়ই অদ্ভুত ব্যাপার বলে মনে করবে। তোমরা হয়তো বিশ্বাস করতেই চাইবে না যে, ঠাণ্ডা দিলে জল টগবগ করে ফুটতে পারে। ব্যাপারটা কিন্তু অদ্ভুতও নয় বা অস্বাভাবিকও নয়। ঘরে বসে যাতে সহজেই পরীক্ষা করে দেখতে পার সে উপায়টা বলে দিচ্ছি। দেখবে, ঠাণ্ডা দিলে জল কেমন টগবগ করে ফুটতে থাকে।

১নং ছবি
ফ্লাস্কে জল গরম করা হচ্ছে

ছবিতে যেমন আঁকা আছে সেরূপ একটা কাচের ফ্লাস্ক জোগাড় করে নাও। যেকোন রকম কাচের শিশি-বোতলে চলবে না, কারণ একটু বেশী তাপ দিলেই সেগুলো ফেটে যাবে। ওরকমের ফ্লাস্ক যেকোন সায়েন্টিফিক ইনষ্ট্রুমেন্টের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়।
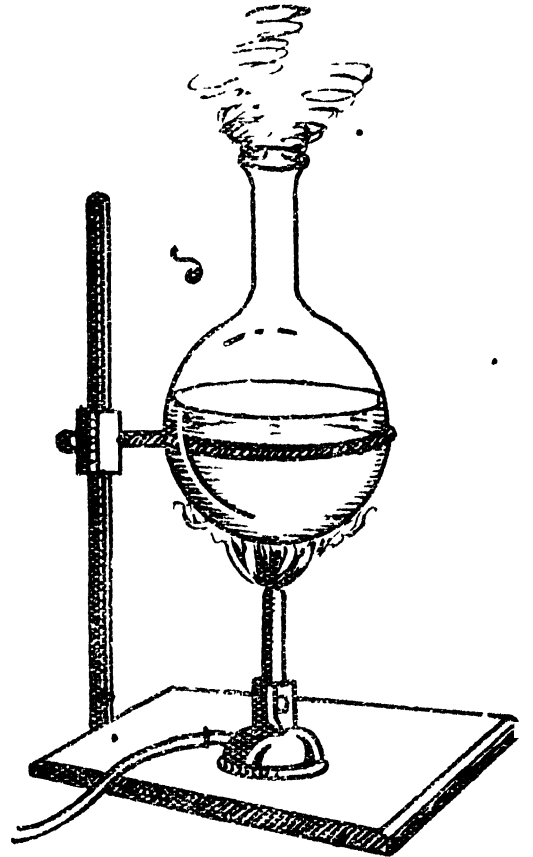
ফ্লাস্কটাকে অর্ধেক জল ভর্তি করে মুখ খোলা রেখেই লোহার একটা ষ্ট্যাণ্ডের গায়ে আটকানো রিংএর উপর ছবির মত করে বসিয়ে দাও। তারপর গ্যাস-বার্ণার জ্বেলেই হোক বা স্পিরিট-ল্যাম্প জ্বেলেই হোক ফ্লাস্কটার তলায় উত্তাপ দিতে থাক। জল যখন টগবগ করে ফুটতে থাকবে এবং ফ্লাস্কের মুখ দিয়ে বাষ্প বেরুতে থাকবে তখন গ্যাস-বার্ণারটাকে সরিয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে একটা রাবারের ছিপি দিয়ে ফ্লাস্কের মুখটাকে বেশ ভাল করে বন্ধ করে দাও। গ্যাস-বার্ণার বা স্পিরিট-ল্যাম্পটাকে সরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখবে—আস্তে আস্তে ফ্লাস্কের জলের টগবগানি থেমে গেছে এবং জলটা ঠিক সমতলে শান্তভাবে রয়েছে। এবার জল সমেত ফ্লাস্কটার মুখ নীচু দিকে রেখে দ্বিতীয় ছবিটার মত করে রিংএর উপর বসিয়ে দাও। ফ্লাস্কের তলার গোল দিকটা থাকবে এবার উপরের দিকে। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে এস। গোলদিকটার উপর গ্লাস থেকে বেশ খানিকটা জল ঢেলে দাও। দেখবে, ফ্লাস্কের ভিতর সেই শান্ত জল আবার টগবগ করে ফুটে উঠছে। ছবির সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষাটা করতে পারলে একবারেই বেশ কৃতকার্য হবে।
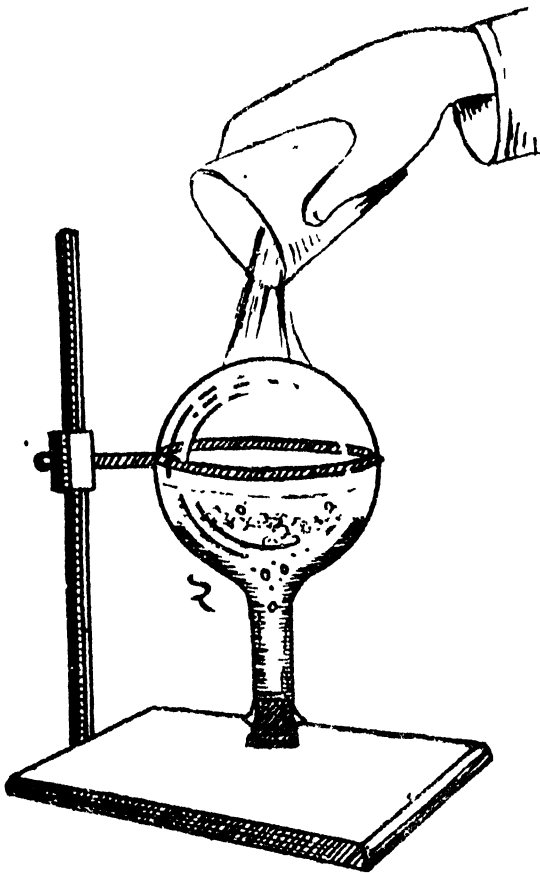
২নং ছবি

ফ্লাস্কটাকে উল্টেদিয়ে ঠাণ্ডা জেল ঢালা হচ্ছে

কেন এমন হয় বলতে পার? ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়। খাল, বিল, পুকুরের জলকে সর্বদাই আমরা শান্ত ভাবে থাকতে দেখি। আদতে কিন্তু সে অত শান্ত নয়। একটু সুবিধা পেলেই সে অশান্ত হয়ে ওঠে এবং বাষ্প হয়ে উবে যেতে চায়। বায়ুমণ্ডলের প্রবল চাপে সে তা' পেরে ওঠে না। এক ইঞ্চি লম্বা, এক ইঞ্চি চওড়া স্থানের উপর বায়ুর চাপ হচ্ছে প্রায় সাড়ে সাত সের। হিসেব করে দেখ, সামান্য এক গ্লাস জলের উপরেই তাতে কত চাপ পড়ে। যদি কোন রকমে এই চাপ সরিয়ে দেওয়া যায় তবে জল মুক্তি পেয়ে উশৃঙ্খলভাবে দাপাদাপি করে' উবে যাবার চেষ্টা করে। তার ফলেই সুরু হয় টগবগানি। গরম দিলে জলের উপরকার বাতাস হাল্কা হয়ে সরে যায় আর বাষ্প তার স্থান অধিকার করে। কাজেই বাষ্প ওঠবার সময় ফ্লাস্কের

ছিপিবন্ধ করলে তার মধ্যে বাতাস কিছুই থাকে না। তবুও আবদ্ধ বাষ্পের চাপে জলকে শান্তভাবে অবস্থান করতে হয়। ফ্লাস্কটাকে উল্টো করে অনেকটা জায়গায় এক সঙ্গে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলে ভিতরের বাষ্প তৎক্ষণাৎ জমাট বেঁধে জলকণারূপে ফ্লাস্কের জলের সঙ্গে মিশে যায় এবং সে সময়ে বাতাস বা বাষ্প কিছুই না থাকাতে জল অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যে চাপ মুক্ত হয়ে লাফালাফি সুরু করে দেয়।

(২)

স্বয়ংক্রিয় ফোয়ারা

তোমাদিগকে এক রকমের খেলনা ফোয়ারা তৈরীর কথা বলছি। তিনটে সরু কাচের নল, দু'টো কাচের ফাঁপা বল আর কয়েকটা মোটা কর্কের ছিপি যোগাড় করতে পারলেই হলো। ঠিক ছবির মত জিনিষটাকে তৈরী করতে পারলে দেখবে—কিছুটা জল ঢেলে দিলেই ফোয়ারার মুখ থেকে আপনা আপনি জল উপরের দিকে ছিটকে উঠ্‌তে থাকবে। ব্যাপারটা খেলনা হলেও এথেকে বাতাসের চাপ, ওপরে জল তোলবার বৈজ্ঞানিক কৌশল সম্বন্ধে অনেক কিছু বুঝতে পারবে। দু'হাজার বছরেরও আগে হিরো নামে আলেকজাণ্ড্রিয়ার একজন গাণিতিক ও দার্শনিক এই অপূর্ব জিনিষটিকে সর্বপ্রথম তৈরী করেছিলেন।

জিনিষটা কি রকম হবে—ছবিটাকে ভাল করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে। ৬ নম্বরের অংশটা চায়ের পিরিচের মত একটা জিনিষ। এর মাঝখানে বেশ মোটা একটা ছিদ্র আছে। এ জিনিষটা মাটি, কাঠ, টিনের পাত বা অন্য যেকোন কিছুর তৈরী হলেই চলবে। পিরিচের মাঝখানে ছিদ্রের মধ্যে একটা মোটা কর্কের ছিপি আঁটা। ছিপিটার মধ্যস্থলে ও এক পাশে দু'টো সরু ছিদ্র থাকবে। আই-ড্রপারের মত সরু মুখ একটা কাচের নল কর্কের মধ্যের ছিদ্রটাতে ছবির মত করে বেশ এঁটে বসিয়ে দেওয়া
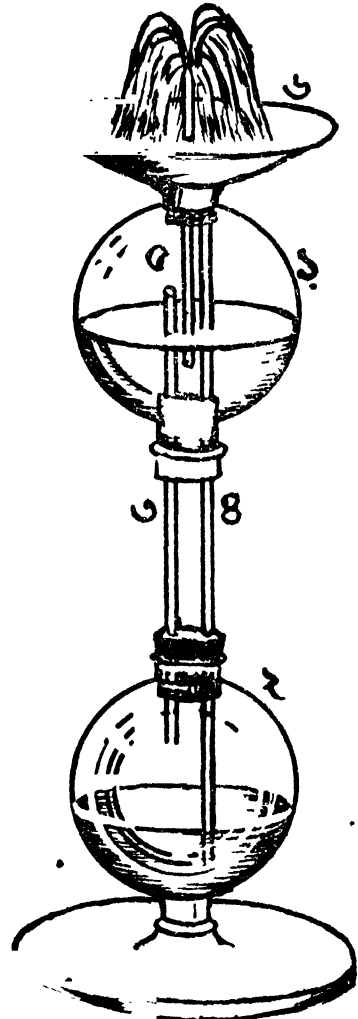
৩নং ছবি
স্বয়ংক্রিয় ফোয়ারা

হয়েছে (৫ নং)। ৪ নম্বরের আর একটা লম্বা কাচের নল পাশের ছিদ্রটাতে গলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১ এবং ২ নম্বরে কাচের দুটো ফাঁপা বল, বোতলের মুখের মত উপরে ও নীচের দিকে ছিদ্র করা কর্ক দিয়ে দিয়ে আঁটা। ৩ নম্বরের কাচের নলটাকে ছবিতে যেমন আছে তেমনি করে ১ ও ২ নম্বরের কাচের বলের দু'টো কর্কের ছিদ্রের মধ্যে পরিয়ে দিতে হবে। ২ নম্বরের কাচের বলটাকে ছবির মত যেকোন একটা ষ্ট্যাণ্ডের ওপর এঁটে বসিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবে। ১ নম্বরের কাচের বলটার মধ্যে আগে থেকেই প্রায় পুরোপুরি জল ভর্তি করে দেবে। নীচের ২নং বলটা থাকবে খালি। এবার ৬নং পিরিচখানার মধ্যে খানিকটা জল ঢেলে দাও। পিরিচের জল ৪নং নলের ভিতর দিয়ে নীচে নেমে ২নং বলের মধ্যে জমতে থাকবে। জল ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গেই ২নং বলের বাতাসটা ৩নং নলের ভিতর দিয়ে ১নং বলের মধ্যে প্রবেশ করে জলের ওপর চাপ দেবে। বাতাসের এই চাপের ফলে ১নং বলের জল সরুমুখ নলটা দিয়ে ফোয়ারার মত ওপরের দিকে ছিটকে উঠতে থাকবে। ফোয়ারার জলটা ৬নং পিরিচ খানার মধ্যেই পড়বে। সেই জলটা ৪নং নলদিয়ে ক্রমাগত নীচে এসে ১নং বলটার জলের উপর বাতাসের চাপ বাড়িয়ে তুলতে থাকবে। এর ফলে ১নং বলের ভিতরকার সব জলটাই ধীরে ধীরে ফোয়ারার আকারে বেরিয়ে আসবে।

এখানে কাচের জিনিষের কথাই বলেছি। বুদ্ধিকরে যদি অন্য কিছু দিয়ে তৈরী করতে পার তাতেও এরকমের কাজই হবে। এজিনিষটাকে ঠিক ছবির মত নাকরে অন্যভাবেও করা যেতে পারে। জলটা কেন আপনা আপনি ফোয়ারার মত উপরে উঠে যায় —এরহস্যটা যদি বুঝতে পেরে থাক তবে তোমরা নিজেরাই বুদ্ধিকরে আরও অন্যান্য কৌশলে এরকমের জিনিষ তৈরী করতে পারবে। এরপরে জলের ফোয়ারা বা উপরে জল তোলবার অন্যান্য কৌশলের কথা তোমাদিগকে ক্রমশঃ জানিয়ে দেওয়া যাবে।

(৩)

স্বয়ংক্রিয় কাচ-গোলক

এবার তোমাদিগকে চমৎকার একটা বৈজ্ঞানিক খেলার কথা বলব। একটু চেষ্টা করলে অনায়াসেই যন্ত্রটা তৈরী করে প্রচুর আমোদ পেতে পার!

৫।৬ ইঞ্চি লম্বা সরু একটা কাচের নলের দু'দিকে দু'টো কাচের ফাঁপা বল। দেখতে অনেকটা ডাম্বেলের মত। পাল্লার দাঁড়ির মত ডাম্বেলটা একটা ষ্ট্যাণ্ডের ওপর আলতোভাবে বসানো রয়েছে। ষ্ট্যাণ্ডসমেত যন্ত্রটাকে রোদে বসিয়ে দিলেই ডাম্বেলটা একবার এদিক, আবার ওদিক যদি অনবরত ওঠানামা করতে থাকে তবে সেটাকে যন্ত্র-কৌশলের একটা অদ্ভুত খেলা বলে মনে হবে না কি? ইচ্ছে করলে তোমাদের মধ্যে অনেকেই এরকম

একটা যন্ত্র তৈরী করে বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয় দিতে পার। অবশ্য ডাম্বেলের মত কাচের জিনিষটা তৈরী করতে বড়দের সাহায্য নিতে হবে। কাচ গলিয়ে যারা নানারকম জিনিষ তৈরী করে তাদের দিয়ে কাচের ডাম্বেলটা তৈরী করে নিতে পারলে বাকিটা তোমরা নিজের হাতেই করতে পারবে।

একটা কাচের নলের দু'পাশে দু'টা ফাঁপা বল থাকবে। বল দু'টাকে ডাম্বেলের মত ঠিক সোজাসুজি না রেখে একদিকে সমকোণে বাঁকিয়ে দিতে হবে। মুখ বন্ধ করে দেবার আগে একটা বলের অর্ধেকের কিছু বেশী জল ভর্তি করে সেটাকে আগুনের ওপর ধরলেই জল গরম হয়ে বাষ্প উঠতে থাকবে। এর ফলে বলের ভিতরকার বাতাস বেরিয়ে যাবে। বাষ্প বেরুবার সময় বলের খোলা মুখটির কাচ গলিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। ঠাণ্ডা হলেই বাষ্প জলে পরিণত হবে এবং জল ছাড়া বাকি
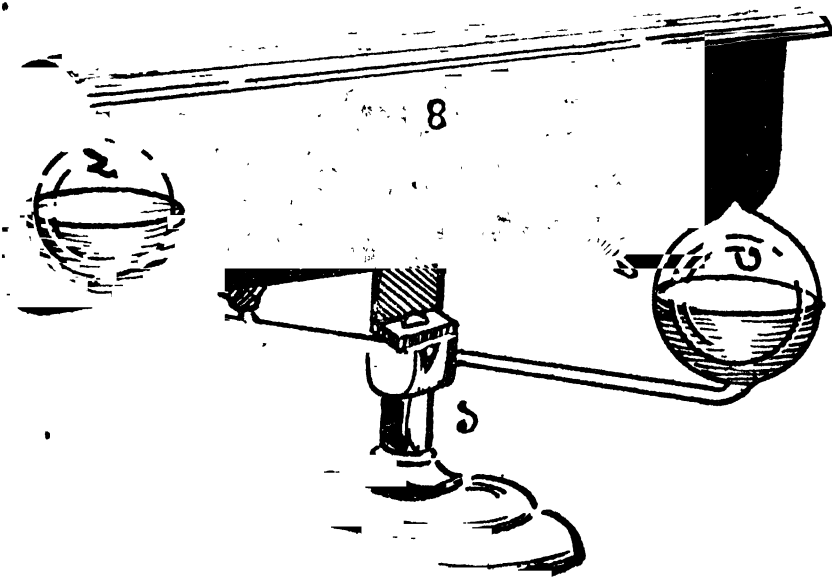
৪নং ছবি
স্বয়ংক্রিয় কাচগোলক

জায়গাটুকু বায়ুশূন্য থাকবে। একটা বলের অর্ধেকের বেশী জলে ভর্তি, অপরটা খালি। এ অবস্থায় বল দু'টাকে উপরের দিকে রেখে, নলটাকে শয়ানভাবে ধরে, জলের দিকটায় একটু তাপ দিলেই দেখবে—জল থেকে কিছু পরিমাণে বাষ্প উৎপন্ন হচ্ছে। এই বাষ্পের চাপে জলটা ক্রমশঃ সরে গিয়ে খালি বলটায় উপস্থিত হবে। কাচের এই যন্ত্রটাকে যদি একটা ষ্ট্যাণ্ডের ওপর ঢেঁকিকলের মত বসিয়ে দেওয়া যায়, তবে বেশী জল ভর্তি বলটা জলের ভারে নীচের দিকে নেমে যাবে। এমন কোন কৌশলে যদি একবার এ-বলের জলকে ও-বলে, আবার ও-বলের জল এ-বলে নেবার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে কাচের ডাম্বেলটা পর্যায়ক্রমে একবার এ-দিকে আবার ও-দিকে ওঠানামা করতে থাকবে।

কি কৌশলে এরূপ করা যেতে পারে সেটা ভালকরে বুঝিয়ে দেবার জন্যে ছবি দেওয়া হল। ছবিখানা মনোযোগ দিয়ে দেখে নাও, তাহলেই কৌশলটা বুঝতে পারবে।

১নং-একটা ষ্ট্যাণ্ড। উপরে ঢেঁকিকলের মত ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাচের নলটার ঠিক মধ্যস্থলে একটা পেতলের পাত গোল করে এঁটে দিয়ে তার নীচের দিকে তেকোণা কাচের মত ছোট্ট একটু লোহা বা পেতলের টুকরা জোড়া দেওয়া হয়েছে। এই তেকোণা টুক্‌রা টুকুর ওপরই ২ এবং ৩ নম্বরের বল সমেত কাচের নলটা ঢেঁকিকলের মত বসানো আছে।

১নং ষ্ট্যাণ্ডের পিছনের দিকে ৪ নম্বরের জিনিষটার মত পেতল বা টিনের একখানা পাতলা পর্দা জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই টিন বা পেতলের পর্দাখানার পেছন দিকটা থাকবে খুব চক্‌চকে পালিশ করা, আর সামনের দিকটা রং দিয়ে কালো করে দিতে হবে। এই পর্দার নীচের দু'দিকে দু'টা পিন ছবির মত করে বসানো থাকবে; ফলে বল দু'টা কোন রকমেই নির্দিষ্ট সীমা ছেড়ে বেশী উঁচুতে উঠতে পারবে না।

পর্দার চকচকে দিকটাকে আলোর মুখী করে' এবার যন্ত্রটাকে রোদে বসিয়ে দাও। উত্তপ্ত চুল্লী বা অন্য কোন উজ্জ্বল আলোকাধারের কাছেও রাখতে পার। এমনভাবে বসাবে, পর্দার চক্‌চকে দিকটা যেন আলো অথবা উত্তাপের দিকে থাকে। দেখবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আলো বা উত্তাপ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত বল দু'টা আপনা আপনিই ওঠানামা করছে। বল দু'টার সামনের দিকের অর্ধাংশ কালো করে দিলে এই ওঠানামা আরও দ্রুত গতিতে চলতে থাকবে।

কেন এমন হয় বুঝেছ তো ? ধর, ছবির ৩নং বলটা পেতলের পর্দাটার নীচে নেমে গেছে। কাজেই ৩নং বলটাতে আলো অথবা তাপ লাগবে। ২নং বলটা থাকবে ছায়ার মধ্যে ; কালো রঙের জন্য সেটাতে তাপও প্রায় কিছুই লাগবে না। আলো বা তাপ লেগে ৩নং বলের মধ্যে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হবে। এরই চাপে ৩নং বলের জল ধীরে ধীরে ২নং বলে প্রবেশ করতে থাকবে। যখন ২নং বলের জলের পরিমাণ ৩ নম্বরের চেয়ে কিছু বেশী হবে তখনই ভারে ২নং বলটা নীচে নেমে আসবে। ৩ নম্বরের বলটা যাবে ছায়ার মধ্যে। এবার ২ নম্বরের বলটা আলোতে চলে আসায় সেটার মধ্যে বাষ্প উৎপন্ন হবে এবং বাষ্পের চাপে জল আবার ৩নং বলে প্রবেশ করে সেটাকে নীচে নামিয়ে আনবে। এভাবে ক্রমাগত ওঠানামা চলতেই থাকবে।

(৪)

ঘূর্ণায়মান জল-চক্র

এবার তোমাদিগকে এমন একটা সহজ পরীক্ষার কথা বলবো যার উপকরণ সংগ্রহ করতে তোমাদিগকে কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ করতে হবে না। একটু মনোযোগ দিয়ে দক্ষতার সঙ্গে করতে পারলে প্রত্যেকেই আশ্চর্য রকম সফলতা লাভ করবে।

প্রথমে একখণ্ড সোলা বা কর্ক এবং চাপ-দেওয়া কর্পূরের চৌকা টুকরা সংগ্রহ করতে হবে। সোলার গাছ হয়—সাধারণ একটা লাঠির মত মোটা। ভিতরে আগা গোড়া একটা সরু ছিদ্র আছে। আধ ইঞ্চি মোটা একটুকরা সোলা বা কর্ক হলেই চলবে। চাপ-দেওয়া কর্পূরের চৌকা ব্লক বা তার টুকরা যেকোন দোকানেই কিনতে পাওয়া যাবে। এ ধরণের কর্পূরের টুকরা পেলেই ভাল হয়, নচেৎ ডেলা কর্পূরেও কাজ চলতে পারে। অবশ্য এ সকল পরীক্ষার বেশীর ভাগই তোমাদের বুদ্ধি-কৌশল এবং দক্ষতার উপর নির্ভর করে। চারটে ফুটো-পয়সা উপরে উপরে এক থাকে সাজিয়ে রাখলে যতটা পুরু হয় ততটা পুরু করে এক চাক সোলা খুব ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে নাও। একটা দেশলাইয়ের কাঠি লম্বালম্বি চার ভাগে চিরলে চারখানা খুব সরু কাঠি হবে। দেশলাইয়ের কাঠির বদলে ওরকমের সরু চারখানা বাঁশের চোঁচ অথবা সূচ বা অন্য যা' কিছু একটা হলেই কাজ চলবে। ওরূপ চারখানা কাঠির একমুখ সূচলো করে নিয়ে সোলার চাকতি খানার গায়ে চারদিকে সমান দূরে দূরে বেশ একটু শক্ত করে বসিয়ে দাও। সোলার চাকতি যতটা পুরু করে কেটেছ ঠিক ওই রকম পুরু আর চারখানা সোলার ছোট্ট চৌকা কেটে নিয়ে চাকতিটার গায়ে বসানো কাঠির মাথায় ঢুকিয়ে বসিয়ে দাও। এবার কর্পূরের ব্লক থেকে ছোট্ট চারখানা লম্বাটে বা চৌকা টুকরা কেটে বার কর। সহজে জলে গুলে না যায় এরূপ সামান্য একটু ভাল আঠা দিয়েই হোক বা পাতলা করে মোম গালিয়েই হোক, কর্পূরের চ্যাপ্টা টুকরাগুলোকে কাঠির মাথায় আটকানো সোলার টুকরার গায়ে একদিক থেকে এঁটে দাও। কর্পূরের টুকরাগুলো যেন একটায় এধারে, আর একটায় ওধারে লাগানো না হয়। বাঁ-দিক ধরেই হোক, কি ডান-দিক ধরেই হোক, কর্পূরের ফালিগুলো সোলার চর্কিটার চারটা বাহুতে একদিকে লাগাতে হবে। ছবিটা ভালকরে দেখে নাও তবেই পরিষ্কার বুঝতে পারবে। সোলার চর্কিটাকে যতদূর সম্ভব হাল্কা আর চারদিক সমভার করবার জন্যে বিশেষ নজর রাখবে। এবার হয় একটা গামলা, না হয় চৌবাচ্চা বা পুকুরের জলের উপর চর্কিটাকে আস্তে ছেড়ে দাও। দেখবে, হাওয়ায়-ঘোরা চর্কির মত এই চর্কিটাও জলের উপর পাক খেয়ে ঘুরতে সুরু করেছে এবং অনেকক্ষণ ধরে অনবরত ঘুরতেই থাকবে। কর্পূরের পরিবর্তে ভাল সাবান দিয়েও এ পরীক্ষা করা যেতে পারে। গামলার জলে মোম বা প্ল্যাষ্টেসিন

৫নং ছবি
সোলার চাকতির গায়ে আটকানো কাঠির মাথায় কর্পূরের টুকরা জুড়ে চর্কি তৈরী হয়েছে

দিয়ে একটা সরু কাঠি বসিয়ে দাও। কাঠিটা যেন জলের ওপর খানিকটা বেরিয়ে থাকে। সোলার ফুটোর মধ্য দিয়ে ওই কাঠিটা গলিয়ে দিলে এক জায়গায় থেকেই চর্কিটা চাকার মত ঘুরতে থাকবে।

ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়; জলের ওপর কর্পূরের গুঁড়া বা পাতলা এক টুকরা সাবান অথবা এক ফোঁটা তেল ছেড়ে দিয়ে দেখো, ব্যাপারটা কি হয়। কর্পূর
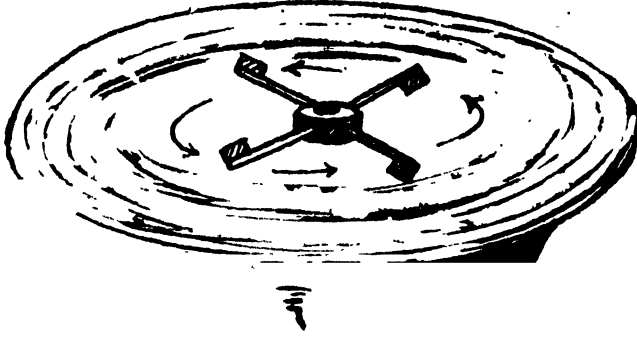
৬নং ছবি
গামলার জলে কর্পূরের চর্কি ঘুরছে

বা সাবান থেকে কোন পদার্থ যেন ভয়ানক বেগে জলের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে—দেখতে পাবে। কর্পূরের টুকরা যদি ভাসমান সোলার সঙ্গে এরূপ বিশেষ কৌশলে আটকানো থাকে তবে চারদিকের চারটে বাহুর ওপর সমবেত ধাক্কায় চর্কিটা ঘুরতে থাকবেই। যদি কেউ বুদ্ধি করে জিনিষটাকে বেশ একটু বড় অথচ হাল্কা করে নিখুঁতভাবে তৈরী করতে পার, তবে প্রত্যেক বাহুর উপর হাল্কা কাগজের ছবি কেটে দাঁড় করিয়ে বা অন্য অনেক উপায়ে চিত্তাকর্ষক খেলার ব্যবস্থা করতে পার। গ. চ. ভ

ছোটদের চিঠি-পত্র

'ছোটদের পাতা'য় সহজ সহজ যেসব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা লেখা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য হলো তোমাদের মধ্য থেকে তরুণ বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করা। শুধু লেখাটুকু পড়েই জানবার আনন্দ লাভ করবে এটাই আমাদের অভিপ্রায় নয়। আমাদের অভিপ্রায়, তোমরা নিজেরা চেষ্টা করে এগুলো তৈরী করবে। একা না পারলেও সহপাঠীরা একসঙ্গে মিলে চেষ্টা করবে। প্রয়োজন মত বড়দের সাহায্য নেবে। কোন কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র ছোটদের বিভাগে পত্র যোগে বা দেখা সাক্ষাৎ করে জ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নিতে পার। এ বিভাগে বিজ্ঞানের এমন সব বিষয়েরই আলোচনা করা হবে, যা' তোমরা সহজেই বুঝতে পার এবং ইচ্ছে করলে নিজেরাই করতে পার।

গত মাসে ছোটদের পাতায় যে সব পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে বড়

ও ছোটদের অনেকের কাছ থেকে উৎসাহ ও আগ্রহের কথা শুনেছি এবং চিঠিপত্রও পেয়েছি। যেসব ছেলে মেয়েরা পরীক্ষাগুলো করে দেখেছে এস্থলে কেবলমাত্র তাদের নামই প্রকাশিত হলো। গেলবারে প্রকাশিত পরীক্ষাগুলোর সঙ্গে ছবি না থাকাতে অসুবিধার কথা অনেকেই জানিয়েছে। অনিবার্য কারণে প্রবন্ধের সঙ্গে সেবার ছবি দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নাই। যা হোক, সে অসুবিধাটা দূর করবার জন্যে, দেরী হলেও এবার সেই ছবিগুলো দেওয়া হলো। যারা ছবির জন্যে গেলবারের পরীক্ষাগুলো ঠিকভাবে করতে পার নাই, এই ছবিগুলো দেখে সেসব পরীক্ষাগুলো করবার চেষ্টা করবে।

যারা পরীক্ষাগুলো করেছে:—অসীম চট্টোপাধ্যায়, মিহির ভট্টাচার্য, সুনীল পাল, আরতি রায়, রেণুকা বসু, সুধাময় দত্ত, সুধারাণী, নিধু, মন্তু, দেবব্রত ব্যানার্জি, কল্যাণী, বীণা, রবীন দে, সমীর সেন, নলিনী কান্ত দে, শরদেন্দু রায়, কনক বিশ্বাস ও মিলনকুমার দাশগুপ্ত।

গত সংখ্যার 'ছেলেদের পাতা'র ছবি:—
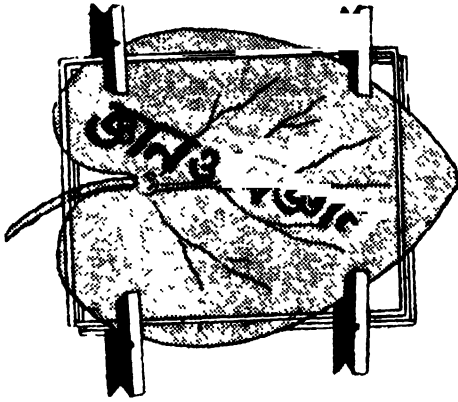
১নং চিত্র
গাছের পাতায় ফটোগ্রাফী

৩নং চিত্র
পাতার নাচন
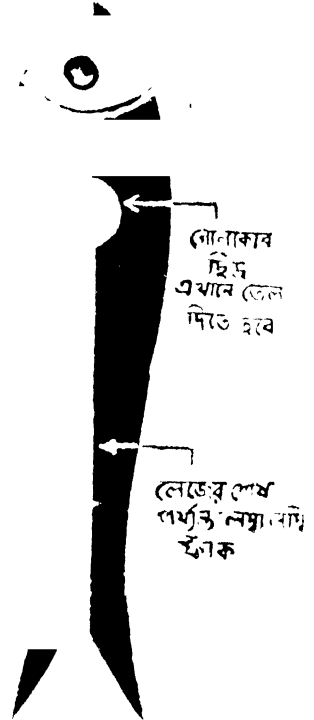
২নং চিত্র
কাগজের চলন্ত মাছ

পুস্তক পরিচয়

আমাদের খাদ্য :—লেখক শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী, ১৩৫৪। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ৯১ পৃ+ভূমিকা ও গ্রন্থকারের নিবেদন। মূল্য দশ আনা।

বাংলা ভাষায় চিত্তাকর্ষক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি লেখক হিসাবে ডক্টর হরগোপাল বিশ্বাসের নাম সুপরিচিত। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত লেখকের 'খাদ্যবিজ্ঞান' ভাষার প্রাঞ্জলতা ও তথ্যসন্নিবেশের সৌকর্যে অনেকের প্রশংসমান দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বর্তমান পুস্তক তাহার অবলম্বনে স্কুলের ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে।

বইখানিতে বৈজ্ঞানিকের বিশিষ্ট জ্ঞানের সহিত গৃহস্থের সাধারণ জ্ঞানের সুচারু সমন্বয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তথ্যবহুল বিষয়টিকে লেখক যেরূপ মনোজ্ঞ ভাষায় ও সরলভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে সুধী পাঠক মাত্রেই আনন্দিত হইবেন।

সামান্য ত্রুটি হিসাবে চোখে পড়িতেছে,—৭৩ পৃষ্ঠায় "নির্জলা চিনি বা গ্লুকোজ, বিশুদ্ধ কার্বোহাইড্রেট এবং বিশুদ্ধ ঘি বা চর্বিতে প্রায় ষোল আনা স্নেহ পদার্থ বিদ্যমান" বাক্যটি অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। ৪৯ পৃষ্ঠায় "জলের মধ্যে একটি পরিষ্কার টাকা বা রৌপ্যখণ্ড কিছু সময় রাখিলে সে জলের ব্যাধিজীবাণু নষ্ট হয় বলিয়া জানা গিয়াছে" কথাটি বিজ্ঞানসম্মত নয়।

এরূপ দু'একটি ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে বলা যায়, বইখানি সারগর্ভ, সুখপাঠ্য ও ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী। ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় কর্তৃক ১৯৪২ সালে লিখিত ভূমিকাটি দ্বারা লেখক পুস্তিকাখানির শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট ছাপা ও কাগজ, এবং বিরল ভ্রমপ্রমাদ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীজগন্নাথ গুপ্ত

নির্জ্ঞান মন—ডাঃ নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, এম্ এস্, সি, এম্ বি, বি এস্।

প্রকাশক—সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭নং পণ্ডিতিয়া প্লেস্, বালিগঞ্জ। মূল্য ২॥ টাকা।

ডাঃ নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'নির্জ্ঞান মন' মনোবিদ্যার একখানি সরল গ্রন্থ। বহু পর্যবেক্ষণের ফলে নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। নির্জ্ঞান মনের চিন্তাধারা কি ভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত করে তাহা অতিশয় রহস্যময় এবং জটিল। গ্রন্থকার নিজে একটি মানসিক রোগের হাসপাতালের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া মানসিক রোগ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। এগ্রন্থে তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতাপ্রসূত বহু গবেষণামূলক তথ্যের অবতারণা করিয়াছেন। গ্রন্থখানার ভাষা অতি সরল, স্বচ্ছ ও সাবলীল। আধুনিক মনোবিদ্যা যে কতখানি বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হইয়াছে এ গ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যায়। পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

সহজ অজৈব বিশ্লেষণ :—(Simple Inorganic Analysis) শ্রীবীরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী প্রণীত ও প্রকাশিত। ৩৬ পৃষ্ঠা, দাম বার আনা।

মধ্যমা পরীক্ষার (Intermediate) ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্যবহারিক রসায়ন বিদ্যার প্রথম পাঠের জন্য পুস্তিকাটি রচনা করা হইয়াছে। পিছনে ইংরাজীতেও বিষয়বস্তু আদ্যোপান্ত পুনর্লিখিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় রচনা সহজে বুঝা যায় না বলিয়া আমাদের এককালে বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অভিযান অন্যতম। লেখকও

বাংলায় এই পারিভাষিক পুস্তিকাটি রচনা করিয়া বিজ্ঞান পরিষদের উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান হইয়াছেন। লেখক স্বয়ং মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক; শিক্ষাদানে ও পরীক্ষা গ্রহণে উভয় বিষয়েই অভিজ্ঞ। শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক রসায়নের যে যে অংশ বিশেষ জানা প্রয়োজন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। পুস্তিকাটির ভাষায় আড়ষ্টতা নাই।

ইংরাজীতে যাহাকে ব্রাউন রঙ্ বলে তাহা দুই এক স্থলে তামাটে রঙ্ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার অনেক স্থলে বাদামী বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ব্রাউনকে বরং বাদামী রঙ্ বলা চলে, কিন্তু তামাটে বলা চলে না। ইংরাজি কনসেনট্রেটেড শব্দটির পরিবর্তে বাংলা গাঢ় শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। এদিকে ডেন্স ফিউমস্ = গাঢ় ধুঁয়া, আর ডীপ ব্লু—গাঢ় নীল বলা হইয়াছে এইভাবে ইংরাজি বিভিন্ন সমধর্মী শব্দের পরিবর্তে কেবল মাত্র গাঢ় প্রতিশব্দ ব্যবহার করায় অর্থবোধ তত সহজ হয় নাই। বরং অর্থানুসারে অন্যান্য শব্দ ব্যবহার করিলে সুখবোধ্য হইত বলিয়া মনে হয়। কয়েক স্থলে শব্দ বিন্যাস বেশ সুন্দর হইয়াছে। যেমন, লাল রঙের পাতলা আস্তর, অদগ্ধ গ্যাস, ছানার মত সাদা সিলভার ক্লোরাইড, বলয় পরীক্ষা ইত্যাদি। যাহা হউক পুস্তকটিতে বিষয় বস্তুর কোন ভুল নাই। আমরা নিঃসংশয়ে ইহা অনুমোদন করিতে পারি।

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

বিবিধ সংবাদ

কিছুদিন আগে পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় এই প্রদেশের ব্যাপক চিকিৎসা-ব্যবস্থা সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের এক পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ডে একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের কর্তৃত্বাধীনে চিকিৎসাকেন্দ্র পরিচালিত হবে। আগামী সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে কাজ আরম্ভ হতে পারে বলে আশা করা যায়। এই বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী জানিয়েছেন যে, সমগ্র প্রদেশে সরকার একটি ডেভেলপমেণ্ট বোর্ডের পরিকল্পনার কথা এবং সে সম্পর্কে আইন প্রণয়নের বিষয়ও চিন্তা করছেন। প্রতিটি পঞ্চায়েতে একজন অফিসার নিয়োগ করা হবে। শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতি বিধান করাই হবে এই অফিসারের কাজ। পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে এই অফিসার কাজ করবেন।

ইণ্ডিয়া ষ্টীমশিপ কোম্পানী ভারতে এই প্রথম ভারত-ইউরোপ জাহাজ সার্ভিস খুলেছেন। পশ্চিম বঙ্গের গভর্ণর ডাঃ কৈলাস নাথ কাটজু খিদিরপুর মেরিন ক্লাবে এই সার্ভিসের উদ্বোধন করেছেন।

ভারত সরকার যক্ষ্মারোগের বিস্তার প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে মাদ্রাজের অন্তর্গত গিডনিতে নতুন আবিষ্কৃত টিকা বি, সি, জি প্রস্তুত করবার ব্যবস্থা করেছেন। গিডনিতে এই টিকা প্রস্তুতের কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রদেশের কর্মীদের ওষুধ তৈরী এবং তার ব্যবহারের বিষয় শিক্ষা দেওয়া হবে। কলকাতার চিকিৎসকগণ বাংলার সর্বত্র তা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

যক্ষ্মার মত আর একটা কঠিন এবং দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় নতুন ব্যবস্থা হয়েছে। এই ব্যাধিটা হচ্ছে—ক্যান্সার। পশ্চিম বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে ক্যান্সার ইনষ্টিটিউটের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেছেন, ক্যান্সার চিকিৎসার আধুনিক সবরকমের সাজ-সরঞ্জাম, গবেষণাগার, হাসপাতাল

সহ এই ইনষ্টিটিউট গড়বার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই হাসপাতালে ১০০ টি বেড থাকবে, তার মধ্যে ৭০ টি থাকবে বিনা মূল্যের বেড।

লণ্ডনের খবরে প্রকাশ, বৃটেনে শীঘ্রই চীনাবাদাম থেকে 'আরডিল' নামে এক প্রকার কাপড় প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করা হবে। পশমী কাপড়ের যাবতীয় গুণই এই কাপড়ের থাকবে অথচ তাদের দোষগুলো থাকবে না। এই কাপড় পোকায় কাটবে না, ভাঁজও পড়বে না অথচ দেখতে হবে বেশ চকচকে ও নরম। কাপড়টা হবে পশমের মতই তাপ নিরোধক এবং যে কোন রঙে রঞ্জিত করা চলবে। তুলা বা রেয়নের সঙ্গে 'আরডিল' মিশিয়ে খুব সুন্দর ও টে কসই কাপড় তৈরী করা সম্ভব। রেয়ন ও 'আরডিল' মিশ্রণে তৈরী কাপড়ের গুণাগুণ প্রায় পশমী কাপড়ের মত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আলুর বীজ সরবরাহের জন্যে সাত হাজার ফুট উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে প্রায় দেড়শ একর জমিতে আলু চাষের ব্যবস্থা করেছেন। এদ্বারা প্রায় ৬ হাজার মণ বীজ পাওয়া যাবে এবং ৬ শ' একর জমিতে বোনা সম্ভব হবে। এর ফলে প্রায় এক লক্ষ মণ আলু উৎপন্ন হবার সম্ভাবনা।

ভারতের রাডার যন্ত্র নির্মাণ সম্পর্কে আগ্রা অর্ডন্যান্স ডিপোতে এই সর্বপ্রথম গবেষণা চলছে। ভারতের দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিং গত ২৬শে জুলাই আগ্রা অর্ডন্যান্স ডিপো পরিদর্শন করতে যান। সেখানে তাঁহাকে রাডার যন্ত্র দেখানো হয়।

রয়টারের খবরে প্রকাশ, গত ২৮শে জুন ভূমিকম্পে জাপানের পাঁচটি সহর ধ্বংস হয়ে গেছে। ভূমিকম্প এবং তারপর অগ্নিকাণ্ড ও বন্যার ফলে প্রায় ৩০ হাজার লোক, হয় মারা গেছে, না হয় হারিয়ে গেছে কিংবা আহত হয়েছে। ফুকুই সহরে ৮৫ হাজার লোকের বাস। ভূমিকম্পের ধাক্কায় এই সহরটি ধ্বংস হয়ে গেছে। এখানকার ৩ হাজার বাড়ী ধ্বংস এবং ৬৪ হাজার অধিবাসী গৃহহারা হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগার আছে সেগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবেই চলছিল। তাতে পরস্পরের সহযোগিতার তেমন কোন উপায় না থাকায় দেশের বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির খুব দ্রুত উন্নতি ব্যাহত হচ্ছিল। সম্প্রতি ভারত সরকার বিভিন্ন প্রদেশে যত বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান বা গবেষণাগার আছে তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত করেছেন। এরূপ একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হলে এবং তার মাধ্যমে সমস্ত প্রদেশের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত হলে দেশ সত্যই উপকৃত হবে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞানের লেখকদের প্রতি নিবেদন

১। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রবন্ধের জন্যে বিজ্ঞান সম্পর্কিত এমন বিষয়বস্তুই নির্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় জনসাধারণ যাতে সহজেই আকৃষ্ট হয়।
২। বক্তব্য বিষয় সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় বর্ণনা করাই বাঞ্ছনীয়।
৩। প্রবন্ধ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা প্রয়োজন। অন্যথায় প্রবন্ধ প্রকাশে অযথা বিলম্ব হতে পারে।
৪। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত প্রবন্ধ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ৪।৫ পৃষ্ঠার বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।
৫। বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত বানান অনুসরণ করাই বাঞ্ছনীয়।
৬। উপযুক্ত পরিভাষার অভাবে বিদেশী শব্দগুলোকে বাংলা অক্ষরে লেখাই বাঞ্ছনীয়।
৭। বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হবে না। টিকেট দেওয়া থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ পাঠানো হবে।
৮। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নিকট, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অফিস ৯৩, আপার সারকুলার রোডে পাঠাতে হবে।
৯। প্রবন্ধের সঙ্গে লেখকের পুরা ঠিকানা থাকা দরকার।

জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সবিনয় নিবেদন,

সমাজের বিজ্ঞান-চেতনা গঠন লক্ষ্যে রাখিয়া সমাজের কল্যাণে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রায় ছয়মাস হইল 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' স্থাপিত হইয়াছে। পরিষদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য জনগণের বৈজ্ঞানিক মানস ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করা। এতদুদ্দেশ্যে লোক-বিজ্ঞান গ্রন্থমালা প্রণয়ন করা, লোকপ্রিয় বৈজ্ঞানিক পত্রিকা পরিচালনা করা, লোকরঞ্জনী ছায়া ও আলোক-চিত্র সহকারে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা, স্থায়ী প্রদর্শনী স্থাপনা করা প্রভৃতি বহুবিধ অতীব প্রয়োজনীয় জাতীয় কর্তব্য সমাধান করার পরিকল্পনা পরিষদ গ্রহণ করিয়াছে। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, বাংলার বৈজ্ঞানিক সুধিমণ্ডলীর সাহচর্য ও সাহায্যে পরিষদ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিপুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এযাবৎকাল অর্থাভাবে আমরা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা ব্যতীত অন্য কোন কাজেই হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই।

লোকশিক্ষায় বিশেষতঃ বিজ্ঞান প্রচারে ফিল্ম ও ল্যান্টার্ন ছবি সহকারে বক্তৃতার কার্য-কারিতা সর্বজনবিদিত। দেশের এই যুগসন্ধিক্ষণে অনুরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব বিশেষভাবেই অনুভূত হইতেছে। পরিষদ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এই জাতীয় কর্তব্য সত্বর পালন করিতে সমধিক আগ্রহান্বিত হইয়াছে। তজ্জন্য প্রয়োজন মাইক্রোফোন, লাউড-স্পীকার, এপিডায়াস্কোপ ও সবাক-চলচ্চিত্র-প্রদর্শক যন্ত্র। যে সকল শিক্ষামূলক চিত্র পাওয়া যায়, আপাততঃ তাহাই হইবে আমাদের বিষয় বস্তু। কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে আমাদের দেশের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুগুলির সবাক চিত্র তোলা সম্ভব হয় তাহারই বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। সুতরাং প্রারম্ভেই আমাদের আবশ্যক অন্ততপক্ষে ২০,০০০ টাকা। দেশের এই অতি প্রয়োজনীয় ও আশুসম্পাদ্য কর্তব্য পালন করবার দায়িত্ব সমগ্র দেশবাসীর। তাই আমাদের বিনীত অনুরোধ, দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রই যেন যথাসাধ্য চাঁদা পাঠাইয়া আমাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিতে সাহায্য করেন। আমরা আশা করি এক মাসের মধ্যেই এই অর্থ আমাদের নিকট পৌছিবে।

স্বাঃ—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

নাম ও ঠিকানাসহ চাঁদা নিম্ন ঠিকানায় ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে—

অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
৯২, আপার সারকুলার রোড। কলিকাতা

সকল কাজে তার ক্ষমতা অনুভূত হওয়ার প্রয়োজন স্থাবধা এই যে এতে স্থানাদষ্ট এবং নগদ আয়ের

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

প্রথম বর্ষ আগষ্ট—১৯৪৮ অষ্টম সংখ্যা

বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ জীবিকা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান

শ্রীহীরালাল রায়

"বাঙ্গালী জাতি চাকরী ব্যবসায়ী" এই দুর্ণাম আমাদের বহুদিন যাবতই আছে এবং আমরা এই জন্য সময় সময় লজ্জাও অনুভব করি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালীর এই অপযশ দূর করাবার জন্য অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন এবং বক্তৃতা দিয়েছেন। বক্তৃতায় বিশেষ ফল হয়েছে বলে মনে হয় না; চাকরী যখন আর পাওয়া যাচ্ছে না তখনই বাঙ্গালী ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটে এবং নানা কারখানায় ঘুরতে আরম্ভ করেছে। বৃটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই বাঙ্গালীর চাকরীবৃত্তি আরম্ভ হয়েছে। তার আগে সকলেই জাতিগত বা বংশগত বৃত্তি নিয়ে থাক্‌তো; বহুলোক নিয়ে কোন বিশেষ কারখানা ছিল না সুতরাং চাকরীর বিশেষ চলন ছিল না। জমিদারী বা বাণিজ্যই ধনীলোকের ধন জোগাতো। বাণিজ্যে অর্থোপার্জন হয় কিন্তু সৃষ্টির আনন্দ তাতে নেই।

ইংরাজ রাজত্ব যখন আরম্ভ হলো তখন রাজত্ব চালাবার এবং তাকে স্থায়ী করবার জন্য একটা বিরাট প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হলো। ইংরাজ-পূর্ব ভারতবর্ষে রাজা রাজত্ব করতেন. কিন্তু তিনি দেশের সকল কাজে তাঁর ক্ষমতা অনুভূত হওয়ার প্রয়োজন মনে করতেন না। শাসন অনেক সময়েই অত্যন্ত শিথিল এবং শৃঙ্খলাবিহীন ছিল। এই শৈথিল্য দূর করতে এবং নিয়মানুবর্তিতা আনতে একটি বিরাট অনমনীয় শক্ত কাঠামো খাড়া করতে হলো। রাজত্ব পড়লো ব্যবসায়ীর হাতে; হিসাব নিকাশ এবং লাভ লোকসানের প্রতি দৃষ্টি পড়লো। এই কাঠামো ঠিক রাখতে নানা রকমের লোকের দরকার হলো—এবং তাদের বিদেশীয় ভাষা জানতে হবে। কলকাতা এবং বাংলাদেশ ইংরাজের প্রথম শাসন স্থল; কাছে যারা থাকে তারাই প্রথম প্রসাদ পায়। বাঙ্গালী আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, মোঙ্গল সকল জাতির সমাবেশে সৃষ্ট, সেইজন্য আমরা বাঙ্গালীরা সহজে যে কোন অবস্থার মধ্যে অপেক্ষাকৃত কমক্লেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারি। ইংরাজী প্রথায়, নিজেদের চালাতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। রাজ্য বিস্তারের এবং বন্দোবস্তের জন্য ইংরাজ যে দিকেই অগ্রসর হয়েছে বাঙ্গালীও তাদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে। এই ভাবেই বাঙ্গালী চাকুরীজীবি হয়ে পড়েছিল। চাকুরীর সুবিধা এই যে এতে সুনির্দিষ্ট এবং নগদ আয়ের

ব্যবস্থা আছে এবং দায়িত্বও কম। স্বাধীন ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে চব্বিশ ঘণ্টার খাটুনি এবং চিন্তা; চাকরীতে নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিশ্রম এবং দায়িত্ব। অধিকাংশ লোকেরই চাকরীতে লোভ, কারণ এটা সাধারণ মানবধর্মের অনুকূল। পৃথিবীতে অধিকাংশ লোকেই চাকরী করে। এক-জনের ব্যবসায়ে বা শিল্পে বহুলোক জীবিকা উপার্জন করে। চাকরী যদি করতেই হয় তবে সরকারের চাকরীই ভালো। চাকরীতে লোভ আছে বলে আমাদের লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমাদের মত অবস্থায় পড়লে অনেকে মত বদ্‌লাতো এবং অনেকেই আমাদের পন্থা অবলম্বন করতো।

এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে; ইংরাজী শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু সরকারী চাকরী আর সুলভ নয়। যারা চাকরী করে নাই, ব্যবসা করেছে তারাই দেখছি ধনী এবং বিত্ত-শালী। এখন আমরা ভাবছি যে, ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্পেই ধনলাভ হয় সুতরাং ঐ দিকেই যাওয়া উচিত। কতকটা নিরুপায় হয়ে, এবং কতকটা লোভে পড়ে আমরা ব্যবসা বাণিজ্য এবং শিল্প-কর্মে নামতে চাচ্ছি। "স্বাধীন" ব্যবসাতে স্বাধীনতা কতটুকু আছে জানি না; ব্যক্তিবিশেষের অধীন না হয়ে অনির্দিষ্ট বহুলোকের অধীন হতে হয়।

আগেই বলেছি ব্যবসা বা বাণিজ্য দ্বারা কোন নূতন জিনিষের সৃষ্টি বুঝায় না; এটা জিনিষ কেনা-বেচার ব্যবস্থা। উৎপাদনকারী এবং ব্যবহার-কারীর মধ্যে জিনিষ যতবার হাত বদ্‌লাবে তার দাম তত বাড়বে। এতে ব্যবহারকারীরই লোকসান। মনে করুন, কাপড়ের কল থেকে মালিক যে দরে কাপড় বিক্রী করে, তারপর কত ব্যবসায়ীর হাত দিয়ে সে কাপড় সুদূর পল্লীর লোকের হাতে গিয়ে হাজির হয়। যত জনের হাত দিয়ে গিয়েছে তাদের প্রত্যেকেই কিছু কিছু লাভ করেছে এবং সেই লাভের টাকা শেষ পর্য্যন্ত সেই পাড়াগাঁয়ের ক্রেতা-টিরই দিতে হয়েছে; অন্য সকলেই কম দরে কিনে কিঞ্চিৎ বেশী দরে বেচেছে। এই মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীর সংখ্যা যত কমানো যাবে ব্যবহারকারীর ততই কম দাম দিতে হবে। জাপানী জিনিষের দাম খুব কম। অনেকের মতে এর নানা কারণের মধ্যে নিম্নলিখিত কারণ কয়েকটীও বর্তমান:—(১) প্রস্তুতকারক এবং ব্যবহারকারীদের মধ্যে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী বেশী নাই; (২) সমস্ত ব্যবসা বানিজ্য এবং শিল্প সমস্ত দেশের মধ্যে মাত্র নয় দশটি পরিবার বা কোম্পানীর মধ্যে আবদ্ধ, এই জন্য প্রতিযোগীতা নাই; (৩) প্রতিযোগীতা না থাকায় বিজ্ঞাপনের খরচও নাই। জাপানী জিনিষ আমাদের দেশে খুব আমদানী হতো কিন্তু তার বিক্রীর জন্য বিজ্ঞাপনের বহর বেশী দেখা যায় নাই একমাত্র "আসাহি বিয়ার" ভিন্ন।

আমাদের দেশে যত ধনীলোক দেখতে পাই তাদের অধিকাংশই ব্যবসা করে' টাকা করেছে, কোন জিনিষ উৎপন্ন বা প্রস্তুত করে নয়। শিল্প-কারখানা আমাদের দেশে বেশী নাই। চল্লিশ বৎসর আগেও কাপড়ের কল, পাটের কল, চা বাগান ভিন্ন আমাদের বাংলা দেশে কোন বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠান ছিল না—এ সকলেরও বেশীর ভাগ বিদেশী বা অ-বাঙ্গালীর হাতেই ছিল। স্বদেশীর যুগে দেশপ্রেমের প্রেরণায় অনেক কল-কারখানার চেষ্টা আমরা করেছিলাম, কিন্তু তাদের একটীও বোধহয় এখন বর্তমান নাই—অন্ততঃ প্রথম প্রতিষ্ঠাতাদের হাতে নাই। কল-কারখানার কাজে বা শিল্পে অভিজ্ঞতা, ব্যবসাবুদ্ধি কিছুই আমাদের ছিল না। প্রায় ত্রিশবৎসর আঘাত খেয়ে নানা প্রকার লোকসান দিয়ে কতকটা অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি। যাঁরা তখনকার দিনে শিল্প-কারখানার কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন দেশনেতা, উকীল, ব্যারিষ্টার, জমিদার বা ডাক্তার। ব্যবসায়ের বুনিয়াদ তাদের কারুর বংশে বা রক্তে ছিল না। এই ত্রিশ বৎসর নানা প্রকার লোকসান দিয়ে যাকে ত্যাগস্বীকারও বলা

যেতে পারে—আমরা কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। এই অভিজ্ঞতার উপর ভরসা করে আমরা এখন নানাপ্রকার ব্যবসায়ে বা শিল্পে শক্তি এবং সামর্থ্য নিয়োগ করতে চাই।

ব্যবসা আমরা সকল রকমই করতে পারি কিন্তু তাতে দেশের প্রত্যক্ষ উন্নতি কি হবে? তেজারতি ও মহাজনি করেও লোকে ব্যক্তিগত ভাবে টাকা রোজগার করেছে। ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স কোম্পানি, দালালি, আমদানি, রপ্তানি সকল কিছুতেই আমরা শক্তি নিয়োগ করতে পারি, কিন্তু তাতে নূতন কিছু উৎপন্ন করবো কি? টাকায় টাকা প্রসব করবে, কিন্তু সুক্ষ্মভাবে দেখতে গেলে তাতে দেশের কোন লাভ নেই।

উৎপাদনকারী শিল্পে আমাদের হাত দিতে হবে। সকল প্রকার জিনিষই কি আমরা তৈয়ার করবো? ভারতবর্ষ—বিশেষ করে বাংলাদেশে অনেক রকম কাঁচা মালের অভাব। কোন্ কোন্ জিনিষ আছে এবং কোন্ জিনিষ নাই সে সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান সুস্পষ্ট নয়; কারণ ভূগর্ভে বা বনেজঙ্গলে কোন্ কোন্ জিনিষ কি রকম পরিমাণে আছে এবং তাদের ব্যবহার যোগ্যতা কতটা তা' আমরা এখনও ভাল রকম পরীক্ষা করি নাই।

কোন ব্যক্তিবিশেষের বা কোম্পানীর কি লাভ হবে তা' না ভেবে জিনিষের দাম কি দ্বারা নির্দ্ধারিত হবে এবিষয়ে নানা রকম নূতন মতের সৃষ্টি হয়েছে। একটি মত বিজ্ঞানীদের কাছে বেশ ভাল মনে হবে। পৃথিবীতে সর্বসমেত যত মৌলিক পদার্থ আছে তার পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি আমরা করতে পারি না। মাতা বসুন্ধরা মৌলিক পদার্থ যা দিয়েছেন তার পরিমাণ সুনির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তনীয়; আমরা তা' উদ্ধার করি এবং নানা প্রকার প্রক্রিয়া দ্বারা তা' থেকে নূতন নূতন জিনিষ তৈরী করি। সুতরাং কোন জিনিষ তৈয়ার করতে প্রস্তুতকারকদের (বিজ্ঞানী, শিল্পী, রাসায়নিক' ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞ এবং অবিশেষজ্ঞ মজুরদের) যে পরিশ্রম করতে হয় তাই দিয়ে প্রত্যেক তৈরী জিনিষের প্রথম মূল্য নির্দ্ধারণ করা উচিত। বাজারে এই সকল জিনিষ অনেক বেশী দরে বিক্রীত হয়, কারণ মূলধনকারীরা, মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীরা, এবং অন্যান্য অনেকে এর থেকে অর্থোপার্জন করেন।

এই পত্রিকারই দ্বিতীয় সংখ্যায় একটী প্রবন্ধে শ্রীরুক্মিণীকিশোর দত্ত রায় এবং শ্রীসুধাংশুরঞ্জন দত্ত আমাদের দেশে কি কি খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় তা' জানিয়েছেন। অবস্থা সন্তোষজনক নয়। লোহা ভিন্ন আর কোন প্রধান প্রয়োজনীয় ধাতুদ্রব্য (যথা তামা, দস্তা, টিন, সীসা, নিকেল, রূপা, পারদ, ইত্যাদি) আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় না, বা তাদের আকর নাই। দেশের আয়তন এবং লোক সংখ্যার তুলনায় কয়লা বা খনিজ তেলও যথেষ্ট নাই।

সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা বাংলা দেশ পলি-মাটীতে গড়া, তাতে কয়লা ভিন্ন আর কোন খনিজ পদার্থ নাই বললে অত্যুক্তি হবে না। লোহার কারখানা একটি আছে কিন্তু তাতে বাংলাদেশের চাহিদারই পূরণ হয় না। কয়লা পাওয়া যায় কিন্তু ধাতু খনিজ এই প্রদেশে নাই সুতরাং ধাতু নিষ্কাষণের কোন কারখানা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করা বিশেষ বিবেচনা-সাপেক্ষ।

তুলা বাংলাদেশে উৎপন্ন হয় না অথচ প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) পরে অনেকগুলি কাপড়ের কল খোলা হয়েছে। অন্য প্রদেশ থেকে রেল গাড়ীতে তুলা আনিয়ে কাপড় তৈরী হয়। বোম্বাই, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে যে রকম নানাপ্রকারের ভাল কাপড় তৈরী হয় আমাদের এই প্রদেশে তা' হয় না।

কাচের, সাবানের এবং তেলের কল অনেক গুলি আছে কিন্তু কোনটাই খুব বড় নয় এবং জিনিষ যা' তৈরী হয় তাও খুব ভাল নয়। কাচের জন্য কাঁচামাল—বালি, চূণাপাথর, সোডা—কোনটাই

বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। সাবানের জন্য কাঁচামাল—তেল, চর্বি, কষ্টিক সোডা, গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি বাইরে থেকে আনতে হয়। তৈল বীজ বাংলাদেশে বিশেষ জন্মায় না—চীনা বাদাম, নারিকেল, তুলার বীজ, মহুয়া, সর্ষে, তিল, তিসি প্রভৃতি সকলই, হয় বীজাকারে অথবা তৈলাকারে বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। প্রাদেশিকতা যেরকম তীব্র আকার ধারণ করছে তাতে এই অভাব কিরকম ভাবে অতিক্রম করা যায় তা' ভাবা উচিত। বাংলা দেশের কাঁচামালের অভাবের কথা বলা হলো। অনেকে বলতে পারেন যে এইরকম কাঁচা মালের অভাব সত্বেও ইংলণ্ড, জার্মানি এবং জাপান শিল্পজগতে উচ্চস্থান অধিকার করেছে। আমেরিকা এবং অন্যান্য অনেক দেশ-বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করে অনেকে শিল্প কারখানা চালায়। বাংলাদেশে তা' করা যায়না এরকম ধারণা করা উচিত নয়; কিন্তু এর সুবিধা, অসুবিধা, আয়ের সম্ভাবনা ইত্যাদি খুব ভাল করে হিসাব করা উচিত। কাঁচামালের যে দাম দিতে হয় তার তুলনায় প্রস্তুত দ্রব্যের মূল্য যদি বেশী হয়, কাঁচামালের সরবরাহের বাধা উপস্থিত হওয়ার যদি সম্ভাবনা না থাকে এবং অন্ততঃ দুচার মাসের উপযোগী কাঁচামাল গুদামে সর্বদা মজুত রাখার মতো পুঁজি যদি থাকে, তবে কাঁচামাল দেশে না থাকা সত্বেও কারখানা খোলা যায়।

বড়রকমের কাগজের কল বাংলা দেশে চারটী আছে; কিন্তু তাদের কাঁচামাল—বাঁশ, সাবাই ঘাস, কাঠের মণ্ড বাইরে থেকে এনে কারখানা চালাতে হয়।

বর্তমান বাংলা দেশে চিনি বা সিমেণ্ট্ তৈরী হয়না, চূণাপাথরের খনি নাই। চীনামাটির জিনিষ তৈরীর কারখানা আছে কিন্তু চীনামাটি নাই—এই শিল্পের জন্য যে সকল কাঁচামাল দরকার হয়, তার মধ্যে একমাত্র কয়লা আমাদের আছে।

এই সকল অভাব দেখিয়ে ভয় বা হতাশার সৃষ্টি করা আমার উদ্দেশ্য নয়। যে সকল কারখানা আছে বা চলছে তাতেই প্রমাণ হচ্ছে যে, মালিকরা লাভ করছেন এবং এই রকম কাজ সাধারণতঃ চলতে পারে। ভবিষ্যতে প্রতিযোগিতা তীব্রতর হবে, এইজন্য এখন থেকেই খুব সাবধান হয়ে হিসাব করা উচিত। অন্যান্য দেশে যে মাল যে দরে বিক্রয় হয় আমাদের কারখানা গুলিরও সেই দরে বাজারে দেওয়ার মত করে জিনিষ তৈয়ার করা উচিত। সরকারের কাছে সর্বদা আবেদন নিবেদন দ্বারা রক্ষার দাবী করে আমদানি শুল্ক বাড়ালে ক্রেতাকেই সেই টাকা দিতে হয়। শিল্পের প্রথম অবস্থায় এই রক্ষা কবচ সরকার দিতে পারে কিন্তু বেশী দিনের জন্য তার দাবী করলে সাধারণেরই ক্ষতি।

এখন চিন্তার বিষয় বাংলাদেশে কোন্ কোন্ বা কি রকমের শিল্প চলতে পারে।

আমার কোন এক বিশেষজ্ঞ—এঞ্জিনিয়ার বন্ধু বলেছেন যে, ভারতবর্ষের সমস্ত এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার শতকরা আশিভাগই কলকাতার চারদিকে এবং পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। বন্ধুটি বোম্বাইএর অধিবাসী এবং কলকাতার একটি প্রধান শিল্প বাণিজ্য কোম্পানীর বড় এঞ্জিনিয়ার। একটু ভাবলেই দেখবেন যে, তাঁর এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার কারণ নাই। এতদিন এই সত্য আমরা উপলব্ধি করি নাই, কারণ বড় বড় এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিগুলির প্রায় অনেকই বিদেশীর হাতে। বাংলাদেশে যতদিন তারা আছে ততদিন এগুলি দেশেরই ভাবা উচিত। কলকব্জার কারখানা ব্যাঙ্কের টাকা নয় যে হঠাৎ রপ্তানি হয়ে বিদেশে চলে যাবে। এগুলি পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে আমাদেরই কাজে লাগবে। বাংলাদেশে এই ধাতু নির্মিত কলকব্জা এবং জিনিষ তৈরীর কারখানা আরো বিস্তার লাভ করতে পারে। এখন পর্যন্ত আমরা বেশীর ভাগ জিনিষ ঢালাই লোহা, সাধারণ ইস্পাত, পিতল, কাঁসায় তৈরী করি; য়্যালুমিনিয়ামের

জিনিষও কিছু কিছু হচ্ছে। আমাদের দেশে বিশেষ বিশেষ ধাতুসঙ্কর বা মিশ্র ধাতু তৈয়ার করতে হবে। বর্তমান যুগকে অনেকে মিশ্র ধাতুর এবং প্ল্যাষ্টিকের যুগ বলেন। নানা প্রকার রাসায়নিক সংযোগে বিভিন্ন চাপে এবং তাপমানে বিভিন্ন প্রক্রিয়া সাধিত হয়। এতদিন সাধারণ ধাতুতে সাধারণ কাজ চলতো, এখন কাজও হয়েছে অসাধারণ সুতরাং সরঞ্জামও হয়েছে অসাধারণ। অনেক যন্ত্রপাতিতে বিশেষ বিশেষ গুণ সম্পন্ন ধাতুদ্রব্যের দরকার। এই সকল দাবী মেটাবার জন্য সহস্রাধিক রকমের মিশ্র-ধাতুর সৃষ্টি হয়েছে। গত মহাযুদ্ধের সময় জামশেদ-পুরে, ভদ্রাবতীতে, এবং জামালপুরে কয়েক রকমের লৌহজড়িত মিশ্রধাতু তৈরী হয়েছিল। যুদ্ধোত্তর বাজারে তা' বিক্রয়ের জন্য এখনও হাজির হয় নাই। এইজন্য মনে হয় যে, হয়ত প্রতিযোগিতায় দরে এবং গুণে এগুলি দাঁড়াতে পারছেনা। কাঁচামালের দামের তুলনায় এই মিশ্রধাতুর দাম বেশ বেশী। দুই দামের প্রভেদের অনেকটা বিশেষজ্ঞের বিদ্যা এবং কৃতিত্বের জন্য দিতে হয়। প্রকৃতিদেবী কাঁচামাল বিষয়ে আমাদের প্রতি কৃপা করেন নাই; কেউ কেউ বলেন যে, বাঙ্গালীকে বুদ্ধি দিয়ে সেই কৃপণতার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। এই বিদ্যা-বুদ্ধি এবং বিশেষ জ্ঞান দিয়েই আমাদের জীবিকা উপার্জন করতে হবে। অনেক সময়ে মনে হয় বাঙ্গালীর এই বুদ্ধি হয়ত ক্ষুরধারের মতো, এতে মোটা কাজ চলে না। শিল্প ব্যবসায়ে সফল হতে হ'লে বুদ্ধির ধারও চাই, ভারও চাই।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের মধ্যে বর্তমান পশ্চিম বাংলায়ই লোকের সকলের চেয়ে ঘন বসতি। এই রকম ক্ষেত্রে চাষ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে হলে তাতে হয়ত কোন প্রকারে জীবনধারণ হতে পারে, কিন্তু সুখ, শান্তি বা আনন্দ থাকবে না। সুতরাং অল্প সংখ্যক লোকের হাতে যন্ত্র এবং সার দিয়ে চাষ করার জন্য অনেক পরিমাণে জমি দিয়ে বাকী লোকদের শিল্পে, ব্যবসায়ে এবং বাণিজ্যে নিযুক্ত হতে হবে।

আগেই বলা হয়েছে যে, বাংলা দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য কাঁচামালের সংস্থান বিশেষ নেই। আমাদের এই রকম শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ গড়তে হবে যার কাঁচামাল আমাদের আছে, অথবা যে সকল শিল্পে প্রস্তুত মালের দামের তুলনায় কাঁচামালের দাম খুব কম এবং যে সকল শিল্পে বিশেষ বিদ্যা, বুদ্ধি, কুশলতা, এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

আমাদের দেশে কাচামাল যা আছে তা হচ্ছে— আকাশের বায়ু, নদী ও সমুদ্রের জল, এবং কয়লা। সমুদ্রের জলে নানাবিধ জিনিষ আছে কিন্তু বাংলা দেশের সমুদ্রতটের যে অবস্থা তাতে সমুদ্রের জল রৌদ্রে শুকিয়ে তা' থেকে নানাপ্রকারের লবণ উদ্ধার করা লাভজনক হবে কি না, এই বিষয়ে অনেকের সন্দেহ ছিল। নদীবহুল বাংলা দেশের সমুদ্রতীরের নিকটবর্তী জল পাতলা হয়, লবণ বেশী থাকে না; বৃষ্টি এত বেশী হয় যে, রৌদ্রে তা' শুকাবার ব্যবস্থা করা কঠিন। এত অসুবিধা সত্ত্বেও অনেকের ধারণা যে পাইপ লাইন বসিয়ে পাম্প্ করে সমুদ্রের জল দূরে নিয়ে লবণ উদ্ধারের ব্যবস্থা করা যায়। খনিজ তেল অনেক দেশে হাজার হাজার মাইল এই রকম ভাবে নিয়ে যায়। সম্প্রতি খবরের কাগজে পড়া গিয়েছে যে, মেদিনীপুরের কোন কোন জায়গায় লবণ উদ্ধারের ব্যবস্থা করা সম্ভব। শুধু আমাদের খাওয়ার নুন নয়, অন্যান্য অনেক প্রকারের লবণ সমুদ্র জল থেকে পাওয়া যেতে পারে—বিশেষ করে ক্যাল্সিয়াম্, ম্যাগ্নেসিয়াম্ এবং পটাসিয়াম ধাতুর লবণ। আমরা যে লবণ খাই তা' থেকে কষ্টিক্ সোডা, ক্লোরিন্, হাইড্রোজেন, সোডিয়াম্ ক্লোরেট্, হাইপোক্লোরাইড, ব্লিচিং পাউডার ইত্যাদি অনেক জিনিষ পেতে পারি। দামোদর নদের প্রস্তাব কার্যে পরিণত হ'লে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ হেতু তখন তার চারদিকে বিদ্যুৎ-রাসায়নিক এবং বিদ্যুৎ-তাপিত অনেক শিল্প গড়ে

উঠতে পারে। পূর্বে যে' ধাতুসঙ্কর বা মিশ্র ধাতুর কথা বলেছি সে সকল বিদ্যুৎতপ্ত চুল্লীতেই ভাল তৈরী হয়। অনেক সময় ভাবি যে, প্রত্যেক বিদ্যুৎ-রাসায়নিক বা বিদ্যুৎ-তাপিত শিল্পেই গ্র্যাফাইট ইলেক্ট্রোডের দরকার হয় তথাপি আমাদের দেশে এ জিনিষ এতদিন তৈরী হয় নাই কেন? আশা করি এবার হবে।

আমাদের দেশে ধাতু খনিজের খুব অভাব। য়্যালুমিনিয়াম তৈরীর কাঁচামাল আমাদের আছে। যা' নাই তা' তৈয়ার করা যায়। ক্রমশঃ তামা, পিতল, কাঁসা, ইত্যাদির স্থান য়্যালুমিনিয়াম্ ও তার সঙ্কর ধাতুগুলি নিবে। য়্যালুমিনিয়াম্ তৈরী করতে মোটা খরচ হয় বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং গ্র্যাফাইটের জন্য। সে সমস্যার এক সঙ্গেই সমাধান হবে।

আকাশের বাতাস থেকে নাইট্রোজেন এবং জল ও কয়লা থেকে হাইড্রোজেন্ নিয়ে আমরা য়্যামোনিয়া ও তার লবণ সমূহ তৈরী করতে পারি। গন্ধক আমাদের দেশে নাই বললেই চলে সুতরাং সাল্‌ফিউরিক্ য়্যাসিডের ব্যবহার এড়িয়ে চলাই আমাদের উচিত। পৃথিবীতে যত সাল্‌ফিউরিক্ য়্যাসিড্ তৈরী হয় তার একটা মোটা অংশই জমির সার তৈরী করতে খরচ হয়। আমাদের দেশে নাইট্রোজেন সার তৈরী করতে মাছের তেলে মাছ ভাজতে হবে, অর্থাৎ য়্যামোনিয়ার কতকাংশ দিয়ে নাইট্রিক য়্যাসিড্ তৈরী করে তাই দিয়ে য়্যামোনিয়াম নাইট্রেট করতে হবে, অথবা সিন্ধ্রি প্রস্তাবের মত জিপ্‌সাম্ এর সাহায্যে য়্যামোনিয়াম্ সাল্‌ফেট্ করতে হবে। এই সকল বিস্তৃত বিবরণের দরকার নাই। আসল কথা দামোদর নদের চারপাশে কয়লার খনিম কাছে নিকট ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পক্ষেত্র গড়ে উঠবে।

কয়লা আমাদের একটী বিশেষ সম্পদ অথচ এই সম্পদ আমরা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নষ্ট করছি। লোকসংখ্যার তুলনায় এর প্রাচুর্য বেশী নয়, সুতরাং আমাদের খুব হিসাব করে খরচ করতে হবে। কাঁচা কয়লা থেকে বহু জিনিষ উদ্ধার করা যায়; এবং এই সকল নিষ্কাশিত জিনিষ থেকে অসংখ্য প্রকারের জিনিষ প্রস্তুত হয়। কাঁচা কয়লা জ্বালিয়ে ফেললে এই সকল হারাতে হয়। এই বিষয়ে আগে অনেক লোকে অনেক লিখেছেন সুতরাং পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। কাঁচা কয়লা পোড়ানো আইন প্রণয়ন দ্বারা নিষেধ করা উচিত। কাঁচা কয়লা বায়ুহীন পাত্রে গরম করলে কতকগুলি জিনিষ বাষ্প হয়ে আসে এবং পাত্রে কোক্ পড়ে থাকে। বাষ্পীয় জিনিষ গুলি থেকে অসংখ্য প্রকারের জিনিষ পাওয়া যায়।

শুধু কাঁচা কয়লাকে কেন্দ্র করে বিশাল শিল্প ক্ষেত্র গড়ে উঠতে পারে।

সমুদ্রের জল, আকাশের বায়ু এবং খনির কয়লা থেকে যে সকল শিল্প গড়া যায় তার জন্য মূল ধনের দরকার হয়। প্রথমতঃ যে সকল জিনিষ তৈরী হয় সেগুলি হচ্ছে অন্যান্য শিল্পের ভিত্তি, সুতরাং এই প্রাথমিক জিনিসগুলি সস্তায় তৈরী এবং বিক্রী হওয়া উচিত। তা হলেই এদের উপর নির্ভর করে ছোট আকারে অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই জন্য ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি এই শিল্পগুলিকে জাতীয় শিল্পে পরিণত করার পরামর্শ দিয়েছিলেন কিন্তু বর্তমান গভর্ণমেণ্ট ধনিকদের বিরাগভাজন হওয়ার এবং ভারতীয় শিল্পোন্নতিতে বাধা পাওয়ার ভয়ে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেছেন। অন্যান্য ধনিকসম্প্রদায় শাসিত দেশে মূলধনের উপর শতকরা পাঁচ থেকে দশ টাকা লাভে শিল্প প্রতিষ্ঠান চালিত হয় কিন্তু আমাদের দেশে অত্যধিক পরিমাণে লাভ না থাকলে ধনিকসম্প্রদায় সন্তুষ্ট হন না। ছলে, বলে, কৌশলে এই লাভ তাদের রাখতেই হবে। ভারতে শিল্পোন্নতির ভবিষ্যৎ কি জানি না। যাই হউক এরকম ভাবে ভরসা পেয়েও যদি ধনিকসম্প্রদায় আপাতঃ প্রচুর লাভের লোভ না করে দূরদৃষ্টির সঙ্গে এই সকল শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেন তবু আমরা আনন্দিত হবো।

বাংলা দেশের শিল্প ও বাঙ্গালীর জীবিকা সম্বন্ধে যা বলা হলো তার সারমর্ম হচ্ছে—

চাকরী ঘৃণার জিনিষ নয়। যদি গুণ থাকে তবে আত্মসম্মান বজায় রেখেও চাকরী করা যায়। অন্যান্য দেশেও বেশীর ভাগ লোকই চাকরী করে। মানুষের স্বাধীনতা আপেক্ষিক; সম্পূর্ণ স্বাধীনতা কোন সামাজিক জীবের থাকতে পারে না। আমাদের দেশেও বেশীর ভাগ লোকই চাকরী করবে কিন্তু আর্থিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রথার যে রকম পরিবর্তণ হচ্ছে তাতে চাকরীবৃত্তি আগের মতো হীন হবেনা।

(২) বাংলা দেশে, বিশেষতঃ বৃহত্তর কলিকাতা সমেত পশ্চিম বাংলায় লোকের বসতি খুব ঘন। এত লোকের জীবিকা জমি থেকে আসতে পারে না। সুতরাং অনেককেই শিল্পপ্রতিষ্ঠানে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবেশ করতে হবে। বর্ত্তমান জমি বণ্টন এবং অধিকার প্রথার পরিবর্তণ করতে হবে। অল্প-সংখ্যক লোক অধিকতর জমি নিয়ে সার এবং কলের সাহায্যে জমি চাষ করবে। জল সেচনের এবং বন্যা নিবারণের উন্নততর ব্যবস্থা থাকবে। চাষোপজীবিরাও অন্য চাকুরেদের ন্যায় ভাল রোজগার করবে।

(৩) বাংলা দেশে কোন্ কোন্ শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং বিস্তার সম্ভব?

(ক) বাংলা দেশে কাঁচামালের অভাব খুব বেশী। এইজন্য এরকম শিল্প প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে বিদ্যা বুদ্ধি এবং যান্ত্রিক কুশলতা খুব বেশী দরকার। তৈরী মালের দাম কাঁচামালের দামের চেয়ে অনেক বেশী হওয়া চাই।

(খ) এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশে অনেক বেশী আছে। এই ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করতে হবে। নানা প্রকার কল, যন্ত্র, পরিমাপক যন্ত্র, বৈদ্যুতিক, মোটর, ডাইনামো, ট্র্যান্সফর্মার, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার পাত্র ইত্যাদি প্রস্তুত করতে আরম্ভ করা উচিত। এই শিল্পের জন্য নানাপ্রকার ধাতুসঙ্কর বা মিশ্র ধাতু তৈয়ার করা দরকার। কাচের যন্ত্রপাতি আমাদের দেশে খুব কম হয়; উন্নততর এবং নানাবিধ কাচ এবং তা' থেকে কাচের জিনিষ তৈরী হতে পারে। চীনামাটির বাসন, যন্ত্র এবং পাত্র সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। উচ্চতাপসহ কাঁচামাল আমাদের দেশে আছে। প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে এর থেকে তৈরী জিনিষ চুল্লী গড়তে, পাত্র বানাতে, নল গড়তে, নানাপ্রকার ইট বানাতে দরকার হয়। এই শিল্পের ভবিষ্যৎ খুব ভাল

(গ) আকাশের বায়, সমুদ্রের জল, এবং কয়লার কথা পূর্বে বলেছি। এর থেকে বহুল পরিমাণে অনেক শিল্পের প্রাথমিক জিনিষগুলি পাওয়া যায় এবং পরে এ থেকেই নানা প্রকার রাসায়নিক জিনিষ, ঔষধ, রং ইত্যাদি তৈয়ার করার শিল্প গড়ে উঠবে। বাঙ্গালীর কৃষ্টি, শিক্ষা, দীক্ষা, মানসিক উৎকর্ষতা (অন্য প্রদেশ-বাসীরা এ কথায় আপত্তি করতে পারেন, এবং আমাদেরও অহঙ্কার করা উচিত নয়) এ সকলের সাহায্য নিয়ে আমাদিগকে নানা প্রকার সূক্ষ্ম রাসায়নিক দ্রব্য এবং শিল্প গড়ে তুলতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ভারতবর্ষে নানা প্রকার ঔষধ এবং রাসায়নিক জিনিষ তৈরী আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড্ ফার্মাসিউটি-ক্যাল ওয়ার্কস্ প্রথম আরম্ভ করেন। সিরাম্, ভ্যাক্সিন্ ইত্যাদি বেঙ্গল ইমিউনিটি (বোধহয়) প্রথম তৈয়ারি করেন। ঠিক এই রকম করেই ভারতবর্ষে ভাল কাচ, সিগ্‌ন্যাল্, ইলেকট্রিক ল্যাম্প, বেঙ্গল ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প্ ওয়ার্কস্, রাবারের জিনিষ, বেঙ্গল্ ওয়াটারপ্রুফ্ কোম্পানী, বেল্টিং ও হোস্ পাইপ্, বেঙ্গল্ বেল্টিং ওয়ার্কস, আরম্ভ করেন। এনামেলের জিনিষ, চীনামাটির বাসন, ইলেকট্রিক্ পাখা ইত্যাদিও বাঙ্গালীই প্রথম করে। আরও অনেক শিল্পের নাম করা যেতে পারে যা' বাঙ্গালীরা ভারতবর্ষে প্রথম আরম্ভ করেছিলেন। একমাত্র কাপড়ের কল বাঙ্গালী প্রথমে করে নাই। স্বদেশী-যুগের প্রারম্ভে যে উৎসাহ এবং উদ্যম দেখা গিয়াছিল বাঙ্গালীর সে প্রাধান্য এখন কমে গিয়েছে। আত্ম-রক্ষার জন্য এবং বেঁচে থাকতে হলে আবার তাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

বর্তমান্ বাংলা দেশের সঙ্গে একশ বৎসর পূর্বের জার্মানির তুলনা হতে পারে। সে দেশেও কাঁচামালের অভাব। জার্মানরাও তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি ও শিল্পকুশলতা দ্বারা পৃথিবীর শিল্পজগতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছিল।

বি, সি, জি, ভ্যাক্‌সিন

শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

বিপত্তিই বিপত্তিকে জয় করতে শেখায়। ছোটো আঘাত সহ্য করা থাকলে পরে বড়ো আঘাতকে সহ্য করা সহজ হয়। জীবনের ক্ষেত্রেও আমরা তাই দেখে আসছি, আর স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও তাই দেখছি।

যক্ষ্মা রোগটি থেকে রক্ষা পাওয়া সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবেই খাটে। আজকাল কলকারখানার যুগের মানুষ মাত্রেরই এই রোগের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ঘটছে। দুরবিগম্য পল্লীগ্রামের কথা ছেড়ে দিয়ে এখনকার যে-কোনো লোকসমাগমের স্থান ও শহরমাত্রেই দেখা যাবে যে, সেখানে প্রায় প্রত্যেকেই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে দেহের মধ্যে যক্ষ্মা বীজাণুর দ্বারা সংক্রমণপ্রাপ্ত হয়েছে। এসম্বন্ধে পরীক্ষা করে দেখবার উপায় আছে, এবং সে পরীক্ষা বহু দেশে বহু স্থানে প্রয়োগ করেই এই আশ্চর্য কথাটি জানতে পারা গেছে। কিন্তু যক্ষ্মার বীজাণু-সকলের শরীরে ঢুকলেও সকলের যক্ষ্মা রোগটি হয় না। শতকরা আশি জন লোক এর প্রকৃত সংক্রমণ সত্ত্বেও রোগ থেকে অব্যাহতি পেয়ে যায়, মাত্র কুড়ি জন লোক প্রকাশ্যভাবে আক্রান্ত হয়।

কিন্তু অব্যাহতি পায় মানে এ কথা নয় যে, তারা বীজাণুর ক্রিয়ামাত্র থেকেই অব্যাহতি পায়। তাদের শরীরে সংক্রমণও ঘটে, রোগের মতো ঈষৎ কিছু ব্যাপারও ঘটে, অর্থাৎ সামান্য কিছু ক্ষত প্রদাহ প্রভৃতিও ঘটে—কিন্তু তার পরে সেটুকু আপনা আপনি আরোগ্য হ'য়ে যায়। রোগী জানতেও পারে না যে, সে কোনোকালে যক্ষ্মা-রোগীপদবাচ্য হয়েছিল। আসল কথা, সংক্রমণকে কেউ নিবারণ করতে পারে না, কিন্তু সংক্রমণ ঘটলে তখন তাকে ভিতরে ভিতরে ব্যর্থ করে ফেলতে অনেকেই পারে। মানুষ জাতীয় জীবগুলির শরীরে এই যক্ষ্মা-রোগনাশক ক্ষমতাটি স্বাভাবিক রূপেই কতক পরিমাণে বর্তমান এবং সুযোগ পেলে তারা এই ক্ষমতাটি আরো বেশি পরিমাণে অর্জন করতে পারে। এইটুকুই মানুষের বাঁচোয়া।

এই সহজাত ক্ষমতাটির নাম দেওয়া যাক প্রতিরোধশক্তি। আমরা এই প্রতিরোধ শক্তিকে দুই স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ ক'রে থাকি,—অকৃত্রিম ও কৃত্রিম। প্রকৃতির দানের সঙ্গে যেটুকু গোড়া থেকেই আছে তাকে বলি অকৃত্রিম, আবার জীবনযাত্রার কালে রোগে ভুগে অথবা কোনো কৃত্রিম উপায়ে শরীরের মধ্যে রোগের অনুরূপ মহড়া দিয়ে যেটুকু শক্তি অর্জন করা হয় তাকে বলি অর্জিত বা কৃত্রিম। স্বাভাবিক রোগ এসে আমাদের শরীরকে এই শক্তি বেশি পরিমাণে অর্জন করায়। সেই শক্তির বলেই আমরা শিশুকাল থেকে যক্ষ্মা বীজাণুর দ্বারা একাধিকবার আক্রান্ত হয়েও তাকে বিনা আয়াসে পরাস্ত ক'রে ফেলি এবং যতবারই জয়ী হয়ে উঠি ততবারই সে শক্তি আরো বাড়িয়ে ফেলি।

কিন্তু ঐ যে বলা হলো, অনেকের পক্ষে এমন গোপনে গোপনে আক্রমণ ও আরোগ্য ঘটলেও সকলের পক্ষে সে সৌভাগ্য ঘটেনা। তবে সকলেরই পক্ষে এরূপ সৌভাগ্য ঘটানো যেতে পারে কৃত্রিম উপায়ে, অর্থাৎ আগে থেকে শরীরের মধ্যে রোগের মতো অভিনয়ের প্রবর্তনের দ্বারা। এমন একটি উপায় আছে যাতে প্রকৃত রোগ হবে না, অথচ রোগের অনুরূপ আভ্যন্তরিক বিপর্যয় ঘটিয়ে তার বিরুদ্ধে রীতিমত সংগ্রামের দ্বারা শরীর খানিকটা

শক্তি অর্জন ক'রে ফেলবে। এই উপায়টি হলো শরীরের মধ্যে রোগ-বীজাণুর ভ্যাক্‌সিন প্রয়োগ।

সামান্য একটু মাত্রাতে বিষও আমরা হজম করতে পারি, অধিক মাত্রাতে অমৃতও হজম করতে পারিনা। আর এক কথা, অল্প মাত্রার দ্বারা অভ্যাস করলে যে কোনো একটি বস্তু সম্বন্ধে আমাদের হজমশক্তিকে বা সহ্যশক্তিকে কিছু বাড়াতে পারি। এই দুই পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত সত্যের উপর ভিত্তি স্থাপন করেই ভ্যাক্‌সিনের দ্বারা রোগ-প্রতিরোধ রীতি প্রচলিত হয়েছে। এর সুফল প্রায় সকল ক্ষেত্রেই মিলে যায়।

রোগ প্রতিরোধের ভ্যাক্‌সিন দুই রকম ভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। সেটা বিভিন্ন জাতীয় রোগ হিসাবে। কোনো কোনো রোগের পক্ষে মৃত বীজাণুর প্রয়োগের দ্বারাই জীবন্ত বীজাণুর বিরুদ্ধে শক্তি অর্জিত হয়। এর উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে কলেরা, টাইফয়েড, প্লেগ প্রভৃতি কয়েকটি রোগ। এই রোগগুলির আক্রমণ নিবারণ করবার জন্য আমরা প্রায় সকলেই আজকাল ঐ প্রকার ভ্যাক্‌সিন নিয়ে থাকি। কিন্তু কয়েকটি রোগের পক্ষে মৃত বীজাণুর ভ্যাক্‌সিনের দ্বারা কোনোই কাজ হয় না। সেখানে রোগ সম্বন্ধে নিরাপদ-জাতীয় জীবন্ত বীজাণুর দ্বারাই রোগ প্রবর্তক সমগোত্র-বীজাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করাতে হয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বসন্ত রোগ। এই রোগের বিরুদ্ধে যে বসন্ত-বীজের টিকা আমরা প্রত্যেকেই নিয়ে থাকি. তার মধ্যে রয়েছে নিরাপদ ধরণের জীবন্ত বসন্ত-বীজাণু। ঐ নিরাপদ বীজাণুই শরীরের মধ্যে মারাত্মক বসন্ত বীজাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি আনিয়ে দেয়।

১৮৮২ সালে কক্ যখন যক্ষ্মার বীজাণু আবিষ্কার করেন, তখন তিনি এর বিরুদ্ধে ভ্যাক্‌সিন প্রস্তুত করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দেখা গেল যে, মৃত বীজাণুর ভ্যাক্‌সিনের দ্বারা এ-রোগের বিরুদ্ধে কোনোই কাজ হবে না। তারপর থেকেই চেষ্টা হ'তে লাগলো, কি উপায়ে যক্ষ্মার বীজাণুকে এমনই নিরাপদ ক'রে ফেলা যেতে পারে, যাতে তার দ্বারা কেবল প্রতিরোধ শক্তিটুকুরই সৃষ্টি হবে, কিন্তু রোগের সৃষ্টি কোনোমতেই হবে না।

ফরাসী পণ্ডিত ক্যালমেট এবং গ্যেরিন, এঁরা আবিষ্কার করলেন যে, গো-যক্ষ্মার বীজাণুকে আলু ও গো-পিত্ত মিশ্রিত খাদ্য-মিডিয়ার মধ্যে রেখে বংশানুক্রমিক ভাবে উপর্যুপরি কালচার ক'রে যেতে থাকলে তারা ক্রমে ক্রমে এমন নির্বিষ ও নিরাপদ হ'য়ে যায় যে তখন আর তাদের জীবদেহে রোগ সৃষ্টির কোনো ক্ষমতাই থাকেনা। আরো দেখা গেল, যতই অধিক কাল যাবত তাদের পরে পরে কালচার করতে থাকা যায় ততই তাদের বিষ-ক্রিয়ার শক্তি আরো কমে যেতে থাকে। যত বেশি বার কালচার করা হবে ততই বেশি নিরাপদ।

এই নিরাপদ বীজাণুর বংশকে ২০০ থেকে ২৩৫ বার পর্যন্ত কালচার করবার পরে সেগুলিকে বিভিন্ন রকম জন্তুর শরীরে প্রয়োগ করা হ'তে লাগলো। ঘোড়া, গরু, বাঁদর, কুকুর, খরগোস ও গিনিপিগ, কারো দেহেই তার দ্বারা কোনো রোগ জন্মালো না। মানুষের দেহেও তারপরে প্রয়োগ ক'রে এই সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া গেল। তখন ১৯২০ সালে ক্যালমেট ও গ্যেরিন ঘোষণা করলেন যে, এই জীবন্ত বীজাণুর ভ্যাক্‌সিনের নাম দেওয়া হোক বি. সি. জি. ভ্যাক্‌সিন (ব্যাসিলাস ক্যালমেট-গ্যেরিন ভ্যাক্‌সিন) তাঁরা বললেন যে, এই বিশিষ্ট প্রকারের বীজাণু জীবন্ত হ'লেও এর ভ্যাক্‌সিন এতই নিরাপদ যে, ৪৪,০০০ সংখ্যক বীজাণুকে কোনো মানুষের রক্তবাহী শিরার মধ্যে সরাসরি ইনজেকশনের দ্বারা প্রয়োগ করলেও তার কোনো অনিষ্ট হবেনা।

ক্যালমেট প্রথমে এই নির্বিষ জীবন্ত বীজাণুর বি. সি. জি ভ্যাক্‌সিন কেবল সদ্যোজাত শিশুদের বেছে নিয়ে মুখ দিয়ে খাইয়ে প্রয়োগ করতেন। ফ্রান্স দেশে এর ব্যবহার ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হ'তে লাগলো, এবং যে বাড়ীতে যক্ষ্মা রোগ দেখা দিয়েছে

সেই বাড়ীর শিশুদের সংগ্রহ ক'রে এর দ্বারা সংক্রমণমুক্ত করবার প্রচেষ্টা হ'তে লাগলো। যখন কোনো বিপত্তি ঘটলো না এবং সকল ক্ষেত্রে সাফল্যই লক্ষিত হ'তে লাগলো, তখন অন্যান্য দেশেও এর ব্যবহার সুরু হলো। ১৯৩২ সালে ক্যালমেট বিবৃতি দিলেন যে, প্রায় দশ লক্ষ শিশুকে এই ভ্যাক্সিনের দ্বারা রোগ-নিরাপদ করা হয়েছে। ১৯৩৩ সালে মৃত্যুর পূর্বে তিনি মুখ দিয়ে খাওয়ানোর পরিবর্তে ইনজেকশন রূপে প্রয়োগবিধির প্রবর্তন ক'রে গেলেন।

সম্পূর্ণ নির্বিবাদে এই ভ্যাক্সিনটির প্রচার ঘটে যাচ্ছিল। কিন্তু ১৯৩০ সালে জর্মনির লিউবেক সহরে এক দুর্ঘটনা ঘটলো। সেখানে ২৪৯টি শিশুকে এই ভ্যাকসিন খাওয়ানো হয়েছিল, তাদের মধ্যে ৭৩টি শিশু কয়েক মাসের মধ্যে মারাত্মক যক্ষ্মা রোগে মারা গেল। এইরূপ বিসদৃশ দুর্ঘটনায় সকলেই বিচলিত হ'য়ে উঠলো। সন্দেহ উপস্থিত হলো যে, জীবন্ত বীজাণু নির্বিষ হ'লেও সেই অবস্থা থেকে কোনো কারণে হঠাৎ সবিষ হ'য়ে উঠতে পারে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান হ'তে লাগলো, এবং বিচারালয়ে এই নিয়ে বিচার করাও হলো। তখন প্রমাণ হ'য়ে গেল যে, নির্বিষ বীজাণুদের মধ্যে কোনোক্রমে সবিষ বীজাণুর সংমিশ্রণ ঘটে গেছে তার ফলেই এমন হয়েছে। ল্যাবরেটরির কর্মীদের অসাবধানতাই এর কারণ। তখন থেকে আইন হ'য়ে গেছে যে, ল্যাবরেটরিতে বি. সি. জি. ভ্যাক্সিন প্রস্তুত হবে সেখানে অন্যরূপ যক্ষ্মা-বীজাণুর আদৌ কোনো কালচারই হবে না। হ'লে তা অপরাধরূপে দণ্ডনীয় হবে।

কিন্তু তথাপি লোকে এই ভ্যাক্সিনকে এরপর থেকে অবিশ্বাস করতে থাকলো। ফ্রান্সে ও জর্মনীতে এর ব্যবহার অনেক কমে গেল। জীবন্ত বীজাণু দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতে কারো আর আস্থা হয় না। কে বলতে পারে শরীরের মধ্যে গিয়ে তা কারো পক্ষে দৈবক্রমে সবিষ হ'য়ে উঠবে না।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার বৈজ্ঞানিকরা কিন্তু এর ব্যবহারে উৎসাহিত হ'য়ে উঠলেন। তাঁরা বললেন, যে বীজাণুর—যাকে বলে বিষদাঁতই নেই, তার দ্বারা বিষক্রিয়া কারো পক্ষে কোনো কালে সম্ভব হ'তে পারে না। এটা প্রকৃতির আইন-বিরুদ্ধ। উৎসাহের সঙ্গে তাঁরা এই ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করতে লাগলেন বেছে বেছে শিশুদের মধ্যে, নার্সদের মধ্যে, এবং ডাক্তারী শিক্ষার্থী ছাত্রদের মধ্যে। বহুকাল যাবত পর্যবেক্ষণ ক'রে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, এই ভ্যাক্সিন বাস্তবিকই সম্পূর্ণ নির্দোষ ও নিরাপদ। তারপর থেকে নরওয়ে এবং সুইডেনে এই ভ্যাক্সিন ব্যাপকভাবে সর্বসাধারণের মধ্যে আজও পর্যন্ত প্রয়োগ করা হচ্ছে। তার ফলে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে যক্ষ্মায় মৃত্যুর সংখ্যা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা খুবই কম। সেই দেশে এই ভ্যাকসিন রীতিমতভাবে সরকারী তরফ থেকে প্রস্তুত করা হয়। এই ভ্যাক্সিন প্রয়োগের জন্য সেখানে একরূপ যন্ত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐ যন্ত্র স্প্রিংএর সাহায্যে কাজ করে। এক মুহূর্তের মধ্যে সেই যন্ত্র এককালীন চল্লিশটি সূচীবেধ ঘটায়, অথচ নিমিষের মধ্যে হ'য়ে যায় বলে কোনো ব্যথা লাগে না। এই প্রকার ভ্যাক্সিন প্রয়োগকে বলে ট্রান্সকিউটেনিয়স প্রয়োগবিধি।

এই ভ্যাক্সিন প্রয়োগের বাস্তবিক কোনো সার্থকতা আছে কিনা তা দুই প্রভাবে জানা যায়। তার মধ্যে একটি উপায় টিউবারকুলিন পরীক্ষা। চর্মগাত্রের উপর এই পরীক্ষার ফলাফল প্রত্যক্ষ করা যায়। পরীক্ষিত স্থানটি প্রদাহের দ্বারা সুস্পষ্টরূপে লাল হয়ে ওঠে। যদি পরীক্ষার স্থল লাল হ'য়ে উঠলো তবে জানা গেল যে, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সেটি পজিটিভ বা আভ্যন্তরিক প্রতিরোধক্রিয়ার অস্তি-চিহ্ন জ্ঞাপক। যদি মোটেই লাল হ'য়ে না উঠলো, তবে জানা গেল সেটি নেগেটিভ বা নাস্তি-চিহ্ন জ্ঞাপক। বলা বাহুল্য কেবল নাস্তিচিহ্নিত ব্যক্তিদেরই এই ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা

হ'য়ে থাকে। অস্তি-চিহ্নিত ব্যক্তিদের এ ভ্যাক্সিন দেওয়া যায় না। এর প্রয়োগের পরে প্রায় সকলেরই এক সপ্তাহ থেকে তিন মাসের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রতিরোধশক্তি অর্জিত হ'য়ে যায়। তার প্রমাণ পাওয়া যায় তখন তাদের শরীরে অস্তি-চিহ্নের অভ্রান্ত প্রকাশের দ্বারা। যারা নাস্তি-চিহ্নযুক্ত ছিল তারা অস্তি-চিহ্নযুক্ত হ'য়ে গেল। তাতেই বোঝা গেল যে, ভ্যাক্সিন তার কাজ করেছে। অর্থাৎ যার প্রতিরোধশক্তি ছিলনা, তার সে শক্তি অর্জ্জিত হয়েছে।

আর একটি উপায় মৃত্যুর হার দেখে। যারা ভ্যাক্সিন নেয়নি এবং যারা নিয়েছে, তাদের দুই দলকে পৃথক ক'রে এ বিষয়ে তুলনা ক'রে দেখতে হয়। এ পরীক্ষা সময়সাপেক্ষ। ১৯৩০ সালে মাত্র দশ বছরের অভিজ্ঞতার ফলেই ক্যালমেট বলেছিলেন, ফ্রান্স দেশে গণনা ক'রে দেখা গেছে, ভ্যাক্সিন-রিক্তদের মধ্যে যক্ষ্মায় মৃত্যুর সংখ্যা যেখানে শতকরা ১৫'৯, ভ্যাক্সিন-প্রাপ্তদের মধ্যে সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা মাত্র ২'৪। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার বৈজ্ঞানিকরা আটাশ বছরের অভিজ্ঞতার ফলে বলেছেন যে, তাঁদের দেশে মৃত্যু সংখ্যা তার চেয়েও কম, শতকরা মাত্র ১।

এই ভ্যাক্সিন প্রয়োগের ফলে রোগ নিবারণের শক্তি কতদিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়? স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার বৈজ্ঞানিকরা বলেন, এর ক্রিয়া গড়ে পাঁচ ছয় বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তবে এ বিষয়ে নিশ্চয়তা নেই। সন্দেহস্থলে পুনরায় টিউবারকুলিন পরীক্ষার দ্বারা জেনে নিতে হবে, এবং নাস্তি-চিহ্ন দেখলেই ভ্যাক্সিনের পুনঃপ্রয়োগ করতে হবে। ক্যালমেট বলেছিলেন, শিশুদের পক্ষে এই ভ্যাক্সিন প্রথম বার প্রয়োগ করা উচিত এক বছর থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যে, এবং দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করা উচিত সাত বছর থেকে পনের বছরের মধ্যে।

নির্দিষ্ট প্রকারের যন্ত্রটি না থাকলেও এই ভ্যাক্সিন সাধারণ টিকা দেবার মতো প্রয়োগ করা যায়। প্যারিস শহরে উইল-হ্যালি এই প্রকারেই লক্ষ লক্ষ শিশুকে প্রয়োগ করেছেন। প্রয়োগের প্রক্রিয়াটি এইরূপ। বাম বাহুতে ডেল্‌টয়েড পেশীর নিচে আধ ইঞ্চি অন্তর তিন স্থানে তিন ফোঁটা বি সি জি ভ্যাক্সিন সারিবদ্ধভাবে স্থাপন করা হয়, এবং সরু ছুচের দ্বারা ঢ্যারা কাটার মতো আকারে তিনটি ছড়ে-যাওয়া দাগ তার উপর দিয়ে টেনে দেওয়া হয়। ঢ্যারা চিহ্নগুলি দশ পনের দিনের মধ্যে লাল এবং শক্ত হ'য়ে ওঠে। সেই সঙ্গে বাম বগলের বিচিগুলিও একটু ফুলে ওঠে। এই পর্যন্ত, এ ছাড়া আর কোনো কষ্ট নেই; জ্বর, ব্যথা কিংবা অসুস্থতা বিশেষ কিছুই হয় না।

এই ভ্যাক্সিনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কিছু নেই। প্রত্যেকটি ব্যাচ্ ভ্যাক্সিন ল্যাবরেটরি থেকে বাইরে ছাড়বার পূর্বে তার থেকে নমুনা নিয়ে গিনিপিগের শরীরে প্রয়োগের দ্বারা কণ্ট্রোল ক'রে দেখা হয় যে তার দ্বারা কোনো রোগলক্ষণ জন্মায় কিনা। অসাবধানতাবশতঃ কোনো মারাত্মক জাতীয় যক্ষ্মা বীজাণু বা অন্য কোনো বীজাণু ওর মধ্যে প্রবেশ করেছে কিনা, তাও পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়। নিরাপত্তা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় না হ'য়ে কোনো ব্যাচের ভ্যাক্সিন সাধারণের জন্য সরবরাহ করা হয় না।

পৃথিবীর সকল দেশে না হ'লেও বহু দেশেই সাধারণভাবে এর এতাবৎকাল প্রয়োগের ফলে এখন বলা যেতে পারে যে, এই ভ্যাক্সিন জীবন্ত বীজাণুপূর্ণ হ'লেও সম্পূর্ণ নির্বিষ ও নিরাপদ। এমন যদি না হতো তাহ'লে এতদিনে এর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ শোনা যেতো। কিন্তু আজ পর্যন্ত ঐ এক লিউবেক-দুর্ঘটনা ছাড়া আর কোনো কিছুই শোনা যায় নি।

কেউ কেউ বলেন, ভ্যাক্সিন এখন ব্যাপকভাবে সাধারণ টিকাদারের দ্বারাই প্রয়োগ করা যেতে পারে। তারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে একসঙ্গেই বাম

বাহুতে দেবে বসন্ত বীজের টিকা, আর ডান বাহুতে দেবে বি. সি. জি. ভ্যাক্‌সিনের টিকা। কিন্তু এর ব্যাপারটা বসন্তের মতো অতোখানি সহজ নয়। এর প্রয়োগের পক্ষে দুটি বিশেষ রকমের সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। প্রথম কথা, নবজাত শিশুদের ছাড়া অন্যান্য প্রত্যেক ব্যক্তির বেলাতেই আগে টিউবারকুলিন পরীক্ষার দ্বারা দেখে নিতে হবে যে তাদের শরীরে অস্তি-চিহ্ন পাওয়া গেল, না নাস্তি-চিহ্ন পাওয়া গেল। নাস্তি-চিহ্ন ব্যক্তিদেরই এই ভ্যাক্‌সিন দেওয়া চলবে। অস্তি-চিহ্ন ব্যক্তিদের নয়। আর দ্বিতীয় কথা, ভ্যাক্‌সিন প্রয়োগের পর থেকে ছয় সপ্তাহ পর্যন্ত তাদের যক্ষ্মা রোগীদের সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে রাখতে হবে। ঐ ছয় সপ্তাহ তাদের পক্ষে আদৌ প্রতিরোধ শক্তিবিহীন অসহায় অবস্থা। তখন কোনো গতিকে সংক্রামিত হয়ে গেলেই তাদের বিপদ ঘটবে। এর ব্যবস্থা করা সকল স্থানে সম্ভব নয়।

এই ভ্যাকসিনের ব্যাপক প্রয়োগ যে কোন্ দেশ এবং কোন্ অঞ্চলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী সেটাও বিবেচ্য। আমেরিকাতে স্থানে স্থানে এর ব্যবহার করে দেখা হয়েছিল। কিন্তু সেখানে যক্ষ্মা নিবারণের জন্য স্বাস্থ্যমূলক সকল প্রকার ব্যবস্থাই অনেক আগে থেকে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তারা রোগীমাত্রকেই স্যানাটোরিয়মে পাঠাতে পারে, এবং সুস্থ ব্যক্তিদের রোগসংস্পর্শ থেকে পৃথক রাখতে পারে। এ-ছাড়া তারা স্বভাবতঃই স্বাস্থ্যনীতিগুলি নিখুঁতভাবে মেনে চলে, তারা খোলা বাতাসে বাস করে, নিজেদের বাসস্থানগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে এবং প্রায় সকলেই পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পায়। এই সকল ব্যবস্থার ফলে তাদের দেশে এমনিতেই যক্ষ্মায় মৃত্যুসংখ্যা খুব কম। বি. সি. জি. ভ্যাক্‌সিন ব্যবহারের দ্বারা তাদের দেশে মৃত্যুসংখ্যা সম্বন্ধে বিশেষ কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। সুতরাং যারা স্বভাবতঃই সুস্থ থাকতে জানে এবং সুস্থ থাকতে পারে, তাদের পক্ষে এই ভ্যাক্‌সিন গ্রহণ করবার কোনো প্রয়োজন নেই। উৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যলাভের দ্বারা ও রোগীমাত্রকেই অপসারণের দ্বারা যারা এমনিতেই নিরাপদ হয়েছে, বি. সি. জি. ভ্যাক্‌সিন তাদের তদপেক্ষা বেশি নিরাপদ করবে না। পরিপূর্ণ জীবনী-শক্তিই যাদের পক্ষে প্রতিরোধ-শক্তির কাজ করবে বি. সি. জি. ভ্যাক্‌সিন তাদের সে-শক্তি আর বেশি বাড়াতে পারবে না।

কিন্তু আমাদের দেশের মতো 'স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহেলায় অভ্যস্ত জনপদে এবং লোকবহুল স্থানে, যেখানে কলকারখানায় কাজ করতে গিয়ে অনেক লোকে একত্রে সর্বদা ভিড় করে বসবাস করতে থাকে, যেখানে লোকে সংক্রমণ বাঁচিয়ে চলা সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ, যেখানে রোগী এবং নীরোগ ব্যক্তিকে পৃথক করে চেনবার কোনোই উপায় নেই, যেখানে লোকে অস্বাস্থ্যকর আবেষ্টনের মধ্যে দিন কাটায় এবং আপন শরীরকে সুস্থ রাখবার কোনো নিয়ম জানেনা, অথবা জেনেও পালন করতে পারেনা। যেখানে পুষ্টিকর খাদ্যের একান্ত অভাব, যেখানে যক্ষ্মা রোগের প্রভাব উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে এবং যেখানে রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিপর্যয়ের ফলে বহু লোকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হয়ে অচেনা আবেষ্টনের মধ্যে অচেনা মানুষদের সঙ্গে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে,—এমন দেশের পক্ষে বি. সি. জি. ভ্যাক্‌সিন যে অনেক অকালমৃত্যু নিবারণ করতে সক্ষম হবে এটুকু আশা করা যায়।

বিজ্ঞানের বিকাশ ও বিজ্ঞান-চর্চার লক্ষ্য

শ্রীহরগোপাল বিশ্বাস

যা জানা যায় তাই জ্ঞান এবং বিশেষ ধরণের জ্ঞানকে বলা হয় বিজ্ঞান। অবশ্য তলিয়ে দেখলে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মধ্যে সীমা রেখা টানা কঠিন। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উহার পঠন পাঠনের সুবিধার জন্য বিজ্ঞানের মধ্যেও অনেকগুলি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। গণিত-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, শরীর-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতি সুপরিচিত। কিন্তু বিজ্ঞান বলতে সচরাচর আমরা বিজ্ঞানের সেই সকল বিভাগই বুঝি যে গুলির তথ্যাদির সাহায্য নিয়ে মানুষ গড়ে তুলেছে তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সহস্র উপকরণ—সমাজ ও সভ্যতাকে সে চালিত করছে দিন দিন উন্নতির পথে। সেই কারণেই গণিত-বিজ্ঞান অপর সকল বিজ্ঞানের জননী-স্বরূপ হলেও রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানই মর্যাদা পেয়েছে সবচেয়ে বেশী।

সত্যের সন্ধানই বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। পায়ের নীচের ধূলিকণার জন্ম-কথা থেকে আরম্ভ করে কোটি কোটি যোজন দূরের তারকার সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ও গতির সমস্যা সমাধানই বিজ্ঞানের বিষয় বস্তু। 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান' কথা আছে। যুগে যুগে মানব-সমাজেও এরূপ ক্ষ্যাপা লোকের অনুসন্ধিৎসার ফলেই মানব-জাতি জীব-জগৎ থেকে এতদূর এগিয়ে গেছে। জীববিদ্‌গণ বলেন, অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষের মস্তিষ্কের পরিমাণ তাহার দেহের অনুপাতে অনেক বেশী। তদ্ভিন্ন মানুষের মস্তকের তথা চোখের সংস্থানই সম্ভবতঃ তার মনের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা জাগিয়ে তোলবার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। মানুষ দশদিকে যেমন অবাধ দৃষ্টিসঞ্চার করতে পারে অন্য কোনও প্রাণীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। গরুত চিরদিন তার পায়ের তলার ঘাস চেটেই চলেছে। "মন তুমি আঁখির গরব কর" কথাটি মিথ্যা নয়। মানুষের গর্ব করার মত ইন্দ্রিয় বাস্তবিকই তার দুটি চোখ। বিজ্ঞান যে আজ এত অভাবনীয় উন্নতি করেছে তার মূলেও রয়েছে মুখ্যতঃ মানুষের দৃষ্টিশক্তির সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার।

যদিও আধুনিক বিজ্ঞানের বয়স তিন চারশত বৎসরের বেশী নয়, আর তার মধ্যে গত একশত বৎসরের মধ্যেই প্রায় তার সর্বোচ্চ পরিণতি আমরা লক্ষ্য করি, তবু একথা ঠিক যে, বিজ্ঞানের এই আকস্মিক উন্নতির মূল রয়েছে সুদূর অতীতে যার পুরোপুরি ইতিহাস এখনও উদ্‌ঘাটিত হয়নি, কখনও যে সঠিক উদ্‌ঘাটিত হবে তারও সম্ভাবনা কম। প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবাল দ্বীপ যখন সমুদ্র গর্ভ থেকে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে তখন দেখতে দেখতে অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই উহা ফুল ফল শোভিত মনোহর রূপ ধারণ করে, কিন্তু সমুদ্রতল হ'তে ঐ দ্বীপ গড়ে উঠতে কত হাজার হাজার বছর যে কেটেছে এবং কত কোটি কোটি প্রবাল কীটের দেহাবশেষে যে উহা গঠিত হয়েছে সে বিষয় আমরা চিন্তা করে দেখি না।—বিজ্ঞানের অতি-আকস্মিক উন্নতিও অনেকটা এইরূপ। মানব সভ্যতার আদিম ঊষা থেকেই আরম্ভ হয়েছে মানুষের এষণা—কতকটা তার ভাবালুতা-প্রযুক্ত, আর অনেকটাই তার প্রয়োজনের তাগিদে। আগুনের আবিষ্কার ও তার নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার মানুষের প্রাচীন কীর্তির অন্যতম। মানুষের ভাষার ক্রমবিকাশ এবং তার

চিন্তাধারাকে স্থায়িত্ব দান কল্পে অক্ষর সৃষ্টি পূর্বক লিখন-প্রণালীর আবিষ্কার মানুষের উন্নতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সোপান। তারপর সংখ্যার উদ্ভাবন ও তার লিখন পদ্ধতির বিকাশ। অনেকেই জানেন, সমগ্র পৃথিবীতে প্রচলিত দশমিক প্রথা সৃষ্টি করেছেন প্রাচীন ভারতীয় মনীষিগণ। এ কথা আজ সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, এই পদ্ধতি আবিষ্কৃত না হলে আধুনিক বিজ্ঞান আদৌ এগোতে পারত কি না তদ্বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। সুতরাং যদিও পাশ্চাত্য আজ আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা বলে বড়াই করে, তথাপি এর মূলসূত্র যে সে পেয়েছে প্রাচ্যের কাছ থেকেই তা অস্বীকার করবার উপায় নাই। গণিত এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে ভারতের দান অতি প্রাচীন ও অতীব উচ্চস্তরের। এমন কি রসায়ন-শাস্ত্রেও যে প্রাচীন ভারত অগ্রণী ছিল প্রাতঃ-স্মরণীয় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের "হিন্দু-রসায়ন" গ্রন্থে তার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক বিভাগই আরববাসিগণ আয়ত্ত করেন এবং তাঁদের কাছ থেকেই ইউরোপীয়-গণ উহা গ্রহণ করেন। প্রাচীন পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডারে চীন ও মিশরের দানও কম মূল্যবান নয়।

বিজ্ঞানের বিবিধ বিভাগের মধ্যে রসায়ন ও পদার্থ-বিজ্ঞানের স্থানই সকলের উপর। কারণ, বিজ্ঞানের এই উভয় শাখার তথ্যাদির ব্যবহারিক রূপের দ্বারাই রূপায়িত হয়ে উঠেছে আধুনিক সভ্যতার বিরাট সৌধ। খনির পাথর থেকে লৌহাদি ধাতু নিষ্কাশন হ'তে আরম্ভ করে রেলগাড়ী, মোটরগাড়ী, বিমানপোত, রেডিও, রাডার, এমন কি আণবিক বোমা নির্মাণেও এই দুই বিজ্ঞানের নিবিড় সহযোগিতার আবশ্যক। রসায়ন শাস্ত্র যোগায় দেহ—পদার্থ বিজ্ঞান যোগায় প্রাণ—কে বড়, কে ছোট ঠিক করবার উপায় নাই—একটি না হলে অপরটি অচল! আজকাল বিজ্ঞানের কথা মনে হলেই তার ব্যবহারিক দিকটার কথাই আগে মনে পড়ে। কারণ, বসন ভূষণ, কাগজ-কালি, ঔষধ-পথ্য, রঞ্জন ও বিস্ফোরক পদার্থ, প্রসাধন সামগ্রী এবং আধুনিক সভ্যতার অধিকাংশ উপকরণই বিজ্ঞানের দান। তাই ছেলেদের বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে গিয়েই আমরা মনে করি তারা বর্তমান সভ্যতার উপকরণ তৈরীর উপায় শিখবে বা মানব-কল্যাণকর কোনও উপকরণ আবিষ্কারের খ্যাতি লাভ করবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকটাই গৌণ, মুখ্য উদ্দেশ্যই হ'ল জ্ঞানের জন্য বিজ্ঞানচর্চা—বিশ্ব প্রকৃতির অনন্ত রহস্যের সমাধান প্রচেষ্টাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূলমন্ত্র। বিজ্ঞানের যাঁরা গোড়া পত্তন করেছেন—নাগার্জুন, আর্যভট্ট, লীলাবতী, গ্যালিলিও, কোপার-নিকস, নিউটন, ড্যালটন, ফ্যারাডে, ম্যাডাম কুরি, রাদারফোর্ড প্রভৃতি মনীষীর জীবনে ইহারই সাক্ষাৎ মেলে। এঁরা সবাই ছিলেন সত্যের একনিষ্ঠ পূজারী। প্রকৃতির রহস্যঘন অবগুণ্ঠনের ঈষৎ উন্মোচনই ছিল এঁদের প্রত্যেকেরই প্রধান ব্রত। সত্য সাধনায় এঁরা লাভ করেছেন অপরিসীম অন্তর্দৃষ্টি, চারিত্রিক দার্ঢ্য, উদার দৃষ্টিভঙ্গী এবং অহংকারশূন্যতা। যিনি যত বড় বৈজ্ঞানিক, তিনি ছিলেন তত বেশী নিরভিমান। কারণ তিনিই বেশী বুঝেছিলেন যে, প্রকৃতির অসীম জ্ঞান-ভাণ্ডার এখনও প্রায় অস্পৃষ্ট রয়ে গেছে। জানার চেয়ে অজানার পরিমাণ অপরিসীম অধিক। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এঁদের মনোভাব প্রকাশ করলে দাঁড়ায়—

"এখনো কিছুই তব করি নাই শেষ,
সকলি রহস্যপূর্ণ নেত্র অনিমেষ,
বিস্ময়ের শেষতল খুঁজে নাহি পায়—
এখনও তোমার কোলে আছি
শিশু-প্রায়—মুখপানে চেয়ে।"

উপযুক্তভাবে বিজ্ঞান অনুশীলনে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মে, জাগতিক বিষয় বস্তুর কার্যকারণ সম্বন্ধের প্রতি সহজেই নজর পড়ে, জগতের সর্বত্র সর্বসময়েই অবিচ্ছিন্ন নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখে চরিত্রে নিয়মানুবর্তিতা, সংযম, শৃঙ্খলা, কর্মস্পৃহা ও অহংকার

প্রশ্ন দানা বেঁধে ওঠে—আরও বুঝবার আগ্রহ দিন দিন বাড়তে থাকে।

বিজ্ঞান সাধনা ব'লে কথাটি আমরা প্রায়ই ব্যবহার করি, কিন্তু এর সত্যিকার স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা তেমন সচেতন নই। কোনও একটি সত্যের সন্ধানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অনন্যমনে একান্তভাবে লেগে থাকবার কথা আমরা ভাবতেই পারিনা। মুনি-ঋষিদের তপশ্চর্যার এরূপ কাহিনীই কেবল আমাদের শোনা আছে। কিন্তু আধুনিক কালে বিজ্ঞানের রহস্যোদ্‌ঘাটনে যে ঠিক এইরূপ একনিষ্ঠ সাধনারই প্রয়োজন হয়েছে সে ধারণা আমাদের নাই বললেই চলে। অথচ আমাদের দেশের আচার্য জগদীশচন্দ্র, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, রামন, সাহা, বোস থেকে আরম্ভ করে ইউরোপ খণ্ডের গ্যালিলিও, নিউটন, ড্যালটন, ফ্যারাডে, পাস্তুর, কুরি, কেকুলে, বেয়ার, ফিশার, রাদারফোর্ড প্রভৃতি মনীষীর চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্যই লক্ষিত হয়েছে। উল্লিখিত ভারতীয় মনীষীদের সম্বন্ধে অনেকেরই সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা আছে। এ কারণ এ স্থলে একজন জার্মান বিজ্ঞানীর বিষয়ে দু' একটি কথা বলা যাচ্ছে। অগাষ্ট কেকুলে বলেছেন জৈবরসায়ন শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা লিবিগ তাঁকে উপদেশ দিতেন—"রসায়ন শাস্ত্রের চর্চায় স্বাস্থ্যহানি না ঘটালে ঐ শাস্ত্রে কেউ পারদর্শিতা অর্জন করতে পারেন না, আর পড়তেও হবে বিভিন্ন ভাষায় বিশেষ ক'রে জার্মান ভাষার মাধ্যমে।" কেকুলে এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। তিনি বলেছেন, একরাত্রি পড়াশুনা ও গবেষণার চিন্তা করে কাটান তিনি ধর্তব্যের মধ্যেই মনে করতেন না। যখন পর-পর দুই তিন রাত্রি জেগে তিনি এরূপ সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন তখনই কিছুটা আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। এদিকে দিনের বেলায় ল্যাবরেটরিতে খাটতেনও তিনি অসাধারণ পরিশ্রম সহকারে। অনেকেই জানেন কেকুলের এই সাধনা সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। হফ্‌মানের মত অসামান্য কৃতী বিজ্ঞানীও আক্ষেপ করে বলেছেন—"কেকুলের একটি মাত্র আবিষ্কারের বিনিময়ে আমার জীবনের সমুদয় আবিষ্কার ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি।" ফলতঃ কেকুলের বেনজিন ফরমুলা আবিষ্কৃত না হলে জৈব-রসায়নশাস্ত্র এবং তৎসম্ভূত শিল্প-রঞ্জন ও বিস্ফোরক পদার্থ, কৃত্রিম গন্ধ দ্রব্য এবং আধুনিক ঔষধ প্রভৃতি কিছুই দাঁড়াত কিনা সন্দেহ।

বিজ্ঞানের প্রধান বিভাগগুলির মধ্যেও ক্রমে দুটি উপবিভাগ দাঁড়িয়েছে—বিশুদ্ধ বিজ্ঞান এবং ফলিত বিজ্ঞান। নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের লক্ষ্য, আর সভ্যতার উপকরণ প্রস্তুতকল্পে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের তথ্যাদির প্রয়োগ কৌশল সংক্রান্ত গবেষণা ফলিত-বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। এই উপবিভাগ দুটির শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে অনেক সময় বিতর্কের সৃষ্টি হয়ে থাকে। জার্মানির অন্যতম মহাকবি শিলার বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে সূর্যের ও ফলিত বিজ্ঞানকে গাভীর সঙ্গে উপমা দিয়েছেন। যদিও প্রত্যক্ষভাবে দুধ মাখন খেয়েই আমরা বাঁচি, তথাপি সূর্য না থাকলে ঘাস পাতা জন্মাত না, ফলে গাভীও বাঁচত না, আমরাও বঞ্চিত হতাম দুধ মাখন থেকে। দেশে ফলিত বিজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা শিল্পোন্নয়ন করতে হলে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের উন্নতির প্রতিই যে সর্বাগ্রে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য শিলারের উক্তিতে তা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

বৈজ্ঞানিক সত্য মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনে কিরূপ সহায়ক হতে পারে তার উদাহরণ দেওয়া যাচ্ছে। "অবস্তু থেকে বস্তুর উদ্ভব সম্ভব নয়" একটি প্রচলিত বৈজ্ঞানিক সত্য। দৈনন্দিন জীবনে এর সত্যতা উপলব্ধি করা যায় যখন আমরা দেখি বীজ না পুঁতলে গাছ জন্মায় না, পরিশ্রম না করলে সাফল্য অর্জিত হয় না—অর্থাৎ ফাঁকি দিয়ে জীবনে পাওয়ার মত বস্তু কিছুই পাওয়া যায় না। "প্রকৃতি শূন্যস্থান সহ্য করতে পারে না" ব'লে বৈজ্ঞানিক সূত্র আছে। ইহা জড় জগতের বেলায় যেরূপ

সত্য নৈতিক চরিত্র গঠনেও সেইরূপ। যদি ভাল কাজ বা উচ্চ চিন্তা না করি তবে মন ভ'রে উঠবে বাজে চিন্তা বা কুচিন্তায়, ফলে বিষিয়ে তুলবে চিত্ততল—পিছিয়ে দেবে জীবনের অগ্রগতি। বিজ্ঞানের যে কোনও বিভাগ থেকেই এরূপ ভুরি ভুরি উদাহরণ উদ্ধৃত করা যায়।

বিজ্ঞান সাধনা এবং বিজ্ঞান অনুশীলন ব্যতীত আমাদের জনসাধারণের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক সত্যগুলির যাতে বহুল প্রচার হয়, মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজবোধ্য পুস্তকাদির সাহায্যে বা বেতার বক্তৃতার ভিতর দিয়ে তার ব্যবস্থা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

সকলেই জানেন, বিজ্ঞান চর্চায় একদিকে যেমন মানুষের অশেষ কল্যাণকর তথ্য ও পদার্থনিচয় আমাদের করায়ত্ত হয়েছে তেমনি সেই সঙ্গে পেয়েছি আমরা সর্বধ্বংসী বিস্ফোরক পদার্থ যার চরমতম পরিণতি লক্ষিত হয় আণবিক বোমায়। বিজ্ঞানের এই সংহার মূর্তি দেখে অনেকেই বিজ্ঞানচর্চার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছেন। তবে আগুনে ঘর পোড়ে বলে তার ব্যবহার যেমন কেউ ছাড়তে পারেনা বিজ্ঞানের বেলাতেও অনুরূপ যুক্তিই গ্রহণীয়। বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক কার্য কলাপের কারণ অনুসন্ধান করলে এই কথাটিই মনে পড়ে যে, মানুষ জড় বিজ্ঞানের সাধনায় যত দ্রুত অসীম শক্তি অর্জন করেছে সেই শক্তি সুপরিচালনার উপযোগী আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী সে এখনও হয়ে উঠতে পারেনি। হৃদয়কে পিছনে ফেলে মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ গেছে অনেক এগিয়ে এতে ক'রেই জমে উঠেছে যত অশান্তি, যত পুঞ্জীভূত মর্মবেদনা। তবে এত টুকু বিশ্বাস আমাদের আছে যে, প্রাচীন ভারতে জড়বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও উহা যেমন সর্বাংশে মানব কল্যাণেই নিয়োজিত হয়েছিল ভারতবাসিগণ আধুনিক বিজ্ঞান সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করলেও ভারতের মজ্জাগত সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য-বশতঃ বিজ্ঞানের পরম কল্যাণময়ী মূর্তিই এখানে বিকাশ লাভ করবে।
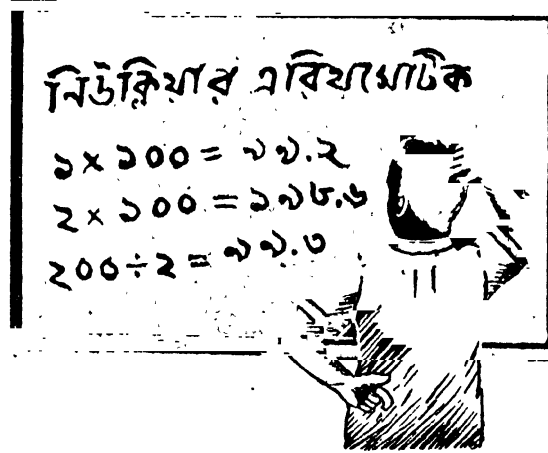
পরমাণুর নিউক্লিয়াস অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বস্তুর ভাঙা টুকরোগুলোকে একত্রে যোগ অথবা ভাগ করলে তাদের মোট ওজন সাধারণ গণিতের নিয়ম মেনে চলে না। ওজনে খানিকটা ঘাটতি দেখা যায়। এই ওজন-হ্রাসই mass-defect নামে পরিচিত। নিউক্লিয়াসের 'ফিসন' ঘটবার সময় বস্তুমাত্রার এই যে সামান্য হ্রাস ঘটে তা-ই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

বিজ্ঞান ও মানুষ

শ্রীপরেশনাথ ভট্টাচার্য

বিজ্ঞানের উৎস কোথায়? কেহ বলেন যে, মানুষের স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানলিপ্সা ও অনুসন্ধিৎসাই বিজ্ঞানে প্রবৃত্তির মূল কারণ। আবার কেহ বা জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার প্রচেষ্টায় প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডারকে নিত্য নূতন উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করাকেই বিজ্ঞানের উৎস বলিয়া বিবেচনা করেন। মোটের উপর, বিজ্ঞানের উৎস সম্বন্ধে সকল প্রকার মতকেই এই দুইটির ইতরবিশেষ বলা যাইতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে এই দুইটি মত পরস্পর বিরোধী মনে হইলেও, ইহাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই, বরং আছে ঘনিষ্ঠ ঐক্যসূত্র। প্রথম অর্থে বিজ্ঞান জ্ঞানবোধক এবং দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক। জীবনযুদ্ধে জয়যুক্ত হইবার জন্য চাই শুধু জ্ঞান নয়, আরও চাই প্রকৃতির নিত্য চঞ্চল ঘটনাপুঞ্জের সাথে তাল রাখিয়া চলিবার উপযোগী নিত্য নূতন উপকরণ। যদি প্রকৃতিকে করায়ত্ত করা না যায়, যদি তাহাকে প্রয়োজন মত ব্যবহার করা না যায়, তবে প্রকৃতিই থাকিয়া যাইবে প্রভু আর মানুষ তাহার দাসানুদাস। তাই মানুষ প্রকৃতির দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিতে চায়, প্রকৃতিকে মানিয়া লয় না—বেকনের ভাষায়, তাহাকে 'প্রশ্ন' অথবা জেরা করিয়া তাহার রহস্যাবৃত রূপটিকে উন্মুক্ত করে। "জ্ঞানই শক্তি"—অজ্ঞানান্ধকারে আলোকবর্তিকা। জ্ঞানই লক্ষ্য নির্দেশ করে এবং লক্ষ্যে পৌছিবার উপায় উদ্ভাবিত করে। অতএব, বিজ্ঞানের জ্ঞানাংশ ও ব্যবহারিক অংশের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। জ্ঞান ছাড়া ব্যবহারের সূত্র মিলে না, আবার ব্যবহারিক প্রয়োগ ছাড়া জ্ঞানও নিরর্থক। জ্ঞান ও কর্মের এই সংযোগ সূত্র মানিয়া না লইলে জীবন পথে চলা অসম্ভব।

জ্ঞান এবং ব্যবহার উভয়ই মানুষের জন্য এবং মানুষ-সাপেক্ষ। মানুষেরই বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের মানুষ নয়। কথাটি অতি সাধারণ বলিয়া মনে হইলেও, অধিকাংশ সাধারণ সত্যের ন্যায়, কার্যতঃ এইটিও পদে পদে অস্বীকৃত হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের প্রয়োগ-ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে মনে হয়, বিজ্ঞানী যেন অন্ততঃ সাময়িকভাবে ভুলিয়া গিয়াছেন যে, মানুষের জন্যই বিজ্ঞান—যে মানুষ বিজ্ঞানের জন্মদাতা সেই হইয়া দাঁড়ায় গৌণ। এই প্রসঙ্গে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বিখ্যাত খেদোক্তি—"মানুষ মানুষের কি দশা ঘটাইয়াছে"—মনে পড়ে। যেমন কোন কোন কৃপণ পরিণামে অর্থকেই উদ্দেশ্যে পরিণত করে, ভুলিয়া যায় যে, অর্থ, সুখ ও কর্তব্য সাধনের উপায় মাত্র, তেমনি বিজ্ঞানীও মানুষের দুর্বলতা দূর করিয়া জ্ঞানশক্তি লাভে প্রবৃত্ত হইয়া প্রায়ই ভুলিয়া যান বিজ্ঞান প্রচেষ্টার কেন্দ্র মানুষকে।

বিজ্ঞানে মানুষের স্থান প্রসঙ্গে প্রধানতঃ দুইটি মতবাদ পরিলক্ষিত হয়। একটি যান্ত্রিক কার্য-কারণ-বাদ এবং অপরটি উদ্দেশ্যমূলক কার্যকারণবাদ প্রথমটি বিশ্বের যাবতীয় ঘটনারাজির ন্যায় মানুষের সকল প্রকার আচরণকে কার্যকারণের পৌর্বাপর্যে পরিণত করে। ক, খ, গ, ঘ, ঙ, ইত্যাদি ঘটনাগুলির মধ্যে যেটি আর একটির নিয়ত ও অব্যবহিত পূর্ববর্তী সেটিই অপরটির কারণ। অতএব 'খ' ঘটনাটির মধ্যে এমন কিছু নূতনত্ব নাই যাহা ইহার নিয়ত ও অব্যবহিত পূর্ববর্তী 'ক' দ্বারা বোধগম্য নয়। এইরূপে 'গ' এই ঘটনাটির সকল ধর্মই 'খ' দ্বারা ব্যাখ্যাত হইতে পারে। অতএব মানুষ যে 'পুরুষকারের' দাবী করে তাহা বস্তুতঃ কয়েকটি পূর্ববর্তী ঘটনার অবশ্যম্ভাবী ফল। মানুষের

ভগবানে আত্মসমর্পণ বা অস্পৃহাও ঐরূপ নিয়ত অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনার ফল। বৃক্ষচ্যুত ভূপতিত আপেলটি যেমন প্রাথমিক বেগ, মাধ্যাকর্ষণ, বায়ুর চাপ প্রভৃতি কারণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তেমনি মানুষের সত্যসেবা, চরিত্রগঠন অথবা ঈশ্বরানুগত্যও কতক-গুলি নিয়ত ও অব্যবহিতভাবে পূর্ববর্তী ঘটনার দ্বারা সংঘটিত।

এই মতবাদে যন্ত্রের সহিত মানুষের কোন প্রকারগত বৈষম্য নাই, আছে শুধু পরিমাণগত পার্থক্য। মানুষও একটি যন্ত্রবিশেষ, শুধু একটি জটিল যন্ত্র মাত্র। সুতরাং মানুষ জড় অথবা জীবপ্রকৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এইরূপ দাবী অমূলক। জড় অপেক্ষা জীবেরও কোন শ্রেষ্ঠতা নাই। যদি পতনোন্মুখ প্রস্তরখণ্ডের অথবা বৃক্ষপত্রের ভাষা থাকিত তবে নিশ্চয়ই বলিত যে, সে স্বেচ্ছায় পড়িতেছে, তাহার পতনের পশ্চাতে কোন কারণ নাই। জড় এবং জীব একই আণবিক উপাদান হইতে উৎপন্ন। মানুষের আপন চরিত্রগঠনের কোন স্বাধীনতা নাই।

কিন্তু যান্ত্রিকবাদের গুরুত্ব স্বীকার করলেও মনুষ্যস্তরে ইহার সার্বভৌমত্ব স্বীকার অযৌক্তিক ও অনাবশ্যক। এই মতের আনুকূল্যে বিজ্ঞান অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই অগ্রগতি মানুষ সম্বন্ধে উদাসীন। বিজ্ঞান বাস্তবকে মানিয়া লয় এবং তাহার স্বরূপসন্ধানে ও ব্যবহারিক প্রয়োগে প্রবৃত্ত হয়। সে বাস্তব হইতে যাত্রাপথ সুরু করিয়া আবার বাস্তবেই ফিরে আসে। এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীটি শুধু জড়জগতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে কেন? জড়জগতের ন্যায় জীব ও মনের স্তরে ইহা সম্প্রসারিত হউক। প্রকৃতপক্ষে জৈব ও মানবস্তরে এমন কতকগুলি নূতন ঘটনার আবির্ভাব হয় যাহার নূতনত্ব অস্বীকার করিয়া আণবিক আদর্শে রূপান্তর চেষ্টা, নিতান্ত অসঙ্গত। এই নূতন ঘটনাগুলিকে বিকৃত করিবার চেষ্টায় বিরত হইয়া তাহাদের সম্মুখীন হওয়াই সঙ্গত। যদি তাহারা বাস্তবই হয় তবে তাহাদের বস্তুধর্ম উপেক্ষিত হইতে পারেনা। জৈবস্তরে আত্মরক্ষা এবং আত্মপ্রজনন এই দুইটি বৃত্তি এমনই মৌলিক যে, তাহাদিগকে শুধু পরমাণুপুঞ্জের সংযোগ বা বিয়োগ বলা যায়না। যদি পরমাণু সংঘাতেই জীবসৃষ্টি, তবে ইহা তো পরীক্ষাগারে জল উৎপাদনের ন্যায় সহজসাধ্য হইত। কিন্তু অদ্যাপি একটিও জীবন্ত জীবাণু উৎপন্ন করা যায় নাই। জীবের আত্মরক্ষা ও আত্ম-প্রজনন মূলক ধর্মগুলিকে কেবলমাত্র পরমাণু দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। জীবের সকল ক্রিয়াই উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করিয়া। স্বভাবতঃ আমরা এমন বস্তু হইতে দুঃখ পাই যাহা জীবনের প্রতিকূল। আমরা যদি প্রতিকূল বস্তুগুলি হইতেই সুখ অনুভব করি তবে বুঝিতে হইবে জীবনধারণের সম্ভাবনা নাই। যদিও জীবস্তরের ক্রিয়াগুলি জ্ঞাতসারে কোন উদ্দেশ্যাভিমুখী নয়, তথাপি তাহারা যে অজ্ঞাতসারে দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত হয় তাহা নিঃসন্দেহ।

জীবের ধর্মগুলিকে যেমন জড়ের মানদণ্ডে বিচার করা যায় না তেমনি মনের ধর্মগুলিও জড়ের অথবা জীবের স্তরে পরিণত হইতে পারে না। মনের স্তরে সর্বপ্রথমে চৈতন্যের আবির্ভাব হয়। সমস্ত জীবেই চেতনা আছে কিনা সন্দেহ থাকিলেও মনুষ্যস্তরে অন্যান্য জীব অপেক্ষা অধিক স্পষ্টভাবে চৈতন্যের অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। এখানে চৈতন্য স্বচৈতন্যে উন্নীত হয় যাহার গুণে মানুষ শুধু যে 'জানে' তাহাই নয় তদুপরি সে তাহার জানা সম্বন্ধেও জানে। মানসবৃত্তিগুলি সতত পরিবর্তিত হইতেছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও চৈতন্য তারতম্যবোধ বিশিষ্ট। অর্থাৎ 'আমার' ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তন ঘটিলেও, এইগুলি 'আমার' পরিবর্তন এবং সকল পরিবর্তনের মধ্যেও আমি 'আমিই' এই প্রকার একত্ব এবং তাদাত্ম্য বোধ একটি প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্য। তদুপরি জ্ঞান, বেদন এবং ইচ্ছামূলক ক্রিয়ানুসারে যথাক্রমে সত্যস্পৃহা, সৌন্দর্যানুভূতি,

চরিত্রগঠন এবং সর্বোপরি এই তিনটি পুরুষার্থই যেখানে সার্থক হইয়াছে, যেখান হইতে সত্য, শিব এবং সুন্দর ত্রিধারায় প্রসৃত এবং প্রবাহিত হইয়াছে এমন যে ধর্মবোধ, ইহারা সবই প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য। অতএব ইহাদিগকে অস্বীকার, মানুষের আত্মসম্ভ্রম-জ্ঞানকে খর্ব করারই নামান্তর মাত্র।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, নিছক যন্ত্রবাদ দ্বারা মানুষকে প্রাণহীন জড় ক্রীড়নক অথবা পুতুলে পরিণত করা হয়। অতএব এই মতে মানুষ সম্বন্ধে সম্যক্‌জ্ঞান লাভ তো অসম্ভব বটেই, যতটুকু জ্ঞানও বা সম্ভব হয় তাহা ভ্রান্ত এবং বিকৃত। মানুষ শুধু অতীতের গর্ভ হইতেই বর্তমানে ভাসিয়া ওঠেনা। সে শুধু নিয়ত অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘটনার অবশ্যম্ভাবী ফলমাত্র নয়। পক্ষান্তরে মানুষের সীমাহীন আশা ও অশেষ আকাঙ্ক্ষা তাহাকে টানিয়া লয় অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে। এই ভবিষ্যৎ বর্তমানে উদ্দেশ্যরূপে থাকিয়াই তাহাকে সম্মুখে ছুটাইয়া লয়। মানুষকে বুঝিতে হইলে সে কি ছিল শুধু তাহা বুঝিলেই হইবেনা, সে কি হইতে চায় তাহাও বুঝিতে হইবে। তাহার উদ্দেশ্যই তাহাকে পথ নির্দেশ করে। অতএব মানসস্তরে আসিয়া দেখা যায় যে, এখানে উদ্দেশ্যটি জীবস্তরের ন্যায় শুধু অজ্ঞাত নয়, কিন্তু জ্ঞাত ও স্বীকৃত।

আপত্তি উঠিতে পারে যে, এইভাবে জড় হইতে জীব ও মনকে পৃথক্‌ করিলে জগৎ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং একটি খণ্ডের সহিত আর একটি খণ্ডের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ অথবা অনবচ্ছেদ থাকে না। এই আশঙ্কা অমূলক। যন্ত্রবাদের সাহায্যে যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা ক্ষুণ্ণ না করিয়া উদ্দেশ্যবাদ সাহায্যে আমরা প্রথম মতের অমীমাংসিত জড়, জীব ও চেতনের প্রত্যক্ষসিদ্ধ মৌলিক পার্থক্য বুঝিতে পারি। এই মতানুসারে অনবচ্ছেদ সূত্রটিও অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তদুপরি যে বস্তুর যাহা স্বভাব তাহাকে একটুও বিকৃত করিতে হয়না। জড়, জীব ও চেতন এই তিনটি স্তরের মধ্যে কোথায়ও কোন ছেদ বা অবকাশ নাই। সৃষ্টির মধ্যে যে একটি প্রকাশ ও অগ্রগতির বেগধারা আছে তাহাই জড় হইতে জীবে, জীব হইতে মানুষে এবং মানুষ হইতে সত্য-শিব-সুন্দরে স্তরে স্তরে পদক্ষেপ করিয়া পরিণতি লাভ করে। একই অবিচ্ছিন্ন বেগধারা তাহার অন্তর্নিহিত ধর্মকে পরিপূর্ণভাবে সার্থক করিয়া প্রচেষ্টার প্রতিরূপে রূপায়িত।

বিশ্বের ক্রমবিকাশ ধারায় একটি কল্যাণাভিমুখী গতি আছে। বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানী ইহা স্বীকার ও প্রচার করিয়াছেন। নীতি অথবা ধর্ম এই ধারার বিরোধী নয়, যদিও যন্ত্রবাদী বিজ্ঞানীরা তাহাদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে বিশ্বের এই নীতি ও ধর্মাভিমুখী গতিকে স্বীকার করিতে পারেন না। আইনষ্টাইন্‌ তাঁহার The World as I see it পুস্তকে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, "আমি মনে করি যে, কি বিজ্ঞান, কি কলা, এতদুভয়েরই প্রধান কার্য হইতেছে একটি সার্বভৌম ধর্মবোধ জাগাইয়া তোলা এবং যাঁহারা ইহার অধিকারী, তাঁহাদের মধ্যে ইহাকে বাঁচাইয়া রাখা।" ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক্‌ তাহার 'Where is Science going ?' গ্রন্থে বিজ্ঞান ও ধর্মকে একটি অপরের পরিপূরক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। নীতির স্বপক্ষে তিনি বলিয়াছেন, "এখানে এবং এইক্ষণে অহমের স্বাধীনতা এবং কার্যকারণ পরম্পরা হইতে ইহার স্বাতন্ত্র্য এমন একটি সত্য যাহা মনুষ্য চেতনার প্রত্যক্ষ বাণী হইতে উদ্ভূত।" উপযুক্ত সার্বভৌম ধর্মবোধকেই আইনষ্টাইন তাঁহার বিপুল বিজ্ঞান সাধনার মূল উৎস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাহা ছাড়া জীনস্‌, এডিংটন, জুলিয়ন হাক্সলি প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা বিশ্বের মূলসূত্র হিসাবে ধর্ম ও নীতিকে মানিয়া লইয়াছেন।

সম্প্রতি ইউরোপে যন্ত্র-বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দেওয়ার ফলে মানবিক বিজ্ঞানগুলি প্রসার লাভ করিতেছে। যন্ত্রবাদী বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের নিজ নিজ কার্যে নিবিষ্ট থাকুন, কিন্তু মানবিক

বিজ্ঞানগুলি মানুষ সম্বন্ধে যে জ্ঞান সম্ভার পরিবেশণ করিতেছে সেদিকেও তাঁহারা অবহিত হউন। যদি যন্ত্রবাদী, মানুষের স্বরূপটি মনে রাখিয়া বিজ্ঞানে প্রবৃত্ত হন তবে মানুষ উদ্ভাবিত বিজ্ঞান ফ্র্যাঙ্কেন্‌ষ্টাইনের ন্যায় মানুষের ধ্বংস সাধনে উদ্যোগী হইবে না। নতুবা গর্ব ও অভিমানবশে বিজ্ঞানী তাঁহার জ্ঞান সাধনা হইতে মানুষকে বাদ দিয়া মানুষের ক্ষতি সাধনে যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইবেন, যেমন বিগত মহত্তর যুদ্ধে হইয়াছিলেন। মানুষ কি, সে কি চায়, তাহার অন্তর্নিহিত স্বভাব অনুযায়ী তাহার কি চাওয়া উচিত, তাহার চাওয়াকে পাইতে হইলে কিরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, উপায়টি উদ্দেশ্যের মতই ভাল হইবে কিনা, ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়া বিজ্ঞান চক্ষুষ্মান্‌ হইতে পারিবে না। মানুষ কি স্বার্থপর, না তাহার স্বভাবে পরার্থপরতা স্বার্থপরতার ন্যায় রহিয়াছে? মানুষ কেন আত্মকেন্দ্রিক না হইয়া পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি গোষ্ঠীগত জীবনে সঙ্ঘবদ্ধ হইল? যদি বিজ্ঞানী বুঝিতে পারেন যে, এই সকল প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে তিনি অপারগ, তাহা হইলে যাঁহারা অধিকারী তাহাদের সহযোগীতা তাঁহাকে লাভ করিতে হইবে।

আজকাল অনেকেই বলিতেছেন যে মানবিক বিজ্ঞানগুলির যতটা মনোযোগ আকর্ষণ করা উচিত ছিল ততটা তাহারা করে নাই। অতএব যে সকল বিজ্ঞান মানুষকে প্রত্যক্ষভাবে কেন্দ্র করিয়া জ্ঞান সাধনায় লিপ্ত হয় তাহাদিগকে গুরুত্ব দিতে হইবে। মনোবিদ্যা মানবিক বিজ্ঞানগুলির শীর্ষস্থানীয়, অথচ মনোবিদ্যাকে অনেকে বিজ্ঞান বলিয়াই স্বীকার করিতে চাহেন না। একটু অনুধাবন করিলেই এই আপত্তির কারণ দেখা যাইবে। প্রথমতঃ মানুষ বহির্মুখী। 'আমি লিখিতেছি'—বাহিরের ঘটনা হিসাবে জ্ঞাত হইলেও ইহা একটি মানস জ্ঞান হিসাবে স্পষ্টভাবে জ্ঞাত নয়, ইহা জানিতে হইলে মনকে অন্তর্মুখী করা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেকের ধারণা যে, তাহার মন তাহার নিকট সুস্পষ্ট, অতএব এই মন লইয়া বিজ্ঞানীর গবেষণা নিষ্প্রয়োজন এবং অসম্ভব। মন সম্বন্ধে জ্ঞান যদি সহজাত হয় তবে মনোবিদ্যা নিষ্প্রয়োজন। পুনশ্চ, যেহেতু মন ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ, মন সম্বন্ধে কোন সাধারণ জ্ঞান, যাহা সকলের মন সম্বন্ধেই সত্য, অসম্ভব, অতএব মনোবিদ্যাও অসম্ভব।

এই জাতীয় যুক্তিগুলি ভ্রান্ত। প্রথমতঃ মন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে যে অন্তর্মুখী ও নিস্পৃহ দৃষ্টি আবশ্যক তাহা বহু শিক্ষা ও অনুশীলন সাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ মনের জ্ঞান সহজাত নয়, কারণ তাহা হইলে মন সম্বন্ধে মতবিরোধ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। তৃতীয়তঃ মন সম্বন্ধে সর্বসাধারণ জ্ঞান অথবা মনোবিদ্যা অসম্ভব নয়। প্রত্যেক বিজ্ঞানী মনন দ্বারাই পর্যবেক্ষণ অথবা সত্যনিরূপণ করেন। সকলের জ্ঞানই তাঁহাদের নিজস্ব। অথচ এই নিজস্ব জ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞানী যে সত্যে উপনীত হন তাহা কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, তাহা সর্বসাধারণ। মনোবিৎও মন সম্বন্ধে কতকগুলি সর্বসাধারণ সত্য আবিষ্কার করেন। যদিও প্রত্যেকের অন্তর্নিরীক্ষণ প্রত্যেকের নিজস্ব, তথাপি এই কারণে অন্তর্নিরীক্ষণের ফল মনোবিদের বক্তিগত থাকে না, সর্বসাধারণে ব্যাপ্ত হয়। কারণ মানস বৃত্তিটিও পদার্থবিদের শব্দ অথবা চুম্বকের মত— মনোবিদের সৃষ্ট নয়, পরন্তু তাহা বাস্তব। যদিও জ্ঞান প্রক্রিয়াটি সকল বিজ্ঞানের মত মনোবিদ্যায়ও ব্যক্তিগত, কিন্তু ফলটি সার্বভৌম। মনোবিদ্যা শুধু বিজ্ঞানই নয়, ইহা একটি প্রয়োগবিজ্ঞান। মনোবিৎ মনকে শুধু তাহার স্বাভাবিক ক্রিয়ায়ই পর্যবেক্ষণ করেন না। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় নিজকৃত অবস্থার মধ্যে কোন উত্তেজকের সাহায্যে মানসবৃত্তি উৎপন্ন করিয়া, একবারে সত্য নির্ধারণ করিতে না পারিলে পুনঃ পুনঃ পর্যবেক্ষণ করিয়া সত্য নিরূপণ করেন।

শুধু তাই নয়, মনোবিদ্যা সকল বিজ্ঞানেরই মূলে রহিয়াছে। বিজ্ঞান মনেরই একটি ক্রিয়া। মনের জ্ঞানস্পৃহা এবং নানা প্রকার অভাব বোধই

বিজ্ঞান প্রবৃত্তির মূল কারণ। অতএব বিজ্ঞানী এমন মনবিশিষ্ট ব্যক্তি যিনি সকল রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া জ্ঞানলোকে উত্তীর্ণ হন। বিজ্ঞানীর মন যদি রোগগ্রস্ত হয় তবে তাঁহার আবিষ্কার রোগদুষ্ট হইবে। বিজ্ঞানীর ইন্দ্রিয়গুলি, যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি যদি বিকারগ্রস্ত হয় তাহার ফলগুলিও বিকৃত হইবে। 'দেখা' 'শোনা' 'ঘ্রাণ লওয়া', 'স্পর্শ করা' প্রভৃতি মানস বৃত্তিগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকিলে বিজ্ঞানীর সকল গবেষণা স্বভাব বিরুদ্ধ হইবে। অতএব বিজ্ঞানী যে মনোবিদ্যাকে 'ব্যক্তিগত ব্যাপার'—এই আপত্তি দ্বারা খণ্ডিত করিবেন তাহার আর উপায় নাই, কারণ, তাহা হইলে সকল বিজ্ঞানই 'ব্যক্তিগত ব্যাপারে' পর্যবসিত হয়। (মনোবিদ্যাকে ব্যক্তিগত আখ্যা হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে, মনোবিদ্যার সহিত সকল বিজ্ঞানই একই দশা প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞানরূপে প্রতিষ্ঠা করা নিতান্ত আবশ্যক এবং প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াই রহিয়াছে।) মনোবিদ্যার জ্ঞানক্রিয়াটি অন্যান্য বিজ্ঞানেরই মত ব্যক্তিগত হইলেও জ্ঞানের বিষয়-বস্তু এবং জ্ঞানের পদ্ধতিটি নির্ব্যৈক্তিক অথবা নিস্পৃহ। অন্তর্নিরীক্ষণ পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রনাধীন অবস্থার মধ্যে প্রয়োজন মত উদ্দীপকের সাহায্যে অভিপ্রেত মানসক্রিয়ার উৎপাদন, যন্ত্র সাহায্য প্রয়োগফলের সূক্ষ্মতা অথবা নিশ্চয়তা বিধান এবং অঙ্ক সাহায্যে ফলের হিসাব, ইত্যাদি দ্বারা মনোবিদ্যার সমাধানগুলিকে নিস্পৃহ, নির্ব্যৈক্তিক এবং সার্বভৌম স্তরে উন্নীত করা যায়।

মনোবিদ্যা সম্বন্ধে এই কথাগুলি প্রসঙ্গক্রমে উঠিয়াছিল। প্রসঙ্গটি এই যে, মানুষই যদি বিজ্ঞানের কেন্দ্র হয় তবে মানুষ যাহার জন্য মানুষ সেই মনই বিজ্ঞানের লক্ষ্যস্থল। প্রত্যক্ষভাবে মন বিজ্ঞানের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকৃত না হইলেও বিজ্ঞান যে একটি অতি উচ্চতর মানসিক বৃত্তির সহিত সংশ্লিষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গেই মনোবিদ্যার কিঞ্চিৎ আলোচনা হইল। কিন্তু মানুষকে কেন্দ্র করিয়া বিজ্ঞানের যে স্থান নিরূপিত হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে একটি প্রবল আপত্তি রহিয়াছে। মানুষকেন্দ্রিক বিজ্ঞান, পৃথিবীকেন্দ্রিক সৌরমণ্ডলের সমসাময়িক। বিশ্ব এখন সূর্যকেন্দ্রিক, পৃথিবী এবং তাহার অধিবাসী মানুষ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে। মানুষের দৃষ্টি অনেক দূরে প্রসারিত হইয়াছে। বিজ্ঞানীর চোখের সম্মুখে একটি বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের যবনিকা উন্মোচিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় বিজ্ঞানী কেন শুধু মানুষকেই আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকিবেন? কিন্তু বাহ্যবিশ্বের বিরাটরূপের সাথে সাথে মানুষেরও একটি অসীম রূপ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকে উদ্ভাসিত করে নাই কি? বিজ্ঞানী যাহা লইয়াই থাকুন না কেন, তিনি মানুষ, তাঁহার প্রচেষ্টা মানুষের এবং তাঁহার জ্ঞানভাণ্ডার মানুষের ক্ষুধার অন্ন। কোন বিশেষ ব্যক্তির কথা বলা হইতেছে না, বলা হইতেছে মানুষ সাধারণের কথা, যে মানুষকে মহামতি কোম্‌ত ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়াছিলেন। কোন বিশেষ মানুষ বিজ্ঞানের লক্ষ্য নয়, কারণ বিজ্ঞান নির্ব্যৈক্তিক এবং নিস্পৃহ। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—এই দৃষ্টিতে মানুষকে বিজ্ঞানের কেন্দ্র বলা হইয়াছে। বিজ্ঞান মানুষের নানাপ্রকার অভাব বোধ, তাহার জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দের ক্ষুধা মিটাইতে চায়। মানুষের প্রয়োজনেই বিজ্ঞান। সুতরাং মানুষের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা ও দরদ লইয়াই যদি বিজ্ঞান প্রবৃত্ত হয়, তবেই ইহা জগতের কল্যাণে নিয়োজিত হইবে। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা বিজ্ঞানীকে ন্যায় ও ধর্মনিষ্ঠ করিয়া তুলিবে এবং জ্ঞান শক্তি সাধনায় অথবা শক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগে মাত্রাজ্ঞান প্রদান করিয়া বিজ্ঞানীকে জগতের দুঃখ মোচনে অধিকতর সক্ষম করিবে।

পাকানো সুতার অসমতা বিধানে পাঁজের ক্রমিক সূক্ষ্মতা এবং আঁশের গুণাগুণের প্রভাব

শ্রীকামাখ্যারঞ্জন সেন

আমরা সবাই জানি যে যাঁরা চরখায় সুতা কাটেন তাঁরা প্রথমে পাঁজ তৈরী ও পাঁজের ক্রমিক সূক্ষ্মতা সম্পাদন করে, পরিশেষে পাক দিয়ে বয়ন-বস্তুর অন্তর্বর্ত্তী, নানাভাবে বিরাজমান তন্তু বা আঁশ সমূহকে নিয়ন্ত্রনাধীন ক'রে সুতা প্রস্তুত করেন। সুতা প্রস্তুত করবার যে সব বড় বড় কল আছে, তাতেও এই ক্রিয়াগুলির প্রত্যেকটিই সম্পাদিত হয়। মেশিনে সুতা প্রস্তুত-প্রণালী অনুসারে সমগ্রভাবে সুনিয়ন্ত্রিত একটি তন্তু-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। প্রবাহের প্রধান গতির সমসাময়িকভাবে তন্তুরাশি কর্তৃক পরস্পরকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া সুতাকাটার মেশিন-প্রণালীর অপর একটি বিশিষ্ট কার্যক্রম। এইরূপ পরস্পরকে অতিক্রম করার মধ্য দিয়েই পাঁজের সূক্ষ্মতা সম্পাদিত হয়। এই যে দুইটি বিভিন্ন গতি দ্বারা (একটি সর্বসাধারণ ও অপরটি আপেক্ষিক) তন্তুসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, সেই গতিদ্বয় প্রত্যেকটি তন্তুর উপর আরোপিত এবং পরস্পর নিরপেক্ষ। এই উভয় প্রকার গতিই সংসাধিত হয় সম্মুখে এবং পশ্চাতে, বিভিন্ন বেগে ঘূর্ণায়মান, পরস্পর সংলগ্ন যুগ্ম ডলনা দ্বারা। সম্মুখের (অর্থাৎ তন্তু সমূহ ক্ষীণ কলেবর পাঁজরূপে যেখানে কল হ'তে বেরিয়ে আসে সে দিকের) রোলারদ্বয়ের গতিবেগ পশ্চাতের রোলারদ্বয়ের বেগ হ'তে একটু অধিক থাকায় সম্মুখের দিকে একটা আকর্ষণ শক্তির সৃষ্টি হয়। এই শক্তি বয়ন বস্তুর যে সব আঁশ পশ্চাতের রোলারদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, তাদের সবগুলিকেই একমুখীভাবে প্রচলিত করে। সমস্ত পথ ব্যাপেই আঁশগুলি পরস্পর সংলগ্ন থাকে। সমষ্টিগত সাধারণ গতির উপর ব্যষ্টিগত আপেক্ষিক গতি আরোপিত হয় সম্মুখের এবং পশ্চাতের রোলার ব্যবস্থাকে পরস্পরের নিকট হইতে উপযুক্ত পরিমাণে বিচ্ছিন্ন করে।' এই দুই জোড়া রোলারের মধ্যে দূরত্ব অধিকাংশ আঁশের দৈর্ঘমানের চেয়ে বেশী হওয়া প্রয়োজন। কারণ, অন্যথায় যে আঁশ একই সময়ে উভয় রোলার-ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ হইবে, তাহাই রোলার ব্যবস্থার গতির তারতম্য হেতু ছিড়িয়া ছোট হ'য়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। অপরতঃ রোলার ব্যবস্থার বিচ্ছেদ আঁশের একুন দৈর্ঘ হইতে বড় হওয়ায়, প্রত্যেকটি আঁশের গতিকালে এমন এক সময় উপস্থিত হয় যখন আঁশটি উভয় রোলার ব্যবস্থা হইতে সম্পুর্ণ আলাদা হ'য়ে অন্তর্বর্ত্তী স্থানে অবস্থান করে। সেই সময় উভয় রোলার ব্যবস্থার কোনও না কোনওটি কর্তৃক ধৃত অন্যান্য আঁশ সমূহে গঠিত চক্র-জালিকার অভ্যন্তরে থাকায় এই রোলার-বিচ্ছিন্ন আঁশটির পার্শ্বদেশে স্থানবিচ্যুতি হয় না। কিন্তু এই রোলার চ্যুত আঁশের গতি সম্মুখস্থ রোলার ব্যবস্থায় ধৃত যে কোনও আঁশ হইতে মৃদুতর হয়। কারণ এই আঁশের গাত্র সংলগ্ন যে আঁশ সম্মুখস্থ রোলারদ্বয়ের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় সম্মুখের দিকে আকৃষ্ট হ'য়ে, বর্ধিত গতিতে ধাবমান হয়, শুধু উহার ঘর্ষণজনিত আকর্ষণ শক্তির দ্বারাই ইহা সম্মুখে পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলতঃ রোলার বিচ্ছিন্ন স্বল্পগতি আঁশকে অধিকতর পিছনে ফেলে ক্রমশঃ স্পর্শমুক্ত হয়ে, রোলারে আবদ্ধ আঁশ এগিয়ে যায়। এইভাবে সমষ্টিগত গতির উপর ব্যষ্টিগত গতি পর পর

বিভিন্ন মেশিনের ভিতর দিয়ে যাওয়ার কালে পাঁজের ক্রমিক সূক্ষ্মতা সম্পাদন করে। ইহাই সূতা প্রস্তুত-প্রণালীর মূল দুইটি কথার প্রথম ও প্রধান বিষয়। দ্বিতীয়টি হল সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত পাঁজে পাক দেওয়ার ব্যবস্থা।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, বয়নতন্তুর সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত যে দুইটি গতির বিষয় উপরে আলোচিত হল, সেই দুইটি গতিই, ব্যবহারিকভাবে বলতে গেলে, একেবারে অবিমিশ্র নয়। আঁশের ওজন, ঘর্ষণ-ক্ষমতা এবং অন্যান্য গুণাগুণের আতিশয্য বা লঘুতা অনুযায়ী প্রবহমান তন্তুরাশির মধ্যে ইতস্ততঃ বিভিন্নমুখী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিরও সঞ্চার হয়ে থাকে। তাতে কোনও আঁশের গতি হয়তো বা বর্দ্ধিত অথবা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে, হয় কোনও স্থানে প্রায়োজনাতিরিক্ত তন্তু জমা হয়, না হয় কোনও অংশে প্রয়োজনীয় পরিমাণ তন্তুর অভাব ঘটে। এটা বোঝা সহজ যে, যেহেতু মোটের উপর সাধারণ গতির সমতা প্রযুক্ত তন্তু-প্রবাহ প্রায় স্থির পরিমাণে পশ্চাতের রোলারদ্বয় কর্তৃক নিষ্কাশিত হয়, তাই কোনও স্থানে প্রয়োজনের তুলনায় আঁশের সমাবেশের ফলে পশ্চাতে অধিক পরিমাণে তন্তু জড় হওয়াই সম্ভব। এইভাবেই সুতায় স্থূল ও সূক্ষ্ম স্থান জন্মায় এবং সুতার গাত্র অসমতাপ্রাপ্ত হয়।

অসম স্থানের ঘনসন্নিবেশ এবং স্থূলতা ও সূক্ষ্মতার পরিমাপই সুতার অসমতা নির্ণায়ক। যদি কোনও সুতার যথেচ্ছ স্থান থেকে একই দৈর্ঘের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ কেটে নিয়ে প্রত্যেকটি আলাদাভাবে ওজন করা যায়, অথবা সুতার বিভিন্ন অংশের স্থূলত্ব অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায়, তাহলে এই সব এক জাতীয় পরিমাণের সংখ্যাশাস্ত্রানুযায়ী ভেদ-গুণক নিরূপণ পূর্বক অসমতার এক প্রকার পরিমাপ স্থির করা সম্ভব। সুতার বিভিন্ন অংশের ভারবহন-ক্ষমতা পরীক্ষান্তে তদীয় ফলাফলের ভেদ-গুণক দ্বারাও অসমতার পরিমাপ করা যায়। যদি আঁশের বস্তুগত ঘনত্ব সব আঁশেই সমান হয়, একমাত্র তাহলেই প্রথমোক্ত দুই প্রকার পরিমাপ পরস্পর সন্নিহিত হতে পারে। 'নাইলন' প্রভৃতি মানুষের সৃষ্ট তন্তু, এবং কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি তন্তুর বস্তুগত ঘনত্বের সমতা হেতু এইসব তন্তুজাত সুতা সম্বন্ধে দুইটির যে কোনও একটি উপায়ে অসমতা নিরূপণ করা বিধেয়। যেহেতু তুলার অপক্ক আঁশ এবং পূর্ণপক্ক আঁশে বস্তুগত ঘনত্ব সমান না হওয়াই সম্ভব (কারণ, অপক্ক আঁশে শুধুমাত্র প্রাথমিক আবরণ থাকে, পরন্তু পূর্ণপক্ক আঁশে প্রাথমিক ও গৌণ উভয় প্রকারই বিদ্যমান) সেইজন্য তুলাজাত সুতার অসমতা প্রথমোক্ত দুইটি উপায়েই নির্ণীত হলে উভয় পরিমাপের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান সম্ভব। অপরতঃ, ভারবহন ক্ষমতা সাধারণভাবে ওজনের অনুগামী হলেও পরস্পরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয় না। কারণ, কোনও একটুকরা সুতার একমাথা দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া যদি অপর মাথায় দৈর্ঘ বরাবর ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু বল প্রয়োগ করা যায় তবে একসময় সুতাটি হঠাৎ একাংশে ছিঁড়ে যায়। স্বতঃই বুঝা যায় যে, যেই স্থানে সুতাটি ছিঁড়ে, অপরাপর স্থানের তুলনায় সেই স্থানের দুর্বলতা অধিকতর। সুতার কোনও অংশ বিশেষের দুর্বলতা সেই অংশে অবস্থিত আঁশের জমায়েত সংখ্যা ছাড়াও অন্য কারণে হওয়া সম্ভব। যথা, আলো বাতাসের রাসায়নিক ক্রিয়া, সুতার পরীক্ষাপূর্ব ব্যবহার, দুর্বল আঁশ সমূহের একটি বিশেষ স্থানে একত্রীভবন ইত্যাদি। এই সব কারণের দ্বারা সুতার অংশ বিশেষের ওজন কিঞ্চিৎ প্রভাবিত হওয়া সম্ভব বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। অতএব দেখা গেল যে, সুতার অসমতা কিভাবে নিরূপিত হলে তৎসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য পূর্ণাঙ্গভাবে লাভ হওয়া সম্ভব, ইহা তর্কের ব্যাপার। ভারবহন ক্ষমতা নির্ণয় করে সুতার অসমতা নির্দ্ধারণের আরও একটি দিক আছে। এই ক্ষমতা সাধারণতঃ আঁশের দৈর্ঘের তুলনায়

বহুগুণ অধিকতর লম্বা সুতার উপরই পরীক্ষিত হয়। যথা, তুলার আঁশ ২ইঞ্চি পরিমাণ দীর্ঘ হতে পারে, কিন্তু সুতার ভারবহন ক্ষমতা সাধারণতঃ পরীক্ষিত হয় অন্যূন ১২ইঞ্চি দৈর্ঘের উপর; সুতার অভ্যন্তরে পাটের আঁশের দৈর্ঘের পরিমাণ প্রায় ৫ইঞ্চি, কিন্তু সুতার শক্তি পরীক্ষার জন্য সধারণতঃ ২৪ইঞ্চি দৈর্ঘ লওয়া হয়। এ অবস্থায় ভারবহন ক্ষমতার ভেদ-গুণক দ্বারা সুতার স্বল্প-দীর্ঘ অংশের অসমতার পরিমাপ সম্ভব নয়। অপর পক্ষে অনুবীক্ষণে স্থূলত্ব ও লঘুত্ব নির্ণয়দ্বারা ঘনতম অসমতারও পরিমাপ হয়। কিন্তু এ কার্যও বিঘ্নসংকুল। কারণ সুতার উপরিভাগের আঁশগুলি সাধারণতঃ ঢিলাভাবে সংযোজিত হয়ে উহার প্রকৃত প্রশস্ততা আচ্ছন্ন করে রাখে।

আঁশের বস্তুগত গুণাগুণ কি প্রকারে সুতার অসমতা সম্পাদনে সহায়তা করে এইবার তাহাই বিবেচ্য। মার্টিনডেল (১) দেখিয়েছেন যে, বয়ন-তন্তুর কোনও নমুনার অন্তর্গত আঁশগুলি, একে অন্যের সহিত গুণাগুণের প্রভেদ হেতু, পাঁজের মধ্যে অনির্দিষ্টভাবে বণ্টিত থাকে বলেই মেশিনের ভিতর দিয়ে যাওয়ার কালেও অংশগুলির গুণাবলীর বণ্টনভেদ বজায় থাকে। এবং শুধু এই অনির্দিষ্ট বণ্টনবিভেদের জন্যই তৈয়ারী সুতায় যথেষ্ট পরিমাণে অসমতা উৎপন্ন হতে পারে। মেশিন যদি নিখুঁতও হয়, তবুও এ কারণে সুতার অসমতা অবশ্যম্ভাবী। এভাবে প্রজনিত অসমতাকে মূল-অসমতা বলা যেতে পারে। কোনও স্বভাবজাত তন্তু হতে সুতা উৎপাদন কার্যে এরূপ অসমতার সৃষ্টি অপরিহার্য। কিন্তু যদি নমুনার অন্তর্গত সব আঁশ সমগুণবিশিষ্ট হয়, তবে অনির্দিষ্ট বণ্টনের কোনও অর্থ থাকে না। এবং সেই ক্ষেত্রেই মূল অসমতা অদৃশ্য হয়। মানুষের সৃষ্ট তন্তু বহুলাংশে সমগুণ বিশিষ্ট; তাই তা হতে উৎপন্ন সুতার মূল অসমতাও অতি সামান্য। পাটের সম্বন্ধে বর্তমান লেখক দেখিয়েছেন (২) যে, এরূপ মূল অসমতা আঁশের ব্যষ্টিগত জটিলতা এবং মোট দৈর্ঘ, উভয়ের দ্বারাই যৌগিক পরিমাণে বর্ধিত হতে পারে। তুলার আঁশে জটিলতার বালাই নাই; তাই উহা হতে প্রস্তুত সুতার অসমতা পাটের সুতার অসমতা অপেক্ষা স্বল্পতর। পশমে আঁশের জটিলতা না থাকলেও উহার স্বাভাবিক কুঞ্চন এবং শল্কাবরণ সুতার অসমতা বৃদ্ধির সহায়ক। কাজেই দেখা যায় যে, আঁশের ব্যষ্টিগত গুণাগুণের প্রভেদ আছে বলেই মূল অসমতা সুতায় পরি-লক্ষিত হয়। এবং ঐ সব গুণাগুণের বিশেষত্ব এবং বিভেদের উগ্রতা মূল অসমতার উপর অধিকতর অসমতার সৃষ্টি করে।

সুতার অসমতার রূপ দ্বিবিধ, উহা আমরা পূর্বেই দেখিয়েছি। তার একটা হল অসমতার ঘনত্ব এবং অপরটা স্থানীয় আপেক্ষিক বিস্তার। পাঁজের লঘুকরণ পরম্পরায় গুণাগুণের প্রভেদ সম্পন্ন প্রত্যেকটি আঁশ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পরস্পর সন্নিবিষ্ট হয়ে জপমালার ন্যায় অসম আকারে গঠিত সুতায় পরিণত হয় তা আমরা পূর্বেই জানিয়েছি। বর্তমানে মেশিনের যে পরিমাণ পূর্ণতা সম্পাদিত হয়েছে তাতে সুতার পরি দৃশ্যমান অসমতার প্রায় সমস্তটাই লঘুকরণ প্রথার তরঙ্গায়ন-প্রসূত বলে অভিহিত করা যায়। বল্‌স্ (৩) দেখিয়েছেন যে, তুলাজাত সুতার অসমতায় পরম্পরাপেক্ষিক স্থানীয় বিস্তার পাঁজের লঘুতায় উগ্রতর হয়। একথা মনে রাখতে হবে যে, পাঁজ স্থূল হলেও অসমতা তৎপ্রজনিত সুতায় বিরাজিত থাকে, যদিও হয়তো তা নগ্ন দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না। যখন পাঁজ খুবই লঘু অবস্থায় আসে, অর্থাৎ পাক দেওয়ার পূর্বে, অসমতার পরিমাণ নিঃসন্দেহে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। (৪) বল্‌স্ ইহাও দেখিয়েছেন যে, প্রত্যেক দফায় লঘুকরণ কালে যে অসমতার আবির্ভাব হয় তার সবটাই পরিণত সুতায় বিদ্যমান থাকে। শুধু অনুবর্তী লঘুকরণ বিধানের ফলে, কোনও স্থূলাংশের কিঞ্চিৎ আঁশ পার্শ্ববর্তী স্থূল বা সূক্ষ্মাংশে স্থানান্তরিত হতে পারে। অথবা

কোনও অংশ আপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতর হতে পারে। ফলে তরঙ্গায়িত অবস্থা সম্পূর্ণ বর্তমান থাকলেও পরস্পরের নৈকট্য বা আপেক্ষিক স্থানীয় বিস্তার পরিবর্ত্তিত হতে পারে।

পূর্বোক্ত আলোচনার ফলে দেখা যায় যে, সুতার অসমতার ঘনত্ব নিম্নোক্ত কারণগুলি দ্বারা প্রভাবিত হয়—

(ক) প্রথম ও তদনুবর্তী লঘুকরণ প্রথায় পাঁজের প্রত্যেকটি আঁশের গতিনিয়ন্ত্রণ ;

(খ) উপর্যুপরি লঘুকরণ প্রথার প্রয়োগে তরঙ্গসমূহের দূরান্তরণ ; এবং

(গ) কোনও লঘূকরণ প্রথায় উৎপন্ন উগ্র অসমতার পরবর্তী লঘূকরণ বিধানে বিস্তার লাভ।

অপরতঃ, আপেক্ষিক স্থানীয় বিস্তার নির্ভর করে এই কয়টি অবস্থার উপর—

(ক) প্রাথমিক লঘূকরণ প্রথায় নিয়োজিত পাঁজের গুরুত্ব ;

(খ) কোনও একবারের তরঙ্গ সৃষ্টির অনুবর্তী লঘুকরণ প্রথার সংখ্যা ; এবং

(গ) পাশাপাশি ব্যবস্থিত তরঙ্গচূড়া বা খোল কর্তৃক তন্তু বিনিময়ে, পরস্পরের নিয়ামন।

এখন দেখা যাক, সুতার ব্যবহারিক কার্যকারিতায় অসমতার প্রভাব কি প্রকারে ঘটতে পারে। স্থূল ও সূক্ষ্ম অংশগুলি অত্যধিক উগ্রতাসম্পন্ন হলে সুতা দেখতে অতি বিশ্রী হয়। পাটের বস্তার জন্য তৈরী সুতায় অনেক সময় স্থূল ও সূক্ষ্ম অংশের এরূপ দৃষ্টিকটু উগ্রতা পরিলক্ষিত হয়। তুলা হতে উৎপন্ন সুতা যদিও খোলা চোখে সমতাসম্পন্নই মনে হয়, তথাপি অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করলে বহুল পরিমাণে অসমতা দেখা যায়। এই রকম সুতা দৃষ্টিকটু না হলেও, বিদ্যমান অসমতার প্রাবল্য সুতার ভারবহন-ক্ষমতা ব্যহত করে। কারণ সুতা যত অসমতা-সম্পন্ন হয়, ততই উহার কোনও না কোনও অংশের অতিরিক্ত দুর্বল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। বল্‌স্-এর পরীক্ষার ফলে জানা যায় (৫) যে, সুতার স্থূল অংশে কম এবং সূক্ষ্ম অংশে বেশী পাক সন্নিবিষ্ট থাকে। অধিকন্তু, যখন সুতায় টান পড়ে তখন স্থূল অংশ হতে পাক সূক্ষ্ম অংশে পরিক্রম করে। ফলে, সূক্ষ্মাংশে অতিরিক্ত পরিমাণ পাকের দরুণ সুতার ভারবহন-ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আবার, সুতার স্থূলাংশে পাকের স্বল্পতা সুতাকে নরম করে, এবং বস্ত্রবয়নের পর ধোবীশালায় ইস্ত্রি করার সময় তৎস্থানের আঁশগুলি ছড়িয়ে পড়ে। তাতে শুধু বস্ত্রের স্থায়িত্বই ব্যহত হয় না, পরন্তু রঙীন বস্ত্র হলে ছড়িয়ে পড়া অংশের রংও ফিকে দেখায়।

বস্ত্রবয়ন বা বস্ত্রের ব্যবহারকালে এবং ধোবীশালায় সুতার উপর যে বল প্রয়োগ চলে, তাতে সুতার স্থূল বা নরম অংশ এবং সূক্ষ্ম বা শক্ত অংশ দৈর্ঘ বিস্তার বা পুনঃ সংকোচ সম্বন্ধে সমান ভাবে সাড়া দেয় না। এরূপ অসম প্রসার বা সংকুচনের ফলে বস্ত্রের স্থায়িত্ব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। যাঁরা সচরাচর খদ্দর ব্যবহার করেন তাঁরা জানেন যে, খদ্দর একবার ধ্বংসোন্মুখী হলে উহাকে রক্ষা করা কষ্টকর। হাতে তৈরী সুতায় সাধারণতঃ অসমতা বেশী এবং উগ্রতর থাকে বলেই খদ্দরের এই ত্রুটি লক্ষিত হয়।

---

(১) জে, জে, মার্টিনডেল—জে, টি, আই—৩৬, ৩, ১৯৪৫। (২) কে, আর; সেন ও সি, আর, নডার-টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ মেময়ার (আই, সি, জে, সি) নং ৭, ১৯৪৪। (৩) ডব্লিউ, এল, বল্‌স্ "ষ্টাডিজ অফ কোয়ালিটি ইন কটন", পৃঃ ৮৩, ১৯২৮। (৪) ডব্লিউ, এল, বল্‌স্—ঐ, পৃঃ ১২৬-২৭। (৫) ডব্লিউ, এল, বল্‌স্—ঐ।

রাসায়নিক শক্তি ও তাহার ব্যবহার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

প্রচণ্ড দাবানল যখন অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া বনানীকে ভস্মীভূত ও বিধ্বস্ত করিয়াছে, তখন পশুপক্ষীর সঙ্গে আদিম বনবাসী মানবও ভয়ে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হইয়া পলাইয়াছে, আর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিয়াছে, এ আগুন কোথা হইতে আসিল। তাহার পর একদিন যখন সে দুইখণ্ড অরণি-ঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপাদনে সক্ষম হইয়াছিল, সেইদিনই, সে নিজে বুঝিতে না পারিলেও, এমনই একটি আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছিল, যাহা মানবজাতির ভাবী ইতিহাসে এক বিরাট অবদান-রূপে প্রতিভাত হইবে। এই অগ্নি-প্রজ্বালন যে এক রাসায়নিক ক্রিয়া,—যাহার ফলে শক্তি প্রকাশিত হয়, এই তত্ত্ব সে সম্পূর্ণ অজানাভাবে সেদিন আবিষ্কার করিলেও, ইহাই মাত্র তাহার বোধগম্য হইয়াছিল যে, যে আগুনের আবির্ভাব তাহাকে অভিভূত করিয়াছিল, তাহার উৎপাদন তাহার করায়ত্ত।

ক্রমে, অগ্নির সাহায্যে মানব ভাল খাবার প্রস্তুত করিতে শিখিল, শীতের রাত্রে আগুন পোহাইয়া তৃপ্তি-লাভ করিল। আত্ম-প্রয়োজন সিদ্ধির পর সেই আগুনে সে শত্রুর গৃহ পোড়াইতেও শিখিল। ইহারই বহুকাল পরে, রাসায়নিক-ক্রিয়া সম্ভূত শক্তি কিভাবে গতি-শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, তাহাও মানুষ শিখিল। তবে, তাহার সেই জ্ঞান ব্যবহৃত হইয়াছিল সমাজ সংগঠনের জন্য নয়, ধ্বংসের দেবতাকে জাগাইয়া দিয়া তাহার তাণ্ডবলীলা দর্শন করিবার জন্যই।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে খৃষ্টান পাদরী, রোজার বেকন আবিষ্কার করেন যে, সোরা, গন্ধক, ও কয়লা সহযোগে এক অতি দ্রুত দহনশীল বস্তু প্রস্তুত করা যায়। এই আবিষ্কারও প্রযুক্ত হইতে লাগিল, শত্রুর রণপোত বা সুরক্ষিত দুর্গ ইত্যাদিতে ভারী ভারী গোলা নিক্ষেপ কার্যে। তারপর কয়েক শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, পাল-বাহিত জাহাজ বন্দুকাদি নানাপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সপ্তসমুদ্র পরিভ্রমণ করিলেও, জাহাজ চালাইবার অন্য কোন কৌশল আবিষ্কৃত হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে, অগ্নিশক্তির সহায়ে জলীয় বাষ্প উৎপাদন ও তাহার প্রভাবে যন্ত্র-পরিচালনা করিবার কৌশল আয়ত্ত হইলে প্রথমে বাষ্পীয় শকট ও কল চলিতে লাগিল। তারপরে আরও দুই শতাব্দীর অভিজ্ঞতায় আয়ত্ত হইল যে, দহনকার্যে যে শক্তি প্রকট হয়, তাহাকে জল ও বাষ্পের সহায়তায় যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত না করিয়াও সরাসরি কোনপ্রকার তরল ইন্ধন ও বায়ুর মিশ্রণে অগ্নিসংযোগ করিলেও যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যায়। ফলে, পাইয়াছি পেট্রোল ইঞ্জিন।

এমনি সময়ে রসায়নশাস্ত্রে কতকগুলি যৌগিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইল, যাহাদিগকে বিশ্লেষণ করিলে অন্যান্য মৌলের সহিত কার্বন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়। এই সকল পদার্থে রাসায়নিক ক্রিয়ায় শক্তির বিকাশ অতি সহজেই দেখা যায়। এই প্রকার সহজ ও আকস্মিক শক্তি-বিকাশকে 'বিস্ফোরণ' আখ্যা দেওয়া হয়। এই বিস্ফোরণ ক্রিয়ার ফলে কোন সীমাবদ্ধ স্থানে প্রভূত চাপ সঞ্জাত হয়। পেট্রোল ইঞ্জিনের চলমান পিষ্টনে যে চাপ প্রযুক্ত হয়, তাহা অতি সামান্য; কারণ সেই চাপের উৎপত্তি হয় দাহ্য পদার্থের মৃদু দহনে। কিন্তু, যে বিস্ফোরণের কথা বলা হইল, তাহার

ক্রিয়া এত দ্রুত ও প্রচণ্ড যে, তাহার দাপটে দাহ্য পদার্থের আধার ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। এই সকল বিস্ফোরণ ক্রিয়া সাধারণতঃ খনির কাজে ও রাস্তা নির্মান ব্যাপারে অশেষ কল্যাণ সাধন করে বটে, কিন্তু যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট নানাপ্রকার লোক ক্ষয়কর ব্যাপারে তাহাদের প্রয়োগ অত্যধিক।

মানব সভ্যতার ক্রমিক প্রসারের কথা আলোচনা করিলে ইহার মূলে দেখা যায়, রাসায়নিক পরিবর্তন সঞ্জাত শক্তি। বস্তুতঃ, শুষ্ক কাষ্ঠের কার্বন, কয়লা বা তৈল, দহন ক্রিয়ায় বায়ু-স্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া, কার্বন-ডাইঅক্সাইড্ গ্যাস উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে যে শক্তি প্রকট করে, মুখ্যতঃ তাহার সাহায্যেই গড়িয়া উঠিয়াছে বর্তমান সভ্যতা।

রাসায়নিক ক্রিয়ায় বিকশিত শক্তি আমাদের প্রয়োজনে নিয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানীর গবেষণা চলিয়াছে, ঐ সকল ক্রিয়ার মূল কারণের সন্ধানে ও সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের স্বরূপ উদ্ঘাটনে। পদার্থের অতি ক্ষুদ্র একটি খণ্ড সাধারণ চক্ষে নির্বিশেষ-গঠন মনে হইলেও, প্রকৃত পক্ষে অগণিত অতি সূক্ষ্ম বস্তুকণার সংহতিতেই উৎপন্ন। এই কণাগুলি পদার্থের পরমাণু। নানা মৌলের নানা-প্রকার পরমাণু, আর তাহারাই বিশিষ্ট নিয়ন্ত্রণে সম্মিলিত হইয়া প্রস্তুত করে যৌগিক পদার্থের শেষ অবিভাজ্য অংশ বা 'অণু'। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমাদের নিত্যব্যবহার্য যৌগিক পদার্থ জলের অণুতে রহিয়াছে দুইটি হাইড্রোজেন ও একটি অক্সিজেন পরমাণু; আমাদের খাদ্য লবণের অণু গঠিত হইয়াছে সোডিয়মের একটি পরমাণু ও ক্লোরিণের একটি পরমাণুর সংহতিতে; পেট্রোলের অণুতে আছে কার্বণের আটটি ও হাইড্রোজেনের আঠারটি পরমাণু (C_8H_{18}); নাইট্রোগ্লিসারিণ নামক বিস্ফোরক পদার্থের অণুতে আছে তিনটি কার্বণ, পাঁচটি হাইড্রোজেন্, তিনটি নাইট্রোজেন ও নয়টি অক্সিজেনের পরমাণু ($C_3H_5N_3O_9$)।

রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এক যৌগিক পদার্থ হইতে পদার্থান্তরের উদ্ভব হইতে পারে। এস্থলে, ক্রিয়মান পদার্থের অণু-গঠনকারী পরমাণু সমূহ নূতন প্রণালীতে বিন্যস্ত হইয়া নব গঠিত পদার্থের অণু উৎপন্ন হইয়াছে।

রাসায়নিক ক্রিয়াকে দুই পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। কতকগুলি ক্রিয়ায় বাহির হইতে শক্তি গৃহীত হয়, আবার অন্যগুলিতে ভিতর হইতে শক্তি নিষ্ক্রান্ত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, হাইড্রোজেন-পার্-অক্সাইড্ প্রথমোক্ত পর্যায়ে, আর লোহায় মরিচা ধরা-রূপ রাসায়নিক ক্রিয়া, কিংবা কয়লার দহন দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের রাসায়নিক ক্রিয়া অনেক প্রকার শিল্প-সংক্রান্ত কার্যে শক্তি-প্রদায়ক উৎস স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

এক খণ্ড কয়লা উত্তপ্ত করিলে উহার গাত্রস্থিত কার্বন পরমাণু বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হয় ও বিনিষ্ক্রান্ত শক্তি তাপ-রূপে প্রকাশিত হয়। তবে, এস্থলে তাপ-শক্তির বিকাশ হয় অতি মৃদু গতিতে। কারণ, অগণিত পরমাণুর সংহতিতে উৎপন্ন হইলেও কয়লা খণ্ডের গাত্রস্থিত পরমাণু-গুলিই বায়ুর সংস্পর্শে থাকায় সক্রিয় হয়। একই প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া সাধিত হয় পেট্রোল ইঞ্জিনের নলে। তবে, এস্থলে কার্য হয় অতি দ্রুতগতিতে। নলের ভিতর রহিয়াছে, বাষ্পীভূত পেট্রোল ও বায়ুর এক ওতপ্রোত মিশ্রণ। তাহাতে অনেক অধিক-পরিমাণ পেট্রোল-কণার গাত্র বায়ুর সংস্পর্শে আসে, সুতরাং উত্তাপ-প্রয়োগে রাসায়নিক ক্রিয়া সামান্য স্থানে নিবদ্ধ না থাকিয়া বহুস্থানে পরিব্যাপ্ত হয়। ফলে অল্প সময়ে অধিক কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু এ কথাও মনে রাখিতে হইবে যে, পেট্রোল পোড়াইবার সময় শুধু কার্বণ পরমাণুই নহে, সঙ্গে সঙ্গে হাইড্রোজেন পরমাণুও বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত হয়।

দহন ও বিস্ফোরণ উভয় কার্যই মূলে এক; উহাদের পার্থক্য শুধু রাসায়নিক ক্রিয়ার গতিবেগে।

দহন অপেক্ষা বিস্ফোরণে যে অধিকতর শক্তির বিকাশ হয়, এরূপ মনে করা ভুল। দেখা যায় যে, পেট্রোল পোড়াইলে প্রতি গ্রাম পেট্রোল-অক্সিজেনের মিশ্রণ হইতে প্রায় দুইহাজার পাঁচশত ক্যালোরি তাপশক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু T. N. T. (Trinitro toluene) বিস্ফোরণে প্রতি গ্রামে মাত্র এক হাজার ক্যালোরি শক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু রাসায়নিক ক্রিয়ার গতিবেগ চর্চা করিলে দেখা যায় যে, পেট্রোল ইঞ্জিনে যে কার্যে $\frac{1}{১০}$ সেকেণ্ড অতিবাহিত হয়, T. N. T, বিস্ফোরণে সেই কার্যে লাগে এক সেকেণ্ডের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ বা ঐ ক্রমের সময় মাত্র। উপরে ক্যালোরি তাপ শক্তির একক রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যে পরিমাণ তাপ শক্তির প্রয়োগে এক গ্রাম পরিমিত জলের উষ্ণতা মাত্র ১° সেঃ পরিবর্তিত হয়, তাহাই এক ক্যালোরি। এক গ্রাম জলকে 0° ডিগ্রি হইতে ফুটন্ত অবস্থায় আনিতে একশত ক্যালোরি তাপ-শক্তির প্রয়োজন।

রাসায়নিক ক্রিয়া ভেদে বিকশিত শক্তির পরিমাণ ভিন্ন হইলেও উহাদের পার্থক্যের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক নহে। গড়ে ধরা হয় যে, পরিপাটিরূপে সংসাধিত যে কোন রাসায়নিক ক্রিয়ায় সমুদ্ভূত শক্তি প্রতি গ্রাম ক্রিয়মান দ্রব্যে কয়েক হাজার ক্যালোরি মাত্র, অর্থাৎ মোটামুটি হিসাবে প্রায় এক গ্রাম ইন্ধনের দহনে যে শক্তি সমুৎপন্ন হয়, দশ বিশ বা ত্রিশ গ্রাম জলকে শূন্য ডিগ্রী হইতে একশত ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তপ্ত করিতে তাহাই প্রয়োজন হয়।

দেখা যাইতেছে যে, সকল প্রকার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াই মূলতঃ আণবিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। এখন প্রশ্ন এই যে, এই সকল প্রতিক্রিয়ার সূচনা ও অনুশাসন কি উপায়ে সাধিত হয়? একখণ্ড কয়লা বায়ুতে কিংবা পরিশুদ্ধ অক্সিজেনে রাখিয়া অগ্নিসংযোগ করিলেই দহন আরম্ভ হয় না। প্রথমতঃ কয়লা খণ্ডটিকে একটি বিশেষ উষ্ণতায় উত্তপ্ত করিতে হইবে। তাহা হইলে দহন আরম্ভ হইবে। এই উষ্ণতাকে আমরা দহনাংক বলিতে পারি। সাধারণ বিস্ফোরণ-দ্রব্যকে সক্রিয় করিতে হইলে উহাতে এরূপ উত্তাপ দিতে হইবে বা, 'বাহির হইতে আঘাত সঞ্জাত এমন শক্তির প্রযোগ-বিধান করিতে হইবে যাহাতে উহার অভ্যন্তরের আণবিক বিন্যাস-প্রণালীতে সবিশেষ বিপর্যয় উপস্থিত হয়। যে কোন প্রকার রাসায়নিক শক্তির বিকাশ-সাধন করিতে হইলে বাহির হইতে যথানির্দিষ্ট শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। শক্তির আধার যে কোন সংস্থিতি হইতেই বাহির হইতে প্রযুক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ কারয়িত্রী শক্তি বা য়্যাক্টিভেটিং এনার্জির প্রভাবে অন্তরস্থ শক্তি বিকশিত হইয়া পড়ে। পদার্থ যে অবস্থায় থাকিলে এই কার্য সম্ভব হয়, তাহাকে আমরা উহার সাম্য বা সুস্থির অবস্থা বলিতে পারি না, আবার অবস্থাটি দুঃস্থিরও নয়। আমরা বলিব অপস্থির। সুতরাং অপস্থির কোন সংস্থিতি হইতে কারয়িত্রী-শক্তিপ্রয়োগে অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সাধন করা যায়।

নানারূপ রাসায়নিক পরিবর্তন উপলক্ষে এই সুস্থিরতা ও অপস্থিরতা বিজ্ঞানী কিভাবে বুঝাইয়া থাকেন তাহা জানা প্রয়োজন। জল একটি সুস্থিরাবস্থ পদার্থ, কারণ উহার অণুতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণুগুলি এরূপ সুনিয়ন্ত্রিত ও সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ যে, উহাদের কোন-প্রকার বিপর্যস্ত অবস্থা কল্পনা করাও যায় না, যাহাতে শক্তির বিকাশ হইতে পারে। অপরপক্ষে নাইট্রো-গ্লিসারিণ, কিংবা পেট্রোল-অক্সিজেন মিশ্রণ অপস্থির পদার্থ। শক্তি প্রয়োগে ইহাদের আণবিক বিপর্যয় ও নবধারায় আণবিক বিন্যাসে অন্তস্থিত শক্তি বিকশিত করা যায়। যে কারয়িত্রী শক্তির প্রয়োগে এই ক্রিয়া সম্ভব হইতে পারে, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাপ-শক্তিরূপে প্রযুক্ত হয়। তাপ-প্রভাবে উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আণবিক চাঞ্চল্যের

প্রখরতা সবিশেষ বর্ধিত হয়। আণবিক সংঘাতের বিবর্ধমান প্রাখর্য প্রত্যেকটি অপস্থির অণুর আন্তরিক কম্পন বর্ধিত করে ও ফলে সংঘাত সময়ে অণুগুলি পরস্পরের অধিকতর সান্নিধ্যে আসিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ লাভ করে। ইহাতেই তাহাদের নবধারায় বিন্যাস ও সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক শক্তির বিকাশ এই উভয় কার্যই সহজে নিষ্পন্ন হয়।

রাসায়নিক শক্তি বিকশিত করিতে হইলে অপস্থিরাবস্থ পদার্থ প্রয়োজন। ইহা কোথায় পাইব? আমাদের ভূত্বকে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়, তাহাদের প্রায় সকলেই সুস্থিরাবস্থ। সুতরাং উহাদের অন্তরস্থ শক্তি প্রকট করার কোন উপায় নাই। কেবল মাত্র কয়লা ও তৈলই দুইটি নৈসর্গিক অপস্থির পদার্থ, আর ইহাদের উপরেই পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করিয়াছে বর্তমান মানবসভ্যতা। কয়লা বা তৈলকে ঠিক খনিজ পদার্থ বলা চলে না। প্রকৃতির খেয়ালবশে আদিম যুগে ভূগর্ভে সঞ্জাত এই দুইটি জিনিষ দেবতার দানরূপে পাওয়া গিয়াছে। ইহাকে মানবজাতির সৌভাগ্য ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? ভূস্তরের গঠনের ইতিহাসে কোন্ অতীত যুগে মৃত ভূপতিত বৃক্ষরাজি তখনকার ভূপৃষ্ঠের অগভীর জলে নিমজ্জিত হইয়া বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে পূর্ণবল রাসায়নিক সংমিশ্রনে মিলিবার (অর্থাৎ পচিবার) সুযোগ পায় নাই। আর তাহা হইলে পাওয়া যাইত মাত্র কার্বণ-ডাই-অক্সাইড্ গ্যাস। ক্রমে সেই নিমজ্জিত বনানীর উপর আরও নানা ভূস্থর গ্রথিত হইয়া উহাদিগকে বায়ু হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। তাগতেই ভূগর্ভে জন্ম হইল কয়লা ও তৈলের। ইহাদের অন্তঃস্থ শক্তি আমরা পাইতে পারি বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত উহাদের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সুযোগ সাধন করিয়া। কিন্তু দৈবদত্ত কয়লা ও তৈল ভাণ্ডার অফুরন্ত নহে। আর আমাদের শিল্প সম্ভারের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের প্রয়োজনও বাড়িয়া চলিয়াছে অভাবিত রূপে। সুতরাং এই প্রশ্ন সহজেই উপস্থাপিত হইতে পারে যে, কয়লা ও তৈল নিঃশেষ হইলে আমাদের শক্তি যোগাইবে কে?

অবশ্য শক্তি পাওয়ার জন্য ভূপৃষ্ঠের বৃক্ষরাজি দগ্ধ করা যায়; নদীর জলধারা বা জলপ্রপাতের শক্তি মানুষের কাজে লাগিতে পারে; কিংবা ইহাদের যে শক্তি 'শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ড' সূর্য হইতে প্রাপ্ত তাহাও ব্যবহারোপযোগী করার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহাতেই কি মানবসভ্যতার চাহিদা মিটিবে? কোটী কোটী বৎসর পূর্বে ভাবী সন্তানের প্রয়োজন মনে করিয়া প্রকৃতি দেবী যে শক্তি ভাণ্ডার ভূগর্ভে জমাইয়া রাখিয়াছিলেন, আমরা উচ্ছৃঙ্খল উত্তরাধিকারীর ন্যায় দুইহাতে তাহা খরচ করিয়া চলিয়াছি। আমাদের চাহিদা কে মিটাইতে পারে?

সুতরাং রাসায়নিক শক্তির সাহায্যের আশা মানবজাতি আর বেশীদিন করিতে পারে না। ইহার উপর নির্ভর করিয়া ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দৃষ্ট হয় না। তবে এ অন্ধকারে এক ক্ষীণ আলোকের রেখাপাত করিয়াছে বর্তমান যুগের পরমাণু শক্তির জ্ঞান। প্রায় অর্ধ-শতাব্দী হইতে চলিল, বিজ্ঞানী তেজস্ক্রিয় মৌলের তেজোবিকীরণ হইতে উহার অন্তরস্থলের যে দৃশ্য আবছায়ার ন্যায় দেখিয়াছিলেন, অনুসন্ধিৎসু মানবের অজেয় অধ্যবসায়ের ফলে পরমাণুর অভ্যন্তরে সেই দৃশ্য বিগত পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, পরমাণুর অভ্যন্তরের শক্তিভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হইবে না। আর ইহাও বোঝা গিয়াছে যে, এতাবৎ কাল এই পরমাণু শক্তি সৌরজগতের সূর্য ও তারকামণ্ডলী একচেটিয়া ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

ভারতের বিজ্ঞান সাধনা*

শ্রীসুবোধনাথ বাগচী

বিদেশী পণ্ডিতদের মুখে শুনতে পাওয়া যায় এবং বৈদেশিক প্রামাণ্য গ্রন্থে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় যে, জ্ঞানের বিশেষতঃ বিজ্ঞানের জন্মদাতা গ্রীস। এর প্রধান কারণ, প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, এবং যে স্বল্প জ্ঞান আহরণ করা ব্যক্তি-বিশেষের ত্যাগ ও সাধনায় সম্ভব হয়েছে তাও প্রচারিত নয়। আজকের এই পুণ্য দিবসে আমাদের জাতীয় লোকায়ত্ত সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে, এদিকে দৃষ্টিপাত করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতির রূপ ও তথ্য নির্ণয়ের জন্য সরকারকে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গঠন করতে হবে এবং বর্তমান সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই কার্য গ্রহণ করবার জন্য প্রচুর সাহায্য করতে হবে। অতীতের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, কিম্বা তার তাৎপর্যকে অতিরঞ্জিত করা, বা তজ্জন্য নিষ্ক্রিয় গৌরবের দম্ভ করা অবশ্য সঙ্গত নয়। কিন্তু অতীতের গৌরব সম্ভার থেকে আমাদিগকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করতে হবে। আজকের এই শুভক্ষণে সবাইকেই অঙ্গীকার করতে হবে যে, আমরা অতীত ও বর্তমানকে নিষ্প্রভ করে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করবার জন্য এগিয়ে যাব—একই তালে সমবেত ভাবে।

মানুষের বসতির সঙ্গে সঙ্গেই কৃষিকার্যের সুবিধার জন্য নজরে পড়েছে জ্যোতিষের উপর। তাই জ্যোতির্বিদ্যা পৃথিবীর সবচেয়ে পুরাণো শাস্ত্র। ভারতে বৈদিক যুগেই (খৃঃ পূঃ ২০০০—১৪০০) নক্ষত্রের অবস্থিতি ও চন্দ্রের অবস্থার পরিবর্তনের কথা জানা ছিল। স্বভাবতঃই গোড়ায় ধর্মকর্মের সঙ্গে এই জ্ঞান জড়িত ছিল। মহাকাব্যযুগে (খৃঃ পূঃ ১৪০০—১০০০) পেশাদার জ্যোতিষীর জন্ম হয়। যাগযজ্ঞের কাল এই জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নির্ণীত হ'ত।

র‍্যাসনেলিষ্টিক পিরিয়ড বা সূত্র-যুগে (খৃঃ পূঃ ১০০০—২৪২) পুরাণো জ্ঞান ও বিজ্ঞান নির্দিষ্ট রূপ নিয়ে সূত্রাকার গ্রহণ করে। এই যুগ ভারতবর্ষ কেন সমগ্র জগতের ইতিহাসে সবচেয়ে গৌরব-ময়। সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, মীমাংসা ও বৌদ্ধদর্শন এই যুগের সৃষ্টি। কপিল, ঋষি গৌতম, গৌতম-বুদ্ধ, পানিনি—যাঁদের নাম সমস্ত চিন্তাশীল জগতের শ্রদ্ধা ও বিস্ময় উৎপাদন করে, তাঁরা এই যুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জ্যামিতির জন্মস্থান গ্রীস কিংবা আলেক-জেন্দ্রিয়া নয়—এই যুগের ভারতবর্ষ। শব্দ ও ভাষা বিজ্ঞান এবং ব্যাকরণ এই যুগে শুধু যে জন্মলাভ করেছিল তা নয়—এমন উৎকর্ষ লাভ করেছিল যে, একে ছাড়িয়ে যেতে এখনও কোনও দেশই পারেনি।

বেদী নির্মানের নিয়ম থেকে জ্যামিতির জন্ম। এর জন্য জ্যামিতির বহু সম্পাদ্য সমাধান করতে হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে বর্গক্ষেত্রের বাহুর তুলনায় কর্ণের মান নির্ণয়। তাঁদের নিয়মানুযায়ী $\sqrt{২} = ১.৪১৪২১৫৬$। বর্তমানে $\sqrt{২} = ১.৪১৪২১৩\cdots$।

জ্যামিতি ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্র বৌদ্ধ (খৃঃ পূঃ ২৪২—খৃষ্টাব্দ ৫০০) ও পৌরাণিক (খৃষ্টাব্দ ৫০০—১১৯৪) যুগে আরও বিস্তার লাভ করে। কাত্যায়ণ, পরাশর, আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করা-

---

* ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসে পঠিত।

চার্য, লীলাবতী, চরক, শুশ্রুত, নাগার্জুন প্রভৃতি মনীষীরা এই কালের।

য়ুরোপের চিকিৎসা শাস্ত্রের আদিগুরু হিপোক্রেটাসের বহু পূর্বেই ভারতে আয়ুর্বিদ্যার জন্ম হয়েছিল, একথা আজ অনেকেই স্বীকার করেন। সংখ্যা বিজ্ঞান ও শূণ্যের আবিষ্কারক এই ভারতবর্ষ। বীজগণিত ও গোলীয় ত্রিকোণমিতির জন্মস্থানও এই ভারতবর্ষ। বীজগণিতের সাহায্যে জ্যোতিষ-শাস্ত্র ও জ্যামিতির চর্চা আর একটা অভিনব ভারতীয় আবিষ্কার। সাধারণ সূত্রানুসন্ধিৎসু ভারতীয় মনে এই জন্যই পরবর্তী যুগে জ্যামিতিক চর্চার জন্য আশানুরূপ, অনুপ্রেরণা আসেনি।

শুদ্ধ ও তত্ত্বীয় জ্ঞানে ভারতের দান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও যুগোপযোগী কারুশিল্পে, ফলিত বিজ্ঞানে ও টেকনিক্যাল পারদর্শিতায় অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ অনেক বিষয়েই অগ্রণী ছিল। মরিচা-বিহীন লৌহ অশোক স্তম্ভ, সারনাথের ২৫০০ বছরের পুরাণো ঘুণে-না খাওয়া ইট ও মসৃণ প্রকাণ্ড প্রস্তর স্তম্ভ এখনও বিস্ময় সৃষ্টি করে।

তারপর এল অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ যার প্রভাব হতে সম্পূর্ণভাবে নির্মুক্ত হতে আমরা এখনও পারিনি। অতীতের এই গৌরবের তুলনায় জগতে আজ আমাদের স্থান অনেক নিম্নে—বিশেষতঃ টেকনোলজিতে। কিন্তু খুব আশার কথা এই যে, শত বাধাবিপত্তি সত্বেও আমরা জগতের বিজ্ঞানে একটি সম্মানজনক স্থান পেয়েছি, বিশেষতঃ তত্ত্বীয় শাস্ত্রে।

এই নতুন যুগের সৃষ্টি হয় ইংরাজি শিক্ষার আরম্ভে। উনিশ শতক অবধি বিজ্ঞান সাধনা নিবদ্ধ ছিল প্রধানতঃ বিদ্বজ্জনসভায়, যথা রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি ও সরকারী প্রতিষ্ঠানের বৈজ্ঞানিক দপ্তরে। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির জন্ম, শাসকের স্বার্থেই হয়েছিল। স্বভাবতঃই অনুপ্রেরণা ও নেতৃত্ব ছিল 'সাহেবদের' হাতে। এঁদের মধ্যে প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি যাঁরা এখানে কাজ করেই বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন, যথা ম্যালেরিয়া, গবেষক রস ও কলেরা-গবেষক রোজার্স—থাকা সত্বেও ভারতবাসীর মনে বিশেষ কোন অনুপ্রেরণা আসেনি, তার প্রধান কারণ তাঁরা কখনও যোগ্যতা থাকলেও সহকর্মী হতে পারেননি। সর্বপ্রকার সুযোগ ও সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁরা ছিলেন অনেকটা শিক্ষিত যোগানদারের মত। এরূপ অবস্থায় এ সব প্রতিষ্ঠানও যে অন্যান্য সরকারী দপ্তরের মত শুধু ফাইলের সংখ্যাই বৃদ্ধি করে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কি! এই পরিবেশের মধ্যেও যে দুই একজন কৃতিত্ব অর্জন করেছেন—যাদের প্রতিভা একেবারেই চাপা পড়ে যায়নি—তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম মনে পড়ে রাধানাথ শিকদারের নাম। পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ গিরিশিখরের আবিষ্কারক হয়েও সম্মানটা তার ভাগ্যে জোটেনি।

এই প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও যাঁরা ভারতীয়দের মনে নতুন গবেষণার অনুপ্রেরণা জাগিয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু।

বিংশ শতাব্দীতে প্রধানতঃ স্বনামধন্য শিক্ষাব্রতী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারপর থেকেই সুরু হয়েছে ভারতের বর্তমান পদ্ধতিতে প্রকৃত বিজ্ঞান-চর্চা। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স,' আচার্য জগদীশচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত 'বসু বিজ্ঞান মন্দির,' জে, এন, টাটা প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট ফর সায়েন্স,' বাঙ্গালোর এবং নবপ্রতিষ্ঠিত 'টাটা ইনষ্টিটিউট ফর ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ,' বোম্বাই। বিজ্ঞানীর সংখ্যা, সমিতি ও পত্রিকা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সাধনায় আজ বিশ্ব-বিজ্ঞানে ভারতের

স্থান খুবই উচ্চে। প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের পর যাঁরা ভারতকে বিশ্বসভায় স্থাপন করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রধানতঃ রামানুজম, রমন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাথ সাহা, বীরবল সাহনী, কে, এস, কৃষ্ণন, এইচ, জে, ভাবা ও চন্দ্রশেখরের নামই মনে পড়ে।

গত দশ বৎসরের ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—পরমাণবিক ও মহাব্যোম-রশ্মির গবেষণার প্রচেষ্টা। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক সাহার তত্ত্বাবধানে 'সাইক্লোট্রন'--পরমাণু ভাঙ্গার যন্ত্র (জাপান ব্যতীত এশিয়ার অন্য কোথাও এই যন্ত্র নাই) ও একদল পরমাণুতত্ত্ববিদ তৈরী হচ্ছে। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের বিজ্ঞানীরা পরমাণবিক ও মহাব্যোম-রশ্মির কাজে ইতিমধ্যেই নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। বোম্বাইতে ডক্টর ভাবার তত্ত্বাবধানেও কাজ সুরু হয়েছে।

শত বাধা বিপত্তি ও পরবশতার কথা যদি স্মরণ করি তবে এই দানও আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করবে এবং জাতির ভবিষ্যৎ গৌরব ও সাফল্যের নিশ্চয়তার সাক্ষ্য দেবে। অধ্যাপক বের্ণাল তাই মন্তব্য করেছেন যে, ভারতবাসীরা অতীব প্রতিভা সম্পন্ন জাতি।

তত্ত্বীয় বিজ্ঞানে আমরা পৃথিবীর অনেক জাতি, এমন কি জাপানী, রুশীয়দের অপেক্ষাও অধিক সাফল্যের পরিচয় দিয়েছি; কিন্তু দুঃখের বিষয়, ফলিত বিজ্ঞানে, কারুশিল্পে বিশেষতঃ টেকনোলজিতে আমরা রয়েছি অনেক পশ্চাতে। তার অবশ্য বিশেষ কারণ আছে, তন্মধ্যে সর্বপ্রধান, পরাধীনতা ও তদ্ভূত উপযুক্ত সুযোগাভাব। কিন্তু পূর্বের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করলে আমাদের নিরাশ হবার কোন কারণ দেখতে পাওয়া যায় না। শুধু আমাদের মনে রাখতে হবে, আজকের এই যন্ত্র সভ্যতার যুগে জাতির ক্রমবর্ধমান সমস্যার সমাধান করতে হলে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে ফলিত বিজ্ঞানে ও টেকনোলজিতে—উপযুক্ত দক্ষতা ও পারদর্শিতা অর্জন করতে রাষ্ট্রকে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে হবে। তত্ত্বীয় জ্ঞানে আমরা আত্মনির্ভরশীল সহজেই হতে পারব অন্যের সাহায্য না পেলেও। কিন্তু টেকনোলজিতে আমাদের গোড়ায় বিভিন্ন দেশের সাহায্য নিতে হবে এবং রাষ্ট্রকে উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা অর্জনের ভার গ্রহণ করতে হবে। একটা অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে, বৃটেন ও আমেরিকা আমাদের জাতীয় জীবনের উন্নতিকল্পে যথোপযুক্ত সাহায্য করছেনা, টেকনোলজিকাল কারখানায় প্রকৃত শিক্ষা দিচ্ছেনা—ব্যবসায়িক স্বার্থে। এর প্রতিবিধান করতে হলে জাতীয় লোকায়ত্ত সরকারকে যথাস্থানে চাপ দিতে হবে যাতে যথোপযুক্ত সাহায্য পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রয়াসী শিল্পোন্নত জাতি, যথা সুইডেন, সুইজার্ল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া ও রাশিয়ার নিকট সাহায্য গ্রহণের চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা আমাদের প্রত্যেককেই ব্যক্তিগতভাবে স্বচেষ্টায় উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে দেশ সেবার জন্য।

আজ ভারতবর্ষে নতুন পটভূমিকার সৃষ্টি হ'ল। আমাদের প্রত্যেককে স্বপ্রণোদিত হয়ে ব্যক্তিগত ও সমবেত ভাবে এগিয়ে যেতে হবে অন্যতম গৌরবের অধিকারী হবার প্রয়াসে।

প্লাষ্টিক্স শিল্প

শ্রীঅজিৎকুমার গুপ্ত

আদিমযুগে মানুষ তার প্রথম দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত করতে শিখলো প্রস্তরে। তারপর ব্রোঞ্জ ও অন্যান্য ধাতু এসে ঘটালো প্রস্তরযুগের অবসান। লৌহ-যুগের সুরু হল মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটা যুগপ্রবর্তনকারী পদক্ষেপ। বহুশতাব্দী পরে আজ সে আবার তার জীবনধারাকে এক সম্পূর্ণ নূতন পথে বইয়ে নিয়ে চলেছে। এক যুগবিপ্লবকারী প্লাষ্টিক্স-সভ্যতার আজ সূচনা হয়েছে। মানুষ আজ প্লাষ্টিক্স পাগল।

প্লাষ্টিক্স অর্থে বুঝায় এক জাতীয় নবাবিষ্কৃত রাসায়নিক পদার্থ যাহা সম্প্রতি ধাতু, প্রস্তর, কাষ্ঠ, কাঁচ ও মৃত্তিকার স্থান অধিকার করেছে। প্লাষ্টিক শব্দের আসল অর্থ নমনীয়, কিন্তু আজ প্লাষ্টিক অর্থে এত বিভিন্ন গুণাগুণ সমন্বিত পদার্থ বুঝায় যে, তার বিশেষ কোন বাংলা তর্জমা হয়তো যুক্তি-সঙ্গত হবে না। তবে এক অবস্থায় তাদের বিশেষ এক আকার বা রূপ দেওয়া হয় যা তারা পরে বজায় রাখে, এ অর্থে তাদের আকারপ্রদ বা রূপদ বলা যেতে পারে।

এদের প্রাকৃতিক ব্যবহার নির্ভর করে দীর্ঘ শৃঙ্খলাকৃতি আণবিক গঠন প্রণালীর উপর। এদের বৈশিষ্ট্যই হোলো যে, এরা খুব শক্ত, ঘাত সহ, অথচ হাল্কা, ক্ষয়-সহ, মসৃণ ও মনোরম। এদের উপর করাত চালনা করা যায়, কাটা যায়, স্ক্রু লাগানো যায়, পালিশ করা যায়। এদের সর্ব-প্রধান গুণ হোলো যে, এরা আকারপ্রদ। স্বল্প আয়াসেই এদের ছাঁচে ঢালাই করে যেকোনো আকারের বস্তু তৈরী করা যায়! এদের পাওয়াও যায় সর্ববিধ রঙে। এই বহুবিধ গুণাগুণ ঘটিয়েছে তার এই বিশ্বব্যাপী প্রয়োজনীয়তা। মানবসভ্যতা হয়েছে আজ এক নূতন প্লাষ্টিক্সযুগের সম্মুখীন।

জীবনের এক অধ্যায়ে বাইরের নির্দিষ্ট চাপে ও তাপে এরা হয় প্রবহমাণ, তখন এদের প্রদান করা হয় বিশেষ আকার, পরে যার আর কোন পরিবর্তন হয় না।

প্লাষ্টিক-শিল্প আজ ভারতে নেই বললেই চলে। এ বিষয়ে ভারত আজ জগতের অন্যান্য সভ্যদেশ গুলির তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে আছে। আজ উৎপন্ন প্লাষ্টিকের পরিমাণ দেশের সভ্যতার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্লাষ্টিক প্রস্তুতির উপকরণাদি

সাধারণতঃ প্রস্তুত পদার্থের মূল্য নির্ভর করে কাঁচামালের উপর। কাঁচামাল সস্তায় উৎপন্ন করা গেলে প্লাষ্টিকের ব্যবহারও অনেক বাড়বে। এই প্রবন্ধে ভারতের স্বার্থের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

(১) সেলুলোজ—এর মূল উৎস হ'ল তুলো এবং কাঠ।

তুলোর লম্বা তন্তুগুলি সরিয়ে ফেলে অবশিষ্টাংশ হতে উৎকৃষ্ট সেলুলোজ করা যেতে পারে। এ ছাড়া কাষ্ঠ-মণ্ড, শণ, পাট, বাঁশ, গম ও ভুট্টাগাছের কাণ্ড হতেও সেলুলোজ করা হয়।

(২) অ্যাসিড—এদের প্রস্তুতি বোঝানো হচ্ছে নক্সার সাহায্যে।

(ক) নাইট্রিক অ্যাসিড :—

বাষ্প —(উত্তপ্ত কাঠকয়লা)→ হাইড্রোজেন }
বায়ু —(উত্তপ্ত কাঠকয়লা)→ নাইট্রোজেন } —(চাপ ও তাপ / তপ্ত লৌহ)→ অ্যামোনিয়া

অ্যামোনিয়া + বায়ু —(তপ্ত লৌহ ও বিসমাথ অক্সাইড)→ নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড —(জল)→ নাইট্রিক অ্যাসিড

(খ) সালফিউরিক অ্যাসিড :—

গন্ধক বা পাইরাইটি খনিজ —(দহন)→ সালফার ডাই-অক্সাইড —(বায়ু বা অক্সিজেন / তপ্ত প্ল্যাটিনাম)→

সালফার ট্রাই-অক্সাইড —(জল)→ সালফিউরিক অ্যাসিড।

(গ) অ্যাসেটিক অ্যাসিড :—

কাঠকয়লা + চূণাপাথর —(বিদ্যুত শক্তি)→ কালসিয়াম কার্বাইড —(জল)→ অ্যাসিটিলিন গ্যাস

—(উষ্ণ সালফিউরিক অ্যাসিড ও মারকারি সালফেট)→ অ্যাসিটাল ডেহাইড —(বায়ু / ভ্যানাডিয়াম পেণ্টকসাইড)→ অ্যাসেটিক অ্যাসিড
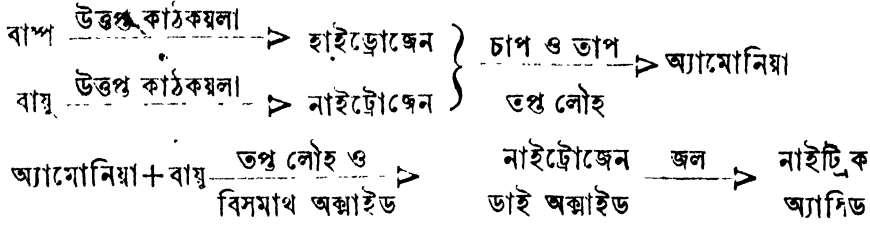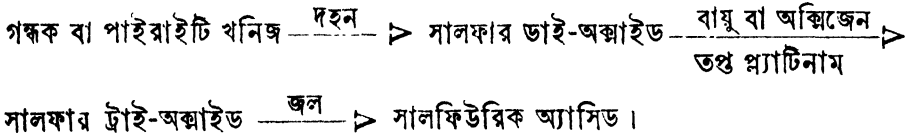
কিংবা, চাল বা আলু —(ব্যাকটিরিয়া)→ অ্যালকহল —(ব্যাকটিরিয়া)→ অ্যাসেটিক অ্যাসিড।
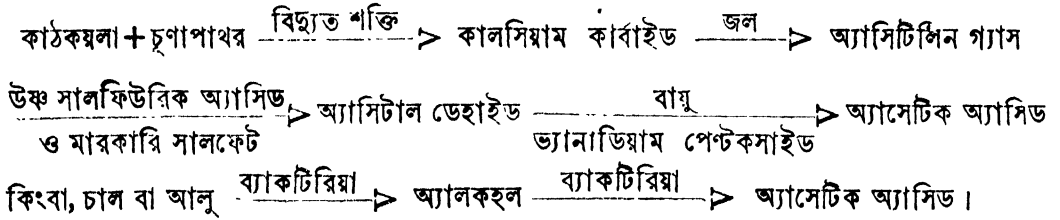
(৩) দ্রাবক বা সল্‌ভেণ্টস্—কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতিতে প্রয়োজন হয় অ্যাসিটোন দ্রাবকের। অ্যাসিটোন প্রস্তুত হয় অ্যালকহল বা অ্যাসেটিক অ্যাসিড থেকে। আলু, গম প্রভৃতি শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ বা মোলাসেস হতে অ্যাসিটো-ইথাইলিকাম ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে প্রচুর অ্যাসিটোন ও অ্যালকোহল প্রস্তুত করা যায়।

(৮) নমনীয়ক হিসাবে কর্পূরের খুব ব্যবহার। কর্পূর প্রস্তুত হয় তার্পিন তেল থেকে সাংশ্লেষিক উপায়ে। আজকাল নমনীয়ক হিসাবে কয়েক প্রকার এস্টার খুব ব্যবহার করা হচ্ছে।

(৫) ফিনল ও ক্রিসল—এদের একমাত্র উৎস আলকাতরা।

কয়লার অন্তর্ধূম-পাতন করলে পাওয়া যায় আলকাতরা। আলকাতরার আংশিক পাতনে প্রথমে পাওয়া যায় বেঞ্জিন, তারপর ফিনল, তারপর ক্রিসল। আবার বেঞ্জিন থেকে তৈরী হয় ফিনল। যথা :—

বেঞ্জিন —(ক্লোরিণ)→ বেঞ্জাইল ক্লোরাইড —(তাপ / সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড)→ ফিনল
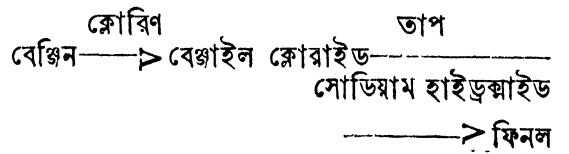
এই উপায়ে ১০০ টন কয়লা থেকে ১ মণ ফিনল ও ক্রিসল পাওয়া যায়।

(৬) ফরমালডেহাইড—প্রস্তুত হয় সাংশ্লেষিক উপায়ে; জলীয় বাষ্প —(তপ্ত কাঠ কয়লা)→ হাইড্রোজেন + কার্বন-মনোক্সাইড —(চাপ, তাপ, অনুঘটক)→ মিথেন গ্যাস —(বায়ু, তপ্ত অনুঘটক)→ ফরমালডেহাইড।
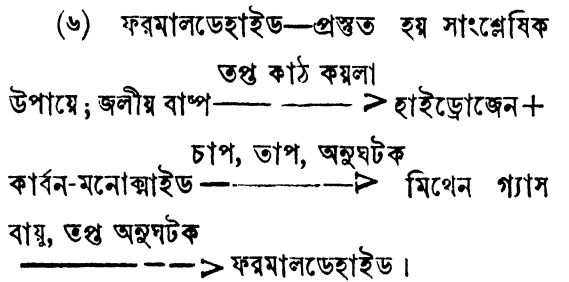
সাধারণতঃ এই গ্যাসের ৪০% দ্রবণ ফরমালিন নামে ব্যবহৃত হয়।

(৭) ইউরিয়া—অ্যামোনিয়া ও কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস একত্রে চাপে ও তাপে সম্মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে ইউরিয়ার।

(৮) কেসিন—দুগ্ধে ক্যালসিয়াম যৌগরূপে অবস্থান করে। পরিষ্কার মাটা তোলা দুগ্ধ রেনেট

সহযোগে জমানো হয়। তারপর তাকে ঈষদুষ্ণ অবস্থায় মন্থন করলে চূর্ণ কেসিন অধঃক্ষেপিত হয়। কেসিনকে পৃথক করে উষ্ণ জল দ্বারা ধৌত করা হয়, ও পরে তপ্ত বায়ু দ্বারা শুষ্ক করা হয়। ৩২ গ্যালন দুগ্ধ হতে ২ সের কেসিন প্রস্তুত হয়।

(৯) অ্যাসিটিলিন জাত পদার্থ সমূহ—

(ক) অ্যাসিটালডিহাইড থেকে অল্প অ্যাসিড প্রয়োগে অ্যালডল পাওয়া যায়। একে গরম করে হয় ক্রোটোনাল ডেহাইড, এ থেকে কয়েক প্রকার প্লাষ্টিক তৈরী হয়।

(খ) আবার অ্যাসেটিক অ্যাসিড + চূণ ——>
তাপ
ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেট ————> অ্যাসিটোন। অ্যাসিটোন হতে মিথাক্রাইলেট প্লাষ্টিকসমূহ প্রস্তুত হয়।

(গ) অ্যাসেটিক অ্যাসিড থেকে যৌগিক জল বার করে অ্যাসেটিক নিরুদক প্রস্তুত করা হয়। এর থেকে সহজে সেলুলোজ অ্যাসিটেট প্লাষ্টিক তৈরী করা যায়।

(ঘ) অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও গ্লিসারিণ বা অ্যালকহল সহযোগে নানাবিধ দ্রাবক ও নমনীয়ক প্রস্তুত করা হয়।

(১০) ইথিলিন জাত পদার্থ—গরম চীনামাটির উপর দিয়ে পেট্রোলিয়ম বাষ্প প্রবাহিত করলে প্রচুর পরিমাণে ইথিলিন গ্যাস পাওয়া যায়। একে বলে বিদারণ প্রক্রিয়া। ইথিলিন ও বেঞ্জিন থেকে ইথাইল বেঞ্জিন ও তা থেকে পলিষ্টিরিণ প্লাষ্টিকসমূহ প্রস্তুত করা হয়। আবার ইথিলিন ও ক্লোরিণ থেকে ভিনাইল ক্লোরাইড এবং তা থেকে পলিভিনাইল প্লাষ্টিকসমূহ প্রস্তুত হয়।

(১১) গ্লিসারিণ—মহুয়া, চীনাবাদাম, নারিকেল প্রভৃতির তৈল কষ্টিক সোডা দিয়ে গরম করে লবণ সহযোগে সাবান পৃথক করা হয়। অবশিষ্ট লবণজলে প্রচুর গ্লিসারিণ দ্রবীভূত থাকে। এই দ্রবণকে উষ্ণ জলীয় বাষ্প দ্বারা উত্তপ্ত করলে গ্লিসারিণ বাষ্প নির্গত হয়, তা ঘনীভূত করে পাওয়া যায় গ্লিসারিণ। একে আর একবার পাতন করলে খাঁটি গ্লিসারিণ পাওয়া যায়। গ্লিসারিণ ও অ্যাসেটিক অ্যাসিডের প্রক্রিয়ায় ট্রাইঅ্যাসেটিন নামে নমনীয়ক প্রস্তুত করা হয়।

(১২) থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড—ন্যাপথালিন বাষ্প বায়ুর সাথে মিশ্রিত করে ৩৫০° পর্যন্ত তপ্ত ভ্যানাডিয়াম পেণ্টক্সাইড অনুঘটকের উপর দিয়া প্রবাহিত করলে প্রায় আঙ্কিক অনুপাতে থ্যালিক অ্যানহাইড্রাইড পাতিত হয়। এর ব্যবহার গ্লিসারিণ সহযোগে গ্লিপ্টাল প্লাষ্টিক এবং অ্যালকহল সংযোগে নমনীয়ক প্রস্তুতিতে।

প্লাষ্টিক পরিচয় ও প্রস্তুত প্রণালী

(১) সেলুলোজ প্লাসষ্টিক—

(ক) নাইট্রোসেলুলোজ—সেলুলোজকে জল, নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের এক নির্দ্দিষ্ট দ্রবণে রেখে দ্রুত আলোড়ন করা হয়। তারপর তা' থেকে সমস্ত তরল পদার্থ নিষ্কাশিত করা হয় উৎকেন্দ্রিক করে অবশিষ্ট নাইট্রোসেলুলোস পিণ্ডটিকে জলের সাহায্যে একটা ঘন মিশ্রণেরমত করা হয় এবং তাকে বাষ্পের সাহায্যে ফুটানো হয়। এতদ্বারা যৌগ সালফিউরিক অ্যাসিডের পরিমাণ খুবই কমিয়ে ফেলা হয়। এরপর শুক্লীকরণ বা ব্লিচিং করা হয় হাইপোক্লোরাইট সহযোগে। এই বিরঞ্জিত তন্তুগুলি হতে সমস্ত জল ও অ্যাসিড নির্গত করা হয় উৎকেন্দ্রিক বা সেণ্ট্রিফিউজ করে। অবশিষ্ট পিণ্ডটি অ্যালকহল সহযোগে ধোয়া হয় ও উদ্বৃত্ত অ্যালকহল নিষ্কাশিত করা হয়। ডেলাটি এবার মিশ্রণোপযোগী হয়।

(খ) সেলুলোজ অ্যাসিটেট—সেলুলোজকে বরফের তাপে সালফিউরিক ও অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও তার নিরুদকের সাথে মিশানো হয়। উৎপন্ন তাপ মিশ্রণমধ্যস্থ নলের ভিতর প্রবাহিত শীতল লবণ জলের দ্বারা মন্দীভূত করা হয় ও মিশ্রণটিকে দ্রুত

আলোড়িত করা হয়। এরপর কিছু ক্ষারসহযোগে এর উদ্বৃত্ত অম্ল বিদূরিত করা হয়। এতদবস্থায় একে তিন দিন ধরে পাকতে দেওয়া হয়। ইত্যবসরে কিছু যৌগ অ্যাসেটিক অ্যাসিড এর থেকে বিদূরিত হয় এবং সমস্তটা অ্যাসিটোন-দ্রবণীয় হয়ে যায়। এই ঘনমিশ্রণে অত্যধিক জল মেশালে সেলুলোজ অ্যাসিটেট একটা সাদা ঘোলাটে পদার্থ-রূপে অধঃক্ষেপিত হয়। একে ধৌত করে শুষ্ক করা হয়।

সেলুলোজ প্লাষ্টিক প্রস্তুতি

নাইট্রোসেলুলোজ বা সেলুলোজ অ্যাসিটেটের পিণ্ডগুলির সঙ্গে কিছু অ্যাসিটোন জাতীয়দ্রাবক ও নির্দিষ্ট নমনীয়ক এবং প্রয়োজনানুসারে রং ভাল করে মিশিয়ে তাকে গরম করে দলন করা হয়। তারপর তাকে পেষণী-যন্ত্রের মধ্য দিয়ে চালিয়ে পাত অবস্থায় বের করা হয়। কয়েকটি পাতকে একত্র চাপ দিয়ে একটা চৌকা ডেলায় পরিণত করা হয়। এথেকে যন্ত্রের সাহায্যে স্তরে স্তরে পাতলা প্লাস্টিকের চাদর কাটা হয়। এরপর চাদরগুলিকে গরম করে শুকানো হয় এবং উদ্বায়ী দ্রাবক বাষ্পীভূত করা হয়। পরে এগুলিকে চাপ দিয়ে মসৃণ করা হয়। ফিল্ম প্রস্তুত করতে হলে সেলুলোজ অ্যাসিটেট বা নাইট্রোসেলুলোজের পাতলা অ্যাসিটোন দ্রবণ মসৃণ ধাতুপৃষ্ঠে ঢেলে শুকিয়ে ফেলা হয় এবং শুষ্ক ফিল্মগুলি তুলে ফেলা হয়।

সেলুলয়েড প্রস্তুতিকালে নাইট্রোসেলুলোজের অর্ধেক পরিমাণ কর্পূর অ্যালকহলে দ্রবীভূত অবস্থায় নমণীয়করূপে ব্যবহার করা হয়। অন্যথা পাতগুলিকে খণ্ড খণ্ড করে কিছু পূরকের সঙ্গে মিশিয়ে ইচ্ছানুযায়ী ছাঁচে ঢালাই করা হয়। পূরক ও নমণীয়কের প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর প্লাষ্টিকের নমণীয়তা, আকার-প্রদতা, সহ ও দাহ্যগুণ; তাপ ও তাড়িত-রোধক শক্তি নির্ভর করে।

কৃত্রিম রেশম

(১) কলোডিয়ন সিল্ক বা রেয়ণ—নাইট্রোসেলু-লোজকে অ্যালকহল ও ইথার মিশ্রণে ঘনদ্রবণ করা হয়। তারপর একে উচ্চচাপে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে নির্গত করলে তা' সূক্ষ্ম তন্তুতে পরিণত হয়। তন্তুগুলিকে হাইড্রোসালফাইড দ্রবণে সিক্ত করলে তাদের দাহ্য ভাব নষ্ট হয়ে যায়।

(২) অ্যাসিটেট সিল্ক—সেলুলোজকে সাল-ফিউরিক ও অ্যাসেটিক অ্যাসিড ও তার নিরুদকে দ্রবীভূত করা হয়। এথেকে একই উপায়ে সূক্ষ্মতন্তু পাওয়া যায় যা রেয়ণ অপেক্ষা শক্ত।

(৩) নাইলন—হেক্সামেথিলিন ডায়ামিন ও অ্যাডিপিক অ্যাসিড একত্র মিশ্রিত করে অত্যন্ত তাপ ও চাপ প্রয়োগে প্রস্তুত হয়। গলিত নাইলন সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে নির্গত করা হয়। এর সুতা অসাধারণ সূক্ষ্ম, শক্ত ও উজ্জ্বল। বাজারের প্যারসুট সিল্কগুলি অধিকাংশই নাইলনে প্রস্তুত। ফিনল ও হাই-ড্রোজেন অনুঘটকের প্রভাবে সাইক্লোহেক্সানলে পরিণত হয় বা আবার অনুঘটকের উপস্থিতিতে অক্সিজেনের সংযোগে অ্যাডিপিক অ্যাসিড প্রস্তুত করে। অ্যাডিপিক অ্যাসিড ও অ্যামোনিয়া অনু-ঘটন প্রক্রিয়ায় হেক্সামেথিলিন ডায়ামিন প্রস্তুত করে।

কেসিন প্লাষ্টিক

চূর্ণ কেসিনকে মিশ্রণ যন্ত্রে পূরক ও রঙের সহিত সম্যকরূপে মিশ্রিত করা হয়। ২০মিনিট পরে রঞ্জন দ্রবণ সূক্ষ্মকণাকারে উৎক্ষিপ্ত করা হয়। অল্পসিক্ত কেসিন পরিমিত ছিদ্রপথে চাপে নির্গত করে' দণ্ড হিসাবে অথবা দুটি ধাতব পাতের মধ্য দিয়ে চালিয়ে কেসিনের পাত বের করা হয়। এর বর্ণ দুগ্ধ ফেননিভ। নানাবিধ মনোরম বস্তু এ থেকে প্রস্তুত করা হয়।

বেকেলাইট জাতীয় প্লাষ্টিক

ফিনল বা ক্রিসলকে ফরমালিন দ্রবণের সাহায্যে একটি ঢালাই লৌহ পাত্রে ঘনীভূত করা হয় প্রক্রিয়ার

গতিবর্ধক ও অনুঘটকের উপস্থিতিতে। পাত প্রস্তুতির জন্য কষ্টিক সোডা ও চূর্ণের জন্য সাল-ফিউরিক অ্যাসিড অনুঘটক হিসাবে এবং হেক্সা-মেথিলীন টেট্রামিন গতিবর্ধক হিসাবে মিশানো হয়। এখন মিশ্রণটিকে পাকযন্ত্রে উচ্চ চাপে ও তাপে ফোটানো হয় যতক্ষণ না ঘনীভবন সম্পূর্ণ হয়। এবার এই অর্ধতরল পদার্থটিকে ঠাণ্ডা করে তার উপরি-ভাগের জল বার করে ফেলা হয়, পরে গরম করে এ থেকে জল সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করা হয়।

এরপর প্লাস্টিকটিকে নির্দিষ্টমাপের চূর্ণে পরিণত করা হয় এবং চূর্ণগুলির সঙ্গে রঙ্ ও পূরক হিসাবে কাঠের গুঁড়া সম্যকরূপে মিশ্রিত করে তা ছাঁচে ঢালার উপযোগী চূর্ণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অন্যথা রোলার সাহায্যে এগুলিকে পাতে পরিণত করা হয়।

এই জাতীয় প্লাষ্টিক তাপ ও তাড়িত-সহ, শক্ত, এদের ব্যবহারও বহুবিধ। অন্যান্য প্লাষ্টিকের তুলনায় এদের দামও কম।

ইউরিয়া বা অ্যামিনো প্লাষ্টিক—

এদের রং বেকেলাইটের মত অত ঘোর নয় এবং অনেকটা স্বচ্ছ। ইউরিয়া এবং সময়ে সময়ে কিছু থায়োইউরিয়া ১০° সে তাপে ফরমালডেহাইডে দ্রবীভূত করা হয়। তারপর মিশ্রণটিকে ১৩০°সে তে রেখে সেই অবস্থায় প্লাষ্টিকটি ঘনীভূত করা হয়। পরে অত্যন্ত চাপে ও তাপে সমস্ত জল পাতিত করা হয়। গলিত প্লাষ্টিকটি এবার পাত্রে ঢেলে জমানো হয়। অন্যথা কিছু জল থাকতে ঘন অবস্থায় রেখে এর সঙ্গে কাষ্ঠ চূর্ণ বা সেলুলোজ মণ্ড এবং উজ্জলবর্ণ-বিশিষ্ট রঞ্জক দ্রব্য মিশ্রনযন্ত্রে উত্তমরূপে দলন করা হয়। পরে অল্প তাপে শুকিয়ে একে চূর্ণ করে ছাঁচ বা ঢালাই-যন্ত্রে দেবার উপযোগী করা হয়। নানাবর্ণের নানাবিধ দ্রব্য এথেকে প্রস্তুত হয়।

গ্লিপ্টাল বা অ্যাল্কিড প্লাষ্টিক—

গ্লিসারিণ ও থ্যালিক অ্যাসিডের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এর উদ্ভব। গ্লিসারিণের পরিবর্তে গ্লাইকল ও ম্যানিটল এবং থ্যালিকের পরিবর্তে টার্টারিক, সাইট্রিক ও সাকসিনিক এসিড ব্যবহার করা যেতে পারে। অ্যাসবেষ্টস ও অভ্রের পাতের ধারে লাইনিং হিসাবে এর খুব ব্যবহার হয়, কারণ এর উচ্চতাপসহশক্তি আছে। প্রাকৃতিক রজন জাতীয় পদার্থের সাথে মিশিয়ে বার্ণিশ বা আস্তরণ হিসাবে একে ব্যবহার করা যায়।

স্ফটিক-স্বচ্ছ বা ইথিনয়েড প্লাষ্টিক—

এই পর্যায়ে পড়ে ভিনাইল,ষ্টিরিণ ও অ্যাক্রাইলিক এষ্টার প্লাষ্টিক। যেহেতু স্বচ্ছতাই এদের বৈশিষ্ট্য তজ্জন্য কোন পূরক এর সাথে ব্যবহার করা হয় না। (ক) মিথাইল মিথাক্রাইলেট—প্রথমে অ্যাসিটোন হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিডের ঘনীভবনে তৈরী হয় অ্যাসিটোন সায়ানোহাইড্রিন, পরে তাকে সাল-ফিউরিক অ্যাসিড দিয়ে ১০০°সে পর্যন্ত গরম করা হয়,। তারপর তার সঙ্গে মিথাইল অ্যালকহল মিশিয়ে মিথাইল মিথাক্রাইলেট প্রস্তুত করা হয়, যার কয়েকটি অণু একত্র সংহত হয়ে সৃষ্টি করে এই প্লাষ্টিকটি। শুকিয়ে চূর্ণ করে ডায়াকোন নামে বিক্রয় করা হয়। এই চূর্ণ প্রেস বা অন্তর্নিক্ষেপ উভয় প্রণালীতেই ঢালাই করা হয়। এছাড়া পাত বা দণ্ড হিসাবে পারপেক্স নামেও এর বাজারে খুব চলন। এই প্লাষ্টিক খুব লঘু, অথচ তাপ ও তাড়িতসহ। বিদ্যুত-যন্ত্রে ও নকল দাঁত প্রস্তুতিতে এর খুব ব্যবহার। ছাঁচে ঢেলে উৎকৃষ্ট অভঙ্গুর লেন্স এথেকে তৈরী হয়। আঁচড় খায় বলে এর উপরিভাগে একটা সিলিকার আবরণ দেওয়া হয়।

(খ) ভিনাইল ও ষ্টিরিণ প্লাষ্টিক্স—

পলিভিনাইল ক্লোরাইড প্লাষ্টিক—অ্যাসিটিলিন ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এর উৎপত্তি। নিয়ন্ত্রিত তাপ ও অনুঘটকের সাহায্যে এর অণুগুলি সংহত হয়ে এই প্লাষ্টিকটির সৃষ্টি করে। অদাহ্য, অদ্রবনীয় ও সহনশীলতার গুণে এর রসায়নযন্ত্রের নল, বৈদ্যুতিক তারের আবরণ হিসাবে ব্যবহার আছে। উচ্চতাপে গলে বলে

ঢালাইয়ের পূর্বে নমনীয়ক মিশিয়ে এর গলনাঙ্ক কমিয়ে দেওয়া হয়।

পলিভিনাইল অ্যাসিটেট—পারাঘটিত লবণ অনুঘটকের উপস্থিতিতে অ্যাসিটিলিন ও অ্যাসেটিক অ্যাসিডের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এর সৃষ্টি। জৈব দ্রাবকে দ্রাবনীয় বলে বার্ণিশ হিসাবে এর খুব প্রচলন। এই প্লাষ্টিক খুব হাল্কা, স্বচ্ছ ও সহ্যগুণসম্পন্ন। এছাড়া নানা অনুপাতে ভিনাইল ক্লোরাইড ও অ্যাসিটেট একত্রে ঘনীভূত হয়ে একটি মিশ্র প্লাষ্টিক প্রস্তুত করে।

পলিভিনাইল অ্যাসিটাল—পলিভিনাইল অ্যাসিটেট থেকে রাসায়নিক উপায়ে খানিকটা যৌগ অ্যাসেটিক অ্যাসিড বার করে তাকে অ্যাসিটালডেহাইডের দ্বারা ঘনীভূত করা হয়। নিরাপদ কাঁচের মধ্যস্তর হিসাবে এর খুব ব্যবহার।

পলিষ্টিরিন প্লাষ্টিক—ইথিলিন ও বেঞ্জিনের রাসায়নিক সংযোগে এর সৃষ্টি। তাপও গতিবর্ধকের সাহায্যে একে 'পলিমেরাইজ' অর্থাৎ সংহত করা হয়। অত্যন্ত লঘু ও সহজে গলনীয়, অন্তর্নিক্ষেপ ছাঁচে এর খুব ব্যবহার। সহন-শক্তিসম্পন্ন ও বিদ্যুত-রোধক, তাই বেতার যন্ত্রে এর ব্যবহার আছে। প্রেস ছাঁচে ফেলে এথেকে শ্বেত ও বিবিধ উজ্জল বর্ণবিশিষ্ট নানাবিধ মনোরম সামগ্রী প্রস্তুত করা হয়, তার মধ্যে টেলিফোন অন্যতম। বেঞ্জিন দ্রবণে এর লেপন বা আস্তরণ হিসাবে ব্যবহার আছে। গলিত প্লাষ্টিক লম্বা ও সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে চাপে প্রবাহিত করে এ থেকে শক্ত অথচ নমনীয় ফিল্ম প্রস্তুত করা হয়। অন্যথা মেথিলিন ক্লোরাইড ও জাইলিনের পাতলা দ্রবণ শুকিয়ে ফেলেও ফিল্ম তৈরী করা হয়।

(গ) সংহত ইথিলিন প্লাষ্টিক—এগুলি উচ্চ আণবিক গুরুত্ব-সম্পন্ন দীর্ঘশৃঙ্খল হাড্রোকার্বন। এরা অস্বচ্ছ, ঘাতসহ, নমনীয়, অথচ রবারের ন্যায় স্থিতিস্থাপক নয়। তাপে গলনীয় তাই অন্তর্নিক্ষেপ ও প্রেস উভয় ছাঁচেই এদের ব্যবহার হয়।

(ঘ) মিথাইল সিলিকন প্লাষ্টিক—

এই প্লাষ্টিকের বৈশিষ্ট্য এই যে, এদের মধ্যে কোন অঙ্গার শৃঙ্খল নেই, তৎপরিবর্তে আছে সিলিকন শৃঙ্খল, তাই সাধারণ তাপপ্রয়োগে এদের নষ্ট করা যায় না। এতে প্রতিটি সিলিকন পরমাণুর সঙ্গে অন্ততঃ একটি মিথাইল মূলকও যুক্ত থাকে। সময়ে সময়ে আংশিকভাবে মিথাইল মূলকগুলির পরিবর্তে অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত থাকে। এরা তাপ রোধক বলে অভ্রপাতের মধ্যস্তর হিসাবে এবং বিদ্যুৎ রোধক হিসাবে নানাবিধ বৈদ্যুতিক যন্ত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।

আরও নানাবিধ প্লাষ্টিক আবিষ্কার হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক হবে। এই প্লাষ্টিকের যুগে প্লাষ্টিকশিল্প প্রতিদিনই উন্নততর হবে। ভারতের প্রধান দৌর্বল্য যে, প্লাষ্টিক প্রস্তুতির উপকরণাদিও ভারতে প্রস্তুত হয় না। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতেও প্লাষ্টিকশিল্প সম্বন্ধে শিক্ষা পাবার কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। ভারতবাসী তার প্রচীন সভ্যতা ও ঐতিহ্য নিয়ে বৃথা গর্ব করতে পাবে, কিন্তু আধুনিক সভ্যতার অঙ্গ হিসাবে প্লাষ্টিকের প্রাধান্য আজও ভারতে স্বীকৃত হয় নি। আজ জাতীয় সরকারের উচিত দেশে প্লাষ্টিকশিল্পের প্রবর্তন করা এবং জনগণকে প্লাষ্টিকের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা।

সাহার তাপ-আয়নন তত্ব

শ্রীবিভূতিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক রাদারফোর্ড প্রথমে পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে সুন্দর ছবির অবতারণা করেন। ১৯১৪ সালে নীল বোর, পরমাণু-বর্ণালী কোয়ান্টাম্ বাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন। এদের সিদ্ধান্ত অবলম্বন করে অধ্যাপক সাহা অণু ও পরমাণুর উপর তাপের প্রভাব সম্বন্ধে এক নতুন তত্ব প্রকাশ করেন। সাহার এই আয়নন-তত্ব ও নভোবস্তুবিদ্যার গবেষণায় তার ব্যাপক প্রয়োগ সম্বন্ধে সাধারণভাবে আলোচনা ক'রছি।

আয়নন অর্থে পরমাণু একটি কিংবা অধিক ইলেকট্রন মুক্ত করে। ফলে আয়নিত পরমাণু ও মুক্ত ইলেকট্রনের উদ্ভব হয়। আমরা জানি, যদি বৈদ্যুতিক চাপের অধীন হয়, তবে পরমাণুর বহিঃকক্ষ থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হয়। সাহা নিজের উদ্ভাবিত গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে দেখিয়েছেন, এই আয়নন তাপ ও চাপের অধীনেও সম্ভব। তিনি আয়নন-কে রাসায়নিক বিষঙ্গের মত কল্পনা করেন। রাসায়নিক বিষঙ্গ অর্থে, একটি গ্যাসীয় অণু ভিন্ন দু'টি গ্যাসীয় অণুতে রূপান্তরিত হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, যদি চাপ বেড়ে যায় তবে বিষঙ্গ প্রক্রিয়াও বেড়ে যাবে। এই দিকের বিচারে আয়ননের সঙ্গে একটা অসঙ্গতি মেলে। আয়নন এবং গ্যাসীয় বিষঙ্গের পরিবর্তনীয় বিক্রিয়ার তুলনামূলক আলোচনাও হয়েছে। মনে করুন, একটি গ্যাস (ক)-এর বিষঙ্গ। গ্যাস ক-এর একটি অণু, গ্যাস খ-এর একটি অণুতে ও গ্যাস গ-এর একটি অণুতে বিষঙ্গিত হ'লো। এই বিক্রিয়াকে লেখা হয় এরূপে,

$$ক \rightleftharpoons খ + গ$$

অণুপুঞ্জে তাপের প্রভাব সহজেই বুঝা যায়। আমরা জানি, বরফ তাপে গলে জল হয় অর্থাৎ তাপ অণুপুঞ্জ আলোড়িত করে। ফলে, অণুদের সমাবেশ ক্রমে ভেঙ্গে যায়। অণুদের এই অবস্থার ক্রমপর্যায়ে জল ও বাষ্পের উদ্ভব হয়। এর বিপরীত অবস্থার উদ্ভবও হয় একই কারণে। যদি তাপ ক্রমে কমতে থাকে, অর্থাৎ অণুপুঞ্জে আলোড়ন কম হয়, তবে অণুদের সমাবেশ ক্রমে ঘন হয়ে আসে। এরূপে বাষ্প, জলে এবং জল, বরফে পরিণত হয়। তাপ যখন এত কম যে, অণুদের সমাবেশ গায়ে গায়ে দৃঢ় বাঁধনের মধ্যে, তখন হয় বরফ, অর্থাৎ ঘন বস্তুর অবস্থা। এরূপে তাপের প্রভাবে নানা অবস্থান্তর ও রাসায়নিক পরিবর্তন সম্বন্ধে গবেষণা উনবিংশ শতাব্দীতে হয়েছিল। এই সব পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যাও হয়েছে নানা গাণিতিক সূত্রের উদ্ভাবনে। এই সময়ে তাপের প্রভাব সম্বন্ধে যা কিছু মিমাংসা তার মূলে এই ধারণা ছিল যে, পরমাণু স্থিতিস্থাপক গোলক। এই ধারণা অনুযায়ী গণনায় অনিয়ত পরিণাম দেখা যায়।

১৯২০ সালে অধ্যাপক সাহা বলেন, তাপের প্রভাব সম্বন্ধে সমস্ত গণনা পরমাণুকে স্থিতি-স্থাপক গোলক কল্পনা করে হয়েছে, পরমাণুর গঠন বিবেচনা করা হয়নি। আমরা জানি, সীসা উত্তপ্ত হলে গলে যায়। ইতিপূর্বে ধারণা ছিল, এই গলিত অবস্থার কারণ, অণুর সমাবেশ আলগা হয়ে পড়ে। যদি তাপ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে তবে সীসা প্রথমে গলিত অবস্থা ও পরে বাষ্পীভূত অবস্থায় এসে পৌছবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, শেষ পর্যন্ত কী হবে? এর কোনও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা পূর্বতন ধারণায় সম্ভব ছিল না!

কেননা পরিবর্তনীয় বিক্রিয়া দুই দিকে তীর চিহ্ন দিয়ে প্রকাশিত হয়। এরূপে কোনও মৌলের পরমাণুর, মনে করুন ক্যালসিয়ম পরমাণুর আয়ননও প্রকাশিত হবে।

$$\mathrm{Ca\ I} \rightleftharpoons \mathrm{Ca\ II} + e$$
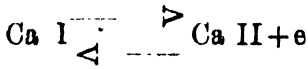
ক্যালসিয়মের (Ca) স্বমিত পরমাণুকে Ca I, এক আয়নিত পরমাণুকে Ca II, ও ইলেকট্রনকে e, এই প্রতীক দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। এই বিক্রিয়ার অর্থ, ক্যালসিয়মের স্বমিত পরমাণু থেকে আয়ননের জন্য আয়নিত পরমাণু ও মুক্ত ইলেকট্রনের উদ্ভব হয়। ভৌত রাসায়নের নিয়ম অনুসারে, বিযঙ্গের মান অর্থাৎ আয়নিত পরমাণুর অনুপাত, তাপ ও চাপের উপর নির্ভরশীল। অবশ্য বিযঙ্গের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তার পরিমাণ জানা থাকে। এই শক্তিই আয়নন বিভব। এর সংখ্যা-মান হ'চ্ছে, ভোল্ট। আয়নন বিভব অর্থ, যে বিভবে পরমাণু আয়নিত হয়। সাহার সূত্র প্রয়োগ ক'রে, বিযঙ্গের মান নিরূপণ করা যায়। যদি আয়নন বিভব, তাপ ও চাপ জানা থাকে, তবে আয়নিত পরমাণুর অনুপাতের এই সূত্র থেকে হিসাব হবে।

১৯২০ সালে 'ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিন'-এ ও ১৯২১ সালে প্রসিডিং অব দি রয়েল সোসাইটি-তে অধ্যাপক সাহা প্রথমে 'সৌর ক্রমোগোলকে আয়নন' ও 'সূর্যে মৌলিক পদার্থ' এই প্রবন্ধ দুটি প্রকাশ করেন। আমরা জানি, আর্ক ও স্পার্ক এই দুটি বিভিন্ন উপায়ে বর্ণালীর সৃষ্টি হয়। স্পার্ক-বর্ণালী আর্ক-বর্ণালী থেকে স্বতন্ত্র। লকইয়র মনে করেন, স্পার্কে উষ্ণতা আর্কের চেয়ে অনেক বেশী। অর্থাৎ স্পার্ক-বর্ণালী উষ্ণতর অবস্থার পরিচয় দেয়। সূর্যপৃষ্ঠ থেকে সহস্র মাইল দূরে অর্থাৎ সৌরমণ্ডলের উচ্চ অনুভূমিকে কতক পরমাণুর বিক্ষিপ্ত আলোক স্পার্ক-বর্ণালীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। সূর্যপৃষ্ঠে অনুরূপ পরমাণুর বর্ণালীতে এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় এত নেই। লকইয়রের মত অনুসারে উষ্ণতা সূর্যপৃষ্ঠ থেকে উচ্চ অনুভূমিকে অনেক বেশী। কিন্তু সূর্যপৃষ্ঠে প্রচণ্ড তাপের কথা আমরা জানি। গ্যাসীয় নীহারিকার বর্ণালীও স্পার্ক বর্ণালীর পরিচয় দেয় অর্থাৎ উষ্ণতা খুবই বেশী। লকইয়রের সিদ্ধান্ত অনুসারে সৌরমণ্ডলের উচ্চ অনুভূমিকের উষ্ণতা সূর্যপৃষ্ঠ থেকে অনেক বেশী। এর ব্যাখ্যা সাহার তত্ত্বে হয়েছে।

লকইয়র বলেন, 'ক্রমোগোলকে' উষ্ণতা ফটোগোলকের চেয়ে অনেক বেশী।' অধ্যাপক সাহা প্রথম প্রবন্ধে তার 'আয়নন সূত্র' প্রকাশ করেন এবং প্রমাণ করেন, ক্রমোগোলকের বর্ণালীর বৈশিষ্ট্য ক্রমোগোলকে চাপ হ্রাস হওয়ার জন্য হয়েছে। অধ্যাপক সাহা বলেন, তাপের প্রভাব যেমন গ্যাসের ক্ষেত্রে তেমনি প্রতি পরমাণুতেই সহজ গাণিতিক সূত্রে প্রকাশ করা সম্ভব। সাহার সূত্রে, গ্যাসের চাপ প্রধান অংশ নিয়েছে। গ্যাসে চাপ ও তাপ যদি খুবই কম হয়, তবে এর প্রতি পরমাণু একই রকম আলো বিক্ষিপ্ত করে। অর্থাৎ প্রতি পরমাণু যেন একই অবস্থায় আছে। অনুরূপ আলো বিক্ষিপ্ত হবে, যদি চাপ সাধারণ ও তাপ বেশী হয়। আয়নিত পরমাণুর আধিক্য ও স্পার্ক বর্ণালী ক্রমোগোলকের (সৌরমণ্ডলের উচ্চ অনুভূমিকের) বৈশিষ্ট্য। ক্রমোগোলকে নিম্নচাপ পরমাণুর অবস্থা পরিবর্তনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু সূর্যপৃষ্ঠে প্রচণ্ড তাপ সাধারণ চাপের অধীনে এই অবস্থা পরিবর্তনের এত কার্যকরী হয় না।

বর্ণালীগত পরীক্ষায় দেখা গেছে, সূর্যপৃষ্ঠের বিভিন্ন অনুভূমিকে বর্ণালীর যে পরিবর্তন হয়, সেই অনুভূমিকে আয়নিত পরমাণুর অনুপাতের উপর তা' নির্ভর করে। বিভিন্ন মৌলের পরমাণু ও একই মৌলের পরমাণু আয়ননের বিভিন্ন অবস্থায় যে আলোর সৃষ্টি করে, সেই আলোর বর্ণালী-বীক্ষণ যন্ত্রে বিশ্লেষণ হ'লে দেখি বিশেষ বিশেষ বর্ণালী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। এই বর্ণালীরেখা সমূহের পরিচয় থেকে

মৌলের অবস্থিতি জানা যায়। বর্ণালীগত গবেষণা থেকে জ্যোতিষ্কের সংযুতি ও বিশ্বের দূরতম মণ্ডলে হাইড্রোজেন, কারবন, ক্যালসিয়ম প্রভৃতি মৌলের অবস্থিতি জানা গেছে। কোনও জ্যোতিষ্কে তাপ ও চাপ সেই পরিমণ্ডলের পরমাণুর অবস্থার উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন নক্ষত্রে কি ভাবে তাপ এবং চাপের তারতম্যের জন্য কোনও মৌলের পরমাণুর স্বমিত অবস্থা, এক আয়নিত অবস্থা ও দুই আয়নিত অবস্থার ক্রমপর্যায় হয়, সে সম্বন্ধে নানা পর্যবেক্ষণ হয়েছে। অধ্যাপক সাহা কোনও বিশেষ তাপে এবং চাপে এই আয়ননের মান নিরূপণের জন্য হিসাব করেন। মনে করুন, নক্ষত্র মণ্ডলের কোন অংশে বর্ণালীর পরিচয় থেকে জানা গেল বহুলাংশে ক্যালসিয়ম পরমাণু এক ইলেকট্রন চ্যুত হয়ে আছে, তবে সাহার সূত্র থেকে সেই অংশের তাপ এবং চাপ নিরূপণ করা যাবে। তাপ এবং চাপ অবশ্য একসঙ্গে নিরূপিত হয় না। একটা জানা গেলে অন্যটার হিসাব হয়। অর্থাৎ যদি বর্ণালী রেখার পরিচয় থেকে আয়নিত পরমাণুর অনুপাত ও আয়নন বিভব জানতে পারি, তবে সাহার সূত্রে নক্ষত্র মণ্ডলের তাপ কিংবা চাপের হিসাব হবে। প্রতি পরমাণুর আয়নন বিভব জানা আছে। ক্যালসিয়ম ও হাইড্রোজেন পরমাণুর আয়ননের অনুপাত সাহার সূত্রে হিসাব হয়েছে। সাহার গাণিতিক সূত্র অনুযায়ী, আয়ননের অনুপাত বেড়ে যায় তাপ বেড়ে গেলে, চাপ কমে গেলে ও আয়নন বিভব কম হলে।

"সূর্যে মৌলিক পদার্থ" এই প্রবন্ধে অধ্যাপক সাহা বিশেষ কয়েকটি মৌলের বর্ণালী-রেখা কেন সৌরবর্ণালীতে প্রকাশিত হয়, তার সাধারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি দেখিয়েছেন, কয়েকটি মৌল, যথা রুবিডিয়ম (Rb) ও সিজিয়ম (Cs) সম্পূর্ণ রূপে আয়নিত হয়, কিন্তু অন্যান্য মৌল তাদের অধিক আয়নন বিভব ও অনুনাদ বিভবের জন্য এত উত্তেজিত হয় না; অবশ্য এদের প্রধান বর্ণালীরেখা সমূহের অতিবেগনি কিংবা অবলোহিত অংশে উপস্থিতিও একটা বিশেষ কারণ।

সাহার আয়নন তত্ত্ব সৌরমণ্ডলের সংযুতি, বিভিন্ন অনুভূমিকে কোন মৌলের বর্ণালী-রেখা সমূহের সমাবেশ ও তদনুযায়ী তাপ ও চাপের অবস্থা সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে। 'নক্ষত্র বর্ণালীর ভৌততত্ত্ব' প্রবন্ধে অধ্যাপক সাহা, তাঁর আয়নন তত্ত্বের সাহায্যে নক্ষত্র-বর্ণালীর ক্রমপর্যায় ব্যাখ্যা করেন। ইতিপূর্বে স্যার নরম্যান লক্ইয়র মৌলের অভিব্যক্তিবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছিলেন। অধ্যাপক সাহা, "গ্যাসের তাপ বিকীরণ প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, ফারনেস বর্ণালী সম্বন্ধে অধ্যাপক কিং-এর গবেষণা মৌলের তাপ উত্তেজনার পরিণাম থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। ১৯১৯ সালে প্রকাশিত "বৃত বিকীরণ চাপ" প্রবন্ধে অধ্যাপক সাহা দেখিয়েছেন, ক্রমোগোলকের গঠন ও ক্যালসিয়ম পরমাণুর ক্রমোগোলকের উচ্চ অনুভূমিকে অবস্থিতি কয়েকটি পরমাণুর উপর বিকীরণ চাপের বৃত প্রয়োগের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। উষ্ণ নক্ষত্রের পৃষ্ঠ-তাপ নিরূপণে দেখা গেছে, ১২০০০° ডিগ্রি থেকে ২৫০০০° ডিগ্রী তাপে অন্য কোন নিয়ম সাহার নিয়মের মত এত কার্যকরী হয় না। স্যার আর্থার এডিংটনের বই থেকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি। বর্ণালীগত পর্যবেক্ষণ থেকে নিরূপিত নক্ষত্রের এক অনুভূমিকে চাপের পরিমাণ, সাহার সূত্র অনুসারে গণনা করে দেখা যায়, বায়ুমণ্ডলের $\frac{১}{১০০০০}$ অংশ। কিন্তু পূর্বে ধারণা ছিল, এই চাপ বায়ুমণ্ডলের অনুরূপ।

অধ্যাপক মিল্নে এবং আরও অনেক বিজ্ঞানী সাহার তত্ত্ব অবলম্বনে নক্ষত্রমণ্ডল সম্বন্ধে নানা জটিল পর্যবেক্ষণের মীমাংসায় সর্বপ্রথম যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যার অবতারণা করেন। এডিংটন "এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা" ১৪শ সংস্করণে লিখেছেন, '১৬০৮ সালে গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর থেকে আজ পর্যন্ত নভোবস্তু-বিদ্যার গবেষণায়

যে দশটি প্রধান আবিষ্কার হ'য়েছে, সাহার তত্ত্ব তার মধ্যে একটি।' অধ্যাপক রাসেল, মিল্‌নে ও অন্যান্য বিজ্ঞানী নক্ষত্রমণ্ডল এবং সৌরমণ্ডলের গবেষণায় যে সকল নতুন তত্ত্বের অবতারণা করেছেন, অধ্যাপক সাহার গবেষণা তা'র মূলে র'য়েছে। রোসেল্যাণ্ডের মত অনুসারে, নভোবস্তুবিদ্যার গবেষণায় সাহা এক নতুন ধারার প্রবর্তক।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, পদার্থ বিদ্যার পালিত গবেষণাগারে ১৯১৬ সালে গবেষণা আরম্ভ করেন। ১৯১৯ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি এই গবেষণাগারে নিজের তাপ-আয়নন তত্ত্ব ও নভোবস্তুবিদ্যায় এর ব্যাপক প্রয়োগ সম্বন্ধে যে গবেষণা করেন, তার কিছু পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি।

পৃথিবীর বৃহত্তম দূরবীণ-

মাউণ্ট প্যালোমারের ২০০ ইঞ্চি রিফ্লেকটর

এই দর্পণ খানার ওজন প্রায় ৫৫০ মণ এবং ব্যাস ১১ হাতের কিছু বেশী। কাঠামোসুদ্ধ যন্ত্রটার ওজন হবে প্রায় ১৫ হাজার মণ। কাঠামোর দৈর্ঘ্য ৫৫ ফুট ও ব্যাস ২২ ফুট। অভাবনীয় শক্তিশালী এই বিরাট যন্ত্রের মধ্য দিয়ে দশ হাজার মাইল দূরের ছোট্ট একটি বাতিকে দেখাও সম্ভব হবে এবং আকাশে মানুষের দৃষ্টি একশ' কোটি আলোক-বর্ষের দূরত্ব পর্যন্ত প্রসারিত হবে। (১ আলোক-বর্ষ = ১৮৬০০০ × ৬০ × ৬০ × ২৪ × ৩৬৫ মাইল)।

রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে পেট্রল চালিত ইঞ্জিন পরীক্ষা

আর্থার কেম্পেল

পেট্রল-চালিত ইঞ্জিনকে রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা করার কাজ গত যুদ্ধের সময় বিমান শিল্পে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইয়াছিল। ইহার ফলে নূতন নূতন অভিজ্ঞতাও লাভ করা গিয়াছে এবং অধুনা বৃটেনে মোটর শিল্পে তাহা প্রয়োগ করা হইতেছে।

লৌহ এবং অন্যান্য হাল্কা ধাতুর ছাঁচে ঢালাই কাজের প্রথম অবস্থাতেই রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে দোষক্রটি ধরা পড়ে। স্থান বিশেষে ঝালাই কাজেও অধুনা রঞ্জনরশ্মির ব্যবহারের ফলে এইরূপ হইবার আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে। ফলতঃ ঢালাইর কাজ এখন পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইতেছে। হাল্কা ধরণের মিশ্র ধাতু অর্থাৎ খাদ মিশ্রিত ধাতুকে রঞ্জনরশ্মি দ্বারা পরীক্ষা করার মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। লৌহ অথবা ভারী ধাতব দ্রব্য যে ভাবে রঞ্জনরশ্মি দ্বারা পরীক্ষা করা চলে মিশ্রধাতু সেই ভাবে পরীক্ষা করা চলেনা। ইহার জন্য ভিন্ন ধরণের এক্সরে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন। মিশ্র ধাতুর মধ্যে
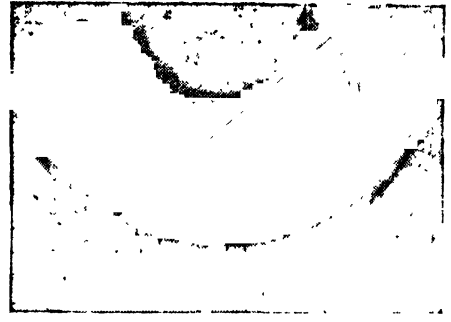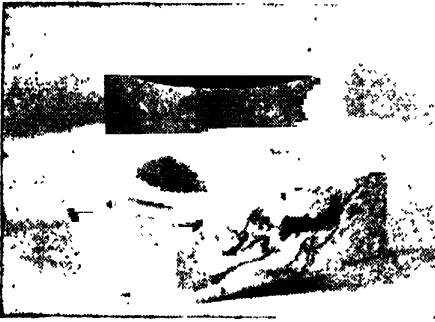
ইহার প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বোতভাবে উপলব্ধি করা গিয়াছে।

কোন ধাতুকে গলাইয়া ছাঁচে ঢালার পর স্থানে স্থানে কাটিয়া পরীক্ষা করার কাজে যেমন হয় অপচয় তেমনি ঢালাইর দোষক্রটিও সব সময় ধরা পড়ে না। হয়তো যে স্থানে কাটা হইল সে স্থানে কোন ঢালাইর ক্রটি পাওয়া গেল না, কিন্তু অন্য সমস্ত স্থানে গ্যাস প্রবেশ করিয়া এবং গলান ধাতু সঙ্কুচিত হইয়া বহু ছিদ্র হইয়া রহিল। যে সমস্ত দোষ ক্রটি থাকে তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা কষ্টসাধ্য এবং সেই জন্যই বিশেষ ধরণের যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। যেমন ম্যাগনেসিয়ামে সাধারণতঃ অতি সূক্ষ্ম সরন্ধ্রতা দেখা যায়।

ঝালাইর কাজে রঞ্জনরশ্মির পরীক্ষায় নিম্নলিখিত দোষক্রটি ধরা পড়ে। যথা, (ক) মূলধাতু ও ঝালাই করা ধাতুর মধ্যে অসংলগ্নতা; (খ) গ্যাস প্রবেশজনিত সরন্ধ্রতা (গ) সঙ্কোচনের ফলে ফাটল প্রভৃতি।

খুব পুরু এবং কঠিন পদার্থের পরীক্ষার জন্য গামা রেডিওগ্রাফী ব্যবহৃত হইতেছে। এই রশ্মি দীর্ঘ সময় প্রয়োগ করিতে হয় কারণ লৌহের গভীরতা বেশী হওয়ার দরুন স্বাভাবিক রঞ্জনরশ্মি দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন হইতে পারে না। যদি কোন মোটর ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিন পরীক্ষা করিতে চাহে তাহা হইলে গামা-রেডিওগ্রাফীর সাহায্য লইতে হইবে।

বিভিন্ন শিল্পে রঞ্জনরশ্মির সাহায্য গ্রহণের দিন আসিয়াছে। আশা করা যায় ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের সহিত বিজ্ঞানের এই শাখার প্রয়োগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে।

'উদ্ভিদগুলো যেন নোঙ্গর-বাঁধা প্রাণী'—আচার্য জগদীশচন্দ্র
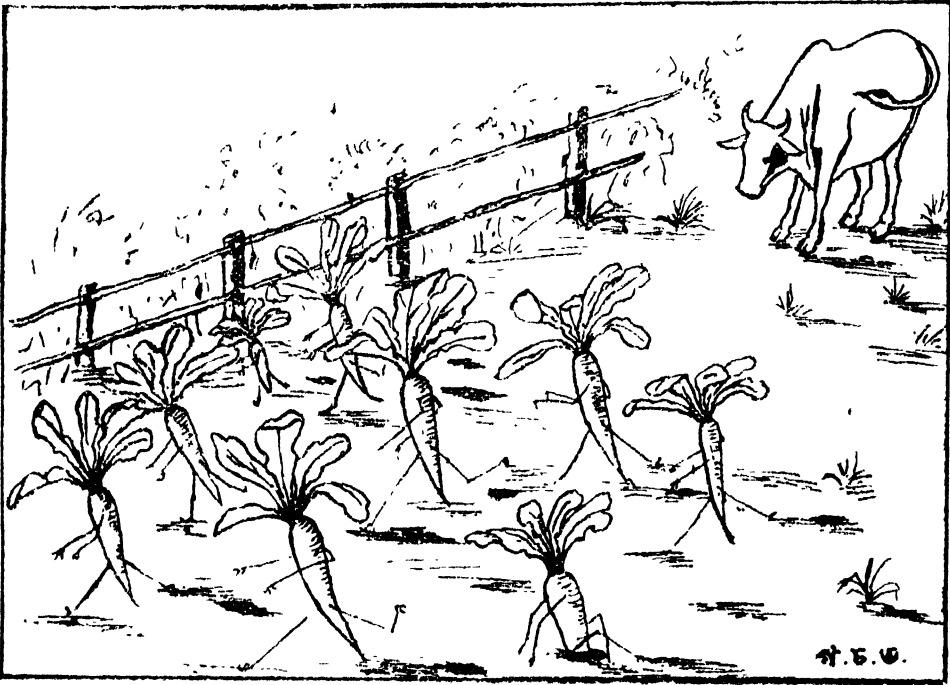
মানুষ বনাম যন্ত্র

শ্রীঅমূল্যধন দেব

মানব সভ্যতার প্রারম্ভ হইতেই মানুষ যন্ত্র ব্যবহার করিতেছে। তখন পাথরে পাথর ঠুকিয়া অগ্নি স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি বা কুঠারের সাহায্যে সমিধ আহরণ হইত। পাথর বা কুঠার যন্ত্র-ই। যন্ত্র তখন মানুষের অধীন ছিল।

শক্তির বিনাশ নাই। শক্তিকে এক পর্যায় হইতে অন্য পর্যায়ে পরিবর্তন করিবার নিয়ামক—যন্ত্র।

সভ্যতার অগ্রগতিতে, বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার আওতায় যন্ত্রের প্রচলন বাড়িয়া যায়। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে জেমস্ ওয়াট্ বাষ্পের সাহায্যে ইঞ্জিন চালাইতে কৃতকার্য হন। তখন হইতে খুব দ্রুত-গতিতে যন্ত্র-বিজ্ঞানের বিবর্তন হইতে থাকে। যন্ত্রযুগের পত্তনের সহিত ভারতের বেদনামূলক স্মৃতি জড়িত। এই সম্বন্ধে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর ডিস্কভারী অব ইণ্ডিয়ার ৩৫০ পৃষ্ঠা হইতে কিঞ্চিৎ সঙ্কলন করিলাম। "আমেরিকান লেখক ব্রুক এডামস্ বলিতেছেন—ভারতবর্ষ হইতে আনীত সম্পদ ব্রিটীশের ধনভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া শুধু যে শক্তি বৃদ্ধি করিল তাহা নহে, ইহার নিয়ন্ত্রণও সুগম করিল। পলাশীর পরই বঙ্গদেশ হইতে লুন্ঠিত সম্পদ লণ্ডনে পৌছিতে আরম্ভ করিল এবং ইহার ফল সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যক্ষ হইল, কারণ ইহা সর্ববাদিসম্মত যে যন্ত্র-যুগ বা শিল্প-বিপ্লব ১৭৭০ খৃষ্টাব্দেই আরম্ভ হয়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে, তাহার তুলনা নাই। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ফ্লাইয়িং সাট্‌ল আবিষ্কার হয় এবং ধাতু নিষ্কাষন কার্যে কাঠের পরিবর্তে কয়লা ব্যবহার হয়। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে হারগ্রিভ্‌স্ স্পিনিং জেনী আবিষ্কার করেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ক্রম্পটন মিউল প্রস্তুত করেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কার্টরাইট যন্ত্রচালিত টাকুর পেটেন্ট বাহির করেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে জেমস্ ওয়াট বাষ্পীয় ইঞ্জিন এর উৎকর্ষ সাধনে কৃতকার্য হন। যদিও এই সমস্ত আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তথাপি অর্থ বলের অপ্রতুলতা হেতু তাদৃশ তৎপরতা পরিলক্ষিত হইতেছিল না। যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে সম্পদ আসে নাই ততদিন পর্যন্ত এই সব আবিষ্কারের প্রচলনের প্রয়োজনীয় আর্থিকশক্তি জোগান সম্ভব হয় নাই। মনে হয়, পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে এমন কোনও ব্যবসা এত লাভজনক হয় নাই, যাহা ভারতীয় লুণ্ঠন হইতে হইয়াছিল।" "লুট শব্দটি হিন্দুস্থানী হইলেও তাহা ইংরেজী ভাষায় তখনকার দিনেই স্থান পাইয়াছিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দেই বঙ্গে ও বিহারে দুর্ভিক্ষ হয় এবং এক তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়।" এই পরিপ্রেক্ষিতে যন্ত্রযুগের সৃষ্টি করিবার জন্য ভারতের যে "দান" তাহা বড়ই বেদনা বিজড়িত। ভারতের ধন, ভারতের প্রাণ বিলাতের শিল্প-বিপ্লবএর ইন্ধন জোগাইয়াছিল। ভারতবর্ষে ভারতবাসীর কোনও প্রচেষ্টা সম্ভব হয় নাই, কারণ ভারত তখন পরাধীন, ভারতীয় প্রচেষ্টা ব্রিটিশ একচেটিয়া স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া গণ্য হইত।

যন্ত্রযুগের প্রবর্তনের পর মানুষ দৈহিক শক্তির পরিবর্তে যন্ত্র-দানবএর শক্তি ব্যবহার করিতে অভ্যস্ত হইতে লাগিল। বাষ্প শক্তি, তড়িৎ শক্তি, বায়বীয় ও জলীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র সাহায্যে সম্ভব হইল। প্রাকৃতিক শক্তিকে মানব বুদ্ধির কাছে হার মানিতে, অন্ততঃ সংযত হইয়া থাকিতে, হইল। প্রকৃতির শক্তির উপর মানব বুদ্ধির এই জয়, সভ্যতার মাপকাঠি বদলাইয়া দিল। দার্শনিক গবেষণা, শাস্ত্রীয় আলোচনা, আধ্যাত্মিক সাধনার পরাকাষ্ঠা সভ্যতার মাপকাঠি রহিল না। অপ, তেজ, মরুৎ

এই তিন ভূতের উপর আধিপত্য বিস্তার করা সভ্যতার পরিচায়ক হিসাবে গৃহীত হইল।

মানব শক্তি অপেক্ষা প্রাকৃতি শক্তির বল বেশী, যন্ত্র সাহায্যে এই প্রাকৃতিক্ শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করায় দৈহিক শক্তির ব্যবহার অনেক হ্রাস হয়। মানুষ তখন কম সময়ে, অল্প আয়াসে যন্ত্রের সাহায্যে বেশী উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। মানুষ যন্ত্রের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। ইচ্ছামত যন্ত্রকে খাটাইয়া নিজের অবসর বাড়াইয়া লয়।

যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় নূতন অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়। প্রাক্‌যন্ত্র-যুগে সমবায় বা বিনিময় প্রথা সমাজে প্রচলন ছিল। যাহার যতটুকু প্রয়োজন সেই পরিমাণেই সে সম্পদ উৎপন্ন করিত। কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হইতে লাগিল। প্রয়োজনাতিরিক্ত এই উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয় করিবার জন্য প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হইল। নূতন নূতন রপ্তানি কেন্দ্র খুঁজিতে হইল। উৎপাদন বৃদ্ধি করায় এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হইল। লোকের ভাবনা, চিন্তা—অধিক উৎপাদন হেতু—বাড়িয়া গেল। শান্তি ব্যাহত হইল। আজও তাহার জের চক্রবৃদ্ধি মতে চলিতেছে। অধিক উৎপাদন যুদ্ধ বাধিবার বা বাধাইবার প্রধান কারণ। যাহারা পুঁজিপতি পণ্য বিক্রয়ের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয় যুদ্ধ বাধিলে। বিগত প্রথম মহাসমরে (১৯১৪-১৮) ব্রিটিশের কারখানায় উৎপন্ন মারণাস্ত্র, ব্রিটিশ পুঁজিপতি জার্মানীর নিকট গোপনে বিক্রয় করিয়াছিলেন এবং জার্মানরা ব্রিটিশের উৎপন্ন মারণাস্ত্র ব্রিটিশের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করিয়াছে, এইরূপ প্রমাণ যুদ্ধের পর পাওয়া গিয়াছিল। অর্থ-নৈতিক সমস্যা, শ্রমিক সমস্যা ইত্যাদির মূলে রহিয়াছে অসামঞ্জস্য মূলক অধিক উৎপাদন।

একদা যন্ত্র মানুষের অধীন ছিল, এখন প্রকারান্তরে মানুষই যন্ত্র-দৈত্যের চাপে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইতে চলিয়াছে। যন্ত্রকে যদি ঠিক প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করা না যায় তবে অর্থ-নৈতিক, শ্রমিক সমস্যার সমাধান হইবে না। এক মাত্র সহযোগিতা ও সমবায় নীতির সাহায্যে এই কাম সম্ভব। এইচ্ জি, ওয়েলস্ তাহার ওয়ার্ক, ওয়েলত্ ও হেপিনেস নামক বইএ ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সমবায় নীতির সাহায্যে উৎপাদন ও বণ্টনই বর্তমানে একমাত্র পন্থা যাহা শান্তি আনিতে পারে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অধিক উৎপাদন এর পরিবর্তে প্রয়োজনীয় উৎপাদনই যুক্তিসঙ্গত। যন্ত্র দানব বড় নয়, মানবই বড়। যন্ত্র দাস মাত্র।

বঙ্গদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ সমস্যা

শ্রীমনোরঞ্জন দত্ত

মধ্য ও প্রাচীন যুগে যে সকল কাজে শক্তি সামর্থ্যের প্রয়োজন হইত তাহার অধিকাংশই মানুষ করাইয়া লইত গো-মহিষ-অশ্বাদি পশু অথবা ক্রীতদাসের দ্বারা।

বাষ্পীয় ইঞ্জিনের উদ্ভব ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট পরিবর্তনের সূত্রপাত হইল। যেখানে কয়লা লইয়া যাওয়া যাইত সেখানেই বাষ্পীয় শক্তির সরবরাহ সম্ভব হইত বটে, কিন্তু এক স্থান হইতে বিশেষ ব্যয়সংকুল বলিয়া দেশের বিভিন্নাংশে কয়লার মূল্যে বেশ তারতম্য পরিলক্ষিত হইত। কয়লা খনির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অথবা সস্তায় কয়লা লইয়া যাওয়া যায় মাত্র এমন সকল স্থানেই কারখানা প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা উপলব্ধি হইল। বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন ও সহজ প্রেরণ এ সকল প্রণালী অসুবিধা অনেকটা দূর করিতে সক্ষম হইয়াছে।

যে স্থানে উৎপন্ন হয় সেই স্থান হইতে দরকার-মত উচ্চ ভোলটেজের বৈদ্যুতিক শক্তিকে শত শত মাইল দূরে লইয়া যাওয়া সম্ভব। নিম্ন ভোলটেজে এই শক্তিকে বাড়ীর বিভিন্নাংশে লইয়া যাওয়া চলে। তা' ছাড়া সস্তায় শক্তি সরবরাহের জন্য কয়লাখনির নিকটবর্তী অঞ্চলে শিল্পগুলিকে আর সীমাবদ্ধ করিতে হয় না।

প্রথমে বিলাসিতারূপে গণ্য হইলেও বর্তমানে শহর ও পল্লী উভয় অঞ্চলেই বিদ্যুৎ এখন অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। আজ সকলেই স্বীকার করিবেন যে, জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্য বিদ্যুৎ অপরিহার্য। দিনে দিনে ইহার প্রয়োগ আমাদের গার্হস্থ্য ও সামাজিক সর্ববিধ কর্মের মধ্যেই দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে।

বিদ্যুতের প্রয়োগ :

শহরের পথঘাট ও গৃহগুলিকে আলোকিত করে বিদ্যুৎ। বৈদ্যুতিক আলো স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার উপযোগী। রাত্রিকালে পথঘাটে যাতায়াতকে ইহা নিরাপদ করিয়াছে।

পূর্বে গার্হস্থ্য জীবনে বিদ্যুতের ব্যবহার শুধু আলোক উৎপাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু অধুনা আমাদের প্রাত্যহিক কার্যতালিকাকে সরল ও সহজ করিবার উদ্দেশ্যে ঘর ও কারখানা-গুলিকে আলোকিত ও বায়ুপূর্ণ রাখিবার ব্যাপারে, এমন কি রন্ধনাদি ক্রিয়ায়ও বিদ্যুতের ব্যবহার চলিতেছে। লোকে যাহাতে এইসকল কার্যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করিতে পারে, তাহার জন্য মূল্য হ্রাস করিয়া বিদ্যুৎ বিক্রীত হয়।

বিশুদ্ধ জলের সরবরাহ একটি অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার। ইহার অভাবে কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব স্বাভাবিক। বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত যন্ত্রাদির দ্বারা বিশুদ্ধ জল সরবরাহ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। যাহাতে কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশের প্রত্যেকটি পরিবার গৃহকর্মে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে গ্রেট্ ব্রিটেন একটি প্রশস্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার চেষ্টায় আছে।

শিল্পক্ষেত্রে বিদ্যুতের সাহায্যে একই অথবা অল্পতর ব্যয়ে বেশী পরিমাণে উন্নতধরণের দ্রব্যাদি উৎপন্ন হওয়ার ফলে তাহাদের মূল্য কমিয়াছে এবং জনগণের জীবন ধারণের মান বাড়িয়াছে।

পল্লীঅঞ্চলে কার্যের পক্ষে প্রতিকূল ঋতুগুলিকে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে কার্যের উপযোগী করিয়া তোলা যায়। ইহাতে অধিবাসিগণ তাহাদের অলস

মুহূর্তগুলি নানারূপ গ্রাম্যশিল্পে নিয়োজিত করিয়া অধিক অর্থ অর্জন করিতে পারে।

বঙ্গে শিল্পোন্নতির জন্য বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা :

বঙ্গদেশের (নববিভক্ত পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের) মোট জনসংখ্যা ৬ কোটীর উপর। তন্মধ্যে অধিকাংশ লোক পল্লী অঞ্চলে (অর্থাৎ ৭০,০০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত ৮৬টি মহকুমায় বিভক্ত স্থানে) বাস করে। শিল্প বাণিজ্যের কোনরূপ সুবিধা না থাকায় পল্লী অঞ্চলের লোকদের জীবনধারণের মান অতি নিম্ন। একমাত্র শিল্পবাণিজ্যের বহুল প্রসারই এই সমস্ত লোকের অর্থনৈতিক জীবনে বিচিত্রতা আনিতে পারে। শত শত বেকার ও অর্ধবেকারকে কর্মে নিয়োজিত করিতে পারে।

প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যুৎ প্রেরণ ও অল্প মূল্যে বিতরণের যে কোন পরিকল্পনা শিল্পের ব্যাপক প্রসার সম্ভব করিতে পারে এবং বেকার শ্রমিকদের বেকারত্ব ঘুচাইতে পারে। সস্তা বিদ্যুতের সরবরাহ ব্যতীত জলের এবং দ্রব্যাদি আদান প্রদানের পক্ষে সুবিধাজনক স্থানে কারখানা নির্মাণের প্রশস্ত সম্ভাবনা ধনীদের দৃষ্টি পল্লীঅঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট করিবে। পল্লী অঞ্চলে সহজে শ্রমিকও পাওয়া যায়। সুতরাং শিল্পোন্নয়ন সমিতি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বিভাগের কর্তাদের পরস্পর সহযোগিতার সহিত কার্য করিয়া উপযুক্ত অঞ্চলে সহজ শিল্পগুলি প্রতিষ্ঠা করিয়া বাণিজ্যের প্রসার করিতে একান্ত চেষ্টা করা উচিত। কৃষিকার্যে অনাবশ্যক উদ্বৃত্ত শ্রমিকেরা এই সব শিল্পে নিযুক্ত হইলে একটা অর্থনৈতিক সমতা রক্ষিত হইবে।

বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের বহু প্রাকৃতিক সুবিধা আছে। শিল্পে প্রয়োজনীয় বহু কৃষিজাত দ্রব্য নিকটেই পাওয়া যায়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চা ও পাট এই খানেই উৎপন্ন হয়। তাহা ব্যতীত প্রচুর পরিমাণে কয়লা, তামাক, আখ, তৈলবীজ, লাক্ষা, পশুচর্ম, কাঠ এবং বাঁশও বঙ্গদেশে জন্মায়। যেসব স্থানে কাঁচা মাল পাওয়া যায়, আমদানি রপ্তানির সুবিধা আছে এবং শ্রম ও বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহ সহজে সম্ভব, সেই সব স্থানে শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিলে অল্প ব্যয়ে প্রচুর উত্তম দ্রব্য উৎপন্ন করা যাইতে পারে।

খনি ও কারখানায় বিদ্যুৎ

কারখানাগুলিতে যন্ত্রাদি চালনে এবং সার প্রস্তুত প্রভৃতি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন। ভারতবর্ষে সার উৎপাদনের কারখানা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা এখনও বিবেচনাধীন। সিন্ধ্রিতে এইরূপ একটি কারখানা নির্মিত হইতেছে।

বঙ্গদেশে প্রায় ২২০টি কয়লাখনি আছে। তাহাদের একচতুর্থাংশ মাত্র বিদ্যুৎ ব্যবহার করিয়া থাকে। বিদ্যুতের সস্তা সরবরাহের উপরেই রাসায়নিক ও ধাতব শিল্পগুলিতে বিদ্যুতের ব্যবহার নির্ভর করে।

রেলওয়ে বিভাগে বিদ্যুৎ :

সম্প্রতি এক প্রেসনোটে ঘোষণা হইয়াছে যে, কলিকাতা ও শহরতলীর মধ্যে বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা করা হইবে যাহাতে দিবারাত্র জনসাধারণ এইসব অঞ্চলে যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে যাতায়াত করিতে পারে। ইহাতে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুতের প্রয়োজন। কিন্তু 'লোড্ ফ্যাক্টর' অধিক নহে, যদিও একবার পথঘাট ঠিক হইয়া গেলে এবং যাত্রীসরবরাহ সুনিশ্চিত হইলে অবসর সময়ে অতিরিক্ত যাতায়াত দ্বারা ইহার উন্নতি সম্ভব। এই সমস্ত অতিরিক্ত যাতায়াতে বেশী খরচ হইবে না, অথচ জনসাধারণের উপকার সাধিত হইবে। এইসব সময়ে মালগাড়িরও চলাচল করা যাইতে পারে।

কৃষিকর্মে বিদ্যুৎ :

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত উন্নতদেশে ব্যাপক ভাবে এবং ভারতবর্ষের কতকাংশে পরিমিতভাবে

কৃষিকার্যে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইতেছে। মহীশূর, ইউ, পি, এবং মাদ্রাজের কতকাংশে একবার ঘুরিয়া আসিলে বোঝা যাইবে পুরাতন পদ্ধতির পরিবর্তে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগে কৃষিকর্মে কি বিশাল উন্নতি দেখা দিয়াছে। বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান। ইহার শতকরা ৭৫ জন অধিবাসী জীবিকার্জনের জন্যে কৃষির উপর নির্ভর করে। ইহার মোট আয়তন ৫৩ লক্ষ একর। তন্মধ্যে ২৫ লক্ষ একর জমি অর্থাৎ মোট আয়তনের ৪৭% কৃষির অধীন। বনাঞ্চল বাদ দিলে আরও প্রায় ৬½ লক্ষ একর জমি অর্থাৎ বর্তমানে যে জমি চাষ হয় তাহার প্রায় এক চতুর্থাংশ কৃষিকর্মের জন্য পাওয়া যাইতে পারে। যদি সেচনের সুবিধা থাকিত তবে আরও অধিক জমিতে চাষ সম্ভব হইত। এসব আলোচনা বাদ দিলেও বর্তমানে যে জমি চাষ করা হয় তাহাতেও উত্তম জল সরবরাহ সম্ভব হয় নাই এবং জলের জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে **মৌসুমী বায়ুর** খেয়ালের উপর নির্ভর করিতে হয়। মধ্যবঙ্গের নদীগুলি মৃতপ্রায়। পশ্চিমবঙ্গের নদীগুলি যখন বৃষ্টি হয় তখন পূর্ণ থাকে, বৃষ্টির অভাবে শুকাইয়া যায়। পক্ষান্তরে পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ ক্ষেত্র বর্ষাকালে জলে ডুবিয়া যায়। এই প্রদেশের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য ধান্য। কর্ষিত ক্ষেত্রের প্রায় ৮৮% ভাগে ধান্য রোপন করা হয়। এই চাষে প্রচুর জলের প্রয়োজন। যদি সেচের সুবিধা থাকিত তবে অনায়াসে বৎসরে একই ক্ষেত্রে দুইটি উত্তম ধান্যের চাষ এবং একটি উত্তম তরিতরকারি শাকশব্জীর চাষ সম্ভব হইত। সেচ সুবিধার অভাবে বর্তমানে একই জমিতে মাত্র একটি কি দুইটি ধান্যের আবাদ হয়। তন্মধ্যে কোনটিকেই উত্তম বলা যায় না।

পুরাকাল হইতে আজ পর্যন্ত একই উপায়ে আমাদের দেশে মৃৎ-কর্ষণ হইতেছে। এই প্রদেশে জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে সর্বপ্রথমে দরকার জলসেচনের ও সার সরবরাহের সুব্যবস্থা।

কিভাবে U. S. S. R একটি কৃষিপ্রধান দেশ হইতে একটি শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হইয়াছে তাহা বিশেষ অনুধাবনের বিষয়। পূর্বে এইদেশে স্বতন্ত্রভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি প্রচলিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে বৃহৎ পরিকল্পনায় যন্ত্রাদির সাহায্যে যৌথকৃষি প্রবর্তিত হইয়াছে। যে দেশ একদিন অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও অসংস্কৃত ছিল তাহা আজ একটি সুশিক্ষিত, ও বিশেষভাবে বিজ্ঞানে উন্নত দেশে পরিণত হইয়াছে।

আমাদের প্রদেশে ক্রমবর্দ্ধমান খাদ্যসংকটের সমাধান করিতে হইলে প্রত্যেকটি উপযুক্ত ভূমিতে উন্নতরধরণের কৃষির প্রচলন করিতে হইবে। ইহা একমাত্র উপযুক্ত সেচব্যবস্থা ও নিষ্কাষণ প্রণালীর দ্বারাই সম্ভব। এই ব্যবস্থার জন্য নির্ভরযোগ্য ও পরিমিত বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন। ইহা হইতে উপলব্ধি করা যায় যে আমাদের দেশের বিশাল সম্পদকে অসংবদ্ধ ও অব্যবহৃত রাখিবার জন্যই এই শোচনীয় দারিদ্র।

ফলের চাষ, গো-মহিষ পালন, অন্যান্য পশু-পক্ষীর চাষ, উদ্যানের আচ্ছাদিত অংশের বায়ুতাপন, মৃৎশোধন ও উত্তাপন প্রভৃতি কার্যেও ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যুতিক আলোকের স্থিতি ও ঘনত্বের সাহায্যে বৃক্ষকে উত্তেজিত করিয়া তাহার পুষ্টি ও পুষ্পপ্রসবের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

জাতিকে উন্নত করিতে হইলে তড়িৎ শক্তিকে সম্যকভাবে ব্যবহার করিতে হইবে। দেশের যুদ্ধোত্তর শিল্পোন্নয়নের দিক হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্পই সর্বাধিক প্রয়োজনীয়। দেশের উন্নতিকল্পে তড়িৎ সরবরাহ শিল্পের প্রতিষ্ঠা দেশের মনীষিবৃন্দের এবং ভাগ্যনিয়ন্তাগণের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষন করিবে সন্দেহ নাই।

করে দেখ

(১)

বুমেরাং

বুমেরাং কথাটা তোমরা অনেকেই হয়তো শুনেছ। কিন্তু বস্তুটা যে কি এবং কেনইবা এর নাম সে কথাটা জান কি? বুমেরাং অতি সাধারণ একটা বস্তু,—একখণ্ড কাঠ মাত্র। কাঠখানা সোজা নয়, একদিকে বাঁকানো এবং অনেকটা চেপ্টা। এই বাঁকানো কাঠের কার্য-ক্ষমতা অদ্ভুত। অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা বহুকাল থেকে পাখীশিকারের অস্ত্র হিসাবে অথবা খেলাধূলার জন্যে বুমেরাং ব্যবহার করে আসছে। অবশ্য অষ্ট্রেলিয়া ছাড়াও অন্যান্য দু'একটা দেশে বুমেরাং ব্যবহারের কথা শোনা যায়। বুমেরাঙের মজা হচ্ছে এই যে, কায়দা করে ছুঁড়ে মারতে পারলে, সেটা ঘুরতে ঘুরতে শূন্যপথে অনেকদূর এগিয়ে গিয়ে আবার নিক্ষেপকারীর কাছেই ফিরে আসে। ফিরে আসবার কায়দাও বিভিন্নরকমের হতে পারে। জিনিষটার গঠনে একটুখানি মোড় বা বাঁকের তারতম্য এবং ছোঁড়বার কৌশলের উপরই ফিরে আসবার রকমারি কায়দা নির্ভর করে। যুদ্ধের অস্ত্রহিসাবেও বুমেরাং ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সেগুলো কিন্তু নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে আসে না। অনেকটা চেপ্টা একখানা কাঠ দিয়ে বুমেরাং তৈরী করা হয়। এর চেহারা অনেকটা হাতল শূন্য দেশী লাঙ্গলের মত। কতকটা ধনুকের মতও বলা যেতে পারে। বুমেরাং ধনুকের মত বাঁকানো হলেও ওর বাহু দু'টা কিন্তু সমান নয়। একটা বড়, অপরটা তার চেয়ে কিঞ্চিৎ ছোট। সাধারণ একখানা চেপ্টা কাঠকে আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারলে ঘুরতে ঘুরতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে; কিন্তু সেটা আবার ঘুরতে ঘুরতে নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে আসেনা। বুমেরাঙের এইটেই হল বিশেষত্ব। সেটা ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করে' ঘুরতে ঘুরতেই আবার

নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে আসবে। কথাটা হয়তো তোমরা অতিশয়োক্তি বলে ভাবতে পার। কিন্তু অতিশয়োক্তি মোটেই নয়। ব্যাপারটা সত্যই এরূপ ঘটে কিনা নিজেরাই সেটা পরীক্ষা করে দেখতে পার। কিভাবে পরীক্ষা করবে বলে দিচ্ছি :—
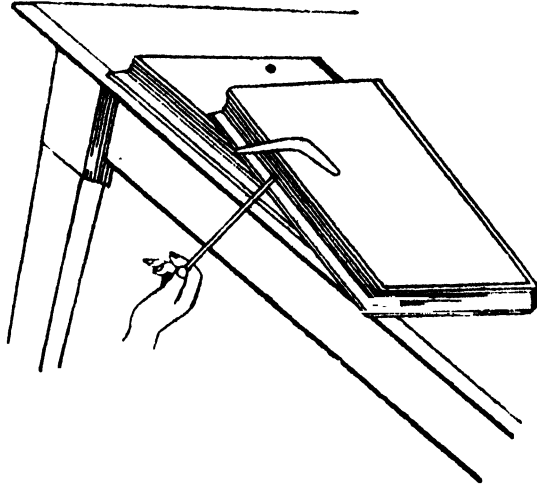
বুমেরাং ছোঁড়বার কায়দা

ছবিতে টেবিলে রাখা বই দু'খানার উপর ধনুকের মত বাঁকানো একটা জিনিষ দেখতে পাচ্ছ। এটাই বুমেরাঙের নমুনা। পাতলা অথচ শক্ত একখণ্ড কার্ডবোর্ড থেকে কাঁচি দিয়ে কেটে ওইরকমের একটা জিনিষ তৈরী কর। ৫ ইঞ্চি বা ৬ ইঞ্চি লম্বা করলেই চলবে। একটা বাহুর চেয়ে অপরটা যেন একটু ছোট হয়। বড় বাহুর লেজটাকে পিছনের দিকে সামান্য একটু মোচড় দিয়ে দিলে অনেকটা ভাল ফল হবে। ছবিতে যেভাবে দেখানো হয়েছে তেমনিকরে টেবিলের ধার ঘেঁষে একখানা বই রেখে তার উপর আর একখানা বই ঢালু ভাবে রাখ। ঢালু বইখানার উপর কার্ডবোর্ডের বুমেরাংটাকে ছবির মত করে বসাও। বুমেরাঙের লম্বা বাহুটা যেন টেবিলের ধার থেকে খানিকটা বাইরের দিকে বেরিয়ে থাকে। এবার একটা পেন্সিল বা শক্ত কাঠি একহাতে ধর। অপর হাতের আঙুল দিয়ে—ঠিক মার্বেল ছোঁড়বার মতকরে কাঠি বা পেন্সিলের মাথার দিকটা খানিকটা পিছনে টেনে হঠাৎ ছেড়ে দাও। পেন্সিলের উপরের দিকটা ছিটকে গিয়ে বুমেরাঙের বাহুটাকে আঘাত করবে। সঙ্গে সঙ্গে কার্ডবোর্ডের বুমেরাংটা ঘুরতে ঘুরতে শূন্যপথে এগিয়ে যাবে। কিন্তু দেখবে, খানিকদূর যাওয়ার পর সেটা মাটিতে না পড়ে ঘুরতে ঘুরতে আবার তোমার কাছেই ফিরে এসেছে। কেন এমন হয়—এস্থলে তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বড় হয়ে পড়াশোনা করলেই বুঝতে পারবে।

(২)

মাছ কি জলে ডুবে মরে

প্রশ্নটা হয়তো তোমাদের কাছে অদ্ভুত বলেই মনে হবে। জলের মাছ, সে আবার জলে ডুবে মরবে কেন? কথাটা যুক্তিযুক্ত বটে; কিন্তু পরীক্ষা করলেই দেখতে পাবে—অনেক জাতের মাছ ঠিক মানুষ বা অন্যান্য ডাঙার প্রাণীদের মতই জলে ডুবে ছট্‌ফট্‌ ক'রে মারা যায়। সাঁতার জানে না, এমন কোন লোক জলে পড়ে' গেলে প্রথমটায়, যতক্ষণ হাবুডুবু খেতে থাকে ততক্ষণ তার শ্বাসরোধ ঘটে না। কিন্তু ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে জলের নীচে ডুবে যাবার পর শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মাছের বেলায়ও ঠিক ওইরকমের অবস্থাই ঘটে। কৈ-মাছ তোমরা সকলেই চেন। এরা খুবই কষ্টসহিষ্ণু; ডাঙায়ই তোল, কি সর্বশরীর ক্ষত বিক্ষতই করে দাও সহজে মরে না। এই কৈ-মাছ নিয়েই পরীক্ষা করে দেখতে পার। দেখবে—গুরুতর আঘাত, যন্ত্রণায় যাদের মৃত্যু নেই, জলের নীচে শ্বাসবন্ধ হয়ে দশ, পনর মিনিটের মধ্যেই তারা কেমন ছট্‌ফট্‌ করে' মারা যায়! পরীক্ষাটা কেমন করে করবে বলছি:—
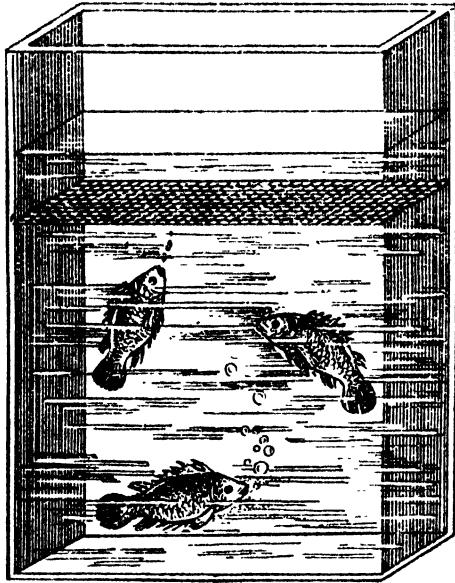
তারের জালতির জন্যে মাছগুলো জালের উপরে আসতে পারে না।

ফুট দেড়েক উঁচু, পাঁচ ছয় ইঞ্চি চওড়া একটা কাচের জার বা ওইরকম ধরণের কোন একটা কাচের পাত্র যোগাড় করতে পারলেই ভাল হয়। কাচের পাত্রটার প্রায় গলা পর্যন্ত জল ভর্তি করে তাতে দু'তিনটা কৈ-মাছ ছেড়ে দাও। মাছগুলো তাতে বেশ স্বাভাবিক অবস্থায়ই থাকবে। জারটার ভিতরের দিকের মাপের চেয়ে একটু বড় করে একখানা তারের

জাল কেটে নাও। ভিতরের মাপের চেয়ে একটু বড় থাকায় জালটাকে সমানভাবে জারের যে কোন জায়গায় আটকে রাখতে পারবে। জালটাকে এবার জারের মধ্যে জলের প্রায় ইঞ্চি খানেক নীচে চেপে বসিয়ে দাও। দেখবে, মাছগুলো তখনও জলের মধ্যে বেশ নিশ্চিন্তভাবে খেলা করছে। দু'চার মিনিট পরেই দেখবে, মাছগুলো জলের উপরে আস্‌বার চেষ্টা করছে, কিন্তু জলাটার জন্যে পারছে না। আরও কিছুক্ষণের মধ্যেই মাছগুলো জালটাকে ঠেলে উপরে ওঠবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে থাকবে। জলের উপর থেকে একটু বাতাস নেবার জন্যেই তাদের এ প্রাণপণ চেষ্টা। শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হতেই মরিয়া হয়ে জাল ঠেলে বেরিয়ে না আসতে পেরে মাছগুলো ছটফট্ করে মৃত্যু মুখে পতিত হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় জলের মধ্যে চলাফেরা করবার সময় মাঝে মাঝে এরা অতি অল্প সময়ের জন্যে জলের উপর মুখ বা'র করে এক এক ঢোক বাতাস নিয়ে নেয়। উপর থেকে এই বাতাসটুকু নিতে না পারলে ডাঙার প্রাণীদের মত এদেরও শ্বাসরোধ ঘটবেই।

(৩)

গাছে ইচ্ছামত ফল ধরানো

এবার তোমাদিগকে উদ্ভিদের বিষয়ে একটা পরীক্ষার কথা বলবো। গাছে ফুল ফোটে কেন বলতে পার? ফুল ফোটে ফল ধরবার জন্যে। কেমন করে ফল ধরে সে কথা বলছি। প্রাণীদের মত উদ্ভিদের মধ্যেও স্ত্রী, পুরুষ ভেদ আছে। কতকগুলো উদ্ভিদের মধ্যে স্ত্রী আর পুরুষ গাছ সম্পূর্ণ আলাদা। এদের কেবল স্ত্রীগাছেই ফল ধরে। তাল, পেঁপে প্রভৃতি গাছ এরকমের। কতকগুলো উদ্ভিদের স্ত্রী, পুরুষ পার্থক্য কেবল ফুলের মধ্যেই দেখা যায়। যেমন লাউ, কুমড়ো, শশা প্রভৃতি। আবার কতকগুলো গাছের একই ফুলের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ পার্থক্য আত্মপ্রকাশ করে। যেমন আম, জাম, বেগুন ইত্যাদি। কোন্‌টা স্ত্রী-ফুল আর কোন্‌টাই বা পুরুষ-ফুল কিকরে জানা যাবে? যে পদার্থটাকে ফুলের রেণু বলা হয় তোমাদের প্রত্যেকেই বোধ হয় সেটা চেন। স্ত্রী এবং পুরুষ আলাদা ফুলের যেটার মধ্যে রেণু দেখবে সেটাই হচ্ছে পুরুষ ফুল। আর যেসব গাছে একই ফুলের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ পার্থক্য আত্মপ্রকাশ করে তার যে অংশটুকুতে রেণু থাকে সেটুকু পুরুষ আর যে অংশে শোঁয়ার মত অথবা কোন আঠালো পদার্থ

থাকে সেটুকু হলো স্ত্রী অংশ। পুরুষ অংশের রেণু স্ত্রী অংশে লেগে গেলে গাছ ফলবতী হয়। নচেৎ প্রথমে ছোট্ট ফল দেখলেও পরে সেটা নষ্ট হয়ে যায় অথবা বোঁটা থেকে খসে পড়ে।
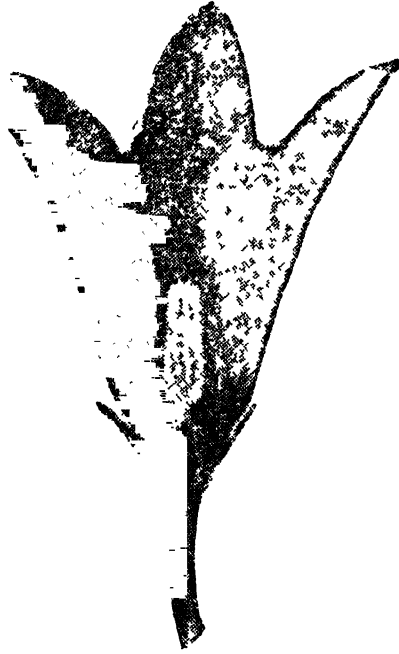
কুমড়োর পুরুষ ফুল

এবার পরীক্ষার কথা বলছি। পরীক্ষা করতে হলে সহজে চেনা যায় এরকমের সহজ লভ্য কোন বড় ফুলের গাছ নেওয়াই সুবিধা। কুমড়োর ফুলই প্রথম পরীক্ষার জন্যে বিশেষ উপযোগী। কিছুদূর লতিয়ে যাবার পর কুমড়ো-লতার গাঁটে গাঁটে বড় বড় ফুল ফুটতে থাকে। কতকগুলো ফুলের বোঁটা খুবই লম্বা। সেই লম্বা বোঁটাওয়ালা ফুলের ভিতরে দেখবে—হলদে রঙের স্থূলকায় অথচ লম্বাটে একটা পদার্থ। সেটার গায়ে আঙুল লাগলেই আঙুলের সঙ্গে হলদে গুঁড়ার মত পদার্থ লেগে থাকবে। ওগুলোই পুরুষ ফুলের রেণু। গাছটার আরও কয়েক গাঁট দূরে দেখবে—খুব ডগমগে অন্য রকমের ফুল ফুটে আছে। এ ফুলের ভিতরে লম্বাটে পদার্থের পরিবর্তে দেখবে পিণ্ডাকার একটা পদার্থ রয়েছে। পিণ্ডটার গায়ে থাকে একরকম চট্‌চটে আঠালো পদার্থ। ফুলটার বাইরে, নীচের দিকে থাকে ছোট্ট একটি কুমড়ো। এই সবটা নিয়েই কুমড়োর স্ত্রী-ফুল। ছবি দেখলে বুঝতেই পারবে। দু'রকমের ফুলই সকালের দিকে এক সঙ্গে ফোটে। ফোটবামাত্র যে কোন একটা স্ত্রী-ফুলকে খুব পাতলা টিস্যু কাগজ বা রেশমী রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখ। দুপুরের দিকে ঢাকনা সরিয়ে নিলেই হবে। দু'চারদিন লক্ষ্য রাখলেই দেখবে—

রুমাল্-ঢাকা ফুলটার ছোট্ট কুমড়োটা ক্রমশঃ লালচে হয়ে বোঁটা থেকে খসে পড়লো, না হয় পচে গেল; কিন্তু অন্যান্য ফুলের বোঁটায় বেশ ফল ধরে আছে। কেন এমন হয় বুঝেছ তো? মৌমাছিরা ওই ফুলের মধু খেতে এসে তাদের অজ্ঞাতসারেই পুরুষফুলের রেণুগুলোকে স্ত্রী-ফুলের আঠালো পদার্থটার গায়ে লাগিয়ে দিয়ে যায়। তাতেই ফলটা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হয়ে বড় হয়ে ওঠে। রেণু না লাগলে স্ত্রীফুলটার সঙ্গে যে ছোট্ট ফলটা থাকে (চিত্র দেখ) সেটা বাড়তে পারে না। গাছে অজস্র ফুল ফুটলেও মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াসা প্রভৃতি খারাপ আবহাওয়া এবং অন্যান্য কারণে স্ত্রী-ফুলে রেণু লাগা সম্ভব হয় না। কাজেই ফল ধরতে পারে না।
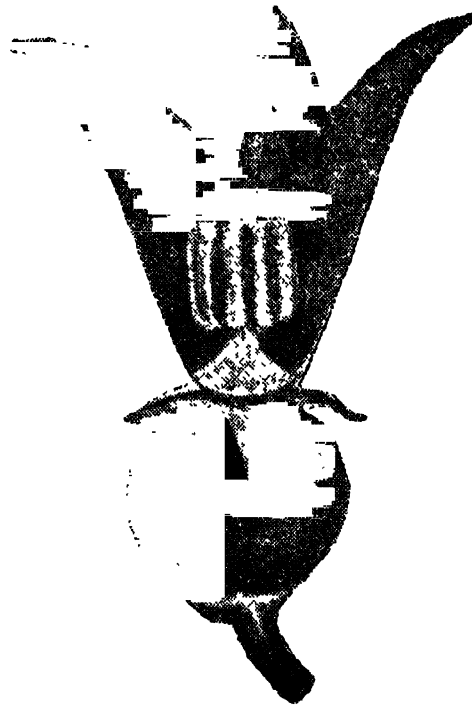
কুমড়োর স্ত্রী ফুল।

গাছ বাড়ন্ত এবং ফুলও অজস্র, এরূপক্ষেত্রে ফল ফলতে না দেখলে পাখীর পালক বা নরম তুলি দিয়ে রেণু তুলে এনে অথবা পুরুষ ফুলের বোঁটা ছিড়ে নিয়ে স্ত্রী-ফুলের পিণ্ডাকার পদার্থটার গায়ে রেণু লাগিয়ে দিলে দেখবে প্রত্যেকটা ফুল থেকেই ফল ধরছে। খুব সাবধানে আলতোভাবে রেণু লাগাতে হবে। কয়েকদিন চেষ্টা করলেই বেশ অভ্যস্ত হয়ে যাবে। ফসল বাড়ানো, উন্নত ধরণের ফসল উৎপাদন এবং আরও অনেক ব্যাপারে এর কত প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবে যখন এ ব্যাপারে অন্ততঃ কিছুটাও সাফল্য লাভ করবে এবং কৃষিবিজ্ঞান সম্বন্ধে তোমাদের উৎসাহ ক্রমেই বেড়ে উঠবে। এ বিষয়ে তোমরা উৎসাহিত হলে পরে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। গ, চ, ভ,

জেনে রাখ

নিজের হাতে সহজেই করে' দেখতে পার—এ ধরণের মাত্র দু'একটা সাধারণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথাই "ছোটদের পাতায়" তোমাদিগকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, বিশেষ করে যন্ত্র-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এতসব কৌতূহলোদ্দীপক ও প্রয়োজনীয় কথা রয়েছে যেগুলো তোমাদের একান্তই জানা দরকার অথচ তোমাদের পক্ষে সেগুলো হাতে কলমে করে' দেখাও সম্ভব নয়। জানবার আগ্রহ থাকলে এদের মোটামুটি রহস্যগুলো বুঝতে তোমাদের মোটেই কষ্ট হবে না। কাজেই এধরণের বৈজ্ঞানিক বিষয় সম্পর্কে এস্থলে কিছু কিছু আলোচনা করা হবে।

ষ্টীম এঞ্জিন

ষ্টীম এঞ্জিন (বাংলায় যাকে বাষ্পীয়-যন্ত্র বলা হয়) তোমাদের কাছে অপরিচিত নয়। বিভিন্ন রকমের কল-কারখানার এঞ্জিন না হোক, অন্ততঃ রেলগাড়ীর এঞ্জিন বোধহয় প্রত্যেকেই দেখেছ। এঞ্জিনে দেওয়া হয়, শুধু জল আর কয়লা। কয়লা পুড়ে জল গরম হয়ে বাষ্প হয়। সেই বাষ্পের জোরেই হাজার হাজার যাত্রী এবং হাজার হাজার মণ মাল বোঝাই রেলের গাড়ীগুলোকে টেনে নিয়ে ঘণ্টায় ৬০।৭০ মাইল বা তারও বেশী বেগে এঞ্জিন ছুটে চলে। কিন্তু সাধারণ এই গরম জলের বাষ্প, এতগুলো বোঝাই গাড়ী সমেত এঞ্জিনটাকে কেমন করে ঠেলে নিয়ে যায়, সেই কৌশলটা তোমরা জান কি? এঞ্জিনের যন্ত্রপাতির খুঁটিনাটি অনেক জটিলতা থাকলেও বাষ্পের চাপে এঞ্জিন চলবার মোটামুটি কৌশলটা খুবই সহজ। বাষ্পের জোরে কেমন করে এঞ্জিন চলে, সে কথাই আজ তোমাদিগকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করবো। তোমরা ভুতের গল্প শুনেছ নিশ্চয়ই। গল্পে আছে, ভুতের অলৌকিক ক্ষমতা'র কথা। হাজার হাজার মানুষ একযোগেও যেকাজ করতে পারে না, কাজ আদায় করবার কৌশল জানা থাকলে, ভুতকে দিয়ে অনায়াসেই সে কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। মানুষ 'মরে' ভুত হয়, কাজেই ভুতের আর মরণ নেই; কিন্তু সুখ-দুঃখ জ্বালা-যন্ত্রণা-বোধ আছে। মরণ নেই বলেই যত খুসী যাতনা দিয়ে যত খুসী কাজ আদায় করা যায়। মনে কর, জলও সেরকমের একটা ভুত। অন্ততঃ পঞ্চ ভুতের এক ভুত তো বটে! কাজ আদায় করবার উদ্দেশ্যে বুদ্ধিমান মানুষ এই জল-ভুতকে ভর্তি

করলো লোহার একটা চোঙের মধ্যে। চোঙটার সব মুখ বন্ধ করে তাকে দিল আগুনে ফেলে। অসহ্য উত্তাপে চোঙের মধ্যে সে বাষ্প হয়ে, পাত্রটাকে ভেঙেচুরে বেরিয়ে যেতে চায়। মানুষ তখন চোঙের গায়ে সরু একটা দরজা খুলে দিল। বিশেষ একটা মতলব করেই সেই দরজার সঙ্গে সে বড় একটা লোহার পিচকিরি জুড়ে রেখেছে। মতলব হলো, বাষ্পরূপী জল-ভূত যদি পিচকিরির ভিতরের ভারী চাকতি খানাকে ঠেলে খানিকটা উপরে নিয়ে যেতে পারে তবে বেরিয়ে যাবার জন্যে সরু একটা রাস্তা খোলা পাবে। অসহ্য উত্তাপে অধীর হয়ে বষ্পরূপী জল-ভূত খোলা দরজা দিয়ে পিচকিরির মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং ভিতরের চাকতি খানাকে উপরে ঠেলে নিয়ে যায়। চাকতি খানা কিছু উপরে উঠলেই পিচকিরির গায়ে একটা ছিদ্র পথ বেরিয়ে পড়ে। সেই ছিদ্র দিয়ে বাষ্পরূপী ভুত বাইরে বেরিয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। তখন মানুষ দেখলো—পিচকিরির চাকৃতি খানাকে একবার উপরে তুললেই তো আর কোন কাজ হবে না। বাষ্পরূপী ভুতকে দিয়েই আবার তাকে নীচের দিকে ঠেলে নিতে হবে। তবেই কাজ পাওয়া সম্ভব। তখন মানুষ কৌশলকরে পিচকিরির উপরের দিকটা এঁটে দিল এবং যে দরজা দিয়ে পিচকিরির মধ্যে বাষ্প ঢোকবার কথা সেখানে দুটো দরজা বসিয়ে দিল। একটা দরজা দিয়ে পিচকিরির নীচের দিকে, আর একটা দরজা দিয়ে পিচকিরির উপরের দিকে ঢুকতে পারে। এই দুটো দরজার জন্যে আছে বিশেষ কায়দায় তৈরী একখানা মাত্র কবাট। পিচকিরির ভিতরের চাকৃতি সংলগ্ন ডাঁটটার সঙ্গে এমন কৌশলেই ওই কবাটখানার সংযোগ করা হয়েছে যে, বাষ্পরূপী ভুতের চাপে পিচকিরির ভিতরের চাকৃতিটা উপরে ওঠামাত্রই নীচের দরজা বন্ধ হয়ে যায় এবং উপরের দিকের দরজা খুলে যায়। কাজেই তখন সে উপরের দরজা দিয়ে ঢুকে পিচকিরির চাকৃতিটাকে আবার নীচের দিকে ঠেলে আনে। চাকৃতিটাকে নীচে অথবা উপরে ঠেলে আনবার পর সে বেরিয়ে যাবার রাস্তা পায়। এভাবে লোহার পিচকিরির ডাঁটটা অনবরতই উপরে, নীচে ওঠানামা করতে থাকে। আচ্ছা, পিচকিরির ডাঁটটা নাহয় ওঠানামা করলো, তাতে চাকা ঘুরবে কেমন করে? খুব সহজ কৌশলেই সে ব্যবস্থা করে নিয়ে মানুষ জল-ভুতের শক্তিতে বড় বড় জাহাজ, রেলের গাড়ী এবং আরও অনেক রকমের কল-কারখানা চালাচ্ছে। দর্জির দোকানে সেলায়ের কল দেখেছ তো? কলটার নীচের দিকে তাকালেই দেখবে—পা-দানের সঙ্গে খাড়াভাবে একটা লোহার 'রড্' দিয়ে উপরের চাকার সংযোগ রক্ষা করা হয়েছে। ঠিক তালমত পায়ের চাপে 'রড্‌টা' ওঠানামা করলেই চাকাটা ঘুরতে থাকে। বাষ্পের চাপে পিচকিরির ডাঁটটা ওঠানামা করে' ঠিক ওই রকম ব্যবস্থাতেই কলকারখানা বা এঞ্জিনের চাকা ঘুরিয়ে থাকে।

যে বুদ্ধিমান মানুষটি জল-ভুতকে এরূপভাবে বন্দী করে' তাকে দিয়ে প্রথম রেলের এঞ্জিন চালাবার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর নাম ছিল—জেম্‌স্ ওয়াট। শোনা যায় গরম

জলের কেট্‌লি থেকে বাষ্প বেরিয়ে যাবার সময় ঢাকনাটার ওঠানামা দেখেই জেম্‌স্‌ ওয়াট ষ্টীম এঞ্জিন তৈরী করবার মনন করেন। কিন্তু এর বহুকাল পূর্বেই মানুষ বাষ্পের শক্তির বিষয় জানতে পেরেছিল। প্রায় দু'হাজার বছর পূর্বে আলেকজেণ্ড্রিয়ার হিরো বাষ্পচালিত ঘূর্ণনশীল একরকম খেলনা যন্ত্র তৈরী করেছিলেন। যন্ত্রটায় জটিলতা কিছু নেই। দুদিকে দুটা খুঁটির গায়ে পিনের উপর ধাতু নির্মিত একটা ফাঁপা বল বসানো। বলটার গায়ে দুদিকে মাথা বাঁকানো দু'টো সরু নল আছে। একটা নলের মুখ কর্ক দিয়ে
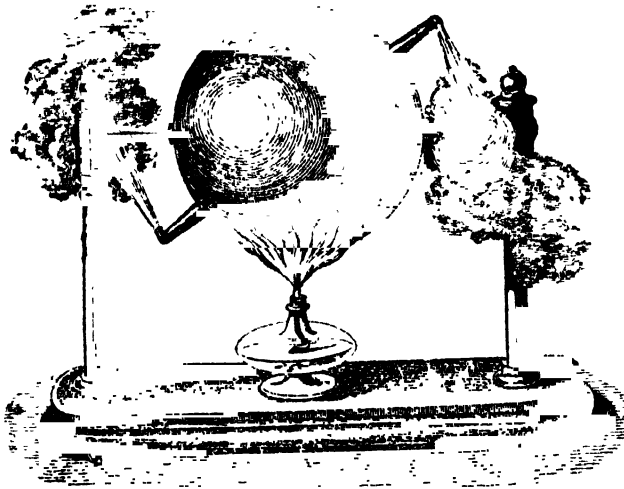
১নং ছবি। বাষ্পের ধাক্কায় ঘূর্ণনশীল ফাঁপা ধাতু-গোলক

বন্ধ করে, বলটাকে বেশ করে আগুনে তাতিয়ে, অপর নলের মুখটা জলে ডুবিয়ে ধরলেই বলের মধ্যে জল ঢুকে যায়। তখন কর্কটা খুলে নিয়ে বলের তলায় আগুনের তাপ দিতে থাকলে ভিতরের জল বাষ্প হয়ে দুটো নল দিয়েই জোরে বেরিয়ে আসতে থাকে। এই বাষ্পের ধাক্কায় বলটা পিনের উপর দ্রুতগতিতে ঘুরতে সুরু করে। ১ নম্বরের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে।

এরপর বহুকাল পর্যন্ত বাষ্প দিয়ে কোন যন্ত্রপাতি চালানোর খবর শোনা যায়নি। আজ থেকে প্রায় দু'শো আটান্ন বছর আগে ডেনিস্‌ পেপিন নামে ফরাসী দেশের একজন পদার্থ-বিজ্ঞানীই বোধহয় সর্বপ্রথম বাষ্প-চালিত একরকম কল উদ্ভাবন করে' কিছু কাজ চালাবার ব্যবস্থা করেন। তারপর খনি থেকে জল ও কয়লা তোলবার জন্যে ১৭০৫ সালে নিউকোমেন ও কলি আরও উন্নতধরণের বাষ্পীয় যন্ত্র তৈরী করতে সমর্থ হন। তার-

পরেই আসরে অবতীর্ণ হন জেম্‌স্‌ ওয়াট। প্রথমে তিনি নিউকোমেন্ন উদ্ভাবিত যন্ত্রেরই উন্নতি সাধনে মন দেন। অনেক বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং গবেষণার ফলে তিনি কাজের উপযোগী রেলের ইঞ্জিন তৈরী করতে সমর্থ হন। এহিসাবে ওয়াটকেই বর্তমান এঞ্জিনের জন্মদাতা বলা যেতে পারে। মোটের উপর এখন আমরা যেসব শক্তিশালী ষ্টীম এঞ্জিন দেখতে পাই তা' একদিনেই, একজনের চেষ্টার ফলে উৎপন্ন হয়নি। এর পিছনে বহুকাল ধরে বহু বিজ্ঞানীর বুদ্ধি ও পরিশ্রম খরচ করতে হয়েছে। এদের মধ্যে জেম্‌স্‌ ওয়াট, উইলিয়াম মারডক, জর্জ ষ্টীফেনসন্‌ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
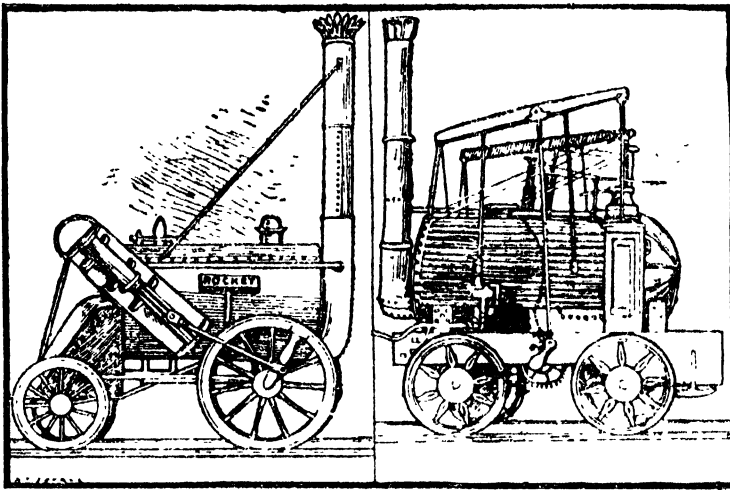
২নং ছবি। ডাইনে—কলিয়ারীর কাজের জন্যে ১৮১৩ সালে উইলিয়াম হেড্‌লি কর্তৃক নির্মিত "পাফিং বিলি" নামক রেলের এঞ্জিনের নমুনা।
বাঁয়ে—১৮২৫ সালে জর্জ ষ্টিফেন্‌সন্‌ কর্তৃক নির্মিত 'রকেট' নামক রেলের এঞ্জিনের নমুনা।

১৮১৩ সালে উইলিয়াম হেড্‌লি, কয়লার খনির কাজের জন্যে 'পাফিং বিলি' নামে এক ধরণের রেলের এঞ্জিন তৈরী করেন। প্রথম যাত্রীবাহী গাড়ী চালানো হয় ইংল্যাণ্ডের ষ্টক্‌টন্‌ এবং ডার্লিংটন্‌ লাইনে, ১৮২৫ সালে। ১৮৩০ সালে লিভারপুল এবং মানচেষ্টার লাইন খোলা হয়। ষ্টীফেন্‌সন্‌ নির্মিত 'রকেট' নামক এঞ্জিন এলাইনে ব্যবহৃত হতো। ২ নম্বরের ছবি দেখ।

জর্জ ষ্টীফেন্‌সন্‌ যে এঞ্জিন তৈরী করেছিলেন তা' থেকেই বর্তমান উন্নত ধরণের এঞ্জিনের উৎপত্তি হয়েছে। রেলের এঞ্জিন বা কলকারখানার এঞ্জিন ভিন্ন ভিন্ন কাজে

ব্যবহৃত হলেও সবরকম এঞ্জিনের চল্‌বার কৌশলই মূলতঃ এক। ৩ নম্বরের ছবি থেকে এঞ্জিন চলবার মূল কৌশলটা মোটামুটি বুঝতে পারবে। ৩ নম্বরে দু'টো ছবি আছে। পূর্বে যে বাষ্পরূপী জল-ভুতের কথায় লোহার পিচকিরি ও তার কবাটের কথা বলেছি
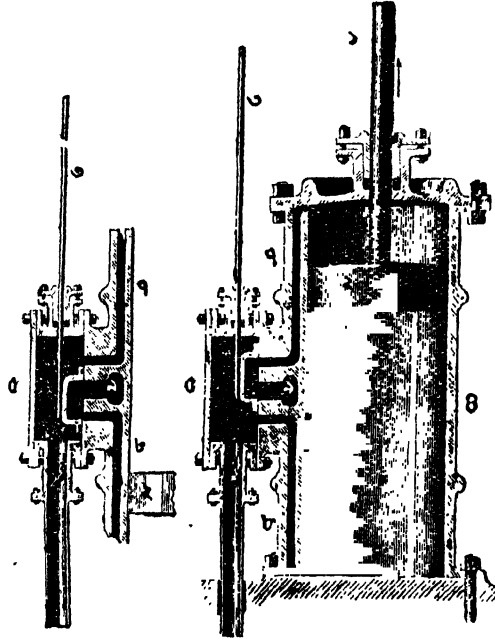
৩নং ছবি। বাষ্পের চাপে এঞ্জিন চলবার কৌশল

ডানদিকের ছবিটাতে তার পুরো নক্সা দেখানো হয়েছে। বাঁ-দিকের ছবিটাতে খালি কবাটের নক্‌সাটাকে আলাদা করে দেখানো হয়েছে। ৪ নং একটা বড় লোহার পিচকিরি। ২ নং, পিচকিরির চাক্‌তি। ১ নং, ওই চাক্‌তি সংযুক্ত পিচকিরির ডাঁট। ৩ নং, পিচকিরির মধ্যে বাষ্প ঢোকবার পথ খোলা ও বন্ধ করবার কবাটের ডাঁট। সেলায়ের কলের চাকাটা, মধ্যস্থলে একটুখানি বাঁকানো একটা দণ্ডের উপর যেভাবে বসানো থাকে ঠিক সেরূপ একটা দণ্ডের সংগে ১ নং ও ৩ নং ডাঁট দুটা সংলগ্ন। কিন্তু সে অংশটা এখানে দেখানো হয়নি। ৫ নং, চৌকা বাক্সের মত একটা কুঠরী, পিচকিরির গায়ে সংলগ্ন। নীচের দিকের কালো মোটা নলটা দিয়ে 'বয়লার' (যেখানে জল গরম করে বাষ্প তৈরী করা হয়) থেকে বাষ্প এসে বাক্সটার মধ্যে ঢোকে; কিন্তু নলটার মধ্যখানে একটা ভাল্‌ভ্‌ বা কৌশলী দরজা এমনভাবে বসানো যে, একবার ঢুকলে আর সেদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। ওই বাক্স থেকে ৪ নং পিচকিরিটার গায়ে, উপর ও নীচের

দিকে ৭নং ও ৮ নম্বরের যে দু'টো কালো লাইন দেখা যাচ্ছে সে দু'টোই হলো পিচকিরির মধ্যে বাষ্প ঢোকবার দু'দিকের দু'টা রাস্তা।

৫ নং বাক্সটার মধ্যে ৩ নং ডাঁটটার প্রান্তভাগে সংলগ্ন ৬ নম্বরে একটা বাঁকানো জিনিষ দেখা যাচ্ছে। ওটাই হলো পিচকিরির মধ্যে বাষ্প ঢোকাবার রাস্তার কবাট। ৯ নম্বরের কালো ছিদ্রটা হলো বাষ্প বেরিয়ে যাবার রাস্তা। এবার একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝবার চেষ্টা কর, কেমন করে' বাষ্পের চাপে এঞ্জিন চলে। বাক্সটার মধ্যে ৬ নম্বরের কবাট এবং ৭, ৮ এবং ৯ নম্বরের দরজাগুলোর ব্যবস্থা যদি বুঝতে পার তবেই দেখবে কত সহজ, সাধারণ একটা কৌশলে ষ্টীম এঞ্জিন চলে থাকে। ডানদিকের ছবিতে যে রকম আছে তাতে ৫ নং বাক্স থেকে বাষ্প নীচের দিকের খোলা দরজা দিয়ে পিচকিরিতে ঢুকে' ২ নং চাকতি খানাকে উপরের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। দরজা ও কবাটখানার ব্যবস্থা এমনই যে, ঠিক ওই সময়ে পিচকিরির ওপরের দিকের বাষ্প বেরিয়ে যাবার জন্যে ৭ নম্বরের রাস্তাটা ৯ নম্বর রাস্তার সংগে মিলে গেছে। ২ নম্বরের চাকতিটা পূরোপূরি উপরে ওঠবার সংগে সংগে কবাটের অবস্থান বদলে গিয়ে ঠিক বাঁ-দিকের চিত্রের মত হবে। বাঁ-দিকের চিত্র লক্ষ্য করে দেখ। এবার
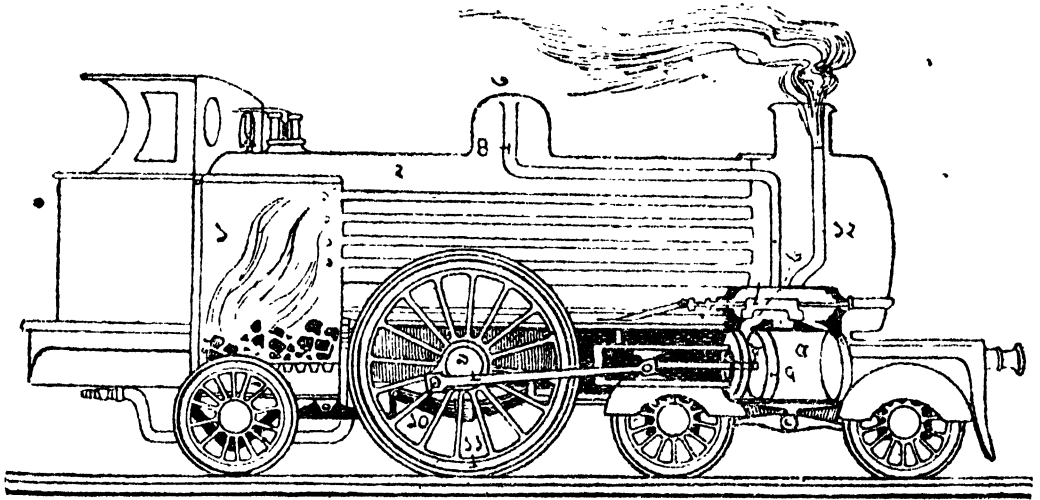
৪ নং ছবি। আধুনিক রেলের এঞ্জিনের ভিতরের ব্যবস্থা।

৬ নম্বরের কবাটখানা নীচের ৮ নম্বরের রাস্তাটাকে ৯ নম্বরের বাইরে যাবার রাস্তার সংগে যোগ করে দিয়েছে এবং সংগে সংগে পিচকিরিটার উপরের দিক দিয়ে বাষ্প ঢোকবার জন্যে ৭ নম্বরের রাস্তাও খুলে দিয়েছে। কৌশলটা এমনই যে, এক দিকের ঢোকবার রাস্তা খুললেই

অপর দিকের ঢোকবার রাস্তা বন্ধ হবে এবং যে দিকের ঢোকবার রাস্তা বন্ধ হবে তার বাইরের রাস্তা খুলে যাবে। আজকালকার রেলের এঞ্জিনের ভিতরে কি কি ব্যবস্থা থাকে এবার সেকথা বুঝিয়ে বলছি। এ থেকেই তোমরা এঞ্জিন চলার মোটামুটি রহস্যটা বুঝতে পারবে। ৪ নম্বরের চিত্রটা ভাল করে দেখ। এতে রেলের এঞ্জিনের ভিতরের ব্যবস্থাটাই দেখানো হয়েছে। এঞ্জিনটার পিছনের দিকে ড্রাইভারের ছোট্ট ঘর, তার পরেই ১ নম্বরে হলো প্রকাণ্ড জ্বলন্ত চুল্লী। ২ নং হলো বিরাট একটা লম্বা চোঙের মত বয়লার। এর মধ্যে জল গরম হয়ে প্রচণ্ড চাপের বাষ্প উৎপন্ন হয়। চুল্লী থেকে ১´ নম্বরের কতকগুলো লম্বা ধাতব নল রয়েছে। এগুলোর মধ্য দিয়ে আগুনের হল্কা, গরম বাতাস পরিচালিত হয়ে জল গরম করবার সুবিধা হয় এবং ১২ নম্বরের রাস্তায় সামনের ফানেল দিয়ে ধোঁয়াও বেরিয়ে যায়। ২ নং বয়লারের উৎপন্ন বাষ্প এঞ্জিনের ঘাড়ের উপর কুঁজের মত ৩ নং স্থানে জমায়েৎ হয়ে জলকণা মুক্ত হয়। বাষ্প সেখান থেকে ৪ নং নল দিয়ে লৌহ-পিচকিরির উপরের বাক্সটার মধ্যে প্রবেশ করে এবং ৬ নম্বরের কবাটখানার অবস্থান অনুযায়ী যে রাস্তা খোলা পায় সেখান দিয়েই ৫ নং পিচকিরির মধ্যে ঢুকে ৭ নং চাক্‌তি খানাকে সামনে অথবা পিছনে ঠেলে নিয়ে যায়। এর ফলেই ৮ নম্বরের রডের সাহায্যে ১১ নং চাকাটা ঘুরে যায়। বাষ্পের চাপে ৭ নম্বরের চাক্‌তিখানা অবিরত এদিক ওদিক করার ফলে এঞ্জিনের চাকাটাও একটানা ঘুরতে থাকে। গ. চ. ভ।

জুলাই মাসের 'ছোটদের পাতায়' প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলোর কোন কোনটা করতে পেরেছে বলে অনেকেই জানিয়েছে। কেউ কেউ এসম্পর্কে নানারকমের কথাও জানতে চেয়েছে। স্থানাভাবে এবার তাদের নাম এবং প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হলো না।

বিবিধ প্রসঙ্গ

আসামে ট্রাক্টরের সাহায্যে কৃষিকার্য :— কিছুকাল আগে খবর পাওয়া গিয়েছিল—নিম্ন আসামে মঙ্গলদৈত্রর অন্তর্গত মোয়ামারি রাজ্যে প্রায় ১৪ হাজার বিঘা জমি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ক্রীত আটটি কলের লাঙ্গল বা ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করা হবে। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত লোকজনকে ওই অঞ্চল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। গভর্ণমেণ্টকে কোন খাজনা না দিয়ে বে-আইনী ভাবে তারা জমি চাষ করছিল। এখন সেখানে সমবায় পদ্ধতিতে কৃষিকার্য চলবে। কাকেও জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হবেনা। ভূমিহীন লোককে এই জমি দেওয়া হবে এবং উৎপন্ন ফসল কোন মধ্যসত্ব ভোগীর সাহায্য ছাড়া গভর্ণমেণ্টের মারফৎ বিক্রয় করা হবে। গভর্ণমেণ্টই চাষীকে বীজ ও সার সরবরাহ করবেন। অধিক ফসল উৎপাদন প্রচেষ্টার অংগ হিসেবে গভর্ণমেণ্ট একাজে হাত দিয়েছেন, ধান ছাড়া কতক জমিতে পাটের ফসলও করা হবে। এই চেষ্টা সাফল্য লাভ করলে, ব্রহ্মপুত্র নদের তীর বরাবর এই রকমের সমবায় পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা করা হবে। এ উদ্দেশ্যে গভর্ণমেণ্ট আরও ট্রাক্টরের ফরমাস দিয়েছেন।

ভারতে কৃষিকার্যে ট্রাক্টর ব্যবহার :— কেন্দ্রীয় কৃষিসচিব শ্রীজয়রাম দাস দৌলতরাম গত ২৮ শে আগষ্ট ভারতীয় পার্লামেণ্টে এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের প্রচেষ্টায় ভারতে মোট এক লক্ষ ২০ হাজার ৭৯৫ একর জমি ট্রাক্টর দিয়ে চাষ করানো হয়েছে। ওই জমিতে প্রায় ৮ হাজার ৬৪২ টন শস্য উৎপন্ন হবে। কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠান যুক্তপ্রদেশে ২৫ হাজার ৮০০ একর এবং মধ্যপ্রদেশে ৮ হাজার একর জমি চাষ করেছেন এবং ওই জমি থেকে ১১ হাজার ২৬৭ টন শস্য পাওয়ার সম্ভাবনা। এছাড়া মৎস্য ইউনিয়নে মুসলমানদের পরিত্যক্ত প্রায় ৫০ হাজার একর জমিও কেন্দ্রীয় ট্রাক্টর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চাষ করা হবে এবং ইতিমধ্যেই সে কাজ সুরু হয়ে গেছে।

ভারতের কৃষিকার্যে ট্রাক্টর ও কৃত্রিম সার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না :— রাশিয়া ও অন্যান্য দেশের অনুকরণে ফলন বাড়াবার উদ্দেশ্যে সমবায় প্রথায় ভারতের জমিতে ট্রাক্টর চালাবার এবং কৃত্রিম রাসায়নিক সার প্রয়োগ করবার জন্যে আজকাল অনেকেই মত প্রকাশ করছেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ভারতের কৃষিকার্যে এ ব্যবস্থা কতটা কার্যকরী হতে পারে সে বিষয়ে অনেকেরই বোধহয় কোন পরিষ্কার ধারণা নেই। ভারতের কৃষি-দপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কৃষি-বিজ্ঞানী হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, নরম মাটিতে কলের লাঙ্গল চালিয়ে কৃত্রিম সার দিলে প্রথমতঃ উর্বরা শক্তির উন্নতি দেখা গেলেও পরে জমির ক্রমশঃ অবনতি ঘটতে থাকে। সাধারণতঃ আমাদের দেশের জমি যে রকমের তাতে ট্রাক্টরের সাহায্যে চাষ করে কৃত্রিম সার প্রয়োগে প্রথম দু'তিন বছর ফলন বাড়ে বটে; কিন্তু তারপরে জমির উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। আবার উতকামণ্ড সম্মেলনে যোগদানকারী সোভিয়েট প্রতিনিধিবৃন্দের একজন কৃষিবিশেষজ্ঞ ভারতীয় কৃষি-বিজ্ঞানীদের উক্ত অভিমতের প্রতিবাদ করে বলেছেন যে, রাশিয়া আজ ২৫ বছর ধরে কলের লাঙ্গল এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপকরণ ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের হার যথেষ্ট বাড়িয়ে তুলেছে। এর ফলে কিন্তু তাদের জমির উর্বরা শক্তি হ্রাস পায়নি; তবে একই জমিতে প্রতিবারে একই ফসলের আবাদ না করে' পালাক্রমে

বিভিন্ন ফসলের আবাদ করতে হয়, নচেৎ জমির উৎপাদিকা শক্তির হানি হতে পারে।

কিছুকাল আগে একটা খবর বেরিয়েছিল যে, এক সাক্ষাৎকার উপলক্ষে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন নাকি ডাঃ অমর নাথ ঝাকে বলেছিলেন যে, কলের লাঙ্গল ও রাসায়নিক সার ব্যবহারে ভারতের জমির ফলন প্রথমতঃ কিছু বৃদ্ধি পেলেও পরে তার উৎপাদিকা শক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এ বিষয়ে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় সম্প্রতি জানিয়েছেন যে, তিনি এধরণের কোন কথাই বলেন নি। তাঁর কথা ভুল বুঝা হয়েছে মাত্র।

যাহোক, এইরূপ বিরুদ্ধ মতামত প্রকৃত তথ্যের অভাবের জন্যও হতে পারে। মাটির ধর্ম সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি এমন এক স্তরে উন্নীত হয়েছে যে, এই বিষয়ে আলোচনা মোটামুটি স্থান কাল নিরপেক্ষ হয়ে করা সম্ভব। অর্থাৎ রাশিয়ার বা অন্যান্য দেশের গবেষণার ফল আমাদের দেশেও মূলতঃ প্রযোজ্য।

উপরোক্ত প্রশ্নের বিচার করতে হলে দুটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে: (১) মাটির উর্বরতার উপর যান্ত্রিক কৃষি পদ্ধতির অথবা কৃত্রিম সারের প্রভাব; এবং (২) প্রভাব সাফল্য সূচক হ'লে আমাদের দেশে ঐ পদ্ধতিতে কৃষি প্রচলন সম্ভব কিনা। প্রথমটি বৈজ্ঞানিক তথ্য সুতরাং গবেষণার ফল সর্বত্র প্রযোজ্য। দ্বিতীয়টি আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার উপরে বহুলাংশে নির্ভর করে। অর্থাৎ প্রথমটির সিদ্ধান্ত যদিও বা যান্ত্রিক কৃষিপ্রণালী বা কৃত্রিম সার প্রয়োগের অনুকূল হয় তবুও দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত দ্বারা তার প্রচলন সীমিত হবে।

রাশিয়া এবং আমেরিকাতেই যান্ত্রিক কৃষি বা কৃত্রিম সারের প্রচলন অধিক। তথায় বহুদিন থেকে এই প্রণালীতে কৃষিকার্য চলছে এবং উত্তরোত্তর প্রচলনও বাড়ছে। সুতরাং যান্ত্রিক কৃষির অনুকূলে ইহা একটি পরোক্ষ প্রমাণ। মাটি পারিপার্শ্বিক অবস্থার তারতম্যের মধ্যেও অধিক মাত্রায় নিজস্ব ধর্ম সংরক্ষণ করতে পারে। মাটির উর্বরতাই তার ধর্মের হ্রাস বৃদ্ধি বা বিকৃতির পরিমাপক রূপে গ্রহণ করা হয়। মাটির উর্বরতা বহুবিধ অন্তঃ-ও বহি প্রভাবের উপর নির্ভর করে। সুতরাং কেবলমাত্র যান্ত্রিক কৃষির প্রভাব জানতে হলে অন্যান্য প্রভাব মুক্ত তুলনামূলক তথ্যের প্রয়োজন। অথবা শেষোক্ত প্রভাবগুলির তীব্রতা সামান্য হিসাবে অগ্রাহ্য করা যেতে পারে এমন কোন পরীক্ষার ফল জানা দরকার। সহজেই অনুমেয় যে মাটির স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি এবং অসমতার দরুণ বহু বৎসরের ক্রমাগত পরীক্ষার ফলই বিবেচনার যোগ্য। এইরূপ পরীক্ষা আমাদের দেশে হয়েছে বলে আমরা জ্ঞাত নহি। উপরন্তু ট্রাক্টর ইত্যাদির প্রয়োগ ও প্রচলন যেরূপ ব্যয়সাধ্য তাতে উক্তরূপ প্রারম্ভিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রয়োজন উপেক্ষনীয় নয়।

এই পরীক্ষার ফল না জেনেও অন্যান্য তথ্যের সাহায্যে যান্ত্রিক কৃষির প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। ক্রমাগত হল চালনা এবং চাপের প্রভাবে মাটির স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু গঠনপ্রণালী (structure) বহুলাংশে ব্যাহত হয়। এই অতি প্রয়োজনীয় ভৌতধর্মের ক্ষতির জন্য মাটির উর্বর ক্ষমতাও হ্রাস প্রাপ্ত হ'তে পারে। যান্ত্রিক কৃষির প্রয়োগে এই ক্ষতির পরিমাণ ও হার স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাবে। এই অপপ্রভাবের প্রতি বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে এবং যান্ত্রিক কৃষি যাতে আরও হালকাভাবে করা যায় তার প্রচেষ্টাও চলছে। পুনরায় স্মরণ রাখতে হবে যে অংশতঃ মাটির স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য এবং কৃত্রিম সার প্রয়োগের জন্য মাটির উর্বরতা অল্প সময়ের মধ্যেই এতখানি হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না যাতে ক'রে যান্ত্রিক কৃষির ফলাফল নির্ভুলরূপে নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

(এ সম্বন্ধে আগামী সংখ্যায় বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।)

জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সবিনয় নিবেদন,

সমাজের বিজ্ঞান-চেতনা গঠন লক্ষ্যে রাখিয়া সমাজের কল্যাণে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রায় ছয়মাস হইল 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' স্থাপিত হইয়াছে। পরিষদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য জনগণের বৈজ্ঞানিক মানস ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করা। এতদুদ্দেশ্যে লোক-বিজ্ঞান গ্রন্থমালা প্রণয়ন করা, লোকপ্রিয় বৈজ্ঞানিক পত্রিকা পরিচালনা করা, লোকরঞ্জনী ছায়া ও আলোক-চিত্র সহকারে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা, স্থায়ী প্রদর্শনী স্থাপনা করা প্রভৃতি বহুবিধ অতীব প্রয়োজনীয় জাতীয় কর্তব্য সমাধান করার পরিকল্পনা পরিষদ গ্রহণ করিয়াছে। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, বাংলার বৈজ্ঞানিক সুধিমণ্ডলীর সাহচর্য ও সাহায্যে পরিষদ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিপুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এযাবৎকাল অর্থাভাবে আমরা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা ব্যতীত অন্য কোন কাজেই হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই।

লোকশিক্ষায় বিশেষতঃ বিজ্ঞান প্রচারে ফিল্ম ও ল্যাণ্টার্ন ছবি সহকারে বক্তৃতার কার্য-কারিতা সর্বজনবিদিত। দেশের এই যুগসন্ধিক্ষণে অনুরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব বিশেষভাবেই অনুভূত হইতেছে। পরিষদ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এই জাতীয় কর্তব্য সত্বর পালন করিতে সমধিক আগ্রহান্বিত হইয়াছে। তজ্জন্য প্রয়োজন মাইক্রোফোন, লাউড-স্পীকার, এপিডায়াস্কোপ ও সবাক-চলচ্চিত্র-প্রদর্শক যন্ত্র। যে সকল শিক্ষামূলক চিত্র পাওয়া যায়, আপাততঃ তাহাই হইবে আমাদের বিষয় বস্তু। কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে আমাদের দেশের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুগুলির সবাক চিত্র তোলা সম্ভব হয় তাহারই বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। সুতরাং প্রারম্ভেই আমাদের আবশ্যক অন্ততপক্ষে ২০,০০০ টাকা। দেশের এই অতি প্রয়োজনীয় ও আশুসম্পাদ্য কর্তব্য পালন করবার দায়িত্ব সমগ্র দেশবাসীর। তাই আমাদের বিনীত অনুরোধ, দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রই যেন যথাসাধ্য চাঁদা পাঠাইয়া আমাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিতে সাহায্য করেন। আমরা আশা করি এক মাসের মধ্যেই এই অর্থ আমাদের নিকট পৌঁছিবে।

স্বাঃ—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

নাম ও ঠিকানাসহ চাঁদা নিম্ন ঠিকানায় ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে—

অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
৯২, আপার সারকুলার রোড। কলিকাতা

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

প্রথম বর্ষ সেপ্টেম্বর—১৯৪৮ নবম সংখ্যা

উপজাতি সমস্যা

শ্রীক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(১)

ভারতবর্ষে উপজাতির সংখ্যা আড়াই কোটী কি আরও কিছু বেশী। এদের অনেক সময়ে আদিম জাতি অথবা আদিবাসী এই দুই আখ্যাও দেওয়া হ'য়ে থাকে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দিক হ'তে প্রথম শব্দটীর ব্যবহারই বেশী সঙ্গত। কারণ উপজাতিরা সকলেই একসময়ে এদেশে আসে নাই বা বাস শুরু করে নাই। উপরন্তু ইংরেজী ট্রাইব্ শব্দে যা বোঝায় 'উপজাতি' শব্দ তার অর্থ ভাল করেই প্রকাশ করে। কোন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে একভাষা ভাষী একই সংস্কৃতি সম্পন্ন বহু সংখ্যক লোক যদি বাস করে এবং শাসনকার্যে বা ঐ জাতীয় উদ্যোগে এক হ'য়ে চলে তবে তাদের একটি ট্রাইব বলা হয়। এই ধরণের একটি সমষ্টি উন্নতকৃষ্টি ও বৃহদাকার হ'লে তাকে নেশন বা জাতি বলা হয়। সুতরাং তার পূর্বরূপকে উপজাতি বলা সমীচীন।

আমাদের বাংলাদেশে উপজাতির সংখ্যা কম হ'লেও নিতান্ত অল্প নয়। পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে প্রায় পনের লক্ষ সাঁওতাল, রাজবংশী প্রভৃতি বাস করে। তবে ভারতরাষ্ট্রের চারটী প্রদেশ উপজাতি প্রধান—আসাম, উৎকল, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশ।

আসাম বিভক্ত হ'বার পূর্বেই এখানে নাগা, খাসী, কুকী, লুসাই প্রভৃতি উপজাতি মিলিয়ে সমগ্র প্রদেশের লোকসংখ্যার একচতুর্থাংশ ছিল। বর্তমানে শ্রীহট্টের কয়েক লক্ষ হিন্দু মুসলমান বাদ যাওয়ার ফলে উপজাতির রাশি অনেক বেশী হ'য়েছে।

উৎকলে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যগুলি যুক্ত হ'বার পূর্বেই একপঞ্চমাংশের অধিক উপজাতির লোক ছিল। দেশীয় রাজ্যগুলিতে উপজাতির ঠিক হিসাব মেলে না। অনেক সময় এদের হিন্দু বলে গণনা করা হ'য়েছে। মোটের উপর একথা বলা যায় যে, এই রাজ্যগুলিতে বেশীর ভাগ লোকই উপজাতির। বৃহত্তর উৎকলের সম্ভবতঃ একতৃতীয়াংশেরও উপর লোক এই দলে পড়ে।

ছোটনাগপুর বিহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও প্রকৃতপক্ষে এটী একটি আলাদা প্রদেশের সামিল। এখানে প্রায় অর্ধেক লোকই উপজাতিসম্ভূত। মধ্যপ্রদেশেও এক ষষ্ঠাংশ লোক এই শ্রেণীর। আমাদের রাজনীতিনবীশগণ ভারতরাষ্ট্রে সংখ্যালঘু

মুসলমানদের অধিকার ও কৃষ্টিরক্ষা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেছেন ও করে চলেছেন। কিন্তু উপজাতিদের সমস্যা এর চেয়ে কিছু কম নয়। এ বিষয়ে বরং উন্নত সম্প্রদায়ের দায়ীত্ব অনেক বেশী। কিন্তু উপজাতি সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে ও তারচেয়েও বেশী এদের সংস্কৃতির প্রতি ঔদাসীন্যের দরুণ এদের বিশেষ সমস্যার সমাধানের জন্য খুব কমই চেষ্টা হ'য়েছে।

ইংরেজরা এদেশে যখন তাদের শাসনভার চাপিয়ে বসলেন তখন তারা উপজাতিদের সরলতা প্রভৃতির উল্লেখ করে তাঁদের নিজেদের বিরোধী হিন্দু ও মুসলমানদের তুলনায় "এরা কত ভাল" এই সব কথা বলে এদের প্রতি যথেষ্ট মৌখিক দরদ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু শাসনকার্যে এদের মঙ্গলের জন্য খুব যে সুব্যবস্থা করেছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের দেশীয় কর্মচারীরা বা ক্ষমতাপন্ন মন্ত্রীরাও সাধারণতঃ এদের প্রকৃত কুশল কোথায় তা' বোঝবার খুব কম চেষ্টাই করেছেন।

এই সকল উপজাতির প্রকৃত মঙ্গল সাধন করতে হ'লে প্রথমতঃ এদের আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতি এবং সাংস্কৃতিক মূলধারা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। তার সঙ্গে আবশ্যক এদের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন সম্বন্ধে ঝরঝরে ধারণা। কারন এই দ্বিতীয়টীর উপর আমাদের কর্তব্য কর্ম নির্ভর করে।

একদল লোক মনে করেন যে, উপজাতিরা হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরের জাতির সামিল এবং এদের কৃষ্টির বৈশিষ্ট্য রক্ষার কোনও আবশ্যক নাই। অধ্যাপক ঘুরিয়ে তাঁর "তথাকথিত আদিম জাতিরা" নামক পুস্তকে লিখেছেন যে, এইসব জাতির ভাষার কোনও মূল্য নাই; এগুলি লোপ পাওয়াই ভাল। প্রাথমিক শিক্ষাও তাঁর মতে পারিপার্শ্বিক উন্নত জাতির ভাষায় দেওয়া উচিত। হিন্দুসমাজে এদের গ্রাস করে নেওয়াই তিনি কর্তব্য মনে করেন।

এই ধরণের মনোভাব "সাম্রাজ্যবাদী" বলা যেতে পারে। 'স্বাধীন ভারতে কোনও উপজাতিকে এভাবে তাদের কৃষ্টি হ'তে উপড়ে নিয়ে গ্রাস করা সম্পূর্ণ অন্যায় হ'বে এবং গণতন্ত্রবাদী কেহই এই মতের সমর্থন করবেন না। উপজাতিদের মধ্যে যাঁরা বাস করে বা কাজ করে তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে, উপজাতিদের কাছ হতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং গণতান্ত্রিক অধিকার সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষার বস্তু আছে। তাদের সংস্কৃতি হ'তে এইসকল মূল্যবান অংশগুলি লোপ পেতে দেওয়া যথেষ্ট ক্ষতিকর হবে।

অপর একদল লোক আছেন যাঁরা মনে করেন যে, 'আদিম জাতিদের সংস্কৃতির সবই ভাল। যেহেতু আমাদের সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ী ও মহাজন প্রভৃতিরা উপজাতিদের আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে যথেষ্ট ফাঁকি দিয়ে থাকে এবং দুর্নীতির প্রসারে সাহায্য করে, সেজন্য এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা বলেন যে, উপজাতিদের সম্পূর্ণ আলাদা বাসস্থান নির্দেশ করে দেওয়া উচিত এবং সেখানে আর অন্য কেহ থাকতে পারবে না। এদের মঙ্গলের জন্য শিক্ষা বিস্তারও তাঁরা পছন্দ করেন না। শ্রীযুক্ত ভেরিয়ের এলুইন তাঁর বৈগা এবং অন্য একটি পুস্তকে স্পষ্টই লিখেছেন যে, এইসব গোঁদ প্রভৃতি জাতির জন্য আলাদা এলাকা ছেড়ে দেওয়া উচিত এবং সেখানে তারা তাদের আদিম প্রথায় খাদ্য উৎপন্ন করবে। এদের শিক্ষা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে, এখনকার মানুষ বড় খারাপ। হয়তো পঞ্চাশ বৎসর পরে কি আরও বিলম্বে এমন মানুষ জন্মাবে যারা আমাদের চেয়ে অনেক ভাল।

তারা এইসব উন্নয়নের কাজ হয়তো ঠিকমত করতে পারবে। ততদিন এদের আলাদা জমিতে ও জঙ্গলে আদিমভাবে বাস করতে দেওয়া কর্তব্য।

এলুইন সাহেব গোঁদদের খুবই ভালবাসেন; তাদের জন্য হাসপাতাল করে তিনি এদের রুগ্নদের সেবা করেছেন। গোঁদজাতি তাঁর পরম আত্মীয়।

কিন্তু স্নেহে অন্ধ কোন কোনও মা যেমন সন্তানকে বড় হওয়ার মর্যাদা না দিয়ে চিরকালই তাঁর আঁচল চাপা রাখতে চান ও ফলে সন্তানের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেন, অত্যধিক স্নেহপ্রীতির ফলে এলুইন সাহেব যে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বলেছেন তাতেও ঠিক তাই ঘটবে। পরিবর্তনশীল জগতে জোর করে উপজাতিদের অপরিবর্তিত রাখা চলে না। এ বিষয়ে সব চেয়ে বড় কথা হ'ল আর্থিক ব্যবস্থা। আদিম পদ্ধতিতে খাদ্য উৎপন্ন করলে যে পরিমাণ জমি একটি পরিবারের সংস্থানের জন্য আবশ্যক হয়, আমাদের সাধারণ কৃষকদের হাতে সেই পরিমাণ জমিতে অনেক বেশী ফসল হয়। আবার আধুনিক উপায় অবলম্বন করলে এর মাত্রাও দুই তিনগুণ বৃদ্ধি পেতে পারে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কোথাও এত জমি নাই যে অপর্যাপ্ত বনভূমি ও কর্ষণোপযোগী ক্ষেত উপজাতিদের জন্য আলাদা করে রেখে দেওয়া যেতে পারে। এই পরিস্থিতিতে এদের আদিম অবস্থায় ফেলে রাখা মানে ধীরে ধীরে মেরে ফেলা।

উপজাতিদের সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য:— ১। এদের শিক্ষার প্রসার সম্পাদন ২। আদিম খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতি ও শিল্পযন্ত্র যেখানে সহজে পরিবর্তন করা চলে তার উন্নয়ন; ৩। মহাজন ও ব্যবসায়ীদের লোলুপতা হ'তে এদের রক্ষা এবং ৪। এরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য ঠিক রেখে বর্তমান যুগের সংস্কৃতিতে যাতে দ্রুত পৌঁছাতে পারে তার অন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা।

(২)

উপজাতিদের আর্থিক অবস্থা বা সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ না করে, এদের শাসন ব্যবস্থা করতে গেলে কি কুফল ফলে, তার কয়েকটী উদাহরণ নীচে দেব। এগুলি দেওয়ার সার্থকতা এখনও যথেষ্ট আছে এই জন্য যে, বিভিন্ন প্রদেশে আমাদের বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর খুব কম লোকই এ কথা বোঝেন, বা এ বিষয়ে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অগ্রসর হয়েছেন।

আমি প্রথমে মধ্যপ্রদেশের কোরকু উপজাতির উদাহরণ দেব। এরা সাঁওতালদের মত একটী অনার্য ও অদ্রাবিড় ভাষা বলে; এদের আবাস বিদর্ভপ্রদেশের মেলঘাট পাহাড়ের বনভূমিতে। ১৮৫৫ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চল নিজামের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারপর এই দেশ ব্রিটিশ ভারতের মধ্যে চলে আসে। কোরকুরা এতকাল "বেন্দার" অর্থাৎ অর্ধ যাযাবর পদ্ধতিতে বাজরা, মড়ুয়া প্রভৃতি শস্য চাষ করত। জঙ্গলের একটী অংশের গাছ কেটে এরা বড় গুঁড়ি সরিয়ে ডালপালা সব শুকিয়ে নিত ও তারপর আগুন লাগিয়ে দিত। আগুন নিবলে ছাইটা জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে, প্রথম বৃষ্টির সঙ্গে এরা বীজ পুঁতে দিত। বৎসর তিন চাষ করার পর আবার নূতন জঙ্গল কেটে নূতন ক্ষেতের পত্তন হ'ত। এই রকম বার তিনেক করে আবার প্রথম ক্ষেতটীতে এরা ফিরে আসত। এই ধরণের চাষ সাঁওতালরাও আগে করত; তারা একে বলে "ডাহি"। আসামে এর নাম "ঝুম" চাষ।

বেন্দার চাষ ছাড়া আর একটি উপায়ে কোরকুরা জীবিকা চালাত। মেলঘাট জঙ্গলে ভাল কাঠ পাওয়া যায়। কোরকুরা এই সব গাছ কেটে সমতল ভূমির হিন্দু ও মুসলমানদের কাছে বিক্রয় করত ও কাপড়, মশলা প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য তার পরিবর্তে নিয়ে যেত। উদ্বৃত্ত টাকাও থাকত অনেকের। খাদ্যের দিক হতে চাষের ফসলে যেমন রুটি মিলত, তেমনই শিকারে লব্ধ পশু হ'তে যথেষ্ট মাংসও পাওয়া যেত। মেয়েরা বনভূমিতে নানা শাক সংগ্রহ করে সিদ্ধ করে তরকারীর স্থান পূরণ করত।

১৮৫৫ সালের পূর্বে নিজামের শাসন এই সকল গভীর অরণ্য ও পার্বত্য প্রদেশে একরূপ পৌঁছাত না বললেই চলে। ব্রিটিশ আমলে তার পরিবর্তন ঘটল। ইংরেজ কর্মচারী ও ব্যবসায়ীরা মেলঘাট অঞ্চলের ভাল কাঠের কথা আগেই শুনেছিলেন। তাঁরা তদন্ত করে জানলেন যে, এই জঙ্গলে ভাল সেগুণ জন্মায়। এই মূল্যবান গাছ পুড়িয়ে ছাই করে মড়ুয়া চাষ করা তাদের বরদাস্ত হ'ল না। আইন

হ'ল বেন্দার চলবে না। এ নিয়ম খুবই ভাল, তাতে দেশের সম্পদ অপচয় বন্ধ হয়। কিন্তু বেন্দারের বদলে কোরকুরা কিভাবে চাষ করবে তার কোনও ব্যবস্থা হ'ল না। বেন্দার চাষ হ'তে কোরকুদের বৎসরের অন্ততঃ আট মাসের খোরাকী জুটত বলে শোনা যায়। হিসাবেও প্রায় তাই দাঁড়ায়, ঠিকমত ফসল হ'লে। সেটা বন্ধ হয়ে গেল। তারপর কথা উঠল, গাছ কাটাব। কোরকুরা ইচ্ছামত গাছ কেটে বেচে দেবে, এতে সরকারী বনবিভাগের লোকসান। সুতরাং নিয়ম হ'ল বিনা লাইসেন্সে গাছ কাটা হ'বে না। আদিম কোরকু মানব "লাইসেন্স" শব্দ কখনও শোনে নাই। সেটা কি জিনিষ না বোঝার ফলে গাছ কাটা ও কাঠ বিক্রয়ে যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি হ'ল। তারপর শিকার; এর জন্যও লাইসেন্স দরকার। নিয়ম সবই ভাল। কিন্তু তার চাপে হঠাৎ হাজার পনের কোরকু খাদ্য সংস্থানের সমস্ত উপায় হারিয়ে মরতে বসল। মেলঘাট জঙ্গলে প্রচুর বড় বাঘের বাস। তাদের সঙ্গে কুঠার হাতে লড়াই করে কোরকুদের বাস করতে হয়। তারা এত সহজে মরতে রাজী হ'ল না। সরকারী নিয়ম ভেঙ্গে তারা বেঁচে থাকতে চাইল। ফলে কিছু কোরকু ও সরকারী লোক হতাহত হল। তারপর অবশ্য জমি চাষ, কাঠ কাটা ও শিকারের আইন অনেকটা বদলাল। তবে এই মধ্যাবস্থাতে "গোলমালে" অর্থাৎ অনাহারে, অর্দ্ধাহারে ও তারই পরিণামে রোগে কয়েক হাজার কোরকু মরে গেল। সরকারী দপ্তরের বিবৃতিতে লেখা আছে যে, কিছু কিছু জনপদ এই সবের ফলে জনশূন্য হ'য়ে যায়।

নূতন ব্যবস্থায় ঠিক হ'ল, কোরকুরা স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট এলাকায় জমি চাষ করবে এবং সরকারী মজুরী নিয়ে গাছ কাটবে ও বিক্রয় করবে। শিকারের বাধাও কিছু কমল। এই সকল নিষেধের ফলে কোরকুদের অবস্থা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক খারাপ হ'য়ে গেল। ১৯৩০ সাল আন্দাজ, সরকারী তরফ হ'তে আরও কতকগুলি বিধিনিষেধ সৃষ্টি হ'ল। সরকারী কর্ম্মচারীরা দেখলেন যে, মেলঘাটের সেগুণ ও অন্যান্য কাঠ হতে যতটা আয় হতে পারে তা' মোটেই হ'চ্ছেনা। লাইসেন্স বা কাঠ কাটার জন্য খাজনা অনেক কম মেলে। তাঁরা ঠিক করলেন, সরকারী কাঠ কাটাই ও চেরাই এর কারখানা খুলবেন। কিন্তু কাঠ কাটবে কে? হুকুম হ'ল কোরকুদের, তোমরা তোমাদের গ্রামের কাছের কারখানায় কাজ করবে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে যারা সরকারী তরফ হ'তে ছাড় পেল, বাকী সকলকেই (মেয়েরা বা শিশুরা অবশ্য নয়) কাঠ কাটাই ও চেরাই এর সরকারী কারখানার মজুর হিসাবে কাজ করতে হ'বে। কোরকুরা আপত্তি প্রকাশ করলে; তারা কারখানার কাছের গ্রাম ছেড়ে দূরে উঠে যেতে লাগল। নিয়ম হয়ে গেল বিনা অনুমতিতে কোনও পরিবার এক গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে বাস করতে পারবে না। সব গ্রামের চাষের জমী সরকারী খাসে; শুধু পরিবার পিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ বিলি হয়। সুতরাং গ্রাম ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব হ'ল। লোকে আবার ফিরে গেল। কোরকুরা বলে যে, বনবিভাগের জন্য কাজ করে আর তাদের চাষের ঠিক সময় থাকে না। সরকারী কর্ম্মচারীরা বলেন, না এ কথা ভুল। তাঁরা আমাকে জোরের সঙ্গে বললেন "আমরা বুঝে সুঝে কাজ করাই।" বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তদন্ত করে কিন্তু দেখা গেল, কোরকুদের নালিশ অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গত।

যুদ্ধের মধ্যে ঠিক কি অবস্থা হ'য়েছে জানা নাই; কিন্তু ১৯৩৮—৩৯ সালে কোরকুদের বেশীর ভাগ পরিবার ঋণগ্রস্ত ছিল এবং বৎসরের মধ্যে দুই তিন মাস অর্দ্ধাশনে কাটাত। অন্য সময়েও উপযুক্ত পরিমাণ ছানা জাতীয় উপাদান তাদের খাদ্যে থাকে না। অথচ এই উপজাতিকেই যদি যৌথভাবে চাষে উৎসাহ দেওয়া যায় ও কাঠের কারবারও যৌথভাবে করতে শেখান হয় এবং উন্নত যন্ত্র ব্যবহার শিক্ষা দেওয়া হয়, তা হ'লে এদের অনেক

সমস্যার সমাধান হবে। এই সকল যৌথকাজ যে উপজাতিদের এককালে মজ্জাগত ছিল সেটা বোধ হয় সরকারী কর্মচারীদের খেয়াল নাই। ১৯৩৬—৩৭ সালের বনবিভাগের এক রিপোর্টে বরং দেখা যায় যে, তাঁরা কোরকুদের অর্ধাহার-প্রসূত বিরক্তি প্রকাশে অসন্তুষ্ট হয়ে আলোচনা করছেন যে, এরা যখন কাজে এতই নারাজ তখন অন্য এলাকা হ'তে লোক আনা ভাল এবং মাল চালানের জন্য এদের গরুর গাড়ী বাতিল করে ব্যবসায়ীদের মোটর ট্রাক্ ব্যবহার করা যাক। বলা বাহুল্য এ ব্যবস্থা চালু করলে কোরকুরা আবার পূর্ণ অনশনের দরজায় পৌঁছাবে।

(৩)

উপজাতিদের সামাজিক ও আর্থিক কাঠামো সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকার ফলে শুধু যে এদের অন্ন নিয়ে টানাটানি পড়ে তা' নয়। অনেক সময় সরকারী কর্মচারীরা অজ্ঞতাবশতঃ উদোরপিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চড়িয়ে দেন। এ বিষয়ে আমি বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্ত হ'তে দুটী উদাহরণ দেব।

পূর্ববঙ্গের ও আসামের সীমান্ত প্রদেশের একটি পার্বত্য এলাকায় গারো জাতি বাস করে। পাহাড়গুলি এদেরই নামে গারো পাহাড় বলে পরিচিত। এরা মঙ্গোল মিশ্র জাতি; ভাষার দিক হতে চীন ও তিব্বতের জ্ঞাতি। সমাজ ব্যবস্থায় এরা মাতৃসম্বন্ধকে বড় স্থান দেয়।

এদের দেশের মেয়েরা জমি ও বাড়ীর মালিক; পুরুষরা শুধু উপস্বত্বভোগী। তবে তদ্বির তদারক, ব্যবস্থা, বেশীর ভাগ পুরুষের হাতে। বিবাহের পর পুরুষ তার গৃহিনীর বাড়ীতে ঘর করতে যায়। মায়ের বসত বাড়ী কিন্তু পায় একজন মাত্র মেয়ে যাকে উত্তরাধিকারিণী বলে সমাজে জানানো হয়। অন্য মেয়েদের বিবাহের পর তাদের স্বামী ঐখানে শাশুড়ীর জমিতে ঘর দুয়ার নির্মাণ করে বাস করে। সে গৃহ সম্পত্তি হয় গৃহিনীর। প্রতিবেশী খাসী জাতিরও এই ধরণের ব্যবস্থা।

সমাজব্যবস্থায় অধিকার ও দাবী একই যোগসূত্রে যুক্ত হ'য়ে থাকে। গারো পুরুষ জন্মায় ও মানুষ হয় মায়ের ঘরে, মায়ের সম্পত্তিতে; বিবাহের পর ঝুমচাষ করে পত্নীর গ্রামে, তার জমিতে। তাই গারো পুরুষ কুমার অবস্থায় মারা গেলে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্শায় মাতা ও তদভাবে ভগিনীতে। বিবাহের পর-উত্তরাধিকারিণী হ'ন পত্নী, ও তদভাবে কন্যা। ভ্রাতা কিম্বা পুত্রের এ অধিকার নাই।

কিন্তু এ সব কথা আমাদের পিতৃ প্রভাব সম্পন্ন হিন্দু সমাজের লোক বিশেষ খবর রাখে না। তা' ছাড়া মেয়েদের সম্পত্তি বল্‌তে আমরা যে সীমাবদ্ধ স্বত্ব বুঝি, তার ফলে হিন্দু ভূস্বামীরা নারীর নামে জমি বিলি করা সম্বন্ধে গররাজী হ'য়ে থাকেন। গারো পাহাড়ের কিয়দংশ সুসংরাজ জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত; এটি আসামের বাহিরে, ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে পড়ে। এখানে জমি বিলি সম্পর্কে জমিদাররা গারো মেয়েদের নামে দাখিলা দিতে বিশেষ নারাজ। তাঁরা এই মাতৃ-প্রভাব বদল হ'য়ে পিতৃ-প্রভাব নিয়ম বিস্তারিত হ'লে খুশী হ'ন।

খৃষ্টধর্মের প্রচারকগণও জমিদারদের সঙ্গে একমত। কারণ অবশ্য ভিন্ন। মেয়েরা পুরুষের চেয়ে বেশী স্থিতিশীল; তাদের ধর্মান্তর গ্রহণ করানো শক্ত। পুরুষকে নানা চটকে মুগ্ধ করে ফেলা যায় ও খ্রীষ্টান করা চলে। কিন্তু গারো পাহাড়ে কোনও পুরুষ এইভাবে পরিবারের মতামত অগ্রাহ্য করলে তাকে তার জীবিকা সম্বন্ধে ভাবতে হয়। সম্পত্তি তার নয়; অধিকার তার মায়ের বা গৃহিনীর।

এই অবস্থায় হঠাৎ যদি আদালত হ'তে বা সরকারী তরফ হ'তে মাতৃঅধিকার বিনষ্ট করে পিতৃ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয় তা হ'লে এদের সমাজে একটি জবরদস্তি বিপ্লব আনা হ'বে। বিলাতী মিশনারী সাহেবরা এই পরিবর্তনই আনতে চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদেরই জাতের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর সাহায্যে।

হিন্দু জমিদারগণ পূর্বে উল্লিখিত কারণে তাতে কোনও আপত্তি করেন নাই। কিন্তু গারো মেয়েরা এত সহজে তাদের সনাতন অধিকার ছাড়তে রাজী হয় নাই। তারা দলবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানায়। আমাদের নৃতত্ত্ব বিভাগ হ'তে তাদের দাবীর কতখানি ন্যায্য ও কোথায় পরিবর্তন আবশ্যক সেটা তথ্যানুসন্ধান করে জানানো হ'য়েছিল। ফলে অনিষ্টকর পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

এই সময়ে গারো জাতির জন্য একজন বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি বা বিচার বিভাগের ঐ অঞ্চলের অন্য কর্মচারীরা এ সব ব্যাপারে কোনও রূপ সাহায্য করতে পারেন নাই। তার প্রধান কারণ জ্ঞানের অভাব। এই অজ্ঞতা এত বেশী যে, একবার এই অঞ্চলে একজন সাবজজের আদালতে গারোজাতির একটি সম্পত্তি বিষয়ক মকদ্দমাতে ধর্মাধিকরণ মহাশয় লেখেন যে, ছেলে বর্তমানে মেয়ে সম্পত্তি পাবে, এ দাবী অশ্রুতপূর্ব। তিনি মেয়েকে বাদ দিয়ে ছেলেকেই সম্পত্তি দান করেন!

সাঁওতালরা এক হিসাবে গারো জাতির ঠিক উল্টা। এদের মধ্যে পুরুষরাই সম্পত্তির অধিকারী; কন্যা বর্তমানেও সম্পত্তি পায় ভাইপো, যদি না মেয়ের বাপ এ বিষয়ে একটা বিশেষ বন্দোবস্ত করে পঞ্চায়েৎকে বলে গিয়ে থাকে মারা যাবার আগে। তা' হ'লে মেয়ে বিষয়ের অংশ পায়। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রেরা পুরাপুরি বঞ্চিত হয় না। এদের মধ্যে একমাত্র দৌহিত্রও শ্রাদ্ধাধিকারী হয় না; শ্রাদ্ধ করে জ্ঞাতি পুত্রেরা।

এ বিষয়ে ময়ূরভঞ্জে তদন্ত করে জানা গেল, আদালতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে বিচার হ'লে নিষ্পত্তি হয় মিতাক্ষরা আইনে; আর বাংলাদেশে ঝাড়গ্রামে রায় দেন বিচারপতিরা দায়ভাগ মতে। সাঁওতালদের যে নিজস্ব একটা রীতি আছে এ বিষয়ে উভয়েরই সমান অজ্ঞতা।

বিবাহের নিয়ম সম্বন্ধেও এইরূপ জ্ঞানের অভাবের ফলে একবার এক বিচারপতি সাঁওতাল স্বামী ও স্ত্রীর বিবাহবিচ্ছেদের পূর্বেই তাদের খেসারতের ব্যবস্থা করে দেন। অথচ শেষ পর্যন্ত বিবাহবিচ্ছেদ উপজাতি নিয়মে একেবারেই ঘটল না। আর একবার, নিজ গৃহে প্রবেশের অপরাধে "ট্রেসপাস" দায়ে স্বামীকে দণ্ড দেওয়া হয়। বিচারকের ধারণা ছিল বাড়ীটা কর্ত্রীর; তিনি খেয়াল করেন নাই যে, সাঁওতাল স্ত্রীলোক এ অধিকার পায় না। বলা বাহুল্য এই ধরণের বিচারের ফলে উপজাতিরা মোটেই আমাদের উপর প্রীত হ'য়ে উঠে না।

বায়ু-মণ্ডল ও জলবায়ু

শ্রীহৃষীকেশ রায়

সসীম জ্ঞানের অধিকারী মানব বিশ্বস্রষ্টার অসীম সৃষ্টি রহস্য ভেদ করিতে সর্বদাই সচেষ্ট। বহুবর্ষব্যাপী বহু সাধনার ফলে সে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামান্য তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিলেও তাহা এত সামান্য ও নগণ্য, যে সেই জ্ঞানকে চরম লাভ বলিয়া মনে করা যায় না। সেজন্য অনন্তকাল ব্যাপিয়া মানুষের জ্ঞান আহরণের চেষ্টা অক্লান্তভাবে চলিয়াছে। এই বিপুলা পৃথ্বীর অধিবাসী হইয়াও মানুষ তাহার সম্যক পরিচয় লাভে সমর্থ হয় নাই। তাহার অদৃশ্য বহিরাবরণ, বহু বৈচিত্র্যের অনন্ত আধার বায়ুস্তর এখনও বহুলাংশে আমাদের নিকট রহস্যাবৃতই রহিয়াছে।

অ্যারিষ্টটল, * হ্যালী † প্রমুখ বহু বৈজ্ঞানিকের দুই হাজার বৎসরের চেষ্টায় আমরা বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অবগত হইয়াছি। বায়ুমণ্ডল বলিতে আমরা কি বুঝি? এই পৃথিবীর বহিরাবরণ ঊর্ধ্বে প্রায় ৩০০ মাইল ব্যাপী যে বায়বীয় স্তর বিরাজিত তাহাই বায়ুমণ্ডল। উল্কাপিণ্ডগুলি পৃথিবীর দিকে আসিবার সময় যতক্ষণ বায়ুমণ্ডলের বাহিরে থাকে ততক্ষণ তাহাদিগকে দেখা যায় না। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিবার পর উল্কার প্রবল গতিপথে তাহার সম্মুখস্থ বায়ুর অতিরিক্ত চাপে তাহারা জ্বলন্ত পিণ্ডরূপে প্রতিভাত হইয়া প্রায় ২০০ মাইল দূর হইতেও দেখা যায়। মহাকর্ষশক্তির প্রভাবে এই বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর সহিত আবরণের ন্যায় লাগিয়া আছে এবং পৃথিবীর আবর্তন গতির জন্য এই বায়ুস্তরও পৃথিবীর সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে আবর্তিত হইতেছে।

আরিষ্টটলের সময় হইতে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বায়ুর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের পরিধির বিশেষ বিস্তার লক্ষিত হয় না। ইতালীয় বৈজ্ঞানিক টরিসেলী * ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে বায়ুচাপমান যন্ত্র আবিষ্কার করিলে বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে আমরা অনেক নূতন তথ্য জানিতে সমর্থ হই। এই যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যে সমুদ্রপৃষ্ঠে এক বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানে বায়ুর চাপ প্রায় সাড়ে সাত সের। ইহাই

---

* **আরিষ্টটল**—গ্রীসের প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত; ৩৮৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আঠার বৎসর বয়সে এথেন্সে যান এবং পরে প্লেটোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ৩৪৭ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে প্লেটোর মৃত্যু হইলে তিনি এথেন্স ত্যাগ করিয়া যান; পরে মাসিডন ভূপতি ফিলিপের আহ্বানে তাঁহার পুত্র আলেকজাণ্ডারের শিক্ষকরূপে ৩৩৪ খৃষ্টপূর্বাব্দে তথায় ফিরিয়া যান এবং ৬২ বৎসর বয়সে অজীর্ণ রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

† **হ্যালী**—বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত; এডমণ্ড হ্যালী ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর লণ্ডনের হ্যাগার্টনে জন্মগ্রহণ করেন। অক্সফোর্ডের কুইন্স কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন এবং রয়াল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন। তিনি একটি ধূমকেতু আবিষ্কার করিয়া প্রসিদ্ধ হন এবং সেই ধূমকেতুটি তাঁহারই নাম অনুসারে "হ্যালীর ধূমকেতু" নামে পরিচিত। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আয়নবায়ু ও মৌসুমীবায়ু বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেন। হ্যালী চুম্বকের ধর্ম সম্বন্ধেও অনেক গবেষণা করিয়াছেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে ডুবুরীদের জন্য ডাইভিং বেল আবিষ্কার করেন ও রাজকীয় জ্যোতিষীর সম্মানিত পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী তিনি গ্রীনউইচে মারা যান।

* **টরিসেলি**—(১৬০৮-১৬৪৭) ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে রোমে আসিয়া অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বায়ুচাপ বিষয়ে গবেষণা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। দূরবীক্ষণ ও অনুবীক্ষণ যন্ত্রের অনেক উন্নতি বিধান করেন। ইনি বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওর বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। ইহার মৃত্যুর পর ব্লেইসি প্যাসক্যাল (১৬২৩-১৬৬২) ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে বায়ুচাপ সম্বন্ধীয় পরীক্ষা করেন।

বায়ুর ওজন। অবশ্য বায়ুর উষ্ণতা, বায়ুস্তরের উচ্চতা, বায়ুতে জলীয় বাষ্পের তারতম্য অনুসারে বায়ুমণ্ডলের এই চাপেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। ইহার ফলে বায়ুচাপমান যন্ত্রের পারদস্তম্ভের উচ্চতারও হ্রাস-বৃদ্ধি হয় এবং ইহা লক্ষ্য করিয়া ঝড়, বৃষ্টি ঘূর্ণাবাত প্রভৃতির পূর্বাভাষ দেওয়া যায়।

বায়ুর প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। ইহারা আয়তনে যথাক্রমে শতকরা প্রায় ৭৮'০৩ ও ২০'৯৯ অংশ অধিকার করে। ইহা ব্যতীত বায়ু কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং চাপ ও তাপের তারতম্য অনুসারে জলীয় বাষ্প কমবেশী সামান্য অংশ, অবশিষ্টাংশ উইলিয়াম রামজে আবিষ্কৃত হিলিয়াম, আর্গণ, ক্রিপটন, নিয়ন প্রভৃতি কয়েকটি বিরল বায়বীয় পদার্থে পূর্ণ। উর্ধে ২০,০০০ ফিট পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের উপাদানের এই হার প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বায়ুমণ্ডলের সাত আট মাইল উর্ধে জলীয় বাষ্প, বার মাইল উর্ধে কার্বন ডাইঅক্সাইড, প্রায় সত্তর মাইল উর্ধে অক্সিজেন ও আশী মাইল উর্ধে নাইট্রোজেন পাওয়া যায় না। ইহার উপরে বায়ুমণ্ডল বলিতে কেবল হাইড্রোজেন বুঝায়। বায়ুমণ্ডলের ৩½ মাইলের মধ্যে অর্ধেক, এবং সাত মাইলের মধ্যে ইহার সমগ্র চাপের তিন চতুর্থাংশ বর্তমান।

বায়ুমণ্ডলে বায়ু স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে যেমন সজ্জিত থাকে পৃথিবীপৃষ্ঠে পাললিক শিলাস্তর। যত উর্ধে যাওয়া যায়, ততই যেমন বায়ুর বিভিন্ন উপাদানের অভাব হয়, তেমনি নানা নৈসর্গিক দৃশ্যও দেখা যায়। ভূ-পৃষ্ঠ হইতে উর্ধে ১০,০০০ ফিটের মধ্যে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের আধিক্য হেতু নানা প্রকার মেঘের আতিশয্যে মেঘরাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে; কিন্তু ইহার উর্ধে বায়ু প্রায় শুষ্ক। সাত মাইল উর্ধ পর্যন্ত বায়ুস্তরের নাম দিয়াছেন পণ্ডিতেরা "ট্রপোস্ফিয়ার।" এই স্তরে তাপের বৈষম্য হেতু বায়ু চাপেরও বৈষম্য হয়, যাহার ফলে বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি। এই স্তরের উপরে ৪৮ মাইল পর্যন্ত বায়ু প্রায় গতিহীন ও ইহার তাপ শীতল, ইহাই "ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার।" এই বায়ু স্তরের গভীরতা মেরু প্রদেশে কম, কিন্তু বিষুবরেখার উপরে অনেক বেশী। উত্তর দক্ষিণ মেরুপ্রদেশে যে মেরু জ্যোতি নৈশ আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া আলোকোজ্জ্বল পর্দার ন্যায় লম্বিত থাকে তাহার উৎপত্তি উর্ধে ৪৮ হইতে ১৩০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হাইড্রোজেনস্ফিয়ার (উদজানমণ্ডল?) নামক স্তরে। উল্কারাশি তাহাদের গমন পথে এই স্তরে আসিয়া পৌঁছিলে আলোক বিকিরণ করিতে সমর্থ হয়। অসীম আকাশের যে নীল রং, বৈজ্ঞানিকগণ বলেন তাহাও এই স্তরের গুণেই। ইহার পরবর্তী অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের শেষ স্তরটি অতি সূক্ষ্ম ও লঘু "জীয়করনিয়ম" নামক পদার্থে পূর্ণ এবং ঐ নামে পরিচিত।

নানা বৈচিত্র্যের আধার আমাদের এই বায়ুমণ্ডল! জলীয় বাষ্পের ন্যায় অগণিত সূক্ষ্ম ধূলিকণাও ইহার মধ্যে বহুলাংশে-একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ধূলিকণা না থাকিলে শীতের কুয়াসার আবির্ভাব হইত না। পার্শ্বস্থ বায়ু অপেক্ষা ইহার তাপ বিকীরণ করিবার ক্ষমতা অধিক। সেজন্য জলীয় বাষ্প ধূলিকণাকে কেন্দ্র করিয়া ঘনীভূত হয় ও কুয়াসার সৃষ্টি করে। আকাশে মেঘের সঞ্চার এবং বৃষ্টিপাত, সেও এই অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণার কাজ। ফলতঃ কুয়াসা ও মেঘের মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নয়। বায়ুমণ্ডলে এই ধূলিকণা থাকায় সূর্যোদয়ের পূর্বেই উষার আলোক জগতে নূতন দিনের সূচনা করে; আবার সূর্যাস্তের পরেও গোধূলির আলো অনেকক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীকে আলোকিত রাখে। এই তুচ্ছ ধূলিকণা নিজে অদৃশ্য, কিন্তু সূর্যের আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করিয়া আমাদের গৃহ আলোকিত করে; নচেৎ যেখানে সূর্যালোক প্রবেশ করে না, -সেসকল স্থান দিবাভাগেও অন্ধকারাবৃত থাকিত।

অন্যান্য বায়বীয় পদার্থের ন্যায় বায়ুরও কয়েকটি স্বাভাবিক ধর্ম—তাহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে।

গেরিকের* সময় হইতেই জানা যায় যে, বাতাসের ওজন প্রতি ঘন ফুটে ১¼ আউন্স এবং তাহা পৃথিবী পৃষ্ঠে সেই পরিমাণ চাপ দেয়। তরল পদার্থ যেরূপ পরিচলন স্রোতের দ্বারা উত্তপ্ত হয়, বায়ুও ঠিক সেই প্রণালীতেই উত্তপ্ত হয়। বায়ু উষ্ণ হইলে প্রসারিত ও লঘু হয় আবার শৈত্যে সঙ্কুচিত ও ভারী হয়। কোন কারণে চাপ বর্ধিত হইলে বায়ু সঙ্কুচিত, ভারী ও উষ্ণ হয় কিন্তু চাপ কমিলে ইহা প্রসারিত, লঘু ও শীতল হইয়া বৃষ্টিপাতের সূচনা করে। বায়ু উর্ধ্বে, নিম্নে, চারি পার্শ্বে চাপ দেয়; ইহাই বায়ুচাপ বা বায়ুপ্রেষ। জলীয় বাষ্প সম-আয়তন বায়ু অপেক্ষা হাল্কা, সেজন্য উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ু যত বেশী জলীয় বাষ্প ধারণ করিবে ইহার ওজনও তত কমিবে। বায়ুর এই শেষোক্ত ধর্মের জন্যই বায়ুচাপমান যন্ত্রের সাহায্যে আবহাওয়ার পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

পৃথিবীর আবরণরূপী এই বায়ু জলের ন্যায় তাপের ভাল পরিবাহী নয়, সেজন্য ইহা পৃথিবীর বিকীর্ণ তাপকে ধরিয়া রাখিয়া ইহার তাপ সংরক্ষণে যথেষ্ট সহায়তা করে; ফলে রাত্রিতে বা শীতকালে পৃথিবী বেশী শীতল হইতে পারে না। চন্দ্রে এইরূপ বায়ুমণ্ডল না থাকায় চন্দ্র, সূর্যালোকে যত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় আবার সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তেমনি শীঘ্র শীতল হইয়া যায়।

সূর্য সৌরজগতের সকল তাপের আধার। বায়ুমণ্ডল সাধারণতঃ সূর্যের বিকীরিত তাপের দ্বারা উত্তপ্ত হয়। বায়ুতে ধূলিকণা ও জলীয় বাষ্পের পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধিতে ইহার তাপগ্রহণ ও সংরক্ষণের ক্ষমতারও হ্রাস বৃদ্ধি হয়। এইজন্য উচ্চস্তরের বায়ু শীতল, কারণ যতই উর্ধ্বে উঠা যায় বায়ুস্তর ততই লঘু ও ধূলিশূন্য হয়, ফলে তাহার তাপগ্রহণ ও সংরক্ষণ করিবার ক্ষমতা কম হয়। সূর্যকিরণ উর্ধ্বে প্রখর ভাবে পতিত হইলেও জলীয়বাষ্প ও ধূলিকণার অভাবে তাপ দ্রুত বিকীর্ণ হইয়া যায়। ভূ-পৃষ্ঠ ও তাহার সংলগ্ন বায়ুস্তর উত্তপ্ত হয় সূর্যকিরণে; আবার ভূ-পৃষ্ঠ হইতে তাপ বিকীরিত হইয়াও বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে। এই উষ্ণ বায়ু প্রসারিত হইয়া লঘু হয় ও উপরে উঠে এবং সেই স্থান পূরণের জন্য শীতল ও ভারী বায়ু নীচে নামিয়া আসে। তাহা আবার পূর্ববৎ উত্তপ্ত হয় ও উপরে উঠে। এইরূপ পরিচলন স্রোতের দ্বারা বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়।

বায়ুমণ্ডলের এই যে তাপ ইহা সর্বত্র সমান নয়; নানা নৈসর্গিক কারণে ইহার তারতম্য লক্ষিত হয়। পৃথিবী একটি অভিগত গোলক (oblate spheroid) এবং ইহার অক্ষ কোনরূপ দিক্ পরিবর্তন না করিয়া নিজ কক্ষপথের সহিত ৬৬½° ডিগ্রী কোণ করিয়া প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ১৮½ মাইল বেগে সূর্যকে পরিক্রমণ করে, সেজন্য সূর্যকিরণ সর্বত্র সমভাবে পড়ে না। আবার ঐ একই কারণে দিবারাত্রিরও হ্রাস বৃদ্ধি হয় এবং তাপগ্রহণের সময়েরও পার্থক্য হয়, ফলে বায়ুমণ্ডলে উত্তাপেরও তারতম্য হয়। এই উত্তাপের তারতম্যই আবার ঋতু পরিবর্তনের মুখ্য কারণ; কিন্তু ভূ-নিম্নে ৬০ হইতে ৮০ ফিট গভীরতার মধ্যে এবং জলতলের ৩০০ হইতে ৬০০ ফিট গভীরতার পর এ পরিবর্তন আর লক্ষিত হয় না।

সূর্য কিরণে পৃথিবী যে উত্তপ্ত হয় তাহার পরিমাণ সমগ্র দিনমানের সকল সময় সমান নয়, আবার বৎসরের বিভিন্ন সময়েও ইহার বিশেষ তারতম্য হয়। কারণ সূর্য পরিক্রমণ কালে পৃথিবীর অবস্থানের পরিবর্তন হওয়ায় সূর্যরশ্মি স্থান বিশেষে লম্ব বা তির্যকভাবে পতিত হয়। ইহাতে তাপের পার্থক্য হয় দুইটি কারণে—(১) সূর্য কিরণ লম্বভাবে পড়িলে অল্প এবং তির্যকভাবে পড়িলে অধিক বায়ুস্তর ভেদ করে। (২) যদি এক

* অটো ভন গেরিক (১৬০১-১৬৮৬)—বিখ্যাত পদার্থবিদ্যা-বিদ্। ইনি ম্যাগডিবার্গে জন্মগ্রহণ করেন ও হামবার্গে মারা যান। বিদ্যুৎ ও বায়ুর চাপ সম্বন্ধে গবেষণা করেন ও বাতপাম্প আবিষ্কার করেন।

ইঞ্চি বর্গ পরিমিত সূর্য-রশ্মি কোন স্থানে লম্বভাবে পতিত হয় তাহা ঠিক এক ইঞ্চি বর্গ স্থানকেই উত্তপ্ত করে, কিন্তু ঐ সূর্য-রশ্মি তির্যক ভাবে পতিত হইলে তাহাকে অধিক স্থান উত্তপ্ত করিতে হয় বলিয়া তাপের তীব্রতাও কম হয়। সূর্য-রশ্মি ভূ-পৃষ্ঠের সহিত যত ছোট কোণ করিয়া পতিত হইবে ইহার তীব্রতাও তত কমিবে। (ক) চিত্রে দেখা যাইতেছে যে, যে-স্থানে সূর্য-রশ্মি পতিত হইতেছে উহার দৈর্ঘ্য একইঞ্চি এবং প্রস্থও ১ইঞ্চি অপরপক্ষে (খ) চিত্রে প্রস্থ ১ইঞ্চি হইলেও দৈর্ঘ্য ১ইঞ্চি অপেক্ষা অধিক।
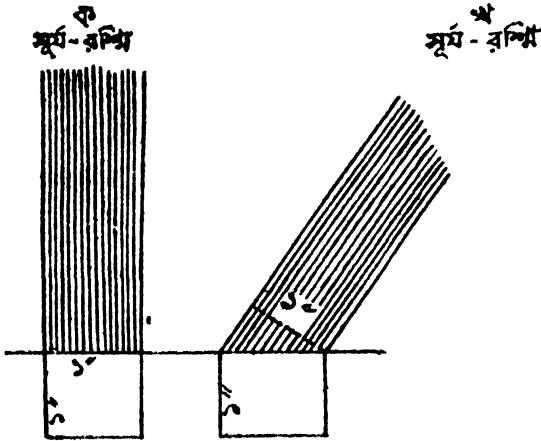
জলীয় বাষ্প বহুল পরিমাণে বায়ুর তাপ নিয়ন্ত্রণ করে। যে সকল স্থানের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের হার বেশী, সে সকল স্থানের শীত গ্রীষ্মের পার্থক্য অধিক লক্ষিত হয় না; কারণ জলীয় বাষ্প দিবসে সূর্যরশ্মির তাপ কিয়ৎ পরিমাণে শোষণ করিয়া এবং রাত্রিতে তাপ বিকীরণে বাধা সৃষ্টি করিয়া তাপের সমতা রক্ষা করে। এইজন্য সমুদ্র উপকূলবর্তী স্থানে কোন সময়েই উষ্ণতা প্রখর হয় না। আবার মরু-অঞ্চলের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের একান্ত অভাব থাকায় সেখানে শীত গ্রীষ্ম উভয়ই প্রবল; এমন কি দিবাভাগে প্রখর তাপ এবং রাত্রিতে প্রবল শীত। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের উপযোগিতা সম্বন্ধে আমেরিকাবাসী আবহতত্ত্ববিদ্ ইপ্‌সি * ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে প্রথম তাঁহার মতামত সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করেন।

উচ্চতার তারতম্য অনুসারে বায়ুর তাপের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। উর্দ্ধস্তরের বায়ু স্বভাবতঃ লঘু এবং ইহাতে জলীয় বাষ্প ও ধূলিকণা কম; সেজন্য ইহা শীঘ্র তাপ বিকরণ করিয়া শীতল হইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত ভূ-পৃষ্ঠের বিকীর্ণ তাপও উর্দ্ধস্তরে কম পৌছায়, ইহার ফলে সেখানকার বায়ু কম উত্তপ্ত হয়। দেখা গিয়াছে বায়ুমণ্ডলের নিম্ন ভাগে সমুদ্রতল হইতে প্রতি ৩০০ ফুট উচ্চতায় উষ্ণতা ১০ ডিগ্রী কমে। প্রধানতঃ জানুয়ারী ও জুলাই মাসে পৃথিবী পৃষ্ঠের যে যে স্থানের গড় উষ্ণতা সমান সেই সকল স্থানের উপর দিয়া মানচিত্রে যে রেখা অঙ্কন করা হয়, তাহাকে সমোষ্ণ রেখা বলে। এই সমোষ্ণ-রেখা-অঙ্কন করিবার সময় উক্ত নিয়ম অনুসরণ করিয়া অঙ্কন কার্য করিতে হয়। ফলে মানচিত্রে এই রেখাগুলি জটিলতার সৃষ্টি করিতে পারে না; কিন্তু এই রেখাগুলি দেখিয়াই আবার কোন দেশের প্রকৃত উষ্ণতা অবগত হওয়া যায় না।

অক্ষাংশ অনুসারে শীতাতপের তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু অক্ষাংশ ব্যতীত উচ্চতা, সমুদ্র হইতে দূরত্ব, সমুদ্রস্রোত, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি নানাবিধ কারণের উপর কোন স্থানের বিশেষতঃ স্থলভাগের তাপ নির্ভর করে। সেজন্য সমোষ্ণ রেখাগুলি অক্ষাংশের সমান্তরাল হয় না। তবে সমুদ্রের উপর সমোষ্ণ রেখাগুলি অক্ষাংশের সহিত প্রায় সমান্তরালভাবে গিয়াছে, কারণ স্থল-ভাগের ন্যায় সমুদ্রে উচ্চতার বিশেষ তারতম্য হয় না। স্থলভাগ জলভাগ অপেক্ষা শীঘ্র উত্তপ্ত হয় বলিয়া গ্রীষ্মে স্থলভাগের উষ্ণতা জলভাগ অপেক্ষা

---

* জেমস্ পোলার্ড ইপ্‌সি (১৭৮৫-১৮৬০)—পেনসিলভেনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন এবং বায়ুপ্রবাহ সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া বিখ্যাত হন।

অধিক হয়। আবার শীতকালে স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগের উষ্ণতা অধিক সেজন্য জুলাই মাসের সমোষ্ণরেখা স্থলভাগে উত্তরে ও জলভাগে দক্ষিণে বাঁকিয়া যায় এবং জানুয়ারী মাসের সমোষ্ণরেখা স্থলভাগে দক্ষিণে ও জলভাগে উত্তরে বাঁকিয়া যায়। জলভাগের উষ্ণতা প্রায় সমভাবাপন্ন, তাই সমোষ্ণরেখাগুলিও প্রায় সরল। সমোষ্ণরেখাগুলির উপর বায়ুপ্রবাহের প্রভাবও বেশ লক্ষিত হয়, কারণ বায়ুপ্রবাহ যেমন সমুদ্রের উপরিভাগের জলকে অন্যস্থানে লইয়া যায়, সেইরূপ তাপকেও নিজ পথে পরিচালিত করে। বায়ু যে-দিকে প্রবাহিত হয়, সেই দিকের তাপ, স্বভাবত: অধিক।

বায়ুমণ্ডলে শীতাতপের হ্রাসবৃদ্ধির আরও কয়েকটি গৌণ কারণ বর্তমান। উদ্ভিদ প্রস্বেদন ক্রিয়ার * দ্বারা যে জলীয় বাষ্প ত্যাগ করে তাহাতেও বায়ুর উষ্ণতার পরিবর্তন হয়। গ্রীষ্মের প্রখর তাপের শান্তি প্রচুর বৃষ্টিপাতের দ্বারা সংঘটিত হয়।

সূর্যের আপাতগতিপথের উত্তর ও দক্ষিণের শেষ সীমাকে ভূ-পৃষ্ঠে যথাক্রমে কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তি এবং ইহাদের মধ্যবর্তী স্থানকে গ্রীষ্মমণ্ডল বলে। ইহার বিস্তার নিরক্ষরেখার উভয়দিকে প্রায় ১৬২৫ মাইল। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুবিন্দুর চতুর্দিকে ২৩½° ডিগ্রী পরিমিত পৃথিবীপৃষ্ঠের যে দুইটি অংশের শেষ সীমায় (সুমেরু ও কুমেরু বৃত্ত) বৎসরে ছয়মাস অন্তর ২৪ ঘণ্টা ব্যাপী একটি দিন ও পরবর্তী ছয়মাস অন্তর একটি রাত্রি হয়; সেই দুইটি অংশকে যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ হিমমণ্ডল বলে। ইহারা প্রত্যেকে ১৬০০ মাইল বিস্তৃত। আবার কর্কটক্রান্তি ও সুমেরুবৃত্ত এবং মকরক্রান্তি ও কুমেরুবৃত্ত এই ৬০০০ মাইল বিস্তৃত উভয় স্থানের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল অবস্থিত। পৃথিবীকে এইরূপে পাঁচটি তাপমণ্ডলে বিভক্ত করিলেও প্রকৃত পক্ষে ইহাদিগকে আলোকমণ্ডল বলাই সুসিদ্ধ। সমোষ্ণরেখা অনুসারে তাপমণ্ডলের ভাগ ও নামকরণ হওয়া সঙ্গত। যে সকল স্থানের গড় উষ্ণতা ৮০° ডিগ্রী বা তদতিরিক্ত তাহাই গ্রীষ্মমণ্ডল, ৩২°
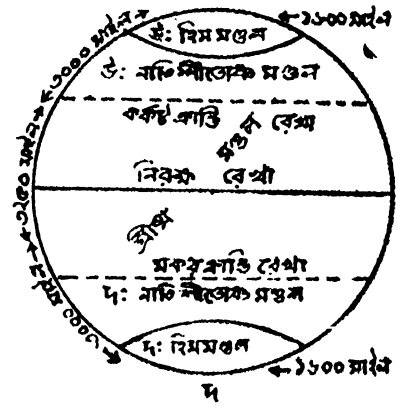
ও ৮০° ডিগ্রী সমোষ্ণ রেখার মধ্যবর্তী স্থান উত্তর ও দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল এবং উভয় মেরু ও ৩২° ডিগ্রী সমোষ্ণরেখার মধ্যবর্তী স্থান উত্তর ও দক্ষিণ হিমমণ্ডল; প্রকৃতপক্ষে এই পঞ্চ তাপমণ্ডল; এইরূপে সর্বোচ্চ তাপযুক্ত সমোষ্ণ রেখাটিকে "তাপবিষুব রেখা" কল্পনা করা যায়।

পূর্বোলিখিত বায়ুবাষ্পের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে যত উচ্চে উঠা যায় বায়ুস্তর ততই লঘু হয় ফলে চাপও কম হয়। দেখা গিয়াছে ৩০০০ ফিট পর্য্যন্ত প্রতি ৯০০ ফিট উচ্চতায় বায়ুচাপমান যন্ত্রের পারদ ১ ইঞ্চি নামিয়া আসে। পারদস্তম্ভের এই উঠা-নামা হইতে সমুদ্র সমতলের তুলনায় কোন স্থান কত উচ্চে তাহা নির্ণয় করা সহজ। ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা অনুসারে পারদস্তম্ভের যে উচ্চতা হওয়া উচিত তাহার ব্যতিক্রম হইলে ঝড়-বৃষ্টির বা পরিষ্কার দিনের সম্ভাবনা সূচনা করে। জানুয়ারী ও জুলাই মাসে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের

---

* **প্রস্বেদন ক্রিয়া**—গাছের দেহের প্রয়োজনাতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে বাহির করিয়া দেওয়া গাছের পাতার অন্যতম কার্য। ইহাই পাতার প্রস্বেদন ক্রিয়া। প্রস্বেদন ক্রিয়া দিনের বেলা বেশী ও রাত্রে কম হয়। তাপ, বায়ুর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, বাতাসের গতিবেগ প্রভৃতির উপর ইহা নির্ভর করে।

বায়ুর গড়চাপ নির্ণয় করিয়া সমান চাপের স্থানগুলি রেখার দ্বারা যুক্ত করিয়া সমপ্রেষ রেখা অঙ্কন করা হয়। উক্ত নিয়মে পর্বত প্রভৃতি উচ্চস্থানের বায়ুচাপকে সমুদ্র সমতলের চাপে পরিবর্তিত করিয়া সমপ্রেষ রেখা অঙ্কন করিতে হয়।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে দিনেমার আবহতত্ত্ববিদ ব্যাজ ব্যালো বায়ুচাপ ও বায়ু প্রবাহের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া তাঁহার নিজনামে দুইটি সূত্র গ্রথিত করেন। এই সূত্র অনুসারে, উত্তর গোলার্ধে বায়ু প্রবাহের দিকে কেহ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইলে তাহার বাম ভাগে দক্ষিণ পার্শ্ব অপেক্ষা বায়ুচাপ কম হইবে; দক্ষিণ গোলার্ধে এই নিয়মের ঠিক বিপরীত প্রয়োগ হইবে। অবশ্য বায়ুচাপের হ্রাসবৃদ্ধি ঠিক বাম বা দক্ষিণভাগে হয় না বরং কিঞ্চিৎ পশ্চাতে হওয়াই স্বাভাবিক। আরও দেখা যায় যে, বায়ু সমপ্রেষ রেখা অনুসরণ করিয়া তাহার গতিপথ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করে। ইহা ব্যতীত উত্তর গোলার্ধে বায়ু ঘড়ির কাঁটার গতির বিপরীত দিকে নিম্নচাপ-কেন্দ্রাভিমুখে এবং ঘড়ির কাঁটার গতির দিকে উচ্চচাপ কেন্দ্র হইতে বাহিরের দিকে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে এই নিয়ম ঠিক বিপরীত ভাবে প্রযোজ্য। আবহতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট ব্যাজ ব্যালোর এই সূত্রগুলি আজও অবিসংবাদিতরূপে সত্য বলিয়া পরিগণিত।

বায়ু যখন স্থির বা মন্দ মন্দ বহিতে থাকে, সে সময় ইহা সমপ্রেষ রেখার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রবাহিত হয় না, কারণ ইহা স্থানীয় বায়ুচাপের অতি সামান্য পরিবর্তনেই সংঘটিত হয়। পার্বত্য উপত্যকা বা জনাকীর্ণ নগরের অট্টালিকা সমাকুল রাস্তার বায়ুপ্রবাহ সম্পূর্ণরূপে বায়ুচাপের উপর নির্ভর না করিয়া উপত্যকা বা রাস্তার অবস্থানের উপর নির্ভর করে। স্থানীয় কোন কারণ ব্যাঘাত সৃষ্টি না করিলে ব্যাজ ব্যালোর সূত্রগুলি সর্বতোভাবে সত্য।
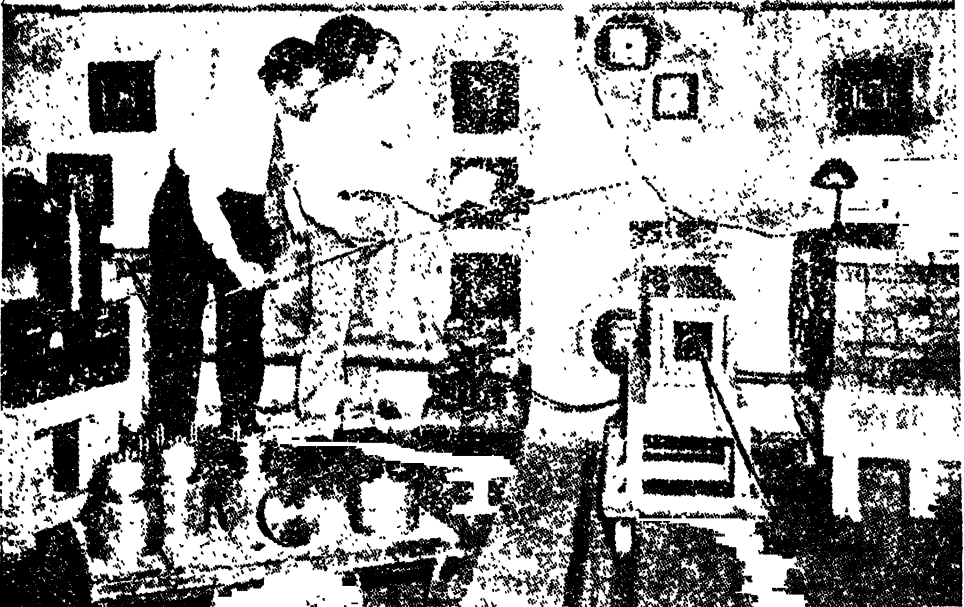
য়্যাটমিক-পাইল থেকে বেশ সুরক্ষিত ভাবে দূর হতে যান্ত্রিক-কৌশলে রেডিও-য়্যাকটিভ্ আইসোটোপ বা'র করে আনা হচ্ছে

গ্লিসারিণ ও তাহার ব্যবহার

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর

অবতরণিকা—

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশে বৈজ্ঞানিক শীলি এই দ্রব্যটী আবিষ্কার করেন। পরে সিভ্রিয়ুল প্রমাণ করেন যে, সকল স্বভাবজাত তৈল ও চর্বির ইহা একটী সাধারণ উপাদান।

যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশকে বলা হয় অণু। অণুতে যৌগিক পদার্থের গুণাগুণ ও ধর্ম বিদ্যমান থাকে। গ্লিসারিণ হলো কার্বণ, হাইড্রোজেন, এবং আক্সিজেন দ্বারা গঠিত একটী যৌগিক পদার্থ। একটি গ্লিসারিণ অণুর মধ্যে ৩টি কার্বণ, ৮টি হাইড্রোজেন এবং ৩টি অক্সিজেন পরমাণু সরল রেখার আকারে সন্নিবিষ্ট আছে।

বিভিন্ন প্রস্তুত প্রণালী—

গ্লিসারিণের প্রধান প্রাপ্তিস্থল তৈল বা চর্বি হইতে সাবান প্রস্তুত কালে মিষ্ট জল বা লাল জল হইতে।

তৈল ও চর্বিজাতীয় দ্রব্যসমূহ মেদাম্ল এবং গ্লিসারিণের সমভিব্যহারে গঠিত। মনে করা যাউক সাধারণ নারকেল তৈল। ইহা নিম্নলিখিত অম্লসমূহ দ্বারা গঠিত—

ক্যাপরয়িক্	—	অতি সামান্য মাত্রায়
ক্যাপরাইলিক্	—	৭·৯%
ক্যাপরিক্	—	৭·২%
লরিক্	—	৪৮·০%
মিরিষ্কিক্	—	১৭·৫%
পামিটিক্	—	৯·০%
ষ্টিয়ারিক্	—	২·১%
অলিয়িক্	—	৫·৭%
লিনঅলিয়িক	—	২·৬%

উপরোক্ত অম্ল সমূহ তৈল বা চর্বিতে অধিক মাত্রায় বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া তাহারা মেদাম্ল নামে জ্ঞাত।

কোন তৈল বা চর্বি যদি কোন ক্ষারের সহিত যথা, কষ্টিক সোডা বা কষ্টিক্ পটাস্ মিশ্রিত করা যায় তবে সাবান তৈয়ারী হয়। সাবান আর কিছুই নহে—তৈল বা চর্বি মধ্যস্থ মেদাম্লসমূহ ক্ষারস্থ সোডিয়াম বা পটাসিয়মের সহিত যথাক্রমে সোডিয়াম বা পটাসিয়াম লবণ সৃষ্টি করিল এবং তৈলমধ্যস্থ গ্লিসারিণ পৃথক হইয়া পড়িল।

সকল তৈলজাতীয় পদার্থ হইতে আবার সমপরিমাণ গ্লিসারিণ পাওয়া যায় না। বিশুদ্ধ কতকগুলি সাধারণ তৈলজাতীয় দ্রব্য হইতে শতকরা কি পরিমাণ গ্লিসারিণ পাওয়া যায় তাহা লিপিবদ্ধ করা হইল:—

গোজাত, শূকরজাত চর্বি, পাম তৈল, তুলা-বীজের তৈল	প্রায় ১১%
জলপাই, বাদাম, সয়াবিন ও তিলতৈল	প্রায় ১০·৫%
পাম কারনেল তৈল	প্রায় ১৩·৫%
নারিকেল তৈল ও বাবাসু তৈল	প্রায় ১৪%
রেপসিড তৈল	প্রায় ৯·৫%

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নারিকেল তৈল হইতে সর্বপেক্ষা বেশী পরিমাণে গ্লিসারিণ পাওয়া যায়।

সাবানের একটি বিশেষত্ব এই যে উহা ঘন লবণ জলে প্রায় একেবারেই দ্রবীভূত হয় না। সুতরাং সাবান প্রস্তুত হইবার পর পাত্রে যদি তাহার উপর লবণজল যথেষ্ট মাত্রায় দেওয়া যায় তবে সাবান উপরে ভাসিয়া উঠিবে এবং লবণজল তলায় জমা হইবে পৃথক স্তররূপে।

সাবান প্রস্তুতকালে জাত গ্লিসারিণ লবণ জলে সহজেই দ্রবীভূত হয় বলিয়া তাহা লবণ জলের সহিত সঞ্চিত হইবে। অবশ্য উৎপন্ন গ্লিসারিণের অতি সামান্য অংশ সাবানের সহিত রহিয়া যায়। গ্লিসারিণ সমেত এই ঘন লবণজলই মিষ্টজল নামে জ্ঞাত। সাধারণ মিষ্টজলের শতকরা গঠন এইরূপ :—

গ্লিসারিণ	৪'৫—৬'৫%
লবণ	১০—১১%
ক্ষার (অব্যবহৃত)	অল্প মাত্রায়

এতদ্ব্যতীত কিছু পরিমাণ সাবান, ও অন্যান্য ময়লা উহাতে বিদ্যমান থাকে।

মিষ্টজলে প্রাপ্য গ্লিসারিণ হইতে বিশুদ্ধ গ্লিসারিণ পৃথক করিতে হইলে তিনটি পৃথক প্রক্রিয়ার আশ্রয় লইতে হইবে :—(১) রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে অব্যবহৃত ক্ষার, দ্রবীভূত সাবান এবং জৈব অনাবশ্যক দ্রব্যসমূহের অধিকাংশ দূরীকরণ, (২) জলীয় অংশ বাষ্পীভূতকরণ এবং লবণ অপসারণ দ্বারা শতকরা ৮০ ভাগ বা তদূর্ধ্ব গ্লিসারিণ পাওয়া যায়। ইহাই অবিশুদ্ধ গ্লিসারিণ নামে পরিজ্ঞাত। ইহার মধ্যে বহু জৈব ও অজৈব অনাবশ্যক দ্রব্য এবং সামান্য মাত্রায় জল তখনও রহিয়া যায় এবং (৩) এই শেষোক্ত দ্রব্যটিকে অল্পচাপে বাষ্প দ্বারা পাতিত করিয়া বিশুদ্ধ গ্লিসারিণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মোমবাতির জন্য ষ্টিয়ারিক অম্ল প্রস্তুত কালেও গ্লিসারিণ গৌণদ্রব্য হিসাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অম্লটিরও প্রাপ্তিস্থল কতকগুলি চর্বিজাতীয় পদার্থ, যেমন গোজাত চর্বি ইত্যাদি। এইগুলিকে ভাঙণ দ্বারা অম্লটি পৃথক করিয়া লওয়া হয় এবং গ্লিসারিণ অবশিষ্টাংশে থাকে। ইহাকে আবার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা বিভিন্ন পর্যায়ের গ্লিসারিণ প্রস্তুত করা হয়।

গ্লুকোজের পচন দ্বারাও গ্লিসারিণ পাওয়া যায়। পচন কার্যের সহায়ক কয়েকটি আরক দ্রব্যের সাহায্যে মাত্র শতকরা ৩ ভাগ গ্লিসারিণ পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে ক্ষারধর্মাবলম্বী সোডিয়াম সালফাইট অথবা কার্বণেট-অল্প মাত্রায় দিলে ৮—১০ গুণ পরিমাণ বেশী গ্লিসারিণ লাভ করা যায়। ১৯১৪—১৮ সালে মহাসমরের সময় এতদুপায়ে জার্মানি মাসে প্রায় ২৫,০০০ মণের বেশী গ্লিসারিণ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়।

আধুনিক আর একটি প্রক্রিয়া হইতেছে প্রোপেণ হইতে গ্লিসারিণের প্রস্তুত প্রণালী। মধ্যবর্তী পদার্থটি হইল প্রোপেণ ট্রাইক্লোরাইড্। জানা গিয়াছে যে বিগত বিশ্বযুদ্ধে জার্মানী এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্লিসারিণ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয়।

গ্লিসারিণের ধর্ম ও প্রধান প্রধান ব্যবহার—

বিশুদ্ধ গ্লিসারিণ একটি বর্ণহীন, আঠাল, মিষ্ট স্বাদযুক্ত তরল পদার্থ। বিশুদ্ধ গ্লিসারিণ শৈত্যপ্রয়োগে মিছরীর দানার মত জমিয়া যায়। ইহার আপেক্ষিক ঘনত্ব ১'২৬৫। জলের সহিত এবং এলকোহলের সহিত ইহা যে কোন অনুপাতে মিশ্রিত হয়। ইহার স্ফুটনাঙ্ক ২৯০° সেন্টিগ্রেড্। কিন্তু এই অবস্থায় কিছু মাত্রায় বিনষ্ট হইয়া যায়। গ্লিসারিণ বাতাস হইতে জল সঞ্চয় করিয়া থাকে। কার্যক্ষেত্রে এবং ব্যবসায় জগতে গ্লিসারিণের কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ করা হয়—ইহা আর কিছুই নয়, জিনিষটির বিশুদ্ধতার পরিমাপ করা। প্রত্যেক শ্রেণীর কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকিবে যথা—"রাসায়নিকগত বিশুদ্ধ গ্লিসারিণ" আপেক্ষিক গুরুত্ব হইবে ১'২৪ হইতে ১'২৬ এবং গ্লিসারিণ থাকিবে ৯৫—৯৮%।

"ডিনামাইট গ্লিসারিণ" :—আপেক্ষিক গুরুত্ব যেন ১'২৬২ এর কম না হয় এবং গ্লিসারিণ থাকিবে অন্ততঃ ৯৮'৫% ইত্যাদি।

বহু সংখ্যক জৈব পদার্থের মূল উপাদান গ্লিসারিণ। উৎপন্ন গ্লিসারিণের অধিকাংশই ন্যাইট্রোগ্লিসারিণ নামক বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। এল্‌কিড রেজিন প্রস্তুত কালে গ্লিসারিণ অপরিহার্য। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে চকোলেট এবং শ্রেণী বিশেষের উদ্ভিজ্জ ঘৃত সংরক্ষণের জন্য গ্লিসারিণ ব্যবহৃত হয়। গ্লিসারিণ ও জলের মিশ্রণ গ্যাস পরিমাপ যন্ত্র এবং

অন্যান্য যন্ত্রাদিতে ব্যবহৃত হয়। এই সকল যন্ত্র চরম শৈত্য ও উত্তাপে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত হয়।

এতদ্ব্যতীত এমন বহু শিল্পের নাম করা যায় যাহাতে গ্লিসারিণের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ব্যবহার আছে। যথা—স্বচ্ছ সাবান প্রস্তুতকালে, প্রসাধন সামগ্রী এবং ত্বকের শোধকশিল্পে, ছাপার কার্যে, তামাকে, এবং ফল সংরক্ষণ কার্য ইত্যাদিতে।

ভারতীয় গ্লিসারিণ—

উপযুক্ত পরিকল্পনার অভাবে আমাদের দেশে প্রায় সমস্ত মিষ্টজলই নষ্ট হয়—তাহা হইতে গ্লিসারিণ বাহির করা হয় না। এই বৃহৎ দেশে মাত্র পাঁচটী কারখানা নিজ নিজ মিষ্টজল হইতে গ্লিসারিণ ও তৎসহ লবণ উদ্ধার করে। এই লবণ সাবান প্রস্তুত কালে পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হয়। গ্লিসারিণ পৃথক করিয়া লওয়ার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয়তা এই যে, ইহা সাবান তৈয়ারীর খরচ কমাইতে যথেষ্ট সাহায্য করে। বিক্রয়মূল্য অনেকটা নির্ভর করে তৈয়ারীর খরচের উপর। আমাদের দেশে সাবানের গড়ে ব্যবহার নিতান্তই নগণ্য। তাহার একটি কারণ এই যে অপেক্ষাকৃত বেশী বিক্রয়মূল্য। এমতাবস্থায় তৈয়ারীর খরচ কম করা কতটা প্রয়োজনীয় তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, এক সময়ে ভারতে বৎসরে প্রায় ৬৮,০০০মণ গ্লিসারিণ প্রস্তুত হইত। কিন্তু মধ্যে উৎপাদন যথেষ্ট হ্রাস প্রাপ্ত হয়। ভারত সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বে-সরকারী কতকগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। সুতরাং ভারতের চাহিদা মিটাইয়া তখন গ্লিসারিণকে একটি রপ্তানী শিল্পরূপে গড়িয়া তোলা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

গ্লিসারিণ জাতীয় আরও কয়েকটি পদার্থ—

গ্লিসারিণের অভাব মিটাইবার জন্য পাশ্চাত্য দেশসমূহে, বিশেষ করিয়া জার্মানদেশে অনেকগুলি সমপর্যায় ভুক্ত পদার্থ ব্যবহৃত হইতেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইহারা গ্লিসারিণের ন্যায় রাসায়নিক ও অন্যান্য গুণাবলম্বী অথবা মাত্র কতকগুলি বস্তুগত ধর্মবিশিষ্ট। এই শ্রেণীর কতকগুলি দ্রব্যের নাম- গ্লিসারোজেন ১,৫, পেণ্টামেথিলিন গ্লাইকল ইত্যাদি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী গ্লিসারিণের অনুরূপ রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ দিন দিন অধিকতর সংখ্যায় বাহির হইবে বলিয়া আশা করা যায় এবং গ্লিসারিণের যে যে ধর্ম আছে তাহার অনুরূপ ধর্মাবলম্বী দ্রব্যসমূহ প্রস্তুত করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

"লোকের ধারণা, সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিকেরা উঁচু স্তরে বিচরণ করেন। সমাজের এক শ্রেণীর লোক এই উঁচুস্তরে বিচরণ করেন বটে, কিন্তু নীচু স্তরের লোকেরা যারা সংখ্যায় বেশী, এ বিষয়ে তেমন ভাবেন না। চিন্তাশক্তির উৎকর্ষতায় আমাদের দেশ বিশ্বের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজ যদি জ্ঞান ও বিজ্ঞানে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে হয় তবে বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু নীচের দিক হইতে ভিৎ গড়িয়া না তুলিলে উপরের দিকে উহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না"

ইউক্লিডীয় ও অনিউক্লিডীয় জ্যামিতি

শ্রীক্ষমা মুখোপাধ্যায়

বর্তমানে জ্যামিতিশাস্ত্রকে মোটামুটি দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—একটি হোলো ইউক্লিডীয় ও অপরটি অনিউক্লিডীয় জ্যামিতি। ইউক্লিডীয় জ্যামিতি বলতে আজকাল আর শুধু ইউক্লিড যা লিখে গেছেন সেটুকুই বোঝায় না; এটি একটি বিশেষ শ্রেণীর জ্যামিতি, যার মূল সূত্রগুলি ইউক্লিড দিয়ে গেছেন। ইউক্লিডের সংজ্ঞাবিশিষ্ট সমতল এবং দেশের যে জ্যামিতি সেই হোলো ইউক্লিডীয় জ্যামিতি যদিও ত্রি-মাত্রিক দেশের ক্ষেত্রে ইউক্লিডের দান খুব বেশী নয়। ইউক্লিডের জ্যামিতির মূল সূত্রগুলিকে কিছু পরিবর্তিত করে একশ্রেণীর জ্যামিতি গড়ে উঠেছে। ইউক্লিডের জ্যামিতির স্বীকার্যগুলিকে কিছু কিছু পরিবর্তন করলে অন্যপ্রকার জ্যামিতি পাওয়া যায়। এইরূপে বিশেষ বিশেষ অনিউক্লিডীয় জ্যামিতি বিশেষ বিশেষ স্বীকার্যকে ভিত্তি করে হয়েছে। লোবাচেব্-স্কীয় জ্যামিতি, রীমানীয় জ্যামিতি ইত্যাদি সবই অনিউক্লিডীয় জ্যামিতির গণ্ডীতে পড়ে। এখানে আমরা মোটামুটি ইউক্লিডীয়, লোবাচেবস্কীয় ও রীমানীয় জ্যামিতি নিয়ে আলোচনা কোরবো।

জ্যামিতির উৎপত্তি প্রথম হয়েছিল জমির জরিপ ইত্যাদি ব্যবহারিক প্রয়োজন থেকে। আমাদের দেশেও ঐ কারণে এবং যজ্ঞবেদী নির্মাণ ইত্যাদি প্রয়োজন থেকে জ্যামিতি শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। পাশ্চাত্য দেশে জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞাগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজানোর প্রথম প্রচেষ্টা হয়েছিল প্রাচীন মিশরে এবং করেছিলেন মিশরীয় পুরোহিত 'আহমেস্'। তাঁর রচিত পুঁথি এখন বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। জ্যামিতিশাস্ত্রবিদদের মধ্যে থেল্‌স্ আবরোহিক পদ্ধতির প্রথম প্রণেতা। তারপর তাঁকে অনুসরণ করলেন পীথাগরাস্। ইউক্লিড (খৃঃ পূঃ ২৮৫ অব্দ) পূর্ব প্রমাণিত সমস্ত প্রতিজ্ঞা এবং স্বপ্রণীত বহু সম্পাদ্য ও উপপাদ্য তাঁর এলিমেণ্ট্‌স্ নামক গ্রন্থে সুসংবদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট করে প্রকাশ করলেন। তারপর দীর্ঘ দুই সহস্র বৎসর ধরে ইউক্লিড-প্রণীত জ্যামিতি জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে রাজত্ব করেছে। বৎসরের পর বৎসর, শতাব্দীর পর শতাব্দী ইউক্লিডের জ্যামিতিতে কোন ভুল না পেয়ে পণ্ডিতদের মনে ঐ জ্যামিতির অবিসম্বাদী সত্যতা ও অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল এবং কারো কারো মনে একটু কুসংস্কারও ঢুকে গিয়েছিল।

ইউক্লিডের জ্যামিতি (এবং অন্যান্য জ্যামিতিও) আবরোহিক যুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমে কতকগুলি তথ্যকে সত্য বলে ধরে নিয়ে সেগুলিকে ভিত্তি করে একটির পর একটি উপপাদ্য ও সম্পাদ্যের প্রণয়ন করা হয় এবং আবরোহিক প্রমাণের সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইউক্লিড তাঁর প্রাথমিক তথ্যগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন :—

১। সংজ্ঞা—এই ভাগে তেইশটি সংজ্ঞা আছে, যেমন রেখা, বিন্দু ইত্যাদি।

২। স্বতঃসিদ্ধ—বিজ্ঞানের যে কোন শাখাতেই এগুলি সমান প্রযোজ্য। এগুলির সত্যতা এত স্পষ্ট যে প্রমাণের কোন প্রয়োজন হয় না বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। পাঁচটি স্বতঃসিদ্ধ আছে, যেমন, 'একই জিনিষের সঙ্গে সমান জিনিষগুলি

পরস্পর সমান,' 'সম্পূর্ণ তার যে কোন অংশ অপেক্ষা বৃহত্তর' ইত্যাদি।

৩। স্বীকার্য—ইউক্লিড এগুলিকে সত্য বলে ধরে নিয়েছেন। স্বীকার্য মোট পাঁচটি :—

(১) যে কোন বিন্দু থেকে অন্য যে কোন বিন্দু পর্যন্ত একটি এবং মাত্র একটি সরল রেখাই টানা যেতে পারে।

(২) একটি সসীম সরলরেখাকে ঋজুভাবে যতদূর ইচ্ছা বর্ধিত করা যেতে পারে।

(৩) যে কোন বিন্দুকে কেন্দ্র করে এবং যে কোনো সসীম সরল রেখার সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত অঙ্কিত করা যেতে পারে।

(৪) সকল সমকোণই পরস্পর সমান।

(৫) যদি কোন সরলরেখা দুইটি সরলরেখাকে ছেদ করে এবং রেখাটির একই পার্শ্বস্থ অন্তঃকোণ দুইটির সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হয় তাহলে সরলরেখা দুইটিকে সেই পার্শ্বে বরাবর বর্ধিত করলে কোনো না কোনো সময়ে তারা পরস্পরকে ছেদ করবে।

আবরোহিক বিজ্ঞানের মূল পদ্ধতিটি হচ্ছে, প্রথমে এক বা একাধিক তথ্যকে প্রমাণ ছাড়াই সত্য বলে ধরে নিয়ে তার থেকে ন্যায়শাস্ত্রের অনুসরণে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। এখন আবরোহিক যুক্তির সাহায্যে কোনো বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রণয়ন করতে হলে তার স্বীকার্য অংশটি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন। দেখতে হবে যাতে স্বীকার্যগুলি (১) সম্পূর্ণ (অর্থ একটু পরে পরিস্ফুট হবে)। (২) পরস্পর অবিরোধী ও (৩) অনির্ভরশীল হয়।

ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধগুলিকে একেবারে এই বিংশ শতাব্দীতে ছাড়া খুব বেশী বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়নি। কিন্তু আধুনিক যুগে গণিতশাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গণিতজ্ঞরা এমন সব তথ্যের আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করেছেন, যে সব ক্ষেত্রে ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ 'স্বয়ংসিদ্ধ' তো নয়ই, উপরন্তু মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ক্যাণ্টরের অনন্ত শ্রেণীর কথা ধরা যেতে পারে। এখানে 'সম্পূর্ণ তার যে-কোন অংশ থেকেই বৃহত্তর নয়।' অবশ্য এই সব ব্যতিক্রমের জন্য ইউক্লিডের জ্যামিতিকে খুব বেশী বিপদগ্রস্ত হতে হয়নি।

গোলমাল বাধলো স্বীকার্য অংশটিকে নিয়ে। পণ্ডিতেরা ইউক্লিডের স্বীকার্যগুলিকে প্রথম দোষেই দুষ্ট বলে অভিহিত করলেন—ওগুলো 'সম্পূর্ণ' নয়। ইউক্লিড তার স্বীকার্য্য অংশটিতে কোথাও একথা বলেন নি যে আকৃতি ও আয়তন অক্ষুণ্ণ রেখে জ্যামিতিক চিত্রগুলিকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় স্থানান্তরিত করা চলতে পারে। কিন্তু তিনি তাঁর কয়েকটি উপপাদ্য—উদাহরণ স্বরূপ চতুর্থ উপপাদ্যটি নেওয়া যেতে পারে,—প্রমাণ করেছেন একটি ত্রিভুজকে অন্যটির ওপরে সমাপতিত করে। তাছাড়া এই পদ্ধতিকে প্রমাণ করতে গিয়ে সামতলিক জ্যামিতিতে ত্রি-মাত্রার সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে। তৃতীয় মাত্রার সাহায্য না নিয়ে দুইটি সর্বসম ত্রিভুজের একটিকে অপরটির ওপরে সমাপতিত করা যায় না। নীচের চিত্র দুটি থেকেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।
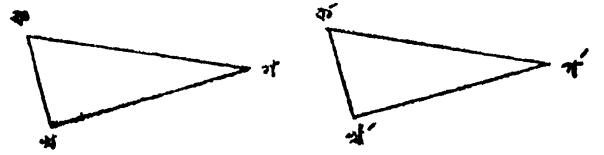
প্রথম চিত্র

প্রথম চিত্রে কখগ ও ক' খ' গ' দুইটি সর্বসম ত্রিভুজ এবং সমতল থেকে না তুলেই শুধুমাত্র গতির সাহায্যে বা গড়িয়ে একটিকে অপরটির ওপরে সমাপতিত করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয় চিত্রে যে দুটি ত্রিভুজ আছে তার কোন একটিকে না তুলে শুধু গড়িয়ে একটিকে অপরটির ওপরে সমাপতিত করা যায় না। এখানে তৃতীয় মাত্রার সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন উপায়ন্তর নেই।' তাহলে

তর্কের বিষয় হোলো দ্বিমাত্রিক ক্ষেত্রকে তৃতীয় মাত্রায় উন্নোলিত করা যায় কিনা এবং ইউক্লিডের
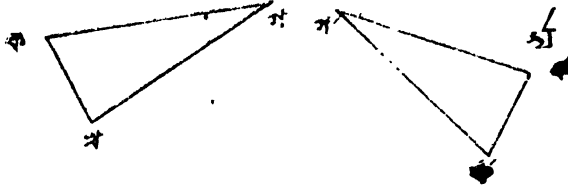
দ্বিতীয় চিত্র

'স্বীকার্য' অংশটিতে যখন এর কোনো উল্লেখ নেই তখন এই পদ্ধতিতে প্রমাণ করা যুক্তিসঙ্গত কি না।

ইউক্লিডের স্বীকার্য বিষয়ের বা সংজ্ঞার অসম্পূর্ণতার আর একটি নিদর্শন হোলো, তিনি কোথাও জ্যামিতিক চিত্রের বা জ্যামিতিক রাশির অন্তর্ভাগ ও বহির্ভাগ নির্দিষ্ট করেন নি। তার ফলে চিত্রের সাহায্যে জ্যামিতিক উপপাদ্য প্রমাণ করতে গিয়ে পরবর্তী যুগে পণ্ডিতরা বহু অলীক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

যাই হোক, এ সমস্তই হোলো ছোটখাট ব্যাপার। ইউক্লিডের জ্যামিতিকে যার জন্য সবচেয়ে বেশী সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে, এবং দুই হাজার বছর ধরে যেটা জ্যামিতিবিদ্ পণ্ডিতদের বহু চিন্তা এবং পরিশ্রমের কারণ হয়েছে সে হোলো তার পঞ্চম স্বীকার্য। পঞ্চম স্বীকার্যটি পড়লেই মনে হয় অন্যান্য স্বীকার্যগুলির মত এটি সরল নয়, বরং বেশ জটিল এবং প্রমাণসাপেক্ষ। সত্য বলে ধরে নেওয়ার দিক থেকে এটা যেন একটু অতিরিক্ত হয়ে গেছে। পণ্ডিতরা তাই চেষ্টা করতে লাগলেন স্বতঃসিদ্ধ ও অন্যান্য স্বীকার্যগুলির সাহায্যে এটিকে প্রমাণ করতে, কিন্তু বহু শতাব্দী ধরে কেউই কৃতকার্য হতে পারলেন না।

পঞ্চম স্বীকার্য প্রমাণ করতে যারা চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ইটালীয় গণিতজ্ঞ সাক্কেরির (১৬৬৭-১৭৩৩) কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং কৌতূহলোদ্দীপক। তিনিই প্রথম জ্যামিতিবিদ্ যিনি ইউক্লিডের স্বীকার্যের বিপরীত প্রকল্প সম্ভব বলে কল্পনা করলেন এবং তার থেকে বিভিন্ন প্রতিজ্ঞার অবতারণা করলেন। তিনি একটি চতুর্ভুজ কখগঘ নিলেন, যার কঘ ও খগ বাহু সমান এবং কখ বাহুর ওপর লম্ব। (তৃতীয় চিত্র) সুতরাং কখঘ ও কখগ ত্রিভুজ দুইটি সর্বসম। অতএব খঘ = কগ। ∴ কগঘ ত্রিভুজ এবং খগঘ ত্রিভুজ দুইটি সর্বসম। ∴ ঘ ও গ কোণ দুইটি সমান। এক্ষেত্রে তিনটি সম্ভাবনা আছে,
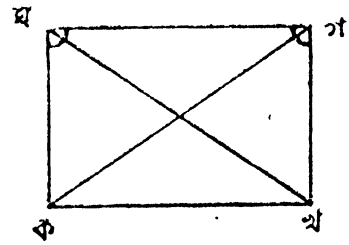
তৃতীয় চিত্র

১। ঘ ও গ উভয়েই সমকোণ।
২। ঘ ও গ উভয়েই স্থূলকোণ।
৩। ঘ ও গ উভয়েই সূক্ষ্মকোণ।

ইউক্লিডের জ্যামিতি অনুসারে ঘ ও গ উভয়েই সমকোণ হবে। ঘ ও গ যদি স্থূলকোণ হয়, সাক্কেরি দেখালেন, তাহলে বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। তারপর তিনি কল্পনা করলেন যে ঘ ও গ উভয়েই সূক্ষ্মকোণ। এই স্বীকার্য থেকে তিনি একটির পর একটি প্রতিজ্ঞার অবতারণা করতে লাগলেন এবং আবরোহিক প্রমাণের সাহায্যে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হতে লাগলেন, তাতে কোনো বিপরীতবাদের সম্মুখীন হতে হোলো না। কিন্তু সিদ্ধান্তগুলি ক্রমেই জটিল এবং অদ্ভুত আকার ধারণ করতে লাগলো। তার ফলে তাঁর মনে ধারণা হোলো যে প্রতিজ্ঞাগুলির ভিতরে নিশ্চয়ই কোথাও কোনো অসঙ্গত যুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়েছে, বা কোনো বিপরীতবাদী সিদ্ধান্ত এসে গেছে, যদিও তিনি সেটা আবিষ্কার করতে পারছেন না। সেই যুগের অন্যান্য গণিতজ্ঞদের মত তাঁর মনেও

একটা সংস্কার ছিল যে, ইউক্লিডের জ্যামিতিই একমাত্র সঙ্গত জ্যামিতি। এইভাবে তিনি প্রমাণ করলেন যে, ঘ ও গ কো স্থূলকোণ বা সূক্ষ্মকোণ হতে পারে না; ঘ ও গ উভয়েই সমকোণ, এটাই একমাত্র সম্ভাব্য প্রকল্প এবং ইউক্লিডীয় জ্যামিতিই একমাত্র সম্ভাব্য জ্যামিতি। ঘ ও গ কে সূক্ষ্মকোণ ধরে নিয়ে তিনি যে এক নতুন জ্যামিতির সৃষ্টি করেছিলেন তা তাঁর নিজের কাছেই অজ্ঞাত রয়ে গেল। এই সাক্কেরিকেই অনিউক্লিডীয় জ্যামিতির জন্মদাতা বলা যেতে পারে যদিও জন্মদাতা হিসাবে তিনি সম্পূর্ণ সাফল্যলাভের গৌরব অর্জন করতে পারেন নি।

সাক্কেরির পরে এলেন স্কট্ল্যাণ্ডের ভূতত্ত্ববিদ্ ও গণিতজ্ঞ প্লেফেয়ার (১৭৪৮-১৮১৯)। তিনি ইউক্লিডের পঞ্চম স্বীকার্যটির আর একটি রূপ দিলেন :—

'কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট সরল রেখার সমান্তরাল করে একটি এবং মাত্র একটি সরল রেখাই টানা যেতে পারে।' তিনি প্রমাণ করে দেখালেন যে এই প্রকল্পটিতে ইউক্লিডের স্বীকার্যের তাৎপর্য সম্পূর্ণ রক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে প্লেফেয়ারের স্বীকার্যটিই ইউক্লিডের স্বীকার্যের পরিবর্তে গৃহীত হয়ে আসছে। ভাষার দিক দিয়ে প্লেফেয়ারের স্বীকার্য অপেক্ষাকৃত সরল তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে এতে সমস্যার সমাধান কিছুমাত্র হোলো না।

উনবিংশ শতাব্দী জ্যামিতির ইতিহাসে এক বিপ্লবময় যুগ। বহুশতাব্দীর ধূমায়িত অসন্তোষ হঠাৎ এক নূতন সত্যের আঘাতে শতধা হয়ে ভেঙ্গে পড়লো। এই বিপ্লবের প্রথম প্রণেতা হলেন রুশিয় গণিতজ্ঞ লোবাচেব্স্কি ও হাঙ্গেরীয় গণিতজ্ঞ বোলিয়াই। ১৮৩০ সালে একই সঙ্গে উভয়ে তাদের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশিত করলেন,—

'ইউক্লিডের পঞ্চম স্বীকার্য যেমন প্রমাণ নিরপেক্ষ সত্য নয়, তেমনি প্রমাণ সাধ্যও নয়; অন্যান্য স্বতঃসিদ্ধ থেকে একে অবরোহিত করা যায় না। এটি শুধুমাত্র স্বীকার্য—সত্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। সমান্তরাল সম্বন্ধীয় আর যে কোন প্রকল্প যদি এর পরিবর্তে বসানো যায় তাহলে ইউক্লিডের জ্যামিতির সমান সত্য ও সমান সঙ্গত এক নূতন জ্যামিতি পাওয়া যাবে।'

ইউক্লিডের জ্যামিতির অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘুচে গেল। এক সময়ে পণ্ডিতরা ইউক্লিডের জ্যামিতিকে বাইব্‌ল্ এর মত সত্য বলে মনে করতেন। প্লেটো মন্তব্য করেছিলেন যে, 'ঈশ্বর যদি কোনো দিন জ্যামিতির প্রণয়ন করতে যেতেন তাঁহলে নিশ্চয়ই তিনি নিয়মাবলীর জন্য ইউক্লিডের স্মরণাপন্ন হতেন।' বাইব্‌ল্-বিরুদ্ধ উক্তি করার ফল গ্যালিলিও প্রমুখ বহু বৈজ্ঞানিককে ধর্মরক্ষকদের হাতে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। লোবাচেবস্কি জ্যামিতি-রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন উনবিংশ শতাব্দীতে; আর কয়েক শতাব্দী আগে হলে তাঁকেও হয়তো ইউক্লিড-অতিরিক্ত কথা বলার জন্য শাস্তি ভোগ করতে হোতো।

লোবাচেবস্কি ইউক্লিডের অন্যান্য স্বীকার্য ও স্বতঃসিদ্ধগুলিকে অপরিবর্তিত রেখে শুধু পঞ্চম স্বীকার্যটি বদলে দিলেন :

'তলের উপরিস্থিত, যে কোনো বিন্দু দিয়ে যে কোনো রেখার সমান্তরাল দুইটি রেখা টানা যায়।'

ইউক্লিডের জ্যামিতির মত সমতল ক্ষেত্রের ওপর চিত্র অঙ্কিত করে লোবাচেবস্কীয়-স্বীকার্য সম্যক্ উপলব্ধি করা কঠিন। যাই হোক, নিম্নলিখিতভাবে লোবাচেব্স্কীয় জ্যামিতির সূচনা করা যেতে পারে :—

চতুর্থ চিত্রানুসারে মনে করা যাক গঘ সরল রেখাটি কখ সরল রেখার উপর লম্ব। এখন গ বিন্দুকে স্থির রেখে গঘ রেখাটিকে যদি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরানো যায়, তাহলে গঘ, ঘ বিন্দুর দক্ষিণ দিকে বিভিন্ন বিন্দুতে কখ রেখাটিকে ছেদ করবে। এইভাবে ঘোরাতে

ঘোরাতে এমন একটা অবস্থা আসবে যখন গঘ কখ'র সমান্তরাল হয়ে যাবে। আবার যদি গঘ কে ঐ একই দিকে ঘোরাতে থাকা যায় তাহলে
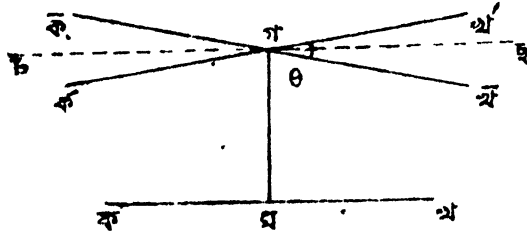
চতুর্থ চিত্র

গঘ, ঘ বিন্দুর বামে বিভিন্ন বিন্দুতে কখ কে ছেদ করতে থাকবে। ইউক্লিডীয় জ্যামিতির মতে গঘ'র এরূপ অবস্থান মাত্র একটিই আছে যেখানে সে কখ'র সমান্তরাল। চিত্র অনুসারে চছ রেখাটিকে ধরা যেতে পারে। কিন্তু লোবাচেভ্স্কীয় জ্যামিতির মতে গঘ'র এরূপ দুইটি স্বতন্ত্র অবস্থান বর্তমান, যেমন চিত্রের ক' খ' ও ক' খ' রেখা; এবং ক' খ' ও ক' খ'র মধ্যবর্তী কোণটিকে যদি θ বলা যায়, তাহলে এই θ র মধ্যবর্তী যত রেখাই টানা যাক না কেন সেগুলি ইচ্ছামত বর্ধিত করলে কখনো কখ রেখাটিকে ছেদ করবে না। এই রেখাগুলিকে তিনি কখ'র সমান্তরাল বলেননি, শুধু ক' খ' ও ক' খ' রেখা দুইটিকে 'সমান্তরাল' নামে অভিহিত করেছেন। ক' খ' ও ক' খ' যেন ছেদকারী ও অ ছেদকারী রেখাগুলির মধ্যবর্তী সীমানা নির্দিষ্ট করছে।

আগেই বলা হয়েছে যে, চিত্রের সাহায্যে লোবাচেভ্স্কীয় জ্যামিতির মূল সূত্র বোঝা কঠিন। চিত্র থেকে যদি আমরা এই তর্ক করতে যাই যে, 'এতো দেখেই বোঝা যাচ্ছে ক' খ' এবং ক' খ' কে যথেষ্ট বর্ধিত করলে উভয়েই কোনো না কোনো সময়ে কখ কে ছেদ করবে,' তাহলে সেটা ভুল হবে। কখ রেখার সমান্তরাল দুইটি রেখা যে আমরা কল্পনা করতে পারছি না তার কারণ হোলো তল, দেশ ও সরলরেখা সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে সে হোলো ইউক্লিডীয় তল ও দেশের ধারণা। তাছাড়া অনন্ত দেশ সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যয় যথেষ্ট পরিষ্কার নয়। দেশ যত বর্ধিত হবে, ঐ θ কোণটিও ততই ছোট হবে, এবং θ কোণের মধ্যবর্তী রেখাগুলি কখনো কখ কে ছেদ করবে না, যদিও ক্রমেই তার নিকটবর্তী হতে থাকবে।

লোবাচেবস্কীয় জ্যামিতিতে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির বহু প্রতিজ্ঞা অপরিবর্তিত রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বিপ্রতীপ কোণ সম্বন্ধীয় উপপাদ্য, (Eu. 1. 15) সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ সংক্রান্ত উপপাদ্য ইত্যাদির কথা ধরা যেতে পারে। লোবাচেভ্স্কীয় জ্যামিতিতে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে একটি নির্দিষ্ট সরল রেখার ওপর মাত্র একটি লম্বই টানা যেতে পারে।

আবার ইউক্লিডের অনেক প্রসিদ্ধ ও প্রয়োজনীয় প্রতিজ্ঞা লোবাচেভ্স্কীয় জ্যামিতিতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ইউক্লিডের জ্যামিতিতে একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণের সমান। কিন্তু লোবাচেভ্স্কীয় জ্যামিতিতে একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। ইউক্লিডের জ্যামিতিতে একটি ত্রিভুজের বাহুগুলি যথাক্রমে আর একটি ত্রিভুজের বাহুগুলির সমান না হয়েও, কোণগুলি সমান হতে পারে (সদৃশ ত্রিভুজ)। কিন্তু লিবাচেবস্কীয় জ্যামিতিতে ত্রিভুজের বাহু যত বর্দ্ধিত হয়, কোণগুলির সমষ্টি ততই কমে যায়। কাজেই ক্ষেত্রফল সমান না হলে দুইটি ত্রিভুজের কোণগুলি কখনো সমান হতে পারে না।

লোবাচেভ্স্কির পরে এলেন রীমান্। রীমানের নাম আজ সর্বজনবিদিত। জগতের শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞদের মধ্যে রীমান্‌কে অন্যতম বলে গণ্য করা হয়। একমাত্র জ্যামিতি নয়, গণিতের অন্যান্য শাখাতেও রীমানের দান অতুলনীয়।

রীমান্ ইউক্লিডের পঞ্চম স্বীকার্যটি আবার

একটু অন্যভাবে বদলে দিয়ে আর এক নূতন জ্যামিতির ভিত্তিস্থাপন করলেন। তাঁর স্বীকার্যটি হোলো :—

"তলের উপরিস্থিত, কোন নির্দিষ্ট বিন্দু দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট সরল রেখার সমান্তরাল করে একটি রেখাও টানা যায় না।' তার মানে হোলো সমান্তরাল রেখা বলে কোনো জিনিষ নেই, তলের উপরিস্থিত যে কোনো দুইটি রেখা পরস্পরকে ছেদ করে। ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সঙ্গে রীমানীয় জ্যামিতির আরো কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে দুইটি বিন্দুর সংযোগকারী মাত্র একটি সরল রেখাই টানা যেতে পারে, কিন্তু রীমানীয় জ্যামিতিতে বা রীমানীয় তলে সাধারণভাবে দুইটি বিন্দুকে মাত্র একটি সরল রেখা যুক্ত করে বটে, কিন্তু কয়েকটি বিশেষ বিশেষ যুগ্ম বিন্দু আছে যে সব বিন্দুর সংযোগকারী অসংখ্য সরল রেখা টানা যেতে পারে।

ইউক্লিডের সরল রেখা অনন্ত, কিন্তু রীমানের সরলরেখা অনন্ত নয়, যদিও তার কোনো নির্দিষ্ট প্রান্তসীমা নেই। এইভাবে রীমান্ অনন্ত ও অসীমের প্রভেদ নির্দিষ্ট করলেন। রীমানীয় দেশ অসীম কিন্তু অনন্ত নয়। রীমানের দেশে যদি একজন লোক অবিরত একই দিকে অগ্রসর হতে থাকে তাহলে যদিও সে কখনো কোনো সীমায় এসে পৌছবে না, কিন্তু এমন একটি সময় আসবে যখন সে আবার তার পুরানো স্থানে এসেই উপস্থিত হবে।

লোবাচেব্স্কি ও ইউক্লিডের জ্যামিতিতে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে একটি নির্দিষ্ট সরল রেখার ওপর মাত্র একটি লম্ব টানা যায়, কিন্তু রীমানীয় জ্যামিতিতে কোনো কোনো বিন্দু থেকে একটি নির্দিষ্ট রেখার ওপর অসংখ্য লম্ব টানা যায়। আবার রীমানীয় জ্যামিতিতে একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর, এবং ত্রিভুজ যতই বৃহত্তর, হয় কোণগুলির সমষ্টি ততই বৃহত্তর হয়।

ভারতবর্ষে এটা ফলিত বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানুশীলনের মূল্য আজকাল অনেকেই বিচার করেন তার ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক থেকে। বিজ্ঞানের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গী জাতি এবং বিজ্ঞানের উন্নতির পক্ষে কল্যাণকর কিনা সেটা এখানে বিচার্য নয়; কিন্তু লোবাচেব্স্কি ও রীমানের জ্যামিতির কোনো ব্যবহারিক দিক আছে কিনা শুধু সেটুকু নিয়েই এখানে একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

ইউক্লিডীয় জ্যামিতির ব্যবহার আমরা চারিদিকেই দেখতে পাই। ব্যাড্মিণ্টন খেলার ছক্ কাটা থেকে আরম্ভ করে, রাস্তাঘাট, বাড়ী, পুল ইত্যাদি সব কিছু তৈরী করতেই ইউক্লিডীয় জ্যামিতির প্রয়োজন হয়। ইউক্লিডীয় সরলরেখার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই, কারণ যে কোনো স্কুলের ছাত্রকেই সরলরেখা কি দেখাতে বল্লে তখনি পেন্সিল এবং রুলার দিয়ে কাগজের ওপর এক দাগ কেটে দেবে। যে আরও একটু বেশী বুদ্ধিমান সে হয়তো কোনো টেবিলের বা বই'এর ধারটা দেখিয়ে দেবে। কিন্তু মজার কথা হোলো, যে-তলের ওপর আমরা বাস করি সেই তলেই কিছু বৃহত্তর ক্ষেত্রে জ্যামিতির ব্যবহার করতে হলে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি অচল হয়ে পড়ে। ক'লকাতা থেকে দিল্লী পর্যন্ত ভূমির ওপর দিয়ে একটি ইউক্লিডীয় সরল রেখা আমরা টানতে পারি কি?

রীমান্ এবং লোবাচেব্স্কি যখন তাদের জ্যামিতির প্রণয়ন করেন তখন তাঁরা তার ব্যবহারিক দিকের কথা ভেবে করেন নি। গণিত-শাস্ত্রের নিজস্ব সত্তার বিকাশ সাধিত হয়েছে এই দুই গণিতজ্ঞের সাহায্যে। কিন্তু পরে এই দুই জাতীয় জ্যামিতিরই প্রয়োগ হয়েছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে।

পঞ্চম চিত্রে যে তলটি অঙ্কিত হয়েছে গণিতজ্ঞ বেলট্রামি তার নাম দিয়েছেন স্যুডো-স্ফিয়ার।

ট্র্যাকৃট্রিক্স নামক রেখাটিকে ঘুরিয়ে এই তলের সৃষ্টি
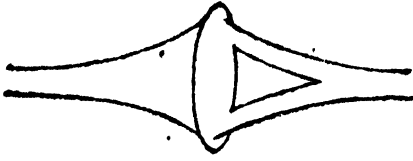
পঞ্চম চিত্র

হয়। পর পর সাজানো সমরেখ কেন্দ্রবিশিষ্ট কতকগুলো সমান বৃত্ত পরিধি'র উপর লম্ব রেখাটি হলো ট্র্যাকট্রিক্স। ষষ্ঠ চিত্র থেকে জিনিসটি খানিকটা অনুমান করা যাবে। কখগ রেখাটি একটি ট্র্যাকৃট্রিক্স। এখন কখগ রেখাটিকে যদি
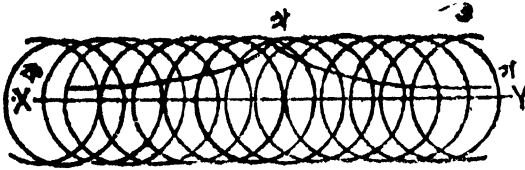
ষষ্ঠ চিত্র

X Yএর চারিদিকে ঘোরানো যায় তাহলে যে তলটির সৃষ্টি হবে সেটিই হোলো স্যাডো-স্ফিয়ার। এই স্যাডো-স্ফিয়ারে লোবাচেবস্কীয় জ্যামিতি প্রযোজ্য।

রীমানীয় জ্যামিতির প্রয়োগ করা যায় আমাদের অতি পরিচিত একটি তলের ওপর, সে হোলো গোলক। পৃথিবীপৃষ্ঠ ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সমতল নয়, একটি গোলক এবং পৃথিবীপৃষ্ঠে রীমানীয় জ্যামিতিই প্রযোজ্য। গোলক ও স্যাডো-স্ফিয়ারে জ্যামিতির প্রয়োগ করতে হলে প্রথমে ঐ তলস্থিত সরলরেখার সংজ্ঞা নিরূপিত করা প্রয়োজন। ইউক্লিডীয় জ্যামিতিতে, 'দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী হ্রস্বতম দূরত্ব' বলে সরল রেখার একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয়। অন্যান্য সমস্ত তলের ওপরেও সরল রেখার সংজ্ঞা এইভাবেই ধার্য হয়েছে। একটি গোলকের উপরিস্থিত দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী হ্রস্বতম দূরত্ব হোলো এ দুই বিন্দু ভেদকারী গুরুবৃত্তের অংশ। গোলকের কেন্দ্রবিন্দুর ভিতর দিয়ে অতিক্রমকারী সমতল, গোলককে যে বৃত্তে ছেদ করে সেটাই হোলো গুরুবৃত্ত। এই গুরুবৃত্তগুলি গোলক তলের সরল রেখা। স্যাডো-স্ফিয়ারেও সরল রেখার ঐ একই সংজ্ঞা। গোলকের যে কোনো দুইটি গুরুবৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করে, সুতরাং গোলক তলে
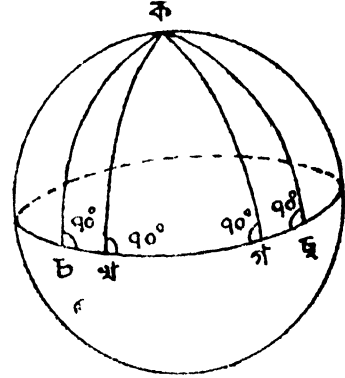
সপ্তম চিত্র

সমান্তরাল রেখা বলে কোনো জিনিস নেই। সপ্তম চিত্রে কখগ ও কচছ গোলকতলে দুইটি ত্রিভুজ। কখগ ত্রিভুজের খ ও গ কোণ দুইটি, এক একটি সমকোণ। সুতরাং ক, খ, গ, তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর। আবার কচছ ত্রিভুজটি কখগ ত্রিভুজ অপেক্ষা বৃহত্তর এবং ∠চকছ > ∠খকগ। চ ও ছ কোণ দুইটি সমকোণ। সুতরাং কচছ ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি কখগ ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি অপেক্ষা বৃহত্তর। কাজেই বৃহত্তর ত্রিভুজের কোণ-সমষ্টি বৃহত্তর হোলো। গোলকের উপরিস্থিত সরলরেখা অসীম কিন্তু অনন্ত নয়। কেউ যদি চখগছ রেখাটি ধরে চলতে থাকে তাহলে সে আবার পূর্ব-রচিত পথে এসে উপস্থিত হবে, কিন্তু কখনো কোনো প্রান্তসীমায়' পৌঁছবে না। আবার ক বিন্দু থেকে চখগছ রেখাটির ওপর কচ, কখ, কগ ও কছ এই চারিটি লম্ব টানা হয়েছে। এরূপ অসংখ্য লম্ব যে টানা যায় তাতে সন্দেহের কোনই কারণ নেই। এইভাবে রীমানীয় জ্যামিতির সমস্ত প্রতিজ্ঞাই এই তলে প্রয়োগ করা যাবে।

গোলক ও স্যুডো-স্ফিয়ার রীমানীয় ও লোবাচেবস্কীয় প্রয়োগযোগ্য তলের উদাহরণ মাত্র। ব্যাপকভাবে বলা যায়, নিত্য ধনাত্মক বক্রতা বিশিষ্ট তলে রীমানীয় জ্যামিতি, নিত্য ঋণাত্মক বক্রতাবিশিষ্ট তলে লোবাচেব্স্কীয় জ্যামিতি, এবং নিত্যশূণ্য বক্রতাবিশিষ্ট তলে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি প্রযোজ্য।

প্রকৃত দেশ, যে দেশে আমরা বাস করি, আমাদের এই সৌরজগৎ, নক্ষত্রমণ্ডলী, নীহারিকা, ছায়াপথ, বৃহৎ নক্ষত্র-পরিবার সমস্তই যে দেশে বর্তমান এবং যে দেশে নিজ নিজ কক্ষে পরিভ্রমণ করে, আধুনিক বিজ্ঞানের মতে সে দেশ সরল নয়, বক্র। ক্ষুদ্রগণ্ডীর ভিতরে (অবশ্য তার মধ্যে সমস্ত সৌরজগৎকেও ফেলা যায়) ইউক্লিডীয় দেশ ও রীমানীয় দেশের প্রভেদ এত সূক্ষ্ম যে তার পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের বৃহৎ ক্ষেত্রে এই প্রভেদ খুবই বেশী। কাজেই জ্যোতির্বিজ্ঞানে আজকাল ইউক্লিডীয় জ্যামিতি অচল,—রীমানীয় জ্যামিতিই এখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। আইনষ্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব যা নাকি বর্তমানে বহু অসমাধিত সমস্যার সমাধান দানে সমর্থ হয়েছে, এবং যা গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণের সময়কার চাঞ্চল্যকর আলোক-নমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, সে তত্ত্ব এই রীমানীয় জ্যামিতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

এখানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন, অনিউক্লিডীয় জ্যামিতি শুধু দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক নয়। ইউক্লিডীয় এবং অনিউক্লিডীয় জ্যামিতি উভয়েই চতুর্মাত্রিক বা বহু-মাত্রিক হতে পারে। এই উভয় প্রকার জ্যামিতিই আজকাল ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক থেকে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু জগতের বিশাল ক্ষেত্রে অনিউক্লিডীয় জ্যামিতির প্রয়োগ এবং মানব-সংসারের ক্ষুদ্রগণ্ডীতে ইউক্লিডীয় জ্যামিতির প্রয়োগের কথা বিবেচনা করলে ইউক্লিডীয় জ্যামিতিকে কি অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয় না? যাই হোক, ইউক্লিড আমাদের ক্ষুদ্রজীবনে অপরিহার্য জ্যামিতিশাস্ত্রের ভিত্তি-স্থাপয়িতা, সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গেই সাধারণ ও বিজ্ঞান জগৎ তাঁর নাম স্মরণ করবে।
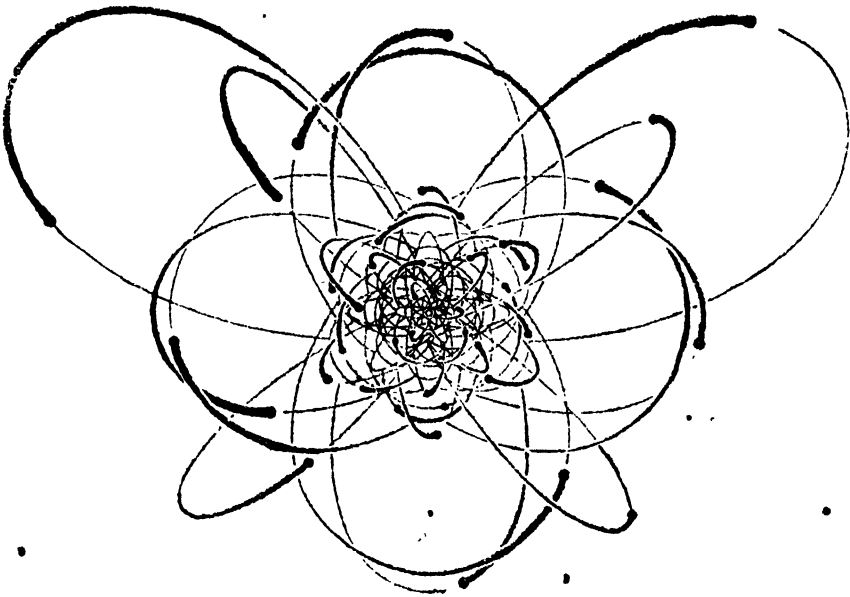
ইউরেনিয়াম গোষ্ঠীভুক্ত একটা পরমাণুর আভ্যন্তরীণ চিত্র। চারিদিকের বিভিন্ন কক্ষে ইলেকট্রনগুলো ছুটোছুটি করছে। এর ঠিক মাঝখানে রয়েছে—নিউক্লিয়াস। নিউট্রন-বুলেট দিয়ে আঘাত করে' এই নিউক্লিয়াসটা ভাঙতে পারলে শক্তি পাওয়া যায়। য়্যাটম-বোমার অভাবনীয় শক্তি এভাবেই উৎপন্ন হয়ে থাকে।

কৃষিকৌশলের চর্চা

শ্রীশুভেন্দ্রকুমার মিত্র

এদেশে যখন বেশীর ভাগ লোকই নিজের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্য চাষের উপর নির্ভর করে তখন চাষীদের যাহাতে কল্যাণ হয় তাহার উপর দেশের সর্বাঙ্গীন কুশল সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। এই জন্যই জাতীয় সরকার চাষীদের কল্যাণকল্পে নানা প্রকারের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন, যেমন জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, সমবায় প্রথার সম্প্রসারণ, বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহ, স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি। এগুলি খুবই প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, তবে আমাদের দেশে চাষীদের সর্ববিধ দুর্গতির মূল হইতেছে—দারিদ্র্য এবং কোন উপায়ে দারিদ্র্যের কিছু লাঘব হইলে তাহারা নিজেরাই যে নানা প্রকার গ্রামোন্নয়ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিবে ইহা সুনিশ্চিত। অবশ্য আশা করা হয় যে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ ও চাষীদের ঋণভার মোচনের জন্য আইনগুলি কতক পরিমাণে তাহাদের ব্যাপক দারিদ্র্যের লাঘব করিতে পারিবে। এ আশা কতখানি সফল হইবে তাহা অর্থ নীতিজ্ঞরাই অনুমান করিতে পারেন; কিন্তু এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে চাষের ফসলের সমৃদ্ধিই চাষীদের সমৃদ্ধির পাকা পথ। এ কথাও আজ কাহারও জানিতে বাকী নাই যে, আমাদের দেশে যেটুকু জমিতে যে পরিমাণ ফসল জন্মায়, অন্যান্য অনেক দেশে জমির অনুপাতে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী ফসল পাওয়া যায় মাত্র উন্নতধরণের কৃষিকৌশলের দ্বারা। কাজেই চাষীদের তথা সমগ্রদেশের ব্যাপক ও স্থায়ী কল্যাণের জন্য উন্নততর কৃষিপ্রণালীর প্রবর্তনই যে সর্বাপেক্ষা প্রশস্তপথ তাহা দেশ হিতৈষীগণ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।' এই উপলব্ধির ফলেই বোধ হয় অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রস্তুতের সরকারী কারখানা স্থাপন ও জাতীয় কৃষিবিভাগের ট্র্যাক্টর শাখার উদ্বোধন করা হইয়াছে।

কিন্তু সমস্ত দেশে উন্নত কৃষির প্রবর্তন এমনই বিরাট সমস্যা যে, মাত্র সরকারী প্রচেষ্টা দ্বারা তাহা সফল হওয়া সম্ভব নয়, অথচ এবিষয়ে পরস্পর আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে অনেকের মনেই একটা বদ্ধমূল ধারণা আছে যে উন্নত কৃষি প্রণালীর সৃষ্টি করা বিজ্ঞানীদের কাজ এবং উহা যে আমাদের দেশে এত বিলম্বিত হইয়াছে তাহার কারণ, বিজ্ঞানচর্চার অভাব এবং এখন বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ও সরকারী গবেষণাগারগুলি হইতে যখন এই অভাব অনেকাংশে দূরীকৃত হইতেছে তখন আর চিন্তার কারণ নাই। এই প্রকার ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। কৃষির যে উন্নতির কথা কল্পনা করিয়া আমরা ভবিষ্যতের জন্য পুলকিত হই তাহা কৃষিকৌশলের উন্নতির কথা। ইহার সহিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থাকিলেও সে সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কৃষি ও কৃষিবিজ্ঞানকে গুলাইয়া ফেলিয়াছি বলিয়াই এ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। শুধু কৃষিবিদ্যায় কেন, সর্বত্রই, বিজ্ঞানী ও শিল্পকুশলী পরস্পরের নিকট ঋণী থাকিলেও তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র ও কার্যপ্রণালী স্বতন্ত্র।

বিজ্ঞানী চলেন পরীক্ষা ও বিচারের পথে। তিনি জড় পদার্থ, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করিয়া তথ্য গুলিকে সুসম্বদ্ধ করিবার জন্য বীক্ষণাগারে নানা প্রকারের পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির সাহায্যে এবং নিপুণ পর্যবেক্ষণ দ্বারা যে সব তথ্য অশেষ ধৈর্য

ও অধ্যবসায়ের সহিত সংগৃহীত হয় সেগুলিকে আবার সম্পূর্ণ নিষ্কাম ও নিরপেক্ষ ভাবে মাত্র যুক্তির আলোতে বিচার করিতে হয়। এই ভাবে যে সব সিদ্ধান্তে পৌছান হয় সেগুলিকে অবার অন্যান্য বিজ্ঞানীর ভূয়োদর্শন ও সমালোচনার সামনে উপস্থিত করা হয়। এইভাবে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধ হইলে বিজ্ঞানীয় সিদ্ধান্তগুলি আন্তর্জাতিক জ্ঞানভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। এই কর্মপ্রণালীর মধ্যে জ্ঞানের পরিধি বাড়ানো ছাড়া আর কোন লাভ লোকসানের হিসাব নাই।

শিল্প-কুশলী চলেন ব্যবহারিক প্রয়োগের পথে। বিশেষ বিশেষ শিল্পের বিশেষ বিশেষ অভাবগুলি হয় নিজ পর্যবেক্ষণের দ্বারা অথবা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা প্রতিকার করিয়া তিনি শিল্পোন্নতিকে প্রয়োগ-সিদ্ধ প্রণালীতে পরিচালিত করেন। শিল্প-কলার ইতিহাসে অনেক স্থলেই শিল্প-কুশলী বিজ্ঞানীর আগে আগে চলিয়াছেন। কুতব মিনারের কাছে যে লৌহ-স্তম্ভটি প্রোথিত আছে, তাহা খাঁটি লোহার তৈয়ারী এবং মরিচা-মুক্ত। অথবা যে সব কারিগর উহা নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহারা লৌহনিষ্কাশনের রসায়ন কিছুই জানিত না এরূপ অনুমান করিলে অন্যায় হইবে না। যিনি প্রথম বাষ্পীয় যন্ত্র নির্মাণ করেন তিনি তাপ **বিনিময়ের যে গতিবিদ্যা** আছে তাহা জানিতেন না। এরূপ বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। কৃষিবিদ্যায়ও মোটামুটি যে প্রণালীতে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের খাদ্য সংগৃহীত হইতেছে তাহা আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মের বহু শত বৎসর পূর্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে কোন অজ্ঞাত শিল্পকুশলী গোষ্টির নিপুনতায়ই। অতএব আমাদের এখন কৃষিক্ষেত্রে নিপুণ কৃষিকৌশলীরই বিশেষ প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে অনেককে বলিতে শুনিয়াছি যে, তাই যদি হয় তবে আমাদের দেশের যে অবস্থা, আপাততঃ আমাদের শিল্পকুশলী হইলেই চলিবে। অতএব বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানচর্চা ছাড়িয়া শিল্পকৌশলের উন্নতির চেষ্টা করুন। এই প্রকারের প্রস্তাব কিন্তু যুক্তি-সিদ্ধ নয়। বিজ্ঞানীর গবেষণাগারে যে সব তথ্য সংগৃহীত হয় তাহাকে শিল্পের কাজে লাগানো আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানীর পক্ষে অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। এবং সে চেষ্টা জোর করিয়া করিলে ফলও আশানুরূপ হয় না। বিজ্ঞানচর্চার মূল সত্যানুসন্ধিৎসা। তাহার অন্য লক্ষ্য না থাকাই ভাল। বরং নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ দ্বারা উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পটভূমিকা সৃজন করিয়া বিজ্ঞানী শিল্প-কুশলীর গতিপথ সাফল্য মণ্ডিত করিতে পারেন। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, উনবিংশ শতাব্দীতে আণবিক বিস্ফোরণ যে আবিষ্কৃত হয় নাই তাহার কারণ এ নয় যে, তখনকার শিল্পকুশলীরা বিংশ শতাব্দীর শিল্পকুশলীদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তখন উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পটভূমিকার সৃষ্টি হয় নাই বলিয়াই উহার আবিষ্কার সম্ভব হয় নাই।

এখন বিচার্য এই যে, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার হইতে যদি কৃষিকুশলীর সৃষ্টি না হয়, তবে হইবে কি উপায়ে? অবশ্য কৃষিকুশলীর উদ্ভব হইবে চাষীদের মধ্য হইতেই। এ কথাও মনে করা ঠিক নয় যে, এখনও পর্যন্ত আমাদের দেশে উপযুক্ত পরিমাণে কৃষিকুশলীর আবির্ভাব হয় নাই। আমাদের দেশের চাষীরা অন্যান্য দেশের চাষীদের অপেক্ষা বোকা ত' নয়ই বরং বেশী চালাক-চতুর বলিয়াই মনে হয়। পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, বিশেষ একটি কৃষিজাত দ্রব্য বিশেষ এক স্থানে খুব ফলপ্রদ। আমরা সাধারণতঃ বলি যে, ইহা ওখানকার মাটির গুণ। সম্পূর্ণরূপে তথ্য উদ্ঘাটন করিতে পারিলে হয়ত দেখা যাইত যে ঐ স্থানে অতীত কালে কোন নিপুণ কৃষকের কৌশলে ঐ উন্নত শ্রেণীর ফসলের উদ্ভব হইয়াছে। তারপর আশেপাশের লোক তাহার কাছ হইতে উন্নত প্রণালীটি শিখিয়া ও উন্নতধরণের বীজ সংগ্রহ করিয়া তাহা ঐ স্থানের বিশেষ ফসলে পরিণত করিয়াছে। কৃষিকুশলতার আরও নিদর্শন বিরল নয়। বাংলা দেশে নানাবিধ কলমের আমের অস্তিত্ব হইতে

বুঝা যায় যে, ফলের বাগানের অনেক কৌশলই আগেকার চাষীরা জানত। বিশেষ বিশেষ কৃষি-কুশলীর নাম আমের সহিত যুক্ত হইয়া অমর হইয়া আছে, যেমন সাদতউল্লা, বিশ্বনাথ মুখুজ্জে ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন উঠে যে, ভারতবর্ষের চাষীদের মধ্য হইতে যদি কৃষিকুশলীর আবির্ভাব সম্ভব, তাহা হইলে আমাদের দেশের বর্ত্তমানের অভাব মিটাইবার মত যথেষ্ট সংখ্যক কৃষিকুশলী নাই কেন। কারণ অনেকগুলি আছে। প্রথমতঃ কৃষকেরা বেশীর ভাগই নিরক্ষর। পরস্পরের সহিত জ্ঞানের আদান প্রদান করার সুযোগ তাহাদের কম। কোন জিনিস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তারপর কোন উন্নত ফসল আকস্মিক ভাবে আবিষ্কার করিলেও, তাহার উন্নতির কারণগুলিকে যথোপযুক্ত বিশ্লেষণ দ্বারা অনুধাবন করিবার মত শিক্ষা তাহাদের নাই। আবার অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার দিকটাও আছে। নিজের আবিষ্কারের সুযোগ লইয়া অন্যে অর্থোপার্জন করিবে ইহাতে চাষীদের মত রক্ষণশীল লোকদের ঘোরতর অনিচ্ছা। এই মজ্জাগত অনিচ্ছা আমাদের দেশে শুধু চাষীদের মধ্যে নয়, অনেক ক্ষেত্রেই আছে। যাহার জন্য ভাল ভাল বিদ্যা, যেমন আয়ুর্বেদ, সঙ্গীতবিদ্যা প্রভৃতি লোপ পাইতে বসিয়াছে। আরও বিপদ আছে। যে বিদ্যা দান করিবে সে বলিতে রাজি হইলেও শুনিবে কে? চাষীরা বহু পুরুষের অর্জিত অভিজ্ঞতা হইতে চাষের যে নিরাপদ পন্থা আয়ত্ত করিয়াছে তাহা সহজে সে বদলাইতে চায় না। অনেক সময় তাহাদের বহু যত্নের ফসল আকস্মিক কারণে সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায়, কাজেই সে নূতন প্রণালী অবলম্বন করিতে বিশেষ উৎসাহ কখনই দেখায় না; বিশেষ করিয়া যদি উহার জন্য তাহাকে কিছু অতিরিক্ত পরিশ্রম বা অর্থব্যয় করিতে হয়। এই সব কারণকে অতিক্রম করিতে হইলে চাষীদের সহস্র বৎসরের অভ্যাস ও ধারণা পরিবর্তিত করাইতে হয়। ইহা আপাততঃ সম্ভব নয়। অতএব কৃষি কৌশলের উন্নতির কাজে অগ্রসর হইতে হইবে সমাজের নেতৃত্ব করিবার যোগ্যতা যাহাদের আছে, সেই শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীকে।

চমকাবার প্রয়োজন নাই, ভদ্রলোকেরা চাষের কাজ আরম্ভ করুক, এরূপ প্রস্তাব করিতেছি না। নিজেরা চাষ না করিয়াও কৃষি সংক্রান্ত আলোচনা ও কৃষিবিদ্যার চর্চা দ্বারাই কৃষিকৌশলের উন্নতি করা ভদ্রশ্রেণীর পক্ষে সম্ভব। ইংলণ্ডে লর্ড কোকের মত বড় জমিদার, বৎসরে একবার তাঁহার অধীনস্থ চাষী প্রজাদের নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের পরস্পর আলোচনা করিবার সুযোগ ও পুরস্কার দিয়া উৎসাহিত করিয়া উন্নত কৃষির অনেক কৌশল আবিষ্কার ও সেগুলির প্রসারে সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। আর্থার ইয়ং নামে এক পাদ্রী, যিনি জমিদারও নন বা চাষীও নন, কেবল মাত্র জানিবার আগ্রহ লইয়া কৃষি সম্বন্ধে এক বিরাট সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্য অন্যান্য দেশেও নানা প্রকারের সমিতি ও প্রতিষ্ঠান আছে যাহার সভ্যেরা কৃষি সম্বন্ধে নিয়মিত আলোচনা করিয়া থাকেন ও পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রচার করেন; যদিও তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে চাষ-আবাদ করেন না। বিজ্ঞানাগারের সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশের জন্য পত্রিকা আপনাদের দেশে আছে। সেগুলির মধ্যে যে আলোচনা হয় তাহার কোন পরিবর্ত্তনের কথা বলিতেছি না, সেগুলি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা হিসাবেই চলিবে। বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের নির্দিষ্ট পথে তথ্যানুসন্ধান করিবেন, বারবার পরীক্ষা দ্বারা তথ্যগুলির সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবেন, তারপর সেই তথ্যগুলি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন যাহাতে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের সিদ্ধান্তের বিচার করিবার সুযোগ পান। বিজ্ঞানীর তথ্যগুলি যদি যথার্থ হয়, তাঁহার সিদ্ধান্তগুলি যদি অভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে কোন না কোন সময়ে

কৃষিকৌশলী তাহাদের ঠিকই ব্যবহারে লাগাইতে পারিবেন।

বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগুলি ছাড়া কতকগুলি বিশেষ পত্রিকাও আছে, যেমন ইণ্ডিয়ান ফার্মিং, যাহাতে কৃষি-বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি ভঙ্গী হইতে আলোচিত হয়। ইহার আবার হিন্দী সংস্করণ হইবার কথাও হইতেছে। কিন্তু এগুলিতেও ব্যাপক আলোচনা ও চর্চার অভাব মিটিবেনা যে সব ভদ্রলোক গ্রামে থাকেন বা গ্রামে প্রায়ই যাতায়াত করেন তাঁহাদের চাষীদের কাজ কর্ম সম্বন্ধে সন্ধান করা উচিত এবং এইভাবে সংগৃহীত তথ্যগুলি গ্রাম্য বৈঠক খানায় আলোচনা ও সাধারণ পত্রিকায় প্রচার করা উচিত। যেমন আজকাল মাসিক পত্রিকায় মহিলা ও শিশু বিভাগ থাকে তেমনি একটি কৃষি বিভাগও থাকা উচত যাহাতে কৃষি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণগুলি স্থান পাইতে পারে। আমাদের দেশের কৃষি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি শিক্ষিত সমাজে প্রায় কিছুই জানা নাই। বৈজ্ঞানিক পত্রিকাগুলিতে পরীক্ষাক্ষেত্রে লব্ধ তথ্য অনেক পাওয়া যায়; কিন্তু চাষীরা তাহাদের ক্ষেত্রে কিভাবে চাষ করে, কতখানি জমিতে কতখানি বীজ দেয় তাহাতে কতটাই বা ফসল পায়, কি শ্রেণীর কতখানি সার দেয়, কোন সময় কর্ষণ করে, কখনই বা বপন করে, এইগুলির সময়ের তারতম্যে ফসলের পরিমাণ কিরূপ বাড়ে-কমে এসব প্রায় কিছুই জানা নাই। অথচ এগুলি ভাল করিয়া না জানিলেও কোন প্রগতি সম্ভব নয়। আর এসব তথ্য বেসরকারী ভাবে সংগৃহীত না হইলেও ফল ভাল হয় না। এখন ফসলের পরিমাণ সম্বন্ধে যে সব সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয় তাহাতে সরকারী প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত তথ্যগুলির সত্যতা সম্বন্ধে খুব নিশ্চিত হওয়া যায় না।

কৃষি সম্বন্ধে তথ্যগুলি শিক্ষিত সমাজে আলোচিত হইতে থাকিলে সেগুলিকে বৈজ্ঞানিক পটভূমিকায় বিচার করার সুযোগ হইবে। ফলে চাষীরাও গ্রাম্য ভদ্র সমাজের নিকট হইতে বৈজ্ঞানিক নির্দেশগুলি অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারিবে এবং সেগুলিকে লইয়া পরীক্ষা করিতেও তাহাদের তত আপত্তি থাকিবেনা। এতদ্ব্যতীত শিক্ষিত ভদ্র-সমাজ গ্রাম সম্বন্ধে সচেতন হইলে গ্রাম্য জীবনে তাঁহারা তাঁহাদের স্বাভাবিক নেতৃত্ব পুনরধিকার করিতে পারিবেন। তাহাতে দেশে রসামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। কৃষকদের মধ্যে অধিক সংখ্যক কৃষিকৌশলীর আবির্ভাব সম্ভব করিতে হইলে নিম্নলিখিত উপায়গুলি দ্বারা কৃষকদের মধ্যে জ্ঞানের আদান প্রদানের ব্যবস্থা করাও একান্ত প্রয়োজন। (১) কৃষি বিজ্ঞানাগারে লব্ধ জ্ঞানরাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশ করিয়া ব্যাপকভাবে প্রচার করা। গ্রামস্থ সম্পন্ন ও মাতব্বর শ্রেণীর চাষীদের নামে যদি সরকারী খরচায় পুস্তিকাগুলি বিতরণ করা হয় তাহা হইলে সেগুলি সম্বন্ধে চাষীদের কৌতুহল বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইবে বলিয়া অনুমান করা যায়। (২) গ্রাম্য শিক্ষিত ও ভদ্রব্যক্তি কর্তৃক আলোচনার জন্য কৃষক সভা গঠন ও তাহার নিয়মিত অধিবেশন। এই সমিতি কর্তৃক নিয়মিত ভাবে মেলা ইত্যাদির প্রচলন, যেখানে কৃষিকুশলী চাষীদের পুরস্কার ইত্যাদি দ্বারা উৎসাহিত করা যায়। (৩) বিদ্যালয়ে শিক্ষা বিষয় গুলির মধ্যে কৃষিতত্বকে স্থান দেওয়া, যেমন স্বাস্থ্য-তত্বকে দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গ্রাম্যলোকেরা তাহাদের ঔদাসীন্য কতটা পরিহার করিতে পারিবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার পূর্বে যদি এক বৎসর প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে কৃষিকর্ম ও পশুপালন সম্বন্ধে কোন না কোন কার্য নিজ হস্তে করান যায় তাহা হইলে শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনও হইবে এবং শিক্ষাও সম্পূর্ণ হইবার সুযোগ পাইবে। সম্প্রতি জাতীয় সরকার কর্তৃক বুনিয়াদী শিক্ষার যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে কোন না কোন ব্যবহারিক বিদ্যা হাতে কলমে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কাজেই বর্ণিত প্রস্তাব অনুযায়ী কৃষিতত্ব শিখানো ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগের ব্যবস্থা করা কিছু শক্ত নয়।

কৃষি তথা গ্রাম্য জীবন সম্বন্ধে উল্লিখিত বা সেইরূপ অন্য কোন উপায়ে যদি সহরবাসী ও শিক্ষিত সমাজের কৌতুহল ও ঔৎসুক্য জাগ্রত করা যায়, তাহা হইলে শুধু যে কৃষিকৌশলের উন্নতিই সহজ হইয়া আসিবে তাহাই নয়, জাতীয়-জীবনেও অভূতপূর্ব সংহতি সংঘটিত হইবার সুযোগ হইবে। এই গণতান্ত্রিক যুগে, কি বিজ্ঞানী, কি সমাজতত্ববিদ, কি রাষ্ট্রনীতিবিদ্ কাহারও এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, এদেশের শতকরা নব্বই জন চাষ করিয়া খায়। তাহাদের সম্বন্ধে কৌতুহল ও আগ্রহ নেতৃস্থানীয় বা নেতৃত্বকামী সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ না থাকিলে কোন প্রকার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই ফলপ্রসূ হইতে পারিবে না।

ভারতের শিল্পসমস্যার রূপ

শ্রীকেশবচন্দ্র ভট্টাচার্য

রাতারাতি অলৌকিক কিছু ঘটে যাবে একথা না ভাবলেও ভারত এবার থেকে দৃঢ় পদক্ষেপে শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হবে এবং অবিলম্বে তার অভ্রান্ত নির্দেশ অন্তত পাওয়া যাবে, এ রকম আশা কিছুদিন আগে অনেকেই পোষণ করতেন। ইতিমধ্যেই সে আশা অনেকটা স্তিমিত হয়ে এসেছে এই সন্দেহ অনেকে করেন, এর যে একবারে কোনো কারণ নেই তা' নয়। শিল্পোন্নতির আপাত কোন উন্নতির সম্ভাবনা না দেখে এবং চারিদিকে একটা শিল্পসংকটের রব শুনে এই সন্দেহ হয়েছে যে, উৎপাদন কমে যাচ্ছে। উৎপাদন বাড়াতে হবে এ কথা আজ আমরা অবিরাম শুনছি। নয়া দিল্লীতে কিছুদিন আগে শান্তি রক্ষা উদ্দেশ্যে একটি ত্রিদলীয় সন্ধি পত্রও স্বাক্ষরিত হয়ে গেছে। আশানুরূপ শিল্পোৎপাদন না হওয়ার দায়িত্ব শিল্পপতির কি শ্রমিক শ্রেণীর এ বাদানুবাদের উদ্দেশ্য এ প্রবন্ধের নয়। ভারতের প্রত্যেক হিতাকাঙ্ক্ষীই ভারতের সর্বাঙ্গীন শিল্পোন্নতি কামনা করেন, কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই ধারণা খুব পরিষ্কার নয়। তাই অপরাধী নির্ধারণের আগে আমাদের কর্তব্য হল ভারতের শিল্প সমস্যার আসল রূপটা কি এবং শিল্পোন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়গুলো কি তা' নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখা। বর্তমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে আমরা সেই চেষ্টাই করব।

অর্থনীতিবিদ্‌রা এ সংকটের অনেকে অনেক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। অনেকের মতে আমাদের শিল্পবৃদ্ধির প্রধান অন্তরায় হচ্ছে যন্ত্রপাতির অভাব। এই ব্যাখ্যার যে বেশ কিছুটা যৌক্তিকতা আছে তা' অস্বীকার করা চলেনা। আমাদের দেশে এখনও অতিসাধারণ ও সাদাসিধে ধরণের যন্ত্রপাতি ছাড়া আর কিছু তৈরী হয় না। মূলধনী মালের জন্য ভারত সর্বতোভাবে ইউরোপ ও আমেরিকার উপর নির্ভরশীল। অথচ পশ্চিম থেকে প্রয়োজন মত যন্ত্রপাতি আসছে না। নতুন শিল্প পত্তনের জন্যই যে যন্ত্রপাতি দরকার তা' নয়; যুদ্ধের ভিতরেও প্রয়োজনের তাগিদে কল-মালিকেরা তাদের যন্ত্রপাতিগুলোকে অপরিমিতভাবে খাটিয়েছিলেন; এই অতি ব্যবহারের দরুণ সেগুলির আয়ু অনেক কমে গেছে। নতুন যন্ত্রের বন্দোবস্ত না হলে আশানুরূপ শিল্পোৎপাদন সম্ভব নয়। গতযুদ্ধের পর ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলিতে এ সমস্যা দেখা দিয়েছিল; কিন্তু তাদের দশা ভারতের মত শোচনীয় হয়নি। মার্কিন ডলারের উপর নির্ভর করা সত্ত্বেও তারা সম্পূর্ণভাবে পরমুখাপেক্ষী নয়, যন্ত্রপাতি উৎপাদন করার ক্ষমতা তাদের নিজেদেরও বেশ কিছুটা আছে। কিন্তু ভারতের মিল-মালিকদের নিঃশেষে বৈদেশিক কলওয়ালাদের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

অবশ্য বিঘ্ন কেবল যন্ত্রের অভাবজনিত নয়। আজ দেশীয় শিল্পপতিদের হাতে মূলধনের অভাব নেই। যুদ্ধের সময় এরা যে, কোটি কোটি টাকা মুনাফা করেছিলেন তা' এখনও ব্যাংকে জমা রয়েছে। কিন্তু এই মূলধনকে শিল্পে খাটাতে গেলে, বিদেশ থেকে যন্ত্রপাতি আমদানী করতে গেলে, বিদেশে 'বিনিময়ে'র দরকার। ভারতের নিজের কোনো স্বাধীন 'বিনিময়' নেই। বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে ভারতকে তাই স্টার্লিংয়ের শরণাপন্ন হতে হয়। ভারতের পক্ষে বিদেশী 'বিনিময়' পাওয়া আজ

ক্রমশঃ কঠিন হয়ে পড়েছে; সমস্যাটা উঠেছে তাই নিজেই। এদেশী মালিকেরা ভরসা করেছিলেন যে, যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য ইংল্যাণ্ড ভারতের কাছে যে ঋণ করেছিল, তার থেকে বিদেশী 'বিনিময়' পাওয়া যাবে এবং এই স্টার্লিং উদ্‌বৃত্ত দিয়েই বিদেশের বাজার থেকে যন্ত্রপাতি কেনা যাবে। কিন্তু তাদের সে আশা নির্মূল হয়েছে। আজ তারা ক্রমশঃ বুঝতে পারছেন, ইংল্যাণ্ডকে ঋণ দেওয়া যত সহজ, আদায় করা তত সহজ নয়। যুদ্ধের সময় বাংলাদেশে যখন ত্রিশ লাখ লোক মরতে বসেছিল, গ্রামে মেয়েদের যখন প্রায় উলঙ্গ অবস্থা, তখন প্রয়োজনের তাগিদে এদেশ থেকে খাদ্য-সামগ্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পাঠানো হয়েছে বিদেশে যুদ্ধের চাহিদা মেটানর জন্য। কোটি কোটি ভারতীয়ের শ্রমলব্ধ এই স্টার্লিং জমা হয়েছিল; অথচ আজ ইংল্যাণ্ড সেই ঋণ মেটাতে নারাজ। তার নাকি ঋণ শোধের ক্ষমতা নেই। এ নিয়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট অনেক ঝোলাঝুলি করেছেন, কিন্তু কোন ফল হয় নি। সর্বাধুনিক স্টার্লিং আলাপ আলোচনার ফলও ভারতের পক্ষে আশাপ্রদ নয়। ঋণী হয়েও ইংল্যাণ্ড এমন ব্যবহার স্থরু করেছে যেন সেই উত্তমর্ণ। যেটুকু ঋণ সে আজ অবধি শোধ করেছে তাও কিভাবে খরচ করা হবে তা' ঠিক করে দিচ্ছে ইংল্যাণ্ড। স্টার্লিং অঞ্চল থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজের ইচ্ছামত যন্ত্রপাতি কিনবার স্বাধীনতা ভারতের আজ নেই। তাই আমেরিকার উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ছেড়ে দিয়ে তাকে বাধ্য হয়ে ইংল্যাণ্ডের পুরানো আমলের যন্ত্রপাতিই গ্রহণ করতে হচ্ছে। ভারতের শিল্পভবিষ্যতের পক্ষে এটা খুব শুভলক্ষণ নয়।

একদিকে যেমন ষ্টার্লিং উদ্‌বৃত্ত পাওয়ার সম্ভাবনা কমে গিয়েছে অন্যদিকে তেমনি ভারতের বাণিজ্য উদ্‌বৃত্ত (Trade balance) ক্রমশঃই প্রতিকূল ভাব ধারণ করছে। বিশেষ করে অন্যান্য দেশের মত ভারতের পক্ষেও মার্কিন ডলার সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুষ্কর। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ড যখন প্রভুত্ব করত, তখন বাণিজ্যে কিছুটা সামঞ্জস্য ছিল, ইংল্যাণ্ডের আমদানী ও রপ্তানীর ভিতরে কিছুটা ভারসাম্য ছিল। ইংল্যাণ্ড যেমন যন্ত্রপাতি রপ্তানী করত, যেমনি বিদেশ থেকে কাঁচা মাল, খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি আমদানীও করত। আজ বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমেরিকার প্রভুত্বের যুগ। কিন্তু আমেরিকায় শিল্প ও কৃষি দুই-ই সমানভাবে বৃদ্ধিলাভ করেছে। দু' একটি জিনিষ ছাড়া, শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচা মালও সবই আমেরিকায় পাওয়া যায়। আমেরিকা তাই কেবল রপ্তানী করেই চলেছে, আমদানীর বিশেষ তাগিদ নেই তার। কাজেই সব ডলার গিয়ে জমেছে আমেরিকায়। সারা পৃথিবী আমেরিকার শিল্পজাত দ্রব্য কেনার জন্য উদ্‌গ্রীব, কিন্তু কেনার সামর্থ নেই ডলারের অভাবে। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের এইটেই সবচেয়ে বড় সমস্যা। ইউরোপে এ সমস্যা সমাধানের সাময়িক চেষ্টা করা হচ্ছে মার্শাল-ঋণের সাহায্যে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের হাত থেকে ইউরোপের মুমূর্ষু পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বাঁচাবার জন্য ঋণ পরিশোধের আশা না রেখেই আমেরিকার শিল্পপতিরা কোটি কোটি ডলার ঢালবার সিদ্ধান্ত করেছেন। ভারতের শিল্পপতিরাও পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে আছেন, যদি বা "বদান্যতার" দু' এক কণা এদিকে ছিট্‌কে আসে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হওয়ার নিকট ভবিষ্যতে কোনো সম্ভাবনা নেই।

ভারতের মত একটি অনুন্নত দেশের শিল্পোন্নতির পথে একটি প্রধান অন্তরায় সাম্রাজ্যবাদীদের বাধা। এঁরা এশিয়া ও আফ্রিকার জন্য যতই কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করুন না কেন, এঁরা কথনই চান না যে, এই সব দেশ তাদের অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে শিল্পোন্নত হয়; এদের প্রতিদ্বন্দ্বীতাকে তারা সব সময়েই সন্দেহের চোখে দেখেন। ভারতে

বস্ত্র-শিল্প, সিমেণ্ট, লোহা ও ইস্পাত প্রভৃতি যতগুলি মূল শিল্প আজ অবধি উঠেছে তার সবগুলিই দেশী মূলধনের সাহায্যে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে। আজও সাম্রাজ্যবাদীদের সে প্রকৃতির পরিবর্তন হয়নি, কেবল মাত্র তাদের বুলি বদ্‌লেছে। যতদিন পাশ্চাত্যের উৎপাদন শক্তি মুষ্টিমেয় শিল্পপতিদের হাতে থাকবে, ততদিন এশিয়ার সংগে তার শোষক ও শোষিতের সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোনো সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে না। ভারতবর্ষকে আজ তাই আমেরিকা ও ইউরোপের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকলে চলবে না। নিজের পায়ের উপর তাকে আজ দাঁড়াতে শিখতে হবে। না হ'লে আমাদের দশা হবে চীনের মত; নামমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিয়ে চীনদেশ আজ আমেরিকার একটি অর্ধ-উপনিবেশে পরিণত হয়েছে। ভারতের প্রত্যেকটি হিতাকাঙ্ক্ষীকে এই শোচনীয় অভিজ্ঞতার শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ইংল্যাণ্ডকে জোর গলায় জানিয়ে দিতে হবে যে, তার ঋণ কড়ায়, গণ্ডায় শোধ করতেই হবে। যদি সে অসামর্থ্য জানায়, তাহ'লে ভারতে যত বৃটিশ পুঁজি খাটছে সেগুলি বাজেয়াপ্ত করে নিতে হবে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এতে নিশ্চয়ই আপত্তি তুলবেন; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের ঘাটিতে আঘাত পড়লে সে আপত্তি করবে না, এমন অবাস্তব কথা কে কবে কোথায় শুনেছে? দেশের শিল্পোন্নতিও চাই, আবার সাম্রাজ্যবাদকেও চটাব না—এ হয় না। কেক খাওয়া ও জমিয়ে রাখা একসংগে চলতে পারে না।

ভারতের শিল্পবৃদ্ধির পথে চতুর্থ এবং সবচেয়ে বড় বাধা আভ্যন্তরীন বাজারের অভাব। যথেষ্ট বড় বড় কারখানা থাকলেই শিল্পের প্রসার হয়না; শিল্পপ্রসারের জন্য সর্বপ্রধান প্রয়োজন হ'ল চাহিদার। ভারতের বাজারে এই চাহিদারই সবচেয়ে বেশী অভাব। এ দেশের অধিকাংশ লোকের ক্রয়ক্ষমতাই অত্যন্ত নিম্ন স্তরে থেকে গেছে। এর কারণ মূলতঃ ঐতিহাসিক। পাশ্চাত্যদেশে যন্ত্রযুগের জন্ম হয় অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর বিপ্লবের ভিতর দিয়ে, সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদের ভিতর দিয়ে। সেদেশে বিপ্লবী, ধনিক জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত ক'রে কৃষকদের ভিতর সেই জমি বণ্টন করে দেয় এবং প্রগতিশীল কৃষি-ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে যন্ত্রসভ্যতার প্রবর্তন করে। বাজারের অভাব তাই তাদের যৌবনের দিনগুলিকে বিব্রত করে তোলেনি। আমাদের দেশে কিন্তু পুঁজিবাদ গড়ে উঠেছে সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করে নয়, তারই সংগে মিলেমিশে। যে ইংরেজ এদেশে কল এনেছে, সেই ইংরেজই আবার এদেশে জমিদারীও পত্তন করেছে। আমাদের দেশের পুঁজিপতিরা তাই কেউই খাঁটি পুঁজিপতি নয়, ব্যাঙ্কের মারফতই হোক বা প্রত্যক্ষ ভাবেই হোক এদের জমির সংগে স্বার্থ জড়িত রয়েছে। দু'শো বছর আগের ইউরোপের মত এদেশের পুঁজিপতিরা তাই আজ আর জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কৃষকদের ডাক দিতে সাহস পান না। কৃষিবিপ্লব আজ তাই আমাদের দেশে অতি বিলম্বিত। শিল্প বৃদ্ধির সংগে সংগেই কৃষি ব্যবস্থাও ক্রমশঃ অবনতির পথেই চলেছে। ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান দেশকেও আজ আমেরিকার কাছে খাদ্যদ্রব্যের জন্য হাত পাততে হয়। গ্রামগুলির অবস্থা দিনদিনই অধিকতর শোচনীয় হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই গ্রামে বাস এবং এদের কেনবার ক্ষমতা ক্রমশঃই কমছে বই বাড়ছে না। শিল্পের বাজার ক্রমশঃই সংকুচিত হচ্ছে। কে কিনবে এই ভাবনায়ই এদেশের শিল্পপতিরা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। স্বল্প পরিসর বাজারের মত এদের আশা-আকাঙ্খার গণ্ডিও সংকীর্ণ। এদেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাই, জন্মাতে না জন্মাতেই বুড়িয়ে যায়; উৎপাদন সুরু হতে না হতেই অতি-উৎপাদনের হিড়িক লাগে। এই বিষাক্ত আবর্ত থেকে উদ্ধারের একমাত্র উপায় হল :- (১) বিনা-

খেসারতে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ (২) যুগ যুগ সঞ্চিত কৃষকদের ঋণভার তুলে নেওয়া এবং (৩) ভূমিকর হ্রাস করা। এ ছাড়া কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াবার অন্য কোনো রাস্তা নেই এবং যতদিন এদের ক্রয়ক্ষমতা না বাড়ছে ততদিন দেশের সর্বাঙ্গীন শিল্পোন্নতির আশা আকাশকুসুম ছাড়া আর কিছুই নয়। সরকার পক্ষ থেকে জমিদারী উচ্ছেদের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে উঁচু হারে খেসারতের ব্যবস্থা আছে এবং খেসারতের এই লাখ লাখ টাকা কর হিসেবে চাষীদের মেহনত থেকেই তুলতে হবে। চাষীর স্বাচ্ছন্দ্য তাতে বাড়বে না এবং শিল্পের আসল সমস্যারও কোনো সমাধানই হবে না।

এজন্যে কেউ কেউ বাইরের বাজারের দিকে মনোনিবেশ করেছেন। ভূতপূর্ব বাণিজ্য-সচিব এবং টাটার ডিরেকটর মিঃ ভাবা কিছুদিন আগে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, যুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের ফলে এশিয়ার যে সব জায়গায় শূন্যস্থান সৃষ্ট হয়েছে, ভারতের শিল্পপতিদের উচিত সেই সব স্থান অধিকার করা। তাঁর মতে, রপ্তানীর উপরই ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এবং এদিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া উচিত। কিন্তু নিজের দেশের লোককে অভুক্ত ও নগ্ন রেখে অতিরিক্ত লাভের তাড়নায় বিদেশে মাল রপ্তানীর এ প্রতিক্রিয়াশীল নীতিকে দেশের কোন শুভাকাঙ্ক্ষীই সমর্থন করতে পারেন না।

কোন সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পথে অন্যতম অন্তরায় হলেন একচেটিয়া মালিকেরা। নিজেদের সংঘবদ্ধ শক্তির উপর এদের এতদূর বিশ্বাস যে, এরা জনমতকে তো অগ্রাহ্য করেনই এমন কি সময় সময় সরকারী সিদ্ধান্তগুলিকে পর্যন্ত অগ্রাহ্য করতে বাধা বোধ করেন না। একচেটিয়া মালিকানার এই দুর্ভেদ্য দুর্গকে ভাঙা দরকার; এদের কবলে পড়ে এ দেশের শিল্পগুলির শ্বাস-রোধের অবস্থা হয়েছে। "জ্ঞান ও বিজ্ঞানের" পূর্ববর্তী এক সংখ্যায় জনৈক লেখক পুঁজিপতিদেরই একটি কাগজ থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেখিয়েছেন, কিভাবে অবৈধ বহিষ্কার ও অন্যান্য উপায়ে মালিকেরা বস্ত্রোৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করছেন। সরকারের কর্তব্য হচ্ছে এই সব মূল শিল্পগুলিকে মুষ্টিমেয় একচেটিয়া মালিকদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে জাতীয়কৃত করা এবং সরকার ও শ্রমিকদের যৌথ-পরিচালনায় উৎপাদন চালানো। অবিলম্বে বস্ত্রশিল্পে যদি এই পন্থা অবলম্বন করা হয় তা'হলে বস্ত্রসংকটের তীব্রতা অতি শীঘ্রই যে কিছুটা কমবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আগামী দশ বৎসর মধ্যে কোন মূল শিল্প জাতীয়করণ করবেন না বলে যে সিদ্ধান্ত করেছেন সেটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ভারতের শিল্পোন্নয়নের পথ এতে প্রশস্ত হবে না, বরং একচেটিয়া মালিকদের লাভের অংক বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে।

রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পের ক্ষমতা কতখানি সে বিষয়ে গবেষণা করবার দিন চলে গেছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের গত ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতাই এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালী, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির চাইতে কত বেশী অগ্রগামী ও কার্যকরী রাশিয়া নিঃসন্দেহে তা' প্রমাণ করেছে। ত্রিশ বছর আগে রাশিয়ার অর্থ-নৈতিক অবস্থা, বর্তমান ভারতবর্ষের চাইতে কোন অংশে উন্নত ছিল না, অথচ আজ সে শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বসেছে। আর ভারতবর্ষ এবং এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি আজও সেই ঔপনিবেশিক বা অর্ধ ঔপনিবেশিক দাসত্বের স্তরে আবদ্ধ রয়েছে। মার্কসীয় অর্থনীতি এবং তার সিদ্ধান্তগুলি ভ্রমাত্মক হতে পারে, কিন্তু এই অতি সহজ সত্যটিকে এড়াবার জো' নেই। আজকে আমাদের চিন্তা করতে হবে শিল্প সমস্যার এই অতি প্রাথমিক জিনিষগুলো সম্পর্কে। অবশ্য রুশদেশের প্রগতিশীল অর্থনীতির প্রশংসার মানে এই নয় যে, আমরা সেখানকার সরকারের আমলা

তান্ত্রিক নীতিরও এখানে অনুসরণ করতে বলছি। গত বিশ বৎসর ধরে রুশদেশে ক্রমাবনতির ইতিহাস যিনিই অনুধাবন করেছেন তিনিই জানেন কিভাবে আমলাতন্ত্র শিল্পে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নিজের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেছে, কিভাবে বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যেও বৈসম্য ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। কিন্তু বিকৃতি সত্বেও উৎপাদন ক্ষমতা এখনও সেখানে বেড়ে চলেছে, কেন না ১৯১৭ সালের বিপ্লবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন প্রণালীর এখনও অবসান ঘটেনি। যদি আমলাতন্ত্রের বদলে সেখানে গণতান্ত্রিক সরকার থাকত, তা'হলে নিঃসন্দেহে উৎপাদন শক্তি আরও দ্রুত গতিতে অগ্রসর হতো।

রুশদেশের অনুকরণে পৃথিবীর বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও আজকাল কিছুটা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার রেওয়াজ উঠেছে, যদিও সে অনুসারে কাজ চালান সম্ভব হয়নি কোথাও। যুদ্ধের মধ্যে এদেশেও কতকগুলি যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা গজিয়ে উঠেছিল। এদের ভিতরে ভারতের সবচেয়ে প্রধান শিল্পপতিদের রচিত "বোম্বে প্ল্যান"ই বোধহয় সে সময়ে সবচেয়ে বেশী আলোচিত হয়েছিল, আজ যুদ্ধের পর প্ল্যানের রচয়িতারাই একে কুলঙ্গিতে তুলে রেখেছেন; অর্থনীতির ছাত্র ছাড়া আর কেউ তা' পড়েও না। আমাদের দেশে সমস্ত প্ল্যানেরই এই একই দশা। আজকে দেশে অভাব প্ল্যানের নয়, কার্যকরী করে তুলতে হলে যে বাস্তব অবস্থার দরকার তারই। শিল্পোন্নতি যদি সত্যিই আমরা চাই, তা'হলে উপরোক্ত অন্তরায়গুলিকে দূর করতেই হবে।
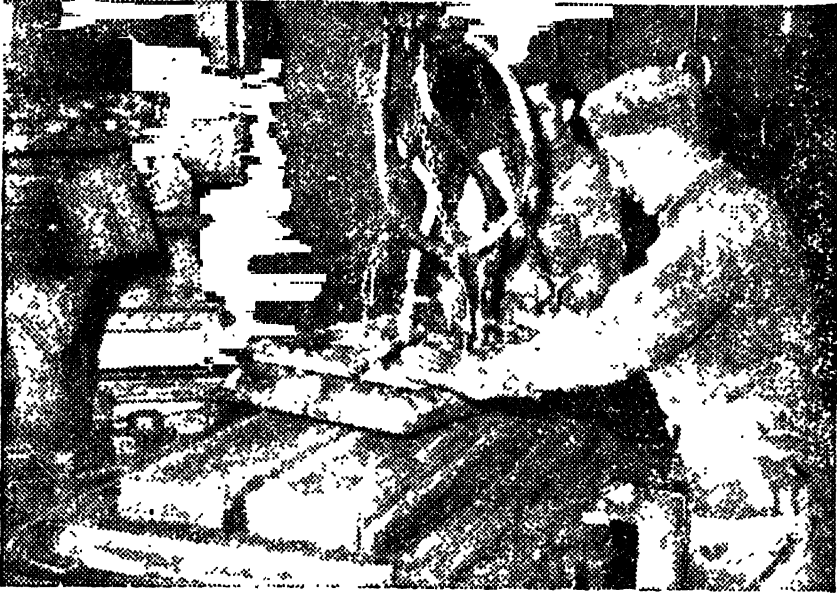
ভাঙা চীনামাটির বাসন-কোসন ও অন্যান্য পরিত্যক্ত আবর্জনার সংগে সিমেণ্ট মিশিয়ে অতি সস্তায় বিলাতে গৃহনির্মাণ সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে এসব পরিত্যক্ত জিনিস মিশিয়ে যন্ত্র সাহায্যে বড় বড় ইট হচ্ছে।

'বি. আই. এস' এর সৌজন্যে।

মানুষ সম্বন্ধে সকলের যা' জানা দরকার

শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রকৃতির বুকে মানুষের স্থান

উনবিংশ শতাব্দীর সর্বপ্রধান আবিষ্কার হচ্ছে "প্রকৃতির বুকে মানুষের স্থান" নির্ণয়। মানুষের উৎপত্তি যে নিম্ন শ্রেণীর জন্তু থেকে হয়েছে সে কথা সকলেই এখন মেনে নিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেহই সঠিক বল্‌তে পারেন না, কিরূপে ক্রমে ক্রমে নিম্ন শ্রেণীর-জন্তুর অবস্থা থেকে 'মানুষ তা'র বর্তমান অবস্থায় এসে পড়েছে।

মানুষ মেরুদণ্ডী প্রাণীর একটী শাখা। এই শাখারই অন্তর্ভুক্ত স্তন্যপায়ী জন্তুর সহিত মানুষের সম্বন্ধ আছে। এই জাতীয় জন্তুদের বলা হয় **প্রাইমেট**। এই জাতীয় প্রাণীদের এমন কোন বিশেষ লক্ষণ নেই যা'র সাহায্যে একটিকে আর একটী থেকে ভিন্ন করা যায়। কিন্তু প্রাইমে জাতীয় জন্তুর মস্তিষ্ক বড় ও তাহাদের আবিষ্কা করিবার শক্তি আছে। এই কারণেই প্রাইমে- প্রাণী প্রকৃতি ও পরিবর্তনের সহিত অবস্থানুযায়ী নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে ক্রমশঃ প্রকৃতির সর্বপ্রিয় প্রাণী হয়ে পড়েছে। প্রাইমেট জাতীয় জন্তুর হাত ও পায়ের দ্বারা কোন কিছু ধরিবার শক্তি আছে। এদের পায়ের নখগুলি চেপ্টা, অন্য জন্তুদের মত বাঁকান বা খুরের মত নহে। এদের হাতের বুড়ো আঙ্গুল চারিদিকে ঘুরিতে পারে—এবং খিলের মত অন্য আঙ্গুলগুলির উপর চাপিয়া থাকিয়া মুষ্টিকে দৃঢ় করে। এদের বুকের উপর দিকে দুটি স্তন আছে।

মানুষের আত্মীয় স্বজন

বর্তমানে যেসব প্রাইমেট জাতীয় জন্তু বেঁচে আছে তারা এসে' পড়েছে তাদের ক্রমবিকাশের শেষ সীমায়। যে সকল অশ্মীভূত প্রাইমেট জাতীয় জন্তুর কঙ্কাল ভূগর্ভ থেকে পাওয়া গেছে সেই সকল কঙ্কাল থেকে বেশ বুঝতে পারা যায় যে তা'দের মূলতঃ বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু প্রাইমেট জাতীয় "মানুষ জন্তুর" ক্রমবিকাশের ফলে পরিবর্তন হয়েছে খুব বেশী।

লেমুর

প্রাইমেট জাতীয় সর্বপ্রথম জন্তু হ'চ্ছে এক প্রকার কাঠবেড়ালির মত প্রাণী। এদের প্রথম উৎপত্তি হয় ৫০ লাখ্ বছর আগে। এদের বলে লেমুর। এরা রাতের বেলা বা'র হয় এবং নানা প্রকার আওয়াজ করতে পারে। এই কারণে এদের বলা হয় "রাতের ভুত"। মাদাগাসকার দ্বীপপুঞ্জে, আফ্রিকা ও পূর্ব ভারত দ্বীপপুঞ্জে এদের এখনও দেখা যায়।

প্রাইমেট শ্রেণীভুক্ত দ্বিতীয় দলের অন্তর্গত জন্তু হচ্ছে বানর:—লেজ যুক্ত বানর লেজ, বিহীন বানর মানুষ। ক্রমবিকাশের ফলে এদেরও পরিবর্তন মুখ থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে। লেজযুক্ত বানরের নাক চওড়া ও চ্যাপ্টা, এরা হচ্ছে আজ

কালকার পৃথিবীর জীব। দ্বিতীয় দলের লেজ নেই—নাক সরু ও কেশ কালো—দেখলে মনে হয় এদের মানুষের সঙ্গে যোগ আছে।

মানুষের মত বানর

মানুষের নিকট আত্মীয় হচ্ছে "মানুষের মত বানর" কিম্বা **য়্যান্থ্রপয়েড।** এদের চার ঘর এখনও জীবিত আছে।

গিবন

১। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে **গিবন**। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় এদের পাওয়া যায়। এদের কতকগুলি চরিত্রগত লক্ষণ হচ্ছে এরা দেখতে ছোট, প্রায় ৩ ফুটের বেশী নয়; কিন্তু এদের এক এক খানা হাত পাঁচ ফুট লম্বা। এদের এত লম্বা হাত থাকায় এক ডাল থেকে আর এক ডালে দুলে দুলে যেতে ভারি সুবিধা।

২। ওরাংওটাং সুমাত্রা ও বর্ণিওতে থাকে। এরাও গাছের উপরে থাকে—দেখতে বড়—গায়ে লাল্‌চে লোম। দেখলে মনে হয় এরা এক নম্বরের কুঁড়ে; কিন্তু এদের বুদ্ধি আছে।

৩। শিম্পাঞ্জি থাকে মধ্য-আফ্রিকায়। এদের গায়ের লোম হালকা কালো। মুখ দেখলে মনে হয় এরা মানুষের বিকৃত প্রতিমূর্তি। পোষ মানালে এরা বেশ পোষ মানে ও বুদ্ধি দেখায়। সেজন্যে মানুষের মনোবৃত্তির সঙ্গে বানরের মনোবৃত্তির তুলনামূলক পরীক্ষা এদের উপর দিয়ে অনেক করা হয়েছে।

শিম্পাঞ্জি

৪। এদের চতুর্থ ঘরের লোক হচ্ছে গরিলা। এরা পাঁচ ফুটের চেয়ে বেশী লম্বা। বিশাল হাত-পা,

গরিলা

বিরাট বক্ষস্থল। এদের শরীরের ওজন ২০০ সের

অপেক্ষাও বেশী। এদের সবল হাত—বিরাট চোয়াল, ধারালো দাঁত, ঢালু কপাল থাকায় এরা যুদ্ধ করতে খুব পটু। এরা দলবদ্ধ হয়ে থাকে এবং পরিষ্কার জায়গা দেখে শোয়। এরা মানুষের সঙ্গ পছন্দ করে না। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ক্রমান্বয়ে চলতে চলতে যায়। থাকবার জন্যে এরা চালা বাঁধে। বড়রা শোয় মাটিতে আর ছোটরা শোয় গাছের উপরে।

এখন আমরা যদি মানুষকে তার আত্মীয়দের সঙ্গে তুলনা করে দেখি তাহলে আমরা দেখবো চলতে পারে—আর মানুষের সেই মাথার ভিতর থাকে বিরাট মস্তিষ্ক। মানুষের চোয়াল বানরের চোয়াল থেকে অনেক ছোট; আর দাঁতগুলো গরিলার মত বেরিয়ে থাকে না। মানুষের কপাল উচু সেইজন্যে মানুষের মুখটা সামনের দিকে বানরের মত বেরিয়ে থাকে না।

একটি গরিলা ও মানুষের মাথার কঙ্কালের সঙ্গে তুলনা করে দেখলেই বোঝা যাবে যত তফাৎ এই মাথায়। একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে বেশ বুঝতে পারা যায় যে, মানুষের মস্তিষ্ক ক্রমশঃ বড় হ'তে থাকায়
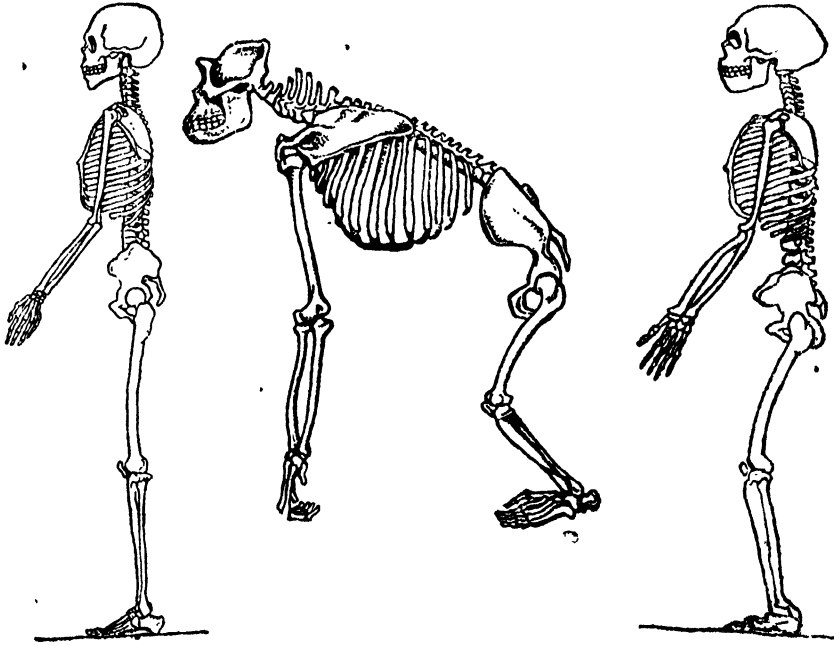
হোমোসেপিয়েন্স, গরিলা ও নিয়েণ্ডারথ্যাল মানুষের কংকাল

শরীরগত লক্ষণ এদের সবই সমান। তফাৎ হচ্ছে কেবল তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনের সমতায়। মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটা সমতা আছে, কিন্তু তার আত্মীয়দের তা' নেই। সেই জন্যে মানুষ গাছে ওঠবার 'যোগ্য' নয়, আর এর আত্মীয়েরা গাছে উঠতে খুব পটু। মানুষের পা বড়, হাত ছোট, পায়ের বুড়ো আঙুল ছোট—সেই জন্যে মানুষ তার অন্যান্য আত্মীয়ের মত পায়ে করে গাছের ডাল জড়িয়ে গাছে উঠতে পারে না। মানুষের মাথার গঠনের সমতা থাকার দরুণ মানুষ মাথা খাড়া করে তার মাথার খুলিটা ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে বেশ গোল আকার ধারণ করেছে। মেরুদণ্ড ও করোটির সংযোগ স্থলে ক্রমশঃ চাপ পড়তে থাকায় সংযোগ স্থলটা ক্রমশঃ মাথার মধ্যস্থলে এসে পড়েছে। কপালের উপরেও চাপ পড়তে থাকায়, কপাল ক্রমশঃ উচু হয়ে মানুষের মুখখানাকে সুন্দর করে তুলেছে। গলপেশীর সংযোগ স্থল দুটি লক্ষ্য করলে বেশ বুঝতে পারা যায়—মানুষের মাথা কেন খাড়াভাবে থাকে, আর গরিলার মাথা কেন সামনের দিকে ঝুকে পড়ে। আরো অনেক কিছু 'তারতম্য

আছে। সেসব বিষয় সাধারণের জানবার তত প্রয়োজন নেই বলে এখানে আলোচনা করব না।

মানুষের মুখটা যে কেন ক্রমশঃ চ্যাপ্টা হতে থাকলো তা' কেউই বলতে পারে না। তবে এইটুকু বলা যায় যে, কোন একটা অঙ্গ পূর্বে যে কাজে লাগতো ক্রমশঃ যদি তাকে আর সে কাজ করতে না হয় তাহলে সেই অঙ্গটিও ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসে। মানুষ যখন জন্তুর অবস্থায় ছিল তখন সে জন্তুদের মত তার লম্বা মুখ দিয়ে অনেক কিছু কাজ করতো। কিন্তু মানুষ যখন হাতকে কাজে লাগাতে লাগলো বেশী তখনই তার মুখের কাজ কমলো অনেক। মুখের দ্বারা তাদের আত্মরক্ষা করতে হয়না, মুখের দ্বারা খাদ্য আহরণও করতে হয়না সুতরাং অত লম্বা মুখের প্রয়োজন কি? এই তো গেল মানুষের মাথার কথা। এখন আমাদের কিছু জানা দরকার মানুষের কথা।

য়্যান্থ্রপয়েড জাতীয় জন্তুর পায়ের হাড়গুলো ছিল কতকটা ধনুকের মত বাঁকা। এই জাতীয় জন্তুরা, যারা ক্রমবিকাশের ফলে মানুষ হয়েছে তাদের একটা লক্ষ্যই ছিল সোজা হয়ে চলা। সেই কারণে পায়ের হাড়গুলো হলো ক্রমশঃ সোজা। ইহার ফলে মানুষের সমস্ত শরীরের ভার পড়লো তার পায়ের উপর। সেই কারণে পরিবর্তন হলো তার পায়ের পাতার। উপরের ছবি তিনটি দেখলেই বেশ বুঝতে পারা যাবে, ক্রমবিকাশের ফলে মানুষের দেহে কঙ্কালের কত পরিবর্তন হয়েছে।

অনেক সময় বলা হয়, মনোভাব প্রকাশ করবার ক্ষমতা মানুষের একচেটে। কিন্তু মানুষের আত্মীয়-দেরও সে ক্ষমতা আছে। শিশু শিম্পাঞ্জির ঠিক ছোট ছেলের মত স্বভাব থাকে। তারা কুকাজ করলে বকুনির ভয়ে কোণে গিয়ে লুকোয়, আর বকলে মুখ গোমড়া করে বসে থাকে। মন ভাল থাকলে আবার ছেলেদের মত চঞ্চলপনা করে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তারাও মানুষের মত গম্ভীর হয়ে ওঠে, আর ছেলেমানুষী পছন্দ করেনা। এদের রাগ, দুঃখ, হিংসা, আনন্দ ও সমবেদনা আছে। বন্ধুর দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করে। প্রতিশোধ নিতেও এরা খুব পটু।

মানুষের ক্রমোন্নতির ইতিহাস

মানুষের ও বানরের মধ্যে এত মিল থাকায় আমরা ধরে নিতে পারি, এদের মূল বংশধর এক। তাহলে আমাদের ভাববার কথা যে, গোড়া এক হলেও মানুষ কেমন করে বিশেষ কতকগুলি চরিত্র যুক্ত জাতি হয়ে পড়লো?

বানর যখন লেমুরয়েড-মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল—সে সব লাখ বছর আগের কথা—তখন তাদের মধ্যে একদল হাতে করে গাছের ডাল ধরে পায়ের উপর ভর দিয়ে গাছের ডালে ডালে বেড়াতে শিখে নিলে। তখন থেকে হলো "দাঁড়িয়ে চলা" বানরের আরম্ভ। সম্ভবত এই সময়েই বদলে গেল এদের নাকের গঠন ও রইলো না তাদের লেজ। এদের মধ্যে একটা দলের বাড়লো হাতের জোর, তারা হলো গিবন। আর এক দলের বাড়তে থাকলো শরীর ও মস্তিষ্ক এবং হারাতে থাকলো গাছে ওঠবার ক্ষমতা—এরা হলো গরিলা। তার পর ১৫ লক্ষ বছর পর এদেরই মধ্যে কারো কারো বাড়তে থাকলো মস্তিষ্ক ও সেই সঙ্গে বুদ্ধি। তারা শিখলো যন্ত্রপাতি তৈরী করতে, আগুন জ্বালতে ও সমাজবদ্ধ হয়ে থাকতে।

মানুষের মস্তিষ্ক হঠাৎ এমন বেড়ে গেল কি করে? কারণটা ঠিক করে কেউ বলতে পারেনা, তবে আমাদের মনে হয়, বানর যখন ক্রমে ক্রমে মানুষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় পৃথিবী হচ্ছিল শীতল—বরফের মত হিম। সৃষ্টি হচ্ছিল হিমালয়, আর উষ্ণ দেশীয় বন-জঙ্গল যাচ্ছিল নষ্ট হয়ে। এ অবস্থায় বনবাসীরা পড়লো মহা মুস্কিলে। যারা বনের আবরণ ছেড়ে খোলাজায়গায় বাস করতে

পারলো তারাই বেঁচে রইলো। চারিদিকে আরম্ভ হ'লো বেঁচে থাকবার চেষ্টা—কারুর বাড়লো দেহের বল, কারুর বাড়লো হাতের বল, আর কারুর বাড়লো মস্তিষ্কের শক্তি। যাদের মস্তিষ্কের শক্তি বাড়লো তারা দেখলো জমিই তাদের পক্ষে ভাল। সুতরাং অভ্যাস করতে লাগলো তারা জমির উপর চলাফেরা করতে, আর জমির উপরের খাদ্য দ্রব্য খেতে। এমনি করে তারা নিলে গাছের কাছ থেকে বিদায়। গাছের বাসা ছেড়ে জমির উপর বাসা বাঁধবার মত ছিল কেবল য়্যান্থ্রপয়েড জাতীয় বানর। কারণ শরীরের গঠনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে তারাই ছিল সোজা হয়ে চলবার যোগ্য।

মানুষ জাতি

জীব-বিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেখলে আমাদের বলতে হয়, মানুষ ও বানরের সঙ্গে একটা যোগ আছে। কিন্তু মানুষ ও বানরের যোগ কোথায়? ক্রম-বিকাশের পথে কোন্ স্তরে কখন মানুষ বানর থেকে আলাদা হয়ে গেল? সে কথা ঠিক করে কেউ বলতে পারে না। আমাদের জানা আছে কেবল জংধরা শিকলের কয়েকটা মাত্র যোগসূত্র, যা' দিয়ে আমরা বুঝতে পারি মানুষের মত ও বানরের মত জন্তরা পাশাপাশি ক্রমে ক্রমে বিকশিত হতে হতে কত লক্ষ বছর পরে তারা উপস্থিত অবস্থায় এসে পৌচেছে। এদের সম্বন্ধে যা' কিছু আমরা জানতে পারি তা' কয়েকটা কঙ্কাল ও এদের হাতেগড়া জিনিষপত্র দেখে। মানুষের কঙ্কাল বেশী পাওয়া যায় না। তার প্রধান কারণ হচ্ছে, তাদের বুদ্ধি থাকার জন্যে পাঁকে পড়ে কিম্বা গর্তে পড়ে প্রাণ হারাতো না অন্য জন্তদের মত। তারপর মানুষ মরে গেলে দেহকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার নানা রকম প্রথা ছিল। এদের কঙ্কাল পাওয়া যায় কেবল নদীর চড়ায় বা বালুকা সৈকতে। কারণ যারা জলে ডুবে মারা যেতো তাদের আর সৎকার করা হতো না। পাহাড়ের গুহার ভিতরও মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গেছে—কারণ মানুষ সর্বপ্রথম পাহাড়ের গুহাতেই আশ্রয় নেয়।

মানুষ সর্বপ্রথম কোনখানে দেখা দেয়? অষ্ট্রেলিয়ার কথা আমরা এক কথায় শেষ করতে পারি। এখানে মানুষকে দেখা যাওয়া সম্ভব নয় কারণ মানুষের আত্মীয়েরা এখানে বাস করে না। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাতেও মানুষ প্রথম দেখা দিতে পারে না, কারণ ছোট ছোট গেছো বানর ছাড়া এখানে মানুষের মত বানরের বাস নয়। বাকি থাকে—এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ।

এই সকল স্থানে যেসব মানুষের মত বানরের কঙ্কাল পাওয়া গেছে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে:— ১। জাভাদেশীয় বানরের মত মানুষ। ২। পিকিং-এর মানুষ। ৩। পিল্টডাউন মানুষ। ৪। হাইডেলবার্গ মানুষ বা নিয়ানডারথাল মানুষ।

ডাঃ ইউজিন ডুবয় ১৮৯১ সালে মধ্য-জাভায় ট্রিনিল গ্রামে সোলো নদীর ধারে প্রথম একটি বানরের দাঁতের মত দাঁত পান। তারপর দশ ফুট দূরে পান আর একটা দাঁত। তারপর পান মাথার খুলি, কেবল মাত্র চোখ ও কানের উপর দিকটুকু। তারপর পান একটি উরুর হাড়। তিনি এই কঙ্কালের মালিকের নাম দিলেন **পিথেক্যান্থ্রপাস্ ইরেক্টাস** (খাড়া বানরের মত মানুষ)।

তারপর ডাঃ কোয়েনিসংওয়াল্ড জাভা থেকে আর কতকগুলি কঙ্কাল আবিষ্কার করেন। অনেক মত বিরোধের পর এখন স্থির করা হয়েছে যে, এই সব কঙ্কালের মানুষেরা ছিল জানোয়ারের মত মানুষ।

২। ডাঃ ডেভিডসন ব্ল্যাক ও ডাঃ ভাইডেন-রাইক পিকিং দেশের নিকট ৪০ মাইল দূরে চুকুটিয়েন গ্রামে ১৯২৭ সালে একটি জাভা দাঁত আবিষ্কার করলেন। ১৯২৯ সালে একটী মাথার খুলি, তারপর ক্রমশঃ অনেকগুলি মাথার খুলি ও টুকরো টুকরো হাড়গোড় পাওয়া গেল। এই সকল কঙ্কালের মালিকদের নাম দেওয়া হ'লো সাইনেন্থ্রপাস্।

এরা প্রায় জাভা মানুষের মত কিন্তু আর একটু উন্নত।

৩। ১৯০৪ সালে চার্লস ডসন ইংলণ্ডে ব্রাইটনের নিকটে পিণ্টডাউনে একটি মাথার খুলি, ও কপালের হাড় খুঁজে পান। পরের বছর ভলা করে অনুসন্ধানের পর আরো কতকগুলি করোটির টুকরা পাওয়া যায়।

কেউ আগুন জ্বালতে জানতো; পাথর কেটে কুড়ল ও মাটি খোড়বার যন্ত্র তৈরী করতে পারতো।

আমরা প্রায় শুনি, আগেকার মানুষ গুহায় বাস করতো। পিকিং মানুষের পর লক্ষ লক্ষ বছর পরে, যে মানুষ পৃথিবীতে বাসকরতো তাদের সভ্যতার অবশেষ যা' পাওয়া যায় তা' দেখে মনে
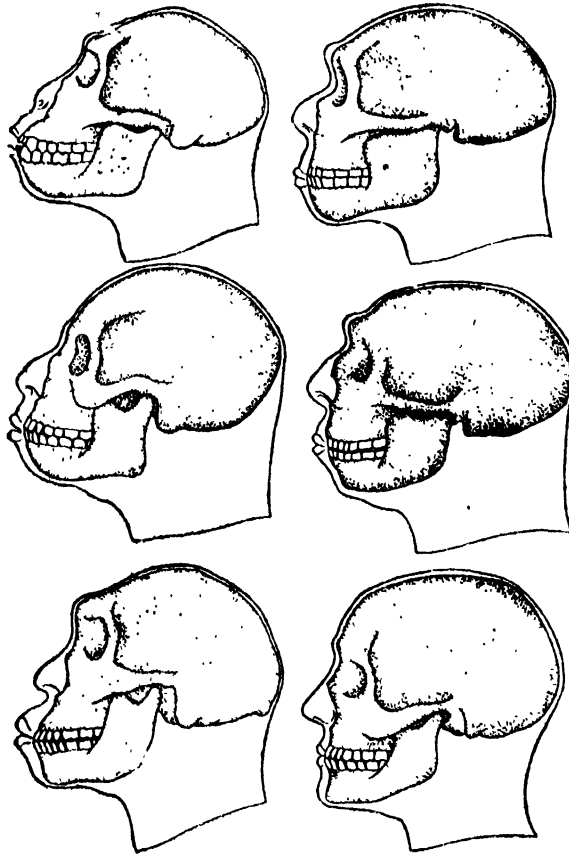
বাঁ থেকে ডানে ক্রমশঃ নীচের দিকে—জাভা ও হাইডেল-বার্গ মানুষ, পিণ্টডাউন ও নিয়েণ্ডারথ্যাল মানুষ, রোডে-সিয়ান ও ক্রোম্যাগ্‌নন্‌ মানুষ।

৪। হাইডেলবার্গ গ্রামে ১৯০৭ সালে ডাঃ অটো সণ্টেনসাক জমির ৮০ ফুট নীচে একটি চোয়ালের হাড় আবিষ্কার করেন।

এই সকল কঙ্কালের সঙ্গে আরো যে সব বস্তু পাওয়া যায় তা' দেখে মনে হয়, এদের মধ্যে কেউ

হয়, তারা গুহার বাসিন্দা ছিলনা। এদের বলা হয় নিয়ানডারথাল মানুষ। এরা ছিল খর্বকায়—চলতো সামনে ঝুঁকে—এদের কপাল ও চিবুক ঢালু। আজকালকার মানুষের মস্তিষ্কের, মতই ছিল এদের মস্তিষ্ক। এদের তৈরী যন্ত্রপাতি এদের পূর্ব-

পুরুষদের যন্ত্র অপেক্ষা উচুদরের। এরা পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস করতো। তার কারণ হাতের কাছে খাদ্য ও যন্ত্রপাতি দিয়ে মৃত দেহকে গোর দিত।

নিয়ান্ডারথাল মানুষ প্রায় ন'লক্ষ বছর ইউ-রোপে রাজত্ব করবার পর আসে—লম্বা, উচু কপাল যুক্ত ও সুস্পষ্ট চিবুকযুক্ত একদল মানুষ। এদের যন্ত্রপাতি ছিল উচুদরের, সভ্যতায়ও ছিল এদের অনেক উন্নত। এদের সঙ্গে বিরোধ বাঁধলে সে সময়কার বাসিন্দারা ইউরোপ ছেড়ে পালালো। এই নতুন মানুষের নাম হলো ক্রোম্যাগনন। এরা এদের সভ্যতার সঙ্গে নিয়ে এলো "রূপের পুজা"। এরা গজদন্তের ও কড়ির গহনা পরে' নিজের অঙ্গ ভুষিত করতো। গুহার দেওয়ালে জন্তু জানোয়ারের রঙ্গীন ছবি আঁকতো। এরাই হলো মানুষের পূর্ণবিকাশের শেষ সীমা।

এরপর কি?

একথার উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। তবে মানুষের ক্রমবিকাশ মানুষের সভ্যতার উপর নির্ভর করে একথা বলা যায়। অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেছেন, মানব সভ্যতা পিছুতে আরম্ভ করেছে। মনে হয় আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে, সেই সঙ্গে যাবে মানুষের বৈজ্ঞানিক উন্নতি। তবে বিজ্ঞানের দিক থেকে মানুষ যা' উন্নতি করেছে তা' যদি বজায় থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি, মানুষ ছিল বানরের মত, মানুষ হয়েছে মানুষের মত এবং হবে দেবতার মত। বিজ্ঞা-নের দৌলতে মানুষের জীবনের কী পরিবর্তন হবে তা' ধারণা করতে পারা যায়না। মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি মাতা দিলেন সভ্যতা। মানুষের পড়লো চাওয়ার পালা। মানুষের আশা আর মিটবেনা, আশা মেটাবার জন্যে মানুষ যে শেষ পর্যন্ত দানবের মত মানুষ হবে না কেউ বলতে পারে না। তবে একটা কথা আমরা নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, ক্রমবিকাশের ফলে মানুষের পরিবর্তন হবে। মানুষ নতুন আকার ধারণ করবে। কিরকম আকার যে ধারণ করবে তা' বলা সম্ভব নয়।

"বাঙলাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙালীকে বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে। যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে। কেহ ইচ্ছা করিয়া শুনুক আর না-ই শুনুক, দশবার বলিলে দুইবার শুনিতেই হইবে।"

"বিদেশী ভাষার সাহায্যে পাঠ্যবস্তুর মধ্যে প্রবেশ, অধিকার প্রবেশ। তাহাতে প্রবেশ ঘটে; কিন্তু অধিকার ঘটে না"

কাঁচ-শিল্প

শ্রীঅমলেন্দ্র নাথ বসু ও শ্রীঅখিলচরণ বসু

অপরিহার্য প্রয়োজনে কাঁচের ব্যবহার মানব সভ্যতার প্রায় প্রারম্ভ হইতেই প্রচলিত আছে। কাঁচ সর্বপ্রথম কি প্রকারে আবিষ্কৃত হয় এবং তারপর এর প্রস্তুত প্রণালী কি করিয়া সকল দেশে ছড়াইয়া পড়ে, সে সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এই বিপুল ইতিহাসের চুম্বকমাত্র দিয়া আপাততঃ আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। প্রাচীন সভ্যতার প্রতিক্ষেত্রে প্রাচ্যদেশ সমূহের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ ও চীনের যে দান, কাঁচ নির্মাণ শিল্পের ক্ষেত্রেও আমরা তাহার প্রভূত পরিচয় পাই। পাশ্চাত্য দেশসমূহে সভ্যতার বিকাশ ঘটিবার বহুপূর্বেই যে ভারতবর্ষ ও চীনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভিত্তিতে কাঁচের নানাপ্রকার সৌখীন দ্রব্য প্রস্তুত হইত সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। চৈনিক কাঁচ-প্রস্তুতকারীরা সেই সুদূর অতীতে বেরিয়ামের ব্যবহার পর্যন্ত জানিতেন। প্রাচীন মিশরীয়েরাও কাঁচ প্রস্তুত করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কিন্তু এমন সকল প্রমাণও আছে যাহাতে মনে হয় যে, মিশরীয় কাঁচ বলিয়া প্রচলিত কাঁচের মধ্যে যে সকল কাঁচ সর্বাপেক্ষা পুরাতন সেগুলি বাণিজ্যসূত্রে ভারতবর্ষ হইতে গৃহীত (১)। এ বিষয়ে অধিক জানিতে ইচ্ছুক পাঠক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে কোন পুস্তক পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন (২)।

কিন্তু অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রেও নায়কত্বের গৌরব আমরা অধিকদিন রক্ষা করিতে পারি নাই। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ অথবা নিজেদের মধ্যে আত্মঘাতী কলহে বিব্রত ভারতবর্ষ ও চীন যখন নানাপ্রকার কালজীর্ণ অন্ধ-সংস্কারকে আকড়াইয়া ধরিয়া বাঁচিয়া থাকিবার মিথ্যা অভিনয় করিতেছিল সে সময় পাশ্চাত্য জাতিসমূহ নানা প্রকার আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সদ্ব্যবহার করিয়া সর্বপ্রকার শিল্পের ক্ষেত্রে 'আপনার নায়কত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, আধুনিক সভ্যতার অগ্রণীদের দৃষ্টিও অন্যান্য বহু শিল্পের পরে কাঁচশিল্পের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। বস্তুতপক্ষে ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে স্কটের সহযোগীতায় অধ্যাপক আবে যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আরম্ভ করেন তাহাই এ বিষয়ে প্রথম প্রচেষ্টা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। আবের মৃত্যুর পরেও স্কট তাঁহার প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন না। উইঙ্কেলম্যানকে সহকর্মী করিয়া তিনি আরব্ধ কার্য সমাপ্তির পথে লইয়া চলিলেন এবং আজ যে আমরা বহু বিভিন্ন চাহিদা মিটাইবার উপযোগী কাঁচ ইচ্ছানুসারে প্রস্তুত করিতে পারি সে জন্য এঁদের নিকট আমরা গভীর ঋণজালে জড়িত। তবে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, উইঙ্কেলম্যান ও স্কটের গবেষণাগার ভিন্ন অন্যত্রও এ বিষয়ে অনুসন্ধান কার্য চলিতেছিল। বোনটেম্পস্, হারকোর্ট ও ষ্টোকস্, ফেইল, বেইলি, মোরে, রাস্, টার্ণার, টিলোটসন প্রভৃতি। কাঁচ শিল্পের আজ যে প্রভূত উন্নতি হইয়াছে তাহা এই অনুসন্ধানকারীদের মিলিত প্রচেষ্টার ফল।

সাধারণ নিত্যব্যবহার্য কাঁচ এদেশে চিরকালই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত বিজ্ঞানের সাধনালব্ধ জ্ঞানের

১। প্রাচীন মিশরে কাঁচ প্রস্তুতের যে সকল চিত্র দেখা যায় তাহাতে কর্মীদের আকৃতি দেখিয়া ভারতীয় বলিয়া বোধ হয়।

২। Morey:—Properties ofl Gass. Hudson & Cousen :—Text book of Glass Technology. এখানে যুধিষ্ঠিরের স্ফটিক সভাগৃহের উল্লেখ করা যায়। খ্রীষ্টের জন্মের ৩-৪ হাজার বৎসর পূর্বে মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীরা কাঁচ প্রস্তুত করিতে জানিতেন। তাহার পাঁচশত হইতে হাজার বৎসর পর ভারতের আর্য অধিবাসীরা কাঁচের ব্যবহার জানিতেন কিনা সে তথ্য ঐতিহাসিকদের চিত্তাকর্ষক হইতে পারে।

সাহায্যে এই শিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের বিশেষ কোন প্রচেষ্টার চিহ্ন দেখা যায় না। অবশ্য মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি একত্রিত হইয়া একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন (৩)। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে পরিকল্পনাকে তাঁহারা বাস্তব ক্ষেত্রে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তথাপি বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ বিদ্যা যে আমাদের শিল্পোন্নতি-প্রচেষ্টার বহুতর সাহায্য করিতে পারে সেই চেতনার প্রাথমিক উন্মেষের পরিচয় হিসাবে এই পরিকল্পনার মূল্য সামান্য নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভের পর কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও ঔষধ প্রস্তুত-কারক তাঁহাদের প্রথম মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। (ইঁহাদের মধ্যে ষ্টাণ্ডার্ড কেমিক্যাল য়্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের ডাঃ হেমেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।) অ্যাম্পিয়ুল প্রস্তুতের উপযোগী অম্ল-ক্ষার নিরপেক্ষ নলের অভাবে যাহাতে এ দেশীয় ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিপন্ন না হয় সেই উদ্দেশ্যে ইঁহারা কলিকাতার সায়েন্টিফিক ইণ্ডিয়ান গ্লাস কোম্পানীকে ঐ প্রকার কাঁচ তৈয়ারী করিতে অনুরোধ করিলেন। (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) বস্তুতপক্ষে প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণের দৃষ্টি পূর্বেই এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছুদিনের মধ্যেই (১৩ই নভেম্বর ১৯৩৯) এঁদের প্রস্তুত নিউট্র্যাল গ্লাস বাজারে বাহির হইল। ইহাই ভারতে প্রস্তুত প্রথম নিউট্র্যাল গ্লাস। সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠানটি এদেশে নানা-প্রকার নূতন ধরণের কাঁচ প্রস্তুত করিবার জন্য অবিরত গবেষণা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে তাঁহাদের এ প্রচেষ্টা বহুলাংশে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। এঁদের প্রস্তুত আর্সেনিক বর্জিত নিউট্র্যাল গ্লাস এবং অম্ল-ক্ষারতাপ প্রতিরোধী কাঁচ এই সাফল্যের জাজ্জ্বল্যমান পরিচয়। আর্সেনিক বর্জিত কাঁচের বিশেষমূল্য পেনিসিলিন আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত আমরা সম্যক রূপে উপলব্ধি করিতে পারি নাই। পরে যখন দেখা গেল যে, কাঁচে আর্সেনিক থাকিলে অন্য সকল প্রকারে সম্পূর্ণ উপযুক্ত অবস্থাতেও পেনিসিলিন অনেক সময়ে জন্মানো যায় না তখন সকলের দৃষ্টি এ দিকে আকৃষ্ট হইল। পাইরেক্স কাঁচ আর্সেনিক বর্জিত বলিয়া বলা হয়। আর্সেনিক ব্যতীত সীসক, বেরিয়াম ও দস্তার নির্বিচার ব্যবহার উচিত কিনা তাহা চিকিৎসকগণকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

প্রধানতঃ এই প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতার ফলেই আজ ভারতবর্ষ হইতে সুদূর ও মধ্যপ্রাচ্যে আবার কাঁচ রপ্তানী হইতেছে।

এখন যদিও ভারতবর্ষে কয়েক প্রকারেরই কাঁচ প্রস্তুত হইতেছে তবুও আজ পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে নির্ভরযোগ্য তথাকথিত দৃষ্টি বা আলোক-বিজ্ঞান সম্মত কাঁচ (যাহা অণুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, বর্ণচ্ছত্রবিশ্লেষক ইত্যাদি যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়।) প্রস্তুতের কোন প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে বলিয়া জানা নাই।

অন্যান্য আর সকল উন্নততর শিল্পের ন্যায় "সন্দর্শক যন্ত্র নির্মাণের উপযোগী কাঁচ" প্রস্তুত করিবার পক্ষেও কতকগুলি বিশেষ বাধা আছে। প্রথমতঃ মৌলিক রাসায়নিক উপাদান সমন্বয়ের পরিমাণের দ্বারা এর বিভিন্ন গুণসমূহ কি প্রকারে নিয়ন্ত্রিত হয় সে বিষয়ে খুব বেশী কিছু জানা নাই। যাঁহারা বা এবিষয়ে জানেন তাঁহারাও সে তথ্য সযত্নে গোপনে রক্ষা করিয়াই চলেন। দ্বিতীয়তঃ নানা প্রকার অতিশয় কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে দৃষ্টি বা আলোক-বিজ্ঞানসম্মত কাঁচ কোন বৈজ্ঞানিক কার্যে ব্যবহৃত হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। কাঁচামালের

৩। হল্যাণ্ড কমিশনের নিকট প্রদত্ত অধ্যাপক নগেন্দ্র চন্দ্র নাগের সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য।

একান্ত বিশুদ্ধতা এবং প্রস্তুত কালে প্রতিপদে নিপুণ তত্ত্বাবধান ব্যতীত এ কার্যে সাফল্য লাভ অসম্ভব। এতদ্ব্যতীত কাঁচ যদি জল বা বাতাসে সহজেই আক্রান্ত হয় তবে সে কাঁচ অব্যবহার্য হইয়া পড়ে। দেখা যাইতেছে যে এদেশে চাহিদার উপযুক্ত দৃষ্টি বা আলোক-বিজ্ঞানসম্মত কাঁচ তৈয়ারীর চেষ্টা করিবার পূর্বে এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা হইবার প্রয়োজন আছে।

গাণিতিক যন্ত্র বিভাগের মিঃ ম্যালকমের অনুরোধে এবং অধ্যাপক নগেন্দ্র চন্দ্র নাগের একান্ত চেষ্টার ফলে ১৯৩৯ সালে বোর্ড অফ সায়েন্টিফিক্ য়্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল রিসার্চ, দৃষ্টি বা আলোক-বিজ্ঞান সম্মত কাঁচের বিষয়ে গবেষণার জন্য আর্থিক সাহায্য দানে স্বীকৃত হন। বার্ণ য়্যাণ্ড কোম্পানীর মিঃ বেইট্স্, যুক্তপ্রদেশের শ্রীযুক্ত ঈশ্বরদাস ভাসনী (ব্যবসায়ের পক্ষ হইতে) এবং লাহোরের অধ্যাপক যোশীকে এ কাজের উপযুক্ত বিবেচনায় কার্যভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত করা হয়। তাপ ও রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া-প্রতিরোধক পদার্থ বিশেষজ্ঞ মিঃ বেইট্স্‌কে লইবার বিশেষ প্রয়োজন আমরা পরে উপলব্ধি করিব। অধ্যাপক যোশী ইতিমধ্যে এক প্রকারের অপটিক্যাল গ্লাস তাঁহার গবেষণাগারে প্রস্তুত করাইয়াছেন। এবং এ বিষয়ে তাঁহার কাজ এই প্রবন্ধ লেখা হইবার সময়ও চলিতেছিল। কাঁচের রাসায়নিক সংগঠন এবং আলোক-রশ্মির প্রতি ইহার ব্যবহারের মধ্যে যে সম্পর্ক তাহা অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে আমরা দুই প্রকারের কাঁচ প্রস্তুত করিয়াছি। কয়লার চুল্লীতে, সংরক্ষক দ্বিতীয় পাত্রের অভ্যন্তরে রক্ষিত ঢাকনাযুক্ত পাত্রে এই কাঁচ প্রস্তুত করা হয়। প্রয়োজন মত ঘুঁটিয়া বিভিন্ন উপাদানকে সমভাবে মিশ্রিত হইবার সুযোগ দিবার বন্দোবস্ত করা হয়।

মিশ্রিত উপাদান সমূহের পরিমাণ হইতে হিসাব করিলে এই কাঁচ দুইটির যে সংগঠন হওয়া উচিত এবং প্রকৃতপক্ষে বিশ্লেষণ করিয়া যে সংগঠন পাওয়া

	Sio_2	Pbo	As_2o_3	Al_2o_3	Bao	Zno	K_2O	Na_2o	B_2O_3
(১)	৩৮ ৭১	২১'০২	০'৫	..	২৫'২	২'৪	৩'২	৭'৪	১'৫২
(২)	৪২'৪	২৪'০	০'৫	সামান্য	২৩'১	২'১	১'৪	৫'০	১'৫

কাঁচ "খ"

	Sio_2	Al_2o_3	As_2o_3	Bao	K_2o	Na_2o	B_2O_3
(১)	৪৯'৮	০'৭৫	০'৭	৩৮'৩৪	৯'৩৬	১'৭	০'৫
(২)	৫০'৯	৩'৫	০'৯	৩৫'৩	৭'৮	০'৯	০'৭

গিয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল (৪)। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যে পরিমাণে উপাদান সমূহ মিশ্রিত করা হইয়াছিল, কাঁচ প্রস্তুতের পর তাহার সহিত যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য থাকিলেও, দুইয়ের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবধানেরও সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য আশ্চর্য হইবার কারণ বিশেষ কিছু নাই। কেন না মূল উপাদানে যে সকল ক্ষার জাতীয় পদার্থ ব্যবহার করা হয় তাহারা পাত্রের দেয়ালকে অল্প বিস্তর আক্রমণ করে। ফলে, কিছুটা ক্ষার পাত্র টানিয়া লয়। তৎপরিবর্তে পাত্র হইতে কিছুটা বালুকা ও এলুমিনিয়াম অক্সাইড কাঁচে আসিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উপায়েও কিছুটা ক্ষার ও বোরিক এসিড নষ্ট হয়। সাধারণ ব্যবহারের জন্য যে কাঁচ তাহার পক্ষে এই পরিবর্তন সাধারণতঃ অগ্রাহ্য করা চলিতে পারে। কিন্তু আলোক বা দৃষ্টিবিজ্ঞান সম্মত কাঁচের বেলায় মৌলিক পরিমাণ হইতে সামান্য পরিবর্তনেও তাহার বিশেষ গুণ সমূহের এত বেশী তফাৎ হয় যে, কোন একটি বিশেষ কাজের পক্ষে কাঁচ একেবারেই অনুপযুক্ত হইয়া পড়িতে পারে। সেই জন্য মূল উপাদান সংমিশ্রণের সময় এই পরিবর্তনের কথা চিন্তা করিয়া মিশ্রিত পদার্থের পরিমাণ কিছুটা পরিবর্তন করিয়া দিতে হয়। এ জন্য অবশ্যই অভিজ্ঞতার দরকার। কিন্তু মিশ্রণকারী যতই অভিজ্ঞ হোন না কেন তিনি যে পাত্রে কাঁচ প্রস্তুত করিবেন তাহা যদি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হয় তবে এই কার্যে সাফল্য লাভ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের "ক" কাঁচ প্রস্তুত করিবার সময় একটি পাত্র এইরূপ একেবারে অকর্মণ্য হইয়া যায়। এই পাত্র প্রস্তুত করিতে যে প্রতিরোধী দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়াছিল তাহা বিশ্লেষণ করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তাহা এখানে দেওয়া হইল (১)। সেই সঙ্গে একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাত্র পরীক্ষার ফলও দেওয়া হইল (২)। কাঁচ গলানোর

	SiO_2	Al_2O_3&Fe_2O_3	CaO	Na_2O	মোট
(১)	৫৫.৯	৩৪.৮	১.৯৫	৫.৫	৯৮.১
(২)	৩৯.৮	৫৯.১	সামান্য	—	৯৮.৯

জন্য পাত্র কিনিবার সময় আমাদের কতটা সাবধান হওয়া উচিত তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এমন কি নিজেদেরও বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য পরীক্ষা (যেমন তাপ সহন ক্ষমতা) করিয়া দেখা উচিত—যে পাত্রটি ব্যবহার করা হইবে তাহা ঐ কাজের উপযোগী কিনা।

যে দুই প্রকারের কাঁচ আমরা প্রস্তুত করিয়াছি প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে তাহাদের কতকগুলির ভৌত-ধর্ম নির্ধারণ করা হইয়াছে। তাহার ফল এখানে সন্নিবেশ করা হইল। যেখানেই সম্ভব গাণিতিক নিয়মের সাহায্যে হিসাব করিয়া এই ফলসমূহের নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা করা হইয়াছে।

৪। কাঁচ প্রস্তুতকালে এবং প্রস্তুতের পরেও ঠাণ্ডা করিবার সময় যদি সাবধানতার সহিত পাত্রের উত্তাপ রক্ষা করা না হয় এবং পাত্রটিকে যদি হঠাৎ ঠাণ্ডা হইতে দেওয়া হয় তবে কাঁচের প্লাষ্টিক গুণ নষ্ট হইয়া যায় এবং বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রাসায়নিক সংগঠন হয়। তাহা ছাড়াও এর অভ্যন্তরে নানাপ্রকার চাপের সৃষ্টি হওয়ায় ইহার উপর পতিত আলোক-রশ্মি পোলারাইজ্‌ড্ হয় এবং এই প্রকার কাঁচে কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক কার্য হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে।

আপেক্ষিক গুরুত্ব :—

	উইঙ্কেলম্যান ও স্বট কতৃক	বেইলী কতৃ´ক	রাস কতৃ´ক	নির্ণীত
কাঁচ 'ক'	৩'৫৯	৩'৬৬	৩'৬৫	৩'৬০
কাঁচ 'খ'	৩'১৫	৩'১১	৩'১৫	৩'২০

'আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ের যে সকল প্রচলিত পন্থা আছে তাছাড়াও পরিবর্তিত সম্পূর্ণ কাচের প্রস্তুত "নিকলসন-হাইড্রোমিটার" নিজেদের পরীক্ষাগারে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়াছি। অতিক্রান্ত সঠিক ফল পাইবার জন্য এর ব্যবহার খুবই সুবিধাজনক।

"খ" কাচের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যে সকল উপায়ে প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয় করা হয় তদ্ব্যতীত অন্য উপায়ও আমরা অবলম্বন করিয়াছি। এই কাচ হইতে একটি প্লেনো-কনভেক্স লেন্স তৈয়ারী করা হয়। লেন্সের ফোক্যাল লেংথ এবং রেডিয়াস যথাক্রমে ৮'২৫ ও ৫'৩ সে-মি।

এই তথ্য হইতে $\frac{I}{f}=(w-1)\left(\frac{I}{r_1}-\frac{I}{r_2}\right)$

এই সূত্রের সাহায্যে ইহার সাধারণ আলোকরশ্মি বক্রীকরণের ক্ষমতা স্থির করা হয়। এই ফল এবং অন্যান্য কর্মীরা প্রায় সমসংগঠনযুক্ত কাচের বেলায় যে ফল পাইয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

	Sio	Bao	Na o	K o	Al o,	Pbo	Zno	B_2O_3	As_2O_3
D=3·22 Q/w =1·56	50	35	7·5	7 5	—				
D=3·23 R w =1·57	50	40	5·0	5 0	-				
D=3·2 OurBa Glass w=1·64	50·9	35·3	0·9	7·8	3·5			0·7	0·9
D3·1 3w=1·57	50	—	10·0	10	—	30			

1 & 2 Morey, Properties of glass, P. P. 381, Table XVI 9 Series 202.

3 Morey, Proporties of glass ; P. P. 380 Series 188.

তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, কাঁচের আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইবার সংগে সংগে তাহার প্রতিসরাঙ্ক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এ কথা কেবল সমসংগঠিত কাচের পক্ষেই প্রযোজ্য।

মৌলিক উপাদান সমূহের তারতম্য ঘটাইয়া এমন দুইটি কাঁচ প্রস্তুত করা যাইতে পারে যাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব এক হইলেও প্রতিসরাঙ্ক বিভিন্ন। উপরের ফল সমূহ অনুধাবন করিয়া দেখিলে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যাইবে। স্পষ্টই দেখা যাইবে যে প্রতিটি উপাদান নিজ নিজ বিশিষ্ট উপায়ে প্রতিসরাঙ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে সঠিক সম্বন্ধ এখনও নির্ণীত হয় নাই। এবং এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

এই প্রবন্ধে যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফল লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা ১৯৪৬ সনে জুন-জুলাই মাসে সমাপ্ত হয়। কিন্তু প্রথমতঃ সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও তৎপর লেখকদের সময় অভাব বশতঃ ইতিপূর্বে ইহার প্রকাশ সম্ভবপর হয় নাই।

মূল্যবান উপদেশ, নিরন্তর উৎসাহ দান এবং নিজস্ব গবেষণাগার ব্যবহার করিতে দেওয়ার জন্য অধ্যাপক নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ, M. A, F. R. I. C. মহোদয়ের নিকট আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ।
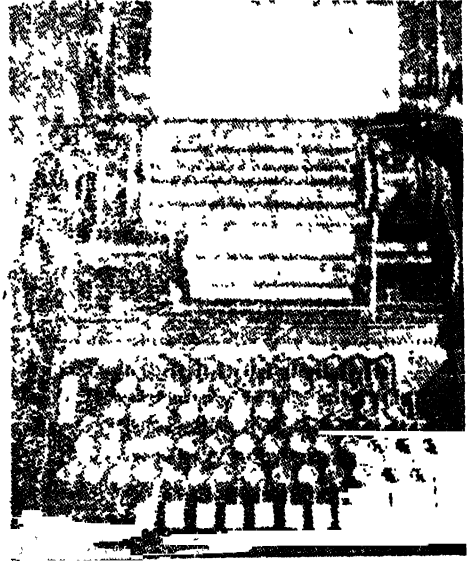
চীনা ভাষার টাইপরাইটার

অনেকের ধারণা যুক্তবর্ণমালার বাহুল্যের জন্যে বাংলা ভাষার টাইপরাইটারের খুবই অসুবিধা। কিন্তু চীনা অক্ষরমালার গুরুতর জটিলতা সত্ত্বেও চীনা ভাষার যে টাইপ-রাইটার তৈরী হয়েছে, তা' আকৃতি, আয়তন ও কর্মকুশলতায় ইংরেজী টাইপরাইটারের মত। যে লেখা নকল করতে লিপিকারের পুরা একদিন লাগে, এই টাইপরাইটারের সাহায্যে তা' এক ঘণ্টায়ই করা যায়। চীনা ভাষায় ঠিক আমাদের মত বর্ণমালা নেই। প্রত্যেকটা শব্দের এক একটা সাংকেতিক চিহ্ন লেখা হয়। লিখতে হয় ডান দিক থেকে বাঁ-দিক তা-ও আবার উপর থেকে নীচে। বিভিন্ন শব্দ জুড়ে যে সাংকেতিক চিহ্ন তৈরী হবে, পরপর দু'টা চাবি টিপলেই যান্ত্রিককৌশলে সেটা টাইপরাইটারের উপর একটা পর্দার গায়ে ফুটে ওঠে। টাইপিষ্ট সেটা দেখে চাবি টিপে শব্দটা ছেপে যায়। ছবির বাঁ-দিকে টাইপরাইটারের মোটামুটি চেহারা, ডানদিকে ভিতরের ব্যবস্থা এবং উপরে— পর্দার গায়ে শব্দের অক্ষর দেখা যাচ্ছে।

ভাণ্ডারদহ বিলে মৎস্য চাষের ভবিষৎ সম্ভাবনা

শ্রীশচীন্দ্র নাথ মুখার্জী

মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগিরথী নদীর প্রায় সমান্তরালে বহরমপুর সহর থেকে ছ' মাইল দূরে আবদ্ধ নদীর মত একটি জলাশয়ের নাম ভাণ্ডারদহ বিল। এই ভাণ্ডারদহ বিলের মাছ অনেকদিন থেকেই কিছু কিছু কলকাতায় চালান যায়; বাকী স্থানীয় চাহিদা মেটায়। লালবাগ (নবাবী আমলের রাজধানী) বহরমপুর, বেলডাঙ্গা প্রভৃতি সহরের এবং বিলের নিকট গ্রামগুলির চাহিদার বেশীরভাগ এই বিলের মাছ থেকেই পূরণ হয়। বর্তমানে এর উৎপাদনকে বাড়াবার বিরাট সম্ভাবনা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

ভাণ্ডারদহ বিল সরকারী নক্সা গুলিতে গোবরা নালা নামে অধিক পরিচিত। অন্যান্য সাধারণ বিলগুলি যেমন ঘোড়ার খুরের মত হয় ভাণ্ডারদহ বিল সেরূপ নয়। আকৃতি দৃষ্টে মনে হয় যেন হঠাৎ কোন নদীর উপর ও নীচের দিক একসঙ্গে নষ্ট হয়ে যাওয়াতে এই বিরাট জলাশয়টি আবদ্ধ থেকে গিয়েছে। লালবাগ সহরের পূর্বথেকে সুরু করে দক্ষিণমুখে এই জলাশয় প্রায় বেলডাঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত ও রীতিমত গভীর। সরকারী সেচবিভাগ থেকে কয়েকবৎসর পূর্বে খাল কেটে পদ্মা নদীর সঙ্গে এর যোগাযোগ করা হয়েছে। একটি রেগুলেটারের মধ্যে দিয়ে প্রতি বর্ষার পরিমিত জল নেওয়া হয়, প্রধানতঃ কচুরীপানা স্রোতে বার করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। নীচের দিকে ছোট ভৈরব নদীর একটি শাখা,' যা' পূর্বে রামডহরা নামে প্রচলিত ছিল এবং এখন যাকে সেচবিভাগ ছোট 'ভৈরব নদী' বলেন, এর সঙ্গে যোগ হয়েছে ও পরে একসঙ্গে জলঙ্গী নদীতে বালী টুঙ্গীর কাছে মিশেছে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের মতে ভাগিরথীই পূর্বে গঙ্গা বা পদ্মানদীর মূল জলপ্রবাহ নালা ছিল এবং কালে পদ্মানদীর পূর্ব মুখী অভিযানে যে বিভিন্ন নদীপথ সৃষ্টি হয়েছিল ভাণ্ডারদহ বিল সেইরূপ একটি পরিত্যক্ত জলপথ। কিন্তু বিখ্যাত বাস্তুকার উইলকক্স সাহেবের মতে ভাণ্ডারদহ বিল ভাগিরথী, ভৈরব, জলঙ্গী, মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি নদীর মতই পুরাকালের অদ্ভুতকর্মা বাস্তুকারদেব কীর্তি, অর্থাৎ প্রত্যেকটিই তাঁদের কাটানো খাল। কোন্ মত ঠিক বলা কঠিন। উইলকক্স সাহেবের মত কোণঠাসা হয়ে গিয়ে থাকলেও বর্তমানে নলকূপ বসাতে গিয়ে জেলার বিভিন্ন স্থানে মাটির স্তরগুলির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তাঁর মতকে একেবারে ফেলে দেওয়া যায় না।

ভাণ্ডারদহে মাছের চাষের সম্ভাবনার কথা আলোচনা করতে গিয়ে আপাতঃদৃষ্টিতে এসব কথার অবতারণা অবান্তর মনে হতে পারে। কিন্তু নদী-নালাগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে যদি একটা সিদ্ধান্তে আসা না যায় তবে অচিরেই হয়ত এই জলাশয়টিকে নদী বা নালারূপে উদ্ধার (?) করে এর বিরাট মৎস্য উৎপাদন সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেওয়া হবে। গঙ্গানদীতে বাঁধ দিয়ে ভাগিরথী প্রভৃতি নদীগুলির উন্নতিসাধন করার চেষ্টা চলেছে; গোবরা নালার উন্নতি পরিকল্পনায় মৎস্য উৎপাদনের আলোচ্য সম্ভাবনা বিবেচিত হবে বলে আশা করা যায়।

মাছ-চাষের দিক দিয়ে গোবরা নালায় বিশেষ সুবিধার কথা এই যে, এটি একটি আবদ্ধ জলাশয়ের মত। বর্ষার সময় পদ্মা থেকে পরিমিত জল নেওয়া হয় বটে, কিন্তু মূল প্রশস্ত ও গভীর' বিল থেকে রেগুলেটার অনেক দূরে হওয়ায় ও যোগাযোগকারী নালাটি অপ্রশস্ত ও অগভীর হওয়ায় মাছ মূল বিলেই

থেকে যায়। ঠিক সেই রকমেই দক্ষিণদিকে অগভীর ও অপ্রশস্ত হয়ে যাওয়াতে মাঝের এই বিরাট লম্বা, গভীর ও প্রশস্ত জলাশয়টি থেকে মাছ নীচের দিকে বড় একটা যায় না। উপরন্তু বর্তমানে জাল দিয়ে মাছের দক্ষিণমুখী গতি অবরুদ্ধ রাখা হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনায় এই ব্যবস্থার একটি নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক উপায় করা প্রয়োজন। বর্তমান ব্যবস্থা মন্দ নয়। এখন আসল প্রয়োজন এই বিরাট জলাশয়টিতে মাছ ছাড়া ও পালন করা। নদীর মত বিরাট এই জলাশয়ে মাছ ছাড়া ও পালন করার প্রস্তাব অবাস্তব নয় একথা বিশেষজ্ঞ মাত্রেই জানেন। আমেরিকায় উন্মুক্ত নদীতে এই ব্যবস্থায় আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও যে উন্মুক্ত নদীতে একই ব্যবস্থায় বিশেষ সুফল ফলবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকার কারণ নেই। গরম দেশে মাছ দ্রুত বাড়ে, আমাদের দেশে মৎস্যউৎপাদন বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা প্রচুর। পাশ্চাত্যদেশের দৃষ্টান্তে উন্মুক্ত নদীতে মাছের চাষ করতে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যদি আমাদের নবীন রাষ্ট্রের না—হয় তবে এই ভাণ্ডারদহ বিলে আমাদের অনভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞদের হাত পাকিয়ে নেবার সুযোগ দেওয়া উচিত। বিলের আয়তন দৃষ্টে বিশেষজ্ঞ মাত্রেই বুঝতে পারবেন যে, এই বিলে যে পরিমাণ মাছ উৎপাদন সম্ভব তাতে সমগ্র কলকাতা সহর ত' বটেই উপরন্তু ভাগিরথীর উভয় কূলবর্তী কারখানা বহুল-অর্থাৎ জনবহুল সহরগুলিকে পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছ সরবরাহ করা কঠিন হবে না।

পরিকল্পনার বাস্তব দিকটা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে তৈরী করান উচিত। তবে তাঁদের অবগতির জন্য কয়েকটি তথ্য জানাচ্ছি। এই বিলের জল কখনও কূল ছাপিয়ে ওঠে না। এখানে এখনই বিভিন্ন স্থানে জমিদারদের কাছ থেকে জমা বন্দোবস্ত নিয়ে ধীবররা প্রচুর মাছ ধরে। বর্তমানে কোন আবাদ করা হয় না, অর্থাৎ মাছের পোনা ছাড়া হয় না। রুই, কাতলা, মৃগেল প্রভৃতি বড় মাছ ছাড়া খয়রা, গলদা চিংড়ি প্রভৃতিও প্রচুর হয়। বহরমপুর সহর থেকে জলঙ্গী থানায় যাওয়ার উত্তর পূর্বমুখী একটি পাকা রাস্তার ৯ মাইলে ও নওদা থানা যাওয়ার দক্ষিণ পূর্বমুখী আর একটি পাকা রাস্তার ৭ মাইলে এই বিল পাওয়া যায়। দুটি যায়গাতেই রুই প্রভৃতি মাছের ডিম থেকে বা ছোট পোনা থেকে বড় পোনা তৈরী করার জন্য অগভীর পুষ্করিণী বা খাদের জন্য প্রয়োজনীয় জমির অভাব নেই। বহরমপুর সহরে এ সময় বা পরেও প্রচুর পোনা পাওয়া যায়। লালগোলাতে পদ্মা নদীতে আষাঢ় মাসের প্রথম থেকেই মাছের ক্ষুদ্রতম পোনা পাওয়া যায়। বিলের পূর্বদিকে ৮।১২ মাইল দূরে ভৈরব নদী, এই নদীতে প্রচুর পরিমাণে গলদা চিংড়ির পোনা পাওয়া যায়। আশা করা যায়, এই তথ্যগুলি থেকে বিশেষজ্ঞগণ বুঝতে পারবেন যে ব্যাপারটি আশু প্রনিধাণযোগ্য।

মাছের যে রকম অনাটন তাতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ না করলে এবং মাছ ধরা ও চালানের ব্যাপারে আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার না করলে অবস্থার কোন উন্নতি হবার সম্ভাবনা ত' নেই-ই উপরন্তু অবনতির বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে। ভাণ্ডারদহ বিলের বিভিন্ন স্বত্বগুলি জাতীয়করণ করা প্রয়োজন। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ করে নার্সারী, পুষ্করিণী প্রভৃতি দ্বারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে পোনা মাছ লালন-পালন করা ও উপযুক্ত সময়ে সেগুলি বিলে ছাড়া প্রয়োজন। নির্দিষ্ট দরে মাছ বিক্রি করার জন্য ধীবরদের সমবায় সমিতি গঠন করে সমিতিকে মাছ ধরার ইজারা দেওয়া, আধুনিক সাজ সরঞ্জাম দেওয়া ও চালানের জন্য দ্রুত যানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। •

সমুদ্রে মাছ ধরে' সেই মাছ দিয়ে কলকাতার চাহিদা মেটানোর প্রস্তাব বহু পুরাণো। কয়েক-বার চেষ্টা করা সত্বে এখনও তা' সফল হয়নি। উন্মুক্ত নদী-নালায় মাছের চাষ পাশ্চাত্য দেশে করা হয়; এখানে এখনও চেষ্টাই হয়নি। এর সুবিধা অনেক, অসুবিধাগুলো হাতে কলমে কাজে

নেমে জানা যাবে। তবে ভাণ্ডারদহ বিলে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা যে আছে আর তাতে করে মোট-মাট সুবিধাই প্রবল,—আশাকরি, বিশেষজ্ঞরা এতে একমত হবেন। এই প্রস্তাবে বর্তমানে ট্রলার, রেফ্রিজারেটার প্রভৃতি না হলেও চলবে; এটা একটা মস্ত সুবিধা। আরও সুবিধা এই যে, প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ সুরু কর্তে অতি অল্পসময়ই লাগবে। বর্তমানে বিভিন্ন স্বত্বগুলি খাস করা, সমবায় সমিতি গঠন করে নির্দিষ্ট দরে বিক্রয় করা হবে এই সর্তে সমিতিকে মাছ ধরার ক্ষমতা ইজারা দেওয়া, কয়েকটি অগভীর পুষ্করিণী খনন করা, স্থানীয় পোনা সংগ্রহ করে পুষ্করিণী গুলিতে ছাড়া ও কয়েকমাস পরে সেগুলি বিলে ছাড়া—এই ধারা অনুযায়ী কাজ অতি শীঘ্রই সুরু করা যেতে পারে।
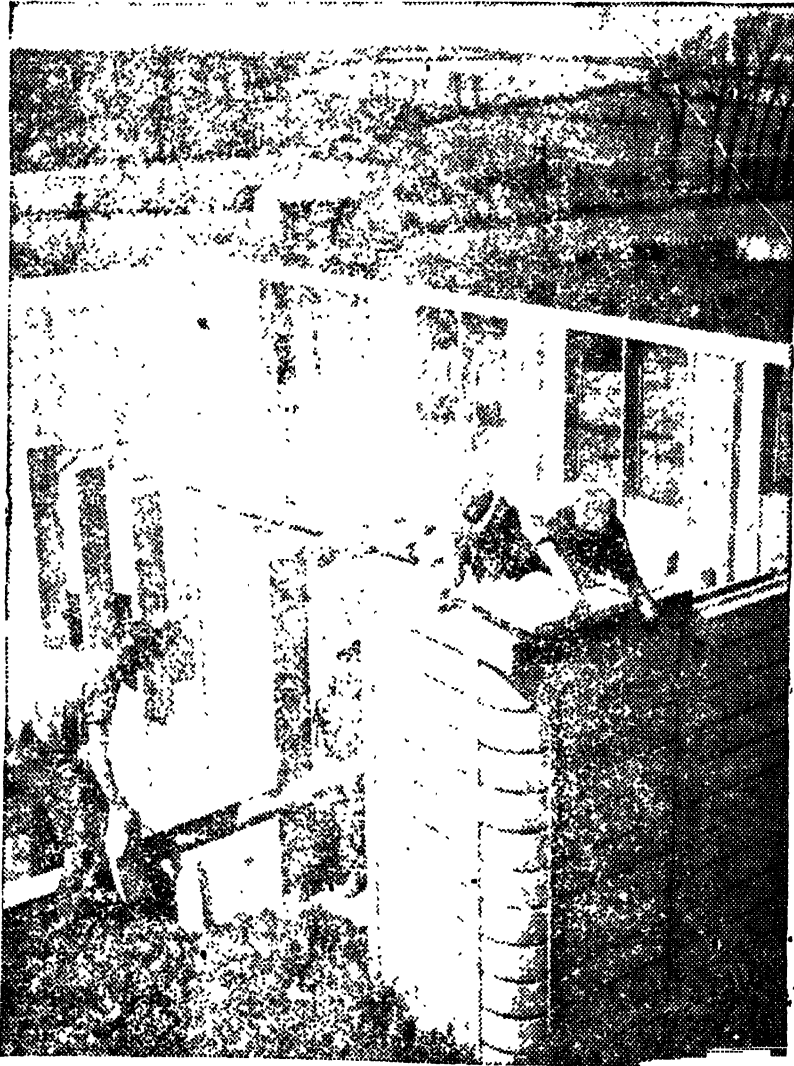
ভাঙা চীনামাটির বাসন-কোসন ও অন্যান্য আবর্জনার সংগে সিমেণ্ট মিশিয়ে 'তৈরী ইটের বাড়ীর দৃশ্য। 'বি, আই, এস' এর সৌজন্যে।
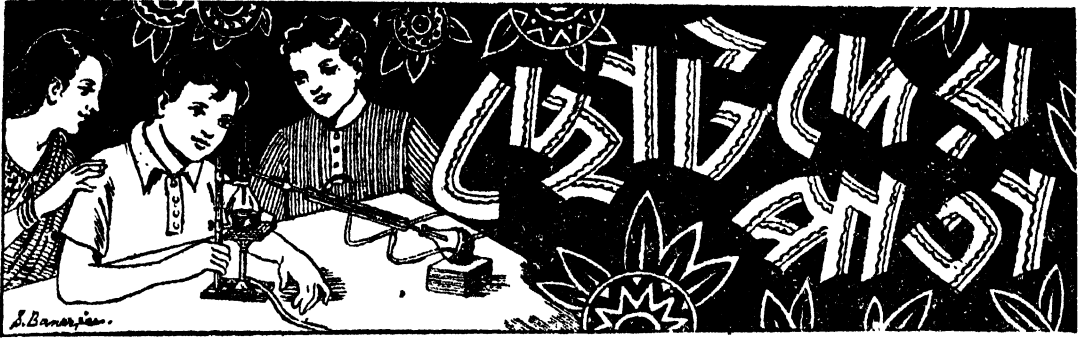
"ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে"

নবলব্ধ স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষার গুরু দায়িত্ব আমাদিগকে বহন করতেই হবে। তোমাদের উপরই জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। স্বাধীনতার অরুণ আলোক তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছে—ওঠো, জাগো, যাত্রা সুরু কর। অতীতের গৌরবোজ্বল ঐতিহ্য, সংস্কৃতির কথা স্মরণ করে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে জয়-যাত্রা সুরু কর। এই জয়-যাত্রায় তোমাদিগকে উদ্বোধিত করবার জন্যেই "জ্ঞান ও বিজ্ঞানের" আবির্ভাব ঘটেছে। তোমাদের অনেকের হয়তো ধারণা—বৈজ্ঞানিক ব্যাপারগুলো যেমন নীরস তেমনই দুর্বোধ্য ; কিন্তু একবার মন দিয়ে এর মধ্যে প্রবেশ কর, দেখবে—দুর্বোধ্য এতে কিছুই নেই, যেমন সহজ তেমনি আনন্দদায়ক। তোমাদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা জাগ্রত করবার জন্যে শিল্প-বিদ্যা, যন্ত্র-বিজ্ঞান, কারিগরী-বিদ্যা এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গবেষণার বিষয় ক্রমে ক্রমে এবিভাগে প্রকাশিত হবে। এ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে তোমাদের কৌতূহল কিছুটা পরিতৃপ্ত হতে পারে। আশা করি, এ প্রচেষ্টার পরিপূরকরূপে বড়রাও তোমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।
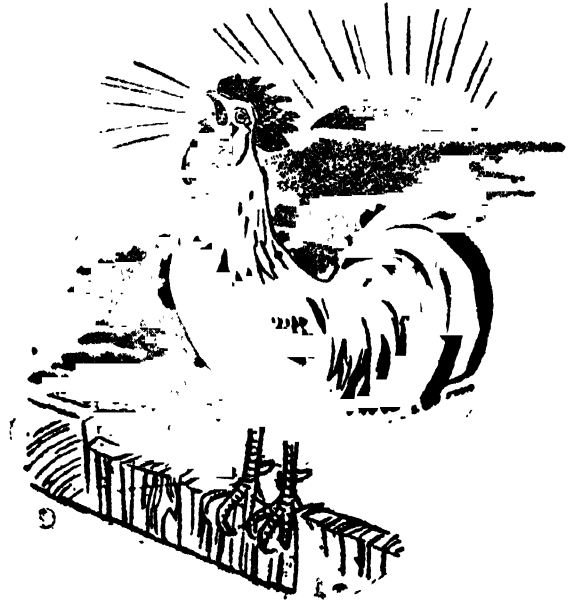
ছোটদের পাতা

কয়েকজন বিজ্ঞানের ছাত্র জানিয়েছে যে, তারা লেবরেটরীর সহায্য নিয়ে "ছোটদের পাতায়" প্রকাশিত ফোয়ারা ও স্বয়ংক্রিয় কাচ-গোলক প্রভৃতি কয়েকটি জিনিষ সুন্দরভাবে তৈরী করতে পেরে বিশেষ উৎসাহিত হয়েছে এবং অনুরোধ করেছে, নেহাৎ ছোট ছেলেমেয়েদের খেলনার ব্যাপারগুলো কমিয়ে দিয়ে ওই ধরণের কিছু কিছু জিনিষ তৈরী করবার কথা যেন প্রকাশ করা হয়। এজন্যেই এবার কয়েকটা জিনিস তৈরী করবার কৌশল জানিয়ে দেওয়া হলো এবং ভবিষ্যতে আরও পরিকল্পনা দেওয়া হবে। তবে নেহাৎ ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্য মাঝে মাঝে দু'একটা ছোটখাট বৈজ্ঞানিক খেলার কথাও প্রকাশিত হবে।

করে দেখ

(১)

কলের পাখী

সবাই তোমরা এরোপ্লেন দেখেছ। অনেকটা পাখীর মত দেখতে হলেও এরোপ্লেন কিন্তু পাখীর মত ওড়ে না। এরোপ্লেন বাতাসের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায় প্রোপেলারের টানে। এরোপ্লেনের সামনে বৈদ্যুতিক পাখার মত জিনিষটাই—প্রোপেলার। আর পাখীরা আকাশে উড়ে বেড়ায়—ওপরে নীচে ডানা আন্দোলন করে'। তোমরা অনেকেই হয়তো খেলনা এরোপ্লেন তৈরী করেছ; কিন্তু পাখীরা যেমন করে আকাশে ওড়ে ঠিক তেমন কায়দায় কোন ওড়বার যন্ত্র তৈরী করেছ কি? ঠিক পাখীর মত আকাশে উড়ে বেড়াতে পারে এরকমের খুব সহজ একটা যন্ত্র তৈরী করবার কৌশল বলে দিচ্ছি। ছবিটা ভালকরে দেখে আনায়াসে এরকমের একটা কলের পাখী তৈরী করতে পারবে।

ছবিটাকে ভাল করে' দেখে নাও। উপরের 'ক' চিহ্নিত ছবিটাতে কলের পাখীর পুরোপুরি নমুনা দেওয়া হয়েছে। কি কৌশলে 'ক' চিহ্নিত পাখীটা ডানা কাঁপিয়ে বাতাসে উড়বে, 'খ' চিহ্নিত চিত্রে সেটা একটু বড় করে পরিষ্কার ভাবে দেখানো হয়েছে। একটু ভাল করে লক্ষ্য করলে ছবি থেকেই কৌশলটা বুঝতে পারবে। প্রথমে খানিকটা লম্বা, খর, প্রায় দেড় ফুট একটা মোটা তার সোজা করে নাও। এই লম্বা তারটার একদিকে ইংরাজী Y অক্ষরের মত দু'টা খুঁটি বসাতে হবে।

(ছবির ৫নং দেখ)। ১নং এবং ২নম্বরের ডানার ফ্রেম দু'টাকে ৫ নম্বরের খুঁটির দু'টা বাহুর সংগে সামান্তরালে বসানো দু'খণ্ড সোজা তারের উপর এমন ভাবে বসিয়ে দাও যাতে ডানা দু'টা অতি সহজেই উচু, নীচু ওঠানামা করতে পারে। ৫ নম্বরের খুঁটি দু'টার একটু নীচের দিকের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ৬ নম্বরের মত উভয়দিকে সমকোণে বাঁকানো একটা তার গলিয়ে দাও। এই তারটার সামনের দিকে আর একটা শক্ত তার সমকোণে হাতলের মত জুড়ে দিতে হবে। ছিদ্রের মধ্য দিয়ে গলানো ওই তারটার পিছনের দিকটা হবে হুকের মত
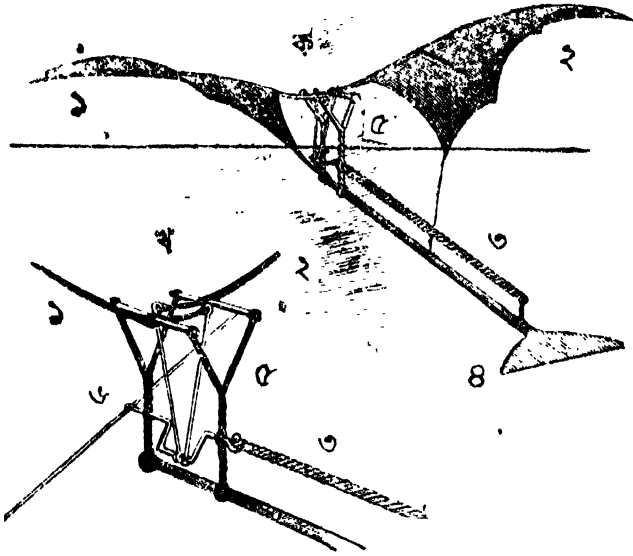
কলের পাখী

বাঁকানো। এই হুকটার সংগে সংলগ্ন দু'গাছা বা চারগাছা সরু রবারের ব্যাণ্ড, ফ্রেমের শেষ প্রান্তে আর একটা শক্ত হুকের সংগে আটকানো থাকবে। (চিত্রের ৩নং দেখ) ১নং ও ২নং ডানার ফ্রেমের গোড়ার দিকের দু'প্রান্ত, ৬নং তারের মধ্যেকার ভাঁজের সংগে দু'দিক আংটির মত বাঁকানো ছোট্ট দু'টি সোজা তার দিয়ে ছবির মত করে' সংলগ্ন করে' দেবে। ডানার কাঠামোটাকে এবার সেলোফেন বা কলোডিয়ন বেলুনের পাতলা পর্দা দিয়ে মুড়ে দাও। সেলোফেন মোড়া ডানা দু'টার চওড়া দিকের মুক্ত প্রান্ত সূতা দিয়ে ফ্রেমের সংগে বাঁধা থাকবে। ফ্রেমটার শেষের দিকে থাকবে ৪নম্বরের মত পাতলা লেজ।

এভাবে যন্ত্রটা তৈরী করবার পর ৬নম্বরের হ্যাণ্ডেলটাকে যেকোন একদিকে কয়েক পাক ঘুরিয়ে দিলেই রবারের ব্যাণ্ডগুলো দড়ির মত পাকিয়ে যাবে। এঅবস্থায় যন্ত্রটাকে একটু হেলানোভাবে আকাশের দিকে ছেড়ে দিলেই দড়ির পাক খোলবার সংগে সংগে ৬ নম্বরের তারটাও ঘুরে' খাড়া তার দু'টার সাহায্যে ডানা দু'টাকে ঠিক উড়ন্ত পাখীর ডানার মত উপরে নীচে আন্দোলিত করতে থাকবে। ফলে, যন্ত্রটা ঠিক পাখীর মতই আকাশে উড়ে যাবে। অবশ্য যতক্ষণ দম থাকবে ততক্ষণই মাত্র উড়তে পারবে। ভারী জিনিষ নিয়ে বেশীক্ষণ দম রাখবার উপযুক্ত হাল্কা মোটর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে পারলে তোমরাও এভাবে অনায়াসে পাখীর মত আকাশে উড়ে বেড়াতে পার।

(২)

পিস্তল—ধনুক

ছবিটা দেখলেই বুঝতে পারবে ব্যাপারটা কি। সাধারণ ধনুককে পিস্তল বা বন্দুকের মত ব্যবহার করবার জন্যেই এব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ধনুক ঠিক পিস্তলের মত এক হাতে বা বন্দুকের মত দু'হাতেও ছোড়া যায়। এর পাল্লাও বড় কম নয়। ছোট, বড়, সব রকম শিকারকে অব্যর্থ লক্ষ্যে ঘায়েল করা যায়। এর নির্মাণ-কৌশল সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। ধনুকটা যত বড় হবে তদনুযায়ী একখানা সরু লম্বা কাঠের উপর-দিকে, বরাবর লম্বা খাঁজ কেটে নাও। ধনুকটা কাঠখানার সম্মুখভাগে শক্ত করে আঁটা থাকবে। কাঠখানার পিছনের দিকে পিস্তলের মত বাঁট করে নাও। কাঠ-খানার পিছনদিকে, বাঁটের কাছে, ওপর-নীচে, এফোঁড় ওফোঁড় করে একটা ছিদ্র কর। ছিদ্রটা এমন হবে যেন মোটা পেরেকের মত একখণ্ড লোহার তার আলতোভাবে তারমধ্যে ঢুকে যেতে পারে। লোহার তারের বদলে ছবির মত পাতলা একখণ্ড লোহার পাতও বসাতে পার। গায়ে জড়ানো স্প্রিঙের সাহায্যে এই তার বা পাতটা কাঠের ছিদ্রের মধ্যে এমন ভাবে বসানো থাকবে যে, উপর থেকে টিপলেই নীচে নেমে যায়, আবার ছেড়ে দিলেই খানিকটা উপরে উঠে আসে। এই লোহার তারটার উপরের দিকটা থাকবে, ইংরেজী U অক্ষরের মত চেরা। কাঠখানার নীচের দিকে, বাঁটের কাছে, পিস্তল বা বন্দুকের টিগ্রার বা ঘোড়ার মত একটা ঘোড়া বসাও। ছিদ্রের মধ্য দিয়ে গলানো তারটার নীচের প্রান্তভাগ ঘোড়ার সংগে কব্জার মত করে এমনভাবে সংলগ্ন থাকবে যে, ঘোড়াটাকে পিছনদিকে একটু টানলেই তারটা ছিদ্রের খানিকটা নীচে চলে আসে। আবার ঘোড়া ছেড়ে দিলেই উপরে উঠে যায়। এবার ধনুকের ছিলাটাকে টেনে এনে ঘোড়া সংলগ্ন ওই তারটার পিছনদিকে পরিয়ে দাও। তীরের লেজটাতেও একটু খাঁজ কাটা থাকবে। তীরটাকে লম্বা কাঠের খাঁজের মধ্যে বসিয়ে লেজটাকে তারের U অক্ষরের মত ফাঁকের ভিতর দিয়ে ছিলার সংগে লাগিয়ে দাও। এবার লক্ষ্য স্থির করে ঘোড়া টিপলেই, তীর ছুটে বেরিয়ে যাবে। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, আরও অন্যান্য কৌশলেও এরকমের ধনুক তৈরী করা যায়।
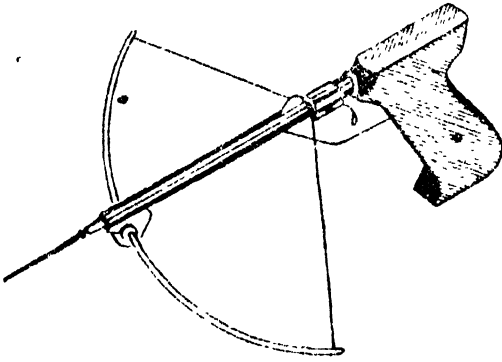
পিস্তল-ধনুক

(৩)

ইলেকট্রিক বেল

বাড়ীর ভিতরে তোমার ঘরে আছে—একটা ইলেকট্রিক বেল, আর সদর দরজায় আছে, সুইচের মত একটা বোতাম। সদর দরজায় এই বোতাম টিপলেই তোমার ঘরে ইলেকট্রিক বেল বেজে উঠবে এবং তুমি বুঝতে পারবে, বাইরে কেউ তোমাকে ডাকছে। কেমন করে' এই বেল তৈরী করতে হয় বুঝিয়ে বলছি। এই বেল তৈরী করা খুবই সহজ। মাত্র কয়েকটা ছোটখাট জিনিষের দরকার! সূতা জড়ানো বা এনামেলকরা হাত পঁচিশেক ২৮ নং তামার তার, সাইকেলের বেলের উপরকার একটা বাটি, U অক্ষরের মত-বাঁকানো একটা নরম লোহার শিক (ইস্পাতের নয়), ঘড়ির কয়েক টুকরা ভাঙা স্প্রিং আর আধ ইঞ্চি পুরু, ৭.৮ ইঞ্চি লম্বা, তিন ইঞ্চি কি সাড়ে তিন ইঞ্চি চওড়া একখণ্ড কাঠ এবং কয়েকটা স্ক্রু জোগাড় করতে হবে। এবার ছবিটা ভাল করে দেখ। ছবির মত করে' জিনিষগুলোকে যথাস্থানে বসাতে হবে। প্রথমে U অক্ষরের মত বাঁকানো ২নং লোহার শিকটার দু'দিকে ১,১ নম্বরের দু'টা সুতার কাটিম বসাও, তারপর ২৮ নম্বরের তারটাকে দু'দিকে দু'টা লম্বা মুখরেখে কাটিম দু'টার গায়ে ছবির মত করে জড়িয়ে দাও। পঁচিশ হাত তারের অর্ধেকটা জড়াবে একটা কাটিমে, বাকী অর্ধেকটা জড়াবে অপর কাটিমে। প্রথম কাটিমটাতে ডান পাক দিলে দ্বিতীয়টাতে দিবে বাঁ-পাক। এবার U অক্ষরের মত লোহার গায়ে তার জড়ানো সব জিনিষটাকে ছবির মত করে' কাঠ খানার উপর আটকে দাও। কাঠের উপর ৩ নম্বরের পাতের মত একটা স্প্রিং স্ক্রু দিয়ে বসাও। আর একটু উপরে ৫ নম্বরের মত স্প্রিং এঁটে দাও। এই স্প্রিঙের মাথাটা ৭ নম্বর স্থানে ৩ নম্বর পাতটার গায়ে লেগে থাকবে। ১,১ নম্বর কাটিমের তারের একটা মুখ ৬ নম্বর স্ক্রুর সংগে এবং অপর মুখটা ৩ নম্বর পাতটার সংগে জুড়ে দাও। এবার ৫ নম্বরের স্প্রিঙের সংগে একটু তার দিয়ে ৮ নং স্ক্রু যোগ করে দাও। ৩ নম্বরের পাত খানার সংগে একটু তার ঝালাই করে ৪ নম্বর হাতুড়ি বসাতে হবে। ছোট্ট একটু কাঠের খুঁটির উপর ৯ নম্বরে সাইকেলের বেলের বাটিটা বসাও। এবার ১,১ নম্বর তারের দু'টা মাথা ছোট্ট একটা ড্রাই-ব্যাটারির (এগুলো সস্তা দরেই বাজারে
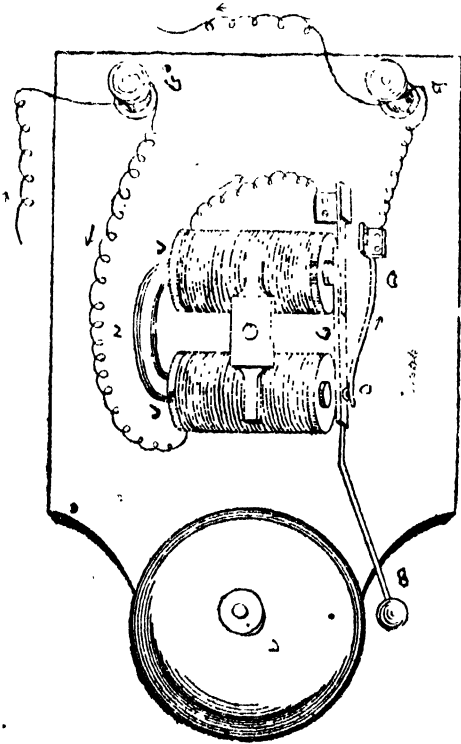
ইলেকট্রিক বেল

কিনতে পাওয়া যায়) দু'টা মুখের সংগে জুড়ে দিলেই বেলটা বেজে উঠবে। ৮ নং এবং ৬ নম্বরের তার দু'টাকে যতদূর প্রয়োজন বাড়িয়ে নিতে পার। এই দু'গাছা তারের যে কোন একটার সঙ্গে একটা স্প্রিঙের সুইচ বসিয়ে দেবে। সুইচের বোতাম টিপলেই ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে থাকবে। ছেড়ে দিলেই বিদ্যুত চলবার রাস্তা কাটা পড়বে, আর ঘণ্টা বাজবেনা।

কেমন করে' ঘণ্টা বাজে এবার সেকথা বলছি—সুইচের বোতামটা টিপলেই বিদ্যুৎ চলবার কাটা রাস্তা জুড়ে যায়। তখন ব্যাটারী থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহ ৬ নম্বরের তার দিয়ে বাঁকানো লোহার গায়ে কাটিমে জড়ানো তারের মধ্য দিয়ে ৩ নম্বরের পাতে উপস্থিত হয় এবং সেখান থেকে ৭নম্বরের সংযোগ-স্থল দিয়ে ৮ নম্বর তারের রাস্তায় পুনরায় ব্যাটারীতে ফিরে যায়। যতক্ষণ কাটিমের তারের মধ্যদিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলতে থাকে ততক্ষণই ওই বাঁকানো লোহাটা চুম্বকের গুণ লাভ করে, বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হবার সংগে সংগেই লোহাটার চুম্বকের গুণও বন্ধ হয়ে যায়। কাজেই কাটিমের তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলবার সংগে সংগেই বাঁকানো লোহাটা চুম্বক শক্তিবলে ৩ নম্বরের লোহার পাতখানাকে নীচের দিকে টেনে আনে, এতেই বেলের উপর হাতুড়ির ঘা পড়ে। ফলে, ৭ নম্বরের সংযোগ-স্থলে ফাঁক হয়ে পড়ে! এই ফাঁক হওয়ার অর্থ, বিদ্যুত চলার রাস্তা কেটে যাওয়া অর্থাৎ বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হওয়া। প্রবাহ বন্ধ হওয়ামাত্রই লোহার চুম্বকশক্তিও লোপ পায়, কাজেই সংগে সংগে ৩ নম্বর পাতখানাকেও ছেড়ে দেয়। ৩নং পাতখানা ছাড়া পেয়েই আবার ৭নম্বরে সংযোগ সাধন করে। তৎক্ষণাৎ আবার বিদ্যুৎ চলতে থাকে। আবার ২নং চুম্বক, ৩ নম্বরের পাতখানাকে টেনে নিয়ে বিদ্যুতের রাস্তা বিচ্ছিন্ন করে। এভাবে অনবরত ফাঁক ও সংযোগ হতে থাকে এবং ঘণ্টাও বাজতে থাকে। গ, চ, ভ,

জেনে রাখ

ষ্টীম টারবাইন

গত মাসে এবিভাগে তোমাদিগকে স্টীম এঞ্জিনের কথা বলা হয়েছিল। এবার তোমাদিগকে স্টীম টারবাইনের কথা বলবো। টারবাইন কথাটার অর্থ হলো—ঘূর্ণীবায়ু। স্টীম বা বাষ্পের ধাক্কায় যে যন্ত্র ঘূর্ণীবায়ুর মত জোরে ঘুরতে থাকে তাকে বলা হয়—স্টীম টারবাইন। স্টীম এঞ্জিন ও স্টীম টারবাইন একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্তু উভয়ের চলবার কৌশল বিভিন্ন। স্টীম এঞ্জিনের মোটামুটি বিবরণ থেকে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ—অনেক রকম যান্ত্রিক-কৌশলের ব্যবস্থা করে' বাষ্পের সাহায্যে কাজ আদায় করে নেওয়া হয়। কিন্তু স্টীম টারবাইনে স্টীম এঞ্জিনের মত অত জটিল কল-কৌশলের বালাই নেই। খুব সহজ উপায়ে ঘুড়ির লাটাইয়ের মত লৌহ-নির্মিত বিরাট এক একটা পদার্থ বাষ্পের ধাক্কায় ঝড়ের মত ঘুরে যাচ্ছে। সহরের মত বিরাট এক একটা জাহাজকে টারবাইন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—অথচ তার কল ঘরে ঢুকে' দেখ—একটানা

একটা মিহি-সুরের মত শব্দ ছাড়া আর কিছুই তোমার কানে যাবে না। তাছাড়া কোন যন্ত্রপাতিরও ঝামেলা নেই। আর যেসব যান-বাহন, কল-কারখানা স্টীম এঞ্জিনের সাহায্যে চলে, তাদের কল-ঘরে ঢুকে দেখ, মনে হবে, যেন শত সহস্র দৈত্য-দানব ঝাঁঝর, ঝিঞ্জিরের ঝনঝনা তুলে তাণ্ডব নৃত্য সুরু করে দিয়েছে। তাদের আস্ফালনে পায়ের নীচে মাটি থরথর করে' কাঁপছে, শব্দে কানে তালা লেগে যাবে। মোটের উপর স্টীম টারবাইনের তুলনায় স্টীম এঞ্জিনের কতকগুলো কার্যকরী অসুবিধা আছে। তবে ছোটখাট কলকারখানা বা যন্ত্রপাতি চালাতে স্টীম এঞ্জিনই অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক। কিন্তু সুবিশাল রণপোত, লাইনার, বিরাট ডায়নামো বা বৃহৎ কলকারখানা চালাতে টারবাইনের কার্যক্ষমতা অতুলনীয়। টারবাইনের ঘূর্ণনবেগ অসম্ভব বেশী। এই ঘূর্ণনবেগ কমিয়ে আনতে না পারলে টারবাইন থেকে কাজ পাওয়া শক্ত। ঘূর্ণন-বেগ বেশী হলে কেন কাজ পাওয়া যায় না, একটি দৃষ্টান্ত থেকেই তা' পরিষ্কার বুঝতে পারবে। ১৮৯৪ সালে টার্বিনিয়া নামক ছোট্ট একখানা বিলিতী জাহাজে সর্বপ্রথম স্টীম টারবাইন বসিয়ে পরীক্ষা করা হয়। টারবাইন চালানো হলো। অসম্ভব বেগে ঘুরতে লাগলো, জাহাজের প্রোপেলার। (প্রোপেলার, ইলেকট্রিক পাখার মত একটা যন্ত্র। জাহাজের পিছনে জলের নীচে থাকে। ঘূর্ণায়মান প্রোপেলার, স্ক্রু প্যাচের মত জল কেটে জাহাজখানাকে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়।) প্রোপেলার ঘুরছে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, জাহাজ তো এগুতে চায়না! অনেক চেষ্টায় বোঝাই গরুর গাড়ীর মত খানিকটা এগুলো বটে, কিন্তু গতিবেগ ঘন্টায় মাইল খানেকও নয়। এঞ্জিনিয়ার মহলে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে' গেল—ঝড়ের বেগে প্রোপেলার ঘুরছে অথচ জাহাজ চলছে না—এতো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার! পরীক্ষা সুরু হয়ে গেল। কাচের জানালা দেওয়া বৃহৎ জলের ট্যাঙ্কে বিভিন্ন গতি-বেগে প্রোপেলার ঘুরিয়ে পর্যবেক্ষণ এবং ফটো নেওয়া হতে লাগল। অনেক পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে দেখা গেল, প্রোপেলার যখন মিনিটে ১৫০০ বার করে' পাক খেতে থাকে তখন তার চারদিকে একটা ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হয়। জলের নীচে এই ফাঁকা জায়গাটা অনবরতই একটা কুঠরীর মত ঘূর্ণায়মান প্রোপেলারটাকে ঘিরে থাকে। কাজেই প্রোপেলারটা জলে ধাক্কা দিয়ে জাহাজখানাকে আর সামনে ঠেলে নিতে পারেনা। ছোট বড় চাকা সংযোগে প্রোপেলারের ঘূর্ণন-বেগ কমিয়ে সমস্যা সমাধানের মতলব হলো; কিন্তু দেখা গেল, তাতে অযথা বাষ্প খরচ হয়ে যায়। অথচ স্বাভাবিক ভাবে চালালেও প্রোপেলারের ঘূর্ণন-বেগ হয়ে যায়—অসম্ভব বেশী। অবশেষে সার চার্লস্ পারসন্স্ অভিনব উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করেন।

টার্বিনিয়া জাহাজে ছিল একটা মাত্র টারবাইন ও বড় রকমের একটা প্রোপেলার। সেখানে তিনি পরস্পর সংলগ্ন তিনটা টারবাইনে তিনটা ছোট ছোট প্রোপেলার বসিয়ে দিলেন। একই বাষ্প পর পর তিনটা টারবাইনের ভিতর প্রবেশ করে' তিনটা প্রোপেলার ঘুরিয়ে দিত। তিনটা টারবাইনের মধ্য দিয়ে বাষ্প ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হওয়ার ফলে প্রোপেলারের

ঘূর্ণন-বেগ কমে গিয়ে মিনিটে পাঁচশ'বার করে পাক খেতে লাগলো। পারসনস্ উদ্ভাবিত এই নতুন ধরণের টারবাইন বসিয়ে ১৮৯৭ সালে টার্বিনিয়াকে আবার জলে ভাসানো হলো। এবার টার্বিনিয়া সবাইকে বিস্মিত করে অসম্ভব দ্রুতগতিতে জল কেটে চলতে লাগলো।

স্টীম টারবাইনের উৎপত্তি এবং তার চলবার কৌশল সম্বন্ধে এখন তোমাদিগকে মোটামুটি বুঝিয়ে বলছি। পূর্বে স্টীম এঞ্জিনের প্রসঙ্গে তোমাদিগকে হিরোর ঘূর্ণায়মান ধাতব গোলকের কথা বলেছিলাম। এই ধাতু-গোলকের আর একটু উন্নত সংস্করণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল ১নং চিত্রের বাঁ-দিকের ছবির মত করে। নীচে বড় একটা আবদ্ধ-মুখ কড়াইয়ের মত বয়লার। বয়লারের উপর দুটা খুঁটির মধ্যে একটা ফাঁপা। খুঁটি দুটার বাঁকানো মুখের উপর ফাঁপা গোলকটা আলতোভাবে বসানো। বয়লার থেকে বাষ্প উঠে ফাঁপা নলের ভিতর দিয়ে গোলকটার মধ্যে প্রবেশ করে। সেখান থেকে গোলকের গায়ের বাঁকানো মুখ দুটা দিয়ে জোরে বেরিয়ে যায়। এই বাষ্পের ধাক্কাতেই গোলকটা ঘুরতে থাকে। হিরোর এই ঘূর্ণায়মান ধাতব গোলকই প্রকৃতপ্রস্তাবে সর্বপ্রথম উদ্ভাবিত অতি সরল গঠনের স্টীম টারবাইন। টারবাইন ও স্টীম এঞ্জিন উভয়েই চলে বাষ্পের সাহায্যে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য হচ্ছে এই যে, টারবাইন চলে—বাষ্পের ধাক্কায়, আর এঞ্জিন চলে—বাষ্পের চাপে। যাহোক, হিরোর এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল খৃষ্টের জন্মের প্রায় দুশো বছর আগে। তারপর অনেককাল পর্যন্ত এ যন্ত্রের উন্নতি করবার জন্যে কেউ কিছু চেষ্টা করেছিলেন বলে জানা যায়নি। এরপরে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবার টারবাইনের মত এক রকম যন্ত্র উদ্ভাবনের কথা জানা যায়। ১৬২৯ সালে ব্র্যাংকা নামে একজন ইটালিয়ান এক অদ্ভুত যন্ত্র তৈরী করেন। ১নং চিত্রের ডানদিকের ছবিটা দেখলেই ব্র্যাংকা-উদ্ভাবিত টারবাইনের কৌশলটা বুঝতে পারবে। একটা ভারী চাকার গায়ে পর পর কতকগুলো ছোট ছোট খাপ কাটা। বেড়টার খুব কাছেই টেরছা-ভাবে একটা নল বসানো আছে। এই নলের মধ্য দিয়ে বয়লার থেকে খুব জোরে বাষ্প বেরিয়ে আসে। এই বাষ্পের ধাক্কাতেই চাকাটা ঝড়ের বেগে ঘুরতে থাকে।

১নং চিত্র। বামে-হিরোর এঞ্জিন। ডানে-ব্র্যাংকা-টারবাইন
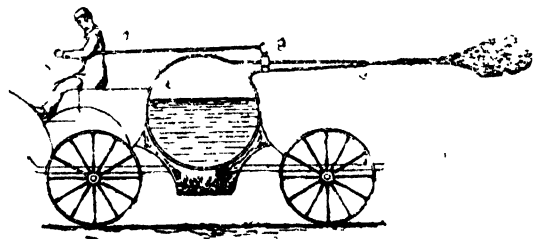
২নং চিত্র। নিউটন পরিকল্পিত বাষ্পীয় গাড়ী

এর পরে ১৬৮০ সালে সার আইজাক নিউটন বাষ্পের ধাক্কায় গাড়ী চালানোর এক অপূর্ব পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ২নং ছবি থেকে গাড়ী চালানোর কৌশলটা সহজেই

বুঝতে পারবে। ছবির ১ নম্বরে আছে গাড়ীর চালক। ২ নম্বর, গাড়ীর মধ্যে স্থাপিত বয়লার। বয়লারের নীচে আগুনের চুল্লী। ৩নং, বয়লার থেকে পিছন দিকে বর্ধিত নল। এই নলের মুখ দিয়ে প্রচণ্ডবেগে বাষ্প নির্গত হয়। এই বাষ্পের ধাক্কাতে গাড়ী সামনের দিকে এগিয়ে যায়। নলের গোড়ার দিকে ৪ নম্বরে একটা চাবি বসানো আছে। এই চাবিটার সংগে ৫ নম্বরের একটা লম্বা 'রড' বা ডাঁট যোগ করা। এই ডাঁটটার সাহায্যে চালক ইচ্ছামত বাষ্প বেরুবার পথ খুলতে বা বন্ধ করতে পারে।

যাহোক, ব্র্যাংকার যন্ত্র উদ্ভাবনের পর আড়াইশ' বছরের মধ্যে মাঝে মাঝে উন্নত ধরণের টারবাইন নির্মাণের চেষ্টা হয়েছিল বটে; কিন্তু কোনটাই সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। ১৮৪৮ সালে আভেরি, নামে যুক্তরাষ্ট্রের এক ভদ্রলোক নতুন একরকম স্টীম টারবাইনের পেটেন্ট নেন। কয়েক বছর পর্যন্ত এই যন্ত্র বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু উন্নত ধরণের স্টীম এঞ্জিন আবির্ভাবের ফলে তার জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। ১৮৮২ সালে সুইডেনের অধিবাসী ডাঃ ডি লাভালই প্রকৃতপ্রস্তাবে কার্যকরী স্টীম টারবাইন নির্মাণ করেন। ৩নং নম্বরের ছবি থেকে লাভাল-টারবাইনের কার্যপ্রণালী বুঝতে পারবে। খাঁজ-কাটা চাকাটার উপর টেরছা-কাটা নলের মুখগুলো খুব কাছাকাছি বসানো আছে। একই সময়ে চারটা নলের মুখ থেকে নির্গত বাষ্পের ধাক্কায় চাকাটা প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকে।
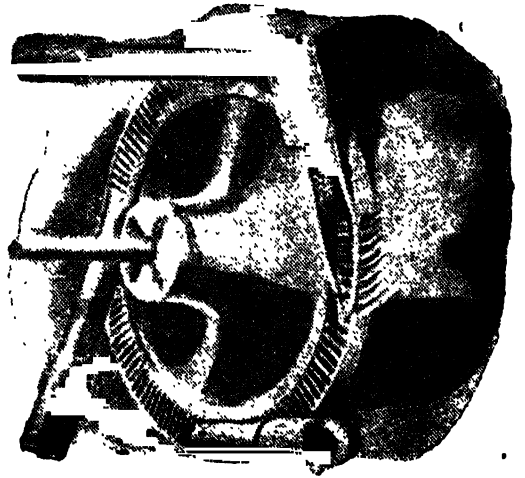
৩নং চিত্র। লাভাল-টারবাইনের নমুনা

বর্তমান যুগে যে সব প্রচণ্ড শক্তিশালী টারবাইন ব্যবহৃত হয় তার উদ্ভাবক হচ্ছেন—সার চার্লস্ পারসন্স্। প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনি লাভাল-টারবাইনের অদ্ভুত উন্নতি বিধান করেন। ছবি দেখেই বুঝতে পারছো—লাভাল-টারবাইনে ছিল একটা চাকা। চাকাটার বেড়ের পাশে ছোট ছোট খাঁজ কাটা। পারসন্স্ একটা চাকার পরিবর্তে একটা লম্বা স্যাফ্‌ট বা 'রডের' উপর গায়ে গায়ে লাগিয়ে অনেকগুলো চাকা বসিয়ে দিলেন। চাকাগুলোর বেড় ছোট থেকে একদিকে ক্রমশঃ বড় হ'তে হ'তে আবার একটু ছোট হয়ে গেছে। জিনিষটা দেখতে মস্ত বড় একটা পিঁপের মত। পিঁপেটার ঠিক মধ্যদিয়ে লম্বালম্বি ভাবে একটা প্রকাণ্ড রড চালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মোটের উপর, সব নিয়ে জিনিষটা হয়েছে যেন প্রকাণ্ড একটা ঘুড়ির লাটাইয়ের মত। ৪নং ছবি দেখে জিনিষটা সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারবে। এই লাটাইটা বসানো থাকে
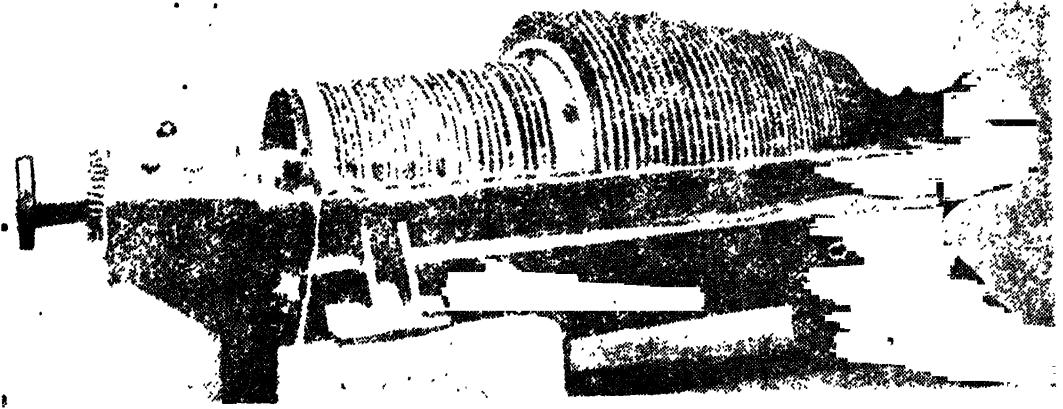
৪নং ছবি। আধুনিক টারবাইন। উপরের ঢাকনা খোলা। এই ঢাকনাটাই চোঙের অর্দ্ধেক

উভয় দিক বন্ধ বিরাট একটা চোঙের মধ্যে। লাটাইয়ের চাকাগুলোর বেড়ের উপর একদিকে বাঁকানো সরু সরু অসংখ্য খাঁজ আছে। প্রত্যেকটা চাকার গায়ে সরু অথচ পাতলা অসংখ্য পাত বসিয়ে এই খাঁজের সৃষ্টিকরা হয়েছে। একটা থেকে আর একটা চাকার মধ্যে যে ফাঁক আছে, সেই ফাঁকের মধ্যে খাপ খেয়ে বসতে পারে এরকমের মিল রেখে বিরাট চোঙটার ভিতরের দিকের গায়ে, চাকাগুলোর মতই অসংখ্য সূক্ষ্ম পাতের বেড় আছে। বয়লার থেকে প্রচণ্ড-চাপের বাষ্প এসে একদিক দিয়ে চোঙটার ভিতরে ঢোকে, আবার অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। লাটাইয়ের চাকা
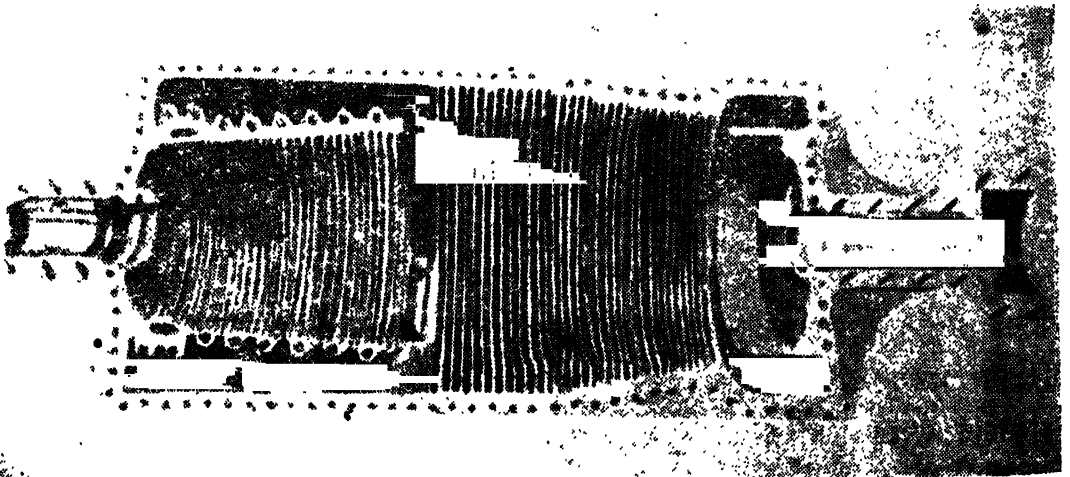
৫নং ছবি। উপরের খোলা ঢাকনার অর্থাৎ চোঙের উপরের অর্দ্ধেকের অভ্যন্তরের দৃশ্য।

ও চোঙের গায়ের পাতগুলোর মধ্যের ঈষৎ বাঁকানো ফাঁকই হচ্ছে বেরিয়ে যাবার রাস্তা। বিশাল এক একটা বয়লার থেকে এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ফাঁকের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড বেগে বাষ্প

বেরিয়ে যাবার সময় ওই লক্ষ লক্ষ পাতলা পাতগুলোর উপর সমবেত ধাক্কার ফলে লাটাইয়ের মত বিরাট বস্তুটা ঝড়ের বেগে ঘুরতে থাকে। এই ঘূর্ণায়মান বস্তুটার স্যাফ্‌টের সংগে সংযুক্ত হয়েই জাহাজের প্রোপেলার চলে, ডায়নামো ঘোরে, এবং আরো কত বিরাট কলকব্জা তাদের নিয়মিত কাজ চালিয়ে যায়।

৬ নম্বরের চিত্রটা থেকে পারসন্‌স্‌ টারবাইনের কার্যপদ্ধতির একটা পরিষ্কার ধারণা করতে পারবে। আগে যে আবদ্ধ চোঙের মধ্যে লাটাইয়ের মত বস্তুটার কথা বলেছি ৬নং চিত্রে তার খানিকটা অংশের নমুনা দেখানো হয়েছে। ১,১ নম্বরের বাঁকানো পাতগুলো চোঙের গায়ে সংযুক্ত, আর ২,২ নম্বরের পাতগুলো লাটাইয়ের এক একটা চাকার চারদিকে খাড়াভাবে বসানো। বাষ্প প্রথমে চোঙের গায়ের ১নং সারের তীর চিহ্নিত পথে ঢোকে এবং সেখান থেকে ২ নং সারের তীর চিহ্নিত পথে প্রবেশ করবার সময় পাতগুলোর উপর ধাক্কা দেয়। ফলে চাকাটা লম্বা তীর-চিহ্নের দিকে ঘুরে যায়। এই বাষ্পই আবার পরের ১ নম্বরের পাতগুলোর ভিতর দিয়ে তার নীচের ২ নং সারের পাতগুলোকে ধাক্কা দেয়। এভাবে এক সংগে পর পর অনেকগুলো চাকার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বাষ্প অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই ধাক্কার ফলেই লাটাইয়ের মত বিরাট বস্তুটা ঘুরতে থাকে।

৬নং চিত্র। পারসন্‌স্‌-টারবাইনের ভিতরের ব্যবস্থা দেখানো হয়েছে।

বোধহয় টারবাইন চলবার মোটামুটি কৌশলটা তোমরা বুঝতে পেরেছ। বহুকাল থেকেই মানুষ জল-ভুত, বায়ু-ভুতকে দিয়ে জল-চক্র, বায়ু-চক্র প্রভৃতি যন্ত্র চালিয়ে কাজ আদায় করে নিচ্ছিল। কিন্তু জল-ভুতকে বাষ্পে রূপান্তরিত করলে তাকে দিয়ে আরও বেশী কাজ করানো যায়, এরহস্যটা জানবার পর থেকেই মানুষ—বাষ্পরূপী জল-ভুতকে দিয়ে তার বেশীর ভাগ কাজ করিয়ে নিচ্ছে।

এখানেও সেই জল-ভুতকে দিয়ে কাজ করানোর ব্যাপার। তোমরা আলিপুর পশু-শালায় বা কোন কোন পার্কের প্রবেশ-পথে ঘূর্ণনক্ষম দরজা দেখেছ নিশ্চয়ই। ধর, একটা বড় হলঘরে অনেক লোক জমায়েৎ হয়েছে। হলঘর থেকে বেরিয়ে যাবার একটামাত্র দরজা। একবারে একজনের বেশী লোক বেরুতে পারে না। প্রত্যেকটি লোক বেরুবার সময় দরজাটা খানিকটা করে ঘুরে যায়। হঠাৎ যদি হলঘরে আগুন লেগে যায় তবে সব লোকই একসংগে বেরিয়ে আসতে চাইবে, কিন্তু একবারে একজনের বেশী বেরুবার উপায় নেই বলে স্রোতের মত পর পর লোক বেরুতে থাকবে আর সংগে সংগে দরজাটাও চর্কিরমত ঘুরতে থাকবে। এখানেও জল-ভুতকে বয়লারে আটকে রেখে প্রচণ্ড উত্তাপে তাকে বাষ্পে পরিণত করা হয়। সেখান থেকে বাষ্প বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘূর্ণনক্ষম বিরাট একটা লাটাইয়ের গায়ের উপর দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য আকাবাঁকা পথ করে দেওয়া হয়েছে। এই সব পথ দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় বাষ্প পর্দার মত ক্ষুদ্রক্ষুদ্র কবাটের গায়ে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে যায়। এই সমবেত ধাক্কাতেই টারবাইনের ঘূর্ণায়মান গতি উৎপন্ন হয়।

. . . গ, চ, ভ,

পুস্তক পরিচয়

গণিতের কথা—**গগণ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়।**

বিখ্যাত দার্শনিক ক্যাণ্ট গণিত সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে, গণিতের যুক্তি formal বা ন্যায়-শাস্ত্র সঙ্গত যুক্তি নয়, কারণ গাণিতিক প্রমাণে অনেক ক্ষেত্রেই স্থান ও কাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান হয়েছে। Professer Paensর হাতে Symbolic Logic যে রূপ নিয়ে বেরিয়ে এসেছে তাতে বর্তমানে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শুধু দশটি Principle এবং দশটি Premise থেকে ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত নিয়ম নিখুঁত ভাবে মেনেও গাণিতিকি প্রতিপাদ্য সমস্ত বিষয় প্রমাণ করা যায়। বিশুদ্ধ গণিত বা Pure mathematics এ একবার কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ধরিয়া লইলে যুক্তিবলে সমস্ত শাস্ত্রটি গড়িয়া তোলা সম্ভব, তা' জাগতিক অভিজ্ঞতার অনুকূল হোক বা না-ই হোক। মোটামুটি ভাবে ইহাকেই বলি Symbolic Logic বা প্রতীক ন্যায়। আলোচ্য গ্রন্থে লেখকের মূল বক্তব্য ইহাই। যে উদাহরণে এই বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

পুস্তকটী তিনটি অধ্যায়ে সমাপ্ত। রস বিচার, ক্রীড়াকৌতুক ও চতুর্থমান।

প্রথম অধ্যায়ে লেখক যত্ন সহকারে শেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, আপাতঃ দৃষ্টিতে গণিত শাস্ত্রকে নীরস ঠেকলেও এর মধ্যে এমনই এক গভীর আত্মসমাহিতি ও অনুভূতির ক্ষেত্র আছে যা' কবি বা চিত্রকরের রসোপলব্ধির পর্যায়ে পড়ে। প্রচারকের আগ্রহাতিশয্যে দেশের অর্ধশিক্ষিত শিক্ষকমণ্ডলীর উপর কিঞ্চিৎ কটাক্ষপাত থাকলেও উদাহরণগুলি মনোরম হয়েছে।

নীরস্ গণিত কি ভাবে শিশুমনকে আনন্দানুভূতির দিকে আকর্ষণ করতে পারে তারই উদাহরণ 'Mathematical Recreation' থেকে দু'একটী 'খেলার' উল্লেখ করা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। বিজোড় order এর ম্যাজিক square তৈরীর ব্যাখ্যাটি আরও একটু প্রাঞ্জল হওয়া বোধহয় সম্ভব।

তৃতীয় অধ্যায়ে লেখক যে বিষয়টির অবতারণা করেছেন তা' অবশ্যই জটিল। কারণ চতুর্মাত্রিক জগতে (four dimensional space) যুক্তির গতিবিধি অবাধ হলেও কল্পনা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। তৃতীয় মাত্রা বা মানকে ছাড়িয়ে চতুর্থমানের পরিচয় দেবার প্রয়াসী হয়ে লেখক অবতারণা করেছেন Tesseract এর। আলোচনাটিতে একটু হঠাৎ পরিসমাপ্তির ভাব আছে; হয়ত লেখকের ব্যাখ্যা-নিপুণতার গুণে 'আর একটু হলে মন্দ হত না' এই ধারণার উদ্রেকে।

এই পুস্তকের ভূমিকার পরিচয় কিছু না দিলে আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যাবে। ভূমিকা লিখেছেন ডাঃ ব্রতীশঙ্কর রায় ও শ্রীপরিমল কান্তি ঘোষ। এক কথায় বলতে গেলে ভূমিকাটি রস-সাহিত্যের পর্যায়ে পৌঁচেছে। গণিতজ্ঞ অথবা গণিতবিমুখ যে কোনও ব্যক্তি শুধু যে পুস্তকটি পাঠে উপকৃত হবেন তা' নয়, ভূমিকাটি পাঠ করলে যথেষ্ট রসানুভূতিও হবে।

উপসংহারে গণিতশিক্ষকদের বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এই পুস্তকটি পড়িতে অনুরোধ করি। আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীনন্দলাল ঘোষ।

বাংলার মাকড়সা—**শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য** প্রণীত। গঙ্গা পাব্লিসার্স্ লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ২৲।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রায় সকল পুস্তকই ইংরেজী হইতে নিকৃষ্ট অনুবাদ। তাহার উপর

মৌলিকত্ব ফলাইতে যাইয়া নানা ভুলের উদ্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলি "পতঙ্গের দেহ তিন ভাগে বিভক্ত —(১) মাথা (২) বুক ও (৩) পেট। তাহার পর মৌলিকত্ব ও সাধারণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া ৩ জোড়া পা কোথায় থাকে তাহা বলিতে, প্রত্যেক ভাগে এক জোড়া করিয়া পা আছে" এইরূপ লেখা বহু পুস্তকেই দেখিতে পাই। মাথায় পা আজ পর্যন্ত কোন প্রাণীতেই দেখি বা শুনি নাই। পতঙ্গের ৬ খানা পা-ই বুকে আঁটা থাকে। সেজন্য প্রত্যেক ভাগে এক জোড়া পা লিখিলে যে, কি সর্ব্বনাশ হইল তাহা অনুবাদকের ধারণাতীত। গোপালবাবুর বাংলার মাকড়সা এধরণের পুস্তক নহে। ইহা বাংলার নিজস্ব প্রাণীর নানাতত্ত্বের অনুসন্ধান প্রসূত বিবরণ। ইহাতে ছোট ছেলেমেয়েদের অনুসন্ধানপ্রিয়তা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বৃদ্ধি বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য হইবে।

গোপালবাবু বহুদিন যাবত বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরে সংশ্লিষ্ট আছেন। তাঁহার পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা সত্যই প্রশংসনীয়। ছবি ছাপা ও লেখার ভাষা সকলই প্রথম শ্রেণীর। আমরা এই প্রকার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকের যথেষ্ট চাহিদা আছে বলিয়া মনে করি। **শ্রীহিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায়।**

বিদ্ধি—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ, প্রকাশক—মডেল পাবলিশিং হাউস—পৃষ্ঠা ২৩২—দাম তিন টাকা।

এ দেশে যাঁরা প্রবীণ ও পাকা, তাঁদের কাছে কৌতূহলমাত্রেই বালসুলভ—যদি আশু আধি-ভৌতিক লাভের সম্ভাবনায় তা গৌরবান্বিত না হয়। আমাদের ছেলেদের সুস্থ কৌতূহল, প্রতিকূলতার তপ্ত হাওয়ায় শুকিয়ে যায়; তারপর জীবন গড়িয়ে চলে গতানুগতিকতার গড্ডলিকা প্রবাহে। এ হচ্ছে তামসিক মোহের চিহ্ন। আজ যদি জাতির মূর্ছা ভেঙে থাকে, তবে তার হৃদয়ে জাগবে জানবার ক্ষুধা। আমরা যদি উপযুক্ত সময়ে, সেই জ্ঞানের ক্ষুধা মেটাবার আয়োজন না করতে পারি, তবে আমাদের নিদারুণ কর্তব্যচ্যুতি ঘটবে। গ্রন্থকার দেশের সেই গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন। "বিদ্ধি"তে তিনি দেশবাসীকে এই জ্ঞানের ক্ষুধা মেটাবার জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন। শুনিয়েছেন, বিরাট বিশ্বের জীবন ইতিহাস, বসুন্ধরার জন্মরহস্য। বলেছেন, কেমন করে তপনতনয়া অগ্নিগর্ভা পৃথিবী হল জীব-ধাত্রী ধরিত্রী; মানুষ জন্মাল, সভ্যতা বিস্তার লাভ করল, রাষ্ট্র ও ধর্ম মানব সমাজে বিকশিত হয়ে উঠল। গ্রন্থকারের যুক্তি বৈজ্ঞানিক জনসুলভ ও দৃষ্টিভংগী উদার। কোন বিশেষ মতবাদের গোঁড়ামি তাঁর বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে নাই। সহজ ও সাবলীল ভাষায় তিনি সৃষ্টিতত্ব, ভূতত্ব ও নৃতত্ত্বের অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি লোক শিক্ষার আসরে উপস্থিত করেছেন। বিচিত্র সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার ভারে দেশ যখন উদ্ভ্রান্ত; তখন জীবন সমাজ ও রাষ্ট্রকে উদার বৈজ্ঞানিক পটভূমিয় সম্মুখে রেখে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। 'বিদ্ধি'র আহ্বান এজন্য সম্পূর্ণ সময়োপযোগী। এজন্য তিনি বিজ্ঞান প্রচারানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হবেন, আর প্রশংসাভাজন হবেন জনসাধারণের, যখন তারা জানবে এই পুস্তক বিক্রয়লব্ধ লাভ, জনশিক্ষার জন্য ব্যয় করার পাকা বন্দোবস্তের কথা। পরিশেষে একটি কথা নিবেদন করতে চাই। আমাদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা এখনও ব্যবহার প্রাচুর্যের পোক্ত জমিতে ঠাঁই পায় নাই—এর অদল বদল অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং অর্থবোধ সৌকর্যার্থে পরিশিষ্টে সংক্ষেপে এদের অর্থ ও ইংরাজী প্রতিশব্দের তালিকা সন্নিবেশ করলে সুবিধা হয়। বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক নির্ঘণ্টযুক্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। **শ্রীপরিমলবিকাশ সেন।**

খাদ্য কথা-শ্রীঅনিলকুমার রায় এম,বি, প্রণীত। গঙ্গা পাব্লিশার্স লিমিটেড, ৫২।৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২ হইতে প্রকাশিত। ৯২ পৃষ্ঠা, মূল্য দুইটাকা।

আহার, আহার্য, পাচন, খাদ্যের রাসায়নিক উপাদান ও শরীর গঠন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সমূহ এই পুস্তিকাটিতে সহজ ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। লেখকের গবেষণামূলক চিন্তাধারা পুস্তিকাটিতে ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে। তাই পুস্তিকাটির বিষয়-বস্তু দুরূহ হইলেও ভাষা আড়ষ্ট হইয়া উঠে নাই। পাঠক ইহা হইতে কেবল কোন্ ভিটামিনে আমাদের কি উপকার হয় ও কেমন করিয়া আমরা খাদ্য জীর্ণ করি ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিচয় পাইবেন না, ইহার উপরও এই সকল তথ্য আবিষ্কার করিতে গবেষকেরা কি প্রণালী অবলম্বন করেন, তাঁহাদের চিন্তা কোন সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হয়, তাহারও কিছু আভাস পাইবেন। বলা বাহুল্য, প্রকাশভঙ্গীর নৈপুণ্যের ফলে ইহা খাদ্য বিজ্ঞানের ব্যাকরণ হইয়া উঠে নাই। পুস্তিকাটির শেষ দুই অধ্যায়, অজৈব বা খনিজপদার্থ ও ভাইটামিন, বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করিয়া ভাইটামিনের অধ্যায়টি।

আমাদের দেশের লোকের দৈনন্দিন যেরূপ অর্থসঙ্কট তাহাতে ৯২ পৃষ্ঠার পুস্তিকা দুই টাকা মূল্য দিয়া কয়জন কিনিয়া পড়িতে চাহিবে কে জানে, বিশেষ এই এই জাতীয় পুস্তক ইহা অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে যখন বিক্রয় হইয়া থাকে। কেবল মূল্যের পরিমাণ অধিক হওয়ার জন্যই হয়ত এই পুস্তিকাটির বহুল প্রচারে বাধা হইবে।

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

বিবিধ প্রসঙ্গ

এদেশের কৃষিকার্যে কৃত্রিম সার ও যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা—বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা জানা গিয়েছে যে, গাছের খাদ্য কি কি এবং মূলতঃ কি উপায়ে গাছ তাহা গ্রহণ করে। কৃত্রিম সারের প্রয়োগ এই তথ্যের উপরই নির্ভর করে। আমরা মাটির ফলন ক্ষমতা নির্ধারণ করি ফসলের পরিমাণ এবং গুণাগুণ বিচার করে। মাটির অভাবেও যখন শস্য ফলান সম্ভব তখন মাটির উর্বরতার মীমাংসা অর্থহীন। বস্তুতঃ এই পদ্ধতিতে কৃত্রিম সারের তুলনামূলক ক্ষমতাই নির্ধারিত করা হয়। আমাদের দেশের বোম্বাই, নাগপুর ও মধ্যদেশীয় "রেগুর" মাটির উর্বর ক্ষমতা সর্বজনবিদিত; কোন প্রকার সার প্রয়োগ ব্যতিরেকে একই মাটিতে বহু বৎসর ধরে ফসল তোলা হয়েছে, অথচ উর্বরতার হ্রাস পরিলক্ষিত হয়নি। কৃত্রিম সার কি মাটিতে এইরূপ উর্বর ক্ষমতা দান করতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে জোর করে' 'না' বলা সম্ভব। কিন্তু গোবর সার, সবুজ সার ইত্যাদি জৈব সার প্রয়োগ করে অথবা পালাক্রমে চাষ করে মাটির উর্বর ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে এবং তা' বিজ্ঞান সম্মতও। এই উপায়ে ক্রমশঃ মাটির উর্বর ক্ষমতা উচ্চস্তরে উন্নীত করা এবং ঐ স্তরে সংরক্ষণ করাও সম্ভব। যেখানে মাটির এই নিজস্ব ক্ষমতার অভাব ঘটেছে, সেখানে কৃত্রিম সার আপাতঃ দৃষ্টিতে মাটির উর্বর ক্ষমতা বাড়িয়েছে বলে মনে হবে। জৈবসার মাটির গঠনপ্রণালী যেমন সুষ্ঠু রাখে, তেমন বহিঃপ্রভাবের প্রতিরোধ ক্ষমতাও বহুগুণে বৃদ্ধি করে। সুতরাং কৃত্রিম সারের অপপ্রভাব খণ্ডন করতে জৈবসারের মিশ্রণ বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বহুবিধ তথ্যের প্রয়োজন। এখানে দুই-একটি তথ্য নিয়েই

আলোচনা করব। যান্ত্রিক কৃষি প্রধানতঃ যে দুইটি কারণে সুবিধাজনক তা' হচ্ছে এই :—(১) লোক-সংখ্যার বিস্তৃতি, মজুরের দুর্লভতা ও মজুরীর উচ্চহার; এবং (২) একক বর্গ জমির উৎপাদন বৃদ্ধি। রাশিয়া ও আমেরিকায় প্রত্যেক বর্গ মাইলে লোকসংখ্যা যথাক্রমে ২০ ও ২৮, সেখানে ভারতবর্ষে (অবিভক্ত) গড়পরতা ২৫০। যান্ত্রিক কৃষিতে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় বটে, কারণ অধিক পরিমাণ জমি কৃষির উপযোগী করা সম্ভব—কিন্তু একক বর্গ জমির গড়পরতা উৎপাদন বৃদ্ধি তেমন পরিলক্ষিত হয় না। এতদ্ভিন্ন যান্ত্রিক কৃষির প্রচলন লাভজনক করতে হলে জমি একত্রীকরণ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। অথচ ইংলণ্ডে ফার্ম জরীপের ফলে জানা গিয়েছে যে, ফার্মের বর্গক্ষেত্রের সঙ্গে উহার আয়ের বিপরীত অনুপাত সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া ছোট ছোট ফার্মের বা মিশ্র-কৃষি ফার্মের স্থিতিস্থাপকতা' বহুলাংশে বেশী। গত দুই যুদ্ধে ডেনমার্কের মোট উৎপাদন যেমন অল্পই ব্যাহত হয়েছে তেমনি ছোট ছোট ফার্মশিল্প থাকার দরুণ যুদ্ধের প্রভাব তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়েছে। অবশ্য এই বিষয়ে আরও বিশদ আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

রাশিয়ায় বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় স্বাধীনতা ব্যাহত—

২৭শে অগাষ্ট, রয়টারের মস্কোর খবরে প্রকাশ, 'জৈব-বিজ্ঞানকে সমাজতন্ত্রীদের ব্যাখ্যার অনুকূল করে তুলতে পারছেন না বলে' সোভিয়েট ইউনিয়ন বিজ্ঞান-পরিষদের সম্পাদক এল, এ, অরবেলীকে ওই পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে।

অন্যান্য জৈব-বিজ্ঞান পরিষদের বিশিষ্ট জীবতত্ত্ববিদ্‌গণকে দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছে। এই বিজ্ঞান-পরিষদগুলোতে বৈজ্ঞানিক আলোচনার রীতি ও পন্থার পরিবর্তন সাধন করা হচ্ছে। রুশ বৈজ্ঞানিক মাইচুরিন জৈব-বিজ্ঞান আলোচনায় যে মতের প্রবর্তন করেছেন, ওই সকল পরিবর্তনকে তারই বিপুল জয় বলে মনে করা হচ্ছে।

'বুর্জোয়া পশ্চিম' কর্তৃক প্রবর্তিত মর্গ্যানিজম্, মেণ্ডেলিজম্ তত্ত্বানুসারে প্রধানতঃ বংশানুক্রমেই উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ ঘটে থাকে, মানুষ তাদের বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত পরিবর্তন সাধন করতে পারে না।

মাইচুরিনের মতে, বিভিন্ন জাতের উদ্ভিদ বা প্রাণীর সংমিশ্রণে নতুন জাতির সৃষ্টি করে' তাদের বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

জড়বাদী মার্ক্সতত্ত্ব ও লেনিনতত্ত্বের সংগে মাইচুরিনের মতবাদের বিশেষ সংগতি আছে এবং এই মত মার্শ্যাল ষ্ট্যালিন কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে কম্যুনিষ্ট দলের অবলম্বনীয় বলে গৃহীত হয়েছে।

রাশিয়ায় কি তবে সক্রেটিস্, কোপার্নিকাস্ বা গ্যালিলিওর যুগ ফিরে এল!

ইনসুলিনের সরবরাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা—

জেনেভা হতে নিখিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনের এক বিবরণে প্রকাশ যে, সম্ভবত একটি নতুন এবং অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে জীবদেহের অগ্ন্যাশয়-গ্রন্থি হতে রস নিষ্কাশন করে জগতের ইনসুলিন সরবরাহ অনেকটা বাড়ানো যাবে। বহুমূত্র প্রতীকারে ইনসুলিন অপরিহার্য।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ৪৬টি দেশের প্রতিনিধিদের মত এই যে, যদি ইতিমধ্যে ইনসুলিনের উৎপাদন না বাড়ানো যায় তবে আগামী দশ বছরের মধ্যেই জগতে প্রয়োজনের তুলনায় বাৎসরিক প্রায় ৪০ কোটি আন্তর্জাতিক ইউনিট হিসাবে এর অভাব হতে থাকবে।

নতুন প্রণালীটি উদ্ভাবিত হয় জার্মানীতে। ইহাতে ইনসুলিন তৈরীর একমাত্র উপাদান জীব-গ্রন্থিকে তাপহারক যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াও ঠিক ভাবে রাখা যায়। এবং এই প্রণালীতে জগতের ইনসুলিনের উৎপাদন বহু গুণে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ফ্রাংক্ফোর্টের (জার্মানী) ডাঃ এফ, আর, লিণ্ডনার নামক একজন বৈজ্ঞানিক এই নতুন পন্থার উদ্ভাবক। নিখিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংগঠনের মুখ্য অধিনায়ক ডাঃ ব্রুক চিস্‌হোম এর বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করেছেন।

বর্তমানে গ্রন্থির অভাবের চেয়ে এর সংরক্ষণ ব্যবস্থার ত্রুটির জন্তেই ইনস্থলিনের এত অভাব হয়েছে। কসাইখানা থেকে গ্রন্থি সংগ্রহ করবার পরেই যদি কাজ আরম্ভ না করা যায় অথবা যদি সংগে সংগে গ্রন্থিগুলোকে তাপহারক যন্ত্রের সাহায্যে ২০ থেকে ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপে ঠাণ্ডা না করা হয় তবে সেগুলো থেকে আর ইনস্থলিন তৈরী করা যায় না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বাংলা ভাষায় উত্তর দানের সুবিধা—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ; আই, এস সি; বি, এ; বি এস সি, বি কম; এল, টি ও বি, টি পরীক্ষায় ১৯৪৮ সালের মত ১৯৪৯ সালেও বাংলা ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সুবিধা দেওয়া হবে। ইংরেজী ভাষার পরীক্ষায় অবশ্য এই সুবিধা প্রযোজ্য হবে না। যে সকল প্রশ্নপত্রে ভাষা সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশ দেওয়া থাকবে সে সকল ক্ষেত্রেও উহা প্রযোজ্য হবে না। যদি কোন পরীক্ষার্থী কোন পেপার বাংলায় লিখতে চান তবে সম্পূর্ণ পেপারটিই তাকে বাংলায় লিখতে হবে। অবশ্য পরীক্ষার্থীরা একই বিষয়ের এক প্রশ্নপত্র বাংলায় এবং অন্যান্য প্রশ্নপত্রের উত্তর ইংরেজীতে লিখতে পারবেন।

বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে আবেদনের উত্তরে সাড়া—

জন সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের আবেদন ক্রমে নিম্নলিখিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট হইতে নিম্নোক্ত দান ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইয়াছে—

শ্রীমহেশলাল শীল—২০৲
শ্রীবৈদ্যনাথ বাগচী—৫৲
শ্রীশেফালিকা বসু—১০৲
শ্রীপি, কে, সেন—৫০০৲
শ্রীশক্তিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৲
শ্রীছবিল দাস—১০০০৲
শ্রীবি, বি, মজুমদার—২৲
শ্রীকরমচাঁদ থাপার—১০০০৲
শ্রীঅক্ষয়কুমার সুর—১০০০৲
শ্রীদিলীপকুমার দাস—৫৲
শ্রীঅমূল্যচরণ সুর—১৲
শ্রীঅমূল্যলাল, জে, চঞ্চল—২০০৲
বাস্তাকোলা কোলিয়ারী কোং—১০০৲
শ্রীচারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১০০৲

প্ল্যানেটেরিয়ামের আংশিক দৃশ্য

৬০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য
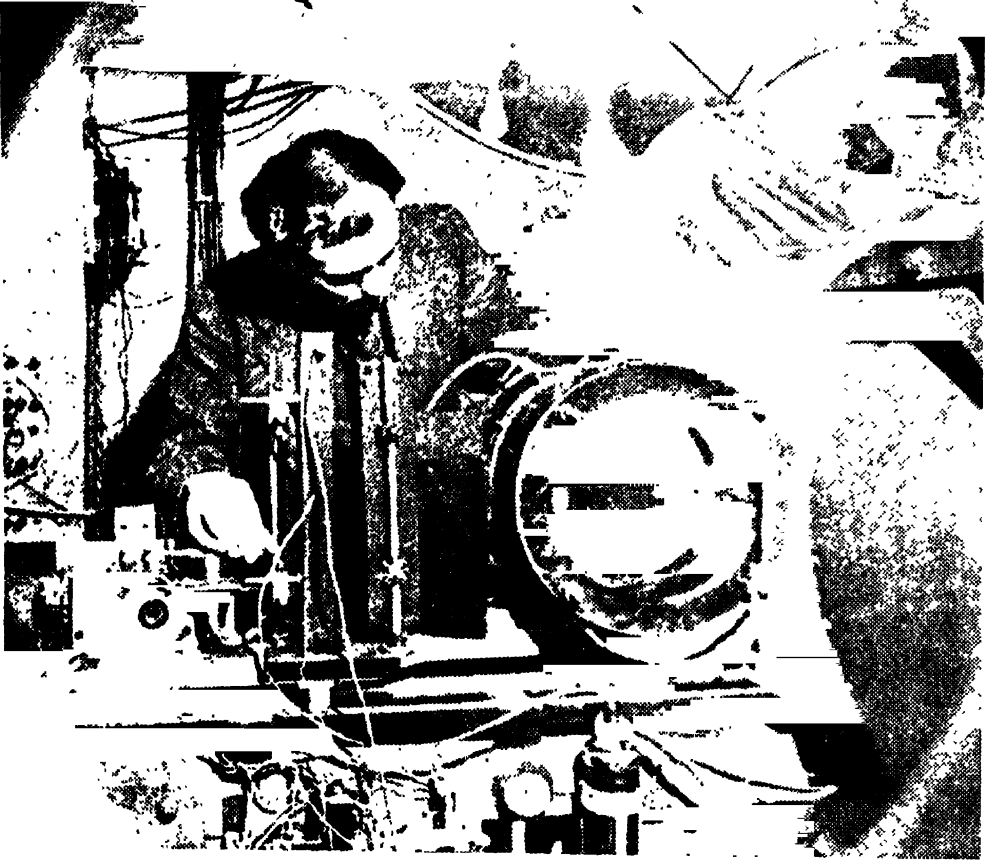
মহাজাগতিক-রশ্মি (Cosmic ray) পুরু সীসার স্তর ভেদ করে উইলসন মেঘ-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে' তার গতিপথ পরিস্ফুট করে। ছবিতে ডাঃ ক্লিফোর্ড বাটলারকে এই যন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যাচ্ছে

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

প্রথম বর্ষ | অক্টোবর—১৯৪৮ | দশম সংখ্যা

পরমাণু জগতের রহস্য

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে নানাপ্রকার রাসায়নিক ক্রিয়ায় লিপ্ত হইয়াও মৌলের পরমাণু তাহার সত্তা হারায় না। বিভিন্ন মৌলের পরমাণু সংহতিতে মৌলিক পদার্থের অণু সৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল পদার্থ বিশ্লেষণ করিলে পরমাণুগুলিকে অবিকৃত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অক্‌সিজেন পরমাণু হাইড্রোজেনের সঙ্গেই মিলিত হউক, কিংবা স্বর্ণ বা লৌহের সংঙ্গেই সংশ্লিষ্ট হউক, কোন সংস্থিতিতেই উহা স্বীয় স্বাতন্ত্র্য হারায় না। কিন্তু বত মান শতাব্দীর প্রথম ভাগেই পরমাণুর অভ্যন্তর ভাগের নব নব তথ্য আহরণের ফলে দেখা গেল যে, সে স্থল নানা দুরূহ রহস্যের লীলায়তন। সাধারণ পরমাণু তড়িদ্ধর্মহীন হইলেও উহার অভ্যন্তরে — ও + তড়িতের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। তনুকৃত গ্যাসে তড়িৎ-প্রবাহ চালাইলে তড়িদণু বা ইলেকট্রন বাহিরে বিতাড়িত করা যায়; ফলে পরমাণুর অবশিষ্টাংশে + তড়িদ্ধর্মের বিকাশ দেখা যায়। আবার ইহাও দেখা যায় যে, ঐ গ্যাসেরই অনেক পরমাণু মুক্ত-ইলেকট্রন গ্রহণ করিয়া তড়িদ্ধর্মের পরিচয় দেয়। এই দুই অবস্থায় পরমাণুকে আয়নিত (ionised) বলা হয়। কিন্তু কখনও কোন পরমাণুর + তড়িৎ বা তাহার কোন অংশ উপরোক্ত উপায়ে বিতাড়িত করা যায় না। সহজেই মনে হয়, অভ্যন্তরে + তড়িতের বন্ধন সুদৃঢ়তর।

রাদারফোর্ড ও বো'র ১৯১২ খৃঃ অব্দে পরমাণুর যে মডেল প্রতিষ্ঠিত করেন তাহার মতে পরমাণু মানেই বর্তুলাকার ও উহাদের কেন্দ্রস্থলে +তড়িতাধান নিউক্লিয়াস বিদ্যমান। এই স্থলেই পরমাণুর সকল ভর নিহিত। ইহাকে কেন্দ্রে রাখিয়া নানা কক্ষে ইলেকট্রনগুলি সৌরজগতের গ্রহগণের ন্যায় প্রদক্ষিণ করিতেছে। আর পরস্পর বিপরীত ধর্মী তড়িতাধানের মধ্যে ক্রিয়মান আসক্তিই এস্থলে গতিশক্তির উৎস।

প্রত্যেক ইলেকট্রনের স্ব স্ব কক্ষ ও তাহাতেই ইহারা অবিশ্রান্ত গতিতে ঘূর্ণায়মান। ইলেকট্রনগুলির আধান সমষ্টি নিউক্লিয়াসের তড়িতের সমপরিমিত। ফলে পরমাণু তড়িদ্ধর্মহীন। ইলেকট্রন সংখ্যা পরমাণু ভেদে বিভিন্ন। ইহারাই মৌলের রাসায়নিক গুণ-ধর্মের নির্দেশ দেয় এবং মেণ্ডেলিফের ছকে ইহারাই মৌলের অবস্থানস্থল বা পরমাণু-অঙ্ক

বিজ্ঞাপিত করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, হাইড্রোজেনে ১টি ইলেকট্রন, হিলিয়ামে ২টি, লিথিয়ামে ৩টি, কার্বনে ৬টি ও লৌহের পরমাণুতে ২৬টি। ছক মতে এই সকল মৌলের পরমাণু-অঙ্কও যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৬ ও ২৬। ছকের সর্বশেষ মৌল ইউরেনিয়ামের পরমাণুতে ৯২টি ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন বিদ্যমান। পরমাণুর ইলেকট্রনের আসক্তিতেই গড়িয়া উঠে অণু ও উহাদের উপরই নির্ভর করে মৌল কর্তৃক বিকীর্ণ আলোকের প্রকৃতি। এখানে কার্বন পরমাণুর অন্দর মহলের একটি চিত্র প্রদত্ত হইল। বিহীন। প্রথম ৪টি ইলেকট্রন বৃত্তাকার কক্ষে পরিভ্রমণ করে; কিন্তু বাহিরের ২টি ইলেকট্রন উপ-বৃত্তাকার কক্ষে ঘূর্ণায়মান।

পরমাণু ও অণুর গঠন-বিন্যাসে উহার নিউক্লিয়াসেই উহার ভারকেন্দ্র ও জড় স্থাণুর ন্যায় ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই ইলেকট্রন ঘূর্ণায়মান হয়। রাসায়নিক ক্রিয়া ও আলোক বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ হইতে যে সকল তথ্য আহরিত হইয়াছিল, তাহাতে পরমাণুর অভ্যন্তরের ইলেকট্রন-বিন্যাস নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইলেও গোটা নিউক্লিয়াসকে এক নির্বিশেষে গঠন,
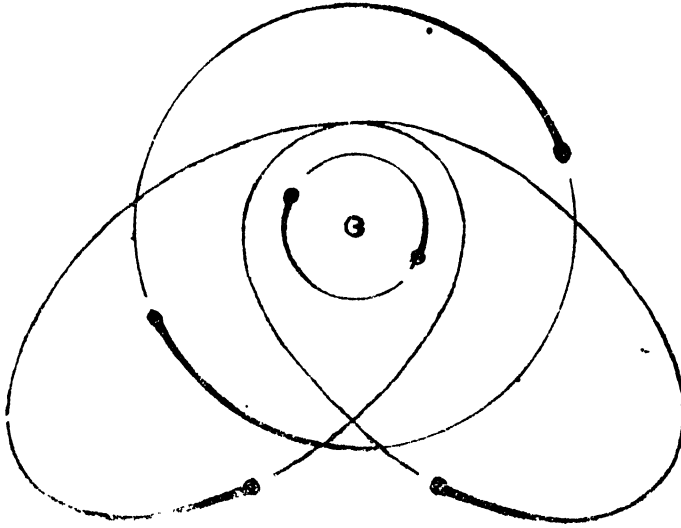
কার্বন পরমাণু

পরমাণুর গুণ-ধর্ম বিবেচনায় বো'র-রাদারফোর্ড মডেল অনুযায়ী কার্বন পরমাণুর এই চিত্রই সাব্যস্ত হইয়াছে। ইহার বহির্ভাগের ইলেক্ট্রনগুলি অতিশয় দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। সেজন্য ইলেকট্রন বিতাড়িত করিয়া ইহাকে আয়নিত করা সম্ভবপর হয় না। আবার সমস্ত জৈব-রসায়ন এই কার্বন পরমাণুর সংশ্লেষণ শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সেজন্য জড়-বিজ্ঞানে ইহার স্থান সকলের ঊর্ধ্বে। ইহার অভ্যন্তরে ভারী নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করিয়া ৬টি ইলেকট্রন বিভিন্ন কক্ষে ঘূর্ণায়মান। কেন্দ্রকোষে যথোচিত + তড়িতাধান থাকাতে পরমাণুটি তড়িদ্ধর্ম অবিধ্বংসী সত্তা রূপেই প্রতীত হইত। কারণ ইলেকট্রনের আদান প্রদানে পরমাণুকে আয়নিত করার অতিরিক্ত কোন কার্য করার উপায় জানা ছিল না। তবে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, আয়নিত অবস্থা পরমাণুর এক স্বল্পকাল স্থায়ী অবস্থা মাত্র। উহা সহজেই কোন মুক্ত ইলেকট্রন গ্রহণ করিয়া কিংবা গৃহীত অতিরিক্ত ইলেকট্রন ত্যাগ করিয়া সাধারণ তড়িদ্ধর্মহীন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে।

সুতরাং পরমাণুর প্রকৃত রহস্য উহার নিউক্লিয়াসেই বিদ্যমান ও কোন উপায়ে ইহার বিকার সাধন করিতে পারিলেই মৌল হইতে মৌলান্তরের

উদ্ভব আশা করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী রাসায়নিক প্রাউট প্রতিপন্ন করিতে চান যে, বিভিন্ন মৌলের পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণুকেই নানা সংখ্যায় সংশ্লিষ্ট করিয়া সমুৎপন্ন। এই সিদ্ধান্তের মূলে ছিল মৌলের পরমাণু-ভার। প্রচলিত জ্ঞানে এরূপ প্রতিষ্ঠিত ছিল ও অল্প কয়েকটি ব্যতিক্রম উপেক্ষা করিলে এরূপ বলা চলিত যে, প্রায় সকল মৌলের পরমাণু-ভার হাইড্রোজেনের পরমাণু-ভারের সাধারণ গুণিতক। কিন্তু "ব্যতিক্রমেই নিয়ম প্রতিপাদ্য" এ নীতি বিজ্ঞানে চলে না ও বিশেষতঃ নানা পরীক্ষায় নির্ধারিত ক্লোরিন মৌলের পরমাণু-ভার ৩৫ বা ৩৬ না হইয়া প্রতি ক্ষেত্রেই ৩৫.৫ হওয়াতে প্রায় অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই প্রাউটের মতবাদ পরিত্যক্ত হইল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ জড়-বিজ্ঞানী অ্যাষ্টন প্রতিপন্ন করেন যে, সাধারণ ক্লোরিনেরই দুই প্রকার পরমাণু রহিয়াছে। ইহাদের রাসায়নিক গুণ-ধর্ম সম্পূর্ণ অভিন্ন; সেজন্য কোন রাসায়নিক উপায়ে ইহাদের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু অ্যাষ্টন দেখাইলেন যে, ইহাদের পরমাণু-ভার যথাক্রমে, ৩৫ ও ৩৭। এই আবিষ্কার যুগান্তকারী, সন্দেহ নাই। কারণ ইহা হইতেই সর্বপ্রথম পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ নিউক্লিয়াসের উপর আলোকপাত হইতে চলিল। যে বিখ্যাত যন্ত্র সাহায্যে অ্যাষ্টন উক্ত আবিষ্ক্রিয়ায় সাফল্য অর্জন করেন তাহার নাম দিয়াছেন মাস-স্পেক্টোগ্রাফ্ বা পরমাণুর ভার-বিশ্লেষক যন্ত্র।

এই যন্ত্রের ক্রিয়া-পদ্ধতি নিম্নরূপ:—তড়িতাবিষ্ট পরমাণু বা আয়নের এক ধারা সরল পথে গমন করিতে করিতে এমন এক তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্রে প্রবেশ করে যে স্থলে তড়িৎ-বল-দিক্ চৌম্বক বল-দিকের সমকোণে অবস্থিত। ক্ষেত্রের গুণে আয়ন-গতি-পথ বক্রতা প্রাপ্ত হয় ও ভর অনুযায়ী কণাগুলির পথও পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া যায়। ক্ষেত্রের প্রকোপ হইতে বহির্গত কণাগুলি আবার যথোপযুক্তরূপে সংস্থাপিত ফটোগ্রাফির ফিল্মের উপর পতিত হইয়া তাহাদের গতিপথের স্বাতন্ত্র্য জ্ঞাপন করে। সমভার বিশিষ্ট কণাগুলি একই বিন্দুতে পতিত হয়। ফিল্মের চিত্র হইতে পরমাণু-ভার নির্ধারণ করা চলে।

ক্লোরিন আয়ন-ধারা এই যন্ত্রে পরিচালিত করিয়া অ্যাষ্টন দেখিতে পান যে, ফিল্মের যেস্থলে ৩৫.৫ ভরের পরমাণুর আপতন নির্দিষ্ট, সেস্থলে কোন দাগই পড়েনা। প্রত্যুত প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ পরমাণু ৩৫ ভর নিদেশ করে ও ২৫ ভাগ ৩৭ ভর নির্দেশক বিন্দুতে পতিত হয়। সুতরাং ক্লোরিন যে দুই প্রকার পরমাণুর সমবায়ে সঞ্জাত তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকেনা। ইহারা আইসোটোপ বা সমপদ মৌল আখ্যায় আখ্যাত হয়। ক্লোরিনে আছে শতকরা ২৫ ভাগ গুরুভার সমপদ (ভর=৩৭) ও ৭৫ ভাগ লঘুতর সমপদ (ভর=৩৫)। সুতরাং পরমাণুর গড় ভার= $০.২৫ \times ৩৭ + ০.৭৫ \times ৩৫ = ৩৫.৫$। ইহা রাসায়নিক উপায়ে নির্ধারিত পরমাণু-ভারের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন। অ্যাষ্টনের যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, অধিকাংশ মৌলই দুই বা অধিক সংখ্যক সমপদের সমবায় মাত্র, তবে অনেক ক্ষেত্রেই একটি সমপদই অধিক মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কার্বনের (পরমাণু-ভার ১২) একটি সমপদ আছে—ভার ১৩; কিন্তু তাহার মাত্রা অতি সামান্য। অক্সিজেনকে সাধারণ ১৬ ভারের পরমাণু ধরা হইলেও উহাতে ১৭ ও ১৮ ভারের দুই জাতীয় পরমাণুর সমপদ সামান্য মাত্রায় মিশ্রিত আছে।

১৯৩২ খৃঃ অব্দে মার্কিণ বিজ্ঞানী উরে প্রমাণ করেন যে, যে হাইড্রোজেনের পরমাণু সর্বাপেক্ষা লঘুতম মনে করিয়া তাহার ভারকেই পরমাণু ভারের একক ধরা হয়; তাহাতেও অতি সামান্য মাত্রায় এক ভারী সমপদ মিশ্রিত থাকে। ইহার ভার পূর্বপরিচিত

হাইড্রোজেন পরমাণুর ২ গুণ। এই ভারী হাইড্রোজেন সমপদের নাম হইয়াছে ডয়টেরিয়ম ও ইহারই সহিত অক্‌সিজেনের সংশ্লেষণে উৎপন্ন জলকে বলা হয়, ভারী জল। সাধারণ জল হইতে উরে ভারী জলাংশ পৃথক করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সাধারণ ও ভারী জলের মধ্যে কোন রসায়নিক পার্থক্য নাই। তবে শেষোক্তটির ঘনাঙ্ক অধিক ও অন্যান্য দৈহিক গুণ-ধর্ম ও স্বতন্ত্র।

সমপদ মৌলের আবিষ্কার ও সঙ্গে সঙ্গে পরমাণু-ভারের পূর্ণ-সংখ্যাবাচকতার তত্ত্ব প্রাউটের প্রাচীন তত্ত্বের সমর্থন করিল ও আরও বিশদরূপে ব্যক্ত করিল যে, বিভিন্ন মৌলের নিউক্লিয়াস নানা সংখ্যায় হাইড্রোজেন মৌলের নিউক্লিয়াস লইয়া এক অপরূপ গঠনে গঠিত। হাইড্রোজেন মৌলের নিউক্লিয়াসের বিশেষ নাম দেওয়া হইয়াছে প্রোটন। তবে এ সম্বন্ধে বিশেষ নিঃসন্দেহ প্রমাণ পাওয়া যায় রাদারফোর্ডের ১৯৩২ খৃঃ অব্দের পরীক্ষার ফল হইতে। তিনি চাহিয়াছিলেন কোন মৌলকে মৌলান্তরে পরিণত করিতে। এজন্য নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন সাধন প্রয়োজন হেতু তিনিই প্রথমে নানাপ্রকার শক্তিশালী লোষ্ট্র-প্রয়োগে নিউক্লিয়াস হইতে প্রোটন বিতাড়নে সক্ষম হন।

তেজস্ক্রিয় মৌলের স্বতঃ-বিদারণে আলফাকণা রশ্মি-ধারারূপে নির্গত হয়। এই কণা প্রকৃতপক্ষে হিলিয়াম মৌলের নিউক্লিয়াস—পরমাণু হইতে বাহিরের দুইটি ইলেক্‌ট্রন তাড়াইয়া দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে। রাদারফোর্ড এই আলফাকণাই লোষ্ট্ররূপে ব্যবহার করেন। এই কণা-রশ্মি নানা মৌলের স্বল্পবেধ স্তরের ভিতর দিয়া পরিচালিত করার ফলে তিনি বহুসংখ্যক প্রোটন-কণা প্রাপ্ত হন। এই সকল প্রোটন নিশ্চয়ই প্রহত নিউক্লিয়াস হইতে বিনির্গত হইয়াছে। সুতরাং নিউক্লিয়াস মাত্রেরই অবশ্য-বর্ত্তমান-উপাদান প্রোটন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকেই একমাত্র উপাদান বলা যায় না।

নানা মৌলের পরমাণু-ভর ও নিউক্লিয়াসের+ তড়িতাধান সম্বন্ধে আমরা যে সকল তথ্য অবগত আছি, তাহার সহিত উপরের মতের সামঞ্জস্য হয়না। সহজ হিসাবেই দেখা যায় যে, অক্‌সিজেন পরমাণু-কোষে ভার অনুযায়ী ১৬টি প্রোটন ও দুই প্রকার ক্লোরিন আইসোটোপে যথাক্রমে ৩৫ ও ৩৭টি প্রোটন থাকিবে। কিন্তু তাহা হইলে তড়িদ্ধর্মহীন পরমাণুর ভার ও পরমাণু-অঙ্কও যথাক্রমে ১৬, ৩৫, ও ৩৭ হয়। কিন্তু ইহা সত্য নহে। মৌলের বেলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরমাণু-অঙ্ক পরমাণু-ভারের প্রায় অর্দ্ধেক। পরমাণুর গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই অনুপাতও হ্রাস পাইতে থাকে। গুরুতম মৌল ইউরেনিয়ামের পরমাণু-অঙ্ক ৯২, কিন্তু পরমাণু-ভার ২৩৮। অক্‌সিজেন, সালফার ও পারদের বেলায় উক্ত অনুপাত যথাক্রমে $\frac{৮}{১৬}$, $\frac{১৬}{৩২}$, $\frac{৮০}{২০০}$। দেখিয়া মনে হয়, গুরুতর মৌলের নিউক্লিয়াসের প্রোটনে সংখ্যা হিসাবের অর্দ্ধেক হইলে পরীক্ষালব্ধ ফলের সহিত সামঞ্জস্য থাকে। যদি মনে করা যায় যে, হিসাবে প্রাপ্ত প্রোটনের অর্দ্ধাংশ কোন অজ্ঞাত কারণে তড়িদ্ধর্মহীন হইয়া গিয়াছে তাহা হইলে রহস্যের সমাধান হয়। এই তড়িদ্বিহীন প্রোটনগুলি নিউক্লিয়াসে থাকিয়া পরমাণু-ভার বাড়াইতেছে মাত্র, তড়িতাধানে ইহাদের কোন অবদান নাই। এই কাল্পনিক তড়িদ্ধর্মহীন প্রোটনের অস্তিত্ব ১৯৩২ খৃঃ অব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহারা নিউট্রন নামে আখ্যাত হয়। এই আবিষ্ক্রিয়ার ইতিহাস অতি চমৎকার।

জার্মান বিজ্ঞানী বোথে দেখিতে পান যে, বেরিলিয়ামের উপর আলফাকণা প্রহৃত হইলে, এক প্রকার রশ্মি-ধারা নির্গত হয়। ইহাকে প্রথমে বেরিলিয়াম নিউক্লিয়াস হইতে বিকীর্ণ গামা-রশ্মি বলিয়াই মনে হইয়াছিল; কিন্তু প্রায় একই সময়ে কুরি ও জোলিয়ট দেখিতে পান যে, উক্ত রশ্মি-ধারা কোন গ্যাসের ভিতর দিয়া গমন কালে তাহার অণুগুলিকে প্রভূত বেগে বেগবান করে। পরের বৎসরেই রাদার-

ফোর্ডের প্রিয় শিষ্য শ্যাডউইক নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেন যে, এই নূতন রশ্মি প্রোটন কণার ন্যায়ই এক প্রকার কণার ধারা; তবে এই নূতন কণাগুলি একেবারে তড়িদ্ধর্ম বিহীন। ইহাদেরই নাম নিউট্রন কণা। ইহারা কোন পদার্থের ভিতর দিয়া গমন কালে কথন কথন সম্মুখে আপতিত অণুতে প্রহৃত হইলেই তাহাকে নিজেদের বেগে বেগবান্ করে। কুরি ও জোলিয়ট এই কার্যটিই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সমৃদ্ধ-বেগ অণুর পথ উইলসন পরিকল্পিত মেঘ-প্রকোষ্ঠে পরিদৃশ্যমান করিয়া তাহার আলোকচিত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে।

এই নিউট্রন কণা আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র নানা মৌলের নিউক্লিয়াসের গঠন-পদ্ধতি প্রাঞ্জল হইল। ইহাই বর্তমানে সর্ববাদিসম্মত সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য যে, নিউক্লিয়াসের ভিতরে প্রায় অর্ধেক প্রোটন ও অপরার্ধ নিউট্রন-কণা। মৌলের পরমাণু-অঙ্ক প্রোটন-কণার সংখ্যা নির্দেশক আর পরমাণু-ভার হইতে পরমাণু-অঙ্ক বিয়োগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাই নিউট্রন সংখ্যার নির্দেশক। কার্বন নিউক্লিয়াসের তড়িতাধান ৬ ও পরমাণু-ভার ১২; সুতরাং উহাতে আছে ৬টি প্রোটন ও ৬টি নিউট্রন। লৌহের পরমাণুতে ২৬টি প্রোটন ও (৫৪ – ২৬ =) ২৮টি নিউট্রন। সর্বাপেক্ষা গুরুতম মৌল ইউরেনিয়মের নিউক্লিয়াসে আছে ৯২টি প্রোটন ও (২৩৮ – ৯২ =) ১৪৬টি নিউট্রন।

গুণ-ধর্ম বিচারে নিউট্রনকে ঠিক নূতন কণা বলা যায় না। কোন অজ্ঞাত কারণে প্রোটন তাহার তড়িতাধান হারাইলেই জড় কণা নিউট্রনে পরিণত হইতে পারে। অনেক পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়াছে যে তড়িৎ হারাইয়া প্রোটন নিউট্রন হয় ও নিউট্রনও তড়িৎ গ্রহণে প্রোটনে পরিণত হয়। এইজন্য বর্তমান নিউক্লিয়াস বিজ্ঞানে "নিউক্লিয়ন" নামে এক নূতন সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইতেছে। নিউক্লিয়াসের দুইটী উপাদানের মধ্যে প্রোটনকে তড়িদ্ধর্মযুক্ত নিউক্লিয়ন ও নিউট্রনকে তড়িদ্ধর্মহীন নিউক্লিয়ন বলিতে পারি।

উপরে নিউক্লিয়সের প্রায় অর্ধেক প্রোটন ও অপরার্ধ নিউট্রন এরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ ভাগ বাটোয়ারা নিউক্লিয়াসের আভ্যন্তরিক স্থির বা সাম্যাবস্থার উপর নির্ভর করে। যদি কোন আণবিক প্রতিক্রিয়ার ফলে নূতন নিউক্লিয়াস গঠিত হয় যাহার প্রোটন বা নিউট্রন সংখ্যা এত অধিক যে. আভ্যন্তরিক স্থিরাবস্থার সংরক্ষণ অসম্ভব, তাহা হইলে তড়িতাধানের নবতর ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হইতে পারে। প্রোটন সংখ্যা অত্যধিক হইলে তাহাদের কাহারও কাহারও তড়িৎ বিযুক্ত ও বিনির্গত হইয়া যায়। তখনই নিউক্লিয়াস হইতে পজিট্রন কণা বাহির হইয়া আসে। পক্ষান্তরে নিউট্রন সংখ্যা অধিক হইলে বিপরীত ক্রিয়া সাধিত হয়। কোন কোন নিউট্রন ইলেকট্রন ত্যাগ করিয়া প্রোটনে রূপান্তরিত হইয়া যায়। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, নিউট্রন সম পরিমিত + ও – তড়িদ্ধর্মযুক্ত দুইটি জড়কণার সংহতিতে সমুৎপন্ন।

বর্তমান জড়বিজ্ঞানে পরমাণুর অন্দর মহলের উক্ত প্রকার চিত্রই প্রকট হয়। এ তত্ত্ব বহু মনীষীর চিন্তা, পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা প্রসূত। এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই।

বিজ্ঞানের অদৃশ্যলোক ও তাহার সত্যাসত্য

শ্রীপ্রবাসজীবন চৌধুরী

সাধারণতঃ আমরা মনে করে থাকি যে, বিজ্ঞান যে সকল অণু পরমাণুদের কথা বলে তারা অপর সকল বস্তুর মতই প্রাকৃত, অর্থাৎ তাদের বাস্তব অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা সন্দেহ করি না। এ কথাও অনেকে জানেন না বা জানলেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না যে, এই সব তথাকথিত বস্তুকণাগুলিকে কোন অনুবীক্ষণ দ্বারাই প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়নি। অতি অনুবীক্ষণ (ultra microscope) সাহায্যে শুধু এই অনুগুলি দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আলো দেখা যায়, যেমন নদীতীরে বালুকণা হতে সূর্যালোককে দেখি। তখন আমরা বালুকণাগুলিকে দেখি না, শুধু সেই বিক্ষিপ্ত ঝিকিমিকি আলোকেই দেখি, বালুকণাকে অনুমান করি মাত্র; সুতরাং অতি অনুবীক্ষণ দ্বারা এইটুকুই প্রমাণিত হয় যে, কোন বস্তুকণা আলোকতরঙ্গকে ইতস্ততঃ ভেঙ্গে বিক্ষিপ্ত করছে। কিন্তু এই কণাকে দেখেছি বললে অত্যুক্তি হবে। বালুকণাগুলিকে আগে দেখেছি। সেইজন্য তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না, কিন্তু এই অণুপরমাণুদেরই সংগে কখনও সাক্ষাৎ হয়নি, তাই তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যয় জন্মানো একটু কঠিন। কারণ অনুমিত কোন বস্তু সম্পর্কে আমরা তখনই নিশ্চিত হতে পারি যখন দেখি যে সেই বস্তুটিকে পূর্বে বহুবার লক্ষ্য করেছি, যেমন আগুন হতে ধোঁয়াকে বহুবার লক্ষ্য করেছি বলেই কোন ঘরে ধোঁয়া দেখলে আগুনকে চাক্ষুষ না দেখলেও তাহার অবস্থিতি অবশ্য স্বীকার্য মনে হয়। কিন্তু এখানে অণুদের অস্তিত্ব এইরূপ অনুমানের ওপর নির্ভর করে না, এর ভিত্তি একপ্রকার উপমানের ওপর। আমরা এইভাবে বিচার করে অণুদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি:—আমরা বলি, "যেমন ক্ষুদ্র বস্তুকণার বেলায় দেখা গেছে যে, তারা আলোকে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ফেলে সেই রকমই মনে করা যেতে পারে যে, অতি অনুবীক্ষণে লক্ষিত ঝিকিমিকি আলোক-পুঞ্জগুলিই এই অণুদের কেন্দ্র করে আছে। অণুগুলি নিশ্চয় তাদের ওপর নিক্ষিপ্ত আলোকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করছে। (এইরূপ আলোক-বিক্ষেপকে ইংরাজিতে Scattering বলে এবং এইরূপ বিচার পদ্ধতিকে analogical argument বলে)। এখন দেখতে পাই যে, যদিও আমরা এইরকম বিচার দিয়ে অনুপরমাণুদের সত্তা সম্বন্ধে আস্থাবান হই তবুও একথা নিশ্চিত যে, আমরা এদের আকার প্রকার বিষয়ে কিছুই জানি না। অর্থাৎ এরা গোল, চৌকো না লম্বা তা জানি না, এরা তরল না কঠিন, মসৃণ না খরখরে, ঠাণ্ডা না গরম, ইত্যাদি যত কিছু গুণ কোন পদার্থ সম্বন্ধে জানবার থাকে, আমরা কিছুই জানি না। সুতরাং এদের অন্য পদার্থের মত বাস্তব বলে মনে হয় না।

এ কথার উত্তরে অনেকে হয়তো বলবেন যে, বিজ্ঞান এ সমস্ত তথ্য ধীরে ধীরে সংগ্রহ করবে, বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে নতুন নতুন সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির উদ্ভব হবে এবং এদের দিয়ে এই অ-দৃষ্ট রাজ্য দৃষ্ট হবে। কিন্তু তারও আশা নেই। কারণ এই সত্তাগুলির যে আয়তন অনুমিত হয়েছে তা ক্ষুদ্রতম আলোক-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হতেও ছোট, সুতরাং বিজ্ঞান মতেই এরা চিরকাল অদৃশ্যই থাকবে। সেইজন্য এদের কী রঙ একথা উঠতেই পারে না, এমনকি এদের কালো বলাও চলে না। আবার এদের ছুঁলে কী রকম বোধ হবে এও অতিপ্রশ্ন। কারণ আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয় কোন স্থূল

পদার্থকেই অনুভব করতে পারে। ঘসা কাঁচ আর মসৃণ কাচের অনুগুলিতে কোন তফাৎ হয় না, শুধু কাঁচের উপরিভাগে অণু-সমষ্টির অবস্থানের কিঞ্চিৎ তারতম্য ঘটে। বলা যেতে পারে যে এমন দিন আসতে পারে যখন ক্রম-বিবর্তনের ফলে মানুষ এক একটি অণুকেও স্পর্শ করতে পারবে, তখন আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয় এত সূক্ষ্ম হবে যে তাদের তুলনায় অণুপরমাণুরা স্থূল মনে হবে। এর উত্তরে এই বলা যায় যে, তা' হলে তখন আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি যে বস্তুকণা দ্বারা গঠিত হবে তাদের জানা তেমনই কঠিন হবে যেমন আজ অণুপরমাণুদের জানা কঠিন হচ্ছে। তা ছাড়া এমন সময় যখন আসবে তখনই অণু-পরমাণুদের নিয়ে উৎসাহ প্রকাশ করা সঙ্গত হবে, এখন নয়। এই সূক্ষ্ম সত্তাগুলির উত্তাপ কত এ প্রশ্নও অর্থহীন, কারণ এদের চঞ্চল গতি হতেই উত্তাপের সৃষ্টি হয়, এদের একটিকে সামনে ধরে পরীক্ষা করলে উত্তাপের কোন লক্ষণই পাওয়া যাবে না। যেমন কোন ছাত্র-মিছিল থেকে এক একটি ছাত্রকে অধ্যক্ষের ঘরে ডেকে দেখলে মিছিলের উত্তাপের কোন ধারণাই হয় না।

চোখে দেখা আর স্পর্শ করার বাইরে এই আণবিক জগতকে কানে শোনা, ঘ্রাণ করা বা রসনা দ্বারা আস্বাদ করাও অসম্ভব। অতএব এর সত্তা সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান হই। এই জগতের অধিবাসীদের কেবল কয়েকটি প্রাথমিক গুণ আছে বলে কল্পনা করা হয়। গুণগুলি হচ্ছে—আয়তন, ভর ও গতি। কিন্তু মাত্র এই কয়টি গুণসমন্বিত কোন সত্তাকে কল্পনা করা কঠিন এবং এরা যে সাধারণ বস্তু সকলের সমগোত্রীয় নয় তা' বলা বাহুল্য। এবং যেহেতু কোন বস্তুর যাথার্থ্য প্রমাণিত হয় তার গুণাবলীর প্রত্যক্ষ দর্শন হতে, সেইজন্য এই স্বল্প গুণবিশিষ্ট সত্তাগুলির যাথার্থ্য নিয়ে মতভেদের সৃষ্টি হওয়া অসঙ্গত নয়। আধুনিক বিজ্ঞান-দর্শনে এই মতভেদ যথেষ্ট হয়েছে। অণু, পরমাণু, ইলেক্ট্রন ইত্যাদি অদৃশ্য কণাগুলি সত্যই আছে, কি তারা কল্পনা মাত্র এই নিয়ে বিজ্ঞান-দার্শনিকেরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে বাক্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়েছেন আজ বহু বৎসর ধরেই। আমরা বর্তমান প্রবন্ধে এই সবের মধ্য প্রবেশ না করেও বিষয়টি সহজে বুঝতে চেষ্টা করবো।

ইহার জন্য আমাদের বিজ্ঞানবিদের অনুসন্ধান প্রণালীকে সংক্ষেপে পরীক্ষা করে জানতে হবে যে, তিনি কি প্রকারে এইসব সূক্ষ্ম সত্তাগুলির অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি প্রথমেই অতি অণুবীক্ষণ সাহায্যে এগুলিকে দেখতে যাননি, এগুলিকে প্রথমে অনুমান করেন এবং অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্যই ওই যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। আমরা দেখেছি যে, এই যন্ত্র দিয়েও তিনি এদের দেখতে পাননি এবং দেখা যে সম্ভব নয় একথাও স্বীকার করেছেন বললে ভুল হবে; কারণ তা হলেই মেনে নেওয়া হল যে, এগুলি যথার্থই ছিল ও আছে। সুতরাং অনেকে বলেন যে, এগুলিকে বিজ্ঞানবিদ্ কল্পনা করেছেন। এগুলি আবিষ্কার নয়, উদ্ভাবিত মানসিক ধারণা মাত্র। এরকম কী করে সম্ভব হলো তাই আলোচনা করা যাক। যদি দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি দিনের বেলায় খায় না অথচ বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট হচ্ছে তখন এটা ধরে নিতে হবে যে সে নিশ্চই রাতে লুকিয়ে ভাল-মন্দ খায়। ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্য একদল এইরূপভাবে লব্ধ জ্ঞানকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন, তাঁরা একে একটি প্রমাণ হিসাবে দেখেন এবং 'অর্থাপত্তি' আখ্যা দেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিক-দের মতে এরূপ জ্ঞানকে সম্যক বলে মনে করা ভুল। এঁরা বলেন যে, উদাহরণের ব্যক্তিটির রাত্রে ভোজন করার ব্যাপারটি তখনই সত্য বলে পরিগণিত হবে যখন কেউ তা প্রত্যক্ষ করবে, তা না হওয়া পর্যন্ত এই জ্ঞান কেবল একটি পূর্ব-সিদ্ধান্ত বা প্রকল্পেরই পর্যায়ে থাকবে এবং এদের সত্যাসত্যের কোন মীমাংসাই হবে না। (ইংরাজিতে এদের Postulate বা Hypothesis বলে এবং

এদের সত্যতাকে মেনে নেওয়া হয় Provisionally)। বিজ্ঞানে এইরূপ প্রকল্পের ব্যবহার হয়ে থাকে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাদের পরে প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা করে সম্যক জ্ঞানের বা সত্যের কোঠায় তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু এই সূক্ষ্ম অণুপরমাণুদের বেলায় এমন গোত্রোন্নতি সম্ভব হয়না। উদাহরণতঃ—,জ্যোতিষে দেখা গেল যে, ইউরেনাস গ্রহের গতিবিধির কিছু তারতম্য ঘটছে, কোথাও অন্য কোন গ্রহ থাকলে তার আকর্ষণের ফলে যেমন আশা করা যায় তেমনই বিক্ষেপ লক্ষ্য করা গেল। এই নতুন গ্রহটির তাই প্রকল্প হলো, এবং এর অবস্থান গতি ইত্যাদির হিসাব করা গেল। পরে শক্তিশালী দুরবীক্ষণ সাহায্যে যথার্থই দেখা গেল যে, একটি গ্রহ পরিগণিত স্থানেই অবস্থান করছে। সুতরাং এই গ্রহটির যাথার্থ্য প্রমাণিত হলো এবং একে নেপচুন নাম দেওয়া হল। যা' প্রকল্প ছিল তা' সত্য বলে স্বীকৃত হলো। কিন্তু অণুপরমাণুদের বেলায় এরূপ প্রত্যক্ষ পরীক্ষা অসম্ভব, এখানে তাদের দ্বারা উৎপন্ন কোন ব্যাপারকেই প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন কোন গ্যাসের অণুগুলির সংঘাত জনিত চাপ বা তাদের চাঞ্চল্য জনিত উত্তাপ বা তাদের দ্বারা বিক্ষিপ্ত আলো। অর্থাৎ তাদের প্রমাণ প্রত্যক্ষ না হয়ে পরোক্ষ হতে বাধ্য। বিজ্ঞানবিদ্ এদের পরিকল্পনা করেন এই সমস্ত ব্যাপারগুলিকে বুঝিবার জন্যই। উত্তাপের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি অণুদের পরিকল্পনা করেন। তাদের চঞ্চল গতিকেই উত্তাপের কারণ বলেন। এই অণুগুলিই আবার খুব চঞ্চল হলে অধিক স্থান অধিকার করে। সুতরাং কোন বস্তু উত্তপ্ত অবস্থায় আয়তনে বেড়ে যায়। আবার কোন বদ্ধ পাত্রে গ্যাস রাখলে পাত্রের গায়ে অণুদের ধাক্কা হতেই চাপের সৃষ্টি। এইরূপে বিজ্ঞানবিদ্ অণুদের কল্পনা করে কয়েকটি পরীক্ষিত বস্তু-ব্যাপারের ব্যাখ্যা করেন; কিন্তু এই অণুদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁর নেই। এরা তাই তাঁর মানসিক ধারণা মাত্রই এবং এদের বাস্তবিক সত্তা কিছু আছে কিনা এ প্রশ্ন স্বতঃই ওঠে।

প্রত্যক্ষবাদীদের মতে এই সব সূক্ষ্ম সত্তাগুলির কাজ আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতা বা সংবেদনা রাশির মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য সাধন করা। এরা প্রকৃতপক্ষে নেই, অর্থাৎ এরা বস্তু নয় প্রত্যয়মাত্র। অভিজ্ঞতার বৈচিত্রের মধ্যে যে কয়েকটি নিয়মের সূত্র বিজ্ঞানবিদ্ দেখেন তাদের সরল ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গিয়েই এই সব অণুপরমাণুদের কল্পনা করেছেন। এরা তাই নিজেরা ইন্দ্রিয়াতীত হয়ে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতাকে সুশৃঙ্খল ও সুসমৃদ্ধ করে আমাদের জ্ঞানগোচর করে। বিশৃঙ্খল সংবেদনা সমূহ আমাদের হতবুদ্ধিই করে, জ্ঞান দেয় না। বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলি তাই ঐক্যসূত্রের কাজ করে, এরা অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত সমষ্টি বা সাঙ্কেতিক প্রতিভাস মাত্র। (ইংরাজিতে mental summary বা shorthand বলা হয়) এদের সত্তা মানসিক, কিন্তু তাই বলে এদের নিছক কল্পনা বা খেয়ালখুসির সৃষ্টি মনে করাও অন্যায় হবে; কারণ এরা কোন বিশেষ মন-বুদ্ধি-রুচির ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বহির্জগতের রূপবৈচিত্রের মধ্যে যে প্রাকৃতিক নিয়মাবলী আছে তাদের ওপর। এই নিয়মগুলিকেই বিজ্ঞানবিদ্ নিরীক্ষা-পরীক্ষা দ্বারা আবিষ্কার করেন এবং এদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও ব্যাখ্যা দেবার জন্যই সূক্ষ্ম সত্তাদিগের কল্পনা করেন। এরা তাই প্রাকৃতিক না হলেও প্রকৃতি-নিরপেক্ষ নিছক মন-গড়া কিছু নয়, এদের সৃষ্টি বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত কল্পনা হতে হলেও এদের ভিত্তিস্থল ব্যক্তি নিরপেক্ষ বাহ্য অভিজ্ঞতা। এক কথায় বলতে হয় যে, যদিও এরা বাস্তবিক অস্তিত্বের অধিকারী নয়, তথ্য না হয়ে তত্ত্ব মাত্র, তবুও এদের আত্মমুখী subjective না মনে করে বিষয়মুখী (objective) মনে করাই উচিত।

পরমাণু-শক্তি সম্পর্কিত সাংকেতিক ভাষা

আলফা কণা—রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থ কর্তৃক বিচ্ছুরিত হিলিয়াম পরমাণুর তড়িতাবিষ্ট কেন্দ্রীণ।

পরমাণু—পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ, যার রাসায়নিক ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকে।

বিটা-কণা—রেডিও অ্যাকটিভ পরমাণু কর্তৃক বিচ্ছুরিত উচ্চগতি সম্পন্ন (ঋণ তড়িতাবিষ্ট) ইলেকট্রন।

ক্যালিউট্রন—আইসোটোপ পৃথক করবার জন্যে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভাবিত একরকমের যন্ত্র। সাইক্লোট্রনের পরিবর্তিত সংস্করণ।

সাইক্লোট্রন—কুণ্ডলীকৃত পথে পরিচালনার ফলে বর্ধিত গতিবেগ কণিকার সাহায্যে পরমাণবিক লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানবার যন্ত্র।

ডি. এস. এম প্রোজেক্ট—(পুরা কথাটা হলো—ডেভেলপমেন্ট অফ সায়েন্টিফিক মেটেরিয়েল।) অ্যাটম-বোমা প্রতিষ্ঠানের সামরিক সাংকেতিক নাম।

ইলেকট্রন—পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থ অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের বাইরের কক্ষে ঘূর্ণায়মান ঋণ তড়িতাবিষ্ট কণিকা।

এলিমেন্ট—বিশেষ বিশেষ রাসায়নিক গুণসম্পন্ন মূল পদার্থ। অনেকগুলো এলিমেন্টের আবার বিভিন্ন রকমফের আছে। তাদের বলা হয় আইসোটোপ। তাদের রাসায়নিক ধর্ম একই রকমের।

ফিসন—পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থের অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের ভাঙন, যাতে দুই বা ততোধিক বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ উৎপন্ন হয়।

গামা রেডিয়েসন—উচ্চ ভেদকারী শক্তি সম্পন্ন রশ্মি। এই রশ্মি এক্স-রে'র মত হলেও তরঙ্গ-দৈর্ঘে অনেক ছোট।

হাফ-লাইফ—সম্পূর্ণরূপ ক্ষয় অর্থাৎ ডিসইন্টিগ্রেসন ব্যতিরেকে রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থের স্থিতি-কালের তুলনামূলক পরিমাপ।

ভারী জল—যে জলে দ্বিগুণ গুরুত্ব সম্পন্ন হাইড্রোজেন আইসোটোপ অর্থাৎ ডয়টেরিয়াম বিদ্যমান।

হট লেবরেটরী—তীব্র রেডিও অ্যাকটিভ পদার্থের প্রভাব-মুক্ত দূরস্থিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার যন্ত্র গৃহ।
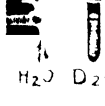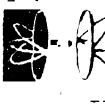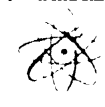
আইসোবার—একই রকমের পরমাণবিক গুরুত্ব সম্পন্ন দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ।

আইসোটোপ—একই রাসায়নিক গুণ বিশিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্ব সম্পন্ন পরমাণু গঠিত পদার্থ।

মাস স্পেকট্রোগ্রাফ—আইসোটোপ বা প্রায় একই রকমের বিভিন্ন পদার্থ পৃথকীকরণ যন্ত্র।

মডারেটর—কার্বন বা ভারী জল প্রভৃতি পদার্থ, যা পরমাণু-সংঘর্ষে নিউট্রন বুলেটগুলোকে শোষণ বা আত্মসাৎ না করে তাদের গতি মন্দীভূত করে দেয়।

নেপচুনিয়াম—অধুনা উৎপাদিত ক্ষণস্থায়ী নতুন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ।

নিউট্রন—পরমাণুর কেন্দ্র অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের মধ্যস্থিত কণিকা। এতে কোন তড়িতাবেশ নেই। পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে ভাঙবার জন্যে নিউট্রন কণিকা বুলেটরূপে ব্যবহৃত হয়।

নিউক্লিয়াস—পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থ। একে কেন্দ্রীণ বলা যেতে পারে। নিউট্রনের আঘাতে নিউক্লিয়াস চূর্ণ হয়ে যেতে পারে।

পাইল—প্লুটোনিয়াম নামক নতুন মৌলিক পদার্থ উৎপাদনের জন্যে বিশুদ্ধ গ্র্যাফাইট-ব্লক নির্মিত নির্দিষ্ট আয়তনের স্তূপ। এই স্তূপের মধ্যে স্থানে স্থানে নির্ধারিত দূরত্বে কতক গুলো ইউরেনিয়াম 'রড' বসানো থাকে।

পাইলট প্ল্যান্ট—কোন বিরাট কারখানা স্থাপনের পূর্বে বিভিন্ন কার্য পদ্ধতি পরীক্ষার জন্যে ক্ষুদ্রায়তনের যন্ত্রাগার বা কারখানা।

প্লুটোনিয়াম—অধুনা উৎপাদিত নতুন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ। এই পদার্থ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী। প্লুটোনিয়াম পরমাণু বিস্ফোরিত হওয়ার ফলে পরমাণবিক শক্তি নির্গত হয়।

প্রোটন—পরমাণুর কেন্দ্রীণের ধন তড়িতাবিষ্ট প্রধান কণিকা।

রেডিও অ্যাকটিভিটি—কতক গুলো মৌলিক পদার্থের স্বতঃ অথবা কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত ক্ষয় অর্থাৎ ডিসিন্টিগ্রেসন।

ইউরেনিয়াম—রেডিয়াম শ্রেণীর পদার্থের জনয়িতা একরকমের মৌলিক পদার্থ। এ পদার্থের মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ ২৩৫ আইসোটোপ পাওয়া যায়, তা থেকে পরমাণু-শক্তি নির্গত হয়। -গ-

পৃথিবীর অভ্যন্তরের অবস্থা

শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি তাহার অভ্যন্তরের বিষয় জানিতে কাহার না উৎসুক্য হইয়া থাকে! ভূ-বিশেষজ্ঞমণ্ডলী পৃথিবীর অন্তস্তরের বিষয় জানিতে গিয়া প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছেন এবং অনেকাংশে তাহারা সফল হইয়াছেন। পৃথিবীর অভ্যন্তরের কথা মনে পড়িলে স্বভাবতই মনে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় পৃথিবীর অভ্যন্তর—তরল, কঠিন বা গ্যাসীয়—কোনটি? আমরা এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে প্রথমে চেষ্টা করিব।

মহাদেশের উপরিভাগের শিলা প্রধানতঃ পাললিক। এই শিলা সাধারণতঃ ½ মাইল হইতে ১½ মাইল পর্যন্ত পুরু হইয়া থাকে। এই পাললিক শিলার তলদেশে ক্রিষ্টালাইন শিলা দেখা যায়। পৃথিবীর সর্ব পুরাতন অংশে অর্থাৎ সিল্ড অঞ্চলে এই ক্রিষ্টালাইন শিলাকে বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে দেখা যায়। এই শেষোক্ত শিলার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩ হইতে কিছু কম। সমগ্র পৃথিবীর শিলাসমষ্টির আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫·৫। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়—পৃথিবীর অন্তস্তরের শিলার আপেক্ষিক গুরুত্ব আরো অধিক। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, জল হইতে এই শিলা ৭॥০ গুণ ভারী হওয়ার কথা।

অনেকের মনে হইতে পারে উপরিভাগের প্রচণ্ড চাপে পৃথিবীর অন্তস্থলের শিলার আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। কিন্তু একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, চাপবৃদ্ধির ফলে আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়িয়া যাইবার একটা সীমা আছে। এই সীমা অতিক্রম করিলে যত প্রচণ্ড চাপই হউক না কেন আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়ে না। ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, পৃথিবীর অন্তস্থলের শিলা অন্যান্য শিলা হইতে অনেক ভারী। আপেক্ষিক গুরুত্বও অধিক। একমাত্র নিকেল ও লৌহের মিশ্রণঘটিত ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব এত অধিক হইতে পারে। উল্কাপাতের পর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহার শিলা নিকেল ও লৌহের মিশ্রণে গঠিত। পৃথিবীর এক অবস্থায় এই উল্কা পৃথিবী হইতেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, পৃথিবীর অন্তস্তর নিকেল ও লৌহ জাতীয় ধাতু দ্বারা গঠিত।

পৃথিবীর অভ্যন্তরের দিকে যতই যাওয়া যায় ততই তাহার উষ্ণতা বাড়িতে থাকে। এই উষ্ণতা গড়ে ১০৮ ফুটে ১° সেন্টিগ্রেড বাড়িয়া থাকে। এই হারে উষ্ণতা বাড়িয়া চলিলে পৃথিবীর অভ্যন্তরের উষ্ণতা অত্যন্ত অধিক হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অগ্ন্যুৎপাতের সময় ভূগর্ভ হইতে উৎক্ষিপ্ত গলিত শিলা বা লাভার উষ্ণতা হইতে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক উষ্ণতার কিছু ধারণা পাওয়া যায়। এই উষ্ণতায় অন্তস্তরের শিলা তরল হইয়া যাওয়ার কথা। ভূত্বকের নীচে যে এক তরল শিলার স্তর আছে, এই ধারণা কয়েকটি প্রমাণের ফলে পরিত্যক্ত হইয়াছে। পৃথিবীর অন্তস্তরের যে উষ্ণতা বর্তমান সেই উষ্ণতায় সেইখানকার ব্যাসাল্টশিলা তরলাবস্থায় থাকার কথা; কিন্তু অভ্যন্তরের অত্যধিক চাপ এই শিলাকে তরলাবস্থায় আনিতে দেয় না। পৃথিবীর অন্তস্তর তরল হইলে জোয়ার ভাঁটার সময় পৃথিবীর কোন না কোন অংশ স্ফীত হইত। কিন্তু জোয়ার ভাঁটার সময় পৃথিবী কঠিন পদার্থের মত ব্যবহার করে। ভূকম্পনের সময় ভূকম্পন-স্রোত পরীক্ষা

করিয়া দেখা গিয়াছে, যে-স্রোত পৃথিবীর অন্তস্তর পরিভ্রমণ করে সেই স্রোত কঠিন ও তরল পদার্থের ভিতর দিয়া গমন করিতে সক্ষম। কিন্তু যে স্রোত কেবল কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়া গমন করিতে পারে তাহা পৃথিবীর অন্তস্তর ভেদ করিতে পারে না। অন্যপক্ষে যে স্রোত কেবলমাত্র তরল পদার্থের ভিতর দিয়াই গমন করিতে পারে তাহাও পৃথিবীর অন্তস্তর ভেদ করিতে পারে না। ইহাতে মনে হয়, পৃথিবীর অন্তস্তর কঠিনও নয়—তরলও নয়—কঠিন ও তরল পদার্থের মধ্যবর্ত্তী গুণবিশিষ্ট কোন ধাতু দিয়া গঠিত। অবশ্য এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত আছে। কিন্তু নিম্নলিখিত বিষয় তিনটিতে বিজ্ঞানীরা একমত—

(১) হঠাৎ কোন বহির্শক্তির প্রয়োগে পৃথিবীর অভ্যন্তর কঠিন বলিয়া মনে হয়।

(২) অবস্থা বিশেষে পৃথিবীর অন্তস্তর ও বহিস্তরের মধ্যবর্ত্তী স্তর পিচের মত আঠাল পদার্থ দ্বারা গঠিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

(৩) পৃথিবীর অন্তস্তরের শিলার উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইলে অথবা উপরিস্থিত চাপ কমিয়া গেলে তরল পদার্থে পরিণত হয় এবং আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করে।

ভূবিদ্ ও পদার্থবিদ্গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন—পাললিক শিলার নীচে সাধারণ গ্রানাইট শিলার গুণবিশিষ্ট শিলাস্তর রহিয়াছে। এই শিলাস্তরকে Sial বলে। Sial এর নীচে অপেক্ষাকৃত ভারী শিলার স্তর বা Sima অবস্থিত। Simaর নীচে গুরুশিলা ও ধাতুমিশ্রিত এক স্তর বর্ত্তমান। শেষোক্ত বর্ণিত স্তর হইতে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত লৌহ ও নিকেল জাতীয় ধাতু দ্বারা গঠিত স্তর বর্ত্তমান।

পূর্বেই বলিয়াছি যতই নীচে যাওয়া যায় ততই উষ্ণতা বাড়িতে থাকে। কেলভিনের মতে ৬০০০° ফা. উষ্ণতায় পৃথিবী তরল হইতে কঠিন গোলকে রূপান্তরিত হইয়াছিল। পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ লাভাদির উষ্ণতা ২০০০° ফা.। সূর্যের উপরিভাগের উষ্ণতা ৬০০০° ফা.। সুতরাং পৃথিবীর অন্তস্তরের উষ্ণতা ২০০০° ফা. এর কম নহে ও ৬০০০° ফা. এর বেশী নহে। পৃথিবীর বিভিন্ন শিলাস্তরের ভিতর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব কেলভিনের জানা ছিল না। তাঁহার গণনা তাই নির্ভুল হয় নাই। কারণ এই সকল তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপাদান পৃথিবীর অন্তস্তরের উষ্ণতা প্রচুর পরিমাণে বাড়াইয়া দেয়। আবার একথাও মনে রাখিতে হইবে অভ্যন্তরের উষ্ণতা পরিবহন প্রণালীতে অধিকতর শীতল ভূত্বকের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে অভ্যন্তরের উষ্ণতা কমিয়া যায়।

এই সকল তেজস্ক্রিয় পদার্থের ভিতর ইউরেনিয়াম ও রেডিয়াম প্রতিমুহূর্তে নিজ নিজ পরমাণু বিচ্ছিন্ন করিতেছে। এই সকল পরমাণু বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবীর অভ্যন্তরের কতখানি উষ্ণতা বাড়াইয়া দিতেছে তাহা যদি জানা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীর অভ্যন্তরের প্রকৃত উষ্ণতা জানা যাইতে পারে। যদি এই সকল তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপাদানের স্তরবিন্যাস ভূপৃষ্ঠে ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে সমান হয় তবে পরিবহন প্রণালীতে মুক্ত পৃথিবীর উষ্ণতা অপেক্ষা তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপাদান-সৃষ্ট উষ্ণতা অনেক বেশী হইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্নিবেশ Sial ও Simaর স্তরের ভিতরই অধিক।

'যতই পৃথিবীর অভ্যন্তরে যাওয়া যায় ততই তেজস্ক্রিয় পদার্থের অল্পতা ঘটে' এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া জেফ্রীস্ পৃথিবীর শীতল হওয়ার এক পরিমাণবাচক ইতিহাস দিলেন। পৃথিবী যখন তরল অবস্থায় ছিল, তখন পরিবহন স্রোতের বশ্যবর্তী হইয়া পৃথিবীর অন্তস্থিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ উপরের স্তরে চলিয়া আসে এবং উপরের স্তরে অবস্থিত শীতল পদার্থ গভীর অভ্যন্তরে চলিয়া যায়। সুতরাং এই স্রোতাবর্তের ফলে সর্বত্র উষ্ণতা কমিয়া যায়। ক্রমে চাপের

ফলে এই উষ্ণতা কমিয়া গলনাঙ্কে পরিণত হয়। প্রথমে ভূত্বকের অল্প নীচে শিলাস্তর কঠিন হয় এবং ভূত্বকের শিলা কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হয়। জেফ্‌রীস্ আরো গণনা করিয়া বলিলেন যে, মধ্যবর্তী শিলাস্তরের নিম্নপ্রদেশ হইতে ৩০০ কি, মি, নীচে পরিবহন প্রণালী দ্বারা প্রায় ৮০০° সে. উষ্ণতা কমিয়া গিয়াছে; কিন্তু এই স্তর হইতে ৬০০ কি, মি, আরো নীচে উষ্ণতা মাত্র কয়েক ডিগ্রী কমিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হইল যে, উপরোক্ত শেষোক্ত স্তরটি যদিও ভূকম্পন তরঙ্গে কঠিন বলিয়া প্রতিভাত হয় তথাপি এই স্তরটি নরম বা তরল পদার্থের কয়েকটি ধর্ম মানিয়া চলে। আরো অধিক চাপ প্রয়োগ করিলে ও উষ্ণতা কমিয়া গেলে এই স্তরটিও কঠিন স্তরে পরিণত হইবে, সন্দেহ নাই।

জেফ্‌রীস্ উদ্ভাবিত পৃথিবীর অভ্যন্তরের ইতিহাস ও অবস্থার সহিত সকলে একমত হইলেও কয়েকটী প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। বিজ্ঞানীরা তেজস্ক্রিয় পদার্থের স্তরবিন্যাস বিষয়ে জেফ্‌রীসের সহিত একমত নহেন। যদি তেজস্ক্রিয় পদার্থ সমগ্র শিলাস্তরে সমভাবে বিন্যস্ত থাকে, তাহা হইলে পৃথিবীর শীতল হওয়ার ইতিবৃত্ত জেফ্‌রীসের প্রদত্ত ইতিবৃত্ত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হইবে, সত্য। উষ্ণতার আধিক্য হেতু ভূত্বকের নিকটস্থ শিলা তরল শিলায় পরিণত হইবে। কিন্তু জেফ্‌রীস প্রদত্ত স্তরবিন্যাস হইতে অধিক দূরে তেজস্ক্রিয় পদার্থের আধিক্য ঘটিলে এই স্তরের শিলাও উষ্ণতার আধিক্য হেতু তরল শিলায় পরিণত হইবে। ভূত্বকের নিকটবর্তী স্তরে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অহেতুক সন্নিবেশের পক্ষে হোম্‌সের আপত্তি আছে। যাহা হউক এই বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে কেহ উপনীত হইতে পারেন নাই। ফলে জেফরীসের প্রমাণের ও অনুমানের সংশোধন করা সম্ভবপর হয় নাই।
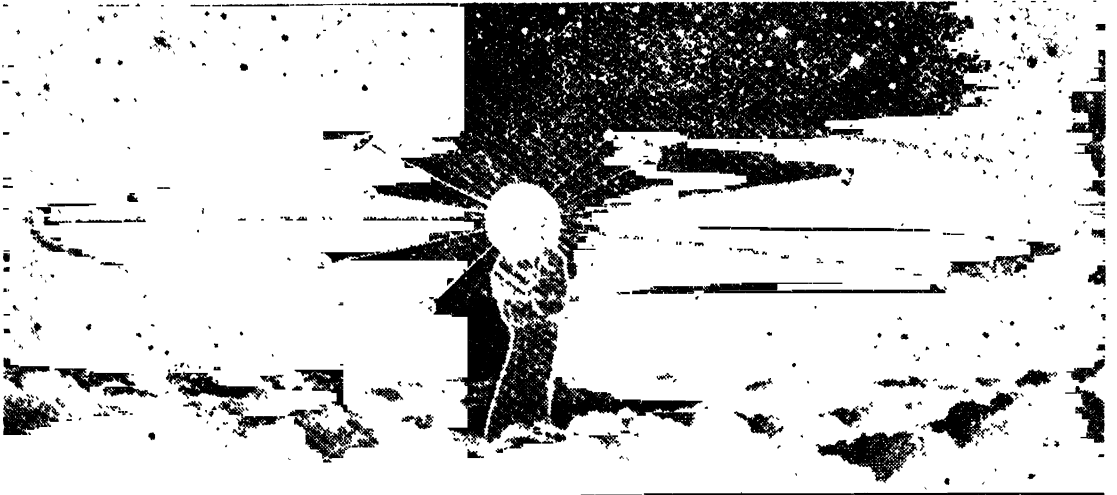
মহাকাশের অগণিত নক্ষত্রমণ্ডলীর ছায়াপথের মধ্যে মহকর্ষের বন্ধনে থেকে গ্রহ-উপগ্রহগুলো যেমন সূর্যের চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, পরমাণুর আভ্যন্তরীণ অবস্থাও সেরূপ। অভাবনীয় সূক্ষ্মতম তড়িৎ-কণিকার ছায়াপথের মধ্যে অতিসূক্ষ্ম কতকগুলো তড়িৎ-কণিকা নির্দিষ্ট দূরত্ব রক্ষা করে পরমাণুর কেন্দ্রীয়-বস্তুর চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে"

তরুলতার আত্মরক্ষার উপায়

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস

বাহ্যিক দৃষ্টিতে তরুলতাদের নিতান্ত নিরীহ ও অসহায় বলে মনে হয় বটে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের কেউই একেবারে অসহায় নয়। শত্রুর হাত থেকে নিজেদের সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে এদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু আত্মরক্ষার উপায় আছে। বিজ্ঞান-বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত লেখক স্বর্গীয় এইচ, জি, ওয়েলসের "দি কানট্রি অফ দি ব্লাইণ্ড" নামক বইয়ে দেখা যায় 'নানেজ' অন্ধদের দেশে সহসা গিয়ে পড়ে ভেবেছিল অন্ধেরা নিতান্ত অসহায়, কাজেই তার মত চক্ষুষ্মান লোকের পক্ষে তাদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে আদৌ বেগ পেতে হবে না। বারে বারে তার মনে হয়েছিল,—"অন্ধের দেশে একচোখ কানা-ই সর্বেসর্বা"; কিন্তু ক্রমে ক্রমে যতই সে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে লাগল ততই তার ধারণা ভ্রান্ত বলে মনে হতে লাগল। কাজেই দেখা যাচ্ছে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে কারও প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না। অতি নিরীহ-দর্শন কুঁচলে গাছের সামান্য পাতা কিম্বা সুমসৃণ একটি কলকে-ফুলের বীজ বা একটী ধুতরো ফল গলধঃকরণ করলেই চোখে নেমে আসবে একেবারে চির-নিদ্রা।

এ পৃথিবীতে উদ্ভিদভোজী জীবের অভাব নেই, তাছাড়া মানুষ থেকে আরম্ভ করে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলেই তাদেরকে কেবল বিব্রত ও বিপর্যস্তই করে ছাড়ে না, সুযোগ পেলে তাদের সমূলে নির্মূল করতেও কুণ্ঠিত হয় না। কারোর প্রয়োজন পাতা, কারোর কাণ্ড, কারোর ফল, কারোর মূল; এ হেন শত্রু-সঙ্কুল পৃথিবীতে আত্মরক্ষা করতে গেলে কোন না কোন রকম আত্ম-রক্ষার অস্ত্র থাকা একান্ত প্রয়োজন।

জীব-জগতে যেমন নানা রকমের আত্মরক্ষার অস্ত্র বা উপায় দেখা যায় তরুলতাদের মধ্যেও ঠিক তেমনি নানা রকমের আত্মরক্ষার বর্ম, অস্ত্র বা অপর উপায় দেখা যায়। শোঁয়া-পোকাদের মধ্যে দেখা যায়, তিন রকমের আত্মরক্ষার উপায়, যথা—শোঁয়া, বিষভরা-শোঁয়া ও উগ্র গন্ধ; উদ্ভিদ জগতেও এ তিনটী বস্তুই দেখা যায়। বিচুটি আত্মরক্ষা করে শোঁয়ার দ্বারা। শোঁয়ার ভেতর ভরা থাকে যন্ত্রণাদায়ক ফরমিক য়্যাসিড। উগ্র গন্ধ দ্বারা আত্মরক্ষা করে গাঁদাল, গুয়ে-বাব্‌লা প্রভৃতি। সজারু ধারাল কাঁটার সাহায্যে আত্মরক্ষা করে; বেল, বাবলা, কুল, গোলাপ এবং আরও অজস্র রকমের গাছ ছোট কিম্বা বড় কাঁটার সাহায্যে আত্মরক্ষা করে। বাঘের নখের আত্মরক্ষার অস্ত্র হিঁসেবে খ্যাতি আছে। শিবাজী ইস্পাত নির্মিত কৃত্রিম বাঘ-নখের সাহায্যে বহুবার শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা

বাঘ-নখ

বিচুটীর শোঁয়া
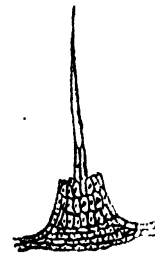
করেছেন। এক রকম গাছ আছে, যার ফলে অবিকল বাঘের নখের মত বাঁকা বাঁকা ভয়ঙ্কর কঠিন ও অত্যন্ত ধারাল কাঁটা থাকে। তাই এ গাছগুলিকে বাঘনখ গাছ বলা হয়। সাপ, বিছে বিষের দ্বারা আত্মরক্ষা করে, বহু জাতের ছত্রাক আছে যারা বিষের সাহায্যে আত্মরক্ষা করে।

এছাড়া প্রাণীদের মত অনুকরণ ও বর্ণবৈচিত্র্যের দ্বারাও তরুলতারা নানাভাবে আত্মরক্ষা করে থাকে। কাটিপোকা কাঠির আকার ধারণ করে' আত্মরক্ষা করে; আলু, মাটির ডেলার আকার ধারণ করে' আত্মরক্ষা করে। অনেক জাতের গুটিপোকা ও প্রজাপতি গাছের ছালের কিম্বা পাতার আকার অনুকরণ করে' শত্রুর দৃষ্টি এড়ায়। একাধিক জাতের ছত্রাক ও লাইকেন্স্ গাছের ছালের আকার বর্ণ, 'কুণ্ডয়ন' প্রভৃতি অনুকরণ করে; শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিদ পরিবেশের জলের রং অনুকরণ করে আত্মরক্ষা করে থাকে। * জীবজগতে অবিষাক্ত সাপ বিষাক্ত সাপের আকার ও বর্ণ অনুকরণ করে' আত্মরক্ষা করে; ডার্লিংটনিয়া নামক গাছ,—উদ্ভিদ হলেও অবিকল ফণাধারী গোখরো সাপের আকার ধারণ করে।

ডার্লিংটনিয়া ফনীমনসা
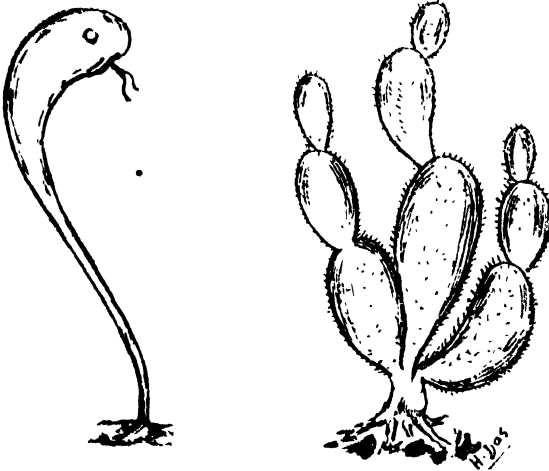
মানুষ ও জীবজন্তু সাপ ভ্রমে তাদের এড়িয়ে যায়। মাকড়সা জাল বুনে ও ফাঁদ পেতে ছোটো-খাটো কীট-পতঙ্গ ধরে খেয়ে বুভুক্ষার হাত থেকে আত্মরক্ষা করে। পতঙ্গভুক গাছেরাও নানারকম ফাঁদ পেতে ছোট ছোট কীটপতঙ্গ শিকার করে তারই দেহরস পান করে। স্পঞ্জ নামক জীবের দেহের ভেতর খনিজ পদার্থের অতি সূক্ষ্ম সূচের মত আত্মরক্ষার অস্ত্র থাকে; ওল ও কচুর দেহের সমস্ত অংশেই ঠিক স্পঞ্জেরই অনুরূপ খনিজ পদার্থের সূচ থাকে। অনেক সময় মানুষ শক্তিশালী মানুষকে আশ্রয় দিয়ে, গুণ্ডা ভোজপুরী লেঠেল কিম্বা সশস্ত্র দেহরক্ষী রেখে তাদের সাহায্যে আত্মরক্ষা করে থাকে; গাছেরা ও সেরূপ অনেক সময় বোল্‌তা, ভীমরুল, মৌমাছি কিম্বা বিষ-পিপড়াকে আশ্রয় দিয়ে রাখে। শত্রু এলেই এই সব আশ্রিত জীবেরা শত্রুকে আক্রমণ করে। সুতরাং আমরা দেখছি, প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে বাহ্যিক আকারে যথেষ্ট পার্থক্য থাকলেও আত্মরক্ষার ব্যাপারে জীবজগতের সংগে এদের ঘনিষ্ঠ মিল আছে।

১। **স্বাদ—**

কুঁচলে, নিম, শিউলি, কালমেঘ, গিমে, ঘেঁটু বা ভাঁট, বা সিঙ্কোনা কুইনিন্, প্রভৃতি গাছগুলির তিক্ত স্বাদের জন্যে এবং গোলমরিচ, লঙ্কা, আদা, হলুদ প্রভৃতি গাছের ফল কিম্বা মূলের উগ্র ঝালের জন্যে জীবজন্তুরা এদের ত্যাগ করে।

২। **গন্ধ—**

গাঁদাল, পিঁয়াজ, রসুন, মূলা প্রভৃতির উগ্র গন্ধের জন্যে অনেক জীবজন্তু তাদের ত্যাগ করে। ঈশের মূলের গন্ধ এত উগ্র যে, বিষাক্ত সাপও তার গন্ধ সহ্য করতে না পেরে পালায়। কয়েক জাতের অরকিড্ আছে তাদের ফুলের গন্ধ অসহ্য উগ্র। এদের গন্ধের জন্যে ফুলের ঋতুতে কোন কীট-পতঙ্গ বা অপর জীব এদের কাছে ঘেঁসতে পারে না। আমাদের দেশের ঘেঁটু ও ছাতিম গাছের ফুলের গন্ধও কম উগ্র নয়। জীবজন্তুর স্নায়ুর ওপর এদের গন্ধের ক্রিয়া অতি তীব্র। ছোট কীট-পতঙ্গের বা জীবজন্তুর কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, কোন সুস্থ মানুষ এদের কাছে দাঁড়িয়ে ঘ্রাণ নিলে প্রথম অস্বস্তি লাগে তারপর অল্পক্ষণের

* জলের নিজের অবশ্য কোন রং নেই; অণুবীক্ষণু উদ্ভিজাণু ও জীবাণুর জন্যে জলকে রঙ্গীন মনে হয়। আকাশের মেঘের প্রতিফলনেও জল নীল কিম্বা সবুজ দেখায়।

মধ্যেই ধীরে ধীরে মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-মণ্ডলী কেমন অসাড় হয়ে আসে।

৩। **বিষাক্ত পদার্থ**—

(ক) কতকগুলি গাছের পাতা, ফল, কাণ্ড বা মূলে বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চিত থাকায় জীব-জন্তু তাদের পরিত্যাগ করে। ধুতুরা ও কলকে ফুলের বীজ অত্যন্ত বিষাক্ত।

(খ) তামাকের পাতার 'নিকোটিন্', চায়ে 'থিন্' ও 'ট্যানিন্', কফির বীজে 'কেফিন্', 'সিংকোনা' গাছে 'কুইনিন্', বেলেডোনা গাছে 'য়্যাট্রোপিন্, আফিং গাছের আঠায় 'মর্ফিন্' প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চিত থাকে। পূর্বোক্ত বস্তুগুলিকে বলা হয় উপক্ষার বা 'য়্যাল্কলয়েড'; ভাং ও স্বর্ণলতার গাছেও বিষাক্ত পদার্থ থাকে। ভারতবর্ষের বাংলা ও আসাম প্রদেশে এছাড়াও অনেক জাতের 'য়্যালকলয়েড' পূর্ণ গাছ পাওয়া যায়। এই সব বিষাক্ত পদার্থ এদের আত্মরক্ষায় সহায়তা করে।

(গ) উগ্র লাল, হল্‌দে, সিঁদুরে এবং কালো ও শ্লেট রঙের বহু জাতের ছত্রাক আছে; চলতি ভাষায় যাদের "ব্যাঙের ছাতা" বলা হয়, এরা ভয়ঙ্কর বিষাক্ত। অনেক সময় খাদ্য-ছত্রাক ভ্রমে এই বিষাক্ত ছত্রাক আহার করে অনেক লোকের প্রাণনাশ ঘটে। অনেক অবিষাক্ত ছত্রাক আবার বিষাক্ত ছত্রাকের আকার ও বর্ণ হুবহু নকল করে' জীব-জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করে' থাকে। উদ্ভিদ-জগতে এটা হলো অনুকরণ ও সতর্কীকরণ রং ব্যবহারের দৃষ্টান্ত।

(ঘ) আকন্দ, বাগ-ভ্যারেণ্ডা, লাল-পাতা, বিভিন্ন জাতের মনসা, শিয়ালকাঁটা, পোস্ত, বট প্রভৃতি গাছে ঘন দুধের মত আঠাল রস থাকে। এই রস বিষ হিসেবে অনেক জীব-জন্তুর হাত থেকে গাছকে বাঁচায়। এছাড়া রস যেখানে লাগে সেখানের ত্বকে ক্ষত জন্মায়। গাছের দেহের কোথাও কোন রকম ক্ষত হলে সেই স্থান থেকে প্রচুর রস বার হয়ে ঐ ক্ষতের চারপাশে একটা পুরু আবরণ রচনা করে। এইভাবে এই সব গাছ নানা জাতের জীবাণুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করে থাকে।

৪। **কাঁটা**—

তরুলতার দেহের বিভিন্ন অংশে নানা আকারের কাঁটা জন্মে' তাদের আত্মরক্ষায় সহায়তা করে যথা, কুল, শিমুল, বেঁত। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা কাঁটার জন্মের তারতম্য অনুসারে তাদের তিন ভাগে ভাগ করেছেন,—

(ক) থর্ণ

বেল, লেবু প্রভৃতি গাছের গায়ে বড় বড় কাঁটা জন্মায়; এগুলিকে থর্ণ বলা হয়।

(খ) স্পাইন্

বাবলা, কাঁটানটে, শিয়ালকাঁটা প্রভৃতি গাছের ডাল ও কাণ্ডে প্রচুর অতি তীক্ষ্ণ ছুঁচের মত ধারাল কাঁটা জন্মায়। শিয়াল-কাঁটার পাতার সর্বত্র কাঁটা জন্মায়। খেজুর গাছের পাতার প্রান্তে অতি ধারাল কাঁটা জন্মায়।

(গ) 'প্রিক্‌ল্

কুল, সিয়াকুল, বন-বকুই, গোলাপ ফুলের গাছ প্রভৃতির দেহে যে বেঁটে বেঁটে অত্যন্ত ধারাল কাঁটা থাকে, তার নাম প্রিক্‌ল। কুশ-কাঁটার ক্ষতও যন্ত্রণা দায়ক। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের বর্ণনায় দেখা যায় আশ্রম-কন্যাদের পায়ে কুশ-কাঁটা ফুটলে যন্ত্রণার উপশমের জন্যে তারা ক্ষতস্থানে ইঙ্গুদী তৈলের প্রলেপ দিত।

৫। **শোঁয়া**—

বিচুটী গাছের পাতা, ও ডালপালায় শোঁয়া-পোকার গায়ের মত ঘন অতিসূক্ষ্ম কাঁটা থাকে। কোমল ত্বকের সংস্পর্শে আসবামাত্র শোঁয়াগুলি ত্বকে ফুটে ভেঙ্গে যায়। তারপর ঐ শোঁয়ার ভেতরের 'ফরমিক্ য়্যাসিড' বার হয়ে তীব্র-যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। আলকুশি ফলের এই রকম খুব ঘন ও যন্ত্রণাদায়ক শোঁয়া থাকে। এগুলি অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর।

৬। সিলিকার কাঁটা—

উলু, বাঁশ, কয়েক জাতের ঘাস প্রভৃতির পাতার কিনারায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাঁচ বা 'সিলিকা' জাতীয় পদার্থের সুতীক্ষ্ণ কাঁটা থাকে; এই জন্যেই অনেক সময় দেখা যায় বাঁশ পাতা খেতে গিয়ে গবাদি পশুর মুখ ছড়ে রক্ত বা'র হয়।

৭। আভ্যন্তরীণ অস্ত্র—

অনেক গাছের দেহের মধ্যে নানারকম রাসায়নিক পদার্থের স্ফটিক, নানা রকম সূক্ষ্ম অস্ত্রের আকারে সঞ্চিত থাকে। ওল্, নানাজাতের কচু, কচুরীপানা প্রভৃতির দেহে প্রচুর পরিমাণে এমনি স্ফটিক সঞ্চিত থাকে। ওল বা কচু আহার করলে অনেক সময় মুখ ও গলায় যন্ত্রণা হয়। এর কারণ হলো ওদের দেহের ইডিওব্ল্যাষ্ট নামক বিশেষ এক জাতের কোষের মধ্যে স্ফি-র‍্যাফাইড্ নামক ছুঁচের মত আকারের ও র‍্যাফাইড নামক তারকার মত আকারের স্ফটিক থাকে; মুখের লালার সংস্পর্শে আসবামাত্র ইডিওব্ল্যাষ্টগুলি ফেটে যায়, তখন তার ভেতর থেকে ঐ ছুঁচের মত সুতীক্ষ্ণ স্ফটিকগুলি বা'র হয়ে এসে মুখ ও গলার কোমল ত্বকে ফুটে গিয়ে বিশেষ যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। খনিজ অম্লরসে এই স্ফটিকগুলি গলে যায়; এই জন্যেই সম্ভবতঃ ওল বা কচু খেয়ে মুখে লাগলে তেঁতুল বা লেবু খাওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। এই অবস্থায় কোন টক জিনিস কিম্বা ভিনিগার খেলে দ্রুত যন্ত্রণার উপশম হতে দেখা যায়।

৮। গন্ধক—

Sulphur Bacteriaয় গন্ধক থাকার জন্যে জীবজন্তু বা কীট-পতঙ্গেরা ওদের খায় না।

৯। আশ্রয়—

(ক) অনেক ছোট ছোট গাছ—যেমন আমরুল, থানকুনি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বড় লতা-গুল্মের আড়ালে জন্মে শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করে।

(খ) অনেক জাতের ছত্রাক ও শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ বড় বড় গাছের ফাটলে, কিম্বা খুব ওপরে জন্মায়। এতে ভূচর শত্রুরা এদের নাগাল পায় না। পরগাছা মাত্রেই এই-উপায়ে আত্মরক্ষা করে।

১০। অনুকরণশীলতা—

(ক) রেঙ্গুনের এক জাতীয় আলু মাটির ওপরেই প্রায় থাকে। এগুলি দেখতে অবিকল মাটির ঢেলার মত। থামআলু ও ওলকে দূর থেকে মাটির ঢেলা বলে ভ্রম হয়।

(খ) ফণী-মনসা ফণীর মত আকার ধরে শত্রুর হাত এড়ায়; তা'ছাড়া এদের গায়ে প্রচুর সুতীক্ষ্ণ কাঁটা ও দেহে রস থাকে।

(গ) দার্জিলিংয়ে "য়্যারিসিমা স্পেসিওসা" বলে এক রকম গাছ আছে। স্থানীয় ভাষায় এদের বলা হয় সম্প্-কি-খাম্। গায়ের রং, বিস্তৃত ফণা, দীর্ঘ লাঙ্গুল, সব কিছুতেই এদের সাপ বলে ভ্রম হয়। এমনি বর্ণ ও আকার ধারণ করে এরা শত্রুর হাত এড়ায়।

(ঘ) পূর্বেই বলেছি ক্যালিফোর্নিয়ায় ডার্লিংটনিয়া বলে এক রকম পতঙ্গভুক্ গাছ আছে। এদের দেহের আকার অবিকল কেউটে সাপের মত বলেই এদের কোব্রা-গাছ বলে। এদের বিস্তৃত ফণার নিচে সাপের জিভের মত দুটো করে ফিতের মত বস্তু ঝোলে। এমন কি সাপের চোখের অনুকরণে এদের ফণার দু'পাশে দুটি অবিকল চোখের মত দুটি স্বচ্ছ অংশ থাকে। অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মানুষও এদের সর্প ভ্রমে ভীত হয়ে পড়ে। উদ্ভিদ জগতে দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটানোর ব্যাপারে ডার্লিংটনিয়ার তুলনা নেই।

১১। মারমিকোফাইলি—

যে সব গাছের আত্মরক্ষার উপায় নেই, তারা নিজদেহে বোল্‌তা, ভীমরুল প্রভৃতিকে আশ্রয় দিয়ে আত্মরক্ষা করে থাকে। অতি যন্ত্রণাদায়ক কাঠ-পিঁপড়েরা প্রধানতঃ গাছের কোটরেই বাস

করে। লাল নাল্‌সো পিঁপড়েরা আম, জাম প্রভৃতি গাছের পাতা জুড়ে থলির আকারের বাসা
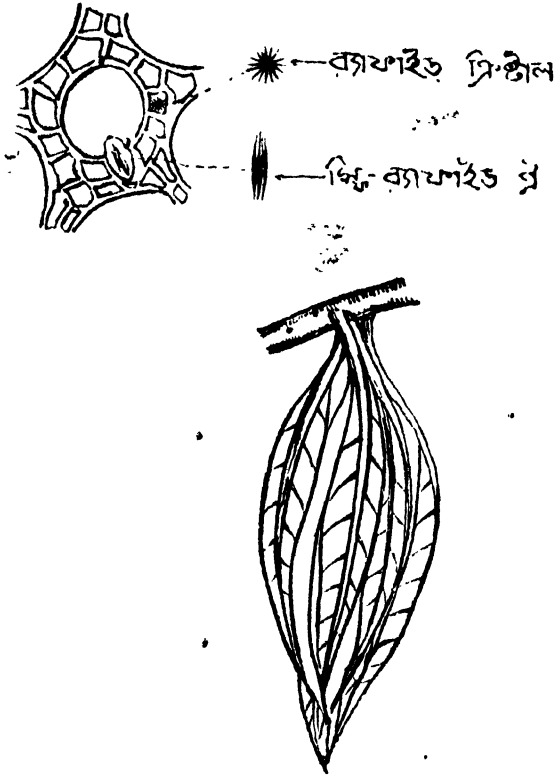
লাল পিঁপড়ের বাসা

নির্মাণ করে। এক একটী বাসায় সহস্র সহস্র পিঁপড়ে বাস করে। কোন আততায়ী এসে গাছে সামান্য আঘাত দেবামাত্র তারা গো-মহিষাদি জন্তুর মত শিং উঁচিয়ে তেড়ে অসার মত শুঁড় উঁচিয়ে শত্রুর সামনে এগিয়ে আস্ফালন করে; তাতেও যদি শত্রু গাছ আক্রমণ করে তখন তারা সংঘবদ্ধ ভাবে সকলে এগিয়ে এসে দংশন করে' শত্রুকে বিষের জালায় জর্জরিত করে তোলে। বহুজাতের অসহায় জলজ উদ্ভিদ মৃত শামুকের খোলের মধ্যে, কিম্বা জীবন্ত শামুক, ঝিনুক প্রভৃতির গায়ে জন্মে শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করে। হাঙ্গর, কুমীর, শুশুক, বড় বড় সামুদ্রিক মাছ প্রভৃতির গায়ে যে পুরু শেওলা হয় এগুলি জলজ উদ্ভিদ ছাড়া আর কিছুই নয়। এদের মধ্যে শেওলা, ডায়েটম, স্পাইরোগাইরা প্রভৃতি বহু জাতির উদ্ভিদ দেখা যায়।

সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে উদ্ভিদদের যতটা অসহায় মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তারা ততটা অসহায় নয়। এদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু আত্মরক্ষার উপায় বা অস্ত্র থাকে।

কয়েক জাতীয় কীট-পতঙ্গ ও শ্লথ নামক জীবও টুনটুনি পাখী প্রভৃতিদের ধরলে তারা মরে যাওয়ার ভান করে' শত্রুর হাত এড়ায়। লজ্জাবতী লতাকে ছুঁলেই অমনি নুয়ে পড়ে। এ হলো মৃতের ভান করে আত্মরক্ষা করা। এর পরেও যদি শত্রু তাকে ছুঁতে যায়, তখনকার জন্যে আছে তীক্ষ্ণ কাঁটা। এটি Mimicryর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

"বিদেশী ভাষার সাহায্যে পাঠ্যবস্তুর মধ্যে প্রবেশ, অনধিকার প্রবেশ; তাহাতে প্রবেশ ঘটে কিন্তু অধিকার ঘটে না।"

পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্রম-বিবর্তন

শ্রীসতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

বিখ্যাত আপেক্ষিক তত্ত্ববাদ আপাতদৃষ্টিতে চিরাচরিত চিন্তাধারার আকস্মিক বিচ্ছেদ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা প্রচলিত এবং প্রবর্তিত বিশ্বাসের অবশ্যম্ভাবী যুক্তিসঙ্গত পরিণতি। গ্যালিলিও, নিউটনের গতি সম্পর্কীয় মৌলিক সিদ্ধান্ত এবং তৎপরে ফ্যারাডে, ম্যাক্স-ওয়েলের ক্ষেত্র সম্পর্কীয় গবেষণা 'আপেক্ষিক তত্ত্বের' ভিত্তিভূমি প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবেনা। আপেক্ষিক তত্ত্ববাদের মূলনীতি গণিতের সূক্ষ্ম ভাষার সাহায্য ব্যতীত সুপ্রকাশ কঠিন হইলেও অসম্ভব নহে। কিন্তু উপরিলিখিত পটভূমির সহিত সম্যক পরিচয় ব্যতীত ইহার অনুধাবন প্রচেষ্টা কল্পনার অতীত। সুতরাং পদার্থ বিজ্ঞানের ক্রম-বিবর্তন-ধারার আলোচনার প্রয়োজন।

গতি সম্পর্কে গবেষণার পর নিউটনই প্রথম কয়েকটী অতি বিখ্যাত এবং অত্যাবশ্যক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তৎপূর্বে গ্যালিলিও এবং তাঁহার পূর্বে এরিষ্টটল এই সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু এরিষ্টটলের সিদ্ধান্ত ভুল বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহা বিজ্ঞানের মর্যাদা লাভে বঞ্চিত হইয়াছে। গ্যালিলিওর মতবাদই নিউটনের সুচিন্তিত এবং সুশোভিত ভাষায় প্রকাশিত হয়। ইহাই নিউটনের বিখ্যাত Laws of motion বলিয়া সুপরিচিত। বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেই বহু প্রচারিত এবং বহুল প্রচলিত এই সমস্ত নিয়মের সহিত সুপরিচিত। গতিবিহীন বা গতিসম্পন্ন কোনও দ্রব্যের অবস্থার অপরিবর্তন দ্রব্যের স্বাভাবিক ধর্ম; কেবল মাত্র বাহ্যিক বল প্রয়োগ দ্বারাই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব। ত্বরণ এবং দ্রব্যভর সমন্বয় ফল বাহ্যিক বল পরিমাণ সাপেক্ষ। এককথায় ইহা ভরবেগ সাপেক্ষ।

ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার পরিমাণ সমান। প্রথম বিধি, জাড্য বিধি (Law of inertia) নামে সুপরিচিত। দ্বিতীয় বিধি, বলের সংজ্ঞা এবং পরিমাপক বা ইউনিট নির্ধারণের অদ্বিতীয় কৌশল। তৃতীয় বিধি, বিখ্যাত ভরবেগ নিত্যতার প্রতিষ্ঠাতা। যে সমস্ত বিধির উপর সমগ্র পদার্থ-বিজ্ঞান-সৌধ দণ্ডায়মান, তন্মধ্যে ভরবেগ নিত্যতা অন্যতম।

সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবী এবং অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহের যে বিবর্তন তাহার সম্যক ব্যাখ্যার জন্য নিউটনের অপর একটী সিদ্ধান্তের উল্লেখ আবশ্যক। Laws of gravitationএর কথা বলিতেছি। এই বিধি অনুযায়ী দ্রব্যের পারস্পরিক আকর্ষণ, দূরত্বের উপর নির্ভরশীল। দূরত্ব দ্বিগুণ হইলে আকর্ষণ এক চতুর্থাংশ হয়, এবং দূরত্ব তিনগুণ হইলে আকর্ষণ এক নবমাংশ হইবে। নিউটনের এই সিদ্ধান্ত গ্রহ, উপগ্রহের বিবর্তন বুঝিবার পক্ষে পরম সহায়ক।

প্রসঙ্গত একটী কথার উল্লেখ প্রয়োজন। সম্পূর্ণ সমতল মসৃণ প্রাঙ্গনে একটী গাড়ীকে ধাক্কা দিলে গাড়ীটি গতিসম্পন্ন হইবে এবং এই গতি-বেগ বল-বেগের উপর নির্ভরশীল। এইবার দুইটি গাড়ী লওয়া হউক। একটী বোঝাই এবং অপরটি শূন্য। দুইটিকে সবলে ধাক্কা দিলে বেগ কিছু সমান হইবেনা। শূন্যটির বেগ অবশ্যই বেশী হইবে। যাহার ভর বেশী তাহার বেগ কম হইবে। সুতরাং এই বেগ হইতে দ্রব্যের ভর নির্ণয় সম্ভব। ইহাকে জাড্যভর বলা হইবে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ইহার সহিত অভিকর্ষের কোনও সম্পর্ক

বিদ্যমান নাই। অপরপক্ষে দ্রব্যের অভিকর্ষীয় আকর্ষণ দ্রব্যের ভরের উপর নির্ভরশীল। ভর বেশী হইলে আকর্ষণ প্রবল হইবে। ইহা হইতেও আমরা দ্রব্যের ভর নির্ণয় করিতে পারি। এখন প্রশ্ন এই যে, জাড্যভর এবং অভিকর্ষীয় ভর সমান কি না? যদি সমান দৃষ্ট হয়, তাহা কি আকস্মিক, না, ইহা কোনও বিশেষ অর্থ-ব্যঞ্জক? প্রাচীন বিজ্ঞানের পটভূমিতে ইহা আকস্মিক এবং নব্য বিজ্ঞান মতে ইহা বিন্দুমাত্র আকস্মিক নয়, বরং ইহা বিশ্বরহস্য বুঝিবার অভিনব কৌশল আবিষ্কারে আমাদের পরম সহায়ক।

অপ্রত্যাশিত ঘটনাকে আকস্মিক বলিয়া বর্জন করে যে তত্ব, তাহাকে শ্রেয় বলা যায় না। যে তত্ব অপ্রত্যাশিত ঘটনার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম, তাহা অবশ্যই বরণীয়। এই হিসাবেই নব্য বিজ্ঞান, প্রাচীন বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রদ্ধেয়। ইহা অভিকর্ষীভর এবং জাড্যভরের সমতাকে আকস্মিক বলিয়া বর্জন করিবার চেষ্টা না করিয়া ইহার ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম হইয়াছে, এবং এই ভরসমতার উপর ভিত্তি করিয়াই বিখ্যাত আপেক্ষিক তত্ববাদ গড়িয়া উঠিয়াছে।

এই সম্পর্কে স্বাভাবিক প্রশ্ন এই—কোন্ অভিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করিয়া ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল যে, উভয় ভর সমান? সুউচ্চ চূড়া হইতে বিভিন্ন ভরসম্পন্ন দ্রব্যের পতন সময় (গ্যালিলিও) উল্লেখযোগ্য। দ্রব্য যাহাই কেন হউক না, পতন কাল সমান দৃষ্ট হইল। গতিবেগ ভরের উপর নির্ভর করে না। দুইটি বিভিন্ন ভরসম্পন্ন দ্রব্যকে ধাক্কা দিলে, জাড্যভর যাহার বেশী তাহার গতিবেগ কম হয়। ঊর্ধ্ব হইতে বিভিন্ন ভরসম্পন্ন দ্রব্য পতিত হইতে দিলে কাহার অগ্রে পৌছান সম্ভব? যদি পৃথিবী সকল দ্রব্যকে সমান বেগে আকর্ষণ করিত তাহা হইলে যাহার জাড্যভর বেশী তাহা পরে পতিত হইত। কিন্তু তাহা হয় না। সুতরাং পৃথিবীর আকর্ষণ বিভিন্ন দ্রব্যের উপর বিভিন্ন। এই আকর্ষণ কেবল অভিকর্ষী ভরের উপর নির্ভরশীল। অপরপক্ষে দ্রব্যের গতি কাল inertial massএর উপর নির্ভর করে। এবং যেহেতু এই সব দ্রব্যের গতিবেগ বা কাল সমান, সুতরাং উভর ভর অবশ্যই সমান।

"বড়ো অরণ্যে গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পড়ে, তাতেই মাটিকে করে উর্বরা। বিজ্ঞান চর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিষগুলি কেবলি ঝরে ঝরে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে চিত্তভূমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার জীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারি অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক হয়ে। এই দৈন্য কেবল বিদ্যার বিভাগে নয়, কাজের ক্ষেত্রেও আমাদের অকৃতার্থ করে রাখছে।"

রবীন্দ্রনাথ

ভারতবর্ষের অধিবাসীর পরিচয়

শ্রীননীমাধব চৌধুরী

[পূর্বের এক প্রবন্ধে (জ্ঞান ও বিজ্ঞান মে, ১৯৪৮) নেগ্রিটো গোষ্ঠী ভারতবর্ষের অধিবাসীদের মধ্যে জাতি সংমিশ্রণের প্রথম স্তর, নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানীগণের এই মতের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে যে, এই মতের সমর্থনে তাঁহারা যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছেন তাঁহাদের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট ও সন্তোষজনক প্রমাণ নহে। অতিশয় সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে দেশের প্রান্ত সীমানায় অধিবাসীদের দুই একটি উপজাতির মধ্যে মেলানেশিয়ান সংমিশ্রণ থাকা সম্ভব—এইরূপ অনুমান করিবার অবসর আছে; কিন্তু এই সংমিশ্রণ যে বহিরাগত এবং দেশের প্রান্ত সীমা অতিক্রম করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নাই, উপস্থাপিত প্রমাণের আলোচনা করিয়া তাহাই মনে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে নেগ্রিটো গোষ্ঠীকে ভারতবর্ষের সর্বপ্রাচীন বা আদিঅধিবাসী বলিয়া যে মতের বহুল প্রচার হইয়াছে সেই মত মানিয়া লইবার কোন যুক্তি দেখা যায় না।]

ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের মধ্যে সর্বপ্রাচীন স্তর যাহাদের লইয়া গঠিত মনে করা যাইতে পারে তাহারা এখনও ভারতবর্ষের জনসমষ্টির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই জনসমষ্টি ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী বা আদিবাসী। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীগণ ইহাদের সম্বন্ধে কি বলেন তাহা আলোচনা করিবার পূর্বে সাধারণ ভাবে ইহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা হইতেছে।

ভারতবর্ষের Census রিপোর্টগুলিতে আদিবাসীদিগকে tribal population নাম দেওয়া হইয়াছে। ধর্ম, ভাষা, সামাজিক অবস্থা, বর্ণ, বাসের অঞ্চল ইত্যাদি হিসাবে তাহাদিগের সংখ্যাকে বিভিন্ন ভাবে ভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে। ব্রহ্মের যে সকল উপজাতি ভারতীয় জনসংখ্যার বিবরণীতে স্থান পাইয়াছে তাহাদিগকে বাদ দিলে ভারতবর্ষের আদিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি হইবে। ইহাদের মধ্যে প্রায় এক কোটি লোক হিন্দু ধর্ম অবলম্বন করে নাই এবং আপনাদিগের ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি মানিয়া চলে এবং বাকী এক কোটি মোটামুটি ভাবে হিন্দু ধর্ম মানিয়া চলে এবং আপনাদিগের সামাজিক রীতিনীতি মানিয়া চলিলেও হিন্দু বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। মোটামুটি হিসাবে বাংলা ও বিহারের ১৭ লক্ষ সাঁওতালের মধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ হিন্দু, বিহারের ৫ লক্ষ হো'র মধ্যে ১ লক্ষের উপর হিন্দু, সাড়েপাঁচ লক্ষ মুণ্ডার মধ্যে দেড় লক্ষ হিন্দু, ৬ লক্ষ ওরাওঁর মধ্যে সওয়া দুই লক্ষ হিন্দু, ৩ লক্ষ খোন্দের মধ্যে দেড় লক্ষ হিন্দু। মধ্য প্রদেশের গোন্দ প্রায় অর্দ্ধেকের উপর হিন্দু, মধ্যভারত এজেন্সীর অধিকাংশ গোন্দ হিন্দু। মধ্যপ্রদেশের কোল, খারিয়া, করওয়া প্রভৃতির অধিকাংশ হিন্দু। মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত ষ্টেট এজেন্সী, রাজপুতানা, পশ্চিম ভারত ষ্টেট এজেন্সী ও আজমীর মারবারের অধিকাংশ ভীল ও মীনা হিন্দু। আসামের গারো, খাশী, কুকী, লালুং, মেচ, মিকির, নাগা প্রভৃতির মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা প্রচুর। আসামের নাগা, কুকী প্রভৃতি ও ছোট নাগপুরের ওরাওঁ প্রভৃতির মধ্যে অনেকে খৃষ্টান মিশনারীদিগের উদ্যমে খৃষ্টান হইয়াছে। ইহা ছাড়া প্রায় ৬ কোটী ২৬ লক্ষ Exterior Castes বা Scheduled caste এর মধ্যে ও ছোটনাগপুরের ওরাওঁ প্রভৃতির মধ্যে সম্পূর্ণরূপে হিন্দু হইয়া গিয়াছে এরূপ আদিবাসী উপজাতি অনেক পাওয়া যাইবে।

প্রধানতঃ অর্থ নৈতিক কারণে দেশের নানাস্থানে ছোটবড় দলে ছড়াইয়া পড়িলেও আদিবাসীদিগের নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাসভূমি আছে। নির্দিষ্ট অঞ্চলে এক গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন উপজাতির বা বড় বড় উপজাতিগুলির নিজস্ব এলাকা আছে। এই সকল এলাকায় নিজ নিজ প্রাচীন সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মবিশ্বাস রক্ষা করিয়া তাহারা বাস করে। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির কথা জানতে গেলে ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হয়। আমরা দেখিতে পাই, বাঙ্গলা দেশের পশ্চিম সীমানা হইতে আরম্ভ করিয়া একটি উচ্চ ভূমির অঞ্চল বিন্ধ্য, কৈমুর পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। ইহার পশ্চিমে মালব মালভূমি। মধ্যভারতের মালভূমি মালবের উত্তরে আরাবল্লী হইতে পূর্ব ভারতের রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যভারতের এই মালভূমির পূর্বের অংশ ছোটনাগপুর মালভূমি। এই অংশের প্রাচীন নাম ঝাড়খণ্ড। ছোটনাগপুরের মালভূমি দক্ষিণ পূর্বে উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্য দিয়া মধ্য প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। মধ্য প্রদেশের এই উচ্চ-ভূমি, উত্তরে মধ্যভারতের ও দক্ষিণে ছোটনাগপুরের মালভূমিকে যুক্ত করিতেছে। এই অঞ্চলের মধ্য মধ্যপ্রদেশের দেশীয় রাজ্যগুলি অবস্থিত। এই বিস্তৃত উচ্চভূমির পূর্বে মহানদীর উপত্যকা হইতে বাহির হইয়া পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণী, পূর্ব উপকূল বরাবর চলিয়া গিয়া নীলগিরি পর্বতে পশ্চিমঘাট পর্বত শ্রেণীর সহিত মিলিয়াছে। নীলগিরির দক্ষিণে আন্নামালাই, ঝুলনি প্রভৃতি পর্বত। বাংলার পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণা হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটনাগপুর, উড়িষ্যায় উত্তরাংশ, মধ্যপ্রদেশের বৃহৎ
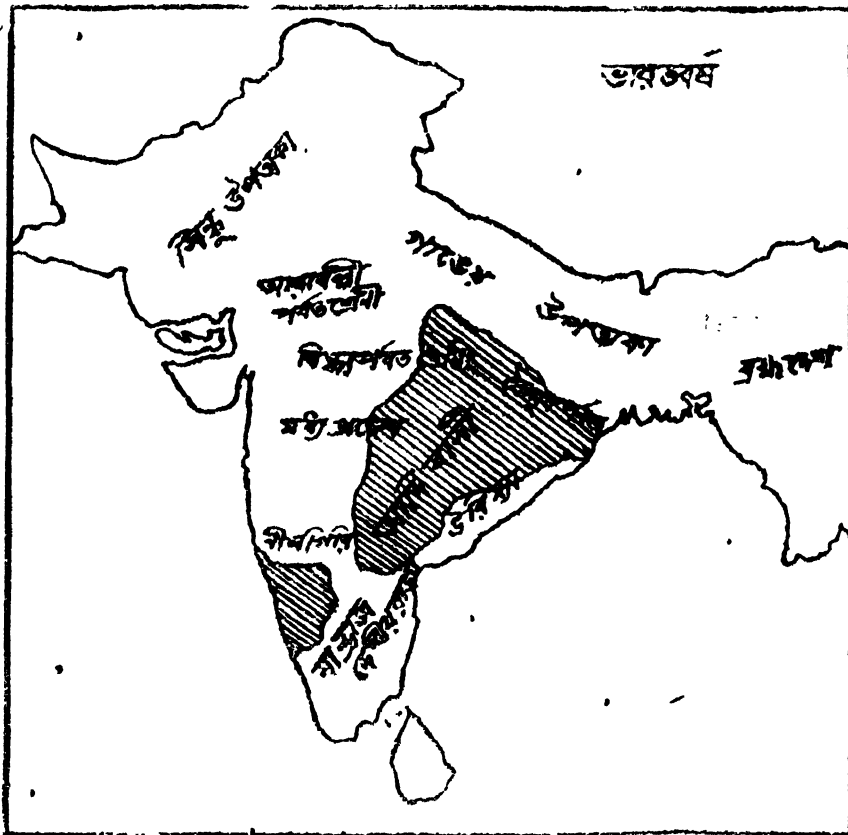
মানচিত্রে আদিবাসীদের প্রধান অঞ্চলগুলি মোটামুটি ভাবে দেখান হইয়াছে

অংশ ও মাদ্রাজের মধ্যে আন্নামালাই পর্যন্ত পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণী লইয়া যে বিরাট পর্বত ও অরণ্যময় ভূভাগ অবস্থিত ইহার বিভিন্ন অংশ সাঁওতাল মুণ্ডা, হো, ওরাওঁ, খোন্দ, ভূমিজ, ভুঁইয়া, সারিয়া, মুরিয়া, অসুর, শবর, পোয়জা, গোন্দ, চেঞ্চু, করওয়া, কয়া, বৈগা প্রভৃতি গোষ্ঠীর আদিবাসীদিগের বাস। এই অঞ্চলের বাহিরে মধ্যভারত ষ্টেট এজেন্সীতে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ, রাজপুতনা এজেন্সীতে প্রায় ২ লক্ষ ২৯ হাজার, বরোদায় প্রায় ৩ লক্ষ অদিবাসীর বাস। মধ্যভারত ষ্টেট এজেন্সীতে ভিল, গোন্দ, বৈগা, কোল, ভূমিয়া, করকু প্রভৃতি গোষ্ঠী দেখা যায়। অন্যত্র ভিল, মীনা প্রভৃতি প্রধান।

মানচিত্রে আদিবাসীদের প্রধান অঞ্চলগুলি মোটামুটি দেখান হইয়াছে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই অঞ্চলটি গাঙ্গেয় উপত্যকার বাহিরে, সিন্দু উপত্যকা হইতে অনেক দূরে, পূর্ব ও মধ্যভারতের একটি বিস্তৃতঅংশ জুড়িয়া রহিয়াছে। উত্তরে এই অঞ্চল গাঙ্গেয় উপত্যকার দক্ষিণ-পূর্ব অংশ স্পর্শ করিতেছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে এই অঞ্চলকে সাতপুরা, মহাদেব, মহাকাল পর্বত শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। দক্ষিণ-পূর্বে পূর্বঘাট পর্বতশ্রেণীর সহিত যুক্ত করা যাইতে পারে। সমগ্র ছোটনাগপুর মালভূমি, মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমির কিয়দংশ এই অঞ্চলের গণ্ডীর মধ্যে পড়ে। মুণ্ডা গোষ্ঠির ভাষাভাষী প্রায় ৫০ লক্ষ এবং কুরুখ, গোন্দী, কুই, মাল্টো প্রভৃতি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর ভাষাভাষী প্রায় ৭৬ লক্ষ আদিবাসীর বাস এই অঞ্চলে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন অংশে যে সকল আদিবাসী উপজাতি দেখা যায় তাহাদের কতক এই অঞ্চলের বিভিন্ন উপজাতির শাখা, বাকী অংশ ভীল, ভিলানা, মীনা প্রভৃতি উপজাতি। এই বাকী অংশ মোটামুটিভাবে হিন্দুদিগের ধর্ম ও ভাষা গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া গিয়াছে বলা যায়। দক্ষিণ ভারতে যে সকল আদিবাসী উপজাতি দেখা যায় তাহাদের সম্বন্ধে এই কথা কতকটা খাটে। অবশ্য দক্ষিণ ভারতের নিজস্ব উপজাতিগুলি ভীল প্রভৃতি গোষ্ঠীর নহে, পৃথক গোষ্ঠীভুক্ত।

এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন উঠিতে পারে, এখানে তাহার উল্লেখ মাত্র করা হইতেছে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের এই আদিবাসীরা এক কালে সিন্দু ও গাঙ্গেয় উপত্যকা সমেত সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়াইয়া ছিল তাহা হইলে যে ধারণা সাধারণে প্রচলিত আছে অর্থাৎ আর্য সভ্যতার ক্রমিক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীরা ক্রমশঃ সরিয়া আসিয়া দুর্গম পর্বত ও অরণ্যময় অঞ্চলে আশ্রয় লইয়াছে—সেই ধারণা হইতে ভারতবর্ষের আদিবাসীদিগের প্রধান গোষ্ঠীগুলিকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূর্বের এই অঞ্চলে দেখিতে পাইবার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কি ? আদিবাসীদিগের আধুনিক ইতিহাস হইতে তাহাদের অনেক গোষ্ঠীর মধ্যে এক স্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকা অপেক্ষা দল বাঁধিয়া ছড়াইয়া পড়িবার (migration) দিকে ঝোঁক দেখা যায়। আমরা দেখিতে পাই, সাঁওতালগণ উত্তর ও পশ্চিম হইতে বাঙ্গলার মধ্যে প্রবেশ করিয়া বীরভুম, বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, দিনাজপুর মালদহ ও রাজসাহীর মধ্যে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যাহাহউক, যে প্রশ্নের উল্লেখ করা হইল পরে তাহার আলোচনা করিবার চেষ্টা করা হইবে।

দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের ও পশ্চিম ভারতের আদিবাসীদিগের উল্লেখ করা হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতে নীলগিরি, পুলনি, আন্নামালাই প্রভৃতি পর্বত-অঞ্চলে ও অন্যত্র কতকগুলি আদিবাসী উপজাতি উল্লেখযোগ্য এবং তাহাদের সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। পরে এই আলোচনার উল্লেখ করা হইবে।

ভারতবর্ষের উপজাতীয় জনসমষ্টি (tribal population) বলিতে যাহাদের বুঝায় তাহাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের আসাম

ও আসাম সীমান্তে বাস করে। ইহাও পর্বত ও অরণ্যময় অঞ্চল। হিমালয়ের পূর্ব প্রান্ত হইতে বাহির হইয়া পাটকাই ও নাগা পর্বত উত্তর মুখে ও লুসাই পর্বত দক্ষিণদিকে প্রসারিত হইয়াছে। এই পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যভাগ হইতে আবার খাশী, জয়ন্তীয়া, গারো পাহাড় পশ্চিমদিকে বিস্তৃত। আসামের ও এই পার্বত্য অঞ্চলের সহিত ত্রিপুরা রাজ্য ও পার্বত্য চট্টগ্রামের এলাকা সংযুক্ত। লুসাই পর্বতের পশ্চিমে এই এলাকা পূর্বদিকে চীন পর্বত ও দক্ষিণে উত্তর আরাকানের পার্বত্য অঞ্চলের সহিত সংযুক্ত।

আসামের এই বিস্তৃত অঞ্চলে খাশী ও জয়ন্তীয়া পর্বতে প্রায় ৭৪ হাজার, নাগাপর্বতে প্রায় ২ লক্ষ, লুসাই পর্বতে প্রায় ৬০ হাজার এবং আসাম বা ব্রহ্মপুত্র এলাকায় প্রায় ৪ লক্ষ বিভিন্ন গোষ্ঠীর উপজাতীয় জন-সমষ্টির বাস। মণিপুর রাজ্যের প্রায় সাড়ে চার লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে দেড় লক্ষ ও খাশীরাজ্যগুলির ১ লক্ষ ৮০ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ১ লক্ষ ২৬ হাজারকে উপজাতির দান ধরা হয়। উপজাতীয় বলিতে যাহারা হিন্দু বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেয় না তাহাদের বুঝান হইয়াছে। বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে প্রায় ২১টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ২ লক্ষ ৬৮ হাজার নাগা, ১৮টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত প্রায় ৯০ হাজার কুকি, প্রায় ২ লক্ষ গারো, ১ লক্ষ ৬০ হাজার খাশী, ১ লক্ষ ১৪ হাজার লুসাই, ১ লক্ষ ১০ হাজার মিকির ও ৩ লক্ষ ৪০ হাজার কাছারী প্রধান। ইহা ছাড়া সদিয়া সীমান্ত এলাকায় ডাফ্লা, আবর, মিশমি, সিংপো, খামটি, আসাম উপত্যকার মেচ, মিরি, লুসাই পর্বতের লাখের, লালুং, ফানাল, মাহ্‌র প্রভৃতি আছে। আসামের জনসংখ্যার মধ্যে উপজাতি, অর্থাৎ যাহারা জনসংখ্যা গণনাকারীদিগের মতে হিন্দু নয় এরূপ জনসমষ্টির সংখ্যা, দশ লক্ষ ধরা হইয়াছে; কিন্তু ধর্ম হিসাবে সংখ্যা নির্দেশ না করিয়া ভাষা হিসাব করিলে আসামী ও বাংলা ভাষাভাষী প্রায় ৫৯ লক্ষ লোক ও হিন্দী, মুণ্ডারী, উড়িয়া, সাঁওতালী, গোন্দী, খারিয়া প্রভৃতি ভাষাভাষী। ১৫ লক্ষ চা বাগানের কুলীও অন্যান্যের সংখ্যা বাদ দিলে আসামের উপজাতীয় লোকের সংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষে দাঁড়ায়।

আসামের নাগা, কুকী, খাশী, লুশাই, মেচ, মিকির এবং গারো, ত্রিপুরার অধিবাসী উপজাতি সমূহ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা প্রভৃতিকে ভারতবর্ষের প্রকৃত আদিবাসীর পর্যায়ে ধরা উচিত কিনা তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন। ভাষা ও দৈহিক লক্ষণের দিক দিয়া ভারতবর্ষের অভ্যন্তর ভাগের যে সকল আদিবাসীর কথা বলা হইয়াছে তাহাদের সহিত আসাম ও আসামের সীমান্ত অঞ্চলের এই সকল উপজাতির কিরূপ সম্পর্ক আছে তাহার কথা পরে বলা হইবে। এই দুই দলের মধ্যে যে অসাদৃশ্য আছে তাহা একজন সাঁওতাল ও একজন খাশীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। আসামের এই সকল উপজাতি অল্পবিস্তর মোঙ্গলীয় লক্ষণযুক্ত। আসাম সীমান্ত হইতে পূর্বদিকে যত অগ্রসর হওয়া যাইবে অধিবাসীদিগের মধ্যে মোঙ্গলীয় লক্ষণ তত পরিস্ফুট হইয়াছে। যদি মানিয়া লওয়া যায় যে, এক কালে এই সকল অঞ্চলে যাহাদিগকে ভারতবর্ষের আদিবাসী বলা হয়, সেই গোষ্ঠীর লোক বাস করিত তাহা হইলেও বৈদেশিক সংমিশ্রন এত অধিক পরিমাণে ঘটিয়াছে যে, নূতন গোষ্ঠীর উৎপত্তি হইয়াছে। দুই চারিটি অনুমান-মূলক সাক্ষ্য ছাড়া আসামের সীমান্ত অঞ্চলে ভারতীয় আদিবাসী গোষ্ঠীর সহিত সংমিশ্রন ঘটিয়াছে ইহা প্রমাণ করা শক্ত। খামটি, সিংপো প্রভৃতি সদিয়া সীমান্ত এলাকার উপজাতি পাটকাই পর্বতের পূর্বে বাস করে। সিংপোরা ব্রহ্মের কাচিন উপজাতির সহিত সম্পর্কিত। নাগাদিগকে ব্রহ্মের এলাকার মধ্যেও দেখা যায়। খামতিগণ তাই গোষ্ঠীর সহিত সম্পর্কিত। শান উপজাতি এই গোষ্ঠীর। ব্রহ্ম সীমান্ত হইতে সরিয়া বাঙ্গলার

সীমান্তের দিকে যত অগ্রসর হওয়া যাইবে বাঙ্গলার সমতলভূমির অধিবাসীদিগের সহিত সংমিশ্রনের পরিচয় তত পরিস্ফুট। বোদো, গারো, সাঁওতাল, কোচ প্রভৃতি উপজাতি ইহার পরিচয় দেয়।

উত্তর-পূর্ব ভারত হইতে এইবার দক্ষিণ ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে। দক্ষিণ ভারতের প্রান্তসীমায় কতকগুলি আদিবাসী উপজাতি দেখা যায়। ইহাদের কথা সংক্ষেপে পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

দক্ষিণ ভারতের উপজাতিগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। কতকগুলি উপজাতি, আদিবাসীদিগের প্রধান অঞ্চলের কোন কোন গোষ্ঠীর শাখা বা বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির মধ্যভাগে অবস্থিত হায়দারাবাদ রাজ্যের কতকাংশ এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। এই এলাকায় প্রায় ১ লক্ষ ১৩ হাজার গোন্দ, ৫৯ হাজার করওয়া, ৬৩ হাজার কয়া এবং পোরজা, শবর, খোন্দ, খোন্দেরা প্রভৃতি উপজাতি বাস করে। পশ্চিম ভারতের ভীলদিগকে এই রাজ্যের মধ্যে দেখা যায়। এই সকল উপজাতি প্রধানতঃ পূর্ব উপকূলের উত্তরাংশে বাস করে। দ্বিতীয় ভাগে পড়ে দক্ষিণ ভারতের নিজস্ব কতকগুলি উপজাতি। প্রধানতঃ এজেন্সী এলাকায় তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। চেঞ্চুগণ দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতি, হায়দারাবাদের বাহিরে কেবল মাদ্রাজের মধ্যে তাহাদিগকে দেখা যায়। বাদাগা, কুরুম্বা এরভালান, কাদান, কানিক্কারান, পানিয়ান, ইরুলা, কুডুবী, কুদিয়া, পার্নো, যেনাদি প্রভৃতি এবং ত্রিবাঙ্কুর ও কোচীনের এলাকায় মালয়ন, পানিয়ান, মুথুবন, নায়চদি, বেতান, বেত্তুবন, কাদির বা কাদার প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের নিজস্ব উপজাতি। টোডগণ দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতি কিন্তু অন্যান্য উপজাতি হইতে ভিন্ন গোষ্ঠীর। দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতিগুলির বিশেষত্ব এই যে, তাহাদের অধিকাংশের সংখ্যা অতি অল্প ইহাদের নিজস্ব পৃথক ভাষা দেখা যায় না, যে অঞ্চলে বাস করে সেই অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করে। মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, দক্ষিণ ভারতীয় উপজাতিগুলিকে একটি বহু প্রাচীন গোষ্ঠীর ইতস্তত ভাসমান অবশিষ্ট ভগ্নাংশ বলিয়া মনে হয়।

আসাম ও আসাম সীমান্তের উপজাতিগুলিকে যদি ভারতবর্ষীয় আদিবাসীর মধ্যে গণনা করা হয় তাহা হইলে বলা যায় যে, আমরা প্রধানতঃ চারিটি অঞ্চলে আদিবাসীদিগকে দেখিতে পাই;—(১) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে (২) ছোটনাগপুরের মালভূমি ও মধ্যভারতের মালভূমির কিয়দংশ লইয়া গঠিত একটি বিস্তৃত অঞ্চলে (৩) পশ্চিম ভারতে কোন কোন বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে এবং (৪) দক্ষিণ ভারতে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, উত্তর পশ্চিম উপজাতীয় এলাকার পাঠান বা পুস্ত ভাষাভাষীদিগকেও কেহ কেহ ভারতবর্ষের আদিবাসীদিগের পর্যায়ভুক্ত করিতে চাহেন। এই মত সমীচীন কিনা পরে দেখা যাইবে।

ইহার পরে নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী ও ভাষাতত্ত্ববিদেরা ভারতবর্ষীয় আদিবাসীদিগের সম্বন্ধে কি বলেন, তাহার আলোচনা করা হইবে। ০

জীব-তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা

শ্রীঅশোক ঘোষ

কোন একটি বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা নিরূপিত হয় দু'টো দিক থেকে, প্রথমতঃ তার তাত্ত্বিক দিক আর দ্বিতীয়তঃ ব্যবহারিক দিক।

যখন কোন নূতন বিষয় চালু হয় তখন তার ভিতর মনের খোরাক জোগানোর দিকটাই বেশী পরিপুষ্ট থাকে। পরে সেই জ্ঞানেরই আংশিকভাবে রূপান্তর হয় তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক কাজে। যে কোন বিজ্ঞানের বিষয়েই একথা সমান ভাবে খাটে। জীবতত্ত্বের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

বিজ্ঞানের আসরে জীবতত্ত্বের আবির্ভাব বহুদিন হয়েছে সত্য, কিন্তু তার সুষ্ঠু ও ধারাবাহিক অনুশীলন খুব বেশীদিন আরম্ভ হয়নি। কাজেই পদার্থ বা রসায়ন বিজ্ঞানের তুলনায় ব্যবহারিক দিকে তার দানের পরিমাণ সামান্যই। এর মানে এ নয় যে, ভবিষ্যতে ফলিত জীববিজ্ঞানের সম্মুখে কোন বৃহত্তর সম্ভবনা নেই।

আজ আমরা যে পৃথিবীতে বাস করছি, তাকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য গাছপালা আর জীবজন্তু। প্রাণের স্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে সমুদ্রে, পাহাড়ে, আকাশে, বাতাসে। আণুবীক্ষণিক প্রাণী আর উদ্ভিদ থেকে আরম্ভ করে বিরাটকায় মহীরুহ আর দানবপ্রায় জন্তুর মধ্যেও আমরা দেখতে পাই, জীবনের এই বিস্তৃতি।

মানুষের কৌতূহলী প্রবৃত্তিই আবহমান কাল ধরে তার মনে জাগিয়েছে নানা প্রশ্ন। এই অনুসন্ধিৎসু মন থেকেই মানুষের মনে একদা প্রশ্ন জেগেছিল, তার চারপাশের জীবজগৎ সম্বন্ধে। তখন থেকে সে জীবজগৎকে দেখতে আরম্ভ করে আপেক্ষিক দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে। আর সেদিন থেকেই জীব-বিজ্ঞানের গোড়া পত্তন হয়ে যায়, অন্যান্য বিজ্ঞানের সহযোগী হিসাবে। প্রাণী আর উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তুলনামূলক আলোচনা চলতে থাকে। এই তুলনার মূল উপাদান হচ্ছে, প্রাণী আর উদ্ভিদের বাহ্যিক আর আভ্যন্তরীন গঠন প্রণালী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মেরুদণ্ডীদের ভিতর সমস্ত প্রাণীরই দেহাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রগুলির একই সাধারণ গঠন প্রণালী। মাছ, ব্যাং, সাপ, পাখী বা মানুষের 'হৃৎপিণ্ড ও রক্ত চলাচল' নিয়ে যদি আলোচনা করি, তবে দেখতে পাব প্রত্যেকের যন্ত্র-বিশেষের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য থাকলেও মূল গঠন প্রণালীতে তারা প্রায় সবাই এক। যেমন প্রত্যেকটি হৃদয়ই মোটামুটি ভাবে দু'টি বিভক্ত বা অবিভক্ত কুঠরী (অলিন্দ ও নিলয়), ও তার অঙ্গসংশ্লিষ্ট (শিরা ও ধমনী) রক্ত বহানালী দ্বারা গঠিত। এধরণের উদাহরণ উদ্ভিদ জগতেও বিরল নয়।

কাজেই এথেকে প্রমাণিত হয় যে, উদ্ভিদে উদ্ভিদে আর প্রাণীতে প্রাণীতে নিজেদের মধ্যে এক গভীর আত্মীয়তার ইতিহাস রয়েছে।

এই আত্মীয়তার ইতিহাসকেই জীবতত্ত্বে অভিব্যক্তিবাদ বা বিজ্ঞানবাদ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠন প্রণালীর প্রমাণ ছাড়াও, জীবতত্ত্বের অন্যান্য শাখার (ভ্রূণতত্ত্ব, প্রত্ন প্রাণীতত্ত্ব প্রভৃতি) সাহায্য নিয়ে বিবর্তন-বাদকে আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা চলে।

বিবর্তনের মূলকথা, প্রাণীজগত পরস্পর সংশ্লিষ্ট আর তারা যুগযুগান্তর ধরে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে সরল থেকে জটিলতর অবস্থায় পরিবর্তিত হচ্ছে।

এই পরিবর্তনের কথায় আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে যে, এই 'অনুসন্ধিৎসা

বিবর্তনের যুগে, জীবতাত্ত্বিকদের বংশানুক্রম সম্বন্ধে মূল্যবান্ গবেষণার উৎসাহ দান করেছিল। আর আজ আমরা এমন পর্য্যায়ে এসে উপনীত হয়েছি—যেখানে বংশানুক্রমের মধ্যে সুস্পষ্ট আইনের সন্ধান পর্যন্ত পেয়েছি।

সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে, মাতা পিতার যৌন-কোষই (Gametes) তাদের সন্তানের বংশানুক্রম নির্ধারণ করে। এখন আবার আমরা এ-সন্ধানও পেয়েছি যে, এই যৌন-কোষগুলির অভ্যন্তরস্থ জৈবসূত্রগুলিই (Chromosomes) সন্তানের ভবিষ্যৎ চারিত্রিক গুণাবলী (বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন) প্রকাশের জন্য প্রধানতঃ দায়ী। আর এই জৈবসূত্রগুলির অত্যদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের ফলে—জীবজগতে নানা রূপান্তরের সৃষ্টি হয়, আর তা' বংশ পরম্পরায় স্থায়িত্ব লাভ করে। এই জৈবসূত্রগুলির ব্যবহার খেয়ালমাফিক নয়, এদের গতিবিধিতে সুস্পষ্ট নিয়মানুবর্তিতাই লক্ষিত হয়।

জীবতত্ত্বের এই নবতম শাখার অবদানে আজ আমরা বংশানুক্রম সম্বন্ধে অনেক কুসংস্কার দূর করতে পেরেছি। আর এর আলোচনার ফলেই আমরা বিবর্তনের অনেক রহস্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হয়েছি। এমন কি, বংশানুক্রমের সূত্র ধরে, জীবতাত্ত্বিকরা 'কৃত্রিম অভিব্যক্তি' পর্যন্ত সম্ভব করে তুলেছেন। অর্থাৎ আজ বংশানুক্রম ও বিবর্তনের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ সুস্পষ্টভাবে নিরূপিত হয়ে গেছে। তাই আমাদের কাছে এটা চিন্তার খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, মানব সমাজের ওপর বিবর্তনের গতি কিভাবে প্রভাববিস্তার করছে। সঙ্গে সঙ্গে এ 'ব্যাপারটা জীবতত্ত্বের অনুশীলনের ওপরই নির্ভর করছে যে—এই গতিকে আমরা আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করতে পারি কি না।

জীববিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার প্রথম অংশের সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করে, এবারে আমরা তার ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

মানব গোষ্ঠির প্রাথমিক অথচ সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ সমস্যা কি, তা যদি আমরা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখি, তবে সেটা যে খাদ্য-সমস্যা, সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

ব্যবহারিক জীবতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে না হলেও, আংশিকভাবে এর সমাধান করতে পারে। কিন্তু কি উপায়ে? সেই আলোচনাই এখানে করব।

খাদ্য-সমস্যার সমাধান বলতে সাধারণভাবে খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধিই বোঝায়। জীবতত্ত্বের নানা শাখার গবেষণা-লব্ধ জ্ঞান থেকেই আমরা এ প্রচেষ্টা সার্থক করে তুলতে পারি।

আমরা প্রধানতঃ আমাদের পারিপার্শ্বিক জীব-জগতকেই খাদ্যের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে থাকি। তাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে যে, কি করে এই জীবজগত থেকে আমরা অধিকতর খাদ্য সংগ্রহ করতে পারি।

প্রথম উপায়, কৃত্রিম ও নির্বাচিত প্রজনন দ্বারা আমরা জীব-জগতের 'খাদ্য-বস্তুর' পরিমাণ বাড়াতে পারি। যেমন নির্বাচিত প্রজনন দ্বারা গরু প্রভৃতির দুধ ও মাংসের পরিমাণ, হাঁস মুরগীর ডিমের সংখ্যা, আকৃতি এবং তাদেরও মাংসের পরিমাণ অনেকটা ইচ্ছামত বাড়াতে পারি। আমাদের economic plantsগুলিকে অর্থাৎ ধান, গম প্রভৃতি ফসলকেও এইভাবে নিয়ন্ত্রিত ও নির্বাচিত প্রজননের সাহায্যে বাড়িয়ে তুলতে পারি।

এই ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রজননের সম্মুখে প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে। এর দ্বারা আমরা খাদ্য-বস্তু বৃদ্ধি বা খাদ্যোপযোগী নূতন নূতন উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রবর্তন করতে পারি।

দ্বিতীয় উপায়, প্রাণী ও উদ্ভিদের শারীরতত্ত্ব, পারিপার্শ্বিকতা প্রভৃতির জ্ঞান থেকেও আমরা তাদের উন্নতি সাধন করতে পারি। এর সঙ্গে আমাদের এটাও জানা দরকার যে, এই সমস্ত প্রাণী আর উদ্ভিদ কি খেয়ে বেঁচে থাকে। সে জ্ঞান

থেকেও আমরা তাদের 'গৃহীত খাদ্যে'র ওপর নিয়ন্ত্রণ চালাতে পারি।

আজকালকার বৈজ্ঞানিক কৃষি ও মৎস্যচাষ এই সমস্ত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ওপরেই মূলতঃ নির্ভরশীল।

তৃতীয় উপায়, আমাদের খাদ্যের উপাদান-গুলিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা।

খাদ্যের উপাদান অর্থাৎ 'অর্থনৈতিক উদ্ভিদ আর গৃহপালিত পশু,—এরা প্রায় সকলেই বহি-জগতের শত্রুর দ্বারা পর্যুদস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এর অর্থ খুব সহজভাবেই অনুমেয় যে, তার ফলে আমরাও প্রকারান্তরে খাদ্য থেকে বঞ্চিত হই।

আমাদের এই বঞ্চনা থেকে রক্ষা করবার জন্যে জীবতত্ত্ব এগিয়ে আসে। তাই আমাদের খাদ্যের উপাদানগুলিকে কীট-পতঙ্গ থেকে রক্ষার জন্যে জন্ম নিয়েছে পতঙ্গ-বিদ্যা, ছত্রাক্ আক্রমণের বিরুদ্ধে সৃষ্টি হয়েছে মাইকোলজি, প্রোটোজোয়ার জন্যে প্রটোজুওলজি আর ব্যাক্টেরিয়ার জন্যে ব্যাক্টেরিওলজি।

জীবতত্ত্বের এই শাখাগুলি আমাদের কি শিক্ষা দেয়? তারা আমাদের প্রত্যক্ষভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়, এই সমস্ত ক্ষতিকর কীট-পতঙ্গ, ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া আর প্রোটোজোয়ার সঙ্গে। আমরা তাদের জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করি। আর তারই ফল-স্বরূপ আমরা কৌশলের সঙ্গে তাদের আক্রমণ বন্ধ করতে পারি বা ক্ষতিকর জীবের বিরুদ্ধে জৈবিক দমনের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারি।

যদিও আমাদের পারিপার্শ্বিক জীবজগৎকে সম্পূর্ণভাবে আজও এই সব শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারা যায়নি তবু এ আশা জীব-তাত্ত্বিকরা পোষণ করেন যে, তাদের উদ্ভাবিত পথেই মানুষের পক্ষে কল্যাণকর জীবজগৎ অদূর ভবিষ্যতে রোগমুক্ত হতে পারবে।

এই ত্রয়ী পরিকল্পনাই মোটামুটিভাবে খাদ্য বৃদ্ধির জন্যে, জীবতাত্ত্বিকদের দ্বারা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। তা'ছাড়া এইভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে খাদ্য উৎপাদনের বাড়তি সুবিধা এই যে, সেটা আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। আমরা 'সমাজতন্ত্রবাদ' কায়েম করবার কথা বলে থাকি,—তা করতে হলে নিয়ন্ত্রিত খাদ্য উৎপাদনের জন্য আমাদের এই ধরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

ব্যবহারিক জীব-বিজ্ঞানের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যদি আমরা সামাজিক জীব-বিজ্ঞানের আলোচনা না করি।

সামাজিক জীব-বিজ্ঞান আমাদের সমাজকে কি ভাবে প্রভাবান্বিত করছে, আর তার সম্মুখেই বা কি কি সম্ভাবনা রয়েছে—এ কৌতূহল স্বভাবতঃই আমাদের মনকে সচেতন করে তোলে।

প্রথমত জীবতত্ত্বের এই শাখা আমাদের মানব সম্প্রদায়ের 'এক-জাতিত্ব' স্বীকার করে নিয়েছে—আর তা' জগতের সম্মুখে প্রমাণও করেছে। বিশেষ করে, পৃথিবীর ফ্যাসিষ্ট ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি জাতিত্বের ফতোয়া দিয়ে পৃথিবীতে অসাম্যের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু সামাজিক জীব-বিজ্ঞান জোরের সঙ্গে সারা পৃথিবীকে জানিয়েছে, **Race**এর সৃষ্টি হয়েছে স্বাভাবিক জৈব পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে—এবং তা' কখনও জাতিতে জাতিতে উচ্চ-নীচুর তারতম্য সূচিত করে না।

এরপর সামাজিক জীব-বিজ্ঞানের সম্মুখে যে সমস্যা তা' আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত অসম্ভব মনে হলেও—তাকে সামাজিক কল্যাণের জন্য বাস্তবে পরিণত করবার চেষ্টা চলেছে। অর্থাৎ সামাজিক জীব-বিজ্ঞানের এখনকার উদ্দেশ্য হোল, সমস্ত মানব-সম্প্রদায়কে আরও উন্নততর জাতিতে পরিণত করা। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আজ জীব-বিজ্ঞানে সুপ্রজনন-বিদ্যার সৃষ্টি হয়েছে। জাতি উন্নয়নের জন্যে তাই সারা বিশ্বের **Eugenist**রা সঙ্ঘবদ্ধভাবে পরিকল্পনা তৈরী কচ্ছেন। আপাতত তারা দু'টি পথকেই এ কাজের সহায়ক হিসাবে ব্যবহার কচ্ছেন।

যথা, প্রথমত—অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্ম-নিরোধ অর্থাৎ উন্মাদ, বোবা-কালা, যৌন-ব্যধিগ্রস্থ প্রভৃতি সমাজের-অকল্যাণকারী ব্যক্তিগণের সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা লোপ করা।

জন্ম-নিরোধের উপায় অনেকগুলি বের হলেও **castration** বা মুষ্কছেদ, **Vasectomy** বা শুক্রনালীচ্ছেদ, **Salpiriogectomy** বা ডিম্বনালী-চ্ছেদ ইত্যাদি কোনটিই সর্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভ করেনি।

দ্বিতীয়ত—উদ্ভিদ বা প্রাণীর অনুকরণে মানব সম্প্রদায়েও 'নির্বাচিত প্রজনন' চালু করা। অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও এ প্রস্তাব সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়। 'সামাজিক জীব-বিজ্ঞানীদের' একে রূপায়িত করবার জন্য চেষ্টার অন্ত নেই।

Engenist দের স্বপ্ন যদি সত্যি হয় (না হবারও বিশেষ কোন কারণ নেই), তবে আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজের অধিবাসীগণ মোটামুটিভাবে সকলেই হবেন আজকের চেয়ে অধিক স্বাস্থ্যবান, ধী-সম্পন্ন ও সর্বোপরি রোগমুক্ত। রোগজর্জর পৃথিবীকে উদ্ধার করবার কাজে **Medical Biology**র দানকেও অস্বীকার করা চলবে না।

এ প্রবন্ধে এ কথাটাই বলবার চেষ্টা করা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে জীব-তত্ত্বের কতটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ। কিন্তু সাধারণত আমাদের মনে জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে যখনই কোন প্রশ্ন দেখা দেয়, তখনই আমরা সেটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি। এর ফলে জীবন আমাদের কাছে রহস্যাবৃতই থেকে যায়, আমরা তাকে বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে কখনও দেখবার চেষ্টা করি না।

এ ছাড়া, বস্তুবাদী হিসাবে বিচার করলেও দেখতে পাব যে, জীব-বিজ্ঞান আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রাকেও সুষ্ঠু করে তোলবার চেষ্টা করে। জীবনের অন্যতম প্রধান সমস্যা যে খাদ্য-সমস্যা, তাকে মেটাবার কাজে সে যথেষ্ট সহায়ক হয়। এমন কি, আজ সে সাম্যবাদের ভিত্তিতে আমাদের সম্মুখে এক উন্নততর নূতন সমাজের সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছে।

ভারতবর্ষ জীব-তত্ত্বের অনুশীলনে অত্যন্ত পিছিয়ে আছে, তাই তার এগিয়ে যাওয়া চাই।

"আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা যে কতদূর প্রয়োজনীয় তাহা কি নূতন করিয়া বলিতে হইবে? প্রয়োজনীয় বলিলে বরং কম বলা হয়। বিজ্ঞান ব্যতীত আমাদের গতি নাই, রক্ষা নাই। * * * মনে করিও না, বিজ্ঞান হইতে কেবল অর্থলাভই হয়। সংসারে মানুষের চেয়ে বড় কে? মানুষের মনের চেয়ে বড় কি আছে? মানব মন বিজ্ঞান বলে মার্জ্জিত, উন্নত ও শক্তিশালী হয়। সমাজনীতি, ধর্মনীতি সমস্তই নানাপ্রকারে বিজ্ঞানের নিকট ঋণী। তাই বলি, যদি বাঁচিতে চাও, সভ্য মানবমণ্ডলীর মধ্যে মুখ দেখাইতে চাও, বিজ্ঞানের সেবা কর।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

প্রকৃতি ও প্রাণ

শ্রীমৃণালকান্তি হোড়

"খোকা মাকে শুধায় ডেকে, এলেম আমি কোথা থেকে
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।"

মানুষ আজ প্রকৃতি মাকে এই কথাই জিজ্ঞেস করে। অতৃপ্ত হৃদয়ের চঞ্চলতায় মানুষ খুঁজে চলছে তার অস্তিত্বের সন্ধান। উৎস-পথে এসে হারিয়ে ফেলেছে তার পথচিহ্ন। উন্নতির ধাপে ধাপে অনেক এগিয়ে এসে সে পেছনে তাকায়—পথের আরম্ভ আর দেখ্‌তে পায় না। ফুলে-ফলে বৈচিত্র্যময় প্রাণপূর্ণ এই পৃথিবীর প্রাণ কোথায়—কবে তার সৃষ্টি—কি করে? শিল্পে, সাহিত্যে, জ্ঞানে, গরিমায় প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, মানুষ এর সন্ধান পেয়েছে কি?

তীক্ষ্ণ সন্ধানী-দৃষ্টি নিয়ে পৃথিবীর বক্ষ খুঁড়ে খুঁড়ে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রাণের সন্ধান না পেলেও প্রাণের গতিপথের সন্ধান পেয়েছে। তাতে জ্ঞান-জগতের আর এক দিকের অন্ধকার দূর হল। কি জানি, গতিপথ ধরে উৎসমুখের সন্ধান তারা একদিন পাবে কিনা।

প্রকৃতি আজ কত বিচিত্র। বিভিন্ন দেশে তার বিচিত্র রূপের প্রকাশ। বিষুব উষ্ণ অঞ্চল থেকে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল দিয়ে মেরুর হিম অঞ্চলে তার শেষ। অথচ এই সেদিনকার হিমযুগে আবহাওয়া এতই শীতল ছিল (প্রায় ১০ লক্ষ বছর আগেকার কথা) যে, পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের প্রায় সমস্ত ভূভাগ বরফে ঢাকা ছিল; আর তারও পূর্বে সেই আবহাওয়া এখনকার অবস্থা থেকে অনেক উষ্ণ ও আরামপ্রদ ছিল। তখন গ্রীনল্যাণ্ড সত্যি-কারের সবুজ ভূমি ছিল—এর প্রমাণও পাওয়া যায়। সুতরাং যুগে যুগে তাপের এই তারতম্য চলে আস্‌ছে এবং এটা বেড়ে যায় কোন যুগের প্রারম্ভে বা শেষের দিকে; আর এই সময় প্রকৃতির রুক্ষতাও বেড়ে যায়।

তাপের এই প্রকারভেদ আজ পর্যন্ত সাতবার ভূভাগের উত্তাপ অনেক কমিয়ে এনেছিল এই সমস্ত যুগে—প্রোটোযোয়িক যুগের প্রথম ও শেষের দিকে সিলুরিয়ান্, পারমিয়ান্, ট্রায়াস্, ক্রেটেসাস্, ইওসিন্ ও প্ল্যাস্‌টোসিন। তার মধ্যে চারবার হিমযুগে। বিস্ময়ের কথা এই যে—তাপের এই তারতম্য ভূমি বিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে। ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাপেরও ব্যতিক্রম ঘটে—আবহাওয়া বদ্‌লে যায়—প্রকৃতি নানারূপ ধরে। প্রকৃতির এই নানারূপে প্রকাশ, পরিবর্তন এনে দেয় জীবজগতের বিবর্তনের পথে।

প্রাণের লক্ষণ কবে যে প্রকাশ পায়, বিজ্ঞান তা' এখনো বল্‌তে পারেনি। তবে এটা ঠিক, শান্ত নিস্তরঙ্গ জলেই এর প্রথম প্রকাশ। এক কোষবিশিষ্ট সরল প্রাণী—অস্তিত্ব বোঝা যায়না বল্‌লেই হয়; তাদের কেউ কেউ নিজের আশে পাশে যা' খাবার পেত তাতেই সন্তুষ্ট হত—তারা এসে শিকড় গেড়ে উদ্ভিদ্-জগতের গোড়াপত্তন করল। বাকীরা বেশী লোভী—তারা নাগালের খাবারে সন্তুষ্ট নয়,—তাদের আরও বেশী ভাল আহারে রুচি ও আগ্রহ হল। তারাই হলো ক্রমে গতিবিশিষ্ট জীবজগতের আদি পুরুষ। তবে অতি সরল তাদের গড়ন। হাড়, মাস বা রক্ত বল্‌তে কিছুই ছিল না—স্বচ্ছ অনেকটা জেলির মত। পরবর্তীকালে ভূবিবর্তনে ও প্রকৃতির ক্রম-পরিবর্তনে ঝঞ্ঝা-তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে তারা বিশেষ অসুবিধায় পড়লো। নরম, তুল্‌তুলে শরীর নিয়ে আর পারে না জলের ঝাপ্‌টা সহ্য করতে—তাই তারা চাইল শক্ত আবরণের অন্তরালে নিজেদের রক্ষা করতে। এই আবরণ তারা সংগ্রহ করলো জলে দ্রবীভূত ক্ষার পদার্থ হতে। অমেরুদণ্ডী প্রাণীর জন্ম

ইতিহাস এরূপই বটে। জীবজগতের এই অবস্থায় আস্‌তে প্রোটোযোয়িক যুগ শেষ হোল (প্রায় ৫০ কোটি বছর আগে)।

তাদের চেয়ে উন্নততর মেরুদণ্ডী জীব, যথা মাছ এর আবির্ভাব হোল—মধ্য ওবডোভিসিয়ান্ যুগে, প্রায় ৩৭ কোটি বছর আগে। এরা দ্রুতগতি বিশিষ্ট; জীবনযাত্রাও অনেকটা উচ্ছল—তাই এদের বিবর্তনও খুব দ্রুত ও সহজে লক্ষ্য করবার মত। উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা যায়—স্থির নিশ্চল জলে এদের জন্ম হয়নি। বাত্যা বিক্ষুব্ধ প্রবাহশীল জলে প্রথম উন্মেষ—তাই এনে দিল তাদের জীবনে চঞ্চলতা। এই সময় ভূ-ভাগের আলোড়নের জন্য ভূ-ভাগের উন্নয়নও বেড়ে যায়। ভূ-ভাগস্থ নদীসমূহ বেগবতী হয়—আর মেরুদণ্ডীরা নদীসঙ্গমে, হ্রদে ও নদীজলের চঞ্চলতায় নিজেদের ভাসিয়ে দিল। নদীজলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের আস্বাদ পেয়ে নূতনের উন্মাদনায় তারা মেতে উঠলো—ফুস্‌ফুস্ বা শ্বাস-যন্ত্রের দেখা দিল তাদের শরীরে। শেষে একদিন এই অক্সিজেনই তাদের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সিলুরিয়ান্ যুগে (প্রায় ৩৫ কোটী বছর আগে) ভূ-উন্নয়নে আবহাওয়ার রুক্ষতাও বেড়ে যায়। নদী, হ্রদ শুকিয়ে যেতে লাগ্‌লো—তখন নদীবাসীরা ভীষণ বিপদে পড়ে। অক্সিজেন না পাওয়ায় অনেকে দম আটকে মারা যায়। কেউ কেউ সমুদ্রে ফিরে গিয়ে অতিকষ্টে দিন কাটাতে লাগ্‌লো; বাকীরা এক ভীষণ কাজ করে বস্‌ল। তারা জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠতে লাগ্‌ল। প্রকৃতিও তাদের সাদরে বরণ করে নিল। প্রচুর আহার, লতায়, পাতায়, গাছে ঢাকা নিবিড় শান্তির ছায়ানীড়, উন্মুক্ত আকাশে প্রচুর আলো, আর হাওয়ার ভাণ্ডার নিয়ে প্রকৃতি যেন তাদেরই অপেক্ষায় ছিল। প্রচুর হাওয়া পেয়ে তারা একেবারে শ্বাসী হয়ে উঠে। এভাবে উভচরের আবির্ভাব হোল। নূতন জায়গায় এলেও তারা পুরোনো স্মৃতি ভোলেনি —জলে ঝাঁপিয়ে পড়েও সেই স্মৃতি মনে করত। ক্রমে স্মৃতি, বিস্মৃতির অন্ধকারে ঢাকা পড়ে যায়।

কারবনিফেরাস যুগের প্রথম দিকে (প্রায় ২৭ কোটি বছর আগে) আবহাওয়া বেশ মৃদু ও জলো—নদ, নদী, হ্রদ আবার জলে ভরে যায়। এই সময় নূতন ধরণের এক জীব দেখা দেয়।

তারা সরীসৃপ। এরা ডাঙ্গায় থাকলেও জলে থাকতে পারে। এদের একটা বড় অসুবিধা ছিল যে, শরীর চাঙ্গা করবার জন্যে সূর্যের তাপের দরকার হতো। তাদের রক্ত বড় শীতল। তারা বেশ করে রোদ পোহালে শরীর চাঙ্গা হয়, অথচ প্রায় পারমিয়ান্ যুগের (প্রায় ২২ কোটি বছর আগে) কাছাকাছি সময়ে ভূ-উত্থান এত বেড়ে যায় যে, প্রকৃতিতে আরও রুক্ষতা দেখা দিল তাপ কমে এলো; বিশেষ করে পৃথিবীর দক্ষিণভাগ এত ঠাণ্ডা হোল যে, হিমবাহ দেখা দিল। সরীসৃপ এত শীতে একেবারে কাবু। বাঁচবার জন্যে এদের এক উন্নততর শাখা বাইরের তাপ ছাড়া শরীর গরম করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে যায়। ক্রমে তাদের শরীরে উষ্ণ রক্তস্রোত বইতে সুরু করে দিল—আধুনিক জীবজগতের শুকতারা দেখা দিল। উষ্ণরক্তবাহীদের এক শাখা চতুষ্পদ স্তন্যপায়ীদের আদিপুরুষ ও আর একশাখার পরিণতি দ্বিপদ জাতি। ট্রায়াসিক যুগে (প্রায় ১৯ কোটি বছর আগে) প্রাকৃতিক রুক্ষতা আরও বেড়ে যায়। ডাইনোসর (সরীসৃপের এক বিশেষ শাখা) উৎপন্ন হয় ও দ্বিপদ হওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। রুক্ষতা যতই বাড়ে ততই তারা দ্বিপদী হওয়ার দিকে এগিয়ে যায়। বোধহয় এই রুক্ষতার জন্য তারা বিশেষ কষ্টসহিষ্ণু হয়। খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হওয়াতে আহরণের জন্য বিশেষ-ভাবে সচেষ্ট হয়। সেইজন্য গতিবৃদ্ধিরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মোটকথা, প্রকৃতি যতই নিষ্ঠুর হতে লাগ্‌লো, ততই তারা অবস্থার সাথে জীবনযাত্রা মানিয়ে নিয়ে উন্নততর পর্যায়ে এগিয়ে যায়।

জুরাসিক যুগে (প্রায় ১৫ কোটি বছর আগে) প্রকৃতি আবার উর্বরা হতে লাগলো—জীবনযাত্রা বেশ আরামপ্রদ হয়ে উঠ্‌লো। ডাইনোসর অল্প আয়াসে জীবননির্বাহ করতে পেরে বেশ বিলাসী

হয়ে উঠে। এটাই তাদের ধ্বংসের কারণ হলো। কারণ ক্রেটেশাস্ এর শেষের দিকে ভূ-সংকোচনের ফলে পৃথিবীব্যাপী যে পরিবর্তন এসে যায় তাতে আবহাওয়ার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। ডাইনোসর, শ্লথ প্রভৃতি বিশালী হওয়াতে এই দ্রুত পরিবর্তনের সাথে খাপ খেতে পারেনি—দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।

আদি স্তন্যপায়ীরা প্রতিযোগীতায় নূতন স্তন্যপায়ীদের সঙ্গে পেরে উঠ্‌লো না—ধ্বংস হয়ে গেল। ভূ-উন্নয়নের পরবর্তী অধ্যায়ের সময় ভূমিভাগ ধীরে ধীরে উঠ্‌তে থাকে। আবহাওয়ার পরিক্রম বিশেষ করে উত্তর গোলার্ধে হওয়াতে স্তন্যপায়ীরা আহার ও বাসস্থানের উপযোগী জায়গা খুঁজে নিতে দক্ষিণদিকে যাত্রা করল। অবস্থার পরিবর্তনে জীবনেরও অনেক পরিবর্তন এসে গেল। নূতন গেল এগিয়ে—পুরাতন রইল পেছনে পড়ে এবং ধ্বংস হোল ইওসিনের শেষে (প্রায় ৫ কোটি বছর আগে)।

অলিগোসিন্ ও মাইওসিন্ (প্রায় ৩½ কোটি বছর আগে) যুগে ভূ-আলোড়ন থামেনি। রুক্ষতা বেড়ে যায়—গাছপালা কমে এসে তৃণভূমির প্রসার হয়, স্তন্যপায়ীদের মধ্যেও এক বিরাট পরিবর্তন আসে। লতাপাতা ভোজীদের সংখ্যা কমে যায়, আর ঘোড়া, উট, হরিণ ইত্যাদি তৃণভোজীদের সংখ্যা প্রচুর বেড়ে যায়।

শেষে প্লাইওসিনে (প্রায় ১½ কোটি বছর আগে) আবহাওয়া শীতল ও শুষ্ক হওয়াতে স্তন্যপায়ীরা নানা শাখাতে বিকশিত হয়ে উঠে—বিশেষ করে গৃহপালিত প্রাণীর প্রসার হয় বেশী। শুধু তাই নয়, গোরু, ঘোড়া, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি ছাড়াও বর্তমান জীবজগতের বাঘ, হাতী, সিংহ, চিতা ইত্যাদি প্রাণীর আবির্ভাবে জীবজগত প্রসারিত হতে থাকে। একে যখন অপরের আহার জোগায়—সৃষ্টির তখন বাধা কি?

মানুষ তখনও আসেনি। এই যুগের শেষে প্রকৃতি যতই শীতল ও রুক্ষ হতে লাগলো বনভূমি ততই সঙ্কীর্ণ হতে লাগল এবং শেষে যখন আর বনভূমি বল্‌তে প্রায় কিছুই রইলো না, মানুষের পূর্বতন পুরুষেরা ভূমিতে নাম্‌লো—মানুষ হোল।

তারপর এলো মানব ইতিহাসের ভীষণ সঙ্কটময় যুগ—প্রচণ্ড হিমযুগ। প্রকৃতির এই অন্যায় অবিচার মানুষ বিধিলিপি বলে মেনে নেয়নি। অদৃষ্টের দোহাই পেড়ে চুপ করে থাকেনি; মানুষ বিদ্রোহী হোল। সর্বপ্রথম প্রকৃতির জীব তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালো। মাথা খাটিয়ে আচ্ছাদন তৈরী করে প্রচণ্ড শীতে আত্মরক্ষায় ব্রতী হোল—খেটে খেতে লাগ্‌লো। শারীরিক অভাব পূরণ করে নিল হাতিয়ার দিয়ে। প্রকৃতির গ্রাস হতে সে নিজেকে রক্ষা করলো। মানুষ তার গতিপথ নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলো। প্রকৃতির ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলো। নিজের ক্ষমতায় তাই আজ মানুষ প্রাণী-জগতের শ্রেষ্ঠ জীব। তার যাত্রা হোল সুরু—শেষ হবে তখন, যখন সে প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করবে—তার সুরে প্রকৃতির ছন্দ রচিত হবে।

বাতব্যাধির চিকিৎসা

আর্থার এ্যাষ্টবেরী

বাতরোগের প্রাদুর্ভাব পৃথিবীর সব দেশেই আছে। ঠাণ্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়াতে অবশ্য এর প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই রোগে মৃত্যু ঘটেনা বলে চিকিৎসকেরা অন্যান্য কঠিন রোগের দিকে যে পরিমাণ মনোযোগ দেন এর দিকে সম্ভবত ততটা দেননি।

বাতরোগ নানাপ্রকারের আছে। তবে এর সাধারণ লক্ষণগুলি হচ্ছে—শরীরের গ্রন্থি ফোলা, বেদনা এবং কখন কখনও শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি। এই রোগ অল্পবয়স্কদের মধ্যে কঠিন রিউম্যাটিক ফিভার আকারে দেখা দেয়, যার ফলে হৃদ্‌যন্ত্র পর্যন্ত আক্রান্ত হয়। আবার কখন কখন রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস বা অসটিও—আরথ্রাইটিস নামক দীর্ঘকালস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক রূপেও দেখা দেয়।

সাধারণত যুবতী ও মধ্যবয়স্কা স্ত্রীলোকেরা এই রিউমাটয়েড আরথ্রাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়। প্রথমে শরীরের ছোট ছোট গ্রন্থিস্থল, যেমন আঙ্গুল বা আঙ্গুলের গ্রন্থিগুলি আক্রান্ত হয়; ক্রমে সমস্ত হাত ফুলে ওঠে এবং বেঁকে যায়। এই রোগ অত্যন্ত কষ্টদায়ক। বাতরোগ আরো নানারকম রূপে ও নামে পরিচিত। যেমন—গাউট, ফাইব্রোসাইটিস্, সাইটিকা, লাম্বাগো ইত্যাদি।

বাতরোগের কারণ কি? গত বৎসর ম্যানচেষ্টারের এক চিকিৎসা গবেষণাগারে প্রমাণিত হয়েছে যে, শরীরের অভ্যন্তরে একপ্রকার বিষের (virus) অস্তিত্বই এই রোগের কারণ। একটি খরগোসের শরীরে এই বিষ প্রবিষ্ট করে দেখা যায় যে, তার দেহে বাতের লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে। আবহাওয়া, বংশের প্রভাব, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, গ্রন্থির রসক্ষরণ, অত্যধিক শ্রান্তি বা ক্লান্তি—এগুলি রোগবৃদ্ধির সহায়তা করে মাত্র।

এই রোগের চিকিৎসা কি? চিকিৎসকেরা আশা করছেন যে, বসন্তের টীকার মত যদি ওই বিষ থেকে টীকা তৈরী করে মানুষের দেহে প্রবিষ্ট করান হয় তাহলে তা প্রতিষেধকের কাজ করবে। এবিষয়ে পরীক্ষা চালান হচ্ছে।

বাতরোগের উপশমের জন্য নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহার করা হয়। তার মধ্যে পেনিসিলিন, টি, এ, বি, গোল্ড, ভিটামিন, গ্ল্যাণ্ড একষ্ট্র্যাক্ট ইত্যাদি ব্যবহারে অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া গেছে। ল্যাকটিক এ্যাসিড এবং এ্যাসিড সোডিয়াম ফসফেট ইনজেকসন করে অষ্টিও-আরথ্রাইটিস রোগের যন্ত্রণার উপশম করা গেছে। মালিস, ব্যায়াম, উত্তাপ ও আলো চিকিৎসা ইত্যাদিতেও অনেক সময় উপকার হয়। অনেক চিকিৎসক রঞ্জনরশ্মি ও বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যেও আজকাল এই রোগের চিকিৎসা করছেন।

বৃটেনের অনেক হাসপাতালে বাতজাতীয় কঠিন ব্যাধিগুলির চিকিৎসার জন্য আলাদা বিভাগ খোলা হয়েছে। চিকিৎসকরা উপলব্ধি করেছেন যে, বাতরোগকে সামান্য ও সাধারণ রোগের পর্যায়ে ফেলে অবহেলা করা চলবেনা। এর জন্য বিশেষ ধরণের চিকিৎসার প্রয়োজন।

কিন্তু সাধারণ লোক, যারা বাড়ীতে এই যন্ত্রণাদায়ক রোগে ভুগছে, তাদের কষ্টের লাঘব হবে কি করে?

শরীরকে প্রথমতঃ শুষ্ক ও গরম রাখতে হবে। আহারাদি সম্বন্ধেও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। মালিসকেও অবহেলা করলে চলবেনা। বেদনার সময় এ্যাসপিরিনেও উপকার পাওয়া যায়।

বাতের জন্য কেউ কেউ 'কলচিকাম' জাতীয়

ঔষধ ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এই ঔষধ ব্যবহার করা বিপজ্জনক।

উনবিংশ শতাব্দিতে ডাঃ ফোক্স নামে লণ্ডনের এক চিকিৎসক 'গ্রেগরী পাউডার' (রাবার্ব ও ম্যাগ্নেসিয়া) নামে এক ঔষধের বিধান দিতেন। তাঁর ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী তিন চারবার করে অধিক মাত্রায় এই পাউডার সেবন করতে হবে, যতক্ষণ না বেদনার উপশম হয় এবং তারপর কয়েক মাস ধরে দৈনিক এক মাত্রা করে এই ঔষধ সেবন করে যেতে হবে। ভারতবর্ষে জাত টার্কী রাবার্বই তাঁর মতে সর্বাপেক্ষা বেশী কার্যকরী। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন যে, বহু পুরাতন ও কষ্টদায়ক বাতব্যাধিও এই সহজ ও সুলভ চিকিৎসায় প্রশমিত হয়। এই আরোগ্যলাভ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থায়ী।

বি, ই, স,

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে Vernacular Literary Society নামে এক সমিতি স্থাপিত হয়। হড্সন্ প্র্যাট এ সমিতির স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে অন্যতম উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। তিনি উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার স্থূলমর্ম এই :—"বাঙলার অধিবাসীদিগকে ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে ব্যুৎপন্ন করার আশা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় ভাষায় ইহাদের শিক্ষার পথ প্রসারতার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। (বিশ্বকোষ)

" * * যে (রুশ) ভাষা রুশ ভল্লুকের উপযুক্ত বলিয়া উপহসিত হইত, টলষ্টয়ের ন্যায় ঔপন্যাসিক সে ভাষাকে বিবিধ আভরণে সাজাইয়া জগতের সম্মুখে সমুপস্থিত করিয়াছেন। সেই ভাষাতেই রুশ রাসায়ন-শাস্ত্রবিদ Mendeleef স্বীয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সমুদায় লিপিবদ্ধ করিয়া ইউরোপীয় অপরাপর পণ্ডিতদিগকে রুশভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই ত মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

* * ফলকথা এই যে, আমরা যতদিন স্বাধীনভাবে নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব ততদিন আমাদের ভাষার এই দারিদ্র্য ঘুচিবে না। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি এক প্রকার মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। যেমন ধনীর সন্তান পৈতৃক বিষয় হারাইয়া নিঃস্বভাবে কালাতিপাত করেন, অথচ পূর্ব্ব পুরুষগণের ঐশ্বর্য্যের দোহাই দিয়া গর্ব্বে স্ফীত হন, আমাদের দশা সেইরূপ।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

প্ল্যানেটেরিয়াম

প্ল্যানেটেরিয়ামের কথা অনেকেই জানেন, কারণ যন্ত্রটা উদ্ভাবিত হয়েছে অনেককাল আগে। ইউরোপের মধ্যে একমাত্র বৃটেনেই এতকাল প্ল্যানেটেরিয়ামের মত একটা বিস্ময়কর অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল না। অথচ সুইডেনের মত ক্ষুদ্র দেশেও প্ল্যানেটেরিয়াম রয়েছে। জার্মেনীর তো কথাই নেই। মস্কোর প্ল্যানেটেরিয়ামে বছরে দশলাখেরও বেশী দর্শকের সমাগম হয়ে থাকে। আমেরিকারও অনেক জায়গাতেই প্ল্যানেটেরিয়াম স্থাপন করা হয়েছে। প্রায় বছর দুই হলো বৃটেনে একটা প্ল্যানেটেরিয়াম স্থাপনের চেষ্টা চলছে। ইংল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে, বৃটেনে প্ল্যানেটেরিয়াম তৈরীর ব্যবস্থা করা অসম্ভব নয়। তবে প্রথম প্রচেষ্টার ফলে জার্মাণ যন্ত্রের চেয়ে তাদেরটা অনেক নিকৃষ্ট হবেই। কাজেই জার্মেনীতে এখনও যেসব প্ল্যানেটেরিয়াম অক্ষত অবস্থায় রয়েছে তা' থেকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ একটা যন্ত্র আনা যেতে পারে। সায়েন্স মিউজিয়ামে প্ল্যানেটেরিয়াম স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে। প্ল্যানেটেরিয়ামের পরিবর্তে তাকে বলা হবে—'ষ্টার-হাউস'।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত জার্মেনীর ভি-টু মারণাস্ত্রের মত প্ল্যানেটেরিয়ামও যান্ত্রিক কৌশলের এক অপূর্ব বিস্ময়। উভয়ের উদ্দেশ্য অবশ্য বিভিন্ন; ভি-টু ধ্বংস কার্যের জন্যে আর প্ল্যানেটেরিয়াম জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের জন্যে পরিকল্পিত হয়েছে। আমাদের সৌরজগতে চন্দ্র, পৃথিবীর চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবী আবার চন্দ্রকে নিয়ে সূর্য-প্রদক্ষিণ করছে। কেবল চন্দ্র আর পৃথিবীই নয়, পৃথিবীর মত আরও অনেকগুলো গ্রহ তাদের উপগ্রহ নিয়ে নির্দিষ্ট গতিতে, নিয়মিতভাবে সূর্যের চতুর্দিক পরিভ্রমণ করছে। তাছাড়া আমাদের পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে অসীম শূন্যের অসংখ্য তারকারাজির ক্রমাগত স্থান-পরিবর্তন লক্ষিত হয়ে থাকে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণার বিবরণ থেকে আমরা জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর কক্ষপথ ও গতিবিধির জটিলতার ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারি মাত্র; মানসপটে তাদের একটা বাস্তবচিত্র কল্পনা করা সহজ নয়। কোন ঘটনা উপলব্ধি করতে হলে মনে মনে আমরা তার একটা ছবি কল্পনা করে নিই। সৌরমণ্ডলের গ্রহ, উপগ্রহ ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করতে হলে তাদের একটা নিখুঁত চিত্র কল্পনা করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে অনেককাল থেকেই বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত হয়ে আসছিল; কিন্তু কোনটাই আশানুরূপ হয়ে ওঠেনি। প্ল্যানেটেরিয়াম তারই একটা সর্বোন্নত নিখুঁত সংস্করণ।

উপরের দিকে তাকালেই মনে হবে—আকাশটা যেন একটা বিশাল গম্বুজের মত গোল হয়ে আছে। এই গম্বুজাকৃতি আকাশের মধ্যেই আমরা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রগুলোকে দেখতে পাই। প্ল্যানেটেরিয়ামের জন্যে এরকমের গম্বুজাকৃতি একটা বিরাট ঘরের প্রয়োজন। গম্বুজের মসৃণ অভ্যন্তর-ভাগ গোলাকার আকাশের ক্ষুদ্র অনুকৃতি মাত্র। প্ল্যানেটেরিয়ামের সাহায্যে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র-গুলোর অনুরূপ ছোট বড় আলোক-প্রতিকৃতি ওই গম্বুজের গায়ে প্রতিফলিত করে' তাদের স্বাভাবিক গতিবিধি দেখানো হয়। আপেক্ষিক গতিবিধি ছাড়াও আলাদা ভাবে যে কোন গ্রহ-উপগ্রহের গতিবেগ বাড়িয়ে কমিয়ে দেখানো যেতে পারে।

ওরেরী নামে ছেলেদের একরকম খেলনা আছে। চন্দ্র পৃথিবীর চারধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পৃথিবী আবার সেই ঘূর্ণায়মান চন্দ্রকে নিয়ে পাক খেতে খেতে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে—এই ব্যাপারটার ছোট্ট একটা মডেল, ঘটিকা-যন্ত্রের কৌশলে পরিচালিত হয়। এর নামই ওরেরী। আর্ল অফ ওরেরী এই খেলনা যন্ত্রটা উদ্ভাবন করেন। সেথেকেই যন্ত্রটা ওরেরী নামে পরিচিত হয়েছে। ওরেরীর নাম ছিল চার্লস্ বয়েল। রসায়ন শাস্ত্রের জন্মদাতা রবার্ট বয়েলের ছিলেন তিনি নিকট জ্ঞাতি। তখনকার দিনে (সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত) বিভিন্ন বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করাটাকেই বড় লোকের লক্ষণ বলে মনে করা হতো। চার্লস্ বয়েল তখনকার দিনের একজন বিখ্যাত লোক। একাধারে তিনি ছিলেন সৈনিক, গ্রন্থকার এবং কূটনীতিজ্ঞ। অথচ অবসর সময়ে তিনি ছোটখাট যন্ত্রপাতি নির্মাণে ব্যাপৃত থাকতেন। তারই ফল এই ওরেরী। এই ওরেরীই কিন্তু আজও তার নাম অমর করে রেখেছে। এই ওরেরী থেকেই জার্মেনীতে সর্বপ্রথম প্ল্যানেটেরিয়ামের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল।

গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থান এবং গতিবিধি পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯১৩ সালে মিউনিক মিউ-জিয়ামের জন্যে ওরেরীর অনুকরণে এক বিরাট মডেল তৈরী হয়। এতে একটা সুবৃহৎ মডেল-পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে ছোট্ট টেলিস্কোপের সাহায্যে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত আলোক জোতিষ্ক-গুলোকে দেখতে হতো। তারপর জেনার জাইস্ কোম্পানী কর্তৃক আধুনিক উন্নত ধরণের প্ল্যানে-টেরিয়াম নির্মিত হয়। অতি জটিল যান্ত্রিক কৌশলে এতে পূর্বেকার সকল রকমের অসুবিধা দূর করা হয়েছে। এই প্ল্যানেটেরিয়ামের সাহায্যে দর্শকেরা সৌরজগৎ এবং তার বাইরের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর যাবতীয় ব্যাপার সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

যন্ত্রটা দেখতে মোটামুটি একটা বিরাট ডাম্বেলের মত। তারই বিভিন্ন অংশে, স্থূল ও সূক্ষ্ম অসংখ্য বিচিত্র যন্ত্রপাতির সমাবেশ। বিভিন্ন রকমের লেন্সের সাহায্যে ডাম্বেলের একটা গোলক থেকে উত্তর আকাশের এবং অপরটা থেকে দক্ষিণ আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অনুকৃতি, ছোট বড় আলোর গোলকের মত তাদের স্বাভাবিক অবস্থানস্থল অনুযায়ী গম্বুজের গায়ে প্রক্ষেপ করা হয়।

পৃথিবীর পৃষ্ঠে কেহ উত্তর থেকে দক্ষিণে সরে যাবার সংগে সংগে ক্রমশঃ যেমন উত্তরের আকাশ অদৃশ্য হয়ে দক্ষিণের আকাশ দেখা দেয়, যন্ত্র-কৌশলে ডাম্বেলটিকেও এদিক ওদিক একটু হেলিয়ে দিয়ে ঠিক তেমন করেই উত্তর বা দক্ষিণ আকাশের গ্রহ নক্ষত্রগুলোকে ইচ্ছামত গম্বুজের উপর প্রতিফলিত করা যেতে পারে। পৃথিবীর নিজ মেরুদণ্ডের উপর ঘোরবার ফলে দূরস্থিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর যে রকম গতিবিধি দেখা যায়, ডাম্বেলের মত যন্ত্রটা যে কোন ভাবে থেকে লম্বা দণ্ডের উপর ঘুরলেই গম্বুজে প্রতিফলিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীরও ঠিক সেরকম গতিবিধি দেখা যাবে। মোটের উপর, পৃথিবীর বুকে অবস্থান করে আমরা সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র-গুলোকে যে অবস্থায়, যেমন ভাবে স্থান বা আকৃতি পরিবর্তন করতে দেখি, প্ল্যানেটেরিয়ামেও সে-গুলোকে ঠিক তেমনটিই দেখতে পাওয়া যায়। প্ল্যানেটেরিয়ামে দর্শকদের মনে হবে তারা সত্যিকার আকাশই দেখছেন। তা'ছাড়া, বর্তমানের তুলনায় সুদূর অতীতে বা সুদূর ভবিষ্যতে গ্রহ-উপগ্রহ-গুলোর অবস্থানস্থল বা আকৃতিগত কি পার্থক্য ছিল বা হতে পারে, প্ল্যানেটেরিয়ামে সেগুলোও প্রদর্শন করবার ব্যবস্থা আছে। —গ, চ, ভ,

ব্যোমযান

শ্রীঅমূল্যধন দেব

পঞ্চভূতের উপর আধিপত্য বিস্তার করার প্রয়াস মানুষের চিরন্তন ধর্ম। মাছের মত সাঁতার দেওয়া বা পাখীর মত উড়িবার কথাও মানুষের মনে উদিত হয়। মেঘের আড়ালে থাকিয়া যুদ্ধ করার কথা, পক্ষীরাজ ঘোড়ার কথা আমাদের প্রাচীন কাহিনীতে আছে।

মানসিক চিন্তা গণিতের সূত্রাকারে প্রথম বিকাশ লাভ করে; তারপর ব্যবহারিক জীবনে গবেষণালব্ধ ফল লাভের চেষ্টা করা হয়।

ব্যোমযান সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানলাভের জন্য গাণিতিক পর্যায় হইতে আরম্ভ করা প্রয়োজন। নিউটন শক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহাতে কোনও জিনিষ যদি একই বেগে অর্থাৎ বেগ পরিবর্তন না করিয়া চলে বা স্থিতাবস্থায় থাকে তবে বুঝা যাইবে যে, কোনও শক্তি উহার উপর কাজ করিতেছে না। শক্তির প্রয়োগে বেগের পরিবর্তন এই প্রকাশ হয়।

নিউটনের অন্য এক সংজ্ঞার ভাষ্য এই যে, প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া হয়। তা' বলে "ঘোড়া যেমন গাড়ীকে টানে, গাড়ীও তেমনি ঘোড়াকে টানে" এই সত্য অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া লইলে গাড়ী কিসের জোরে চলে—ইহা রহস্যজনক মনে হয়। যদিও গাড়ী টানার বিপরীত ক্রিয়া হিসাবে গাড়ীর চাপ ঘোড়ার উপর পড়ে, কিন্তু ঘোড়ার পেশীবলের বা টানিবার শক্তির সঙ্গে ইহার কোনও সংশ্রব নাই। আর্কিমিডিসের নিয়ম অনুযায়ী কোনও ভাসমান বস্তু তাহার সম ওজনের পদার্থ স্থানচ্যুত করে; অর্থাৎ যে বস্তুটি ভাসিতেছে তাহার ওজন, উক্ত ভাসমান বস্তুর জন্য স্থানচ্যুত পদার্থের ওজনের সমান। যদি স্থানচ্যুত পদার্থের ওজন কম হয় [এই ওজন উক্ত পদার্থের ঘন পরিমিতি সাপেক্ষ] তবে বস্তুটি ডুবিয়া যায়, আর যদি বেশী হয় তবে বস্তুটি কিছুতেই ডুবিবে না অর্থাৎ পদার্থের উপরই থাকিবে।

উপরোক্ত সূত্র সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়, কেন বেলুন আকাশে উড়ে। এক ঘন ইঞ্চি হাইড্রোজেনের ওজন এক ঘন ইঞ্চি বায়ুর ওজন অপেক্ষা কম। কাজেই হাইড্রোজেন ভর্তি বেলুন ভাসিবে। কিন্তু ঘুড়ির বেলায় এই যুক্তি খাটিবে না, কারণ ঘুড়ির ওজন সম পরিমাণ বায়ুর ওজনের চেয়ে বেশী। কিন্তু তবুও ঘুড়ি উড়ে।

এরোপ্লেনের প্রপেলার বা এয়ার-স্ক্রু (ঘূর্ণায়মান পাখা) বায়ুর উপর যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তাহা হইতেই চলন শক্তি আহৃত হয়।
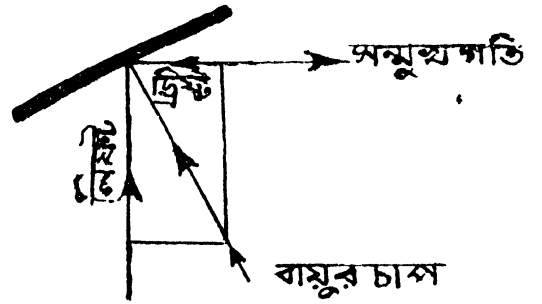
চলমান এরোপ্লেনের উপর বায়ুর যে চাপ পড়ে, তাহার বিশ্লেষণ উপরের নক্সায় দেখান হইয়াছে। কি কারণে এরোপ্লেনের নীচে বায়ুর চাপ পড়া সম্ভব তাহা একটী উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করি। এক টুকরা পাতলা কাগজ মুখের সামনে ধরিয়া ফুঁ দিলে দেখা যাইবে যে কাগজের টুকরাটি ফুঁ দেওয়া সত্ত্বেও নিম্নমুখী না হইয়া পত্‌পত্‌ করিয়া উর্ধমুখী উড়িতেছে। এর কারণ দুইটি। (১) উপর দিকে ফুঁ দেওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসাবে নিম্ন হইতে উর্ধমুখী

চাপ। (২) ফুঁ দেওয়ায় বায়ু সরিয়া শূন্যতার সৃষ্টি অর্থাৎ উপরের চাপের হ্রাস এবং তজ্জন্য নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধমুখী গতি।

এরোপ্লেনের ভারবাহী শক্তি, "লিফ্ট" এর প্রযোজ্য শক্তির সমান। আর "ড্রিফ্ট" চলন শক্তির প্রতিক্রিয়ার সমান। এরোপ্লেনের ও বায়ুর পরস্পর সংঘাতের বেগ যত বৃদ্ধি হইবে ততই বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পাইবে। প্রপেলার হইতে যে শক্তি আহৃত হয় তাহা "ড্রিফট" এর প্রযোজ্য শক্তিকে হার মানায়। 'ড্রিফ্ট্' বা 'হেড রেজিষ্ট্যান্স' যাহাতে কম হয় সেই জন্য "ষ্টীম লাইন" এ এরোপ্লেনের কাঠামো তৈয়ারী হয়। আজ কাল রেলগাড়ী বা মোটরগাড়ীও ষ্টীমলাইন ছাঁচে তৈয়ার হইতেছে। নৌকা বা জাহাজের চলন-শক্তির প্রতি জলের বাধা দিবার শক্তি কমাইবার জন্য ষ্টীমলাইনের ছাঁচে নৌকা বা জাহাজ তৈয়ার হইতেছে। যে ছাঁচে গড়িলে বায়ু বা জলের মধ্যে চলিতে স্রোতের প্রতিরোধশক্তি সবচেয়ে কম হয় তাহাকেই ইংরাজীতে ষ্টীমলাইন বলে।

সাইকেল-আরোহী নিজেই হাতল দ্বারা গতিপথ নির্ণয় করেন। মোটর চালকও "ষ্টীয়ারিং" এর চাকা ঘুরাইয়া গতিপথ নির্ণয় করেন। এরোপ্লেনের বেলায় এই গতিপথ নিয়ন্ত্রণ বিবিধ ভাবে সম্ভব।
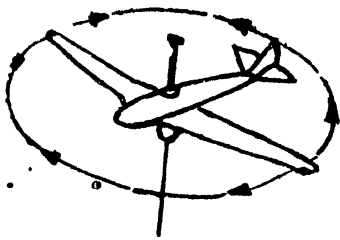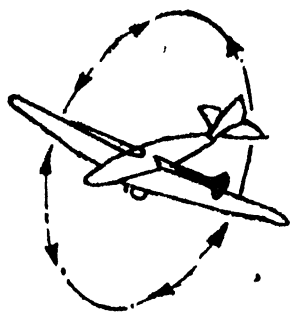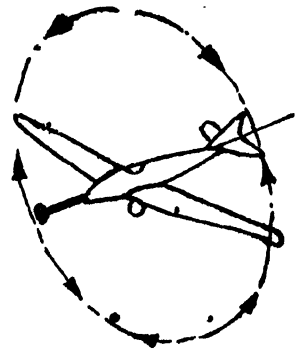
১নং, ২নং, ৩নং

১নং চিত্র হইতে বুঝা যায় যে, এরোপ্লেনটি অঙ্কিত দণ্ড বা পিনকে (ঊর্দ্ধ-অধঃ) অক্ষ ধরিয়া ডাইনে বাঁয়ে ঘুরিবে। রাডার বা হাল এই গতি নিয়ন্ত্রণ করে।

২নং চিত্র হইতে বুঝা যায় যে, এরোপ্লেনটি অঙ্কিত পিনকে (ডানে-বাঁয়ে) অক্ষ ধরিয়া তরঙ্গায়িত-ভাবে উপর নীচে চলিবে। 'এলিভেটর' এই গতি নিয়ন্ত্রণ করে। এলিভেটরও হালের কাজ করে।

৩নং চিত্রে বুঝা যায় যে, এরোপ্লেনটি অঙ্কিত পিনকে (সম্মুখ-পশ্চাৎ) অক্ষ ধরিয়া ক্রমাগত পার্শ্ব পরিবর্তন করিবে। 'এলেরন' এই গতি নিয়ন্ত্রণ করে। জাপানী এরোপ্লেন যখন কলিকাতার উপর আসিত তখন ইহা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

উপরোক্ত তিন প্রকারের হাল, চালক নিজ জায়গায় বসিয়াই ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন।

এরোপ্লেন কত উঁচুতে চলিতেছে তাহা জানিবার জন্য 'অল্টিমিটার' নামক যন্ত্র আছে। বায়ুর স্রোত-বেগ কত তাহা জানিবার জন্যও যন্ত্র আছে। ইঞ্জিন কি বেগে চলিতেছে, তেল সমস্ত ঘূর্ণায়মান কলকব্জায় কি চাপে পড়িতেছে ইত্যাদি খুটি-নাটি সমস্ত বিবরণ যন্ত্রের সাহায্যে চালক নিজ জায়গায় বসিয়াই নির্ণয় করিতে পারেন। রক্ত চলাচল বন্ধ হইলে যেমন আমরা বাঁচিতে পারিনা তেমনি ঘূর্ণায়মান কলকব্জায় যদি তেল দেওয়া বন্ধ হয় তবে কলকব্জার কাজও বন্ধ হইয়া যায়। এরোপ্লেনে সাধারণত পেট্রল চালিত ইঞ্জিন ব্যবহার হয়।

অন্যান্য আবিষ্কারের ন্যায় এরোপ্লেনেরও নব নব পরিকল্পনা বাহির হইতেছে। এক সারি ডানা

থাকিলে তাহাকে মনো-প্লেন বলে। দুই সারি ডানা থাকিলে বাই-প্লেন বলে।

পূর্বে বেলুনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। ডিরিজিবল, জেপেলিন বেলুন জাতীয়।

যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের এরোপ্লেন এর আগমন-বার্তা পূর্বে অবহিত হইবার জন্য "রাডার বিম" আবিষ্কৃত হয়। এ সম্বন্ধে ভারতবর্ষেও গবেষণা চলিতেছে।
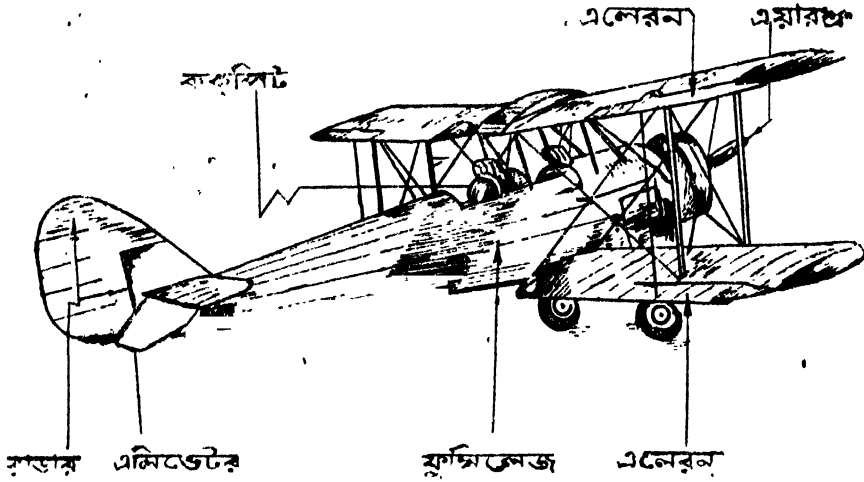
গ্লাইডারের কোনও ইঞ্জিন থাকে না।

জলের উপর দিয়া চলিবার জন্য এরোপ্লেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী সী-প্লেন আছে। জলে স্থলে চলিবার জন্য উভচর প্লেনও আছে।

আমাদের দেশের বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনীয়ার উত্তরোত্তর নব নব সৃষ্টি, আবিষ্কার বা পরিকল্পনার উৎকর্ষ সাধন করিতে যত্নবান হউন এবং সরকার তাহাদিগকে উপযুক্ত সুযোগ ও দেশবাসী উৎসাহ দান করুন।
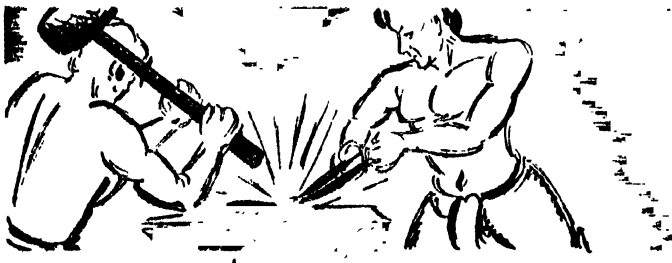
ছোটদের বিভাগ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান
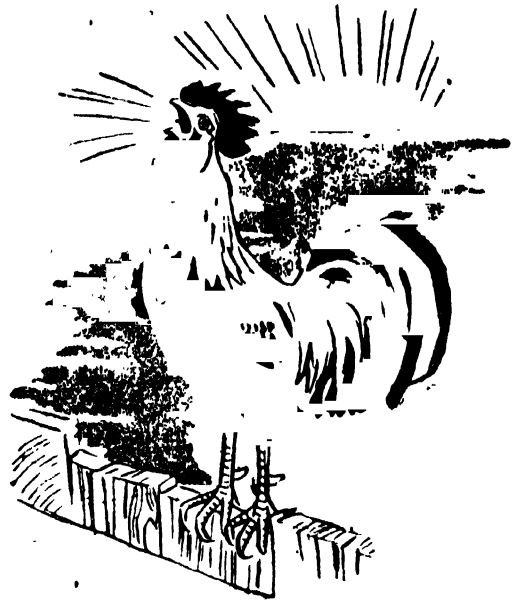
অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসী তার ছোট্ট ছেলেকে বুমেরাং চালানোর কৌশল শিক্ষা দিচ্ছে। ইতিপূর্ব্বে 'ছোটদের পাতায়' বুমেরাং তৈরীর কথা পড়েছ। সত্যিকার বুমেরাং দেখতে কেমন—এই ফটোগ্রাফ থেকে পরিষ্কার বুঝতে পারবে।

ছোটদের পাতা

কেমন করে হয়

সূচ, আলপিন, পেন্সিল, কাগজ, কলম প্রভৃতি জিনিষগুলো আমাদের নিত্যই প্রয়োজন। দামে সস্তা এবং সহজলভ্য হওয়ায় আমরা এগুলোকে তুচ্ছ জিনিষ বলেই মনে করি। একটু ভেবে দেখলেই বুঝবে—যত তুচ্ছ মনে হয় আসলে কিন্তু ওগুলো তত তুচ্ছ নয়। এই তুচ্ছ জিনিষগুলো তৈরী করতে কি বিরাট ব্যাপার—কি বিরাট কলকারখানার প্রয়োজন হয়, সে কথা শুনলে তোমরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবে। সূচ একটা অতিক্ষুদ্র, তুচ্ছ পদার্থ, ছোট্ট এক টুকরা ইস্পাতের তার মাত্র। সূচের মুখটা ক্রমশঃ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে এসেছে আবার পিছনের দিকে ছোট্ট একটা চোখ। এই সূক্ষ্ম বস্তুটা কেমন করে' তৈরী হয়? হাতে ঘষে অনেক পরিশ্রমের ফলে এক আধটা সূচ তৈরী করা সম্ভব বটে; কিন্তু যে সূচ আজকাল আমরা ব্যবহার করি তার সবগুলোই নির্দিষ্ট মাপের, একই রকমের—যেমন মসৃণ, চকচকে তেমনই নিখুঁৎ। তাকে এত কম দামে কেমন করে' পাওয়া যায়—এ প্রশ্ন কি কখনও তোমাদের মনে জাগেনি? কেমন করে সূচ তৈরী হয়, কেমন করে কাগজ, কলম, কাচের দোয়াত, বাসন কোসন ও অন্যান্য জিনিষপত্র তৈরী হয়—এসব কথা নিশ্চয়ই তোমাদের জানবার ইচ্ছা হয়। এসব বিষয় সম্পর্কে ক্রমশঃ তোমাদের কৌতুহল মিটাবার চেষ্টা করবো। এখন মোটামুটি ব্যাপারটা জেনে রাখলে, বড় হয়ে এ সম্বন্ধে খুটিনাটি বিস্তৃত বিবরণ নিজেরাই চেষ্টা করে জেনে নিতে পারবে। আজ তোমাদিগকে সূচ এবং আলপিন তৈরীর কথা বলছি:—

সূচ অনেক রকমের হয়ে থাকে—একথা বোধ হয় তোমাদের অজানা নয়। সাধারণত দু'রকমের সূচের সঙ্গে তোমরা নিশ্চয়ই পরিচিত। সেলাইয়ের কলের সূচ আর

সাধারণ সেলাই-ফোঁড়াই করবার সূচ। তাছাড়া মোজা, অথবা গেঞ্জি-কলের সূচও বোধহয় অনেকেই দেখেছ। সাধারণ সূচের পিছন দিকে যে ছিদ্র থাকে তাকে বলা হয় সূচের চোখ। ছোট্ট সূচের চোখে সূতা পড়ানো যে বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির প্রয়োজন সে কথা তোমরা জান। এই চোখটাই হলো সূচের আসল জিনিষ। সাধারণ সূচের চোখটা থাকে পিছনের দিকে, আর সেলাইয়ের কলের সূচের চোখটা থাকে ডগায়। মোজা, গেঞ্জি বোনবার সূচগুলো কিন্তু আরও অদ্ভুত। এদের মুখটা ভোঁতা আর চোখটা থাকে সাধারণ সূচের মতই পিছনে। কিন্তু চোখটা এমন অদ্ভুত কায়দায় তৈরী যে, সূতা পড়াবার কোন হাঙ্গামাই নেই। চোখটার একপাশে ফাঁক—সূতাটা আপনাআপনিই চোখের ভিতর ঢুকে পড়ে এবং সংগে সংগে ফাঁকটাও বন্ধ হয়ে যায়।

যাহোক, সূচের পিছনে চোখ থাকাটাই ছিল বরাবরকার ব্যবস্থা। কিন্তু কলে সেলাই করবার জন্যে সূচের পিছনের এই চোখটাকে মাথায় আনতে হয়েছিল। সে এক অদ্ভুত ইতিহাস। সামান্য একটা সূচ, তার তুচ্ছ একটা চোখ। পিছন থেকে মাথার দিকে এই তুচ্ছ চোখটার স্থান পরিবর্তনের ইতিহাস অতীব বিস্ময়কর। সেলাই করতে হলে সূতা-পরানো সাধারণ একটা সূচকে কাপড়ের একদিক দিয়ে ফুঁড়ে অপর দিক দিয়ে বে'র করে নিতে হয়। কলের সাহায্যে এরূপ ব্যবস্থা করা দুঃসাধ্য। কাজেই অনেককাল ধরে বিভিন্ন লোকের চেষ্টা সত্ত্বেও সন্তোষজনক সেলাইয়ের কলের উদ্ভাবন সম্ভব হয়নি। আমেরিকার এক ভদ্রলোক প্রায় সারাজীবন ধরেই সেলাই-কলের উন্নতি বিধানের জন্যে চেষ্টা করে আসছিলেন। কিন্তু সূচের এই পিছন দিকের ছিদ্রের জন্যে অন্যান্য লোকের মত কিছুতেই তিনি সাফল্য লাভে সমর্থ হচ্ছিলেন না। এভাবে তাঁর প্রায় বিশ বছর কেটে গেল। একদিন তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। রেড্‌ইণ্ডিয়ানরা বল্লম নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করেছে। তিনি শুয়েই আছেন, উঠতে পারছেন না, হাত পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড একটা বল্লমের ফলা তাঁর প্রায় নাকের ডগার কাছে এসে গেছে—মুহূর্তের মধ্যেই তাঁকে গেঁথে ফেলবে। এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও তিনি লক্ষ্য করলেন—বল্লমের ফলাটায় লম্বাটে গোছের একটা ছেঁদা। বল্লমের ডগায় ছেঁদা কেন?—ঘর্মাক্ত কলেবরে জেগে উঠে তিনি বিস্মিত হয়ে কেবল সে কথাই ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ মনে হলো—আচ্ছা, সূচের ছেঁদাটাকে যদি পিছন থেকে স্বপ্নে-দেখা বল্লমের ফলার মত মাথায় আনা যায় তবেতো সেলাই-কলের সমস্যাটা সহজেই মিটে যেতে পারে। হলোও তাই। সূচের পিছনের ছেঁদা মাথায় এনে তিনি সেলাই-কল তৈরীর সমস্যা অনায়াসেই সমাধান করে ফেল্লেন। তখন থেকেই প্রকৃত সেলাই-কলের উদ্ভব হলো।

যাহোক, এখন তোমাদিগকে সূচ তৈরীর কথা বলছি। প্রত্যেকটা সূচ কেমন মসৃণ, চকচকে, নিখুঁত—তা' নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। তোমরা শুনে বিস্মিত হবে যে, এরূপ সুদৃশ্য আকার ধারণ করতে এই তুচ্ছ বস্তুটাকে অন্ততঃ বিশ রকমের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে

আসতে হয়। বস্তুটা তুচ্ছ হলে কি হয়! এই তুচ্ছ বস্তুটা তৈরী করতেই এক একটা কারখানায় হাজার হাজার লোক রাতদিন কাজ করছে, অপূর্ব কৌশলী বিচিত্র যন্ত্রপাতি চলছে।

সূচ তৈরী হয় কি দিয়ে?—সূচ তৈরী হয় ইস্পাতের সূক্ষ্ম তার থেকে। বিলাতের সেফিল্ডের কারখানাগুলিতেই প্রধানতঃ এই ইস্পাতের তার উৎপাদিত হয়ে থাকে।

কেমন করে সূচ তৈরী হয়?—অনেক তার এক সংগে কুণ্ডলী করা থাকে। দুটা সূচ লম্বায় যতটা হবে ঠিক ততটা লম্বা করে, তারের কুণ্ডলীটাকে প্রথমতঃ খণ্ড খণ্ড করে কাটা হয়। খণ্ড করা প্রত্যেকটি টুকরাকে বলা হয় 'লেংথ্'। কুণ্ডলী থেকে কাটা হয় বলে 'লেংথ'গুলো থাকে খানিকটা ধনুকের মত বাঁকানো। কাজেই প্রথমে দরকার—এই তারগুলোকে সোজা করা। অনেকগুলো 'লেংথ' একত্রিত করে দুদিকে দুটা শক্ত আংটির

১নং চিত্র

বাঁধন দিয়ে বাণ্ডিল করা হয়। ১ নং ছবি দেখ। তারের বাণ্ডিলগুলিকে অতঃপর আগুনের চুল্লীতে পুড়িয়ে লাল করা হয়, তখন তারের টুকরা বা 'লেংথ'গুলো হয়ে যায় নরম। চুল্লী থেকে বা'র করবার পর সামান্য ঠাণ্ডা করে 'লেংথ'গুলোকে লোহার মসৃণ টেবিলের উপর রাখা হয়। সেখানে 'স্মুদ ফাইল' নামক বক্র-পৃষ্ঠ এক প্রকার লৌহ যন্ত্রের সাহায্যে 'লেংথ্'গুলো সম্পূর্ণরূপে সোজা না হওয়া পর্যন্ত ডলাই চলতে থাকে। প্রত্যেকটি সোজা তারের টুকরা থেকে দুটি করে সূচ তৈরী হবে। এদের বলা হয় 'ব্ল্যাংক্স্'।

'ব্ল্যাংক্সে'র মুখগুলো কেমন করে তীক্ষ্ণ করা হয়?

অদ্ভুত কৌশলসম্পন্ন একপ্রকার শাণ-যন্ত্রের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ব্ল্যাংক্সের মুখগুলো সরু ও তীক্ষ্ণ করে তোলা হয়। শাণ-চক্রটা ঘোরে রাবারে ঢাকা একটা চাকার মধ্যে। রাবারে ঢাকা চাকা ও শাণের চাকার মধ্যে সামান্য একটু ফাঁক আছে। 'হপার' নামক এক প্রকার কৌশলী পাত্র থেকে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় ব্ল্যাংক্স্গুলো ওই ফাঁকের মধ্যে আপনা আপনি ঢুকে গিয়ে চাকার গায়ের রবারের সংগে লেগে থাকে। চাকাটা ঘোরবার সময় শাণ-চক্রের ঘর্ষণে 'ব্ল্যাংকসে'র মুখ তীক্ষ্ণ এবং মসৃণ হয়ে যায়। ঘর্ষণের ফলে নির্গত অতিসূক্ষ্ম ইস্পাত-কণিকা ধূলার আকারে একটা নলের ভিতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। ইস্পাতের এই সূক্ষ্ম চূর্ণগুলোকে বাইরে বের করে দেওয়া নেহাৎ প্রয়োজন। কারণ এগুলো কারখানার মধ্যে ছড়িয়ে গেলে নাক-মুখ দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে কর্মীদের গুরুতররূপে স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়ে থাকে। শাণ-যন্ত্র উদ্ভাবিত

হওয়ার পূর্বে হাতে চালানো শাণে একাজ করা হতো। তখন এই মিহি লৌহচূর্ণ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করার ফলে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে বহুলোক মারা যেত।

সূচের চোখ কেমন করে তৈরী হয় ?

'ব্ল্যাংক্‌সে'র দুদিকের মুখ সুতীক্ষ্ণ হওয়ার পর, এমারির চাকার ঘর্ষণে সেগুলোকে পালিস করা হয়। তারপর ক্রমান্বয়ে এক একটা করে আপনা আপনি স্ট্যাম্পিং-মেসিনে চলে যায়। সেখানে 'ব্ল্যাংক্‌সে'র ঠিক মধ্যস্থলের খানিকটা চেপ্টা করে এবং যেখানে সূচের চোখ থাকে সেখানে দাগ কেটে দুদিকে একটু খাঁজের মত করা হয়। পরে এই দাগের উপরেই

২নং চিত্র

হ্যাণ্ড-প্রেস বা মেসিন-প্রেসের সাহায্যে ছিদ্র করা হয়। ২নং ছবি দেখ। এরপরে 'ব্ল্যাংকসে'র দুদিকের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে দুগাছা সরু তার প্রবেশ করিয়ে দেয়। 'ফাইলার' নামক কর্মীরা দুগাছা তারে গাঁথা সারিবদ্ধ সূচগুলোর ছিদ্রের আশপাশ মসৃণ করে দেবার পর তারের মধ্যে গাঁথা অবস্থাতেই সেগুলোকে সামনে ও পিছনে বাঁকাতে থাকে। ফলে দুটা চোখের মধ্যস্থল ভেঙে গিয়ে দু'সারি সূচের মালা সৃষ্টি হয়। তারে গাঁথা সূচের মালাগুলোকে অতঃপর 'ভাইস' নামক এক প্রকার যন্ত্রের মধ্যে চালিয়ে দেয়। সেখান থেকে পালিস হয়ে এবং ডগাগুলো নির্দিষ্ট আকৃতি নিয়ে বেরিয়ে আসে।

এভাবে সম্পূর্ণরূপে তৈরী সূচ পাওয়া গেল বটে; কিন্তু তখনও অনেক কাজ বাকী। তৈরী সূচগুলোকে এবার সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ একটা পাত্রে রেখে চুল্লীতে পুড়িয়ে লাল করা হয়। তেল ভর্তি বৃহৎ পাত্রের মধ্যে হঠাৎ ডুবিয়ে দিয়ে সেগুলোকে ঠাণ্ডা করে। তেল থেকে তুলে নিয়ে আবার ধীরে ধীরে গরম করে পুনরায় ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করা হয়। একে বলে 'টেম্পার' করা বা পান দেওয়া। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় এরূপ 'টেম্পার' করার ফলে সূচগুলো কড়া হয়ে যায়। কিন্তু বার বার পোড়ানো এবং ঠাণ্ডা করবার ফলে সেগুলো হয়ে যায় কালো এবং খস্‌খসে। কাজেই আবার পালিস করা দরকার। ক্যানভাসের মধ্যে নরম সাবান, এমারি-পাউডার এবং তেলের সংগে সূচগুলোকে রেখে রোলারের মত করে পাকিয়ে তোলা হয়। লোহার টেবিলের উপর স্থাপিত দুখানা পুরু কাঠের ব্লকের মধ্যে এই ক্যানভাসের রোলারগুলোকে বসিয়ে যন্ত্র সাহায্যে সামনে পিছনে ডলাই করবার পর সূচগুলো বা'র করে খুব ভাল করে ধোলাই করা হয়। এরপরে পালিস-পাউডার মিশিয়ে আবার রোলারে ডলাই করবার পর বার্নিশ করে বিক্রয়ের জন্যে প্যাকেটে ভর্তি হতে চলে যায়।

আলপিন তৈরী হয় কেমন করে ?

আলপিন তৈরী হয় পিতলের সরু তার থেকে। তৈরী হবার পর সেগুলোকে টিন বা রাঙের কলাই করে দেওয়া হয়। ভার্ডিগ্রিজ নামে একরকম বিষাক্ত পদার্থ পিতলের উপর জমে বলেই বিশেষ করে কলাই করা দরকার। ১৮৩৮ সাল অবধি বিলাতে হাতে করেই আলপিন তৈরী হতো। মাথাগুলো আলাদা তৈরী করে জুড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আজকাল সম্পূর্ণরূপে কলেই আলপিন তৈরী হয়। আমেরিকানরাই সর্বপ্রথম আলপিন তৈরীর যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। একটা যন্ত্রের সামনের দিকে প্রকাণ্ড একটা 'রিল' আছে। আলপিম তৈরী করবার তারগুলো এই রিলের গায়ে জড়ানো থাকে। তারটাকে যন্ত্রের মধ্য দিয়ে সোজা হয়ে আসতে হয়। সাঁড়াশির মত একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে তারের মুখটাকে টেনে ধরে' সেই অবস্থায় 'ষ্ট্যাম্পিং' করে' মাথাটা তৈরী হয় এবং স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় তারটা ঠিক মাপ মত কেটে যায়। এই কর্তিত খণ্ডগুলোর ভোঁতা দিকটা একটা যন্ত্রের সাহায্যে সূচালো করা হয়। স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তারটা থেকে একটার পর একটা করে অতি দ্রুতগতিতে আলপিন তৈরী হতে থাকে। পিনের মুখটা তীক্ষ্ণ করা হয় চক্রকার একপ্রকার উখার সাহায্যে। চক্রের মত এই যন্ত্রটা অতি দ্রুতবেগে ঘুরতে থাকে। যান্ত্রিক কৌশলেই আলপিনগুলো আপনা আপনি সামনে পিছনে যাতায়াত করে' চাকার ঘর্ষণে সূচীমুখ হয়ে যায়। এ অবস্থায় পিনগুলো যখন বেরিয়ে আসে তখন থাকে হলদে রঙের। হলদে পিনগুলোকে ঘূর্ণায়মান পিঁপের মত একটা যন্ত্রের মধ্যে রেখে পরিষ্কার করা হয়। তারপর সেগুলোকে রাং বা টিন চূর্ণ ও এসিডের সংগে মিশিয়ে লৌহ পাত্রে উত্তপ্ত করা হয়। টিনের কলাই হবার পর পিনগুলোকে যন্ত্র সহযোগে শুকিয়ে নেয়, তারপর পালিশ করে আলাদা এক রকম যন্ত্রের সাহায্যে কাগজের মধ্যে গেঁথে বিক্রয়ের জন্যে চালান দেওয়া হয়।　　　　গ, চ, ভ,

করে দেখ

(১)

আর্কিমিডিস্ স্ক্রু

তোমরা আর্কিমিডিসের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই। খৃষ্টের জন্মের পূর্বে এত বড় বৈজ্ঞানিক আর জন্মগ্রহণ করেননি। সেই যুগে তিনি যেসব অদ্ভুত জিনিষ আবিষ্কার করে গেছেন আজও আমরা সেগুলোকে কাজে লাগাচ্ছি। তাঁর আবিষ্কারের কাহিনীগুলো এতই অদ্ভুত যে, তোমরা শুনে কেবল বিস্মিতই নয় মুগ্ধও হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে আলাদা

প্রসঙ্গে সে কাহিনী তোমাদিগকে শোনাবার চেষ্টা করবো। এস্থলে কেবল তাঁর একটা সাধারণ আবিষ্কারের কথা বলছি—যেটা তোমরা অনায়াসেই করে দেখতে পার। নীচ থেকে উপরে জল তোলবার জন্যে আজকাল বিভিন্ন ধরণের পাম্প, বায়ু-চক্র প্রভৃতি অনেক রকমের যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সে-যুগে এধরণের কোন যন্ত্রের কথা কেউ কল্পনাও করেনি। আর্কিমিডিস্ সে সময়ে উপরে জল তোলবার জন্যে এক অদ্ভুত যন্ত্র তৈরী করেন। যন্ত্রটা খুবই সরল। একটা সরু, লম্বা 'রড'—তার গায়ে চওড়া অথচ পাতলা একখানা পাত, স্ক্রুর মত প্যাঁচে আগাগোড়া জড়ানো অর্থাৎ জিনিষটা চওড়া প্যাঁচওয়ালা লম্বা একটা স্ক্রু। দুমুখ খোলা একটা লম্বা নলের মধ্যে প্যাঁচ-ওয়ালা লম্বা স্ক্রুটা ঢোকানো আছে। 'রডে'র এক মাথায় একটা হ্যাণ্ডেল আটকানো। হ্যাণ্ডেলের দিকটা উপরে রেখে নলটা হেলানো ভাবে জলে বসিয়ে হ্যাণ্ডেল ঘোরালেই নীচের জল উপরে এসে পড়তে থাকবে। চওড়া প্যাঁচওয়ালা এরূপ একটা লম্বা 'রড' যোগাড় করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব না-ও হতে পারে; কাজেই এ পরীক্ষাটা করে দেখবার জন্যে তোমাদিগকে আর একটা সহজ উপায় বলে দিচ্ছি। আশাকরি, এ পরীক্ষাটা সবাই তোমরা করে দেখতে পারবে। কাঠেরই
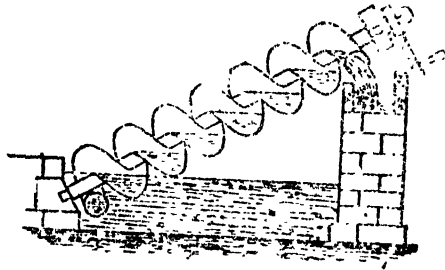
আর্কিমিডিস্ ওয়াটার-স্ক্রু

হোক কি বাঁশেরই হোক বেশ একটু মোটা, লম্বা লাঠির মত একটা পদার্থ যোগাড় কর। লম্বা লাঠির মত পদার্থটার একদিকে একটা হ্যাণ্ডেল লাগিয়ে দাও। মোটা ছিদ্রওয়ালা একটা রবারের নল স্ক্রুর প্যাঁচের মত করে লাঠির গায়ে জড়িয়ে আটকে দাও। হ্যাণ্ডেলটাকে উপরে রেখে এবার নল-জড়ানো লম্বা দণ্ডটাকে হেলানো ভাবে জলে বসিয়ে হ্যাণ্ডেল ঘোরালেই নীচের জল উপরে এসে পড়তে থাকবে। ছবিটাকে ভাল করে দেখে নাও—ব্যাপারটা খুব সহজেই বুঝতে পারবে।

স্বয়ংক্রিয় ফোয়ারা—

পূর্বে তোমাদিগকে হিরো কর্তৃক উদ্ভাবিত স্বয়ংক্রিয় ফোয়ারা তৈরী করবার কৌশল সম্বন্ধে বলেছিলাম। কয়েকজন মাত্র এই ফোয়ারা তৈরী করতে পেরেছে বলে জানিয়েছে! এবার সেই ফোয়ারারই একটা রকমফের কৌশলের কথা বলছি। হিরো যে কৌশলে ফোয়ারা তৈরী করেছিলেন তাতে সামান্য কিছু খুটিনাটি ঝঞ্ঝাট আছে। এখন যে যন্ত্রটার কথা বলছি সেটাতে তেমন কোন ঝঞ্ঝাট নেই; তবে যন্ত্রটা কোন গ্লাস-ব্লোয়ারকে দিয়ে তৈরী করিয়ে নিতে

হবে। ছবিটা দেখলেই পরিষ্কার বুঝতে পারবে কেমন করে জল আপনা আপনি ফোয়ারার মত উপরের দিকে ছিটকে ওঠে। ডান-দিকের নলটার মুখ একটা গ্লাসের মত করা হয়েছে।
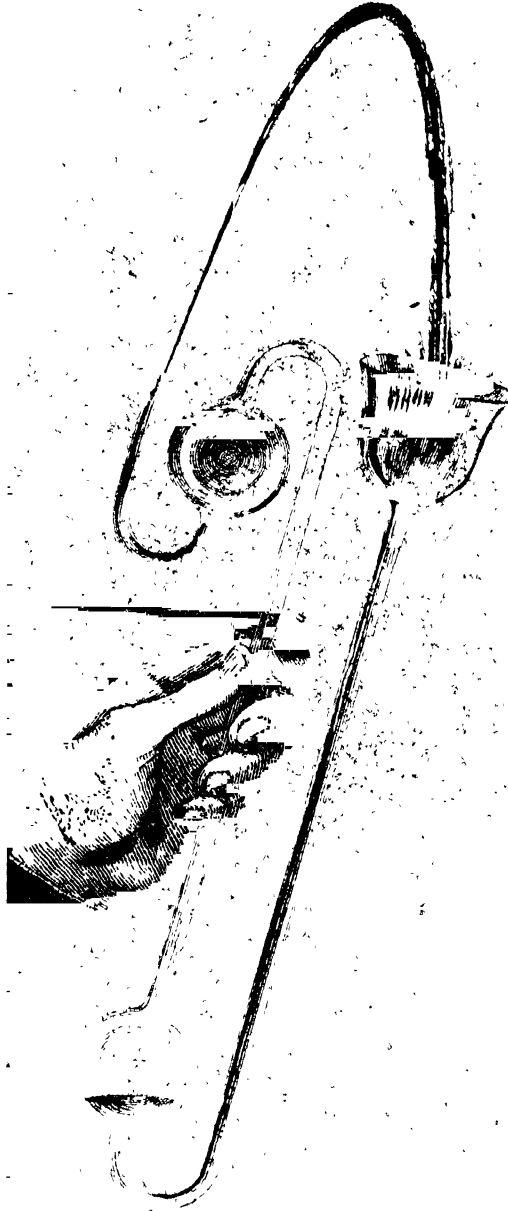
কাচনলের স্বয়ংক্রিয় ফোয়ারা

প্রথমে এখানে জল ঢেলে দিলে জলটা বাঁ-দিকের নলের নীচের ফাঁপা বলটা ভর্তি করে উপরের দ্বিতীয় বলটাকেও ভর্তি করবে। তারপর যন্ত্রটাকে আস্তে কাৎ করে নীচের বল থেকে জলটুকু ফেলে দাও। উপরের বলটা জল-ভর্তি থেকে যাবে। নীচের বলটার মধ্যে এবার

জল থাকবে না বটে, কিন্তু বাতাস থাকবে। এবার পুনরায় ডান-দিকের নলের গ্লাসের মধ্যে খানিকটা জল ঢেলে দাও। জলটা নীচের দিকে নামতে থাকবে। ফলে, নল ও নীচের বলের মধ্যেকার বাতাসের উপর চাপ পড়বে। এই চাপ গিয়ে পড়বে বাঁ-দিকের উপরের বলের ভিতরকার জলের উপর। বাতাসের এই চাপে উপরের বলের জল নলের সরু মুখ দিয়ে ফোয়ারার মত ছিটকে উঠবে। যন্ত্রটাকে কায়দামত একটু কাৎ করে ধরলেই ফোয়ারার মুখের জলটা বাইরে না পড়ে ডান-দিকের গ্লাসের মত পাত্রটার মধ্যে পড়বে। কাজেই নীচের বলটা ক্রমাগতই জল ভর্তি হতে থাকবে এবং বাতাসের চাপে উপরের বলের জলটাও ফোয়ারার মত আপনা আপনিই বেরিয়ে আসতে থাকবে। গ, চ, ভ,

[ছোটদের পাতায় যে সব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা লেখা হয়, অনেক ছেলেমেয়েরা তার কিছু কিছু পরীক্ষা নিজেরা করে কৃতকার্য হয়েছে বলে জানিয়েছে। যারা এ সবের কোন কিছু জিনিষ ভালকরে করতে পারবে, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের পক্ষ থেকে তাদের পুরস্কৃত করবার ব্যবস্থা হবে। পরে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বিজ্ঞপিত করা হবে।]

জেনে রাখ

জাইরোস্কোপ

এর আগে তোমাদিগকে স্টীম এঞ্জিন, টারবাইন প্রভৃতির কথা বলেছি। এবার একটা অদ্ভুত যন্ত্রের কথা বলবো। যন্ত্রটা মোটের উপর খুব সাধারণ, খুব ভারী সামান্য একটা নীরেট লোহার চাকা মাত্র; কিন্তু তার কার্যকারিতার কথা শুনলে তোমরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবে। রেলের গাড়ীর দুপাশে চাকা; এজন্যে রেলের লাইন থাকে দুটা, বরাবর পাশাপাশি করে বসানো। কিন্তু এমন রেলের গাড়ীও আছে যাদের দুপাশে চাকা না থেকে ঠিক মাঝামাঝি, বরাবর একসারি চাকার উপরেই চলতে হয়। সাধারণ ট্রেনের মতই লম্বা ট্রেনটার আগাগোড়া এক লাইন মাত্র চাকা। কাজেই এই ট্রেন চলবার জন্যে পাশাপাশি দুটা লাইন পাতবার দরকার হয় না। অনেককাল থেকেই পেনসিলভেনিয়ার একটা জলাভূমির উপর দিয়ে প্রায় শ'খানেক মাইল এক লাইনে রেলের গাড়ী চলাচল করছে। এছাড়া আরও অন্যান্য জায়গায় এক লাইনের রেল-গাড়ীর প্রচলন আছে। যাহোক, তোমরা বোধহয় ভাবছ—এটা হতেই পারে না—একটা মাত্র লাইনের উপর দিয়ে এত বড় একটা বোঝাই রেলের গাড়ী কেমন করে চলতে পারে? সাধারণ যে রেলের গাড়ীর সংগে তোমরা পরিচিত সে গাড়ীর পক্ষে একটা মাত্র লাইনের উপর দিয়ে চলা সম্ভব নয়—একথা ঠিক। কিন্তু যে রেলের

গাড়ীর কথা বলছি সেটা চলে অদ্ভুত একরকম যন্ত্রের সহায়তায়। সেই অদ্ভুত যন্ত্রটার নামই—জাইরোস্কোপ। জাইরোস্কোপ অনেকটা মানুষের মস্তিষ্কের মতই কাজ করে। যন্ত্রটা যেন বুঝেশুনেই প্রয়োজনমত যথাযোগ্য কাজ করে যায়। চল্‌তি অবস্থায় গাড়ীটা না হয় বাইসাইকেলের মত খাড়া থাকতে পারে, কিন্তু যখন থামে তখন তো কাৎ হয়ে পড়বার কথা। কিন্তু ষ্টেসনে দাঁড়িয়ে থাকবার সময়ও ট্রেনটা ঠিক খাড়া ভাবেই থাকে—গাড়ীর মধ্যেকার জাইরোস্কোপই তাকে 'ব্যালান্স' করে খাড়া রাখে। মতলব করে যদি অনেক লোক এক সংগে একদিক দিয়ে গাড়ীতে ওঠে বা মালপত্র চাপাবার চেষ্টা করে, তবুও ট্রেনখানাকে সেদিকে কাৎ করে ফেলবার উপায় নেই। একদিকে ভার বেশী হলে অন্যদিকে ভার চাপিয়ে যেমন পাল্লার দাঁড়ি সমান রাখা যায়, জাইরোস্কোপও তেমনি ট্রেনের ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে।

টর্পেডোর কথা শুনেছ তো? গেল দুই দুইটা মহাযুদ্ধে কত বড় বড় জাহাজ টর্পেডোর আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেছে—সেকথা কারো অজানা নেই। এই টর্পেডো একটা অদ্ভুত যন্ত্র। যন্ত্রটার চেহারা প্রকাণ্ড একটা বর্মা-চুরুটের মত। অবশ্য কতকগুলো আবার সোজা নলের মত করেও তৈরী হয়। টর্পেডোর ভিতরে যে কত কল-কৌশল, কত জটিল যন্ত্র-পাতি বসানো থাকে তা' শুনলে তোমরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবে। যদি তোমাদের জানাবার আগ্রহ জাগে তবে টর্পেডোর কথা পরে জানাব। এখন জাইরোস্কোপের কথাই বলি। কোন জাহাজকে ঘায়েল করতে হলে তার দিকে ডুবো-জাহাজ থেকে টর্পেডো ছোড়া হয় অনেক দূর থেকে। উচ্চ-চাপের বায়ু চালিত এঞ্জিনের সাহায্যে প্রোপেলার ঘুরিয়ে টর্পেডো জলের নীচ দিয়ে ছোটে অসম্ভব দ্রুতগতিতে। একে জাহাজ চলন্ত, তাতে জলের স্রোত ও জলের ঢেউ আছে। এ অবস্থায় দূর থেকে লক্ষ্য-বস্তুকে ঠিক জায়গা মত আঘাত করা খুবই শক্ত ব্যাপার। ডুবো-জাহাজ থেকে টর্পেডো ছোড়া হয়, খুব হিসাব করে'। টর্পেডো এই হিসাব মত ঠিক পথে চলে; হঠাৎ একটা ঢেউই আসুক বা স্রোতের চাপই লাগুক, টর্পেডোকে কিছুতেই তার নির্দিষ্ট পথ থেকে বিচলিত করা যাবে না। এটাই হলো টর্পেডোর বিশেষত্ব। জাইরোস্কোপের সাহায্যেই এরূপ ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে।

দিকনির্ণয়ের জন্যে চুম্বক কম্পাস ব্যবহৃত হইত। দেখা গেছে, নানা কারণে চুম্বক কম্পাস সব সময়ে সঠিক নির্দেশ দেয় না। জাইরো-কম্পাস কিন্তু একেবারে নির্ভুল। গেল যুদ্ধে জার্মানরা ইংল্যাণ্ডের উপর অনেক উড়ন্ত বোমা ফেলেছিল। বোমাগুলো ডানাওয়ালা ছোট এরোপ্লেনের মত। চালকশূন্য এরোপ্লেনের মত এই বোমাগুলো জাইরোস্কোপের সাহায্যে নির্ধারিত দিকে লক্ষ্যবস্তুর উপর পরিচালিত হতো। চালক-বিহীন এরোপ্লেনের কথা শুনে থাকবে; চালক-বিহীন এরোপ্লেন পরিচালিত হয় জাইরোস্কোপের সাহায্যে। জাইরোস্কোপ সহযোগে আজকাল জাহাজেরও এমন ব্যবস্থা করা

হয়েছে যে, চালক হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও জাহাজ তার নির্দিষ্ট পথেই চলতে থাকে। তাছাড়া, তোমরা বোধহয় জাহাজের দোল খাওয়ার কথা শুনেছ—জাহাজের দোলন বন্ধ করবার জন্যে জাইরোস্কোপ বসানো থাকে। জাইরোস্কোপ কেমন করে এই অদ্ভুত কাজগুলো সম্পন্ন করে, বড় হয়ে পড়াশুনা করলে সহজেই সে কথা বুঝতে পারবে। তোমাদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে এস্থলে কেবল জাইরোস্কোপটা কি রকমের যন্ত্র এবং তার ক্রিয়া-কৌশল সম্পর্কে মোটামুটিভাবে আলোচনা করবো।

তোমাদের অনেকেই খেলনা লাট্টু ঘুরিয়েছে নিশ্চয়। লাট্টুর গায়ে সুতা বা লেত্তি জড়িয়ে জোরে ছুঁড়ে দিলেই লাট্টু তার আলের উপর ঘুরতে থাকে। লাট্টুর আলটা উপরে নীচে দু'দিকেই খানিকটা বে'র করা থাকতে পারে। লাট্টুর ঠিক মধ্য দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করা আলটাকে বলা হয়—অক্ষদণ্ড। অক্ষদণ্ড কথাটা বুঝে রেখ, কারণ একথাটা পরে আরও ব্যবহার করা দরকার হবে। যাহোক, তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ—ঘুরন্ত লাট্টুকে যদি কৌশলে আঙুলের ডগায় বা ঝুলানো সূতার উপর তুলে দেওয়া যায়, সেখানেও সে তার আল বা অক্ষদণ্ডের উপর ঘুরতে থাকে। একদিকে একটু চাপ বা ধাক্কা দিলেও সে তার টাল সামলে নেয়। অবশ্য ঘূর্ণনবেগ কমে গেলে কাৎ হয়ে পড়ে যায়। এই লাট্টুই হলো—জাইরোস্কোপের প্রথম সংস্করণ। 'জাইরোস্কোপ ও লাট্টুর মধ্যে কেবল এটুকু পার্থক্য যে, জাইরোস্কোপ বৈজ্ঞানিক কৌশলে নিখুঁৎভাবে তৈরী কিন্তু সাধারণ লাট্টু সেরূপ নিখুঁৎ নয়। অবশ্য চালক বিহীন এরোপ্লেন, জাহাজ বা অন্যান্য ব্যাপারে জাইরোস্কোপের সংগে অনেক রকমের জটিল কল-কৌশল সংশ্লিষ্ট থাকে। তোমরা ইচ্ছাকরলে নিজেরাই খেলনা-জাইরোস্কোপ তৈরী করে তার ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ করতে পার। ১নং ছবি থেকে জাইরোস্কোপ কিরকম তার হদিস পাবে। নিরেট এবং নিখুঁৎ একটা
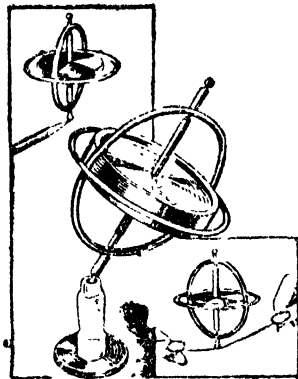
১নং চিত্র

ভারী চাকার অক্ষদণ্ডের দু'দিকের সূচালো মুখ দুটা চেপ্টা একটা বলয় বা রিঙের মধ্যে আলতো ভাবে বসানো। এই প্রথম রিং বা বলয়টা অপেক্ষাকৃত বড় আর একটা

রিঙের মধ্যে চাকার অক্ষদণ্ডের সমকোণে আলের উপর ঘুরতে পারে। এই দ্বিতীয় রিংটাও আবার দু'টা আলের উপর আলতোভাবে বসানো। ফলে এই দাঁড়ায় যে, ভারী চাকাটা প্রথম রিঙের মধ্যে যেমন ঘুরতে পারে, প্রথম রিংটাও তেমনি দ্বিতীয় রিঙের মধ্যে এবং দ্বিতীয় রিং আবার তৃতীয় রিঙের আলের উপর ঘুরে যেতে পারে। চাকার অক্ষদণ্ডের এক দিকে ছোট্ট একটা ছেঁদা করে' তার সংগে খানিকটা লম্বা সূতার একমুখ বেঁধে দাও। চাকাটাকে একটু ঘুরিয়ে সূতাটা কয়েক প্যাঁচ জড়িয়ে একটু জোরে টেনে ছেড়ে দিলেই দেখবে, চাকাটা অসম্ভব বেগে রিঙের মধ্যে ঘুরতে স্বরু করেছে। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ জিনিষটকে একটা পেন্সিলের ডগায়ই হোক বা টাঙানো একগাছা সূতার উপরেই হোক, যেকোন জায়গায় ছেড়ে দিলেই দেখবে সেটা লাট্টুর মতই খাড়া, শয়ান অথবা কাৎ হয়ে স্থিরভাবে ঘুরছে। ঘূর্ণন-বেগ কমে গেলে অবশ্য একদিকে পড়ে যাবে। ২নং চিত্রে
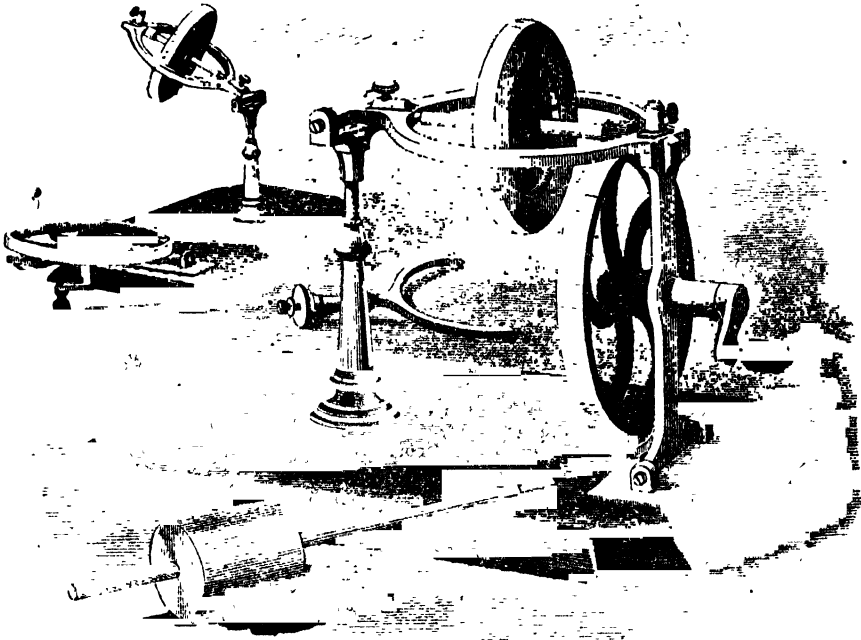
২নং চিত্র

জাইরোস্কোপ একটা মাত্র রিঙের মধ্যে বসানো আছে। ভারী চাকা হলে সূতা বেঁধে ঘোরানো সম্ভব নয়, তাই ওরকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রিংটা বাঁ-দিকের ষ্ট্যাণ্ডের সংগে এমন ভাবে সংলগ্ন যে, অনায়াসেই উপরে বা নীচের দিকে ওঠানামা করতে পারে। রিঙের ডানদিকের অংশটা ষ্ট্যাণ্ডের গায়ে আঁটা নয়; অক্ষদণ্ডটা কেবল হ্যাণ্ডেল সংযুক্ত চাকাটার উপর স্থাপিত। হ্যাণ্ডেল ঘোরালেই চাকাটা মিনিটে প্রায় ৫০০০ বার করে পাক খেতে থাকে। এভাবে চাকাটাকে ঘুরিয়ে দেবার পর হ্যাণ্ডেলওয়ালা চাকাটাকে সরিয়ে নিলে জাইরোস্কোপ ঠিক বাঁ-দিকের ছোট্ট ছবিটার মত অবস্থান করবে।

কিন্তু সূতা বেঁধেই ঘোরাও, কি হাতেই ঘোরাও কিছুক্ষণ বাদেই তার ঘূর্ণনবেগ কমে আসবে। জাইরোস্কোপের ঘূর্ণনবেগ যদি বরাবর সমান রাখবার কোন ব্যবস্থা করা যায় তবেই তাকে দিয়ে অদ্ভুত কাজ করানো যেতে পারে। প্রথমত উচ্চ চাপের বাতাস সরু নলের মুখ দিয়ে বা'র করে' তার ধাক্কায় জাইরোস্কোপকে অনবরত ঘূর্ণায়মান রাখার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর আবার নিখুঁৎ গোলাকার কাগজের বলকে বাতাস অথবা বাষ্পের ধাক্কায় ঘোরাবার ব্যবস্থা হয়েছিল। ৩নং ছবি ভাল করে দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে
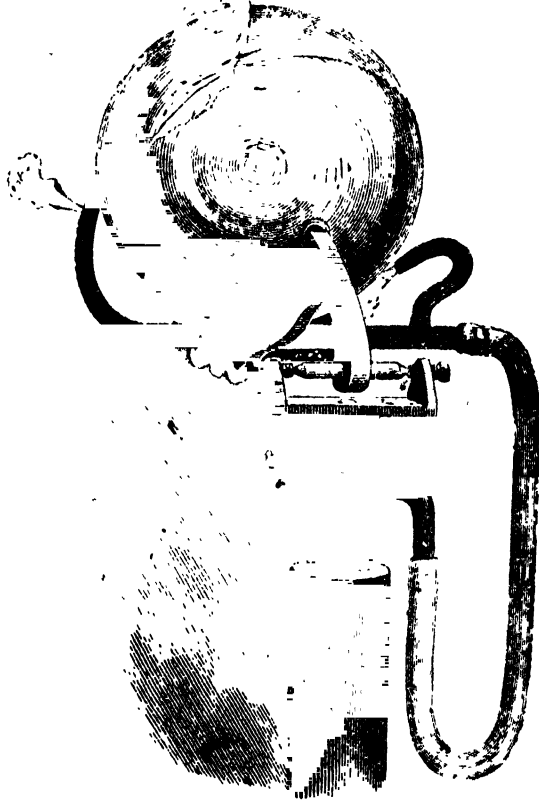
৩নং চিত্র

পারবে। এর পরে ষ্টীম এঞ্জিন সহযোগে জাইরোস্কোপের চাকাটাকে নির্দিষ্ট বেগে ঘূর্ণায়মান রাখার ব্যবস্থা হয়। ৪নং ছবি দেখ। ছোট্ট বয়লার, তার সংগে ছোট্ট এঞ্জিনের সাহায্যে ফ্লাই-হুইলটাই জাইরোস্কোপের মত ঘুরছে। বয়লারটা আলের উপর বসানো, কাজেই এদিক-ওদিক ঘুরতে পারে। আবার সমস্ত জিনিষটারই নীচের দিকে একটা আলের উপর ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরবার ব্যবস্থা আছে। এরপরে জাইরোস্কোপকে নির্দিষ্ট বেগে ঘূর্ণায়মান রাখবার জন্যে বিদ্যুৎশক্তির সাহায্য লওয়া হয়। ৫নং এবং ৬নং চিত্র থেকে বিদ্যুৎ চালিত জাইরোস্কোপের নমুনা বুঝতে পারবে। বিদ্যুৎশক্তিতে যেমন করে মোটর ঘোরে, সে রকম সহজ ব্যবস্থাতেই জাইরোস্কোপ ঘোরাবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। প্রয়োজন হলে এ সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে। তবে জাইরো-

৪নং চিত্র

৫নং চিত্র
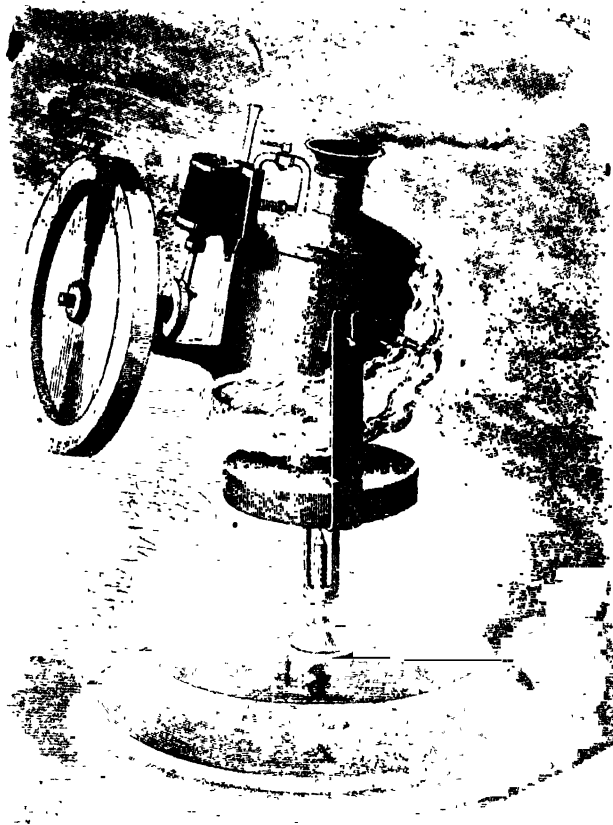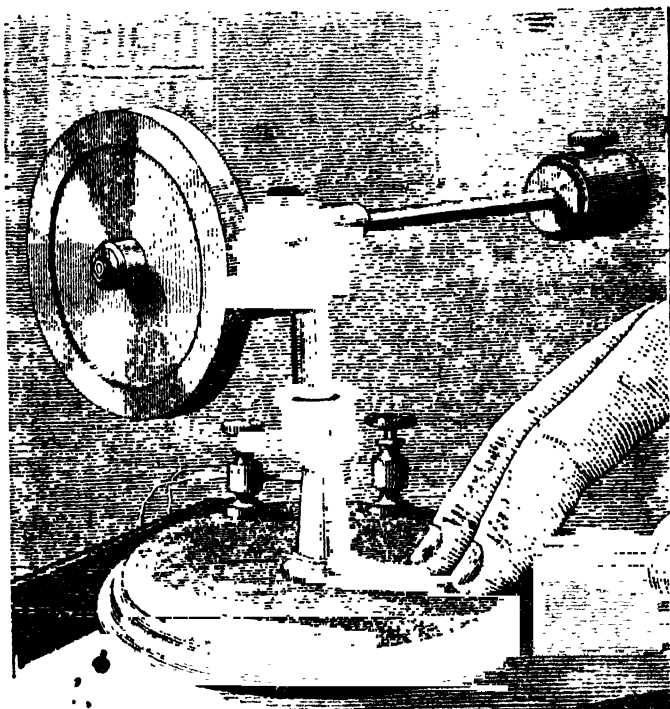
স্কোপের বিশেষত্ব সম্বন্ধে তোমরা এটুকু জেনে রাখ যে, নির্দিষ্ট গতিতে এরূপ অনবরত ঘূর্ণায়মান একটা জাইরোস্কোপের অক্ষদণ্ডটাকে যদি সূর্যোদয়ের সংগে সূর্যের দিকে মুখ
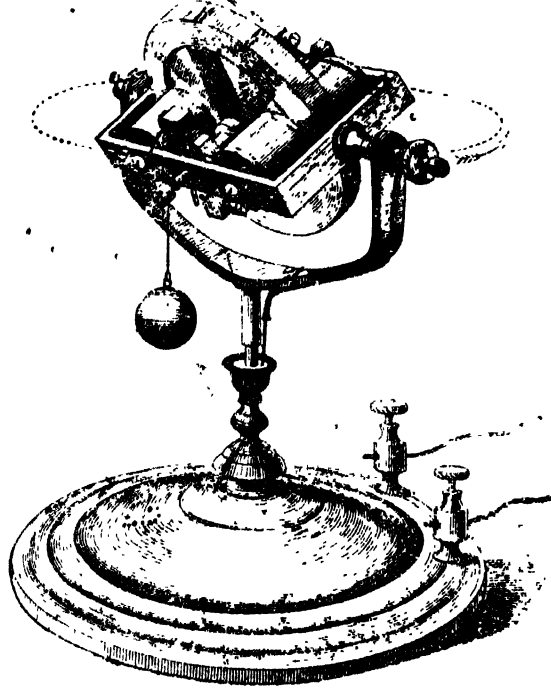
৬নং চিত্র

করে রেখে দাও—তবে দেখবে—অক্ষদণ্ডটা সারাদিন সূর্যের দিকে মুখ করেই আছে, বেলা বাড়বার সংগে সূর্য যত উপরে উঠতে থাকবে অক্ষদণ্ডটাও তত খাড়া হতে থাকবে। তোমরা হয়তো মনে করতে পার, জাইরোস্কোপের অক্ষদণ্ডটা বরাবর ঘুরে যাচ্ছে। তা' মোটেই নয়। অক্ষদণ্ডটা সূর্যের দিকে ঠিকই আছে, কেবল পৃথিবী ঘুরে যাচ্ছে বলে এরূপ দেখাচ্ছে। অক্ষদণ্ডটাকে সূর্যের দিকে না রেখে উত্তর আকাশের ধ্রুবতারার দিকে নিশানা করে রাখ। দেখবে, সারা দিন অক্ষদণ্ডের মুখ সেই এক দিকেই আছে। কেন এমন হয়? একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে। মোটের উপর, জাইরোস্কোপের অক্ষদণ্ডের মুখ যেদিক করে রাখা যায় ঠিক সেদিকেই থাকে। এই ব্যাপারের জন্যেই একে দিয়ে চালকবিহীন এরোপ্লেন, জাহাজ, টর্পেডো চালানো এবং আরও অনেক কিছু অদ্ভুত কাজের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। গ, চ, ভ।

নবতারা

শ্রীসূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

বিশাল বিশ্বজগতে বিচরণশীল অসংখ্য নক্ষত্রদের জীবনযাত্রার একটা সাধারণ নিয়ম ও শৃঙ্খলা রয়েছে। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, নক্ষত্রগুলির মধ্যে নিয়তই বিভিন্ন পরমাণুর ভাঙ্গা-গড়া চলেছে। এই ভাঙাগড়া থেকে জন্ম হচ্ছে বিরাট তেজের, এই তেজই হচ্ছে নক্ষত্রের জীবন। এই তেজ আপাতদৃষ্টিতে অফুরন্ত মনে হলেও নক্ষত্রের জীবনের বিরাট ব্যবধানের মধ্যে এই তেজের উৎস একদিন ফুরিয়ে যায় ও তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। এই জীবন ও মৃত্যু চলে একটা সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে। এ ছাড়া কিন্তু নক্ষত্র জীবনে একপ্রকার দুর্ঘটনাও দেখা যায়। নির্মল আকাশে হঠাৎ দেখা যায়, একটি নক্ষত্র ক্ষীণ উজ্জ্বলতা নিয়ে এতদিন বেঁচেছিল; হঠাৎ একদিন তার উজ্জ্বলতা হাজার, লক্ষ; এমন কি কোটি গুণ পর্যন্ত বেড়ে গেল। পৃথিবীর আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎ-পাতের মতো এ হল নক্ষত্রজীবনে বিরাট বিস্ফোরণ। তারপর ধীরে ধীরে এই উজ্জ্বলতা কমে গেল—সেই নক্ষত্রটি ফিরে পেল তার পূর্বেকার দীপ্তি।

দূরবীণ আবিষ্কার হওয়ার আগে এই রকম বিস্ফোরণশীল নক্ষত্র বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে পড়েছিল—কিন্তু তার বিস্ফোরণ-পূর্ব অবস্থায় খালি চোখে দেখা যায় না বলে, তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, বিশ্বজগতে আর একটি নতুন তারার আবির্ভাব হল। তাই তাঁরা এর নামকরণ করেছিলেন 'নোভা' বা নবতারা। আজকাল এই ধারণা যদিও বদলে গেছে, তবু নামটা চালু আছে।

প্রাচীন ইতিহাসের 'বেথেলহেমের নক্ষত্র'কে এইরূপ একটি বিস্ফোরণশীল নক্ষত্র বলে অনুমান করা হয়। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে ড্যানিস্ জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইকোব্রাহী, দিবালোকে স্পষ্ট দেখা যায় এরূপ একটি নোভার আবিষ্কার করে-ছিলেন। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে জোহান্ কেপ্‌লার আর একটি উজ্জল নোভার সন্ধান পান। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে এ্যাকুইলা নক্ষত্র-মণ্ডলে সিরিয়াস্ নক্ষত্রের চেয়ে উজ্জল আর একটি 'নোভা' কিছুক্ষণের জন্য আবির্ভূত হয়েছিল। আমাদের পৃথিবী থেকে নক্ষত্রগুলির বিরাট দূরত্বের জন্য অধিকাংশ নোভা আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু বর্তমান আলোকচিত্র গ্রহণ প্রণালীতে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন যে, আমাদের নক্ষত্র জগতেই প্রতি বৎসর প্রায় কুড়িটি নক্ষত্র এইরূপ বিস্ফোরণের মুখে পতিত হয়।

নক্ষত্র জগতে নোভা সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীগণ দেখলেন, সব নোভাগুলির উজ্জলতা সমান নয়। কোনটি বা খালি চোখে দেখা যায়, আর কোনটি দূরবীণ না হলে দেখতে পাই না। উজ্জলতায় এই অসাম্য অনেকটা দূরত্বের কমবেশীর জন্যেই হয়ে থাকে। এগুলি পৃথিবী থেকে একই দূরত্বে অবস্থান করলে এদের উজ্জলতা প্রায় সমান হবে। আর সেই উজ্জলতা হবে সূর্যের সাধারণ উজ্জলতার প্রায় ২ লক্ষ গুণ বেশী।

আরও উজ্জলতর বেথেলহেম্ বা টাইকো-নোভাগুলির বিশেষত্ব আছে। এদের উজ্জলতা সাধারণ নোভার চাইতেও দশহাজার গুণ বেশী। বৈজ্ঞানিক ব্যাডে ও জুইকি এদের নাম দিয়েছেন 'সুপার নোভা' বা অতিনবতারা। ১৬০৪ খৃষ্টাব্দের কেপ্‌লার নক্ষত্র এই সুপারনোভা শ্রেণীর অন্তর্গত এবং আমাদের নক্ষত্র-জগতে পরবর্তী কালে আর এরূপ নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটেনি। হিসাব করে দেখা গেছে যে, আমাদের নক্ষত্র-জগতে তিনশো

বৎসর অন্তর একটি সুপার নোভার আবির্ভাব ঘটতে পারে। কেপ্‌লার নক্ষত্রের পর প্রায় ৩৩৪ বৎসর অতীত হ'ল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তাই অদূর ভবিষ্যতে এরূপ একটি সুপার নোভার আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করছেন।

সুপারনোভার আবির্ভাব আমাদের নক্ষত্র জগতে যদি এত দুর্লভ, তবে সুপারনোভা সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধান তো সময় সাপেক্ষ! কিন্তু বিজ্ঞানীরা হতাশ হননি। আমাদের ছায়াপথের বাইরে যে সমস্ত নীহারিকা রয়েছে তাদের সংখ্যা অগণিত। আগে ধারণা ছিল এগুলি উজ্জল বাষ্পীয় পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু এখন নিশ্চিতভাবেই জানা গেছে যে, এগুলি কোটি কোটি নক্ষত্রের সমষ্টি। আমাদের ছায়াপথের বাইরে এই অসংখ্য নক্ষত্র-জগৎকে বলা হয় দ্বীপ-জগৎ। বৈজ্ঞানিক জুইকি মনে করলেন যে, এই নক্ষত্র-জগৎগুলি যদি আমাদের নক্ষত্রজগতের মত হয় তবে এগুলিতেও সুপারনোভার আবির্ভাব হওয়া স্বাভাবিক। গড়ে প্রত্যেক তিনশত বৎসরে যদি প্রত্যেক নক্ষত্র-জগতে একটি সুপারনোভা দেখা যায়, তবে প্রতি বৎসর গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে আমরা পৃথিবীতে অন্ততঃ একটি সুপারনোভা দেখতে পাব। বাইরের এই নক্ষত্র-জগতগুলির আলোকচিত্র তিনি গ্রহণ করলেন কিছুদিন ধরে। তারপর হঠাৎ একদিন এন্, জি, সি ৪১৫৭ নামক নীহারিকায় ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে ড: জুইকি একটি সুপারনোভার সন্ধান পেলেন। এই সব বাইরের নক্ষত্রজগতে তারপর আজ পর্যন্ত প্রায় কুড়িটি সুপারনোভার সন্ধান পাওয়া গেছে।

এখন দেখা যাক, আমাদের সূর্যের এরূপ দুর্ঘটনায় পড়বার কোন সম্ভাবনা আছে কি না! সত্যই যদি এরূপ সম্ভাবনা থাকে তা'হলে আমাদের দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে। বিস্ফোরণ কালে সূর্যের তেজ তা'হলে বহু সহস্রগুণ বেড়ে যাবে, ফলে আমাদের পৃথিবী পাতলা বাষ্পে পরিণত হবে। হয়ত পৃথিবীর মানুষ আমরা এই প্রলয়ংকর পরিবর্তন অনুভব করবার অবকাশও পাব না। সত্যই কি এ রকম আকস্মিক মৃত্যু ঘটবে পৃথিবীর? এর সঠিক উত্তর দেওয়া আজও সম্ভব হয়নি। প্রথমেই আমাদের মেনে নেওয়া উচিত যে, আপাতদৃষ্টিতে সূর্যের সমগ্র জীবনকাল মধ্যে তার একবার নোভায় রূপান্তরিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। প্রত্যেক বৎসর আমাদের নক্ষত্র-জগতে কুড়িটি নক্ষত্রের বিস্ফোরণ হয়; আর আমাদের বিশ্বজগতের বয়স প্রায় কুড়ি কোটি বছর। তা'হলে আজ পর্যন্ত প্রায় ৪০০ কোটি নক্ষত্রের বিস্ফোরণ হয়ে থাকবে। অপরপক্ষে আমাদের নক্ষত্রজগতে নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় ৪০০ কোটি। তা'হলে আমরা বলতে পারি যে, প্রত্যেক নক্ষত্র তার জীবনে একবার অন্ততঃ নোভায় পরিণত হবে। সম্ভবত একটি নক্ষত্র জীবনে একবার বিস্ফোরিত হয়। তবে হয়ত পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে আমাদের সূর্যের বিস্ফোরণ সম্ভব হবে। অথবা অতীতে তার নোভা অবস্থা প্রাপ্তি একবার ঘটে গেছে। এর একটা উত্তর পেতে হলে নোভার বিস্ফোরণ পূর্ব অবস্থা অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, যদিও এ সম্বন্ধে খুব নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নি। নোভা আবির্ভাবের সময় আকাশের সেই অঞ্চলের আলোকচিত্রে নোভাটির জায়গায় একটি ক্ষীণ নক্ষত্র ছিল মাত্র। এই নক্ষত্রগুলির উজ্জলতা কোন ক্ষেত্রে আমাদের সূর্যের সমান, কখনও কম বা বেশী। এই সাধারণ নক্ষত্রগুলি একদিন নোভায় পরিণত হবে এই ধারণা কারো ছিল না। তাই এদের বিস্ফোরণ-পূর্ব সময়কার বর্ণালী বা অন্যান্য ধর্ম পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়নি। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে দৃষ্ট নোভা এ্যকুইলির বিস্ফোরণ-পূর্ব অবস্থার বর্ণালী কোনক্রমে নেওয়া হয়েছিল। তাতে দেখা গেল যে, সাধারণ পর্যায়ের কোন নক্ষত্রের সংগে এর কোনও পার্থক্য ছিল না। বরং এর ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণালীর বৈশিষ্ট্য আমাদের সূর্যের সংগে প্রায় মিলে

যায়। তাহলে আমাদের সূর্যও কি অদূর ভবিষ্যতে এ্যাকুইলির মত নোভায় পরিণত হবে? না-ও হতে পারে। কারণ জ্যোতির্বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে অদূর ভবিষ্যৎ বল্‌তে কয়েক লক্ষ বছরও হতে পারে। তাছাড়া এক্যুইলি বা সূর্যের মত ঔজ্জ্বল্য এবং বর্ণালী নিয়ে আকাশে আরও কয়েক লক্ষ নক্ষত্র রয়েছে; কই, তাদের মধ্যে তো বিস্ফোরণ হচ্ছে না! মোটের উপর নোভা-পূর্ব অবস্থায় নক্ষত্রের কিছু বাহ্যিক পরিবর্তন হয় না—হলেও তা এত সূক্ষ্ম যে, বিজ্ঞানীর চোখে পড়েনি। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের নোভা এ্যাকুইলি এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট প্রমাণ করেছে। এখন দেখা যাচ্ছে, যে কোন সাধারণ নক্ষত্র যে কোন মুহূর্তে বিরাট বিস্ফোরণের সম্মুখীন হতে পারে। অতএব আমাদের সূর্যের ভাগ্যে কী আছে, তা' সঠিক বলা সম্ভব নয়।

সুপার নোভার বিস্ফোরণ-পূর্ব অবস্থার কথা বিশেষ কিছু জানা যায়নি। কারণ আমাদের নক্ষত্রজগতে এর আবির্ভাব বিরল। বহুদূরবর্তী অন্যান্য নক্ষত্র জগতে যে সমস্ত সুপার নোভার সন্ধান আমরা পেয়েছি, তা সম্ভব হয়েছে কেবল এদের অসাধারণ উজ্জলতার জন্যে। কিন্তু এদের বিস্ফোরণ-পূর্ব কালের অনুজ্জ্বল দেহ সম্বন্ধে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা বিশেষ কিছু জান্‌তে পারেন নি।

এই সব বিস্ফোরণকালে নক্ষত্র দেহে বিপুল পরিবর্তন হয়। বিস্ফোরণ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নক্ষত্রের উজ্জলতা বহু সহস্র গুণ বেড়ে যায় এবং অল্প সময়ের মধ্যে ক্রমশঃ এই উজ্জলতা কমে গিয়ে তার পূর্বেকার দীপ্তি ফিরে আসে। বিস্ফোরণ সময়ে নক্ষত্রের পূর্ব অবস্থার সাধারণ বর্ণালীতে বিপুল পরিবর্তন হয়। তার পৃষ্ঠের তাপ মাত্রা বহু সহস্র গুণ বেড়ে যায়! আর তার উজ্জল বর্ণালী রেখাগুলি বেগনির দিকে সরে আসে। এথেকে অনুমান করা হয় যে, বিস্ফোরণের সময় নক্ষত্রটির চতুর্দিকে একটি বৃত্তাকার বাষ্পীয় আবরণ স্ফীত হয়ে পড়ে। নোভা এ্যাকুইলির ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল যে, এই স্ফীত আবরণ প্রতি সেকেণ্ডে ২০০০ কিলোমিটার বেগে ব্যাপ্তি লাভ করতে থাকে। ছ'মাস পরে পৃথিবীর দূরবীণে এই ব্যাপারটা ধরা পড়ে। তার চারিদিকের এই বাষ্পাবরণের ব্যাস এখন বৎসরে প্রায় দুই কৌণিক সেকেণ্ডে বেড়ে চলেছে। যদি এই বেগে নিয়তই এই আবরণটি বেড়ে চলে তবে এক হাজার বছরে এর ব্যাস আমাদের চন্দ্রের দৃশ্য ব্যাসের সমান হবে। এখন আকাশে এমন কতকগুলি নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের চতুর্দিকে বিস্তৃত বাষ্পাবরণ বিদ্যমান। গ্রহ-নীহারিকাগুলি নবতারার পরবর্তী অবস্থা কিনা সে প্রশ্নের এখনো কোন সমাধান হয়নি। তাউরাস নক্ষত্র-মণ্ডলের বাষ্পীয় নীহারিকা ক্র্যাব নেবুলার কথা এখানে বলা প্রয়োজন। এই নীহারিকা এখন বৎসরে ·১৮ কৌণিক সেকেণ্ড বেগে স্ফীতি লাভ করছে। এ থেকে গণনায় দেখা যায় যে, প্রায় আট কি নয়শো বছর আগে এই স্ফীতি আরম্ভ হয়েছিল।

একাদশ শতাব্দীতে লিখিত একখানি চীনা পুঁথিতে দেখা যায় যে, ১০৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় ক্র্যাব নেবুলার স্থানেই একটি নাক্ষত্রিক বিস্ফোরণ হয়েছিল। তাই এসম্বন্ধে আর সন্দেহ নেই যে, সেদিন সেই সুপার নোভার ঐতিহাসিক বিস্ফোরণই ক্র্যাব নেবুলার জন্ম দিয়েছিল। সিগ্‌নাস্ নক্ষত্র-মণ্ডলের সূত্র নীহারিকাকেও একটি সুপারনোভার বিস্ফোরণের পরিণতি বলে মনে করা হয়। বিজ্ঞানী জি, পি, কুইপার্ সম্প্রতি দেখিয়েছেন যে, নক্ষত্রের বিস্ফোরণের ফলে শুধু এই ব্যাপ্তিশীল বাষ্পাবরণের জন্ম হয় তা নয়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের নোভা হারকিউলিস্‌কে কয়েক বৎসর পরে দূরবীণে পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, বিস্ফোরণের ফলে নক্ষত্রটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এখন এই দু'টি বিভক্ত অংশ পরস্পর থেকে বৎসরে ০·২৫ কৌণিক সেকেণ্ড আপেক্ষিক বেগে পৃথক্ হয়ে পড়ছে। মনে হয়

৯১৩০ খৃষ্টাব্দে এই অংশ দুটির ব্যবধান চন্দ্রের দৃশ্য ব্যাসের ০.৫ ডিগ্রী পর্যন্ত দাঁড়াবে।

নক্ষত্র-জগতে কেন এই বিস্ফোরণ ঘটে তা আমরা সঠিক বল্তে পারিনা, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করেই বৈজ্ঞানিকরা কোন কোন সিদ্ধান্তে এসেছেন।

এই বিস্ফোরণের সহজ তত্ত্ব এই যে, নক্ষত্র মহাশূন্যে তার গতিপথে কোনও বাধা পেয়ে বিস্ফোরিত হয়। কিন্তু মহাশূন্যে জ্যোতিষ্কগুলির অবস্থান এত ঘন নয় যে, এরকম সংঘর্ষ সহজে সম্ভব হবে। গণনা করে দেখা গেছে যে, ২০ কোটি বছরে আমাদের নক্ষত্র-জগতে ২।৩ বার এরূপ সংঘর্ষের সম্ভাবনা আছে মাত্র।

আমরা জানি যে, নক্ষত্র-জগতে মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানগুলিতে বিস্তৃত পাতলা বস্তুপুঞ্জ রয়েছে—এর নাম বাষ্পীয় নীহারিকা। এই নীহারিকাগুলি প্রায়ই প্রতিবেশী নক্ষত্রদের আলোকে বিস্তৃত ও উজ্জল দেখায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই নীহারিকাগুলি কৃষ্ণবর্ণের হয়—তাদের পশ্চাতের নক্ষত্রগুলির আলোক এই শ্রেণীর নীহারিকায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে অন্ধকার অংশের অবস্থান থেকে আমরা এদের অস্তিত্ব দেখতে পাই। যেমন উল্কাপিণ্ড পার্থিব বায়ুমণ্ডলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উজ্জল হয়ে উঠে তেমন কোনও নক্ষত্র তার বিরাট গতিবেগ নিয়ে এই নীহারিকাপুঞ্জে বাধাপ্রাপ্ত হলে প্রচণ্ড উজ্জলতায় ফেটে পড়বে। নাক্ষত্রিক গতিবেগের গতি শক্তির কিছু অংশ যখন এইভাবে তাপে রূপান্তরিত হবে, তখনই তার নোভা প্রাপ্তি ঘটবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের সূর্যের বেগ বর্তমানে সেকেণ্ডে ১৯ কিলোমিটার। এই বেগ কোনও নীহারিকাপুঞ্জে বধাপ্রাপ্ত হয়ে যদি অর্ধেক কমে যায় তবে সেই শক্তি রূপান্তরিত হয়ে সূর্যের উজ্জলতা কয়েক সপ্তাহের জন্য লক্ষ গুণ বাড়িয়ে দেবে। কিন্তু নোভাগুলির প্রায় সমান বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়; অথচ এই নীহারিকাগুলির ঘনতা এবং জ্যামিতিক আয়তন এত অসমান যে, এদের সংগে নক্ষত্রের সংঘর্ষের ফলে সমান বৈশিষ্ট্যের নোভার কি করে উদ্ভব হয় তা বলা সম্ভব নয়। আবার এই তত্ত্ব থেকে যদিও সাধারণ নোভার তেজের ব্যাখ্যা করা যায়; কিন্তু সুপার নোভার প্রচণ্ডতর তেজের ব্যাখ্যা এদিয়ে সম্ভব হয় না।

পরমাণুর পরস্পর রূপান্তরের উপর নক্ষত্রের সাধারণ জীবন নির্ভর কর্ছে—কেউ কেউ মনে করেন, নক্ষত্র দেহস্থ পরমাণুগুলির উপর তাপঘটিত কোন বিশিষ্ট ক্রিয়ার দ্বারা নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় তাপের পরিবর্তনের ফলে এই বিস্ফোরণ ঘটে। এতে নোভা এমনকি সুপার নোভার তেজের উদ্ভব হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। কিন্তু এরূপ কোন ক্রিয়ার সম্ভাবনা আজও জানা যায়নি। তাই আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, নোভার উদ্ভবের কারণ সম্বন্ধে এখনো সঠিক আমরা কিছু জানিনা।

সুপার নোভার বিস্ফোরণের কারণ সম্বন্ধে ডাঃ জুইকি একটা তত্ত্ব খাড়া করেছেন। আমরা জানি যে, নক্ষত্রের তেজের উৎস হচ্ছে হাইড্রোজেন। তাপ-কেন্দ্রীন (thermonucleur) ক্রিয়ার ফলে এই হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস্ বিভক্ত হয়ে নক্ষত্র তেজের জন্ম দেয়। কিন্তু এই হাইড্রোজেন যখন ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসে, তখন বিরাট নক্ষত্রগুলির ব্যাসার্ধ কমে যায় এবং এরা অতি ঘন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। গণনায় দেখা গেছে যে, এই নক্ষত্রগুলি সূর্যের চেয়ে ১.৪ গুণের বেশী ভর সম্পন্ন হলে এদের ব্যাসার্ধ শূন্য দাঁড়াবে। এদের বহিরাবরণের ওজন এতবেশী যে এদের অন্তর্নিহিত ফার্মির ইলেকট্রন বাষ্প ভারসাম্য রাখতে পারেনা—তাই সংকোচন চলতে থাকে।

তবে কি এই ভারী নক্ষত্রগুলির সংকোচন অসীম—এর কি শেষ নেই? রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক ল্যাণ্ডাউ দেখিয়েছেন যে, এই সব নক্ষত্রে বস্তুর পরমাণুকেন্দ্র ও বিভক্ত ইলেকট্রনগুলির ব্যবধান তার ব্যাসের সংগে সমান হলে এই সংকোচন

আর সম্ভব হবে না। বিভিন্ন পারদবিন্দু যেমন একসংগে মিশে যায় তেম্‌নি এক্ষেত্রে পরমাণু কেন্দ্র ও ইলেক্‌ট্রনগুলি একসংগে মিলিত হয়ে একটানা নিউক্লিয়ার বস্তুপিণ্ডে পরিণত হবে। তখন এর ঘনত্ব বেড়ে যাবে জলের চেয়ে প্রায় ১০^১২ গুণ পর্যন্ত। এরূপ ঘন একটি ধূলিকণার ওজন হবে প্রায় কয়েকটন। এইসব সংকোচনশীল নক্ষত্রগুলির অন্তর্নিহিত চাপের বলেই এত ঘন অবস্থায়ও নক্ষত্রের অস্তিত্ব বজায় থাকবে। কোনরকমে সেই চাপ থেকে ছাড়া পেলেই, যে নিউক্লিয়াস্‌ ও ইলেকট্রনগুলি মিলে এই বস্তুপিণ্ডের উদ্ভব হয়েছিল সেগুলি বিভিন্ন পরমাণু গঠন করবে।

ডাঃ জুইকির মতে ভারী নক্ষত্রের দ্রুত সংকোচনের ফলে তার ভিতরে নিউক্লিয়ার অবস্থা-প্রাপ্তি ঘটে। বাইরের চাপের ফলে নিউক্লিয়াস্‌ ইলেকট্রনের সংগে মিশে উদাসীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ফলে সমগ্র নক্ষত্রটা একটা কঠিন উদাসীন নিউক্লিয়ার বস্তুতে পরিণত হয়। এই সংকোচনের ফলে কয়েক ঘণ্টায় নক্ষত্রের ব্যাসার্ধ শতকরা একভাগ কমে যায়। ফলে নক্ষত্র দেহ থেকে উন্মুক্ত মহাকর্ষশক্তি প্রচণ্ড তেজ বিকীরণ করে। তখনই এই নক্ষত্রকে আমরা সুপার নোভা আখ্যা দিয়ে থাকি। নক্ষত্রের অন্তর্নিহিত এই বিকীরণের চাপে তার বহিরাবরণ স্ফীত হয়ে উঠে। বিস্ফোরণের পর আমরা এই স্ফীতিশীল বাষ্পাবরণ তার চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়তে দেখি।

এই তথ্যটী খুব যুক্তিপূর্ণ হলেও এরূপ সম্ভাবনার কথা অনেকে অস্বীকার করেন। মোটের উপর, আমরা নোভা বা সুপার নোভা সম্বন্ধে এখনো যথেষ্ট তিমিরে আছি—কে জানে, হয়ত ভবিষ্যৎ এই কঠিন সমস্যার সমাধান করবে।

মেক্সিকোর সান্টা মেরিয়া ডেলটিউল গ্রামের এই বিশাল সাইপ্রেস গাছটা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন জীবন্ত পদার্থ। গাছটার বেড় ১৭৫ ফুটেরও বেশী। এর বয়স ৫,০০০ বছর থেকে ৬,০০০ হাজার বছরের মধ্যে।

ভারতে কুক্কুট-পালনের প্রসার

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়

কুক্কুট-ডিম্ব যদিও অত্যন্ত পুষ্টিসাধক বস্তু ও সহজেই উৎপাদন করা যায়, তথাপি ভারতবর্ষে উহার উৎপাদন এযাবৎ উপেক্ষিতই রহিয়াছে। এই উক্তি সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার পূর্বে ভারতবর্ষে আমাদের দৈনন্দিন আহার্যে মুর্গির ডিমের স্থান কোথায় তাহা জানা প্রয়োজন। ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে ন্যূনাধিক পাঁচ কোটী দুই লক্ষ মুর্গি ছিল অর্থাৎ ১০০ জন প্রতি ১৫টী মুর্গি; সে স্থলে ডেনমার্ক ও আমেরিকায় ছিল জন প্রতি ৩টি মুর্গি। একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতে জনপ্রতি বৎসরে মাত্র আটটি ডিম খাইতে পায়। অবস্থা যে শোচনীয় তাহা বলা বাহুল্য। আমাদের দেশে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই আহার্যে এই বিলাসভোগ করিতে পায়। বিদেশে ডিম জনসাধারণের খাদ্যের একটি অপরিহার্য দ্রব্য, কারণ পুষ্টিকারিতার দিক দিয়া সকল বিষয়েই ইহা একটি আদর্শ খাদ্য এবং সস্তাও বটে। ভারতেও ঐরূপ হওয়া উচিৎ নয় কি?

বর্তমানে মুর্গির চাষ অনেক দেশে অজ্ঞাত হইলেও আমাদের দেশের পক্ষে একথাটি যেমন খাটে তেমনটি বোধহয় আর কোন দেশের পক্ষে নহে। বিগত মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতে এবিষয় লইয়া কেহ মাথা ঘামায় নাই। আমেরিকা, ইংলণ্ড ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে মুর্গির চাষ যেরূপ সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় তাহা আমাদের দেশে অজ্ঞাত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা মনে রাখা দরকার যে মুর্গি পালন যেকোন দেশে একটি প্রগতিশীল ও লাভজনক ব্যবসায়রূপে গৃহীত হইবার দাবী রাখে। অধিকন্তু ডিম গরীব গৃহস্থের আহার্যে জান্তব-প্রোটিন্ যোগাইবার একটি প্রধান উপাদান।

আমেরিকা, ডেনমার্ক ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে একটী মুর্গি বৎসরে গড়পড়তা ১২০টী ডিম্ব প্রসব করে, আর আমাদের দেশে একটী মুর্গি প্রসব করে মাত্র ৬৪টি। এতদ্ভিন্ন আকারে ভারতে উৎপন্ন ডিম বিদেশী ডিমের ২।৩ অংশ মাত্র। ভারতে নিম্নহারে ডিম্ব উৎপাদনের জন্য দায়ী হইল মুর্গির বংশগত দীনতা, নানাবিধ ব্যারাম, খাদ্যাভাব বা স্বল্প পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োগ এবং পালন-নীতি সম্বন্ধে অজ্ঞতা।

ভারতবর্ষে জনসাধারণের আহার্য আদর্শের মান হইতে বহুলাংশে নিম্নশ্রেণীয়। এজন্য ডিম্ব উৎপাদনের হার যত শীঘ্র বর্ধিত করিতে পারা যায় ততই মঙ্গল, কারণ ডিম্বে জান্তব প্রোটিন্, ভাইটামিন্ ও প্রয়োজনীয় ধাতব বস্তুর এক অদ্ভুত সমাবেশ আছে যাহা নাকি গম, চাল, ডাল ইত্যাদিতে নাই। ভারতবর্ষে গত মহাযুদ্ধের পর হইতে কুক্কুট-পালন যে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কুক্কুট চাষ সম্বন্ধে গবেষণা বা অনুসন্ধানমূলক প্রচেষ্টা ভারতবর্ষে বহুস্থানেই বেশ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু চাহিদা পূরণ করিবার মত অবস্থা ভারতের আজও হয় নাই। মুর্গির খাঁটী ও মিশ্র জাতি সম্বন্ধে নানারূপ অনুসন্ধানমূলক কার্য ভারতের বহুস্থানে চলিতেছে; কিন্তু ফলাফল সম্বন্ধে আমরা আজও এরূপ স্তরে পৌঁছিতে পারি নাই, যাহাতে কোন বৃহৎ পরিকল্পনা লইয়া আমরা মুর্গির চাষ আরম্ভ করিতে পারি। ভারতে অনেকগুলি কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও অন্যান্য আদর্শ কুক্কুট-কৃষিভবন আছে। সেগুলি জনসাধারণকে উন্নত বংশজাত মুর্গি বিতরণ করে, কিন্তু তাহার সংখ্যা ভারতে মোট মুর্গির সংখ্যার তুলনায় নিতান্তই অল্প।

ভারতে কুক্কুট-কৃষি সম্পর্কে জাগরণ আনিবার উদ্দেশ্যে শীতকালে দিল্লী ও অন্যান্য স্থানে কুক্কুট

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। কুক্কুট পালন-নীতি, কুক্কুটের উন্নতি, আদর্শের বিচার ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রকাশ্য প্রচারই এই প্রদর্শনীগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। ফেব্রুয়ারী মাসে নিখিল ভারত কুক্কুট প্রদর্শনীতে সরকারী ও বেসরকারী মতামতের বিশদ্ আলোচনা দ্বারা উন্নত পরিকল্পনার সৃষ্টি সম্ভবপর হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ, কি জাতীয় কুক্কুট পালনের দ্বারা লাভবান হইতে পারে সে বিষয়েও ঐ প্রদর্শনী আলোকপাত করে।

ঐ জাতীয় প্রদর্শনীর দুইটি দিক আছে—যথা (১) বংশগতগুণাবলী ও সৌন্দর্য এবং (২) উপকারিতা বা ডিম্ব উৎপাদন ক্ষমতা ও মাংস উৎপাদন সম্বন্ধে বিচার। এইরূপ প্রদর্শনী উন্নত জাতীয় কুক্কুট উৎপাদনের প্রচেষ্টায় সাহায্য করে,—তাহা সৌন্দর্য, ডিম্ব বা মাংস যে কোনটি বৃদ্ধির দিক দিয়াই হউক না কেন। প্রতিযোগিতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া চাষীরা আপনাআপন সম্পদ আপ্রাণ চেষ্টা, যত্ন ও সেবা দ্বারা উন্নত করিতে প্রয়াসী হয় যাহাতে প্রতিযোগিতায় তাহাদের সম্পদ সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিতে পারে। এই সকল প্রদর্শনীতে কোন একটি পক্ষীকে প্রদর্শনীর যেকোন একটি বিভাগের প্রতিযোগিতা তালিকাভুক্ত করা হয়।

সাদা, খয়েরী ও অন্যান্য বর্ণের ডিম (যাহা প্রদর্শিত মুর্গি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে) পর্যায়ক্রমে প্রদর্শিত হইয়া জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রদর্শনীতে আধুনিক কুক্কুট-চাষ প্রণালী সংশ্লিষ্ট বস্তু ও আলোকচিত্রাদি প্রদর্শিত হয়। কুক্কুট পালন-নীতি সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ সহ পুস্তিকা বিতরণ ও অখণ্ডনীয় যুক্ত ও তথ্যযুক্ত কুক্কুট লালন-পালন প্রণালীও জনসাধারণের দৃষ্টি-গোচর করা হয়।

১৯৪৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে চতুর্থ নিখিল ভারত কুক্কুট প্রদর্শনীতে ভারতের বিভিন্ন স্থানাগত প্রবেশার্থীর সংখ্যা ছিল পাঁচশত। ইহাতে রোড-দ্বীপের শ্বেত লাল লেগহর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ মিনর্কা, অসিল, কৃষ্ণবর্ণ ও পাণ্ডুটে অষ্ট্রালপ্স্, লাইট সাসেক্স, জাপানী ব্যান্টম্, কৃষ্ণবর্ণ পোলিস এবং অন্যান্য নানা জাতীয় দেশী কুক্কুটের সমাবেশ হইয়াছিল। ডিম প্রতি-যোগিতায় প্রবেশার্থীর সংখ্যা ছিল চল্লিশ।

ইদানীং দেশীয় কুক্কুটের উন্নতিকল্পে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। ইহা খুবই আশা ও আনন্দের বিষয়। পুষ্টিকারিতার দিক দিয়া ডিমের উপকারিতা প্রমাণিত। সেইজন্য বিদেশে আজ ডিম জনসাধা-রণের আহার্য তালিকায় অপরিহার্য। ভারতবাসীর আহার্যে ডিম বিলাসিতা মাত্র। ডিম পুষ্টিকর ও স্বল্প-মূল্য কাজেই ভারতে কুক্কুট চাষে এমন এক পরিবর্তন আসা উচিৎ যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই ডিমের উপকারিতা গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতে পারে। কুক্কুট-পালন সম্বন্ধে—সাধারণ হিন্দু গৃহস্থের সংস্কারগত ঘৃণা আছে। এই ঘৃণার মূলে কোন বিজ্ঞান সম্মত যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয়না। আপত্তির কারণে তাঁহারা বলেন, বড় নোংরা করে। কিন্তু পালন নীতি সম্বন্ধে সচেতন হইলে এই নোংরামি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে। আমরা গাভী পালনে যদি যত্নবান হইতে পারি তাহা হইলে কুক্কুট পালনে যত্নবান না হইবার কারণ কি? দশ বারটী মুর্গি রাখা যে কোন গৃহস্থের পক্ষে ব্যয়সাপেক্ষ নহে। গৃহস্থের পাতকুড়ানি আহার্যে মুর্গি জীবনধারণ করিতে পারে এবং স্বল্প মাত্র ব্যয় দ্বারা কুক্কুটের উন্নতিসাধন করিয়া লাভবান হওয়া অসম্ভব নহে।

এই প্রসঙ্গে দুইটী বিষয়ের অবতারণা করা নিতান্ত প্রয়োজন। প্রথমত, জন সাধারণ আপত্তির সুরে বলিতে পারেন যে কুক্কুট পালনে শস্যাদির প্রয়োজন। যাহা জনসাধারণের জীবনধারণের জন্যই পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া অসম্ভব তাহা কিরূপে কুক্কুট পালনে ব্যয় করা যাইতে পারে? উত্তরে বলা যায় যে, এরূপ প্রশ্ন তখনই আসে যখন জন সাধারণ অধিক সংখ্যক কুক্কুট পালনে প্রয়াসী হন; কিন্তু আধুনিক গবেষণা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, অতি অল্প পরিমাণ শস্যাদির দ্বারাও কুক্কুট পালন সম্ভবপর। যে স্থানে মেষ, ছাগলাদি পশু বধ করা হয় সে স্থান হইতে অতি অল্প মূল্যে রক্ত ও পশু-দেহের সাধারণতঃ অব্যবহার্য অংশ কুক্কুট খাদ্যের অন্তর্ভূক্ত করা যাইতে পারে। অধিক সংখ্যক কুক্কুট পালনের প্রধান অন্তরায়, তাহাদের সংক্রামক ব্যাধি। কুক্কুটের রানীক্ষেত নামক রোগ অত্যন্ত সংক্রামক ও কোন এক সময়ে স্থান বিশেষে এই রোগে সহস্রাধিক কুক্কুট মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু অধুনা এই সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ করা সম্ভবপর হইয়াছে। ভারতীয় পশু গবেষণাগারে দীর্ঘকাল বিশেষ গবেষণার ফলে একপ্রকার টীকা (vaccine) প্রস্তুত হইতেছে যাহা নিঃসন্দেহে কুক্কুট জাতির এই ব্যাধি প্রতিরোধ করিতে সক্ষম।

বিবিধ প্রসঙ্গ

ভূমি-উন্নয়ন সম্পর্কিত জনপ্রিয় বক্তৃতা—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর, ৪৮, মঙ্গলবার, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ নীলরতন ধর ভারতের ভূমি উন্নয়ন সম্পর্কে একটি জনপ্রিয় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—আবহমান কাল থেকেই ভারতের জমিতে বিনা সারেই ফসল উৎপন্ন হচ্ছে। পাশ্চাত্য দেশবাসীদের কাছে এটা একটা বিস্ময়কর ব্যাপার বলেই প্রতীয়মান হয়। সূর্য-কিরণে ভারতের জমির নাইট্রোজেনের ক্ষয় পরিপূরিত হয়ে থাকে। প্রায় ৩০ বছরের অভিজ্ঞতার ফলে অধ্যাপক ধর প্রমাণ করেন যে, এদেশের জমিতে সার হিসাবে রাবগুড়, খড়কুটা প্রভৃতি ব্যবহার করেই উৎপাদিকা-শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে তোলা যায়। রাসায়নিক সারের আবশ্যকতা থাকিলেও উপরোক্ত উপায়ে জমিতে নাইট্রোজেনের অংশ বর্ধিত হয়ে থাকে। বিবিধ রাসায়নিক পরীক্ষার সাহায্যে বক্তৃতাটি বিশেষ শিক্ষাপ্রদ এবং উপভোগ্য করা হয়েছিল।

ভারতের ১৯টি উন্নয়ন পরিকল্পনা—সমগ্র ভারতের জন্যে মোট ১৯টি পরিকল্পনা করা হয়েছে। তার মধ্যে ৭টি বিবিধ উদ্দেশ্যমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে একসঙ্গে কাজ আরম্ভ হয়েছে। আরও ১২টি পরিকল্পনা সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্য অগ্রসর হচ্ছে।

দামোদর উপত্যকা উন্নয়ন পরিকল্পনা (দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন):—পশ্চিমবঙ্গের প্রধানমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় গত ৪ঠা নভেম্বর এক সাংবাদিক সম্মিলনে 'দামোদর পরিকল্পনা কার্যকরী করার ব্যাপার কতদূর অগ্রসর হয়েছে তার এক মোটামুটি বিবরণ দিয়েছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার এঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের দেওয়া তথ্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক অনুসন্ধান ছাড়াও কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ সিওরী ষ্টীমপাওয়ার ষ্টেসনের বিশ হাজার কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি বণ্টনের কাজ আরম্ভ করেছেন। এই শক্তি মিহিজাম লোকোমোটিভ কারখানা এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের নিকটবর্তী কয়লাখনি এলেকায় বণ্টন করা হবে। ১৯৫০ সালের মধ্যেই বৈদ্যুতিক শক্তির লাইন বসাবার কাজ শেষ হবে, আশা করা যায়। বোকারো ষ্টীমপাওয়ার ষ্টেসন তৈরী সম্পর্কে প্রাথমিক অনুসন্ধানকার্য বেশ কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে। উক্ত পাওয়ার ষ্টেসন ৪ বছরের মধ্যে কার্যকরী হওয়ার আশা করা যায়। টিনাইয়া পাওয়ার ষ্টেসনের কাজও আরম্ভ করা হয়েছে। এই পাওয়ার ষ্টেসন থেকে কোডারমা মাইকা খনিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। বিভিন্ন কনষ্ট্রাকশন ক্যাম্প, রাস্তা, সেতু, কর্মচারীদের বাসস্থান প্রভৃতি তৈরী করা হচ্ছে। ১৯৫০ সালের মধ্যেই এসব কাজ শেষ হবে আশা করা যায়। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করবার ফলে যেসব লোক বাস্তহারা হবেন তাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা সম্পর্কেও তদন্ত আরম্ভ হয়েছে। এ সকল লোককে যতদূর সম্ভব তাদের পুরাতন বাসভূমির নিকটেই পুনর্বসতির ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

কর্পোরেশন আশা করেন, থার্মেল শক্তির ব্যবস্থা হলেই পরিকল্পিত আটটি বাঁধের কয়েকটির কাজ বেশ কিছুটা অগ্রসর হবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি মাত্র ব্যারেজ তৈরী সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হচ্ছে। দামোদর ও বরাকর নদের সঙ্গমস্থলে, দুর্গাপুরে এই ব্যারেজটি তৈরী হবে। এই অঞ্চলের শিল্প উন্নয়নের জন্যে যত শীঘ্র সম্ভব জল ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করাই এর উদ্দেশ্য। দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পাঁচ বছরে প্রায় ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে। পরিকল্পনার তিনটি বিভাগ আছে—(১) বিদ্যুৎ সরবরাহ, (২) বন্যানিয়ন্ত্রণ এবং (৩) সেচ। বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে ২৮ কোটি টাকা লাগবে। কেন্দ্রীয় সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বিহার সরকার সমান ভাগেএই ব্যয় বহন করবেন। বন্যানিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ব্যয় হবে প্রায় ১৪ কোটি টাকা; কেন্দ্রীয় সরকার এতে ৭ কোটি টাকা দিবেন, বাকীটা পশ্চিমবঙ্গ

সরকার দিবেন। সেচ উন্নয়নের জন্যে ১৩ কোটি টাকা লাগবে। এ টাকার অধিকাংশ দিবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সেচ উন্নয়নের ফলে পশ্চিম-বঙ্গের ৯ লক্ষ একর জমি সমৃদ্ধ হবে বলে আশা করা যায়। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সরকার দামোদর ভ্যালি পরিকল্পনা পরিচালনার ব্যয় বহন করবেন। বাস্তুহারাদের সুবিধার জন্যে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনাও গ্রহণ করেছেন। তিনজন বিদেশী বিশেষজ্ঞকে তিন বছরের জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছে। যে সব বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে কনট্রাক্ট দেওয়া হবে, চুক্তি অনুসারে তাঁরা ভারতীয় কলকব্জা বিশেষজ্ঞদের নিযুক্ত করবেন এবং নির্মাণ-কার্যের সকল বিষয়ে তাদের হাতেকলমে শিক্ষাদান করতে হবে।

২। **মহানদী উপত্যকা পরিকল্পনা** (উড়িষ্যা) এই পরিকল্পনা অনুসারে তিনটি বাঁধ নির্মিত হবে। তন্মধ্যে হীরাকুণ্ড বাঁধের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়ে গেছে। গত ১২ই এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী হীরা-কুণ্ড বাঁধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। সড়ক ও রেলপথের যোগাযোগ স্থাপনের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। ভারতের পূর্ত, খনি ও বৈদ্যুতিক শক্তি বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত এন, ভি, গাডগিল নভেম্বর মাসে সম্বলপুরে হীরাকুণ্ডে মহানদীর উপর সেতু নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। মহানদীর উপর এটিই হবে প্রথম সেতু এবং হীরাকুণ্ড বাঁধ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভের প্রথম ধাপ। বাঁধ নির্মাণের পর তার চারদিকে শিল্প এলেকা গড়ে তোলবার জন্যে সেতু নির্মাণ অপরিহার্য। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ও মালমসলা ঠিকমত পাওয়া গেলে ১৯৪৯ সালের জুন মাসের মধ্যেই সেতু নির্মাণ সম্পূর্ণ হবে।

৩। **ভক্রা বাঁধ পরিকল্পনা** (পূর্ব পাঞ্জাব) :— নির্মাণস্থলের সংগে সড়ক ও রেলপথের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং কর্মীদের বাসস্থান নির্মাণ-কার্য প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হচ্ছে এবং নাঙ্গল বাঁধ ও খালের কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

৪। **তুঙ্গভদ্রা বাঁধ পরিকল্পনা** (মাদ্রাজ) : বাঁধের পাকা পাঁচীল এবং ভিতের জন্যে খনন কার্য অনেকদূর এগিয়ে গেছে। হায়দরাবাদের গোলযোগের জন্যে কংক্রিটের কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছিল। খাল খনন ও গাঁথনির কাজ চলছে। রেলস্টেশন, রেল কর্মচারী ও শ্রমিকদের বাসস্থান তৈরীর কাজ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে।

৫। **রিহান্দ বাঁধ পরিকল্পনা** (যুক্তপ্রদেশ) :— পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর হয়েছে। নক্সা প্রস্তুতের ব্যবস্থা হয়েছে। যোগাযোগের জন্যে সড়ক ও ইমারতাদি তৈরী হচ্ছে।

৬। **ময়ুরাক্ষী বাঁধ পরিকল্পনা (পশ্চিম বাংলা)** :—এই বাঁধের নক্সা প্রভৃতি তৈরী হয়েছে। বাঁধ নির্মাণের মাল-মসলা ও যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হচ্ছে। বাঁধ ও খালের জন্যে মাটি কাটার কাজ চলছে।

৭। **ভদ্রা বাঁধ পরিকল্পনা** (মহীশূর) :— অস্থায়ী বাসস্থান ও যোগাযোগের রাস্তা নির্মাণ শেষ হয়েছে। বাঁধের ভিৎ নির্মাণের জন্যে খনন কার্য চলছে।

নিম্নোক্ত পরিকল্পনাগুলো সম্পর্কে ভূ-তাত্বিক অনুসন্ধান, নির্বাচিত স্থানের জরিপ এবং স্থানীয় আবহাওয়া, জল-শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

(১) **কুশী বাঁধ পরিকল্পনা** (নেপাল ও বিহার) (২) **রামপদসাগর বাঁধ পরিকল্পনা** (মাদ্রাজ), (৩) **তাপ্তী উপত্যকা পরিকল্পনা** (বোম্বাই), (৪) **নর্মদা উপত্যকা পরিকল্পনা** (বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশ) (৫) **মহানদী উপত্যকা পরিকল্পনা** (উড়িষ্যা)—টিকরপাড়া, নারাজ বাঁধ প্রভৃতি, (৬) **সবরমতী বাঁধ পরিকল্পনা** (বোম্বাই ও বরোদা) (৭) **ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পরিকল্পনা** (আসাম), (৮) **নায়ার বাঁধ পরিকল্পনা** (যুক্তপ্রদেশ), (৯)

রামগঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা (যুক্তপ্রদেশ), (১০) **বাইনগঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা** (মধ্যপ্রদেশ), (১১) **চম্বল উপত্যকা পরিকল্পনা** (মধ্যভারত, রাজস্থান) (১২) **কৃষ্ণা পেনার পরিকল্পনা** (মাদ্রাজ)।

ভারতের শিল্প উন্নয়নের ব্যবস্থা:—নয়াদিল্লীতে ভারতের শিল্প উন্নয়নের ব্যবস্থার জন্যে ২৪টি কমিটি গঠিত হয়েছিল। তাদের ১০টি কমিটির সুপারিশ দাখিল করা হয়েছে। যন্ত্রপাতি নির্মান ও উন্নয়ন সম্পর্কে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল তাদের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, দুটি বৃহদায়তন যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠা করবার মত যথেষ্ট কলকব্জা সরকারের হাতে এসে গেছে। ভারত এসব কলকব্জা জার্মেনী থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদে পেয়েছে। এসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভারত সরকার রাষ্ট্রপরিচালিত যন্ত্র-নির্মাণ কারখানা স্থাপন করবার কথা বিবেচনা কচ্ছেন। বেসরকারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে সরকারী সাহায্য দানের কথাও বিবেচিত হচ্ছে। সরকারী সাহায্য দানের ব্যবস্থা হওয়ার পূর্বে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমন পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে যাতে এই যন্ত্র-নির্মাণ শিল্প ক্রমশঃ উন্নত হতে পারে। হয়তো এক ধরণের যন্ত্র অনেক তৈরী হলো অথচ অন্য ধরণের যন্ত্র মোটেই তৈরী হলো না—এরূপ অবস্থা যাতে না ঘটে সেজন্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবহিত হতে হবে। তৈরী যন্ত্রপাতি যাতে ক্রমান্বয়ে উন্নতি লাভ করে এবং যাতে সমগ্র দেশে সেগুলোর বিক্রয় ও প্রয়োজন মত মেরামতের ব্যবস্থা হয় সেদিকেও তাঁদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

মোটর ও কলের লাঙ্গল সম্পর্কিত কমিটির আলোচনা থেকে জানা গেছে যে, আর বছর তিনেকের মধ্যেই ভারতে মোটরগাড়ী তৈরী হতে পারবে। কমিটি স্থির করেছেন যে, ভারতে উৎপাদন ও ব্যবহারের জন্যে যাত্রীবাহী গাড়ীর জন্যে ১০ থেকে ১২ এবং বড় গাড়ীর জন্যে ২৮ থেকে ৩০ অশ্বশক্তিই হবে ষ্ট্যাণ্ডার্ড। মোটরগাড়ীর অতিরিক্ত অংশাদি নির্মাণে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে কমিটি বিদেশ থেকে আমদানী অংশের উপর শতকরা ৫০ ভাগ শুল্কের বদলে শতকরা ১০০ ভাগ শুল্ক নির্ধারণের সুপারিশ করেছেন। অন্যান্য অংশের উপর তাঁরা শতকরা ৫০ ভাগ শুল্ক ধরবার সুপারিশ করবেন। দেশে এখন মোটর ও ট্রাকের অংশাদি জোড়া লাগিয়ে পূর্ণরূপ দেওয়ার যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে বলে আগামী তিন বছরের মধ্যে যাতে এরূপ আর কোন যন্ত্রপাতি আমদানী করতে না দেওয়া হয় এবং যাতে এদেশে অংশাদি জোড়া লাগাবার ব্যবস্থা করা হয় সে সম্পর্কেও সরকারকে সুপারিশ করা হবে।

জাহাজ-শিল্প উন্নয়ন কমিটি বিদেশ থেকে দু'তিন জন বিশেষজ্ঞ আনাবার জন্যে সুপারিশ করেছেন। এই বিশেষজ্ঞেরা জাহাজ তৈরীর কারখানার জন্যে নতুন স্থান নির্বাচন করবেন এবং ভিজাগাপট্টম কারখানা বিস্তার করবার সম্ভাবনা ও উপযুক্ততা সম্পর্কে রিপোর্ট দিবেন। সরকার কোন বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে জাহাজের কলকব্জা নির্মাণের জন্যেও আহ্বান করতে পারেন। অবশ্য তাদের সংগে এই সর্ত রাখতে হবে যে, ভারতীয়েরা ওই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবেন এবং পরে সরকার সে প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনতে পারবেন। কলকতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের কারিগরী শিক্ষায়তন সমূহে জাহাজ নির্মাণ সম্পর্কিত শিক্ষার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল ডাঃ জে, সি, ঘোষ এই কমিটির চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ যাতে আগামী পাঁচ বছর ধরে বছরে দেড়লক্ষ টন জাহাজ উৎপাদন করতে পারে সেজন্যে তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন।

বিমানপোত সম্পর্কিত কমিটি ব্যাঙ্গালোর হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফট্ ফ্যাক্টরীকে ছোট ছোট ট্রেলার

বিমানের উপযোগী এঞ্জিন প্রস্তুতের জন্যে উৎসাহ দেবার সুপারিশ করেছেন। জেট চালিত বিমান তৈরীর বিষয়ও বিবেচনা করতে বলা হয়েছে।

কৃত্রিম রেশম-শিল্প কমিটি জানিয়েছেন যে, আর ছয়মাসের মধ্যেই ত্রিবাঙ্কুরের রেওন ফ্যাক্টরীর অধিকাংশ নির্মাণকার্য শেষ হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে যেসব যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হয়েছিল তার শতকরা ৭০ ভাগই এসে গেছে। সেগুলো এখন বসানো হচ্ছে। বোম্বাইয়ের রেওন ফ্যাক্টরীর গৃহাদি নির্মাণ-কার্য শীঘ্রই আরম্ভ হবে এবং কলকাতাও শীঘ্রই এসে পড়বে।

প্লাষ্টিক শিল্প সম্পর্কে জানা গেছে, প্লাষ্টিকসের বিলাস সামগ্রী তৈরী না করে প্রথমে বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, শিল্পোৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, মোটর ও বিমানের অংশ, বোতলের ছিপি ও গার্হস্থ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুতের উপরই গুরুত্ব দেওয়া হবে।

রবার শিল্প সম্পর্কিত কমিটি রবার টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট খোলবার সুপারিশ করেছেন। এই ইনষ্টিটিউট ভারতীয় রবার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিবে এবং তাদের নমুনা পরীক্ষা করে দেখবে।

বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় ভারতের কৃষিকার্য— ভারতীয় কৃষিগবেষণা পরিষদ কৃষিকার্য ও পশুপালন সম্পর্কে বিবিধ গবেষণাকার্য পরিচালনা এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। গত ২০ বছরের চেষ্টার ফলে পরিষদ যেসকল উন্নত ধরণের চাউল, গম ও অন্যান্য শস্যাদি উৎপাদন করেছেন তাতে ভারতীয় কৃষকদের প্রায় ২৯ কোটি টাকা লাভ হয়েছে।

উন্নত ধরণের বীজ বোনার ফলে শতকরা ২৫ ভাগ বেশী ফসল উৎপন্ন হয়। উন্নত ধরণের বীজ থেকে যদি প্রতি একরে একমণ করে শস্য বেশী তৈরী হয় তবে মোট ২৯০ লক্ষ মণ বেশী শস্য উৎপন্ন হয়ে থাকে। বহরমপুর, চুচুঁড়া, হবিগঞ্জ, রায়পুর, নাগিনা, কটক, বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর, কাশ্মীর ত্রিবাঙ্কুর এবং বরোদায় কতকগুলো পরিকল্পনা কার্যকরী করবার জন্যে আর্থিক সাহায্য করে পরিষদ চাউল উৎপাদনের উন্নতির ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন রকমের পরীক্ষার ফলে অনেকরকম নতুন ধরণের চাউল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এগুলো অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গের এবং বিভিন্ন রোগ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক অবস্থায় বর্ধিত হওয়ার উপযোগী। মধ্যপ্রদেশ এবং বেরারের কোন কোন অঞ্চলে নীল এবং লাল রঙের চাউল উৎপন্ন হওয়ার পর থেকে ধানের ক্ষেতে আগাছার আধিক্যের জন্যে যে ক্ষতি হতো তা বন্ধ হয়েছে। এর ফলে একমাত্র ছত্রিশগড় মহকুমাতেই ১০ লক্ষ মণ ধান রক্ষা পাচ্ছে। প্রধান প্রধান চাউলের মধ্যে যে উন্নতি দেখা গেছে তার শতকরা হার—বিহারে ২০ থেকে ২৫, উড়িষ্যায় ৩০ থেকে ৫২, ত্রিবাঙ্কুরে ১৭ থেকে ২০, কাশ্মীরে ৫৫ থেকে ৭০। বাংলা এবং মাদ্রাজেও অনুরূপ উন্নতি হয়েছে। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন প্রদেশে গম, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি শস্যের উৎকর্ষ বিধান ও উৎপাদন বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা হয়েছে। পরিষদের অর্থানুকুল্যে গবেষণা ও পরীক্ষা চালিয়ে বিবিধ প্রদেশে ডাল, আলু, বিভিন্ন রকমের ফল-মূল প্রভৃতির উৎকর্ষ ও উৎপাদন বৃদ্ধির পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে।

কেবল খাদ্যশস্যাদির উন্নয়ন পরিকল্পনাই নয়, পরিষদ বিভিন্ন অঞ্চলে পশুপালন ও কুটীর শিল্পের উপযোগী বিবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপাদনের সহজ উপায় নির্ধারণের জন্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরীক্ষা চালাবার ব্যবস্থা করে অনেক বিষয়ে সাফল্য লাভ করেছেন।

ভ্রম সংশোধন

বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে যাঁরা অর্থ সাহায্য করেছেন, গত সংখ্যার পত্রিকায় তাঁদের নামের তালিকায় কিছু ভুল রয়ে গেছে। শ্রী পি, কে, সেনের স্থলে শ্রী কে, পি, সেন ও শ্রীঅমূল্যলাল জে, চঞ্চলের স্থলে শ্রীঅমৃৎলাল জে, চঞ্চল হবে।

জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সবিনয় নিবেদন,

সমাজের বিজ্ঞান-চেতনা গঠন লক্ষ্যে রাখিয়া সমাজের কল্যাণে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের জন্য প্রায় ছয়মাস হইল 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' স্থাপিত হইয়াছে। পরিষদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য জনগণের 'বৈজ্ঞানিক মানস ও দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করা। এতদুদ্দেশ্যে লোক-বিজ্ঞান গ্রন্থমালা প্রণয়ন করা, লোকপ্রিয় বৈজ্ঞানিক পত্রিকা পরিচালনা করা, লোকরঞ্জনী ছায়া ও আলোক-চিত্র সহকারে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা, স্থায়ী প্রদর্শনী স্থাপনা করা প্রভৃতি বহুবিধ অতীব প্রয়োজনীয় জাতীয় কর্তব্য সমাধান করার পরিকল্পনা পরিষদ গ্রহণ করিয়াছে। অত্যন্ত আনন্দের কথা যে, বাংলার বৈজ্ঞানিক সুধিমণ্ডলীর সাহচর্য ও সাহায্যে পরিষদ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিপুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এযাবৎকাল অর্থাভাবে আমরা 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা ব্যতীত অন্য কোন কাজেই হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই।

লোকশিক্ষায় বিশেষতঃ বিজ্ঞান প্রচারে ফিল্ম ও ল্যাণ্টার্ন ছবি সহকারে বক্তৃতার কার্যকারিতা সর্বজনবিদিত। দেশের এই যুগসন্ধিক্ষণে অনুরূপ উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাব বিশেষভাবেই অনুভূত হইতেছে। পরিষদ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া এই জাতীয় কর্তব্য সত্বর পালন করিতে সমধিক আগ্রহান্বিত হইয়াছে। তজ্জন্য প্রয়োজন মাইক্রোফোন, লাউড-স্পীকার, এপিডায়াস্কোপ ও সবাক-চলচ্চিত্র-প্রদর্শক যন্ত্র। যে সকল শিক্ষামূলক চিত্র পাওয়া যায়, আপাততঃ তাহাই হইবে আমাদের বিষয় বস্তু। কিন্তু ভবিষ্যতে যাহাতে আমাদের দেশের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুগুলির সবাক চিত্র তোলা সম্ভব হয় তাহারই বিশেষ চেষ্টা করা প্রয়োজন। সুতরাং প্রারম্ভেই আমাদের আবশ্যক অন্ততপক্ষে ২০,০০০ টাকা। দেশের এই অতি প্রয়োজনীয় ও আশুসম্পাদ্য কর্তব্য পালন করবার দায়িত্ব সমগ্র দেশবাসীর। তাই আমাদের বিনীত অনুরোধ, দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তি মাত্রই যেন যথাসাধ্য চাঁদা পাঠাইয়া আমাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করিতে সাহায্য করেন। আমরা আশা করি এক মাসের মধ্যেই এই অর্থ আমাদের নিকট পৌছিবে।

স্বাঃ—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

নাম ও ঠিকানাসহ চাঁদা নিম্ন ঠিকানায় ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে—

অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু, সভাপতি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ

৯২, আপার সারকুলার রোড। কলিকাতা

ক্রমিক সংখ্যা

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ্

৯২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা—৯

কর্ম-সচিব সমীপেষু

মান্যবর,

আমি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের আজীবন/সাধারণ সভ্য হইতে ইচ্ছুক। আমি পরিষদের আদর্শে বিশ্বাস করি ও পরিষদের নিয়মাবলী মানিয়া চলিতে সম্মত আছি।

নিবেদক—

স্বাক্ষর

নাম

ঠিকানা

তারিখ

প্রস্তাবক

সমর্থক

তারিখ

তারিখে কার্যকরী সমিতির .... অধিবেশনে

নির্বাচিত হইলেন।

কর্মসচিব

আচার্য জগদীশচন্দ্র

জন্ম—৩০শে নভেম্বর, ১৮৫৮

মৃত্যু—২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭

মাটিশূন্য পরিষ্কার বালিতে টোমাটো গাছটিকে জন্মানো হয়েছে। গাছের শরীর পুষ্টির পক্ষে অপরিহার্য কয়েকটি 'রাসায়নিক পদার্থ কেবল জলে মিশিয়ে নিয়মিত ভাবে বালির মধ্যে দেওয়া হয়েছিল।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

প্রথম বর্ষ নভেম্বর—১৯৪৮ একাদশ সংখ্যা

জমি-উন্নয়ন সম্বন্ধে কিছু নতুন তত্ত্ব

শ্রীনীলরতন ধর

স্বদেশী যুগের জননায়ক মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন বক্তৃতায় প্রায়ই বলিতেন যে, বাঙ্গালী জাতি বাংলা দেশকে ও বাংলা দেশের জমিকে খুব ভালবাসে ও সেইজন্য জমিকে "মা"-টি বলে। কিন্তু আমাদের কৃষকেরা জমির উন্নতির জন্য যত পরিশ্রম করে, তাহা অপেক্ষা চীন দেশের কৃষকেরা অনেক বেশী পরিশ্রম করিয়া থাকে এবং সেই জন্য তাহারা ক্ষেত্র হইতে অনেক বেশী শস্য উৎপাদন করে। চীনের কৃষিতে উৎপাদিত সব পদার্থই সাররূপে ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। অনেকেই জানেন যে, চীনদেশবাসীরা এমন অনেক জিনিস খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে যাহা ভারতবর্ষে খাদ্যরূপে চলে না। যাহা কিছু খাওয়া যায় না, চীনবাসীরা তাহা ক্ষেত্রে জমি উর্বর করিতে ব্যবহার করিয়া থাকে। যত আমিষ ও নিরামিষ দ্রব্য, জৈব ও অজৈব পদার্থ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। কোনো জিনিষই তাহারা অপচয় করে না। সাংহাই সহরে মল-মূত্র বেশ মূল্যে বিক্রয় হয় এবং তাহা চীনা-কৃষকরা শস্য উৎপাদনে ব্যবহারও করে। নাইট্রোজেন-সংযুক্ত কোনো পদার্থ বা কোনো জৈব পদার্থ, ঘাস, পাতা, খড় ইত্যাদি তাহারা সাররূপে ব্যবহার করিতে ছাড়ে না। চীনে বন্যা আসিলে নদীগুলি যখন দুই দিক প্লাবিত করিয়া প্রবাহিত হয়, সেই সময় দুই কিনারায় পলিমাটি ধীরে ধীরে জমিতে থাকে। এই পলিমাটি সার হিসাবে খুব উপকারী এবং চীনের কৃষকেরা জৈব পদার্থের সহিত মিশাইয়া সাররূপে ব্যবহার করিয়া থাকে এবং ক্ষেত্র হইতে বহু ফসল উৎপাদন করে।

সাধারণতঃ বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন জড়রূপে বিরাজ করিলেও, যৌগিক অবস্থায়—যুদ্ধের সময় বিস্ফোরক পদার্থের উৎস হিসাবে এবং শান্তির সময় সার হিসাবে—ইহা অতি প্রয়োজনীয়।

তুলনামূলক বিচার করিলে দেখা যায় যে, যেখানে বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশে একর প্রতি ২৫ হইতে ২৬ মণ গম জন্মে, সেখানে ভারতবর্ষে প্রতি একরে হয় মাত্র ৮ হইতে ১০ মণ। ভারতীয় জমির নাইট্রোজেন ন্যূনতা ও সারাভাবই এই উৎপাদনাল্পতার প্রধান কারণ। আবার, অন্যান্য ইক্ষু-উৎপাদক দেশনিচয়ের তুলনায় ভারতের জমিতে ইক্ষু যে কম জন্মে, তাহার কারণও ইহা। এই

জন্যই প্রত্যেক সভ্য জাতির নাইট্রোজেন সন্নিবদ্ধ করিবার নিজ নিজ শিল্প আছে। বস্তুতঃপক্ষে, যৌগিক নাইট্রোজেন উৎপাদন ক্ষমতাকে সভ্যতার মাপকাঠি রূপেও ধরিয়া লওয়া যায়। কয়লা বা লৌহ-শিল্পের ন্যায় নাইট্রোজেন-শিল্পও আজকাল একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বিষয়ে জার্মানীর স্থান শীর্ষে, ইহার পরেই জাপানের। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষের এইরূপ কোনো শিল্প নাই (১ম পঞ্জী দ্রষ্টব্য)। অবশ্য সম্প্রতি ত্রিবাংকুর রাজ্যে একটি নাইট্রোজেন সন্নিবদ্ধ করিবার কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। ইহা বৎসরে ৫০০০০ টন নাইট্রোজেন সংরক্ষণ করিতে পারে।

১নং পঞ্জী (১৯৩৭ সনের হিসাব)

দেশ	কারখানার সংখ্যা	নাইট্রোজেনের পরিমাণ
জার্মানী	১৩	১৩,৬৫,৮৫০ টন
জাপান	২১	৪,৯০,১৩২ ”
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	১৬	২,৯২,৫১০ ”
ফ্রান্স	২৭	২,৪৪,০৫০ ”
ইংলণ্ড	২	২,৩২,৮৭০ ”
বেলজিয়াম	১০	২,১৭,৯৮০ ”
রুশিয়া	৪	১,৫৭,৫০০ ”
ইটালী	১৮	১,৪৬,৮৩০ ”
হল্যাণ্ড	৩	১,৩৬,৬৩০ ”
নরওয়ে	৪	১,২১,০০০ ”
কানাডা	৩	১,০২,০০০ ”
মাঞ্চুরিয়া	১	৪০,০০০ ”
সুইডেন	৩	১৪,০০০ ”
সুইজারল্যাণ্ড	৩	১৩,২০০ ”
স্পেন	২	৮,০০০ ”
চীন	২	৭,১৭৫ ”
দক্ষিণ আফ্রিকা	১	৫,৭৪০ ”
হাংগেরী	১	৫,৭৪০ ”
	মোট	৩৫,৪৭,৩৫২ টন

একটি ভালো ফসলের জন্য জমিতে প্রতি একরে ২৫ হইতে ৪০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন আবশ্যক। কারণ ঠিক এই পরিমাণ নাইট্রোজেনই শস্য ও তৃণে বর্তমান। কিন্তু বিদেশের সভ্য দেশগুলিতেও যে পরিমাণ নাইট্রোজেন জমিতে প্রয়োজন, তাহার চাইতে অনেক কম পরিমাণ সার ব্যবহার করা হয়।

২নং পঞ্জী

দেশ	প্রতি একরে পাউণ্ড হিসাবে সার ব্যবহারের পরিমাণ
হল্যাণ্ড	২৪.৭৯
বেলজিয়াম	২৮.৫৫
জার্মানী	১৫.৬৫
ডেনমার্ক	১০.২৬
নরওয়ে	৫.৯৮
সুইডেন	৫.২৪
ফ্রান্স	৪.০
ইটালী	৪.২৯
গ্রেট ব্রিটেন	২.৪৯
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	১.৩৬
পোল্যাণ্ড	০.৭৩
হাংগেরী	০.১৫

ভারতবর্ষে কোনো প্রকার কৃত্রিম সার ব্যবহার না করা সত্তেও প্রতি বৎসর পরিমিত পরিমাণে শস্য ফলিয়া থাকে। এখন দেখা যাক্, জমি কি প্রকারে এই নাইট্রোজেনের অভাব পূরণ করে।

চালনী কাগজ বা ফিল্টার পেপার, পাতা, তৃণ প্রভৃতি সেলুলোজ জাতীয় জিনিষ যদি জমির সহিত মিশাইয়া তাহা সূর্যের আলোকে অবারিত রাখা যায়, অথবা উহাকে যদি অন্ধকার বা বিচ্ছুরিত আলোকে ফেলিয়া রাখা হয় তাহা হইলে নাইট্রোজেন সন্নিবদ্ধ হয়। আবার সেলুলোজ জাতীয় জিনিষের সহিত যদি অল্প একটু পরিমাণ গুড় মিশানো যায় তাহা হইলে দহন ক্রিয়া বা অক্সিডেশন অধিকতর সহজে নিষ্পন্ন হয়; বায়ু হইতে নাইট্রোজেনও ইহাতে সহজে সন্নিবদ্ধ হয়। অন্ধকার

বা বিচ্ছুরিত আলো হইতে সূর্যের আলোকে বেশী নাইট্রোজেন সন্নিবদ্ধ হয়। গোময় ব্যবহারেও অনুরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। এই সিদ্ধান্তগুলি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ইহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সেলুলোজ জাতীয় বস্তু, গাছের জঞ্জাল, পাতা, গোবর ইত্যাদি কেবল যে জমির উদ্ভিজ্জ সার বৃদ্ধি ও উহার উর্বরতা বা জলধারণ ক্ষমতারই উন্নতি সাধন করে, তাহা নহে, পরন্তু ইহারা নাইট্রোজেন সন্নিবদ্ধ করিবার ক্ষমতাদ্বারা জমিরক্ষণ ও উর্বরতা ব্যাপারেও সহায়তা করে। এই জন্যই দেখা গিয়াছে যে, যে গোময় সাররূপে ব্যবহৃত হয়, উহা কেবল নিজের নাইট্রোজেনই জমিতে সরবরাহ করে না, বায়ুতে যে নাইট্রোজেন আছে, সন্নিবদ্ধ করবার শক্তিদ্বারা তাহাও ইহার সহিত যুক্ত করে। আমরা যতগুলি পরীক্ষা করিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটিতেই দেখিয়াছি যে, সময়ের সংগে সংগে দহনক্রিয়ার জন্য অংগারের পরিমাণও হ্রাস পাইয়াছে। গোময় ব্যবহার করিবার দুই মাসের মধ্যে ক্ষেত্রে অংগার ও নাইট্রোজেনের অনুপাত স্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মুটারলিন ১৯১৩ সালে যে গণনা করিয়াছেন তাহাতে জানা যায় যে, জার্মানীতে প্রতি একর জমি বৎসরে ২০০ সের সেলুলোজ সার হিসাবে পায়। মনে হয়, মাটিতে যে বহুল পরিমাণ সেলুলোজ জাতীয় জিনিষ দেওয়া হয়, তাহার কিছুটা হয়ত নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ায় নাইট্রোজেন সংরক্ষণ কার্যে ব্যবহৃত হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাপাধিক্য, সূর্যালোকের প্রখরতা এবং অ্যাজোটোব্যাক্টারের অধিকতর সক্রিয়তার ফলে দ্রবণীয় শ্বেতসার পেণ্টোসান এবং সেলুলোজ জাতীয় বস্তুর দহনক্রিয়া অতি সত্বর সম্পন্ন হয় এবং ফলে প্রভূত পরিমাণ শক্তিরও সৃষ্টি হয়, যাহা পরে নাইট্রোজেন সন্নিবদ্ধ করিবার কাজে লাগে। এই কারণেই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জমিতে গুড় ও সেলুলোজ জাতীয় জিনিষ দ্বারা সার দেওয়ার যুক্তি অতীব কার্যকরী। আমাদের অভিমত এই যে যদি শ্বেতসার, পেণ্টোসান ও সেলুলোজ জাতীয় জিনিষ দ্বারা নাইট্রোজেন সন্নিবদ্ধ হইয়া নাইট্রোজেনের ঘাটতি পূরণ না হইত, তাহা হইলে বহু পূর্বেই ভারতীয় জমি নাইট্রোজেন শূন্য হইয়া যাইত। অধিকন্তু আমরা গবেষণা করিয়া জানিয়াছি যে, বৃষ্টির জল হইতে ব্যবহার্য নাইট্রোজেন নাতিশীতোষ্ণ দেশের জমির চাইতে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জমিই অধিক পায়।

রাসেল দেখাইয়াছেন যে, একটি তৃণভূমির নাইট্রোজেন ১৮৫৬ সালে শতকরা ·১৫২ হইতে বাড়িয়া ১৯১২ সনে শতকরা ·৩৩৮ দাঁড়াইয়াছিল। অনুরূপভাবে আরেকটি জমি পুরোপুরি ২৪ বৎসর উদ্ভিদাচ্ছাদিত থাকিবার পর দেখা যায় যে, উহার নাইট্রোজেন শতকরা ·১০৮ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ·১৪৫ হইয়াছে। প্রতীয়মান হয় যে, অংগার ও সেলুলোজ জাতীয় জিনিষ দগ্ধ হইয়া যে শক্তির উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহার ফলে বায়ুমণ্ডলের যে নাইট্রোজেন সন্নিবদ্ধ হইয়াছিল—উহাই জমির এই নাইট্রোজেন বৃদ্ধির জন্য প্রধানতঃ দায়ী।

ফসল তোলার পর মাঠে পড়িয়া থাকে বীজ ও উহার সহিত শিকড়ের কিছুটা। জমিতে ইহাদের চষা হয়; ফলে, উহারা দগ্ধ হইয়া শক্তির উৎপত্তি করে এবং সেই শক্তি নাইট্রোজেন সন্নিবদ্ধ করে। ভারতবর্ষের জমি যে কেন অন্তঃসারশূন্য হয় না, তাহার কারণই হইল যে, শস্য তোলা হইবার পর যে জঞ্জাল পড়িয়া থাকে, উহার মধ্যেকার সেলুলোজ জাতীয় বস্তু, পেণ্টোসান ও শ্বেতসার, নাইট্রোজেন সন্নিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা রাখে। জমির তাপশূন্যতা ও সূর্যালোকাভাবের জন্য শীতপ্রধান দেশে অ্যাজোটোব্যাক্টার কিছুটা নিষ্ক্রিয় থাকে। প্রধানতঃ এই কারণেই মাটিতে বৃক্ষ-জঞ্জালের সহিত যে সেলুলোজ ও শক্তি উৎপাদক জাতীয় বস্তু দেওয়া হয়, তাহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মত অত সহজে দগ্ধ হইতে পারে না বলিয়া শীতপ্রধান দেশের জমিতে প্রভূত পরিমাণে নাইট্রোজেন সন্নিবদ্ধ হওয়া সম্ভবপর হয়

না। রথামষ্টেডের সারবিহীন ক্ষেত্রগুলির ধীরে-ধীরে অপকৃষ্ট হইবার কারণের ব্যাখ্যাও এইখানে পাওয়া যায়। নিম্নে তাহা আলোচিত হইল।

একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর সার দেওয়া হয় নাই, রথামষ্টেডের এরূপ কয়েকটি জমিতে যে পরিমাণ গম উৎপন্ন হইয়াছিল, ডাঃ জে, এ, ভোলকার তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

একর প্রতি সের পরিমাণ শস্যোৎপাদন

আট বৎসর (১৮৪৪-৫১) ···· ·····৫১০
কুড়ি বৎসর (১৮৫২-৭১)··········৩৩৭
কুড়ি বৎসর (১৮৭২-৯১)·········· ৩৩৩

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, জমিতে উদ্বৃত্ত উদ্ভিজ্জ-জঞ্জালে যে শক্তি উৎপাদক বস্তু থাকে, তাহার দহনক্রিয়ার ফলে নাইট্রোজেন সন্নিবদ্ধ হয় বলিয়া প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে ফসল জন্মানো অসম্ভব নহে।

স্কোডার গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন, পৃথিবীতে প্রতি বৎসর মোটামুটি প্রায় ৩৫ লক্ষ কোটি সের সেলুলোজ যুক্ত হয়। আমরা সেলুলোজ জাতীয় বস্তু দ্বারা নাইট্রোজেন সন্নিবদ্ধ করা সম্বন্ধে যে গবেষণা চালাইয়াছি, তাহাতে দেখিয়াছি যে, চালুনী কাগজ হইতে দাহক্রিয়াদ্বারা উদ্ভূত প্রতি একগ্রাম অংগার—আলোকে, ১৮ মিলিগ্রাম ও অন্ধকারে, ৯ মিলিগ্রাম নাইট্রোজেন সন্নিবদ্ধ করে। অনুরূপ অবস্থায় গোময়, আলো ও আঁধারে যথাক্রমে ৩৩ ও ১৪ মিলিগ্রাম নাইট্রোজেন সন্নিবদ্ধ করে।

প্রতি একগ্রাম দগ্ধ অংগার ১০ মিলিগ্রাম নাইট্রোজেন সন্নিবদ্ধ করে—এই হিসাব মতেও যে ৩৫ লক্ষ কোটি সের সেলুলোজ জমিতে দেওয়া হয়, তাহা হইতে, সন্নিবদ্ধ প্রণালী দ্বারাই প্রায় ১৩,০০০,০০০ মেট্রিক টন নাইট্রোজেন পৃথিবীর সহিত যুক্ত হয়। কৃত্রিম উপায়ে পৃথিবীতে নাইট্রোজেন সন্নিবদ্ধ করিবার মোট পরিমাণ হইল ৩,৫৪৭,৩৫২ টন।

আমাদের গবেষণা হইতে আমরা ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, মোট ১৩,০০০,০০০ মেট্রিক টনের মধ্যে শতকরা অন্ততঃ ৫০ ভাগ, অর্থাৎ ৬,৫০০,০০০ মেট্রিক টন নাইট্রোজেন সূর্যালোকের সহিযোগে জমিতে সন্নিবদ্ধ হয়। কাজেকাজেই দেখা যাইতেছে যে, শিল্প প্রণালীদ্বারা যে পরিমাণ নাইট্রোজেন সংরক্ষিত হইতেছে, তাহা হইতে অনেক বেশী নাইট্রোজেন প্রকৃতি দেবী সংরক্ষণ করিতেছেন আলোক শোষণ দ্বারা। সুতরাং প্রকৃতির নিয়মে দেখা যাইতেছে যে, উদ্ভিদের ফটোসিন্থেসিসের পরেই আলোক ও নাইট্রোজেন সন্নিবদ্ধ করিয়া জীব-জগতের প্রভূত মংগল সাধন করিয়াছে, এবং ইহার মূল্য বাস্তবিকই খুব বেশী।

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এমোনিয়াম সালফেটের সহিত যদি গোবর, পাতা, গুড়, খইল বা যে কোনো অংগারযুক্ত বস্তু মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে বিশেষতঃ গ্রীষ্ম প্রধান দেশে সার হিসাবে ইহার মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পায়। ক্ষেত্রে যে সমুদয় নাইট্রোজেনযুক্ত বস্তু থাকে, উহার দগ্ধ বা অধিকতর নাইট্রোজেন মিশ্রিত হইবার ব্যাপারে স্নেহদ্রব্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এই কারণেই খইল, যাহার মধ্যে স্নেহ ও নাইট্রোজেন পদার্থ থাকে, নাইট্রোজেনযুক্ত সার হিসাবে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বেশ কার্যকরী। খামার বা ক্ষেত্রের সারের আভ্যন্তরিক অংগার জাতীয় দ্রব্য জমির নাইট্রোজেন-ধারক বস্তুর অধিকতর নাইট্রোজেন গ্রহণে বাধা দেয় এবং নাইট্রোজেন-হানিও হ্রাস করে। এই কারণে কেবলমাত্র এমোনিয়াম সালফেটের চাইতেও খামার বা ক্ষেত্রের সার অধিকতর শস্যোৎপাদন করে। বস্তুতঃপক্ষে যদি এমোনিয়াম সালফেটের বদলে খামারের সার জমিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে জমিতে অধিকতর নাইট্রোজেন সংরক্ষিত ও সন্নিবদ্ধ হয়। রথামষ্টেডের ক্ষেত্রের নিম্নের ফলাফল হইতেই ইহা প্রতীয়মান হইবে :—

শতকরা মোট নাইট্রোজেন

১। ১৮৪৩ সন হইতে কোনো সার
পায় নাই ০·০৯৫

শতকরা মোট নাইট্রোজেন

২। ১৮৫২ সন হইতে খামারের সার দেওয়া হইয়াছে ০'২৫৬

৩। পুরাপুরি কৃত্রিম সার + এমোনিয়াম সালফেট দেওয়া হইয়াছে ০'০৯৯

৪। পুরাপুরি কৃত্রিম বস্তু + খামারের সার দেওয়া হইয়াছে ০'২৫৩

৫। পটাস এবং ফসফেট (কিন্তু নাইট্রোজেন নহে) দেওয়া হইয়াছে ০'০৯০

অবশ্য ইহাও সত্য যে, জমিতে যে প্রোটিন থাকে, তাহা গুড় বা অংগার জাতীয় দ্রব্য যোগ করার ফলে অতি অল্প পরিমাণ দগ্ধ হইলে জমি শস্যোৎপাদনের পক্ষে উপযোগী হইবে না। কাজে-কাজেই জমির উর্বরতা রক্ষা করিতে হইলে জমির দগ্ধ ও অদগ্ধ প্রোটিন এবং এমোনিয়াম ও নাইট্রোজেন জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে একটি ভারসাম্য আনয়ন করা বিশেষ আবশ্যক। নাইট্রোজেন ও এমোনিয়াম জাতীয় বস্তুর অত্যধিক পরিমাণ দহনক্রিয়ার ফলে প্রভূত নাইট্রোজেন হানি হইতে পারে, আবার অতি অল্প দহনক্রিয়ার ফলে জমি ভালো ফসলের পক্ষে তেমন উর্বর হইবে না। এই জন্যই গুড় বা সেলুলোজ জাতীয় বস্তু বা অন্যান্য অংগারযুক্ত দ্রব্য খুব অধিক পরিমাণে দেওয়া উচিত নহে এবং এইগুলি দিবার পর দহনক্রিয়ার সহায়তা করিবার জন্য জমিকে চষা উচিত। অধিকন্তু গুড় এবং সেলুলোজ জাতীয় বস্তু জমির মোট নাইট্রোজেন ও এমোনিয়া বৃদ্ধিপূর্বক নাইট্রোজেন সন্নিবদ্ধ করিতেও সহায়তা করে। যদি উপরোল্লিখিত দ্রব্যগুলি বেশী পরিমাণে দেওয়া যায়, তাহা হইলে সময়ও বেশী দেওয়া আবশ্যক।

উপরোক্ত ফলাফল হইতে আমরা ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, জমিতে নাইট্রোজেনযুক্ত সারের কার্যকারিতা বহুল পরিমাণে নির্ভর করে জমিতে কতকখানি জৈব পদার্থ বা গোময় আছে তাহার উপর। যদি উহা কম থাকে, তবে নাইট্রোজেনও কম হয়। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক গবেষণাগারে কৃত পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে যে, জমিতে জৈব পদার্থ দেওয়া হইলে উহা কেবল জমির বুনটের উন্নতি এবং ইহার জলধারণ-ক্ষমতা বৃদ্ধিই করে না, বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন সন্নিবদ্ধ করিয়া ইহা জমির এমোনিয়া সহ মোট নাইট্রোজেনও বৃদ্ধি করে। জৈব পদার্থের দহনক্রিয়ার ফলে যে শক্তির উদ্ভব হয়, তাহা বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন সংবদ্ধ করে। এই ব্যাপারেও শক্তির প্রয়োজন। দেখা গিয়াছে, সূর্যালোক বা কৃত্রিম আলোকে নাইট্রোজেন বেশী সন্নিবদ্ধ হয়। এইজন্য জমিতে বেশ পরিমাণ জৈব পদার্থ থাকিলে সাধারণ অবস্থাতেও নাইট্রোজেন সংরক্ষিত হয়। জমিতে বেশ ভালো পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকিবার কারণ ইহা। অধিকাংশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই দেখা যায় যে, সার না দিলেও বেশ নির্ভরযোগ্য ফসল ফলিয়াছে। প্রাচ্যের ব্যক্তিদের নিকট ইহা জটিল মনে হইলেও, এলাহাবাদের গবেষণা হইতে জানা যায় যে, জমিতে বৃক্ষ-পত্র, তৃণ, জঞ্জাল ইত্যাদি সেলুলোজ জাতীয় জিনিষ দিলে উহা দগ্ধ হইয়া সূর্যালোকের সহায়তায় নাইট্রোজেন সংরক্ষণ করে। উষ্ণাঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন নাইট্রোজেন সরবরাহের ইহাই প্রধান কারণ।

দুর্ভাগ্যবশতঃ নাইট্রোজেন অতি প্রতারণাত্মক বস্তু। জমির অবস্থা দহনক্রিয়াযোগ্য হইলেই ইহা বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন, গ্যাসরূপে বিলীন হইয়া যায়। এইজন্য সংযুক্ত নাইট্রোজেন অধিক দিন জমিতে থাকিতে পারে না। এই ব্যাপারটি পৃথিবীর বহুস্থানে দৃষ্ট হইয়াছে এবং অনেকেই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন। নিম্নে ইহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইল।

যখনই কোনো জৈব বা এমোনিয়া জাতীয় নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থ জমিতে দেওয়া হয় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা দহনক্রিয়ার উপযোগী হয়, যেমন চাষ করিবার পর, তখন নাইট্রোজেনযুক্ত পদার্থগুলি দগ্ধ হইয়া ক্রমে-ক্রমে এমোনিয়া,

নাইট্রাইট ও সর্বশেষে নাইট্রেট প্রস্তুত করে। এই কার্যের মধ্যবর্তী অবস্থায় এমোনিয়াম নাইট্রাইটের উদ্ভবের যথেষ্ট সম্ভাবনা বর্তমান। সকলেরই জানা আছে, এমোনিয়াম নাইট্রাইট ভাংগিয়া নাইট্রোজেন ও জল প্রস্তুত হয়। তাপ বৃদ্ধি পাইলে অথবা সূর্যালোকে অবারিত রাখিলে কিংবা জমির অম্লতা বৃদ্ধি পাইলে এই পরিবর্তন সহজসাধ্য হয়। সাধারণ জমিতে এই প্রক্রিয়াগুলি ঘটে বলিয়াই অধিক পরিমাণে জৈব নাইট্রোজেনযুক্ত বা এমোনিয়া জাতীয় পদার্থ জমিতে দিলে দেখা গিয়াছে, বহু নাইট্রোজেন, গ্যাসরূপে বিনষ্ট হইয়া হইয়া গিয়াছে। সব দেশের জমিতেই এইরূপ ঘটে। সেলুলোজ, স্নেহ প্রভৃতি জৈব পদার্থ নাইট্রোজেনযুক্ত বস্তুর দহনক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে বলিয়া এই সকল জিনিষ জমিতে দিলে এই অপচয় কমানো যাইতে পারে।

কাজেকাজেই নাইট্রোজেন গ্যাসরূপে নাইট্রোজেনযুক্ত সারের অপব্যয় বন্ধ করিতে জমিতে শ্বেতসার, স্নেহ, সেলুলোজ ইত্যাদি জৈব পদার্থের উপস্থিতি বা যোগান বিশেষ প্রয়োজন। এই কথাগুলি সব জমি সম্বন্ধেই খাটে। আমরা দেখিয়াছি যে, শ্বেতসার, সেলুলোজ ও স্নেহপদার্থ প্রভৃতি—জৈব নাইট্রোজেনযুক্ত দ্রব্য এবং এমোনিয়াম সালফেট ও অন্যান্য এমোনিয়া জাতীয় বস্তুর নাইট্রোজেন অপচয় বন্ধ করে। সুতরাং জৈব পদার্থের কার্যকারিতা হইল এই যে, উহা নাইট্রোজেন সংরক্ষণে সহায়তা করে এবং অস্থায়ী এমোনিয়াম নাইট্রাইটের উৎপাদন ও বিঘটনে যে নাইট্রোজেন অপচিত হয়, তাহা বন্ধ করিয়া জমি-রক্ষণ করে। শ্বেতসার ও স্নেহপদার্থ উভয়েই জীবদেহে প্রোটিন সংরক্ষণ করে। তেমনি আমরা দেখিয়াছি যে, সেলুলোজ সহ এই দ্রব্যগুলি জমির নাইট্রোজেনও সংরক্ষণ করে। এই কারণে, নাইট্রোজেনের অপচয় বন্ধ করিতে হইলে সকল জমিতে জৈব পদার্থের যোগান দেওয়া বিশেষ কর্তব্য। এই জন্যই কেবলমাত্র এমোনিয়াযুক্ত পদার্থের চাইতে জৈব ও এমোনিয়াযুক্ত পদাথের সংমিশ্রণ সার হিসাবে অধিক কার্যকরী। জৈব পদার্থ নিশ্চিতরূপে নাইট্রোজেন সংরক্ষণ ও সন্নিবদ্ধ করিয়া থাকে। এইজন্যই জমির উপর ইহার মূল্য এত বেশী।

"বস্তুতঃ একজামিন পাশ করিবার নিমিত্ত (আমাদের দেশের ছাত্র ছাত্রীদের) এরূপ হাস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ করিয়া সরস্বতীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ—শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তি আর কোন দেশেই নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া আত্মাদরে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞান-চর্চার কাল আরম্ভ হয়; কারণ সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে। তাঁহারা একথা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞান-সমুদ্র মন্থনের প্রশস্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি। অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি দৃষ্টিগোচর না করিয়াই ক্ষুন্নমনে প্রত্যাবর্তন করি"

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

আচার্য জগদীশচন্দ্র

শ্রীহৃষীকেশ রায়

মানব সভ্যতার আদিমকাল হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত যে-সকল মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের ব্রত ছিল জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক, তাঁহাদের লক্ষ্য নব নব তত্ত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করিয়া আমাদের জীবনধারণ প্রণালী আরও সরল ও আরামপ্রদ করা। আমাদের এই বাংলায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারোন্মোচন করেন আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র।

জগদীশচন্দ্রের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় ধীবর ও কৃষক পুত্রগণের সহপাঠীরূপে তাঁহার পিতা ভগবানচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালায়। এই পাঠশালার প্রভাব তাঁহার উত্তর জীবনে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইংরাজী বিদ্যালয়ের পরিবর্তে পুত্রকে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্তি করার সম্বন্ধে তাঁহার পিতা ভগবানচন্দ্রের ধারণা ছিল যে, মাতৃভাষার দ্বারা যে শিক্ষার সূত্রপাত তাহা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া অচিরে সুসম্পন্ন হয়। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পুত্র জগদীশচন্দ্র বৃথা আত্মমর্যাদার গর্বে গর্বিত না হইয়া সাধারণভাবে সহপাঠীগণের সহিত মিশিতেন। ফলে তিনি দেশকে চিনিয়া ভবিষ্যতে সুগভীর দেশাত্মবোধের পরিচয় দিলেন এবং প্রকৃতিকে চিনিয়া প্রকৃতির প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিলেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর আচার্য জগদীশচন্দ্র ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাঢ়িখালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ভগবানচন্দ্র যখন ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সে-সময় অতি অল্প বয়সেই পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষার আরম্ভ। পাঠশালার শিক্ষা ব্যতীত তিনি তৎকালীন যাত্রা অভিনয়ের সাহায্যে রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হন। ভগবানচন্দ্র বর্ধমানের সহকারী কমিশনাররূপে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বদলী হইলে, জগদীশচন্দ্র কলিকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন; কিন্তু তিন মাস পরে তিনি সেণ্টজেভিয়ার্স স্কুলে চলিয়া আসেন এবং এইখানেই তাঁহার ইংরাজী ও বিজ্ঞান শিক্ষা আরম্ভ হয়। এই অল্প বয়সেই খেলাধূলায় ও লেখাপড়ায় তাঁহার বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। কলিকাতা সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় তাঁহার সামান্য অসুবিধা হইয়াছিল। স্কুলের ফিরিঙ্গী বালকেরাও তাঁহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিত। একদিন তিনি তাঁহাদের এ অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া দলপতিকে কৌশলে এমন প্রহার দিলেন যে, ভবিষ্যতে কেহ তাঁহাকে আর কিছু বলিতে সাহস করিত না।

পশুপক্ষীর প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। কলিকাতায় যে ছাত্রাবাসে তিনি থাকিতেন, তাহারই একপার্শ্বে তাঁহার ছোট বাগান এবং পায়রা, খরগোস ও ভেড়া প্রভৃতি থাকিবার ঘর ছিল। খেলাধূলার মধ্য দিয়াই ঐ বাগানে নল বসাইয়া গাছে জল দিবার বন্দোবস্ত করেন এবং ঐ বাগানের মধ্যে কৃত্রিম একটি ছোট নদী ও তাহার উপর সেতুর ব্যবস্থা করেন। পরবর্তী কালে তাঁহার দার্জিলিং ও কলিকাতার বাড়ীতে এই খেলার পরিণতি দেখা যায়। বর্ধমান যাইবার সময় তিনি এই সকল প্রিয় সহচরগুলিকে সেখানে লইয়া যাইতে ভুলিতেন না। বর্ধমানে তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত একটি ঢালাইয়ের কারখানায় তিনি এক সময়ে যে পিতলের কামানটি তৈয়ারী করান তাহাও খুব প্রিয় ছিল।

ষোড়শ বৎসর বয়সে জগদীশচন্দ্র সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে প্রবেশ করেন। কলেজের অধ্যাপক ফাদার লাফোঁর অধ্যবসায়, গবেষণার ধারা ও আদর্শ তাঁহার ভবিষ্যত জীবন গঠনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং পদার্থবিদ্যার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। কিন্তু জগদীশচন্দ্রের ইচ্ছা বিলাত গিয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট হন আর পিতা ভগবানচন্দ্র চাহেন পুত্র বড় বৈজ্ঞানিক বা বড় পণ্ডিত হন। তাঁহার শিক্ষা, "অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার অপেক্ষা নিজের জীবন শাসন বহুগুণে শ্রেয়স্কর।" ফলে জগদীশচন্দ্রকে আপাততঃ বিলাত যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হয়। পরে তাঁহার মাতার চেষ্টায় ডাক্তারী পড়ার প্রতিশ্রুতিতে পিতার নিকট বিলাত যাওয়ার অনুমতি পাইলেন। এই সময়ে আসামের এক জমিদার বন্ধুর নিমন্ত্রণে সেখানে শিকার করিতে যান ও জ্বর লইয়া ফিরিয়া আসেন; সেজন্য উপাধি পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাইতে পারেন নাই। অতঃপর অসুস্থ শরীরেই তাঁহাকে বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। অনেকের মতে তাঁহার এই জ্বর আসামের কালাজ্বর।

চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে জগদীশচন্দ্র বিলাত যাত্রা করিলেন। পথে সমুদ্রযাত্রার সময় তাঁহাকে জ্বরের জন্য অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রথম বৎসরে জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ করিলেন; কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষে শারীরবিদ্যা পাঠের সময় পুনরায় তিনি জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহার চিকিৎসক ডাক্তার রিঙ্গারের পরামর্শক্রমে তিনি চিকিৎসা-বিদ্যার পরিবর্তে কেম্ব্রিজে আসিয়া বিজ্ঞান পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। এইরূপে তাঁহার অজ্ঞাত-সারে তাঁহার ভবিষ্যত জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হইল। কেম্ব্রিজ হইতে তিনি ন্যাচারেল সায়েন্সে ট্রিপস লাভ করেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এস-সি উপাধি পান (১৮৮৪)। বিলাতে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চারি বৎসর পরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

কর্মজীবনে বহু ঝঞ্ঝা বিঘ্নের সম্মুখীন হইয়াও নিজ অধ্যবসায়ে ও প্রতিভাবলে জগদীশচন্দ্র অশেষ সাফল্য অর্জন করেন। তাঁহার বিলাতের বন্ধু অধ্যাপক ফসেট তদানীন্তন বড়লাট লর্ড রিপনের (১৮৮০-১৮৮৪) নিকট যে পরিচয় পত্র দেন তাহার ফলে তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থবিদ্যার অস্থায়ী অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন (১৮৮৫)। এখানে অধ্যক্ষ সি, এইচ, টনি এই নিয়োগ ব্যাপারে আপত্তি করায় তাঁহাকে যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হয়। কারণ তখন শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল যে, বাঙ্গালী দর্শনশাস্ত্র ও সাহিত্যের অধ্যাপনায় পারদর্শী হইলেও বিজ্ঞানে তাঁহাদের সে উৎকর্ষের একান্ত অভাব। ইহা ব্যতীত ভারতবাসীকে শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদ দান করাই তাঁহাদের নীতি বিরুদ্ধ ছিল। আবার ইউরোপীয় ও ভারতীয় সমপর্যায়ের অধ্যাপকগণের মধ্যে বেতনের যথেষ্ট তারতম্য বিদ্যমান ছিল। তেজস্বী জগদীশচন্দ্র এই অন্যায় বৈষম্য দূর করিতে অশেষ ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করিয়া অবশেষে কৃতকার্য হন। তাঁহার অধ্যাপনার গুণে ছাত্রগণ এরূপভাবে আকৃষ্ট হইত যে, নানা যান্ত্রিক পরীক্ষা সহযোগে তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য তাহারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিত। তখন অধ্যক্ষ টনি এবং শিক্ষা বিভাগের কর্তা সার আলফ্রেড ক্রফট্ তাঁহাদের মত পরিবর্তন করিয়া জগদীশচন্দ্রের বন্ধু হইলেন এবং তাঁহাকে স্থায়ীভাবে শিক্ষা বিভাগে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

বাঙ্গালী যে মৌলিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় জগতে কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে হীন নয়, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন নীরবকর্মী আচার্য জগদীশচন্দ্র পদার্থবিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যার গবেষণায় এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র করিয়াছেন রসায়ন-শাস্ত্রের গবেষণায়। ইঁহাদের

নায় জগত মুগ্ধ, আর আমরা গোঁধাঁধাম্বিত। জগদীশ-চন্দ্র যে সময় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হন, সে-সময় ঐ কলেজে ভাল পরীক্ষাগার না থাকায় তাঁহাকে বহু অসুবিধার মধ্যে কাজ করিতে হয়। দেশীয় মিস্ত্রীর দ্বারা গবেষণা কার্যের সহায়ক বহু সূক্ষ্ম যন্ত্র তিনি নির্মাণ করাইয়াছেন। অবশ্য এজন্য তাঁহাকে বহু ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইত। নিজ তত্ত্বাবধানে দেশীয় মিস্ত্রীর দ্বারা প্রস্তুত যন্ত্রের সাহায্যে তিনি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে "বিদ্যুত উৎপাদক ঈথর তরঙ্গের দিক পরিবর্তন" বিষয়ে গবেষণায় সাফল্য লাভ করেন। এই গবেষণার বিষয় বিলাতের রয়াল সোসাইটির গোচরে আসিলে তাঁহারা তাঁহাকে গবেষণা কার্যে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি, এস, সি, উপাধিতে ভূষিত করিলেন।

চাকুরী, তথা গবেষণার ক্ষেত্রে তখনও তাঁহাকে বহু বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কলেজে কাজ করিবার পর গবেষণা কার্যের জন্য তিনি সময় খুব কমই পাইতেন। তদানীন্তন ছোটলাট সার জন উডবার্ণ তাঁহাকে উৎসাহিত ও তাঁহার গবেষণা কার্যের সুবিধা বিধান করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার জন্য একটি নূতন পদ সৃষ্টির ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভার অধিবেশনে জগদীশচন্দ্র ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য সিনেট সভার সভ্যরূপে সরকার পক্ষ সমর্থন না করায় ছোটলাট বাহাদুরের এই পরিকল্পনা কার্যকরী হয় নাই। ইহার পর গবেষণা কার্যের সুবিধার জন্য তিনি ছয় মাসের ছুটী লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। অবশ্য এই ছুটী মঞ্জুর করাইতে তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়।

এই সময় (১৮৯৫) জগদীশচন্দ্র বেতারে সংবাদ প্রেরণের বিষয় গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন। কলিকাতার টাউন হলে ছোটলাট সার উইলিয়াম ম্যাকেঞ্জির উপস্থিতিতে তিনি বিদ্যুত তরঙ্গের সাহায্যে বিনা তারে অপর কক্ষে পিস্তল ছোঁড়া দেখান। ইংলণ্ডে পৌছিয়া জগদীশচন্দ্র প্রথমে লিভারপুলের ব্রিটিশ এসোসিয়েসনে এবং রয়েল ইনষ্টিটিউটে তাঁহার গবেষণার বিষয় বক্তৃতা করিয়া লর্ড কেলভিন প্রমুখ বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি (১৮৯৭) প্যারিস ও বার্লিনের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সভায় বক্তৃতা করিয়া যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

বেতারের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে সাধারণতঃ লোকে ইটালীয় বৈজ্ঞানিক মার্কনীর নাম উল্লেখ করেন। ম্যাক্সওয়েল, হার্টজ প্রভৃতি বহু বৈজ্ঞানিকের সাধনায় আজ বেতারের বর্তমান রূপ সম্ভব হইয়াছে। জগদীশচন্দ্রের দানও ইহাতে কম নহে। কিন্তু বেতার-বিজ্ঞানের আলোচনার সময় তিনি দেখেন যে, জড় পদার্থেরও ক্লান্তি আছে। বেতার-বিজ্ঞানের গবেষণা ত্যাগ করিয়া এইবার জগদীশচন্দ্র জড়ের প্রাণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। এ-সাধনার মূল্য হয়ত সাধারণের কাছে নগণ্য; কিন্তু তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ নূতন আলোকে যে নূতন পথেব সন্ধান দিলেন তাহা অভিনব।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিদ্যুৎ সম্বন্ধীয় গবেষণার ফলে তিনি ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের কংগ্রেসে নিমন্ত্রিত হন। ইতিপূর্বে কোন ভারতীয়ের ভাগ্যে এ সম্মান লাভ হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ সে-সময়ে প্যারিসে ছিলেন। তিনি জগদীশচন্দ্রের প্যারিস ত্যাগের প্রাক্কালে লিখিতেছেন,—"একা, যুবা বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক, আজ বিদ্যুতবেগে পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলীকে নিজের প্রতিভায় মুগ্ধ করলেন—সে বিদ্যুতসঞ্চার মাতৃভূমির মৃতপ্রায় শরীরে নবজীবনের তরঙ্গ সঞ্চার করলো! সমগ্র বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীর শীর্ষ-স্থানীয় আজ জগদীশ বসু—ভারতবাসী, বঙ্গবাসী!" পূর্ব বারের ন্যায় এক্ষেত্রেও শিক্ষা বিভাগের অনুমতি পাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল, যদিও তদানীন্তন ছোটলাট তাঁহাকে সর্ববিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। অবশেষে আশা নিরাশার মধ্যে ভারতমাতার সুসন্তান প্যারিস যাত্রা করিলেন।

প্যারিস কংগ্রেসে তাঁহার আবিষ্কৃত তথ্যগুলি ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হয়।

প্যারিস কংগ্রেসের পর জগদীশচন্দ্র পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় তাঁহার বন্ধুবর্গ ইংলণ্ডের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। বন্ধুবর্গের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলে তাঁহার গবেষণা কার্যের অনেক সুবিধা হইত; কিন্তু স্বদেশে তাঁহার গবেষণা কার্যের যত অসুবিধাই হোক, তিনি ভারতে থাকিয়াই দেশের সেবা করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। লণ্ডনে তাঁহার জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া সার উইলিয়াম ক্রুকস্, সার রবার্ট অষ্টিন প্রমুখ বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ধাতু নির্মিত যন্ত্রেরও যে অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্তি আসে এই সময়ে তিনি পরীক্ষার দ্বারা এই সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি যে কিরূপ গভীর ছিল, ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত "বসু বিজ্ঞান মন্দির"-ই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। নিজের গবেষণা কার্যের অসুবিধা হওয়ায় তিনি নিজস্ব একটি গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার বিষয় বহুদিন হইতেই মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁহার সাধ্বী পত্নী শ্রীযুক্তা অবলা বসুও তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষের এরূপ ইচ্ছা ছিল না যে, জগদীশচন্দ্রের পদোন্নতি হয়। কিন্তু নিয়মানুসারে পদোন্নতির সময় অতিবাহিত হইবার বহু পরে সরকারের চেষ্টায় তাঁহার পদোন্নতি হয়, ফলে তাঁহার বাকী প্রাপ্য বেতন পাইবার আদেশ হওয়ায় তিনি একত্রে বহু টাকা পান। এই টাকা তিনি "বসু বিজ্ঞান মন্দির" প্রতিষ্ঠায় ব্যয় করেন। তিনি ভারতীয় শিল্প পদ্ধতিতে এই মন্দির প্রস্তুত করাইয়া তাহার বেদীমূলে নিম্ন লিখিত লিপি খোদিত করেন।

"ভারতের গৌরব ও জগতের
কল্যাণ কামনায়
এই বিজ্ঞান-মন্দির
দেব চরণে নিবেদন করিলাম।"

এই মন্দিরই তাঁহার সাধন ক্ষেত্ররূপে জগতে পরিচিত। কলিকাতার এই গবেষণাগার ব্যতীত তিনি সিজবেড়িয়াতে একটি ও দার্জিলিং-এ একটি নিজস্ব গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। পরে সিজবেড়িয়া পরিত্যক্ত হয় এবং ফলতায় একটি গবেষণাগার স্থাপন করেন।

জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা বহুমুখী। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়ের সহিত দৃশ্য ও অদৃশ্য আলোকের তথ্যাদি আবিষ্কার করিয়া সুধী সমাজকে বিস্মিত করিলেন। ইহার পর তিনি পদার্থবিদ্যার গবেষণা ত্যাগ করিয়া জড় ও জীবের বিশেষত্ব বিষয়ে গবেষণা কার্যে ব্রতী হইলেন। নিজ উদ্ভাবিত যন্ত্রের দ্বারা উদ্ভিদ বিদ্যার বহু জটিল তত্ত্বের সমাধান করিয়া তিনি প্রাচীন ভারতীয় সত্যদ্রষ্টা ঋষির মর্যাদা লাভ করিলেন। তিনি দেখাইলেন, আঘাত বা কোন প্রকার বাহ্যিক উত্তেজনায় উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাভ্যন্তরে একই প্রকার ক্রিয়া লক্ষিত হয়। গাছের রস শোষণ সম্বন্ধে বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ জলি ও ডিকসনের মতবাদ বা অন্যান্য প্রচলিত মতবাদগুলি খণ্ডন করিয়া তিনি নিজস্ব মত প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন; তিনি দেখান যে, উদ্ভিদ শরীরের কোষ ও অণুর উত্তেজনাই তাহার রস শোষণের প্রধান কারণ। অন্তঃপ্রবাহের দ্বারা উদ্ভিদ রস শোষণ করিতে সক্ষম, এই মতটিও তিনি পরীক্ষার দ্বারা ভ্রান্তিপূর্ণ প্রমাণ করেন। উদ্ভিদের বৃদ্ধি, উদ্ভিদের সহিত আলোকের সম্বন্ধ, উদ্ভিদের নিদ্রা, অবসাদ, তাহার পরিপাক ক্রিয়া প্রভৃতি নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ গবেষণা দ্বারা জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ-বিদ্যায় এক নবযুগের সূচনা করেন। এমন কি পাশ্চাত্য জগতকে স্তম্ভিত করিয়া তিনি আমাদিগকে উদ্ভিদের স্নায়ুর সন্ধান দেন।

জগদীশচন্দ্র যে একজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ছিলেন ইহাই তাঁহার একমাত্র পরিচয় নহে। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। সহজ সাবলীল ভাষায় দুরূহ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী বাংলায় লিখিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার অনেক প্রবন্ধ বালকেরও বোধগম্য। তাঁহার কয়েকটি মূল্যবান বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ "অব্যক্ত" নামে ১৩১৮ সালের ১লা আশ্বিন প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিত করে। বঙ্গ-সাহিত্যে 'অব্যক্ত' তাঁহার অমর দান। তাঁহার পৃথিবী পর্যটন সম্বন্ধে তিনি "অব্যক্তে" লিখিয়াছেন—"আমার নূতন আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রচার করিবার জন্যে ভারত গভর্ণমেণ্ট ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে আমাকে পৃথিবী পর্যটনে প্রেরণ করেন। সেই উপলক্ষে লণ্ডন, অক্‌সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, ভিয়েনা, হার্ভাড, নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া, সিকাগো, কালিফর্ণিয়া, টোকিও ইত্যাদি স্থানে আমার পরীক্ষা প্রদর্শিত হয়। তখন আমি একাকী; অদৃশ্যে কেবল সহায় ছিলেন, ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী।" এমনই তাঁহার স্বদেশপ্রীতি। ইহার বহুপূর্বে দেশবাসী তাঁহাকে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মৈমনসিংহ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি পদে বরণ করিয়া তাঁহার সাহিত্য সাধনার যোগ্য সম্মান দান করেন। অতঃপর তিনি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। বাংলায় "অব্যক্ত" ব্যতীত তিনি ইংরাজীতে মৌলিক বৈজ্ঞানিক তথ্য পূর্ণ পনেরটি মূল্যবান পুস্তক প্রণয়ন করেন।

বিদেশ ভ্রমণে যশের মুকুট ধারণ করিয়াই তিনি তৃপ্ত হন নাই; স্বদেশকে জানিবার আগ্রহও তাঁহার প্রবল ছিল। নালন্দা, তক্ষশীলা, অজন্তা প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখিয়া তিনি যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিতেন। কোন কোন স্থানে তিনি একাধিকবারও গিয়াছেন। ভ্রমণের কোন ক্লেশকেই তিনি কষ্টকর বলিয়া মনে করিতেন না। বিজ্ঞানের পরীক্ষাগার অপেক্ষা বন্ধুর পার্বত্য পথে ভ্রমণের আকর্ষণ তাঁহার কম ছিল না। তাই তিনি কেদারনাথ, বদরীকাশ্রম প্রভৃতি আমাদের তুষারাবৃত দুর্গম প্রাচীন তীর্থস্থানগুলিও সস্ত্রীক পরিদর্শন করিয়া আসেন। ইহার ফলেই তাঁহার লেখনী হইতে 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' বাহির হইয়াছিল।

বন্ধুভাগ্যও জগদীশচন্দ্রের অতুলনীয়। বৈজ্ঞানিক বন্ধুর গবেষণায় মুগ্ধ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হন। যখন নানাপ্রকার অসুবিধার মধ্য দিয়া জগদীশচন্দ্র অগ্রসর হইতেছিলেন, সেই সময় রবীন্দ্রনাথই তাঁহার উৎসাহদাতা ছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রও জগদীশচন্দ্রের অন্যতম বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ইহা ব্যতীত আনন্দমোহন বসু, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। প্রথম নালন্দা ভ্রমণের সময় কবিগুরু, অধ্যাপক যদুনাথ সরকার, ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার সঙ্গী ছিলেন।

বহু বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইলেও তাঁহার যশোরাশি চারিদিকে বিস্তৃত হইতেছিল। তাঁহার যশের প্রভায় বঙ্গজননীর মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। পাটনা, মহীশূর, পাঞ্জাব প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে উপাধি বিতরনী সভায় বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রণ করিয়া এবং এলাহাবাদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ সম্মান D. Sc উপাধি দিয়া যোগ্য পাত্রে সম্মান দান করিয়াছেন। জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সভা, বিলাতের রয়াল সোসাইটি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে আচার্য জগদীশচন্দ্রকে তাঁহাদের সভ্য (Fellow of the Royal Society) মনোনীত করিয়া সম্মানিত করেন। গভর্ণমেণ্টও তাঁহাকে C. I. E., C. S. I, Knight প্রভৃতি সম্মানজনক বহু উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। যে শিক্ষা বিভাগ একদিন তাঁহাকে অস্থায়ী অধ্যাপকের পদ দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিল, সেই শিক্ষা বিভাগই তাঁহার অবসর গ্রহণের সময় (১৯১৩) হইলে তাঁহাকে আরও দুইবৎসর পূর্ণ বেতনে

প্রোফেসার এমেরিটাস্ রূপে নিযুক্ত রাখেন। তাঁহার গুণমুগ্ধ ছাত্রগণ বহু অর্থব্যয়ে প্যারিস হইতে আচার্য দেবের একটি পিত্তল মূর্তি নির্মাণ করাইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের বেকার ল্যাবরেটরীতে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার প্রতি তাঁহাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধার অঞ্জলি দেন। ইহা উল্লেখ যোগ্য যে, আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্র তাঁহার জীবদ্দশাতেই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে সেই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

আজীবন একনিষ্ঠভাবে বিজ্ঞান সাধনায় রত, বাংলা, তথা ভারতের ঋষি জগদীশচন্দ্র ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর, সোমবার, প্রাতঃ ৮টা ১৫ মিনিটের সময় গিরিডিতে মহাপ্রয়ান করেন। জগদীশচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তিনি মৌলিক গবেষণার যে নূতন ধারা বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠার দ্বারা প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

"উদ্ভিদগুলো যেন নোঙর-বাঁধা প্রাণী"
আচার্য জগদীশচন্দ্র।

গরুটা মুলাক্ষেতে ঢোকবার ফলে ভয়াবহ অবস্থা।

পশ্চিম-বাংলার বনরাজি

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

(প্রথম পর্যায়)

ইতিহাস ঃ—

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত আমাদের এই বাংলদেশ প্রচুর বনসম্পদে সমৃদ্ধিশালী ছিল। তখনকার দিনে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশদ্বয় বাংলা দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন এই তিনটি অঞ্চলেই শাল (Shorea robusta Gaertn.), শিশু (Dalbergia Sissoo Roxb.), শিমুল (Bombax malabaricum DC.) ইত্যাদি নানা জাতীয় বৃক্ষপূর্ণ অরণ্যের প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু এদেশে বৃটিশ প্রভুত্ব স্থাপনের অল্পকালের মধ্যেই উত্তরোত্তর প্রজাবৃদ্ধির জন্য ও অন্যান্য নানা কারণে, বিশেষতঃ তৎকালীন কর্তৃপক্ষের দূরদৃষ্টির অভাব ও দেশবাসীর অবিমৃষ্যকারিতার ফলে, সেই নৈসর্গিক প্রাচুর্যের অবসান ঘটে। সে সময়ে ভারতবর্ষের রাজধানী বাংলাদেশে কলিকাতা সহরে অবস্থিত ছিল। সেইজন্য বাংলাদেশ নানাবিধ শিল্পের প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত হয়, আর এই শিল্পের ক্রমবর্ধমান ক্ষুধা মিটাইবার প্রয়োজনে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায়, (বিহার ও উড়িষ্যা সহ) বাংলা প্রদেশের বনসমূহ সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। বহু যুগ ধরিয়া সঞ্চিত বনসম্পদ প্রায় শূন্য হইয়া আসে। বনভূমি সংকুচিত হইয়া তাহার পরিমাণ দেশের প্রয়োজনানুপাতে যথেষ্ট কমিয়া যায় এবং গৃহ ও আসবাবপত্রাদি নির্মাণের জন্য কাষ্ঠ সরবরাহের উপযুক্ত বড় গাছ দুর্লভ হইয়া পড়ে। অবশেষে যখন ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে দেখা গেল যে, সরকারী পূর্তবিভাগ রেলপথ নির্মাণের জন্য যথেষ্ট কাষ্ঠজাত স্লিপার সংগ্রহ করিতে বেগ পাইতেছে, তখন সৌভাগ্যবশতঃ এই বিষয়ে ভারত সরকারের প্রথম দৃষ্টি পড়িল। তাহার ফলে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার ও অন্যান্য প্রদেশে সরকারী বনবিভাগ স্থাপিত হয় এবং তৎপর-বৎসর বৃটিশ ভারতে বনরাজি সংরক্ষণকল্পে একটি সর্বভারতীয় আইন জারি হয়। এই আইন ১৮৭৮ সালের ৭নং আইন দ্বারা এবং পরে আবার ১৯২৭ সালের ১৬নং আইন দ্বারা সংশোধিত ও পরিবর্তিত হয়। শেষোক্ত আইনটি এখনও এদেশে বলবৎ আছে। এই ব্যবস্থা দুইটি তৎকালীন অবশিষ্ট বনসম্পদকে আসন্ন ধ্বংসের গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া ও চিরকালের ভিত্তিতে সুরক্ষিত করিয়া যে এই দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। ঐ সময়ে অবিভক্ত খাঁটী বাংলার শতকরা ১৩·৫ অংশ আইন দ্বারা রক্ষিত বন হিসাবে গণ্য হয়। ইহাই বাংলাদেশে উপস্থিত যে সরকারী বনরাজি আছে তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এই পুরাবৃত্তের ধারা লক্ষ্যনীয়—আদিতে স্বাভাবিক প্রাচুর্য, মধ্যে তাহার বহুল পরিমাণে ধ্বংস ও তজ্জনিত ভবিষ্যতের জন্য আশঙ্কা এবং শেষে সংরক্ষণের ব্যবস্থা। ভারতে বিভিন্ন প্রদেশের এবং জগতের অন্যান্য অনেক দেশেরই অরণ্যরাজির ইতিহাসে পর্যায়ক্রমে এইরূপ ধারাই চলিতে দেখা যায়।

সৌভাগ্যক্রমে এদেশে বন-বিভাগ পত্তনের পর হইতেই, ইহার কার্যক্রম একটি 'প্রচ্ছন্ন' বিধি অনুসরণ করিয়া চলিতেছে; 'প্রচ্ছন্ন' বিশেষণটির তাৎপর্য এই যে, যদিও বিধিটি সরকারী বন-বিভাগ

দ্বারা অনুসৃত হইয়া আসিতেছে, ভারত সরকারের বন-কার্যক্রম সংক্রান্ত লিপিবদ্ধ যে নীতি আছে তাহাতে ইহার কোনও উল্লেখ নাই। সে যাহা হউক, বিধিটি এই যে, কোন কোন নির্দিষ্ট বন হইতে সংগৃহীত কাষ্ঠাদির পরিমাণ প্রতি বৎসর প্রায় সমান সমান হইবে, অথবা বৎসরের পর বৎসর ক্রমশঃ অল্প অল্প বাড়িয়া ঐ বনের সম্ভবপর বার্ষিক উৎপন্নের চরম মাত্রায় পৌঁছিবে। ইহাকে 'ধারাবাহিক সমপরিমাণ বার্ষিক উৎপন্ন বিধি' বলা যাইতে পারে। এই বিধিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহার উপর বনরাজির চিরস্থায়িত্ব নির্ভর করে। আর বনজাত উৎপন্নের বাৎসরিক পরিমাণে যদি বেশী তারতম্য ঘটে, তাহা হইলে যে সকল শিল্প বা শ্রমজীবিগণ অরণ্যদ্বারা প্রতিপালিত হয় তাহাদের নানাবিধ অসুবিধা হয়। কোন বনের উৎপন্ন যদি কোন বৎসর হঠাৎ অত্যধিক কম হয়, তাহা হইলে ঐ বনে কাজ করিয়া যে সকল শ্রমিক জীবিকা অর্জন করে তাহাদের অনেকে বেকার হইয়া পড়ে এবং তৎসংশ্লিষ্ট কলকারখানা বা শিল্পগুলির ক্ষতি হয়।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ১৯শে অক্টোবর তারিখে ২২ এফ্ নং বিজ্ঞপ্তিতে ভারত সরকার এদেশের বন-কার্যক্রম নীতি প্রথম লিপিবদ্ধ করেন। এতদ্দ্বারা বনগুলিকে মোটামুটি চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা:—

(১) ভূ-প্রকৃতি ও আবহাওয়া রক্ষাকারী বন। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক বন, এমন কি প্রত্যেক ঘাস জঙ্গলও, এই পর্যায়ে পড়ে; কারণ বনমাত্রই পর্যাপ্ত বৃষ্টির জল স্পঞ্জের ন্যায় শোষণ ও সঞ্চয় করে। এই জল ধীরে ধীরে ক্ষরিত হইয়া ভূগর্ভস্থ জলপ্রণালীগুলিকে স্থায়ী করে। আর বনমাত্রেই বর্ষার সময় বারিস্রোতের বেগ প্রশমিত করিয়া ভূপৃষ্ঠস্থ মৃত্তিকার ক্ষয় ও বন্যা নিবারণ করে। আবার গাছপালার সমষ্টিভূত পত্রের বিশাল ক্ষেত্র হইতে প্রচুর জলের বাষ্পীভবনের ফলে বনসন্নিহিত স্থানের উষ্ণতা কমে ও আদ্রর্তা বাড়ে এবং এই কারণে ঐ সকল স্থানে মোট বাৎসরিক বারিপাত না বাড়িলেও, ঘন ঘন বৃষ্টি হয়। এইরূপে প্রত্যেক বনের দ্বারা স্থানীয় আবহাওয়া অল্পবিস্তর প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু পাহাড়-পর্বতস্থ বনগুলিই বিশেষ করিয়া রক্ষাকারী-বন বলিয়া গণ্য হয়। কারণ এই সকল বিষয়ে ইহাদের প্রভাব অপরিমিত ও সুদূরপ্রসারী। কৃষিক্ষেত্র ও তাহার উর্বরতা রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ বনরাজি অপরিহার্য—কেবল উহাদের পার্শ্ববর্তী বা সন্নিহিত স্থানের জন্য নয়, পরন্তু দূরবর্তী স্থানের জন্যও অপরিহার্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যুক্তপ্রদেশ হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত সমগ্র গাঙ্গেয় সমতলভূমির ভবিষ্যৎ, হিমালয় অঞ্চলের বনরাজি কি ভাবে রক্ষিত হয় তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

(২) উচ্চশ্রেণীর বন অর্থাৎ যে সকল বন হইতে প্রধানতঃ শিল্প ও বাণিজ্যের উপযোগী বড় কাঠ সরবরাহ হয়।

(৩) নিম্নশ্রেণীর বন অর্থাৎ যে সকল বন হইতে তন্নিকটস্থ গ্রামবাসীদের জন্য খুঁটি জ্বালানিকাঠ ইত্যাদি সরবরাহ হয়।

(৪) পশু চারণ বন অর্থাৎ যে সকল বন প্রধানতঃ পশু চরাইবার বা পশুখাদ্য সরবরাহ করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

বনরাজির উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ উঁহাদের আইনসঙ্গত পর্যায় বা অবস্থার কোন পরিচয় দেয় না, কেবল কোন্ নীতি অনুসারে কোন্ শ্রেণীর বনের কার্যক্রম স্থির করিতে হইবে তাহার ইঙ্গিত দেয়।

অধুনা প্রচলিত বন কার্যক্রম নীতির মূল তত্ত্বগুলি এই যে—

(ক) দেশের ভূ-প্রকৃতি ও আবহাওয়া রক্ষার প্রয়োজনীয় বনরাজির সংরক্ষণ প্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য।

(খ) দেশবাসীর সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য অন্ততঃ নিম্নতম পরিমাণ বনরাজি সংরক্ষণের স্থান দ্বিতীয়।

(গ) বনকার্য অপেক্ষা কৃষিকার্যের দাবী অধিকতর গ্রাহ্য;

(ঘ) রাজস্বের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া গ্রামের অধিবাসীবর্গ যাহাতে তাহাদের প্রয়োজন মত বনজ কাষ্ঠাদি বিনামূল্যে অথবা প্রকৃত ব্যয়মূল্যে পায় তাহার ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

(ঙ) উপরোক্ত চারিটি সর্ত যথাযথ পালনের পর বন হইতে যথাসম্ভব উচ্চতম রাজস্ব উপার্জনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

এই বন কার্যক্রম নীতির ভিত্তি জনসাধারণের গরিষ্ঠতম সংখ্যার সর্বোত্তম মঙ্গল। ইহা প্রায় সর্বাঙ্গসুন্দর। উহাতে কেবলমাত্র দুইটি ত্রুটি দেখা যায়, যথা :—

১ম। ইহাতে ধারাবাহিক সমপরিমাণ বার্ষিক উৎপন্ন বিধি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নাই।

২য়। দেশের সকলের জন্য তাহার মোট আয়তনের কতটা অংশ চিরস্থায়ী ভিত্তিতে সংরক্ষিত বনভূমি স্বরূপ রাখিতে হইবে, সে সম্বন্ধে কোন নির্দেশ ইহাতে নাই।

প্রথম ত্রুটিটির জন্য কোন ক্ষতি হয় নাই। কেন হয় নাই তাহার আভাস পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়টি এদেশে উপযুক্ত পরিমাণ বনরাজি না থাকার জন্য কতকটা দায়ী। এই ত্রুটি দুইটি সংশোধন করিয়া প্রচলিত বন কার্যক্রম নীতি সর্বতোভাবে অনুসরণ করিয়া চলাই আমাদের পক্ষে উচিত।

র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারা

পশ্চিম বাংলার বনরাজি সম্পর্কে উপস্থিত পরিস্থিতির পরিচয় দিবার পূর্বে র‍্যাডক্লিফ বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই বাঁটোয়ারার ফলে পশ্চিমবাংলা অপ্রত্যাশিত ও অন্যায়ভাবে দুইটি মূল্যবান বনসম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে—একটি চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের বনরাজি, ইহাদের মোট আয়তন ১,২৮৬ বর্গমাইল; অপরটি খুলনা জেলার পূর্ব সুন্দরবন, ইহার আয়তন ২,৩১৬ বর্গমাইল।

চট্টগ্রাম পার্বত্য অঞ্চলের বনভূমির বাৎসরিক আয় আন্দাজ ১,৬৫,০০০৲। এখান হইতে ভালজাতের বাঁশ ও বড় বড় কাঠ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে সেগুন (Tectona grandis Linn.) স্বভাবজ না হইলেও, ইহার বিস্তৃত বাগান আছে। গর্জন (Dipterocarpus Spp.), গামারি (Gumelina arborea Linn.) চাপালিস্ (Artocarpus Chaplasha Roxb.), জারুল Lagerstroemia Flos-Reginae Retz.), তালি (Dichopsis polyantha Hook.) ও পিতরাজ (Amoora Rohituka W & A) উল্লেখযোগ্য। এই বৃক্ষগুলির মধ্যে কয়েটি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল বাদে সমগ্র বাংলাদেশে অন্য কোথাও পাওয়া যায় না।

পূর্ব সুন্দরবন গোলপাতার জন্য বিখ্যাত। এই গোলপাতা (Nipa fruticaus) দরিদ্রের ঘর ছাইবার জন্য একটি অতি আবশ্যকীয় বনজ দ্রব্য। দক্ষিণবঙ্গে ইহার চাহিদা খুব বেশী। ১৯৪৪-৪৫ সালে গোলপাতা বাবদ ১,৪৫,৬০৮৲ রাজস্ব আদায় হইয়াছিল। পশ্চিম বাংলার ভাগে সুন্দরবনের যে অংশ পড়িয়াছে, সেখানে গোলপাতা অত্যন্ত বিরল; নাই বলিলেই চলে।

সমগ্র সুন্দরবনে মাত্র ৭-জাতীয় গাছ আছে, যাহা হইতে খুঁটি ও কিছু কিছু কাঠ পাওয়া যায়। এই গাছগুলির নাম সুঁদরি (Heritiera minor Roxb.), পশুর (Carapa moluccensis Lamk.), ধুন্দল (Carapa obovata, Blume), কেওড়া (Sonneratia apetala Ham), বাইন (Avicennia officinalis Linn), গেঁওয়া (Exoecaria Agallocha Linn.) এবং কাঁকড়া (Bruguiera gymnorhiza Lamk.)। পূর্ব সুন্দরবনে এই সকল জাতীয় বৃক্ষ হইতে নৌকা ও গৃহাদি নির্মাণের জন্য যথেষ্ট কাঠ ও খুঁটি পাওয়া যায়। কলিকাতার বাজারে প্যাকিং বাক্সের জন্য গেঁওয়া, পেন্সিলের জন্য ধুন্দল এবং হুকার নলিচার

জন্য আমুর (Amoora Cucullata Roxb.) কাঠ প্রচুর আমদানি হয়—এইগুলিও প্রধানতঃ পূর্ব সুন্দরবন হইতে আসে। পশ্চিম সুন্দরবনেও এই সকল গাছ জন্মায়; কিন্তু এত ছোট হয় যে তাহা মোটের উপর কেবলমাত্র জ্বালানি কাঠের উপযুক্ত।

উপরন্তু শিকার ও মৎস্য সম্পদেও পূর্ব-সুন্দরবন অধিকতর সমৃদ্ধিশালী। বঙ্গ বিভাগের পূর্বে সমগ্র সুন্দরবন হইতে কলিকাতার বাজারে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১,০০০ মণ মাছ আমদানি হইত। ইহার মধ্যে প্রায় ৮০০ মণ পূর্ব সুন্দরবন আর মাত্র ২০০মণ পশ্চিম সুন্দরবন হইতে আসিত।

গত মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে সমগ্র সুন্দর-বনের বার্ষিক আয় ছিল আন্দাজ ৬ লক্ষ টাকা। যুদ্ধের সময় এই আয় বাড়িয়া ২৪ লক্ষ টাকা হইয়াছিল। এই রাজস্বের শতকরা অন্যূন ৯৯ ভাগ পূর্ব সুন্দরবন হইতে সংগৃহীত হইত।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌ বাটোয়ারার ফলে বনসম্পদ সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার যে প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরিচয় কতকটা পাওয়া যাইবে।

বনরাজির আয়তন :—

সম্প্রতি বঙ্গ বিভাগের ফলে পশ্চিম বাংলার মোট আয়তন ২৮,০৩৩ বর্গমাইলে পরিণত হইয়াছে, তন্মধ্যে বনভূমির মোট পরিমাণ ২,৬৪৮ বর্গমাইল। এই বনভূমি কিভাবে বিস্তৃত তাহা নিম্নে দেখান হইল।

তালিকা (১)

জেলা	বনবিভাগ	বনভূমির আয়তন (বর্গমাইল)
দার্জিলিং	দার্জিলিং	১১৩
	ক্যালিমপং	২২৫
	কারসিয়ং	১১২
জলপাইগুড়ি	জলপাইগুড়ি	১৯৩
	বক্সা	৩৭৫
২৪পরগণা	পশ্চিম সুন্দরবন	১,৬০০
মোট		২,৬৪৮

বর্তমান বনরাজির অপ্রতুলতা :—

বনবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞদিগের মত এই যে, দেশের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক মঙ্গলের জন্য দেশস্থ উচ্চ-শ্রেণীর বনের পরিমাণ উহার মোট আয়তনের শতকরা অন্ততঃ ২০ ভাগ হওয়া উচিত। ইউরোপে বনভূমির পরিমাণ ঐ মহাদেশের মোট আয়তনের ২৬%; সমগ্র ভারতবর্ষে তাহার আয়তনের ২০% বনভূমি আর তন্মধ্যে উচ্চশ্রেণীর বন ১৪%। এই তুলনায় পশ্চিম বাংলার বনভূমির পরিমাণ অত্যন্ত কম, কারণ উল্লিখিত হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে, এই প্রদেশে উপস্থিত যে সরকারী বনরাজি আছে তাহাদের মোট পরিমাণ উহার আয়তনের মাত্র ৯.৪%।

১,৬৩০ বর্গমাইল ব্যাপী পশ্চিম সুন্দরবনের ৬৭২ বর্গমাইল জলভাগ, আর অবশিষ্ট স্থলভাগে যে জঙ্গল আছে তাহা আদৌ বড় কাঠ সরবরাহের উপযোগী নয়, এ কথা আগেই বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দার্জিলিং জেলার বনভূমির অনেক স্থান সরলোন্নত, কোন কোন স্থান নগ্ন, আবার কোন কোন স্থানে বৃক্ষগুলি বড় হয় না। এই সকল কারণে উহার আনুমানিক এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১১২.৫ বর্গমাইল কাষ্ঠ আহরণের পক্ষে অনুপযোগী। সুতরাং পশ্চিম বাংলার উচ্চশ্রেণীর বনের মোট পরিমাণ ৯০৫.৫ বর্গমাইল, অর্থাৎ প্রদেশের মোট আয়তনের শতকরা ৩.২৩ অংশ। বলা বাহুল্য ইহা এত অল্প যে, ইহা দ্বারা এদেশের শিল্পের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ কাঠ যোগান দেওয়া সম্ভবপর নয়। ইহার ফলে বাংলাদেশকে বাধ্য হইয়া ভারতে অন্যান্য প্রদেশ হইতে, এমন কি বিদেশ হইতেও, অনেক কাঠ আমদানি করিতে হয় এবং এই বাবদে প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হয়। এই ব্যয় বন্ধ করিয়া পশ্চিম বাংলাকে কাঠ সম্পর্কে স্বাবলম্বী করিতে হইলে, এদেশে অন্ততঃ ৪,৭০০ বর্গমাইল নূতন উচ্চশ্রেণীর বন স্থাপন করা আবশ্যক।

বর্তমান বনরাজির অনুপযুক্ত বিস্তার ও তাহার ফল :—

এই প্রদেশের বনরাজির আয়তন একে অতি অল্প, তাহার উপর আবার ইহার বিস্তার অতি অসমীন ও অনুপযুক্ত—বাংলাদেশের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহা বুঝা যায়। মানচিত্রে দেখা যায় বনভূমি মূল জনপদ হইতে বহুদূরে মাত্র উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে দুইটি সরু ফালির ন্যায় অবস্থিত। ফালি দুইটি স্থানে স্থানে ছিন্ন, আর উহাদের মধ্যবর্তী সমগ্রদেশ কার্যত জনশূন্য। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম বাংলার ১৪টি জেলার মধ্যে ১০টিতে (কলিকাতা জেলাকে গণনা না করিয়া) কোন সরকারী বন নাই। এই ১০টি জেলার লোক সংখ্যা ১,৪১,৯৬,০০০। এই বিপুল জনসাধারণের অধিকাংশ গ্রামবাসী। দূরবর্তী বন হইতে যুক্তিসঙ্গত মূল্যে কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করা তাহাদের সাধ্যাতীত। তাহারা জ্বালানি কাঠের অভাবে ঘুটে ব্যবহার করিয়া প্রভূত পরিমাণ সারের অপচয় করিতে বাধ্য হয়। গোময় যে একটি উৎকৃষ্ট সার একথা আমাদের চাষীরা বেশ ভাল ভাবেই জানে; তথাপি নিরুপায় হইয়া তাহারা এই মূল্যবান পদার্থটির অধিকাংশ ইহার ন্যায্য কার্যে লাগাইতে পারে না। বলা বাহুল্য ইহাতে কৃষিকার্যের অপরিমিত ক্ষতি হয়। গ্রামবাসীরা গরুর গাড়ী, কোদাল-কুড়ুলের বাঁট, লাঙ্গল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য আবশ্যকানুযায়ী কাঠ পায় না। নিজেদের পেশার উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবে কোনরূপে জোড়াতালি দিয়া কাজ চালায়। সাধারণ গৃহ নির্মাণের জন্য খুঁটি কি ছোটখাট কাঠও যথেষ্ট পায় না, সুতরাং ছোট ছোট কুঁড়ে ঘরে ভেড়ার পালের মত ঠেসাঠেসি করিয়া বাস করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় বাস করার ফলে নানারূপ রোগে পড়িয়া অনেক শ্রমিককে বৎসরের অনেকদিন বেকার অবস্থায় কাটাইতে হয়। এই সকল কারণেও দেশের চাষবাসের বহু ক্ষতি হইতেছে। বাস্তবিক আমাদের জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার বর্তমান শোচনীয় অবস্থা এবং কৃষিক্ষেত্রের উর্বরতার হ্রাস যে দেশস্থ বনভূমির স্বল্পতা ও অনুপযুক্ত বিস্তারের অন্যতম কুফল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

বনভূমির পরিমাণ বাড়াইবার আবশ্যকতা :—

দক্ষিণ বঙ্গের বন হইতে অদূর ভবিষ্যতে শিল্পোপযোগী বড় কাঠ পাওয়ার কোন আশা নাই। কেবল মাত্র উত্তর বঙ্গের বনরাজির যে সকল স্থান সুগম, তথা হইতে কিছু বড় কাঠ পাওয়া সম্ভব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সাম্রাজ্য রক্ষার প্রয়োজনে ঐ সকল স্থান হইতে অতিরিক্ত কাঠ সরবরাহ করা হইয়াছিল। সেইজন্য উত্তর বঙ্গের বনরাজির অবস্থা এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, উহা হইতে কিছুকাল বেশী বড় কাঠ পাওয়ার আশা খুবই কম। ঐ বনগুলিকে উহাদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে কয়েক বৎসর সময় লাগিবে। স্বাভাবিক অবস্থাতে আসিলেও স্বল্পতাহেতু উহাদের দ্বারা এই এই প্রদেশের উপস্থিত বা ভবিষ্যৎ কাঠের চাহিদা মিটান অসম্ভব। আমাদের জাতীয় লক্ষ্য ও পরিকল্পনা অনুসারে ছোট বড় সকল প্রকার শিল্পের দ্রুত ও ব্যাপক উন্নতির জন্য আয়োজন হইতেছে। সুতরাং শীঘ্রই কাঠের চাহিদা খুব বাড়িবে। এই বাড়তি চাহিদা মিটাইবার জন্য পশ্চিম বাংলাকে বেশ কিছুকাল আমদানী কাঠের উপর নির্ভর করিতে হইবে। এই আমদানি ও তজ্জন্য দেশের বিপুল ব্যয় যতদূর ও যতশীঘ্র সম্ভব বন্ধ করা বা কমান উচিত। এই উদ্দেশ্যে আমাদের উপস্থিত যে বনভূমি আছে তাহার সুরক্ষা ও চরম উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থা করা এবং কৃষির অনুপযুক্ত যে সকল পতিত জমি আছে সেইগুলিতে যতশীঘ্র সম্ভব নূতন বন স্থাপন করা অত্যন্ত আবশ্যক। আর সময় নষ্ট না করিয়া এ সম্বন্ধে আমাদের এখনই অবহিত হওয়া কর্তব্য, কারণ বৃক্ষ রোপনের পর উহা পরিণত হইয়া বড় কাঠের উপযুক্ত

হইতে সাধারণতঃ ৫০ হইতে ১৫০ বৎসর সময় লাগে।

আমাদের প্রয়োজনের পরিমাণ :—

বিশেষজ্ঞদিগের মতে প্রত্যেক ১০০ লোকের জ্বালানি কাঠের চাহিদা মিটাইবার জন্য ১০ একর বনভূমি এবং প্রত্যেক ১০০টি গরুর জন্য অন্ততঃ ২০০ একর ও প্রত্যেক ১০০টি মহিষের জন্য ৪০০ একর বনচারণভূমি আবশ্যক। এই হিসাবে আমাদের কি পরিমাণ বনভূমির প্রয়োজন, এবং এই সম্বন্ধে পশ্চিম বাংলার উপস্থিত পরিস্থিতি কিরূপ তাহা ২নং তালিকা হইতে জানা যাইবে।

২নং তালিকা হইতে দেখা যায় যে,—

(ক) পশ্চিমবাংলায় উপস্থিত যত গরু ও মহিষ আছে, তাহাদের উপযুক্তভাবে চরাণ বা খাওয়ানর জন্য অন্ততঃ ২৮,৭৮৮ বর্গমাইল পরিমিত পশুচারণ বনের আবশ্যক, কিন্তু সমগ্র প্রদেশের মোট আয়তন ২৮০৩৩ বর্গমাইল। সুতরাং এই প্রদেশে কেবলমাত্র পশুচারণের জন্য আলাদা জমির ব্যবস্থা করা অসম্ভব।

(খ) জ্বালানিকাঠ ও ছোটখাট কাঠ সরবরাহ সম্পর্কে গ্রামবাসীদের, বিশেষতঃ কৃষিজীবিদের সুবিধার জন্য ২,২১৮ বর্গমাইল নিম্নশ্রেণীর বন আবশ্যক। আগে বলা হইয়াছে যে, বড় কাঠের জন্য অতিরিক্ত ৪,৭০০ বর্গমাইল উচ্চশ্রেণীর বন স্থাপন করা দরকার। সুতরাং এই প্রদেশকে বনজ সম্বন্ধে স্বাবলম্বী করিতে হইলে মোট ৬,৯১৮ বর্গমাইল পরিমিত অতিরিক্ত বনভূমির প্রয়োজন। উপস্থিত কৃষিকার্যের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে না, এরূপ জমির মোট আয়তন ৯,০০৫ বর্গমাইল—ইহা হইতে নূতন বন গঠনের জন্য আবশ্যকীয় পরিমাণ জমি পাওয়া যাইলেও যাইতে পারে। কতটা পাওয়া যাইবে, তাহা বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতীত সঠিক বলা যায় না। কারণ ২নং তালিকায় যে সকল জমি কৃষির জন্য অব্যবহার্য বলিয়া ধরা আছে, তাহাদের মধ্যে নদী-নালা, জলা, রাস্তাঘাট, বাঁধ, বাস্তুভিটা, রেললাইন ইত্যাদি অনেক কিছু আছে—এই সকলের পৃথক হিসাব সহজপ্রাপ্য নয়। আর যে সকল জমি 'অকর্ষিত' বলিয়া দেখান আছে, তাহার মধ্যে কিছু কিছু বেসরকারী বনভূমিও আছে; আবার এই সকল জমির মধ্যে কতটা সরকারী খাসমহলের অন্তর্গত ও কতটা বেসরকারী তাহারও সঠিক হিসাব জানা নাই।

বেসরকারী বন :—

জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভুম, বর্ধমান, আর সম্ভবতঃ নবদ্বীপ ও মালদা জেলায় স্থানে স্থানে এখনও অল্প স্বল্প জমিদারী জঙ্গল আছে। কিন্তু দুই তিনটি বন ব্যতিরেকে তাহাদের অধিকাংশই প্রায় ধ্বংসের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে এবং সেগুলি ঝোপঝাড় ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্যান্য বেসরকারী বন সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। যেখানেই ব্যক্তিগত স্বার্থ বর্তমান, মালিক যতই শিক্ষিত হউন না কেন, সেখানে বনভূমির পরিণাম সচরাচর এইরূপই হইতে দেখা যায়। এমন কি সরকারী সংরক্ষিত বনেও, যেখানে কোন ব্যবসায়ীকে বন হইতে কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিবার একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়, সেখানেও বনভূমি অল্পবিস্তর ধ্বংস হইতে দেখা যায়। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই এইরূপ অভিজ্ঞতা। এইজন্য অনেক দেশেই সরকার নিজ নিজ দেশের বেসরকারী বনের উপর আইন দ্বারা অল্পবিস্তর আধিপত্য জারি করিতে বাধ্য হইয়াছে। বাংলাদেশও বাদ যায় নাই। তাহার নিদর্শন ১৯৪৬ সালের বঙ্গীয় ব্যক্তিগত বনরক্ষা সম্বন্ধীয় আইন। এই আইনের প্রধান দুইটি সর্ত এই যে—

(ক) যদি দেখা যায়, মালিক তাঁহার জমিদারিভুক্ত জঙ্গল মোটের উপর ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, তাহা হইলে ঐ জঙ্গল তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে রাখা যাইতে পারে; কিন্তু উহার যথোপযুক্ত পরিচালনার জন্য সরকারী বনবিভাগের দ্বারা অনুমোদিত কার্য পরিকল্পনা মানিয়া চলিতে

তালিকা (২)

জেলা	লোক সংখ্যা	প্রয়োজনীয় নিম্ন শ্রেণীর বনের পরিমাণ	গরুর সংখ্যা	মহিষের সংখ্যা	প্রয়োজনীয় পশুচারণ বনের পরিমাণ	সংরক্ষিত সরকারী বনের পরিমাণ	চলতি পতিত ব্যতীত অকর্ষিত ভূমির পরিমাণ	কৃষির জন্য অব্যবহার্য্য জমির পরিমাণ
	শত	একর	শত	শত	একর	একর	একর	একর
১। বর্ধমান	১৮,৯০৭	১,৮৯,০৭০	৭,৮২৮	৭০৫	১৮,৪৭,৬০০	—	২,৩৫,৬৭৬	৩,০৭,০০০
২। বীরভূম	১০,৪৮৩	১,০৪,৮৩০	৬,১৮৩	৩২৯	১৩,৬৮,২০০	—	১,৪০,৭৯৮	১,৮৬,০০০
৩। বাঁকুড়া	১২,৮৯৭	১,২৮,৯৭০	৭,২৯৫	১,০২১	১৮,৬৭,৪০০	—	৪,০২,০৮৮	৪,৩৭,০০০
৪। মেদিনীপুর	৩১,৯০৭	৩,১৯,০৭০	১৭,৩৯৫	৭৩৬	৩৭,৭৩,৪০০	—	৭,২৯,৬৮৩	৫,৩৩,০০০
৫। হাওড়া	১৪,৯০৩	১,৪৯,০৩০	২,২৮৯	৫২	৪,৭৮,৬০০	—	২৯,৯৫৬	৬৭,০০০
৬। হুগলি	১৩,৭৭৭	১,৩৭,৭৭০	৪,৮৮৪	১১৩	১০,২২,০০০	—	৭২,৫৮০	১,৩৩,০৩০
৭। ২৪ পরগণা	৩৬,৬৯৫	৩,৬৬,৯৫০	১১,৩৭১	৪২৯	২৪,৪৫,৮০০	১০,৫৩,২০০	৩,২৮,৫৮০	৪,১৮,২৫৬
৮। কলিকাতা	২১,০৮৯	২,১০,৮৯০	—	—	—	—	—	—
৯। নবদ্বীপ বা নদীয়া	৮,৪০৩	৮৪,০৩০	৪,১৪২	২৯৫	৯,৪৬,৪০০	—	১,৪২,৩৬৫	১,০৭৫
১০। মুর্শিদাবাদ	১৬,৪০৫	১,৬৪,০৫০	৬,১৫৬	৪৬৩	১৪,১৬,৮০০	—	১,৭২,০০০	১,৮২,৫৩৭
১১। পশ্চিম দিনাজপুর	৫,৮৩৫	৫৮,৩৫০	৪,৪৮৯	৫১৭	১১,০৪,৬০০	—	১,০৫,৪৪৪	৮০,৪৭১
১২। মালদা	৮,৪৪৩	৮৪,০৩০	৩,০২২	২৬৩	৭,০৯,৬০০	—	৯৫,১১৯	১,৩৮,৮২০
১৩। জলপাইগুড়ি	৮,৪৫৭	৮৪,৫৭০	৫,২৬২	৩৬৩	১১,৯৫,৬০০	৩,৬৩,৫২০	৩,২৭,২৫৬	১,৮৭,৬১১
১৪। দার্জিলিং	৩,৭৬৪	৩৭,৬৪০	১,০২৪	১১০	২,৪৮,৮০০	২,৮৮,০০০	৩,২৩০	২,৯৪,৩০০
জমা—	২,১১,৯৬৫	২১,১৯,৬৫০	৮১,৫৩০	৫,৩৯৬	১,৮৪,২৪,৪০০	১৬,২৪,৭২০	২৭,৮০,৪৮৩	২৯,৭৬,০৭০
মোট ভূমির পরিমাণ (বর্গমাইল)		৩,৩১২			২৮,৭৮৮	২,৬৩৮	৪৩৫৫	৪,৬৪০
বাদ ৭, ৮, ১৩ এবং ১৪ কারণ এই কয়টি জেলায় সরকারী বন হইতে জ্বালানি কাঠ পাওয়া যায় (বর্গমাইল)		১,০৯৪						
প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত নিম্নশ্রেণীর বনের পরিমাণ (বর্গমাইল)		২,২১৮						

মালিক বাধ্য থাকিবেন। এইরূপ বেসরকারী বনভূমিকে নিয়ন্ত্রিত বন আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

(গ) যদি দেখা যায় যে, মালিক তাঁহার জমিদারিভুক্ত জঙ্গল ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন না বা উহার অপব্যবহার করিতেছেন, অথবা যদি মালিক তাঁহার জঙ্গল রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া উহা রক্ষা করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে ঐ জঙ্গল পরিচালনার ভার বনবিভাগের একজন কর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত করা যাইতে পারে। এইরূপ বেসরকারী বনকে অর্পিত-বন আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

এইরূপে প্রদেশস্থ সমস্ত বে-সরকারী বনকে নিয়ন্ত্রিত অথবা 'অর্পিত' বনরূপে সরকারী প্রভাবে আনয়ন করিয়া উহাদের উপযুক্ত সংরক্ষণ ও উন্নতির পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই আইনের উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে ইহার দ্বারা বিশেষ কোন কাজ হয় কিনা সন্দেহ। জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করিয়া দেশের যাবতীয় ভূসম্পত্তিকে জাতীয় সম্পদরূপে গণ্য করিবার জন্য জল্পনাকল্পনা অনেকদিন ধরিয়া চলিতেছে এবং সম্ভবত ইহা শীঘ্রই কার্যে পরিণত হইবে। তাহা হইলে ব্যক্তিগত বন বলিয়া আর কিছুই থাকিবে না, আর তখন কৃষিকার্যের অনুপযুক্ত পতিত জমি হইতে উপযুক্ত পরিমাণ সংরক্ষিত বন চিরস্থায়ী ভিত্তিতে স্থাপন করা সহজসাধ্য হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।
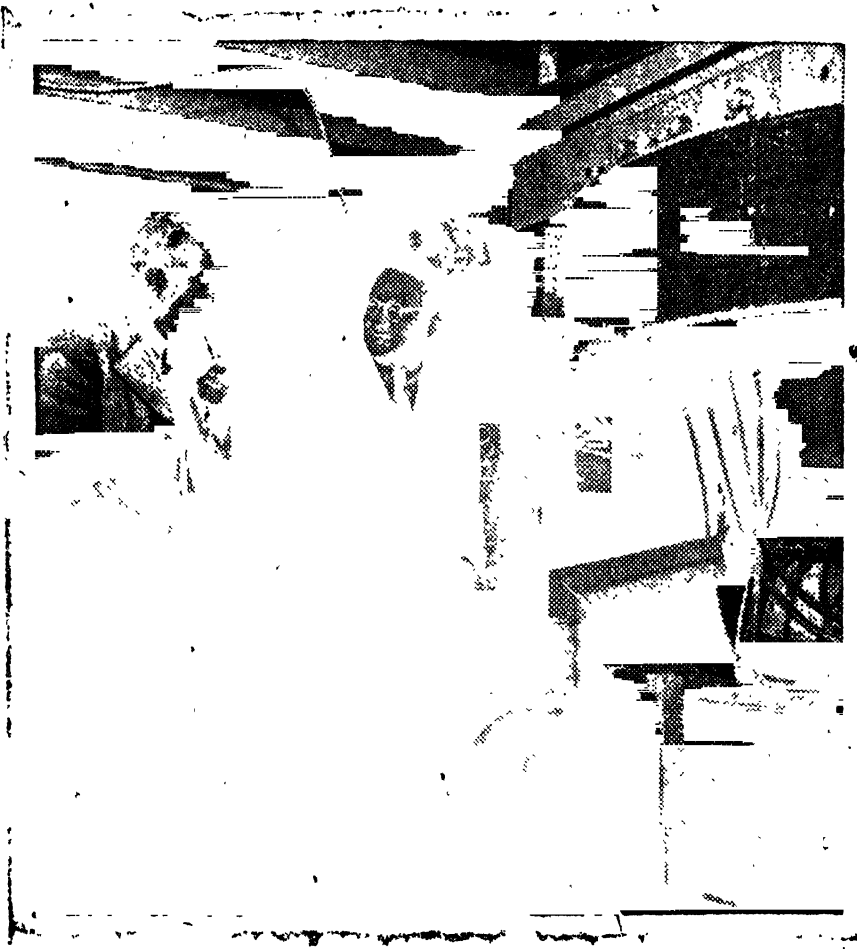
ক্যাভেণ্ডিস্ লেবরেটরীর সাইক্লোট্রন যন্ত্রের কাছে বৃটেনের পরমাণু বিশেষজ্ঞ প্রফেসর কক্রফ্ট্ ও ডাঃ কেম্পটন। বি. আই. এস।

খাদ্য সমস্যা

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যুদ্ধ অবসানে হঠাৎ দেখা গেল মানুষের খাবারের অত্যন্ত অভাব ঘটেছে। সে অভাব এতদিনেও ঘুচল না বরং অনটন ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। যতদিন যুদ্ধ চলেছিল লোহা, তাঁবা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি নানাবিধ ধাতব দ্রব্য প্রচুর নষ্ট হয়ে যায়। কত জিনিষ সমুদ্র গর্ভে রয়ে গেছে, কত জিনিষ পুড়ে ছাই হয়েছে ও বাষ্পে পরিণত হয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। এই সব সামগ্রীর অভাব আর কখনো পূরণ হবে না। তাছাড়া যুদ্ধে অনেক কারখানা নষ্ট হয়েছে। আমাদের প্রয়োজনীয় যে সব জিনিষ কারখানায় প্রস্তুত হত তা আর হতে পারছে না পূর্বের মত। এই সব জিনিষের অভাব হবেই এবং কেন অভাব ঘটেছে তার কারণ বেশ বোঝা যায়। কিন্তু ধান, গম, যব প্রভৃতি আহার্যের প্রধান সামগ্রী উৎপন্ন হয় জমিতে। যুদ্ধের দরুণ ফসলের জমি যা নষ্ট হয়েছিল তার পরিমাণ নগণ্য। তবে শস্যের এত অভাব ঘটল কেন? লোকের খাদ্যের অভাব দিন দিন এত বাড়ছে কেন?

এই সমস্যার প্রতি এখন সকলেরই দৃষ্টি পড়েছে। প্রত্যেক দেশেরই রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষদের দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়েছে দেশের লোকেদের কি করে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা যায়। খাবারের অভাব কেন হল, এর পিছনে কী কারণ থাকতে পারে আমাদের সকলেরই জানা দরকার। এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞেরা কী বলছেন আলোচনা করে দেখলে ক্ষতি নেই।

বিজ্ঞান মহলে অনেক বছর আগে থেকেই এই বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছিল। প্রায় দেড়শ' বছর পূর্বে ম্যালথাস্ সব প্রথম খাদ্যাভাবের সমস্যা সম্বন্ধে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পৃথিবীতে মানুষের মোট জনসংখ্যা ও মানুষের উপযোগী খাদ্যের সঙ্গতি কী আছে বিচার করে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবী জোড়া মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হবে। লোকে তাঁর কথায় তখন বেশী কাণ দেয়' নি, কেন না তিনি যে বিভীষিকার কথা বলেছিলেন তার কোন লক্ষণের পরিচয় সে সময়ে বা তার পরবর্তী কালে পাওয়া যায় নি। ম্যালথাসের বিচারে একটি ভুল ছিল। তিনি ইউরোপ, এসিয়া ও উত্তর আমেরিকার জন সংখ্যা ও সেই সেই মহাদেশগুলির শস্য উৎপাদন ক্ষমতা বিচার করেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার বিষয় তেমন বিবেচনা করতে তখন পারেন নি। গত শতাব্দীতে ইউরোপের বহু-লোক ঐ সব অঞ্চলে গিয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করেছে ও সেখানকার নতুন উর্বরা জমি চাষ করে প্রচুর ফসল উৎপন্ন করছে। সেইজন্য পৃথিবীর দক্ষিণাংশের উৎপন্ন বাড়তি ফসল ইউরোপে চালান হয়ে সেখানকার দ্রুতবর্ধনশীল জনসংখ্যাকেও খাবারের অভাব এতদিন পর্যন্ত বোধ করতে দেয় নি। উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষিবিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে, তার ফলে ইউরোপের প্রাচীন দেশগুলিরও শস্য উৎপাদন ক্ষমতা যথেষ্ট বেড়ে গিয়ে এ বিষয় সাহায্য করেছে। আরো একটি ঘটনা হয়েছে যা ম্যালথাস সেই সময়ে নিরূপণ করতে পারেন নি। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি ও শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল ইউরোপের উপরি স্তরের সন্তান-জনন ক্ষমতা কমে যেতে লাগল। ম্যালথাসের বক্তব্য ছিল পৃথিবীতে যে হারে জন সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই অনুপাতে আহার্য সংগ্রহ সম্ভব নয়, কাজেই সকলকে সমানভাবে খাইয়ে বেশি দিন বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। ম্যালথাসের ভবিষ্যদ্বাণী

তখনকার মত খাটে নি সত্য, কিন্তু তাঁর মূল মতবাদ অপ্রমাণিত কখনই ধরা উচিৎ নয়। ম্যালথাস যে বিভীষিকার ভয় দেখিয়েছিলেন দেড়শত বছর আগে তা কোনো দিনই সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয় নি, তার সম্ভাবনা অভাবিত কারণে এতদিন পিছিয়ে ছিল, সম্প্রতি খুবই এগিয়ে এসেছে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা নির্ভুলভাবে স্থির করা খুবই কঠিন। এখনো অনেক দেশ আছে যেখানে জনসংখ্যা নির্ণয় করার কোনো ব্যবস্থাই নেই, সেইজন্য আন্দাজে গণনা করতে হয়। স্যার জন্ বয়েড ওরের মতে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ২,০০০,০০০,০০০ (দুই শত কোটি) ছিল জনসংখ্যা। যে হারে সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে তাতে বর্তমান শতাব্দীর শেষাশেষি তিন শ' কোটি লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা দরকার হবে। যে হারে লোকসংখ্যা বাড়ছে এখন পৃথিবীতে যত লোক আছে শতাব্দীর শেষে তার প্রায় দ্বিগুণ লোক হবে। আজকের দিনে যদি ধরা যায় পৃথিবীর জনসংখ্যা দুই শত কোটি তাদেরই আমরা অন্ন জোগাতে পারছি না, পঞ্চাশ বছর পরে তাহলে কী হবে?

পৃথিবীতে বড় জোর ত্রিশ হাজার মিলিয়ান বিঘা কৃষির উপযোগী জমি মোটমাট আছে। তার মাত্র অর্ধেক পরিমাণ জমি অর্থাৎ ১৫,০০০,০০০,০০০ বিঘা থেকে আমরা আপাতত ফসল পাই। স্যার জন বয়েড ওরের হিসাব অনুসারে এখনকার জনসংখ্যা যদি ২,০০০,০০০,০০০ হয় তবে দেখা যায় প্রতি মানুষ পিছু মাত্র ৭½ বিঘা শস্যপ্রদ জমি আছে। সারা বছরের সব রকম প্রয়োজনীয় খাদ্য পেতে গেলে প্রতিজনের ৭½ বিঘার কমে হয় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীতে এখন যে পরিমাণ চাষের জমি আছে তাতে বর্তমান জনসংখ্যাকে টায়টায় খাওয়াবার মতই আছে। অভাব পড়েছে খুব সম্ভব রপ্তানি আমদানির অব্যবস্থার জন্য।

কিন্তু জনসংখ্যা ত স্থির নেই। খুব কম করে হিসাব করলেও প্রতি বছর ২০ মিলিয়ান (এক মিলিয়ন = দশলক্ষ) করে লোক সংখ্যা বাড়ছে ধরা যেতে পারে। প্রত্যেকের জন্য যদি ৭½ বিঘা করে জমির প্রয়োজন হয় তবে প্রতি বছর ১৫০,০০০,০০০ চাষের জমি বাড়ান দরকার। কিন্তু ফসলের আবাদ লোকসংখ্যার অনুপাতে বাড়ান সম্ভব হচ্ছেনা। যে পরিমাণ বেড়েছে তদপেক্ষা নষ্ট হয়েছে বেশি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জল ও বাতাসের প্রকোপে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ বিঘা উর্বরা জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে চোখের সামনে দেখা যায়। মোটের উপর ফসলের পরিমাণ সমানই আছে—কিন্তু জনসংখ্যা প্রতি বছরেই হুহুকরে বেড়ে চলেছে। খাবারের অনটন ত পড়বেই। এই অবস্থার আশু প্রতিকার যদি না করতে পারা যায় তবে জগৎব্যাপী প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ অনিবার্য। চাষের দ্বারা এখন যত শস্য উৎপন্ন হচ্ছে আগামী ২০।২৫ বছরের মধ্যে তার পরিমাণ যদি দ্বিগুণ না বাড়াতে পারা যায় তবে পৃথিবী জুড়ে এমন হাহাকার পড়বে যা ইতিহাসে কখনো ঘটে নি।

যদি বিচক্ষণ ভাবে উৎসাহ সহকারে লাগা যায় তবে ২০।২৫ বছরের মধ্যে ফসলের পরিমাণ দ্বিগুণ করা অসম্ভব নয়। আগেই বলা হয়েছে পৃথিবীতে চাষের উপযোগী জমি যা আছে তার মাত্র অর্ধেক পরিমাণ জমিতে বর্তমানে চাষ হচ্ছে। বাকি জমি যদি তাড়াতাড়ি আবাদ করে ফেলতে পারা যায় তবে খাদ্যের সমস্যা আরো কয়েক বছর হয়ত ঠেকিয়ে রাখা যেতে পারে। কিন্তু তারপর?

আমাদের আরো গোড়া ঘেঁসে ভাবতে হবে। মানুষের সমাজকে চার অবস্থায় ভাগ করা যায়। প্রথম অবস্থায় জন্ম ও মৃত্যু দুইয়েরই আধিক্য। অধিকাংশ অসভ্য সমাজের এই অবস্থা। তাদের সন্তান সন্ততি জন্মায় বেশি, লোকে মরেও খুব বেশি। ফলে জনসংখ্যার বিশেষ তারতম্য হয়না। দ্বিতীয় অবস্থায় জন্মের হার সমানই থাকে কিন্তু মৃত্যুর হার কমে যায়। সমাজের এই অবস্থা হয় যখন বিজ্ঞান স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় আবিষ্কার করে

মৃত্যু সংখ্যা কমিয়ে দিতে পারে। ডাক্তাররা শিশু-হত্যা বেশি হতে দেয় না আর বয়স্কদেরও বেশি-দিন বাঁচিয়ে রাখতে পারে। অধিকাংশ আধুনিক সভ্যসমাজ এই অবস্থায় এসেছে। তৃতীয় অবস্থা হচ্ছে জন্ম সংখ্যা কম অথচ মৃত্যুসংখ্যা বেশি। রুশিয়া (ইউ, এস, এস, আর) এখন এই অবস্থায় আছে। চতুর্থ অবস্থায় পৌচেছে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ ও গ্রেটব্রিটেন। সেখানে শিশু জন্মাচ্ছে কম, মৃত্যুহারও কম। সেইজন্য মোট জনসংখ্যা থাকছে সমান। হয়ত দেখা যাবে ফরাসীদের মত এই দুই দেশেও জন্মের হার এত কমে গেছে যে ক্রমশ জনসংখ্যাও হ্রাস হতে আরম্ভ করেছে।

বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিজ্ঞদের একমাত্র ভরসা যে আধুনিক সভ্যতা যেভাবে সর্বত্র প্রবেশ করছে তাতে এসিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলি শীঘ্রই হয় ত দ্বিতীয় অবস্থা থেকে তৃতীয় এমন কি চতুর্থ অবস্থায় পৌছতে পারে। তাদের জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না হয়ে স্থাণু অথবা কমবার দিকে যেতে পারে। যেমন এইসব দেশে এই পরিবর্তন ঘটতে থাকবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষির উন্নতি করে শস্যের পরিমাণ ইতিমধ্যে বাড়িয়ে ফেলতে পারলে আশা করা যায় মানুষ খাবারের অভাবে মরে যাবে না।

জনসংখ্যা কমাতে গেলে কেও কেও বলেন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। সন্তান জন্মের হার কি করে কমান যায় ভাবতে হবে। পাশ্চাত্যে মিসেস মার্গারেট স্যাংগার প্রভৃতি কয়েকজন সন্তান জন্ম সীমাবদ্ধ করার উপায় সম্বন্ধে সর্বত্র প্রচার করে আসছেন। তবে তাঁদের প্রচারিত কৃত্রিম প্রণালী শিশু-জন্ম রোধের প্রকৃষ্ট উপায় কি না সে বিষয় বিজ্ঞানীরা একমত নয়। দেখা গেছে এই প্রণালী উদ্ভাবনের বহু পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুইডেনের জন্ম হার কমই ছিল। বরং ১৯৩০ থেকে সেখানে আগেকার তুলনায় শিশুজন্মের আধিক্য ঘটেছে। আইরারের ক্যাথলিক সমাজ কৃত্রিম উপায়ে গর্ভ-রোধের বিরুদ্ধ অথচ সেখানে শিশুজন্মের হার কমে যাচ্ছে। স্বাভাবিক কোনো অন্য কারণেই নিশ্চয় তা হচ্ছে। ফরাসী দেশে কৃত্রিম গর্ভ নিরোধক ঔষধাদি বিক্রয় করা আইন বিরুদ্ধ অথচ সেখানে সন্তান সন্ততি এত কম জন্মাচ্ছে যে মোট জনসংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে। আধুনিক শিক্ষার প্রসার ও ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে জন্মহার কমে যাবার কয়েকটি সুস্পষ্ট কারণ আছে। অধিক বয়সে বিবাহ প্রথার প্রচলন তার মধ্যে একটি প্রধান কারণ। কিন্তু সহজে বোধ্য এই কারণ ছাড়াও সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক আরো অন্য অজ্ঞাত কারণ এর পশ্চাতে আছে, আমরা এখনো তা জানি না।

কি করে লোকসংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখা যায়, সেই সঙ্গে আহার্যের পরিমাণ বাড়ান যায়—এই হল এখনকার প্রধান সমস্যা। কিন্তু সমস্যাটি দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত জটিল।

প্যানক্রোমেটিক ফিল্ম

শ্রীপরিমল গোস্বামী

ফোটো তোলার কাজে প্যানক্রোমেটিক ফিল্মের বিশেষত্ব কি তা জানতে হলে তার আগে, ফিল্মে আলোর ছাপ লেগে, কি করে তা নেগেটিভে রূপান্তরিত হয় সে সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান থাকা দরকার।

অর্থ লবণ উৎপাদক। সেজন্যে ফিল্মের ঐ যৌগিকটির নাম সিলভার ব্রোমাইড না বলে সিলভার হ্যালাইড্‌স্ বললে ঠিক বলা হয়, কিন্তু তবু সিলভার ব্রোমাইড প্রধান স্থান অধিকার করা হেতু ঐ একটি নামই সাধারণত ব্যবহার করা হয়ে থাকে।)

অর্থোক্রোমেটিক ফিল্ম, ফিলটার ব্যবহার করা হয়নি। নীল আকাশ শাদা।

ফিল্মে থাকে একটি রাসায়নিকের প্রলেপ। এটি হচ্ছে সিলভার ব্রোমাইড ($AgBr$) নামক একটি যৌগিক পদার্থ। ক্যামেরার সাহায্যে যখন ফোটো তোলা হয় তখন আলোর স্পর্শ লেগে এই যৌগিক পদার্থটি ভেঙে এর মধ্যেকার সিলভার পৃথক হয়ে যায়। (সিলভার ব্রোমাইডের সঙ্গে সিলভার ক্লোরাইডও ($AgCl$) কিছু পরিমাণ থাকে। এই দুটি যৌগিকই এক সঙ্গে ভেঙে যায়। ব্রোমিন ও ক্লোরিন হ্যালোজেন শ্রেণীর মূল পদার্থ—হ্যালোজেন

সাধারণত যৌগিক পদার্থ সমূহ এত সহজে ভেঙে যায় না, তার জন্যে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া দরকার হয়, কিন্তু সিলভার হ্যালাইড্‌স্ আলোর স্পর্শে ভেঙে যায়।

কিন্তু প্রকৃতিতে আলো এক রঙের নয়, সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে সকল রঙের স্পর্শে ফিল্মের যৌগিক পদার্থটি সমানভাবে ক্রিয়া প্রকাশ করে কি না, কিংবা কোনো কোনো আলোর স্পর্শে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে কি না।

এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে গিয়েই ফিল্মের বর্তমান উন্নতি সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে 'অর্ডিনারি' ফিল্ম, 'অর্থোক্রোমেটিক' ফিল্ম ও সর্বশেষ 'প্যানক্রোমেটিক' ফিল্মের দেখা মিলেছে। অবশ্য এই তিনটি ফিল্মই সাধারণ ফোটোগ্রাফির সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়—এর বাইরে বিশেষ কাজের জন্যে

প্যানক্রোমেটিক ফিল্ম+হাল্কা ফিল্টার—লাল ফুল ও সবুজ পাতার টোন-বিভিন্নতা বজায় আছে।

ইনফ্রা-রেড ফিল্ম পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে, উপরন্তু স্বভাববর্ণ ফিল্ম তো আছেই।

ক্যামেরার সাহায্যে এক্সপোজার দেবার পর ফিল্মের সিলভার পৃথক হয়ে যায়, তার পর ডেভেলপিং-রাসায়নিকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখলে ব্রোমাইড অংশ ধুয়ে যায় এবং যে অংশে আলোর ক্রিয়া হয় নি সেই অংশের অপরিবর্তিত সিলভার ব্রোমাইড হাইপোফিক্সিং-বাথে (সোডিয়াম থাইওসালফেট $Na_2S_2O_3$, $5H_2O$) নির্দিষ্ট কাল ডুবিয়ে রাখলে ধুয়ে যায়। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ফিল্মে থেকে যায় ডেভেলপিং ক্রিয়ার দরুন কালো রঙে পরিবর্তিত বিশুদ্ধ সিলভার। তখন এই ফিল্মের নাম হয় নেগেটিভ।

এইবার সিলভার ব্রোমাইডের সঙ্গে বিভিন্ন বর্ণের আলোর ক্রিয়া আলোচনা করা যাক।

সূর্যের একটি সঙ্কীর্ণ রশ্মি ত্রিশির কাচ (prism) ভেদ করে গেলে যে রামধনু বর্ণের উদ্ভব হয় তাকে বলে স্পেকট্রাম। এটা সত্যই কৃত্রিম রামধনু। শাদা আলো ত্রিশির কাচের ভিতর দিয়ে বেঁকে যাবার সময় বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হয়ে যায়। আমরা এই বর্ণই সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিতে নানা রূপে দেখি। স্পেকট্রামের বর্ণগুলি নক্সার অনুরূপ বিন্যস্ত হয়। এই পাশাপাশি বিন্যস্ত রামধনু বর্ণগুলির একদিকে অদৃশ্য আলট্রা ভায়োলেট, অন্যদিকে অদৃশ্য ইনফ্রা রেড। এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী বর্ণগুলিই মাত্র আমরা চোখে দেখতে পাই। বহিঃপ্রকৃতির সব জিনিসেই এই বর্ণগুলি নানাভাবে ওতপ্রোত হয়ে আছে।

অদৃশ্য								অদৃশ্য
আলট্রা ভায়োলেট	ভায়োলেট বা বেগুনী	ব্লু বা নীল	গ্রীন বা সবুজ	ইয়েলো বা হলুদ	অরেঞ্জ বা কমলালেবু	ব্রাইট রেড বা উজ্জ্বল লাল	ক্রিমসন রেড বা ঘোর লাল	ইনফ্রা রেড

পূর্বোক্ত সবগুলি রং যে বস্তু একসঙ্গে চোখে প্রতিফলিত করে সেই বস্তু আমরা শাদা দেখি, এবং যে বস্তু সব রংকেই একত্র হজম করে বসে, কোনোটাই চোখে প্রতিফলিত করে না, সেই বস্তুকে কালো দেখি। কোনো বস্তুকে লাল দেখি কারণ সেই বস্তু অন্য সব রংকে হজম ক'রে শুধু লাল রংকে আমাদের চোখে প্রতিফলিত করে। অন্যান্য রং সম্পর্কেও ঐ একই কথা। এই দেখার সঙ্গে সম্পর্ক হচ্ছে আমাদের (১) চোখের লেন্সের, (২) স্নায়ুতন্ত্রীর, আর (৩) মগজের। আংশিক বর্ণান্ধ হলে কোনো কোনো বর্ণের অনুভূতি আমাদের থাকে না। ফোটো তোলার ব্যাপারটিও এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। এখানেও ছবির সঙ্গে সম্পর্কিত (১) ক্যামেরার লেন্সে (২) ক্যামেরা ও (৩) ফিল্ম।

কিন্তু ফোটোগ্রাফির প্রথম যুগে যে প্লেট তৈরি

প্যানক্রোমেটিক ফিল্ম+গাঢ় ফিল্টার=নীল আকাশ কালো, প্রায় রাত্রির আকাশের মতো

হয়েছিল (প্লেট কাচের, ফিল্ম সেলুলয়েডের, মুখ্যভাবে ফোটোগ্রাফির সঙ্গে সম্পর্ক শুধু একটি স্বচ্ছ ধারকের, যা সিলভার ব্রোমাইডের প্রলেপকে ধরে রাখবে।)—সেই প্লেট ছিল আংশিক বর্ণান্ধ। এই প্লেট সকল বর্ণের স্পর্শ গ্রহণ করতে পারত না, ঐ রামধনু

বর্ণবিন্যাসের বাঁয়ের দিকের খানিকটা পারত। একেই বলা হয় অর্ডিনারি প্লেট। বর্ণ বিন্যাসকে আরও একটু বিস্তারিত করে অর্ডিনারি প্লেটের সীমা নির্দেশ করা হয়েছে নীচের নক্সায়।
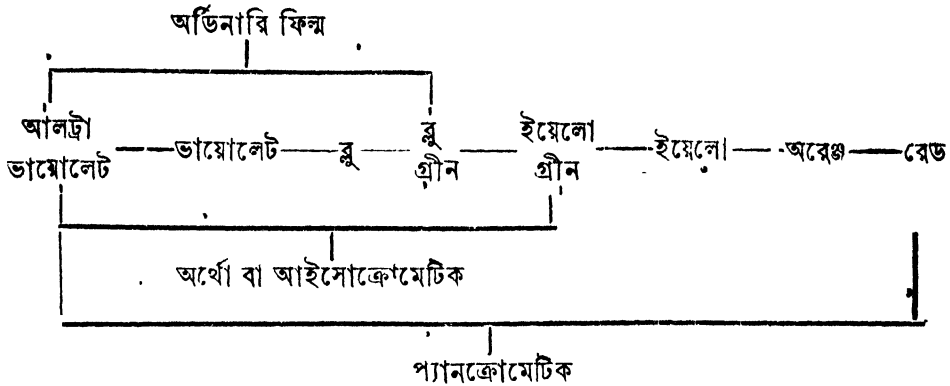
সিলভার ব্রোমাইড যৌগিকের জিলেটিন-ইমালশনে কয়েকটি রঞ্জন পদার্থ মিশিয়ে প্লেটের বর্ণগ্রহণ সীমা আরও বিস্তার করে হলুদের সবুজ অংশ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল। এই সবুজস্পর্শ গ্রহণকারী প্লেট বা ফিল্মের নাম হল অর্থোক্রোমেটিক বা আইসোক্রোমেটিক, অর্থাৎ "সমান বর্ণ", যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয়, কারণ এর পরেও বাকী রইল হলুদ এবং লাল। একমাত্র প্যানক্রোমেটিক ফিল্মে বর্ণস্পর্শ ক্ষমতা লাল পর্যন্ত বিস্তৃত হল। এটিও সম্ভব হল বিশেষ কয়েকটি রঞ্জন পদার্থের যোগে। কয়েকটি রঞ্জন পদার্থের সাহায্যে ফিল্মের বর্ণস্পর্শগ্রহণ ক্ষমতা কিছু বৃদ্ধি করা যায়, এ আবিষ্কার ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে করেছিলেন জার্মান বৈজ্ঞানিক ফোগেল। কিন্তু সে সময় এই পদার্থের রসায়নতত্ত্ব ঠিকমতো জানা না থাকাতে প্যানক্রোমেটিক ফিল্মের উন্নতিতে বিলম্ব ঘটেছে।

'প্যান' কথাটি গ্রীক শব্দ থেকে নেওয়া, এর মানে 'সর্ব', এবং 'ক্রোমা' মানে 'বর্ণ'। সুতরাং প্যানক্রোমেটিক ফিল্ম (বা প্লেট) অর্থে, যে নেগেটিভ দ্রব্যে চোখে-দেখা সকল বর্ণের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। অর্ডিনারি ফিল্ম বা অর্থোক্রোমেটিক ফিল্মে লাল বর্ণের ক্রিয়া নেই বলে ঐ দুটি ফিল্ম ডার্ক রুমে লাল আলো জেলে ডেভেলপ করা চলে। (কোনো ফিল্ম লাল আলোয় খোলা যায় তাতে বুঝতে হবে সেই ফিল্মে লাল আলোর কোনো ক্রিয়া নেই অথবা ক্রিয়া এত কম, বা বিলম্বিত, যে ডেভেলপিং-এ যতটা সময় লাগে তার মধ্যে তার প্রত্যক্ষ কোনো ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। অবশ্য সাবধানতার জন্যে সোজাসুজি লাল আলোর কাছে এনে ডেভেলপ করা নিষেধ। লাল আলোয় কাজ করা গেলেও ফিল্ম অনেক দূরে রাখতে হয়, কিংবা আলো আড়াল করে সেই লাল আলোর ছায়ায় ডেভেলপ করতে হয়, এবং ডেভেলপিং সলিউশনে ফিল্ম ডোবানোর এক মিনিট পরে মাত্র দু এক সেকেণ্ডের জন্যে লাল আলোর কাছে এনে পরীক্ষা করা চলে।)

সর্ববর্ণ স্পর্শ গ্রহণকারী হওয়াতে প্যানক্রোমেটিক ফিল্মের উৎকর্ষ বাড়ল কেন, সে কথা আলোচনা করা যাক। বিভিন্ন আলোর বা বর্ণের উজ্জ্বলতার একটি তারতম্য আছে। আমাদের চোখে সেই তারতম্য প্রতিভাত হয়। লালকে আমরা সবুজের

অপেক্ষা উজ্জ্বল দেখি, হলুদকে বেগুনির অপেক্ষা উজ্জ্বল দেখি। সুতরাং আমরা চাই যে ফোটোগ্রাফেও এই সব রঙের তারতম্য চোখে দেখা তারতম্যের সঙ্গে মিলুক। কিন্তু যে ফিল্মে লাল বা হলুদ রং কোনো ক্রিয়া করে না, সে ফিল্মে হলুদ বা লাল জিনিসের ছবি তুললে ফিল্মের সেই সব অংশে সিলভার ব্রোমাইড প্রায় অপরিবর্তিতই থেকে যাবে এবং হাইপো ফিক্সিংএর সময় ধুয়ে গিয়ে নেগেটিভে সেই সব অংশ স্বচ্ছ হবে এবং পজিটিভ প্রিন্টে তা কালো দেখাবে। লাল এবং হলুদ ফুল বা অন্য কোনো লাল বা হলুদ জিনিসের ফোটো সেই জন্য চোখে দেখা ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে মিলবে না। ফোটোগ্রাফির দিক দিয়ে এটি একটি ত্রুটি। এই ত্রুটি সংশোধন করেছে প্যানক্রোমেটিক ফিল্ম। এই ফিল্মের সঙ্গে বিভিন্ন ফিলটার ব্যবহার করে ইচ্ছামতো যে কোনো রংকে বেশি উজ্জ্বল বা বেশী মলিন করা যায়। নীলকে শাদা করা যায় আবার একেবারে কালো করা যায়। লালকে শাদা করা যায় এবং সম্পূর্ণ কালো করা যায়। এখন সবই ক্যামেরাধারীর আয়ত্তাধীন।
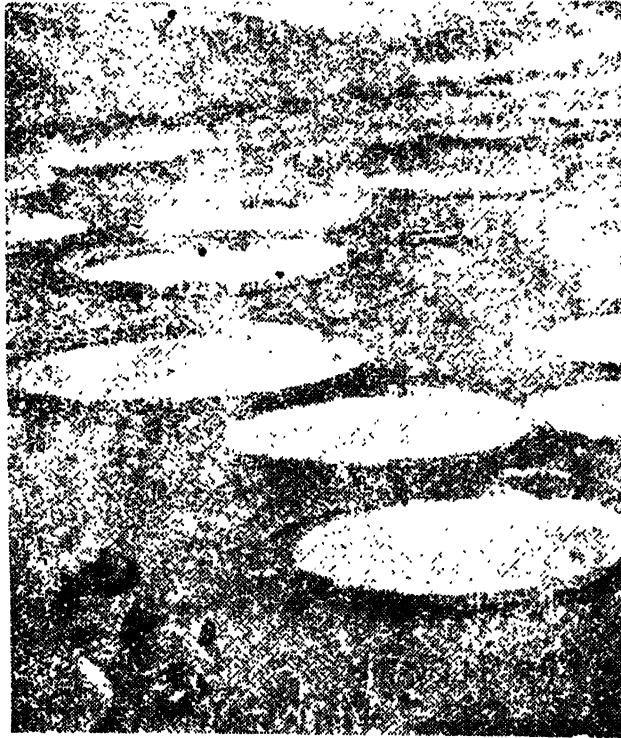
ভিক্টোরিয়া রিজিয়া নামে পরিচিত জল-পদ্মের পাতা থালার মত কানা উঁচু বিশাল আকৃতির এই পাতাগুলো একটা বিস্ময়কর বস্তু। জলে ভাসমান পাতার ওপর একটি ছোট ছেলেকে বসিয়ে দিলেও পাতাটা ডুবে যাবে না।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ

শ্রীহরিচরণ দত্ত

গত জুলাই মাসের জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা নামক প্রবন্ধ বিশেষ সময়োপযোগী হইয়াছে। এই জ্যোতির্বিজ্ঞান মোটামুটিভাবে বিংশ শতাব্দীর দান। বর্তমান , যুগে যে পরমাণু রহস্যের প্রতি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে এবং যাহার মধ্য হইতে তাঁহারা বিপুল শক্তি করায়ত্ত করিবার আশা পোষণ করিতেছেন তাহারও প্রেরণা ঐ সুদূরের জ্যোতির্ময় জগতের অনুশীলন হইতে আসিয়াছে। এই জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণার প্রধান সহায়ক হইল দূরবীক্ষণ যন্ত্র। এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র ও তাহার অন্যান্য আনুষঙ্গিক উপযন্ত্রাদির নির্মাণ ব্যবস্থা এতদিন কয়েকটি যন্ত্র-নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আজ আমেরিকার প্রায় সর্বত্র সাধারণ লোকের দ্বারাই উৎকৃষ্ট ধরণের হাজার হাজার দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মিত হইতেছে। নির্মাণের নূতন নূতন ও উৎকৃষ্টতর পন্থাসমূহ তাঁহারাই উদ্ভাবন করিতেছেন। গত মহাযুদ্ধে আমেরিকান গভর্ণমেণ্টকে এই সৌখীন দূরবীক্ষণ নির্মাতাদের সাহায্য লইতে হইয়াছিল।

এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণবিদ্যা 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' নামক বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকা ১৯২৪ সালে সাধারণের কাছে পরিবেশন আরম্ভ করেন ও তাঁহাদের আনুকুল্যে এই বিদ্যা আজ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও তাঁহারা আজ পর্যন্ত এই বিদ্যার নব নব রহস্যের সন্ধান দিতেছেন।*

দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রধানতঃ দুই রকমের :—

(১) প্রতিফলক দূরবীক্ষণ এবং (২) প্রতিস্ফুরক দূরবীক্ষণ। প্রতিফলক দূরবীক্ষণগুলি আবার অনেক রকমের হইয়া থাকে। যথা :—

১। নিউটনিয়ান টাইপ, ২। ক্যাসেগ্রেন টাইপ, ৩। গ্রেগরিয়ান টাইপ, ৪। সোয়ার্জচাইল্ড টাইপ, ৫। রিচি-ক্রেটিয়েন টাইপ, ৬। আর, এফ, টি, টাইপ ইত্যাদি।

নিউটনিয়ান টাইপটি সবচেয়ে কম খরচে ও সহজে নির্মাণ করা যায়। ইহার কার্য্যকারিতাও অপর যে কোন টাইপের দূরবীক্ষণ অপেক্ষা কম নয়।

প্রথমেই প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণে হাত দেওয়া উচিত নয়। সেজন্য ৬" ব্যাসের নিউটনিয়ান টাইপের দূরবীক্ষণ নির্মাণ প্রণালী বর্ণণা করা হইবে। অধিকাংশ দূরবীক্ষণ নির্মাতাই ৬" তে "হাতে খড়ি" দিয়াছিলেন। এই ৬" যন্ত্রের দ্বারা আমরা দূরের বস্তু সকল ২৫০ গুণ নিকটে দেখিতে পাইব। চন্দ্র ও সূর্য্যের অতি নিখুঁত আকার, শনিগ্রহের বলয় ও তাহার চন্দ্রগুলি, বৃহস্পতি গ্রহের গায়ের বিভিন্ন দাগ ও তাহার চন্দ্রগুলি, মঙ্গলগ্রহের মেরুপ্রান্তদ্বয়ের বরফের মুকুট, শুক্রগ্রহের সুন্দর আকার, নেবুলা, তারকাগুচ্ছ প্রভৃতি সবই দেখিয়া আপনি মুগ্ধ হইবেন। এক মাইল দূরে অবস্থিত হাতঘড়িতে ক'টা বাজিল তাহা আপনার এই ৬" দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখিতে পাইবেন।

মনে করুন ১২" ব্যাসের একটি প্রকাণ্ড গোলক যোগাড় করিয়াছেন। এখন যদি একটি ১" মোটা ও ৬" ব্যাসের কাদার গোলাকার টালির উপর উপরোক্ত প্রকাণ্ড গোলকের অল্প চাপ দেওয়া হয় তবে ঐ কাদার টালির চাপ দেওয়া দিকে

---

* সায়েন্টিফিক আমেরিকানে প্রকাশিত পন্থা অনুসরণ করিয়া লেখক ১৯৩৬ সালে ৫¼" ব্যাসের দূরবীক্ষণযন্ত্র নির্মাণ করেন। ঐ সালের নভেম্বর মাসের সায়েন্টিফিক আমেরিকানে তাহার বিবরণ প্রকাশিত হয়।

উপরোক্ত প্রকাণ্ড গোলকের একটি ৬″ ব্যাসের ছাঁচ উঠিবে। এইটি মনে বেশ উত্তমরূপে কল্পনা করুন। এইবার মনে করুন ঐ টালিটি কাদার না হইয়া কাঁচের—তখন কাঁচখণ্ডটির ক্রস-সেক্‌সনের চেহারা ১নং চিত্রের মত হইবে।

১নং চিত্র
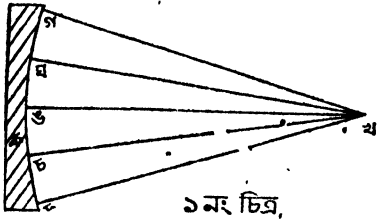
ক ঐ কাঁচখণ্ডটি এবং গ ঘ ঙ চ ছ উহার চাপ দেওয়া দিক। এই দিকটি বা ভূমিটি যেন একটি অগভীর চায়ের ডিস্। এই ভূমি হইতে খ এমন একটি বিন্দু যে, খ হইতে ঐ ভূমির উপর যে কোন সরলরেখা টানা যাউক না কেন লম্বায় ঠিক ৯৬″ হইবেই। এইরূপ ভূমিকে বলা হয়, কংকেভ্ স্ফেরিক্যাল ভূমি এবং খ বিন্দুকে ঐ ভূমির সেণ্টার অফ কার্‌ভেচার্ বলা হয়। গখ, ঘখ, ঙখ, চখ, ছখ রেখাগুলিকে বলা হয় ঐ ভূমির রেডিয়াস্ অফ কার্‌ভেচার। ঙখ নামক রেডিয়াস্ অফ কার্‌ভেচারটির একটু বিশেষত্ব আছে—ঙ বিন্দুটি ঐ কাঁচের গোলাকার ভূমির ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত ও সেজন্য ঙখ রেখাটির একটি বিশেষ নাম—য়্যাক্‌সিস।

এখন ঐ কাঁচখণ্ডটির গ ঘ ঙ চ ছ কংকেভ্ স্ফেরিক্যাল ভূমির উপর সূর্যের কিরণ পড়িলে কি হয় দেখা যাক্। যদি ঐ ভূমিটি বেশ চক্‌চকে হয় তবে সূর্যের কিরণ ঐ ভূমি হইতে বেশ প্রতিফলিত হইবে। ঐ কাঁচখণ্ডটিকে যদি এমন ভাবে ধরা হয় যে, সূর্যের কিরণ ঐ কংকেভ্ স্ফেরিক্যাল ভূমি হইতে প্রতিফলিত হইয়া কোন সুবিধামত দেওয়ালে পড়ে, তবে দেওয়াল হইতে ঠিক ৪৮″ দূরে ঐ কাঁচটি আনিলে দেওয়ালে সূর্যের উজ্জ্বলতম প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঐ উজ্জ্বলতম প্রতিবিম্বটিকে ঐ কংকেভ্ স্ফেরিক্যাল ভূমিটির ফোকাস্ বলা হয় এবং ঐ ভূমির ফোকাল্ লেংথ্ ৪৮″ বলা হয়। এইরূপ কাঁচখণ্ডকে কংকেভ্ স্ফেরিক্যাল দর্পণ বলা হয়। দর্পণটিকে এরূপভাবে ধরুন যাহাতে সূর্যের উজ্জ্বলতম প্রতিবিম্বটি দেওয়ালে পড়ে—অর্থাৎ দেওয়াল হইতে ৪৮″ দূরে দর্পণটি ধরিয়া থাকুন। খুব উত্তমরূপে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, সূর্যের প্রতিবিম্বটি আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর ও নিখুঁত মনে হইলেও বাস্তবিক কিছুটা অস্পষ্ট। ইহার কারণ আলোচনা করা দরকার।

কোন উজ্জ্বল বস্তু, যেমন ঘরের আলো, রাস্তার আলো, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির প্রত্যেক বিন্দু হইতে আলোর রশ্মিসকল সরলরেখায় কোণাকারে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। যে কোন দুইটি রশ্মির মধ্যে একটি, যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, কোণ উৎপন্ন করিবে।
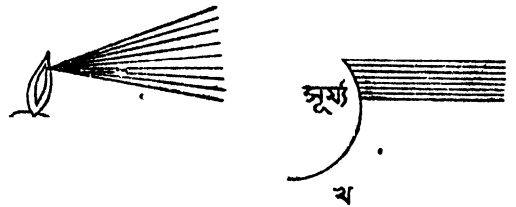
২নং চিত্র

২নং চিত্র হইতে ব্যাপারটি বুঝা যাইবে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিকটের আলো সম্বন্ধে উপরের উক্তি খুবই সত্য। কিন্তু সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির বেলায় রশ্মির কোণগুলি এতই ক্ষুদ্র যে, তাহাদের সমান্তরাল বলিয়াই ধরা হয়। (২ নং খ চিত্র দেখুন)। এখন সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি হইতে সমান্তরাল আলোকরশ্মি সকল কোন কংকেভ্ স্ফেরিক্যাল ভূমির উপর পড়িলে উহার ফোকাসে রশ্মিগুলি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত হয় না—কিছুটা আশেপাশে ছড়াইয়া যায়, সেজন্য প্রতিবিম্বটি নিখুঁত হয় না। এমন একটি ভূমি আছে যাহার উপর

সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি হইতে সমান্তরাল আলোকরশ্মি-গুলি পড়িলে ঠিক এক জায়গায় সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত হইতে পারে। ইহাকে বলা হয় প্যারাবোলিক ভূমি। নিউটনিয়ান দূরবীণ নির্মাণ করিতে হইলে একখণ্ড কাঁচের একদিকে প্রথমে সম্পূর্ণ নিখুঁত কংকেভ্ স্ফেরিক্যাল ভূমি তৈয়ারী করিতে হইবে। তাহার পর ঐটিকে নিখুঁত প্যারাবোলিক ভূমিতে পরিবর্তিত করিতে হইবে। ৩ নং চিত্র দেখুন।

৩নং চিত্র
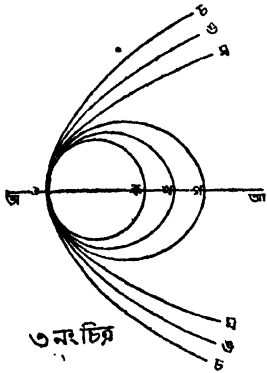
ক চিত্রটি বৃত্ত। যেহেতু ইহার সব রেডিয়াস অফ কার্ভেচার সমান সেজন্য বৃত্তের রেখার বক্রত্ব সর্বত্র সমান। কার্ভেচারের রেডিয়াস্ বেশী হইলে বক্র রেখাটি কম বক্র এবং রেডিয়াস্ কম হইলে বক্র রেখাটি বেশী বক্র হয়। যথা, একটি ৬" ব্যাসার্ধের বৃত্তের রেখা অপেক্ষা একটি ৩" ব্যাসার্ধের বৃত্তের রেখা বেশী বক্র। ক বৃত্তের রেখাটি একটু লম্বাটে এবং ভার্টেক্সের নিকট বৃত্তের অপেক্ষা বেশী বক্র হইয়া খ চিত্রটি হইয়াছে। ইহার নাম ইলিপ্স্। গ চিত্রটি পূর্বাপেক্ষা আরও বেশী লম্বাটে ও ভার্টেক্সের কাছে আরও বেশী বক্র। ইহাও আর একটি ইলিপ্স্। ঘ ঘ চিত্রটিতে দেখুন ইহার বাহু দুইটি আর মিলিত হইল না—যতই বর্ধিত করা যাউক না কেন উহারা ক্রমশঃ সমান্তরালের দিকে যাইবে। ইহার বাহু দুইটি ক্রমশঃ তফাৎ হইবে না বা নিকটে আসিবে না। ইহার বাহু দুইটি বৃত্তের ও ইলিপ্সের রেখা অপেক্ষা কম বক্র ও ভার্টেক্সের কাছে ইহা বৃত্ত ও ইলিপ্সের চেয়ে বেশী বক্র। এই চিত্রের নাম প্যারাবোলা। ঙ ঙ ও চ চ চিত্র দুইটি এরূপ যে উহাদের বাহু দুইটিকে যতই বর্ধিত করা যাইবে উহারা ততই পরস্পর হইতে ক্রমশঃ দূরে যাইতে থাকিবে। ইহাদের বাহুগুলি প্যারাবোলার বাহু অপেক্ষাও কম বক্র ও ভার্টেক্সের নিকট ইহারা প্যারাবোলা অপেক্ষাও বেশী বক্র। এই চিত্র দুইটি ও এরূপ আরও যত অঙ্কন করা যাইবে—সকলেরই নাম হাইপারবোলা। এ স্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বৃত্ত ও প্যারাবোলা মাত্র এক রকমের হয়—অপরগুলি নানা রকমের।

এখন যদি বৃত্তটিকে অ-আ এই য়্যাক্সিসের উপর ঘোরান যায় তবে যে কংকেভ্ স্ফেরিক্যাল ভূমি উৎপন্ন হইবে তাহা বোধ করি বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। ঐরূপ যদি ইলিপ্স্ দুইটিকে ঐরূপ ভাবে ঘোরান যায় তবে যে ভূমি উৎপন্ন হইবে তাহার নাম ইলিপ্সয়ড্যাল ভূমি। প্যারাবোলাটি ঐরূপ ঘুরাইলে যে ভূমি উৎপন্ন হইবে তার নাম প্যারাবোলিক ভূমি ও হাইপারবোলাগুলি ঐরূপ ঘুরাইলে হাইপারবোলিক ভূমিসকল উৎপন্ন হইবে। এই সব ভূমিগুলিকে উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে—কারণ আমাদের দূরবীণের কাঁচটিকে
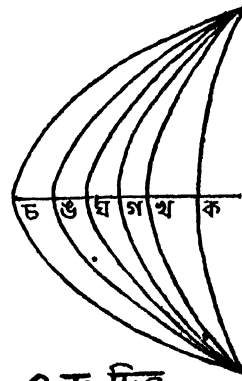
৪নং চিত্র

ঘষিয়া ঘষিয়া প্রথমে কংকেভ্ স্ফেরিক্যাল ভূমি ও পরে তাহাকে প্যারাবোলিক ভূমিতে পরিবর্তন করার সময় উপরিবর্ণিত নানা রকমের ভূমিগুলি উৎপন্ন হইবে—তাহাদের চিনিতে হইবে, মাপিতে

হইবে—তবেই অবশেষে সম্পূর্ণ নিখুঁত প্যারাবোলিক ভূমি তৈয়ারী করা যাইতে পারিবে। অতএব উহাদের আর এক প্রকারে চিনিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করা যাক্। ৪ নং চিত্র দেখুন।

ক চিহ্নিত বক্র রেখাটি কংকেভ্ স্ফেরিক্যাল ভূমির ক্রস্-সেক্সন্, খ ও গ ইলিপ্সয়ড্যাল ভূমি, ঘ প্যারাবোলিক ভূমি এবং ঙ, চ হাইপারবোলিক ভূমি। ক ভূমিটি যদি ধার হইতে কেন্দ্র অবধি ক্রমশঃ গভীর অর্থাৎ বক্র করা যায়, তাহা হইলে প্রথমে খ, গ এবং আরও অসংখ্য প্রকারের ইলিপ্সয়ড্যাল ভূমি উৎপন্ন হইবে। তাহার পরেই ঘ প্যারাবোলিক ভূমি উৎপন্ন হইবে ও আরও গভীর অর্থাৎ বক্র করিতে থাকিলে 'পর পর অসংখ্য প্রকারের হাইপারবোলিক ভূমি উৎপন্ন হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, স্ফেরিক্যাল ভূমি হইতে ইলিপ্সয়ড্যাল, প্যারাবোলিক ও হাইপারবোলিক ভূমিকে "হাতে-কলমে" মাপিয়া তফাৎ বুঝিতে হইলে একটি ছোট্ট ফর্মুলা মনে রাখিতে হইবে। তাহা এই :—$\frac{r^2}{R}$ অর্থাৎ কোন এক গোলাকার কংকেভ্ ভূমির R ইঞ্চি যদি রেডিয়াস অফ কার্ভেচার হয় ও r ইঞ্চি যদি সেই ভূমির ব্যসার্ধ হয় তবে সেই ভূমিটি প্যারাবোলিক হইলে কিনারায় কার্ভেচারের রেডিয়াস কেন্দ্রের কার্ভেচারের রেডিয়াস—$\frac{r^2}{R}$" হইবে। ঈপ্সিত দূরবীণটির প্যারাবোলিক দর্পণটি ৬" ব্যাসের হইবে। উহার ফোক্যাল লেংথ্ হইবে ৪৮"। এখন যদি ঐ দর্পণের কিনারার রেডিয়াস্ অফ কার্ভেচার (এক্ষেত্রে ৯৬"), ও ঐ দর্পণের কেন্দ্রের রেডিয়াস্ অফ কার্ভেচার মাপা যায় ও ঐ দুই মাপের দৈর্ঘের মধ্যে $\frac{r^2}{R}$" তফাৎ মাপা যায় তবে নিঃসন্দেহে ইহা প্যারাবোলিক ভূমি হইবে এবং প্যারাবোলিক ভূমি হওয়ার জন্য সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি নিখুঁতভাবে দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমাদের এই দর্পণের বেলায় r=৩" ও R=৯৬"; অতএব $\frac{r^2}{R}$"=৯/৯৬"=·০৯৩৭৫" বা মোটামুটি ·১"। যদি ঐ দুইটি মাপের তফাৎ ·১" অপেক্ষা কম হয় তবে ভূমিটি ইলিপ্সয়ড্যাল্ আর যদি ঐ দুইটি মাপের তফাৎ ·১" অপেক্ষা বেশী হয় তবে ভূমিটি হাইপারবোলিক হইবে। কিরূপে এই $\frac{r^2}{R}$" ফর্মুলাটিকে "হাতে কলমে" ব্যবহার করিয়া উপরোক্ত ভূমিগুলিকে দেখিতে, চিনিতে ও মাপিতে পারা যায়—তাহা বলি। ফোকোস্ টেষ্ট নামক আলোক-বিজ্ঞানের একপ্রকার পরীক্ষা দ্বারা ঐ কার্য করা যায়। ইহার সাহায্যে স্ফেরিক্যাল, ইলিপ্সয়ড্যাল, হাইপারবোলিক প্রভৃতি সবরকমের ভূমি ও তাহাদের ১/১০,০০০০০" ইঞ্চির যে কোন খুঁত অর্থাৎ উঁচু, নীচু, জল্জলে ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। মাত্র একটি সাধারণ আলো ও একটি সেফ্টি ক্ষুরের ব্লেডের সাহায্যে কাঁচের ভূমির উঁচু নীচু প্রভৃতি খুঁতগুলি কিরূপে প্রায় ১০,০০০০০ গুণ বর্ধিতাকারে চোখের সাম্নে জল্জলেভাবে দেখা যায় তাহা অতি আশ্চর্য ব্যাপার। নিজের চোখে না দেখিলে বিশ্বাস হইবে না।

এখন নিউটনিয়ান দূরবীণ দ্বারা কিরূপে গ্রহ নক্ষত্রাদিকে নিকটে দেখা যায় তাহা জানা দরকার। ৫নং চিত্র দেখুন।

৫ নং চিত্র
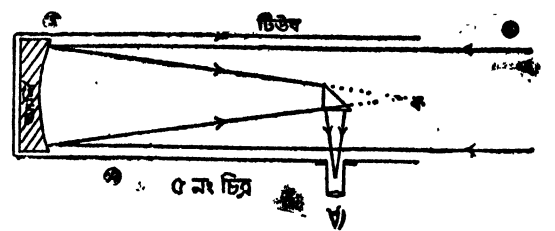
সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি হইতে সমান্তরাল রশ্মিসকল ঐ টিউবের ভিতরে অবস্থিত প্যারাবোলিক দর্পণের উপর পড়িয়া ক ফোকাসে মিলিত হইতে যায়। ক হইতে দর্পণের দিকে একটু দূরে একটি প্রিজম্ এমনভাবে রাখা হয় যাহাতে

ঐ প্রতিফলিত রশ্মিগুলি ক-এতে যাইয়া ফোকাস হইবার আগেই টিউবের পাশের দিকে বাঁকিয়া যায় ও তথায় ঐ সব জ্যোতির্ময় বস্তুগুলির নিখুঁত প্রতিবিম্ব পড়ে এবং ঐ প্রতিবিম্বটি একটি আই-পিসের ভিতর দিয়া দেখা হয়। ঐ সব জ্যোতির্ময় বস্তুগুলি দূরবীণের আকার হিসাবে বহু গুণ বড় হইয়া আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়।

দূরবীণের প্যারাবোলিক দর্পণটি নির্মাণের জন্য নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি যোগাড় করা দরকার :—

১। দুইটি ৬" ব্যাসের ও ১" মোটা পালিস প্লেট কাঁচ।

২। একটি ভারী মজবুত টেবিল

৩। কার্বোরাণ্ডাম নামক কাঁচ ঘষিবার গুঁড়া। ইহা দানার আকার অনুসারে নানা নম্বরে প্রস্তুত হয়। নিম্নলিখিত দানাগুলি যোগাড় করিতে হইবে :

৮০ নং	১ পাউণ্ড
১৮০ নং	$\frac{১}{২}$ "
২২০ নং	$\frac{১}{৪}$ "
৪০০ নং	$\frac{১}{৪}$ "
৫০০ নং	$\frac{১}{৪}$ "
৬০০ নং	$\frac{১}{৪}$ "
৪। উত্তম রুজ গুঁড়া	$\frac{১}{২}$ "
৫। রজন	১ সের
৬। মোম	২ ছটাক
৭। স্পিরিট টার্পেণ্টাইন	২ আউন্স
৮। ১টি প্রাইমাস ষ্টোভ	

১" মোটা ও ৩" ব্যাসের একটি সেগুন কাঠের চাক্তি প্রস্তুত করুন। একটি এলুমিনিয়ামের পাত্রে এক ছটাক রজন ও ১ তোলা মোম একত্রে গলান। একটি তুলি করিয়া অল্প স্পিরিট টারপেণ্টাইন একটি কাঁচখণ্ডের একপৃষ্ঠে লাগান ও কাঁচটির মধ্যস্থলে গলান রজন ঢালুন—তরল রজন চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িবে। আন্দাজ ৩" ব্যাস স্থানে ছড়াইয়া পড়িলে ঐ কাঁচটির ঠিক মধ্যস্থলে পূর্বোক্ত কাষ্ঠখণ্ডটিকে রাখুন ও স্কেল দ্বারা মাপিয়া ঐ কাষ্ঠখণ্ডটিকে অঙ্গুলির চাপে এদিক ওদিক সরাইয়া কাঁচটির ঠিক মধ্যস্থলে রাখুন। রজন বেশ খানিকক্ষণ তরল থাকিবে ও কাষ্ঠখণ্ডটিকে নড়াইবার সময় পাইবেন। ৫।৬ ঘণ্টা পর ঐ রজন কঠিন হইয়া যাইবে ও কাষ্ঠখণ্ডটি কাঁচের পৃষ্ঠে উত্তমরূপে আটকাইয়া যাইবে। ৬ নং ক চিত্র দেখুন। এই কাঁচখণ্ডটিকেই দূরবীণের প্যারাবোলিক দর্পণে পরিণত করিতে হইবে।
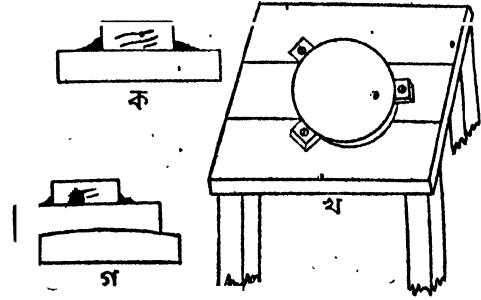
৬ নং চিত্র

এইবার বাড়ীর এক তলায় সব চেয়ে কম আলোবাতাস যায় এমন একটি নিরিবিলি ঘর ঠিক করুন। ঘরের মধ্যস্থলে টেবিলটি রাখুন ও উহার মধ্যস্থলে দ্বিতীয় কাঁচখণ্ডটি রাখিয়া তাহার চারিদিকে তিনটি ছোট কাষ্ঠখণ্ড ঠিক ১২০° অন্তরে রাখিয়া স্ক্রুর সাহায্যে এমন ভাবে আঁটুন যেন ঐ কাঁচখণ্ডটি তিনটি কাষ্ঠখণ্ডের ফাঁকে টেবিলের উপর বসাইয়া দেওয়া যায় ও ইচ্ছামত টেবিল হইতে উঠাইয়া লওয়া যায়। ৬ নং খ চিত্র দেখুন। এই কাঁচখণ্ডটিকে এখন হইতে টুল বলা হইবে।

এইবার একটি নূতন এনামেলের বাটিতে পরিষ্কার জল রাখুন। ধোপার বাড়ীর কাচা পরিষ্কার কাপড়ের কতকগুলি টুকরা পরিষ্কার ফুলস্কেপ কাগজে আলাদা আলাদা করিয়া মুড়িয়া রাখুন।

৮০ নং কার্বোরাণ্ডামের দানা কিছু টেবিলের উপর আঁটা টুলটির উপর রাখুন, তাহার উপর একটু জল দিন ও দর্পণটি কাঠের হাতলটি ধরিয়া

টুলটির উপর রাখুন। এইবার দাঁড়াইয়া দুই হাতে হাতলটি ধরিয়া দর্পণটিকে টুলের উপর খুব চাপ দিয়া সামনের দিকে এমন ভাবে ঠেলুন যেন দর্পণের কিনারা টুলের কিনারা হইতে .৩" দূরে যায়। সংগে সংগে ঐ একই চাপে দর্পণটিকে আপনার কোলের দিকে সোজা ভাবে টানুন যেন কোলের দিকেও দর্পণটির কিনারা টুলের কিনারা হইতে ৩" কোলের দিকে আসে। দর্পণটিকে এইরূপ সোজা একবার সামনের দিকে চাপের সহিত ঠেলা ও তার পরেই কোলের দিকে টানাকে ষ্ট্রোক্ বলা হয়। যেহেতু দর্পণটি সোজা সামনের দিকে টুল হইতে ৩" ও কোলের দিকে ৩" আসে সেজন্য এই মাপের ষ্ট্রোককে ৩" সরল-ষ্ট্রোক বলা হয়। ৫ বার এইরূপ ষ্ট্রোক দিন। তারপর দর্পণকে টুলের উপর ঘড়ির কাঁটার ন্যায় ডানদিকে ঘুরাইয়া আন্দাজ ১ টার জায়গায় (অর্থাৎ আন্দাজ ৩০°) রাখুন ও পুনরায় ৫টি ষ্ট্রোক দিন। পুনরায় দর্পণটিকে ঘড়ির ২টার জায়গা অবধি ঘুরান (অর্থাৎ আরও আন্দাজ ৩০° ডানদিকে ঘুরান) ও ৫টি ষ্ট্রোক দিন। এইভাবে দর্পণটিকে টুলের উপর ঘড়ির কাঁটার ন্যায় আন্দাজ ৩০° করিয়া ঘুরাইতে থাকুন ও প্রত্যেক জায়গায় ৫টি করিয়া ষ্ট্রোক দিন। এইরূপে দর্পণটি টুলের উপর ঘুরিতে ঘুরিতে পুনরায় প্রথম জায়গায় অর্থাৎ ১২টার ঘরে আসিবে ও ইতিমধ্যে ৬০টি ষ্ট্রোক দেওয়া হইবে। এইবার আপনি নিজে আপনার বাম দিকে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে আন্দাজ ৩০° দূরে দাঁড়ান ও সেই অবস্থায় পুনরায় দর্পণটিকে পূর্বের ন্যায় ১২ জায়গায় ৬০ টি ষ্ট্রোক দিন। পুনরায় নিজে বামদিকে আন্দাজ ৩০° দূরে দাঁড়ান ও পূর্বের ন্যায় ৬০টি ষ্ট্রোক দিন। এইরূপ করিতে করিতে আপনি টেবিলের চারিদিকে একবার সম্পূর্ণ ঘুরিয়া আসিবেন। টেবিলের চারিদিকে নিজে ঘুরিতে ঘুরিতে এবং সেই সংগে দর্পণটিকে উল্টাদিকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে ৫ টি করিয়া ষ্ট্রোক দিতে থাকুন অর্থাৎ ঘষিতে থাকুন। এইরূপ ঘষিতে ঘষিতে দেখিতে পাইবেন যে, কার্বোরাণ্ডামের দানাগুলি ক্রমশঃ গুঁড়াইয়া যাইতেছে। যখন শব্দ ও অনুভবে বুঝিতে পারিবেন যে, আর কাঁচঘষা অগ্রসর হইতেছে না, তখন একটি ন্যাকড়ার টুকরা কাগজ হইতে বাহির করিয়া বাটির জল দ্বারা টুল ও দর্পণের গায়ে যে সূক্ষ্ম কার্বোরাণ্ডাম গুঁড়া লাগিয়া রহিয়াছে তাহা ধুইয়া ফেলিয়া পুনরায় কিছু ৮০ নং কার্বোরাণ্ডাম দানা রাখিয়া পূর্বের ন্যায় ঘষিতে থাকুন। এইরূপ এক ঘণ্টা ঘষিবার পর দর্পণ ও টুল ধুইয়া ন্যাকড়ার দ্বারা পরিষ্কার ভাবে মুছিয়া ফেলুন। এখন দর্পণটির ঘষা দিকে চাহিয়া দেখুন উহা ডিসের ন্যায় খোঁদাল অর্থাৎ কংকেভ্ হইয়া গিয়াছে ও টুলটি ইহার বিপরীত অর্থাৎ কন্‌ভেক্স হইয়াছে। ৬ নং গ চিত্র দেখুন।

এইবার দর্পণটি জলে বেশ ভিজাইয়া সূর্যের রশ্মি কোন সুবিধাজনক দেওয়ালে প্রতিফলিত করুন—দেখিবেন সূর্যের রশ্মি দেওয়ালে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। এখন দর্পণটি দেওয়াল হইতে এমন জায়গায় পরীক্ষা করিয়া ধরুন যে, সূর্যের ফোকাসটি উজ্জ্বলতম বলিয়া বোধ হয়। দর্পণ হইতে ঐ ফোকাসের দূরত্ব মাপুন। যতক্ষণ না এই দূরত্ব ৫০" হয় ততক্ষণ পূর্বের ন্যায় ঘষিতে থাকুন। পুনরায় উত্তমরূপে ধুইয়া সূর্যের ফোকাস দেখুন। কিছুক্ষণ পরেই দেখিবেন যে, দর্পণটি এমন কংকেভ্ হইয়াছে যে ফোকাস ৫০" হইয়াছে।

এইবার দর্পণ, টুল, টেবিল, নিজের হাত ও নখের কোণ উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলুন যেন ৮০ নং কার্বোরাণ্ডামের কোন একটি গুঁড়াও ঐ ঘরে না থাকে। বাটির জল, নেকড়া সব ফেলিয়া দিন ও পুনরায় আর একটি নেকড়া কাগজ হইতে বাহির করিয়া বাটিতে পরিষ্কার জল দিয়া রাখুন। এইবার ১৮০ নং কার্বোরাণ্ডামের দানা ব্যবহার করিয়া পূর্বের ন্যায় ঘষিতে থাকুন। কিন্তু এইবার হইতে ২" সরল ষ্ট্রোক দিতে হইবে অর্থাৎ দর্পণটি টুলের ২" সামনে ও ২" কোলের দিকে আসিবে। এই

ভাবে ঘষিতে ঘষিতে দেখিবেন দর্পণের ঘষা দিকটি পূর্বাপেক্ষা মসৃণ হইয়া যাইতেছে। এক ঘণ্টা ঘষিবার পর পূর্বের ন্যায় ধুইয়া দর্পণটি সূর্যের রশ্মি দ্বারা পরীক্ষা করুন। ফোকাসটি পূর্বাপেক্ষা বেশী উজ্জ্বল দেখিবেন। যতক্ষণ ফোকাসের দৈর্ঘ ৪৯" না হয় ততক্ষণ ১৮০ নং গুঁড়া দ্বারা ঘষিতে থাকুন। ফোকাসটি ৪৯" হইলে পুনরায় সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলুন।

পুনরায় পরিষ্কার জল ও নেকড়া লউন ও এইবার ২২০ নং কার্বোরাণ্ডাম গুঁড়ার দ্বারা পূর্বের ন্যায় ২" সরল ষ্ট্রোক দিতে থাকুন। একঘণ্টা ঘষিবার পর দর্পণটি ধুইয়া পরীক্ষা করুন। সূর্যের ফোকাস পূর্বাপেক্ষা আরও বেশী উজ্জ্বল হইবে ও দর্পণের ভূমিটি আরও মসৃণ বোধ হইবে। আবার সব ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া একঘণ্টা ৪০০ নং গুঁড়া দ্বারা ঘষিতে থাকুন।

উপরিলিখিত কার্যগুলি উত্তমরূপে করিতে পারিলে ৬০০নং কার্বোরাণ্ডাম দ্বারা ঘষিবার পর দর্পণটি খুব মসৃণ ও অনেকটা স্বচ্ছ দেখাইবে। পুনরায় সমস্ত দ্রব্য অতি উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলুন যেন ঐ ঘরে কোথাও কার্বোরাণ্ডামের একটি গুঁড়াও না থাকে।

এইবার দর্পণটি পালিশ করিয়া কার্বোরাণ্ডাম গুঁড়ার দ্বারা ঘষার সব দাগ তুলিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ করিতে হইবে ও দর্পণের ভূমিকে প্রথমে নিখুঁত কংকেভ্ স্ফেরিক্যাল ভূমিতে আনিয়া পরে ঐ ভূমিকে প্যারাবোলিক ভূমিতে পরিবর্তিত করিতে হইবে।

একটি এলুমিনিয়ামের পাত্রের মধ্যে এক পোয়া রজন ও দুই তোলা মোম রাখিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া ঐ রজন-মোম ধীরে ধীরে গলান। রজন বেশ গলিয়া গেলে তাহাতে আন্দাজ দশ ফোঁটা স্পিরিট টার্পেণ্টাইন দিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া দিন। একটি পরিষ্কার পাতলা নেকড়া দু'ভাঁজ করিয়া তাহার উপর ঐ তরল রজন ঢালিয়া ছাঁকিয়া লউন। ঠাণ্ডা হইলে ঐ রজন জমিয়া যাইবে। তখন যদি বুড়া আঙ্গুলের নখের চাপে ঐ জমাট রজনের উপর অল্প নখের দাগ পড়ে তবে ঐ রজন ঠিক হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যদি বেশী নরম হইয়া যায় তবে অনেকক্ষণ ষ্টোভের উপর গরম করিতে হইবে, আর যদি বেশী শক্ত হয় তবে পুনরায় গলাইয়া তাহাতে আরও কিছু স্পিরিট টার্পেণ্টাইন দিতে হইবে।

একটি পরিষ্কার চায়ের কাপে খানিকটা রুজ একটু পরিষ্কার জলে ঘন করিয়া গুলিয়া রাখুন। তারপর টুলটির চতুর্দিকে একটি ১$\frac{1}{16}$" চওড়া ও আন্দাজ ২৪" লম্বা মোটা কাগজের দ্বারা ফিতার ন্যায় এমনভাবে জড়ান যেন টুলের ভূমির উপর $\frac{1}{16}$" চওড়া কাগজ উঁচু হইয়া থাকে; একটু গলান রজনের সাহায্যে কাগজের প্রান্তটি আঁটিয়া দিন। ৭ নং চিত্র দেখুন।
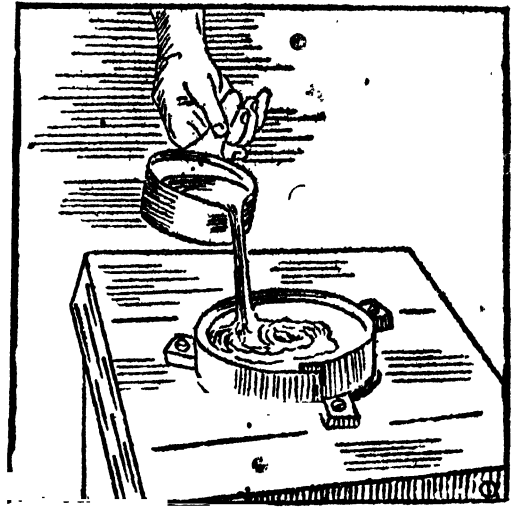
৭ নং চিত্র

তারপর টুলের উপর একপোঁচ স্পিরিট টার্পেণ্টাইন তুলির দ্বারা লাগাইয়া দিন ও পাত্রের গলান রজন ঐ টুলের উপর ঢালুন। ৭নং চিত্র দেখুন। তরল রজন কাগজের ফিতার মাথা অবধি ভরিয়া যাইবে। আন্দাজ মিনিট দশেক পরে ঐ রজন অল্প শক্ত হইলে কাগজের ফিতাটি

ছিঁড়িয়া ফেলুন ও একটি ½" চওড়া তুলির সাহায্যে দর্পণের উপর একপোঁচ রুজ কাপ হইতে লইয়া লাগান ও সংগে সংগে দর্পণটি আল্‌গাভাবে—অর্থাৎ মোটেই চাপ না দিয়া টুলের রজনের উপর রাখুন ও সংগে সংগে এদিক ওদিক নাড়িতে থাকুন। কিছুক্ষণ পরে রজন বেশ শক্ত হইয়া যাইবে ও দর্পণের কংকেভ ভূমির সম্পূর্ণ ছাঁচে পরিণত হইবে। আরও ঘণ্টাখানেক ধরিয়া দর্পণটি মধ্যে মধ্যে রজনের উপর এদিক ওদিক নাড়িতে থাকুন। রজন সম্পূর্ণ শক্ত হইলে দর্পণটি উঠাইয়া লউন। টুলের উপর দর্পণের সম্পূর্ণ ছাঁচে গঠিত এই লম্বা লাইন টানুন। ল্যাপের উপর চৌকা চৌকা ১¼" ঘর অঙ্কিত হইয়া যাইবে। লাইনগুলি এরূপভাবে টানিতে হইবে যে, ল্যাপের কেন্দ্র যেন মধ্যস্থ চৌকার এক কোণে পড়ে, অর্থাৎ ল্যাপের কেন্দ্র যেন কোন চৌকার কেন্দ্রে না পড়ে। ৮নং ক চিত্র দেখুন। চৌকার চারিদিকে ডবল্ লাইন-গুলি $\frac{3}{16}$" অন্তরে টানিতে হইবে।

ধারাল ছুরিটি ও সাবানজলের সাহায্যে ঐ ডবল লাইনগুলির মধ্যস্থ রজন 'V' অক্ষরের ন্যায় ঢাল করিয়া টুল পর্যন্ত আস্তে কাটিয়া ফেলুন। পরিষ্কার নেকড়ায় একটু স্পিরিট টার্পেণ্টাইন দিয়া টেবিল ও

৮নং চিত্র
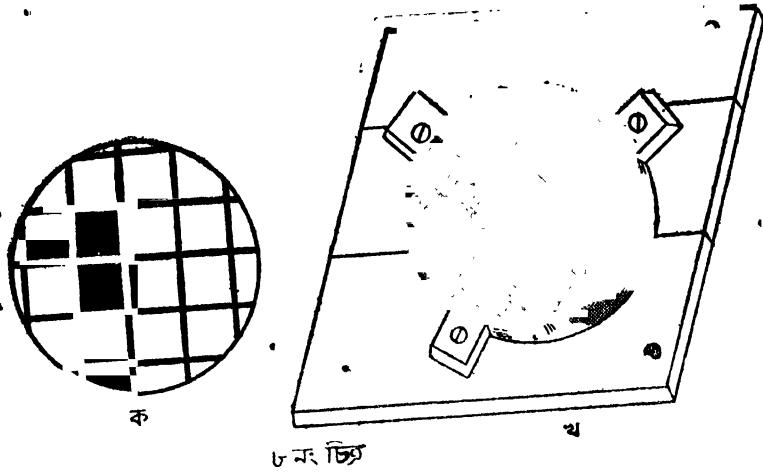
রজনের স্তরের উপর দর্পণটি রুজ দ্বারা পালিশ করিতে হইবে। এই তৈয়ারী রজনের স্তরকে বলা হয়, ল্যাপ। এখন একটি খুব ধারাল ছুরির দ্বারা টুলের চতুর্দিক হইতে যে সব রজন গড়াইয়া জমিয়া গিয়াছে তাহা কাটিয়া ফেলুন ও রজনের চারিধার একটু ঢাল করিয়া কাটিয়া দিন। ৮নং খ চিত্র দেখুন। জলে সাবান গুলিয়া সেই জল ছুরিতে লাগাইয়া তবে রজন কাটিবেন, নচেৎ ছুরিতে রজন লাগিয়া যাইবে ও ল্যাপ হইতে ছোট বড় চটা উঠিয়া যাইবে।

এইবার একটি পাতলা স্কেল ও পেন্সিলের দ্বারা ল্যাপের উপর ৮নং ক চিত্রের ন্যায় লম্বা ল্যাপের চারিপাশ হইতে রজনের গুঁড়া ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া ফেলুন। তখন ল্যাপটি দেখিতে ৮নং খ চিত্রের ন্যায় হইবে।

এইবার দর্পণটিতে আর এক পোঁচ রুজ লাগাইয়া ল্যাপটির ঠিক উপরে রাখিয়া দর্পণটির কাঠের হাতলের উপর একটি ৫ সের বাটখারা ঘণ্টা দুই রাখিয়া দিন। ল্যাপের উপরটি উপরে লিখিত পেন্সিল দিয়া লাইন টানা ও ছুরির দ্বারা কাটা ইত্যাদির জন্য কিছুটা দর্পণের ছাঁচ হইতে তফাৎ হইয়া যায়। বাটখারার ঐ চাপের দ্বারা ল্যাপটি পুনরায় দর্পণের ঠিক ছাঁচে পরিণত হইবে।

ইতিমধ্যে দর্পণটি পরীক্ষা করিবার জন্য টেষ্টিং র‍্যাক (৯ নং ক ও খ চিত্র) নাইফ-এজ ষ্ট্যাণ্ড (৯ নং গ চিত্র) ও কাঁচের চিমনীর বদলে পাতলা

৯ নং চিত্র
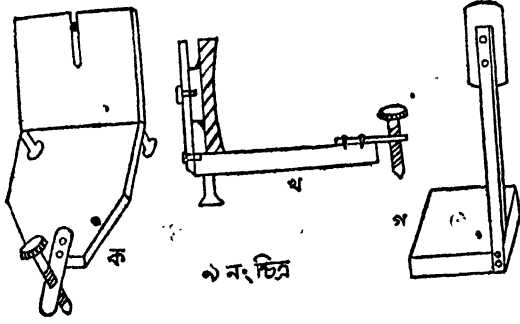
পিতলের চিমনীযুক্ত একটি আলো যোগাড় করিয়া রাখুন। চিমনীটিতে আলোর উচ্চতায় একটি খুব ক্ষুদ্র ছিদ্র করুন। একটি সরু ও প্রায় ৯½" লম্বা ভারী টেবিল যোগাড় করিয়া রাখুন।

লোহার বাটখারাটি উঠাইয়া রাখুন ও দর্পণের উপর এক পোঁচ রুজ লাগাইয়া ল্যাপের উপর রাখিয়া পূর্বের ন্যায় ২" সরল ষ্ট্রোক দিতে থাকুন।

এই কার্যকে পালিশ করা বলে ও ইহার দ্বারা দর্পণের ভূমি পুনরায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও চকচকে হইয়া যায়। ½ ঘণ্টা ধরিয়া পালিশ করুন। মধ্যে মধ্যে দরকার মত দর্পণে রুজ লাগাইবেন। ঐ ½ ঘণ্টার পর ১ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন ও ঐ এক ঘণ্টার পর পুনরায় পূর্বের ন্যায় ½ ঘণ্টা পালিশ করিতে থাকুন। এইরূপ ½ ঘণ্টা ধরিয়া পালিশ ও ১ ঘণ্টা ধরিয়া বিশ্রাম, এই পর্যায়ে পালিশ করিতে থাকুন ও মধ্যে মধ্যে একটি ভাল লেন্স অথবা আই-পিস্ দ্বারা দর্পণের জমিটি পরীক্ষা করিয়া দেখুন যে ঘষার কোন গর্ত বা আঁচড় আছে কি না। যতক্ষণ না দর্পণের জমি সম্পূর্ণ বেদাগ হয়, ততক্ষণ উপরে বর্ণিত প্রণালীতে পালিশ করিতে থাকুন।

সম্পূর্ণরূপে পালিশ হইলে দর্পণটিকে প্রথমে নিখুঁত স্ফেরিক্যাল ভূমিতে আনিয়া পরে ঐ ভূমিকে নিখুঁত প্যারাবোলিক ভূমিতে রূপান্তরিত করিতে হইবে। সেজন্য মধ্যে মধ্যে ফোকোস টেষ্ট দ্বারা পরীক্ষা ও দরকার মত অল্প অল্প পালিশ করিতে হইবে। কিরূপে ফোকোস টেষ্ট করিতে হয় এইবার তাহা বলি।

দর্পণটি উত্তমরূপে ধুইয়া ও পরিষ্কার নেকড়া দ্বারা মুছিয়া ৯নং খ চিত্রের ন্যায় টেষ্টিং র‍্যাকের উপর রাখিয়া ঐ র‍্যাকটি লম্বা টেবিলের একপ্রান্তে রাখুন ও টেবিলের অপর প্রান্তে ও দর্পণ হইতে ৯৬" দূরে ছিদ্রবিশিষ্ট চিমনীযুক্ত আলোটি ও চিমনীর বামপাশে ও খুব নিকটে নাইফ-এজ ষ্ট্যাণ্ডটি রাখুন। এইবার ১০নং ও ১১নং চিত্রের ন্যায় চিমনী ও ক্ষুরের ফলার মধ্যের ফাঁক দিয়া
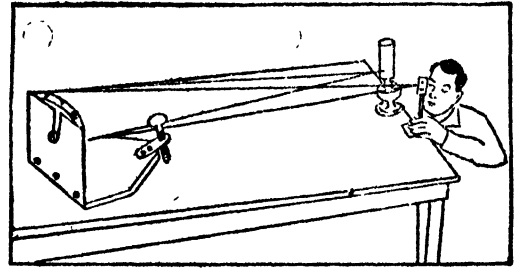
১০ নং চিত্র

দর্পণের দিকে চাহিয়া দেখুন। চিমনীর ছিদ্র হইতে বহির্গত কোণাকারে আলোকরশ্মিগুলি দর্পণের উপর প্রতিফলিত হইয়া পুনরায় চিমনীর বামপার্শ্বে দর্পণ হইতে ৯৬" দূরে কেন্দ্রীভূত হইবে ও ঠিক তথায় চক্ষু রাখিলে দর্পণটিকে খুব উজ্জল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দেখাইবে। সেই সংগে দর্পণটির ভূমির কি চেহারা, কোথায় উঁচু, কোথায় নীচু, কোথায় আঁচড়ের দাগ প্রভৃতি খুব জলজ্বলে ভাবে দেখিতে পাইবেন। এই পরীক্ষা এতই সূক্ষ্ম যে, ১০,০০০০০০ ইঞ্চি মাপের উঁচু নীচুও উত্তমরূপে দেখিতে পাইবেন। দর্পণের উপর এক সেকেণ্ড আঙ্গুল ঠেকাইয়া রাখিলে আঙ্গুলের উত্তাপে উত্তপ্ত সেই জায়গাটি ফোকোস টেষ্টে উঁচু ঢিবির ন্যায় দেখাইবে। প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে তবে ঐ ঢিবি দূর হইবে। কাজেই বুঝিয়া দেখুন, এই পরীক্ষা কত সূক্ষ্ম! ইহা একটা আলো ও ছায়ার ইন্দ্রজাল

এখন ফোকোস টেষ্টের ব্যাখ্যা জানা দরকার। ১২নং চিত্র দেখুন। চিম্‌নীর ছিদ্র হইতে কোণাকায় আলোকরশ্মি বহির্গত হইয়া দর্পণের উপর প্রতিফলিত হইয়া পুনরায় চিম্‌নীর বামপার্শ্বে খ

১১নং চিত্র

চিহ্নিত বিন্দুতে ফোকাস হইয়া তাহা হইতে পুনরায় ছড়াইয়া পড়ে। এখন খ চিহ্নিত স্থানের ঠিক পিছনে চক্ষু রাখিলে সমগ্র দর্পণটি উজ্জল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দেখাইবে। কারণ দর্পণ হইতে প্রতিফলিত সমস্ত রশ্মিই চক্ষুর ভিতরে প্রবেশ করিবে। এখন ঐ স্থান হইতে চক্ষু না নড়াইয়া বাম হস্ত দ্বারা ক্ষুরের ফলাটি আপনার বাম দিক হইতে সাবধানে খ চিহ্নিত স্থানে আহ্নন। ফলাটি খ বিন্দুতে পৌঁছিবা মাত্রই দর্পণের সমগ্র ভূমিটি যাহা পূর্বে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দেখাইতেছিল, দপ্ করিয়া
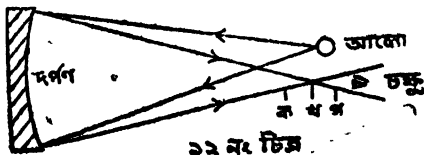
১২ নং চিত্র

অন্ধকার হইয়া যাইবে। ১৩ নং ক ও ঘ চিত্র দেখুন। কিন্তু যদি ফলাটি খ বিন্দুতে না আনিয়া মনে করুন ক-চিহ্নিত স্থানে আনা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, দর্পণটি বাম দিক্ হইতে অন্ধকার হইয়া যাইতেছে—১৩নং খ চিত্র দেখুন। আবার যদি ফলাটি গ চিহ্নিত স্থানে আনেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে দর্পণটি ডান দিক হইতে অন্ধকার হইয়া যাইতেছে,—১৩নং গ চিত্র
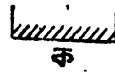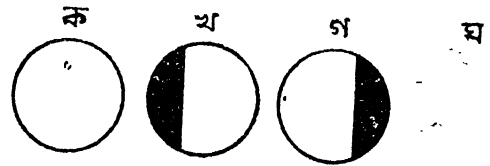
১৩ নং চিত্র

দেখুন। অন্ধকারের মধ্যের দিক্‌টা ক্ষুরের ফলার ন্যায় সরল হইবে। দর্পণটি যদি ঠিক নিখুঁত স্ফেরিক্যাল ভূমি হয় তবে উল্লিখিত খ বিন্দুতে ফলাটি আসিবামাত্রই সমগ্র দর্পণটি অন্ধকার হইয়া যাইবে। আশ্চর্যের কথা এই যে, দর্পণটি আসলে চায়ের ডিসের মত খোঁদাল হইলেও ফোকোর পরীক্ষায় সাধারণ দর্পণের ন্যায় সমতল বলিয়া বোধ হইবে। ১৩নং ক চিত্র দেখুন।

এখন মনে করুন, দর্পণটির মাঝখানে স্ফেরিক্যাল ভূমি অপেক্ষা কম বক্র, অর্থাৎ কম খোঁদাল আছে। ফোকোস টেষ্টে তখন দর্পণের ভূমিটি ১৪নং ক
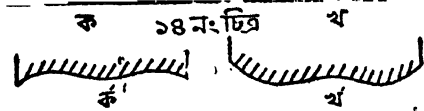
১৪নং চিত্র

চিত্রের ন্যায় দেখাইবে ও ঐ ভূমির ক্রস সেক্‌সন্ ১৪ নং ক' চিত্রের ন্যায় দেখাইবে। ঠিক বোধ হইবে

যেন মধ্যস্থলে একটি ঢিবির ন্যায় উঁচু রহিয়াছে। দর্পণের ভূমিটি ঠিক প্যারাবোলিক হইলে ১৪ নং খ চিত্রের ন্যায় ও উহার ক্রস-সেক্‌সন্‌ ১৪ নং খ চিত্রের ন্যায় দেখাইবে। দর্পণের ভূমিটি ইলিপ্‌সয়ড্যাল হইলে প্যারাবোলার ন্যায়ই দেখাইবে, তবে আলো ও ছায়ার সেডিং প্যারাবোলা অপেক্ষা খুব ক্ষীণ হইবে। ভূমিটি হাইপারবোলিক হইলে প্যারাবোলার ন্যায়ই দেখাইবে। তবে আলো ও ছায়ার সেডিং প্যারাবোলা অপেক্ষা তীব্র হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, প্যারাবোলিক ইলিপ্‌সয়ড্যাল ও হাই-পারবোলিক ভূমি এক জাতীয়। তফাৎ মাত্র সেডিংএ। সেজন্য চক্ষুর উপর নির্ভর না করিয়া মাপিয়া ঠিক করিতে হইবে। কিরূপে তাহা করিতে হয় এবার বলি। প্রথমে প্যারাবোলিক ভূমি হইতে ফোকোস টেষ্টে আলোকরশ্মিগুলি কি ভাবে প্রতিফলিত হয় তাহা জানিতে হইবে। এইবার ১৫নং চিত্র দেখুন। যেহেতু প্যারাবোলিক ভূমির মধ্যস্থল, কিনারা অপেক্ষা বেশী গভীর অর্থাৎ বক্র, সেজন্য মধ্যস্থলের কার্‌ভেচারের রেডিয়াস্‌গুলি কিনারার রেডিয়াস্‌ অপেক্ষা হ্রস্ব। সেজন্য প্যারাবোলিক ভূমির মধ্যস্থল হইতে প্রতিফলিত আলোকরশ্মিগুলি ক বিন্দুতে
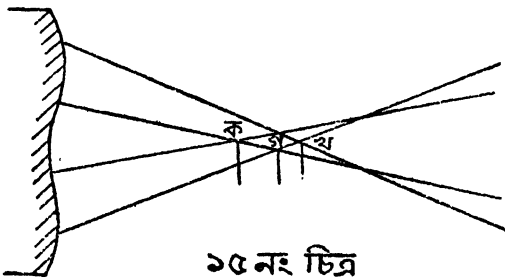
১৫নং চিত্র

কেন্দ্রীভূত হয় ও কিনারা হইতে প্রতিফলিত আলোকরশ্মিগুলি ক বিন্দু হইতে দূরে খ বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়। এই দুই কেন্দ্রের দূরত্ব $\frac{r^2}{R}$ ইঞ্চি হইবে। আমাদের দর্পণের বেলায় এই দূরত্ব '১" হইবে। এই দূরত্ব '১" অপেক্ষা কম হইলে ভূমিটি ইলিপ্‌সয়ড্যাল বুঝিতে হইবে ও এই দূরত্ব '১" অপেক্ষা বেশী হইলে ভূমিটি হাইপারবোলিক বুঝিতে হইবে।

কিরূপে এই দুই কেন্দ্রের দূরত্ব মাপা যায়?

একটি ৬" ব্যাসের পেষ্ট-বোর্ড হইতে ১৬ নং চিত্রের কালরঙ্গে অঙ্কিত জায়গাগুলি কাটিয়া বাদ
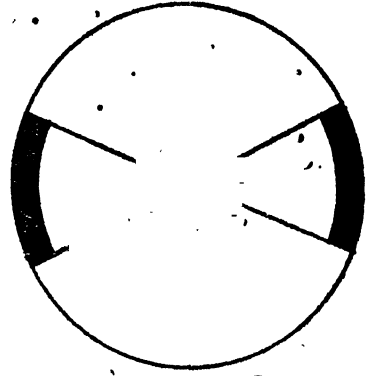
১৬ নং চিত্র

দিন। মধ্যস্থলের বৃত্তাকার ফাঁকটি ১½" হইবে ও ধারের ফাঁক দুইটি ½" চওড়া হইবে। এইবার ঐ কাটা পেষ্টবোর্ডটি টেষ্টিং র্যাকের উপর স্থাপিত দর্পণের সামনে ও দর্পণের কিনারায় ঠেকাইয়া দাঁড় করাইয়া রাখুন। এখন চিম্‌নীর ফুটা হইতে আলোকরশ্মিগুলি, দর্পণের যে অংশগুলি পেষ্ট-বোর্ড দ্বারা ঢাকা নয়, মাত্র সেই জায়গা হইতে প্রতিফলিত হইবে অর্থাৎ দর্পণের মধ্যস্থলের ১½" ব্যাসের জায়গা ও দু'পাশের ½" চওড়া জায়গা হইতে আলোক রশ্মিগুলি প্রতিফলিত হইবে। এইবার পূর্বের ন্যায় চক্ষু রাখিয়া ক্ষুরের ফলাটি যখনই ১৫নং চিত্রের ক বিন্দুতে আনিতে যাইবেন প্রথমে দর্পণের বামদিকে ফাঁকা জায়গাটি অন্ধকার হইবে ও ফলাটি ঠিক ক বিন্দুতে আসিলেই দর্পণের মধ্যস্থলের ১½" ব্যাসের জায়গাটি অন্ধকার হইয়া যাইবে। কিন্তু দর্পণের ডানদিকের ফাঁকা জায়গাটি উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। নাইফ-এজ ষ্ট্যাণ্ডের তলায় টেবিলের

উপর একটি সাদা কাগজ পিন দ্বারা আঁটিয়া রাখুন ও ক বিন্দুতে ফলাটি আসিলে সেই অবস্থায় ষ্ট্যাণ্ডের তলায় কাঠের সামনের ধারের গা দিয়া সম্মুখ পেন্‌সিলের দ্বারা কাগজের উপর একটি সরলরেখা টানুন। এইবার ফলাটি খ বিন্দুতে আনিতে থাকুন। প্রথমে দর্পণের ফাঁকা মধ্যস্থলের মাত্র দক্ষিণ অর্ধেক অন্ধকার হইবে। এইবার ফলাটি ঠিক খ বিন্দুতে আসিলে তৎক্ষণাৎ দর্পণের দু'-পাশের ফাঁকা ফালিমত জায়গা দুইটি একসঙ্গে অন্ধকার হইয়া যাইবে। কিন্তু দর্পণের মধ্যস্থলের ফাঁকা জায়গার বাম অর্ধেক উজ্জ্বল রহিবে। খ বিন্দুতে ফলাটি আসিলে পূর্বের ন্যায় পেন্‌সিল দ্বারা কাগজের উপর লাইন টানুন। ঠিকমত সরাইতে পারিলে পেন্‌সিলের রেখা দুইটি সমান্তরাল হইবে। এইবার ভাল স্কেলের সাহায্যে লাইন দুইটির অন্তর মাপুন। ঐ অন্তর যদি ·১ ইঞ্চি হয়, তবে দর্পণের ভূমিটি প্যারাবোলিক বুঝিতে হইবে— কম হইলে ভূমিটি ইলিপ্‌সয়ড্যাল ও বেশী হইলে ভূমিটি হাইপারবোলিক হইবে।

কিন্তু মনে করুন পালিশ করা শেষ হইলে ফোকোস টেষ্টে দেখা গেল, দর্পণটি হাইপারবোলিক হইয়া গিয়াছে। কিরূপে ঐ হাইপারবোলিক ভূমিকে প্যারাবোলিক ভূমিতে আনিতে হইবে তাহা জানা দরকার।

১৭নং চিত্র
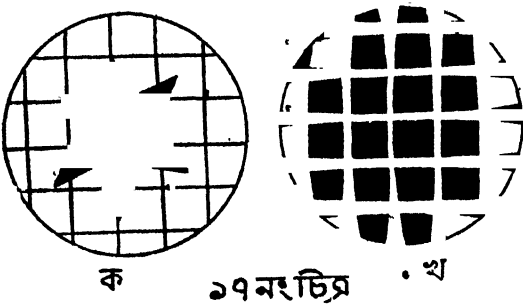
১৭নং ক চিত্রের কাল রঙে অঙ্কিত জায়গাটি ল্যাপ হইতে ছুরির দ্বারা সাবধানে কাটিয়া বাদ দিন। এই ল্যাপের উপর কিছুক্ষণ পালিশ করিতে থাকিলে হাইপারবোলিক দর্পণটি প্যারো-বোলিক হইয়া যাইবে। দর্পণের মধ্যস্থলের জায়গা কম ক্ষয় হইবে ও কিনারার জায়গা বেশী ক্ষয় বা বক্র হইবে ও সেজন্যই ঐ রূপ পরিবর্তন হইবে। আবার মনে করুন দর্পণটি প্রথম পরীক্ষায় স্ফেরিক্যাল বা ইলিপ্‌সয়ড্যাল বলিয়া বোঝা গেল। তখন ১৭নং খ চিত্রের কাল জায়গাগুলি ল্যাপ হইবে ও কাটিয়া বাদ দিতে হইবে। এই ল্যাপের দ্বারা কিছুক্ষণ পালিশ করিলে দর্পণের মধ্যস্থলের জায়গা বেশী ক্ষয় হইবে ও ধারের জায়গা কম ক্ষয় হইবে—সেজন্য কালক্রমে দর্পণটি প্যারাবোলিক হইয়া যাইবে। এই 'ফিগার' করার সময়ে সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে ৫।১০ মিনিট পালিশের পর একঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া তবে দর্পণটি ফোকোস টেষ্টের দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে তবেই দর্পণের ভূমির প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারিবেন।

এবার দর্পণের ভূমির উপর সাধারণ দর্পণের ন্যায় রূপার খুব পাতলা একটি স্তর জমাইতে হইবে। সাধারণ দর্পণে রূপার স্তরটি কাঁচের পিছনে থাকে, কিন্তু আমাদের এই দর্পণটির বেলায় রূপার স্তরটি পালিশ করা প্যারাবোলিক্ ভূমির উপর জমাইতে হইবে।

দর্পণের পিছনের কাঠের হাতলটি খুলিয়া ফেলুন। প্রথমে সাবান জলে ও পরে তীব্র নাইট্রিক এসিড্ দ্বারা দর্পণের ভূমি উত্তমরূপে পরিষ্কার করুন। তারপর তীব্র নাইট্রিক এসিড দ্বারা পরিষ্কৃত একটি আন্দাজ ৮" ব্যাস ও ২" গভীর এনামেলের পাত্রে খানিকটা ডিষ্টিল্‌ড্ ওয়াটার দিয়া দর্পণটিকে ঐ জলে ডুবাইয়া রাখুন। দর্পণের উপর আন্দাজ ½" জল থাকিবে। নাইট্রিক এসিড দ্বারা পরিষ্কৃত একটি কাঁচের গেলাসে ½ আউন্স সিলভার নাইট্রেট দানা, ½ গ্লাস ডিষ্টিলড ওয়াটারে গুলিয়া রাখুন। ঐ জলে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া লাইকার অ্যামোনিয়া ফর্ট ফেলুন। গ্লাসের জলটি মেঘের মত ধোঁয়াটে হইয়া যাইবে। একটা সরু কাঁচের

রড দ্বারা জলটি নাড়িতে থাকুন ও আরও অ্যামোনিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া দিতে থাকুন। কিছুক্ষণ পরেই গ্লাসের জলটি পুনরায় স্বচ্ছ হইয়া যাইবে। গ্লাসটি টেবিলের উপর রাখুন। আর একটি পরিষ্কৃত কাঁচের গ্লাসে ½ গ্লাস ডিষ্টিল্‌ড্‌ ওয়াটার দিন ও আন্দাজ এক চামচ ফরম্যাল ডিহাইড ঐ জলে ঢালিয়া দিন। এখন প্রথম গ্লাসে দ্বিতীয় গ্লাসের জল ঢালিয়া তৎক্ষণাৎ সেই জল এনামেলের পাত্রের জলের উপর ঢালিয়া দিন ও পাত্রটি হাতে করিয়া অল্প অল্প নাড়িতে থাকুন। আন্দাজ ৫ মিনিট পরই দর্পণের উপর সুন্দর রূপার স্তর পড়িয়া যাইবে।

এতক্ষণে আমাদের দূরবীণের দর্পণটি সম্পূর্ণ হইল। এইবার একটি কাঠামো তৈয়ারী করিয়া তাহাতে দর্পণটি ব্যবহারোপযোগী করিয়া আটকাইয়া রাখিতে হইবে। এই কাঠামো নানা আকারের ও নানাপ্রকারের হয়।

একটি ৫"×৭"×১" ও একটি ৭"×৭"×১" পিচ্‌-পাইন তক্তা যোগার করুন। ছোট কাঠটির ঠিক মধ্যস্থলে দর্পণের ব্যাসের মাপের ½" গভীর একটি খাঁজ বাটালির দ্বারা কাটুন। দর্পণটি ঐ কাঠের খাঁজের মধ্যে যেন ½" ঢুকিয়া বসিতে পারে। ঐ খাঁজের মধ্যস্থলে একটি ৪" ব্যাসের
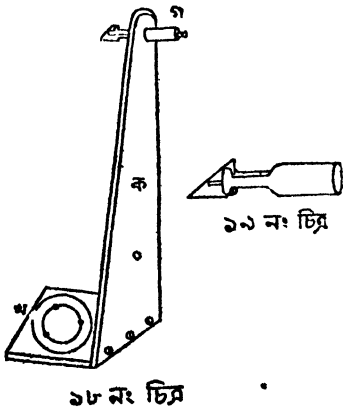
১৮ নং চিত্র

বৃত্ত অঙ্কন করুন ও ঐ বৃত্তের উপর ঠিক ১২০° অন্তরে তিনটি ¼" মোটা ও ২" লম্বা গ্যাল্‌ভ্যানাইজ্‌ড্‌ স্ক্রু যাহাতে প্যাচের সাহায্যে উঠানামা করিতে পারে—তুরপুণের সাহায্যে এমন ৩টি ছিদ্র করুন এবং তিনটি মাথা তলার দিকে করিয়া ঐ ছিদ্র তিনটির মধ্যে প্যাচের দ্বারা অল্প ঢুকাইয়া দিন। লম্বা তক্তাটি ১৮ নং ক চিত্রের ন্যায় কাটিতে হইবে। খাঁজ করা ছোট তক্তাটি ১৮ নং খ চিত্রের ন্যায় হইবে। এইবার ১৮ নং চিত্রের ন্যায় কাঠ দুইটি স্ক্রুর সাহায্যে আঁটুন। একটি ৬" লম্বা ১" ব্যাসের পিতলের টিউব ও একটি ১" ভাল
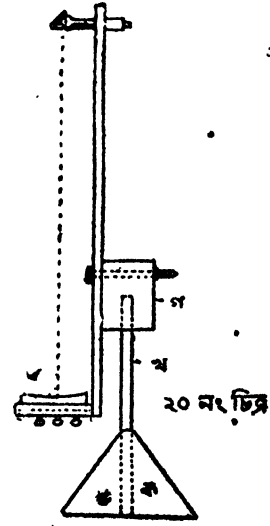
২০ নং চিত্র

প্রিজম্‌ যোগাড় করুন। টিউবটি ১৯নং চিত্রের ন্যায় কাটিয়া প্রিজম্‌টি উহাতে আটকাইয়া দিন। দর্পণটি ১৮নং খ চিত্রের কাঠের খাঁজটির ভিতর বসাইয়া দিন ও ঐ দর্পণ হইতে ৪৩½" দূরে ১৮ নং ক চিত্রের লম্বা কাঠের সরুদিকের ঠিক মধ্যস্থলে পিতলের টিউবের ঠিক ব্যাসের মাপে ছিদ্র করুন ও ১৮ নং গ চিত্রের ন্যায় প্রিজম্‌ শুদ্ধ টিউবটি ঐ ছিদ্রের মধ্যে শক্তভাবে এমনভাবে ঢুকাইয়া দিন যেন প্রিজমের মধ্যবিন্দু দর্পণের মধ্যবিন্দুর উপর পড়ে।

এইবার একটি ১" মোটা ও ৩৬" লম্বা লোহার পাইপ যোগাড় করুন। ২০নং ক ও খ চিত্রের ন্যায় লোহার পাইপটি সিমেণ্ট, বালি ও খোয়ার মধ্যস্থলে ঠিক খাড়াভাবে রাখিয়া কংক্রিট জমাইয়া দিন।

একটি ৬"×৩½"×৩½" সেগুন কাঠ যোগাড় করুন ও ৩½"×৩½" মাপের একদিকে ৩½" লম্বা ও এমন এক ব্যাসার্ধের ছিদ্র করুন যেন কাঠটি ২০ নং গ চিত্রের ন্যায় লোহার পাইপটির উপর ৩½" বসাইয়া দিলে স্বচ্ছন্দে অথচ ঢলঢলে না হইয়া ঘুরিতে পারে। এইবার ঐ কাঠটির ৬"×৩½" দিকে ½" মোটা এফোঁড়-ওফোঁড় ছিদ্র করুন। একটি ½" ব্যাসের ও ৫" লম্বা লোহার বোল্ট ও নাট্ যোগাড় করুন। ১৮ নং ক চিত্রের লম্বা কাঠটির যেখানে ভারসাম্য হয় সেখানের ঠিক মধ্যস্থলে ½" মোটা এফোঁড়-ওফোঁড় ছিদ্র করুন ও ৫" লম্বা বোল্টটির দ্বারা উহা লোহার পাইপের উপর কাঠটির সহিত ২০ নং চিত্রের ন্যায় এমন জোরে আঁটিয়া দিন যেন ঢলঢলে না হইয়া ঘুরিতে পারে। এইবার একটি আই-পিস যোগাড় করিয়া পিতলের টিউবের ভিতর ২০ নং চিত্রের ন্যায় ঢুকাইয়া দিন ও দূরবীক্ষণটি চন্দ্র বা বৃহস্পতি বা অপর কোন জ্যোতিষ্কের দিকে ঘুরাইয়া আই-পিস্‌টি ঠিক ফোকাস্ করিলেই তাহাদিগকে পরিষ্কার দেখিতে পাইবেন।

বিজ্ঞান ও বাঙ্গালা ভাষা

যদি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহা না করিলেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকৃষ্টরূপে ফলবতী হইবে না, তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখিতে হইবে। দুই চারি জন ইংরেজিতে বিজ্ঞান শিখিয়া কি করিবেন ?… তাহাতে সমাজের ধাতু ফিরিবে কেন ? সামাজিক 'আবহাওয়া' কেমন করিয়া বদলাইবে ? কিন্তু দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে যাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে। কেহ ইচ্ছা করিয়া শুনুক আর নাই শুনুক, দশবার নিকটে বলিলে দুইবার শুনিতেই হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবর্তিত হয়। ধাতু পরিবর্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়। অতএব বাঙ্গালাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।

বঙ্গে বিজ্ঞান (বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১২৮৯)

জল

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

আমার এক ডাক্তার বন্ধু সৈন্য দলের সঙ্গে সুয়েজ খালের কাছে মরুভূমিতে ছাউনি ফেলেছিলেন। তাঁর তৃষ্ণার তীক্ষ্ণতা বর্ণনা করতে তিনি বললেন পথের ধারে পড়ে থাকা মরিচা ধরা টিনের খোলাটে জল একদিন তিনি পান করেছিলেন। জল আমাদের নিত্য দরকারী জিনিষ। যেমন বাতাস তেমনি জল। এ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি নে। আমরা যখন অপরিণত অবস্থায় মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে বাস করি, তাও একটা জলভরা পাতলা আস্তরণের মধ্যে। জীবনের সঙ্গে, আমাদের জন্ম বাঁচা বাড়ার সঙ্গে, জলের সম্বন্ধ অত্যন্ত সুনিবিড়। এই পৃথিবীতে জলের পরিমাণও কি কম! সারা পৃথিবীটাকে যদি চারভাগে ভাগ করি তাহলে তার তিন ভাগ কেবল জলে ঢেকে থাকবে। ভূগোলে আমরা যেমন পড়ি যে পৃথিবী হ'ল একটা বলের মত গোল, তেমন সত্যই যদি পৃথিবী কেবল গোলাকার হ'ত, কোন উত্তুঙ্গ পাহাড় পর্বত, গাছ পালা, জমি যদি এতে না থাকত, তাহলে অবশ্যই কেবল সারা পৃথিবী জুড়ে জলে জলময় হ'য়ে থাকত। সে জলের বিস্তারও কম হ'ত না। তার বিস্তৃতি হ'ত পৃথিবীর ব্যাসের সমান। গভীর হ'ত কম করে দু'মাইল! এই রকম মহাম্বুধি যদি নোয়াকে পার হ'তে হ'ত, তাহ'লে আমি নিশ্চিত বলতে পারি সেই সাবেকী নৌকায় চল্লিশ দিন পরে তাঁকে আর স্থল দেখতে পেতে হ'ত না, কোন কিছু কঠিন পদার্থও চতুষ্পার্শ্বে চোখে পড়ত না। তাঁকে অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করতে হ'ত, যতদিন না জলের খানিকটা অংশ ঠাণ্ডায় জমে বরফ হ'ত। এত গেল কল্পনার কথা। বাস্তব জগতের কথা বলি। স্থল হিসাবে সব চেয়ে উঁচু স্থল বা পাহাড় হ'ল গৌরিশঙ্কর চূড়া। এর উচ্চতা হ'ল ২৯,০০২ ফুট। তেমনই সব চেয়ে গভীর জল বা সাগর হ'ল প্রশান্ত মহাসাগরের খানিক অংশ। এ কোথায় জানেন? প্রশান্ত মহাসাগরে, ফিলিপাইন দ্বীপের পূর্ব দিকে। এখানে সাগরতল হ'ল ৩৫,০০০ ফুট গভীর। এ জায়গাটার নাম মিনডানাও ডীপ। এখন ধরুন আধুনিক কালের কোন কালাপাহাড়ী মনোবৃত্তি সম্পন্ন বীর লাঙ্গুল পেঁচিয়ে গন্ধমাদনের মত গৌরিশঙ্কর গিরিশিখর সমূলে উৎপাটিত করে ফেলেন, অবশ্য করা বিচিত্র নয়, আধুনিক বীরের সহায়ে ক্রেন আছে, কপিকল আছে। তারপর সে বীর যদি সংকল্প করেন যে, তিনি ভারতবর্ষের এ উচ্চশিরের গৌরব নিশ্চিহ্ন করে ফেলবেন। জড় ও চল সব বিষয়ে ইউরোপই মাথা উঁচু করে থাকবে। তখন তিনি কি করবেন? আধুনিক লাঙ্গুল সাহায্যে তিনি ঐ উৎপাটিত চূড়া নিক্ষেপ করবেন সেই মিনড নাও ডীপে। তা হ'লে কি হবে? তা হ'লে পুকুরে ঘটি ডোবার মত গৌরিশঙ্কর টুপুস করে ডুবে যাবে। কোন চিহ্নই তার থাকবে না। তারপর কোন এক অনাগত কালে যদি ভারত গৌরব পুনরুদ্ধারকল্পে কোন দল ঐ গৌরিশঙ্কর শিখর সাগরে সাগরে খুঁজে ফেরেন, তা হ'লে সাগর গর্ভে ডুবুরীকে নামাতে হবে মাইল খানেক। তখন সে ডুবুরী গৌরিশঙ্করের মাথায় দাঁড়াতে পারবে।

জলরাশির চাপও কি কম! একফুট বর্গক্ষেত্রে যদি একফুট উঁচু করে একটা বেড়া দেওয়া যায় তাহ'লে চার চৌকা একটা বাক্সের মত হবে তো! ঐ বাক্সে যদি কানায় কানায় জল ভরে দিই তাহ'লে ঐ বর্গক্ষেত্রে চাপ পড়বে প্রায় ত্রিশ সের ওজনের।

আমাদের জগতে এত জল আছে ব'লেই এতে গাছপালা, অন্যান্য প্রাণী; মানুষ সব বাঁচতে ও বাড়তে পারছে। যদি না থাকত, তাহ'লে এ জগত মরু হ'য়ে পড়ত, এতে না থাকত মানুষ, না কোন জন্তু, না গাছপালা। আমাদের শরীরের ভিতরেও জল আছে। আমাদের মেদ, মজ্জা, মাংস, এমন কি হাড়ে, চুলে পর্যন্ত জল আছে। এ জল আমরা চোখে দেখতে পাই না। একজন মানুষের ওজন যদি হয় দেড়মণ, তো তার শরীরে জল থাকবে অন্ততঃ আধমণ। আর বাকী একমণ হ'ল হাড় মাংস ইত্যাদির ওজন। এত জল আমরা পাই খাদ্য থেকে। আমরা যখন খাবার খাচ্ছি, দুধ চা ইত্যাদি পান করছি তখনই অনেক পরিমাণে আমরা বাইরের থেকে জল নিচ্ছি। জল কিসে নেই বলুন? মাছ মাংস খাচ্ছেন, তাতে জল রয়েছে, সে জল পেটে যাচ্ছে। আলু মুলো শাকপাতা খাচ্ছেন, তাতে থাকা জল পেটে ঢুকছে। শাকসব্জীতেই কি জলের পরিমাণ কম। একসের পালং শাকে অন্ততঃ আড়াই পো জল। একসের শাক কিনে, বেশ করে রোদে শুকালে শাকের পাতা কুঁচকে ছোট আর পাতলা হ'য়ে আসে, ডাঁটাগুলি রোগা হ'য়ে যায়। এমনি কিছু দিন পরে যখন পাতা শুকিয়ে খড় খড় করে, ডাঁটাগুলি পাটকাঠির মত মট্ মট্ করে ভাঙ্গতে পারা যায়, তখন ওজন করলে দেখা যাবে ওজন হবে মাত্র দেড় পো। বাকী আড়াই পো কমে যায়। সেটাই জলের ওজন। শাকে জল থাকে, সূর্যের তাপে বাষ্প হ'য়ে যায়।

আমাদের খাদ্য পানীয় আমাদের শরীরে জল সরবরাহ করছে। পাকস্থলীতে সব সময় পাঁচ সের তরল জল থাকে। পেট যেন এঞ্জিনের বয়লার, সেখানে সদাসর্বদা জল মজুত থাকা চাই। তারপর ধরুন রক্ত। শরীরে রক্তের পরিমাণ কত জানেন? আপনার ওজন যদি হয় দেড় মণ, তাহ'লে আপনার শরীরে রক্ত আছে চার সের। এই হ'ল সাধারণ মাপ, তারপর কম বেশিও হ'তে পারে। তবে খুব কম বেশি নয়। এই রক্তের বেশির ভাগই জল—শুধু জল নয়, নুন গোলা জল। চার সের রক্তের সবটাই প্রায় জল, তাতে নুন গোলা। সে নুনের পরিমাণ খুব কম নয়, প্রায় এক পোয়া। যদি আমাদের শরীরে সাড়ে বার সের রক্ত থাকত তাহ'লে নুনের পরিমাণ হ'ত এক সের। রক্ত যদি তরল পদার্থ না হ'ত, তা হ'লে সারা শরীরে রক্ত চলাচল সম্ভব হ'ত না। আর তাহ'লে লাল কণিকাগুলি সারা শরীরে অক্সিজেন কণা চালিত করতে পারত না। ফলে রক্ত দূষিত হ'য়ে আমাদের জীবন সংশয় হ'ত। পেটের গহ্বরে যে পাঁচ সের জল সর্বদা মজুত থাকে তারও অনেক প্রয়োজন। ধরুন কলেরা, আমাশয় জাতীয় যদি কোন রোগ জন্মায়, তা হ'লে অধিকবার দাস্ত হয়। তার জলীয় অংশ ঐ মজুত থাকা জল সরবরাহ করতে থাকে। ঐ জল নিঃশেষ হ'য়ে গেলে রক্তে থাকা জলে টান পড়ে। তাই চিকিৎসকেরা শিরার ভিতরে অল্প গরম নুনজল প্রবেশ করিয়ে দেন যাতে রক্তচলাচলে বাধা না পড়ে। কেন না রক্তের জলীয় অংশ কম হ'তে থাকলে, রক্ত ক্রমশঃ ঘন হ'য়ে পড়বে। তাহলে রক্ত চলাচলে বাধা না পড়ে। শরীরের বর্জনীয় অংশ মূত্রাকারে ঘর্মাকারে শরীর থেকে বেরিয়ে আসে। নালা নর্দমা পরিষ্কার রাখতে যেমন জলের প্রয়োজন আমাদের শরীরের ভিতরও জলের কাজও তাই। নদী খাল সমুদ্রের জলের উপর নৌকা বা জাহাজ ভাসিয়ে যেমন নানা জাতের পণ্য দেশবিদেশে আমদানী রপ্তানি হয়, তেমনি রক্তের জলে লাল কণিকার নৌকা চড়ে, অক্সিজেন সারা শরীরে সঞ্চালিত হয়।

যখন পৃথিবীর আদিম অবস্থা তখন ছিল কেবল জল। গাছপালা জমি পাহাড়, জন্তু জানোয়ার কোন কিছুই ছিল না। তারপর কোন রহস্যময় অজানা উপায়ে সূর্যকিরণের কোন কারসাজিতে সেই জলের বুকে জীবকণা ভেসে বেড়াতে

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

পাখীর কৌতূহল।

জ্ঞান বিজ্ঞানের খবর জানবার জন্যে
তোমাদের কৌতূহল জাগ্রত হোক।
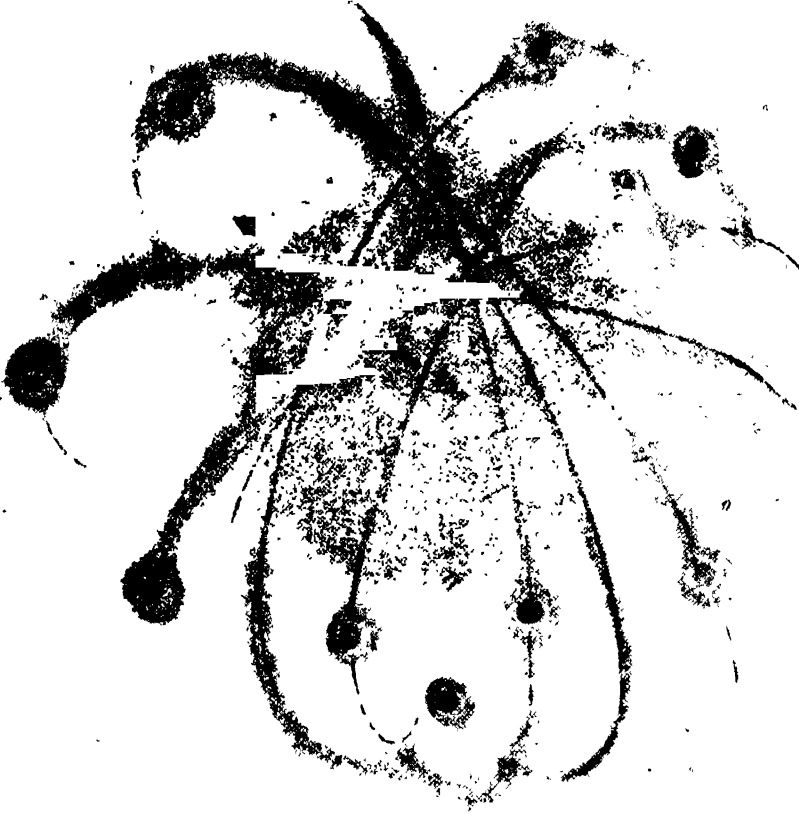
নিয়ন পরমাণুর ভিতরের গঠন।

পরমাণু হলো পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ। এক সময়ে ধারণা ছিল পদার্থের এই সূক্ষ্মতম অংশগুলো সম্পূর্ণ নিরেট। কিন্তু বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে জানা গেছে—পরমাণু মোটেই নিরেট নয়। পরমাণুর মধ্যস্থলে আছে নিউক্লিয়াস নামে একটা পদার্থ। এই নিউক্লিয়াসটার চারধারে ঘুরছে ইলেকট্রন নামে কতকগুলো ঋণ-তড়িতাবিষ্ট কণিকা। আর প্রোটন ও নিউট্রন নামে কতকগুলো কণিকার সমবায়ে নিউক্লিয়াসটা গঠিত। প্রোটন ধন-তড়িতাবিষ্ট কণিকা। নিউট্রনে কোন তড়িতাবেশ নেই। বিভিন্ন পদার্থের পরমাণুর ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন ও সুনির্দিষ্ট। পরমাণুর গঠন কি রকমের, এই ছবি থেকে তার আভাস পাবে। মধ্যের গোল বস্তুটা নিউক্লিয়াস আর বাইরের দিকের ছোট ছোট গোলাকার পদার্থগুলো ইলেকট্রন। মোটা লাইনগুলো ইলেকট্রন ঘোরবার রাস্তা।

লাগল। জল ছিল বলে না হয় আসতে লাগল কিন্তু উদ্ভব হ'ল কেমন করে? কেউ তা' জানে না। সেই আদিম জীবকণাগুলি আর কিছু নয়, কেবল একটা পাতলা চাদরে মোড়া জল বিন্দু। অবশ্য বিশুদ্ধ জল নয়। জলে মিশ্রিত এমন কিছু যাতে প্রাণশক্তি সঞ্চরণ করছে। তারপর দুই বা তার চেয়ে বেশি জীবকণা যুক্ত হ'য়ে আর একটু বড় পাতলা সরের মত জীবকণা সৃষ্টি হ'ল। সেটা জলের বুকে নানান রূপ ধরে ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল। কখনও হ'ল গোলাকার কখনও হ'ল ত্রিভুজাকার, কখনও যেমন তেমন একটা আকার। বাতাস খেলতে লাগল জলের বুকে, জলের নেচে চলা তরঙ্গের সংগে সে রূপ বদলিয়ে ফিরতে লাগল। বৈজ্ঞানিকেরা এর নাম দিলেন এমিবা অর্থাৎ পরিবর্তনশীল। এর পর থেকে জাগতিক বিবর্তনে বিবিধ পশুপক্ষী, গাছপালা, পোকামাকড় জন্ম নিল। পৃথিবীতে যেসব জিনিষ জীবন্ত, তার প্রত্যেকেরই জীবকোষে ঐ পাতলা সরের মত জীবকণা আজও রয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিকেরা তাই থেকে স্থির করেছেন, কি উদ্ভিদ, কি প্রাণী সকলেরই উৎপত্তি সেই আদিম জীবকণা থেকে, যা পৃথিবীর জলের বুকে স্মরণাতীত যুগে রেখা টেনে টেনে ঘুরে বেড়িয়েছে। তাই বলছিলাম জীবনের সংগে, আমাদের জন্ম, বাঁচা বাড়ার সংগে জলের অত্যন্ত নিবিড় সম্বন্ধ। জল ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না।

"** যে (রুশ) ভাষা রুশ ভল্লুকের উপযুক্ত বলিয়া উপহসিত হইত, টলষ্টয়ের ন্যায় ঔপন্যাসিক সে ভাষাকে বিবিধ আভরণে সাজাইয়া জগতের সম্মুখে সমুপস্থিত করিয়াছেন। সেই ভাষাতেই রুশ রসায়ন-শাস্ত্রবিদ Mendeleef স্বীয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সমুদায় লিপিবদ্ধ করিয়া ইউরোপীয় অপরাপর পণ্ডিতদিগকে রুশ ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই ত মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

** ফলকথা এই যে, আমরা যতদিন স্বাধীনভাবে নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব ততদিন আমাদের ভাষার এই দারিদ্র ঘুচিবে না। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি একপ্রকার মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। যেমন ধনীর সন্তান পৈতৃক বিষয় হারাইয়া নিঃস্বভাবে কালাতিপাত করেন, অথচ পূর্বপুরুষগণের ঐশ্বর্যের দোহাই দিয়া গর্বে স্ফীত হন, আমাদের দশা সেইরূপ।"

জেনে রাখ

প্রজাপতির জন্মরহস্য

রূপকথায় তোমরা ব্যাং-রাজপুত্র, বানর-রাজপুত্রের কথা শুনেছ। কুঁয়োর ব্যাং, সে চায় রাজকন্যাকে বিয়ে করতে। বিয়ের পর দেখা গেল, বাসর ঘরে ব্যাং তার খোলসটাকে ফেলে দিয়ে দিব্যি এক রাজপুত্রের রূপ ধারণ করেছে। বানর-রাজপুত্রের কাহিনীও ওই রকমের। এসব রূপকথা শুনে তোমাদের কি মনে হয়েছে? সত্য সত্যই কি একটা ব্যাং তার খোলসটা ফেলে দিয়ে মানুষের রূপ ধারণ করতে পারে? পশুপক্ষি বা মানুষের ভিতর কি এরকমের কোন ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে? এগুলো যে মনগড়া গল্প-কথা সেটা তোমাদের অজানা নয়। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে যে এরকমের ঘটনা সত্য সত্যই ঘটে থাকে—তোমরা তার কোন খবর রাখ কি? ব্যাপারটা জেনে নিয়ে নিজের চোখে দেখবার চেষ্টা করো। দেখলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাবে। তোমাদের কেবল জেনে রাখবার জন্যেই বলছিনা, চোখে দেখবার জন্যেও অনুরোধ জানাচ্ছি। কীট-পতঙ্গের মধ্যে এরকমের রূপ পরিবর্তনের ঘটনা তোমাদের আশেপাশে অনবরতই দেখতে পাবে। এ সম্বন্ধে অনেক কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তবুও কীট-পতঙ্গ সম্পর্কে অনেককাল গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ফলে যা প্রত্যক্ষ করেছি তাথেকে তোমাদের নিত্য পরিচিত প্রজাপতির জন্মরহস্যের কথা বলছি। কারণ ইচ্ছা করলে এদের জীবনের ঘটনা অনায়াসেই তোমরা নিজের চোখে দেখতে পারবে। কখনও যদি নিজের চোখে দেখতে পাও তখন বুঝবে—রূপকথায় ব্যাং-রাজপুত্রের ঘটনার চেয়েও ব্যাপারটা কিরূপ অদ্ভুত ও কত বিস্ময়কর!

ছোটবেলায় শুনেছিলাম শোঁয়াপোকা কোন পাত্রের মধ্যে বন্ধ করে রাখলে কিছুদিন পরে সেটা ফড়িং হয়ে উড়ে যায়। কথাটা শুনে কৌতুহল অদম্য হয়ে উঠেছিল।

একটা শোঁয়াপোকা ধরে মাটির গ্লাস চাপা দিয়ে রাখলাম। মাঝে মাঝে তুলে দেখি, কিছুই হয়নি, যেমন শোঁয়াপোকা তেমনই রয়েছে, তবে পোকাটা বরাবর একই স্থানে চুপ করে বসেছিল। কয়েকদিন আর লক্ষ্য করি নাই। ভুলে গিয়েছিলাম। দিন দশ বারো পর একদিন গ্লাসটা তুলে দেখলাম—শোঁয়াপোকাটার চিহ্নমাত্রও নেই, গ্লাসটার একপাশে সাদা রঙের ছোট্ট একটা পতঙ্গ বসে আছে। ফড়িং হয় নি নিশ্চয়ই। যদিও বা সেই পতঙ্গটাই হয়ে থাকে তবে সেটাই বা কোথা থেকে কেমন করে হলো? তখন কিছুই বুঝতে পারিনি।

অনেককাল পর একদিন কোন এক পাড়াগাঁয়ের বাগানে বেড়াবার সময় দূর থেকেই
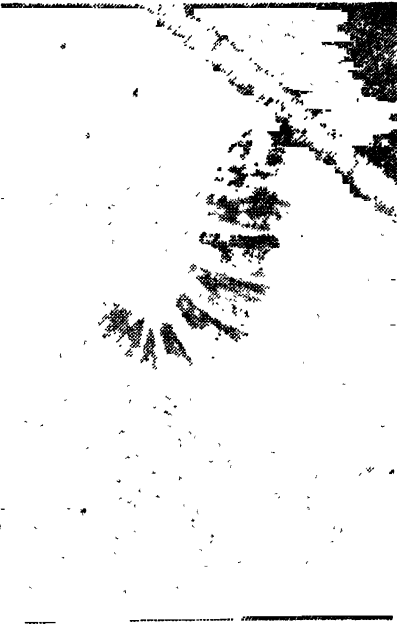
ক্যাটারপিলার পুত্তলীতে রূপান্তরিত হবার পূর্বে একটা ডাঁটার সংগে বড়শীর মত বাঁকা হয়ে ঝুলছে।

ক্যাটারপিলার খোলস ফেলে গুটি বা পুত্তলীর আকার ধারণ করেছে। প্রথম অবস্থা।

একটা করবী-ডালের উপর নজর পড়ল। করবী-ডালটার একটা পাতার নীচে উজ্জ্বল রূপালী রঙের কি একটা পদার্থ যেন ঝিকমিক করছে। কৌতূহলের বশে গাছটার কাছে গিয়ে দেখলাম পাতার নীচের দিকে কালো রঙের ছোট্ট একটা বোঁটা থেকে উজ্জ্বল রূপালী রঙের চীনাবাদামের মত অদ্ভুত একটা পদার্থ ঝুলছে। পূর্বে কখনও এরূপ অপরূপ পদার্থ নজরে পড়েনি। ব্যাপারটা যে কি কিছুই বুঝে উঠতে পারা গেল না। বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে এবং বিচিত্র কারুকার্যে মুগ্ধ হয়ে পাতা সমেত সেই পদার্থটাকে তুলে এনে একটা কাচপাত্রে ঢেকে রাখলাম। পরদিন সকাল বেলায় উঠে দেখি, কাচপাত্রটার মধ্যে সাদা ফোঁটায় বিচিত্রিত কালোরঙের মস্ত

বড় একটা প্রজাপতি ঝটপট করছে। ব্যাপার কি? রূপালীরঙের সেই চীনাবাদামের মত পদার্থটা গেল কোথায়? প্রজাপতিটাই বা কাচপাত্রের মধ্যে এল কোথা থেকে! পাত্রের মধ্যে কেবল করবীর পাতাটাই রয়েছে। চীনাবাদামটাকে দেখতে পাওয়া গেল না। তবে কি সেই অপরূপ চীনাবাদামটার ভিতর থেকেই প্রজাপতিটা বেরিয়েছে? তাও সম্ভব বলে মনে হলো না। কারণ প্রজাপতিটা এত বড় যে, ওটুকু পদার্থের মধ্যে থাকা অসম্ভব। বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। করবী গাছ খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম। এপাড়া ওপাড়া
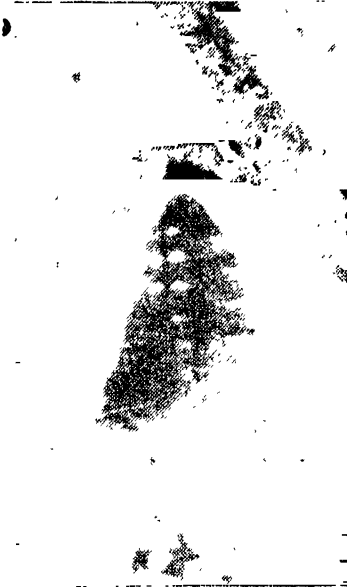
পুত্তলীতে রূপান্তরিত হবার পর ধীরে ধীরে আকৃতি পরিবর্তন হচ্ছে। দ্বিতীয় অবস্থা।
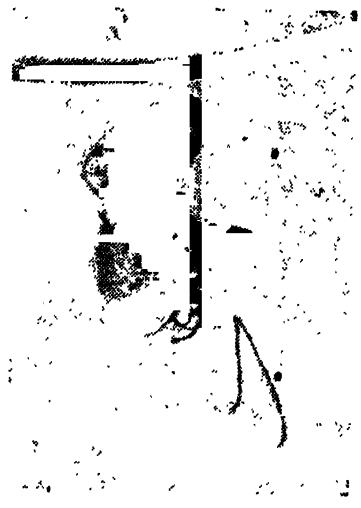
পুত্তলী ফেটে প্রজাপতি বা'র হচ্ছে।

ঘুরে প্রায় সারাদিনের চেষ্টায় কয়েকটা করবী গাছ থেকে পূর্বের মত ৪।৫ টা রূপালী চীনাবাদাম সংগ্রহ করলাম। তাদের প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা কাচের গ্লাস চাপা দিয়ে সাবধানে রেখে দিলাম। যতক্ষণ পারলাম রাত জেগে সেগুলোর প্রতি নজর রাখলাম। কিন্তু কোন কিছু পরিবর্তনই নজরে পড়লো না; চীনাবাদামের মত পদার্থগুলো যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল। খুব একটা অস্বস্তি নিয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরবেলা উঠে দেখি, একটা গ্লাসে পূর্বের মতই বড় একটা কালো রঙের প্রজাপতি, বেরিয়ে আসবার জন্যে ঝাপটা ঝাপটি করছে। বাকীগুলো যেমন ছিল তেমনিই রয়েছে। যে গ্লাসটায় প্রজাপতিটা ঝাপটা ঝাপটি করছিল সেটার মধ্যে দেখলাম—চীনাবাদামের মত পদার্থটার পাতলা একটু খোসা তখনও বোঁটার সংগে পাতাটার গায়ে লেগে রয়েছে। খোসাটার পূর্বের সে ঔজ্জ্বল্য বা চাকচিক্য কিছুমাত্র নেই। এবার বুঝতে পারলাম যে, চীনাবাদামের মত পদার্থটাই প্রজাপতির গুটি বা পুত্তলী। কিন্তু এমন মনোমুগ্ধকর গুটি প্রজাপতিরা কেমন করে তৈরী করে? কোন রকমেই তার সন্ধান করতে পারলাম না।

জানতাম—শোঁয়াপোকা থেকেই প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ যত রকমের শোঁয়াপোকা বা ক্যাটারপিলার দেখা যায়, প্রত্যেকেই তারা কোন না কোন জাতীয় প্রজাপতির বাচ্চা। কিন্তু কেমন করে শোঁয়াপোকার মত এমন একটা বিদঘুটে প্রাণী থেকে অমন মনোরম প্রজাপতির উৎপত্তি ঘটে? প্রজাপতি আর শোঁয়াপোকার চেহারায় কিছুমাত্র সাদৃশ্য নেই, বরং প্রচুর পার্থক্যই দেখা যায়। তাছাড়া পূর্বে যে চীনাবাদামের মত গুটির কথা বলেছি, তা-ই বা আসে কোথা থেকে? ব্যাপারটা জানবার কৌতূহল অদম্য হয়ে উঠলেও কৌতূহল নিবৃত্তির কোন সহজ উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। অগত্যা বিভিন্ন জাতের শোঁয়াপোকা সংগ্রহ করে যত্ন সহকারে পুষতে লাগলাম। তোমাদের

পুত্তলী থেকে প্রজাপতিটা সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে পড়েছে। ডানাগুলো এখনও ছোট রয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি। বাঁ দিকের ছবিটার ফটো নেওয়ার প্রায় একঘণ্টা পরে ফটো নেওয়া হয়েছে।

বোঝবার সুবিধার জন্যে এখানে একটা কথা বলে রাখি—দিনের বেলায় যাদের ফুলে ফুলে উড়ে উড়ে মধু খেতে দেখতে পাও সেগুলোকে বলাহয়—প্রজাপতি। কিন্তু দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকে আর রাত্রি বেলায় উড়ে বেড়ায় এরকমের বিভিন্ন জাতের অসংখ্য প্রজাপতিও রয়েছে। সেগুলোকে বলা হয়—মথ।

সর্বশরীর বিষাক্ত শোঁয়ায় আবৃত বাচ্চাগুলোকেই সাধারণতঃ শোঁয়াপোকা বলা হয়। আবার এমন অনেক রকমারি বাচ্চা দেখতে পাবে যাদের শরীরে ওরকমের বিষাক্ত শোঁয়া নেই অথবা থাকলেও খুবই কম। এই ধরণের বাচ্চা থেকেই প্রধানতঃ প্রজাপতি জন্মে থাকে। মথের বাচ্চাগুলোর শরীর সাধারণতঃ বিষাক্ত শোঁয়ায় ঢাকা থাকে। শোঁয়াশূন্য বাচ্চাগুলোকে ক্যাটারপিলার বলেই উল্লেখ করবো।

যে বাচ্চাগুলো পুষতে আরম্ভ করেছিলাম, তাদের অধিকাংশই ছিল মথের বাচ্চা। তখন অবশ্য এটা বুঝতে পারিনি। দু'চারটে প্রজাপতির বাচ্চাও ছিল। প্রজাপতির ক্যাটারপিলার বা বাচ্চাগুলো ১০।১২ দিন পর্যন্ত প্রচুর পরিমাণ গাছের পাতা উদরস্থ করবার পর খাওয়া বন্ধ করে চুপ করে বসে রইল। মনে হলো যেন এদের শরীরের দৈর্ঘ্য অনেক কমে গেছে। ভাবলাম এবার বোধহয় বাচ্চাগুলো মরে যাবে। কিন্তু দু'একদিন পরেই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, পূর্বের সে ক্যাটারপিলার একটাও নেই। তার পরিবর্তে কাচপাত্রের গা থেকে ঝুলছে—সবুজ, হলদে আর গোলাপী রঙের
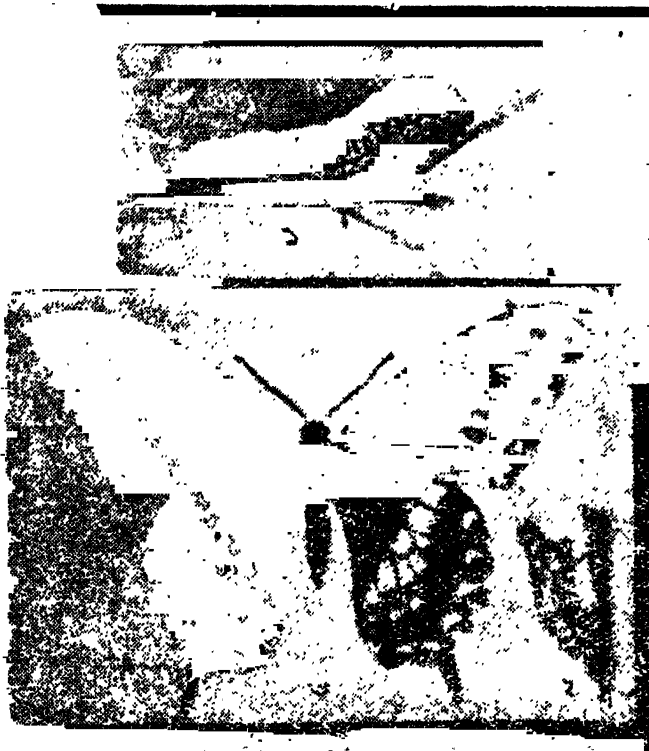
নেবু প্রজাপতি।—১ নং ক্যাটার পিলার। ২ নং পুত্তলি। পুত্তলিটা ডাঁটার গায়ে কতকটা কাঁটার মত আটকে আছে। ৩ নং পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি।

কয়েকটি অপূর্ব পদার্থ। এগুলো যে প্রজাপতির গুটি বা পুত্তলী এবিষয়ে কোন সন্দেহই রইল না। সবুজ রঙের গুটিগুলি দেখে মনে হচ্ছিল যেন এক একটা বোঁটায় এক একটা টাট্‌কা আঙ্গুর ফল ঝুলছে। হলদে আর গোলাপী রঙের গুটিগুলো দেখতে অনেকটা চীনাবাদামের মত। কিন্তু কেমন করে যে লম্বা একটা পোকা আঙ্গুরফলের মত এমন সুন্দর, মসৃণ এবং ঝকঝকে গুটিতে পরিণত হলো তা বুঝতেই পারলাম না। পুনরায় ক্যাটারপিলার পোষা সুরু করলাম। তারা খাওয়া বন্ধ করে নিশ্চলভাবে অবস্থান

করবার পর থেকে সর্বদাই চোখে চোখে রাখবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করতে পারলাম না। হয়তো কিছুক্ষণের জন্য অন্য কোন কাজে ব্যাপৃত হয়েছি, এসে দেখি ইতিমধ্যেই ক্যাটারপিলারটা গুটি হয়ে ঝুলছে। অনেক সময়েই শেষরাত্রির দিকে অথবা ভোরের বেলায় পরিবর্তনটা ঘটে গেছে, কাজেই আমার নজরে পড়েনি। পাত্রগুলো রাত্রিবেলায় বিছানার পাশে সাজিয়ে রেখে মাঝে মাঝে ঘুম থেকে উঠে দেখেছি, কিন্তু একদিনও দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। প্রায় মাসাধিক-কাল অক্লান্ত চেষ্টার পর শেষরাত্রিতে একদিন দেখতে পেলাম—একটা নিশ্চল ক্যাটার-পিলার যেন একটুখানি মোচড় খেয়ে উঠল। সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

প্রায় মিনিটদশেক পরে ক্যাটারপিলারটার ঘাড়ের দিকে পিঠের চামড়াটার খানিকটা অংশ লম্বালম্বি চিরখেয়ে ফেটে গেল। ভিতর থেকে কুলবিচির মত গোলাপী-

কপিপাতার ক্যাটারপিলার।
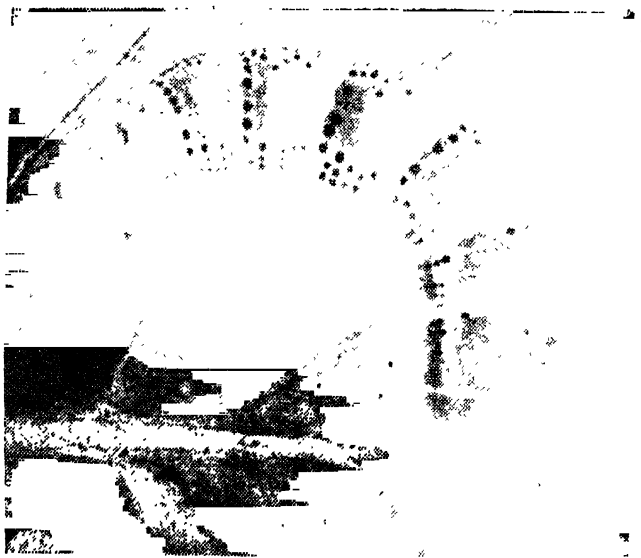
রঙের একটা পদার্থ সেই ফাটল দিয়ে ঠেলে বা'র হচ্ছিল। দেখতে দেখতে প্রায় মিনিট পাঁচসাতেকের মধ্যেই কুলের আঁটির মত পদার্থটা মোচড় খেতে খেতে সম্পূর্ণরূপে ঠেলে বেরিয়ে পড়ল। ক্যাটারপিলারের শরীরের চামড়াটা কুঁচকে সামান্য একটু ঝুলের মত একপাশে পড়ে রইল। ক্যাটারপিলারটা ইতিপূর্বেই কাচপাত্রের গায়ে সুতা বুনে ছোট্ট একটু বোঁটার মত করে রেখেছিল। কুলবিচির মত গোলাপী রঙের পদার্থটা এবার সেই বোঁটা থেকে ঝুলতে ঝুলতে ক্রমাগত শরীরটাকে মোচড় দিতে লাগলো। দেখতে দেখতে ক্রমশঃ তার আকৃতি এবং গায়ের রং পরিবর্তিত হয়ে রূপালী রঙের চিনাবাদামের রূপ পরিগ্রহণ করলো। তখন আবার সে সম্পূর্ণ নিশ্চল। তাতে প্রাণের কোন অস্তিত্ব আছে বলেই মনে হয় না। যাহোক, এই পুত্তলী অবস্থায় প্রায় ১৪।১৫

দিন থাকবার পর আবার চীনাবাদামের মত পদার্থটার পিঠ চিরখেয়ে ফেটে যায় এবং প্রায় ১০।১২ মিনিটের মধ্যেই তার ভিতর থেকে একটা সুদৃশ্য প্রজাপতি ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। খোলশটা একটা বাজে পদার্থের মত পড়ে থাকে। তখন তার কোন রংচং থাকে না। ফাটল দিয়ে প্রথমতঃ প্রজাপতির মাথাটা বেরিয়ে আসে, তারপর ধীরে ধীরে সে তার শরীরটাকে টেনে বার করে। কতকগুলো প্রজাপতির পুত্তলী আবার পাতা বা ডাঁটার গায়ে নোলকের মত ঝোলেনা। সেগুলো ডালের গায়ে কাঁটা বা অন্য কিছুর মত লেগে থাকে। খোলস থেকে বেরিয়ে আসবার পর প্রজাপতির ডানাদুটি থাকে খুবই ছোট্ট এবং মোটা। দেখতে দেখতে তর্ তর্ করে ডানাদুটি বাড়তে থাকে। প্রায় আধঘণ্টা সময়ের মধ্যেই তার ডানা পরিপূর্ণ আকৃতি ধারণ করে, আর ডানার বর্ণবৈচিত্র্যও উজ্জ্বল এবং গাঢ়তর হয়ে ওঠে। গুটি থেকে বেরুবার পর এব্যাপারগুলি ঘটতে এক ঘণ্টারও কিছু
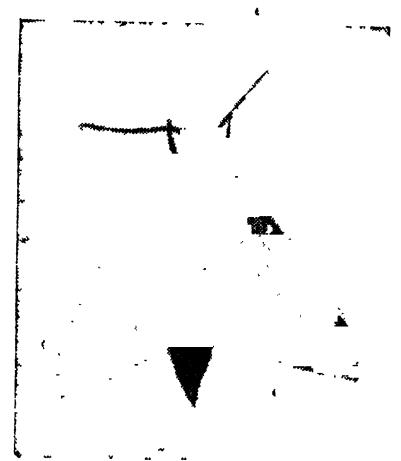
কপিপাতার ক্যাটারপিলার খোলস পরিত্যাগ করে গুটি বা পুত্তলিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

কপিপাতার পুত্তলী থেকে এই মথ প্রজাপতিটি বেরিয়েছে।

কম সময় লেগে থাকে। ডানা প্রসারিত হওয়ার পর একটু শক্ত হওয়ামাত্রই প্রজাপতি উড়ে গিয়ে ফুলে ফুলে মধু খেতে সুরু করে। এই হলো প্রজাপতির জীবনের মোটামুটি ইতিহাস। মথের বাচ্চাগুলোর রূপান্তর গ্রহণের ব্যাপার প্রায় একই রকমের, তবে কিছু পার্থক্য আছে। মথের শোঁয়াপোকা গুটিতে রূপান্তরিত হওয়ার পূর্বে কিছুকাল এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকে। তারপর শরীরের চতুর্দিকে সূতা বুনে একটা আবরণ তৈরী করে। এই গুটির আবরণ থেকেই আমরা এণ্ডি, রেশম প্রভৃতি সূতা পেয়ে থাকি। কোন কোন জাতের শোঁয়াপোকা আবার শরীর থেকে শোঁয়া তুলে নিয়ে সূতার সংগে মিশিয়ে আবরণ তৈরী করে। অন্যান্য ব্যাপারগুলো প্রায় একই রকমের। ছবি থেকে ব্যাপারগুলো অনুধাবণ করতে পারবে। যদি একটু উৎসাহ এবং মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা কর তবে এ সকল ব্যাপারগুলো অনায়াসেই প্রত্যক্ষ করতে পারবে। তখন বুঝবে, রূপকথার ব্যাং-রাজপুত্র অপেক্ষাও বাস্তব জীবনের ঘটনা কত অদ্ভুত, কত কৌতূহলোদ্দীপক! গ, চ, ভ,

কেমন করে হয়

নিব তৈরীর কথা

প্রাচীন কালে কি দিয়ে লিখতো?—আমাদের দেশে প্রাচীনকালে খাগ, বা শরের কলম দিয়ে ভোজপাতার উপর লেখার রীতি ছিল। ভোজপাতা এক রকম গাছের পাতলা ছাল। তারপর তালপাতার উপর লেখার রেওয়াজ হয়। তারপরে প্রচলন হয় তুলট কাগজের। তুলট কাগজে লেখবার জন্যে, পাখীর পালকের কলমই বেশী ব্যবহৃত হতো। রোমানদের সময় কাগজের প্রচলন ছিল না। তখনকার লোকেরা ছোট ছোট মোমের পাতের উপর সূক্ষ্মমুখ এক রকম শলাকা দিয়ে লিখত। তার নাম ছিল—'ষ্টাইলাস'। তারপরে তারা শরের কলম ব্যবহার আরম্ভ করে। কাগজ আবিষ্কারের পর থেকে পালকের কলম বা কুইল পেনের ব্যবহার প্রচলিত হয়। আজকালও অনেকে 'কুইল পেন' ব্যবহার করে থাকেন। রাজহাঁস বা ময়ুরের বড় বড় পালক থেকেই 'কুইল পেন' তৈরী হয়। ছোট ছুরি দিয়ে পালকের কলম কাটা হতো বলে এই ছুরির নামই হয়েছে—'পেন নাইফ'।

সর্বপ্রথম ধাতুনির্মিত কলম বা নিবের ব্যবহার সুরু হয় কখন?—১৭৮০ সালে বার্মিংহামের মিঃ হ্যারিসন নামে এক ভদ্রলোক সর্বপ্রথম ধাতু নির্মিত নিব তৈরী করেন। কিন্তু তারপর বহুকাল পর্যন্ত জনসাধারণ সে জিনিষ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়নি। ১৮১৫ সালেও বিলেতে এক ডজন নিবের দাম ছিল ১৮ শিলিং। বারোটা নিবের এত চড়া দামের কথা শুনে তো আজকাল তোমরা শিউরে উঠবে! কিন্তু তখন নিব তৈরী হতো হাতে আর এখন তৈরী হয় কলে।

কি দিয়ে নিব তৈরী হয় ?

আজকাল নানারকম ধাতু থেকে নিব তৈরী হয়। তবে এ কাজে ইস্পাতই বেশীরভাগ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বার্মিংহামকেই নিব তৈরীর কেন্দ্রস্থল বলা যেতে পারে। নিব তৈরীর জন্যে শেফিল্ড থেকে ছ'ফুট লম্বা এবং প্রায় দেড় ফুট চওড়া ইস্পাতের চাদর বার্মিংহামের কারখানায় আসে। দৈনিক প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ নিব তৈরী হয় এবং এতে দৈনিক তিন টনেরও বেশী ইস্পাত লাগে।

কেমন করে নিব তৈরী হয় ?

প্রায় ষোলটা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে নিব সম্পূর্ণরূপে তৈরী হয় আসে। প্রথমে নিবের চওড়া দিকের ঠিক মাপ মত ইস্পাতের চাদরটাকে লম্বা ফালি করে কাটা হয়—এই প্রক্রিয়াকে বলা হয়—কাটিং। তারপর ফালিগুলোকে পুড়িয়ে এবং ঠাণ্ডা করে এমনভাবে পান দেওয়া হয় যাতে সেগুলো স্প্রিংএর মত প্রয়োজনানুরূপ স্থিতি-স্থাপক হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয়—'অ্যানিল করা'। এরপরে সে গুলোকে ডলাই-কলে ফেলে যথোপযুক্ত পাতলা করা হয়। ডলাই-কল থেকে পাতগুলো মসৃণ ও চকচকে হয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর প্রেস মেশিনের সাহায্যে পাতের দুধারে সারিবদ্ধ ভাবে মোটামুটি আকারে নিবগুলো কাটা হয়ে যায়। এগুলোকে বলা হয়—ব্ল্যাংকস্।

নিবের ব্ল্যাংকস্
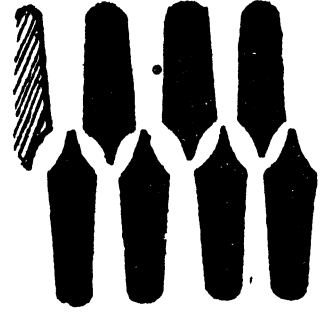
এরপরে ষ্ট্যাম্পিং মেশিনে নিবের মাথার দিকে চোখ কেটে নামের ছাপ ও মার্কা দেওয়া হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট আকৃতিতে পরিণত করবার আগে পুনরায় এগুলোকে 'অ্যানিল' করা দরকার। পুনরায় 'অ্যানিল' করে সেগুলোকে অনেকটা নরম করা হয়। নরম হবার পর সেগুলোকে এমনভাবে পরিষ্কার করা দরকার যেন তাতে একটুও ময়লা বা তৈলাক্ত পদার্থ না থাকে। পরিষ্কার হয়ে গেলে সেই অসম্পূর্ণ নিবগুলোকে গোলাকার পাত্রে ভর্তি করা হয়। সেই গোলাকার পাত্রকে আবার আরও বড় গোলাকার পাত্রে আবদ্ধ করে কাঠ কয়লার গুঁড়া দিয়ে আবৃত করে দেয় এবং সব সমেত সেগুলোকে লোহার বাক্সে পুরে জলন্ত চুল্লীতে দেওয়া হয়। আগুনের তাপে নিবগুলো ঈষৎ লাল হয়ে উঠলেই আবার ঠাণ্ডা করতে দেয়। ঠাণ্ডা হয়ে যাবার পর 'ডাই' এবং 'পাঞ্চিং'এর ব্যবস্থা সমন্বিত স্ক্রু-প্রেসের সাহায্যে নিবগুলোকে যথাযথ আকারে পরিণত করা হয়। এরপরে সেগুলোকে আবদ্ধ পাত্রে রেখে চুল্লীতে পুড়িয়ে তেলের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়। এর ফলে নিবগুলো খুব শক্ত হয়ে যায়। কিন্তু খুব শক্ত হবার ফলে ভংগপ্রবণ হয়ে পড়ে। ভংগপ্রবণতা দূর করবার জন্যে সেগুলোকে সোডার জলে সিদ্ধ করবার পর লোহার সিলিণ্ডারের মধ্যে রেখে কাঠ কয়লার আগুনের উপর ঘোরান হয়। এরপরে

যন্ত্র সহযোগে অনেকবার ঘষামাজার পর নিবগুলো রূপার মত সাদা এবং চক্চকে হয়ে ওঠে। চক্চকে হয়ে যাবার পর নিবের চোক থেকে ডগা পর্যন্ত অংশটাকে ঘষে দেওয়া হয়।

নিবের মাথা চেরা হয় কেন ?

মাথা চেরা না হলে নিবের মধ্যে বেশী কালি থাকে না, এবং লেখবার সময় কলমের ডগা থেকে কালিও সমানভাবে প্রবাহিত হয় না। যদি নিবের ছেঁদা না থাকতো বা ডগা চেরা না হতো তবে সহজে লেখাই সম্ভব হতো না। নিবের মাথা চিরে দেওয়া হলো সর্বশেষ প্রক্রিয়া। কাটিং প্রেসের সাহায্যে নিবের মাথা চেরা হয়। চেরবার পর নিবগুলোকে আবার পালিশ করতে হয়, কারণ চেরার ধারগুলো মসৃণ না করলে কলমের ডগায় কালি সহজে প্রবাহিত হয় না। এরপরে নিবগুলোকে রং করে ভার্নিশ অথবা ল্যাকার করা হয়।

যদি ল্যাকার করতে হয় তবে নিবগুলোকে গালার সল্যিউশনে ডুবিয়ে নিয়ে ঘূর্ণায়মান সিলিণ্ডারের মধ্যে শুকিয়ে নিতে হয়। শুকিয়ে গেলে নিবগুলোকে লোহার ট্রের উপর ছড়িয়ে দিয়ে চুল্লীর মধ্যে দেওয়া হয়। উত্তাপ দেওয়ার ফলে নিবের গায়ে গালা সর্বত্র সমান ভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর নিবগুলোকে বাছাই করে খারাপগুলো ফেলে দিয়ে ভালগুলোকে প্যাকেটে ভর্তি করে বিক্রয়ের জন্যে বাজারে চালান দেওয়া হয়।

করে দেখ

(১)

শুঁয়াপোকার মৃত্যু-অভিযান

লেমিংস্ নামে ইঁদুরের মত একপ্রকার প্রাণী পাহাড়-পর্বতের আশেপাশে বাস করে। এরা বংশবিস্তার করে খুব দ্রুতগতিতে। সংখ্যা অসম্ভবরূপে বেড়ে গেলে তারা দলে দলে চলতে থাকে—কোন অজ্ঞাত নতুন বাসস্থানের সন্ধানে। লক্ষ লক্ষ লেমিংস্ কেবল একদিকেই চলছে; আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম বলতে কিছুই নেই। চলতে চলতে একসময়ে পৌঁছে গিয়ে সমুদ্রের ধারে। কিন্তু তবুও চলতে হবে। দলে দলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা সাঁতার কেটে সামনে এগিয়ে চলে—ফলে অনেকেই জলে ডুবে মারা যায়, স্রোতে ভেসে যায়, আবার অনেকে মাংসাশী প্রাণীদের উদরস্থ হয়। কিন্তু এগিয়ে যাবার প্রেরণা কোন্ কিছুতেই লোপ পায় না।

এরা তো উচুস্তরের জীব। কিন্তু নীচুস্তরের জীবের মধ্যেও এরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে থাকে, নীচুস্তরের জীবের মধ্যেও এরূপ অদ্ভুত ঘটনা যাতে তোমরা নিজের চখে দেখতে পার সেজন্যে একটা পরীক্ষার কথা বলছি। পরীক্ষাটা বিশেষ কিছুই নয়—খুব সহজ, তবে একটু কষ্ট করে গাছপালা খুঁজে কয়েকটা পোকা যোগাড় করতে হবে।

এবার এ বিভাগে প্রথমেই তোমাদিগকে শোঁয়াপোকার কথা বলেছি। সেটা পড়লেই শোঁয়াপোকার কথা জানতে পারবে। যাদের বাড়ীর আশেপাশে দুচারটে গাছপালা আছে সেখানে খোঁজ করলেই দেখতে পাবে, কতরকমের শোঁয়াপোকা গাছের পাতা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। চাঁপা, জবা প্রভৃতি গাছের পাতার মধ্যে ভালকরে লক্ষ্য করলেই দেখবে—অনেকটা সাদা এবং ঈষৎ সবুজাভ প্রায় ইঞ্চিখানেক লম্বা এক জাতের শোঁয়াপোকা দলবদ্ধ ভাবে পাতার নীচের দিকে বসে আছে। এই শোঁয়োপোকাগুলো এক জাতীয় মথ-প্রজাপতির বাচ্চা। খাদ্যের অভাবের জন্যেই হোক কি অন্য কোন অসুবিধার জন্যেই হোক, এদের এক এক দল সময়ে সময়ে সারিবদ্ধ হয়ে—অনির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা সুরু করে। এই অভিযানে অনেক সময়েই এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়,—তবুও তাদের থামবার উপায় নেই।
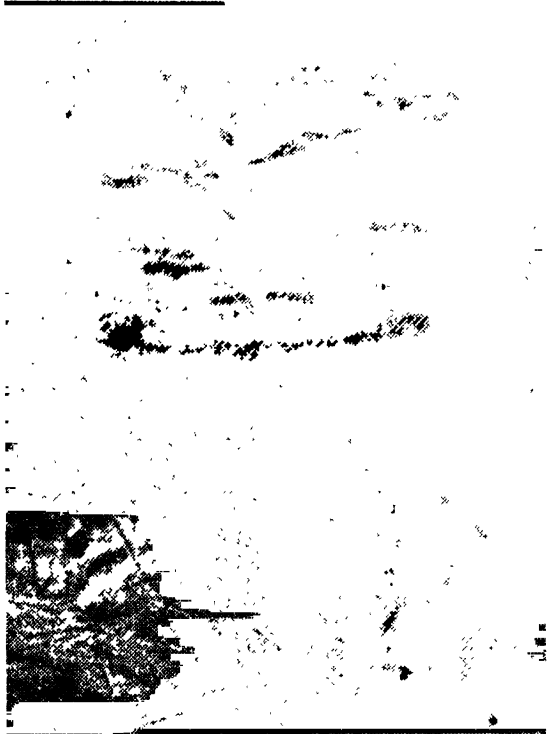
একবার এরকমের একটা অদ্ভুত অভিযান অকস্মাৎ নজরে পড়েছিল। তারই ফটো এখানে দেখতে পাচ্ছ। শোঁয়াপোকাগুলো সার বেঁধে প্রায় ৬০।৭০ গজ দূর থেকে একটা মাঠ পেরিয়ে এসে এই লজ্জাবতী গাছটার টবের উপর উঠে পড়ে। কাণা পর্যন্ত উঠেই কাণার উপর দিয়ে বরাবর চলতে সুরু করে। কাণাটা গোল বলে ঐ পথের আর শেষ হয় না। তাদেরও চলা থামে না। ক্রমে এক একটা করে মরে নীচে পড়ে যায়; কিন্তু বাকীরা সমানেই চলতে থাকে। গাছের পাতার গন্ধ পায় অথচ বাঁধা রাস্তা ছেড়ে চলে না—ফলে তাদের সকলকেই একে একে মৃত্যু বরণ করতে হয়। তারপর বহুবার এই পরীক্ষা করে দেখেছি, প্রত্যেক ক্ষেত্রে একই অবস্থা ঘটে।

শোঁয়াপোকাগুলো টবের কানায় উঠে কদিন ধরে অনবরত চক্রাকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আহার নেই, বিশ্রাম নেই, অথচ থামবারও উপায়ে নেই।

খুঁজে খুঁজে তোমরা যদি এ-রকমের একদল শোঁয়াপোকা যোগাড় করতে পার তবে ছবির মত করে একটা ছোট্ট গাছের টবের গায়ে তাদের এনে ছেড়ে দিও। দেখবে, দিনের পর দিন অনবরত এরা অক্লান্তভাবে আমৃত্যু ঘুরে বেড়াচ্ছে। এখন শীত পড়েছে। এসময়েই শোঁয়াপোকাগুলোকে দেখতে পাবে। পরীক্ষা করতে হলে এসময়েই করে দেখতে পার।

সহজ কৌশলে জলের কল—

গত মাসে তোমাদিগকে সহজ কৌশলে উপরে জল তোলবার জন্যে আর্কিমিডিস্ স্ক্রুর কথা বলেছিলাম। এবার সে যন্ত্রেরই আরও কিছু উন্নত ধরণের ব্যবস্থার কথা বলছি। এ যন্ত্রটাও তোমরা অনায়াসে তৈরী করতে পার। প্রথমে ছবিটা ভাল করে দেখে নাও। ছবি থেকেই যন্ত্রের কৌশল বুঝতে পারা যাবে।

সহজ কৌশলের জলের কল

প্রথমে ডানদিকের মাথা বাঁকানো খাড়া নলটার মত একটা লোহা বা পিতলের পাইপ যোগাড় কর। ওই পাইপটার গোড়ার দিকে সাধারণ জলের কলের মুখের মত, মাঝের জায়গাটা গোল একটা ট্যাপ জুড়ে দিতে হবে। এই গোল অংশটার ভিতর দিয়ে প্রায় আড়াই ইঞ্চি লম্বা অথচ সরু একখণ্ড পাইপের টুকরা ঢুকিয়ে তার এক মুখ বন্ধ করে অপর মুখ খোলা রেখে দাও। এই ছোট্ট পাইপের টুকরাটা, খাড়া পাইপটার গোলাকার স্ফীত স্থানটার ভিতর দিয়ে এমনভাবে বসবে যে, তার কোথাও একটু ফাঁক থাকবে না অথচ বেশ সহজভাবে ঘুরতে পারবে। এই টুকরা পাইপের যে অংশটুকু খাড়া পাইপটার স্ফীত অংশের ভিতরে থাকবে সেখানে তার গায়ে এফোঁড় ওফোঁড় চারটের মোটা ছিদ্র করে দিতে হবে। টুকরা পাইপটার বন্ধ মুখে একটা হ্যাণ্ডেল যুড়ে দাও। হ্যাণ্ডেল ঘোরালে এই ছোট্ট পাইপটাও ঘুরবে। এবার একটা রাবারের নল যোগাড় করে সেটাকে ছবির নলের মত কুণ্ডলী করে তার ভিতরের দিকের মুখটা ওই ছোট্ট পাইটার খোলা মুখে জোরে বসিয়ে দাও। নলের কুণ্ডলীটাকে ঠিকভাবে রাখবার জন্যে ব্যবস্থা করতে হবে। রবারের নলের কুণ্ডলীর পরিবর্তে ধাতুনির্মিত নলও ব্যবহার করতে পার। যন্ত্রটাকে সুবিধামত জায়গায় এমনভাবে বসাও যেন নলের কুণ্ডলীটার কিছুটা জলে ডুবে থাকে। হ্যাণ্ডেল ঘোরালেই নলের কুণ্ডলীটাও ঘুরতে থাকবে। হ্যাণ্ডেলের সাহায্যে নলের কুণ্ডলীটাকে তীর চিহ্নিত দিকে ঘোরাতে থাকলে জল, কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে খাড়া পাইপের পথে উপরে গিয়ে পড়তে থাকবে।

গ. চ. ভ.

পেনিসিলিন আবিষ্কার

শ্রীদিলীপকুমার দাস

যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে সমগ্র মানবজাতি একদিন বিস্মিত হয়ে শুনেছিল আণবিক বোমার কথা, আনন্দে ও ভয়ে সেদিন সবাই হয়েছিল হতবাক্। আনন্দের কারণ, আণবিক শক্তির মত অত ক্ষমতা সম্পন্ন এক শক্তির মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন হ'বার সম্ভাবনায়; আর ভয়ের কারণ, আণবিক শক্তির সৃষ্টিধ্বংসকারী ক্ষমতার অপপ্রয়োগের আশংকায়। বিশ্ববাসী ঠিক এই রকমই বিস্মিত হয়েছিল বিজ্ঞানের আর একটি আবিষ্কারে, তবে সেই বিস্ময়ে ভয়মিশ্রিত আনন্দ ছিল না, শুধু আনন্দই ছিল। সেই আবিষ্কারটি হোলো 'পেনিসিলিন'।

যে সমস্ত ব্যাধি একদিন চিকিৎসকদের কাছে ভয়ের বস্তু ছিল, পেনিসিলিন আবিষ্কার হ'বার পর চিকিৎসকগণ তাদের সেই ভীতি উৎপাদক কতক্গুলি ব্যাধি দমন করতে সমর্থ হয়েছেন; উদাহরণ স্বরূপ নিউমোনিয়া, গণোরিয়া, সিফিলিস, ব্যাকটেরোমিয়া ও ব্লাড-পয়জনিং প্রভৃতি ব্যাধির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এই অদ্ভুত ক্ষমতা সম্পন্ন ওষুধ 'পেনিসিলিন' আবিষ্কারের বহু পূর্বে এমন কতগুলো ঘটনা বৈজ্ঞানিক মহলে পর্যবেক্ষিত হয়েছিল যে, সেইসব ঘটনার সাথে পেনিসিলিন আবিষ্কারের সোজাসুজি কোনও সম্বন্ধে না থাকলেও, একটা মূলগত একতা আছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এইসব পর্যবেক্ষিত ঘটনাগুলো যথার্থ অনুসন্ধানের অভাবে আবিষ্কারের পর্যায়ে না পড়ে তথ্যবহুল কাগজপত্রের মধ্যে সমাধিস্থ হয়ে আছে। প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় আরম্ভ করবার পূর্বে কৌতূহলোদ্দীপক উক্ত অতীতের প্রতি একটু ফিরে তাকানো যাক্।

প্যারিসে পাস্তর ইনষ্টিটিউটে যখন পাস্তর সাহেব নিজে এবং তাঁর অন্যান্য সহকর্মীগণ রোগ উৎপাদক জীবাণু নিয়ে গবেষণা করছিলেন তখন সেই গবেষণাগারেই মেচ্নিকফ্ নামে আর একজন বৈজ্ঞানিক এক নূতন ধরণের আবিষ্কারের আশায় মেতে উঠেছিলেন। পাস্তর সাহেব যেমন জীবাণুগুলোকে শুধু রোগের বাহন হিসেবেই দেখছিলেন তেমনি মেচনিকফ্ সাহেব দেখছিলেন জীবাণুদের ভিতর মানুষের কোনও মিত্র আছে কিনা। তাঁর এই ধারণা ছিল যে, রোগ-বহনকারী জীবাণুগুলো যে হারে বাড়তে থাকে তাতে তাদের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করবার যদি কিছু না থাকতো তাহলে ঐ জীবাণুগুলোই এতদিনে পৃথিবী ছেয়ে ফেলতো, তিনি বোধ হয় রোগ-জীবাণুর প্রতিরোধক হিসেবে মানুষের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন জীবাণুর কথাই বলতেন। এছাড়া তিনি আরও বলতেন, মানুষের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ করবার শক্তি ছাড়াও মানুষের শরীরের মধ্যে এমন কতগুলো জীবাণু থাকে যারা তাদের নিজদেহ নিঃসৃত একপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে মানব-শরীরস্থ রোগ জীবাণুগুলোকে নিষ্ক্রিয় কোরে ফেলে। তাঁর (মেচনিকফের) মতবাদ ছিল যে, মানুষের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন জীবাণু দ্বারা রোগ উৎপাদক জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলা যেতে পারে। পাস্তর ইনস্টিটিউটে এই সময়ে অনেক বৈজ্ঞানিকই যক্ষ্মা জীবাণু নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। ঐ গবেষণাগারেরই এক প্রাণতত্ত্ববিদ্ ডাঃ সার্জি মেটালনিকফ্ মেচনিকফের নির্দেশানুসারে এবং তাঁর নিজ প্রতিভাবলে মৌচাক থেকে গ্যালেরিয়া মেলোনেলা নামক প্রজাপতির শূককীট বের করলেন এবং দেখলেন যে, এই

শূককীটের যক্ষ্মা জীবাণুকে ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে। শুধু তাই নয়, মেটালনিকফ যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত কয়েকটি গিনিপিগকে পর্যন্ত সুস্থ করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর এই আবিষ্ক্রিয়ায় সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হয়েছিলেন মেচনিকফ্। কারণ, এতে তাঁরই মতবাদ সমর্থিত হয়েছিল। তবে মেটালনিকফের এই আবিষ্কার কতগুলো অসুবিধার জন্য বেশী দূর অগ্রসর হয়নি এবং মানবদেহের উপর কোনও দিন পরীক্ষিত হয়েছে কিনা জানা যায়নি। যে আবিষ্কার একদিন বৈজ্ঞানিক মহলে চাঞ্চল্য এনেছিল তার মর্যাদা আজ বিস্মৃত প্রায় এক ঘটনার সাথে সাথেই মুছে যাচ্ছে। মেটালনিকফ্ যখন যক্ষ্মা জীবাণু নিয়ে পাস্তুর ইনষ্টিটিউটে উক্ত গবেষণা চালাচ্ছিলেন তখন ঐ গবেষণাগারেই এ, ভ্যানড্রেমার নামক একজন বৈজ্ঞানিক পেনিসিলিয়াম গ্লাউকাম নামক এক ছত্রাকের পরিশ্রুত অন্তঃসারের যক্ষ্মা-জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করবার ক্ষমতা লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর এই আবিষ্কারের দিকে তখনকার দিনে (১৯১০ সালে) কেউ বড় বিশেষ নজর দেননি। (কয়েক বছর আগে ২জন মার্কিন বৈজ্ঞানিক ডি, কে, মিলার ও এ সি, রেকেট, পেনিসিলিয়াম পরিবারভুক্ত এক ছত্রাকের যক্ষ্মা জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করবার ক্ষমতা লক্ষ্য করেছেন।) মেচনিকফের মতবাদ—জীবাণু দিয়ে জীবাণু ধ্বংস করা—দৃঢ়রূপে সমর্থিত হয়েছিল মানুষের অন্ত্রে ল্যাকটোব্যাসিলাস্ এ্যাসিডোফাইলাস নামক জীবাণুর উপস্থিতিতে। এই জীবাণু কার্বহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যদ্রব্য থেকে ল্যাকটিক এ্যাসিড উৎপন্ন করে। এই এ্যাসিড আবার কয়েকপ্রকার জীবাণু ধ্বংস করতে পারে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, ল্যাকটোব্যাসিলাস্ জীবাণু মানুষের উপকারই করে। আন্ত্রিক গোলযোগগ্রস্ত রোগীকে এই জীবাণু খাদ্যদ্রব্যের সংগে মিশিয়ে খাওয়াবার এক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন মেচনিকফ্। এতে তিনি সফলতা লাভ করতে পারেননি। এবং এই অসফলতার জন্য তাঁকে তখনকার চিকিৎসকমণ্ডলী তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। মেচনিকফ্ সাহেবের মতবাদ সমর্থনকারী এইরকম কয়েকটি ঘটনা ছাড়াও, তাঁর মতবাদ সমর্থিত হয়েছিল আরও কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের গবেষণায়, যারা জীবাণু ধ্বংসকারী জীবাণুর সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ডাঃ এমেরিক, লো প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

জীবাণু-ধ্বংসকারী জীবাণুর অনুসন্ধান খুব বিশেষ সাফল্যজনক না হ'লেও, এই অনুসন্ধান একটা সুদৃঢ় মতবাদের উপর ভিত্তি করেই হয়েছিল। সব বৈজ্ঞানিকের বেলায় এই কথা না খাটলেও, মেচনিকফ্ সাহেব ও তাঁর সহকর্মিগণ যে উক্ত মতবাদের উপর ভিত্তি করেই যে গবেষণা চালিয়েছিলেন সেটা বেশ বোঝা যায়। যাই হোক, এই হলো পেনিসিলিন আবিষ্কারের পূর্বেকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এবার দেখা যাক্ কি করে পেনিসিলিন আবিষ্কার হলো।

১৯২২ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেণ্ট মেরী হাসপাতালের জীবাণুতত্ত্ববিদ্ ডাঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (বর্তমানে 'স্যার') মানুষের চোখের জলে এবং থুথুতে জীবাণু ধ্বংসকারী একরকম পদার্থের কথা জানতে পারেন। তিনি এই নবাবিষ্কৃত পদার্থটির নাম দেন লাইসোজাইম। ডাঃ ফ্লেমিং তার এই আবিষ্কার সম্বন্ধে শুধু একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেই নিরস্ত হয়েছিলেন, বিস্তারিত কিছু জানাতে পারেন নি। ডাঃ ফ্লেমিং এর এই আবিষ্কার পাস্তুর ইনষ্টিটিউটের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ জুলস্ বরডেটের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে ও তিনি এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান করে জানতে পারেন যে ডিমের শ্বেত পদার্থের মধ্যেও লাইসোজাইম আছে। আবার ঠিক এই সময়েই পাস্তুর ইনসটিটিউটের গবেষণাগারে আঁন্দ্রে গ্র্যাসিয়া ও স্যার ডাথ নামে দুজন বৈজ্ঞানিক পূঁজ উৎপাদনকারী ষ্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস্ নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তাঁদের এই গবেষণাকালে তাঁরা স্ট্যাফাইলোকক্কাস ধ্বংসকারী

ছত্রাক ষ্ট্রেপ্টোথ্রিক্স এর সন্ধান পান। তাঁরা ষ্ট্রেপ্টোথ্রিক্সের মত গুণসম্পন্ন পেনিসিলিয়াম গোষ্ঠিভুক্ত আর একটি ছত্রাকের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁদের এই আবিষ্কারে ডাঃ বোরডেট তখন বিশেষ নজর দেন নি। পেনিসিলিন আবিষ্কারের কয়েক বছর আগেকার এই বিস্মৃতপ্রায় ঘটনা শুধু রেকর্ড বুকেই লিপিবদ্ধ হয়েছিল, তার বেশী অগ্রসর হতে পারেনি।

এই ঘটনার ঠিক চার বছর পরে ডাঃ ফ্লেমিং অনুরূপ একটি ঘটনা লক্ষ্য করেন। তিনি তখন লাইসোজাইম আবিষ্কারের পর বিভিন্নপ্রকার জীবাণুর গাঁটি 'কালচার' পাবার উন্নতিসাধনে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি পুঁজ উৎপাদনকারী জীবাণু নিয়েও পরীক্ষা করছিলেন। এই সময়ে তিনি একদিন একটি 'কালচার' পাত্রের মধ্যে কতগুলো নূতন ছত্রাক দেখতে পান এবং পরীক্ষা করে দেখেন যে, এই নূতন ছত্রাকগুলোর সান্নিধ্যে ঐ 'কালচার' পাত্রের জীবাণুগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ডাঃ ফ্লেমিং এই ছত্রাকটিকে অবহেলা করলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এক শক্তিশালী রোগ উপশমকারী পদার্থের সন্ধান তিনি পেয়েছেন। তিনি কালচার-পাত্রে এই নবাবিষ্কৃত ছত্রাকটি জমাবার ব্যবস্থা করলেন এবং যে সমস্ত ছত্রাক জন্মালো তাদের মধ্যেও জীবাণুধ্বংসকারী ক্ষমতা দেখতে পেলেন। তিনি ছত্রাকটি পেনিসিলিয়াম গোষ্ঠিভুক্ত জানতে পারলেন। সেজন্য তিনি এই ছত্রাক থেকে প্রাপ্ত কালচারের নাম দিলেন পেনিসিলিন। ডাঃ ফ্লেমিং বিভিন্ন রোগ জীবাণুর উপর পেনিসিলিনের ধ্বংসকারী ক্ষমতা পরখ করে দেখতে পেলেন যে, পেনিসিলিন গ্র্যাম-পজিটিভ পর্যায়ভুক্ত জীবাণু অর্থাৎ স্ট্রেপ্টোকক্কাস, নিউমোকক্কাস ইত্যাদি ধ্বংস করে, কিন্তু গ্র্যাম-নেগেটিভ অর্থাৎ টাইফয়েড, আমাশয় ইত্যাদি রোগের জীবাণুর উপর এর কোনও ক্ষমতা নেই। নানাভাবে তাঁর এই আবিষ্কার পরীক্ষা করে ডাঃ ফ্লেমিং ১৯২৮ সালে এই আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করলেন। বৈজ্ঞানিকগণ এই আবিষ্কারে বিস্মিত হলেও, বাস্তবক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে সন্দিহান হোলেন। তখনকার দিনের চিকিৎসকমহলও এই অবিষ্কারটি অবহেলার চক্ষে দেখলেন। এই আবিষ্কার প্রকাশিত হওয়ার পরেও দশবৎসর পর্যন্ত কেউ কোনও রকম উচ্চবাচ্য করেন নি। ডাঃ ফ্লেমিং এই সুদীর্ঘকাল চারিদিকে নৈরাশ্যময় পরিস্থিতি থাকা সত্বেও চুপ করে বসে ছিলেন না নানা প্রতিকুল অবস্থার মধ্যেও তিনি তার গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং কালচার পাত্রে ছত্রাকটি জন্মাতে থাকলেন। ডাঃ ফ্লেমিং বহুবার তাঁর চিকিৎসক সহকর্মীদের এই ছত্রাকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কোরে ব্যর্থ হন। ডাঃ ফ্লেমিং এর একজন বিশিষ্ট বন্ধু এবং তাঁর এই নবাবিষ্কারের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসী, 'লণ্ডন স্কুল অফ হাইজিন এ্যাণ্ড ট্রপিক্যাল মেডিসেনের' ডাঃ হ্যারোল্ড রেইষ্ট্রিক তাঁকে (ফ্লেমিংকে) এই সময়ে বিশেষ সহায়তা করেন। ডাঃ রেইষ্ট্রিক একজন বিশিষ্ট রাসায়নিক ও প্রাণিতত্ববিদ। তিনি পেনিসিলিনের রাসায়নিক দিকটা পরীক্ষা করে দেখেন। এরা দুজনেই ভিন্নভাবে গবেষণা চালাচ্ছিলেন। তাঁদের হাতে যখন চিকিৎসা চালাবার মত পেনিসিলিন জমলো তখন তাঁরা ডাক্তারদের কাছে গিয়ে পেনিসিলিন ব্যবহার করবার জন্য আবেদন জানালেন। তাঁদের আবেদন ব্যর্থ হোলো। এরপর জীবাণুতত্ববিদদের এক সভায় ডাঃ ফ্লেমিং বৈজ্ঞানিক মহলের কাছে তাঁর শেষ ব্যর্থ আবেদন জানান। তারপর থেকে ফ্লেমিং তাঁর সমস্ত আশাই পরিত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু এমন সময় বেধে উঠলো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। সুরু হতেই একটা শক্তিশালী জীবাণু ধ্বংসকারীর খোঁজ পড়লো। এই বিষয়ে অনুসন্ধানরত অক্সফোর্ডের স্যার উইলিয়াম ডুন স্কুল অফ প্যাথলজির অষ্ট্রেলিয়ান অধ্যাপক ডাঃ হাওয়ার্ড ওয়াল্টার ফ্লোরির পেনিসিলিনের কথা মনে পড়লো এবং তিনি

ডাঃ হিটলি ও ডাঃ চেইনের সহায়তায় একবছরের মধ্যে পেনিসিলিন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য জেনে ফেললেন।

পেনিসিলিন ওষুধটি হোলো পেনিসিলিয়াম নোটেটাম নামক ছত্রাকের নির্যাস। ডাঃ ফ্লেমিং যখন এই নির্যাস প্রথম নিষ্কাশন করেন তখন সেটা মোটেই খাঁটি অবস্থায় ছিল না। কাজেই ডাঃ ফ্লোরি এবং তাঁর সহকর্মীদের প্রধান কাজ হোলো ঐ নির্যাসকে শোধন করা। তাঁরা সেটা কিছু পরিমাণে করলেন এবং এই শোধিত পেনিসিলিন গিণিপিগ ও মানব দেহের উপর প্রয়োগ করে ভাল ফল পেলেন। পেনিসিলিন ব্যবহারের একটা বিশেষ অসুবিধা তাঁরা ভোগ করলেন যে, পেনিসিলিন রক্তের মধ্যে বেশীক্ষণ থাকে না, প্রস্রাবের সংগে বেরিয়ে যায়। শরীরে প্রবেশ করবার ৩ ঘণ্টা পরে এর আর কোনও অস্তিত্ব শরীরের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। কাজেই খুব বেশী পরিমাণে এবং ঘন ঘন ওষুধটা প্রয়োগ করতে হয়। সেজন্য পেনিসিলিনের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াবার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা মনোযোগী হলেন। যুদ্ধজনিত কারণের জন্য এটা লণ্ডনে করা সম্ভবপর হোলো না। সেজন্য ডাঃ ফ্লোরি 'ফ্লেমিং এর ছত্রাক' নিয়ে আমেরিকা যান ও সেখানে তিনি সম্পূর্ণরূপে সফলতা লাভ করেন।

এই হোলো পেনিসিলিন আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। নানা কারণে মেচনিকফের নিজের জীবনে অসফলতা সত্বেও আমরা আজ তাঁরই মতবাদের জয় জয়কার দেখছি। তাঁর মতবাদ ছিল বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ফ্লেমিং এর অসামান্য নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আবিষ্কৃত 'পেনিসিলিন'কে যদি মেচনিকফের মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখি তাহ'লে দেখতে পাব যে, বৈজ্ঞানিক সত্যের কোনও দিন পরাজয় হয় না।

সংকলন

(১)

চিনির নূতন ব্যবহার প্রণালী—

সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, চিনি কেবল মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য হিসাবেই গণ্য তা নয়। রাসায়নিক শ্রমশিল্পের কাঁচামাল হিসাবে তার গুরুত্ব উল্লেখযোগ্য।

আজকাল প্রধানতঃ কয়লা এবং খনিজ তৈল থেকেই রং, ভেষজ, প্লাষ্টিক এবং অন্যান্য অনেক রকমের নিত্য প্রয়োজনীয় কার্বনযুক্ত পদার্থ তৈরী হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় কয়লা এবং খনিজ তৈল দুই-ই ক্ষয়িষ্ণু, প্রকৃতি তা পূরণ করছে না। এমন একদিন হয়ত আসবে যেদিন এই দুই পদার্থের ব্যবহার সংযত করতে হবে। তা ছাড়া কয়লা এবং খনিজ তৈল এবং তার আনুষঙ্গিক পদার্থগুলি সমস্ত রকম কার্বনযুক্ত পদার্থ তৈরী করার পক্ষে উপযোগীও নয়।

চিনির সেই সুবিধা আছে। এর শেষ নেই, বরং বাৎসরিক উৎপাদন ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে যদিও তারও একটা সীমা আছে। উপরন্তু চিনির রাসায়নিক গঠন জটিল হওয়া সত্বেও তা অতি

সহজেই প্রয়োজনমত নানাভাবে রূপান্তরিত করা সম্ভব, অথচ অন্যান্য কাঁচা মাল দিয়ে তা প্রায় অসম্ভব বললেই হয়।

সম্প্রতি বৃটেনের গবেষকরা মানুষের এই অন্যতম প্রধান খাদ্য নিয়ে অনেক নূতন তথ্যের আবিষ্কার করেছেন। স্যার নর্মান হাওয়ার্থ বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন, এই পদে থাকাকালীন গত ২৩ বছর ধরে চিনির ধর্ম নিয়ে তিনি ব্যাপক গবেষণা করেন, তাঁর সঙ্গে থেকে অনেক তরুণ বৈজ্ঞানিকও আছেন। এই গবেষণার পূর্ণ বিবরণ ইতিমধ্যে সমস্ত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পত্রিকায় যথারীতি প্রকাশিত হয়েছে, বিজ্ঞানীরাও তার পরিচয় পেয়েছেন। এই গবেষণার ফলাফল অদূর ভবিষ্যতে সাধারণের ব্যবহারিক জীবনেও কার্যকরী হবে বলে আশা করা হয়।

বার্মিংহাম বৈজ্ঞানিকদের এই গবেষণার মর্যাদা স্বরূপ স্যার নর্মান হাওয়ার্থের অন্যতম সহকর্মী ডঃ লেস্‌লি উইগিন্‌স সম্প্রতি পুরস্কৃত হয়েছেন। এই পুরস্কারের পরিমাণ ৫০০০ ডলার। পৃথিবীর যে কোন বৈজ্ঞানিকই তাঁর বৈশিষ্ট্যের জন্য এই পুরস্কার লাভের অধিকারী। আমেরিকার 'চিনি' গবেষণা মন্দির (Sugar Research Foundation of America) থেকে প্রতি বৎসর চিনি সম্বন্ধীয় শ্রেষ্ঠ গবেষণার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় চিনিকে শাদা স্ফটিক খণ্ডে রূপান্তরিত করার জন্য প্রয়োজন লেভ্যুলিনিক অ্যাসিড (Levulinic Acid)। এর থেকে অনেক রকম আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি তৈরী করা যায়, যথা নূতন ধরণের সালফোনামাইড ভেষক (Sulphonamide M & B Type) বেদনা নিবারণ ও রক্তচাপ হ্রাস করার জন্য বিশেষ ঔষধ উপকরণ সাবানের মত একরকম পদার্থ এবং আরও অনেক কিছু।

কিছুদিন আগে চিনি থেকে নারিকেলের গন্ধ যুক্ত সুগন্ধি দ্রব্য বা এসেন্স তৈরীর উপায় প্রকাশিত হয়েছে। এই সামান্য আবিষ্কার থেকেই হয়ত একদিন অন্য কোন যৌগিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যাবে যার ফলে সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায় ক্ষেত্রে যুগান্তর দেখা যাবে।

স্পেনের ত্রিনিদাদ সহরেও চিনির ব্যবহার প্রণালী নিয়ে বৃটিশ বিজ্ঞানীরা নানারকম গবেষণার কাজে ব্যাপৃত আছেন, কলোনিয়াল দপ্তরের সাহায্যে সেখানে সম্প্রতি একটি ল্যাবরেটরী স্থাপিত হয়েছে—উদ্দেশ্য, অতিক্ষুদ্র রোগোৎপাদী জীবাণু, মদ তৈরীর জন্য এবং দুগ্ধ অম্লকারী জীবাণু প্রভৃতির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে গবেষণা করা। এই ল্যাবরেটরী গঠনের পর চিনি শিল্প বিশেষ ভাবে উন্নত হবে বলে আশা করা হয়।

চিনি বিশুদ্ধকরণের পর সর্বদা ঝোলা গুড়ের ন্যায় একরকম পদার্থ পাত্রের তলদেশে পরিত্যক্ত হয়, তাতে অনেকখানি চিনির অংশ নানারকম ময়লার সঙ্গে মিশ্রিত থাকে। প্রথম অবস্থায় তা ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী কিন্তু এক প্রকারের জীবাণু আছে যারা এই চিনিকে অবশ্য প্রয়োজনীয় পদার্থে রূপান্তরিত করতে পারে। একথা সকলেই জানেন যে সাধারণ ঈস্টের সাহায্যে চিনি থেকে সুরাসার (alcohol) তৈরী হয়। অন্য রকমের জীবাণু দিয়ে আবার সুরাসার থেকে যায়। এক রকমের পেনিসিলিয়াম ছত্রাক সাহায্যে চিনি এবং অন্যান্য পদার্থ সংমিশ্রিত তরল দ্রব্য থেকে পেনিসিলিন উৎপন্ন করা যায়।

গবেষণার আর একটি চমকপ্রদ ফল এই, ঝোলা গুড়ের উপর 'ছাতা' জন্মিয়ে তা দিয়ে প্রোটিনযুক্ত খাদ্য বস্তু তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। ইউরোপ এবং আমেরিকায় প্রধানতঃ মাংস থেকেই প্রোটিন গ্রহণ করা হয় কিন্তু আজ তা এখনও দুর্লভ এবং ব্যয়বহুল এবং সেখানে আরও কয়েক বছর ধরে এই অভাব অনুভূত হবে বলে মনে হয়। যদি চিনি এবং যৌগিক নাইট্রোজেন সংমিশ্রিত দ্রবপদার্থের মধ্যে ঈস্ট জন্মানো যায়

তা হলে ঈস্টের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের মধ্যে অনায়াসে বহুল পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায়। এই প্রকার ঈস্টের আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে এর মধ্যে—ভিটামিন—'বি' প্রচুর পরিমাণে পাওয়া সম্ভব।

(২)

ক্যান্সার রোগের প্রতিকার

প্রায় ২৫ বছর আগে বৃটিশ এম্পায়ার ক্যান্সার ক্যাম্পেইন (British Empire Cancer Campaign) দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করে। এই রোগের প্রতিকার সমস্যা এখনও তেমনি কঠিন হলেও অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় সুফল পাওয়া গিয়েছে।

জুলাই মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত "ক্যাম্পেইনের"র বাৎসরিক সভায় ক্যান্সার রোগের প্রতিকারের জন্য কি কি গবেষণামূলক কাজ হয়েছে তার বৃত্তান্ত পাওয়া গিয়েছে। "ক্যান্সার ক্যাম্পেইনের হেড-কোয়াটার্স থেকে দেশের বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রের জন্য বাৎসরিক ১৫ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করা হয়েছে, এবং এই জন্য আজ পর্যন্ত ১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা স্বতন্ত্র রাখা হয়েছে।

দেশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সমস্ত গবেষণা কেন্দ্রগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষার ব্যবস্থা করাও ক্যান্সার ক্যাম্পেইনের অন্যতম উদ্দেশ্য। তার ফলে আজ প্রত্যেক কেন্দ্র অপরাপর কেন্দ্রগুলির গবেষণার ফলাফল সহজেই জানতে পারে এবং প্রয়োজন হলে তারা সম্মিলিতভাবে উন্নততর গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে পারে। যেখানে ২৫ বছর আগে একটি মাত্র মানুষ ক্যান্সার রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করেছে সেখানে আজ শত শত কর্মী সেই কাজে ব্যাপৃত।

ক্যান্সার ক্যাম্পেইনের কার্যনির্বাহক সমিতির চেয়ারম্যান মিঃ লকহার্ট মামারী সম্প্রতি এই রোগের চিকিৎসায় দু'টি মূল্যবান ঔষধের পুনরুল্লেখ করেছেন। ঔষধ দু'টির একটি 'ষ্টিলবোয়েষ্ট্রোল' (Stilboestrol) এবং অন্যটি 'ইউরিথেন' (Urithane)। ভেষজ বিজ্ঞানের এই দুটি ঔষধই প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রথম এক্স্-রে চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার ছাড়া রোগ নিরোধের উপায় বলে স্বীকৃত হয়েছে।

নূতন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ সাহায্যেও শরীরের কোষ-সংস্থানে (Body cells) ক্যান্সার রোগের অবস্থা সম্পর্কে নানারকম ফলপ্রদ পরীক্ষা সম্ভব হয়েছে। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রটি ১,০০,০০০ গুণ আয়তন বৃদ্ধি করতে পারে, সেই জন্য ক্ষুদ্রতম জীবাণুটিও দৃষ্টিপথে ধরা পড়ে। এইভাবে ক্যান্সার রোগ সংক্রান্ত নানা রহস্য আবিষ্কারের পথ সুগম হয়েছে।

বিবিধ

এবছরে বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ—
উইলসন্ মেঘ-প্রকোষ্ঠের উন্নয়ন ব্যবস্থা ও ব্যোম-রশ্মি সংক্রান্ত মূল্যবান গবেষণার জন্যে মানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক পি. এম. এস. ব্ল্যাকেটকে এবছর পদার্থ-বিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে।

য়্যালবুমেনের অণুর পরিমাপের উপায় উদ্ভাবন করবার জন্যে সুইডেনের উপশালা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্নি টিসেলিয়াস্‌কে এবছর রসায়নে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে।

ডি. ডি. টি আবিষ্কার করে সুইস্ বিজ্ঞানী ডাঃ পল মুলার চিকিৎসা ও শারীরতত্ত্বে এবছর নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন।

ভারতের আকাশে ধূমকেতু—গত ১০ই

নভেম্বর থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব আকাশে একটি ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল। ধূমকেতুটির কয়েকফুট লম্বা পুচ্ছটি উপরের দিকে বিস্তৃত ছিল। অকল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে ধূমকেতুটিকে দেখা গেছে। গত বয়েক বছরের মধ্যে এই ধূমকেতু সবচেয়ে বেশী জ্যোতিষ্মান বলে দক্ষিণ আফ্রিকার জ্যোতির্বিদ্‌রা এই ধূমকেতুর নাম দিয়েছেন—১৯৪৮ কে।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস—এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে আগামী ২রা থেকে ৮ই জানুয়ারী (১৯৪৯) পর্যন্ত এলাহাবাদে বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩৬তম বার্ষিক অধিবেশন হবে। এ অধিবেশনে ব্রহ্ম, সিংহল, আফগানিস্থান এবং ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে আঠার শ'র বেশী বৈজ্ঞানিক যোগদান করবেন। দিল্লীর ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরীর ডিরেকটর ডাঃ স্যার কে, এস, কৃষ্ণণ বর্তমান অধিবেশনের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন। কংগ্রেসের অধিবেশন কালে কুড়িটির অধিক ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও সমিতির বার্ষিক সভা ও আলাপ আলোচনা চলবে। কংগ্রেস মণ্ডপে ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির জুবিলি উৎসব হবে। এইটি হবে একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সম্ভবতঃ ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং যুক্ত প্রদেশের গভর্ণর শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু উপস্থিত থাকবেন। আশাকরা যায়, বিগত পাটনা অধিবেশনের মত এবারও গ্রেটবৃটেন. ফ্রান্স, আমেরিকা, ক্যানাডা, হাংগেরী এবং রাশিয়া থেকে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরা অধিবেশনে উপস্থিত হবেন। ফ্রান্স থেকে প্রো ডাঃ ম্যাডামকুরি জোলিও এবং রাশিয়া থেকে বায়লজিষ্ট প্রোঃ এঙ্গেলহার্ট আসছেন। রয়াল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট বৃটেনের শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ্‌ স্যার রবার্ট রবিন্সন, আমেরিকার খ্যাতিমান অধ্যাপক হার্ম্যানমার্ক, নিউইয়র্ক রকফেলার প্রতিষ্ঠানের ডাঃ জর্জ ষ্টোড প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে। বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকদের বিমানযোগে যাতায়াত ও ভারতে অবস্থানের খরচ বাবদ ভারত সরকার পঁয়ষট্টি হাজার টাকা দিবেন। বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন গণিত, সংখ্যাতত্ব, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসা, পশু-চিকিৎসা প্রভৃতি তেরোটি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেক বিভাগেই আলোচনাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কাটজুড়ি নদীর উপর সেতু নির্মাণ—গত ৮ই নভেম্বর, ভারত সরকারের পূর্ত, খনি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সচিব শ্রী এন, ভি, গ্যাডগিল কাটজুড়ি নদীর উপর যে সেতু নির্মিত হবে তাহার ভিত্তি স্থাপন করেন। এই সেতু কটকের সঙ্গে উড়িষ্যার ভবিষ্যৎ রাজধানী ভুবনেশ্বরের যোগাযোগ রক্ষা করবে।

মহানদীর উপর সেতু নির্মাণ—গত ৭ই নভেম্বর, হীরাকুণ্ড বাঁধে মহানদীর উপর যে সেতু নির্মিত হবে ভারত গভর্ণমেণ্টের পূর্ত, খনি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সচিব শ্রী এন, ভি, গ্যাডগিল তার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ভারতের অন্যান্য সেতুগুলির মধ্যে ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীযুক্ত গ্যাডগিলকে সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের অনুরোধ করে শ্রী এ, এন, খোসলা বলেন যে, হীরাকুণ্ড বাঁধ সমাপ্ত হলে জনসাধারণের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির যে বিরাট সম্ভাবনা আছে, এই সেতু নির্মাণই তার প্রথম নিদর্শন হবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট যে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলগুলোকে ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধশালী অঞ্চলে পরিণত করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, এই সেতুনির্মাণই তার পরিচয় প্রদান করবে।

তিনি বলেন যে, এই রেলপথ-রাজপথ সেতুতে একশত ফুট করে ২৫টি খিলান থাকবে। সেতু স্তম্ভের মস্তক সাড়ে আট ফুট হবে। রাস্তা কংক্রিটের হবে এবং ইহা ২৪ ফুট প্রশস্ত হবে।

সেতুর মধ্যস্থলে যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য পাঁচ ফুট প্রশস্ত দুইটি রাস্তা থাকবে। সেতুও তার দুইদিকের দশ মাইল সংলগ্ন রাস্তা নির্মাণের জন্য এক কোটি দশ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে। সেতুর উপরের রাস্তা কলকাতার সঙ্গে বোম্বাইয়ের যোগাযোগ স্থাপন করবে এবং তার উপর যে ব্রড গেজ রেলপথ নির্মিত হবে তা সম্বলপুরের সঙ্গে রায়পুর ভিজিয়ানাগ্রাম রেলপথের টাটানগরে সংযোগ স্থাপন করবে।

পিন্‌ক্রোটন
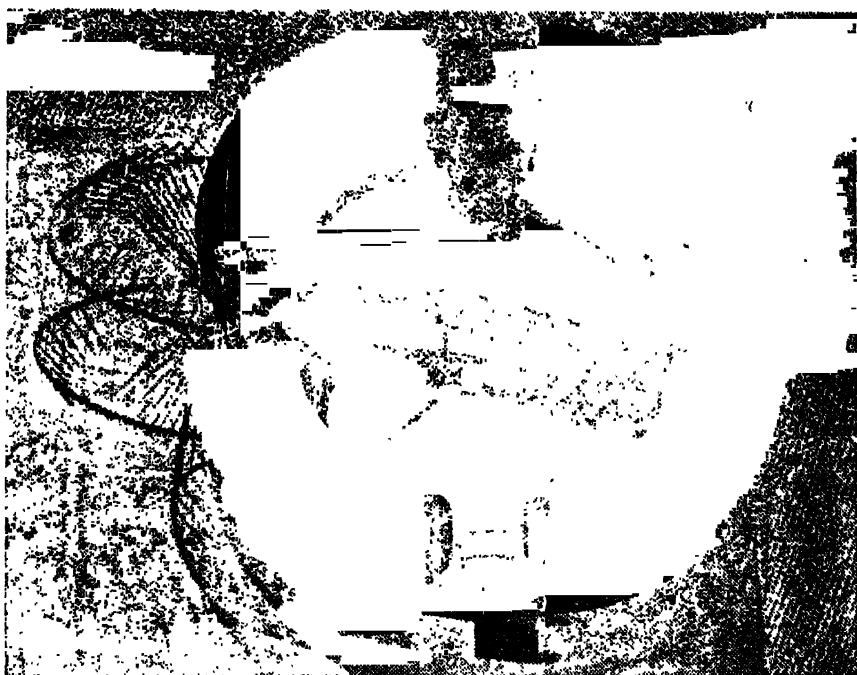
[৭২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য
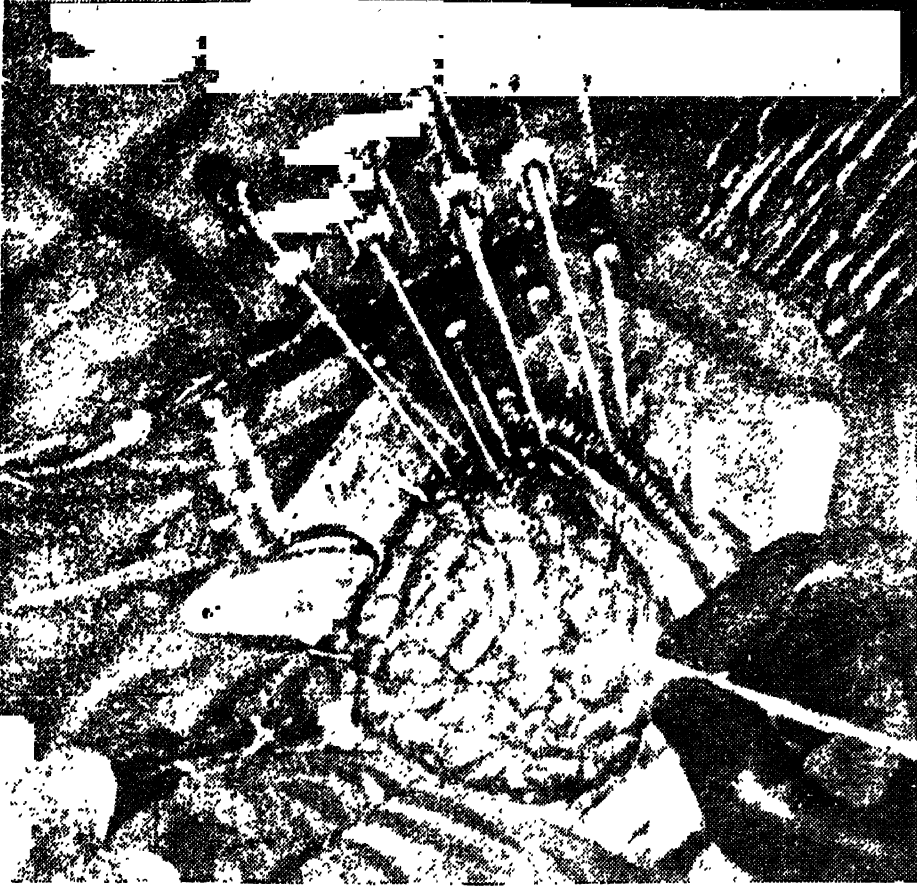
মস্তিষ্ক কেটে তার বিশেষ বিশেষ কার্য-নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্রসমূহের অবস্থানস্থল নির্ধারণ করা হচ্ছে।

জ্ঞান ও বিজ্ঞান

প্রথম বর্ষ | ডিসেম্বর—১৯৪৮ | দ্বাদশ সংখ্যা

নিউক্লিয়াসে বিকার প্রবর্তন ও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

প্রোটন, ডয়টেরিয়াম্ বা আলফা কণা + তড়িদ্ধর্মী। পরমাণুর নিউক্লিয়াস বিদারণে ইহাদিগকে ক্ষেপণী রূপে ব্যবহার করিয়া লঘুতর মৌলে সাফল্য লাভ করিলেও, গুরুতর মৌলে ইহারা তেমন কার্যকরী হয় না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে সহজেই দেখা যায় যে, পরমাণুর অভ্যন্তরে ইহাদিগকে প্রথমেই ইলেকট্রনের আবরণ ভেদ করিতে হয়। এই বিপরীতধর্মী তড়িৎক্ষেত্রে ক্ষেপণীর শক্তির অপচয় ঘটে। গতিজনিত শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় ইহাদের গতিমান্দ্য উপস্থিত হয়। তারপর যখন এই অবস্থায় উহারা + তড়িদ্ধর্মী নিউক্লিয়াসে প্রবেশোন্মুখ হয়, তখন আবার এক বিকর্ষণ বলের প্রভাবে পড়ে। এই পরিবেশে ইলেকট্রনক্ষেত্র জনিত মন্দীভূত শক্তি পর্যাপ্ত না হইলে বিপ্রকর্ষণ ক্ষেপণীকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া বিপথে চালাইয়া দিবে। সুতরাং নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তর দর্শনের সৌভাগ্য অনেক ক্ষেপণীরই হইবে না। আবার ভারী পরমাণুর বেলায় − ইলেকট্রন-ক্ষেত্র ও + নিউক্লিয়াস-ক্ষেত্রের উভয়ই প্রবলতর হওয়ায় ক্ষেপণীর গতিমান্দ্য ও বিকর্ষণ বেগ অধিকতর হইবে ও তাহাদের কার্যকারিতা হ্রাস প্রাপ্ত হইবে।

সুতরাং কৃত্রিম তাড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রে উপযুক্ত ক্ষেপণীর তড়িতাধান উহাদের গতি শক্তি বিবর্ধনের সহায়ক হইলেও, পরমাণুর অভ্যন্তরের স্বাভাবিক তড়িৎক্ষেত্রে ক্ষেপণীর কার্যকারিতার প্রতিকূল হয়। এ জন্য প্রচণ্ড বেগে প্রধাবিত তড়িদ্ধর্ম বিহীন জড়কণাই প্রকৃষ্ট ক্ষেপণী। এই বিবেচনা হইতেই নিউক্লিয়াস বিদারণে নিউট্রনের ব্যবহার আরম্ভ হয়। এই নিছক জড়কণা ওজনে প্রোটনের সমতুল্য। ১৯৩২ খৃঃ অব্দে আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উহা ক্ষেপনীরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। যথোচিত শক্তি যোগে প্রধাবিত হইলে ইহারা অনায়াসে পরমাণুর ইলেকট্রন আবরণ ভেদ করিয়া নিউক্লিয়াসে প্রহৃত হইবে ও কোনও প্রকার বিপ্রকর্ষণ ক্রিয়মান না হওয়ায় নিউক্লিয়াসের অন্তঃপুরে চলিয়া যাইবে। আবার এই কার্যে প্রতি নিউট্রনই সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে। অথচ তড়িদ্ধর্মী ক্ষেপণীর বেলায় অনেকের মধ্যে একটি বা দুইটি কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং নিউক্লিয়াস বিদারণে বাহির হইতে প্রযুক্ত শক্তি ও বিদারণের ফলে প্রকট শক্তির তারতম্যে লাভ ক্ষতির হিসাব করিলে, ক্ষেপণীরূপে নিউট্রনের

ব্যবহারই যে লাভজনক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এ ক্ষেত্রে প্রযুক্ত শক্তি অল্পতর মাত্রায় ব্যবহৃত হইতে পারে, কারণ তাহার অপচয় সামান্য।

কিন্তু ক্ষেপণীরূপে ব্যবহার করিতে হইলে প্রচুর পরিমাণে নিউট্রন সংগ্রহ করা প্রয়োজন। প্রোটন, ডয়টেরিয়াম কিংবা আলফা কণার স্বাভাবিক ভাণ্ডার আমাদের জানা আছে। তাহা হইতে সহজেই ইহাদের প্রচুর সরবরাহ চলিতে পারে। কিন্তু নিউট্রন তত সহজ প্রাপ্য নহে। মুক্ত অবস্থায় নিসর্গে নিউট্রন দেখা যায় না, কিংবা তাহার সম্ভাবনাও আশা করা যায় না। উহার একমাত্র ভাণ্ডার পরমাণুর নিউক্লিয়াস। তাহার বিদারণেই নিউট্রন মুক্ত হইতে পারে। কিন্তু এই বিমুক্ত নিউট্রনের স্বাধীন অবস্থা ক্ষণস্থায়ী, মুক্তিলাভ মাত্রই উহা আশে পাশের অন্য পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রবেশ লাভ করে। অথচ, উহাকে পাওয়ার একমাত্র উপায়ই হইল তড়িদ্ধর্মী ক্ষেপণী প্রয়োগে কোন মৌলের পরমাণু-নিউক্লিয়াস অবিরত বিদারণ। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তড়িদ্ধর্মী ক্ষেপণীর অধিকাংশই কার্যকরী হয় না ও সেইজন্য নিউক্লিয়াস বিদারণে প্রয়োগ করিতে হয়, উহাদের এক ধারা বা স্রোত। সুতরাং একটী নিউট্রন পাইতে বহু শক্তির অপচয় প্রয়োজন হয়। এইভাবে বিবেচনা করিলে নিউট্রনকে ক্ষেপণীরূপে ব্যবহার করিতে শক্তিলাভ অপেক্ষা ক্ষতিই হইবে অধিকতর। কিন্তু নিসর্গে এ প্রকার ব্যবস্থারই সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহাতে নিউট্রনের ব্যবহার পরিণামে লাভজনকই হইতে পারে। এমন মৌল দেখা যায়, যাহার কোন নিউক্লিয়াস হইতে একবার নিউট্রন বহিষ্কৃত করিতে পারিলে তাহারাই আবার পার্শ্বস্থিত অন্য নিউক্লিয়াসে প্রহৃত হইয়া মৌলের অভ্যন্তরে এক স্বতঃ নিউট্রন-প্রজনন ক্রিয়া প্রবর্তিত করিয়া যাইবে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাইবে। সুতরাং অত্যধিক শক্তির অপচয়ে নিউট্রন উৎপাদন প্রবর্তিত হইলেও মৌলবিশেষে সমস্ত কার্য বিবেচনায় এই প্রক্রিয়া লাভজনক হইয়া থাকে, ইহাই ধরিয়া লওয়া হউক। বস্তুতঃ, নিউক্লিয়াস বিদারণের ফলে ব্যবহারোপযোগী শক্তি পাইতে হইলে নিউট্রন-ক্ষেপণীই যে শ্রেষ্ঠ, এই তথ্য নানা পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে।

নিউক্লিয়াস প্রহৃত হইলে নিউট্রন অক্লেশে উহার ভিতরে প্রবেশ লাভ করিবে। নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরস্থ নিউট্রন ও প্রোটনরাজির সংসক্তিজ বল উহাকে আকর্ষণ করিয়া ভিতরে টানিয়া লইবে ও পরম সুহৃদের ন্যায় আপনাদের পূর্ব বিন্যাস রদবদল করিয়া নিজেদের মধ্যেই উহার স্থান করিয়া দিবে। ভিতরে প্রবেশকালে নিউট্রনটির যে শক্তি অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও স্থানবিন্যাস সময়েই অন্তঃপুরের সকল অধিবাসীর মধ্যে ভাগ হইয়া যাইবে। আবার নিউট্রনটি যদি চলার পথে সকল শক্তি প্রায় উজার করিয়া দিয়া একান্ত নিঃস্বের ন্যায় প্রবিষ্ট হয়, তবুও তাহার স্থানপ্রাপ্তির কোন অসুবিধা হয় না। এইভাবে নিউট্রনের অন্তঃপ্রবেশের জন্য ভিতরে যে বিপ্লব উপস্থিত হইবে, তাহার বহির্বিকাশ নিউক্লিয়াসের সারা দেহময় একপ্রকার স্পন্দনরূপে দেখা দিবে। সাধারণ পারদ বা জলের দুইটি ফোঁটা একত্রিত হইয়া বৃহত্তর ফোঁটায় পরিণত হইলেও উক্ত প্রকার স্পন্দন দেখা যায়। ইহার কারণও অন্তর্বিপ্লব। তবে এক্ষেত্রে স্পন্দন স্বল্পক্ষণ স্থায়ী। তরলের অংশসমূহের মধ্যে ঘর্ষণজনিত শক্তির অপচয়ে উদ্গত স্পন্দন অচিরে স্তব্ধ হইয়া যায়। কিন্তু নিউক্লিয়াস ফ্লুয়িড বা কারণ-সলিলে উক্ত প্রকার ঘর্ষণজনিত শক্তির অপচয়ের স্থান নাই। এস্থলে অন্তর্বিপ্লব জনিত স্পন্দন দীর্ঘকাল স্থায়ী ও ইহাই গামারশ্মিরূপে বিক্ষুব্ধ নিউক্লিয়স হইতে দিকে দিকে প্রধাবিত হইয়া থাকে। এ কথা জানা গিয়াছে যে, কোন নিউক্লিয়াসের অন্তর্গত কোন একটি নিউট্রন অপসারিত করিতে প্রায় ৫ Mev বা ৮×১০^{-৬} আর্গ শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। সুতরাং একটি নিউট্রন নিউক্লিয়াসের ভিতরে টানিয়া নিতেও ঐ

পরিমিত শক্তি প্রকট হইবে আর এই শক্তিই দেহের স্পন্দন ও গামারশ্মি বিকিরণের খোরাক যোগাইয়া থাকে।

কিন্তু, গামারশ্মি বিকিরণে শক্তির অপচয় সামান্য। এই কার্য সম্পাদন স্বত্বেও, নিউক্লিয়াসে নিউট্রন প্রবেশ জনিত প্রকট শক্তির অধিকাংশই অব্যাহত থাকে। তাহার আবেগে আগন্তুক নিউট্রনই বা অন্য কোন একটি, পরমাণু হইতে বাহিরে আসিয়া অন্য পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অনুপ্রবেশ করিতে পারে। নিউক্লিয়াসের প্রোটন কিন্তু এই উপায়ে বহির্গত হইতে পারে না। উহারা তড়িদ্ধর্মে বাধা প্রাপ্ত হয়। নিউট্রনের সে বালাই নাই। যথেষ্ট শক্তিশালী হইলেই উহা বাহিরে চলিয়া আসিতে পারে; আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ শক্তি থাকেই। দ্রুতগামী নিউট্রন সেকেণ্ডে চলে প্রায় কয়েক হাজার মাইল। গতিমান্দ্য ঘটিলেও এই বেগ সেকেণ্ডে এক মাইল হইয়া থাকে। সুতরাং উহাদের গতিজনিত শক্তি উপেক্ষণীয় নহে। পর পর বহু নিউক্লিয়াস ভেদ করিয়া চলিয়া আসার ফলে ক্রমে গতিমান্দ্য ঘটিলেই দ্রুতগামী নিউট্রন সকলের শেষে প্রহৃত নিউক্লিয়াসে আবদ্ধ হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং নিউক্লিয়াস বিদারক হিসাবে দ্রুতগামী নিউট্রন সুফলপ্রদ নহে। এ জন্যে লক্ষ্যবস্তুতে আপতনের পূর্বে নিউট্রন ক্ষেপণীর গতিমান্দ্য সাধন প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে নিউট্রন-ধারা হাইড্রোজেনের ভিতর দিয়া চালাইয়া গতিবেগ মন্দীভূত করা হয়। কারণ প্রোটন ও নিউট্রনের ভর প্রায় সমান। কোন গতিশীল নিউট্রন ঠিক সম্মুখে পতিত প্রোটন কণায় প্রহৃত হইলে গতিবিজ্ঞানের নিয়মে উহার গতিজনিত শক্তি অর্ধেক হইয়া যায় ও অপরার্ধ গ্রহণ করে আহত প্রোটন কণা। হিসাবে পাওয়া যায় যে, কোন নিউট্রন পর পর ২৭টি হাইড্রোজেন পরমাণুতে প্রবিষ্ট হইলে উহার গতিবেগ $\frac{1}{2^{27}}$ অংশে নামিয়া যায় ও আমাদের আবহাওয়ার চলতি উষ্ণতায় তাপপ্রভাবিত গতি শক্তির সমান হয়। এইপ্রকার গতিশক্তিই কার্যসম্পাদনের অনুকূল মনে হয়।

এই প্রক্রিয়ায় গতিমান্দ্য সাধনের আনুষঙ্গিক আর একটি কার্য সাধিত হইতে পারে। কোন বিশেষ সংঘর্ষের পর নিউট্রন আর বাহির না হইয়া হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের প্রোটন কণাটির সহবাসী হইয়া পড়িতে পারে। ফলে নিউক্লিয়াসের +তড়িৎ অবিকৃত থাকিয়াও উহার ভার হইয়া যাইবে দ্বিগুণ ও হাইড্রোজেনের এক সমপদ ভারী হাইড্রোজেন-পরমাণু উৎপন্ন হইবে। নিউক্লিয়াসটির আখ্যা দেওয়া হয় ডয়টেরিয়াম। পরীক্ষায় কিন্তু উক্ত ক্রিয়া সম্পাদনের সম্ভাব্যতা অল্পই দেখা যায়। সাধারণতঃ যথেষ্ট গতিমান্দ্য সাধনের পরও নিউট্রনের গতিশক্তি এত অধিক থাকে যে, প্রোটনের সহিত অনাসক্তরূপে প্রায় ১০০ সংঘর্ষ ঘটার পরই ডয়টেরিয়াম উৎপত্তির সম্ভাবনা ঘটিতে পারে।

কোন নিউক্লিয়াসে বাহির হইতে নিউট্রন প্রবিষ্ট ও আবদ্ধ হইলে বিবিধ পরিণতির সম্ভাবনা ঘটে। প্রথমতঃ নিউক্লিয়াসের ভারবৃদ্ধি ঘটায় ও উহার অভ্যন্তর ও বহিঃস্থিত তড়িতাধান অব্যাহত থাকায় মৌলের একটি অপেক্ষাকৃত গুরু সমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ভাবে পাওয়া যায়—কার্বন (পরমাণু অংক ১২) হইতে ভারী কার্বন (পঃ অঃ ১৩); লৌহ (পঃ অঃ ৫৬) হইতে ভারী লৌহ (পঃ অঃ ৫৭)। এই নূতন নিউক্লিয়াস দুইটি স্থিরবস্থ ও স্থায়ী। নিসর্গে প্রাপ্ত সাধারণ মৌলের সহিত ইহারা অল্পমাত্রায় মিশ্রিত থাকে। নিউট্রন প্রহৃত পরমাণু অ্যাষ্টনের পরমাণুভার বিশ্লেষক যন্ত্রে পরীক্ষা করিলেও উৎপন্ন সমপদের অস্তিত্ব জ্ঞাপিত হয়। আবার সোডিয়াম, ম্যাংগানিজ প্রভৃতি যে সমস্ত মৌলের কোন সমপদই নিসর্গে দেখা যায় না, তাহাদের নিউক্লিয়াসে নিউট্রন প্রতিক্রিয়া নিম্ন ব্যবস্থানুরূপ।

সোডিয়াম (পঃ অঃ ২৩)+নিউট্রন=সোডিয়াম (পঃ অঃ ২৪)+গামারশ্মি। ম্যাংগানিজ (পঃ অঃ ৫৫)+নিউট্রন=ম্যাংগানিজ (পঃ অঃ ৫৬)+গামারশ্মি। কিন্তু এই ২৪ পরমাণু অংকের সোডিয়াম বা ৫৬ পরমাণু অংকের ম্যাংগানিজ নিসর্গে দেখা যায় না। উপরে প্রদর্শিত সমীকরণে ইহাদের উৎপত্তির সম্ভাবনা থাকিলেও নূতন নিউক্লিয়াসগুলি অতিশয় অস্থিরবস্থ হয় ও উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের রূপ পরিবর্তন ঘটে। কারণ, নিসর্গে প্রাপ্ত সোডিয়ামের নিউক্লিয়াসে ১১টি প্রোটন ও ১২টি নিউট্রন থাকে। উহাদের ব্যবস্থানে সাম্য রক্ষিত হয় বটে কিন্তু উৎপন্ন নিউক্লিয়াসে ১৩টি নিউট্রন হওয়াতে পূর্বের সাম্য কিছুতেই আশা করা যায় না।

এ অবস্থায় নিউক্লিয়াসের আভ্যন্তরিক সাম্য পুনঃ প্রবর্তনের উপায়ও নির্ধারণ করা যায়। সাধারণতঃ নিউক্লিয়াসে প্রোটন অপেক্ষা নিউট্রনের সংখ্যা অধিক থাকে। এই আধিক্যের অনুপাত পরমাণু অংক বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়িতে থাকে। সেই জন্য মৌলছকের শেষ দিকে সমস্ত নিউক্লিয়াস অস্থিরবস্থ। কিন্তু যদি কোন উপায়ে কতক নিউট্রন প্রোটনে পরিবর্তিত করা যায় তাহা হইলে অসাম্যের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার আশা করা যায়। গ্যামোর মতে যেভাবে কারণ-সলিল হইতে মৌল সৃষ্টি হইয়াছে তাহার আলোতে প্রস্তাবিত কার্যসম্পাদন কৌশল সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। বিজ্ঞানীর মতে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রন মিলিয়া নিউট্রন কণার উদ্ভব হইয়াছে; সুতরাং নিউট্রনের ইলেকট্রনটি অপসৃত হইলেই পাওয়া যাইবে প্রোটন। এইরূপে উৎপন্ন সোডিয়ামের একটি নিউট্রন পরিবর্তিত করিলে নিউক্লিয়াসে থাকিবে ১২টি প্রোটন ও সমসংখ্যক নিউট্রন। ইহা ২৪ পরমাণু অংক বিশিষ্ট পরমাণুর পরিপূর্ণ সাম্যাবস্থা। ইহা মৌলছকের সোডিয়ামের অব্যবহিত পরবর্তী মৌল ম্যাগনেসিয়াম। এই মৌলের আরও দুইটি সমপদ বর্তমান থাকিলেও নিসর্গে প্রাপ্ত ম্যাগনেসিয়ামের শতকরা ৬৮ ভাগই এই ২৪ পরমাণু অংকের সমপদ। একই প্রকারে অস্থির ম্যাংগানিজ নিউক্লিয়াস ইলেকট্রন অপসারিত করিয়া ৫৬ পরমাণু অংক বিশিষ্ট লৌহের সমপদে পরিণত হয়। এই সমপদও নিসর্গে প্রাপ্ত লৌহের শতকরা প্রায় ৯১ ভাগ।

এই ইলেকট্রন অপসারণ অস্থিরবস্থ নিউক্লিয়াস্ উৎপন্ন হওয়া মাত্রই ঘটে না। ক্রিয়াটি সময় সাপেক্ষ; তবে এজন্যে কোন বাঁধা নিয়ম দেখা যায় না। কোন নিউট্রন অল্প সময়ে আবার কোনটি অধিক সময়ে ইলেকট্রন ত্যাগ করে। নিউট্রন নিউক্লিয়াসে প্রবেশের অব্যবহিত পর হইতে কিয়ৎকাল পর্যন্ত ইলেকট্রন অপসারণ ক্ষমতা অধিক থাকে ও সময় অতিবাহনের সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষমতাও হ্রাস পাইতে থাকে। এই ক্ষমতার প্রথম প্রবল বিকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া পরিপূর্ণ অক্ষমতার নির্দেশ কাল পর্যন্ত সময় পরিমাণকে পূর্ণ-অপসারণ-জীবন ধরিয়া যে সময়ে অপসারণ-ক্ষমতা অর্ধেকে পরিণত হয়। সেই সময় পরিমাণকে অপসারণের "অর্ধ-জীবন" আখ্যা দেওয়া হয়। এই হিসাবে নিউট্রন গ্রহণে সমুৎপন্ন সোডিয়াম নিউক্লিয়াসের অর্ধজীবন ১৪·৮ ঘণ্টা। অর্থাৎ উক্ত প্রকারে অস্থিরবস্থ মৌল হইতে ইলেকট্রন-অপসারণ-ক্ষমতা ১৪·৮ ঘণ্টা পর অর্ধেক হইয়া যাইবে। এই অর্ধজীবন, সালফারের বেলা ৮৮ দিন ও কোবাল্টের বেলা ৫·৩ বৎসর।

একথা সকলেরই জানা যে, তেজস্ক্রিয় মৌল হইতে নির্গত বিটারশ্মি স্বতঃবিকীর্ণ ইলেকট্রন ধারা মাত্র। সুতরাং নিউট্রনের অনুপ্রবেশের ফলে কোন পরমাণু হইতে ইলেকট্রন অপসারণ কার্যটি ব্যাপকরূপে দেখিলে মৌলটিকে কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয় করারই সামিল মনে হইবে। সোডিয়াম, ম্যাংগানিজ, সালফার বা কোবাল্ট এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে সাময়িক ভাবে তেজস্ক্রিয় মৌলে পরিণত হয়। ইহাদের অর্ধজীবন বিভিন্ন কালব্যাপী। পরমাণু ভেদে এই অর্ধজীবন ঘণ্টা, দিন, মাস বা

বৎসর পরিমিত হইতে পারে। কার্বনের একটি ভারী সমপদ আছে (পরমাণু অংক ১৩), তাহার অর্ধজীবন ১০ হাজার বৎসর।

একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, নিউট্রনের ন্যায় প্রোটন গ্রহণ করিয়াও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া প্রবর্তিত হইতে পারে। তবে এস্থলে অপসারিত হইবে পজিট্রন, ইলেকট্রনের +তড়িদ্ধর্মী দোসর। কারণ, এক্ষণে নিউক্লিয়াসের অস্থির অবস্থার কারণ প্রোটন সংখ্যা বৃদ্ধি। সুতরাং প্রোটনের সমগ্র +তড়িদাধান লইয়া পজিট্রন বহির্গমন করিলে তৎপরিবর্তে থাকিবে নিউট্রন। তাহাই হইবে এই ক্ষেত্রে সাম্যাবস্থার যথার্থ উপযোগী। তবে ক্ষেপণী হিসাবে প্রোটনের অযোগ্যতার কথা পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। নিউক্লিয়সের +তড়িৎ-ক্ষেত্রে প্রোটনের প্রবেশানুমতি সহজে মিলে না। তবে লঘুতর পরমাণুর বেলায় উহা ক্রিয়মান হইতে পারে।

সুতরাং ক্ষেপণীতে প্রহত হইয়া নিউক্লিয়স + বা —তড়িৎকণা বিতাড়িত করিয়া সাময়িকভাবে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়া প্রদর্শন করে। এই ক্রিয়া প্রথমে লক্ষ্য করেন ইতালীয় বিজ্ঞানী ফের্মি। সেইজন্য নিউট্রন ক্ষেপণী প্রয়োগে যে সকল মৌল তেজস্ক্রিয় হয় তাহাদের নাম "ফের্মি মৌল"। আবার প্রোটন প্রভাবে যে সকল মৌল পজিট্রন বিতাড়ণ করিয়া তেজস্ক্রিয়া প্রদর্শন করে তাহাদের নাম দেওয়া হয় "কুরি-জলিয়ট মৌল"। ইহারাই প্রথমে এই ক্রিয়া সন্দর্শন করেন।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়ার অতি ব্যাপক ব্যবহার স্বল্পায়াস সাধ্য বলিয়া অধুনা ক্যানসারাদি দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসায় ইহারা ব্যবহৃত হয়। রসায়ন বিজ্ঞানের নানা শাখায় ও জীব-বিজ্ঞানে ফের্মি মৌলের বহু ব্যবহার দেখা যায়। অনেক সময় ইহারা নৈসর্গিক রেডিয়াম অপেক্ষাও ব্যবহারোপযোগী।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌলের রাসায়নিক গুণ অক্ষুণ্ণ থাকে। আমাদের দেহ গঠনে ফস্‌ফরাস্ যেরূপ ক্রিয়মান হয়, রেডিও ফস্‌ফরাস্ ও তদ্রূপ; সুতরাং কাহাকেও এই তেজস্ক্রিয় মৌল সেবন করাইলে দেহের অভ্যন্তরেও ইলেকট্রন বিকিরণ ক্রিয়া হইতে উহার অবস্থিতি নিরূপিত হয়। খাদ্যসহ আমরা প্রত্যহ প্রচুর ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস্ গ্রহণ করি ও তাহাই আবার ফস্ফেটরূপে পরিত্যাগ করি। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যে ক্যালসিয়াম একবার ফস্ফেট রূপে অস্থিগঠনে নিয়োজিত হইল, তাহা কি চিরকালই অস্থি-র অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে বিদ্যমান থাকে কিংবা ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও সেই ক্ষয় পূরণার্থই নূতন ফস্ফেট গ্রহণ প্রয়োজন? রেডিও ফস্‌ফরাস্ গ্রহণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রাণীর অস্থিও তখন তেজস্ক্রিয় হয়, সুতরাং রক্ত হইতে অস্থিতে ফস্ফেট গিয়াছে। আবার এই অস্থিস্থিত রেডিও ফস্‌ফরাস্ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় রক্তে প্রত্যাবর্তন করে। সুতরাং দেহাস্থি যে ক্ষয়শীল ও তাহার এই ক্ষয় পূরণার্থ নূতন ফস্ফেট গ্রহণ করিতে হয়, তাহা এই রেডিও ফস্‌ফরাসের ব্যবহার হইতে সুসাব্যস্ত হইয়াছে।

কয়েকটি কৃত্রিম শিল্পদ্রব্য

শ্রীশচীন্দ্র কুমার দত্ত

মানুষের মন আজকাল হয়ে পড়েছে কৃত্রিমতা-মুখী, পোষাকে পরিচ্ছদে আচারে ব্যবহারে স্বাভাবিক মানুষটিকে আজ খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। আমাদের প্রয়োজন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভাবও বেড়ে চলেছে ক্রমাগত। স্বাভাবিক উপায়ে উৎপন্ন দ্রব্যাদি সেই অভাব পূরণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কাজেই মানুষ কৃত্রিম উপায়ে সেই সমস্ত জিনিষ তৈরী করে অভাব মেটাবার জন্যে সচেষ্ট হয়ে পড়েছে। দুর্লভ ও দুর্মূল্য জিনিষকে সহজলভ্য ও সস্তা করে তোলবার জন্যে বিজ্ঞানীর চেষ্টার বিরাম নেই। তাই আজ কৃত্রিম উপায়ে তৈরী হাজার হাজার জিনিষে বাজার ছেয়ে গেছে। সস্তা সুলভ ও টেকসই বলে বহু কৃত্রিম জিনিষের কাটতি, স্বাভাবিক উপায়ে উৎপন্ন সেই জিনিষের চেয়ে অনেক বেশী। নীল, রেশম, রঞ্জন, রবার, দুগ্ধ, মাখন, চিনি, পেট্রল, রং, পাট, গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি অসংখ্য জিনিষ আজ কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন করা হচ্ছে। কয়েকটি সুপরিচিত সাধারণ জিনিষের কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদন প্রণালীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াই এই প্রবন্ধ অবতারণার উদ্দেশ্য।

কৃত্রিম সাগুদানা

সাগুদানা একটি অতি প্রয়োজনীয় উদ্ভিজ্জ শ্বেতসার—একপ্রকার তাল জাতীয় বৃক্ষে উৎপন্ন হয়ে থাকে। প্রধানতঃ আলুর শ্বেতসার থেকে কৃত্রিম উপায়ে এই পদার্থটি জার্মেনী ও ফ্রান্সে তৈরী হয়। এই কৃত্রিম সাগুদানা আকৃতি ও বর্ণে আসলের চেয়ে উৎকৃষ্ট। পরিষ্কৃত আলুর শ্বেতসারের সঙ্গে 'খুব অল্প জল মিশিয়ে শক্ত আঁঠাল পদার্থে পরিণত করা হয়। তারপর সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট ধাতু নির্মিত প্লেটের ওপর এই আঁঠাল শ্বেতসার রেখে চাপ দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই প্লেটটাকে ঝাঁকান হয়। ফলে, সূক্ষ্ম ছিদ্রের ভিতর দিয়ে আঁঠাল পদার্থ নির্গত হয়ে ছোট ছোট দানায় পরিণত হয়—ঠিক আমাদের বোঁদে বা মিহিদানা ভাজার মত। একটি ঘূর্ণায়মান পিপের ভিতর এই দানাগুলোকে ফেলে দেওয়া হয়। পিপে ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে এগুলো গোলাকৃতি হয়ে পড়ে। একটা দানার গায়ে আর একটা যাতে লেগে না যায় সেই জন্যে এই পিপের ভিতর অল্প পরিমাণে শুকনো গুঁড়ো শ্বেতসার ছড়িয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। এর পর চালুনীর সাহায্যে চেলে একই আকারের দানাগুলোকে পৃথক করার পর সেগুলো টিনের ট্রের ওপরে পাতলা করে বিছিয়ে দেওয়া হয়। একটি চুল্লীর ভিতর থাকে থাকে এই ট্রেগুলোকে সাজিয়ে রেখে চুল্লীর দরজা বন্ধ করে নলের সাহায্যে গরম বাতাস ও বাষ্প এর ভিতর প্রবেশ করানোর ফলে, দানাগুলোর গা ভিজে ওঠে এবং প্রত্যেকটি দানার চতুর্দিকে শিরিসের মতো আঁঠাল চটচটে একটা আস্তরণ পড়ে যায়। এর পরে সেই চুল্লীর ভিতর কিছুক্ষণ গরম বাতাস সঞ্চালণ করা হয়ে থাকে; ফলে সেই দানাগুলোর আঁঠাল বহিরাবরণ শুকিয়ে শক্ত হয়ে পড়ে। ঠাণ্ডা হবার পরে দানাগুলো ছাড়িয়ে আবার চালুনী দিয়ে চেলে যন্ত্রের সাহায্যে তাদের গা গুলো মসৃণ ও চকচকে করা হয়। এইরূপে তৈরী কৃত্রিম সাগুদানা উদ্ভিজ্জ ভারতীয় সাগুদানার চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়।

কৃত্রিম শ্লেট

প্রথম বিদ্যার্থীর পক্ষে শ্লেট একটি অপরিহার্য দ্রব্য। দরিদ্র ছেলেমেয়েরা স্কুলে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত শ্লেট ব্যবহার করে থাকে। আজকাল কাগজ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হয়ে পড়ায় শ্লেটের আদর অনেক বেড়েছে। শ্লেট একধরণের পাথর বিশেষ। পাতলা মৃত্তিকাস্তর শিলীভূত হয়ে কঠিন প্রস্তরে পরিণত হয়ে স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে। আমাদের দেশে বিহারের মানভূম, সিংভূম এবং মুঙ্গের জেলায়, মহীশূরের তুমকুর, পাঞ্জাবের গুরুদাস পুর, গুরগাঁও এবং কাঙ্গরা উপত্যকায়, রাজপুতনার আলওয়ারে এবং যুক্ত প্রদেশের আলমোরা, গারওয়াল ও নৈনীতালে শ্লেটের খনি আছে।

আজকাল কৃত্রিম উপায়ে স্কুল শ্লেট উৎপাদন করা হচ্ছে। এই কৃত্রিম শ্লেট সস্তা, হাল্কা এবং ঘাতসহ। চার পাউণ্ড সিমেণ্ট, দশ পাউণ্ড ভাঙ্গা শ্লেটের গুঁড়ো, এক পাউণ্ড ক্যালসিয়াম নাইট্রেট এবং একপাউণ্ড বেরিয়াম নাইট্রেট এক সঙ্গে মিশিয়ে গুঁড়ো করা হয় তারপরে এর সঙ্গে ৫ পাউণ্ড পটাশ সিলিকেট মিশ্রিত করা হয়ে থাকে। দুই পাউণ্ড নরম সাবান অল্প জলে গুলে নিয়ে তার সঙ্গে সেই চূর্ণীকৃত পদার্থ মিশিয়ে আঠার মত পদার্থে পরিণত করা হয়। তারপরে সেই আঁঠাল পদার্থ আয়তাকার ফ্রেমে বা ছাঁচে ঢেলে ওপরে চাপ দেওয়া হয়। আর্দ্র বাতাসে শ্লেট জমে যায়। একটা লোহার প্লেটের সাহায্যে বালি ও জল দিয়ে ঘষে শ্লেটের উপর ও তলদেশ মসৃণ করা হয়। এর পরে রং করার পালা। ৭ভাগ তিসির তেল ১ভাগ গিরিমাটি (Ochre') ৩ ভাগ আলকাতরা এবং ১ ভাগ আসফাল্ট মিশিয়ে রং তৈরী করে সেই রং দিয়ে শ্লেটের ওপরে পাতলা প্রলেপ দেওয়া হয়। রং করবার পরে ২০০° ফারেনহাইট তাপে শ্লেট গরম করা হয়। ঠাণ্ডা করে পিউমিস পাথর ও ত্রিপোলির সাহায্যে পুণরায় শ্লেটের দেহ মসৃণ করার পরে কাঠের ফ্রেমে বাঁধাই হয়ে শ্লেটের সৃষ্টিকার্য সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। কিসেল্‌গার, সিমেণ্ট এবং প্রদীপের কালি মিশিয়েও শ্লেট তৈরী করা যায়।

আজকাল টিনের শ্লেট বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে তৈরী করা হচ্ছে। প্রথমতঃ সমপরিমাণ পটাশ এবং সোডিয়াম সিলিকেট বা জলকাঁচ আট ভাগ জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত ফুটিয়ে পরিষ্কার দ্রাবণে পরিণত করা হয়। আট ভাগ শ্লেটের গুঁড়ো অল্প জলের সঙ্গে মিহি করে বেটে নিয়ে তার সঙ্গে এক ভাগ প্রদীপের কালি মিশিয়ে নেবার পরে পূর্বোক্ত জলকাঁচ দ্রাবণের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়। শ্লেটের মাপে কাটা টিনের পাতে এই মিশ্রিত পদার্থের পাতলা প্রলেপ দিয়ে শুকিয়ে নিলেই শ্লেট তৈরী সমাপ্ত হয়ে থাকে। একরকম কাগজের শ্লেটও আজকাল তৈরী হয়ে থাকে, এগুলোকে শ্লেট খাতা বলা হয়। খাতার প্রত্যেকটি পৃষ্ঠাই এক একখানা শ্লেট। পার্চমেণ্ট কাগজে শ্লেটের লেপ দিয়ে এই শ্লেট তৈরী হয়। এই প্রলেপ প্রধাণতঃ কোপাল বার্ণিশ, তার্পিন তেল, সুক্ষ্ম বালি, শ্লেটগুঁড়ো কাঁচের গুঁড়ো এবং প্রদীপের কালির সংমিশ্রণে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। শ্লেট পেন্সিল দিয়ে এই কাগজের শ্লেটে অনায়াসে লেখা যায় এবং লেখা মুছে ফেলা যায়, তবে একখানা শ্লেট-পৃষ্ঠা বেশী দিন চলেনা।

কৃত্রিম শ্লেটের মত কৃত্রিম শ্লেট-পেন্সিলও তৈরী করা কষ্ট সাধ্য নয়। এই পেন্সিল দু' প্রকারের—শক্ত ও নরম। শ্লেট-পাথরের গুঁড়ো, চুণাপাথর ও সোডিয়াম সিলিকেট—এই তিনটিই প্রধানতঃ প্রথমোক্ত পেন্সিলের উপাদান। নরম পেন্সিল ৮০ভাগ গুঁড়ো-শ্লেট, দশভাগ সাবান-পাথর বা সোপষ্টোন এবং ১০ ভাগ চূর্ণীকৃত কাঁচ মিশিয়ে তৈরী হয়। এই মিশ্রিত পদার্থ ১৫ ভাগ মোমের সঙ্গে মিশ্রিত করে বয়লারে কিছুক্ষণ গরম করা হয়। অল্প ঠাণ্ডা হলে এটা প্লাষ্টিকের মত নমনীয় পদার্থে পরিণত হয়ে যায়। তারপরে যন্ত্রসাহাযে

ছিদ্র বিশিষ্ট প্লেটের ভিতর দিয়ে চালনার ফলে পেনসিলের মতো লম্বাকৃতি হয়ে বেড়িয়ে আসে। এই পেন্সিলে মোমের ভাগ খুব অল্প থাকে, কারণ ছিদ্রের ভেতর দিয়ে চালনার ফলে প্লেটের পেছনেই বেশীর ভাগ মোম আটকে যায়। এই পেন্সিলে লেখা খুবই আরামদায়ক।

কৃত্রিম কর্পূর

কর্পূর একটি অতি প্রয়োজনীয় উদ্ভিজ্জ পদার্থ। বিবিধ ভেষজে কর্পূর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গাছ থেকে যে কর্পূর পাওয়া যায় তা আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। কৃত্রিম উপায়ে এই পদার্থটি আজকাল তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। লবণ ও গন্ধকাম্ল বা সালফ্যুরিক এসিড উত্তপ্ত করলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই গ্যাস শুষ্ক করে নলের সাহায্যে বিশুদ্ধ তাপিণ তেলের ভেতর প্রবেশ করান হয়। লবণ মিশ্রিত গুঁড়ো বরফের ভিতর এই তেলের পাত্র ডোবান থাকে। এতে তেলের তাপ শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের অনেক নীচে নেমে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই এই ঠাণ্ডা তেলের ভিতর সাদা ও কেলাসিত শক্ত জিনিষ জমতে আরম্ভ করে। এই জিনিষটিই হল—কৃত্রিম কর্পূর। খুব কম তাপে তাপিন তেল ও হাইড্রোক্লোরিক অম্লের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই এই কর্পূর তৈরী হয়। তারপর, ওপরের তেল ঢেলে নিয়ে, সেই সাদা পদার্থটিকে ফিলটার কাগজের চাপে শুষ্ক করা হয়। এই কর্পূরকে সুরাসারে দ্রবীভূত করে তারপর পুনরায় কেলাসিত করে বিশুদ্ধ করা হয়ে থাকে। বাজারে কর্পূরের ট্যাবলেট কিনতে পাওয়া যায়। ৫ ভাগ কর্পূর, ২ ভাগ চিনি ও সামান্য পিপারমিণ্ট তেলে মিশিয়ে এই ট্যাবলেট প্রস্তুত হয়ে থাকে।

কৃত্রিম হস্তীদন্ত

হস্তীদন্ত একটি মূল্যবান পদার্থ। সাধারণ জিনিষের তালিকায় এটা পড়ে না। ধনী ও বিলাসী ব্যক্তিদের গৃহসজ্জায় ব্যবহৃত হস্তীদন্তের বিবিধ জিনিষ তাদের ধন-গৌরবের পরিচয় প্রদান করে। কৌটা, সিগারেট কেস, খেলনা, চিরুণী, ছুরির বাঁট, ছবির ফ্রেম, ফুলদানী ইত্যাদি বহুবিধ জিনিষ হাতীর দাঁতে তৈরী করা হয়ে থাকে। সত্যিকারের হস্তীদন্ত মহার্ঘ ও দুর্লভ জিনিষ। হস্তীদন্তের রাসায়নিক বিশ্লেষণে যে সমস্ত উপাদান পাওয়া গেছে—সেগুলোর রাসায়নিক সমবায়ে কৃত্রিম উপায়ে হস্তীদন্ত তৈরী করা সম্ভবপর হয়েছে। বলাবাহুল্য এই কৃত্রিম হাতীর দাঁত, স্বাভাবিক দাঁতের চেয়ে সস্তা এবং গুণে ও ঔজ্জ্বল্যে তার চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করতে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যেতে পারে।

৩০০ ভাগ চূণ যথেষ্ট পরিমাণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে একটা ঘন দুধের মত আরক বা ইমাল্সন্ তৈরী করে সঙ্গে সঙ্গে ৭৫ ভাগ ফস্‌ফরিক অম্লের জলে দ্রাবণ এর মধ্যে ঢেলে দিতে হবে। তার পর অল্প অল্প করে ১৬ ভাগ চকের গুঁড়ো, ২ ভাগ ম্যাগনেসিয়া এবং ৭৫ ভাগ এলুমিনা ধীরে ধীরে ওর সঙ্গে মিশিয়ে ঘন ঘন নাড়তে হয়। অবশেষে ১৫ ভাগ জিলেটিন নামক একপ্রকার আঁঠাল পদার্থ ২০ ভাগ জলে পূর্বোক্ত মিশ্রিত দ্রাবণের সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে দেওয়া দরকার। এখানে সব সময় মনে রাখতে হবে যে, সমস্ত উপাদানগুলো যত ভাল ভাবে মিশবে, হস্তীদন্তের বুনট তত ভাল হবে। তারপর এই প্ল্যাষ্টিকসের মত পদার্থকে সারারাত রেখে দিতে হয়,—তাতে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ওপর ফস্‌ফরিক অম্লের রাসায়নিক ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হবে। পরদিন বিভিন্ন ছাঁচে চেপে প্ল্যাষ্টিকের মতো নমনীয় পদার্থকে ইচ্ছানুযায়ী আকার প্রদানের কাজ সুরু হয়। তারপর ১৫০° সেন্টিগ্রেড তাপের গরম বাতাসে এগুলোকে শুকান হলে প্রায় একমাস এদের ফেলে রাখা হয়। এই সময়ের মধ্যে পদার্থগুলো ভয়ানক শক্ত হয়ে যায়।

আলু থেকেও একরকম নকল হাতীর দাঁত তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। ৪ ভাগ ফসফরিক অম্ল, ৫০ ভাগ জলের সঙ্গে মিশ্রিত করা হয়। জলের সঙ্গে এই অম্ল মিশ্রিত করার সময় ভয়ানক তাপ উৎপন্ন হবে, কাজেই শক্ত পাত্র নেওয়া দরকার। তারপর আলুর খোসা ছাড়িয়ে বেটে সেই অ্যাসিডের সঙ্গে মিশিয়ে প্রায় ৩৬ ঘণ্টা রেখে দেওয়া হয়। এরপর সেই আঁঠাল পদার্থ ব্লটিং কাগজে শুকিয়ে চাপমান যন্ত্রের সাহায্যে চাপার পর নমনীয় পাতলা পাতে পরিণত হয়। সেগুলোকে ছাঁচে ফেলে আগের মতই বিভিন্ন দ্রব্য তৈরী করা চলে।

এই কৃত্রিম হাতীর দাঁতে ভিন্ন ভিন্ন রং প্রদান করাও কষ্টসাধ্য নয়। এই কাজের জন্যে প্রথমতঃ এক বিশেষ ধরণের তাম্রনির্মিত কেটলীর প্রয়োজন। এই কেটলীর ভিতর একটা জালিদার অর্থাৎ অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত একটা পাটাতন বা শেলফ্ আছে। কেটলী জলপূর্ণ করে সেলফের ওপর হস্তীদন্ত নির্মিত জিনিষগুলো রাখা হয়। সেই কেটলীর জল গরম বাষ্পের সাহায্যে ফুটান হয়। দেড় থেকে আড়াই ঘণ্টা পর্যন্ত ফুটাবার পর শক্ত হস্তীদন্তের বহিরাবরণ নরম হয়ে যায়, ফলে এর ভিতর সহজে রং প্রবেশ করতে পারে। তারপর আর একটি গরম জলপূর্ণ পাত্রে সেই কেটলী সারারাত ডুবিয়ে রাখা হয়। রং করার জন্যে খয়ের, logwood নামক এক প্রকার রক্তবর্ণ কাঠের রং ইত্যাদি স্বভাবজ রংই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তুঁতের সাহায্যে ধূসর রং ও পাইরোগেলিক অম্লের সাহায্যে বাদামী রং করা যায়। কার্যক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রং সমবায়ে ইচ্ছামত রঙে এদের রঞ্জিত করা হয়ে থাকে। এই সব রঙে জিনিষগুলো ১৮০° সেন্টিগ্রেড তাপে ডুবিয়ে রাখা হয়। রংএর ঘনত্ব, তাদের ডুবিয়ে রাখার সময়ের উপর নির্ভর করে। সেই একই উত্তাপে পটাসিয়াম ডাইক্রোমেট (১৫—২০%) দ্রাবণে সেই রঞ্জিত দ্রব্য কিছুক্ষণ রাখার ফলে ধীরে ধীরে তাদের গায়ের রং স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তারপর সেগুলো জলে ধুয়ে অল্প উত্তাপে শুষ্ক করা হয়। আজকাল প্ল্যাষ্টিক্স্ বা কৃত্রিম রজনের তৈরী বহুবিধ দ্রব্য বাজারে বে'র হওয়ায় হস্তীদন্ত নির্মিত দ্রব্যের চাহিদা কমলেও বিলাসী ও অভিজাত মহলে এখনও এর আদর আছে। প্ল্যাষ্টিক্সের দ্রব্যাদি দাহ্য পদার্থ—কিন্তু এগুলো সেরূপ নয়।

"বিদেশী ভাষার সাহায্যে পাঠ্যবস্তুর মধ্যে প্রবেশ, অনধিকার প্রবেশ; তাহাতে প্রবেশ ঘটে কিন্তু অধিকার ঘটে না।"

পশ্চিমবাংলার বনরাজি

(২য় পর্যায়)

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র

আমাদের বনসম্পদ সম্বন্ধে বর্তমান পরিস্থিতি কিরূপ তাহার পরিচয় পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে পাওয়া যাইবে। এই সম্পদের প্রয়োজনানুরূপ বৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্বাগ্রে আমাদের লক্ষ্য স্থির করা উচিত। সরকারী বনরাজি-সংক্রান্ত কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য কি হওয়া উচিত তাহা নিম্নে দ্রষ্টব্য :—

(১) জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল গ্রামবাসীর, বিশেষতঃ কৃষকদিগের, জীবনযাত্রা প্রণালী উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে উহাদের প্রয়োজনানুরূপ জ্বালানি-কাঠ, কুটিরশিল্প ও গৃহাদির জন্য ছোটখাট কাঠ আর গৃহপালিত পশুদের জন্য খাদ্য যথাসম্ভব কম মূল্যে ও চিরস্থায়ী ভিত্তিতে ধারাবাহিক সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

(২) চিরস্থায়ী ভিত্তিতে বনরাজির নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিভিন্ন শিল্পের ও জনসাধারণের চাহিদা মিটাইবার জন্য সর্বোচ্চ পরিমাণ বড় কাঠ ও অন্যান্য বনজ সরবরাহের ব্যবস্থা করা এবং এই সম্বন্ধে দেশকে যতদূর সম্ভব স্বাবলম্বী করা।

(৩) উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

অতঃপর এই লক্ষ্যগুলিকে সফল করিবার পন্থা সম্বন্ধে কয়েকটি ইঙ্গিত দেওয়া হইতেছে।

সাধারণ মন্তব্য :—

আমাদের দেশে যত জমি ও জলভাগ আছে তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিবার জন্য একটি ব্যাপক জৈব সমাজতান্ত্রিক জরিপ অর্থাৎ ইকোলজিক্যাল সার্ভে হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই জরিপের ভার এক দল উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক এবং যে সকল সরকারী বিভাগ (যথা, কৃষি-বিভাগ, বন-বিভাগ, মৎস্যবিভাগ ইত্যাদি) এই বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহাদের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত একটি সমিতির হস্তে ন্যস্ত হইবে। ইহার উদ্দেশ্য হইবে :—

(ক) বিভিন্ন প্রকারের আবহাওয়া, মাটি, জল, কৃষিজাত উৎপন্ন, বনজাত উৎপন্ন, মৎস্য-ক্ষেত্র, শিকার-ক্ষেত্র ইত্যাদির যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় ও তাহাদের যথাযথ শ্রেণীবিভাগ করিয়া প্রত্যেকটির বিস্তার-মণ্ডলের বিভিন্ন মানচিত্র প্রস্তুত করা ;

(খ) এইরূপ মানচিত্রের ভিত্তিতে সমুদয় কর্ষিত ও অকর্ষিত ভূমির এবং জলভাগের শ্রেণীবিভাগ করা, এবং

(গ) জাতীয় স্বার্থে যে বিশেষ শ্রেণীর ভূমি বা জলভাগ যে বিশেষ কার্যের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী তৎসম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া।

এই কার্য বিশেষ জটিল। ইহা সম্পন্ন করিতে অনেক অর্থ ও সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু ইহা অত্যাবশ্যক, সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব এই জরিপের ব্যবস্থা করা উচিত। ইতিমধ্যে জমি-বন্দোবস্ত সংক্রান্ত সরকারী নথিপত্র হইতে ২নং তালিকায় যে সকল জমি অকর্ষিত বা কৃষির জন্য অব্যবহার্য বলিয়া ধরা আছে, তাহাদের যথার্থ স্বরূপ অনুসারে বিভিন্ন তালিকাভুক্ত করিতে হইবে। বনভূমি, তৃণভূমি, ঝোপঝাপ, উন্মুক্ত প্রান্তর, ফল বা সবজি-বাগান, জলাভূমি, নদীনালা, খাল, বাস্তুভিটা, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট, রেল লাইন, বালিয়াড়ি, নগ্ন পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দফায় কি কি পরিমাণ জমি আছে তাহার হিসাব নথিপত্র হইতে বাহির করিয়া ও সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া, যে যে দফা কৃষিকার্যের

জন্য অনুপযুক্ত, অন্যথা বনভূমি, অথবা পশুচারণ ভূমিরূপে ব্যবহার্য, সেইগুলিকে (দরকার হইলে খাসে পরিণত করিয়া) সরকারী বনবিভাগের হস্তে অবিলম্বে ন্যস্ত করা প্রয়োজন। একটি সাময়িক পরিকল্পনা স্থির করিয়া বিভিন্ন জেলায়, বিশেষতঃ যেখানে উপস্থিত কোনই বন নাই, জ্বালানিকাঠ ও পশুখাদ্য সরবরাহের জন্য নূতন নূতন বন প্রতিষ্ঠার আয়োজন এখনই করিতে হইবে।

জ্বালানিকাঠের বন :—

পশ্চিম বাংলার যে ১০টি জেলাতে উপস্থিত কোন সরকারী বন নাই, সেই জেলাগুলিতে মোট ২,২১৮ বর্গমাইল পরিমিত জ্বালানিকাঠের বন যত শীঘ্র সম্ভব চিরস্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। ইহা দ্বারা কৃষকদিগের তথা সমগ্র দেশের প্রভূত ও বহুমূখী কল্যাণ হইবে আশা করা যায়। এই অবশ্যকর্তব্য কার্যটির পত্তন বহুকাল আগেই হওয়া উচিত ছিল। এই বিষয়ে আমাদের এই মুহূর্তেই অবহিত হওয়া উচিত।

উপযুক্ত জমি যে যে স্থানে পাওয়া যাইবে অবশ্য সেই সেই স্থানে এইরূপ জ্বালানিকাঠের বন স্থাপন করিতে হইবে। সুতরাং ইহাদের বিস্তার, খুব সম্ভব কতকটা অসমান হইবে। কিন্তু যে বন বিশেষ হইতে যে যে গ্রামের প্রয়োজন সহজে মিটান যায়, সেই বন সেই সেই গ্রামের জন্য স্বতন্ত্রভাবে নির্দিষ্ট রাখিতে হইবে। সহরবাসীদের জন্য জ্বালানিকাঠের পরিবর্তে কয়লা গ্যাস বা বিজলির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

জ্বালানিকাঠের বন স্থাপনের জন্য কোন্ কোন্ জাতীয় বৃক্ষের বীজ বপন বা চারা রোপন করিতে হইবে, তাহা স্থানীয় জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি ও মৃত্তিকা সম্পৃক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয়ের উপর নির্ভর করে। তবে সাধারণভাবে এই কথা বলা চলে যে, পারতপক্ষে বিদেশী গাছ মনোনয়ন করা উচিত নয়। যে স্থানে নূতন বন প্রতিষ্ঠা করা হইবে, সেখানে বা তাহার আশেপাশে যে সকল বৃক্ষ স্বভাবতঃ জন্মায় তাহাদের যেগুলিতে নিম্নলিখিত গুণাবলীর সমাবেশ দেখা যায় সেইগুলি হইতে নির্বাচন করা ভাল :—

১। বৃদ্ধির হার এত বেশী যে, ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে বড় হইয়া জ্বালানিকাঠ ও সাধারণ ঘরের খুঁটি, বরগা ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত হয়।

২। পাতা পাত্‌লা বা বিরল—ইহাতে সুবিধা এই যে, এইরূপ বৃক্ষরাজির তলায় পশুখাদ্যের জন্য তৃণাদির আবাদ করা চলে।

৩। পশুর পক্ষে অপ্রিয় খাদ্য—তাহা হইলে চারা অবস্থায় পশুদিগের দ্বারা অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা কম থাকে।

সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশে বিভিন্ন পরিবেশের উপযুক্ত এমন অনেক গাছ আছে যাহা হইতে ভাল জ্বালানিকাঠও পাওয়া যায়, আবার ঘরের খুঁটি, কৃষিকার্যের যন্ত্রপাতি ও বিভিন্ন কুটিরশিল্পের উপযোগী উত্তম কাঠও পাওয়া যায়, যথা :—

পলিমাটির পাতলা আচ্ছাদনযুক্ত জমির জন্য—শিশু, সাদা শিরিষ (Albizzia procera Benth), গামারি, (Gmelina arborea Linn), বাব্‌লা (Acacia arabica Willd), খয়ের (Acacia catechu Willd) ইত্যাদি।

জলাভূমির জন্য—জারুল, পানিসাজ (Terminalia myriocarpa Heurck & Muell. Arg), কারঞ্জল (Bischofia javanica Blume) ইত্যাদি।

উঁচু ও জলনিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত ডাঙ্গা জমির জন্য—শাল, চাঁপা (Michelia champaka Linn), ঘোড়ানিম (Melia Azedarach Linn), বাঁশ ইত্যাদি।

ভিজা কর্দমাক্ত জমির জন্য—পাকাসাজ (Terminalia tomentosa Bedd.)

মাত্র একজাতীয় বৃক্ষের দ্বারা বন গঠিত হইলে, অনিষ্টকারী কীটপতঙ্গ অথবা পরগাছার আক্রমণে সমূহ ও ব্যাপক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে।

এইজন্য ২।৩ জাতীয় বৃক্ষ মিশাইয়া 'মিশ্রবন' গঠন করা শ্রেয়, তন্মধ্যে অন্ততঃ একটি এমন হওয়া চাই যাহা দ্বারা গ্রামবাসীদের ছোটখাট কাঠের প্রয়োজন মিটান যায়; অপরগুলি কেবল জ্বালানিকাঠের উপযোগী হইলে চলিবে।

বড়কাঠের বন :—

আমাদের দেশের উদ্ভিদকুল বিচিত্র। আমাদের বনরাজি বহু বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের ভাণ্ডার এবং ইহা হইতে প্রায় প্রত্যেক প্রকার শিল্পের উপযোগী কোন না কোন বিশেষ কাষ্ঠ পাওয়া যায়। কিন্তু দু'একটি ব্যতীত, সকল প্রকার কাষ্ঠই পণ্য হিসাবে দুর্লভ। অধিকাংশ জাতির প্রতিনিধিদের একসঙ্গে অনেক দেখা যায় না, এখানে সেখানে দূরে দূরে একক অবস্থায় বা এক জায়গায় ২।৪টা পাওয়া যায়। যেমন শিমুল, পিটালি (Trewia nudiflora Linn), কদম Anthocephalus cadamba Miq); এই বৃক্ষগুলির প্রত্যেকটি দেশলাই শিল্পের উপযোগী, কিন্তু ইহাদের কোনটাই চাহিদার অনুযায়ী পরিমাণে পাওয়া যায় না। আর যা-ও বা পাওয়া যায় দূরে দূরে থাকার দরুণ তাহা সংগ্রহ করিয়া বাজারে আনিতে অতিরিক্ত খরচ পড়ে। এই কারণে পশ্চিমবাংলায় যে কয়েকটি দেশলাইয়ের কারখানা আছে তাহাদের জন্য অধিকাংশ কাঠ আন্দামান, আসাম ও অন্যান্য স্থান হইতে আমদানি করিতে হয়। এইরূপ অবস্থা অন্যান্য অনেক শিল্পের ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

সুতরাং উচ্চশ্রেণীর নূতন বন অথবা বর্তমান সরকারী বনে নূতন বাগান স্থাপন করিবার সময়, যাহাতে তদ্দ্বারা বিশেষ বিশেষ শিল্পের জন্য কাষ্ঠাদির চাহিদা ধারাবাহিকরূপে মিটান যায়, সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কাগজ, দেশলাই, পাট ও কাপড় কলের কাষ্ঠঘটিত সরঞ্জাম, চা ও অন্যান্য পণ্যের জন্য প্যাকিং বাক্স ইত্যাদি সংক্রান্ত অপরিহার্য শিল্পগুলির প্রত্যেকটির জন্য কাষ্ঠ সরবরাহের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে আমাদের স্বাবলম্বী হইবার জন্য যে ৪,৭০০ বর্গমাইল অতিরিক্ত বড় কাঠের বন আবশ্যক, সম্ভব হইলে তাহার সবটা বা যতটার জন্য জমি পাওয়া যায় ততটা যত শীঘ্র সম্ভব প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

পশুচারণ বন :—

পশুচারণ সম্বন্ধে উপস্থিত পরিস্থিতি এইরূপ :—

১৯৪০ সালের গণনা অনুসারে গরুর সংখ্যা ...	৮১,৩৩,০৮৮
১৯৪০ সালের গণনা অনুসারে মহিষের সংখ্যা ...	৫,৩৯,৫৪৯
১৯৪০ সালের গণনা অনুসারে গোমহিষাদির মোট সংখ্যা	৮৬,৭২,৬৩৭
প্রয়োজনীয় পশুচারণ বনের পরিমাণ ...	২৮,৭৮৮ বর্গমাইল
চল্‌তি পতিত ব্যতীত অকর্ষিত জমির পরিমাণ ..	৪,৩৫৫ বর্গমাইল
চল্‌তি পতিত জমির পরিমাণ	৩,০২২ বর্গমাইল
কৃষির জন্য অব্যবহার্য জমির পরিমাণ ...	৪,৬৫০ বর্গমাইল
সংরক্ষিত সরকারী বনের পরিমাণ	২,৬৪৮ বর্গমাইল
অকর্ষিত জমির মোট পরিমাণ	১৪,৬৭৫ বর্গমাইল
সচরাচর কর্ষিত জমির পরিমাণ	১৩,৩৫৮ বর্গমাইল
পশ্চিমবাংলা প্রদেশের মোট আয়তন	২৮,০৩৩ বর্গমাইল

এই হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে,—

(১) পশ্চিমবাংলায় উপস্থিত যত গোমহিষাদি আছে তাদের জন্য যে পরিমাণ পশুচারণ বনের প্রয়োজন তাহা সমগ্র প্রদেশের আয়তন অপেক্ষা ৭৫৫ বর্গমাইল বেশী।

(২) সংরক্ষিত বন, সাময়িকভাবে পতিত জমি, রাস্তাঘাট, বাস্তুভিটা, ইত্যাদি লইয়া যত অকর্ষিত ভূমি আছে, যদি তৎসমুদয় পশুচারণ-কার্যে নিয়োগ করা সম্ভবও হইত, তথাপি তাহা দ্বারা আমাদের গোধনের অর্ধেকের বেশী পোষণ করা চলে না। ইহা হইতেই আমাদের দেশের গরু-মহিষের সাধারণ দুরবস্থার কারণ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

বর্তমানে অকর্ষিত ভূমির ঠিক কতটা অংশ পশুচারণ ভূমিরূপে নিত্য ব্যবহৃত হয় তাহার কোন

হিসাব জানা নাই। কিন্তু যতই হউক উহা যে প্রয়োজনের অনুপাতে অতি সামান্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কারণ সমুদয় অকর্ষিত ভূমির আয়তন মাত্র ৪,৩৫৫ বর্গমাইল।

কৃষির জন্য নির্দিষ্ট সকল জমিতে প্রতি বৎসর চাষ করা হয় না। আবার যে সকল জমিতে চাষ করা হয়, তাহার অধিকাংশ একটিমাত্র ফসলের জন্য ব্যবহৃত হয়; সুতরাং তাহা প্রতি বৎসর ৫।৬ মাস পতিত অবস্থায় থাকে। এইরূপ সাময়িকভাবে পতিত জমিতে চরিয়াই অধিকাংশ গৃহপালিত পশু কষ্টেসৃষ্টে কোনরূপে বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু ভবিষ্যতে এই সকল সাময়িক পতিত জমির আয়তন উত্তরোত্তর হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে, কারণ আমাদের খাদ্যের অনটন দূর করিবার জন্য কৃষির উপযোগী সমুদয় পতিত জমিতে চাষ করিতে হইবে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করিয়া যতদূর সম্ভব প্রত্যেক কৃষিক্ষেত্রে প্রতি বৎসর একের পরিবর্তে ২।৩টি ফসল উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বর্তমানে আমাদের যে সরকারী বনরাজি আছে তাহার ৬১'৫% অর্থাৎ বৃহত্তর অংশ হইল সুন্দরবন। সমগ্র সুন্দরবন এরূপ কর্দমাক্ত ও পশুখাদ্য বর্জিত যে তাহা গোমহিষাদি চরাইবার জন্য আদৌ উপযোগী নয়। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের বনরাজি বর্তমানে আমাদের বড় কাঠ সরবরাহের একমাত্র ক্ষেত্র; আর ভূপ্রকৃতি ও আবহাওয়া রক্ষণকারী হিসাবে ইহাদের গুরুত্ব এত বেশী যে, গৃহপালিত পশুচারণ দ্বারা উহাদের নিরাপত্তা কোনরূপে ক্ষুন্ন করা যাইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে বনকার্যে নিযুক্ত বনবাসী, কাষ্ঠ ব্যবসায়ী ও ঠিকাদারদিগের যে সকল গরু ও মহিষ উত্তরবঙ্গের সরকারী বনে বিনা মূল্যে চরিতে দেওয়া হয়, তাহাদের সংখ্যাই এত অধিক যে উহার অতিরিক্ত কোন গৃহপালিত পশু চরাইবার স্থান আদৌ নাই বলিলেই হয়। সুতরাং বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের কোনও সরকারী বন হইতে গবাদি পশুচারণ সম্বন্ধে কোন সুবিধা পাওয়ার আশা নাই।

প্রস্তাবানুযায়ী উচ্চশ্রেণীর নূতন বনরাজি যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইতেও পশুচারণ সম্বন্ধে বিশেষ কোন সুবিধা পাওয়া যাইবে না, কারণ উচ্চাঙ্গ অরণ্যের সুষ্ঠু জীবনযাত্রার পক্ষে পশুচারণ সম্পূর্ণ বিরোধী।

জ্বালানিকাঠের জন্য নিম্নশ্রেণীর যে সকল বন প্রতিষ্ঠিত হইবে, যথাযথরূপে পরিচালিত হইলে, তাহার ⅓ হইতে ½ অংশ উত্তম উত্তম পশুচারণ-বন হিসাবে নিত্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইরূপ কোন বন-বিশেষের ঠিক কতটা অংশ পশুচারণের জন্য খোলা রাখা সম্ভব হইবে, তাহা অবশ্য সেই বনের উপাদানভূত বৃক্ষের বৃদ্ধির হারের উপর নির্ভর করিবে। সে যাহা হউক, মোটের উপর ইহা ধ্রুব সত্য যে, পশ্চিমবাংলার ভূসম্পদের তুলনায় গোধন অত্যধিক এবং এই প্রদেশে বর্তমানে যত গবাদি গৃহপালিত পশু আছে তাহাদের প্রয়োজনানুরূপ জ্বালানিকাঠ-যুক্ত পশুচারণ বন অথবা স্বতন্ত্র পশুচারণ-বনের যথাযথ সংস্থান করা কোন মতেই সম্ভবপর নয়। সুতরাং পশুখাদ্য সরবরাহ সম্বন্ধে বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতির উন্নতি করিতে হইলে নিম্নলিখিত পন্থাগুলি বিবেচ্য :—

(১) অকর্মণ্য গবাদির পরিবর্তে উৎকৃষ্ট জাতের গবাদি পালন করা—এই উপায় দ্বারা অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক পশুর পেট ভরাইয়া আমাদের দুগ্ধাদির প্রয়োজন পূরণ করা যাইতে পারে।

(২) চরাইয়া খাওয়ানোর পরিবর্তে গোয়ালে রাখিয়া খাওয়ানোর প্রথা প্রবর্তন করা এবং এই উদ্দেশ্যে অরণ্য বা কৃষিক্ষেত্র হইতে সংগৃহীত কাঁচা বা শুষ্ক তৃণাদি খাদ্য ও বায়ুশূণ্য কক্ষে বা ভূগহ্বরে সঞ্চিত খাদ্য সরবরাহের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

(৩) চল্‌তি পতিত কৃষিক্ষেত্রে, জ্বালানিকাঠের বনে ও পশুচারণ-বনে পশুখাদ্যের নিয়মিত চাষের ব্যবস্থা করা এবং উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ ও

পুষ্টিকারিতা গুণ বৃদ্ধি করা। এদেশে অধিকাংশ স্থলে একই ক্ষেত্রে বৎসরের পর বৎসর একই শস্যের চাষ করা হয়, ইহাতে জমির উৎপাদন শক্তি উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে। এই কুপ্রথার পরিবর্তে প্রত্যেক ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে শস্য (অথবা তৃণ) ও মটর (লেগিউম) জাতীয় পশুখাদ্যের চাষ করিলে জমির উর্বরতা বাড়িবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণ পুষ্টিকর পশুখাদ্যও পাওয়া যাইবে।

উপসংহার :—

সর্বশেষে আমাদের মনে রাখা উচিত যে, উত্তরোত্তর প্রজাবৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশে ভূমির মাথাপিছু গড়পড়তা পরিমাণ ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে। সুতরাং যাহাতে, ভূসম্পদের কোনরূপ ক্ষতি বা অপচয় না করিয়া, আমাদের বনভূমির প্রত্যেক ছটাক হইতে অবস্থাভেদে যথাসম্ভব পরিমাণ কাঠ, জ্বালানি অথবা পশুখাদ্য ধারাবাহিকরূপে পাওয়া যায় সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। আমাদের দেশ এখন স্বাধীন হওয়াতে আশা করা যায় যে, আমাদের জাতীয় সরকার এই বিষয়ে অনতিবিলম্বে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন।

র‍্যাডার যন্ত্রের যুদ্ধোত্তর ব্যবহার

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়

এটা বিজ্ঞানের যুগ। রাষ্ট্রের মান, মর্যাদা, সমৃদ্ধি সব কিছু নির্ভর করে তার বৈজ্ঞানিক উন্নতির উপর। তাই যুদ্ধ বাঁধলে সামরিক প্রয়োজনে সুরু হয় নানা বৈজ্ঞানিক গবেষণা, আর তারই ফলস্বরূপ এক একটি যুদ্ধ শেষে দেখা যায় বিজ্ঞান কিছুটা সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছে। গত মহাযুদ্ধে গ্যাস টারবাইন, জেট চালিত বিমান, ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার পরিভ্রমণ, আণবিক শক্তির অপব্যবহার, র‍্যাডার যন্ত্রের ব্যাপক নির্মাণ ও ব্যবহার, পেনিসিলিনের আবিষ্কার ও ব্যাপক ব্যবহার বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কতকগুলি বিশিষ্ট নিদর্শন। জার্মান প্রস্তুত 'এ্যাটেব্রিনে'র নকল 'মেপাক্রিন' ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক। জাপানীরা যখন সমস্ত সিন্‌কোনা চাষের অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছিল তখন 'মেপাক্রিন' না থাকলে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের জয়লাভ সহজসাধ্য হত না। যুদ্ধের প্রয়োজনে আবিষ্কৃত বহু মারণাস্ত্র আজ কল্যাণকর্মে নিয়োগের চেষ্টা চলছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, যুদ্ধে রাসায়নিক মারণাস্ত্ররূপে পরীক্ষিত "ফসফরিক এসিড ও ফ্লুওরিণ" সংক্ষেপে "ডি, এফ, পি" আজ পাকস্থলীর পক্ষাঘাতে অব্যর্থ মহৌষধরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রথম মহাযুদ্ধের 'চার্চিল ট্যাঙ্ক'এর শান্তি-সংস্করণ আজকের দিনের 'ট্রাক্টর'। পুরাকালের তীরের আগায় তখনকার তথাকথিত অসভ্য মানুষ যে বিষ ব্যবহার করতো, একালে তাথেকে বহু মূল্যবান ঔষধপত্র প্রস্তুত হয়েছে। সেইরূপ যুদ্ধকালে আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহৃত 'র‍্যাডার যন্ত্র' আজ কি ভাবে কল্যাণকর্মে নিযুক্ত হয়েছে বা তার চেষ্টা চলছে তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

র‍্যাডার যন্ত্রের প্রাথমিক আবিষ্কার হয় ১৯৩১ সালে। বৃটিশ পোস্টঅফিস ৫ মিটার তরঙ্গ পাঠিয়ে দৃষ্টির বহির্ভূত উড়ন্ত বিমানে প্রতিফলিত সংকেত ধরতে সমর্থ হন। এর পরেই ১৯৩৬ সালে ইংলণ্ডের পূর্বউপকূল বরাবর র‍্যাডার যন্ত্র সন্নিবিষ্ট করা হয়। 'র‍্যাডার' কথাটি মার্কিণ

মস্তিষ্কপ্রসূত, এর অর্থ হল 'রেডিও ডিটেকশন এণ্ড রেন্‌জিং' বা রেডিও তরঙ্গের সাহায্যে অস্তিত্ব ও দূরত্ব নির্ণয়। এই যন্ত্রের দ্বারা বহু দূরবর্তী কোন বিমান বা জলযানের অস্তিত্ব, অবস্থান-স্থল, ও তার দূরত্ব ও গতিবেগ নিমেষে পরিমাপ করা যায়। র‍্যাডার রশ্মির গতিপথে সাধারণতঃ কোনও বাধা সৃষ্টি করা যায় না। বিমান বা জাহাজ যত দূরেই থাক তার অস্তিত্ব ও গতিবেগ সবই র‍্যাডার যন্ত্রের পর্দায় ধরা পড়বে। এই র‍্যাডার যন্ত্রের জন্যই গত মহাসমরে 'বৃটেনের যুদ্ধে' জার্মানীকে ইংরাজরা বিমানহানায় নিরুৎসাহ করে। র‍্যাডার যন্ত্রের যান্ত্রিক কৌশল জানতে হলে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞানে'র ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

যুদ্ধের পরে বিমান ভ্রমণ বিপন্মুক্ত করার জন্য র‍্যাডার যন্ত্র প্রয়োগের চেষ্টা চলছে। হিসাব করে দেখা গিয়েছে যে, গত কয়েক বৎসরে যে সব বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে,—শতকরা ৮০ ভাগ অবতরণ-কালে কুয়াসা, বৃষ্টি অথবা অত্যধিক তুষারপাতের জন্য বৈমানিকের দৃষ্টিবিভ্রমে, ১০ ভাগ উড়বার সময় যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য আর বাকী ১০ ভাগ দৃষ্টিপথের বাধার জন্য উঁচু ভূখণ্ড অথবা পর্বতগাত্রে ধাক্কা লেগে। অবতরণ দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য "টক ইউ ডাউন" নামে একপ্রকার র‍্যাডার পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। এই প্রথায় র‍্যাডার যন্ত্রের পর্দায় বিমানের অবস্থান দেখে বৈমানিককে সব কিছু বেতারে জানানো হয়। এমন কি নামবার সময় কখন বিমানের 'এঞ্জিন' বন্ধ করতে হবে তাও বলে দেওয়া হয়। অবশ্য এই ব্যবস্থায় পুরাতন বৈমানিকরা বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছেন না; কিন্তু তরুণরা এর সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহহীন। র‍্যাডার যন্ত্রের 'জী' পদ্ধতিতে 'ট্রাফিক পুলিশের' মত বিমানকে তার গতিপথ সম্বন্ধে সঠিক খবর দেওয়া হয়, যাতে দিগভ্রষ্ট হয়ে বিমানখানি পথভ্রান্ত না হয়। কোন কোনও দেশে "ষ্ট্যাণ্ডার্ড বীম এ্যাপ্রোচ" নামে এক প্রকার অভিনব পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে। এই র‍্যাডার নিয়ন্ত্রণ প্রথায় বৈমানিক অন্ধ হয়েও চক্ষুষ্মান বৈমানিকদের মত নির্বিঘ্নে অবতরণ করতে পারে।

র‍্যাডার যন্ত্রের আর একটি যুদ্ধোত্তর অদ্ভুত প্রয়োগের কথা শুনা যাচ্ছে। আফ্রিকার "ঔপনিবেশিক জরীপ সমিতি" নাকি র‍্যাডারের সাহায্যে অভাবনীয় অল্প সময়ের মধ্যে ১৫০,০০০ বর্গমাইল স্থান জরীপ করে ফেলেছেন। উড়ন্ত বিমানে এবং ভূপৃষ্ঠে র‍্যাডার সংকেত আদান প্রদান করে এবং একটী সুপরিকল্পিত চক্রাকার পথে বিমান চালনা করে ও ভূপৃষ্ঠে জরীপ বিজ্ঞানীদের নির্দেশমত আলোকচিত্র গ্রহণ করে কয়েক মাসের কাজ কয়েক মিনিটের মধ্যে সেরে ফেলা হচ্ছে। আলোকচিত্র বিমানের গতিবেগ, পরিভ্রমণ পথ, র‍্যাডার সংকেত ইত্যাদির মধ্যে একটা হিসাব নিকাশ করে পরে জরীপের মানচিত্র তৈরী করা হয়। র‍্যাডার জরীপ সম্পূর্ণ নির্ভুল না হলেও বৈজ্ঞানিকরা এর সাফল্য সম্বন্ধে খুবই আশাবাদী। তবে জরীপের আমিনদের অথবা তাদের বহুবিখ্যাত শৃঙ্খলটির নির্বাসন সম্বন্ধে আজও কোন বৈজ্ঞানিক মনঃস্থির করতে পারেন নাই।

সম্প্রতি র‍্যাডার যন্ত্রের সাহায্যে বহু দূর আকাশে উল্কাপিণ্ডের গতিবিধি সম্বন্ধে নানা তথ্য আবিষ্কার হয়েছে। যখন প্রথম বৈজ্ঞানিকরা জানতে পারলেন যে বেতার তরঙ্গ বহু উর্ধাকাশে 'আয়ন স্তরে' প্রতিফলিত হয়ে আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে তখন ঐ সম্বন্ধে নানা গবেষণা চলতে লাগলো। স্যর এডোয়ার্ড এপ্‌লটন্ মন্তব্য করলেন—"উর্ধাকাশের 'আয়নায়ন' সূর্যরশ্মির প্রভাবে সংঘটিত হয় এবং এই আয়নায়ন বহুক্ষণ পর্যন্ত কার্যকরী থাকে বলেই আমরা সূর্যাস্তের পরও বেতার অনুষ্ঠান শুনতে পাই। এ ছাড়া দিবারাত্র অসংখ্য উল্কাপিণ্ড আয়নস্তরে আঘাত

হানে বলেও আমরা সূর্যাস্তের পর বেতার অনুষ্ঠান শুনতে পাই।" সুরু হল নানা গবেষণা। গবেষণারত বৈজ্ঞানিকরা লক্ষ্য করলেন যে, মাঝে মাঝে খুব ক্ষীণ অল্পস্থায়ী অসাধারণ কতকগুলি সংকেত ধরা পড়ছে। তা' ছাড়া ১৯৩১ সালের উল্কাবৃষ্টির সময় ঐরূপ ক্ষীণ সংকেতের সংখ্যা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পায়। স্যর এপ্‌লটন্‌ ঐ সংকেতগুলি উল্কাপিণ্ডের জন্য বলে মন্তব্য করেন। সাধারণতঃ উল্কাপতনের সময় ভূপৃষ্ঠ থেকে উল্কাপিণ্ডগুলি ১০০ কিলোমিটার দূরে এলে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরে থাকতেই ভস্মীভূত হয়ে মিলিয়ে যায়। ১৯৩৩ সালে আমাদের পৃথিবী, ৫৬০,০০০ মাইল দূরে "গায়াকোবিনিজিনার" নামক ধূমকেতুর ভ্রমণপথ অতিক্রম করে এবং ঐ সময়ে ৫½ ঘণ্টা ধরে মিনিটে প্রায় ৪০০ উল্কাপতনের হিসাব পাওয়া যায়। ১৯৪৬ সালে ঐ ধূমকেতুটিকে পর্যবেক্ষণ করার আরও অনেক সুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। ঐ ধূমকেতুটি পৃথিবীর ভ্রমণপথ অতিক্রম করার ১৫ দিনের মধ্যে পৃথিবী ঐখানে এসে পৌঁছায়—তখন ধূমকেতুটি মাত্র ১৩২,০০০ মাইল দূরে সরে গেছে। এই অভাবনীয় সুযোগ গ্রহণের জন্য বৈজ্ঞানিক এবং জ্যোতির্বিদরা তাঁদের যন্ত্রপাতি নিয়ে প্রস্তুত হলেন—আর প্রস্তুত হলেন র‍্যাডার বিজ্ঞানীরা। মিঃ জে, এস্‌ হে র‍্যাডার যন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চেয়ে সোজা এবং সঠিকভাবে উল্কার গতিবেগ পরিমাপ করলেন ২২'৯ কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে। র‍্যাডার যন্ত্রের এই সাফল্যে জ্যোতিবিজ্ঞানীদের একটি মস্তবড় অসুবিধা দূর হল। আলো, বর্ষা, কুয়াসা, তুষারপাত প্রভৃতির জন্য দূরবীণ অনেক সময় কাজে লাগতো না, কিন্তু র‍্যাডার সংকেতকে বাধা দেওয়া যায় না। র‍্যাডারের এই সাফল্যে জ্যোতি-বিজ্ঞানী মিঃ প্রেন্টিস্‌ উৎফুল্ল হয়ে বলেছিলেন—"প্রথম টেলিস্কোপের মালিকের মত আমরা অদ্ভুত দৃষ্টিশক্তি পেয়েছি।"

সৌরজগতে পৃথিবীর কক্ষপথ প্রায় গোলাকৃতি। ধূমকেতু বাহির-বিশ্ব থেকে গ্রহগুলির ভ্রমণ-পথ একটির পর একটি অতিক্রম করে সূর্যের খুব কাছ ঘেঁসে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে ক্রমবিস্ফারিত পথে, আবার বাহির-বিশ্বে ছুটে বেরিয়ে যায়—হয়ত কোন কোনও ক্ষেত্রে চিরকালের মত। উল্কাঝাঁক ধূমকেতুর সহযাত্রী, তাই ধূমকেতুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর আকাশে উল্কাপিণ্ডের ঝাঁক দেখা যায়। তারা একবার পৃথিবীর অন্ধকার পিঠের দিক থেকে আর একবার পৃথিবীর সূর্যালোকিত আকাশ দিয়ে, এই দুবার পৃথিবীকে অতিক্রম করে। দিনের বেলা উল্কা সম্বন্ধে কোনও গবেষণা চালানো এ পর্যন্ত হয়নি। সম্প্রতি মাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জর্ডেল ব্যাঙ্ক পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র' থেকে মিঃ এ, সি, বি, লভেল দিনের বেলা এমনি একটি উল্কাঝাঁকের সন্ধান পেয়েছেন র‍্যাডার সংকেত পাঠিয়ে। ঐ উল্কাঝাঁকটি নাকি প্রায় দশকোটি মাইল চওড়া জায়গা জুড়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। দিনের বেলা উল্কার অস্তিত্ব নিরূপণ ও প্রমাণ জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই প্রথম। কেহ কেহ মনে করেন এই বিরাট উল্কার দলটি হেলীর ধূমকেতুর সহযাত্রী।

আধুনিক র‍্যাডার এত শক্তিশালী যে, এতে উড়ন্ত পাখীও ধরা পড়ে। মুষলধারে বৃষ্টিও র‍্যাডার সংকেত প্রতিফলিত করে। সম্প্রতি বিশেষভাবে নির্মিত র‍্যাডার নিক্ষিপ্ত তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ দ্বারা ভাসমান মেঘপুঞ্জের দূরত্বও পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে।

মার্কিণ বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি চাঁদ থেকে প্রতি-ফলিত সংকেত ধরতে পেরেছেন শুনে মার্কিণ কোটীপতিরা চাঁদে জায়গা কেনবার জন্য রীতিমত দরখাস্ত পেশ করেছেন বলে শুনা যাচ্ছে। 'আমেরিকার সিগন্যাল কোর' সামরিক ব্যবহার

উপযোগী একটী সাধারণ র‍্যাডার যন্ত্রের সাহায্যে চাঁদের প্রতিফলিত সংকেত ধরেছেন—১০ই জানুয়ারী ১৯৪৬ সাল। সংকেত যে চাঁদ থেকে এসেছে তার প্রমাণও তাঁরা দিয়েছেন। চাঁদ থেকে প্রতিফলিত সংকেতের হিসাব করতে গিয়ে তাঁরা দেখেছেন, যে প্রেরিত সংকেতের চেয়ে প্রতিফলিত সংকেত সেকেণ্ডে ২২৭টি বেশী। এর কারণ হল সংকেত প্রেরক যদি এমন কোনও বস্তুর দিকে সংকেত প্রেরণ করেন যেটি তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে তাহলে প্রেরিত সংকেতের চেয়ে সেকেণ্ড পিছু প্রতিফলিত সংকেত সংখ্যা বেশী হয়। একটি রেলওয়ে এঞ্জিন যদি একজায়গায় দাঁড়িয়ে সমান তালে ভক্ ভক্ ধোঁয়া ছাড়ার আওয়াজ করে তবে সেকেণ্ডে আপনি যতগুলি আওয়াজ শুনবেন, এখন যদি এঞ্জিনটি আপনার দিকে এগিয়ে আসতে থাকে তবে সেকেণ্ডে আপনি আওয়াজ সংখ্যা তার চেয়ে বেশী শুনতে পাবেন। চাঁদের বেলাও তাই—চাঁদ পৃথিবীর দিকে ঘণ্টায় ৬৮২ মাইল বেগে এগিয়ে আসছে তাই প্রেরিত এবং প্রত্যাবর্তিত সংকেতের সংখ্যার তারতম্য ঘটছে। একে বলা হয় 'ডপ্‌লার এফেক্ট'। র‍্যাডার বিজ্ঞানীরা এ সব হিসাব নিকাশ পূর্বাহ্নেই সেরে রেখেছিলেন এবং সেইভাবে তাঁদের যন্ত্রটিও উপযোগী করে নিয়েছিলেন। এ ছাড়া চাঁদের দিকে সংকেত প্রেরণ ও প্রত্যাবর্তনের সময় ২'৪ সেকেণ্ড—এও সঠিক মিলে গিয়েছিল।

র‍্যাডার যন্ত্রের সাহায্যে 'মেরুজ্যোতি' বা বোরিয়ালিস্ সম্বন্ধে নানা গবেষণা চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি লভেল সাহেব একটী জ্যোতির্ময় মেঘপুঞ্জে র‍্যাডার সংকেত প্রতিফলিত করে তার বৈদ্যুতিক গুণাবলী নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি দেখেছেন একই সময়ে এবং উচ্চতায় অবস্থিত সাধারণ বাতাসের চেয়ে মেঘপুঞ্জটিতে মুক্ত ইলেকট্রন সংখ্যা ১০০ গুণ বেশী। মেরুজ্যোতির এই গবেষণার সাফল্যে বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যে র‍্যাডার বহু ঊর্ধ্বাকাশের নানা তথ্য জানিয়ে বিজ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধশালী করবে।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে 'আবহাওয়া বিজ্ঞানবিশারদ'রাই সকলের কাছে 'বাহবা' পাওয়ার চেয়ে ধিকৃত হয়েছেন বেশী। হয়ত আরও বহুকাল তাঁদের প্রকৃতির কাছে হার স্বীকার করতে হবে। কারণ তাঁরা আবহাওয়া সম্বন্ধে যা পূর্বাভাষ দিলেন তা হয়তো ফললো না; তখন সাধারণ মানুষ, যাঁরা আবহাওয়া তত্ত্বের জটিলতার খবর রাখেন না তাঁরা আবহাওয়া বৈজ্ঞানিকদের ফুৎকারে উড়িয়ে দেবেন—এতে আর বিস্মিত হবার কি আছে? তবে র‍্যাডার যন্ত্রের সাহায্যে আবহাওয়ার নানা তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। যে বেলুন ছেড়ে, আবহাওয়ার সংবাদ বহু ঊর্ধ্বাকাশে সংগ্রহ করা হয়—র‍্যাডার যন্ত্রের সাহায্যে সেই বেলুনটিকে বরাবর অনুসরণ করে তার দূরত্ব পরিমাপ করে আবহাওয়া তত্ত্বের জটিলতার ভ্রমপ্রমাদ নির্ভুল করার চেষ্টা চলছে। সাফল্যও খানিকটা লাভ হয়েছে।

যুদ্ধোত্তর যুগে যদি যুদ্ধকালীন মারণাস্ত্রকে এইভাবে 'কল্যাণকর্মে' নিযুক্ত করা হয় তবে হয়ত ভবিষ্যতে শান্ত, সুখী পৃথিবী কল্পনা করা বাতুলতা হবে না।

আলোকচিত্রের জন্মকথা

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাসগুপ্ত

সূর্যরশ্মির সহায়তায় কোন বস্তুর যে নিখুঁত চিত্র তুলিয়া লওয়া সম্ভব-এ ধারণা আদিমযুগে কাহারও মনে কখনও উঠিয়াছিল কিনা সন্দেহ। সে যুগের লোক কাঠ, পাথর বা হাড় প্রভৃতির উপর ছবি আঁকিত। পরবর্তী যুগের ইতিহাসে কাগজ ও কাপড় প্রভৃতির উপর মানুষের হাতে আঁকা বহু চিত্রের নিদর্শন মেলে। বলা বাহুল্য ছবির বিষয়বস্তুগুলির সহিত সেই সব ছবির স্বভাবতঃই পার্থক্য থাকিয়া যাইত। তথাপি কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও লোকের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় নাই যে, কোন কিছুর হুবহু প্রতিচ্ছায়া ছবিতে ফুটাইতে হইলে একমাত্র আলোকরশ্মির সাহায্যেই তাহা অতি সহজে সম্ভব হইতে পারে, অথচ বহু পূর্ব হইতে এ বিষয়ে গবেষণা চলিতেছিল।

একটী বন্ধ ঘরের মধ্যে থাকিয়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে উহার কপাটের গায়ে যে সকল ছিদ্র বা ফাঁক আছে তাহার ভিতর দিয়া সূর্যকিরণ কপাটের বিপরীত দিকের দেয়ালে গিয়া পড়িয়াছে; এবং ঐ সকল আলোকিত স্থানে বাহিরের পদার্থের অনুরূপ অস্পষ্ট প্রতিকৃতি দেখা যাইতেছে। ১৫শ শতাব্দীতে ইটালীয় বৈজ্ঞানিক মিঃ পোর্টা এই ব্যাপারটি প্রথম লক্ষ্য করেন। তাহার পর তিনি ছিদ্রযুক্ত একটি ক্যামেরা অব্‌স্কিউরা বা অন্ধকার ক্যামেরা তৈয়ারী করিয়া সেই ছিদ্রে একটি কন্‌ভেক্স কাঁচ বসাইয়া লইলেন এবং সেই কাঁচের ভিতর দিয়া পতিত বাহিরের পদার্থের এই সব প্রতিচ্ছবিকে সুস্পষ্ট করিতে সমর্থ হইলেন। চিত্রশিল্পীগণও সঙ্গে সঙ্গে এই সকল ছায়াচিত্রকে তাহাদের কাজে লাগাইতে সুরু করিয়া দিলেন, অর্থাৎ কনভেক্স কাঁচ প্রসূত সুস্পষ্ট প্রতিকৃতিগুলিকে মূল রূপে গ্রহণ করিয়া তাহারা ছবি আঁকিতে লাগিয়া গেলেন। ইহাকেই আলোকচিত্রের সূচনা বলা যাইতে পারে।

১৫১৯ খৃষ্টাব্দে লিওনার্ডো ডা ভিন্সি প্রথম সূচ্যগ্রছিদ্র বা পিনহোল ক্যামেরা প্রস্তুত করেন। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে ডেনিয়ালো বারবারো পিনহোলের পরিবর্তে লেন্স ও ডায়াফ্রাম সংযোগ করিয়া উহার উন্নতি সাধন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই উভয় প্রকার ক্যামেরাতেই যে প্রতিচ্ছবি দেখা যাইত তাহাকে স্থায়ীরূপে ধরিয়া রাখিবার কোন পন্থাই তখনও কেহ উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হন নাই। যোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই উপায় উদ্ভাবনের জন্য পৃথিবীর নানা স্থানে নানা প্রকার গবেষণা চলিয়াছিল। সর্বপ্রথম যাঁহারা এই গবেষণায় লিপ্ত ছিলেন তাঁহারা সকলেই কিন্তু একটা ভুল সূত্র ধরিয়া বৃথা পরিশ্রম করিতেছিলেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে একমাত্র উত্তাপের ক্রিয়া দ্বারাই উক্ত প্রতিচ্ছবি ধরিয়া রাখা সম্ভব। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে কিন্তু জার্মান রাসায়নিক জন হেনরিচ সুলজ্ 'সিলভার নাইট্রেট ও চক' এর অ্যাসিড মিকশ্চার কোন জিনিষের উপর মাখাইয়া, তাহার কিয়দংশ আচ্ছাদিত অবস্থায় আলোকে ধরিয়া প্রমাণ করিলেন যে, আলোকের সংস্পর্শে যে ভাগ অবস্থিত উহা আলোকের ক্রিয়ায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। তিনি তখন প্রচার করিলেন যে ক্যামেরার এই প্রতিচ্ছবিকে স্থায়ীভাবে ধরিয়া রাখিতে হইলে আলোককে মূল সূত্র ধরিয়া গবেষণা করিতে হইবে; উত্তাপের দ্বারা উহা সম্ভবপর হইবে না।

১৭১৭ খৃষ্টাব্দে সুইডেনের এক প্রসিদ্ধ রসায়নজ্ঞ

প্রমাণ করিলেন যে ক্লোরাইড অফ্ সিলভার আলোকের সংস্পর্শে কালো হইয়া যায়। এই সময় হইতে "উত্তাপ" এর পথ পরিত্যাগ করিয়া আলোককে মূল সূত্র ধরিয়া গবেষণা চলিতে লাগিল। কিন্তু কি উপায়ে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আলোকের সাহায্যে স্থায়ীচিত্র প্রস্তুত হইতে পারে, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সে সম্বন্ধে কেহই কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারিলেন না।

টম ওয়েজউড একখানা কাঁচের উপর কোন জিনিষের ছবি আঁকিয়া নেগেটিভ প্রস্তুত করিতেন তাহার পর সিলভার নাইট্রেট মাখানো কোন সাদা কাগজ বা চামড়ার উপরে ঐ নেগেটিভখানা রাখিয়া আলোকের সংস্পর্শে চিত্র গ্রহণ করিতেন। কীট-পতঙ্গের ডানার ছবিও তিনি ঐ ভাবে প্রস্তুত করিতেন। ক্যামেরার মধ্যের ছায়াকে স্থায়ীরূপে ধরিয়া নেগেটিভ প্রস্তুতের চেষ্টা অনেকেই করিতে লাগিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নিস্‌ফোর নিপসি নামক জনৈক ফরাসী সর্বপ্রথম ক্যামেরায় প্রতিবিম্বিত ছবি স্থায়ী করিয়া নেগেটিভ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইলেন। প্রথমতঃ কোন জিনিষের উপর সিলভার ক্লোরাইড মাখাইয়া তিনি উহা করিতে সক্ষম হন। তাহার পর ১৮২২ খৃষ্টাব্দে কাঁচের উপর বিটুমেন মাখাইয়া তিনি স্থায়ী ছায়াচিত্র গ্রহণের কাজ চালাইতে লাগিলেন। অনেকে ইহাকেই আলোক-চিত্রের প্রথম আবিষ্কার বলেন। এই আবিষ্কার সম্পূর্ণ না হইলেও মিঃ ওয়েজউড যে বীজ বপন করিয়াছিলেন সে বীজ ইহা দ্বারাই অঙ্কুরিত হইয়াছিল এবং পরবর্তীকালে সেই অঙ্কুরই মিঃ ডাগরির চেষ্টায় বৃক্ষে পরিণতি লাভ করিয়াছিল।

প্যারিসের প্রসিদ্ধ সিন্-পেইন্টার মিঃ ডাগরি সিন্‌পেইন্টিং-এর সঙ্গে সঙ্গে আলোকচিত্র সম্বন্ধেও নানাপ্রকার গবেষণা করিতেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মিঃ নিপসির নিকট পত্রযোগে আলোকচিত্র সম্বন্ধে কিছু উপদেশ চাহিয়া পাঠান। মিঃ নিপসি কিন্তু এক অজানা অচেনা লোকের নিকট কোন কথা প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই। অবশেষে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে মিঃ নিপসির সহিত মিঃ ডাগরির একবার সাক্ষাৎ ঘটে। মিঃ নিপসির বয়স তখন প্রায় ৬৪ বৎসর। সুদীর্ঘ-কাল এই আলোকচিত্রের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি একপ্রকার সর্বস্বান্ত হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মিঃ ডাগরিকে তাঁহার সঙ্গে একযোগে কাজ করিতে আহ্বান করিলেন। মিঃ ডাগরিও সে আহ্বানে সাড়া দিতে কালবিলম্ব করিলেন না। ফলে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে এক চুক্তিনামা লেখা হইল। এই চুক্তি অনুযায়ী মিঃ নিপসি তাঁহার সারাজীবনের অভিজ্ঞতার ফল মিঃ ডাগরিকে লিপিবদ্ধ করিয়া দিলেন। মিঃ ডাগরি কিন্তু কয়েকটি মূল্যহীন তুচ্ছ বিষয় ছাড়া কিছুই ব্যক্ত করিলেন না; অবশ্য একথাও সত্য যে তিনি বিশেষ কিছু জানিতেনও না। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে মিঃ ডাগরির নির্দেশানুযায়ী রূপার পাতে আয়ডিন মাখাইয়া পরে সেই পাতখানা ক্যামেরার মধ্যে বহুক্ষণ আলোকে অনাবৃত রাখিয়া প্রথমে নেগেটিভ ও পরে পজেটিভ অর্থাৎ আসল চিত্র প্রস্তুত হইত। কিন্তু এই সকল চিত্র কোন কাজের হইল না। ইহার কিছুদিন পরে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ নিপসির মৃত্যু হইল। মিঃ ডাগরি তখন একাই এই গবেষণায় লাগিয়া রহিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ ডাগরি সর্বপ্রথম একখানা প্লেটের উপরে ক্যামেরার সাহায্যে চিত্র প্রস্তুত করেন। কিন্তু এই সকল চিত্র আলোকের সংস্পর্শে আসিলেই নষ্ট হইয়া যাইত। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে লবণ জল ব্যবহারে তিনি একখানি স্থায়ী চিত্র প্রস্তুত করিতে সফলকাম হন। এই সময় তিনি মৃত নিপসির পুত্র মিঃ ইসিডোরের সহিত বন্দোবস্ত করিলেন যে এই আবিষ্কার মিঃ ডাগরির নামেই চলিবে; কিন্তু মূলধনের চুক্তি পূর্বের ন্যায়ই থাকিবে। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ ডাগরি তাঁহাদের আবিষ্কার জনসাধারণের নিকট বিক্রয় করিতে সংকল্প করিলেন।

এই ক্যামেরা যন্ত্রের আকার ও আয়তন অতিশয় বৃহৎ ছিল এবং সেই অনুপাতে উহার ওজনও ছিল গুরু। উহা দ্বারা ছবি তুলিতে এক ঘণ্টারও অধিক সময়ের প্রয়োজন হইত। রাস্তায় ম্যাজিক দেখাইবার সময় কৌতূহলী দর্শকের যেমন ভীড় হয়, এই ক্যামেরায় চিত্র তুলিবার সময়ও উৎসুক দর্শকবৃন্দের তেমনই ভীড় হইত। ইহা ছাড়া আরও নানা প্রকারের অসুবিধাও ছিল। এই সকল কারণে জনসাধারণের নিকট ইহার সমাদর না হওয়ায়, মিঃ ডাগরি ইহাতে আশানুরূপ উৎসাহ পাইলেন না; কিন্তু দমিয়া না গিয়া তিনি পূর্ণোদ্যমে ইহার উন্নতি বিধানে লাগিয়া গেলেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ ডাগরি প্যারিসে সায়েন্স একাডেমির কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রাদি লইয়া উপস্থিত হইলেন। পরীক্ষান্তে উক্ত একাডেমির কর্তৃপক্ষ রায় দিলেন যে সত্য সত্যই মিঃ ডাগরি ক্যামেরা দ্বারা আলোকচিত্র গ্রহণ করিতে কৃতকার্য হইয়াছেন। ফলে জনসাধারণের মনে তখন এ বিষয়ে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। তখন তাঁহারা ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে ইহা ক্রয় করিয়া পৃথিবীময় প্রচার করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মিঃ ডাগরি ও মিঃ ইসিডোর (নিপসির পুত্র) প্রত্যেকে গভর্ণমেণ্টের নিকট ইহার জন্য ২০০,০০০ ফ্রাঙ্ক (৫৫০০০৲ টাকা) দাবী করিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এককালীন সমগ্র দাবী না মিটাইয়া মিঃ ডাগরিকে ৬০০০ ফ্রাঙ্ক এবং মিঃ ইসিডোরকে ৪০০০ ফ্রাঙ্ক পেন্সনের বন্দোবস্তে এই আবিষ্কার ক্রয় করিলেন। এই আবিষ্কারের গবেষণায় মিঃ ডাগরি কপর্দক শূন্য হইয়াছিলেন, সেই জন্য কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া তিনি অগত্যা গভর্ণমেণ্টের চুক্তিতেই সম্মত হন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে সায়েন্স একাডেমি এই আবিষ্কারকে ডাগরিটাইপ আখ্যা দিয়া সাধারণের নিকট প্রচার করিলেন। মিঃ ডাগরির গবেষণার ইতিহাস পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু উহার প্রচারের সময় তিনি ফিক্সিং এর কার্যে লবণের পরিবর্তে হাইপো সালফাইটের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেন। হাইপোসালফাইট ব্যবহারের প্রথাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ গৌরব ও বিশেষত্ব। বর্তমানে তাঁহার আবিষ্কার পদ্ধতির প্রায় সমস্তই পরিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু এখনও হাইপোসালফাইটের ব্যবহার প্রচলিত। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে, মিঃ ডাগরির আবিষ্কারের প্রায় ২০ বৎসর পূর্বে, সার জন হারসেল প্রমাণ করিয়া দেখান যে হাইপোসালফাইট, সিলভার-ক্লোরাইডকে ক্ষয় করে। এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই মিঃ ডাগরি হাইপোসালফাইট প্রয়োগে ফিক্সিং করিতে কৃতকার্য হন এবং লোক-সমাজে উহা প্রচার করেন।

মিঃ ডাগরির এই আশ্চর্য কৃতিত্বের কথা চতুর্দিকে রাষ্ট্র হইবার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক ব্যক্তি দাবী করিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা প্রত্যেকেই উহার প্রথম আবিষ্কারক। তাঁহাদের গবেষণার বিষয় পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যে সত্যের সন্ধান না পাইয়াছিলেন তাহা নয়। কিন্তু তাঁহারা নিজ নিজ গবেষণার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই এবং লোকসমাজে উহা প্রচার করিতে সাহসী হন নাই।

ইহাদের মধ্যে ইংলণ্ডের ফক্স ট্যালবটের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বহুদিন পর্যন্ত ক্যামেরার গৃহীত চিত্রকে স্থায়ীভাবে পাইবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। একখানা কাগজকে তিনি প্রথমতঃ লবণ জলে ও পরে সিলভার নাইট্রেটে ভিজাইয়া লইয়া ক্যামেরায় ছয় হইতে সাত মিনিট পর্যন্ত সেই কাগজ এক্সপোজ করিয়া ছবি তুলিতেন ও সর্বশেষে ক্লোরাইড্ অথবা আয়ডাইড্ সলিউসনে সেই ছবি স্থায়ী করিতেন। তাহার পর সার জন হারসেলের উপদেশানুসারে এই ফিক্সিং বা স্থায়ীকরণ ব্যাপারে তিনি হাইপোর ব্যবহার সুরু করেন। যদিও মিঃ ট্যালবট ও মিঃ ডাগরি উভয়েই সমসাময়িক তথাপি মিঃ ট্যালবটকে এই ব্যাপারে

আবিষ্কারক বলিয়া স্বীকার করা চলে না, কারণ মিঃ ডাগরিই সর্বপ্রথম সাহসী ও উদ্যোগী হইয়া সর্বসাধারণের সমক্ষে ইহা প্রচার করেন। কিন্তু এ বিষয়ে মিঃ ট্যালবটের যে একেবারে কোনই সম্মান প্রাপ্য নাই একথাও বলা চলে না, কারণ তিনিই সর্বপ্রথম নেগেটিভ হইতে পজেটিভ প্রিণ্টের উপায় উদ্ভাবন করেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি কাগজের উপর সিলভার নাইট্রেট ও গ্যালিক এসিডের প্রলেপ দিয়া ঐ কাগজে নেগেটিভ প্রস্তুত করিতেন। তাহার পর আর একখানা ঐ রূপ কাগজ ঐ নেগেটিভের উপর রাখিয়া পজেটিভ ছাপিয়া লইতেন। এই প্রক্রিয়ায় তোলা প্রিণ্ট বা ছাপ মসৃণ হইত না বলিয়া উহা চলে নাই। ইহাকে ক্যালোটাইপ বলা হইত। আজকাল বাজারে একপ্রকার কাগজের নেগেটিভ পাওয়া যায়, উহা মিঃ ট্যালবটের পদ্ধতির অনুরূপ পদ্ধতিতেই প্রস্তুত, কিন্তু ছাপিবার নিয়ম-বিশেষের ফলে এই নেগেটিভ হইতে যে প্রিণ্ট প্রস্তুত হয় তাহা মসৃণ ও স্বাভাবিকই হয়। মিঃ টালবট যদি প্রিণ্ট তুলিবার এই প্রকারের বিশেষ কোন নিয়ম বাহির করিতে পারিতেন তবে হয়ত আলোকচিত্র তুলিবার প্রণালীও অন্যরূপ হইত এবং তিনিও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন। রেভারেণ্ড জে, বি, রিড গ্যালিক এসিড ব্যবহার করিয়া মিঃ ট্যালবটের নিয়মের কিছু উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে দেখা যায় যে তিনিই সর্বপ্রথম হাইপোসালফাইটের ব্যবহারবিধি প্রয়োগ করেন।

লণ্ডন হইতে মিঃ ফ্রান্সিস ফরাসী গভর্ণমেণ্টকে জানান যে এই আবিষ্কারের প্রকৃত সম্মান মিঃ নিপ্‌সির প্রাপ্য; কারণ নিপসির নির্দিষ্ট পদ্ধতির পথে চলিয়াই মিঃ ডাগরি সফলকাম হইয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণ মিঃ ডাগরিকে তাঁহার যোগ্য সম্মান হইতে বিচ্যুত করিল না। মিঃ নিপসি বাঁচিয়া থাকিলে হয়ত এ সম্মানের খানিকটা তাহার ভাগ্যেও জুটিত। মিঃ হিপোলাইট বেয়ারড এই সময়ে ফ্রান্সে কাগজে সিলভারসল্ট যোগে পজেটিভ চিত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। তাঁহার প্রস্তুত কয়েকখানা চিত্র বর্তমানে ফ্রেঞ্চ ফোটোগ্রাফিক সোসাইটিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ৬০০ ফ্রাঙ্ক পুরস্কার দিয়া মিঃ ডাগরির প্রচার বলবৎ রাখিয়া দিলেন।

মিঃ ডাগরির এই আবিষ্কার যে সম্পূর্ণ নিখুঁত হইয়াছিল এরূপ বলা চলে না। কারণ এই সকল চিত্র স্পর্শ মাত্রেই নষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু তিনিই যে এই ব্যাপারের ভিত্তি স্থাপনকারী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পরবর্তী বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টায় ইহার ক্রমোন্নতি হইয়াছে সে কথাও সত্য। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মিঃ ফিজেন গোল্ড-ক্লোরাইড ও হাইপোসালফাইটের ব্যবহারে ঐ স্পর্শজনিত ত্রুটি দূর করিতে সমর্থ হন। ডাগরিটাইপ প্রণালীতে যাহার আলেকেচিত্র গ্রহণ করা হইত তাঁহাকে প্রায় আধঘণ্টা পর্যন্ত প্রখর রৌদ্রে বসাইয়া রাখা হইত। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে জন ফ্রেড্রিক গডার্ড ব্রোমিন ও আয়ডিন ব্যবস্থা দ্বারা এই এক্সপোজারের সময় এত সংক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন যে ইহা মিনিট হইতে সেকেণ্ডে রূপান্তরিত হইল। এই সময়ে ভয়েগল্যাণ্ডার পেলজ্‌ভাল পোর-ট্রেইট লেন্স প্রস্তুত করিয়া এক্সপোজারের জন্য আরও কম সময়ের ব্যবস্থা করেন। এই প্রকার উন্নতি সত্ত্বেও এগার বৎসরের অধিককাল ডাগরিটাইপ পদ্ধতি চালু থাকিতে পারে নাই।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ফ্রেড্রিক স্কট আরচার ওয়েট কলোডিয়ন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। চিত্র তুলিবার ঠিক পূর্বক্ষণে পাইরোক্সাইলন য়্যালকোহল, ইথার ও আয়ডাইড সংমিশ্রিত করিয়া একখানা কাঁচের উপর লেপন করা হইত এবং ভিজা থাকিতে থাকিতে ঐ কাঁচে এক্সপোজ দিতে হইত। পরে অ্যাসেটিক অ্যাসিডের সহিত পাইরোগ্যালিক অথবা সালফেট অফ আয়রন মিশাইয়া ঐ প্লেট

ডেভেলপ্ করিলে নেগেটিভ প্রস্তুত হইত। পরে একপ্রকার কালো ভার্ণিশ লাগাইয়া ঐ নেগেটিভকে পজেটিভ চিত্রে রূপান্তরিত করা হইত। বিশ বৎসর পর্যন্ত এই পদ্ধতিতেই আলোকচিত্র গ্রহণের কার্য চলিয়াছিল।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ডাঃ হিল নোরিস কলোডিয়ন ড্রাই প্লেট বা শুষ্ক ফলক প্রস্তুত করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জে, বি, সায়েস ও ডব্লিউ, বি, বোল্টন সিলভারবাথ ব্যবহার না করিয়া সিলভার ব্রোমাইড কলোডিয়ন সংযোগে ড্রাই প্লেট প্রস্তুত করেন। যদিও ইহাকে ড্রাই প্লেট আখ্যা দেওয়া হইত, কিন্তু চিত্র তুলিবার পূর্বে এই সকল প্লেট জলে ভিজাইয়া লইতে হইত।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে ট্যালবটের ক্যালোটাইপ প্রণালীতে প্রস্তুত চিত্র মসৃণ না হওয়াতে ইহার বহুল প্রচলন হয় নাই। কিন্তু ব্লাঙ্কোয়ার্ড এভার্ড নামক একজন ফরাসী অ্যালবুমেন সংযোগে ট্যালবটের প্রণালীতে এক মিশ্রণ প্রস্তুত করিয়া সুন্দর মসৃণ পজিটিভ চিত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। এই আবিষ্কারের পর হইতে এই সংশোধিত ক্যালোটাইপের নিমিত্ত কাগজ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। প্রধানতঃ জার্মানী হইতে এই প্রকার কাগজ সরবরাহ হইত। সিলভার নাইট্রেট মাখাইয়া শুকাইয়া লইয়া দুইদিনের মধ্যে এই সকল কাগজ ব্যবহার করিতে হইত। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে এডলফ্ ওষ্ট নামক একজন অষ্ট্রিয়ান উপরোক্ত মিশ্রণের সহিত সাইট্রেট যোগ করিয়া আর এক প্রকারের কাগজ প্রস্তুত করিলেন। এই কাগজ বহুদিন পর্যন্ত অবিকৃত থাকিত। এই সকল কাগজকে অ্যালবুমেনাইজ্‌ড্ কাগজ বলা হইত। কিছুকাল এই নিয়মেই চিত্র প্রস্তুত হইতে থাকে। কিন্তু ড্রাইপ্লেটের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে ইলফোর্ড কোম্পানী জিলাটিন যোগে প্রিণ্টিং আউট পেপার (পি, ও, পি) প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করায় ঐ অ্যালবুমেনাইজ্‌ড্ কাগজের ব্যবহার লোপ পায়।

এই সময়ে অনেকেই কলোডিয়নের সাহায্যে উন্নত ড্রাইপ্লেট প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ডব্লিউ, এইচ, হ্যারিসন কলোডিয়নের পরিবর্তে জিলাটিন দ্বারা ড্রাইপ্লেট প্রস্তুত করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জে, বার্জেস ড্রাইপ্লেট প্রস্তুত করিবার এক প্রকার নূতন মিশ্রণ প্রস্তুত করেন। এইভাবে ইউরোপের চারিদিকে ড্রাইপ্লেট প্রস্তুত করিবার গবেষণা চলিতে থাকে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে সার যোসেফ সোয়ান কাজ চালাইবার মত ড্রাইপ্লেট প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে চার্লস বেনেট ড্রাইপ্লেট প্রস্তুত করিবার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। অন্যান্য ড্রাইপ্লেট অপেক্ষা ইহা অধিক কার্যোপযোগী হইল। এই সকল নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া বহু বৈজ্ঞানিক ও রসায়নবিদ ইহার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অধুনা জগদ্বিখ্যাত কোডাক কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ জর্জ ইষ্টম্যান আলোকচিত্র জগতে পরিবর্তন আনিয়া দেন। ইনি আমেরিকার অধিবাসী। তিনি বাল্যকাল হইতেই আলোকচিত্র বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। কোন নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইলেই তাহা লইয়া তিনি গবেষণা আরম্ভ করিতেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ড্রাইপ্লেটে মিশ্রণ মাখাইবার অর্থাৎ কাঁচের উপর মিশ্রণের প্রলেপ দিবার জন্য তিনি একটি যন্ত্র প্রস্তুত করেন এবং ঐ যন্ত্রের সাহায্যে প্লেট প্রস্তুত করিয়া তিনি বাজারে সরবরাহ করিতে লাগিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পেপার ফিল্ম নেগেটিভ এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বর্তমান প্রচলিত সেলুলয়েড ফিল্ম নেগেটিভ তিনিই প্রস্তুত করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনিই সর্বপ্রথম সর্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী কোডাক ক্যামেরা প্রস্তুত করিয়া সমস্ত জগৎকে চমৎকৃত করিলেন। ইহাই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত ক্যামেরা যাহা দ্বারা অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও অক্লেশে চিত্র তুলিতে পারে। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনিই সর্বপ্রথম ডে-লাইট

লোডিং রোল-ফিল্ম' এবং ফোল্ডিং পকেট কোডাক ক্যামেরার প্রচলন করেন। এই রূপে তিনিই জগতে আলোকচিত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। প্রায় ৬০ বৎসর পূর্বে কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, আলোকচিত্র-জগতের জটিল সমস্যার সমাধান এরূপ সুন্দর ও সরলভাবে সম্ভব ছিল। এই অসাধ্য সাধন করিয়া মিঃ ইষ্টম্যান সমস্ত জগৎকে চিরদিনের জন্য তাঁহার ঋণে আবদ্ধ ও গুণমুগ্ধ করিয়া রাখিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ ইষ্টম্যান নিজে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া যে ব্যবসায়ের সূত্রপাত করিয়াছিলেন সেই ব্যবসায়ে বর্তমানে জগতের অসংখ্য নরনারী কাজে নিযুক্ত। বর্তমানে আমরা ইংল্যাণ্ড, জার্মেনী, জাপান প্রভৃতি নানা দেশের প্রস্তুত ক্যামেরা, প্লেট, ফিল্ম, পেপার ইত্যাদি দেখিতে পাই, কিন্তু "কোডাক"কে তাঁহার আসন হইতে কেহই বিচ্যুত করিতে পারে নাই। "কোডাক" না হইলে কেহ যেন সন্তুষ্ট হইতে পারে না।

এখন যাহা আমরা সাধারণ ব্যাপার বলিয়া মনে করি তাহার সমাধান করিতে ৩০০শত বৎসরেরও অধিক সময় লাগিয়াছে। এইরূপ সরল বিষয়ের মীমাংসায় পৌঁছিতে এত দীর্ঘকাল আর কোন ক্ষেত্রে লাগিয়াছে কিনা সন্দেহ।

ইহাই আলোকচিত্র আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। আর কয়েকটি বিষয় লিখিয়া ইহার শেষ করিব।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে পীত রং মিশ্রিত কলোডিয়ন ড্রাইপ্লেট পরীক্ষা করিবার সময় বার্লিন টেক্নিক্যাল স্কুলের প্রফেসর এইচ, ডব্লিউ, ভোগেল আবিষ্কার করিলেন যে বিভিন্ন রং মিশ্রিত কলোডিয়ন-ড্রাইপ্লেটে সূর্যের রশ্মিতে বিভিন্ন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাকে অর্থক্রোমেটিক বলা হয়।

এই সময়ে কেমব্রিজের গণিত অধ্যাপক জেম্স্ ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল প্রমাণ করিলেন যে তিন খানা প্লেটে লাল, নীল ও সবুজ রংএর পৃথক পৃথক এক্সপোজারে, রঞ্জিত আলোকচিত্র তোলা সম্ভবপর। লুইস ডুকোস ডু হারুণ রঞ্জিত আলোকচিত্রের গবেষণায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি তাহার জীবনব্যাপী গবেষণার বিবরণী লিখিয়া যান। এই সকল সূত্র ধরিয়াই বর্তমানে রঞ্জিত আলোকচিত্র গ্রহণের পদ্ধতি স্থাপিত হইয়াছে। এখন আর তিন খানা প্লেট এক্সপোজ দিতে হয় না, একখানাতেই কাজ হয়। কাগজের উপরেও রঞ্জিত প্রিণ্ট প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জে, ডব্লিউ, সোয়ান কার্বন প্রোসেস পরিকল্পনা করেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম উইলিস প্ল্যাটিনোটাইপ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ডাঃ ফার্ডিনাণ্ড হার্টার ও সি, ড্রিফিল্ড ড্রাইপ্লেটের তুলনামূলক পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে পৃথক পৃথক মিশ্রণে প্রস্তুত বিভিন্ন প্লেটের কার্যশক্তিরও তারতম্য হয়। হার্টারের প্রথম অক্ষর 'H' এর সহিত ড্রিফিল্ডএর আদি অক্ষর 'D' যোগ করিয়া এই শক্তির নামকরণ হয়, H+D শক্তি। সর্বপ্রকার নেগেটিভ প্রস্তুতকারী দ্রব্যের মোড়কের উপর তাহাদের H+D বা 'সেনার' শক্তির উল্লেখ থাকে। ফটোগ্রাফারগণ এই সকল শক্তি অনুযায়ী সহজেই এক্সপোজার দিতে পারেন।

এইরূপে বহু বৈজ্ঞানিক আলোকচিত্রের নব নব উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন ও করিতেছেন। ভুবন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন একটি ক্যামেরা আবিষ্কার করিয়াছেন যাহাতে যে কোন প্রকার আলোতেই ছবি তোলা যাইবে। কথিত আছে যে অন্ধকারেও এই ক্যামেরার দ্বারা ছবি তোলা যায়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক এডিসন শিকাগো প্রদর্শনীতে তাঁহার কিনেটোস্কোপ যন্ত্রে সর্বপ্রথম চলন্ত চিত্র (বায়স্কোপ) দেখাইয়াছিলেন। জার্মান বৈজ্ঞানিক প্রফেসর করুন্ সর্বপ্রথম বার্লিন হইতে প্যারিসে টেলিফোন লাইনযোগে চিত্র প্রেরণ করেন এবং

ইহার ১৫ বৎসর পরে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ইটালি হইতে আমেরিকায় ফটোটেলিগ্রাফি প্রেরণ করিতে সক্ষম হন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক রেঞ্জার ফটো-টেলিগ্রাফির একটি নূতন উন্নত নিয়ম বাহির করেন। স্কটল্যাণ্ডের বৈজ্ঞানিক বেয়ার্ড ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম টেলিভিশন আবিষ্কারে সক্ষম হন। মিঃ বেয়ার্ডের নিয়মানুসারে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডন হইতে সর্বপ্রথম টেলিভিশন করা হয় এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে টেলিভিশন ও ব্রডকাষ্টিং অর্থাৎ দূরের ছবি দেখা ও তাহাদের কথা শোনা একযোগে সম্ভব হয়। মিঃ বেয়ার্ডের আবিষ্কারের পরে জার্মান বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক নূতন ভাবে বহু প্রকারে ইহার উন্নতি হইয়াছে। টেলিভিশন যন্ত্রের প্রেরক ক্যামেরাকে কিনোস্কোপ ও গ্রাহক যন্ত্রকে আইকোনস্কোপ বলা হয়।

বিজ্ঞানের এই নূতন শাখার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃই ইহার যে সকল নূতন নূতন প্রয়োজনীয়তার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে তাহা এই পথের প্রথম আবিষ্কারকদের ধারণারও অতীত ছিল। আধুনিক টকী বায়োস্কোপে শব্দনিক্ষেপ-নের জন্য ফটো ইলেকট্রিক সেল, গ্রহনক্ষত্রাদির তথ্য সন্ধানে দূরবীক্ষণ যন্ত্র, শরীরের ভিতরের কল-কব্জার রহস্য নির্ণয়ে এক্স-রে যন্ত্র, অতি অল্প খরচায় অতি সহজে নির্ভুল কার্যের জন্য ফটো-ষ্টাট, ডাক বিভাগে এয়ারগ্রাফ,—ইহা ছাড়া পুলিশ বিভাগে, যুদ্ধ বিভাগে ও অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে আলোক-চিত্র আজকাল অত্যাবশ্যক।

অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও বর্তমানে আলোকচিত্র ও উহার সহচর ছায়াচিত্র, এক্স রে ইত্যাদি বিশিষ্ট এক আসন অধিকার করিয়াছে। চিত্রশিল্প, মৃৎশিল্প, সূচীশিল্প প্রভৃতি কার্যেও আলোকচিত্রের প্রয়োজন হইতেছে। তুলি ও রং-এর সাহায্যে চিত্রাঙ্কন সময়সাপেক্ষ; ঐ সময়ের মধ্যে অঙ্কনীয় বিষয়বস্তুর রূপের পরিবর্তনও অসম্ভব নয়। কিন্তু আলোকচিত্র ক্ষমতা এত অধিক যে উক্ত বিষয়বস্তুর কোন প্রকার রূপান্তর ঘটিবার পূর্বেই $\frac{1}{100000}$ (এক সেকেণ্ডের লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়) সেকেণ্ডের মধ্যে সর্বাঙ্গ-সুন্দর নিখুঁত চকিত-চিত্র পাওয়া যাইতে পারে। এই কারণে চিত্রশিল্প, সূচীশিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতি বিষয়বস্তুর একখানি আলোকচিত্র সম্মুখে রাখিলে ঐ সকল শিল্পকার্য নির্দোষ হয়।

"বিশ্বের দরবারে সুউচ্চ আসন লাভ করিতে হইলে বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর আমাদের জাতীয়-জীবন গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু নীচের দিক হইতে ভিৎ গড়িয়া না তুলিলে উপরের দিকে উহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।"

সিন্‌ক্রোট্রন

পদার্থের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাদান, পরমাণুর অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড শক্তির কথা বিজ্ঞানীরা অনেকদিন থেকেই জানতেন। অক্লান্ত চেষ্টার ফলে মাত্র অল্প কিছুকাল পূর্বে তাঁরা সেই শক্তিকে কাজে লাগাতে পেরেছেন। অ্যাটম-বোমাই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এতদিনের সাধনার ফলে মানুষ আজ পরমাণু জগতে প্রবেশ করেছে। অবশ্য এই প্রচণ্ড শক্তিকে কাজে লাগিয়েছে তারা ধ্বংসাত্মক কাজের মধ্যদিয়ে। কিন্তু এই শক্তিকে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করতে না পারলে কেবল ধ্বংসকার্যে ব্যবহার করেই শক্তি আহরণের উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হবেনা। তাই আজ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে এই শক্তিকে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করবার জন্যে ব্যাপকভাবে চেষ্টা চলছে। সকলেই জানেন পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ যাকে আমরা পরমাণু বলি, সেগুলো ইলেকট্রন প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি কতকগুলো মৌলিক কণিকার সমবায়ে গঠিত। যেমন ইউরেনিয়াম একটা মৌলিক পদার্থ। ইউরেনিয়াম ২৩৫ এর পরমাণুর বাইরের দিকে আছে ৯২টা ইলেকট্রন। আর এর ভিতরের কেন্দ্রীয়বস্তু অর্থাৎ নিউক্লিয়াসটা ৯২টা প্রোটন এবং ১৪৩টা নিউট্রন কণিকার সমবায়ে গঠিত। এই কণিকাগুলোর মত ছোট ছোট ঢিল ছুঁড়ে মারতে পারলে পরমাণুকে ভেঙে ফেলা যেতে পারে, অবশ্য ঢিল যদি ঠিক মত জায়গায় আঘাত করে। পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থটাকে ভেঙে ফেলতে পারলে পদার্থের রূপান্তর ঘটানো সম্ভব। পরমাণুর উপাদান বিভিন্ন কণিকাগুলোকে ঢিল বা বুলেটের মত ব্যবহার করে পরমাণু ভাঙবার ব্যবস্থা অনেকদিন ধরেই চলছিল। এরূপ সাধারণ ঢিল ছোঁড়ার ব্যবস্থায় ইলেকট্রনগুলোকে পরমাণু থেকে বিচ্ছিন্ন করা কঠিন ব্যাপার নয়; কিন্তু পরমাণুর ভিতরকার কেন্দ্রীয়বস্তু অর্থাৎ নিউক্লিয়াসটাকে ভাঙাই শক্ত। পরমাণুর কেন্দ্রীয়বস্তুটাকে ভাঙতে না পারলে পদার্থের রূপান্তর ঘটে না এবং ভিতরকার সংহত শক্তিকেও ব্যবহার করা চলে না। যেসব মৌলিক কণাগুলোকে বুলেটের মত ব্যবহার করা হয় তাদের গতিবেগ অসম্ভবরূপে বাড়িয়ে তুলতে পারলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। এ উদ্দেশ্যে অনেক চেষ্টাই হয়েছে। সর্বশেষে ডাঃ লরেন্স বহুদিনের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সাইক্লোট্রন নামে অদ্ভুত এক বিরাট যন্ত্র উদ্ভাবন করেন।

একটা ঢিল হাতে করে যত জোরে ছোঁড়া যায়—লম্বা একটা দড়ির প্রান্তে বেঁধে ঢিলটাকে কিছুক্ষণ ঘোরাবার মুখে হঠাৎ ছেড়ে দিলে বেশী শক্তি অর্জনের ফলে তার গতিবেগ অনেকটা বেড়ে যেতে পারে। দড়ি বাঁধা ঢিলের মত না হলেও কতকটা ওই ধরণে, বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক শক্তির সহায়তায় সাইক্লোট্রন, বুলেটরূপে ব্যবহৃত কণাগুলোর গতিবেগ অসম্ভবরূপে বাড়িয়ে তোলে। ঠিক তাগ মাফিক লাগাতে পারলে এই বেগবান কণাগুলো যে কোন পদার্থের পরমাণুকে আঘাত করে ভেঙে ফেলতে পারে। সাইক্লোট্রনের সাহায্যে প্রোটন, ডয়টারন প্রভৃতি ধন-তড়িতাবিষ্ট কণাগুলো বিশ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের মত শক্তি অর্জন করতে পারে। কিন্তু এই কণাগুলোর বস্তুপরিমাণ বা ভর অনেক বেশী, কাজেই গতিবেগ খুব বেশী বাড়ে না। এজন্যেই বিজ্ঞানীরা এরূপ বুলেটের গতি আরও বাড়িয়ে তোলবার জন্যে নতুন উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন। ফলে, অনেকদিন থেকেই বিটাট্রন যন্ত্র তৈরীর কথা তাঁদের মনে উদিত হয়েছিল। অবশেষে ডাঃ ওয়াল্টন্‌ বিটাট্রন তৈরী করবার কার্যকরী পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ১৯৪৩ সালে ইলিনয়েসের প্রোফেসর কার্স্টের উদ্যোগে ১০০

মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের বিটাট্রন যন্ত্রের নির্মাণ কার্য শেষ হয়। ইতিমধ্যে ১৯৪২ সালে প্রোফেসর কার্ষ্ট ২৫০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের আর একটি বিটাট্রন নির্মাণের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। পরে জানা গেছে, জার্মান বিজ্ঞানীরা নাকি তার আগেই বিটাট্রনের সাহায্যে বিভিন্ন রকমের আণবিক গবেষণায় কাজ সুরু করেছিলেন। সাইক্লোট্রনে যেমন ধন-তড়িতাবিষ্ট কণিকাগুলোর গতিবেগ বৃদ্ধি করা হয়, বিটাট্রনে সেরূপ ঋণ-তড়িতাবিষ্ট বিটা-কণিকা অর্থাৎ ইলেকট্রনের গতিবেগ বাড়িয়ে তোলা হয়।

এক ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি সম্পন্ন বিটা-কণিকা সেকেণ্ডে ৩৭০ মাইল বেগে ধাবিত হয়। ১০,০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন কণিকগুলো সেকেণ্ডে প্রায় ৩৭০০০ মাইল বেগে ছুটে চলে। ভোল্টেজ আরও বাড়িয়ে দিলে গতিবেগ কিন্তু ঐ অনুপাতে অসম্ভব রূপে বাড়ে না, তবে ক্রমশঃ আলোর গতিবেগের কাছাকাছি যেতে পারে। আলোর গতি সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল। মিলিয়ন ভোল্ট শক্তি সম্পন্ন ইলেকট্রনের গতিবেগ আলোর গতিবেগের শতকরা ৯৫ ভাগ অর্জন করতে পারে। কারণ অধিকতর শক্তি বৃদ্ধিতে ইলেকট্রন কণিকাগুলোর গতিবেগ আলোর গতিবেগের কাছাকাছি যাওয়ার সংগে সংগেই তাদের 'মাস্' অর্থাৎ ভর বেড়ে যায়। 'আগেই বলেছি সাইক্লোট্রনে ধন তড়িতাবিষ্ট কণিকার গতিবেগ বাড়িয়ে তোলা হয়। কিন্তু এই কণিকা-গুলোর ভর বেশী বলে ২০,০০০,০০০ ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি প্রয়োগেও গতিবেগ বেশী বাড়তে পারে না।

কাজেই ইলেকট্রন বুলেটগুলোর গতিবেগ আরও বাড়িয়ে তোলবার জন্যে বিজ্ঞানীরা এক নতুন রকমের যন্ত্র তৈরী করবার পরিকল্পনা করেন। এই যন্ত্রের নাম সিনক্রোট্রন। বিটাট্রন এবং সাইক্লোট্রন, এই উভয় যন্ত্রের মূলসূত্রের সমন্বয়ে মিচিগান ইউ-নিভার্সিটিতে এরূপ একটা বিরাট যন্ত্র তৈরী হয়েছে। নির্মাণ পরিকল্পনাকারী বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন 'রেস্ট্র্যাক'।

এই যন্ত্র সাহায্যে বিটা-কণিকা অর্থাৎ ইলেকট্রন গুলোকে তিনশ' মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট শক্তি সম্পন্ন করা সম্ভব হবে এবং তাদের গতিবেগ বাড়বে প্রায় আলোর গতিবেগের কাছকাছি। মোটের উপর এগুলো হবে অপেক্ষাকৃত মৃদুগতি সম্পন্ন ব্যোম-রশ্মির মত। এরূপ প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন বুলেটের আঘাতে পরমাণুর কেন্দ্রীয়বস্তু তো চূর্ণ বিচূর্ণ হবেই অধিকন্তু পরমাণুর উপাদান, মৌলিক কণিকাগুলোও হয়তো রেহাই পাবে না। যতদূর জানা গেছে তাতে দেখা যায়, বিটাট্রনের সাহায্যে মেসন নামক মৌলিক কণিকার উৎপাদন, তামাকে নিকেলে আর রূপাকে ক্যাডমিয়াম এবং প্যালাডিয়ামে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে। এখন সিনক্রোট্রন যে আরও কত কি অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলবে তা' জানবার জন্যে বিজ্ঞানীরা অসীম আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন।

গ. চ ভ.

প্লাষ্টিক্‌স্‌

শ্রীঅজিতকুমার গুপ্ত

প্লাষ্টিকগুলিকে সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা হয়।

(১) তাপ-নমনীয় বা থার্মোপ্লাষ্টিকস্—এরা তাপে পরিবর্তনশীল অর্থাৎ উত্তাপ ও শৈত্য পরম্পরায় এদের বারবার শক্ত ও নরম করা যেতে পারে। এদের সহজে গলিত করা যায়। এরা জৈব দ্রাবকসমূহে দ্রবনীয়। এই পর্যায়ে পড়ে সেলুলোজ ও ভিনাইলজাত স্ফটিক স্বচ্ছ প্লাষ্টিক সমূহ।

(২) তাপ-ঘননীয় বা থার্মোসেটিং—বিশেষ তাপে ও চাপে এদের ঘটে এক বিশেষ রাসায়নিক পরিবর্তন, যার ফলে এদের আর দ্বিতীয়বার গলানো যায় না বা কোন জৈব তরল পদার্থ দ্বারা দ্রবীভূত করা যায় না। এই পর্যায়ে পড়ে ফিনলিক, অ্যামিনো, গ্লিপ্টাল ও কেসিন প্লাষ্টিক সমূহ।

সাধারণতঃ কোন জৈব পদার্থের একাধিক অণু একত্র সংহত বা পলিমেরাইজ্‌ড্ হয়ে সৃষ্টি করে তাপগলনীয় প্লাষ্টিকগুলির। আবার এক বা একাধিক জৈব পদার্থের অণু সমূহ একত্র ঘনীভূত হয়ে সৃষ্টি করে তাপ-ঘননীয় প্লাষ্টিকসমূহের।

প্লাষ্টিক্স প্রস্তুতিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া

(ক) সংহতি বা পলিমেরিজেশন্—দ্বি-বন্ধনী-যুক্ত জৈব পদার্থগুলির অঙ্গার পরমাণুসমূহ সহজেই তাদের উদ্বৃত্ত বন্ধনীটির দ্বারা অন্য অঙ্গার পরমাণুর সহিত যুক্ত হতে পারে এবং এর ফলে সৃষ্টি হয় একটি সংহত অঙ্গার শৃঙ্খলের। এইরূপে তরল ইথিলিনকে কয়েকটি বিশেষ অবস্থায় উত্তপ্ত করলে সৃষ্টি হয় পলিইথিলিনের।

(খ) ঘনীভবন বা কনডেন্‌শেসন্ এক বা একাধিক প্রকারের কয়েকটি সরল অণু একত্র ঘনীভূত হয়ে সৃষ্টি করে এক জটিলতর অণুর। সাধারণতঃ এই প্রক্রিয়ার ফলে জল জাতীয় কোন সরল অণুর সৃষ্টি হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে (এষ্টারীফিকেসন্) প্রক্রিয়া।

অ্যাসেটিক অ্যাসিড+ইথাইল অ্যালকোহল—ইথাইল অ্যাসিটেট্ (এস্টার)+জল।

সাংশ্লেষিক প্লাষ্টিকসমূহের গঠন প্রণালী

প্রথম জাতীয়—এদের সৃষ্টি হয় সংহতি প্রক্রিয়ার দ্বারা। এদের মধ্যে পড়ে তাপনমনীয় প্লাষ্টিকসমূহ। বিশেষ প্রক্রিয়ার ফলে ইথিলিন সৃষ্টি করে এক সুদীর্ঘ মুক্তশৃঙ্খল যৌগিকের। একে বলা হয় অ্যালকাথিন প্ল্যাষ্টিক। এর আণবিক গুরুত্ব প্রায় ৩০,০০০। ইথিলিন অণুর একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর পরিবর্তে আর কোনও পরমাণু বা র‍্যাডিক্যাল অর্থাৎ মূলক বসালে পাওয়া যায় আরও নানাবিধ যৌগিক, যাদের সাধারণ সংকেত $XCH=CH_2$। এর—$CH=CH_2$ অংশটিকে বলে ভিনাইল মূলক, যা হতে উৎপন্ন হয় নানাজাতীয় প্লাষ্টিক। ষ্টিরিন প্লাষ্টিকে এই Xএর স্থানে থাকে C_6H_5 বা ফিনাইল মূলক। সহস্রাধিক ষ্টিরিণ অণু সংহত হয়ে সৃষ্টি করে স্ফটিক-স্বচ্ছ পলিষ্টিরিণ প্লাষ্টিকের। মিথাইল মিথাক্রাইলেটেরও সৃষ্টি এই ভিনাইল মূলক থেকে।

ভিনাইলমূলক>অ্যাক্রাইলিক অ্যাসিড>মিথাইল অ্যাক্রাইলিক অ্যাসিড>মিথাইল মিথাক্রাইলেট্।

দ্বিতীয় জাতীয়—এদের সৃষ্টি ঘনী-ভবন প্রক্রিয়ায়। এরা তাপঘননীয়। যেমন ফিনল (C_6H_5OH) ও ফরমালডিহাইডের (CH_2O) ঘনীভবনে হয় বেকেলাইটের সৃষ্টি। ২ ফিনল+ফরমালডিহাইড=বেকেলাইট্।

তৃতীয় জাতীয়—এদের অন্তর্গত বৃহৎ সেলুলোজ অণু রসায়নাগারে সংশ্লেষিত হয় না, প্রাকৃতিক উপায়েই পাওয়া যায়। একটি সেলুলোজ অণু বহুসংখ্যক গ্লুকোস এককের দ্বারা গঠিত।

'গঠন-প্রণালী ও নমনীয়তা'

রঞ্জনরশ্মি বিশ্লেষণ অনুসারে প্রত্যেক প্লাষ্টিকই দীর্ঘ সূত্রাকার অণুসমষ্টি। সেলুলোজ প্লাষ্টিকে তারা থাকে গুচ্ছ হিসাবে এবং অন্যান্য প্লাষ্টিকে তারা থাকে গ্রন্থিময় জাল হিসাবে। আণবিক ও পরমাণবিক সংসক্তির ফলে অভ্যন্তরস্থ অণুগুলি যথাযথ স্থানে থাকে। অল্পশক্তিসম্পন্ন ক্ষুদ্র অণুগুলি সহজেই গলে যায়। কিন্তু দীর্ঘ অণুগুলি ক্রমশঃ নরম হইতে থাকে, একেবারে গলে না। তাপে ঘটায় প্লাষ্টিকগুলির আণবিক গতিশক্তির প্রাবল্য, ফলে অবশেষে পদার্থটি গলে যায়। যখন কোন প্লাষ্টিকের উপর কোন দ্রাবক প্রয়োগ করা হয় তখন আণবিক সংসক্তির গুণে দ্রাবক অণুসমূহ অঙ্গার শৃঙ্খলগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাদের ব্যবধান ক্রমান্বয়ে বাড়াতে থাকে যতক্ষণ না প্লাষ্টিকটি সম্পূর্ণরূপে দ্রবীভূত হয়ে যায়। যদি অল্প পরিমাণে কিছু অনুদ্বায়ী দ্রাবক প্রয়োগ করা যায়, তাহলে ঘটে প্লাষ্টিসিজেশান বা নমনীয়করণ এবং দ্রাবকটিকে বলে নমনীয়ক বা প্লাষ্টিসাইজার। যদি তাপনমনীয় কোন প্লাষ্টিকখণ্ডকে টেনে প্রসারিত করা হয় তা'হলে সূত্রগুচ্ছগুলি বা জালগুলি কিছুটা স্থানভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, কিন্তু আকর্ষণ কমে গেলে আবার স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করে। যখন আকর্ষণ সংসক্তি-বলকে অতিক্রম করে তখন দীর্ঘ শৃঙ্খলগুলি একটি অপরটির উপর সরে সরে পিছলে চলে এবং খণ্ডটির দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। অবশেষে কতকগুলি শৃঙ্খলশেষ একত্র জমা হয়ে এক দুর্বল স্থানের সৃষ্টি করে এবং খণ্ডটি ভেঙ্গে যায়। যে অবস্থায় স্থিতিস্থাপক প্রসারণ থেকে প্রবাহের সূচনা হয় সে অবস্থাকে চরম-ক্ষণ বলে। নমনীয়ক প্রয়োগে চরম-ক্ষণ সহজলভ্য হয় এবং প্রসারণও যায় বেড়ে। নমনীয়ক শৃঙ্খলগুলিকে পৃথক করবার চেষ্টা করে এবং শৃঙ্খলগুলির চারপাশ পিচ্ছিল করে তোলে। যখন তাপ প্রয়োগ করা হয় তখন অল্প শক্তি প্রয়োগেই এদের প্রসারিত বা প্রবাহিত করা যায়। তখন এদের বিশেষ আকার দেওয়া হয় যা শৈত্যপ্রয়োগে জমে স্থায়ী হয়ে যায়।

তাপ-ঘননীয় প্লাষ্টিক সমূহ প্রথম অবস্থায় থাকে গলনীয়, পরে ক্রমাগত তাপ প্রয়োগে তাদের ঘটে এক দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধে ঘনীভবন। ফলে সমগ্র বস্তুটি একটি বিরাট অণুর রূপ ধারণ করে যা আর ক্ষুদ্র একক সমূহে বিভক্ত হতে পারে না। তাপপ্রয়োগে একে আর নরম করা যায় না। তাই এর দ্বারা প্রক্ষেপ ঢালাইয়ের কাজ হতে পারে না।

প্লাষ্টিকের সহনশীলতা

যখন কোন প্লাষ্টিককে সহসা আঘাত করা যায় বা বাঁকান হয়, প্রবল চাপ বা প্রসারজনিত শক্তি তার উপর ক্রিয়া করে। সেলুলয়েডে শৃঙ্খলগুলি সরে সরে যায় এবং প্লাষ্টিকটি ভাঙ্গে না। কিন্তু জালীময় অণুগুলি সহজে সরতে পারে না তাই এই জাতীয় প্লাষ্টিক সেলুলয়েড অপেক্ষা সহজে ভাঙ্গে। বেকেলাইটের অণুগুলি একেবারে গতিহীন, তাই তারা ভঙ্গুর। রাসায়নিক গঠন প্রণালী এবং ভৌতধর্মসমূহের সমন্বয় করে বিজ্ঞানীরা প্রয়োজনীয় গুণসম্পন্ন প্লাষ্টিকের পরিকল্পনা ও তারপর তা' প্রস্তুত করতে সমর্থ হয়েছেন। ষ্টডিঙ্গার দেখেছেন যে পলিষ্টিরিণে নানা পরিমাণ ডাইভিনাইল বেঞ্জিন প্রয়োগ করে বেকেলাইটের ন্যায় জালীবন্ধনীযুক্ত প্লাষ্টিকসমূহ পাওয়া যায় যাদের গলনীয়তা ও দ্রবণীয়তা নির্ভর করে যুক্ত ডাইভিনাইল বেঞ্জিনের পরিমাণের উপর।

সিল্কের অণুকে নমুনা হিসাবে নিয়ে ক্যারোথারস এক নূতন প্লাষ্টিক সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন।—COO মূলক বা র‍্যাডিক্যাল সমেত কোন জৈবাম্লকে NH_2 র‍্যাডিক্যাল সহ কোন অ্যামিনের সাথে ঘনীভবন ঘটিয়ে সৃষ্টি করা হয় নানান জাতীয় প্লাষ্টিকের, যার বিশেষ মূলক হল—CONH—এরা প্রাকৃতিক রেশম অপেক্ষা অনেক শক্ত ও উজ্জ্বল।

প্লাষ্টিক ঢালাই

(১) চাপে ঢালাই—এই প্রণালীতে চূর্ণ প্লাষ্টিক তপ্ত ছাঁচে ঢেলে উপরিভাগ থেকে প্রবল চাপ প্রয়োগ করে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয়।

(২) অন্তর্নিক্ষেপ ঢালাই—

এই প্রণালীতে উত্তপ্ত অর্ধতরল পদার্থ শীতল ছাঁচের মধ্যে নিক্ষেপ করে তাকে আকার দেওয়া হয়। উভয় প্রণালীতেই কোন জিনিষ সম্যক্‌ভাবে শীতল হবার আগে ছাঁচ থেকে সরানো হয় না।

প্লাষ্টিকের ব্যবহার

প্লাষ্টিক উৎপাদন আজ বিংশ শতাব্দীতে এক নূতন শিল্পবিপ্লবের উদ্ভব করেছে। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্লাষ্টিক আজ মানবের জীবনের ধারাকে অনেকাংশে পরিবর্তিত করেছে। জীবনকে উপভোগ করবার নিত্য নূতন পথ প্লাষ্টিক আজ মানুষকে দেখাচ্ছে। প্লাষ্টিক জীবনকে করেছে সাবলীল, দিয়েছে তাতে নূতন ব্যঞ্জনা, নূতন সুর। প্রথমে প্লাষ্টিকের ব্যবহার হ'ল হস্তীদন্ত, মুক্তা, হীরা জহরৎ ইত্যাদির অনুকরণে। সাধারণবিত্তসম্পন্নরা প্রথম সুযোগ পেলো সুন্দরের আস্বাদ গ্রহণ করবার যার অধিকার এতদিন একচ্ছত্রভাবে ছিল একমাত্র লক্ষ্মীর বরপুত্রদেরই। প্লাষ্টিকের বহুবর্ণ বৈচিত্র্য ও রূপদক্ষমতা সুযোগ দিল শিল্পীর অনুচ্চারিত অভিব্যক্তি প্রকাশের।

নূতন যুগের সন্ধানী আলো খোঁজ পেলো সেই ষ্ট্রীমলাইনিং ধরণের, গতির ছন্দ যার দ্বারা সবচেয়ে বেশী ব্যক্ত হতে পারে। দেখা গেছে যে দ্রব্য-সামগ্রীর উপরিভাগের এই ধরণের মৃদু বক্রতা প্লাষ্টিক ঢালাইয়ের পক্ষে খুব সহজসাধ্য।

আজ বাড়ীতে, আপিসে, সাধারণ গৃহে সর্বত্রই প্লাষ্টিক আমাদের জীবনযাত্রা সুখসাধ্য করেছে। প্লাষ্টিকদ্রব্য সস্তাও হয়, জিনিষও ভাল হয়। সাধারণের উপভোগের জন্য প্লাষ্টিকের অবদানের তুলনা নেই। আজ আমরা কল্পনাও করতে পারিনা বিদ্যুৎ-শিল্প, ক্যামেরা, সিনেমা, টেলিফোন, গ্রামোফোন ছাড়া সভ্য মানুষ চলতো কি করে! তাছাড়া সস্তার ফাউণ্টেন পেন, টুথব্রাশ, চিরুণী, চশমার ফ্রেম ইত্যাদি আধুনিক জীবনযাত্রার পক্ষে নানাবিধ অপরিহার্য দ্রব্যাদি থেকে সে হ'ত বঞ্চিত।

স্বচ্ছ ভিসকোসের আচ্ছাদনের প্রচলন আজকাল খুব বেশী। প্লাষ্টিকের বহুল ব্যবহারের জন্যেই আজ টেলিফোন, রেডিও, মোটর ও এরোপ্লেন সাধারণের সহজলভ্য হয়েছে। মোটর ও এরোপ্লেনে অধিকাংশ প্লাষ্টিকে তৈরী করার পরিকল্পনা আজ সফল হয়েছে। প্লাষ্টিকের উপর সহজেই করাত চালনা করা যায়, স্ক্রু বসানো যায়। বহুস্তরবিশিষ্ট প্লাষ্টিকের নির্মাণ দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে কারখানার অভ্যন্তরেই গৃহের বিভিন্ন অংশ উৎপাদিত হবে, যা পরে ইচ্ছামত জোড়া লাগিয়ে নিলেই চলবে। পরীক্ষামূলকভাবে অধিকাংশ প্লাষ্টিকে নির্মিত একটি গৃহ স্কটল্যাণ্ডে প্রস্তুত হবার কথা আছে। লঘুতা, নমনীয়তা, মসৃণতা ক্ষয়রোধী ক্ষমতা, তাপ ও বিদ্যুৎ-সহনতা ইত্যাদি বহুগুণ আজ প্লাষ্টিককে এক বিশেষ পদাভিষিক্ত করেছে। আজকাল আইসোফ্লেক্স বলে একরকম তাপরোধক প্রস্তুত হচ্ছে যাতে দুটি পাতলা সেলুলোজ অ্যাসিটেটের স্তরের মধ্যে বায়ু আবদ্ধ থাকে। একটি পাত এরকম বহুস্তরবিশিষ্ট। খুব লঘু অথচ খুব কার্যকরী বলে এর সুনাম আছে।

প্লাষ্টিক আজ রসায়নশিল্পে করেছে এক নবযুগের সূচনা। সাধারণ নির্মাণ দ্রব্যাদি রসায়ন স্থাপত্যে হয়ে পড়ে একেবারেই অকেজো, অথচ অন্যান্য স্থপতি-শিল্প এদের ব্যতিরেকে চলতে পারে না একপাও। বহুদিনের অভাব অভিযোগ মেটাবার ভার নিয়েছে আজ প্লাষ্টিক। আজ রাসায়নিক প্রক্রিয়া পাত্র, রসায়নাগারের নালীসমূহ সবই তৈরী হচ্ছে প্লাষ্টিকে। পলিভিনাইল-জাত মিপোলাম এবিষয়ে অগ্রণী।

যন্ত্রশিল্পেও প্লাষ্টিক আজ তার যথাযোগ্য স্থান নিতে সুরু করেছে। দেখা গেছে একটি বেকেলাইটের

বিয়ারিংয়ের কার্যকারীতা একটি ব্রোঞ্জের বিয়ারিংয়ের বিশগুণ বেশী।

বিদ্যুৎশিল্পেও প্লাষ্টিকের দান অতুলনীয়। সুইচ, সকেট, প্লাগ থেকে টেলিফোন, রেডিও ও যাবতীয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্লাষ্টিক ব্যতিরেকে তৈরী করার কথা কল্পনাও করা যায় না। আজকাল বহুস্তরবিশিষ্ট বিদ্যুৎরোধকের পরিবর্তে তারের উপরিভাগে পুরু প্লাষ্টিকের আচ্ছাদন লাগিয়ে দেওয়া হয়।

সমুদ্রের জল প্লাষ্টিকের বিশেষ কোন ক্ষতি করতে পারে না বলে জাহাজের নানা অংশে আজকাল প্লাষ্টিক ব্যবহারের ব্যবস্থা চলছে। বার্ণিশ হিসাবে জৈব দ্রাবকে দ্রবীভূত প্লাষ্টিকের ব্যবহার আজ খুব বেশী। সকল দিক থেকেই মানবসমাজ হয়েছে আজ এক নূতন প্লাষ্টিক সভ্যতার সম্মুখীন।

* * *

প্লাষ্টিক ও ভবিষ্যত

আজ জীবনের প্রতিটি অঙ্গেই একটা নূতন প্লাষ্টিকযুগের সূচনা দেখা দিয়েছে, যার কিছুটা কল্পনা আমরা এখন থেকেই করতে পারি।

এই যুগে শিশু প্রথম চক্ষু উন্মীলিত করেই দেখবে বহুবর্ণ বৈচিত্র্যময়, উজ্জ্বল, মসৃণ সামগ্রীপূর্ণ জগত। সেগুলো হবে শক্ত, অভঙ্গুর, পরিষ্কার, নিরাপদ, তাতে থাকবে না কোন ফাট, কোন ধার। তার প্রসাধন দ্রব্যাদি, তার ঠেলাগাড়ী তার দুধের বোতল, চুষিকাঠি, তার যাবতীয় খেলনা, পরে তার খাবার থালা, গেলাস, চামচে সবই হবে বহুবর্ণবিশিষ্ট, তার ছোট্ট মনটিকে খুশীতে ভরিয়ে রাখবার জন্য।

বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সে দাঁত মাজতে শিখলো প্লাষ্টিক ব্রাসে, চুল আঁচড়াতে শিখলো প্লাষ্টিক চিরুণীতে, জামাজুতো পরতে শিখলো কৃত্রিম রেশম, পশম ও চামড়ায়। সে পড়ে মসৃণ ঢালাই করা প্লাষ্টিকের বেঞ্চিতে, লেখে প্লাষ্টিকের কলমে। স্কুলের জানালার কাঠামো ও পর্দাগুলো হবে ধূলিরোধকারী, স্বচ্ছ অভঙ্গুর ঢালাইকরা প্লাষ্টিকে তৈরী। বাড়ীর ন্যায় এখানকার মেঝেও হবে ধূলিহীন ও শব্দহীন প্লাষ্টিকের পাতে প্রস্তুত। তার স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ডটাও হবে প্লাষ্টিকে তৈরী, তবে প্লাষ্টিকের বেতটা বোধহয় তার একটু শক্তই লাগবে, উপায় নেই। ইস্কুলে তাদের পড়াশোনার অঙ্গ হিসাবে শেখানো হবে প্লাষ্টিক শিল্প, শেখানো হবে প্লাষ্টিকের কাজ।

বাড়ী ফিরে এসেও সে সেই একই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে পড়বে। বাড়ীর দেওয়ালগুলোও হবে মনোরম প্লাষ্টিকের পাতে মোড়া। তার স্নানাগারের সবটাই হবে প্লাষ্টিকে তৈরী। প্লাষ্টিকের বাথটব বেসিনে থাকবে প্লাষ্টিকেরই নল ও কল বসানো। এই নলগুলো ইচ্ছামত সিমেণ্ট দিয়ে জুড়ে দেওয়া যাবে। তার বসবার ও শোবার ঘরের সমস্ত আসবাবই হবে বর্ণ বৈচিত্র্যময় উজ্জ্বল ও মসৃণ ঢালাই প্লাস্টিকে তৈরী। ধাতুর প্রয়োগ থাকবে শুধু বিদ্যুৎ ও তাপ পরিবাহক হিসাবে এবং ধারালো যন্ত্রে। কিন্তু যন্ত্রগুলির ধাতব অংশটুকু লাগানো থাকবে ঢালাই করা প্লাষ্টিকের মধ্যে।

সৌন্দর্যের দিক থেকেও প্লাষ্টিকের দান হবে অতুলনীয়। বাতিদান, পর্দা, লুক্কায়িত আলোকের দ্বারা উজ্জ্বল দ্রব্যসমাগ্রী সবই হবে স্ফটিক স্বচ্ছ প্লাষ্টিকে তৈরী। দৈর্ঘ, প্রস্থ ও বেধবিশিষ্ট বহুবিধ মনোরম ছবি ও দৃশ্য থাকবে ঘন স্ফটিকস্বচ্ছ প্লাষ্টিক খণ্ডের মধ্যে। তার খাবার ঘরেরও যাবতীয় সামগ্রী হবে শক্ত ও মসৃণ প্লাষ্টিকে প্রস্তুত।

তার বহির্জগত হবে প্লাষ্টিকময়। তার খেলবার টেনিস র‍্যাকেট, মাছ ধরার ছিপ সবই হবে প্লাষ্টিক। মোটর ও এরোপ্লেনে একমাত্র চাকা, ইঞ্জিন ও তার আনুসাঙ্গিক বাদে সবই হবে প্লাষ্টিকে প্রস্তুত।

বায়ু-নিয়ামক যন্ত্রবিশিষ্ট জাহাজগুলির ভিতরে থাকবে পাতলা প্লাষ্টিকের আচ্ছাদন ও বাইরে থাকবে ক্ষয়রোধী মোটা প্লাষ্টিকের পাতের আবরণ। তার জলবিহারের ছোট্ট নৌকাগুলিও হবে ঢালাই করা প্লাষ্টিকের। অল্প ঘনত্বই হবে তার বহুল

ব্যবহারের প্রধান কারণ, যেহেতু সে অনুপাতে তার সামর্থ্য হবে অনেক বেশী।

তার আপিস হবে বিশেষ নিয়মনের পক্ষপাতী, আপিসের সমুদয় আসবাবপত্র ও ব্যবহার-দ্রব্য হবে প্লাষ্টিকেই তৈরী।

কারখানাতেও সমস্ত যন্ত্রাদি বসানো হবে শক্ত প্লাষ্টিকের বহিরাবরণের মধ্যে। যন্ত্রাদির যে সকল অংশে লঘুতাই প্রয়োজনীয় সেখানে চলবে প্লাষ্টিকের ব্যবস্থা। বিদ্যুৎ-শিল্পে কেবল চুম্বক ও পরিবাহক ছাড়া সবই হবে প্লাষ্টিকে। তার লঘুতা, সামর্থ্য, সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা তাকে করবে সার্বজনীন।

সে চোখে দেখবে প্লাষ্টিকের চশমা প্লাষ্টিকেরই লেন্স লাগানো। ছবি তুলবে প্লাষ্টিকের ক্যামেরা লেন্স ও ফিল্মে। প্রেক্ষাগৃহে দেখবে প্লাষ্টিকেরই ফিল্ম থেকে ফেলা ছবি। গৃহে বসে দূরের বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখাশুনা ও আলাপ আলোচনা করবে প্লাষ্টিকের আবরণস্থ টেলিভিশন যন্ত্রে।

তার বয়স হতে চললো, তাকে এখন ব্যবহার করতে হচ্ছে প্লাষ্টিকের দাঁত। তার অন্তিম যাত্রারও বন্দোবস্ত করা হবে প্লাষ্টিকেরই কফিনে, যা হবে তার দেহের চিরদিনের আশ্রয়। নয়তো, প্লাষ্টিকেরই ঘটসিঞ্চিত বারিতে হবে তার শেষ অগ্নিনির্বাপন।

ব্রাউনের আবিষ্কৃত গতি ও হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর নির্ণয়

শ্রীকামিনীকুমার দে

রবার্ট ব্রাউন ছিলেন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে একদিন তিনি জলের ভিতর ভাসমান কতকগুলি উদ্ভিজ্জ কণিকা অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলেন—এই কণিকাগুলি যেন এদিকে ওদিকে লাফাইতেছে, কিন্তু কি যে কারণ কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। জলের ভিতর ভাসমান, অণুবীক্ষণে দেখা যায় এরূপ অন্য জড়কণাও অনুরূপ ছুটাছুটি করে, ইহাদের গতি 'ব্রাউনিয়ান মুভ্‌মেণ্ট' নামে পরিচিত। এই গতিকে কেন্দ্র করিয়া পরবর্তীকালে অণু পরমাণুর স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব হইয়াছে। এইরকম গতিবিশিষ্ট তরল পদার্থে ভাসমান কণিকাকে ব্রাউন কণিকারূপে উল্লেখ করা হইবে।

ব্রাউনের আবিষ্কারের প্রায় ৫০ বৎসর পরে এই গতির কারণ নির্ণীত হয়। অনেকদিন ধরিয়া বিজ্ঞানীরা মনে করিতেছিলেন পদার্থের অণুগুলি পরস্পর গায়ে গায়ে লাগিয়া নাই—পরস্পরের মধ্যে ফাঁকা জায়গাই বেশী আর এই অণুগুলি অতি দ্রুতগতিবিশিষ্ট ও চঞ্চল। যে কোন পদার্থের কঠিন অবস্থার অণুগুলি অপেক্ষা উহার তরল অবস্থার অণুগুলি অধিকতর গতিশীল এবং উহার গ্যাসীয় অবস্থায় অণুগুলি আরও বেশি গতিশীল। তাপ বাড়াইলে গতিবেগ বাড়ে এবং শেষে পদার্থ কঠিন হইতে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, ইহার পরেও তাপ বাড়াইতে বাড়াইতে যখন পদার্থ গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হয়, তখন গতিবেগ এত বেশি যে অণুগুলি পরস্পরের আকর্ষণ ছিন্ন করিয়া বাঁধনহারা হইয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে। অণুগুলি দ্রুতগতিশীল চঞ্চল বলিয়াই পদার্থকে নিরেট মনে হয়। ব্রাউনের কণিকাগুলি যে এদিকে ওদিকে লাফাইতেছে মনে হয়, তাহাই পরমাণুর অতি দ্রুতগতিশীলতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই কণিকাগুলি অণু অপেক্ষা বহুগুণ

বড় এবং অন্য সাধারণ জড়কণা অপেক্ষা অনেক ছোট। সাধারণ জড়কণা অণুর তুলনায় এত বড় যে অণুর ধাক্কা তাহাকে নাড়াইতে পারে না, কিন্তু ব্রাউনের কণিকাগুলি অণুর ধাক্কার বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া একবার এদিকে আরবার ওদিকে ছুটিতে বাধ্য হয়। এখানেই সব ব্যাপারের শেষ নয়। অণু হইতে শক্তি ব্রাউন কণিকায় সঞ্চারিত হয়। গণিতের নিয়মানুসারে ব্রাউন কণিকা এবং অণুর গড় গতিশক্তি সমান হওয়া উচিত। জন পেরিন্ নামক একজন ফরাসী বিজ্ঞানী ব্রাউন-কণিকার গতিবেগ নির্ধারণ করেন এবং সুকৌশলে ইহার ভর নির্ণয় করিয়া গতিশক্তির পরিমাপ করেন। [গতিশক্তি = $\frac{1}{2}$ ভর × (গতিবেগ)^{২}]। ২০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড্ তাপমাত্রায় ব্রাউন কণিকার গতিশক্তি $৬\cdot৩ \times ১০^{-১৪}$ আর্গ; তাহা হইলে এই তাপমাত্রায় যে কোন পদার্থের অণুর গতিশক্তিও ইহাই। আরও দেখা গিয়াছে গতিশক্তি ও তাপমাত্রার মধ্যে একটা নির্দিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই সম্বন্ধ বা অনুপাত অবগত হইয়া গণিত সাহায্যে যে কোন তাপমাত্রায় গতিশক্তি বলিয়া দেওয়া যায়।

অটো স্টার্ণ নামক জার্মান বিজ্ঞানী চিন্তা করিতে লাগিলেন কোন উপায়ে যদি অণুর গতি-বেগ নির্ণয় করিতে পারা যায় তবে গণিতের সাহায্যে তাহার ভরও জানিতে পারা যাইবে অণুর গতিবেগ নির্ণয়ের জন্য তিনি এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। বায়ু নিষ্কাশিত আবদ্ধ একটী নলের ভিতর প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সকল রক্ষিত হইল। একটি সরু ছিদ্রযুক্ত কক্ষে তিনি এক টুক্‌রা সোডিয়াম ধাতু রাখিলেন। কক্ষটিকে বৈদ্যুতিকশক্তি সাহায্যে উত্তপ্ত করিবার জন্য তার জড়ান ছিল। তাপ প্রয়োগে সোডিয়াম ধাতু উত্তপ্ত হইয়া গ্যাসীয় অবস্থায় অণুসকল ছড়াইয়া পড়ে এবং ছিদ্র পথে বাহিরে আসে। এখানে সোজা সম্মুখে পর পর দুইখানি ছিদ্রযুক্ত পাতলা পাত আছে। কক্ষের ছিদ্র এবং পাত দুইটির ছিদ্র পথে যে সকল অণু আসে তাহাদের গতিপথে একই দণ্ডের দুই প্রান্তে দাঁত ও ফাঁকযুক্ত দুইটি চাকা একটি হইতে দূরে দ্বিতীয়টি এমনভাবে রাখা হইয়াছে যেন একটির দাঁত আর একটির ফাঁক বরাবর পড়ে। এখন চাকা দুইটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে যদি এমন বেগ সম্পন্ন হয় যে একটির ফাঁকের ভিতর দিয়া অণু অন্য চাকায় পৌছিতে যে সময় লাগে সে সময়ে একটি দাঁত ঘুরিয়া তৎস্থলে পরবর্তী ফাঁক আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে অণু অবাধে চলিয়া যায় এবং সম্মুখে রক্ষিত পর্দায় তাহার উপস্থিতি বিজ্ঞাপিত করে। চাকার ঘুর্ণনবেগ ও দুইটি চাকার দূরত্ব জানিয়া অণুর গতিবেগ অঙ্ক কষিয়া নির্ণয় করা যায়। সোডিয়াম ধাতুর পরমাণুর গতিবেগ ৫০০° ডিগ্রি তাপমাত্রায় সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ($১০^{৫}$) সেন্টিমিটার (বা ঘণ্টায় ২০০০ মাইল)। ইহা অবগত হইয়া গণিত সাহায্যে নির্ণয় করা হইয়াছে যে, স্বাভাবিক তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর গতিবেগ সেকেণ্ডে $২\cdot৮ \times ১০^{৫}$ সেন্টিমিটার। কিন্তু পূর্বে বলা হইয়াছে এই তাপমাত্রায় গতি-শক্তির পরিমাণ $৬\cdot৩ \times ১০^{-১৪}$ আর্গ।

অতএব $৬\cdot৩ \times ১০^{-১৪} = \frac{1}{2}$. (হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর) × $(২\cdot৮ \times ১০^{৫})^{২}$ ইহা হইতে পাওয়া যায় হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর = $১\cdot৬ \times ১০^{-২৪}$ গ্রাম। হাইড্রোজেন পরমাণুর তুলনায় অন্যান্য পদার্থের অণু বা পরমাণু কতগুণ ভারী তাহা রসায়ন শাস্ত্র নির্ণয় করিয়াছে। অতএব তাহাদের অণু বা পরমাণুর ভর এখন অনায়াসে বলা যায়।

জলের অণু হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা ১৮ গুণ ভারী। আবার এক ঘন সেন্টিমিটার জলের ভর এক গ্রাম। অতএব হিসাব করিয়া দেখা যায় ১ ঘন সেন্টিমিটার জলে ৩×১০^{২২} অণু আছে। ইহাতেই বুঝা যায় অণু কত ক্ষুদ্র এবং অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে অণু দৃষ্টিগোচর হওয়ার আশা কত সুদূর পরাহত। তবু মানুষের বুদ্ধিশক্তি তাহার ইন্দ্রিয়শক্তিকে হার মানাইয়া অণু ও পরমাণুকে প্রত্যক্ষ জিনিষের মত করায়ত্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছে—তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যথেচ্ছ কাজে লাগাইবার চেষ্টায় আছে।

দেশ ও কাল ভেদে পঞ্জিকার রূপ ও তাহার সংস্কার*

শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু

অবতরণিকা

সুসভ্য মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক জীবনধারায় পঞ্জিকার ব্যবহার অপরিহার্য। বৈষয়িক ব্যাপারে, ধর্মানুষ্ঠানে, সামাজিক আচরণে পঞ্জিকা ছাড়া তাহার চলে না। দেয়ালপঞ্জী, টেবিলপঞ্জী এখন 'ক্যালেণ্ডার', বা পঞ্জিকার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হিসাবে গণ্য। উহাতে প্রতিমাসে ছুটির দিন, উৎসবের দিন, ধর্মানুষ্ঠানের দিন, ও জাতীয় জীবনের গৌরবময় দিন প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া থাকে। এ জন্য সাধারণ কাজ-কর্মে আমাদের অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু, ধর্ম, সামাজিক ও কয়েকটি গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানে আরও বৃহদাকার বা বিস্তারিত পঞ্জিকার প্রয়োজন হয়। যথা—বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত, গুপ্তপ্রেস ও পি, এম, বাগচীর পঞ্জিকা। কারণ, ইহাতে তিথি, নক্ষত্র, গ্রহস্ফুট ব্যতীত পূজাপার্বণ, শুভাশুভ দিনগুলির উল্লেখ থাকে। এই জাতীয় পঞ্জিকা বেশ জটিল। যাঁহারা ধর্মানুষ্ঠান, গার্হস্থ্য ক্রিয়াকলাপের কোন ধার ধারেন না তাঁহাদের কাছে এই পঞ্জিকার কোন মূল্য নাই। কিন্তু, এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, পৃথিবীর কোন দেশেরই পঞ্জিকা—সম্ভবত রুশিয়া ব্যতীত—শুধু বৈষয়িক ব্যাপারে সীমাবদ্ধ নয়।

পৃথিবীতে যতগুলি জাতি ততগুলি তাহার পঞ্জিকা। জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় ভেদে পঞ্জিকার রূপ অসংখ্য। এই সব পঞ্জিকার মধ্যে দেখা যায় যে বৎসরের প্রারম্ভ, মাস গণনা প্রভৃতি স্বতন্ত্র। বর্তমান দ্রুতগতির যুগে দেশ সমূহের অন্তর্বর্তী ব্যবধান হ্রাস পাইয়াছে। বিভিন্ন মানব সমাজ পরস্পর নিরপেক্ষ নয়, এক জাতির সহিত অপর জাতির রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে; এ জন্য প্রত্যেক জাতি যদি পৃথক পৃথক পঞ্জিকা অনুসরণ করিয়া চলে তবে পৃথিবীর সমস্ত দেশের আর্থিক উন্নতি নানাভাবে ব্যাহত হইবে সন্দেহ নাই।** বৈষয়িক ব্যাপারের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র বর্তমানে য়ুরোপীয় পঞ্জিকা অনুসৃত হয়। এই পঞ্জিকা রচনার পদ্ধতি প্রথমে প্রবর্তিত হয় ১৫৮২ খ্রীঃ অব্দে 'পোপ ১ম, গ্রেগরী' কর্তৃক; সুতরাং, ইহাকে 'গ্রেগরী পঞ্জী' বলা চলে। এই পঞ্জী য়ুরোপ ও আমেরিকায় ব্যবহৃত হয় বৈষয়িক ও ধর্ম-সম্পর্কিত প্রয়োজনে; কিন্তু য়ুরোপের অধীনস্থ অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত হয় একমাত্র বৈষয়িক তথা অর্থনৈতিক প্রয়োজনে; আপন আপন ধর্মানুষ্ঠানে হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধগণ স্বকীয় জাতীয় বা সম্প্রদায়িক পঞ্জিকা অনুসরণ করে।

গ্রেগরী পঞ্জীতে বহু ত্রুটি এবং রচয়িতার খাম খেয়ালির নিদর্শন বর্তমান। ইহাতে মাসগুলির দিন সংখ্যা সমান নয়। 'Thirty days hath September' ইত্যাদি প্রচলিত ইংরেজী ছড়াটি আমরা বাল্যকাল হইতে শুভঙ্করীর আর্যার ন্যায় কণ্ঠস্থ করিয়া আসিতেছি, কারণ ইহাতে প্রতি মাসের দিন সংখ্যা নির্দিষ্ট আছে। যথা—

---

* অধ্যাপক শ্রীমেঘনাদ সাহা প্রণীত 'Calender through ages and its Reform' [B. C. Law Vol; Part II] শীর্ষক সন্দর্ভের 'স্বাধীন' অনুবাদ। প্রণেতার অনুমতিক্রমে।

** এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে যুগোশ্লাভিয়ার কোন কোন অঞ্চলে ও প্যালেষ্টাইনে সপ্তাহে তিন দিন ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ রাখিতে হয়; যেহেতু, শুক্রবার মুসলমানদের 'জুম্মাবার' শনিবার ইহুদীদের 'স্যাবাথ', ও রবিবার খ্রীষ্টানদের 'প্রভুর দিন' (Lord's day)।

তিরিশ দিনেতে হয় মাস সেপ্টেম্বর
সেরূপ এপ্রিল, জুন আর নভেম্বর;
আটাশ দিনেতে সবে ফেব্রুয়ারী ধরে,
বাড়ে তার একদিন চারিবর্ষ পরে;
অবশিষ্ট মাস সব একত্রিশ দিনে,
হিসাব রাখিবে শিশু সদা মনে মনে।

মাসের দিন সংখ্যা অসমান হওয়ায় অসুবিধা প্রচুর। কিন্তু, কেন এই খেয়ালি? কেনই বা ফেব্রুয়ারী মাস ২৮ দিনে এবং বাকি মাস ৩০ বা ৩১ দিনে? ইহার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি?

ধর্মোৎসবের, ছুটির তারিখ পরিবর্তন জন্য গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। যথা খ্রীষ্টানদের বিখ্যাত ঈষ্টার পর্ব ২২শে মার্চ হইতে ২৫শে এপ্রিল পর্যন্ত ৩৫ দিনের মধ্যে যে কোন দিন পড়িতে পারে। পুনশ্চ এই মুখ্য ঈষ্টার হইতে গণনা করিয়া অপরাপর ধর্মানুষ্ঠানের দিন নির্ধারিত হয়। ফলে এই হয় যে, সারাবছর ব্যপিয়া সমস্ত ছুটির তারিখ পরিবর্তিত হয়। এই ধরণের তারিখ পরিক্রমায় সাধারণের অসুবিধা ঘটিয়াছে। আবার, সারা বৎসর ধরিয়া সপ্তাহের ৭টি বারের এক পৌনঃপুনিক আবর্তন চলিতে থাকায় কোন্ বিশিষ্ট বারে 'অব্দ' বা মাস শুরু হইবে প্রথম হইতে ধরিবার উপায় নাই, দস্তরমত অঙ্ক কষিয়া বাহির করিতে হয়।

নানাবিধ অসুবিধা দূর করিবার জন্য অধুনালুপ্ত জাতি-সংঘ কর্তৃক একটি পঞ্জিকা-সংস্কার-সমিতি গঠিত হয়। এই সমিতিতে দুইটি প্রস্তাব আলোচিত হয়:—

(১) তের মাসে বর্ষ গণনা করিয়া এক নূতন পঞ্জিকা প্রণয়ন করা; এবং (২) বছরের বারমাস বজায় রাখিয়া যথাযথ সংশোধন পঞ্জিকায় প্রচলন করা।

প্রস্তাবিত সংস্কার দুইটির স্থূল বিবরণ নীচে দেওয়া হইল।

ত্রয়োদশমাসী বর্ষপঞ্জী

প্রস্তাবিত পাঁজিতে বছরে ১৩টি মাস, প্রতি মাসে ৪ সপ্তাহ, এবং প্রতি সপ্তাহে ৭টি দিন থাকিবে; অতএব প্রত্যেক মাস ২৮ দিনে স্থায়ী হইবে। সকল মাসেরই শুরু রবিবারে ও শেষ শনিবারে। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর একবার প্রদক্ষিণ কালকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে বৎসর বলে, বৎসরের পরিমাণ মোটামুটি ৩৬৫¼ দিন। ২৮ দিনে মাস ধরিয়া ১৩ মাসের (অর্থাৎ, ১ বছরের) দিনসংখ্যা হয় ৩৬৪; সুতরাং, প্রকৃত বর্ষমান অপেক্ষা দিনের সংখ্যা ১¼ কম হয়। পঞ্জিকার বর্ষমান জ্যোতিষসম্মত হওয়া আবশ্যক, নচেৎ মাস ও ঋতুপরিবর্তনের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য থাকে না। এজন্য গ্রেগরীপঞ্জীর বিধানের অনুরূপ এই প্রস্তাবিত পঞ্জিকায়ও সাধারণ বর্ষমান হইবে ৩৬৫ দিনে এবং প্রতি ৪র্থ বৎসরে (অধিবর্ষে, ইং: লিপ্-ইয়ারে) বর্ষমান হইবে ৩৬৬ দিন। এখন ত্রয়োদশতম মাসের শেষদিন শনিবার, কিন্তু তাহার পরবর্তী ৩৬৫তম দিনে বর্ষ শেষ। এই দিনটিকে তারিখ দ্বারা নির্দেশের পরিবর্তে বলা হইবে 'বর্ষশেষ দিন' এবং বারের পরিচয় হইবে 'অতিরিক্ত শনিবার'। অতএব, দেখা গেল বছরের শেষে দুইটি দিনই শনিবার। পরবর্তী দিন নববর্ষের ১লা তারিখ, রবিবার। অধিবর্ষের ক্ষেত্রে ঐরূপ দুইটি তারিখ-বিহীন দিন করিয়া বর্ষমানকে ৩৬৬ দিনে সম্পূর্ণ করিতে হইবে। ইহার উভয় দিনই শনিবার। জুন মাসের শেষে একটি অতিরিক্ত শনিবার জুড়িতে হইবে। এবং ডিসেম্বরের শেষে একটি অতিরিক্ত শনিবার জুড়িতে হইবে। প্রথম "শনিবারটিকে" বলা হইবে "বর্ষ-মধ্যম-দিন" (year middle day) এবং দ্বিতীয়টিকে সাধারণ বর্ষের ন্যায় "বর্ষ-শেষ-দিন (year end day)।

প্রস্তাবিত পঞ্জিকার রচনাভঙ্গী সর্ববিধ জটিলতা বর্জিত। ইহার বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে এই:—

(ক) যাবতীয় বৎসর সবই এক প্রকার; (খ) মাস সবই এক প্রকার; (গ) প্রতি মাসের শুরু রবিবারে ও শেষ শনিবারে; (ঘ) ১ মাস—৪ সপ্তাহ—

২৮ দিন; (ঙ) ১ বছর = ১৩ মাস = ১৩×২৮ = ৩৬৪ দিন; (চ) বর্ষশেষদিন ১টি (উহা অতিরিক্ত শনিবার); (ছ) প্রতি অধিবর্ষে দুইটি অতিরিক্ত শনিবার [বর্ষশেষদিন ও বর্ষমধ্যম দিন].

ত্রয়োদশমাসী বর্ষপঞ্জী

র.	সো.	ম.	বু.	বৃ.	শু.	শ.
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮

জনৈক ইতালিয় ধর্মযাজক আব্বে ম্যাস্ত্রোফিনি ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দে সর্বপ্রথম উল্লিখিত তেরমাসের বর্ষপঞ্জী প্রবর্তনের প্রস্তাব আনেন পোপপ্রাসাদ ভ্যাটিকানে; ইহার পর ১৮৪৯ অব্দে ফরাসী প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিক আগস্ট কোমৎ উক্ত প্রস্তাব পুনরুত্থাপন করেন। কিন্তু, এই পঞ্জিকার প্রবর্তনের প্রধান অন্তরায় হয় ১২ মাসের স্থানে ১৩ মাসের গণনায়, কারণ ১৩ সংখ্যার প্রতি লোকের খুবই কুসংস্কার বর্তমান।

সংশোধিত দ্বাদশমাসী বর্ষপঞ্জী

এই পঞ্জীতে অধুনা প্রচলিত পঞ্জিকার অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতিগুলি দূর করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে। ইহাতে ১২ মাসের দিনসংখ্যা এরূপ সুশৃঙ্খলায় সাজান হইয়াছে যে, দুই অর্ধ-বৎসরের মধ্যে অথবা চার সিকিবর্ষ বা বর্ষপাদের মধ্যে ঐক্য রহিয়াছে; সুতরাং প্রত্যেক বর্ষ একই প্রকার এবং প্রতি বর্ষপাদও অভিন্ন। এজন্য, এই পঞ্জীকে 'সনাতন-পঞ্জী' অভিধান দেওয়া যাইতে পারে।

নবপঞ্জিকার প্রতি বর্ষপাদে আছে পুরা ৩টি মাস, বা ১৩ সপ্তাহ, বা ৯১ দিন। প্রতি বর্ষপাদের শুরু রবিবারে ও শেষ শনিবারে। প্রতি বর্ষপাদের ১ম মাস ৩১ দিনে, এবং শেষ দুই মাসের প্রত্যেকটি ৩০ দিনে। প্রতিমাসেই ২৬টি করিয়া 'কর্মদিবস' (Week days) আছে।

পরিকল্পিত বর্ষপঞ্জীর গঠন-পদ্ধতি নিম্নে বিশদভাবে বুঝান গেল।

১ম বর্ষপাদ

জানুয়ারী

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২৯	৩০	৩১				

ফেব্রুয়ারী

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
			১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		

মার্চ

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
					১	২
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

২য় বর্ষপাদ

এপ্রিল

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২৯	৩০	৩১				

মে

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
			১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		

জুন

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
					১	২
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

৩য় বর্ষপাদ

জুলাই

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২৯	৩০	৩১				

আগষ্ট

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
			১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		

সেপ্টেম্বর

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
					১	২
৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০

৪র্থ বর্ষপাদ

অক্টোবর

র	সো	ম	বু	বৃ	শু	শ
১	২	৩	৪	৫	৬	
৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১
১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২
২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮
২৯	৩০	৩১				

নভেম্বর

র	সো	ম	বু	বৃ	শু
			১	২	৩
৫	৬	৭	৮	৯	১০ ১
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭ ১
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪ ২
২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	

ডিসেম্বর

র	সো	ম	বু	বৃ	শু
					১
৩	৪	৫	৬	৭	৮
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২
২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯

জ্যোতিষিক সত্য বজায় রাখিয়া এই পঞ্জীকে চিরন্তন করিতে হইলে বৎসরকে ৩৬৫ দিনে গুণিতে হয় এবং ৩ বৎসর অন্তর অধিবর্ষ ফেলিতে হয়। এজন্য, বর্ষের অতিরিক্ত ৩৬৫তম দিনটিকে 'বর্ষশেষ দিন' গণ্য করিয়া ৩০শে ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারীর অন্তর্বর্তী ধরিতে হইবে, এবং ইহা (৩১শে ডিসেম্বর) 'অতিরিক্ত শনিবার' আখ্যা পাইবে। সেইরূপ, অধিবর্ষের ক্ষেত্রে, ৩৬৬তম দিনটিকে 'অধিবর্ষ দিন' বলিয়া ও 'অতিরিক্ত শনিবার' গণ্য করিয়া ৩০শে জুন ও ১লা জুলাই-এর অন্তর্বর্তী (৩১শে জুন) করিতে হইবে। কাজে কাজেই, পাঞ্জিতে (১) ডিসেম্বর ৩১ তারিখকে 'Y' দ্বারা নির্দেশ করিতে হইবে, এবং (২) জুন ৩১ তারিখকে 'L' দ্বারা নির্দেশ করিতে হইবে। এই অতিরিক্ত শনিবার দুইটিকে আন্তর্জাতিক ছুটি হিসাবে গণ্য করিবারও যুক্তি আছে। সাধারণ বর্ষ (Civil year) ও অধিবর্ষ (Leap year), উভয় ক্ষেত্রেই, বর্ষপ্রবেশ ১লা জানুয়ারী রবিবারে পড়ে।

এই পঞ্জী সম্পর্কে 'Journal of Calender Reform' এর অভিমতের কিছু সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল :—

"এই সংস্কৃত পঞ্জীর গঠন সুসমঞ্জস, সুবিন্যস্ত ও সনাতন ; ইহা সৌর-বৎসরের ৩৬৪.২৪২২ দিনমান ও প্রাকৃতিক ঋতুপর্যায়ের সহিত সঙ্গতি রাখিয়াছে। আর্থিক জগতে এই পঞ্জীর সুবিধা ও উপযোগিতা বর্তমান। দেশের জন্মমৃত্যুহার, আয়-ব্যয়, নানাবিধ ফসল উৎপাদন, বারিপাত প্রভৃতি বৈষয়িক ব্যাপারের সাংখিক বিবরণ (Statistics) তুলনামূলক করিতে হইলে বিভিন্ন বছরের কোন নির্দিষ্ট মাস, অথবা সপ্তাহ, ধরিয়া দেখান যাইতে পারে। ধর্ম-সংক্রান্ত এবং লৌকিক উৎসবাদি উপলক্ষে ছুটির দিন নিত্য-কালের জন্য ধার্য করা যাইতে পারে জননায়কগণের অনুমতিক্রমে। পঞ্জিকা সংস্কারের অপরাপর প্রস্তাব অপেক্ষা বর্তমান প্রস্তাবের প্রবর্তনে সংস্কার-প্রসূত গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা কম।"

পঞ্জিকা সংস্কারের পক্ষপাতী সুধীসমাজ 'World Calendar Reform' নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করেন ; তাহাতে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় সংশোধিত পঞ্জিকা জগতে প্রচলন করিবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু, ত্রয়োদশমাসী বর্ষপঞ্জীর কথা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়া দ্বাদশমাসী বর্ষপঞ্জীই জাতিসংঘের অনুমোদন পাইয়াছে।

পঞ্জিকা রচনার মূলসূত্র

এখন আমরা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পঞ্জিকার মৌলিক উপাদান ও তাহাদের গলদ কোথায় দেখিব এবং আরও দেখিব, কোন বিজ্ঞানসম্মত পঞ্জিকা সৃষ্টির সম্ভাবনা কিরূপ যাহাতে বর্তমান পঞ্জিকার ত্রুটিবিচ্যুতি থাকিবে না ; এবং, তৃতীয়তঃ, 'পঞ্জিকা-সংস্কার সমিতি'র উদ্ভাবিত পঞ্জী সন্তোষজনক কিনা পর্যালোচনা করিব।

সময়ের পরিমাপের জন্য আমরা কয়েকটি কালের একক ব্যবহার করি, যথা, বৎসর, মাস, দিন, সপ্তাহ, ঘণ্টা, মিনিট, ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে সপ্তাহ, ঘণ্টা, মিনিট, দণ্ড, পল প্রভৃতি এককগুলি কৃত্রিম বা মনুষ্যসৃষ্ট ; কিন্তু, বৎসর, মাস ও দিন প্রকৃতি-সৃষ্ট। প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক এই উভয়কালবিভাগ লইয়াই পঞ্জিকার কারবার। কয়েকটি ধর্মানুষ্ঠান আমরা প্রাচীনকাল হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়া আসিতেছি। পঞ্জিকায় উহাদের দিনক্ষণ ধার্য হওয়া প্রয়োজন, অথচ তাহাদের কালনির্দেশের নিয়মকানুন বেশ জটিল ও তাহার সৃষ্টিরহস্যও অস্পষ্ট। কতকগুলি জাতীয় উৎসবের দিনও পঞ্জিকায় নির্দিষ্ট থাকা আবশ্যক, যথা, ভারতের স্বাধীনতাদিবস (১৫ই আগষ্ট) অথবা আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণার দিন (৪ঠা জুলাই)। তাহার পর, কতিপয় কর্মদিবস অন্তর অন্তর বিশ্রামের জন্য একটি দিনের অবসর থাকা মনোবিজ্ঞানসম্মত ; ইহার প্রয়োজনীয়তা হিসাবেও পঞ্জিকায় ছুটির দিন নির্দিষ্ট থাকিবে।

পঞ্জিকাকারের সর্বাগ্রে জানা আবশ্যক বৎসর,

মাস ও দিনের প্রকৃত সংজ্ঞা কি এবং বৎসর ও মাসের প্রকৃত ব্যাপ্তিকাল দিনের একক হিসাবে কি পরিমাণ। পুরাকালে এই সংজ্ঞা, বর্ষমান বা মাসমান সম্বন্ধে সূক্ষ্ম জ্ঞান লোকের ছিল না। ভ্রান্ত ও অসম্পূর্ণ জ্ঞানকে ভিত্তি করিয়া তখনকার দিনে যে পঞ্জিকা প্রস্তুত হইয়াছে তাহার উপর ধর্মের দোহাই চাপাইয়া দেওয়ায় জনসাধারণ নির্বিচারে সে পঞ্জিকা গ্রহণ করে। শীঘ্রই হউক অথবা বিলম্বেই হউক সে সব ভ্রম একদিন ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু ধর্মের দোহাই দেওয়া যতটা সহজ তাহার অপসারণ ততটা সহজ নয়। ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি অসহ্য হইয়া উঠিলেও সংস্কার তখনই সম্ভব হয় যখন জুলিয়স সীজার অথবা পোপ গ্রেগরীর ন্যায় ক্ষমতাশালী সর্বাধিনায়ক ঐ সংস্কার চালাইতে পারেন। জ্ঞানের পশ্চাতে ক্ষমতা না থাকিলে পঞ্জিকাসংস্কার সম্ভব হয় না। —ক্রমশঃ

সংকলন

(১)

লিথোগ্রাফীর জন্মকথা

একশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এ্যালয়েজ সেনিফেলডার নামে ব্যাভেরিয়ার এক তরুণ নাট্যকার হাতের কাছে কোন কাগজ না পেয়ে একটুকরো পাথরের ওপর তাঁর মার ধোপার হিসেব লিখে রাখলেন। পরে তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে পাথরটি ভিজিয়ে এবং তাতে চটচটে কালি লাগিয়ে তার থেকে যতগুলি ইচ্ছা সেই লেখার নিখুঁত ছাপ পাওয়া যায়। এই হল লিথোগ্রাফীর আবিষ্কার।

এই আবিষ্কার অতিশীঘ্র সমগ্র ইউরোপ এবং ইংলণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল। ইংলণ্ড থেকে ভারতবর্ষেও এর আমদানী হতে দেরী হলনা। উনবিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগে যখন কোন দেশীয় ভাষার বর্ণমালার টাইপ প্রস্তুত হয়নি তখন এই লিথোগ্রাফীর সাহায্যে দেশীয় ভাষায় সংবাদ পত্র মুদ্রিত হয়েছে। ভারতবর্ষের সর্বত্র ছোট ছোট লিথোগ্রাফীর প্রেস থেকে শীঘ্রই উর্দু, হিন্দী, গুজরাঠি, মারাঠি, তামিল ও তেলেগু ভাষার বহু পুস্তিকা ও সংবাদপত্র মুদ্রিত হতে থাকে।

লিথোগ্রাফীর সাহায্যে ছবি ছাপানও সহজ; সেই জন্য দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত বহু পুস্তিকা ও সংবাদপত্রে নানা রকমের নক্সা ও ছবি ছাপানও সম্ভব হোত। কিন্তু সেই সব ছবি শিল্পের পর্যায়ে পড়েনা। লিথোগ্রাফীকে চিত্রাঙ্কনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে ভারতীয় শিল্পীরা অনেক ইতস্তত: করেছিলেন। লিথোগ্রাফীর ব্যবহারিক কার্যকারিতা ছাড়া এর যে একটা বিশেষ শৈল্পিক সম্ভাবনা আছে সে সম্বন্ধে ভারতীয় চিত্রকরদের সচেতন হতে অনেক বিলম্ব হয়েছিল।

বৃটেনে কিন্তু তা হয়নি। লিথোগ্রাফীর প্রচলন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ শিল্পীরা পাথর খোদাই এর কাজে লেগে যান। উইলিয়াম ব্লেক এবং বিখ্যাত কাঠ খোদাইকারী শিল্পী টমাস বেউইকও পাথর খোদাই করতে আরম্ভ করেন। পরে দান্তে গেব্রিয়েল রসেটি প্রমুখ প্রির্যাফেলাইট গোষ্ঠির বহু শিল্পী লিথোগ্রাফার হয়েছিলেন।

সেনিফেলডারের আবিষ্কারের দেড়শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ও এ্যালবার্ট মিউজিয়ামে একটি বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দির প্রথম

ভাগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বৃটেন ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের বহু শিল্পীর লিথোগ্রাফের কাজ এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে।

এই প্রদর্শনীতে হেনরী মুর গ্রাহাম সাদারল্যাণ্ড, জন পাইপার, পিকাসো, মাতিসে, ব্রাক্ এবং রুয়্যাণ্ট প্রমুখ আধুনিক যুগের শিল্পীদের এবং ইন্‌গ্রেস, গয়া প্রমুখ পুরাতন যুগের শিল্পীদের খোদাই এর কাজ দেখান হচ্ছে। স্তমিয়ের ও গ্যাভারনির খোদাই কাজের নমুনা এবং বার্ণেট ফ্রীডম্যান এড্‌ওয়ার্ড বডেন ও এড্‌ওয়ার্ড আর্ডিজোন্ প্রভৃতি শিল্পীদের আধুনিকতম পদ্ধতিতে খোদাই এর নিদর্শনও এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে।

বৃটেনে এ ধরণের প্রদর্শনী পূর্বে কখনো হয়নি। ১৯ শে অক্টোবর এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়েছে এবং ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এটি খোলা থাকবে। তারপর দ্রষ্টব্য জিনিষগুলিকে তিন ভাগ করে ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সালে প্রাদেশিক মিউজিয়ামগুলিতে প্রদর্শনের জন্য পাঠান হবে।

(২)

সোভিয়েটে ধানের চাষ

সরকারের সাহায্য লাভ করিয়া সোভিয়েটের সরকারী ও যৌথ খামারগুলি অধুনিকতম বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে ধান চাষের উন্নতি করিয়া চলিয়াছে। পূর্বে যে পরিমাণ ধান হইত এখন তাহার দ্বিগুণ ফলন হইতেছে। প্রথমে মধ্য এশিয়ায় ধানের আবাদ হইত। ক্রমে দেখিতে দেখিতে ধানের চাষ উত্তর ককেশাস, ট্রান্স-ককেশিয়া, ইউক্রেন, দূরপ্রাচ্য, ভল্গা ও অন্যান্য অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সব ক্ষেত্রেই যে ধান চাষের উপযুক্ত জমি ছিল তাহা নয়; যেখানে ছিল না সেখানে উপযোগী করিয়া লওয়া হইয়াছে জল সেচের ব্যবস্থা করিয়া।

সোভিয়েটে পুরাতন পদ্ধতিতে ধানচাষ হয় না। পুরাতন পদ্ধতিতে চাষ করিতে করিতে জমির উর্বরতা কমিয়া যায়। বর্তমানে সোভিয়েটে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্মত শস্যাবর্তন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ধানের বীজ বপনের পূর্বে শুঁটিধারী উদ্ভিদের (leguminous) সহিত সিরিয়েল ঘাস বপন করিলে ও ঐগুলি কাটিয়া পরে ধান বুনিলে বেশী ফসল পাওয়া যায়। শুঁটিধারী উদ্ভিদ বপনের সময় জমিকে জলে ডুবাইয়া রাখা চলে না। এই প্রথায় ধান চাষ করিয়া প্রতি হেকেটয়ারে ৫.৬ টন ফসল পাওয়া গিয়াছে। **ব্যক্তিগত খণ্ড খণ্ড জমিতে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শস্যাবর্তন করার খরচ পোষাইতে পারে না।**

যৌথ ও সরকারী খামারের চাষীরা ব্যাপকভাবে ধানক্ষেত্রে সার ব্যবহার করিতেছেন। সোভিয়েটে কৃষিবিদেরা সম্প্রতি অধিক ফলপ্রসূ ধান্যবীজ তৈয়ারী করিয়াছেন। এই ধান্যবীজ শস্যরোগ প্রতিরোধীও বটে।

সোভিয়েটে প্রতি হেক্টেয়ারে কোথাও কোথাও ১১ টন পর্যন্ত ধান পাওয়া যাইতেছে; ৫.৬ টন তো সাধারণ কথা। মধ্য এশিয়ায় কাডিল উর্দা জনপদে কিম্ মান্ সান্ নামে এক চাষী ১৯৪১ সালে এক হেকেটয়ারে ১১ টন এবং ১৯৩২ সালে ও ১৯৪৩ সালে ১৫ টন ধান উৎপন্ন করিয়াছিলেন। **এ জন্য তাঁহাকে সর্বোচ্চ সম্মান অর্ডার অব লেলিন ও ষ্টালিন পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।** ইব্রাই জাখায়েফ নামে আর একজন কৃষক ১৯৪৬ সালে এক হেকেটয়ারে ১৬ টন উৎপাদন করিয়াছেন। কিম্ মান্ সান্ ও ইব্রাই হাজার হাজার চাষীকে উৎপাদন বৃদ্ধি পদ্ধতি শিক্ষা দিতেছেন।—টাস

(৩)

মনুষ্যচর্ম ব্যাঙ্ক

ব্লাড ব্যাঙ্কের কথা সকলেই জানেন, তেমনি আছে মনুষ্য-চর্ম ব্যাঙ্ক। সম্প্রতি ডাঃ এ্যাড্রিয়ান

ফ্ল্যাট্ নামে এক বৃটিশ অস্ত্র চিকিৎসক মনুষ্যচর্ম সংরক্ষণ করার উপায় আবিষ্কার করেছেন।

দেহের কোন ক্ষতস্থানের দ্রুত আরোগ্যের জন্য অনেক সময় নূতন চর্ম ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। রোগীর দেহের অন্যস্থান থেকে সেই চর্ম সংগ্রহ করতে হয়। কিছুদিন অন্তর প্রয়োজন মত চর্ম সংগ্রহের জন্য রোগীর দেহে বহুবার অস্ত্রোপচার করতে হয়। চর্ম সংরক্ষণ করার উপায়ে আবিষ্কারের ফলে রোগীর এই দুর্ভোগ আর থাকবে না।

ভেসেলিন অথবা প্যারাফিন মোমে সিক্ত একখণ্ড পাতলা বস্ত্রের উপর এই চামড়া রেখে সেই বস্ত্রখণ্ডটিকে দু'ভাঁজ করে শক্ত করে গুটিয়ে প্যাঁচওয়ালা-ছিপি যুক্ত বোতলের মধ্যে রাখা হয়। তারপর বোতলটিকে রেফ্রিজেরেটরের মধ্যে রেখে দেওয়া হয়। এই চর্ম প্রায় ছ' মাস অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

(৪)

নূতন বেদনা-নাশক ঔষধ

সি-বি—১১ (C. B.—11) নামে একটি বেদনা-নাশক ঔষধ বৃটেনে আবিষ্কার করা হয়েছে। বৃটিশ চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করে ইহার কার্যকারিতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। প্রথম ১০ জন চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার্থীদের উপর এই ঔষধ প্রয়োগ করে ভাল ফল পাওয়া যায়। তারপর ১৮ জন রোগী যাঁরা নানারকমের বেদনায় ভুগছিলেন তাঁদের উপর প্রয়োগ করে দেখা যায় যে, ২ মিলিগ্রাম সি-বি-১১ খেয়ে ফেল্লে ২০ থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যে বেদনা নির্মূল হয়ে যায়। বেদনা অধিক হলে মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হয়। ইঞ্জেকশনরূপে ব্যবহার করা হলে দশ থেকে পনের মিনিটের মধ্যেই ফল পাওয়া যায়। কোন অবসাদ আসে না। এডিনবার্গ রয়াল ইন-ফারমারীতে এ নিয়ে গবেষণা চলছে।

(৫)

পঙ্গপাল অজেয় শত্রু নয়

পঙ্গপালের মতন ভয়ংকর শস্যবিনাশী পতঙ্গ আর নেই। পঙ্গপালের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না এই জন্য যে, তারা কখন কোন দিক থেকে আসবে আগে থেকে কিছুই জানা যায় না। হঠাৎ একদিন তারা এসে পড়ে আকাশ অন্ধকার করে, এবং সমস্ত শস্য নিঃশেষ করে দেশকে দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলে দিয়ে আবার অজ্ঞাত স্থান অভিমুখে যাত্রা করে।

গত কুড়ি বৎসর ধরে নানা দেশের বৈজ্ঞানিকরা পঙ্গপালের উৎপত্তি স্থান, জন্মরহস্য, জীবনযাত্রা প্রণালী আচার ব্যবহার এবং গতিবিধি সম্বন্ধে বহু পরিশ্রমে নানা মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই কাজের জন্য তাঁরা আফ্রিকা, আরব, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের অত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলে পরিভ্রমণ করছেন। উষর মরুভূমি এবং অস্বাস্থ্যকর জলা-ভূমিতে মাসের পর মাস তাঁরা পঙ্গপালের মধ্যে কাটিয়েছেন। সমস্ত আফ্রিকার ম্যাপ তৈরী করে সেই ম্যাপে পঙ্গপালের উৎপত্তিস্থান এবং গতিবিধির সমস্ত পথ চিহ্নিত করে রেখেছেন।

পঙ্গপাল সব সময় ঝাঁক বেঁধে থাকে না। হয়ত কয়েক বৎসর ধরে কোন ঝাঁক দেখাই গেল না। যখন তাদের ঝাঁক থাকেনা তখন তারা কোথায় এবং কিভাবে থাকে—এটা একটা সমস্যার বিষয় ছিল।

এ সমস্যার সমাধান বৈজ্ঞানিকরা করেছেন। যখন তাদের ঝাঁক থাকে না তখন তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে এক এক জায়গায় আশ্রয় নেয়। এই সময় তারা অত্যন্ত নিরীহভাবে থাকে এবং কারো কোন ক্ষতি করে না। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ওই সময় তারা তাদের চেহারা এমন বদলে ফেলে যে তাদের আর পঙ্গপাল বলে চেনা যায় না। বৈজ্ঞানিকরাও প্রথম প্রথম এই ভুল করেছিলেন। এই সময় তাদের বর্ণ থাকে সবুজ, দেখলে মনে হয় যেন সাধারণ ফড়িং কিন্তু ঝাঁকের পঙ্গপালের বর্ণ হচ্ছে হলদে ও কালো।

এই অতি ছোট ছোট পঙ্গপালের দল কয়েকটি জায়গায় শরীরধারণ করে থাকে। তারপর অনুকূল আবহাওয়া এলেই তারা বংশবৃদ্ধি করে। বিরাট ঝাঁক সৃষ্টি করে এবং মূর্তিমান সর্বনাশের মত অভিযান সুরু করে। পঙ্গপালের আকৃতি পরিবর্তনের রহস্যটা যখনই বোঝা গেল তখনই তাদের অস্তিত্ব এবং ঝাঁকের উৎপত্তিস্থানও অজানা রইল না। এই সব স্থানের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয় এবং যখনই দেখা যায় যে তাদের দেহের বর্ণ পরিবর্তন সুরু হয়েছে তখনই তাদের ধ্বংস করা হয়। পঙ্গপালের আক্রমণ এইভাবে রোধ করা সম্ভব।

দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ পঙ্গপালের ঝাঁকের উৎপত্তিস্থান এমন জনমানবহীন ও দুর্গম যে, সেখানে বাস করে' তাদের ওপর দৃষ্টি রাখা সম্ভব হয় না। এখনও এমন অনেক স্থান আছে যেখানে লোক-চক্ষুর অগোচরে তারা বংশবৃদ্ধি এবং ঝাঁক সৃষ্টি করার প্রচুর সুযোগ সুবিধা পায়। সুতরাং পঙ্গপালের আক্রমণ আশংকা এখনও দূর করা সম্ভব হয়নি। তবে পঙ্গপালের গতিবিধি সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য জানা গিয়াছে তা থেকে বৈজ্ঞানিকরা পূর্বাহ্নেই বলে দিতে পারেন, কোন দেশের ওপর আক্রমণ আশংকা বর্তমান। এর ফলে সেই সব দেশে সময় থাকতে প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়।

পঙ্গপাল অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ শত্রু হলেও মানুষের কাছে তারা পরাজিত হতে চলেছে। পঙ্গপাল সবুজ খাদ্য খুব পছন্দ করে বটে, কিন্তু ভিজে তুষের ওপর তাদের ভয়ানক লোভ। সুতরাং ওই জাতীয় খাদ্যের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে যদি তাদের অগ্রসার পথে ছড়িয়ে রাখা যায় তাহলে অল্পব্যয়ে লক্ষ লক্ষ পঙ্গপাল ধ্বংস করে শস্য ও দেশকে বাঁচান যায়।

গত মহাযুদ্ধের সময় পঙ্গপালের বিরাট ঝাঁক পূর্ব আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যে সর্বনাশ ডেকে আনার উপক্রম করেছিল; কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা পূর্ব হতে সতর্ক করে দেওয়ায় তাদের ধ্বংস করার সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। বৈজ্ঞানিকদের নির্দেশ মত হাজার হাজার সৈন্য পঙ্গপাল বধের কাজে লেগে যায়। এই যুদ্ধে মানুষেরই জয়লাভ হল। কয়েকটি স্থানে সামান্য শস্যের ক্ষতি হয়, কিন্তু সমগ্র অঞ্চল নিশ্চিত দুর্ভিক্ষের কবল থেকে রক্ষা পায়।

"দেশে যাঁরা আচার্য, যাঁরা সন্ধান করিতেছেন, সাধনা করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, কবে তাঁদের সাধনা মাতৃভাষায় গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে, তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে।"

ছোটদের বিভাগ

জ্ঞান ও বিজ্ঞান
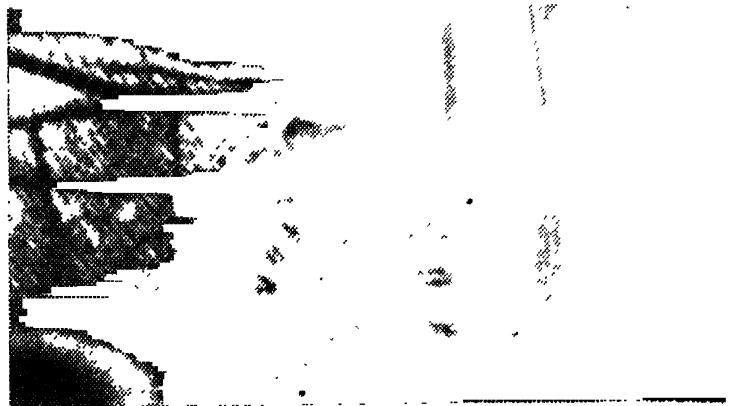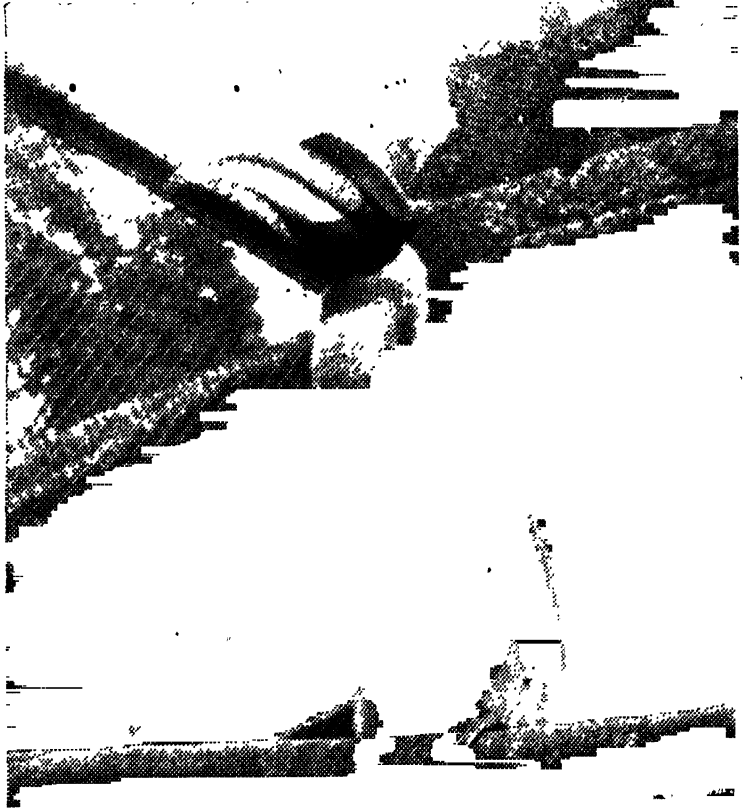
পাখীরও কৌতূহল !

জ্ঞান বিজ্ঞানের খবর জানবার জন্যে তোমাদেরও কৌতূহল জাগ্রত হোক।

তীরন্দাজ মাছ।

এর চলতি নাম—কাঠ-কই। এরা মুখ দিয়ে তীরের মত জল ছুঁড়ে জলের ধারে গাছপালার উপর অবস্থিত পোকা মাকড় শিকার করে থাকে।

[ফটো—গ, চ, ভ
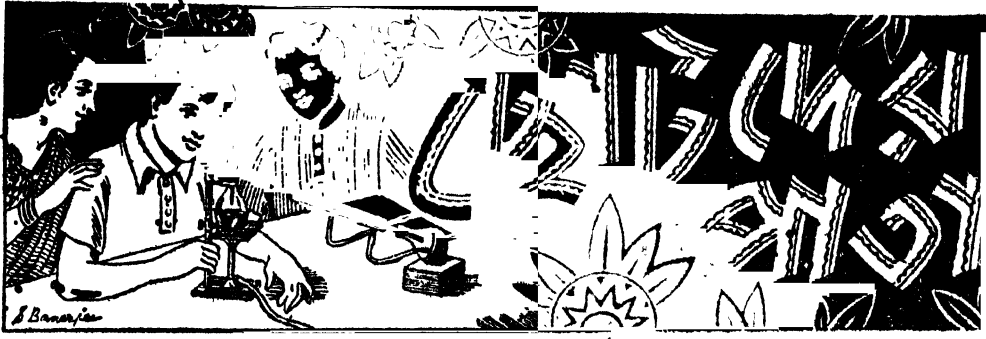
করে দেখ

(১)

ছবি আঁকবার সহজ কৌশল

তোমাদের অনেকেরই ছবি আঁকবার ঝোঁক আছে নিশ্চয়। রীতিমত শিক্ষা না পেলে কোন কিছুরই স্বাভাবিক প্রতিকৃতি আঁকা সহজ ব্যাপার নয়। চিত্রাঙ্কণে মোটামুটি হাত থাকলে নিয়মিত শিক্ষা না করেও যাতে অনায়াসে যে কোন জিনিষের অবিকল ছবি আঁকতে পার তার একটা সহজ উপায়ের কথা বলছি। ইচ্ছে করলে যে কেউ তোমরা ছুতোর মিস্ত্রির সাহায্য নিয়ে এউপায়ে ছবি আঁকবার একটা যন্ত্র তৈরী করে নিতে পারবে। দেখবে—এযন্ত্রের উপর কাগজ ফেলে 'কপি' করবার কায়দায় কত সহজে সুন্দর এবং দৃশ্যানুরূপ নির্ভুল ছবি আঁকতে পার।
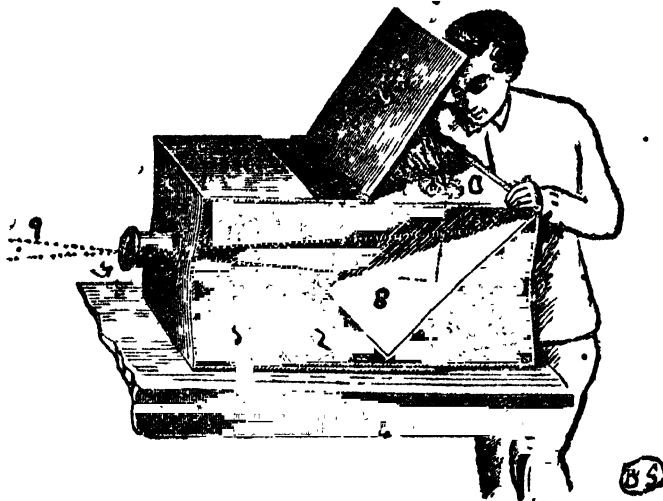
সহজ কৌশলে ছবি আঁকবার যন্ত্র

এই ছবিটা ভাল করে দেখে নাও। ঠিক ওই ধরণের একটা কাঠের বাক্স তৈরী করতে হবে। ১নম্বর আর ২ নম্বর, একদিক খোলা দুটো হাল্কা কাঠের বাক্স। ঠিক

ছবির মত ২ নম্বরের বাক্সটা যেন ১ নম্বরের বাক্সটার মধ্যে ড্রয়ার বা দেরাজের মত অনায়াসে ঢুকতে বা বেরিয়ে আসতে পারে। ১ নম্বরের বাক্সটার মধ্যে ২ নম্বরের বাক্সটা বেশী বা কম যে কোন রকমে ঢুকিয়ে দিলেই সবদিক বন্ধ একটা বাক্স হয়ে যাবে। ১ নম্বরের বাক্সটার উপরের দিকে ৩ নম্বরের মত একখানা পাতলা কাঠের ডালা, কব্জা এঁটে বসিয়ে দিতে হবে। ২ নম্বরের বাক্সটার উপরের দিকে কাঠের বদলে ৫ নম্বরের মত একখানা ঘষা কাঁচ বসাবে। জানালায় যে রকমের ঘষা কাঁচ পরানো হয় সেরকমের একখানা কাঁচ হলেই চলবে। বাক্সটার সামনের দিকে কাঠের ঠিক মধ্যস্থলে একইঞ্চি কি সওয়া ইঞ্চি ব্যাস পরিমিত গোল একটা গর্ত কাটবে। ওই গর্তের মুখে ছোট একটা পিতল বা কাঠের চোঙ বসিয়ে দাও। একখানা লেন্স কিনে এনে ৬ নম্বরের ছবির মত ওই চোঙে পরিয়ে দিতে হবে। ২ নম্বর বাক্সের ভিতরের দিকে মুখ দেখবার একখানা বড় আয়না ঠিক ৪ নম্বরের ছবির মত হেলানোভাবে বসিয়ে দিবে। এই হলো সম্পূর্ণ যন্ত্র।

এবার যে-কোন দৃশ্য, ঘরবাড়ী, গাছপালা অথবা নিশ্চলভাবে অবস্থিত যেকোন জীবজন্তুর ছবি আঁকতে চাও, তার দিকে বাক্সটার মুখ ঘুরিয়ে বসিয়ে দাও। দেখবে, যার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছ তা'থেকে ৭ নম্বরের মত আলো এসে কাঁচের লেন্স খানার মধ্য দিয়ে বাক্সের ভিতরের আয়নার উপরে পড়বে। আয়নাটা হেলানোভাবে থাকায় সেই আলো বাক্সের উপরিভাগের ঘষা কাচের গায়ে পড়ে' পদার্থের অবিকল ছোট ছবি ফুটিয়ে তুলবে। ছবিটা দেখতে ঝাপ্সা হলে ২ নম্বরের বাক্সটাকে একটু টেনে বার করে অথবা ভিতরের দিকে খানিকটা ঠেলে দিলেই দেখবে, ছবি বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যে জিনিষের ছবি আঁকবে তা'থেকে বাক্সটা যতদূরে রাখবে, ছবি ততই ছোট হবে। আবার বাক্সটাকে তার যত কাছে নিয়ে যাবে ছবি ততই বড় হবে। এবার ৩ নম্বরের ডালা খানাকে উঁচু করে আটকে রেখে ওই ঘষা কাচের উপর একখানা পাতলা কাগজ ফেলে পেন্সিল দিয়ে ছবির 'আউট-লাইন' এবং 'সেড-লাইটের' জায়গাগুলো 'কপি' করে নাও। দেখবে কত সহজে কি চমৎকার নিখুঁৎ ছবি এঁকে ফেলেছ। কাঠের ডালাখানার আড়াল না দিলে বাইরের আলো চোখে এসে পড়বে। তাতে ঘষা কাঁচের ছবিটাকে ঠিক স্পষ্ট দেখতে অসুবিধা হবে।

(২)

তরল বায়ু

তোমরা অনেকেই হয়তো তরল বায়ুর কথা শুনে থাকবে; কিন্তু পদার্থটা সম্বন্ধে তোমাদের সত্যিকার কোন ধারণা আছে কি? আমরা যেসব পদার্থের সঙ্গে পরিচিত, সেগুলোকে হয়—কঠিন অথবা তরল, নয়তো বায়বীয় অবস্থাতেই দেখা যায়। কিন্তু একথা তোমরা সবাই জান যে, তাপের মাত্রা কম বা বেশী করলে একই জিনিষকে

বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত করতে পারা যায়। জল তরল পদার্থ; উত্তাপের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে সেই জল বাষ্পীয় বা বায়বীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। তাপের মাত্রা কমিয়ে আনলে জল জমে কঠিন বরফে পরিণত হয়। এরূপ অন্যান্য পদার্থকেও তাপের মাত্রা বাড়িয়ে কমিয়ে বিভিন্ন অবস্থায় রূপান্তরিত করা সম্ভব। ফারেনহাইট থার্মোমিটারের হিসাব অনুসারে উত্তাপ ২১২ ডিগ্রিতে পৌঁছলে জল ফুটতে থাকে। উত্তাপ কমিয়ে ৩২ ডিগ্রিতে নামালে জল জমতে সুরু করে। যে অবস্থায় জল জমে বরফ হয় তার চেয়ে ঠাণ্ডা অবস্থা আমরা সাধারণতঃ ধারণাই করতে পারি না। কিন্তু বরফের চেয়ে অনেক বেশী ঠাণ্ডা অবস্থার সৃষ্টি করা মোটেই অসম্ভব নয়। যে ঠাণ্ডায় জল জমে যায়, সে ঠাণ্ডায় অনেক তরল পদার্থ জমাট বাঁধে না। ফারেনহাইটের শূন্য ডিগ্রির নীচে -৪০ ডিগ্রিতে পারা জমাট বেঁধে যাবে। -২১১ ডিগ্রিতে ইথার, অ্যালকোহল প্রভৃতি তরল পদার্থ জমাট বাঁধবে। তাপের মাত্রা যদি আরও কমানো যায় তবে বাতাস, যাকে বায়বীয় পদার্থরূপে আমরা কেবলমাত্র স্পর্শ-দ্বারা অনুভব করতে পারি, তা-ও জলের মত তরল অবস্থায় উপনীত হবে। এই তরল বাতাসের তাপমাত্রা -২৯২ ডিগ্রি ফারেনহাইটের কম নয়। কি অভাবনীয় ঠাণ্ডা! অনুমান করবার চেষ্টা করতে পার। মোটামুটি ব্যাপারটা এই যে, একটা পাত্রের মধ্যে প্রায় ২০০ অ্যাট্‌মোস্ফিয়ার (এক অ্যাট্‌মোস্ফিয়ারের চাপ প্রায় ৭৸ সের) চাপে বাতাস ভর্তি করে ঠাণ্ডা করা হয়। আবদ্ধ পাত্রের মধ্যেই যান্ত্রিক কৌশলে তাকে অকস্মাৎ প্রসারিত হতে দিয়ে প্রায় ২০ অ্যাট্‌মোস্ফিয়ার চাপে আনা হয়। অকস্মাৎ প্রসারণের ফলে আবদ্ধ বাতাস অসম্ভবরূপে ঠাণ্ডা হয়ে জলের মত তরলতা লাভ করে। তরল বাতাসকে বেশী সময় রাখা বড় কঠিন, কারণ খুব তাড়াতাড়ি উবে যায়। এজন্যে ডেওয়ার্‌স্‌ ফ্লাস্কে রাখা দরকার। ফ্লাস্কের মুখ খোলাই থাকবে। ছিপি আঁটা থাকলে বিস্ফোরণ ঘটে যাবে। এখন এ-জিনিষটা নিয়ে তোমাদিগকে কয়েকটা পরীক্ষা করবার কথা বলছি। বড়দের সাহায্য নিয়ে বাড়ীতেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি। কলকাতার কয়েকটা জায়গায় তরল বায়ু
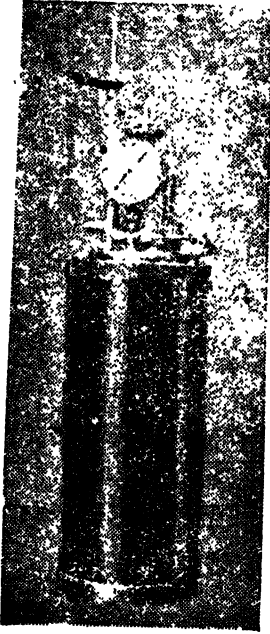
তরল বায়ু তৈরী করবার যন্ত্র

শিখাশূন্য একটা জলন্ত দিয়াশলাইয়ের কাঠি তরল বায়ুতে ডুবিয়ে দেওয়ায় জলে উঠেছে

তৈরী হয়। ডায়মণ্ডহার্বার রোডের ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন ও অ্যাসিটিলিন কোম্পানী থেকে কিনে আনতে পার অথবা সায়েন্স এসোসিয়েসন থেকেও যোগাড় করতে পার। এক পাউণ্ডের দাম হয়তো ২।৩ টাকার মত হবে। পরীক্ষা করবার সুযোগ পেলে সাবধানে ব্যবহার করবে। শরীরের কোন স্থানে লাগলে অসম্ভব ঠাণ্ডায় সে স্থানটা অসাড় হয়ে যেতে পারে অথবা শক্ত ও বিবর্ণ হয়ে উঠবে। তবে জ্বলন্ত অঙ্গারকে যেভাবে মুহূর্তের জন্যে হাতে ধরে তোলা যায়, সেভাবে মুহূর্তের জন্যে স্পর্শ করে বা হাতে নিয়ে ঠাণ্ডাটা অনুভব করতে পার। একটা গোলাপ বা যেকোন ফুলকে সুতায় ঝুলিয়ে তরল বায়ুতে ডুবিয়ে দাও। তপ্ত তেলে মাছ ছেড়ে দিলে যেমন ছ্যাঁক করে শব্দ হয় ঠিক তেমন অবস্থাই হবে। এক আধ মিনিট পরে তুলে আন, দেখবে—চীনামাটির ফুলের মত শক্ত

তরল বায়ুতে হুইস্কি জমে শক্ত হয়ে সুতার সঙ্গে ঝুলছে

কেটলিতে তরল বায়ু রেখে সেটাকে একখণ্ড বরফের উপর রাখার ফলে তরল বায়ু যেন ফুটতে আরম্ভ করেছে

হয়ে গেছে। ঘা দিলে চীনামাটির জিনিষের মতই মটমট্ করে ভেঙে যাবে। গাছ থেকে ছিঁড়ে এনে একটা পাতা তরল বায়ুতে ডোবাও—দেখবে, সেই একই অবস্থা। যা কিছু নরম জিনিষ তরল বায়ুতে ডুবিয়ে দেখ, মুহূর্তের মধ্যেই পাথরের মত শক্ত হয়ে যাবে। আগুনের শিখা নেই এরূপ একটা জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি তরল বায়ুতে ডুবিয়ে দিলে জ্বলে উঠবে।

আচ্ছা, এবার একটা আরসোলো, টিকটিকি, ইঁদুর কিংবা একটা জ্যান্ত মাছকে তরল বায়ুতে ডুবিয়ে দেখ। ছ্যাঁক ছ্যাঁক, শোঁ শোঁ করে শব্দ হতে থাকবে। একটু পরেই তুলে এনে দেখ, চীনামাটি বা শ্বেতপাথরে তৈরী একটা মৃত প্রাণী ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। একটা টিউবে করে পারা বা অন্য কোন তরল পদার্থ তরল বায়ুতে ডুবিয়ে দিলে জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে যাবে। একটা কেটলিতে খানিকটা তরল বায়ু রেখে এক চাপ বরফের উপর বসিয়ে দিলেই মনে হবে, তরল বায়ু যেন জলের মত ফুটতে আরম্ভ করেছে। কারণ তরল বায়ু এত ঠাণ্ডা যে, বরফ তার তুলনায় আগুনের মত গরম। এ ছাড়া তোমাদের খুসীমত অন্যান্য যে কোন পদার্থকে তরল বায়ুতে ডুবিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পার।

কঠিন কাজের সহজ উপায়

জলের নীচে কোন জিনিষের গায়ে পেরেক ঢোকানোর কৌশল

মনে কর, জলের তলায় খুঁটি পুতে একটা কাঠামো তৈরী করতে হবে। খুঁটিগুলোকে ঠিকভাবে রাখবার জন্যে জলের নীচ থেকেই তাদের গায়ে আড়ভাবে কাঠের ঠেকা দেওয়া দরকার। এজন্যে খুঁটির গোড়ায় আড়াআড়ি ভাবে কাঠ বা তক্তা বসিয়ে পেরেক ঠুকে তাকে এঁটে দিতে হবে। কিন্তু জলের নীচে হাতুড়ির ঘা দিয়ে কাঠের মধ্যে পেরেক ঢোকানো যে কিরূপ অসুবিধার ব্যাপার তা সহজেই বুঝতে পার। এ অবস্থায় জলের নীচে সহজে পেরেক ঢোকাবার জন্যে একটা সহজ উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে।

কেবল কাঠামো তৈরী নয়, অন্যান্য আরও অনেক ব্যাপারে জলের নীচে কোন জিনিষের গায়ে পেরেক ঠুকতে হতে পারে।

লম্বা একটা লোহা বা পিতলের পাইপ যোগাড় কর। পাইপের ছিদ্রটা যেন খুব মোটা না হয়। পাইপের মধ্যে অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে এরূপ একটা লোহার রডও সংগ্রহ করতে হবে। পাইপের চেয়ে লোহার রডটা হবে খানিকটা বড়। এবার জলের নীচে কাঠের গায়ে যেখানে পেরেক বসাতে হবে
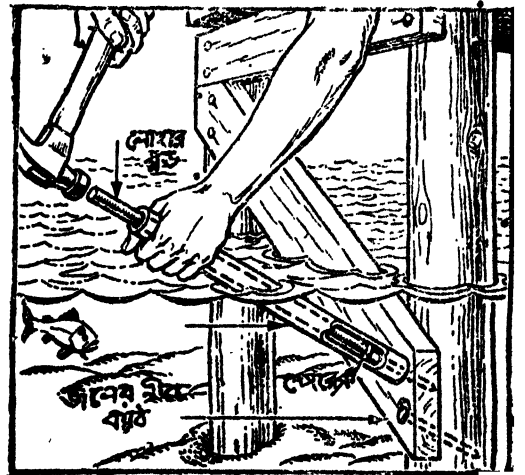
জলের নীচে পেরেক ঠোকবার সহজ ব্যবস্থা

সেখানে পাইপের মুখটাকে চেপে ধর। পাইপের অর্ধেকটা বা আরও বেশী হয়তো জলের নীচে থাকবে, আর বাকী অংশ থাকবে—জলের উপরে। এবার পাইপের উপরের মুখ দিয়ে একটা পেরেক ছেড়ে দাও। তারপর লোহার রডটাকে পাইপের মধ্যে ঢুকিয়ে আস্তে আস্তে কয়েকবার ঠুকলেই পেরেকটা কাঠের গায়ে একটুখানি বসে যাবে। এবার লোহার রডের উপর হাতুড়ির ঘা দিয়ে পেরেকটাকে সহজেই কাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে।

আঁকাবাঁকা তার সোজা করবার উপায়

সর্বদাই আমরা নানা কাজে লোহা, তামা, পিতলের তার ব্যবহার করে থাকি তারগুলো নতুন অবস্থায় থাকে কুণ্ডলী পাকানো। কাজেই যে কোন কাজে ব্যবহার করতে অসুবিধা ঘটে না। কিন্তু পুরণো তার এঁকেবেঁকে এমন একটা অবস্থায় উপনীত হয় যখন আর তাকে কষ্ট করে সোজা না করে কোন কাজে লাগানো যায় না। (যুদ্ধের সময় সব জিনিষেরই অভাব ঘটেছিল, আজও অবশ্য সে অবস্থার খুব পরিবর্তন হয়নি।) তখন নতুন তারের অভাবে পুরণো বা অব্যবহার্য তার দিয়েই কাজ চালাতে হতো। পূর্বে ব্যবহৃত তার এমন ভাবে এঁকেবেঁকে থাকে যে তাকে একটানাভাবে সোজা করা যেমন কষ্টসাধ্য তেমনই সময়সাপেক্ষ। হাতে টিপে টিপে বা আস্তে আস্তে হাতুড়ির ঘা দিয়ে একটু একটু করে সোজা করতে হয়। এরকমের আঁকাবাঁকা তার সোজা করবার জন্য তোমাদিগকে একটা সহজ উপায়ের কথা বলে দিচ্ছি। সরু ছিদ্রওয়ালা খানিকটা লম্বা একটা লোহা বা পিতলের পাইপ যোগাড় করে সেটাকে ছবির মত তিন চার জায়গায় বাঁকিয়ে নাও। এবার আঁকাবাঁকা তারের এক প্রান্ত একটু সোজা করে নিয়ে ওই বাঁকানো পাইপটার এক দিক দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য দিক দিয়ে বা'র কর। তারপর পাইপটাকে কোন কিছুতে আটকে রেখে অথবা পায়ে চেপে তারের প্রান্তভাগ ধরে জোরে টেনে আনলেই দেখবে—তারটা একটানা সোজা বেরিয়ে আসছে।

আঁকাবাঁকা তার সোজা করবার উপায়

নিটোলভাবে তার জড়ানোর সহজ উপায়

১৮নং বা ২০ নম্বরের তার জড়িয়ে অনায়াসেই তোমরা একটা নিখুঁৎ স্প্রিংএর মত জিনিষ তৈরী করতে পার। ১৮ বা ২০ নম্বরের একগাছা লম্বা তার নিয়ে সেটার

এক মুখ চেপে ধরে একটা পেন্সিল বা গোল রডের উপর খুব জোর করে টেনে গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে জড়িয়ে যাও, দেখবে—খুব সুন্দর নিখুঁৎ একটা স্প্রিংএর মত জিনিস তৈরী হয়েছে। কিন্তু তারের স্প্রিংটা যতই নিখুঁৎ হোক পেন্সিলের গায়ে জড়ান থাকা অবস্থায় ছেড়ে দিলেই দেখবে সেটা পেন্সিলের গায়ে ঢিলেভাবে রয়েছে। খুব নরম তার হলে ঢিলে হবে কম; কিন্তু শক্ত তার হলে ঢিলে হবে খুব বেশী। যাহোক, সরু তারকে একটু চেষ্টা করে নাহয় এঁটে জড়িয়ে দিতে পার; কিন্তু তার যদি অনেক মোটা এবং শক্ত হয় তবে শুধু হাতে টেনে কিছুতেই নিখুঁৎ এবং শক্ত করে জড়াতে পারবে না। ধর, একটা আট নম্বরের বা তার চেয়েও মোটা শক্ত লোহার তার; তাকে আধ ইঞ্চি মোটা একটা রডের গায়ে বেশ এঁটে স্প্রিংএর মত জড়াতে হবে। কেমন করে তাকে সহজভাবে জড়ানো যায়? ফুটখানেক লম্বা, প্রায় এক ইঞ্চি চওড়া একটু মোটা একখানা লোহার পাত সংগ্রহ কর। লোহার পাতটার মধ্যে একটা ছিদ্র থাকবে। ওই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে আট নম্বরের তারটা যেন আলগাভাবে গলে যেতে পারে। লম্বা তারটাকে লোহার পাতের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে গলিয়ে দাও। এবার তারের একপ্রান্ত চেপে রেখে লোহার পাতটাকে জোর করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তারটাকে রডের গায়ে অনায়াসে জড়িয়ে দিতে পারবে। ছবিটার দিকে লক্ষ্য করলেই ব্যাপারটা সহজে বুঝতে পারবে।
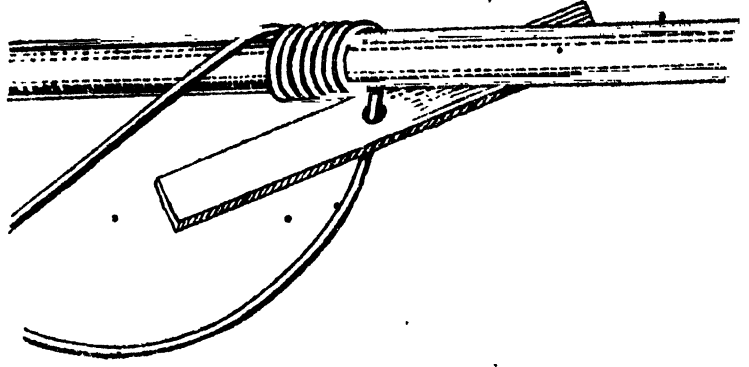
নিটোলভাবে তার জড়ানোর সহজ ব্যবস্থা

চুম্বক বড়শী

কয়েকটি ছেলে ছোট একটা নৌকায় চেপে খালের জলে বাইচ খেলছিল। অসতর্কতার ফলে একটি ছেলের হাত থেকে দামী একখানা রজার্সের ছুরি জলে পড়ে যায়। ছুরিটা উদ্ধার করবার জন্যে এক একজন এক এক রকম মতলবের কথা বলছিল। এদিকে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসছে। জলে কেউ নামতে রাজী নয়। তাছাড়া জলে নেমে যে ছুরিটা উদ্ধার করা সম্ভব নয়, এবিষয়ে কারো কোন সন্দেহ ছিল না। কারণ খোঁজাখুঁজিতে ছুরিটার পাঁকের তলায় চলে যাবার সম্ভাবনাই বেশী। একটি ছেলে এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। সে বললো, আমি নৌকায় বসেই ছুরিটা তোলবার ব্যবস্থা করছি, আমাকে পাড়ে তুলে দাও। বাড়ী তার ওখান থেকে খুব কাছেই। তাকে পাড়ে তুলে দেওয়া হলো। বাড়ীতে ছেলেটির একটা পুরাণো চুম্বক লোহা ছিল। প্রায় মিনিট কুড়িকের মধ্যেই চুম্বক

লোহাটা আর একগাছা লম্বা দড়ি নিয়ে ছেলেটি ফিরে এল। চুম্বকটাকে দড়ির এক প্রান্তে বেঁধে নৌকায় বসেই সেটাকে জলে নামিয়ে দিল। ছুরিটা যেখানে পড়েছিল দড়ি-বাঁধা চুম্বকটাকে সেখানে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক নড়াচড়া করবার পরই ছুরিটা চুম্বক সংলগ্ন হয়ে উঠে এল। তোমাদের অনেকেরই এরকম বুদ্ধি খেলে নিশ্চয়। অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিৎসার ফলে এই বুদ্ধিই ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে বৈজ্ঞানিক প্রতিভার স্ফুরণ করে থাকে।

জলের নীচে দেখবার ব্যবস্থা

চুম্বকের সাহায্যে জলের তলা থেকে ছুরি তুলে আনার কৌশলটাতো একটা সহজ বুদ্ধির ব্যাপার। চুম্বক, লোহাকে টানে। কাজেই দড়ি-বাঁধা চুম্বকের সাহায্যে একটা লোহার জিনিষকে জল থেকে তুলে আনা অদ্ভুত কিছুই নয়। কিন্তু লোহার ছুরির বদলে এমন কোন একটা দামী জিনিষ যদি জলে পড়ে যেত, যার মধ্যে লোহার কিছুমাত্র অংশ নেই, তাহলে সেটাকে জলের তলা থেকে সহজে উদ্ধার করবার কোন উপায় কি? তোমাদের কারো কারোর হয়তো কোন সহজ কৌশল জানা থাকতে পারে এবং ইচ্ছা করলে তা' প্রকাশও করতে পার। কিন্তু আমরা যে কৌশলের কথা জানি, সেটাই তোমাদিগকে বলছি। মোটের উপর, অদেখা জায়গার কোন জিনিষকে যদি কোন রকমে দেখবার ব্যবস্থা করা যায় তবে যত অসুবিধাই হোক, কোন না কোন উপায়ে তাকে উদ্ধার করা যেতে পারে।
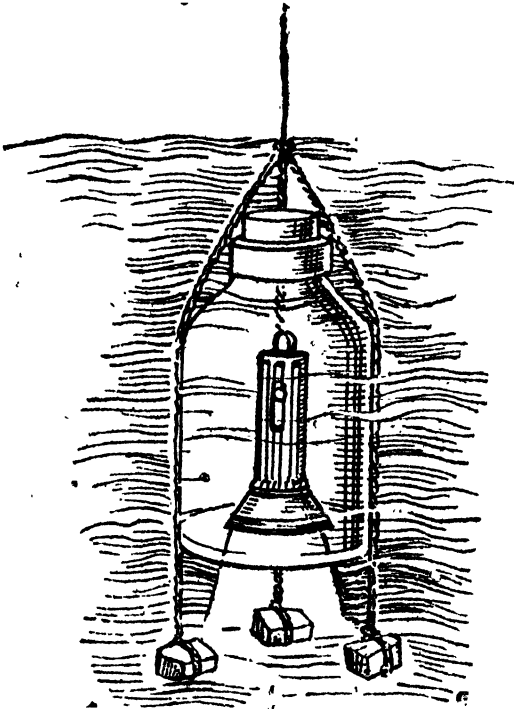
জলের নীচে আলো দেওয়ার ব্যবস্থা

নৌকায় চড়ে বেড়াবার সময় হাত থেকে দৈবাৎ একটা ফাউণ্টেন পেন জলে পড়ে গেল। পুরণো দিঘী, তলাটা পাঁকে ভর্তি, জলও গভীর। নাড়াচাড়া করে' খোঁজাখুঁজি করলে ক্ষুদ্র জিনিষটা পাঁকের নীচে তলিয়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই। ভেবে-চিন্তে একটা কৌশলের কথা মনে হলো। একটু অন্ধকার হ'তেই একটা টর্চলাইট জ্বালিয়ে নীচুদিকে মুখকরে সেটাকে একটা মোটা-মুখ কাচের বোতলে ভর্তি করলাম। বোতলটা যাতে জলের নীচে ডুবে যায় সেজন্যে তার সঙ্গে একটা ভার বেঁধে দেওয়া হলো। যে জায়গায় কলমটা পড়েছিল মোটামুটি আন্দাজ করে বোতলে ভরা টর্চটাকে

দড়ি বেঁধে যেখানে জলের নীচে নামিয়ে দিলাম। টর্চের আলোতে জলের তলা আলোকিত হয়ে উঠলো। উপরে অন্ধকার, কাজেই উপর থেকে জলের তলার প্রত্যেকটি বস্তু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। আলোটাকে এদিক ওদিক নিয়ে কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরই দেখা গেল— কলমটা এক জায়গায় কাৎভাবে পাঁকের মধ্যে খানিকটা ঢুকে গেছে। জলের তলায় জিনিষটাকে দেখতে পেলে যে কোন উপায়েই হোক, তোলবার ব্যবস্থা করা যায়। তারপর ছোট একটা বেতের ঝুঁড়িকে লম্বা লাঠির মাথায় হাতার মত করে জুড়ে দিয়ে তার সাহায্যে অনায়াসেই কলমটাকে তুলে আনা সম্ভব হলো। খুব ছোট্ট দামী জিনিষ জলে পড়ে গেলে এ উপায় অবলম্বন করে দেখতে পার। জল খুব পরিষ্কার হলেই দেখবার সুবিধা, ঘোলা বা অপরিষ্কারজলে ঝাপ্‌সা দেখাবে।

প্রসঙ্গত এখানে আরেকটা কথা [illegible]। রাত্রি বেলায় জলের তলায় এরূপ আলো নামিয়ে দিয়ে দেখবে, মাছ ধরবারও কত সুবিধা হয়। জলের তলায় নানা রকমের মাছ আলোর কাছে ছুটে আসে এবং উপর থেকে তাদের গতিবিধি পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। তখন নানারকম ফন্দি করে তাদের সহজেই ধরা যেতে পারে। গ, চ, ভ,

জেনে রাখ

উল্কা

তোমাদের অনেকেই হয়তো উল্কার কথা শুনেছ। উল্কাপাতও তোমরা অনেকে প্রত্যক্ষ করে থাকবে। উল্কা জিনিষটা কি— এ সম্বন্ধে অনেকেরই একটা কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। এই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে উল্কা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলছি।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মাঝে মাঝে প্রায়ই উল্কাপাত হয়ে থাকে। উল্কাপাতের ফলে গুরুতর রকমের কোন দুর্ঘটনা খুব কমই ঘটে। তবে সময়ে সময়ে একটি দুর্ঘটনার খবর শোনা যায়। যেমন ১৯৪৬ সালের ১৫ই মে, উল্কাপাতের ফলে মেক্সিকো ষ্টেটের অন্তর্গত স্যাণ্টা অ্যানা নামক একখানা গ্রাম ধ্বংস হয়ে যায় এবং ৮জন লোক নিহত ও ৪৮ জন আহত হয়।

[illegible]-বৃষ্টি

মাঝে মাঝে পৃথিবীর বুকে এক একটা অদ্ভুত নৈসর্গিক ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। ঝড়-জল, মেঘ-বিদ্যুৎ—কোন কিছুর চিহ্নমাত্র নেই, পরিষ্কার আকাশ—অকস্মাৎ ভীষণ শব্দে দিগ্বিদিক কাঁপিয়ে একটা জলন্ত বস্তুপিণ্ড আকাশ থেকে ছুটে এসে পৃথিবীর বুকে পড়লো। রাতের বেলায় এরকমের ব্যাপার ঘটলে হঠাৎ সমস্ত সমস্ত আকাশ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং পরমুহূর্তেই সেই জলন্ত বস্তুপিণ্ডটা প্রচণ্ডবেগে ভূমিতে পড়ে ভূগর্ভে প্রোথিত হয়ে যায়। কখনও কখনও আবার অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছোট ছোট অসংখ্য জলন্ত পাথরের টুকরা, বৃষ্টিধারার মত বর্ষিত হয়ে থাকে। এরূপ ঘটনাগুলোকে বলা হয়—উল্কাবৃষ্টি। পৃথিবীর ইতিহাসে উল্কাপাতের সংখ্যা অগণিত। তবে তার মধ্যে কতকগুলো উল্কাপাতের বিশেষ বিশেষ ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগৃহীত ছোটবড় বিভিন্ন আকারের উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর বিভিন্ন যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। আমাদের কলকাতার যাদুঘরেও বিভিন্ন আকারের অনেক উল্কাপিণ্ড সংরক্ষিত হয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে পতিত উল্কাগুলো পরীক্ষা করে দেখা গেছে—এদের কতকগুলো বিভিন্ন খনিজ পদার্থ মিশ্রিত প্রস্তরে গঠিত, কতকগুলো কেবল লোহা ও নিকেল মিশ্রিত ধাতব পদার্থের, কতকগুলোর মধ্যে আবার উভয় রকম পদার্থের অস্তিত্ব দেখা যায়। পিণ্ডগুলোর মধ্যে গ্র্যাফাইট, হীরক, প্ল্যাটিনাম, লোহা, নিকেল, রেডিয়াম, ম্যাগ্নেটাইট, ক্রোমাইট প্রভৃতি নানারকম পদার্থের অস্তিত্ব দেখা যায়। পাঞ্জাবের ধরমশালা প্রস্তর উল্কার মধ্যে সামান্য রেডিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে।

১৯০২ সালে অরিগনে প্রাপ্ত লৌহ-উল্কা

বিচিত্র আকারের উল্কা দেখা যায়। কতকগুলো দেখতে মোচার মত, কতকগুলো ন্যাস-পাতির মত, কতকগুলো আবার পটোলের মত দু'দিক সূচালো। তাছাড়া চাকা বা বালার মত গোলাকার উল্কারও অভাব নেই। আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে এদের পতনের

গতিবেগও অসাধারণ; অবস্থাভেদে সেকেণ্ডে ৭.৮ মাইল থেকে প্রায় ৪৭৷৪৮ মাইল বেগে ছুটে চলে। এরূপ দ্রুতগতিতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে ছুটে আসে বলেই বাতাসের সংঘর্ষে এদের বাহিরাবরণটা প্রায়ই ক্ষয়ে যায় এবং বহু ছিদ্রবিশিষ্ট হয়ে পড়ে। ছোটবড় হিসাবে উল্কাপিণ্ডগুলোর ওজনও সামান্য দু'এক সের থেকে কয়েক শত মণ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

প্রস্তর-উল্কা ভংগপ্রবণ বলে সহজেই বিদীর্ণ হয়ে বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু লৌহ-উল্কা লোহা ও নিকেলের সংমিশ্রণে এত শক্ত হয়ে থাকে যে, সহজে বিদীর্ণ হয় না। ১৮৯১ সালে আমেরিকার কানসাস প্রদেশের লং-আইল্যাণ্ড থেকে সবচেয়ে বড় প্রস্তর-উল্কা পাওয়া গেছে, এর ওজন ১২৭৫ পাউণ্ড। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব উল্কা পাওয়া গেছে, তার মধ্যে ১৯২০ সালে প্রাপ্ত এলাহাবাদের মেরুয়া নামক স্থানের প্রস্তর উল্কার ওজনই বোধহয় সবচেয়ে বেশী। এর ওজন মাত্র দু'মণের মত। ১৯৩৫ সালে রাত্রিবেলায় ত্রিপুরা জেলার কয়েকটি গ্রামেরউপর উল্কাবৃষ্টি হয়েছিল। উল্কার আবির্ভাবে সমস্ত আকাশ আলোকিত হয়ে ওঠে এবং ভীষণ বজ্রনাদের সংগে সংগেই সেটা বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে প্রায় ১৫ বর্গমাইল জায়গার উপর ইতস্তত: ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৩ সালে সন্ধ্যার কিছু পরে ঢাকা জেলার দোগাছিতেও এরূপ উল্কাবৃষ্টি দেখা গিয়েছিল। আকাশে একটা জ্বলন্ত গোলক আবির্ভাবের সংগে সংগেই ভীষণ শব্দে বহু খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেটা প্রায় ছ'মাইল-ব্যাপী স্থানে ইতস্ততঃ ছিটকে পড়েছিল। আমাদের দেশের উল্কাপাতের এরূপ আরও বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রস্তর, উল্কা পাওয়া গেছে; তবে ১৮৭০ সালে মাদ্রাজের ভাইজাগ জেলায়, ১৮৯৮ সালে কোদাইকানালে এবং ১৯৩৪ সালে মোরাদাবাদ জেলায় লৌহ-উল্কা পতিত হয়েছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উল্কাপাতের ফলে ভূপৃষ্ঠে প্রায় দু'তিন ফুট থেকে চার পাঁচ ফুট গভীর গর্ত হয়ে থাকে; কিন্তু আমেরিকার আরিজোনা প্রদেশে বিরাট একটা উল্কাপাতের ফলে প্রায় ৫৭০ ফুট গভীর ও ৪০০০ ফুট আয়তনের বিশাল এক গর্তের সৃষ্টি হয়েছিল।

পতনের মুখে উল্কাটা বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে

অতি প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষ উল্কাপাত দেখে আসছে; কিন্তু এদের উৎপত্তিস্থল কোথায়—এসম্বন্ধে আজও নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যায় না। তবে বিভিন্ন ধরণের উল্কা এবং তাদের গতি, প্রকৃতি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে অনেককিছু জানা সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক অনেককাল থেকেই আকাশ থেকে পতিত উল্কাপিণ্ডকে "স্বর্গীয় পদার্থ" জ্ঞানে ভয় ও ভক্তির সংগে পূজা করে আসছিল। তার পর বিভিন্ন সময়ের বিজ্ঞানীরা উল্কা সম্বন্ধে ক্রমশঃ বিভিন্ন মতবাদ প্রচার করতে থাকেন। নরম্যাণ্ডির বিরাট উল্কাপাতের পর ১৮০৩ সালে ফরাসী খনিজতত্ত্ববিদ বিয়ট বিবিধ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন যে, উল্কা পিণ্ডগুলো আমাদের পৃথিবীর কোন পদার্থ নয়, পৃথিবীর বাইরে থেকেই এগুলো

এসে থাকে। কিন্তু কথা হচ্ছে—পৃথিবীর বাইরে এ অদ্ভুত পদার্থগুলোর কোথায়, কিভাবে উৎপত্তি হয়? কারো মতে—কোন কোন আগ্নেয়গিরি থেকে প্রচণ্ডবেগে নিক্ষিপ্ত দু'একটা প্রস্তর খণ্ড ভীষণ বেগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে চলে যায়। তারাই আবার উল্কারূপে পৃথিবীর বুকে ফিরে আসে। কেউ বলেন, চন্দ্র অথবা অন্য কোন গ্রহের আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত প্রস্তর বা লৌহখণ্ড সমূহই আমাদের পৃথিবীতে উল্কারূপে পতিত হয়, কারো মতে—সূর্য্য বা নক্ষত্র থেকেও এরূপ বস্তুপিণ্ড ছিটকে আসা অসম্ভব নয়। কেউ কেউ বলেন—কোন ধূমকেতু হয়তো কোন কারণে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তারই অংশ-বিশেষ পৃথিবী কর্তৃক আকৃষ্ট হয়ে মাঝে মাঝে উল্কারূপে দেখা দিয়ে থাকে। আবার কারো কারো মতে পৃথিবীর নিকটবর্তী কোন বিধ্বস্ত গ্রহ বা উপগ্রহের
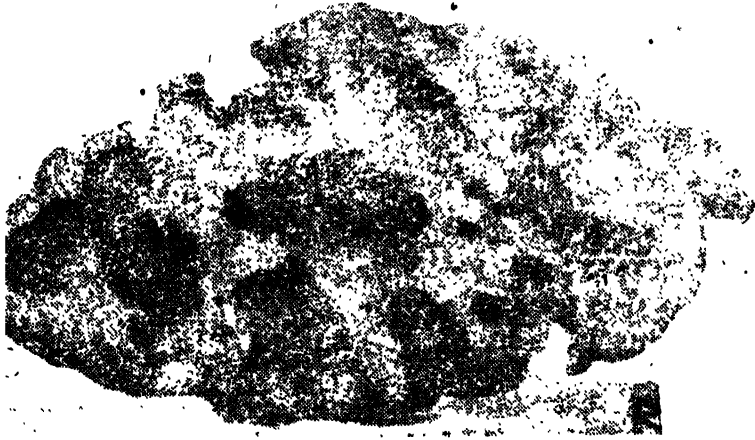
উইলিয়ামেট লৌহ-উল্কার একদিকের দৃশ্য

বিচ্ছিন্ন অংশবিশেষই উল্কারূপে পৃথিবীতে ছুটে আসে। কিন্তু মতবাদের বৈচিত্র্য যা-ই থাক না কেন উল্কাপিণ্ডগুলো যে পৃথিবীর কোন পদার্থ নয়, একথা সহজেই বুঝা যায়। কারণ উল্কাপিণ্ডের উপাদানের সংগে অনুরূপ পার্থিব পদার্থের যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। উল্কাপিণ্ড সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পৃথিবীর কাছাকাছি ছোট গ্রহ বা উপগ্রহের মত কোন বিধ্বস্ত বস্তুপিণ্ডের বিচ্ছিন্ন অংশগুলোই পৃথিবীতে উল্কারূপে উপনীত হয়ে থাকে। খুবসম্ভব এই অজ্ঞাত বস্তুপিণ্ডটার আমাদের পৃথিবীর মত কোন বায়ুমণ্ডল না থাকাতে অতি দ্রুত ঠাণ্ডা হওয়ার ফলে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। অথবা পৃথিবীর মত বিশাল বস্তুপিণ্ডের সান্নিধ্যে আসার ফলেও সে বিধ্বস্ত হয়ে থাকতে পারে। বিধ্বস্ত হলেও সূর্যের আকর্ষণে তাকে একটা নির্দিষ্ট পথেই ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। এর ফলে হয়তো তাকে পৃথিবীর কক্ষপথ অতিক্রম করে যেতে হয়। এই সময়ে কতক কতক বিচ্ছিন্ন অংশ উৎক্ষিপ্ত বা আকর্ষিত হয়ে পৃথিবীর বুকে উল্কাপাত বা উল্কাবৃষ্টির সৃষ্টি করে। অবশ্য এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলোর উৎক্ষিপ্ত হওয়ার মূলে অগ্ন্যুদগীরণ বা অনুরূপ কোন বিস্ফোরণের ব্যাপার থাকাই সম্ভব। এই বিধ্বস্ত বস্তুপিণ্ডটার অভ্যন্তর ভাগ থেকে যে পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হয় সেগুলোই হচ্ছে—লৌহ-উল্কা, আর প্রস্তর উল্কাগুলো এর বহিরাবরণের অংশমাত্র।

গ. চ. ভ.

বিষয়-সূচী, 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'

জানুয়ারী '৪৮

ফেব্রুয়ারী, '৪৮

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা

মে, '৪৮

জুন, '৪৮

নভেম্বর, '৪৮

ডিসেম্বর, '৪৮

বর্ণানুক্রমিক লেখক-সূচী-জ্ঞান ও বিজ্ঞান, ১৯৪৮